# প্রধানতম বিচারালয়ের

## আপীল বিভাগ—নিষ্পন্ন মোকদ্দমার

# বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

UNDER THE PATRONAGE

OF

THE GOVERNMENT OF BENGAL

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের পরিপোষকতায়

শ্রীযুক্ত অভয়াদাস বসু

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ষষ্ঠ ভাগ। ১৮৭০


কলিকাতা

বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র

কালেজ-স্কোয়ার নং ৪

১২৭৭ সাল।


বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ২৩ টাকা। ষাণ্মাসিক, ১৩॥০ টাকা

এই ভাগের মূল্য ১৫ টাকা।

## দেওয়ানী।



---

## পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

## দেওয়ানী।

# দেওয়ানী।



# মাল।



# পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

# দেওয়ানী।



# মাল।



# ফৌজদারী।



# পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।



# প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

# দেওয়ানী।



# ফৌজদারী।



---

# পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

## দেওয়ানী



## মাল।

## দেওয়ানী।



## মাল।



## ফৌজদারী।

## দেওয়ানী।

# দেওয়ানী।



# মাল।



# ফৌজদারী।

## দেওয়ানী।

উ। ১৩ পৃষ্ঠা।

২২৪। মেঘনারায়ণ সিংহ
বঃ রাধাপ্রসাদ সিংহ।
ডিক্রীক্রেতাকে ডিক্রীদারের স্থলাভিষিক্ত করণের ক্ষমতা। দেঃ কাঃ বিঃ ২০৮ ধারা। ঐ ক্ষমতানুযায়ী হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল। ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা। ... ২১১

২২৬। লালচাঁদ রায়
বঃ বৃন্দাবনচন্দ্র রায়।
দেওয়ানী মোকদ্দমা। ফৌজদারী মোকদ্দমার সাক্ষ্য। ... ... ২১৩

২৩০ মসম্মত এতওয়ারী
বঃ রামনারায়ণ রাম।
নাবালগের সম্পত্তির অপচয় নিবারণার্থে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে অভিভাবক নিয়োজিত করিয়া সার্টিফিকেট দিতে আদালতের ক্ষমতা। ... ... ... ২১৫

## মাল।

২১৬। হরক সিংহ
বঃ তুলসীরাম সহায়।
করবৃদ্ধির মোকদ্দমা। ইসু। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার অনুমান। পক্ষগণের নিজ স্বত্ব নিজে উত্থাপন করার আবশ্যকতা। ঐ আইনের ৬৫ ধারা। ইসু নির্দ্ধারণের প্রণালী ... ... ... ৩০

২২২। আনন্দমোহন শর্ম্মা, তালুকদার
বঃ গিরিজাকান্ত লাহিড়ী।
বাঃ কৌঃ ১৮৭২ সালের ৬ আইনের ২৭ ধারা। মোকদ্দমা উঠাইয়া অন্য

উ। ১৩ পৃ।
হাকিমের নিকট অর্পণের ক্ষমতা। অনুষ্ঠিত নীলাম অন্যথা করার কার্য্যপ্রণালী। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারা ও দেঃ কাঃ বিঃ ২৫৬ ধারা ... ... ৩৮

## ফৌজদারী।

২৪। রজনীকান্ত ভূমিক, দরখাস্তকারী।
প্রসিদ্ধ কুব্যবসায়ের অপরাধ বিচারপ্রণালী। প্রমাণ। ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৯৬ ধারা। ... ... ৩১

২৫। মহারাণী বঃ উমাময়ী দেবী।
দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি। ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৯ এবং ১৭০ ধারা। ... ৩৪

২৬। মহারাণী বঃ সরফুদ্দীন।
অপহৃত সম্পত্তি অপরাধভাবে গ্রহণ। গ্রহণের কারণের প্রমাণ-ভার। জুরির অনুমান। ... ... ... ৩৫

১৭। মহারাণী বঃ হারু রাজোয়ার।
ডাকাইতীর অপরাধ। দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা। দণ্ড। ... ৩৭

নবীনচন্দ্ররায়ের অভিযোগ মতে, মহারাণী বঃ সুরেন্দ্রনাথ রায়, প্রভৃতি।
ফৌঃ কাঃ বিঃ ৬৮ ধারা প্রয়োগের স্থল। গেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট জারী করার ক্ষমতা। ফৌঃ কাঃ বিঃ ৭৭ ধারা। ওয়ারেণ্ট জারীর প্রণালী। হাজত। আসামীগণকে স্থানে স্থানে লইয়া বেড়ান অবৈধ। ... ... ”

৩৩। মহারাণী বঃ সোহরাই।
জ্ঞান-কৃত বধ। গুরুতর ও হঠাৎ ক্রোধোৎপাদন। জুরির নিষ্পত্তিতে

## দেওয়ানী।

## মাল।

## দেওয়ানী।



## ফৌজদারী।

## দেওয়ানী।

## দেওয়ানী



## মাল।

| উ। ১৩ | পৃষ্ঠা। |
|---|---|
| ২৮৪। তিলকধারী রায় বঃ মুরলীধর রায়। | |
| ওমেদওয়ার কর্ত্তৃক স্থানীয় তদন্তের রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭১ ধারা ... ... ... | ৫১ |
| ”। স্বরূপচন্দ্র চৌধুরী বঃ নিমচাঁদ চক্রবর্ত্তী। | |
| দুই হাওয়ালার খাজানার দাবীতে একত্রে এক নালিশ ... ... ... | ৫২ |
| ২৯৪। রামেশ্বর সিংহ অযোধ্যাপ্রসাদ সিংহ। | |
| দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত ডিক্রী। খাস আপীল। প্রমাণ। বিপক্ষের খাতা ... ... ... | ৫৪ |

| উ। ১৩ | পৃষ্ঠা |
|---|---|

## প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

| | |
|---|---|
| ২৩। বীরচন্দ্র যুবরাজ বঃ ভুলুয়ার ডেপুটি কালেক্টর। | |
| দখল ও দখলের স্বত্ব। তমাদী | ১৭ |
| ২৪। খাজে আসানুল্লা বঃ অভয়চরণ রায়। | |
| বিচারাধিকার। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ। গবর্ণমেণ্টের জমিদারী-স্বত্ব বিক্রয়। অধীন তালুকদারদিগকে উচ্ছেদিত করিবার স্বত্ব। ১৮২২ সালের ১১ কানুন ... ... ... | ১৮ |

## ভ্রম সংশোধন

ষষ্ঠ ভাগ, দেওয়ানী নিষ্পত্তি, ২৯১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের চুম্বকে ‘ ১৩৭ ’ ধারা স্থলে ‘ ২৩৭ ’ ধারা পাঠ্য।

ষষ্ঠ ভাগ, মালসংক্রান্ত নিষ্পত্তি, ৫২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩৪ পঁক্তিতে ‘ চৌধুরী ’ স্থলে ‘ চক্রবর্ত্তী ’ পাঠ্য।

# দেওয়ানী।

## দেওয়ানী।





## মাল।



## ফৌজদারী

---

## পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।



## প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

## দেওয়ানী



## প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

# দেওয়ানী

---

## পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

# দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

## দেওয়ানী।



---

## মাল।

## ফৌজদারী

বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত এবং সাহায্যকৃত।

# প্রধানতম বিচারালয়ের

## আপীল বিভাগ—নিষ্পন্ন মোকদ্দমার

# বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট।

ষষ্ঠ ভাগ। ১৮৭০।

দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

৪ ঠা জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ১৪৭২ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের মুন্সেফের ১৮৬৭ সালের ১০ ই এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ৩০ এ মার্চ তরিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

নম্মু সাহু (বাদী) আপেলাণ্ট।

বুদ্ধু জমাদার (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন বিক্রেতা আপন বিক্রয়-পত্রে লেখে যে, সে কোন ভূমি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের মালিক এবং বাকী অর্দ্ধাংশ অপর এক ব্যক্তির সম্পত্তি, তবে তাহাই, ঐ বিক্রেতার সেই বাকী অর্দ্ধাংশের মালিক হওয়ার প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ গণ্য হইবে না, এবং ঐ বিক্রেতার নিকট যাহারা সেই বাকী অর্দ্ধাংশ ক্রয় করে তাহাদেরও স্বত্বের কোন হানি হইবে না।

বিচারপতি লক।—পুনঃপ্রেরণের পরে নিম্ন আপীল-আদালত যে রায় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি একটি সম্পূর্ণ নূতন মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মসম্মত সাকরান যে তিন বিক্রয়-পত্র, অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২২ এ ডিসেম্বর তারিখে রহিম বক্সের বরাবর এক খানা, ১৮৬৪ সালের ১৫ ই ডিসেম্বরে দ্বিতীয় এক খানা ও ১৮৬৬ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বাদীর বরাবর তৃতীয় এক খানা, লিখিয়া দেয় তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বিক্রেতা মসম্মত সাকরাণ তাহার পিতা খাজা নুরুদ্দীনের দায়াধিকারিণী সূত্রে ঐ তিন দলীল স্বাক্ষর করে, এবং বাদীর সাক্ষিগণ বলিয়াছে যে, নুরুদ্দীন যে তাহার বিধবা মসম্মত তাজনকে ও তাহার দুই কন্যা মসম্মত সাকরাণ ও মিছরণকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করে, ঐ সম্পত্তি প্রথমে সেই নুরুদ্দীনের সম্পত্তি ছিল, এবং যে স্থলে তাহা বিক্রেতার পিতা নুরুদ্দীনের সম্পত্তি ছিল, সে স্থলে প্রত্যেক কন্যা ।৶০ আনা ও মাতা ৵০ আনা অংশ পাইবে, এবং মিছরণ তাহার মাতার পূর্ব্বে মরিয়াছে কি না, তাহা সপ্রমাণ হইলে কোন বিশেষ ফল দর্শে না, কারণ, তদ্দ্বারা কেবল ঐ ৵০ আনা অংশের প্রতি স্বত্বের ব্যতিক্রম হইবে; কিন্তু যে স্থলে বিক্রেতা সাকরাণ তাহার ১৮৬১ সালের ২২ এ ডিসেম্বরের বিক্রয়-পত্রে লিখিয়াছে যে, সে নিজে কেবল ঐ সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের মালিক এবং আমীর হোসেন বাকী

অৰ্দ্ধাংশের মালিক, সে স্থলে তাহাকে এইক্ষণে ঐ কথা অস্বীকার করিতে ও ১৬ আনাই তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

বাদীর নালিশ এই যে, সম্পত্তি তাজনের ছিল এবং তাহার মিছরণ ও সাকরাণ নাম্নী দুই কন্যা ছিল; মিছরণ আমীর হোসেন নামক এক পুত্র রাখিয়া আপন মাতার পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করে; মিছরণ তাহার মাতার পূর্ব্বে মরাতে তাজনের মৃত্যুর পরে সমুদায় সম্পত্তি সাকরাণের হস্তে অনুগমন করে; সাকরাণ, ১৮৬১ সালে রহীম বকসকে অৰ্দ্ধাংশ, ও বাদীকে বাকী অৰ্দ্ধাংশ বিক্রয় করে। অতএব মিছরণ তাহার মাতার পূর্ব্বে মরিয়াছিল কি না তাহা নির্ণয় করা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; কিন্তু নিম্ন আদালত পূর্ব্বে তাহা নির্ণয় করিয়াছিলেন না। জজ এইক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সে তাহার মাতার পূর্ব্বে মরে, কিন্তু তিনি আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সম্পত্তি নুরুদ্দীন হইতে আগত হয় এবং তাহার মৃত্যুর পরে মিছরণ ।৶০ আনা, সাকরাণ ।৶০ আনা ও তাহার বিধবা স্ত্রী তাজন ৶০ আনা প্রাপ্ত হয়, এবং তিনি বলেন যে, সাকরাণ যে সকল বিক্রয়-পত্র স্বাক্ষর করিয়াছে তদ্দ্বারা ও বাদীর সাক্ষি-গণের জবানবন্দী দ্বারাই ঐ বিষয় সপ্রমাণ হই-য়াছে। আমরা ঐ সকল বিক্রয়-পত্র এবং বাদীর সাক্ষিগণের জবানবন্দী পড়িয়া দেখিলাম যে, ১৮৬১ সালের ২২ এ ডিসেম্বরের ও ১৮৬২ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির দলীল, কেবল যাহাই এই মোকদ্দমার প্রমাণ, তাহাতে মসম্মত সাকরাণ এই সম্পত্তি তাহার পিতা নুরুদ্দীনের নিকট পাইয়াছে বলিয়া অথবা তাহার দায়াধিকারিণী সূত্রে বিক্রয় করে নাই। সে এই মাত্র ব্যক্ত করিয়াছে যে, সে নুরুদ্দীনের কন্যা, এবং শেষোক্ত বিক্রয়-পত্রে সে মৌরসী শব্দের উল্লেখ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মাতার নিকট হইতে সম্পত্তি পাইলেও ঐ শব্দ সমতুল্য রূপে খাটিতে পারে। আমরা আরও দেখিতেছি যে, বাদীর সাক্ষিগণের মধ্যে কেহই নুরুদ্দীনের নাম উল্লেখ করে নাই। তাহারা বলে যে, তাহা তাজনের সম্পত্তি ছিল, এবং সাকরাণের হস্তে তাহা অনুগমন করে। অধঃস্থ জজের এই মোকদ্দমার প্রমাণের মৰ্ম্ম সম্বন্ধে কি প্রকারে এমন ভ্রম হইয়াছিল তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

অপিচ, ১৮৬১ সালের কবালায় যে কথা লেখা আছে তৎসম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, ইহা সত্য বটে যে, মসম্মত সাকরাণ বলিয়াছে যে, সে সম্পত্তির অৰ্দ্ধাংশে স্বত্ববতী, এবং বাকী অৰ্দ্ধাংশ আমীর হোসেনের সম্পত্তি। যদিও এই আদালত তাঁহাদের পুনঃপ্রেরণের রায়ে দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, ঐ কথা সাকরাণের বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রমাণ ভিন্ন চূড়ান্ত প্রমাণ হইতে পারে না, এবং ক্রেতার স্বত্বেরও ক্ষতি-কর হইতে পারে না, তথাপি অধঃস্থ জজ তাহা স্বকাৰ্য্য-জনিত বাধা স্বরূপ বিবেচনা করি-য়াছেন। তাহা ঐ রূপ বাধা না হওয়াতে আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতের হুকুম অন্যথা হইবে, কারণ, সাকরাণ যে সমু-দায় ষোল আনার স্বত্ববতী ছিল না, তদ্বিষয়ে ঐ কথা ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ নাই। আমরা অধঃস্থ জজের হুকুম অন্যথা করিয়া প্রথম আদালতের হুকুম স্থির রাখিলাম। আপেলাণ্ট তাহার এই আদালতের ও নিম্ন আপীল-আদা-লতের খরচা পাইবে। (ক্র)

---

৫ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪৪৬ নং মোকদ্দমা।

হুগলীর প্রথম অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩ রা এপ্রিলের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া উক্ত প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১৬ ই জুলাই

তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

একক‌ড়ি সিংহ প্রভৃতি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

৺বিজয়নাথ চট্টোপাধ্যায় (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ভূমির দখলের মোকদ্দমার আরজীতে ওয়াশীলাতেরও দাবী ছিল, কিন্তু ঐ ভূমির কতক অংশের ডিক্রী হয়, এবং ঐ ডিক্রীতে ওয়াশীলাতের কোন হুকুমই থাকে না। ভূমির যে অংশের ডিক্রী হয় নাই তৎসম্বন্ধে বাদী আপীল করে, এবং নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের এই বিষয়ক রায় অন্যথা করত আপীল "ডিক্রী" করেন।

এ স্থলে ডিক্রীতে ওয়াশীলাৎ প্রদানের হুকুম না থাকায়, এবং এই মোকদ্দমার ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধীয় তর্ক ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার অন্তর্গত হইতে না পারায় ঐ ডিক্রীজারীতে সেই ওয়াশীলাৎ পাওয়া যাইতে পারে না।

আর, নিম্ন আপীল-আদালতের ডিক্রী-লিখিত "আপীল ডিক্রী হইল" এই বাক্যের এমন অর্থ নহে যে, আপেলাণ্ট যাহা কিছু চাহিয়াছিল তৎসমুদায়ই তাহাকে দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে আপেলাণ্ট বস্তুতঃ এমন কোন ডিক্রী পায় নাই যাহা জারী করা যাইতে পারে।

যাবতীয় ডিক্রীই আদালতের নিজের কার্য্যের দ্বারা জারী হয়; অতএব পক্ষগণ যে প্রকার তাহাদের নিজের বন্দোবস্তের অথবা আচরণের দ্বারা নূতন করিয়া আদালত-কর্তৃক কার্য্য করাইতে পারে না, তদ্রূপ, আদালত যে প্রতিকার প্রদান করেন, তাহার ফলও তাহাদের কার্য্য দ্বারা বিস্তারিত হইতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—বাদী আমাদের সম্মুখে ডিক্রীদার ও খাস রেস্পণ্ডেণ্ট স্বরূপে উপস্থিত; সে কতক ভূমির জন্য খাস আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে এক নালিশ করে। সেই মোকদ্দমায় সে যত ভূমির জন্য দাবী করিয়াছিল তন্মধ্যে ২২ বিঘা ভিন্ন আর সমুদায়ের জন্য সে প্রথম আদালতে ডিক্রী পায়। ঐ ভূমির ওয়াশীলাতের জন্যেও আরজীতে প্রার্থনা ছিল, কিন্তু ডিক্রীতে ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই নাই।

বাদী প্রথম আদালতের ডিক্রীতে অসন্তুষ্ট হইয়া যে ২২ বিঘা ভূমির জন্য সে ডিক্রী পায় নাই, তৎসম্বন্ধে জেলা-জজের নিকট আপীল করে, এবং সেই আদালত এতদ্বিষয়ে নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা করিয়া আপীল "ডিক্রী" করেন।

তাহার পরে, বাদী প্রথম মোকদ্দমায় কিছুই ওয়াশীলাৎ পায় নাই দেখিয়া, আরজীর লিখিত কালের ও তৎপরের ওয়াশীলাৎ পাওয়ার-নিমিত্ত দ্বিতীয় নালিশ উপস্থিত করে। দেখা যাইতেছে যে, এই দ্বিতীয় নালিশ এই হেতুবাদে ডিস্‌মিস্ হয় যে, বাদীর প্রথম ডিক্রীজারীতেই ওয়াশীলাৎ লওয়া উচিত ছিল। সে এই ওয়াশীলাৎ পাওয়ার জন্য এইক্ষণে তাহার সেই প্রথম ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং হুগলীর অধঃস্থ জজ ও জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ডিক্রীদার তাহার প্রথম ডিক্রীজারী করিয়া ঐ ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিচারাদিষ্ট-দায়িগণ আমাদের নিকট খাস আপীল করিয়া তর্ক করে যে, ঐ ডিক্রীজারী তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে; এবং ইহা অন্যায় রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ডিক্রীদার ঐ ডিক্রীজারীতে ওয়াশীলাৎ পাইতে পারে।

আমি বিবেচনা করি, ইহা সন্তোষকর রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তমাদী ঘটে নাই, কারণ, মূল মোকদ্দমার খাস আপীলে যে চূড়ান্ত ডিক্রী প্রদত্ত হয় তদবধি ৩ বৎসরের মধ্যেই ডিক্রী-জারীর প্রার্থনা হইয়াছে।

কিন্তু দ্বিতীয় তর্ক সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, খাস আপেলাণ্ট অবশ্য কৃতকার্য্য হইবে। তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা নিম্ন আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তির পোষকতা করে, এবং তদনুসারে ডিক্রীদার তাহার ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান্। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ঐ ধারার মর্ম্ম তাহা নহে। ঐ ধারার বাক্যগুলি এই যে, "কোন ওয়াশীলাৎ যত টাকা হয়, এই কথা "ডিক্রীজারীর কালে নিষ্পত্তি হইবে এমত "কথা যদি ডিক্রীর মধ্যে থাকে, তবে সেই "বিষয়ের কোন বিবাদ হইলে, অথবা মোক- "দ্দমা উপস্থিত করিবার তারিখ অবধি ডিক্রী- "জারী না হইবার তারিখ পর্য্যন্ত বিবাদের "বিষয়ের উপর যে কিছু ওয়াশীলাৎ কি সুদ" (ইহা আমার বোধ হয়, সম্পূর্ণ রূপে লিখিতে হইবে) "দেনা হইতে পারে তাহার বিষয়ে "কিম্বা ডিক্রীর টাকার পরিশোধে কি ডিক্রী- "জারী প্রভৃতিক্রমে যে টাকা দেওয়া গেল "কথিত হয় তদ্বিষয়ে, ও যে মোকদ্দমায় ডিক্রী "হইয়াছে সেই মোকদ্দমার বাদি-প্রতিবাদীর "মধ্যে ঐ ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় অন্য কোন "বিষয়ে বিবাদ হইলে" ইত্যাদি। দাবী-কৃত বিষয় ১১ ধারার অন্তর্গত করিতে হইলে, তাহা ঐ ধারার প্রথম বাক্যের কয়েক দফার কোন এক দফার অন্তর্গত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ যে ওয়াশীলাতের পরিমাণ পশ্চাতে নির্ণীত হইবে বলিয়া ডিক্রীতে লেখা থাকে তৎসম্বন্ধীয় কোন বিবাদ বা নালিশ উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে ডিক্রীজারীর তারিখ পর্য্যন্ত বিরোধীয় বিষয়ের উপর যে কিছু ওয়াশীলাৎ বা সুদ দেয় হইতে পারে তদ্বিষয়ক কোন বিবাদ, অথবা যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে তাহার পক্ষগণের মধ্যে ঐ ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় অন্য কোন বিষয়ক কোন তর্ক, হওনাবশ্যক।

আমার বোধ হয় যে, ডিক্রীতে যাহা নাই, পক্ষগণের মধ্যে তৎসম্বন্ধীয় কোন কথা ঐ ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় প্রশ্ন গণ্য হইতে পারে না। অতএব যে স্থলে ইহা ঐ ধারার প্রথম বাক্যের শেষ সাধারণ শব্দগুলির অন্তর্গত হইতে পারে না, সে স্থলে তাহা ঐ ধারার পূর্ব্ব দফা সমস্তের কোন এক দফার অন্তর্গত হওয়া উচিত। ইহা ওয়াশীলাতের পরিমাণ সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রশ্ন নহে, যাহা ডিক্রীজারীতে নির্ণীত হইবে বলিয়া ডিক্রীতে লেখা ছিল, কারণ, ডিক্রীতে এমন কোন প্রসঙ্গই নাই। নালিশ উপস্থিতের তারিখ হইতে ডিক্রীজারীর তারিখ পর্য্যন্ত বিরোধীয় বিষয়ের উপর যে কিছু ওয়াশীলাৎ কি সুদ দেয় হয়, ইহা তাহার পরিমাণেরও প্রশ্ন নহে, কারণ, ডিক্রীতে তাহা দেয় বলিয়া কোন হুকুম নাই; বিশেষতঃ, এই মোকদ্দমায় পরিমাণ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উল্লিখিত হয় নাই। আমাদের বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, বাদী ওয়াশীলাৎ পাইবে কি না। অতএব এই প্রশ্ন কোন প্রকারেই ১১ ধারার ১ম দফার অন্তর্গত হইতে পারে না।

ঠিক এই মোকদ্দমার অনুরূপ একটি মোকদ্দমা এই ভাবে এই আদালতের আর এক খণ্ডাধিবেশন কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে। সেই মোকদ্দমা ১ম বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ১৩৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে।

অতিরিক্ত জজ বলেন যে, "প্রদত্ত হুকুমের "অর্থ সম্বন্ধে মেং ব্রাইট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "আমিও সেই সিদ্ধান্ত করিলাম, এবং আমি "বিবেচনা করি যে, ডিক্রীকৃত ভূমির ওয়াশী- "লাতের ডিক্রী দেওয়াও ঐ হুকুমের অভিপ্রায় "ছিল।" কিন্তু ডিক্রীর কোন অভিপ্রায় ছিল, এমত বলিলে চলিবে না, কারণ, দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১৮৯ ধারায় লেখা আছে যে, অন্যান্য কথার সহিত কি প্রতিকার প্রদত্ত হইল, তাহা বিশেষ রূপে ডিক্রীতে লেখা থাকিবে; এবং আমি বিবেচনা করি, যাহা ডিক্রীতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা না থাকে তাহা প্রদত্ত হয় নাই। এই সকল হেতু

বাদে আমি বিবেচনা করি যে, যে স্থলে ডিক্রীতে ওয়াশীলাৎ দেওয়ার কোন স্পষ্ট হুকুম নাই, সে স্থলে বাদী তাহা পাইতে পারে না; অতএব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত অন্যথা হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। যে প্রথম হেতুবাদে অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার উপরে ইহা ব্যক্ত করার জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে যে, বাদি-ডিক্রীদার ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান, তৎসম্বন্ধে বিচারপতি জ্যাক্‌সন, এবং ১ ম বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টে প্রচারিত মোকদ্দমায় বিচারপতি ফিয়ার ও হব্‌হৌস যে রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তদতিরিক্ত আমার কোন কথা বলা বাহুল্য। ডিক্রীতে যাহা প্রদত্ত হয় নাই তাহা কেহ সেই ডিক্রীজারীতে ১১ ধারা অনুযায়ী পাইতে পারে না, এই কথায় আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। অতএব পুনরায় এই প্রশ্ন আসে যে, উপস্থিত ডিক্রী দ্বারা কি প্রদত্ত হইয়াছে? তর্কের ভাব আমি যে প্রকার বুঝিলাম, তাহা এই যে, আপীল-আদালত "আপীল ডিক্রী হইল" এই প্রণালীতে ডিক্রী দেওয়াতেই আপেলাণ্ট যাহা কিছু চাহিয়াছিল তাহাকে তৎ সমুদায়ই দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, ঐ বাক্যগুলির এই প্রকার অর্থ করা অসম্ভব। আমি বিবেচনা করি যে, আমরা এই মোকদ্দমায় ন্যায্য রূপে এত দূরও বলিতে পারি যে, জারী হইতে পারে এমন কোন ডিক্রীই হয় নাই। ডিক্রী দ্বারা যে প্রতিকার প্রদত্ত হয় তাহা যদি স্পষ্ট রূপে লেখা না থাকে, তবে আদালতের কি মনন ছিল তাহা দেখাইবার জন্য কত দূর প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে তাহা অতি কঠিন কথা, এবং তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ারও কোন আবশ্যক নাই, কারণ, দ্বিধাত্মক কথা দূরে থাকুক, এই স্থলে কোন ডিক্রীই হয় নাই।

কেবল যে কথার উপরে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ ছিল তাহা এই যে, পশ্চাতের মোকদ্দমায় প্রতিবাদী যে তর্ক করে যে, প্রথম মোকদ্দমায় ওয়াশীলাৎ প্রদত্ত হয়, প্রতিবাদীর এই কার্য্যের দ্বারা পক্ষগণের অবস্থার কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না। কিন্তু আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, স্পষ্টই তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। আইনের ইহা একটি প্রসিদ্ধ যুক্তি বলিয়া আমি বিবেচনা করি যে, পক্ষগণ কোন বিশেষ একরারের দ্বারা অথবা তাহাদের নিজের কার্য্য দ্বারা আদালত কর্ত্তৃক ডিক্রীজারী করাইতে পারে না। ডিক্রীজারী করা আদালতের নিজের কার্য্য; এবং আমার বোধ হয় যে, পক্ষগণ যে প্রকার তাহাদের নিজের একরার অথবা কার্য্যের দ্বারা নূতন করিয়া আদালত কর্ত্তৃক কার্য্য করাইতে পারে না, ঠিক সেই প্রকারে, আদালত যে প্রতিকার প্রদান করিয়াছেন তাহাও তাহারা জারী করাইতে পারে না। অতএব পক্ষগণ যখন আদালতের কোন ডিক্রীজারী করিতে চেষ্টা করে তখন সেই ডিক্রীর ফল পর্য্যালোচনা করিবার কালে পক্ষগণের নিজের কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন তর্কই আবশ্যকীয় নহে। (গ)

---

৫ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন।

১৮৬৯ সালের ৯১১ নং মোকদ্দমা।

হুগলীর অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৩১ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ১৫ ই জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে হুগলীর কালেক্টর প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং, জে, ডবলিউ বি, মণি ব্যারিষ্টর আপেলাণ্টের কৌন্সেল।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষে লিগেল রিমেম্ব্রেন্সর মেং এইচ বেল, ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মাজিষ্ট্রেট যথোচিত সতর্ক এবং মনোযোগের সহিত কার্য্য না করিলে ১৮৫০ সালের ১৮ আইন মতে রক্ষিত হইতে পারেন না। মাজিষ্ট্রেটের যে কার্য্যের বিরুদ্ধে নালিশ হয় তাহা করিতে তাঁহার অধিকার থাকার বিষয় যদি তিনি ন্যায্য রূপে, সতর্কভাবে এবং সযত্নে বিশ্বাস না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার তাহা করিবার বা করিতে হুকুম দিবার অধিকার আছে বলিয়া তিনি যে 'সরল ভাবে' বিশ্বাস করিয়াছেন এমত বলা যাইতে পারে না। যদি কোন মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অন্যান্য প্রকারে নিয়মানুগত না হয়, এবং আইনের তিনি যে অর্থ করেন তাহা যদি অন্য কোন বিবেচক ও যত্নশীল ব্যক্তি না করিতে পারে, তবে তিনি আইনের অন্যায় অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই দায় এড়াইতে পারেন না।

কোন আইন-বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধক বা সাধারণের অপকার-জনক বস্তু দূর করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের ফৌঃ কাঃ বিধির ২০ অধ্যায় মতে কার্য্য করিতে হইলে, যে ব্যক্তি দ্বারা ঐ অপকার-জনক বস্তু বা প্রতিবন্ধক হইয়াছে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা দূর করণার্থে, বা দূর না করার কারণ দর্শাইবার জন্য তলব করিতে হইবে। সে কারণ দর্শাইবার জন্য উপস্থিত হইলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট ও সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া বিচার করত কার্য্য করিবেন।

ব্যক্তিবিশেষের কোন সম্পত্তি হস্তগত বা নষ্ট করিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে এমত বিবেচনা হইলেই যে, গবর্ণমেণ্ট তাহার সেই সম্পত্তি সরাসরীরূপে নষ্ট করিতে স্বত্ত্ববান্ হইবেন, এমত নহে। এই সকল বিষয়ে অপর ব্যক্তির যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণও সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে বাধ্য, এবং কোন অপর ব্যক্তি আপন নিজের সুবিধার জন্য অন্য কাহারও সম্পত্তি অবৈধ রূপে নষ্ট করিলে যে রূপ ক্ষতি-পূরণের দায়ী হয় সেই প্রকার সাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বা তাঁহার কর্ম্মচারিগণও কাহার সম্পত্তি অবৈধ রূপে নষ্ট করিলে দায়ী হইবেন।

বিচারপতি ম্যাক্ফার্সন।—জাহানাবাদের এইক্ষণকার অথবা ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র ও ঐ উপবিভাগের পুলিস ইনস্পেক্টর রাজারাম ঘোষ ও ফেরিফণ্ডের রাস্তার ওবরসিয়র কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, এই তিন জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আপেলাণ্টের নালিশে হুগলির জজ যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে। বাদীর একটি বাঁধ কাটিয়া দেওয়াতে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য এবং তাহার বোরো শস্যে জল সেচনের জন্য ঐ কাটা বাঁধের ন্যায় একটি বাঁধ নির্ম্মাণ ও স্থির রাখিতে তাহার যে স্বত্ত্ব আছে এই কথার এক নির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার জন্য, উক্ত তিন জন প্রতিবাদীর নিজের বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হয়। বাদীর নালিশ এই যে, মণ্ডেশ্বরী খাল অথবা নদী যে স্থানে তাহার ভূমির মধ্য দিয়া যায় সেই স্থানে তাঁহার বোরো শস্যে জল সেচনের নিমিত্ত তাহার এক বাঁধ দেওয়ার স্বত্ব থাকাতে সে ১৮৬৬ সালের শেষে অথবা ১৮৬৭ সালের প্রারম্ভে নিয়মিতরূপে তাহার বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অনুচিত ও অবৈধরূপে ঐ বাঁধ কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দেন এবং অন্যান্য প্রতিবাদিগণ ঐ হুকুম প্রতিপালন করে; তন্নিবন্ধন শস্যের জন্য যে জলের আবশ্যক ছিল তাহা নির্গত হইয়া গিয়া সমুদায় বোরো শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের মূল জওয়াব এই যে, বাঁধ কাটিতে তিনি যে হুকুম দিয়াছেন তাহা তিনি বিচারকস্বরূপে সরলান্তঃকরণে দিয়াছেন এবং তজ্জন্য তিনি ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রক্ষিত। তাঁহার বর্ণনা-পত্রে তিনি বলেন যে, যে সকল লোক বারাণসীর পুরাতন রাস্তা ব্যবহার

করে তাহাদের সুবিধার জন্য মণ্ডেশ্বরী নদীর উপরে যে এক বাঁধ অর্থাৎ মাটির পুল নির্ম্মিত হইয়াছে, বাদীর বাঁধের দ্বারা জল রুদ্ধ হইয়া তাহা জলমগ্ন করাতে তিনি বাদীর বাঁধ কাটিয়া দিতে হুকুম দিয়াছিলেন; কিন্তু বাদী যে পূর্ব্ব-পরম্পরাগত স্বত্বের দাবী করে তাহা যে বাদীর আছে ইহা তিনি অস্বীকার করেন না।

অন্য দুই মূল প্রতিবাদী যাহারা কেবল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুমে কার্য্য করিয়াছিল তাহাদের জওয়াব বিস্তারিতরূপে পর্য্যালোচনা করার আবশ্যক নাই।

যদিও প্রতিবাদিগণের নিজের বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হয় এবং তাহাতে যে ডিক্রী হইত তাহা গবর্ণমেণ্টের উপরে বাধ্যকর হইত না, তথাপি হুগলীর কালেকটর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে, প্রতিবাদী হওয়ার জন্য এক দরখাস্ত করেন। এই দরখাস্তে কথিত হইয়াছে যে, "ডেপুটি "মাজিষ্ট্রেট বিচারক স্বরূপে অথবা সরকারী "কর্ম্মচারী সূত্রে ঐ বাঁধ কাটিবার হুকুম দেন, "অতএব উভয়স্থলেই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের "হাজির হইয়া জওয়াব দেওয়া উচিত;" বিশেষতঃ, "বাদীর নালিশের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাস্তার "ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় তাহা গবর্ণমেণ্টের "সাক্ষাতে বিচারিত হওয়া উচিত।" বাদী সেই দরখাস্তের প্রতি আপত্তি করে, কিন্তু তাহা গবর্ণমেণ্টের দুর্ভাগ্যবশতঃ, মঞ্জুর হয়।

তাহাতে গবর্ণমেণ্ট নানা হেতুবাদে বাদীর বাঁধ নির্ম্মাণ করার স্বত্ব অস্বীকার করত ও সাধারণতঃ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের জওয়াবের পোষকতা করিয়া এবং যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছে তাহার আরও বিস্তারিত বর্ণনা লিখিয়া বর্ণনা-পত্র দাখিল করেন। কিন্তু সাধারণের সুবিধার উদ্দেশ্য ভিন্ন এই নদীর মধ্যদিয়া গবর্ণমেণ্টের বাঁধ দেওয়ায় অন্য কোন বাস্তবিক স্বত্ব থাকার প্রসঙ্গ ঐ বর্ণনা-পত্রে নাই।

এই মোকদ্দমা হুগলীর দ্বিতীয় অধঃস্থ জজের দ্বারা বিচারিত হয়, এবং তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, এই বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে বাদীর পূর্ব্ব-পরম্পরাগত স্বত্ব আছে। আবহমানকালাবধি বাদীর পক্ষ হইতে যে এই বাঁধ নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছে তাহা তাঁহার বিবেচনায় সপ্রমাণ হইয়াছে, কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, প্রথম তিন প্রতিবাদী দায়ী নহে, কারণ, তাহারা সরলান্তঃকরণে কার্য্য করিয়াছে; অতএব তিনি ব্যক্ত করেন যে, বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে বাদীর পূর্ব্ব-পরম্পরাগত স্বত্ব আছে; কিন্তু তিনি ক্ষতিপূরণের দাবী ডিস্‌মিস্ করেন এবং খরচা দেন না।

আপীলে জেলার জজ নির্দ্দেশ করেন যে, বাদীর পূর্ব্বপরম্পরাগত স্বত্ব সপ্রমাণ হইয়াছে এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যদিও ভ্রমাত্মক রূপে কার্য্য করিয়াছেন, তথাপি সেই কার্য্য সরলান্তঃকরণে ও উচিত যত্নের সহিত হইয়াছে সুতরাং তিনি খেসারতের জন্য দায়ী নহেন। তিনি বাদীর বাঁধ নির্ম্মাণ করার স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রী সংশোধন করেন এবং বাদীকে সকল প্রতিবাদীর খরচা দিতে হুকুম দেন।

খাস আপীলে বাদী তর্ক করে যে, জজ যে সকল বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার এরূপ ব্যক্ত করা অন্যায় হইয়াছে যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের বিধানানুসারে দায় হইতে রক্ষিত। খরচার বিষয়ে, ও বাঁধ নির্ম্মাণ করার প্রণালী সম্বন্ধে জজ যে হুকুম দিয়াছেন তদ্বিষয়েও বাদী আপীল করিয়াছে।

১৮৫০ সালের ১৮ আইনে লেখা আছে যে, "কোন জজ, মাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব্ পিস্, কালে- "কটর বা অন্য কোন ব্যক্তি বিচারকার্য্যে "যে কোন কর্ম্ম করেন বা করিতে হুকুম দেন "তাহা তাঁহার বিচারাধিকারের সীমার অন্তর্গত "হউক বা না হউক, অভিযুক্ত কার্য্য করিতে বা "করিবার হুকুম দিতে তাঁহার অধিকার আছে "বলিয়া তিনি সেই সময়ে সরলান্তঃকরণে বিশ্বাস "করিয়া থাকিলে তজ্জন্য তাঁহার *বিরুদ্ধে* দেও-

"য়ানী আদালতে নালিশ হইতে পারিবে না
" এবং কোন আদালতের যে কর্ম্মচারী বা অন্য
" কোন ব্যক্তি, এরূপ জজ, মাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস
" অব্ পিস, কালেক্টর বা অন্য ব্যক্তির বিচারে
" কার্য্যে প্রদত্ত আইন-সঙ্গত হুকুম বা ওয়ারেণ্ট
" জারী করিতে বাধ্য, সে ঐ ওয়ারেণ্ট, বা হুকুম-
" দাতার তাহা দেওয়ার অধিকার থাকিলে, তাহা
" জারী করিতে বাধ্য থাকিয়া তাহা জারী করিলে
" তাহার বিরুদ্ধেও দেওয়ানী আদালতে নালিশ
" চলিবে না।"

যদিও প্রথম দৃষ্টিতে বোধ হয় যে, মাজিষ্ট্রেটের যে কোন ভ্রম হউক তাহাই ঐ আইনের বাক্যের অন্তর্গত, কিন্তু এইক্ষণে ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যে মাজিষ্ট্রেট উচিত যত্নের ও মনোযোগের সহিত কার্য্য না করেন, তিনি ঐ আইনের দ্বারা রক্ষিত হইতে পারেন না। কপটাশূন্য রূপে কার্য্য না করাই জওয়াব গণ্য হইতে পারে না। যেমন দণ্ড-বিধির ৫২ ধারায় ব্যক্ত আছে যে, উপযুক্ত সতর্কভাবে ও মনোযোগ পূর্ব্বক যে কার্য্য না করা যায় কি যাহাতে বিশ্বাস না হয়, তাহা সরলভাবে করা যায় কি তাহাতে সরলভাবে বিশ্বাস হয়, এমত বলা যাইতে পারে না; সেই প্রকার, আমাদের কার্য্যের জন্য ইহা চূড়ান্ত রূপেই নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, মাজিষ্ট্রেটের যে কার্য্যের বিরুদ্ধে নালিশ হয়, তাহা করিতে তাঁহার অধিকার থাকার বিষয় যদি তিনি ন্যায্য রূপে ও সতর্কভাবে এবং সযত্নে বিশ্বাস না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার তাহা করিবার বা করিতে হুকুম দিবার অধিকার আছে বলিয়া তিনি যে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছেন, এমত বলা যাইতে পারিবে না। ১ ম বাঃ টেলর এবং বেলস্ রিপোর্টের ২২৮ পৃষ্ঠায় কস্তুর মোকদ্দমার টীকায় প্রচারিত ল্যাং বঃ গবিন্সের মোকদ্দমা, ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের রিপোর্টের ৩ য় বালমের ক্রোড়পত্রের ১৯ পৃষ্ঠায় বিঠোবা মাথারী বঃ. করফিল্ডের মোকদ্দমা, এবং ৩ য় বাঃ বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের রিপোর্টের ৩৬ পৃষ্ঠায় বিনায়ক দিবাকর বঃ বাই ইচ্ছার মোকদ্দমা, দ্রষ্টব্য। যদি কোন মাজিষ্ট্রেট কোন আইনের অন্যায় অর্থ করেন, তবে তাঁহার কার্য্য সমস্ত অন্য প্রকারে নিয়মানুগত হইলে, এবং সেই অন্যায় অর্থ যদি এমন হয় যে, সচরাচর যত্ন ও মনোযোগের সহিত যে ব্যক্তি কার্য্য করে, সেও সেই প্রকার অর্থ করিতে পারে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট নিঃসন্দেহই নিজে দায়ী হইবেন না। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অন্য প্রকারে নিয়মানুগত না হয়, এবং আইনের তিনি যে অর্থ করেন, তাহা যদি অন্য কোন বিবেচক ও যত্নশীল ব্যক্তি না করিতে পারে, তবে তিনি আইনের অন্যায় অর্থ করিয়াছেন, বলিলেই রক্ষিত হইতে পারেন না।

উপস্থিত মোকদ্দমায় জজ নিম্নলিখিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা, " এমত অবস্থায় আমার বোধ
" হয় যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের যাহাতে হুকুম
" প্রদান করার অধিকার ছিল, তাহাতেই তিনি
" হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন, এবং সেই হুকু-
" মের বিরুদ্ধে আপীল না হইলে তাহাই চূড়ান্ত
" হইত; অতএব তিনি বিচারক স্বরূপে ঐ হুকুম
" প্রদান করিয়াছেন। তিনি আইনের কোন্
" ধারা মতে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তিনি লেখেন
" নাই, কিন্তু তাঁহার পক্ষে কথিত হইয়াছে যে,
" ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২০ অধ্যায়ের বিধান
" মতে ঐ হুকুম প্রদত্ত হয়। আমার কোন
" সন্দেহ নাই যে, এই বিষয়ে তাঁহার হুকুম জাবে-
" তার ও আইনের বিরুদ্ধ হইয়াছে; তিনি কোন
" আইন-সঙ্গত প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া
" কার্য্য করেন নাই, কারণ, পুলিসের রিপোর্ট
" প্রমাণ নহে; এবং তিনি ওবরসিয়ারের জফান
" জবানবন্দী লন নাই; এবং বাদী ঐ হুকুমের
" বিরুদ্ধে যে কারণ দর্শায়, এবং ব্যবহার-জনিত
" স্বত্ব উত্থাপন করে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের উপরে
" ওবরসিয়ারের রিপোর্ট যে রূপ বাধ্যকর, উহাও
" তাঁহার উপরে তদ্রূপ বাধ্যকর ছিল। কিন্তু

"ঐ সকল কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ হইলেও ডেপুটি "ম্যাজিষ্ট্রেট যে সরলান্তঃকরণে কার্য্য করেন নাই "তাহা প্রদর্শিত হয় নাই, এবং আপীলের দর-"খাস্তে এমন কথা লেখা নাই যে, তিনি কপট-"ভাবে কার্য্য করিয়াছিলেন। আমার বোধ "হয় যে, তিনি ২০ অধ্যায় মতে, সাক্ষিগণের "জবানবন্দী লওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন "নাই, এবং ১১ ই ফেব্রুয়ারি তারিখের দর-"খাস্তের উপরে পুলিসের যে তদন্ত হয়, তাহাই "তিনি তাঁহার হুকুম দেওয়ার জন্য যথেষ্ট "বিবেচনা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের "জবানবন্দীতে বলিয়াছেন যে, তিনি অন্য "প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই; অত-"এব দেখা যাইতেছে যে, অনভিজ্ঞতাহেতু ও "যে প্রণালীতে কার্য্য করা আবশ্যক তাহা না "বুঝিতে পারাহেতু তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। "তাঁহার হুকুম যদিও আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে, "তথাপি তাঁহার কার্য্য যে সতর্কতার সহিত করা "হয় নাই এমত দৃষ্ট হয় না; এবং তাঁহার হুকুম "জারী করিতে বাদিগণের যত অল্প ক্ষতি হয়, "তাহার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন।"

জজের এই সকল সিদ্ধান্ত আইন-সঙ্গত কি না, তাহা দেখিবার জন্য, যে সকল কার্য্য দ্বারা বাদীর বাঁধ কাটা হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত রূপে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

১৮৭৭ সালের ১৫ ই জানুয়ারি তারিখে রাস্তার ওবরসিয়র রিপোর্ট করে যে, বাদীর বাঁধের দ্বারা যে জল আটক হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি হইয়া গবর্ণমেণ্টের পুল (যেখানে বারাণসীর পুরাতন রাস্তা খালের উপর দিয়া গিয়াছে) নষ্ট করিতেছে, এবং ঐ বাঁধ না কাটিলে গবর্ণমেণ্টের পুল নির্ম্মাণ করার ও তাহা স্থায়ী রাখার ব্যয় বৃদ্ধি হইবে।

১৭ ই তারিখে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পুলিসের প্রতি হুকুম দেন যে, তাহারা যে ব্যক্তিগণের ঐ বাঁধে স্বার্থ আছে তাহাদিগকে বাঁধ ক দিতে এবং গবর্ণমেণ্টের পুল নষ্ট না করিয়া জল বাহির করিয়া দিতে নোটিস দেয়।

৬ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পুলিস রিপোর্ট করে যে, তাহারা ঐ নোটিস দিয়াছে।

১১ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বাদী এবং তাহার রাইয়তেরা, শস্যে জলসেচনের জন্য ঐ বাঁধ রাখিতে পূর্ব্বাপর ব্যবহারের দ্বারা তাহাদের স্বত্ব আছে বলিয়া, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট পৃথক্ পৃথক্ দরখাস্ত করে, এবং তদারকের প্রার্থনা করে।

তাহাতে ঐ বাঁধ নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বাপর-স্পরাগত স্বত্ব আছে কি না, তাহার তদন্ত করার জন্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পুলিসের প্রতি হুকুম দেন। যে সকল ব্যক্তি বাঁধ কাটার জন্য তাঁহার হুকুম প্রতিপালন করিতে ত্রুটি করিয়াছে, সেই ত্রুটি অপরাধ বিধায় তাহাদের নাম নির্ণয় করত তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেও তিনি সেই সময়ে পুলিসের প্রতি হুকুম দেন। এই স্থানে আমার বলিতে হইবে যে, (যদিও তদ্দ্বারা এই মোকদ্দমার বিচার্য্য প্রশ্নের কোন তারতম্য হয় না) ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, এবং ২৭ এ মার্চ তারিখে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাহাদের জরিমানা করেন।

গবর্ণমেণ্টের পুলের ক্ষতি হইতেছে বলিয়া রাস্তার ওবরসিয়র পুনরায় ২০ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে আর এক রিপোর্ট করে।

২৩ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, যে সকল ব্যক্তিরা বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, পুলিসের দ্বারা তাহাদের উপরে (বোধ হয়, ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩১৪ ধারার মর্ম্মানুসারে) আজ্ঞা প্রচার করিতে হুকুম দেন।

বাঁধ কাটাইয়া দেওয়ার জন্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুনরায় পুলিসের উপরে হুকুম প্রচার করেন।

৫ ই মার্চ তারিখে পুলিস রিপোর্ট করে যে, তাহারা এই শেষ হুকুম জারী করিয়াছে।

৯ ই মার্চ তারিখে পুলিসের একজন সব-ইনস্পেক্‌টর্‌ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করে যে, সে ঐ বিষয়ের তদন্ত ও সাক্ষীর জবানবন্দী করিয়া দেখিয়াছে যে, বাঁধ রাখিতে বাদীর কোন স্বত্ব নাই; চণ্ডীচরণ নামক যে এক ব্যক্তি গোলদিগরী তালুকদার বলিয়া খ্যাত, খালের আরও নিম্নভাগে তাহারই এক বাঁধ নির্ম্মাণ করার স্বত্ব আছে।

১১ ই মার্চ তারিখে এই চণ্ডীচরণ এক দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করে যে, বাদীর বাঁধ দূর করা হয় যে, জল তাহার বাঁধে গমন করিতে পারে।

তাহাতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হুকুম দেন যে, পূর্ব্বপরম্পরাগত স্বত্ব অথবা প্রথানুযায়ী সেই বাঁধ তথায় নির্ম্মিত না হইয়া থাকিলে, তাহা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে; কিন্তু যদি ঐ রূপ স্বত্বের বলে তাহা তথায় থাকিয়া থাকে, তবে, তাহা কাটিতে হইবে, নচেৎ ৭ দিবসের মধ্যে তাহা না কাটিবার কারণ দর্শাইতে হইবে।

১৯ এ মার্চ তারিখে ওবরসিয়র রিপোর্ট করে যে, গবর্ণমেণ্টের পুল তখনও জলমগ্ন আছে, এবং নষ্ট হইতেছে, এবং বাঁধ কাটিবার হুকুম পালিত হয় নাই।

২০ এ মার্চ তারিখে, বাদী আর এক দরখাস্ত করিয়া বাঁধ সম্বন্ধে তাহার স্বত্বের বিষয়ে পুলিসের সব্‌-ইনস্পেক্‌টরের রিপোর্টের সত্যতার প্রতি আপত্তি করত প্রার্থনা করে যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট নিজে গিয়া বাঁধ দৃষ্টি করিয়া তদন্ত করেন।

তাহাতে অনেক হুকুম হয়, তাহার একটি হুকুম এই যে, বাঁধ যে ব্যক্তির সম্পত্তি তাঁহার ব্যয়ে ওবরসিয়র ও পুলিস তৎক্ষণাৎ বাঁধ কাটিয়া দিবে।

২৩ এ মার্চ তারিখে, ঐ হুকুম অনুসারে বাঁধ কাটা হয়।

বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, এই সকল কার্য্য দৃষ্টে জজের এ রূপ নির্দ্দেশ ন্যায্য হইয়াছে কি না যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ন্যায়, সুবিবেচনা ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়াছেন, এবং যখন তিনি বাঁধ কাটাইয়া দেন, তখন তিনি এমন বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, তিনি আইন-সঙ্গত রূপেই কার্য্য করিতেছেন, এবং তাহা কাটিতে তাঁহার অধিকার আছে, এবং উচিত যত্ন ও মনোযোগের সহিতই তিনি সেই বিশ্বাসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয় যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে আদ্যোপান্ত অত্যন্ত অনিয়ম, ত্রুটি ও অশুদ্ধতা হইয়াছিল, এবং তিনি যে উচিত যত্ন ও মনোযোগের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, আইন অনুসারে এমত নির্দ্দেশ করা অসাধ্য।

জেলার জজ বলেন যে, তাঁহার নিকট তর্কিত হইয়াছে যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২০ অধ্যায় মতে কার্য্য করিয়াছেন, এবং কেবল ঐ ধারার বিধানানুসারেই যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ঐ বাঁধ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ছিল, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ঐ অধ্যায়ের বিধান যত দূর এই মোকদ্দমায় খাটে, তাহা আমি বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩০৮ ধারার বিধান এই যে, যখন কোন মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন যে, সর্ব্ব সাধারণের গমনীয় কোন পথ কি প্রকাশ্য স্থান হইতে আইন-বিরুদ্ধ কোন প্রতিবন্ধক কি অনিষ্ট-জনক কোন বস্তু স্থানান্তর করা আবশ্যক, তখন তিনি যাহার দ্বারা ঐ প্রতিবন্ধক কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, তাহাকে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ প্রতিবন্ধক কি অনিষ্ট-জনক বিষয় স্থানান্তর করিতে অথবা ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহা স্থানান্তর না করার কারণ দর্শাইতে হুকুম দিতে পারেন; ঐ নির্দ্দিষ্ট সময় উক্ত হুকুমেই লেখা থাকিবে।

৩১১ ধারার মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি ৩০৮ ধারানুযায়ী হুকুম প্রচারিত হয়, সে যদি তাহা প্রতিপালন না করে, অথবা না করার কারণ না দর্শায়, তবে সে দণ্ডনীয় হইবে, এবং সেই

ব্যক্তির ব্যয়ে মাজিষ্ট্রেট সেই হুকুম পালন করাইতে পারেন, ইত্যাদি।

১০৩ ধারার বিধান এই যে, যে ব্যক্তির প্রতি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম জারী হয়, সে যদি হাজির হইয়া তাহার বিরুদ্ধে কারণ দর্শায়, এবং মাজিষ্ট্রেটের এমত প্রতীতি জন্মে যে, সেই হুকুম সঙ্গত হয় নাই, তবে তদ্বিষয়ে আর কোন কার্য্য করিতে হইবে না।

এই সকল ধারামতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের যে প্রণালীতে কার্য্য করা উচিত ছিল তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। যদি তাঁহার বিবেচনায়, ঐ বাঁধ এমন আইন-বিরুদ্ধ বাধা অথবা অনিষ্ট-জনক বিষয় হইয়াছিল যে, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের গমনাগমনের পথ অথবা স্থান হইতে দূর করা আবশ্যক, তবে যে ব্যক্তি ঐ বাধা করিয়াছিল তাহাকে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় যে সময় উচিত বোধ হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তাহা দূর করিতে অথবা দূর না করার কারণ দর্শাইতে তিনি হুকুম প্রচার করিতে পারিতেন। যে ব্যক্তির প্রতি ঐ রূপ হুকুম জারী হয়, সে যদি কারণ দর্শাইবার জন্য হাজির হয়, তবে তাহার কি কারণ দর্শাইবার আছে, তাহা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, এবং সে কি হেতুবাদে ঐ হুকুমের প্রতি আপত্তি করে তাহা তাঁহার তদন্ত করা, এবং আবশ্যক হইলে, মোকদ্দমা শুনিবার ও প্রমাণ থাকিলে তাহার বিচার করিবার জন্য এক দিন স্থির করা উচিত হইত। মোট কথা এই যে, যে ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি তিনি হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তিকে তাহার আপনাকে রক্ষা করার জন্য সম্পূর্ণ এবং সঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া আদালতের বিচারের ন্যায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কার্য্য করিতে বাধ্য ছিলেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ১৭ ই জানুয়ারির প্রথম হুকুম নিতান্ত অবৈধ হইয়াছিল, কারণ, কোন আইন-সঙ্গত হেতুর উপরে নির্ভর না করিয়া এবং ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইবার জন্য বাঁধের মালিককে কোন সুযোগ না দিয়া ঐ বাঁধ কাটিবার চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া হইয়াছিল।

বাদীর ঐ বাঁধ নির্ম্মাণ করার পূর্ব্ব-পরম্পরাগত স্বত্ব আছে কি না, তাহার তদন্ত করার জন্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ১১ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পুলিসের প্রতি হুকুম দেন। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহার কার্য্য সংশোধিত হইতে পারে না, কারণ, এমন কোন আইন নাই, যদ্দ্বারা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য পুলিসের প্রতি অর্পণ করিতে পারেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিজের ক্ষমতা পুলিসের প্রতি অর্পণ করা কেবল আইন-বিরুদ্ধ, এমত নহে; ফৌজদারী কার্য্য-বিধি অথবা অন্য কোন আইনে এমন কোন বিধান নাই যাহা পুলিসকে ঐ রূপ কার্য্যে নিযুক্ত করার বিধি স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে। কোন মাজিষ্ট্রেটই এই বিষয় কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে কোন প্রকারে (বিবেচনার সচরাচর প্রণালী মতে) এমন সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না যে, পুলিসকে তদন্ত করিতে আজ্ঞা দেওয়া তাঁহার নিজের তদন্ত করার তুল্য, অথবা যে ২০ অধ্যায়ের বিধান এই যে, হুকুম প্রতিপালিত হওয়ার পূর্ব্বে লোককে মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ দর্শাইবার জন্য সুযোগ প্রদান করিতে হইবে, সেই অধ্যায়ানুযায়ী কার্য্যের ন্যায়ই তাঁহার কার্য্য হইয়াছে। স্বত্ব সম্বন্ধে পুলিসের রিপোর্ট সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য বিধায় আমরা দেখিতেছি যে, যদিও বাদী ঐ বাঁধ কাটার প্রতি তাহার আপত্তি ও সেই আপত্তির হেতু ও অতিরিক্ত তদন্তের প্রার্থনা সম্বলিত ১১ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দরখাস্ত করে, তথাপি, যখন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, ৭ দিবসের মধ্যে কারণ প্রদর্শিত না হইলে বাঁধ কাটার জন্য পুনরায় ১১ ই মার্চ তারিখে হুকুম দেন, তখনও কোন তদন্ত করা হয় নাই। বাদী পুনরায় তাহার পূর্ব্বপরম্পরাগত স্বত্বের উল্লেখ করিয়া ও অতিরিক্ত তদন্তের প্রার্থনা সম্বলিত দর-

খাস্ত করিয়া ২০ এ মার্চ তারিখে কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হয়। কিন্তু যদিও সেই তারিখ পর্য্যন্ত কোন আইন-সঙ্গত তদন্ত হয় নাই, এবং যদিও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের পোষকতায় এক বিন্দুও প্রমাণ ছিল না, তথাপি তিনি তদন্ত করিবেন না, এমন কথা স্পষ্ট ব্যক্ত না করিয়া অথবা তদন্ত না করার কোন কারণ ব্যক্ত না করিয়া এক কালে বাঁধ কাটিবার হুকুম দেন।

এই সকল কার্য্যের আদ্যোপান্ত দৃষ্টে আমার বোধ হইতেছে যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এই বিষয়ে স্বত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহার বিবেচনায় সাধারণের উপকারের জন্য তিনি এককালে আইন অবহেলন করত কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু এই প্রকার কার্য্য করাতে তিনি সঙ্গত রূপে অথবা উচিত সতর্ক ও মনোযোগের সহিত কার্য্য করেন নাই। আইনে যাহাকে সরলান্তঃকরণে কার্য্য করা বলে তিনি সেই সরলান্তঃকরণে কার্য্য করেন নাই, অতএব তিনি ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রক্ষিত নহেন।

২০ অধ্যায়ের বিধানানুসারে মাজিষ্ট্রেট জুরী নিযুক্ত করেন নাই, এই বৃত্তান্তের উপরে বাদী কতক নির্ভর করিয়াছে। কিন্তু মাজিষ্ট্রেটকে তদ্বিষয়ের জন্য দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, কারণ, জুরী নিয়োগ করিতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা হয় নাই। মাজিষ্ট্রেট জুরী নিয়োগ করেন নাই বলিয়া বাদী তাঁহার প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছে তাহা অমূলক বলিয়া, সে যখন এমত তর্ক করে যে, মাজিষ্ট্রেটের সমুদায় কার্য্যই জাবেতা-বিরুদ্ধ এবং কাজে কাজে ১৮৫০ সালের ১৮ আইনের দ্বারা রক্ষিত নহে, তখন তাহাকে যে, ঐ এক মাত্র আপত্তিতে আবদ্ধ করিতে হইবে ইহার কোন কারণ নাই।

আপেলাণ্টের তর্ক শ্রবণান্তে আদালত যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, পক্ষগণ বিবেচনা করিবে যে, তাহাদের আপোসে নিষ্পত্তি করা উচিত কি না, তাহা ফলদায়ক না হওয়াতে, প্রতিনিধি-দিগের রিসেস্পণ্ডেণ্ট ও গবর্ণমেণ্টের উকীল শ্রেং বেল নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে নানা আপত্তি উপস্থিত করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি তর্ক করেন যে, আদালতের এই প্রকার নালিশ গ্রহণের এককালেই ক্ষমতা নাই, যেহেতু ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬২ ধারা মতে কার্য্য করিয়া ঐ বাঁধ কাটিয়া দিয়াছেন। তিনি আরও তর্ক করেন যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অন্যথা করার জন্যই এই নালিশ উপস্থিত হয়, এবং এক পূর্ণাধিবেশনের দ্বারা ১৮৬৯ সালের ৪৩২ নং খাস আপীলে উজ্জ্বলমণি দাসী বঃ চন্দ্রকুমার নিয়োগীর মোকদ্দমায় * (এখনও রিপোর্টে প্রচারিত হয় নাই) ১৮৬৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, এ প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারে না, এবং ৬০ বৎসরের ব্যবহার সপ্রমাণ না হইলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বাদী কেবল ব্যবহারের দ্বারা বাঁধ নির্ম্মাণ করার স্বত্ব পাইতে পারে না; এবং বাদীর দ্বারা জল আটক হইয়া গবর্ণমেণ্টের পুল জলমগ্ন হওয়াতে সাধারণের ক্ষতি হইয়াছে, অতএব বাঁধ কাটিতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের অধিকার ছিল।

এই সকল তর্কের ন্যায় তর্ক গবর্ণমেণ্টের পক্ষে উপস্থিত হওয়ায় আমার অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। জজ বলেন যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের জওয়াব এই যে, তিনি ৬২ ধারা মতে কার্য্য করেন নাই, ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২০ অধ্যায়ের অন্তর্গত কার্য্য করিয়াছেন। অপিচ, হুগলীর কালেক্টর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে বর্ণনা-পত্র দাখিল করিয়াছেন তাহাতে তিনি নিজেই বাঁধ কাটা সম্বন্ধে সেই কথা কহিয়াছেন; এবং ঐ বাঁধ কাটার বিষয়টীই এই মোকদ্দমায় বিচার্য্য। ঐ বর্ণনা-পত্রে লেখা আছে যে, "ওবরসিয়রের "রিপোর্টের উপরে যে হুকুম প্রচারিত হয় "তাহা বস্তুতঃ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬২

* বাঃ লাঃ রিঃ, ৫ ম ভাগ, পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি, ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"ধারা মতে হইয়াছে। "গোলদিগরী তালুক-
"দারের দরখাস্তের উপরে ১১ই মার্চ তারিখে
"যে হুকুম প্রদত্ত হয়, তাহা বাস্তবিক ৩০৮ ধারা-
"নুযায়ী।" বিচারাধিকারের কোন প্রশ্নই নিম্ন আদালতে উত্থিত হয় নাই এবং ইহা অল্প আশ্চর্য্যের কথা নহে যে, গবর্ণমেণ্ট যিনি বাদী আপত্তি করা স্বত্তেও নিজে অগ্রহ করিয়া প্রতিবাদী হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে খাস আপীলে প্রথমে এই প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে।

এই মোকদ্দমার প্রশ্ন সম্বন্ধে উল্লিখিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি খাটে না। ঐ পূর্ণাধিবেশন নিষ্পত্তি করেন যে, ২০ অধ্যায় মতে মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন তাহা অন্যথা করার জন্য দেওয়ানী নালিশ চলিতে পারে না। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটর হুকুম স্পষ্ট রূপে বা প্রকারান্তরে অন্যথা করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় নাই, এবং সেই হুকুম এইরূপে অন্যথাও হইতে পারে না। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট অসরল ভাবে যে অবৈধ কার্য্য করিয়াছেন তাহার ক্ষতি পূরণের জন্য ও ভবিষ্যতে বাঁধ বহাল রাখিবার স্বত্ব সাব্যস্ত করার নিমিত্ত বাদী এই নালিশ করে। এই প্রকার মোকদ্দমা যে চলিতে পারিবে না, উক্ত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিতে এরূপ কোন মত বা আভাসও নাই।

যে বাঁধ অথবা পুল জলমগ্ন হওয়াতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাদীর বাঁধ কাটিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই প্রকার পুল নির্ম্মাণ করিতে গবর্ণমেণ্টের কোন স্বত্ব থাকিলে সেই স্বত্ব উত্থাপন ও সপ্রমাণ করা উচিত ছিল। কিন্তু এই প্রকার কোন স্বত্ব সপ্রমাণ হয় নাই, এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যে বর্ণনা-পত্র দাখিল হইয়াছে তাহাতেও এমন স্বত্ব থাকার কথার উল্লেখ নাই।

কিন্তু তর্কিত হইয়াছে এবং লিগেল রিমেম্ব্রান্সরও তাহা আমাদের সমক্ষে পুনরায় বলিয়াছেন যে, সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ঐ বাঁধ কাটিতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব ছিল। কিন্তু যে স্থলে সাধারণের অথবা গবর্ণমেণ্টের সেই সুবিধা পাওয়ার আইন-সঙ্গত স্বত্ব থাকার প্রমাণাভাব, সে স্থলে ঐ প্রকার তর্ক নিতান্ত অকর্ম্মণ্য।

কোন কর্ম্ম মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় সাধারণের উপকার-জনক হইবে বলিয়াই তিনি আইনের বিধানানুযায়ী কার্য্য ব্যতীত অন্য ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তগত অথবা নষ্ট করিতে পারেন না। যদি আমার বাটী ও বাগিচার মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্টের কোন রাস্তা করিবার স্বত্ব থাকে, তবে সেই স্বত্ব অবশ্যই পরিচালিত হইতে পারে। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট এমন বিবেচনা করেন যে, যে স্থলে আমার বাটী ও বাগীচা আছে সেই স্থান দিয়া রাস্তা করিলে সাধারণের উপকার হইবে, তাহা হইলই যে, তিনি সরাসরী রূপে আমার কাণের গোড়ায় আমার বাটী ও বাগিচা ভগ্ন করিতে পারিবেন, এমন হইতে পারে না। এই সকল বিষয়ে অপর ব্যক্তির যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হয় গবর্ণমেণ্টও তাহার কর্ম্মচারিগণও সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে বাধ্য, এবং কোন অপর ব্যক্তি তাহার নিজের সুবিধার জন্য সম্পত্তি অবৈধরূপে নষ্ট করিলে যে প্রকার খেসারতের জন্য দায়ী হয়, সেই প্রকার সাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বা তাঁহার কর্ম্মচারিগণও সম্পত্তি অবৈধরূপে নষ্ট করিলে দায়ী হইবেন। যখন ব্যবস্থাপক সমাজ এমন বিধান করিবেন যে, উপস্থিত ঘটনার ন্যায় ঘটনা সমস্তে মাজিষ্ট্রেটগণ আপনাদের বিবেচনানুযায়ী সুবিধা ও আবশ্যকের জন্য, এবং সেই বিবেচনা সঙ্গত কি না, তাহার কোন প্রমাণ না লইয়া, এবং যাহাদের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহাদিগকে তদ্বিরুদ্ধে কোন কারণ দর্শাইতে অথবা তাহাদের আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সুযোগ না দিয়া, অন্য ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন, তখন, উপস্থিত মোকদ্দমায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, মাজিষ্ট্রেটদিগের সেই প্রকার কার্য্য ন্যায্য হইবে। কিন্তু এইরূপে ব্যবস্থাপক সমাজ ঐ প্রকার কোন বিধান করেন নাই; বরং স্পষ্টা-

প্রকারে বিধিবদ্ধ করিয়াছেন যে, যে সকল মোকদ্দমা ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩০৮ ধারার অন্তর্গত হইবে তাহাতে, যে ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহাকে তাহার আপন সম্পত্তি রক্ষা করার সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করত মাজিস্ট্রেট এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য্য করিবেন।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৭২ ধারায় অথবা ২০ অধ্যায়ে মাজিস্ট্রেটের প্রতি এমন অনুমতি নাই যে, তিনি যে কার্য্য করেন তাহার কোন আইন-সঙ্গত এবং স্পষ্ট হেতু না থাকিলেও তিনি কেবল আপন ইচ্ছানুসারে অপরের সম্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। এই মত এই আদালতের দ্বারা বারম্বার সংস্থাপিত হইয়াছে। ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ২৭ পৃষ্ঠার বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মোকদ্দমায় নিষ্পন্ন হয় যে, ৩০৮ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমায়, অনিষ্ট-জনক বিষয় দূর করার জন্য যে ব্যক্তির উপরে হুকুম প্রচারিত হয় মাজিস্ট্রেট অবশ্যই তাহাকে কারণ দর্শাইতে আদেশ করিবেন, এবং সেই ব্যক্তি যদি নোটিসের লিখিত দিবসের পরেও, কিন্তু মাজিস্ট্রেটের ঐ মোকদ্দমা পুনরায় উঠাইয়া হুকুম চূড়ান্ত করার পূর্ব্বে উপস্থিত হয়, তথাপি তাহাকে তাঁহার শুনিতে হইবে। ১০ ম বালম উইকলি রিপোর্টরের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ৫৩ পৃষ্ঠায় হরিমোহন মালো ও জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় নিষ্পন্ন হয় যে, যে সকল মোকদ্দমা দৃষ্টব্যে ৬২ ও ৩০৮ ধারার অন্তর্গত হয়, তাহাতে মাজিস্ট্রেট ৩০৮ ধারামতে কার্য্য করিতে বাধ্য, এবং যে ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, তাহাকে অবশ্যই কারণ দর্শাইতে সময় দিতে হইবে। ১১ শ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ৪৬ পৃষ্ঠায় ভৈরবদয়াল সিংহের মোকদ্দমায় এই নিষ্পত্তি হয় যে, ৬২ ধারায় এমন কোন বিধান নাই, যে কেবল পুলিসের রিপোর্টের উপরে নির্ভর করিয়াই মাজিস্ট্রেট কোন বাঁধ অথবা আইন-বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধক দূর করার হুকুম দিতে পারেন। এ প্রকার হুকুম দেওয়ার পূর্ব্বে মাজিস্ট্রেট প্রতিবাদীর নিকট এবং আবশ্যক হইলে, দুই পক্ষের নিকটই প্রমাণ লইতে বাধ্য।

বাদী ৬০ বৎসরের ব্যবহার সপ্রমাণ করিতে না পারিলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তাহার এই বাঁধ রাখার স্বত্ব না থাকার তর্ক সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, যে স্থলে যে বাঁধ অর্থাৎ মাটির পুল জলমগ্ন হইয়াছে সেই পুল নির্ম্মাণ করিতে গবর্ণমেণ্টের যে কখন স্বত্ব ছিল এমত প্রদর্শিত হয় নাই, সে স্থলে ঐ প্রকার প্রশ্ন কখন উত্থাপিত হইতে পারে না। ইহা এমন ঘটনা নহে যে, গবর্ণমেণ্ট বৎসর বৎসর একটি পুল নির্ম্মাণ করিতেন, কিন্তু বাদী আসিয়া তাহার এই বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া ঐ পুলের ক্ষতি করিয়াছে। এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অধঃস্থ জজ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, বাদী এত দীর্ঘ কালাবধি এই বাঁধ নির্ম্মাণ করার স্বত্ব পরিচালন করিয়াছে যে, তাহা কাহারও স্মরণ নাই; এবং জজ বলেন যে, সে এত বৎসর যাবৎ তাহা নির্ম্মাণ করিয়া আসিতেছে যে, তদ্দ্বারা পূর্ব্বাপর ব্যবহার-জনিত স্বত্বের উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু এমত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই যে, ইহার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার দাবী-কৃত স্বত্ব কখন পরিচালন করিয়াছিলেন।

মেঃ মণি স্বীয় বক্তৃতায় বলিয়াছেন (এবং রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলেরা তাহা খণ্ডন করেন নাই) যে, গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি এই মাটির পুল নির্ম্মাণ করার পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তি বারাণসীর ঐ রাস্তায় গমনাগমন করিত, তাহারা জল গভীর থাকিলে নৌকায় ঐ নদীপার হইয়া যাইত; এবং আমি দেখিতেছি যে, যে স্থানে ঐ মাটির পুল নির্ম্মিত হইয়াছে সেই স্থান জজ, "খেয়াঘাট" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আমি বিবেচনা করি যে, এই ডেপুটি মাজিস্ট্রেট অনেক বিষয়ে এমন করিয়া আইন উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা আমরা আইন-সঙ্গত রূপেই অনুমান করিতে পারি যে, মাজিস্ট্রেটের যে প্রকার সত-

র্কতার সহিত কার্য্য করা ও আইনের মর্ম্ম গ্রহণ করা উচিত, তাহা তিনি করেন নাই। জজ বলেন যে, অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত এবং কি প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারিয়াই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এই ভ্রম হইয়াছে, এবং তিনি বিচারে এই কার্য্য করিয়াছেন এবং তাঁহার কার্য্যে অসতর্কতা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমার মতে যখন কোন মাজিষ্ট্রেট আইনের স্পষ্ট বাক্য ও বিচারের মূল নিয়ম সমস্ত উল্লঙ্ঘন করেন, তখন তাঁহার কার্য্য যে, সতর্কতার সহিত হয় নাই, ইহাই বলিতে হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, যে স্থলে ঐ অনুমান খণ্ডন করার প্রমাণ নাই সে স্থলে তদ্বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ করায় নিম্ন আদালতের ভ্রম হইয়াছে।

বাদীর এই বাঁধ নির্ম্মাণের প্রণালী সম্বন্ধে জজ যে রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তৎপ্রতি আপেলাণ্ট যে আপত্তি করে, তাহাতে আমার বিবেচনায় কোন বল নাই। জজ যে বাঁধের স্বত্ব ব্যক্ত করিতেছিলেন তিনি অতি ন্যায্য রূপেই তাহার ভাব বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, এবং আমি বিবেচনা করি যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্যান্য মূল প্রতিবাদিগণের খরচা সম্বন্ধে জজের হুকুমের প্রতি হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, কারণ, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম পালন করার গতিকে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য কেবল ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটই নিজে দায়ী।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম প্রতিপালিত হওয়াতে বাদীর কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে, কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা তদন্ত করার জন্য এবং তৎসম্বন্ধে প্রমাণ লওয়ার আবশ্যক হইলে প্রমাণ লওয়ার জন্য, মোকদ্দমা জজের নিকট পুনঃপ্রেরিত হইবে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুমের দ্বারা বাস্তবিক কি পরিমাণে বাঁধ কাটা হইয়াছিল, তাহাই প্রথমে নির্ণয় করিতে হইবে; তাহার পরে আদালতের এই স্থির করিতে হইবে যে, সমুদায় বাঁধ যে নষ্ট হইয়াছে তাহা বাস্তবিক ঐ কাটার দ্বারা কত দূর হইয়াছে; এবং শেষ কথা এই যে, জল বাহির হইয়া যাওয়ার গতিকে বাদীর কোন ক্ষতি হইয়া থাকিলে বাস্তবিক কি ক্ষতি হইয়াছে। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম প্রতিপালিত হওয়ায় স্বভাবতঃ যে ক্ষতি হয় তদ্ভিন্ন অন্য কোন ক্ষতির জন্য তিনি দায়ী হইবেন না।

আমি বিবেচনা করি, বাদী (আপেলাণ্ট) এই আপীলের, ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দুই নিম্ন আদালতের খরচা পাইতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি এই রায়ে সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। (গ)

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২৩৭ নং মোকদ্দমা।

হুগলির জজ তত্রস্থ প্রথম অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ২৭ এ জুনের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৮ সালের ২১ এ ডিসেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (দায়ী) আপেলাণ্ট।

পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য এবং অপর এক ব্যক্তি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমানাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ডিক্রীজারি-কারক আদালতের এমত কোন খরচার হুকুম দিবার অধিকার নাই যাহা সে ডিক্রীজারী হইতেছে বা যাহা তখন বলবৎ আছে তাহাতে বর্ণিত হয় নাই। প্রত্যেক ডিক্রীতেই উভয় পক্ষের খরচার লিপি থাকা সুবিধাজনক।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমায় খাস আপেলাণ্টের নালি-

শের উৎকৃষ্ট হেতু আছে, কারণ, তাহাকে ডিক্রীজারীতে খরচা বলিয়া যে সকল টাকা দিবার আদেশ করা হইয়াছে, তাহা তখন যে ডিক্রীজারী হয় বা যাহা তখন প্রবল ছিল, তাহার মধ্যে দেখা যায় না, সুতরাং আদালতের তাহাকে তাহা দিতে হুকুম দিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী কার্য্য-বিধির যে সকল ধারা প্রথম মোকদ্দমায় এবং আপীলে প্রয়োগ হয় তাহাতে স্পষ্ট বিধান আছে যে, ডিক্রী প্রথম আদালতের হউক বা আপীল-আদালতেরই হউক, তাহাতে অবস্থা দৃষ্টে উক্ত মোকদ্দমায় বা আপীলে যে খরচা পড়ে তাহার পরিমাণ, এবং কে তাহার দায়ী এবং কি পরিমাণে তাহা দিতে হইবে তাহা বর্ণিত হইবে। আপীল-আদালতের ডিক্রীতে উক্ত খরচা অর্থাৎ আপীল-আদালতে এবং প্রথম মোকদ্দমায় যে খরচা পড়ে তাহা কাহার দেয়, এবং কি পরিমাণে দেয় তাহা বর্ণিত হইবে; এবং যে ব্যক্তি ডিক্রী জারী করে তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা সে যে ডিক্রীজারী করে, তাহাতেই থাকা আবশ্যক, অন্য কোন স্থানে নহে।

আমি যখন জেলার জজ ছিলাম, তখন আমার আদালতে এই প্রথা ছিল যে, প্রত্যেক ডিক্রীতেই উভয় বাদি-প্রতিবাদীর বা আপেলাণ্ট রেস্পণ্ডেণ্টের খরচা লিখিয়া দেওয়া হইত। আইনের ইহাই আদেশ, এ কথা নিশ্চয় রূপে না বলিয়া আমি এই দেখাইয়া দিতে চাহি যে, উক্ত উপায় স্পষ্টই সুবিধাকর, কারণ, তাহা হইলে যে ডিক্রী দেওয়া হয় তাহা উচ্চ আদালতে আপীলে রহিত হইলে, এবং খরচা সম্বন্ধে প্রথম বিচারে প্রথম যে হুকুম দেওয়া হয় তাহা হইতে ভিন্ন হুকুম দিতে হইলে, যে আদালত উক্ত ডিক্রী রহিত করেন, প্রত্যেক পক্ষের যে খরচা পড়িয়া থাকে, তাহা তিনি অনায়াসে জানিতে পারেন।

যাহা হউক, অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি তাহার খরচার ডিক্রীজারী করিতে যায়, সে যে ডিক্রীজারী করে তাহাকে তল্লিখিত খরচা নচেৎ উক্ত ডিক্রী দ্বারা যে ডিক্রী বহাল রাখা হয়, এবং যাহাতে খরচার বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ থাকে, সেই ডিক্রীর লিখিত খরচা দিতে হইবে। অতএব আমার বিবেচনায় নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত রহিত হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং ই জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ৪৭ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৯ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

দয়াচাঁদ ওসওয়াল (বাদী) আপেলাণ্ট।

মুক্তিদা দেবী (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন তমঃসুকের উপর নালিশে প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, উক্ত তমঃসুক লিখিত পড়িত হওয়ার পর বাদী দাতার নিকট হইতে কোন মহাল ইজারা এবং দর-ইজারা লইয়া এই সর্ত্তে কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয় যে, এই ইজারার কর হইতে ঋণ পরিশোধিত হইবে। উক্ত কবুলিয়তে এই সর্ত্ত থাকে যে, তাহার মিয়াদ পর্য্যন্ত করের দ্বারা সন সন কিস্তিবন্দি ঋণ পরিশোধিত হইবে এবং ইজারার মিয়াদ অন্তে হিসাব নিকাশ করিয়া দেনাপাওনা শোধ করিতে হইবে; কোন পক্ষেরই উক্ত পাট্টা মিয়াদ মধ্যে রদ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

এমত স্থলে, তমঃসুকে যে উল্লিখিত মিয়াদ অন্তে টাকা পরিষ্কার করিয়া দিবার সর্ত্ত আছে তাহা উক্ত ইজারার সর্ত্ত দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় বাদীর নালিশের স্বত্ব উক্ত ইজারার মিয়াদ পর্য্যন্ত

স্থগিত থাকিবে; কাজে কাজে সে ঐ পাট্টার মিয়াদ পর্য্যন্ত উক্ত তমঃসুকের উপর নালিশ করিতে পারে না।

**বিচারপতি নর্ম্যান।**—গিরীশচন্দ্র সান্যালের দায়াধিকারী হেমচন্দ্র এবং শরচ্চন্দ্র সান্যাল নাবালগদিগের অভিভাবিকা মুক্তিদা দেবীর বিরুদ্ধে দয়াচাঁদ ওসওয়াল নিম্নলিখিত হিসাবে ৪৪০৩১ টাকার দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে:—গিরীশচন্দ্র সান্যাল আপন জীবদ্দশায় যে এক তমঃসুক লিখিয়া দেয় তাহার আসল ৩৯০০০ টাকা এবং ১২৭১ সালের ৬ই চৈত্র হইতে সুদ বাবৎ ৫০৩১ টাকা। তাহা ১২৭১ সালের ৬ই চৈত্র তারিখের তমঃসুক; এবং টাকা পরিশোধ করিবার মিয়াদ ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ছিল।

প্রতিবাদিনী আপন বর্ণনা-পত্রে বলে যে, বাদী, গিরীশচন্দ্র সান্যালকে তমঃসুকের তারিখে তমঃসুক-লিখিত টাকা দেয় না; ১৯ এ চৈত্র তারিখে ২২২০০ টাকা দেয়, এবং পরে আর ৩৪০০ টাকা দেয়।

বাদী নিম্ন আদালতে এই বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করে।

প্রতিবাদিনী আরো বলে যে, উক্ত তমঃসুক লিখিত পড়িত হওয়ার পরে বাদী, গিরীশচন্দ্র সান্যালের নিকট হইতে গিরীশচন্দ্রের এক জমিদারী ইজারা, এবং তাহার শরীক শারদাসুন্দরীর অংশ দর-ইজারা লইয়া উক্ত ইজারা এবং দর-ইজারার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয়; উক্ত কবুলিয়তের সর্ত্ত মতে বাদী উক্ত কবুলিয়ৎ অনুযায়ী দেয় কর দ্বারা ঐ তমঃসুকের পাওনা আদায় করিতে সম্মত হয়।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে বাদী উকীল মুখে বলেন যে, গিরীশচন্দ্রের ইজারা কৃত্রিম সপ্রমাণ হওয়ায়, বাদী, শারদাসুন্দরীর অংশে দখল পায় নাই; হরসুন্দরী প্রভৃতি তাহার বিরুদ্ধে উক্ত ইজারার অন্তর্গত কতিপয় মহালের ডিক্রী পায়; এবং তৃতীয়তঃ গিরীশচন্দ্র প্রতি টাকায় অতিরিক্ত ॥৴০ আনা ধরিয়া উক্ত ইজারার অন্তর্গত সম্পত্তির এক জমা-ওয়াশীল বাকীর কাগজ প্রস্তুত করে; এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, এবং প্রজাগণের ঐ অতিরিক্ত ॥৴০ আনা দিতে হইবে না স্থির হয়।

অধঃস্থ জজ এই ইসু করেন যে, প্রতিবাদিনী যে কবুলিয়ৎ দর্শায় তাহা সত্য কি না, এবং তাহার সর্ত্ত অনুসারে বাদী এখন উক্ত তমঃসুকের টাকার দাবীতে নালিশ করিতে পারে কি না।

উক্ত ইজারার কবুলিয়ৎ যে প্রকৃত, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে। তাহার তারিখ ৬ই শ্রাবণ (যদিও তাহার গর্ভে লেখা আছে যে, উক্ত তমঃসুক যে তারিখে লেখা হয়, তাহাও সেই তারিখেই হয়)। উক্ত পাট্টা দ্বারা গিরীশচন্দ্র সান্যাল বাদীকে তাহার জমিদারী একুসিংহ প্রভৃতির ।০ আনা অংশ ৮৮১০॥৵১৪ টাকা খাজানায় ইজারা দেয়, বাদী তাহার মধ্যে গিরীশচন্দ্রকে সদর খাজানা বাবৎ ২৯৩৮৷৵১৫ দিবে; এবং তাহাতে এই সর্ত্ত আছে যে, বাকী ৫৮৭২৷৵১৯ টাকা কবুলিয়তের তফশীল-লিখিত কিস্তি মতে ১২৭৩ সাল হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত সন সন সুদ সমেত কর্জ্জা টাকা পরিশোধ হইল বলিয়া তমঃসুকে লিখিতে হইবে; যদি উক্ত মিয়াদ মধ্যে কোন ভূমি সিকস্ত হয় বা বাদী দখলচ্যুত হয় তবে ডৌলজমার বাদ দিতে হইবে; গিরীশচন্দ্র এবং তাহার দায়াধিকারী কিছুতেই উক্ত নির্দ্দিষ্ট করের অতিরিক্ত কিছুর দাবী করিতে পারিবে না; উক্ত ইজারার মিয়াদ মধ্যে বাদী ঐ মহালাদি ছাড়িয়া দিতে পারিবে না, এবং গিরীশচন্দ্রও তাহা তাহার নিকট হইতে লইতে পারিবে না; বাদী যদি কোন নূতন পয়বস্ত চরের কর সংস্থাপন করে, তবে উক্ত কবুলিয়তে যাহা লেখা আছে তাহা ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র কর দিতে হইবে; উপস্বত্ব বাবৎ যে ৫৮৭২ টাকা গিরীশচন্দ্রের প্রাপ্য, তাহা বাদী উক্ত ঋণে নির্দ্দিষ্ট কিস্তিবন্দী অনুসারে উসুল দিতে সম্মত হয়; প্রত্যেক কিস্তির টাকা সুদ সমেত খতের পৃষ্ঠে উসুল দিতে হইবে;

বাদী প্রজার নিকট কর বাকী থাকা ইত্যাদি কোন আপত্তি করিতে পারিবে না; গিরীশচন্দ্র যে টাকা প্রতি সন তাহার দেয় সুদ ও আসল স্বরূপে পরিশোধ করিতে অঙ্গীকার করে, তাহার সেই টাকা চাহিবার কোন অধিকার থাকিবে না; বাদী তাহার সমুদায় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ইজারার প্রতিভূ রাখে; মিয়াদ অন্তে হিসাব নিকাশ করিয়া বাদীর কিছু দেনা দাঁড়াইলে, তাহা নগদ দিতে হইবে; এবং পক্ষান্তরে, গিরীশচন্দ্রের কিছু দেনা দাঁড়াইলে তাহাও সে নগদ দিবে।

অধঃস্থ জজ বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন। তিনি বলেন যে, কবুলিয়তে প্রকাশ যে, বাদী ১২৭৪ সাল হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত এক মিয়াদী ইজারা লয়। উক্ত কবুলিয়তের সর্ত্ত এই যে, ঐ মিয়াদ পর্য্যন্ত উক্ত কর দ্বারা সন সন কিস্তবন্দি খতের দেনা পরিশোধ করিতে হইবে, এবং ইজারার মিয়াদ অন্তে হিসাব নিকাশ করিতে হইবে, এবং যে টাকা প্রাপ্য দাঁড়াইবে তাহা তখন দিতে হইবে। তিনি বলেন যে, বাদী স্পষ্টই উক্ত মিয়াদ মধ্যে তমঃসুকের উপর নালিশ করিতে পারে না।

বাদীর উকীল যে বলেন যে, বাদী উক্ত দর-ইজারা মহালের দখল পায় নাই, বাদীর ইজারার মহালের কোন কোন অংশ হইতে উচ্ছেদিত হইয়াছে, এবং গিরীশচন্দ্র বাদীকে যে এক জমা-ওয়াশীল বাকীর কাগজ দেয়, তাহাতে টাকায় ।৵০ আনা করিয়া কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ঐ আদালত বলেন যে, এই নালিশের কারণ বা মোকদ্দমার হেতু নালিশের আরজীতে লেখা নাই। তিনি বলেন যে, ঐ সকল কথা নালিশের আরজীতে না থাকা সত্ত্বেও তাহা শুনা গেলে এবং তাহা সত্য হইলেও তাহাতে কোন ফল দর্শিবে না, কারণ, উক্ত ইজারার এই এক সর্ত্ত আছে যে, কোন অংশ হইতে বেদখল হইলে সেই পরিমাণ জমার মিনাহ হইবে।

আপীলে আমাদের নিকট তর্ক হয় যে, বাদী, গিরীশচন্দ্রকে যে টাকা কর্জ্জ দেয় তাহা যখন উক্ত তমঃসুকে ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের কোন এক বিশেষ তারিখে পরিশোধ করিবার কথা লেখা হয়, এবং যখন উক্ত টাকা আদায়ের নিমিত্ত ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত পাট্টার মিয়াদ দিয়া কিস্তিবন্দী করিয়া ইজারা দেওয়া হয়, তখন উক্ত দুই দলীলই তমঃসুকের টাকা আদায়ের আনুষঙ্গিক প্রতিভূ স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে; এমত অবস্থায় উত্তমর্ণের তাহার যে প্রতিভূ ইচ্ছা অবলম্বন করিবার অধিকার আছে। যদি কর্জ্জগ্রহীতা তাহার টাকার নিমিত্ত অনেক প্রতিভূ, যথা, কোন একরার বা তমঃসুক বা স্বীকৃত পত্র এবং বন্ধক লয়, তবে ঐ সকল প্রতিভূ যে উভয় পক্ষ এবং আদালত আনুষঙ্গিক রূপে গ্রহণ করেন তাহা নিশ্চয়ই সত্য, এবং কর্জ্জগ্রহীতা যে পর্য্যন্ত তাঁহার সম্পূর্ণ টাকা না পাইবে, সে পর্য্যন্ত সে এক সঙ্গে ঐ সকল প্রতিভূ অনুযায়ী স্বত্ব পরিচালন এবং সমুদায় প্রতিকার অবলম্বন করিতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই বিশেষ মোকদ্দমায় উক্ত তমঃসুকে ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সম্পূর্ণ রূপে টাকা পরিশোধ করিবার যে সর্ত্ত আছে, ইজারার সর্ত্ত দ্বারা তাহার ভাবের ব্যতিক্রম হইয়াছে কি না।

আমরা বিবেচনা করি, অধঃস্থ জজ যে ভাব গ্রহণ করেন তাহাই শুদ্ধ, এবং খতের উপর নালিশের স্বত্ব উক্ত ইজারা এবং দর-ইজারার মিয়াদ পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। ঐ দুই দলীলের তুল্য সর্ত্ত আছে।

ইহা দেখিতে হইবে যে, উক্ত ইজারার পাট্টা ১২৭৩ হইতে ১২৮০ সাল পর্য্যন্ত অকাট্য থাকিবে, কোন পক্ষেরই তাহা অন্যথা করিবার অধিকার নাই। যে কর আদায় হইবে তাহা দ্বারা ঋণ পরিশোধ ভিন্ন আর কিছু হইবে না। এই স্পষ্ট সর্ত্ত আছে যে, কোন পক্ষই উক্ত পাট্টা রহিত করিতে পারিবে না। বাদী যদি তমঃসুকের সর্ত্ত

মতে ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তমঃসুকের দাবীতে নালিশ করিতে পারে, তবে স্পষ্টই সে উক্ত পাট্টা-লিখিত তাহার নিজের চুক্তির যাবতীয় সর্ত্ত পরাভব করিতে পারিবে।

তাহার নিজের সর্ত্ত অনুরূপ কর আদায় করা অসম্ভব হইবে। বর্ণিত কিস্তিবন্দী মতে ৫৮৭২।/১৯ টাকা ঋণে উসুল দিবার এবং ঐ উসুল সন সন খতের পৃষ্ঠে লিখিবার যে সর্ত্ত আছে, তদ্দ্বারাই এই অকাট্য চুক্তি হইয়াছে যে, বাদী বর্ণিত কিস্তিবন্দী মতে ঋণের টাকা লইবে; এবং কাজে কাজেই বাদীর নিজের এই সর্ত্ত বর্ত্তিতেছে যে, কবুলিয়তে টাকা আদায়ের যে মিয়াদ আছে তাহা গত হওয়ার পূর্ব্বে সে উক্ত কর্জ্জা টাকা চাহিবে না।

বাদী যদি উক্ত ইজারার মিয়াদ মধ্যে তমঃসুকের প্রাপ্য টাকা চাহিতে পারে, তবে গিরীশচন্দ্রের উত্তরাধিকারিগণের অবস্থার বিশেষ ব্যতিক্রম হইবে। বাদী তাহার সমুদায় স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ইজারার প্রতিভূ রাখিয়াছে। উক্ত ইজারার সর্ত্ত অনুসারে বাদীর ইজারা-লিখিত সর্ত্ত পূরণের অপেক্ষায় সময়ে সময়ে যাহা থাকিবে, গিরীশচন্দ্রের নিকট উক্ত মিয়াদ মধ্যে সেই পরিমাণের ঋণই প্রাপ্য থাকিবে। তমঃসুকের দেনা টাকা চাহিলে গিরীশচন্দ্রের দায়াধিকারিগণ ঐ সর্ত্ত অনুসারে অর্থাৎ খতের পৃষ্ঠে উসুল দিয়া তাহাদের কর পাইতে পারিবে না; কিন্তু বাদীর নামে নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিবার সুবিধা দেখিতে হইবে। আবার যদি বাদী ঐ সর্ত্ত মতে সদর জমা না দেয় এবং সেই জন্য বাকী রাজস্বের নিমিত্ত উক্ত সম্পত্তির নীলাম হয়, তবে তাহারা সেই ক্ষতি পূরণার্থে উক্ত টাকার প্রতিভূ হইতে বঞ্চিত হইবে।

এই সকল হেতুবাদে আমরা বিবেচনা করি যে, অধঃস্থ জজ যে নিষ্পত্তি করেন যে, ইজারার মিয়াদ পর্য্যন্ত তমঃসুকের উপর নালিশের স্বত্ব স্থগিত থাকিবে, তাহাই শুদ্ধ।

বর্ণনা-পত্রে যে জওয়াব দেওয়া হয় তাহার প্রত্যুত্তরে বাদীর উকীল যে মৌখিক বর্ণনা করেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নূতন কথা। বাদী নালিশের আরজীতে তমঃসুকের বাবৎ ৩১০০০ টাকার দাবী করে। বাদী যে বাস্তবিক ২৫৭০০ টাকা ধার দেয়, একথা সে গোপন করে। সে যদি ঐ কথা স্পষ্ট রূপে এবং সরল ভাবে তাহার নালিশের আরজীতে বর্ণনা করিত, এবং যদি এই কথা বলিত যে, উক্ত তমঃসুক দিবার পরে সে টাকা আদায়ের নিমিত্ত সময় দিতে সম্মত হইয়া এক ইজারা কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয়; কিন্তু গিরীশচন্দ্র ছলপূর্ব্বক বা প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া উক্ত কবুলিয়ৎ লেখাইয়া লয়, এবং অবস্থা অনুসারে সে ন্যায্য রূপে উক্ত কবুলিয়ৎ রহিত করিবার বা তাহার সর্ত্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিক পরিমাণে মুক্তি পাই-বার প্রার্থনা করিতে পারে, তবে সে হয়ত কোন না কোন প্রকারের দাবী সংস্থাপন করিতে পারিত। কিন্তু এ রূপে সে মোকদ্দমা উপস্থিত করে নাই।

উপস্থিত স্থলে, যদি বাদীকে তাহার বর্ত্তমান নালিশের আরজীতেই তাহা করিতে দেওয়া হয়, তবে যে প্রতিবাদিগণ অর্থাৎ যে নাবালগ-দ্বয় তাহাদের মাতা এবং অভিভাবিকা দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি বিশেষ অন্যায় হইবে। উক্ত নাবালগদিগের পিতা গিরীশচন্দ্রই আদৌ উক্ত তমঃসুকের নিমিত্ত দায়ী এবং সেই বাদীর সহিত ঐ সকল চুক্তি করে। গিরীশচন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছে। সে যে রাধামাধব মৈত্রেয়কে একজেকিউটর নিযুক্ত করে তাহারও মৃত্যু হই-য়াছে, এবং গিরীশচন্দ্র ও বাদীর মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা এখন কেবল বাদীই জানে। বাদী বলে, সে দর-ইজারদার ১৬৪৪ টাকা উপ-স্বত্বের ভূমি পায় নাই। তাহা সত্য হইলে, সে তাহার নিজের হাতে সর্ত্ত মত প্রদত্ত ১৪২৯ টাকা রাখিয়াছে, এবং তাহার সহিত মৃত গিরীশ-

চন্দ্রের যে বন্দোবস্ত হয়, সে যে তাহার বৃত্তান্ত এবং অবস্থা সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক আদালতের অবিদিত রাখিয়াছে, এমত নহে, সমুদায় টাকা যে দেওয়া হইয়াছিল না, এ কথাও সে গোপন করে, এবং সাহস-পূর্ব্বক সত্যতা লিখিয়া নালিশের আরজীতে এই বর্ণনা করে যে, উক্ত তমঃসুকের বাবৎ ৪৪০৩১ টাকা অর্থাৎ ৩৯০০০ টাকা আসল এবং ৫০৩১ টাকা সুদ পাওনা আছে।

মোকদ্দমা উচিত মতেই ডিস্মিস্ হইয়াছে।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস হইল।

(ব)

---

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৩৬৬ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৯শে জুলাই তারিখের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

রামযাদব সরকার (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

আমীরুন্নিসা বিবী প্রভৃতি (দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে কেহ উপস্থিত নাই।

চুম্বক।—কোন আপীল-আদালতের ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত, উক্ত ডিক্রীজারী করার সম্বন্ধে পূর্ব্বের কোন হুকুম থাকুক বা না থাকুক, যে আদালত ঐ মোকদ্দমায় প্রথম ডিক্রী দেন সেই আদালতে করিতে হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—নিম্ন আদালত যে স্থির করেন যে, প্রধান সদর আমীন এই ডিক্রীজারীর যে কার্য্য করেন তাহা, জেলা-জজ জারীর নিমিত্ত প্রধান সদর আমীনকে হুকুম না দেওয়াতে কোন কার্য্যই নহে, ইহাতে আমার বিবেচনায়, তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। যে কার্য্য বিচারাধিকার অভাবে হইবার কথা বলা হইয়াছে তাহা ১৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের জারী দরখাস্ত ক্রমে হয়। উক্ত দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে দেওয়ানী কার্য্যবিধি অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ৮ আইন জারী হয়; এবং উক্ত আইনের ৩৬২ ধারা অনুসারে যে আদালত প্রথম ডিক্রী দেন সেই আদালতে উক্ত মোকদ্দমায় আপীল-আদালতের ডিক্রীজারী করিবার দরখাস্ত করিতে হইবে। সুতরাং প্রধান সদর আমীন আদালত, কোন পূর্ব্বের হুকুম থাকা না থাকা বা ১৮৫২ সালের ২৫ আইনের বিধান সত্ত্বেও, উক্ত ডিক্রীজারী করিবার উপযুক্ত আদালত।

কথিত হইয়াছে যে, অধঃস্থ জজ বিবেচনা করেন যে, উক্ত কার্য্য সরলান্তঃকরণ-মূলক নহে, এবং উপস্থিত রেস্পণ্ডেণ্টও আপত্তি করে যে, তাহা সরলান্তঃকরণ-মূলক নহে। উক্ত প্রশ্নে আমরা প্রবেশ করিতে পারি না, কারণ, রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে কোন উকীল উপস্থিত নাই, এবং বোধ হয় এ স্থলে আমাদের তদন্ত করিবারও কোন উপায় নাই। আমি বোধ করি অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া এই জন্য তাঁহার নিকট নথী ফেরৎ পাঠাইতে হইবে যে, তিনি এই নিরূপণ করেন যে, ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর উপস্থিত দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত ডিক্রীজারীর অভিপ্রায়ে সরলান্তঃকরণে কোন কার্য্য করিয়াছে কি না। নচেৎ উক্ত ডিক্রীজারী ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন মতে বারিত হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

---

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪৫৭ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ এপ্রিলের হুকুম অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৩ রা জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

প্রসন্ননাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি (দায়ী) আপেলাণ্ট।

বিনোদরাম সেন প্রভৃতি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন দায়ী গ্রেপ্তার হই বার আশঙ্কায় একটি আপত্তি সহকারে ডিক্রীদারের দাবী-কৃত টাকা আদালতে দাখিল করে, সে স্থলে উক্ত টাকা ডিক্রীদারকে দিবার পূর্ব্বে দায়ীর অন্য কোন আপত্তি করিবার বাধা হয় না; কারণ, ঐ রূপ বাধ্য হইয়া আদালতে টাকা দাখিল করিলে কোন পক্ষের স্বত্বের কোন তারতম্য হয় না।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমায়, দায়িগণের বিরুদ্ধে এক অপরিশোধিত ডিক্রী ছিল, এবং ১৮৫৮ সালের ১৩ ই জুলাই তারিখে আদালত নির্দ্ধারণ করেন যে, উক্ত ডিক্রীর বাবৎ বাদীর নিকট কিছু টাকা পাওনা ছিল। দায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া উক্ত ডিক্রীজারীর জন্য বা বিচারের নিমিত্ত ডিক্রীদার অধঃস্থ জজের আদালতে দরখাস্ত করে, এবং যত টাকার ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা হয়, দায়ী তাহা এই দরখাস্ত করিয়া আদালতে দাখিল করে যে, ডিক্রীদার সুদ পাইতে পারে না, কেবল আসল টাকা পাইবে; এবং ডিক্রীদারকে উক্ত টাকা দিবার পূর্ব্বে সুদের বিষয়ের বিচারার্থে সে আদালতে প্রার্থনা করে।

পরে, যখন ডিক্রীদার এই টাকা বাহির করিয়া লইবার প্রার্থনা করে, এবং উক্ত বিষয়ের শুনানী হয়, দায়ী তখন তমাদীর আপত্তি উত্থাপন করে; এবং অধঃস্থ জজ উক্ত ডিক্রী তমাদী দ্বারা বারিত হইয়াছে বিবেচনায় ডিক্রীদারকে মোকদ্দমা চালাইতে দিতে অস্বীকার করেন; এবং এই হুকুম আপীলে জেলা-জজের নিকট উপস্থিত হওয়ায় তিনি বলেন যে, দায়ী উক্ত টাকা ডিক্রীদারের জন্য আদালতে দাখিল করে, এবং দায়ী টাকা দিবার সময় তমাদীর আপত্তি করে নাই। তিনি বলেন—"দায়ী আইনের দ্বারা যাহা দিতে বাধ্য ছিল "না, কিন্তু ন্যায়পরতা এবং সদ্বিচার মতে যাহা "তাহার দেওয়া উচিত, তাহা সে স্পষ্টই দিয়াছে। "অতএব সে উক্ত টাকা ফেরৎ পাইতে পারে "না, বা সে যে এই প্রথম ১৮৬৯ সালের ১৭ ই "এপ্রিল তারিখে তমাদীর আপত্তি করে তাহাও "সে করিতে পারে না।"

এই রায়ের পোষকতায় ডিক্রীদার অর্থাৎ খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল আপত্তি করেন যে, দায়ী যে এ টাকা দেয় তাহা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেওয়া হয়; তাহা ডিক্রীদারের জন্যই দেওয়া হয়; এবং তাহা কেবল এই একটি মাত্র সর্ত্তের অধীনে দেওয়া হয় যে, ডিক্রীদার সুদ পাইবে না, সুতরাং দায়ী কেবল সেই এক আপত্তিতেই আবদ্ধ; এবং উক্ত আপত্তি খণ্ডিত হইলে আদালতের উক্ত টাকা ডিক্রীদারকেই দিতে হইবে।

আমার মতে এ সকল আপত্তি অমূলক। দায়ী উক্ত টাকা ডিক্রীদারের জন্য দেয় নাই, কিন্তু তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে দরখাস্ত করায় সে বাধ্য হইয়া আদালতে যে কিছু টাকা দাখিল করে, তাহাই ফেরৎ পাইবার দরখাস্ত করিয়াছে ও সেই সঙ্গে আর এই এক আপত্তি করে যে, ডিক্রীদার সুদ পাইতে পারে না। কিন্তু আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তাহা দ্বারা তাহার পরে আর কোন আপত্তি করিবার বাধা হয় নাই। তাহার আপত্তি শুনা যাইতে পারে, এবং ডিক্রীদারকে টাকা দিবার পূর্ব্বে, দায়ী আইন

বা বৃত্তান্ত-ঘটিত যে কোন আপত্তি হয়, করিতে পারে; এবং যে ব্যক্তিকে গেপ্তার করিবার আশঙ্কা জন্মান হয়, তাহার পক্ষে সমুদায় প্রশ্ন এবং সমুদায় আপত্তি বিবেচনা করিয়া উঠা অথবা যে কোন বৃত্তান্ত ও আইন-ঘটিত বিষয় উত্থিত হইতে পারে তাহা অবিকল অবগত হওয়া কত কঠিন, তাহা দেখিলে ঐ আপত্তি শ্রবণের ঔচিত্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

এ মোকদ্দমায় যে প্রকৃত প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে তাহা অতিক্রম করিয়া, এই টাকা ডিক্রীদারকে যথার্থই দেওয়া হইলে দায়ী কি করিতে পারিত, তাহা বিবেচনা করার আবশ্যক নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট যে, উক্ত টাকা আদালতে আমানত করা হয়, এবং তাহা যে পাইতে পারে আদালত তাহাকেই তাহা দিতে বাধ্য।

অতএব দায়ী যদি ডিক্রীদারের ঐ টাকা পাওয়ার বাধা থাকিবার আইন-সঙ্গত কোন হেতু সাব্যস্ত করিতে পারে, তবে আদালত ডিক্রীদারকে ঐ টাকা ন্যায্য রূপে দিতে পারেন না।

অতএব আমার বোধ হয় যে, ডিক্রীজারী বারিত হইয়াছে কি না, তাহা নিরূপণার্থে এই মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ফেরৎ যাওয়া উচিত।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঠিক ঐ মত। আমার বোধ হয় যে, গেপ্তারীর ভয়ে বাধ্য হইয়া আদালতে টাকা দাখিল করিলে কিছুতেই পক্ষগণের স্বত্বের ব্যতিক্রম হয় না। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কোন আপত্তি না করিয়া আদালতে টাকা দাখিল করিলেও তাহাই হইত; এবং কোন পক্ষ কোন ডিক্রীজারী সম্বন্ধে এক বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া অন্যান্য হেতু সম্বন্ধে কিছু না বলিলে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

(ঘ)

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি নর্ম্যান এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ৩০৩০ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ১৫ ই জুনের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৮ সালের ২ রা সেপ্টেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মথুরাকুঙারী (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

বুতন সিংহ (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মিতাক্ষরা মতে, পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি পুত্র পৌত্র নাবালগ থাকিলে বা অন্য কোন গতিকে অনুমতি দিতে অশক্ত থাকিলেই কেবল, পরিবারের ঋণ পরিশোধার্থে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে।

যে স্থলে পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি পরিবারের ঋণ পরিশোধার্থে কোন ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে, সে স্থলে তাহা পুত্রের সম্মতি ব্যতীত করা হইয়াছে বলিয়া অন্যথা হইলে উক্ত ক্রয়-মূল্যের যে অংশের দ্বারা উক্ত ঋণ পরিশোধ হয় তাহা পুত্রের প্রাপ্য অংশের পরিমাণে ফেরৎ দিয়া পুত্র দখল লইতে পারে।

বিচারপতি নর্ম্যান।—প্রথম বিচারের প্রমাণ এবং পুনঃপ্রেরণের পর যে অতিরিক্ত প্রমাণ গৃহণ করা হয় তাহাতে এ মোকদ্দমার এই বৃত্তান্ত জানা যায়, যথা:—

দয়াল সিংহের হরেল, লুটন এবং বুতন নামক তিন পুত্র ছিল। দয়ালের বড় পরিবার এবং ক্ষুদ্র সম্পত্তি থাকায় বোধ হয় পরিবার প্রতিপালনার্থে ঋণগ্রস্ত হয়, এবং ১৮৫১ সালে বা তাহার কিঞ্চিৎ অগ্র-পশ্চাতে এক্ষণকার বিরো-

ধীয় সমগ্র সম্পত্তি ৭৭৫ টাকায় এক জরিপেশগী পাট্টা অনুসারে সাত বৎসর মিয়াদে কট দেয়; উক্ত পাট্টা আসল টাকা পরিশোধ হওয়া পর্য্যন্ত প্রতি সাত বৎসর পরে বদলাইয়া দিবার সর্ত্ত থাকে। সুদ দিয়া উক্ত পাট্টা মতে ঐ পরিবারের বার্ষিক ২২ টাকা মাত্র উপস্বত্ব থাকে, তাহা করের স্বরূপ গ্রহণ করা হয়।

এই কটের ঋণ এবং ঐ রূপ আর কোন কোন ঋণ পরিশোধার্থে সে ১৮৬০ সালে উক্ত কটের সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরেলের স্ত্রী প্রতিবাদিনী মথুরা কুওরীর নিকট ৮৭৫ টাকায় বিক্রয় করে।

দয়াল সিংহের উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিবার সময়ে তাহার পুত্র বুতন এবং হরেল যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই; বুতন আদালতে উপস্থিত আছে এবং আমরা তাহাকে দেখিয়াছি।

উক্ত পরিবার মিতাক্ষরার অধীন; এবং মিতাক্ষরার ১ম অধ্যায়ের ১ ধারায় সংস্থাপিত আছে যে, "অত্যাবশ্যকীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে এবং "আইনের বিধান মত কার্য্যে, যথা স্নেহ বশতঃ "দান, পরিবারের ভরণপোষণ, বিপদ্ হইতে "উদ্ধার প্রভৃতি কার্য্যে স্থাবর ভিন্ন অন্যান্য "বিত্ত পিতার হস্তান্তর করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা "আছে; কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিতই "হউক বা পৈতৃকই হউক, তৎসম্বন্ধে সে তাহার "পুত্র এবং অন্যান্যের শাসনের অধীন, "কারণ, বিধি এই যে, 'অস্থাবর সম্পত্তি "স্বোপার্জ্জিত হইলেও সমস্ত পুত্রের সম্মতি না "লইয়া তাহা দান বিক্রয় করা যাইতে পারে না; "যাহারা জন্মিয়াছে, এবং যাহারা এখনও জন্মে "নাই, এবং গর্ব্ভে আছে তাহাদের ভরণপোষণের "উপায় থাকা আবশ্যক, অতএব কোন দান "বিক্রয় করা উচিত নহে।"

ইহার বর্জ্জিত বিধি ২৮ প্রকরণে আছে; তাহা এই,— "কোন এক ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের "সময়ে পরিবারের জন্য, বিশেষতঃ, ধর্ম্মা-"নুষ্ঠানার্থে অস্থাবর সম্পত্তি দান করিতে, "বন্ধক দিতে বা বিক্রয় করিতে পারে।" টীকাকার উক্ত শ্লোকের এই অর্থ করেন যথা, "পুত্র পৌত্র নাবালগ হইলে এবং দান ইত্যা-"দিতে সম্মতি দিতে অশক্ত হইলে, অথবা ভ্রাতৃ-"গণ ঐ অবস্থাপন্ন হইয়া একান্নে থাকিলে, পরি-"বারস্থ এক ব্যক্তি অশক্ত থাকিলে পরিবারের "সমুদায়ের সম্বন্ধে বিপদ্ ঘটিলে অথবা পরি-"বারের ভরণপোষণার্থে আবশ্যক হইলে, "(ইত্যাদি) সেও স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে "বা দান বিক্রয় করিতে পারে।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে স্থলে পুত্রপৌত্র নাবালগ থাকে বা অন্য কোন কারণে সম্মতি দিতে অশক্ত হয়; তাহাতেই কেবল মিতাক্ষরাধীন পরিবারস্থ কোন এক ব্যক্তি পারিবারিক ঋণ পরিশোধার্থে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারে।

পিতার বিক্রয়ে পুত্রগণের সম্মতি থাকার বিষয় সহজেই স্থির হইতে পারিত। কিন্তু আমাদের নিকট ঐ হেতুবাদে মোকদ্দমা উপস্থিত হয় নাই। মথুরার নিকট বিক্রয় দ্বারা কটের ঋণ পরিশোধ করিয়া উক্ত সম্পত্তি গুরুতর দায় হইতে মুক্ত করাতে ঐ পরিবারের যে মহৎ উপকার হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিক্রয়ের পর সাত বৎসরের মধ্যে উপস্থিত বাদী তৎপ্রতি কোন আপত্তি না করাতে আমাদের এই প্রবল অনুমান হইতে পারিত যে, সে উক্ত বিক্রয়ে সম্মতি দিয়াছে। কিন্তু যে ইসু ধার্য্য হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, উভয় পক্ষই এমত স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, সম্মতি দেওয়া হয় নাই।

উক্ত বিক্রয়-লব্ধ টাকা দ্বারা পারিবারিক ঋণ পরিশোধ হওয়ায়, বাদী, ৯ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৫১২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নিষ্পত্তি মতে উক্ত সম্পত্তি ঐ সকল ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া পাইতে পারে না; এবং উক্ত বিক্রয় অন্যথা

হওয়ায়, মথুরা যে ৮৭৫ টাকা দেয় এবং যাহা পরিবারের ঋণ পরিশোধার্থে প্রয়োগ হয়, বাদী সেই টাকার চতুর্থাংশ দিয়া উক্ত সম্পত্তি এখন যে অবস্থায় আছে কেবল তাহাতেই চতুর্থাংশের দখল পাইতে পারে।

অধঃস্থ জজের ডিক্রী মূলে শুদ্ধ, এবং তাহা কেবল এই রূপে সংশোধিত হইবে। দয়াল সিংহ-কৃত বিক্রয় বুতন বাদীর চতুর্থাংশ বাদে স্থির থাকিবে, যে মথুরার প্রদত্ত ক্রয়-মুল্যের চারি আনা অংশের টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে বিক্রীত সম্পত্তিতে আপন অংশে দখল পাইবে; উক্ত টাকা অদ্যকার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে দিতে হইবে।

প্রত্যেক পক্ষ এই আপীলের আপন আপন খরচা দিবে। (ব)

৮ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং জে, বি, ফিয়ার।

১৮৬৯ সালের ১৫১৯ নং মোকদ্দমা।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৩০ এ মে তারিখের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১০ ই এপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

আসর আলী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

উলফতুন্নিসা প্রভৃতি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অখিলচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর, ই, টুইডেল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যখন কোন আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়ে ডিক্রী সংশোধনের প্রার্থনা করা হয়, তখন তাহা পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা স্বরূপেই গণ্য, সুতরাং আদালতের সন্তোষ-জনক রূপে বিলম্বের ন্যায্য এবং উচিত কারণ না দর্শাইতে পারিলে, নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের পরে উক্ত প্রার্থনা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বিচারপতি বেলি।—আমার মতে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত অন্যথা হইবে।

যে বিষয়ে আপত্তি হইয়াছে, তাহা বহুকাল অন্তে এবং উত্তম ও যথেষ্ট হেতু ব্যতীত পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রহণ করা সম্বন্ধীয়।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৭৭ ধারায় লেখা আছে যে, মিয়াদ অন্তে পুনর্ব্বিচারের যে দরখাস্ত হয়, তাহা কেবল এমত স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে, "যে স্থলে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ঐ রূপ "দরখাস্ত না করিবার ন্যায্য ও সঙ্গত হেতু আদা- "লতের তৃপ্তি-জনক রূপে দরখাস্তকারী দেখাইতে "পারিবে।

উপস্থিত স্থলে নিম্ন আপীল-আদালত মিয়াদ অন্তে উক্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিবার কোন কারণের উল্লেখ করেন নাই। তিনি কেবল এই বলেন যে, উক্ত দরখাস্ত যে সময়েই হউক, করা যাইতে পারে। কিন্তু ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের বিধান অনুসারে কাল-বিলম্বের যথেষ্ট কারণ দেখান না হইলে তাহা হইতে পারে না।

এই মোকদ্দমার বৃত্তান্তে দৃষ্ট হইতেছে যে, ১৮৪৩ সালের ৪ ঠা জুলাই তারিখে ডিক্রী প্রদত্ত হয়। দখলের এবং সুদ সমেত ওয়াশীলাতের ডিক্রী দেওয়া হয়, কিন্তু দখল পাওয়া হয় না, এবং ২১ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের পূর্ব্বে সুদ এবং ওয়াশীলাতেরও প্রার্থনা করা হয় না। ১৮৬৪ সালের ৩ রা আগষ্ট তারিখে প্রথম আদালত স্থির করেন যে, ডিক্রীদার সুদ এবং ওয়াশীলাৎ পাইবে। ১৮৬৫ সালের ৩ রা মার্চ তারিখে জেলার জজ উক্ত হুকুম অন্যথা করিয়া স্থির করেন যে, ডিক্রীতে যত দিনের কথা লেখা আছে, ডিক্রীদার কেবল তত দিনেরই সুদ পাইবে। তাহাতে উক্ত হুকুমের বিরুদ্ধে প্রধানতম বিচারালয়ে খাস আপীল হয়, এবং প্রধানতম বিচারালয় ১৮৬৫ সালের ১৮ ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্ন আদালতের হুকুম স্থিরতর রাখেন।

ডিক্রীদার ১৮৬৬ সালের ৭ ই জুলাই তারিখে প্রধানতম বিচারালয়ে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে, এবং প্রধানতম বিচারালয় বলেন যে, ডিক্রীর যত টাকা বাকী থাকে, তাহারই সুদ চলিবে, কিন্তু যে আদালত প্রথমে ডিক্রী দেন সেই আদালতেই দরখাস্ত করিতে হইবে।

তদনন্তর, উপস্থিত কার্য্য সমস্ত হইয়াছে, এবং বিলম্বের উত্তম এবং যথেষ্ট কারণ দেখান সম্বন্ধে কোন কথাই না বলিয়া জজ সমুদায় টাকা আদায়ের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রীদারকে সুদ এবং ওয়াশীলাৎ দিয়াছেন। ইহা আইনের বিধানের এবং এই আদালতের সমুদায় নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ; অতএব আমি বিবেচনা করি, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত অন্যথা হইবে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমি সম্মত হইলাম। কোন ডিক্রী সংশোধনার্থে যে দরখাস্ত করা হয়, তাহার অভিপ্রায় পূর্ব্ব প্রদত্ত রায়ের সহিত উক্ত ডিক্রী ঐক্য করা। না হইয়া, আদালতের নিষ্পত্তির পরিবর্ত্তন করা, হইলে, তাহা উক্ত আদালতের নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হইতে যে ভিন্ন, নিম্ন আদালতের জজের এই মতে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। আমি বিচারপতি বেলির সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া বলিতেছি যে, এ মোকদ্দমায়, ১৮৬৮ সালে অর্থাৎ ৯০ দিবস গত হওয়ার বহুকাল পরে, ডিক্রী সংশোধনার্থে যে দরখাস্ত করা হয়, তাহা অন্যায় রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহা প্রমাণ দ্বারা উত্তম হেতু প্রদর্শিত না হইলে বহুকাল পরে বিধিমত গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এবং জজও এমত কোন প্রকারের প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই, (বাস্তবিকই ঐ রূপ কোন প্রমাণ গ্রহণ করার কথা বলা হয় নাই,) যাহাতে উক্ত বিলম্ব ন্যায্য হইতে পারে। আমি ইহাও বলিতে চাহি যে, যেরূপে উক্ত ডিক্রী সংশোধন করা হইয়াছে, দেওয়ানী আদালত ১৮৪৩ সালে সেই আকারে ডিক্রী দিতে পারিতেন কি না, তৎসম্বন্ধে আমার অত্যন্ত সন্দেহ আছে, কারণ, ডিক্রীর পরে দরখাস্ত করা হইলে আদালত ১৮৩৯ সালের ১১ ই জানুয়ারি তারিখের ৭ ম নিয়ম অনুসারে কেবল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকা পর্য্যন্তের ওয়াশীলাৎ দিয়া ডিক্রী সংশোধন করিতে পারেন; তদতিরিক্ত কোন কালের ওয়াশীলাৎ দিতে পারেন না; এবং যখন ১৮৪৩ সালে আদালতের ঐ রূপ ডিক্রী দিবার ক্ষমতা ছিল না, তখন সেই সময়ের ডিক্রী ১৮৬৮ সালের ৩০ এ মে তারিখের হুকুম দ্বারা যেরূপ সংশোধিত হইয়াছে, তাহা অকর্ম্মণ্য হইবে। (ব)

৮ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি ই, জ্যাক্সন এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৫৮৭ নং মোকদ্দমা।

পূর্ণিয়ার অধঃস্থ জজ তত্রত্য সদর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৮ ই এপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

হরদয়াল মণ্ডল (বাদী) আপেলাণ্ট।

তীর্থানন্দ ঠাকুর (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু রূপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু তারকনাথ দত্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বার্ষিক ৫০ টাকা করের দাবীতে নালিশ হয়, কিন্তু তাহার অর্দ্ধেক হারের ডিক্রী হয়। আপীলে উক্ত নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া সম্পূর্ণ টাকার ডিক্রী হয়। খাস আপীলে এই নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া প্রথম আদালত যে হারের ডিক্রী দেন তাহাই পুনঃ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে ডিক্রীদার নিম্ন আপীল-আদালতের ডিক্রীজারী করিয়া উচ্চ হারের কর আদায় করিয়া লয়। দায়ী যে অতি-

রিক্ত টাকা দেয় তাহার দাবীতে সে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে, কিন্তু কালেক্টর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করায় সে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া উক্ত অতিরিক্ত টাকার ডিক্রী পায়। অধঃস্থ জজ ঐ ডিক্রী অন্যথা করেন।

স্থির হইল যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা কালেক্টরের নিকটের মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় না, সুতরাং কালেক্টর উক্ত অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দেওয়াইবার উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি যখন উচিত বিচারাধিকার পরিচালন করেন নাই এবং বাদীর ক্ষতি হইয়াছে, তখন বাদীকে কালেক্টরের নিকট ফেরৎ পাঠান অধঃস্থ জজের উচিত হয় নাই, তাঁহার নিজেরই উক্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার করা উচিত ছিল।

তমাদীর প্রশ্ন সম্বন্ধে এরূপ মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১৬ প্রকরণ খাটে।

**বিচারপতি জ্যাক্সন।**—বাদী নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সুদ ও আসলে ১১২ টাকার দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদী এই বলিয়া বাদীর নামে বাকী করের দাবীতে নালিশ করিয়াছিল যে, প্রতিবাদীর কর বার্ষিক ৫০ টাকা। বর্ত্তমান বাদী তাহার জওয়াবে বলে যে, তাহার কর বার্ষিক ২৫ টাকা।

প্রথম আদালতে ২৫ টাকার হিসাবে ডিক্রী হয়। কিন্তু আপীল-আদালতে উক্ত নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া ৫০ টাকা হিসাবে ডিক্রী প্রদত্ত হয়।

খাস আপীলে নিম্ন আপীল-আদালতের রায় অন্যথা হয়, এবং প্রথম আদালত যে হারে ডিক্রী দেন তাহাই উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হয়।

ইতিমধ্যে উপস্থিত প্রতিবাদী নিম্ন আপীল-আদালতের উচ্চ হারের ডিক্রীজারী করিয়া উক্ত উচ্চ হারে সমুদায় কর আদায় করিয়া লয়।

প্রতিবাদী এই রূপে যে অতিরিক্ত টাকা আদায় করে, উপস্থিত বাদী তাহার দাবীতে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করায় কালেক্টর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বলাতে প্রতিবাদী ঐ টাকার দাবীতে দেওয়ানী আদালতে এই নালিশ উপস্থিত করে।

সে প্রথম আদালতে ডিক্রী পায়, কিন্তু আপীল-আদালতে পূর্ণিয়ার অধঃস্থ জজ প্রথমতঃ স্থির করেন যে, উক্ত মোকদ্দমা তমাদীর আইন দ্বারা বারিত; এবং দ্বিতীয়তঃ, কালেক্টরেরই কেবল উক্ত অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দেওয়াইবার অধিকার আছে। অধঃস্থ জজ আইনের ঐ মর্ম্ম গ্রহণ করত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

খাস আপীলে আপত্তি হইয়াছে যে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি এ উভয় বিষয় সম্বন্ধেই অন্যায় হইয়াছে।

খাস অপীল শ্রবণ সম্বন্ধে এই হেতুবাদে এক প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপিত হয় যে, ইহা ছোট আদালতের মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমা; ইহা সচরাচর ক্ষতিপূরণের দাবীর মোকদ্দমা, এবং তাহা এরূপ যে, ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত; অতএব এ আদালতে তাহার খাস আপীল হইবে না। এ আপত্তি বিপক্ষ স্পষ্টভাবে করে না, কিন্তু ইহা এই খাস অপীলের মূলোৎপাটক আপত্তি এবং ইহা দ্বারা এই খাস আপীল শ্রবণের বাধা হয়। কিন্তু এ মোকদ্দমার সমুদায় বৃত্তান্ত এবং অবস্থা দৃষ্টে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, অধঃস্থ জজের এ বিষয়ে অধিকার ছিল, এবং তাঁহার এ মোকদ্দমায় বিচারাধিকার থাকাতেও তিনি তাহা পরিচালন করিতে অস্বীকার করায়, অপচিত ব্যক্তির প্রতি সদ্বিচারার্থে এই আদালত উক্ত বিচারাধিকার পরিচালন করাইতে সক্ষম ও বাধ্য। নিম্ন আদালত সকল তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুদ্ধরূপে নির্ব্বাহ করেন কি না, তাহা এই আদালতের সনন্দ-পত্রের ১৫ ধারা অনুসারে দেখিবার অধিকার আছে, এবং উপস্থিত মোকদ্দমা নিশ্চয়ই এরূপ যাহাতে সনন্দের ১৫ ধারা অনুসারে নিম্ন আপীল-আদালতকে তাঁহার আইন

অনুসারে যে বিচারাধিকার আছে তাহা পরিচালন করিতে আদেশ করা উচিত।

অধঃস্থ জজ যথার্থই বলিয়াছেন যে, কালেক্টর প্রথমে তাঁহার ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন, এবং বাদীর দোষে প্রতিবাদী যে অতিরিক্ত টাকা দেয় তাহা ফেরৎ দিবার উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন।

দেওয়ানী আদালতের এবং কালেক্টরের ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় নিয়ম কিছু বিভিন্ন। ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার আদেশ এই যে, "যে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়াছে তাহার পক্ষগণের "মধ্যে ডিক্রীজারী সম্বন্ধে যে সকল বিবাদ "উপস্থিত হয় তাহা স্বতন্ত্র মোকদ্দমায় মীমাং- "সিত না হইয়া ডিক্রীজারীকারক আদালতের "হুকুম দ্বারা মীমাংসিত হইবে।" কালেক্টরের বিচারিত মোকদ্দমায় ঐ রূপ কোন বিধি প্রয়োগ হয় না। উক্ত ধারা কিছুতেই ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় না।

এমত অবস্থায়, যে স্থলে কালেক্টর উচিত বিচারাধিকার পরিচালন করেন নাই, এবং যে স্থলে স্পষ্টই বাদীর হানি হইয়াছে, সে স্থলে তাহার দাবী দেওয়ানী আদালতের শুনা উচিত। তাহা শুনিতে কোন বাধা না থাকায় বাদীকে পুনরায় কালেক্টরের নিকট পাঠান অধঃস্থ জজের উচিত হয় নাই; আমরা বিবেচনা করি, তাঁহার আপীল শুনিয়া মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা উচিত।

অধঃস্থ জজ তমাদীর প্রশ্নের নিষ্পত্তিতে বলেন নাই যে, তমাদীর আইনের কোন্ ধারা অনুসারে তিনি উক্ত দাবী বারিত স্থির করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই তিন বৎসরের তমাদীর বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন। তমাদীর আইনে যে সকল ধারা আছে তাহার মধ্যে এমত কোন বিশেষ ধারা নাই যাহাতে এই প্রকারের মোকদ্দমার কথা বলা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায়, এরূপ মোকদ্দমা উক্ত আইনের ১ ধারায় ১৬ প্রকরণের অন্তর্গত; তাহাতে নালিশের কারণ উপস্থিত হওনাবধি ৬ বৎসর মিয়াদের বিধান আছে। উপস্থিত মোকদ্দমায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৮৬৫ সালের ১ লা আগস্ট তারিখে যখন প্রধানতম বিচারালয় প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি পুনঃ স্থাপিত করেন তখন বাদীর নালিশের কারণ জন্মে; অতএব বাদীর দাবী বারিত হয় নাই।

এই খাস আপীলের ডিক্রী হইবে, এবং এ মোকদ্দমা পুনরায় বিচারার্থে অধঃস্থ জজের নিকট পাঠাইতে হইবে। তাঁহার কেবল এই বৃত্তান্তঘটিত ইসুর বিচার করিতে হইবে যে, প্রতিবাদী যে বলে যে, সে বাদীকে উক্ত অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ দিয়াছে তাহা যথার্থ কি না।

আমরা এই আদালতের খরচা সম্বন্ধে কোন হুকুম দিলাম না, কারণ, আমাদের বিবেচনায় এ মোকদ্দমায় খরচা দেওয়া উচিত নহে। (বি)

---

৮ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪২১ নং মোকদ্দমা।

মেদিনীপুরের প্রতিনিধি জজের ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

গজেন্দ্রনারায়ণ রায় (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

হেমাঙ্গিনী দাসী (দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আশুতোষ ধর আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ভবানীচরণ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি এমত কোন ব্যক্তি রায় প্রদত্ত হওয়ার পরে কোন জামিননামা লিখিয়া দেয়, যে ব্যক্তি মূল মোকদ্দমার কোন পক্ষ ছিল না, তবে ঐ জামিননামা ডিক্রীজারীর কার্য্য দ্বারা সরাসরীরূপে প্রবল করা যাইতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—স্বীকার করা হইয়াছে যে, ৭ ম বালম উইক্লিরিপোর্টরের ৩২৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত রামকৃষ্ণ দাস বনাম হকু সিংহের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে চলিলে ডিক্রীদারের আপীল বিফল হইবে, কারণ, এ মোকদ্দমায় ডিক্রীদারের অভিপ্রায় এই যে, যে ব্যক্তি মুল্ল মোকদ্দমায় কোন পক্ষ ছিল না সে রায় প্রদত্ত হওয়ার পরে যে জামিনীর খত লিখিয়া দেয়, তাহা সরাসরী রূপে ডিক্রীজারী দ্বারা প্রবল করা হয়। এমত স্থলে উল্লিখিত মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ স্থির করেন যে, ২০৪ ধারার বিধান প্রয়োগ হয় না, এবং স্বীকার করা হইয়াছে যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধিতে আর কোন বিধান নাই, যদনুসারে এই রূপ জামিননামা সরাসরীরূপে জারী হইতে পারে। আমার নিজের বিবেচনায়, উক্ত মোকদ্দমায় ২০৪ ধারার অর্থ সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা হইতে মতান্তর হইবার কোন কারণ নাই। যে সকল ধারায় রায় দিবার অব্যবহিত পরেই ডিক্রীজারী সম্বন্ধে যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, এবং যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হইবে তাহা লিখিত আছে, তাহার মধ্যে উহা একটি ধারা, এবং উক্ত ধারার শব্দ এই :—"যদি কোন ব্যক্তি ডিক্রী মতে কি "তাহার কোন ব্যক্তি ডিক্রীমতে কি তাহার "কোন অংশমতে কার্য্য হইবার জামিন "হইয়া দায়ী হয়, তবে তাহার বিরুদ্ধে ঐ "ডিক্রীজারী হইতে পারে।" তাহাতে যাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধের ন্যায় ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিয়া হুকুম লওয়া হয়, উক্ত ব্যক্তিকে স্পষ্টই তাহাদের মধ্যে গণ্য করা হয়। উক্ত ধারায় আর কিছু বলা হয় নাই, এবং রায় দিবার পর যে সকল করার বা দায় গ্রহণ করা হয় তাহার বিষয় বলা হয় নাই। অতএব আমার বিবেচনায় এই হেতুবাদে, এবং আর আর প্রশ্ন কিছু জড়িত বিধায় তাহাতে প্রবেশ না করিয়া ডিক্রীদারের আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—যে নজীর দর্শান হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমারও ঐ মত। (ব)

১০ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডব্লিউ মার্ক্‌বি।

১৮৬৯ সালের ৪৩৯ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৩ রা জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

প্রেমলাল গোস্বামী (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

হোসেনুদ্দীন প্রভৃতি (দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীকৃষ্ণ সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে ক্রমান্বয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেবল এক মৃত প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা হয়, সে স্থলে উক্ত ব্যক্তি নিজের জন্য এবং ঐ অপর প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে দায়ী হইলেও, তাহাকে এক জন মুল প্রতিবাদী বলিয়া তাহার নিজের বিরুদ্ধে আর ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি বোধ করি, নিম্ন আপীল-আদালতের যে রায় দ্বারা প্রথম আদালতের হুকুম স্থির থাকে, তাহাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

যে মোকদ্দমা হইতে এই সকল ডিক্রীজারীর কার্য্য উত্থিত হয়, তাহা করের দাবীর মোকদ্দমা, এবং বোধ হয় সরিয়তুল্লা, মহুলেউদ্দীন এবং অপর এক ব্যক্তি প্রতিবাদী ছিল। কোন ব্যক্তির নাম করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া হয় নাই, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দেওয়া হয়, এবং বোধ হয়, ডিক্রী দেওয়ার পর কেবল সরিয়তুল্লার বিরুদ্ধেই

ডিক্রীজারী করা হয় ; কিন্তু উক্ত কার্য্য চলিবার সময়ে সরিয়তুল্লার মৃত্যু হওয়ায় এই সরিয়তুল্লার স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে মছলেউদ্দীন প্রভৃতির বিরুদ্ধে বাদী ডিক্রীজারী করে ; এবং বাদী যে সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিবার চেষ্টা পায়, তাহা এই ব্যক্তিগণ সরিয়তুল্লার নিকট হইতে দায়ক্রমে প্রাপ্ত হয় কি না, তাহার বিচারার্থে আদালত একবার প্রমাণও গ্রহণ করেন ; এবং যখন জানা যায় যে, এই সম্পত্তি তাহারা পায় নাই, তখন উক্ত কার্য্য স্থগিত করা হয়। আবার অন্য এক সময়ে বাদী মছলেউদ্দীনকে সরিয়তুল্লার নিজের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া গেপ্তারের নিমিত্ত দরখাস্ত করে। তাহাতে আবার আদালত নিষ্পত্তি করেন যে, মছলেউদ্দীন এমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি নহে যে, সে গেপ্তার হইতে পারে ; এবং ডিক্রীজারী করিতে অস্বীকার করেন।

মূল প্রতিবাদী এবং ডিক্রী পরিশোধ করিতে বাধ্য বলিয়া মছলেউদ্দীনের নিজের বিরুদ্ধে বাদী এক্ষণে ডিক্রীজারী করিবার প্রার্থনা করে।

নিম্ন আদালতদ্বয় স্থির করেন যে, সে নিজে দায়ী নহে ; এবং উক্ত ডিক্রী এবং সেই অবধি পক্ষগণের আচরণ দৃষ্টেও আমার বোধ হয় যে, নিম্ন আদালতদ্বয়ের উক্ত সিদ্ধান্ত করা এবং এই স্থির করা উচিত হইয়াছে যে, বরাবর মছলেউদ্দীনকে সরিয়তুল্লার স্থলাভিষিক্ত রূপে দায়ী বলিয়া ব্যবহার করার পর এক্ষণে তাহাকে তাহার আপন দায়ে দায়ী বলিয়া সাব্যস্ত করিবার আর সময় নাই।

বাদী যদি প্রথমে এই মছলেউদ্দীনকে সরিয়তুল্লার স্থলাভিষিক্ত অথচ সহ-প্রতিবাদী স্বরূপে একত্রে দায়ী বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিত, তবে তাহার দাবীর বাধা দেওয়া কঠিন হইত। তাহা করা হয় নাই। আমি বোধ করি স্পষ্টই এই দাঁড়াইতেছে যে, সে নিজের জন্য দায়ী ছিল না। কিন্তু আমার ইহাও বোধ হইতেছে যে, মছলেউদ্দীন যদি স্পষ্টই প্রতিবাদি-শ্রেণীভুক্ত বলিয়া দায়ী হইত, তবে বাদী তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিলে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল দাবী হইতে পারে তাহাই অবলম্বন করা উচিত ছিল। বাদী একই ব্যক্তিকে প্রথমতঃ কোন সহ-প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া এবং পরে তাহাকেই এক জন সহ-প্রতিবাদী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে পৃথক্ পৃথক্ রূপে ডিক্রীজারী করিতে পারে কি না, তাহা সন্দেহের বিষয় ; এবং এরূপ কার্য্য যে একেবারে আইন-বিরুদ্ধ এমত এক্ষণে সংস্থাপন না করিয়া আমরা তাহা নিম্ন আদালতের রায়ে সম্মতি দিবার আরো এক কারণ স্বরূপে ব্যবহার করিব ; এবং যদি এই মোকদ্দমা আমাদিগের নিকট এক্ষণে ডিক্রীজারীতে উপস্থিত থাকিত, তবে, আমরা এরূপ অবস্থায় ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে বিশেষ ইচ্ছুক হইতাম।

অতএব আমার বিবেচনায়, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত স্থির থাকিবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। যে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইয়াছে তাহা এরূপ বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে যে, তাহার অর্থ করা সুকঠিন। উক্ত ডিক্রীতে দুই জন বাদী এবং তিন জন প্রতিবাদীর মধ্যের তর্কের উল্লেখ করার পর, নাম উল্লেখ না করিয়া এক জন মাত্র বাদীকে এক জন মাত্র প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া হয়। ঐ ডিক্রী দেওয়ার অব্যবহিত পরেই এমন বলা যাইতে পারিত যে, ঐ সকল শব্দে সমুদায় বাদীর অনুকূলে সমুদায় প্রতিবাদীর প্রতিকূলের ডিক্রী বুঝায়। কিন্তু তাহা করা দূরে থাকুক, দেখা যায় যে, ক্রমান্বয়ে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত ডিক্রীজারীর নিমিত্ত যে দরখাস্ত করা হয়, তাহার প্রত্যেক দরখাস্তেই এই ডিক্রী কেবল এক জন প্রতিবাদী সরিয়তুল্লার বিরুদ্ধ ডিক্রী স্বরূপ ব্যবহার করা হয়। আমি বোধ করি, নিম্ন আদালতের ইহা স্থির করা উচিতই হইয়াছে যে, এক্ষণে উক্ত ডিক্রী কেবল ঐ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ

ডিক্রী না বলিয়া তাহার অন্য কোন অর্থ করার আর সময় নাই।

অপর বিষয় সম্বন্ধেও আমি সম্মত হইয়া বলিতেছি যে, উক্ত আদালতদ্বয়ের ক্ষমতা থাকিলে (আমার বোধ হয় তাঁহাদের ক্ষমতা আছে) কোন প্রতিবাদীরই বিরুদ্ধে এই ডিক্রীজারী করিতে দিয়া কষ্ট দেওয়া উচিত নহে; এবং আমি বোধ করি, যে স্থলে কোন ব্যক্তি তাহার নিজের জন্য এবং কোন মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত স্বরূপেও দায়ী, তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে এক স্বত্বে এবং পরে অপর স্বত্বে ডিক্রীজারী করিতে দেওয়া সাধারণতঃ বিরক্তিকর কার্য্য হইবে। (ব)

---

১০ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

হুগলির অতিরিক্ত জজ শ্রীরামপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৯ এ জানুয়ারির হুকুম স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২১ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

সৌদামিনী দেবী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

আনন্দচন্দ্র হালদার (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে বাদী কৃষক হয় অর্থাৎ স্বয়ং জমি ব্যবহার করে বা করিতে চাহে, সে স্থলে সে নিজে দখীলকার থাকিলে যাহা পাইত, ওয়াশীলাৎ দেওয়ার কালে তাহাই ধরিতে হইবে।

উপস্বত্ব যে কোন প্রকারেরই হউক, অন্যায় দখীলকার তাহার দখলের সময় তাহা আত্মসাৎ করিলে তাহা বাদীর প্রাপ্য ওয়াশীলাতের মধ্যে গণ্য হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিবেচনায় এ মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি অতি শুদ্ধ। মুন্সেফ যে নিয়মে ওয়াশীলাৎ ধরেন, তাহার নজীর স্বরূপে তিনি এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি দর্শান, এবং তাহা এই মোকদ্দমায় খাটে। খাস আপেলাণ্টের উকীল ৯ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৪৪৫ পৃষ্ঠা হইতে যে নজীর দর্শান তাহা তখন আদালতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তাহাতে প্রয়োগ হয়, কিন্তু আমি বোধ করি সাধারণতঃ ওয়াশীলাতের দাবীর মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় না। উক্ত মোকদ্দমায় যে ভূমি এবং ওয়াশীলাতের দাবী করা হয় তাহা স্বতন্ত্র এক প্রকারের। বাদী উক্ত মোকদ্দমায় কোন এক বিশেষ ফসলের মূল্য ধরিয়া ওয়াশীলাৎ পাইবার দাবী করে; এবং আদালত তাহা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বোধ হয়।

তদনন্তর, আমাদিগকে এই হেতুবাদে মুন্সেফের হুকুমে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হয় যে, প্রতিবাদিনী উক্ত ভূমি ভোগ করিবার সময় যে বাঁশ কাটে, তিনি তাহার মুল্য বলিয়া ১৮০ টাকা এবং প্রতিবাদী যে এক কাঁঠাল গাছ কাটে তাহার মুল্য বলিয়া ৭ টাকা ওয়াশীতের মধ্যে ধরিয়াছেন।

যে সকল বাঁশ গাছ কাটা হয় তাহা স্পষ্টই উক্ত ভূমির (যাহার অধিকাংশই বাঁশ ঝাড়ে পরিপূর্ণ) উৎপন্নের মধ্যে গণ্য। কাঁঠাল গাছের মুল্য সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, কোন্ অবস্থায় ঐ গাছ কাটা হইয়াছিল তাহা বলা হয় নাই। ঐ গাছে হয়ত আর ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভব না থাকায় প্রতিবাদিনী তাহা কাটিয়া জ্বালাইয়াছে বা অন্য কার্য্যে ব্যবহার করিয়াছে, এবং বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল; এবং তাহা হইলে তাহা ওয়াশীলাতের মধ্যে আসিবে এবং প্রতিবাদিনীকে

দায়ী করিলে কোন ভ্রম হইবে না। আমার বিবেচনায় এই আপীল সম্পূর্ণ অমূলক এবং বিরক্তিকর, সুতরাং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত স্থির থাকিবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। আমার বোধ হয় ভূমি হইতে যাহা আদায় হয় কেবল তাহারই কথা পূর্ণাধিবেশনের উক্ত দুই মোকদ্দমাতেই বলা হইয়াছে, এবং ঐ দুই মোকদ্দমায় কখনই আইনের প্রতিজ্ঞা বলিয়া এমত সংস্থাপিত হওয়ার অভিপ্রায় ছিল না যে, যে ব্যক্তি এই মোকদ্দমার বাদীর ন্যায় নিজে কৃষক সে তাহার নিজের চাসে উক্ত ভূমি হইতে যে উপস্বত্ব পাইতে পারিত তাহা সে পাইবে না। যে স্থলে বাদী নিজে কৃষক নহে, সে স্থলে ভূমির আদায় দৃষ্টে চলা যাইতে পারে; কিন্তু যে স্থলে বাদীই কৃষক অর্থাৎ সে নিজেই ভূমি ব্যবহার করে বা করিতে চাহে, সে স্থলে আমার বিবেচনায় সে নিজে ভূমি দখল করিয়া যাহা পাইতে পারিত তদ্দৃষ্টে ওয়াশীলাৎ ধরিতে হইবে।

অপর প্রশ্ন সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঠিক বলিতে গেলে ওয়াশীলাৎ খেসারতের তুল্য কি না, এ প্রশ্নে প্রবেশ না করিয়া, আমি বিবেচনা করি যে, বাদী যখন ওয়াশীলাৎ পায়, তখন সে তাহার মধ্যে, ভূমির যে কোন উৎপন্ন দ্রব্য (তাহা যে প্রকারের দ্রব্যই হউক না কেন) অন্যায় দখীলকার আপন দখলের সময়ে আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা ধরিতে পারিবে; এবং তাহা হইলেই নিম্ন আদালত এই মোকদ্দমায় যে যে বাবৎ ধরিয়াছেন তৎসমুদায় তাহার মধ্যে আসিবে। (ব)

---

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪৪৪ নং মোকদ্দমা।

হুগলীর অতিরিক্ত জজ তত্রত্য দ্বিতীয় অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৪ ই আগস্ট তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মহারাজাধিরাজ মাহতাপচাঁদ বাহাদুর
(ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

রামব্রহ্ম মল্লিক এবং অপর এক ব্যক্তি
(দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বেচারাম মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে আদালত ডিক্রীদারের কোন দরখাস্ত ব্যতীত আপন প্রস্তাবানুসারে কোন ডিক্রীজারীর নীলাম মঞ্জুর করেন এবং ডিক্রীদার পরে নীলামের মূল্যের টাকা বাহির করিয়া লয়, তাহাতে উক্ত দুই কার্য্যের কোন কার্য্যই ঐ ডিক্রীদারের ডিক্রীজারী রাখার কার্য্য গণ্য হইতে পারে না।

বিচারপতি, জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমা ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয়। ডিক্রীজারীর দরখাস্ত ১৮৬৮ সালের ১৮ ই এপ্রিল তারিখে হয়।

উক্ত দরখাস্তের পূর্ব্বে দায়ীর সম্পত্তি ১৮৬২ সালের ১৩ ই মার্চ তারিখে নীলাম হয়। ২২ এ এপ্রিল তারিখে আদালত ঐ নীলাম মঞ্জুর করেন, এবং উক্ত নীলামের মূল্য ২৯ মে তারিখে বাহির করিয়া লওয়া হয়। সুতরাং দরখাস্তের তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে নীলাম হয়, কিন্তু মঞ্জুরী এবং টাকা বাহির করিয়া লওয়া তিন বৎসরের মধ্যেই হয়। প্রশ্ন এই যে, এই দুই কার্য্যেক কোন কার্য্য তিন বৎসরের মধ্যে হইয়াছে বলিয়া ডিক্রীদার এক্ষণে ডিক্রীজারী করিবার জন্য তাহার উপর নির্ভর করিতে পারে কি না।

আমার বিবেচনায়, আমাদের ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৩৫৯ পৃষ্ঠার নজিরের অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত; এবং ৯ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১৭০ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তিতেও ঐ নজীরের অনুসরণ করা

হইয়াছে। উক্ত উভয় মোকদ্দমায় এবং উপস্থিত মোকদ্দমায় নীলামের মঞ্জুরী কেবল জাবেতা অনুযায়ী কার্য্যমাত্র, এবং এমত দেখান হয় নাই যে, ডিক্রীদার তজ্জন্য কোন প্রকৃত দরখাস্ত করিয়াছিল অথবা নীলাম সম্বন্ধে দায়ীর পক্ষ হইতে কোন আপত্তি খণ্ডন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

আমাদিগকে ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২২৪ পৃষ্ঠা-প্রচারিত এক মোকদ্দমা দর্শান হইয়াছে; তাহাতে নীলামের মঞ্জুরী এবং নীলামের মুল্যের টাকা বাহির করিয়া লওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়া জারীকারক উত্তমর্ণের কার্য্য বলিয়া সংস্থাপিত হয়। উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে স্পষ্টই ভিন্ন বোধ হয়, কারণ, উক্ত মোকদ্দমায় নীলামের পরে দায়ীর পক্ষ হইতে আপত্তি উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে ডিক্রীদারের সহিত বিবাদ হওয়ার পরে নীলাম মঞ্জুর হয়; আদালতের নিজের ইচ্ছামতে হয় না। উক্ত মোকদ্দমায় বিচারপতি বেলি আপন রায়ে বলেন:—"৯ ম বালম "উইক্‌লি রিপোর্টরের দশ পৃষ্ঠায়" (আমি বোধ করি ১০০ পৃষ্ঠা হইবে) "প্রকাশিত নজি-"রের সহিত এই মোকদ্দমার বৃত্তান্তের কোন "সাদৃশ্য নাই। সেই নিষ্পত্তিতে নির্দ্দিষ্ট হয় "যে, কেবল জাবেতামত মঞ্জুরীর হুকুম ডিক্রী "জারী রাখার কার্য্য বলা যাইতে পারে না। "কিন্তু এ স্থলে খাস আপেলাণ্ট আপত্তি করে "ও তাহার আপত্তি খণ্ডিত হইয়া নীলাম স্থিরতর "থাকে, এবং তাহার পরে নীলামের মুল্যের "টাকা লওয়া হয়; অতএব আমার বিবেচনায়, "ইহাকে ঐ কার্য্য বলা যাইতে পারে।" আমি বোধ করি, উক্ত বিজ্ঞবর বিচারপতি ঐ সমস্ত ঘটনা, অর্থাৎ দায়ীর আপত্তি, উক্ত আপত্তি খণ্ডন এবং নীলাম মঞ্জুর করা এবং তদনন্তর টাকা বাহির করিয়া লওয়ার ঘটনা সমুহ একত্রে লইয়া এরূপ কার্য্য জ্ঞান করেন যাহার উপর ডিক্রীদার নির্ভর করিতে পারে। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার রায়ে আরও অধিক দূর গিয়াছেন। তিনি বলেন—"ডিক্রীদার এ প্রকার কার্য্যের পরে নীলামের "মুল্যের টাকা লইয়াছে, এবং ঐ টাকা লওয়া "নিশ্চয়ই ঐ ধারার মর্ম্মান্তর্গত কার্য্য।" উক্ত বিজ্ঞবর জজের রায় আমি শুদ্ধ রূপে বুঝিয়া থাকিলে ইহার মধ্যে এরূপ ডিক্রীদারকেও ধরিতে হইবে যে, তাহার নিজের উপকারার্থে নীলামের মুল্যের টাকা ১৮ বৎসর বা ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কালেক্টরীর খাজানা-খানায় ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চাতে দরখাস্ত করিয়া ঐ টাকা বাহির করিয়া লয়। উক্ত বিচারপতির প্রতি অতি সম্মান সহকারে, আমার বোধ হয় যে, আইনে কোন ডিক্রীদারকে তাহার প্রাপ্য টাকা নিজের সুবিধা-জনক কাল পর্য্যন্ত কালেক্টরীর মালখানায় ফেলিয়া রাখিতে দিয়া ডিক্রীজারীর কার্য্য নির্ব্বাহার্থে তাহার ইচ্ছামত তমাদীর মিয়াদ গণনা করিতে দিবে না। কিন্তু তাহা আমি বোধ করি উক্ত বিজ্ঞবর বিচারপতির মতপ্রকাশক বাক্য মাত্র, এবং বোধ হয় অধিক বিবেচনা পূর্ব্বক প্রকাশ করা হয় নাই, এবং মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য তাহা আবশ্যকীয়ও ছিল না, এবং তাহা কিছুতেই আদালতের নিষ্পত্তি নহে। ঐ নিষ্পত্তি আমি বোধ করি বিচারপতি বেলির রায়েই আছে। অতএব আমি ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমায় যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম করিবার কোন কারণ দেখি না।

আমি বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমায় ডিক্রীদার তমাদীদোষে বারিত হইয়াছে, সুতরাং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত স্থির থাকিবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমার বিবেচনায়ও এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে। আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইয়া বলিতেছি যে, আদালত হইতে ১৮৩২ সালের ২৯ এ মে তারিখে ডিক্রীদারকে টাকা দেওয়ার ঘটনা ১৮৫৯ সালের

১৪ আইনের ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত কার্য্য নহে।

নীলাম মঞ্জুর করা সম্বন্ধে আমি এমন বলিতে প্রস্তুত নহি যে, নিরাপত্তিতে নীলাম হইবার ৩০ দিবস পরে কোন আদালত তাহা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৫৬ ধারা অনুসারে কেবল আপন প্রস্তাব মতে মঞ্জুর করিতে বাধ্য; অথবা আমি একথাও বলিতে প্রস্তুত নহি যে, অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষ হইতে আপত্তি না হইলেও ডিক্রীদারের দরখাস্ত অনুসারে নীলাম মঞ্জুর হইলে তাহা ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত কার্য্য হইবে না; অথবা যে দুই নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে তাহাতে তত দূর বলা হইয়াছে এমতও আমি বলিতে পারি না। পরন্তু, এ মোকদ্দমায় ঐ সকল বিষয় সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই; কারণ, আদালত আপন প্রস্তাবে নীলাম মঞ্জুর করিতে বাধ্য হউন, বা না হউন, স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এ মোকদ্দমায় উক্ত উপায়ই অবলম্বন করা হইয়াছে, এবং আদালত যে উক্ত নীলাম মঞ্জুর করেন তাহা ডিক্রীদারের পক্ষের কোন দরখাস্ত অনুসারে করা হয় নাই, নিয়মিত কার্য্য বলিয়া করা হইয়াছে; এবং আদালত আপন প্রস্তাব মতে যে কার্য্য করেন তাহা কি প্রকারে ডিক্রীদারের ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় কার্য্যরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে তাহা বুঝা সুকঠিন। ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় কোন কার্য্যে ডিক্রীদারের নিজের কার্য্য বুঝায়। অতএব আদালত ১৮৬২ সালের ২২ এ এপ্রেল তারিখে যে নীলাম মঞ্জুর করেন তাহা ডিক্রীজারীর কার্য্য কি না, এই প্রশ্ন আর হইতেছে না। তাহা হইলে শেষ কার্য্যের পরে তিন বৎসরের অধিক কাল গত হওয়াতে উক্ত ডিক্রী বারিত হইয়াছে।　　　( ব )

১০ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪৫৮ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ১৪ ই ডিসেম্বরের হুকুম স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৮ ই জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ( মোক্তাহেমদার ) আপেলাণ্ট।

রামরুদ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি ( ডিক্রীদার ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু নীলমাধব সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন মোকদ্দমা খাস আপীলে প্রধানতম বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে যদি নিম্ন আদালতে ফেরৎ পাঠান হয়, তবে প্রধানতম বিচারালয়ের ঐ পুনঃপ্রেরণের হুকুমে, নিম্ন আপীল-আদালতের পশ্চাতের নিষ্পত্তি অনুসারে খরচার হুকুম হইবার আজ্ঞা না থাকিলে এই খাস আপীলের খরচা পাওয়া যাইবে না।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, নিম্ন আদালতদ্বয় যে খরচার হুকুম দেন, তাহা রেস্পণ্ডেণ্ট প্রতিবাদিগণ পাইতে পারে না। বাদী কতিপয় ভূমির দাবীতে যে নালিশ উপস্থিত করে, তাহারা সেই মোকদ্দমার কয়েকজন প্রতিবাদী। তাহারা অন্যান্য প্রতিবাদিগণ হইতে স্বতন্ত্র রূপে জওয়াব দেয়, এবং এই দর্শায় যে, মোকদ্দমা মোট জমির মধ্যে কেবল ৫৩ কাঠা ভূমিতে তাহাদের সম্বন্ধ ছিল। তাহাদের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়। তাহারা উক্ত ৫৩ কাঠা জমি এবং মোকদ্দমার খরচা সম্বন্ধে জেলার জজের নিকট আপীল করে। জজ উক্ত আপীল শুনিয়া প্রথমতঃ উক্ত ৫৩ কাঠা সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের

নিষ্পত্তি অন্যথা করেন, এবং মোকদ্দমার খরচা সম্বন্ধেও তাহাদের অনুকূলে হুকুম দেন।

উক্ত নিষ্পত্তি খাস আপীলে প্রধানতম বিচারালয়ে উপস্থিত হয়, এবং প্রধানতম বিচারালয় উচিত বিচার হয় নাই, এবং উপযুক্ত ইসু ধার্য্য হয় নাই দেখিয়া নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করত নূতন বিচারের জন্য মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ পাঠান।

নূতন বিচারে জজ পূর্ব্ব নিষ্পত্তি হইতে ভিন্ন সিদ্ধান্ত করেন, এবং উক্ত ৮৩ কাঠা সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের রায় স্থিরতর রাখেন। তদনন্তর তিনি বলেন, "উক্ত ৮৩ কাঠা ব্যতীত "আর আর বিষয়ে পূর্ব্ব নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ "করা গেল না।"

তাহাতে নিম্ন আপীল-আদালতের প্রথম নিষ্পত্তিতে উক্ত প্রতিবাদিগণকে যে খরচা দেওয়া হয়, কেবল তাহার প্রতি তাহারা দাবী করে এমত নহে; উক্ত ৮৩ কাঠা ভূমির দাবী সংক্রান্ত উচিত খরচা বাদে তাহাদের সমুদায় আদালতের খরচারও দাবী করে।

আমার প্রথমতঃ, বোধ হয় যে, যে বাক্যগুলির উপর নির্ভর করা হইয়াছে, জজ তদৃষ্টে তাহাদিগকে উক্ত খরচা দিতে পারেন না; এবং দ্বিতীয়তঃ, জজ যে তাহাদিগকে কিছু দিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, এ বিষয়েই আমার অত্যন্ত সন্দেহ আছে; এবং তিনি তাহাদিগকে কিছু দিতে মনস্থ করিয়া থাকিলেও তাঁহার পূর্ব্বের নিষ্পত্তিতে যে খরচা দেওয়া হয়, তিনি কেবল তাহাই দিতে মনস্থ করিয়া থাকিবেন। দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৬০ ধারা অনুসারে আপীল-আদালতের ডিক্রীতে আর আর বিষয়ের মধ্যে আপীলের খরচার হুকুম থাকা আবশ্যক, এবং ঐ খরচা এবং প্রথম নালিশের খরচা কি পরিমাণে কাহার দিতে হইবে, তাহারও হুকুম থাকা আবশ্যক। জেলার আদালতে কোন মোকদ্দমার আপীলের নিষ্পত্তির পর খাস আপীলে সেই মোকদ্দমা প্রধানতম বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে প্রধানতম বিচারালয় যদি মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইবার হুকুমে এই লেখেন যে, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অনুসারে খরচার আদেশ হইবে, তবে নিশ্চয়ই এ হুকুম দ্বারা যে পক্ষ পরে নিম্ন আদালতে জয়ী হয়, সে প্রধানতম বিচারালয়ের ডিক্রী-বর্ণিত তাহার প্রধানতম বিচারালয়ের খরচা পাইবে; কিন্তু প্রধানতম বিচারালয়ের খরচা পাইবার জন্য এরূপ হুকুম এবং এরূপ বর্ণনা থাকা আবশ্যক।

জেলার জজের ১৮৬৪ সালের ৩০ এ মে তারিখের দ্বিতীয় বারের ডিক্রী অতি স্পষ্ট; তাহাতে আপেলাণ্টকে কিছুই দেওয়া হয় নাই; কেবল এই মাত্র নিষ্পত্তি করা হইয়াছে যে, আপেলাণ্টের রেস্পণ্ডেণ্টকে কতক খরচা দিতে হইবে, এবং রেস্পণ্ডেণ্টগণ তাহাদের অবশিষ্ট আপন খরচা বহন করিবে। এমত অবস্থায়, সমুদায় মোকদ্দমা দৃষ্টে আমার বোধ হয় যে, ডিক্রীজারীর দরখাস্তের ৬ ষ্ঠ স্তম্ভের নিম্ন ভাগে কোন কোন মোৎফরকা কার্য্যের যে খরচা দেখা যায়, এবং যৎসম্বন্ধে আমাদের সমীপস্থ খাস আপেলাণ্ট কোন আপত্তি উত্থাপন করে নাই, কেবল তাহা ব্যতীত এই প্রতিবাদিগণ অর্থাৎ জজের সমীপস্থ আপেলাণ্টগণ বাদিগণের বিরুদ্ধে খরচার বাবতে আর কিছুই জারী করিতে পারে না। সে ঐ সকল খরচার দায়িত্ব স্বীকার করে, কিন্তু প্রথম মোকদ্দমার কার্য্যসংক্রান্ত অধিক সংখ্যক অর্থাৎ ৪৮৯ টাকা খরচা সম্বন্ধে সে যে দায়ী নহে, তাহা সে সপ্রমাণ করিয়াছে। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি ঐ টাকা সম্বন্ধে খরচা সমেত রহিত হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—প্রতিবাদিগণ বিরোধীয় খরচা পাইবে না, এই মতে আমি সম্মত হইলাম। (ব)

১০ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪৫৯ নং মোকদ্দমা

হুগলীর প্রতিনিধি জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩রা মে তারিখের হুকুম অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২৬এ আগস্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

রামধন গুড় (দায়িগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

গুরুদাসী দাসী (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু তারকনাথ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু তারকনাথ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—যে স্থলে কোন ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর মিয়াদের তিন বৎসর অতীত হইবার ঠিক এক দিন পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করে, এবং নোটিস জারী হইয়া ফেরৎ আসিবার পর উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আর কিছুই করে না, সে স্থলে এই অনুমান হইবে যে, উক্ত দরখাস্ত করার কার্য্য সরলান্তঃকরণ-মূলক নহে। এমত স্থলে প্রকৃত নোটিস জারীর প্রমাণের আবশ্যক রাখে না।

১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত কার্য্য সম্বন্ধে 'সরলান্তঃকরণ' শব্দে এই বুঝায় যে, যে কার্য্য করা হয় তাহা কেবল ঐ ধারানুযায়ী তমাদীর ফল এড়াইবার জন্য না করিয়া সেই সময়ে প্রকৃত প্রস্তাবে ডিক্রীর ফললাভার্থেই করিতে হইবে।

**বিচারপতি জ্যাক্সন।**—এ বিষয়ে জজের নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ। এ মোকদ্দমা ১৮৬৩ সালের ২৮এ নবেম্বর তারিখের ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা। ডিক্রীদার ১৮৬৬ সালের ২৭ এ নবেম্বর তারিখে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করে, এবং তাহাতে আদালত আইন অনুসারে দায়ীর উপরে নোটিস জারীর হুকুম দেন। তমাদীর আপত্তি হওয়ায় নোটিস প্রকৃত রূপে জারী হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়।

মুন্সেফ স্থির করেন যে, নোটিস জারীর বিষয় সপ্রমাণ হয় নাই; কিন্তু জজ নোটিস জারী সপ্রমাণ করার বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগকে কিছু স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে বিবেচনায়, বোধ করেন যে, ডিক্রীদার যাহা করিয়াছে তাহা যথেষ্টই হইয়াছে। তিনি বলেন "যাহা হউক, এই অনুমান করিতে "হইবে যে, কপটাচরণের বিষয় সপ্রমাণ না "হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত কার্য্য সরলান্তঃকরণেই করা "হইয়াছে।"

এই প্রস্তাবের পোষকতায় তিনি ৯ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪৪৪ পৃষ্ঠা হইতে একটি নজীর * দর্শান। আমি বোধ করি জজ যদি উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আরো কিছু মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িতেন তাহা হইলে, তিনি এ মোকদ্দমায় কার্য্য করিবার প্রণালী তাহাতে দেখিতে পাইতেন। উক্ত রায় এই:—"আমি সর্ব্বদাই এমত বুঝিয়াছি, "এবং বোধ হয়, আমার সুবিজ্ঞ সহযোগিগণের "মধ্যে সকলের না হউক, অধিকাংশেরই এই "মত যে, যে স্থলে সরলান্তঃকরণে কার্য্যের কথা "উপস্থিত হয়, আদালত তাহাতে সাধারণতঃ এই "অনুমান করিবেন যে, সরলান্তঃকরণেই কার্য্য "করা হইয়াছে, এবং যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের "প্রতি দোষারোপ করে, অথবা তাহা অসম্পূর্ণ "বলে, তাহারই এমত কিছু দেখাইতে হইবে বা "উদ্ভাবন করিয়া দিতে হইবে, যাঁহা হইতে আদা- "লত বুঝিতে পারেন যে, উক্ত কার্য্য সরলান্তঃকরণে "হয় নাই।" এ মোকদ্দমায় এই অবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে যে, তিন বৎসর অতীত হইবার ঠিক এক দিবস পূর্ব্বে ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারীর নিমিত্ত দরখাস্ত করায় উক্ত দরখাস্তের নোটিস জারী হয়, এবং উক্ত নোটিসের রিটর্ণ দৃষ্টে প্রকাশ পায় যে, নোটিস বাস্তবিক জারী হইয়াছে। তাহা

* বাং সাং রিং ২য় ভাগ, দেওয়ানী নিষ্পত্তির ৩৮৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

হইলে, ডিক্রীদার দায়ীর সম্পত্তি ক্রোক বা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিত। সে তাহার কিছুই করে নাই, এবং আর কিছুই করে নাই। আমি বোধ করি ঐ রূপ বৃত্তান্ত হইতে আদালতকে এই অনুমান করিবার প্রার্থনা করা যাইতে পারে, এবং প্রার্থনাও করা হইয়াছে যে, উক্ত কার্য্য সরলান্তঃকরণ-মূলক নহে, অর্থাৎ ডিক্রীজারী করিবার প্রকৃত অভিপ্রায়ে করা হয় নাই।

জজ যে স্থলে বলেন যে, নোটিস বাস্তবিক জারী হওয়ার প্রমাণের আবশ্যক রাখে না, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত। তাহা হওয়া দূরে থাকুক, ডিক্রীদার যে চেষ্টা করিয়াও নোটিস জারী করিতে অক্ষম হয় তাহার প্রমাণ দ্বারা ডিক্রীদারেরই পোষকতা হইত, কারণ, ডিক্রীদারের যত্ন সত্ত্বেও নোটিস জারী না হওয়ায় ডিক্রীদারকে আর কোন কার্য্য করিতে না দেওয়া যাইতে পারিত। অতএব আমি বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমা এই জন্য নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ যাইবে যে, উক্ত আদালত সমুদায় কার্য্য দৃষ্টে, এই বিবেচনা করিবেন যে, ১৮৬৬ সালের ২৭এ নবেম্বর তারিখে যে দরখাস্ত করা হয় তাহা ডিক্রীজারী করিবার প্রকৃত ইচ্ছায়ই করা হয়, না উক্ত ডিক্রী জাবেতামত সজীব রাখিবার নিমিত্ত কেবল লোক দেখাইবার জন্য করা হয়।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। আমি বিবেচনা করি, সরলান্তঃকরণ-মূলক শব্দের অর্থ না বুঝিয়াই এই মোকদ্দমায় এবং এই রূপ আরো অনেক মোকদ্দমা যাহা আমি শুনিয়াছি, তাহাতে গোলমাল উপস্থিত হইয়াছে। ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারায় সরলান্তঃকরণ শব্দ নাই; এবং যখন এই কথা বলা হয় যে, ডিক্রী সজীব রাখিবার জন্য যে কার্য্যের আবশ্যক, তাহা সরলান্তঃকরণে করা হইয়াছে তখন আমার বিবেচনায়, তাহাতে এই মাত্র বুঝায় যে, উক্ত কার্য্য কেবল ঐ ধারার ফল এড়াইবার জন্য না করিয়া বাস্তবিক ডিক্রীর ফললাভার্থে করা হইয়াছে (ব)

১১ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৪১৩ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার প্রতিনিধি জজের ১৮৬৯ সালের ২৯এ জুনের হুকুমের বিরুদ্ধ মোৎফরকা আপীল।

এ, ডি, ডন, (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

আমীরুন্নিসা খাতুন প্রভৃতি (দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর এবং বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং ললিতচন্দ্র সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিবার অপেক্ষায় দুই মাসের মধ্যে জামিন দেওয়ার জন্য দায়ীকে হাইকোর্ট আদেশ করায় সে ঐ মিয়াদের শেষ দিবসে জেলার আদালতে দরখাস্ত করিয়া এক দরপত্তনী মহাল জামিন দিতে চাহে, এবং তাহার পর দিবস রেজিষ্টরী-শূন্য জামিন-নামা লিখিয়া দেয়; কিন্তু ঐ আদালত তাহা অগ্রাহ্য করেন।

এ স্থলে, ঐ জামিন আদালত কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত দায়ী ঐ জামিন-নামা রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য ছিল না, এবং যে সম্পত্তি জামিন দেওয়া হয়, তাহা উত্তম এবং যথেষ্ট কি না, তাহার তদন্ত করিতে ঐ আদালতের আদেশ করা উচিত ছিল।

উক্ত জামিন-নামা ৷৷০ আনার এক ষ্টাম্পে লিখিয়া উচিত মূল্যের ষ্টাম্প তাহার সহিত গাঁথিয়া দেওয়ায় তাহা মাল আদালতের নিয়ম-বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া যে আপত্তি হয়, তাহা পারিভাষিক আপত্তি মাত্র; তাহাতে মোকদ্দমার গুণাগুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

বিচারপতি বেলি।—আমার মতে এ মোকদ্দমায় নিম্ন আপীল-আদালতের রায় খরচা ব্যতীত অন্যথা হইবে।

এই আদালতের ১৮৬৯ সালের ২৬এ এপ্রিলের হুকুম এই যে, উপস্থিত আপেলাণ্টকে দুই

মাসের মধ্যে জামিন দিতে হইবে। উক্ত মিয়াদ ১৮৬৯ সালের ২৫ এ জুন তারিখে অতীত হয়। ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুন তারিখে আপেলাণ্ট এই বলিয়া জেলার আদালতে দরখাস্ত করে যে, সে এক দরপত্তনী মহাল জামিন দিতে চাহে, এবং ২৫ এ জুন তারিখে জামিন-নামা লিখিয়া দেয়। স্বীকার করা হইয়াছে যে, এই জামিন-নামা রেজি-ষ্টরী হয় নাই।

জজ ২৬ এ জুন তারিখে এই রায় দেন:—

"প্রধানতম বিচারালয়ের হুকুমে লিখিত মিয়াদের
"শেষ তারিখে কাছারী বরখাস্ত হওয়ার কালে দর-
"খাস্ত দাখিল হয়। ঐ খত ॥০ আনার ষ্টাম্পে
"লেখা হয়, এবং ৯০ টাকা মুল্যের আর কয়েক
"খানা ষ্টাম্প তাহার সহিত গাঁথিয়া দেওয়া
"হয়। যে সম্পত্তি জামিন দেওয়া হয়, তাহা
"ভূমি-সম্পত্তি, সুতরাং তাহার মুল্য তদন্ত করিয়া
"জানিতে হইবে। উক্ত খত রেজিষ্টরী হয় নাই,
"সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্ত শেষ
"সময়ে তাড়াতাড়ি দাখিল করা হয়, এবং আইন
"অনুসারে তাহা তাহার অভিপ্রায় সাধনার্থে
"অসম্পূর্ণ। এত তাড়াতাড়ি করিয়া দাখিল করায়
"এবং যে সম্পত্তি জামিন রাখা হয়, তাহা পাওয়া
"যাইবে কি না, তাহার কোন নিশ্চয়তা না
"থাকায় আমি বোধ করি না যে, দরখাস্ত-
"কারার প্রতি কোন অনুগ্রহ প্রকাশ করা
"যাইতে পারে। যে খত দাখিল হইয়াছে তাহা
"আমি অগ্রাহ্য করিলাম।"

পল সাহেব আপেলাণ্টের পক্ষে আমাদের নিকট বলেন যে, প্রথমতঃ, উক্ত খত রেজিষ্টরী করিবার আবশ্যক ছিল না; এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহার আবশ্যক হইলেও যে পর্য্যন্ত আদালত আপেলাণ্টের জামিন গ্রহণ না করেন, সে পর্য্যন্ত জামিন-নামা রেজিষ্টরী করিবার উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য ছিল না। পরন্তু, আদালত যদি উক্ত প্রতিভূ গ্রহণ করিতেন, এবং খত রেজিষ্টরী করা আবশ্যকীয় বিবেচনা করিতেন, তবে তাঁহার আপেলাণ্টকে তাহা করিবার উপযুক্ত সময় দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু আদালত আবশ্যকীয় প্রতিভূ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত আপেলাণ্ট রেজিষ্টরী-কৃত খত দ্বারা তাহার সম্পত্তি আবদ্ধ করিতে বাধ্য ছিল না। আরো বলা হইয়াছে যে, আপেলাণ্ট স্বহস্তে ষ্টাম্প গাঁথিয়া দিয়া থাকিলেও এবং তাহা সম্পূর্ণ রূপে মালসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষগণের নিয়ম অনুযায়ী না হইলেও সম্পূর্ণ মুল্যের ষ্টাম্পই দেওয়া হইয়াছিল।

আমার বিবেচনায় এ সকল আপত্তি সঙ্গত। ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুনের দরখাস্ত উক্ত জামিননামা অর্পণ-পত্র স্বরূপ, এবং আপেলাণ্ট যে দায় গ্রহণ করে তাহা পূরণার্থে যে সম্পত্তি সে যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিল, ঐ দরখাস্ত তাহার বর্ণনা মাত্র; তাহা গ্রহণ করা না করার ভার আদালতের উপরেই ছিল, কিন্তু তাহাতে এই লেখা ছিল যে, হাইকোর্টের ১৮৬৯ সালের ২৬ এ এপ্রিলের হুকুমের উদ্দেশ্য সাধনার্থে ঐ জামিন-নামাই যথেষ্ট।

১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৪৯ ধারার শব্দে দেখা যায় যে, আইনের বিধান এই যে, "নিম্নলিখিত লেখ্য যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় "তাহা যে ডিষ্ট্রিক্টে থাকে তন্মধ্যে যদি ১৮৬৪ "সালের উক্ত ১৬ আইন কিম্বা এই আইন প্রচ-"লিত হইয়া থাকে, কি হয়, এবং যে তারিখে "তথায় প্রচলিত হয় যদি সেই তারিখে কি "তাহার পরে ঐ লেখ্য স্বাক্ষরিত হয় তবে সেই "লেখ্য রেজিষ্টরী করিতে হইবে।" কিন্তু আমি বোধ করি না যে, এ কথা বলা যাইতে পারে যে, জামিন গ্রহণ করার পূর্ব্বে ১৭ ধারা অনুসারে জামিননামা রেজিষ্টরী করিবার আবশ্যক হয়, কারণ, তাহা গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত, মহারাণীর প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করিবার নিমিত্ত জামিন দিবার যে হুকুম হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালন করিবার পক্ষে তাহা কোন জামিন-নামাই নহে। আরও আমি বোধ করি যে, যদি

আদালতের এই মতও হইয়া থাকে যে, উক্ত জামিননামা গ্রহণ করা উচিত ছিল না, বা যে সম্পত্তি জামিন দেওয়া হয় তাহা যথেষ্ট ছিল না ( এ আপত্তি বিপক্ষ উপস্থিত করে নাই ) তথাপি আপেলাণ্টকে আদালতের এই দেখাইয়া দেওয়া উচিত ছিল যে, উক্ত জামিননামা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তাহা রেজিষ্টরী করা আবশ্যক ছিল, এবং তদনুসারে তাহা রেজিষ্টরী করাইয়া লওয়া উচিত ছিল। তাহা করিলে নিরর্থক গৌণ হইত না, কারণ, জজের আদালত এবং রেজিষ্টরী আফিস একই নগরের মধ্যে ছিল এবং পরস্পর অনেক ব্যবধান ছিল না। সত্য বটে, প্রধানতম বিচারালয় যে দুই মাসের সময় দেন, আপেলাণ্ট তাহার সর্ব্বশেষ দিন পর্য্যন্ত বিলম্ব করে, এবং বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র বিশেষ আগ্রহ সহকারে বলিয়াছেন যে, আপেলাণ্টের জামিন দিতে কেবল না চাহিয়া এমত সময়ের মধ্যে জামিন দেওয়া উচিত ছিল যে, ঐ দুই মাসের মধ্যেই সেই বিষয়ের তদন্ত শেষ হইতে পারিত এবং প্রধানতম বিচারালয়ের হুকুম প্রতিপালিত হইত। আমি স্বীকার করিতেছি যে, এই আপত্তিতে কিছু বল আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমি ইহাও বলিতে চাহি যে, যদি ঐ জামিননামা তদন্তের পর জজের মতে উত্তম এবং যথেষ্ট বলিয়া সপ্রমাণ হইত, তাহা হইলে তাহা দায়ীর প্রিবি কৌন্সিলের আপীলের বিষয়ের সম্পূর্ণ প্রতিভূ হইত।

ষ্ট্যাম্প সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, তাহা এস্থলে যে অবস্থায় দেওয়া হইয়াছে, যদিও মাল আদালতের নিয়ম অনুসারে তাহা সেই রূপে দেওয়া উচিত নহে, তথাপি ইহা আমার বিবেচনায় পারিভাষিক আপত্তি মাত্র; তাহাতে মোকদ্দমার গুণাগুণের কোন তারতম্য হয় না।

অতএব সমুদায় দেখিয়া আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতের জজ যদি তদন্তের জন্য ঐ জামিননামা গ্রহণ করিতেন, ও তদনন্তর আদালতের এক উপযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা ঐ জামিননামা লিখিত সম্পত্তি যথেষ্ট কি না, তদ্বিষয়ের তদন্ত করিতেন, এবং তাহার পরে আবশ্যক হইলে ঐ জামিননামা রেজিষ্টরীর জন্য আপেলাণ্টকে আর কিঞ্চিৎ সময় দিতেন, তাহা হইলে উচিত বিবেচনার কার্য্য হইত।

অতএব আমি নিম্ন আদালতের হুকুম অন্যথা করিয়া, যে সম্পত্তি জামিন স্বরূপ অর্পণ করা হয় তাহা যথেষ্ট কি না, তাহার তদন্তের জন্য এবং তদনন্তর উক্ত জামিননামা রেজিষ্টরী করিয়া দিবার আদেশ করার জন্য এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—আমি বিবেচনা করি এ মোকদ্দমায় জজ যে হুকুম দ্বারা জামিননামার প্রতি আপত্তি করেন তাহা অন্যায় হইয়াছে, এবং যে আপেলাণ্ট ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে, সে যখন আপন দরখাস্তে ঐ সম্পত্তি লিখিয়া দেয় যাহা সে জামিন দিতে চাহে, তখন সে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে অপর পক্ষকে উপস্থিত হইতে বলা এবং যে জামিন অর্পণ করা হয় তাহা যথেষ্ট কি না, তাহা যে জামিননামা চাহিবার পূর্ব্বে পক্ষগণের মধ্যে মীমাংসা করা জজের কর্ত্তব্য ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাতে সম্মত হইলাম। আমি বিবেচনা করি রেজিষ্টরীর আইনের শব্দগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং এই রূপের মোকদ্দমায় জজকে যে বিধান অনুসারে চলিতে হয় তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্ট দেখা যায়।

জজ উক্ত জামিননামা সম্বন্ধে এই করিতে পারিতেন যে, তাহা উত্তম এবং যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি না দেখেন যে, উক্ত সম্পত্তি তাঁহার অভিপ্রায় সাধনার্থে উত্তম এবং যথেষ্ট, সে পর্য্যন্ত তিনি স্পষ্টই উক্ত জামিননামা দৃষ্টে কার্য্য করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাহা উত্তম এবং যথেষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না; এবং আমার বোধ হইতেছে যে, উক্ত প্রতিভূ উত্তম এবং

যথেষ্ট কি না, তাহার তদন্ত করিলে যে ফল পাওয়া যাইতে পারে তাহা দেখিতে গেলে যে পর্য্যন্ত জজ অগ্রে এই মীমাংসা না করেন যে, জামিননামার লিখিত সম্পত্তি উত্তম এবং যথেষ্ট প্রতিভূ কি না, সে পর্য্যন্ত তাঁহার সেই জামিননামা যে অবশ্যই চাহিতে হইবে না, বা তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে না, ইহার কারণ আমরা দেখিতে পারি। যথা, মনে কর, জজ তদন্ত করিয়া এই দেখেন যে, উক্ত জামিননামার লিখিত সম্পত্তি উত্তম এবং যথেষ্ট প্রতিভূ নহে, তাহা হইলে যে খতে এরূপ সম্পত্তির জামিন লিখিয়া দেওয়া হয় তদ্দৃষ্টে কার্য্য করা দূরে থাকুক, তিনি তাহা স্পষ্টই চাহিতেও পারেন না। আমাদিগের যে হুকুম দ্বারা জামিন দিবার জন্য দুই মাসের সময় দেওয়া হয়, তাহা যে এত সূক্ষ্ম রূপে অর্থ করা আমাদের অভিপ্রায় ছিল যে, সেই মিয়াদ মধ্যে উক্ত প্রতিভূর উত্তমতা সম্বন্ধে আদালতের সন্তোষ জন্মাইবার জন্য সমুদায় কার্য্য করিতেই হইবে, এমতও আমার বোধ হয় না। এ প্রকারের স্থলে যখন ভূসম্পত্তি জামিন দেওয়া হয় তখন ঐ জামিনের যথেষ্টতার তদন্তের ভার সাধারণতঃ নাজীরের উপরই দেওয়া হয়, এমত আমি জানি; এবং সেই নাজীর জজের নিকট রিপোর্ট করিতে অনেক সময়ে অনেক মাস ক্ষেপণ করে।

অতএব আমি নিম্ন আদালতের হুকুম অন্যথা করিতে এবং উক্ত প্রতিভূ উত্তম এবং যথেষ্ট কি না, তাহার তদন্ত করিতে ঐ আদালতকে আদেশ করিতে সম্মত হইলাম; এবং তাহা তাঁহার সন্তোষকর হইলে, তিনি আপেলাণ্টকে ঐ জামিনীর খত দিতে বলিতে পারেন, এবং উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাহাকে তাহা রেজিষ্টরী করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারেন। (ব)

---

১১ ই জানুয়ারি, ১৮৭০

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৮৭১ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার অধঃস্থ জজ তত্রত্য প্রতিনিধি সদর মুনসেফের ১৮৬৮ সালের ১৫ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৮ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদিগণের মধ্যে দুই জন) আপেলাণ্ট।

জগচ্চন্দ্র দাস প্রভৃতি (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীমোহন দাস এবং কাশীকান্ত সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ভূসম্পত্তির কট-দাতাগণ নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে কটের দেনা না দেওয়ায় কট-গৃহীতা ১৮০৬ সালের ১৭ কানুনের ৮ ধারা মতে চলা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, অর্থাৎ কটের বয়সিদ্ধ না করিয়া, নালিশ উপস্থিত করত ডিক্রী পায় এবং দখল লয়।

স্থির হইল যে, কট-গৃহীতা যখন বয়সিদ্ধির পূর্ব্বে দখল লইয়াছে তখন কট-দাতা আপন সম্পত্তি খালাস করিয়া লইতে পারে, এবং নগদ টাকা প্রদান দ্বারাই হউক বা কট-গৃহীতা-কর্ত্তৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব আদায় হইয়াই হউক, কটের দেনা পরিশোধ হইলেই কটদাতা তাহার জমি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে।

বিচারপতি হবহৌস।—এই মোকদ্দমার বাদিগণ দুই প্রতিবাদীর অর্থাৎ আমাদের সমীপস্থ খাস আপেলাণ্টের নিকট যে সকল সম্পত্তি কট দেয়, তাহা তাহারা এই হেতুবাদে ফেরৎ পাইবার দাবীতে নালিশ করে যে, উক্ত প্রতি-

বাদিগণ কটের পরে ঐ সম্পত্তি সকল দখল করে, এবং সেই সকল সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে কেবল যে, তাহাদের কটের প্রাপ্য পরিশোধ হইয়াছে এমত নহে, তাহারা অতিরিক্ত কিছু টাকাও লইয়াছে; এবং বাদী সেই অতিরিক্ত টাকা পাইবারও দাবী করে।

নিম্ন আপীল-আদালত ঐ সকল ইসু সম্বন্ধে বাদিগণের অনুকূলে নিষ্পত্তি করাতে প্রতিবাদিগণ, অর্থাৎ কট-গৃহীতাগণ আমাদের নিকট খাস আপীল করিয়াছে। তাহারা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি চারিটি আপত্তি উত্থাপন করে। প্রথম আপত্তি এই যে, নিম্ন আদালতের এই প্রশ্নের বিচার করা উচিত সত্ত্বেও তিনি করেন নাই যে, নারিশের আরজীতে এবং কট-কবালায় যে পরিমাণ সম্পত্তি লেখা আছে বাদিগণ তাহার শরীক কি না। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যখন আদালত স্থির করেন যে, প্রতিবাদিগণ কট-সূত্রে ভোগ না করিয়া বল-পূর্ব্বক দখীলকার ছিল, তখন আদালতের এই বলিবার পরে বাদিগণকে ডিক্রী দেওয়া উচিত হয় নাই যে, উপস্বত্ব হইতে উক্ত কটের দেনা পরিশোধিত হইয়াছে। তৃতীয় আপত্তি আপীলের চতুর্থ হেতুতে বর্ণিত হইয়াছে; তাহা এই যে, আদালতের প্রথম আমীনের তদন্তের বিপরীত এই বলা অন্যায় হইয়াছে যে, কোন কোন কথিত সিকমি জমি উক্ত কটের সম্পত্তির অন্তর্গত। এবং শেষ আপত্তি এই যে, আপেলাণ্টগণ অন্যান্য মোকদ্দমায় যে সকল জমির দাবী করে, তাহা উক্ত কটের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করা আদালতের অন্যায় হইয়াছে।

শেষোক্ত আপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে, যখন আমাদের সমীপস্থ আপেলাণ্টগণ নিজে বলে না যে, ঐ সকল ভূমি কটের অন্তর্গত ছিল না, তখন তৃতীয় পক্ষের এই বাক্য দ্বারা উপস্থিত আপেলাণ্টগণের কোন সাহায্য হইবে না কিন্তু সাহায্য হইলেও, আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি দৃষ্টে বিবেচনা করি যে, এই সকল ভূমি উক্ত কটের সম্পত্তির সামিল সাব্যস্ত হইয়াছে।

তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে প্রথম আমীন এই জানিয়া থাকিবে, এবং দেখা যায় যে, ইহাই জানিয়াছে যে, যে সকল ভূমি সম্বন্ধে ঐ আপত্তি করা হয় তাহা কটের সম্পত্তির অন্তর্গত নহে; কিন্তু আমাদিগকে দেখান হইয়াছে, এবং খাস আপেলাণ্টের উকীলও অস্বীকার করেন নাই যে, খাস আপেলাণ্টগণের কোন আপত্তি ব্যতীতই প্রথম আমীনের রোয়দাদ অন্যথা হয়, এবং দ্বিতীয় আমীন যাহা স্থির করে, এবং আর আর যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায়, তদনুসারে নিম্ন আদালত নির্দ্দেশ করেন এবং ঐই নির্দ্দেশ প্রমাণ বিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই যে, যে সকল জমি সম্বন্ধে এই আপত্তি হয় তাহা উক্ত কটের সম্পত্তির অন্তর্গত।

আমরা এক্ষণে খাস আপেলাণ্টের প্রথম আপত্তির বিচার করিব। এই মোকদ্দমার বাদিগণ বলে যে, তাহারা ১৩৯৫ নং তালুকের /৮॥ আনা অংশের এবং ১৮৫৩ নং তালুকের ।৮৭॥ আনা অংশের মালিক; তাহারা ১২৬৭ সালে তাহাদের এই দুই তালুকের অংশ প্রতিবাদিগণ অর্থাৎ আপেলাণ্টগণকে কট দেয়; এবং উক্ত কট দিবার পর ঐ প্রতিবাদিগণ ১২৬৮ সালে উক্ত অংশের দখল লয়।

প্রতিবাদিগণ বলে যে, বাদিগণ ১৩৯ নং তালুকের ৮॥ গণ্ডা অংশের এবং ১৮৫৩ নং তালুকের /১২॥ আনা অংশের মালিক মাত্র, এবং তাহারা ঐ সকল ভূমির কোন অংশের দখল লয় নাই।

তদনন্তর আমাদিগকে এই নিষ্পত্তি করিতে হইবে যে, নিম্ন আদালত যাহা স্থির করিয়াছেন এবং এ মোকদ্দমায় যে সকল বৃত্তান্ত স্বীকৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ আদালত কোন নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য ছিলেন কি না, অথবা কট-কবালায়

বাদিগণের যে অংশ লেখা আছে তাহাই তাহাদের অংশ, না, প্রতিবাদিগণ বাদিগণের যে অংশ স্বীকার করে, তাহাই তাহাদের অংশ, এতৎসম্বন্ধে আদালত বাস্তবিক কোন নিষ্পত্তি করিয়াছেন কি না। নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি এবং এ মোকদ্দমার উভয় পক্ষ যে সকল বৃত্তান্ত স্বীকার করিয়া লইয়াছে তাহা দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টগণ বাদিগণের অংশের প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালতকে কোন নিষ্পত্তি করিবার প্রার্থনা করিতে বারিত ছিল। ১৮৫৩ নং তালুকের বিষয় (৯১১৫ নং তালুকের বিষয় তাহারই সদৃশ) বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, বাদিগণ ১২৬১ সালে খাস আপেলাণ্টগণের নিকট এই সম্পত্তির ।৵০ অংশ এবং আরো কিঞ্চিৎ বেশী বিক্রয় করে, কিন্তু আমরা যে রায় দিব তাহার নিমিত্ত ।৵ আনাই যথেষ্ট। তদনন্তর আমরা দেখিতেছি যে, এই আপেলাণ্টগণই বলে যে, তাহারা ১২৬৬ সালে অপর কোন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে এই সকল সম্পত্তিরই আর ৷৷০ আনা অংশ ক্রয় করে। এই দুই অংশ একত্রে ৸৵০ আনা হইতেছে। অতএব খাস আপেলাণ্টগণের নিজের বর্ণনামতেই ১২৬৬ সালে এবং তাহার পরে এই সকল সম্পত্তির কেবল ৵০ আনা অংশ বাদিগণের হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল। তথাপি এই খাস আপেলাণ্টগণ যাহারা ১২৬৬ সালে উক্ত সম্পত্তির ৸৵০ আনা অংশের মালিক হয় বলিয়া প্রকাশ করে, আমরা তাহাদিগকে ১২৬৭ সালে বাদিগণের নিকট হইতে বাস্তবিক এই সম্পত্তির আর ।৵ আনা অংশ, অর্থাৎ খাস আপেলাণ্টগণের কথা সত্য হইলে তাহারা সেই সময়ে বাদিগণের যে অংশ হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকার বিষয় জানিত, তাহা অপেক্ষা বেশী ।০ আনা কট লইতে দেখিতে পাই। তদনন্তর, আমরা আরো দেখিতে পাই যে, নিম্ন আপীল-আদালত এই বৃত্তান্ত স্থির করিয়াছেন যে, প্রতিবাদিগণ তাহাদের বাক্যানুসারে তাহাদের ১২৬৬ সালের কথিত ক্রয় দ্বারা এই সকল সম্পত্তির ৸৵০ আনা অংশের দখল পায় নাই, কিন্তু তাহার দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১২৬৮ সালে তাহারা সেই ।৵ অংশের দখল পায়, যাহা তাহারা তাহাদের সহিত একত্রে বাদিগণের যে কট-কবালা লিখিত পড়িত হয় তদনুসারে বাদিগণের বলিয়া এক্ষণে বিরোধ করে; অতএব আমরা এই সকল বৃত্তান্ত এবং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি দৃষ্টে বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদিগণ এখন আর একথা বলিতে পারে না যে, বাদিগণ যে অংশের শরীক থাকিবার কথা বলে তাহারা তাহার শরীক নহে। অন্য প্রকারের অবস্থা হইলে স্বতন্ত্র কথা হইতে পারিত, অর্থাৎ যেমন, প্রতিবাদিগণ যদি বলিত যে, প্রতারণা দ্বারা তাহাদিগকে কট লইতে রত করা হইয়াছিল অথবা তাহারা না জানিয়া শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিয়াছিল, বা তাহাদের যে আচরণ দেখা যায় তাহা যদি তাহারা কোন ন্যায্য রূপে বুঝাইয়া দিত, তবে হয়ত এমত কোন মোকদ্দমা সাব্যস্ত হইতে পারিত, যৎসম্বন্ধে নিম্ন আদালতের কোন নিষ্পত্তি করা কর্ত্তব্য হইত; কিন্তু যে রূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তদ্দৃষ্টে বিচার করিয়া, এবং আমরা যত দুর দেখিতে পাই তাহাতে খাস আপেলাণ্টগণের উকীলেরা যে, নিম্ন আদালতে অথবা এ আদালতে, তাঁহাদের মওক্কেলদিগের ১২৬৭ সালের কট গ্রহণের এবং ১২৬৮ সালে তদনুসারে দখল লওয়ার ভাব বুঝাইয়া দেন নাই, এই বৃত্তান্ত দেখিয়া পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে তদ্রূপই আমরা বিবেচনা করি যে, বাদিগণ যে সকল অংশ সম্বন্ধে নালিশ করে প্রতিবাদিগণ তৎপ্রতি আপত্তি করিতে বারিত।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আমরা প্রথমতঃ বিবেচনা করি যে, বাদিগণের কটের ভাব সম্বন্ধে তাহারা যাহা বলে, তাহা নিম্ন আপীল-আদালত বুঝিতে ভ্রম করিয়াছেন, এবং যদিও নিম্ন

আপীল-আদালতের নিষ্পত্তিতে এমত কতক-গুলি শব্দ আছে যাহাতে প্রকাশ পায় যে, প্রতিবাদিগণ উক্ত কট অনুসারে দখল করে নাই, জবর দখল করিয়াছে, তথাপি প্রথমতঃ বাদিগণের বাক্য এবং তাহাদের কবালা এবং তদনন্তর নিম্ন আপীল-আদালতের ইসুর উপর নিষ্পত্তি দেখিলে বোধ হয় যে, উক্ত নিষ্পত্তি এইমাত্র ভিন্ন আর কিছু নহে যে, প্রতিবাদিগণ উক্ত কটের পর সম্পত্তি দখল করে, এবং বাদিগণ যে রূপ বলে সেই প্রকারে এবং সেই পরিমাণে তাহার উপস্বত্ব আদায় করিয়া লয়। দখল সম্বন্ধে ইসু এই হয়, যথা, "কটদাতাগণ কট-গৃহীতাগণকে যে সকল তালুকের অংশ দেয় তাহাতে কি কট-গৃহীতাগণ দখীলকার ছিল, এবং এখনও কি তাহাতে দখীলকার আছে?" কট-গৃহীতাগণ যে বলে যে, তাহারা ঐ সকল অংশে দখীলকার ছিল না, তাহার সহিতই এই বাক্যের সম্বন্ধ ছিল, এবং ইহা কেবল স্পষ্টই দখল থাকা না থাকার ইসু, বলপূর্ব্বক বেদখল সম্বন্ধীয় ইসু নহে। দখলের এই ইসু সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালত বলেন, "মোকদ্দমার অবস্থা এবং স্থানীয় তদন্ত "হইতে প্রকাশ যে, কট-দাতাগণ কথিত সময়ের "মধ্যে টাকা না দেওয়ায় কট-গৃহীতাগণ অর্থাৎ "প্রধান প্রতিবাদিগণ (যাহারা জমিদার এবং "ক্ষমতাশালী ও ধনী ব্যক্তি) ১৮০৬ সালের "১৭ কানুনের ৮ ধারা অনুসারে চলা অনাব-"শ্যক বোধ করিয়া অর্থাৎ কটের বয়বাতের "জন্য অপেক্ষা না করিয়া নালিশ উপস্থিত করত "ডিক্রী পায়, কটের অংশের দখল লয়, "এবং এখনও তাহাতে দখীলকার আছে। "ইহাই প্রকৃত বৃত্তান্ত। কট-দাতাগণ যে বলে যে, "উক্ত কট উপস্বত্ব ভোগের স্বত্ব-বিশিষ্ট ছিল, "এবং কট-গৃহীতাগণকে সেই কট অনুসারেই ঐ "অংশে দখল দেওয়া হয়, তাহা সত্য বোধ "হয় না;" এবং আদালত এই সাধারণ দখ-লের প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আরও বলেন যে, "কিন্তু দখল লওয়ার ঘটনা যখন অতি "স্পষ্ট, তখন তাহা গোপন করা যাইতে পারে "না। তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।" আমি উপরে যাহা উদ্ধৃত করিয়াদিলাম তাহাই উক্ত ইসুর নিষ্পত্তি, এবং তাহা ইহার অধিক কিছু নহে যে, যদিও কট-গৃহীতাগণ আইন অনুসারে বয়-বাতের পর দখল লইতে পারিত, এবং তাহাই উচিত ছিল, তথাপি বাস্তবিক তাহারা বয়বাত জারী না করিয়া দখল লইয়াছে। কিন্তু তাহারা যে দখল লইয়াছে এ কথা ঠিকই থাকিতেছে, এবং আমাদের নিকট ঐ নিষ্পত্তি এই বোধ হইতেছে যে, তাহারা কট লিখিতপড়িত হই-বার পরে দখল লইয়াছে। অপর, আমা-দিগকে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইতেছে যে, যে স্থলে ঐ বিক্রয় উভয় পক্ষেরই অবশেষ স্বীকারমতই সর্ত্তী বিক্রয় হইয়াছে, এবং কট-গৃহীতাগণ বয়বাত জারী না করিয়াই দখল লই-য়াছে বলিয়া স্থির হইয়াছে, সে স্থলে কট-দাতা-গণ আইন অনুসারে তাহা খালাস করিতে পারে কি না। আমরা বিবেচনা করি যে, আমাদিগের নিকট যে আইন দর্শান হইয়াছে, তদনুসারে তাহারা তাহা করিতে পারে।

আমাদিগের বোধ হয় যে, ১৮০৬ সালের ১৭ কানুনের বিধানে ঠিক এই রূপ মোকদ্দমার কথা বলা হইয়াছে। উক্ত কানুনের ভূমিকায় প্রকাশ যে, এই রূপ মোকদ্দমার বিধান করাও ব্যবস্থাপকগণের মনোগত ছিল। উক্ত ভূমিকায় লেখা আছে যে, "কোন নির্দ্ধারিত মিয়াদ মধ্যে "কটের টাকা না দিলে কটের সম্পত্তি কট-"গৃহীতার নিকট বিক্রয়ের তুল্য ফল হওয়ার "যে সর্ত্ত থাকে তাহা দ্বারা অনুপযুক্ত মূল্যে "ভূসম্পত্তি বিক্রীত হওয়ার অনবধান-সূচক "এবং অনিষ্টকর কার্য্য (এই প্রকারের কট "বয়বল-ওয়াফা, কট-কবালা প্রভৃতি নামে এই "দেশের সর্ব্বত্রে প্রচলিত আছে) নিবারণার্থে, "আসল টাকা পরিশোধ করিয়া কোন উপযুক্ত

"এবং নিয়মিত সময়ের মধ্যে সম্পত্তি খালাস "করিবার স্বত্বের ন্যায়ানুগত বিধানও করা "আবশ্যক।" তদনন্তর, ৭ ধারায় লেখা আছে যে, ভূমির কট খালাসের যে সকল আইনের বিধান ঐ ধারায় উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তদতিরিক্ত তাহাতে আরো এই বিধিবদ্ধ হইল "যে, "যখন কট-গৃহীতা কট-কবালা লিখিতপড়িত "হওয়ার পর, অথবা কটের চূড়ান্ত বয়-সিদ্ধির "পূর্ব্বে কোন সময়ে, ভূমিতে দখল পায়, তখন "ঐ রূপ কোন কট-কবালা অনুসারে যে টাকা "দেওয়া হয়, তাহা কর্জ্জ বা তাহার আসল টাকার "কোন অংশ পরিশোধিত হইয়া থাকিলে তাহার "অবশিষ্ট, দিলে বা রীতিমত দিতে চাহিলে, "কট-দাতা বা উক্ত সম্পত্তির মালিক বা "তাহার বিধিমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি ইহার "পরের ধারার বিধান অনুসারে কটের চূড়ান্ত "বয়-সিদ্ধি হওয়ার পূর্ব্বে তাহার সম্পত্তি খালাস "করিয়া লইতে পারিবে।" ঐ ধারা ৮ ধারা; এবং তাহাতে কট-দাতা কটের বয়বাতজারী করিতে চাহিলে, তাহাকে কি প্রকারে চলিতে হইবে, তাহার বিধান করা হইয়াছে। আমাদের বোধ হয় যে, যে আইন উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল, তদনুসারে উপস্থিত কট-কবালা অবিকল সেই প্রকারেরই দলীল যাহা উদ্ধৃত আইনের ভূমিকায় আছে; এবং ৭ ধারার যে বিধান উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতেও বোধ হয় এই বলা হইয়াছে যে, এ মোকদ্দমায় নিম্ন আদালত যেরূপ স্থির করিয়াছেন, তদ্রূপ কটের বয়বাতজারীর পূর্ব্বে কোন সময়ে উক্ত আদালতের সিদ্ধান্ত মতে কট-গৃহীতা ভূমিতে দখল পাইলে, ৮ ধারার বিধান অনুসারে চূড়ান্ত রূপে বয়-সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কট-দাতা বা সেই সম্পত্তির মালিক তাহা খালাস করিয়া লইতে পারিবে। এবং এ মোকদ্দমায় দেখা গিয়াছে যে, ৮ ধারার বিধান অনুসারে উক্ত কটের বয়-সিদ্ধি হয় নাই। অতএব আমাদের কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা বাকী আছে যে, উক্ত কটের দ্বারা যে টাকা লওয়া হয়, তাহা পরিশোধ করা হইয়াছে কি না, এবং উক্ত টাকা নগদ দেওয়া হইয়াছে, না কটের সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে পরিশোধিত হইয়াছে, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই; এবং মুরের ভারতবর্ষীয় আপীলের ৩৪০ পৃষ্ঠায় যে এক নিষ্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা ইহার সহিত সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য না হইলেও, তদ্দ্বারা আমাদের মতের পোষকতা হইতেছে। উক্ত কটের দ্বারা যে টাকা লওয়া হয়, তাহা যে উপস্বত্ব হইতে পরিশোধিত হইয়াছে, এবং বাদিগণ উক্ত কর্জ্জা টাকা বাদে অতিরিক্ত আর যাহার দাবী করেঃ তাহা যে প্রতিবাদিগণ বাস্তবিকই উপস্বত্ব হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহা নিম্ন আদালত স্থির করিয়াছেন, এবং এই সকল নির্দ্দেশের প্রতি উপস্থিত খাস আপীলে আপত্তি হয় নাই।

অতএব আমরা সমুদায় দৃষ্টে বিবেচনা করি যে, আমরা উপরে যে সকল কারণ দর্শাইলাম তদনুসারে নিম্ন আদালতের জজ এ মোকদ্দমায় উচিত নিষ্পত্তিই করিয়াছেন। সুতরাং আমরা এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। ( ব )

---

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১২২ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ-পরগণার জজের ১৮৬৮ সালের ১৬ ই ডিসেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

হরপ্রসাদ রায়চৌধুরী ( দরখাস্তকারী ) আপেলাণ্ট।

শিবশঙ্করী চৌধুরিণী ( প্রতিপক্ষ ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি, এলেন, এবং বাবু ভবানীচরণ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস এবং কালীপ্রসন্ন দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন হিন্দুপরিবার পঞ্জাব হইতে যে সময়ে বঙ্গদেশে আইসে, তখন তাহারা বঙ্গদেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্র মতে চলিত না, এবং আপন পুরোহিত সঙ্গে লইয়া আইসে; কিন্তু কথিত হয় যে, তাহারা এক্ষণে বঙ্গদেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্রের অধীন; এমত স্থলে যে ব্যক্তি উক্ত কথা কহে তাহার প্রমাণের ভার তাহারই উপর বর্ত্তে।

স্থানীয় প্রথা অবলম্বন করিলে এবং কোন কোন স্থানীয় সামাজিক উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ মানিলেই এমত সপ্রমাণ হয় না যে, পূর্ব্বে যে ব্যবহার-শাস্ত্র অনুসারে চলা হইত, তাহা রহিত হইয়া তাহার স্থানে অপর এক ব্যবহার-শাস্ত্র পরিগৃহীত হইয়াছে।

বিচারপতি লক।—১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের প্রিবি কৌন্সিল-নিষ্পত্তির ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত সুরেন্দ্রনাথ রায় বনাম মুসম্মত হরমণি বর্ম্মণীর মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ কহিয়াছেন যে, "প্রমাণ দৃষ্টে সপষ্ট বোধ "হইতেছে যে, পরিবার তাহাদের আপন মতাব- "লম্বী ধর্ম্ম-যাজকদিগকে সঙ্গে লইয়া আইসে; "এবং যেহেতু পূর্ব্বদেশবাসিগণ তাহাদের আচার "ব্যবহারে, বিশেষতঃ তাহাদের পারিবারিক এবং "ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানাদিতে সাধারণতঃ দৃঢ়রূপে "অনুরক্ত থাকে, অতএব প্রমাণ পর্য্যালোচনার "সাধারণ নিয়মমতে ঐ রূপ অবস্থাই অনুমান "করিতে হইবে, এবং যে ব্যক্তি ঐ রূপ অবস্থা "স্থগিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করে, তাহার উপরেই "তাহার সেই বাক্য সপ্রমাণ করিবার ভার "বর্ত্তে।"

এ মোকদ্দমায় উভয় পক্ষই সপষ্ট স্বীকার করে যে, তাহারা পঞ্জাব হইতে এদেশে আইসে। প্রমাণ দৃষ্টেও সপষ্ট জানা যাইতেছে যে, তাহাদের পুরোহিতগণও আইসে; এবং এখন তাহারা আইসে তখন তাহারা বঙ্গদেশীয় ব্যবহার শাস্ত্রের অধীন হইয়াছিল না; অতএব রেস্পণ্ডেণ্টের উপরই সপষ্ট এই বিষয়ের প্রমাণ-ভার অর্শে যে, উক্ত পরিবার এক্ষণে বঙ্গদেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্রেরই অনুগত। উক্ত পরিবার মিতাক্ষরা কি মিথিলার শাস্ত্রের অধীন, এতৎসম্বন্ধে বোধ হয় দরখাস্তকারীর মনে কিছু সন্দেহ আছে, কিন্তু তাহারা যে বঙ্গদেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্রের অধীন নহে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ বলিতে গেলে, মিতাক্ষরা এবং মিথিলার ব্যবহার-শাস্ত্রের মধ্যে এত অল্প প্রভেদ যে, ঐ দুই নাম যে কখন কখন প্রভেদ না মানিয়া এক অন্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; অথবা আমার বিজ্ঞবর সহযোগী তর্ক-বিতর্কের কালে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন, তদনুসারে কোন পরিবার বঙ্গদেশে বাস করিয়া যে, কালক্রমে তাহার নিজের স্বতন্ত্র দেবসেবার প্রণালীর সহিত স্থানীয় আচার ব্যবহার যোগ করিবে, এবং চতুঃপার্শ্বস্থ লোকদিগের পর্ব্বাদি এবং অন্য ক্রিয়াকলাপ রীতিমত অবলম্বন করিবে এবং এমত স্থলে ঐ ক্রিয়াদি যে স্থানীয় পুরোহিত দ্বারা নির্ব্বাহিত হইবে, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়াদি মানিয়া চলিলেই যে, এই সপ্রমাণ হইল যে, উক্ত পরিবার পূর্ব্বে যে ব্যবহার-শাস্ত্রের অধীন ছিল তাহা রহিত হইয়া তাহার স্থানে অন্য এক ব্যবহার-শাস্ত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, এমত বলা যাইতে পারে না। কোন কোন স্থানীয় সাময়িক উৎসব সম্পাদন করিতে দেখিয়াই উক্ত পরিবার কোন্ শাস্ত্রের অধীন তাহা স্থির করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহারা যে সকল গুরুতর ক্রিয়াকলাপ, যথা, জাতক্রিয়া বিবাহ এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, তাহা দেখিতে হইবে। উক্ত পরিবার যে তাহাদের পুরাতন আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়াছে এ মোকদ্দমায় তাহার প্রমাণ-ভার যদিও আপত্তিকারক রেস্পণ্ডেণ্টের উপরই বর্ত্তে, তথাপি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহ সম্বন্ধে পূর্ব্বপুরুষের আচার ব্যবহার যে পরিত্যাগ করা হয় নাই আপেলাণ্ট

তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছে; এবং রেস্পণ্ডেণ্ট যে প্রমাণ দেয় তদ্দ্বারা তাহার নিজের প্রমাণভার নির্ব্বাহিত হয় নাই, অথবা আপেলাণ্টের প্রদত্ত প্রমাণও খণ্ডিত হয় নাই।

দর্শান হইয়াছে যে, এই পরিবারের অনেক যাগাদি এবং ক্রিয়াকলাপ, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দ্বারা করাণ হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল ক্রিয়া কাণ্ড এবং উৎসবাদির অনুষ্ঠান করা হয় তাহাতে অবশ্যই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আর আর গুরুতর ক্রিয়াকলাপে বোধ হয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে নিযুক্ত করা হইলেও ঐ পরিবার সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মণদিগের তত্ত্বাবধানের অধীনে করা হয়; ঐ সকল ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানভিজ্ঞ এবং এক্ষণে মূর্খ হইলেও ক্রিয়াকলাপের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে; এবং বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদিগকে কখন কখন নিযুক্ত করা হয় বলিয়াই এমত সাব্যস্ত হইতে পারে না যে, উক্ত পরিবারে বঙ্গদেশীয় ব্যবহার শাস্ত্র-প্রচলিত হইয়াছে। এমত অবস্থায়, আমরা বিবেচনা করি যে, রেস্পণ্ডেণ্ট অর্থাৎ আপত্তিকারিণী যাহা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই; অতএব আমরা নিম্ন আদালতের হুকুম অন্যথা করিয়া এই আদেশ করিতেছি যে, হরপ্রসাদ রায়চৌধুরী আপেলাণ্টকে মৃত ব্যক্তির বিধিমত স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের বিধান অনুসারে সার্টিফিকেট দিতে হইবে। উভয় পক্ষ আপন আপন খরচা বহন করিবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং ই জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ১৩২ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১২ ই মার্চের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

দরভাঙ্গার রাজার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক স্বরূপে কোর্ট অব ওয়ার্ডস (বাদী) আপেলাণ্ট।

রাজা লীলানন্দ সিংহ বাহাদুর ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জি, সি পল্ বারিষ্টর এবং আর ই টুইডেল এবং বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে ভূমির মধ্য দিয়া কোন নদী প্রবাহিত হয় তাহাতে যে ব্যক্তির স্বত্ব থাকে সে ঐ নদীর তটের মালিক স্বরূপে তাহার জল ব্যবহার করিবার যে স্বত্ব ভোগ করে, তাহা ঐ ভূমির স্বত্বের স্বভাবতঃ আনুষঙ্গিক স্বত্ব, পূর্ব্ব-পরম্পরাগত ব্যবহার-জনিত স্বত্ব নহে। যে স্থলে ঐ মালিকের অনিষ্ট-জনক রূপে প্রত্যেক বৎসর নূতন বাঁধ প্রস্তুত করা হয়, সে স্থলে, এক এক বাঁধ নির্ম্মাণের কার্য্য এক একটি পৃথক্ নালিশের হেতু স্বরূপ গণ্য।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমার মতে, অধঃস্থ জজের নিজের রায়ের লিখিত হেতুবাদেই তাঁহার নিষ্পত্তি উচিত হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, নালিশের আরজীতে কথিত বিষয়ে বাদীর স্বত্ব সম্বন্ধে বৃথা আশঙ্কা করা হইয়াছে। আরজীর প্রার্থনা সংক্ষেপ এই যে, পূর্ব্ব-পরম্পরাগত ব্যবহারজনিত স্বত্ব বিচার দ্বারা সাব্যস্ত করা, কোন কোন্ মৌজার ভূমিতে জল সেচন করা; অমুক নদীর দুই নির্দ্দিষ্ট স্থানের দুই বাঁধ খুলিয়া দেওয়া; এবং উক্ত নদীর জল হাবেলী খড়গপুরের অন্তর্গত গ্রামাদি পর্য্যন্ত চলিবার হুকুম প্রাপ্ত হওয়া।

আমি বোধ করি, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কোন নদীর তটের মালিকের ঐ নদীর জল তাহার উজানের মালিকগণের ব্যবহার বা কার্য্য দ্বারা বিশেষরূপে, না কমিয়া তাহার

নিকটে আসিতে দিবার যে স্বত্ব আছে, বাদীর স্বত্ব সেই প্রকারের স্বত্ত্ব মাত্র।

ইহা পূর্ব্বাপর-ব্যবহার-জনিত স্বত্ত্ব নহে; যে ভূমি দিয়া নদী প্রবাহিত হয়, ইহা সেই ভূমিতে বাদীর স্বত্বের স্বভাবতঃ আনুষঙ্গিক স্বত্ব, এবং যে ভূমি তাহার নহে তাহার উপরিস্থ জলের যে বাঁধ দ্বারা তাহার জল ব্যবহারের স্বাভাবিক স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হয় তন্নিবারণার্থে তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার যত দূর আবশ্যক হয় তদ্ব্যতীত উক্ত বাঁধ ভাঙ্গিবার আর কোন দাবী সে করিতে পারে না; এবং ভাগলপুরের সরকারী উকীল যিনি বোধ হয় এক জন সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইবেন, তাঁহার মুখ হইতে, কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান পর্য্যন্ত নদী প্রবাহিত হওয়ার হুকুমের প্রার্থনা হওয়ায় নিতান্ত অসারতা প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু প্রতিবাদিগণ কোন কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধের দ্বারা নদী হইতে অতিরিক্ত জল লইয়া ভাটিতে স্থিত বাদীর ক্ষতি করিয়াছে, এই রূপ ভাবে এই মোকদ্দমা তাহাদের বিরুদ্ধে জ্ঞান করিয়া লইয়া আমি বিবেচনা করি যে, উক্ত নালিশের বিষয় বাদীর প্রদর্শিত প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হয় নাই। আমি অধঃস্থ জজের সহিত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া বলিতেছি যে, বাদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। আমার বোধ হয় তাহাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি পরস্পর বিপরীত সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং সাক্ষিসকল একাধিকবার পরস্পর বিপরীত কথা বলিয়াছে। পরন্তু, অধঃস্থ জজের বাক্যমতে তাহাদের সকলেরই মূল উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত নদীর উল্লিখিত স্থান দ্বয়ে ১২৭৪ সালের পূর্ব্বে কোন বাঁধ ছিল না; কিন্তু বাদী বা তাহার পূর্ব্বাধিকারীরা ফৌজদারী আদালতে যে অভিযোগ করে তাহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ যে, উক্ত দুই বাঁধ ১২৭৪ সালের পূর্ব্বে এমন কি ১২৬৫ সাল পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে ছিল। অতএব বাদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য প্রকৃতার্থে মিথ্যা, এবং অধঃস্থ জজের ন্যায় আমারও কোন সন্দেহ নাই যে, প্রতিবাদিগণ বহুকাল যাবৎ আবশ্যকমতে উক্ত নদী হইতে জল লইবার জন্য তাহাতে বাঁধ দেয়। অতএব, এবং যত দূর আমি দেখিতেছি তাহাতে স্পষ্টই অবিচ্ছেদে কোন বাঁধ না থাকায়, প্রত্যেক বাঁধ দেওয়ার কার্য্য এক এক নূতন নালিশের হেতু গণ্য, এবং বাদীর নালিশ ইহার কোন এক বারের বাঁধ লক্ষ্য করিয়া উপস্থিত করা উচিত ছিল। নালিশে আরজী যদি ঐ রূপে লিখিত হইত, বা বাক্যান্তরে, ইহা ১২৭৪ সালে এই সকল বাঁধ নির্ম্মাণের কথিত হেতুবাদে ক্ষতি পূরণের এবং স্বত্ত্ব নির্ণয়ের দাবীর নালিশ হইত, তবে ঐ বাঁধ নির্ম্মাণ সপ্রমাণ হইয়াছে অনুমান করিলেও এই প্রশ্ন উত্থিত হইত যে, প্রতিবাদিগণ এই দুই বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়া উচিতমত জল ব্যবহারের অতিরিক্ত এবং বাদীর ক্ষতিজনক রূপে জল লইয়াছে কি না।

এই-বিষয় সম্বন্ধে অধঃস্থ জজ যাহা বলেন তাহা আমি আমার রায়ের হেতু স্বরূপে গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। তিনি বলেন:—"বাদী "যখন প্রমাণ দিতে পারে নাই যে, কত জল কমিয়া "গিয়াছে, তখন আদালত এই বিষয়ের নিষ্পত্তি "করিতে পারেন না। অধীন ভূমির মালিকের "স্রোতানদীর জলের প্রতি স্বত্বের সাধারণ "প্রশ্নের উত্তরে উপরিস্থ ভূমির মালিকের "স্বত্বের ন্যায় তাহারও স্বত্ত্ব আছে বলা যায়। "সমুদায়ই নদীর জলের পরিমাণের উপর নির্ভর "করে, এবং সাধারণতঃ জলের হ্রাসবৃদ্ধির ঠিক "পরিমাণ না দেওয়া হইলে, কোন সিদ্ধান্তই "করা যাইতে পারে না।"

আমার বিবেচনায়ও এ মোকদ্দমার অবস্থা ঠিক ঐ রূপ। নদীতে কি পরিমাণ জল আছে তাহার প্রমাণ অভাবে, বাদীর স্বত্বের হানি হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা নিতান্ত অসম্ভব।

অতএব আমি অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমারও ঠিক ঐ মত।

আমার বিবেচনায়, অধঃস্থ জজের এই মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করা উচিতই হইয়াছে, কারণ, বাদী যে হেতুতে এই নালিশ উপস্থিত করে তাহা সে সপ্রমাণ করে নাই। বাদী যে সালের কথা কহে সেই সালেই যে প্রতিবাদিগণ প্রথম এই দুই বাঁধ নির্ম্মাণ করে, তাহার প্রমাণ সম্বন্ধে আমিও অধঃস্থ জজের ন্যায় পরিতৃপ্ত হইলাম না। এই সকল বাঁধ যে সর্ব্বদাই নির্ম্মিত হইত তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই; বাদীর প্রমাণ দ্বারাও এ বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে। তৎপ্রতি যে ইতিপূর্ব্বে আপত্তি করা হয় নাই, ইহাতেই প্রকাশ যে, এ রূপ বাঁধ বাদীর অনিষ্ট না করিয়াই নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। প্রতিবাদীর প্রমাণ এই যে, এই সকল বাঁধ নির্ম্মিত হওয়া সত্ত্বেও জল চলিবার এক পথ রাখা হয়, এবং তাহাই বোধ হয় হইয়াছে। প্রতিবাদী যে পরিমাণে জল পাইতে পারে, তাহা অপেক্ষায় সে অধিক জল লইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে বাদী এমত কোন প্রমাণ দেয় নাই যদ্দৃষ্টে আমরা কোন মত ব্যক্ত করিতে পারি। ইহাও প্রকাশ যে বৎসর বৎসর নূতন বাঁধ নির্ম্মিত হয়; অতএব উক্ত বাঁধের দ্বারা কি পরিমাণে বাদীর অনিষ্ট হয় এ কথা প্রত্যেক বাঁধের, এবং তাহা নির্ম্মিত হইবার সময় নদীর অবস্থার উপর নির্ভর করে।

আমি অধঃস্থ জজের মতে এই বিষয়ে ঐক্য হইতেছি যে, উপস্থিত বিরোধ সম্পূর্ণ রূপে এই ঘটনা হইতে উত্থিত হইয়াছে যে, উক্ত বিশেষ বৎসরে নদীর জলের পরিমাণ অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ন্যূন ছিল।

আমিও এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস করিলাম। (ব)

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ১১৫ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মে তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

বিবী মেহরণ (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

মসম্মত কবীরণ প্রভৃতি (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেৎ আর, ই, টুইডেল এবং মুন্সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে উকীল নাই।

চুম্বক।—শরা অনুসারে, স্ত্রীর যৌতুকের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার সাধারণ চুক্তি থাকিলে; সেই চুক্তির সর্ত্তে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি প্রতিভূ রাখিবার কথা না থাকে, তাহা হইলেও যে, স্বামীর ভূসম্পত্তির উপরে স্ত্রীর দখলের দাবী অবশ্যই থাকিবে, এমত নহে। যদি স্বামীর মৃত্যুর পর দায়াধিকারিগণ স্ত্রীকে যৌতুকের টাকার পরিবর্ত্তে স্বামীর কোন সম্পত্তি দখল করিতে দেয়, তবে দায়াধিকারিগণের বিরুদ্ধে তাহার ঐ সম্পত্তির উপর বিধিমত দাবী হইবে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমার বিবেচনায়, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি শুদ্ধ। ১১ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২১২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমায় এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশন যে নিষ্পত্তি করেন আমি তাহাতে সম্মত।

শরা অনুসারে, যৌতুকের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার সাধারণ চুক্তি দ্বারা স্ত্রীকে যে, স্বামীর সম্পত্তি আপন দখলে রাখিবার দাবী অবশ্যই প্রদত্ত হয়, এমত নহে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে অবশ্য এমত হইতে পারে যে, উক্ত চুক্তির সর্ত্ত এরূপ থাকে যে, তাহাকে উক্ত টাকার নিমিত্ত কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি প্রতিভূ স্বরূপ দেওয়া হয়।

পরন্তু, যদি তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর দায়াধিকারিগণ ঐ স্বামীর কোন সম্পত্তি ঐ বিধবা স্ত্রীকে দখল করিতে দেয় এবং উক্ত চুক্তির লিখিত টাকা না দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে তাহাকে তাহা করিতে দেয়, তবে উক্ত দায়াধিকারিগণের বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তিতে তাহার দাবী হইবে, এবং আমি বিবেচনা করি, টুইডেল সাহেব যে নজীর দর্শান তাহাতে আদালতের সমক্ষে এই প্রকারের দাবীই উপস্থিত ছিল।

এ স্থলে বাদিনী মূল চুক্তির সর্ত্তের বিষয় কিছুই বলে না, এবং তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর সে তাহাতে কখন দখীলকার ছিল কি না, তৎসম্বন্ধেও সে কিছু বলে না।

প্রতিবাদিনীগণের বর্ণনা-পত্রে স্পষ্ট প্রকাশ যে, দায়াধিকারিগণ কখন তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে কোন সম্পত্তিতে তাহাকে দখল দেয় নাই।

অতএব আমি বিবেচনা করি, এমত কোন প্রমাণ নাই যে, সে এই মোকদ্দমায় যে দখলের দাবী উপস্থিত করে, তাহা তাহার ছিল; সুতরাং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি শুদ্ধ এবং তাহাই স্থির থাকিবে, এবং এই আপীলে রেস্পণ্ডেণ্ট উপস্থিত না হওয়ায়, খরচা ব্যতীত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমারও ঐ মত। এই বিষয় ইতিপূর্ব্বে ১১ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমায় বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন এবং আমার দ্বারা বিচারিত হইয়াছে। উপস্থিত মোকদ্দমাও ঠিক সেইরূপ বোধ হইতেছে।

এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে। (ব)

---

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্‌সন এবং ডবলিউ, মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৩৮২ নং মোকদ্দমা।

মুরশিদাবাদের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৭ সালের ২১ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রিলে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ওম্মত ফতেমা (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

ভজগোপাল দাস মোহন্ত (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গোপীনাথ মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন কোন স্থলে থাকের নক্‌সা ও কায়্যাদি স্বত্বের যথেষ্ট প্রমাণ হইতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রমাণের উপর কত দূর নির্ভর করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে নিয়ম সংস্থাপন করা খাস আপীলে প্রধানতম বিচারালয়ের সাধ্যায়ত্ত নহে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমি অতি দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, আমার মতে এ মোকদ্দমা পুনরায় নিম্ন আদালতে ফেরৎ পাঠান আবশ্যক। আমি এই জন্য দুঃখিত হইলাম যে, ইতিপূর্ব্বে ১৮৬৮ সালের ২৩ এ আগষ্ট তারিখে একবার এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইয়াছিল। তখন আমরা তমাদীর প্রশ্ন সম্বন্ধে জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করিবার হুকুম দিয়াছিলাম।

জজ এইক্ষণে আবার মুন্সেফের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া বাদিনীর মোকদ্দমা এই হেতুবাদে ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন, যে, "বাদিনী আপন "স্বত্বের প্রমাণ স্বরূপে কেবল থাকের নক্‌সার "উপর নির্ভর করে।" জজ তদনন্তর বলেন, "২ য় বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২১০ পৃষ্ঠায় "প্রচারিত দুর্গাসুন্দরী দেবী বাদিনীর মোকদ্দমায় "প্রধানতম বিচারালয় এই সংস্থাপন করেন "যে, ভূমিতে বাদিনীর স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য "স্বত্বের বা বহুকাল ভোগের অন্য তুষ্টিজনক "প্রমাণাভাবে, থাকের নক্‌সা যথেষ্ট গণ্য হয়

"না।" জজ বলেন, "ইহা পূর্ণাধিবেশনের "নিষ্পত্তি, এবং তাহাতে যে বিষয়ের নিষ্পত্তি "হয় তৎসম্বন্ধে তাহা চূড়ান্ত বলিয়া মান্য করিতে "হইবে।" তিনি তদনন্তর বলেন, "বাদিনীর উকীল "বলেন যে, থাকের নক্সা ব্যতীত আর কোন "প্রমাণ দাখিল করিবার সম্ভাবনা নাই, এবং "এই তর্ক করেন যে, যদি এমত দেখান যাইতে "পারে যে, ঐ সকল ভূমি ১২৬৯ সালের পূর্ব্বে "পতিত ছিল, তবে থাকের নক্সাই স্বত্বের "প্রমাণ রূপে গণ্য হইবে, কিন্তু এই তর্ক প্রধানতম "বিচারালয়ের স্পষ্ট নজীরের বিপরীত, সুতরাং "ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।"

আমার বোধ হয় যে, উক্ত মোকদ্দমার পার্শ্বস্থ চুম্বক, এবং বোধ হয়, উক্ত মোকদ্দমার রায়ের কতক অংশ দেখিয়াই জজের ভ্রম হইয়াছে। তাহাকে পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি বলায় ভ্রম হইয়াছে। এই আদালতে পূর্ব্বে যে প্রথা ছিল যে, কোন আপীলের নিষ্পত্তিতে দুই বিচারপতির পরস্পর মতভেদ হইলে মোকদ্দমা তৃতীয় জজের নিকট অর্পিত হইত, তদনুসারেই উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। এক জন বিজ্ঞবর বিচারপতি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, থাকের নক্সা "এই আদালতের প্রথা এবং নজীর অনুসারে "স্বত্বের এমত প্রমাণ নহে যে, তদ্দ্বারাই প্রতি- "বাদীর দখল রহিত করার ডিক্রী ন্যায্য "হইবে।" উহা বিচারপতি বেলির মত। বিচারপতি এল্‌ফিন্‌ষ্টন জ্যাক্‌সন বলেন,—"আমার "বিজ্ঞবর সহযোগী যে বিধি সংস্থাপন করিতে "চাহেন যে, থাকের নক্সা ভূমির প্রতি বাদীর "স্বত্বের যথেষ্ট প্রমাণ নহে, তাহা শুদ্ধ কি না, "তৎপ্রতি আমার কিছু সন্দেহ আছে।" তখন যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তদনুসারে উক্ত মোকদ্দমা তদনন্তর তৃতীয় বিচারপতির নিকট যায়। তিনি বিচারপতি লক। তিনি বলেন, "অতএব "আমি বিচারপতি বেলির সহিত এই বিষয়ে "ঐক্য হইলাম যে, বাদী যে থাকের নক্সার "উপর নির্ভর করে, তাহা প্রতিবাদীর বর্ত্তমান "দখল রহিত করিয়া ঐ ভূমির উপর বাদীর "স্বত্ব সংস্থাপনার্থে স্বত্বের বা বহুকালের দখ- "লের জন্য সন্তোষকর প্রমাণ ব্যতীত, যথেষ্ট "নহে।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ নিষ্পত্তি উক্ত বিশেষ মোকদ্দমার প্রমাণ দৃষ্টে হয়, যদ্দৃষ্টে অধিকাংশ বিচারপতি বিবেচনা করেন যে, বাদী যে প্রমাণ দাখিল করে, তাহা দ্বারা তাহার মোকদ্দমা সপ্রমাণ হয় না। খাস আপীলে কি প্রকারে এই নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে পারিলাম না, এবং তাহার তদন্ত করিবারও কোন আবশ্যক নাই। এই মাত্র বলা আবশ্যক যে, তাহা এমন বিধি নহে যে, তাহা পরের মোকদ্দমায় নজীর স্বরূপ গণ্য হইবে।

আমাদিগকে সদরল্যাণ্ডের ১৮৬৪ সালের রিপোর্টের ১২০ পৃষ্ঠা হইতে আর এক মোকদ্দমা দর্শান হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমা স্পষ্টই উপস্থিত মোকদ্দমার নজীর হইতে পারে না, কারণ, তাহা জাবেতা আপীলের মোকদ্দমা, এবং যে বিচারপতিগণ ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, (তাঁহাদের মধ্যে আমিও ছিলাম) তাঁহারা বলেন যে, "এ মোকদ্দমায় থাকবস্তের যে সকল নক্সা "দাখিল হইয়াছে, বাদী তাহার যে অর্থ "করে, তৎপ্রতি যদিও আমাদের সন্দেহ আছে "বটে; তথাপি তাহার সেই অর্থ হইলেও, তাহা "কোন প্রমাণ নহে," অর্থাৎ, "স্বত্বের" যথেষ্ট প্রমাণ নহে। অতএব উক্ত মোকদ্দমার বিশেষ বৃত্তান্ত দৃষ্টেই সেই নিষ্পত্তি হইয়াছিল।

৬ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৬৭ পৃষ্ঠা হইতে আর এক নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে। তাহা খাস আপীলের বটে, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার বিচারপতিগণ এই মাত্র বলেন, "যে স্থলে থাকবস্তের "নক্সা অন্যায় রূপে প্রণীত হওয়ার প্রসঙ্গেই "এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, সে স্থলে নিম্ন

"আপীল-আদালত সেই নক্সা প্রতিবাদীর দখ- "লের চূড়ান্ত প্রমাণ স্বরূপে গণ্য করিয়া ঐ "নক্সা আইন-সঙ্গত রূপে যে পর্য্যন্ত প্রবল "গণ্য হওয়া উচিত, তদপেক্ষায় তাহা অধিক "প্রবল করিয়াছেন।" ঐ মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় তদ্রূপ বলা উচিতই হইয়াছিল। অতএব উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে থাক্‌বস্তের নক্সা এবং কার্য্য সমস্ত যে কোন প্রমাণই নহে, এমত বলিবার কোন কারণ নাই।

বস্তুতঃ, ইহা বলাও শুদ্ধ হয় নাই যে, বাদী কেবল ঐ একমাত্র প্রমাণের উপরই নির্ভর করে; কারণ, প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে, আমীন দ্বারা সরেজমিন তদন্ত হয়, এবং দ্বিতীয়তঃ, মুন্সেফ স্বয়ং সেই স্থানে গিয়া তদন্ত করেন, এবং এক নক্সা করেন, এবং তদতিরিক্ত তাঁহার রায়ের যে বাক্য, "আমি আমার নিজের চক্ষে দেখিয়াছি," ইত্যাদি শব্দগুলি দ্বারা আরম্ভ করা হইয়াছে, এবং "তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিয়াছে," শব্দগুলি দ্বারা সমাপ্ত করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মুন্সেফ অনেক অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন।

এ সকল বিষয়ই জজ বিবেচনা করিতে, এবং এই স্থির করিতে বাধ্য ছিলেন যে, থাক্‌বস্তের নক্সা এবং থাকের হাকিমানের কার্য্য অন্যান্য প্রমাণের সহিত গ্রহণ করিয়া বাদী আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছে কি না। অতএব আমার বিবেচনায়, এই মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে আবার নিম্ন আপীল-আদালতে যাইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। আমার বোধ হয়, এই প্রকারের দলীল আদালতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করার প্রথা আদিম বিচারাধিকারের আদালতে সম্পূর্ণ সংস্থাপিত আছে, এবং উক্ত প্রথা এই আদালতও সর্ব্বদা গ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছেন; অতএব উক্ত প্রমাণের উপর কত দূর নির্ভর করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কোন নিয়ম খাস আপীলে সংস্থাপন করা এই আদালতের অধিকার-বহির্ভূত। যে সকল আদালতকে প্রমাণের ফল বিবেচনা করিতে হয়, তাহা সেই সকল আদালতেরই বিবেচনার বিষয়।

কিন্তু আমি এই বিষয়েও সম্মত হইলাম যে, এই মোকদ্দমায় থাক্‌বস্তের নক্সা ব্যতীত এমত আরো প্রমাণ আছে, যাহা জজের দেখা উচিত ছিল। (ঘ)

———

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং ডব্‌লিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৮৫৪ নং মোকদ্দমা।

হুগলির অধঃস্থ জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৩ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৮ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

মহেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জে, ডব্‌লিউ, বি, মণি আপেলাণ্টের বারিষ্টর।

বাবু আশুতোষ ধর রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মালসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের কোন খাস মহালের জরীপের সময় যে সকল চিঠা প্রস্তুত করেন, তাহা তাঁহাদের রাজস্ব সংক্রান্ত তদন্তের চিঠার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এবং তুল্য রূপেই প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে; তাহা খাস মহাল সম্বন্ধীয় কার্য্য বলিয়াই সাধারণের সম্পর্কীয় বিষয়ে সরকারী কার্য্য গণ্য হইবে না, এমত হইতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই মোকদ্দমার বাদী তালুক ভেউতিয়ার মালিক; উক্ত তালুকের জমি মুণ্ডেশ্বরী নামক এক নদী বা খালের পূর্ব্ব ধারে স্থিত। পূর্ব্ব ধারে বলিবার আমার কারণ

এই যে, ঐ কথায় কোন বিরোধ নাই। প্রতিবাদী গোবুরা নামক আর এক তালুকের মালিক; এই তালুক সেই নদীর পশ্চিমে স্থিত।

বাদীর মোকদ্দমার হেতু এই যে, যেহেতু বাদী আপন তালুকের জমিতে বোরো ধান্যের চাসের জন্য জল বদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বরাবর উক্ত নদীর উপর এক বাঁধ দিয়া থাকে, এবং যেহেতু কেবল সে একাকীই উক্ত জল ব্যবহার করিতে স্বত্ববান এবং উক্ত স্বত্ব হেতুই, প্রতিবাদী মূল্য দিয়া, বাদীর চাসের জন্য যে জল আবশ্যক তদ্ব্যতীত, অবশিষ্ট জল লইত; অতএব প্রতিবাদী বাদীর বাঁধের উজানে অন্যায়রূপে এক গভীর খাল খনন করিয়া তাহা দিয়া তাহার নিজের আবাদের মধ্যে মুণ্ডেশ্বরীর জল লইয়া যাওয়ায় বাদী যে পরিমাণে সঞ্চিত জল প্রাপ্ত হইত তৎপ্রতি বাঁধ দিয়া তাহার চাসের ক্ষতি করিয়াছে।

এ মোকদ্দমায় বাদীর প্রধান আপত্তি নিশ্চয়ই এই যে, সে এই বিশেষ স্থানে মুণ্ডেশ্বরীর পূর্ব্ব ধারের জমির মালিক থাকিয়া উক্ত নদীর গর্ভের এবং পশ্চিম ধারে ১৵০ বিঘা পরিসর ভূমিরও মালিক; অতএব উক্ত ধারে নদী হইতে জল লইবার জন্য যে কোন খাল খনন করা হয়, তাহা কাজে কাজেই বাদীর ভূমির মধ্য দিয়া খনন করিতে হইবে এবং খনন করাও হইয়াছিল।

বহুকাল ব্যবহারের হেতুবাদে মুণ্ডেশ্বরী হইতে কেবল বাদীর নিজেরই জল লইয়া ব্যবহার এবং ভোগ করিবার এবং তাহার বাঁধ থাকিবার বা নিয়ত নির্ম্মাণ করিবার এবং আবহমান কাল হইতে তদ্দ্বারা তাহার জমিতে জলসেচন করিবার যে স্বত্ব ছিল, তৎসম্বন্ধেও প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে।

যে মুন্সেফ এই মোকদ্দমার প্রথম বিচার করেন, তিনি স্থির করেন যে, বাদী উক্ত প্রকারের কোন স্বত্ব সপ্রমাণ করে নাই; সুতরাং তিনি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করেন।

অধঃস্থ জজও আপীলে বিবেচনা করেন যে, বাদীর মোকদ্দমা সপ্রমাণ হয় নাই, এবং তাহার ক্ষতি পূরণ হইতে পারে না, কিন্তু তাঁহার ডিক্রীতে কতিপয় নিষেধ এবং সর্ত্ত আছে যে, প্রতিবাদী নদীর সমতল অপেক্ষায় গভীর এমত কোন খাল খনন করিতে পারিবে না, যদ্দ্বারা সে নিজে বাদীর বাঁধ নির্ম্মাণ করিবার পরিশ্রম এবং ব্যয়ের ফল ভোগ করিবে।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদী খাস আপীল করিয়াছে; এবং সেই আপীলের হেতু বহুতর; কিন্তু বস্তুতঃ, প্রধানতঃ দুইটি হেতুর উপর তর্কবিতর্ক হয়; তাহার একটি এই যে, অধঃস্থ জজের উক্ত ভূমির মালিকী সম্বন্ধীয় প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়া এই মীমাংসা করা উচিত ছিল যে, বাদী বহুকাল ব্যবহার দ্বারা এই নদীর জলে কেবল তাহার নিজে ভোগের স্বত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে কি না; এবং অপরটি এই যে, নিম্ন আদালত জমির মালিকী সম্বন্ধে বাদীর বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি করেন, তাহা অন্যায়রূপে গৃহীত প্রমাণ দৃষ্টে করা হইয়াছে।

এ দুয়ের প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমার বোধ হইতেছে যে, বাদী বাস্তবিক মালিকত্বের প্রশ্নের উপরই নির্ভর করে; কিন্তু সে যদি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের স্বত্ব সংস্থাপন করিতে মনস্থ করিত, তবে সে নদীর তটের অন্যান্য মালিকগণকে বর্জ্জন করিয়া একাকী এই জল ব্যবহার করিবার স্বত্ব উত্থাপন এবং সপ্রমাণ করিতে ইচ্ছা করিলে, করিতে পারিত, এবং এস্থলে তাহার তাহা করা কর্ত্তব্যও ছিল। সে তাহা করে নাই। সে এরূপ স্বত্ব সংস্থাপনের উপযোগী কোন প্রমাণ দেয় নাই; সুতরাং উক্ত বিষয়ে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তিতে ভ্রম হয় নাই।

জমির মালিকত্বের প্রশ্ন সম্বন্ধে এই হেতুবাদে নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ে দোষ দেওয়া হইয়াছে যে, কোন এক ডেপুটি কালেক্টর ১৮৫২ সালে মৌজা রামপুর নামক গবর্ণমেন্টের এক খাস মহাল জরীপ করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে কোন

কোন বৃত্তান্ত লিখিয়া যে চিঠা প্রস্তুত করেন, উক্ত নিষ্পত্তি সাধারণতঃ তদ্দৃষ্টেই হইয়াছে। তর্ক করা হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্টের ঐ কর্ম্মচারী দ্বারাও জরীপের ন্যায় ঐ জরীপ এবং তদন্ত করেন, কারণ, উক্ত মৌজা গবর্ণমেণ্টের খাসে ছিল, অতএব উক্ত কার্য্য ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাও কার্য্যের ন্যায় দেখিতে হইবে।

আমার বিবেচনায়, এ প্রস্তাব সংস্থাপিত হইতে পারে না। প্রথমতঃ, আমার নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে, এরূপ স্থলে কোন ডেপুটি কালেক্টর বা উক্ত শ্রেণীস্থ অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী যে তদন্ত করেন এবং চিঠা প্রস্তুত করেন, তাহা, উক্ত তদন্তে যে সকল বৃত্তান্ত নির্দ্ধারিত হয় তাহার প্রমাণ স্বরূপে মান্য করা এ দেশের আদালত সমূহের সর্ব্বপ্রচলিত প্রথা। আমার ইহাও বোধ হয় যে, এমত স্থলে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য কেবল ব্যক্তি বিশেষের দ্বারাও কার্য্য স্বরূপ জ্ঞান করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্ট কোন খাস মহাল সম্বন্ধে কোন কার্য্য করিতেছেন বলিয়াই সেই সকল কার্য্য সাধারণের সম্পর্কীয় বিষয়ে সরকারী কার্য্য স্বরূপ গণ্য হইবে না, এমত হইতে পারে না। সুতরাং ঐ সকল চিঠা উচিত মতেই গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তাহা এই মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য।

এই সকল দলীলের গ্রহণ-যোগ্যতার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে, এই সকল দলীলের লিখিত বিষয়াদি কত দূর উপস্থিত বিচার্য্য বিষয়ের প্রতিপোষক, কারণ, তৎসম্বন্ধীয় সম্পত্তি বাদীর প্রতিবাদীর কাহারই ছিল না। কিন্তু প্রতিপোষণের কথা সাধারণতঃ ইসুর ভাবের উপর নির্ভর করে। আমীনের সরেজমিন তদন্তের কালে যাহা যাহা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে প্রকাশ যে, এ স্থলে পক্ষগণের মধ্যে এই প্রশ্ন উপস্থিত যে, বাদীর কথিতমতে মুক্তেশ্বরী নদীর গর্ত্ত এবং উক্ত নদীর পশ্চিম তীরে যে ক্ষুদ্র ভূমি এক দিকে বাদীর মৌজার এবং অপর দীকে আর আর অনেক মৌজার বরাবর, তাহা বাদীর জেউতিয়া মৌজার সামিল, না যে যে স্থলে তাহা যে যে মৌজার নিম্নে স্থিত, সেই সেই স্থলে সেই সেই মৌজার সামিল। বাদীর কথামতে তাহা আমীনের অঙ্কিত নক্সা অনুসারে মৌজা রাজপুর এবং মৌজা রায়পুর গোবরা, এবং বোধ হয় গোপালপুর পর্য্যন্ত বিস্তারিত। সুতরাং যে স্থলে মৌজা রাজপুর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মৌজা রাজপুরের চিঠার সহিত অনৈক্য সে স্থলে আমার বোধ হইতেছে যে, তাহা মোট ভূমি সম্পর্কে বাদীর বাক্য সম্বন্ধেও খাটে। অতএব তাহা অসংসৃষ্ট নহে, এবং আমি যে পূর্ব্বে বলিয়াছি, তদনুসারে আমার বিবেচনায় তাহা গ্রাহ্য।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, বাদী আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করে নাই, এবং বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করায় নিম্ন আদালতের কার্য্যে কোন ভ্রম হয় নাই।

এই সকল হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আপীল-আদালত যে নিষ্পত্তি দ্বারা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর ক্ষতিপূরণের দাবী অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ।

তাহা হইলে, প্রতিবাদীর আপত্তি অনুসারে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, আমি পূর্ব্বে যে সকল নিষেধ এবং সর্ত্তের কথা বলিয়াছি, নিম্ন আপীল-আদালতের ডিক্রীতে তাহা লেখা উচিত হইয়াছে কি না। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আমার বোধ হইতেছে যে, যে ভূমির মধ্য দিয়া প্রতিবাদী তাহার খাল খনন করিয়াছে তৎপ্রতি বাদী যখন আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে পারে নাই, এবং একাকী উক্ত জলভোগ করিবার অন্য কোন স্বত্বও সপ্রমাণ করে নাই বা করিতে পারে নাই, তখন আর এমন কোন হেতু নাই যদনুসারে বাদী এই প্রার্থনা করিতে পারে যে, প্রতিবাদীর প্রতি ঐরূপ নিষেধ হওয়া উচিত।

অতএব আমি বিবেচনা করি, নিম্ন আপীল-

আদালতের ডিক্রী কেবল বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করার ডিক্রী হওয়া উচিত, এবং যে সকল সর্ত্তের প্রতি আপত্তি হইয়াছে তাহা কাটিয়া দিয়া এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করা উচিত।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত

(ব)

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে বি ফিয়ার এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ১৭০২ নং মোকদ্দমা।

পূর্ণিয়ার জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৫ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৩ ই এপ্রিল তারিখে যে, নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সর্‌ফুল্লা খাঁ এবং আর এক ব্যক্তি (বাদী)
আপেলাণ্ট।

লক্ষ্মীপত সিংহ দুগড়, (প্রতিবাদী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, ই টুইডেল এবং সি গ্রেগরি
আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন এবং বাবু শ্রীনাথ দাস
ও রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—পত্তনীর বাকী খাজানার নীলামের উদ্বৃত্ত টাকা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক হইয়া কালেক্টরের হস্তে থাকিলে ঐ আদালতের হুকুমের দ্বারা যে পর্য্যন্ত অপর কাহাকে দেওয়ার আদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ টাকা বাকীদার পত্তনীদারের সম্পত্তি স্বরূপেই কালেক্টরের নিকট থাকে।

বিচারপতি ফিয়ার।—বাদীর এই মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হইতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, প্রতিবাদীকে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা তাহার টাকা।

এই মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৭০ ধারার বিধানের অন্তর্গত হইলে, প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক নীলামের উদ্বৃত্ত টাকা হইলেও, সেই টাকা আদালতে দাখিল হইলেই তাহা ঐ ধারা মতে বাদীর হইত। কিন্তু উক্ত টাকা যে কখন এমন অবস্থায় ছিল, এমত বলা হয় নাই। তাহা কেবল পত্তনীর বাকী খাজানার নীলামের উদ্বৃত্ত টাকা স্বরূপে কালেক্টরের হস্তে পত্তনীদারের সম্পত্তি স্বরূপেই ছিল। বাদী এই টাকা ক্রোক করাতে ঐ সম্পত্তির অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই; ঐ ক্রোক সত্ত্বেও তাহা পত্তনীদারেরই সম্পত্তি ছিল। যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালত যদি ২৩৭ ধারা অনুসারে কালেক্টরের প্রতি হুকুম দিতেন, এবং কালেক্টর তৎপরে বাদীকে উক্ত টাকা দিতেন, তাহা হইলে তখন তাহা নিশ্চয়ই বাদীর টাকা হইত।

কিন্তু আমার বিবেচনায়, তাহার কিছুই হয় নাই; যে আদালত ক্রোক করেন তিনি কোন হুকুমই দেন নাই; এবং কালেক্টর ন্যায্যরূপেই হউক বা অন্যায় রূপেই হউক, ২৩৭ ধারার বিধান অনুসারে এইরূপ কোন হুকুম ব্যতীতই তাঁহার নিজের ইচ্ছা মতে প্রতিবাদিগণকে উক্ত টাকা দেন।

এমত অবস্থায়, আমার বোধ হয় যে, প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে উক্ত টাকার উপর বাদীর কোন স্বত্ব জন্মিবার কিছুই ঘটে নাই, অতএব আমি বিবেচনা করি, বাদীর মোকদ্দমা উচিত মতেই ডিস্‌মিস্ হইয়াছে, এবং এই আপীলও খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—বিচারপতি ফিয়ারের প্রদর্শিত হেতুবাদেই আমি এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে সম্মত হইলাম। (ব)

১৩ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি. ফিয়ার এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ৩৯১ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২১এ জুলাই এবং ১৭ ই আগস্ট তারিখের দুই হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মনোমোহিনী দাসী প্রভৃতি (প্রতিবাদিনী) আপেলাণ্ট।

ইচ্ছাময়ী দাসী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর এবং বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস এবং ভগবতীচরণ ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দেঃ কার্য্য-বিধির ৯২ ধারায় দেওয়ানী আদালতকে মোকদ্দমা চলিবার সময়ে নিষেধক হুকুম দিবার এবং রিসিবর নিযুক্ত করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা, যে সম্পত্তি মোকদ্দমা চলিবার সময় বর্ত্তমান অবস্থায় রাখা আবশ্যক হয়, কিন্তু তাহা নষ্ট, অপচিত বা আদালতের অধিকারের বহির্ভূত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহাতেই কেবল পরিচালন করিতে হইবে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমার মতে এই নিষেধক হুকুম রহিত হইবে, এবং রিসিবরকে বরখাস্ত করিতে হইবে।

আমার বলা বাহুল্য যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯২ ধারা দ্বারা দেওয়ানী আদালতকে মোকদ্দমা চলিবার সময়ে নিষেধক হুকুম প্রচার এবং রিসিবর নিয়োগ করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অতি সাবধানে পরিচালন করিতে হইবে। যে স্থলে কোন সম্পত্তি যাহা মোকদ্দমা চলিবার কাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থায় রাখা আবশ্যক, তাহা নষ্ট, অপচিত বা আদালতের অধিকার-বহির্ভূত হইবার আশঙ্কা জন্মে, তাহাতেই কেবল আদালতের হস্তক্ষেপ করত ঐ সকল ব্যক্তিকে তাহা ভোগদখল করিতে না দেওয়া উচিত, যাহারা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে ঐ সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হইতে পারে।

এ মোকদ্দমায় বাদিনী যে সম্পত্তির প্রতি দাবী করে, তাহা মোকদ্দমা চলিবার সময় কেন হস্তান্তর করিতে দেওয়া হইবে না, তাহার যে কোন বিশেষ কারণ আছে, এমত বোধ হয় না। পরন্তু, বাদিনীর পক্ষ হইতেই স্বীকৃত হইয়াছে যে, উক্ত মোকদ্দমার বিষয়ে তাহার সহিত প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক জনের তুল্য সম্বন্ধ আছে। বাদিনীর নিজের মোকদ্দমা এই যে, উক্ত সম্পত্তিতে তাহার কেবল অবিভক্ত অর্দ্ধাংশ আছে। রিসিবর নিযুক্ত করিয়া এমত কোন নিষেধক হুকুম দেওয়া অসম্ভব যাহা কেবল ঐ অবিভক্ত অর্দ্ধাংশেই খাটিবে। এ মোকদ্দমায় নিষেধক হুকুম দিলে এবং রিসিবর নিযুক্ত করিলে, বাদিনী যে প্রতিবাদিনীকে সম্পত্তির একাংশের মালিক বলিয়া স্বীকার করে, তাহার স্বার্থের ব্যাঘাত হইবে। আমার বোধ হয়, এ মোকদ্দমায় এমন কিছু নাই, যাহাতে ঐ রূপ কঠিন উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে; এবং আমি বোধ করি, আদালত প্রতিবাদিনীকে না জানাইয়া এবং তাহার অজ্ঞাতসারে যে হুকুম দিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ অন্যায় হইয়াছে।

এই আপীলের ডিক্রী হইবে, উক্ত নিষেধক হুকুম রহিত হইবে, এবং রিসিবর বরখাস্ত হইবে। আপেলাণ্টকে এই আপীলের খরচা বাবৎ রেস্পণ্ডেণ্টের ৫০ টাকা দিতে হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—বিচারপতি ফিয়ার উক্ত নিষেধক হুকুম রহিত এবং রিসিবরকে বরখাস্ত করিবার যে সকল কারণ দর্শাইলেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। আমি আর এই মাত্র বলিতে চাহি যে, এই মোকদ্দমার বিচার এবং নিষ্পত্তি ইতিপূর্ব্বেই কেন হয় নাই, এবং কেন এই আপীলের জন্য তাহার নিষ্পত্তি করিতে

গৌণ করা হইয়াছে, আমি তাহার কোন কারণ দেখি না। (ব)

---

১৩ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

রামতারক বারিক, দরখাস্তকারী।

সিদ্ধেশ্বরী দাসী, প্রতিপক্ষ।

বাবু যাদবচন্দ্র শীল দরখাস্তকারীর উকীল।

প্রতিপক্ষের পক্ষে কেহ উপস্থিত নাই।

চুম্বক।—হাইকোর্টের এড্‌বোকেটগণ উহার আপীল-বিভাগে কেবল উপস্থিত হইয়া তর্কবিতর্ক করিতে পারেন, রেজিষ্ট্রারের আফিসে কোন দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন না; তাহা উকীলের ক্ষমতাধীন কার্য্য।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমার উকীল বাবু * * আমাদিগের নিকট মোশন (প্রার্থনা) করিয়া নিম্নলিখিত দরখাস্তের স্থূল বৃত্তান্ত মুখে বলিয়াছেন। "উক্ত দরখাস্ত" (রামতারক বারিকের পক্ষে) এই যে, "অধীন "গত ২২ এ নবেম্বর তারিখে আপন খাস আপী- "লের হেতু দাখিল করে, এবং এই মান্যবর "আদালতের রেজিষ্ট্রার তাহা এই হেতুবাদে "গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন যে, তাহা উপযুক্ত "ষ্ট্যাম্পে লেখা হয় নাই, এবং তাহা পৃষ্ঠায় "লেখা হইয়াছে।"

"অধীনের বক্তব্য এই যে, সে উক্ত বিষয় "এক কালীন জানিত না, এবং যে ক্লার্ক ঐ "ষ্ট্যাম্পে লেখে সে ঐ সকল নিয়ম এবং জাবেতা না "জানাতেই ঐ ভ্রম হইয়াছে, এবং উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প "না দেওয়ার অভিসন্ধিতে তাহা করা হয় নাই। "অতএব অধীনের প্রার্থনা এই যে, ঐ সকল "হেতু দাখিল করিয়া লইবার হুকুম দেওয়া হয়।" ইত্যাদি।

এক্ষণে যে ব্যক্তি এই দরখাস্ত পড়ে তাহারই বোধ হইবে যে, দরখাস্তকারী আপন খাস আপীলের দরখাস্ত যে ক্লার্ক দ্বারা লেখায় সে ঐ সকল নিয়ম বা জাবেতা জানিত না, এবং দরখাস্তকারী স্বয়ং উক্ত দরখাস্ত দাখিল করে, এবং পরে সে উকীল নিযুক্ত করে; সেই উকীল এক্ষণে তাহার পক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহার অনবগতি এবং অনভিজ্ঞতার বিষয় জানান, এবং এই খাস আপীল গ্রহণ করিবার প্রার্থনা করেন। আসল কথা এই যে, এই আদালতের এক জন এড্‌বোকেট মেং * * * খাস আপীলের দরখাস্ত স্বাক্ষর করেন, সার্টিফিকেট দেন এবং আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাহা দাখিলও করেন।

আরো দেখা যায় যে, খাস আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আর অন্য বিষয়ের সহিত এক ওকালৎনামা ছিল, তাহাতে মেং অমুকের নাম ছিল না, কারণ, তিনি আদালতের উকীল নহেন; কিন্তু আদালতের আর আর উকীলের নাম স্পষ্টাক্ষরে লেখা ছিল। ঐ উকীল বাবু আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া এই ওকালৎ-নামা গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে তারিখ দেওয়া হয় না, এবং উক্ত দরখাস্তেও তারিখ ছিল না।

এই আদালতের এক জন এড্‌বোকেট খাস আপীলের দরখাস্ত স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহার সার্টিফিকেট দিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট আদালতে দাখিল করিয়াছেন দেখিয়া আমরা ডেপুটি রেজিষ্ট্রারকে ডাকিয়া পাঠাই, এবং ডেপুটি রেজিষ্ট্রার আসিয়া আমাদিগকে বলেন যে, ঐ এড্‌বোকেটই আপীল দাখিল করিয়াছেন, এবং তিনি ঐ রূপে আর কয়েক আপীলও দাখিল করিয়াছেন।

দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১৭ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, "কোন দেওয়ানী আদালতে যে "সকল দরখাস্ত করিতে হয় তাহা দরখাস্তকারী "আপনি কিম্বা তাহার স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা

"কিম্বা তাহার তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে "নিযুক্ত উকীলের দ্বারা দাখিল করিবে। ও কোন "দেওয়ানী আদালতে যে সকল পক্ষের হাজির "হইতে হয়, তাহারা নিজে হাজির হইবে, কিম্বা "তাহাদের স্বীকৃত মোক্তারের দ্বারা কিম্বা তাহাদের "তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে নিযুক্ত উকীলের "দ্বারা হাজির হইবে। কিন্তু যদি এই আইনে "সেই বিষয়ের অন্য প্রকারের স্পষ্ট বিধান "থাকে তবে সেই বিধান বহাল থাকিবে।"

এ মোকদ্দমায় মেং * * স্বয়ং কোন পক্ষ নহেন, অথবা উক্ত ধারায় যাহাকে আদালতের স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তিনি সেরূপ স্বীকৃত মোক্তার নহেন, বা কাহার পক্ষে কার্য্য করিবার জন্য রীতিমত নিযুক্ত উকীলও নহেন।

পরন্তু, এই আদালতের ১৮৬৫ সালের সনন্দপত্রে "এড্‌বোকেট, উকীল এবং এটর্নীদিগকে "এই বিচারালয়ের মোকদ্দমায় অর্থিপ্রত্যর্থি-"গণের পক্ষে উপস্থিত হইতে এবং এই "বিচারালয় আপন নিয়ম এবং হুকুম দ্বারা "যেরূপ নির্দ্ধারণ করেন তদনুসারে তাহাদের "পক্ষে তর্কবিতর্কে বা কার্য্য করিতে অথবা তর্ক-"বিতর্ক এবং কার্য্য করিতে" ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল সনন্দ পত্র প্রচারিত হইবার পর এই আদালত কতকগুলি নিয়ম করেন; তাহার এক নিয়ম এই যে, এড্‌বোকেটগণ এই আদালতের দেওয়ানী বা ফৌজদারী যে কোন বিভাগে হউক, উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমায় অর্থিপ্রত্যর্থি-গণের পক্ষে তর্কবিতর্ক করিতে পারেন। কোন নিয়ম বা আচারের কথা ছাড়িয়া দিলেও, স্পষ্ট দেখা যায় যে, এই আদালতের কোন এড্‌বোকেট খাস আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার কার্য্য করিতে পারেন না।

এক্ষণে যে উকীল উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে আদালত জিজ্ঞাসা করেন যে, কি প্রকারে এই অনিয়ম হইল, এবং তিনি তাহার উত্তরে যাহা বলেন তাহাতে আমি অতীব চমৎকৃত হইয়াছি। তিনি প্রথমতঃ, আমাদিগকে বলেন যে, তিনি বিবেচনা করেন নাই যে, তাহার মধ্যে কোন অনিয়ম আছে। তিনি তাহা সামান্য এক দরখাস্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি আমাদিগের নিকট কেবল প্রকৃত বৃত্তান্ত দর্শাইতে এবং এই প্রার্থনা করিতে উপস্থিত হইয়াছেন যে, খাস আপীলের দরখাস্ত গ্রহণ করা উচিত। তিনি তদনন্তর, আমাদিগকে বলেন যে, নূতন সনন্দ পত্রে এড্‌বোকেটদিগকে অর্থিপ্রত্যর্থীদের কার্য্য করিতে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তিনি পরে বলেন যে, এমত কোন নিয়ম নাই যাহাতে এড্‌বোকেটদিগের কার্য্য করিবার স্পষ্ট নিষেধ আছে। কিন্তু অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ উকীল বাবুর প্রথম বাক্যই সত্য; তিনি এমত বিবেচনা করেন নাই যে, এ বিষয়ে কোন গুরুতর কথা আছে; এবং পূর্ব্বের কার্য্য রীতিমত হইয়াছিল কি না, তাহার তদন্ত করিবার কষ্ট তিনি স্বীকার করেন নাই।

এমত অবস্থায়, আমরা বলিতে পারি না যে, এই খাস-আপীলের দরখাস্ত আদালতে রীতিমত দাখিল হইয়াছে; এবং আমরা উপস্থিত প্রার্থনাও গ্রাহ্য করিতে পারি না। রীতিমত বৃত্তান্ত লিখিয়া খাস-আপীল গ্রহণ করা সম্বন্ধে আবার আমাদিগের নিকট দরখাস্ত করিলে আমরা তাহা গ্রহণ করিব কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু আপীল করিবার যে মিয়াদ আছে, এই মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির পর তদতিরিক্ত অনেক সময় গত হইয়াছে বিবেচনায়, উক্ত দরখাস্ত যে গ্রাহ্য হইবে এমত বোধ হয় না।

বিচারপতি মার্কবি।—আমার অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই দরখাস্ত তাহার বর্ত্তমান আকারে অগ্রাহ্য হইবে। আর যে এক প্রশ্ন আনুষঙ্গিকরূপে উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে, এই আদালতের উকীল বারিষ্টরের মধ্যে যে প্রভেদ করা

হইয়াছে যে, যে সকল বারিষ্টর এই আদালতের এড্‌বোকেট হন, তাঁহাদিগকে আদালতে উপস্থিত হইয়া তর্কবিতর্ক করিতে দেওয়া হয়, এবং কেবল উকীলদিগকে উপস্থিত হইয়া তর্কবিতর্ক করিতে এবং কার্য্য করিতেও দেওয়া হয়, তাহা যে অতি স্পষ্ট এবং প্রকাশ্য, এ বিষয়ে আমি কখন কোন সন্দেহ করিতে শুনি নাই। এবং আমার বোধ হয় যে, যে সকল বারিষ্টর এই আদালতের এড্‌বোকেট এবং কেবল তর্কবিতর্ক করিতে পারেন, তাঁহাদের যে আফিসে কোন আপীল দাখিল করিবার ক্ষমতা নাই, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই, কারণ, তাহা তর্কবিতর্ক শব্দের অর্থের অন্তর্গত নহে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আদালতের কোন এড্‌বোকেটের হাত হইতে কোন দরখাস্ত বা কোন আবেদন-পত্র গ্রহণ করিতে রেজিষ্ট্রারের ক্ষমতা নাই। (ব)

---

১৪ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ৪২৭ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১০ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২৫ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

হিম্মতুল্লা চৌধুরী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

বিবী হীরণ (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

মৌলবী সৈয়দ মহম্মৎ হোসেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন সালিশের ফয়সলার উপর যে ডিক্রী হয়, তাহা সিদ্ধ হওয়ার জন্য ঠিক দেঃ কার্য্য-বিধির বিধান মতে প্রদত্ত হওনাবশ্যক; অর্থাৎ সালিশের নিষ্পত্তি দাখিল হইবে, সেই নিষ্পত্তি অনুসারে রায় দিতে হইবে, এবং ডিক্রী সেই রায়ের অনুগামী হইবে, এবং আদালতের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় তাহা ফলে পরিণত হইবে।

ঐ রায় অনুযায়ী ডিক্রীজারীতে কোন হুকুম হইলে, তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিবার কোন নিষেধ নাই।

বিচারপতি ফিয়ার।—যে ডিক্রীজারী করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ডিক্রী হইলে, এমত এক ডিক্রী যাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩২৭ ধারার বিধানমত কার্য্য দ্বারা হইয়াছে। উক্ত ডিক্রীজারী করিবার কালে উপস্থিত আপেলাণ্ট যে সকল আপত্তি করে, তাহা প্রথম আদালত অগ্রাহ্য করেন।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে আপীল হয়, এবং জজ স্থির করেন যে, তাঁহার উক্ত আপীল শুনিবার অধিকার নাই।

আমার বোধ হয়, ঐ বিষয়ে জজের ভ্রম হইয়াছে। যদি এই মোকদ্দমায় প্রথম আদালত ৩২৭ ধারার মর্ম্মানুসারে রায় এবং ডিক্রী দিয়া থাকেন, তবে ৩২৫ ধারার শেষ দুই পংক্তিতে যে নিষেধ আছে, তন্নিবন্ধন নিশ্চয়ই উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে না। কিন্তু উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল না হইলেও আমি বিবেচনা করি, উক্ত রায় অনুযায়ী ডিক্রীজারীতে যে হুকুম দেওয়া হয়, তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইবার কোন প্রতিবন্ধক নাই।

আদালত ডিক্রীজারীতে যে সমস্ত হুকুম দেন, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা মতে তদ্বিরুদ্ধে স্পষ্টই আপীল চলিবে; এবং ৩২৭ ধারার বিধান অনুসারে যে ফয়সলা দাখিল করা হয়, তাহা, কার্য্য-বিধির অন্য কোন ধারায় বিপরীত কিছু বিধিবদ্ধ না হইলে, আমার বিবেচনায়, জারী সম্বন্ধে আদালতের ঠিক অন্য ডিক্রীর ন্যায় থাকিবে। বোধ হয়, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩২৫ ধারায় ইহা স্পষ্ট রূপেই ব্যক্ত হইয়াছে।

অতএব আমি বিবেচনা করি, জজের নিষ্পত্তি

অন্যথা হইবে, এবং এই মোকদ্দমা তাঁহার নিকট পুনরায় শ্রবণের জন্য ফেরৎ যাইবে। কিন্তু যেহেতু আমাদিগের নিকট যে নথী পাঠান হইয়াছে, তাহা হইতে প্রকাশ পায় না যে, প্রথম আদালত উক্ত ফয়সলা দাখিল করিয়া লইয়াছিলেন, এবং তল্লিখিত মতে রায় দিয়াছিলেন, অতএব এ মোকদ্দমায় এমত কোন প্রামাণ্য ডিক্রী হইয়াছিল কি না, যাহা জারী হইতে পারে, তৎপ্রতি আমার অত্যন্ত সন্দেহ আছে।

কোন সালিশের ফয়সলার উপর যে ডিক্রী হয়, তাহা বৈধ হওয়ার জন্য ঠিক ৮ আইনের বিধান অনুসারে প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক। ঐ সকল বিধান এই যে, সালিশের নিষ্পত্তি দাখিল করিতে হইবে, সেই নিষ্পত্তি অনুসারে রায় দিতে হইবে, এবং ডিক্রী সেই রায়ের অনুগামী হইবে, এবং আদালতের অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় তাহা ফলে পরিণত হইবে।

প্রথম আদালত যে ঠিক এই সকল বিধান অনুসারে চলিয়াছেন, এমত দেখা যায় না; অতএব আমার মতে এ মোকদ্দমায় রেস্পণ্ডেণ্টের প্রতি এই হুকুম জারী করা উচিত যে, প্রথম আদালতে সালিশের উক্ত নিষ্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য করা হয়, তাহা অকর্ম্মণ্য বলিয়া কেন রহিত করা হইবে না, তাহার কারণ সে দর্শায়।

বর্ত্তমান নিষ্পত্তির এবং হুকুমের এক নকল দিনাজপুরের অধঃস্থ জজের নিকট এই বলিয়া পাঠান হউক যে, তিনি উচিত বিবেচনা করিলে, উক্ত হুকুম শ্রবণের কালে কারণ দেখাইতে পারেন। এই হুকুম জারীর পর এক মাসের মধ্যে এখানে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিজ্ঞবর সহযোগী এই মোকদ্দমায় যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন, এবং তিনি যে হুকুম দিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত। (ব)

১৪ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৩৬৭ নং মোকদ্দমা।

চট্টগ্রামের জজ সীতাকুণ্ডের মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ৩১ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১০ ই জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বহর আলী (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

সুকিয়া বিবী এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে ভূসম্পত্তি পূর্ব্বে বাদিনীর পিতার ছিল, এবং যাহা তাহার মাতা প্রতিবাদিগণের নিকট বিক্রয় করে, তাহার দখলের দাবীর মোকদ্দমায় প্রতিবাদিগণ বলে যে, ঐ মাতা তাহা যৌতুকের পরিবর্ত্তে হেবানামা দ্বারা প্রাপ্ত হয়; বাদিনী বলে যে, তাহার পিতা আপন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করে এবং তাহার পরে বিক্রয়ের কাল পর্য্যন্ত মাতা, বাদিনীর অভিভাবিকা স্বরূপে দখল করে।

স্থির হইল যে, প্রথম আদালতে যে তমাদীর ইসু হয় তাহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১১ ধারালিখিত নাবালগ সম্বন্ধীয় বিশেষ বিধান সম্বন্ধে বিশেষ ইসু বিধায় বাদিনীগণের নালিশ ১ ধারার ১২ প্রকরণ অনুসারে সাধারণ তমাদীর ইসু সম্বন্ধে শুনা যাইতে পারে, এবং তাহারা দেখাইতে পারে যে, উক্ত বিধবা নালিশ উপস্থিতের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তাহাদের অভিভাবিকা স্বরূপে দখীলকার ছিল।

উক্ত বিধবা ঐ সকল ভূমির সম্পূর্ণ মালিক স্বরূপে (অভিভাবিকা স্বরূপে নহে) যে কোন কার্য্য করে এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন ডিক্রী হয় তাহা দ্বারা বাদিনী বাধ্য হইবে না।

**বিচারপতি হবহৌস।**—বাদিনীগণ কোন ভূসম্পত্তির দখলের দাবীতে নালিশ করে। ৪৩১৫ দাগের ভূমি সম্বন্ধে বাদিনীগণের বিরুদ্ধে এক বৃত্তান্তঘটিত নির্দ্দেশ হয়; অতএব অতঃপর আমাদের রায়ে আমরা যাহা কিছু বলিব তাহা এই বিশেষ সম্পত্তি সম্বন্ধে খাটিবে না।

এক্ষণে আমাদের নিকট যে সম্পত্তির কথা উপস্থিত, তাহা পূর্ব্বে বাদিনীগণের পিতা রমজান আলী নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মঘী ১২১৪ সালে তাহার মৃত্যু হয়; এবং উক্ত সম্পত্তি তাহার স্ত্রীর দখলে থাকে। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ বিধবা স্ত্রী তাহা মঘী ১২১৯ সালে প্রতিবাদিগণের অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টগণের নিকট বিক্রয় করে।

প্রতিবাদিগণের তর্ক এই যে, রমজান আলী এই সকল সম্পত্তি মঘী ১২০৫ সালের হেবানামা দ্বারা যৌতুকের পরিবর্ত্তে তাহার স্ত্রী সামলাকে দেয়; সামলা তাহা এই হস্তান্তর অনুসারে ভোগ করে এবং আমি যে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে সে তাহা প্রতিবাদিগণের অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টগণের নিকট বিক্রয় করে।

পক্ষান্তরে, বাদিনীগণের আপত্তি এই যে, তাহাদের পিতা তাহা ১২১৪ সাল পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া লোকান্তরিত হয়, এবং সেই সময় হইতে প্রতিবাদী-খাস-আপেলাণ্টগণের নিকট বিক্রয় করার কাল পর্য্যন্ত তাহারা নাবালগ থাকায় সামলা তাহাদের অভিভাবিকা স্বরূপে তাহাদের দাবীকৃত অংশ ভোগ করে।

পক্ষগণের মধ্যে প্রথম ইসু এই হয় যে, এই মোকদ্দমা তমাদী দ্বারা বারিত কি না।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালত, নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে বাদিনীগণের দখল থাকা না থাকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তমাদীর বিচার করত এই স্থির করেন যে, বাদিনীগণের ঐ রূপ দখলের দ্রষ্টব্য প্রমাণ আছে। জজ বলেন যে, তাঁহার মতে উক্ত দ্রষ্টব্য প্রমাণ "প্রতিবাদী "আপেলাণ্টের স্বীকৃত মতে এই যে, বিরোধীয় "ভূমি সকল (৪৩১৫ দাগ ব্যতীত) পূর্ব্বে "রমজান আলীর ছিল, এবং তাহার মৃত্যুর "তারিখ হইতে মঘী ১২১৯ সাল পর্য্যন্ত বাদিনী- "গণের বাক্য মতে সামলা বিবীর দখলে ছিল।" এই নিষ্পত্তি স্পষ্টই আইন সম্বন্ধে ভ্রম-মূলক, এবং খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলও ইহা অস্বীকার করেন না। প্রতিবাদিগণ অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টগণ এ কথা স্বীকার করে না যে, সামলা এই সকল ভূমি রমজান আলীর মৃত্যু হইতে উক্ত নাবালগগণের অর্থাৎ বাদিনীগণের অভিভাবিকা স্বরূপে ভোগ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবাদিগণ বলে যে, তাহার স্বামী মঘী ১২০৫ সালে তাহাকে যে হেবা দেয়, সেই হেবা অনুসারে সে তাহা তাহার নিজের স্বত্বে ভোগ করিয়াছিল। সামলা যে, উক্ত নাবালগগণের অভিভাবিকা স্বরূপে ভোগ করে, ইহা স্পষ্টই প্রতিবাদিগণ স্বীকার করে নাই, তাহারা স্পষ্ট তাহার বিপরীত কথা বলে।

আমরা তদনন্তর খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণের উকীলকে এই দেখাইতে বলি যে, সামলা নালিশ উপস্থিতের ১২ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে বিরোধীয় ভূমিতে বাদিনীগণের অভিভাবিকা স্বরূপে দখীলকার থাকার প্রসঙ্গের পোষকতায় নথীতে কোন প্রমাণ আছে কি না। ঐ উকীল স্বীকার করেন যে, ঐ রূপ কোন প্রমাণ নাই; কিন্তু তিনি বলেন যে, ইহার কারণ এই যে, প্রথম আদালতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১২ প্রকরণ অনুসারে সাধারণ তমাদীর বিধান প্রয়োগ সম্বন্ধে ইসু হয় নাই, উক্ত আইনের ১১ ধারায় নাবালগের সম্বন্ধে তমাদীর যে বিশেষ বিধান আছে, তৎসম্বন্ধেই বিশেষ ইসু হয়। প্রথম আদালত যে ইসু ধার্য্য করেন, এবং যে রায় দেন তদৃষ্টে আমরা তাহাই দেখিতে পাই; খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল যে ইসুর কথা বলেন পক্ষগণের মধ্যে উক্ত আদালত বাস্তবিক সেই বিশেষ ইসুই ধার্য্য করেন। অতএব আমরা

বিবেচনা করি, নিম্ন আপীল-আদালতের জজ যে সাধারণ তমাদীর ইসু ধার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে বাদিনীগণের জওয়াব শ্রবণ করা এবং তাহাদিগকে প্রমাণ দাখিল করিতে দেওয়া উচিত।

কিন্তু খাস আপেলাণ্টের উকীল আরো এই তর্ক করেন যে, যদি এমত স্থির হয় যে, সামলা বাদিনীগণের অভিভাবিকা স্বরূপে এই সকল ভূমি বরং ভূমির এই অংশ দখল করিয়াছিল, তবে সে যে মঘী ১২১৯ সালে প্রতিবাদিগণের নিকট এই সকল ভূমি বিক্রয় করে তদ্দ্বারা বাদিনীগণ বাধ্য হইবে; এবং তাহার ও প্রতিবাদিনীগণের মধ্যে এক মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি হয় এবং যাহাতে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী প্রদত্ত হয় তাহা দ্বারাও বাদিনীগণ বাধ্য হইবে। কিন্তু আমরা বিবেচন করি না যে, ন্যায় অনুসারে ইহা হওয়া উচিত। প্রতিবাদিগণের নিকট সামলা যে বিক্রয় করে তাহা সে এই সকল ভূমির সম্পূর্ণ মালিক স্বরূপ করে। সামলার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হয় তাহা তাহাকে নাবালগগণের অভিভাবিকা বলিয়া হয় না, তাহাকেই মালিক উল্লেখ করিয়া হয়, অতএব আমাদের বিবেচনায়, সে যে কোন কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন ডিক্রী হইয়া থাকে তাহা ঐ সকল ভূমির সম্পূর্ণ মালিক স্বরূপে হওয়ায় সে যে কোন কার্য্য করে, এবং তাহার বিরুদ্ধে যে কোন ডিক্রী হয় তাহা দ্বারা বাদিনীগণ বাধ্য হইবে না, এবং খাস আপেলাণ্টের উকীল এই মোকদ্দমার যে এতদ্বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অনুকূলে আমাদিগকে আদালতের কোন নিষ্পত্তি দেখান হয় নাই। অতএব আমরা বিবেচনা করি, এই দ্বিতীয় আপত্তি চলিতে পারে না।

আমরা এ মোকদ্দমা এই জন্য নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ পাঠাইতেছি যে, এ নালিশ উপস্থিতের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে প্রতিবাদীর বিক্রেতা সামলা উক্ত ভূমি সকল বাদিনীগণের অভিভাবিকা স্বরূপে দখল করিয়াছিল কি না, তৎসম্বন্ধে উভয় পক্ষকেই তর্কবিতর্ক করিতে এবং প্রমাণ দিতে দেওয়া হয়। যদি আদালত দেখেন যে, সামলা ঐ রূপ দখীলকার ছিল, তবে তিনি বাদিনীগণের নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবেন; এবং যদি পক্ষান্তরে, আদালত দেখেন যে, সে তাহাতে ঐ রূপে দখীলকার ছিল, তবে তিনি বাদিনীগণকে ডিক্রী দিবেন।

শেষ নিষ্পত্তি অনুসারে খরচার আদেশ হইবে। (ব)

---

১৫ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং ডব্‌লিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২০২ নং মোকদ্দমা।

পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ জুনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

নন্দকিশোর সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

হরিপ্রসাদ মণ্ডল (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ ধর রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—ভূম্যধিকারী তাহার কোন প্রজার স্বত্ব অস্বীকার করিলে, যত বারই অস্বীকার করা হউক, তাহাতে কেবল একটি নালিশের হেতু জন্মে।

ভূমির দখলের জন্য নালিশে স্বত্বের সম্পূর্ণ ইসু হইয়া তাহার নিষ্পত্তি হইলে, সেই স্বত্ব অনুসারে উক্ত ভূমির যে অংশ ভোগ করা হয়, তৎসম্বন্ধেই উক্ত পক্ষগণের মধ্যে ঐ নিষ্পত্তি চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

**বিচারপতি মার্কবি।**—আরজীর লিখিত মতে, সম্পূর্ণ মৌজা করাসনীতে বাদীর পত্তনী

স্বত্ব সংস্থাপনার্থে এবং উক্ত স্বত্ব অনুসারে তাহার দখলের দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত হয়। বাদী বলে যে, উক্ত পত্তনী সেই মৌজার তৎকালের মালিক ক্ষেত্রমোহন সিংহ তাহাকে বার্ষিক ১১ টাকা জমায় ৭৭ টাকা পণ লইয়া দেয়, এবং ১২৫১ সালের ১১ ই পৌষ তারিখে সে তাহার কবুলিয়ৎ লিখিয়া দেয়।

দেখা যায় যে, ঐ ভূমি পূর্ব্বে দেবত্র স্বরূপে ভোগ করা হইত, এবং গবর্ণমেণ্ট তাহা ১৮৬৫ সালে খাস করিয়া লইয়া ক্ষেত্রমোহনের সন্তানগণের সহিত বন্দোবস্ত করেন। পরে হৃদয়নাথ নন্দী ক্ষেত্রমোহনের উত্তরাধিকারিগণ যাহারা এই মোকদ্দমায় তাহার সহ-প্রতিবাদী, তাহাদের নিকট হইতে ঐ সম্পূর্ণ মৌজার পত্তনী লয়।

প্রতিবাদিগণ স্বীকার করে যে, বাদী বহুকালাবধি ঐ মৌজার এক অংশ জমাই স্বত্বে ভোগ করে, এবং সে এখনও তাহাতে দখীলকার আছে, এবং বাদী এ কথা বলে না যে, সে কখন উক্ত মৌজার ঐ অংশ হইতে প্রকৃতার্থে বেদখল হইয়াছে। বাদীও বলে যে, তাহার কথিত পত্তনী-পাট্টা পাইবার পূর্ব্বে সে উক্ত জমাই স্বত্ব ভোগ করিত, কিন্তু বলে যে, ঐ স্বত্ব পত্তনীর মধ্যে ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

১৮৬৭ সালে প্রতিবাদী হৃদয়নাথ নন্দী, ঐ মৌজার যে অংশ উক্ত জমাই স্বত্বের অন্তর্গত নহে, তাহার কতকগুলি বৃক্ষ কাটে এবং এক বাঁধ দেয়। বাদী তাহাতে এই ক্ষতির প্রসঙ্গে এবং হৃদয়নাথ উক্ত কার্য্য দ্বারা তাহাকে যে ৭৫৴ বিঘা জঙ্গলা ভূমি হইতে বেদখল করে, তাহার দখলের দাবীতে নালিশ উপস্থিত করে। বাদী উক্ত সম্পূর্ণ মৌজা পত্তনী লইয়াছে বলিয়া তদনুসারে এই দুই খণ্ড ভূমির উপর দাবী করে, এবং উক্ত মোকদ্দমায় ক্ষেত্রমোহন সিংহের উত্তরাধিকারিগণকেও প্রতিবাদি-শ্রেণী-ভুক্ত করে।

উক্ত মোকদ্দমার এক ইসুতে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, যে ভূমিতে ঐ সকল বৃক্ষ ছিল, তাহা বাদী পত্তনীদার স্বরূপে ভোগ করে কি না।

বাদী উক্ত সমুদায় মৌজায় আপন স্বত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে দেখিয়া মুন্সেফ বিবেচনা করেন যে, তাহার সমুদায় মৌজার মূল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া উচিত, এবং উক্ত হেতুবাদে তিনি বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

আপীলে জজ, সমুদায় মৌজার স্বত্বের প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মুন্সেফের সহিত ঐক্য হইয়াও, বিবেচনা করেন যে, বাদীর দাবীর দোষগুণ সম্বন্ধে তাঁহার বিচার করিবার বাধা নাই। কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, বাদীর পত্তনী সপ্রমাণ হয় নাই, এবং সেই জন্য মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে যে খাস আপীল হয়, তাহা এই আদালত ডিস্‌মিস্ করেন। রায় দেওয়ার সময় এই এক কথা উত্থাপিত হয় যে, জজ উক্ত পত্তনী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলেন, তাহা কথার কথা মাত্র।

এই মোকদ্দমা চলিবার সময়ে হৃদয়নাথ নন্দী ব্যতীত আর আর প্রতিবাদিগণ উক্ত মৌজার যে অংশ বাদীর জমাই স্বত্বে ভোগ করিবার কথা বলা হয়, তাহার বাকী করের দাবীতে বাদীর বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট নালিশ করে। বাদী উক্ত মোকদ্দমার জওয়াব দেয় না, এবং ১৮৬৯ সালের ২০ এ জুন তারিখে তাহার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হয়। পরে বাদী পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনায় কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে, কিন্তু উক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়।

প্রতিবাদিগণ উপস্থিত মোকদ্দমার জওয়াবে নিম্ন আদালতে অনেক আপত্তি উত্থাপন করে, কিন্তু তাহার কোন আপত্তিতেই তাহারা অধস্তন জজের প্রতীতি জন্মাইতে না পারাতে, তিনি বাদীকে উক্ত সমুদায় মৌজায় তাহার পত্তনী স্বত্বের ডিক্রী দেন, এবং তাহাকে তাহাতে দখল দিবার হুকুম দেন।

আপীলে প্রতিবাদী নিম্নলিখিত হেতু গুলি উত্থাপন করে :—

১। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারার বিধান অনুসারে উক্ত সম্পূর্ণ মৌজা বা অন্ততঃ, ৭২৲ বিঘা সম্বন্ধে নালিশ চলিতে পারে না।

২। ২ ধারা মতে, মোকদ্দমা চলিবার বাধা না হইলেও পূর্ব্বের মোকদ্দমায় বাদীর পত্তনীর দাবীর বিরুদ্ধে যে নিষ্পত্তি হয়, তাহা এ মোকদ্দমার সম্পূর্ণ দাবী সম্বন্ধে অথবা উক্ত ৭২৲ বিঘা সম্বন্ধে চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।

৩। এ মোকদ্দমার প্রমাণ দ্বারা উক্ত পত্তনী সাব্যস্ত হয় না।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল প্রথমতঃ, আপীলের প্রথম দুই হেতুর উপরে তর্ক করেন। মোকদ্দমার এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার তর্ক শেষ হইলে, নালিশের আরজীতে নালিশের যে হেতু বর্ণিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে বিবেচনায়, বাদী এ মোকদ্দমায় কি হেতুর উপর নালিশ করে, তাহা নিশ্চয় রূপে নির্দ্ধারণ করা আমরা আবশ্যকীয় বিবেচনা করি।

এই বিষয় সম্বন্ধে রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলের তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া, বাদীর বিরুদ্ধে কালেক্টরের নিকট যে কার্য্য হয়, তাহা হইতে সে কি প্রকারে নালিশের হেতু উত্থিত হওয়া স্থির করে, তাহা আমরা এখনও বুঝিতে পারিলাম না। তর্ক হইয়াছে যে, উক্ত কার্য্য দ্বারা ঐ সম্পূর্ণ মৌজায় তাহার পত্তনী-স্বত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে; প্রকারান্তরে তাহাই বটে; কারণ, পত্তনী প্রদত্ত হইয়া থাকিলে, জমাই-স্বত্ব আর থাকিত না; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা হইয়াছে, তাহা দেখিলে, তাঁহাতে কোন নালিশের কারণ হয় না। যদি পূর্ব্বের মোকদ্দমা না হইত, এবং কালেক্টরের নিকট যে মোকদ্দমা হয়, তাহাই যদি প্রতিবাদি-কর্তৃক বাদীর পত্তনী অস্বীকারের প্রথম কার্য্য হইত, তবে কেবল ঐ কার্য্য হেতু বাদীর পত্তনী-স্বত্ব সাব্যস্তের মোকদ্দমা চলিতে পারিত কি না, তাহা আমাদের এক্ষণে মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই। যে স্থলে প্রজা এক প্রকার স্বত্ব অনুসারে ভূমি ভোগ করিবার দাবী করে, এবং তাহার ভূম্যধিকারী উক্ত স্বত্ব অস্বীকার করিয়া এমত আর এক স্বত্ব উত্থাপন করে, যাহার সহিত উক্ত স্বত্ব অসংলগ্ন হয়, সে স্থলে উক্ত কার্য্য ভূম্যধিকারি-কর্তৃক প্রজাকে দাবী-কৃত স্বত্ব হইতে বেদখল করার কার্য্য হয়, এবং তাহাতে নালিশের কারণ উপস্থিত হয় বলা যাইতে পারে; কিন্তু ইহাও আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উপস্থিত স্থলে সিংহেরা হৃদয়নাথকে পত্তনী দেওয়ায় এবং তাহার পরে হৃদয়নাথ বৃক্ষাদি ছেদন করায় বাদীর পত্তনীর স্বত্ব পূর্ব্বেই অস্বীকৃত হইয়াছে; এবং বাদী তাহা বেদখলের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পূর্ব্বের মোকদ্দমায় সিংহদিগকে হৃদয়নাথের সহিত প্রতিবাদি-শ্রেণী-ভুক্ত করাতেই স্পষ্ট দেখা যায় সে নিজেও ঐ রূপই বুঝিয়াছিল। এবং যদিও ভূম্যধিকারী বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করায় তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশের কারণ হইতে পারে, তথাপি তাহা যত বারই অস্বীকার করা হইয়া থাকুক না কেন, তাহাতে কেবল একটি নালিশের কারণ হইতে পারে।

আমাদের বিবেচনায় এ সকল কেবল পারিভাষিক কথা নহে; তমাদীর নিয়ম এবং দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২ এবং ৭ ধারা প্রয়োগার্থে তাহা বিশেষ রূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক।

অতএব বাদীর নালিশের কারণ নাই, এই হেতুবাদে আমরা এই মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করিতে বাধ্য।

এ স্থলে ইহাও স্পষ্ট বুঝা আবশ্যক যে, বাদী যদি দেখাইতেও পারিত যে, তাহার পূর্ব্বের নালিশের কারণ হইতে এই নালিশের স্বতন্ত্র কারণ ছিল, তথাপি পূর্ব্বের নিষ্পত্তি দ্বারা যে, বাদী বারিত নহে, এমত আমরা বলিতে পারিতাম না। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক শুনিয়া, মান্দ্রাজের হাইকোর্টের ১ম ভাগের রিপো-

র্টের ২৪৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মহিয়দ্দীন বঃ মহম্মদ ইব্রাহিমের যে মোকদ্দমা এই মোকদ্দমার সহিত ঐক্য হইতেছে, তাহাতে উক্ত আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ ঐক্য হইলাম। যে ভূমির প্রতি এক্ষণে দাবী হইয়াছে এবং যে ভূমি বাদী পূর্ব্বের মোকদ্দমায় পাইবার প্রার্থনা করে, এ সমুদায়ই এক স্বত্ব অনুসারে ভোগ করা হয়।

পূর্ব্বের মোকদ্দমায় বাদীর সম্পূর্ণ পত্তনী স্বত্বের প্রশ্ন উপস্থিত এবং নিষ্পন্ন হইয়াছিল; এবং সেই স্বত্ব অনুসারে যে কোন ভূমি দখল করা হউক তৎসম্বন্ধে আমরা উক্ত নিষ্পত্তি এই পক্ষগণের মধ্যে চূড়ান্ত জ্ঞান করি। অতএব এই হেতুবাদেও আমাদের বিবেচনায়, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া উচিত।

এমত অবস্থায়, উল্লিখিত হেতু সম্বন্ধে প্রমাণ দেখিবার আবশ্যক নাই। আমাদের বিবেচনায়, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হওয়া উচিত। এই নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে, এবং বাদী উভয় আদালতের খরচা দিবে। (ব)

---

১৭ ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

## বিচারপতি জি, লক এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফ-আদালতের উকীল বাবু রামকিঙ্কর সেন সম্বন্ধে ঢাকার জজের এস্তমেজাজ।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, মহেশচন্দ্র চৌধুরী এবং চন্দ্রমাধব ঘোষ দরখাস্তকারীর উকীল।

**চুম্বক।**—যে অভিযোগ ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারা অনুসারে বিচারিত হয় তাহাতে অধঃস্থ আদালতের যদি এই অভিপ্রায় হয় যে, অভিযুক্ত উকীলকে মুক্তি দেওয়া উচিত, তবে আর জেলার জজের নিকট ঐ আদালতের রিপোর্ট করিবার আবশ্যক রাখে না।

**বিচারপতি লক।**—আমার বিবেচনায়, আদালত এ মোকদ্দমায় জজের এস্তমেজাজ অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না।

জজের নিকট আপীলে, তিনি বাবু রামকিঙ্কর সেন উকীলের আচরণ অতি অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া নারায়ণগঞ্জের মুন্সেফকে ১৮৬৫ সালের ২০ আইন অনুসারে রামকিঙ্কর সেনের নিকট হইতে এই অভিযোগের জওয়াব গ্রহণ করিতে আদেশ করেন যে, "তাহার, অর্থাৎ রামকিঙ্করের নিজের "প্রদর্শন মতেই প্রকাশ যে, সে যে বিক্রয়-কবলা "প্রতারণামূলক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহা "সে দাখিল করিয়াছে।" ঐ অভিযোগ ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ১৬ ধারার বিধানমতে উপস্থিত এবং বিচারিত হয়, এবং মুন্সেফ উক্ত উকীলের জওয়াব গ্রহণানন্তর এই মত ব্যক্ত করেন যে, তাহাকে খালাস দেওয়া উচিত। এমত অবস্থায়, উক্ত ধারার মর্ম্মানুসারে জজের নিকট ঐ মুন্সেফের রিপোর্ট করিবার আবশ্যক ছিল না, কারণ, যে স্থলে নিম্ন আদালত অভিযোগ সাব্যস্ত হইয়াছে বিবেচনা করেন, এবং অপরাধীকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত রাখিতে বা পদচ্যুত করিতে অনুরোধ করেন, সেই স্থলেই কেবল তাঁহাকে প্রধানতম বিচারালয়ের বিবেচনার্থে জেলার জজের হস্তে রিপোর্ট অর্পণ করিবার আবশ্যক হয়।

যে প্রকারের দালীলের কথা বলা হইয়াছে তাহা লেখা উক্ত উকীলের নিশ্চয়ই অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু যখন সাক্ষী স্বরূপে শপথ পূর্ব্বক তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়, তখন সে যাহা তাহার নিজের বিরুদ্ধে বলে, তাহা উপলক্ষ করিয়া উপস্থিত স্থলে তাহাকে ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের লিখিত কোন দণ্ড দেওয়া আমার মতে উচিত নহে।

জজ প্রধানতম বিচারালয়ে যে রিপোর্ট পাঠান তাহাতে, রামকিঙ্করের প্রতি কি দণ্ড দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা, তাহা তিনি বলেন না। আমরা উক্ত উকীলকে, আপন কর্ম্মে পুনঃপ্রবেশ করিতে আদেশ করিলাম।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

---

২০ এ ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

## বিচারপতি জি লক এবং এ জি ম্যাক্‌ফার্সন।

যশোহরের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য সদর আমীনের ১৮৬৭ সালের ৬ ই আগষ্টের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৮ সালের ১৯ এ নবেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

১৮৬৯ সালের ৩৪০ নং মোকদ্দমা।

মদনমোহন মজুমদার (বাদী) আপেলাণ্ট।

পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও বংশীধর সেন, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস, ভগবতীচরণ ঘোষ এবং ভবানীচরণ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

১৮৬৯ সালের ৩৭১ নং মোকদ্দমা।

পূর্ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

মদনমোহন মজুমদার প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস এবং মতিলাল মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং বংশীধর সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কালেক্টর ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ এবং ১২ ধারা অনুসারে যে কার্য্য করেন, তদ্বিরুদ্ধ নালিশে তাঁহাকে কোন পক্ষ না করা হইলেও, দেওয়ানী আদালতে ঐ নালিশ চলিবে।

যে স্থলে কালেক্টরীর তৌজী-লিখিত মালিক স্বতন্ত্র হিসাব খুলিবার নিমিত্ত কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে, এবং উক্ত দরখাস্তের প্রতি ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের মর্ম্মানুসারে আপত্তি হয়, অথবা কালেক্টর বিবেচনা করেন যে, রীতিমত আপত্তিই করা হইয়াছে; সে স্থলে তাঁহার ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার আর অধিকার থাকে না; পক্ষগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইতে বলা কালেক্টরের উচিত।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।—আমাদের বিবেচনায়, এই উভয় আপীলই খরচা সমেত ডিস্‌মিস হওয়া উচিত। ৩৪০ নং আপীল সম্বন্ধে জজের ইহা স্থির করা উচিতই হইয়াছে যে, কালেক্টরের যে হুকুম অন্যথা করা এই মোকদ্দমার উদ্দেশ্য, সেই হুকুম যখন ১৮৬০ সালে প্রদত্ত হয় তখনই বাদীর নালিশের কারণ জন্মে। দেখা যায়, যে উক্ত হুকুম রীতিমতেই প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং বাদী যে মালিকের অধীনে দাবী করে, সেই মালিকের নিকট হইতে যে ফকীরচাঁদ কট গ্রহণ করে, তাহার নাম তখন রেজিষ্টরীতে থাকায় এবং তদ্দ্বারা কটগৃহীতাই তৌজী-লিখিত মালিক হওয়ায় প্রকৃত মালিকের আপন নাম রেজিষ্টরীতে থাকিলে বাদী যেরূপ বাধ্য হইত, ইহাতেও সে সেইরূপ বাধ্য। এই মোকদ্দমা কালেক্টরের হুকুমের পর ৭ বৎসরের অধিক কাল গতে উপস্থিত হওয়াতে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি মতে তমাদী দ্বারা বারিত হইয়াছে।

৩৭১ নম্বর আপীল সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে মোকদ্দমা হইতে তাহা উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে যে হুকুম অন্যথা করিবার প্রার্থনা হয়, সেই হুকুমের তারিখের পর, ৬ বৎসরের মধ্যে, ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব ইহা কালাতিপাত দোষে বারিত হয় নাই। তর্কিত হইয়াছে যে, কালেক্টর ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১১ এবং তৎপরবর্ত্তী ধারা সমস্ত অনুসারে যে কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা চলিবে না। কিন্তু এরূপ মোকদ্দমা যে চলিবে না, তাহার বিধান কোন স্থানেই নাই, এবং আমার মতে, তাহা চলিবে; যদিও কালেক্টরের বিরুদ্ধে এবং তাঁহার উপর প্রবল কোন ডিক্রী পাইলে তাহা অধিক ফলোপধায়ক হয় বটে, কিন্তু

কালেক্টর মোকদ্দমার কোন পক্ষ না থাকিলেও তাহা চলিবে।

এ মোকদ্দমায় আমার বিবেচনায়, জজের এমত স্থির করা উচিতই হইয়াছে যে, কালেক্টরের কার্য্যে এরূপ অনিয়ম হইয়াছে, যাহাতে তাহা কলুষিত হইয়াছে, কারণ, আমার মতে, প্রস্তাবিত হিসাব পৃথক্ করিবার প্রতি আপত্তি রেজিষ্টরী-লিখিত মালিক কর্ত্তৃক বা তাহার পক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল; অতএব কালেক্টরের উক্ত কার্য্য স্থগিত রাখিয়া পক্ষগণকে দেওয়ানী আদালতে যাইতে বলা উচিত ছিল। তর্ক করা হইয়াছে যে, যে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়াছে তাহার প্রতি বাস্তবিক কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই। কিন্তু কালেক্টর বিবেচনা করেন যে, আপত্তি হইয়াছিল, এবং তিনি স্বয়ং তাহার মীমাংসা করেন।

দেখা যায় যে, অগ্রে পূর্ণচন্দ্র ১৮৫৯ সালের ১৪ ই আগষ্ট তারিখে স্বতন্ত্র হিসাবের প্রার্থনা করে, কিন্তু উক্ত দরখাস্ত (কোন্ তারিখে প্রকাশ নাই) এই বলিয়া নথী-খারিজ হয় যে, দরখাস্তকারীর নাম রেজিষ্টরীতে নাই। ১৮৬০ সালের ১২ ই অক্টোবর তারিখে কটগৃহীতা ফকীরচাঁদ যাহার নাম রেজিষ্টরীতে ঐ অংশের মালিক স্বরূপে লেখা আছে, তাহার বিধবা স্ত্রী আহ্লাদ মণি ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১২ ধারা অনুসারে এক আপত্তির দরখাস্ত করে। এই দরখাস্তের প্রতি হুকুম হয় যে, তাহা নথী সামিল করা হয়। ১৮৬১ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পূর্ণচন্দ্র তাহার নাম রেজিষ্টরী করাইয়া পুনরায় পৃথক্ হিসাবের জন্য দরখাস্ত করে। রীতিমত নোটিস জারী হয়, কিন্তু আর কোন নুতন আপত্তি হয় না। কালেক্টর বিবেচনা করেন যে, আহ্লাদমণির আপত্তি তখনও উপস্থিত ছিল, এবং তাহা পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় দরখাস্তের সহিত সম্বন্ধ রাখে; অতএব তিনি আহ্লাদমণির দরখাস্ত তলব দিয়া, সে পূর্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় দরখাস্তের প্রতি আপত্তি করিয়াছে এমত জ্ঞান করত আহ্লাদমণির অসাক্ষাতে ঐ আপত্তির মীমাংসা করেন, এবং এই নিষ্পত্তি করেন যে, উক্ত আপত্তি সত্ত্বেও পূর্ণচন্দ্র স্বতন্ত্র হিসাবের যে প্রার্থনা করে তাহা মঞ্জুর হইবে।

আমার বোধ হয় যে, আহ্লাদমণি রীতিমত আপত্তি না করাতেও কালেক্টর তাহা করা হইয়াছে বিবেচনা করেন, এবং সেই রূপেই তাহা ব্যবহার করেন; অতএব এক্ষণে আমাদের স্থির করিতে হইবে যে, প্রকৃতার্থে ১১ আইনের ১২ ধারার মর্ম্মানুসারে উক্ত দরখাস্তের প্রতি আপত্তি হইয়াছিল। এমত অবস্থায়, কালেক্টরের যখন বিশ্বাস ছিল যে, আপত্তি করা হইয়াছে, তখন, তিনি যেরূপে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা ১২ ধারা অনুসারে তাঁহার করিবার অধিকার ছিল না।

অতএব আমরা এতদ্বিষয়ে নিম্ন আপীল-আদালতের সহিত ঐক্য হইলাম যে, কালেক্টরের কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ এবং প্রথম আদালতের বাদীকে ডিক্রী দেওয়া উচিতই হইয়াছে। (ব)

১৭ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২০৯ এবং ২১০ নং মোকদ্দমা।

বিচারপতি জি, লক, এবং এফ, এ, গ্লবর ১৮৬৯ সালের ২২ এ মে তারিখে ১৮৬৮ সালের ৪২২ এবং ৪২৩ নং মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারে * যে রায় দেন, তৎসম্বন্ধে পুনরায় বিচারের প্রার্থনা।

মসম্মত বাপ্ত জান প্রভৃতি (বাদিনী) দরখাস্তকারী।

চৌধুরী জহুরল হক্ এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) প্রতিপক্ষ।

মেং জে, ডবলিউ, বি, মণি বারিষ্টর এবং আর, ই, টুইডেল ও বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ

* ৪র্থ ভাগ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ৫৭৫ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

এবং মুন্সী মহম্মদ ইউছফ দরখাস্ত-
কারীর উকীল।

মেং সি, গ্রেগরি, প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—বাদিনীকে ডিক্রী দেওয়ার পর প্রতিপক্ষ পুনর্ব্বিচারে উক্ত ডিক্রী অন্যথা করায় এবং বাদিনীর মোকদ্দমা তমাদী দ্বারা বারিত বলিয়া স্থির হয়। ইহাতে বাদিনী, প্রথম নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের মিয়াদ অতীত হওয়া সত্ত্বেও সে এই বলিয়া উভয় নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারার্থে দরখাস্ত করে যে, প্রথম ডিক্রীর দ্বারা তাহার ক্ষতি না হওয়ায় দ্বিতীয় ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিবার কোন আবশ্যক ছিল না।

এমত স্থলে বাদিনী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৭৬ ধারা অনুসারে উক্ত আপত্তি করিতে পারে।

এ দেশে কোন ব্যক্তি উইল অনুযায়ী বিত্তাধিকারী হইবার পূর্ব্বে তাহার ঐ উইলানুযায়ী অছিয়ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহে।

বিচারপতি লক।—আমরা ১৮৬৯ সালের ২২ এ মে তারিখে যে ডিক্রী দেই তাহার, এবং এই মোকদ্দমায় ১৮৬৮ সালের ১১ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে আদালতে দাখিলী উইলের অর্থ সম্বন্ধে যে রায় দেই তাহার, পুনর্ব্বিচারার্থে আমাদের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে।

আমাদের ১৮৬৯ সালের ২২ এ মে তারিখের রায়ের পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা মিয়াদ মধ্যেই হইয়াছে, কিন্তু তাহা ১৮৬৮ সালের ১১ ই সেপ্‌টেম্বরের রায় সম্বন্ধে মিয়াদ অতীত হইবার পরে হইয়াছে। মণি সাহেব দরখাস্তকারীর পক্ষে তর্ক করেন যে, যখন ঐ মোকদ্দমা ১৮৬৮ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে আদালতে উপস্থিত ছিল, তখন যদিও তাহার বিরুদ্ধে কোন ইসুর নিষ্পত্তি হয়, তথাপি ঐ তারিখের ডিক্রীতে তাহার সমস্ত প্রার্থনাই পূরণ করা হয়; সুতরাং তখন যে ডিক্রী দেওয়া হয় তাহাতে তাহার ক্ষতি না হওয়ায় তখন তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিবার আবশ্যক ছিল না, কারণ, দরখাস্তকারী যাহার প্রার্থনা করে সে যখন তাহা পায়, তখন দুই এক প্রশ্ন সম্বন্ধে রায়ের হেতু শুদ্ধ হউক বা অশুদ্ধ হউক, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না; এবং যখন আদালত প্রতিপক্ষের দরখাস্ত মতে ঐ রায়ের পুনর্ব্বিচারে উক্ত ডিক্রী অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২২ এ মে তারিখে বাদিনীর মোকদ্দমা তমাদীর আইন দ্বারা বারিত প্রকাশে আর এক ডিক্রী দিয়াছেন, তখনই দরখাস্তকারিগণ এই আদালতের ডিক্রী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এবং সেই জন্য আইন অনুসারে উভয় রায়ের পুনর্ব্বিচারার্থে তাহারা আদালতে প্রার্থনা করিতে পারে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৭৬ ধারার শব্দ এই:—"সদর আদালতের ডিক্রী দ্বারা যদি কোন "ব্যক্তি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত জ্ঞান করে "ইত্যাদি, এবং অন্য কোন উত্তম ও মাতব্বর "কারণে যদি ঐ ব্যক্তি আপন বিরুদ্ধ নিষ্পত্তির "পুনর্ব্বিচার হইবার ইচ্ছা করে, তবে যে আদালত "ঐ ডিক্রী দিয়াছেন, সেই আদালতের দ্বারা "ঐ পুনর্ব্বিচার হইবার প্রার্থনা করিতে পারে।" এই শব্দগুলি মণি সাহেবের তর্কের পোষকতা করে। অতএব আমরা তাঁহাকে প্রতিপক্ষের আপত্তির অধীনে সওয়াল-জওয়াব করিতে দিলাম।

তর্ক করা হইয়াছে যে, বন্দাআলীর সম্বন্ধে আদালতের এমত বিবেচনা করা অন্যায় হইয়াছে যে, সে তাহার সন্তানগণের দায়াধিকারী এবং অভিভাবক স্বরূপে বিরোধীয় সম্পত্তি ভোগ করে, মেহেন্দী-আলীর উইলের এক্‌জেকিউটর স্বরূপে নহে; এবং আদালতের ইহাও অনুমান করা ভ্রম যে, আহমেদী বেগমের মৃত্যুর পর বন্দাআলী ও তাহার পুত্রগণ ঐ বেগমের দায়াদস্বরূপে সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, কারণ, প্রথমতঃ, উক্ত উইলের সর্ত্ত সকল তখনও প্রবল ছিল, কারণ, ঐ উইলের সর্ত্ত অনুসারে এক মৃত পুত্র এবং মৃত কন্যার যে সকল সন্তান ছিল তাহাদের উপায়ের বিধান করার আবশ্যক ছিল এবং তাহাতে এক জন চাকরের যাবজ্জীবন ভরণপোষণেরও আদেশ ছিল, এবং যদিও এই নালিশ উপস্থিতের সময়ে এই

সকল ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছিল, তথাপি এমত সপ্রমাণ হয় নাই যে, বন্দা-আলী-কৃত এই হস্তান্তরের পূর্ব্বে তাহাদের মৃত্যু হয়, এবং বাস্তবিক তাহারা জীবিত ছিল; অতএব বন্দা-আলীর অছিয়ত সমাপ্ত হইয়াছে বলিবার পূর্ব্বে এই মীমাংসা করা আবশ্যক যে, কখন্ এই সকল ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কারণ, যত দিন তাহারা জীবিত ছিল তত দিন ঐ অছিয়তও ছিল এবং বন্দা-আলীও অছি ছিল। পরন্তু, যে সকল দলীলদ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, তাহা এবং এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদিগণের জওয়াব হইতে প্রকাশ যে, বন্দাআলী তাহা একজিকিউটর স্বরূপেই হস্তান্তর করে, সুতরাং প্রতিবাদিগণেরই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহারা যে তাহার নিকট হইতে ক্রয় করে তাহা দখীলকার উত্তরাধিকারীর নিকটে ক্রয়ের তুল্য। তৃতীয়তঃ, বলা হইয়াছে যে, বন্দাআলী কোন কার্য্য দ্বারা উক্ত সম্পত্তি একজেকিউটর স্বরূপে নিজের নিকট হইতে নিজেকে বা অন্য কাহাকে দায়াধিকারী এবং উইলক্রমে বিষয়াধিকারী বলিয়া হস্তান্তর না করিলে, আপন অছিয়ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে না, এবং এই তর্কের পোষকতায় আমাদিগকে উইলিয়মের উইল সম্বন্ধীয় গ্রন্থ হইতে কয়েকটি বাক্য দর্শান হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে যে, আদালতের একটি বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্নের, যথা বাদিনীগণের বয়ঃক্রমের বিষয়ের, মীমাংসা করিতে ভ্রম হইয়াছে, কারণ, নথীতে এমত কোন প্রমাণ নাই যে, তাহাদের পূর্ব্বের নালিশের আরজীতে যে বয়স লেখা ছিল তাহাই শুদ্ধ, অতএব মোকদ্দমা তমাদী দ্বারা বারিত বলিবার পূর্ব্বে আদালতকে তাহা এই জন্য ফেরৎ পাঠান উচিত যে, নিম্ন আদালত প্রমাণ গ্রহণ করিয়া ঐ বিষয় স্থির করেন।

এই দরখাস্তের পোষকতায় যে সকল তর্ক হইয়াছে তাহা উচিত মত বিবেচনা করিয়া আমাদের বোধ হইতেছে যে, তাহা গ্রহণ করিবার কোন হেতু নাই। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করণার্থে এই নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক যে, যখন বন্দাআলী হস্তান্তর করে, তখন সে কি ভাবে ছিল। সে কি তখনও একজেকিউটর ছিল, না সে ঐ সম্পত্তি তাহার স্ত্রীর দায়াধিকারী এবং সেই স্ত্রীর গর্ভজাত নাবালগ পুত্রদিগের অভিভাবক স্বরূপে পাইয়াছিল? মোকদ্দমা ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রবণের কালে এ আপত্তি করা হয় নাই যে, বন্দাআলীর উক্ত হস্তান্তর করিবার সময় তাহার কোন দায় অনির্ব্বাহিত ছিল। সেই সময়েই বাদিনীগণকে দেখান উচিত ছিল যে, ঐ সকল দায় তখনও ছিল, এবং বন্দাআলী ঐ সকল বিত্ত বা তাহার কোন কোন বিত্ত হস্তান্তর করিবার সময়ে মেহন্দী-আলীর মৃত পুত্র ও কন্যার সন্তানেরা এবং যে সকল চাকরের নামে উইল করা হয় তাহারা জীবিত ছিল। কিন্তু এরূপ কোন আপত্তি করা হয় নাই। উভয় পক্ষই স্বীকার করে যে, তাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এবং তখন তাহাদের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয় নাই, এবং আমরা বিবেচনা করি, এই প্রশ্ন উপস্থিত করিবার, এবং এতৎ সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণার্থে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইবার জন্য আদালতে প্রার্থনা করিবার আর সময় নাই। বন্দা-আলী কর্ত্তৃক হস্তান্তরের সময় উইল-লিখিত সমুদায় আদেশ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল; এবং আমাদিগকে তদ্বিরুদ্ধে কিছু দেখান হয় নাই বিবেচনায় আদালত জজ হইতে ভিন্ন অভিপ্রায় করেন এবং এই বিবেচনা করেন যে, বন্দা-আলী তখন আর অছি ছিল না, দায়াদ-স্বরূপে তাহার নিজের পক্ষে এবং তাহার নাবলগ পুত্রগণের অভিভাবক বলিয়া দখীলকার ছিল। অতএব এমত প্রয়োজন ছিল কি না, যাহাতে অভিভাবক স্বরূপে তাহার নাবালগ পুত্রগণের সম্পত্তি তাহার বিক্রয় করা ন্যায্য হইতে পারে, এই প্রশ্ন বিচার্য্য ছিল, এবং এবিষয়ে তখন আমরা যে মত স্থির করি, এখনও আমাদের সেই মত।

যে সকল দলীল দ্বারা সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল তাহাতেই প্রকাশ যে, বন্দা-আলী অছি স্বরূপে ঐ সমস্ত দলীল লিখিত পড়িত করে, একথা শুদ্ধ নহে, কারণ, একখানা দলীল ব্যতীত আর সমুদায়ই সে দখীলকার দায়াদ ও তাহার নাবালগ পুত্রগণের অভিভাবক স্বরূপে লিখিয়া দেয়।

সে অছি স্বরূপে যে দলীল লিখিয়া দেয় তৎসম্বন্ধে বিধিমত প্রয়োজনে উক্ত হস্তান্তর হইয়াছে সপ্রমাণ হওয়ায়, তদন্তর্গত সম্পত্তিতে বাদিনীর দাবী ডিস্‌মিস্ হইয়াছে। কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, সকল ক্রেতা এবং পাট্টাগৃহীতাগণই বন্দা-আলীকে অছি স্বরূপে ব্যবহার করে এবং এই বিশ্বাস করে যে, সে তাহাদের সহিত সেই ভাবেই কার্য্য করে, এবং মেহেন্দী-আলীর দেনা পরিশোধার্থে টাকা উঠাইবার জন্যই সে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোন দেনা ছিল না। আমরা বিবেচনা করি, প্রতিবাদিগণ এমোকদ্দমায় যাহা কিছু বলিয়া থাকিতে পারে তাহাতে বন্দা-আলীর অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সে দায়াদ-স্বরূপেও তাহার সন্তানগণের অভিভাবক স্বরূপে দখীলকার থাকিয়া থাকিলে, এবং যে সকল দলীল সে লিখিত পড়িত করে তাহাতে তাহাকে তাহাই বলা হইয়া থাকিলে, প্রতিবাদিগণ যাহা কিছু বলিয়া থাকে তাহাতে ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না।

আমরা বিবেচনা করি, মণি সাহেব যে প্রণালী দর্শাইয়াছেন, যদ্দ্বারা ইংলণ্ডে কোন ব্যক্তি উইলানুসারে বিত্তাধিকারী হওয়ার পূর্ব্বে আপন অছিয়ত পরিত্যাগ করিতে আইনানুসারে বাধ্য হয়, তাহা কিছুতেই এদেশে প্রযুজ্য নহে, বা প্রয়োগ করিবারও কোন আবশ্যক নাই, কারণ, এখানে সহজ প্রণালী অবলম্বিত হইয়াথাকে।

বাদিনীগণের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালতের বিচার করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল। বাদিনীগণ নালিশের প্রথম যে আরজী দাখিল করে, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য হয়, তাহাতে তাহারা তাহাদের বয়সের যে কথা বলে, তাহা হইতেই আদালত তাহাদের বয়স স্থির করেন। বাদিনীগণের উকীলকে এই দরখাস্ত দেখান হয়, এবং তিনি তাহার কোন উত্তর দিতে পারেন না, এবং উক্ত বর্ণনা যে অশুদ্ধ তাহাও দেখাইতে চেষ্টা করেন না। এক্ষণে বলা হইতেছে যে, উক্ত আরজী এই বলিয়া অগ্রাহ্য হয় যে, তাহাতে বাদিনীগণের বয়স শুদ্ধ রূপে বর্ণিত হয় নাই। উক্ত আরজী বাস্তবিক এই বলিয়া অগ্রাহ্য হয় যে, কোন কোন তারিখ, এবং বাদিনীগণের মধ্যে এক জনের বয়স, শুদ্ধরূপে বর্ণিত হয় নাই বলিয়া আপত্তি হইয়াছে; এবং তাহাদিগকে নূতন আরজীতে স্পষ্টরূপে শুদ্ধ তারিখ এবং বয়স লিখিয়া দিতে বলা হয়। তাহারা নূতন আরজী দাখিল করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের প্রত্যেকের বয়স্ লিখিতে অস্বীকার করে, সুতরাং তাহাতে আদালত কেবল এই অনুভব করিতে পারেন যে, তাহারা তাহাদের পূর্ব্বের আরজীতে যে বয়স লিখিয়া দিয়াছিল তাহাই শুদ্ধ; এবং প্রথম আদালত যাহা জানিতে চাহেন তাহা তাহারা এই কারণে জানায় না যে, তাহা তাহাদের মোকদ্দমার অনিষ্টকর হইবে। অতএব এতদ্বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিতে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইবার কোন আবশ্যক নাই; সুতরাং আমরা এই পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা খরচা সমেত অগ্রাহ্য করিলাম। (ব)

### ১৭ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

### বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৯২৯ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের অধঃস্থ জজ কেণ্ডারার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৪ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২২ এ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গদাধর চট্টোপাধ্যায় ( মোজাহেমদার
প্রতিবাদী ) আপেলাণ্ট।

রাজকৃষ্ণ রায় ( বাদী ) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং যাদবচন্দ্র
শীল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—প্রতিবাদী পণের টাকা লইয়া বিক্রয়-কবালা লিখিয়া না দেওয়ায় তাহার চুক্তি প্রবল করিবার নালিশে তৃতীয় পক্ষ এই বলিয়া মোজাহেম দেয় যে, ঐ সম্পত্তি পরে তাহাকে বিক্রয় করিয়া কবালা রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রথম আদালত উক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন, কিন্তু নিম্ন আপীল-আদালত বাদীকে উক্ত উভয় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দেন।

স্থির হইল যে, মোজাহেমদারকে নথীস্থ করা এবং তাহার ও আর আর পক্ষগণের মধ্যে ইসু করিয়া তাহার বিচার করা অনিয়মিত কার্য্য।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এ মোকদ্দমায় রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীশচন্দ্র নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই এক চুক্তি প্রবল করার দাবীতে নালিশ করে যে, সে বাদীর নিকট কোন সম্পত্তি বিক্রয় করিবার করার করে; কিন্তু পণের টাকা লইয়া ( যে রূপ কথিত হইয়াছে ) বিক্রয়-কবালা লিখিয়া দিতে অসম্মত হয়। অতএব তাহার প্রার্থনা এই যে, উক্ত বিক্রয়-কার্য্য প্রবল করণার্থে তাহাকে ডিক্রী দেওয়া হয়।

তাহাতে গদাধর চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি এই বলিয়া মোজাহেম দেয় যে, তাহাকে পরে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়া কবালা রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এবং তর্ক করে যে, রেজিষ্টরীর আইন অনুসারে তাহার রেজিষ্টরী-কৃত বিক্রয়-কবালা বাদি-প্রতিবাদীর মধ্যে যে চুক্তি হয় তদপেক্ষা প্রবল, অতএব তাহার প্রার্থনা এই যে, এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়।

প্রথম আদালত উক্ত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন, কিন্তু অধঃস্থ জজের নিকট আপীলে উক্ত নিষ্পত্তি অন্যথা হয়, এবং বাদীকে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এবং এই হেতুবাদে, গদাধর চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া হয় যে, বাদীর সহিত প্রতিবাদীর পূর্ব্বের চুক্তির বিষয় গধাধর উত্তমরূপে জানিত এবং সে যাহা জানিয়া ক্রয় করিয়াছে তাহা দ্বারা সে বাধ্য।

গদাধর ( যে আপনাকে মোজাহেমদার-প্রতিবাদী বলে ) যে হেতুবাদে মোজাহেম দেয় সেই হেতুবাদেই সে ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আমাদের নিকট আপীল করিয়াছে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই প্রতিবাদীকে নথীস্থ করা এবং তাহার ও মোকদ্দমার আর আর পক্ষের মধ্যে ইসুর বিচার করা সম্পূর্ণ অনিয়মিত কার্য্য হইয়াছে। উক্ত নিষ্পত্তি বর্ত্তমান আকারে থাকিতে দিলে অত্যন্ত গোলমাল এবং অসুবিধা হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, গদাধরের দায়ে ডিক্রী হইতে খারিজ করিয়া এবং উক্ত ডিক্রী কেবল বাদীর অনুকূলে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কথিত বিক্রয়-পত্র লিখিয়া দিবার ডিক্রীর আকারে পরিণত করিয়া নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি আমাদের সংশোধন করা উচিত; কিন্তু যাহা গদাধরের সম্বন্ধে ঘটিয়াছে, তাহা যখন সম্পূর্ণ রূপে তাহারই অন্যায় হস্তক্ষেপের ফল, তখন তাহার এই সকল কার্য্যের সমুদায় খরচার ভার বহন করা উচিত। মূল প্রতিবাদীকে বিক্রয়-কবালা লিখিত পড়িত করিয়া দিবার আদেশ করিয়া উপযুক্ত ডিক্রী এই আদালতে প্রস্তুত হইবে। গদাধরের আপীল তাহার বিরুদ্ধে কেবল তাহার মোজাহেম সম্বন্ধে সমস্ত আদালতের খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমি সম্মত হইলাম। ( ব )

১৯ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।
বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং
এফ, এ গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ১০১ নং মোকদ্দমা।

পাটনার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

ফতে বাহাদুর (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

জানকী বিবী এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদিনী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মেং সি গ্রেগরি, এবং মুনসী মহম্মদ ইউছফ, আপেলাণ্টের
উকীল।

মেং আর টি এলেন এবং আর ই টুইডেল
ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—অবিভক্ত লাখেরাজ ভূমির কোন অংশ-ক্রেতার আপন ক্রীত অংশ ঐ ভূমির অন্যান্য শরীকগণ হইতে বাটোয়ারা করিয়া লইবার স্বত্ব আছে।

এরূপ স্থলে, ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে কালেক্টর বাটোয়ারা করিয়া দিতে পারেন না; কেবল দেওয়ানী আদালতেরই এরূপ বাটোয়ারা করিয়া দিবার ক্ষমতা আছে, এবং হয় মুনসেফ নচেৎ দেওয়ানী আদালতের কোন কর্ম্মচারি-দ্বারা ঐ বাটোয়ারা হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—এ আপীলে এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে যে, কোন অবিভক্ত লাখেরাজ ভূমির কোন অংশক্রেতা তাহার ঐ ক্রীত অংশের বাটোয়ারার জন্য আর আর শরীকগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে কি না। বাদিনী ঐ ভূমিসম্পত্তির ।/৭ আনা অংশ এক শরীকের নিকট ক্রয় করিয়া শরীকগণের মধ্যে বিবাদ হওয়ার এবং সেই বিবাদ হেতু ক্ষতি ও অসুবিধা হইবার আশঙ্কায় আর আর শরীকগণের নিকট হইতে ঐ অংশ বাটোয়ারা করিয়া লইবার প্রার্থনা করে।

লাখেরাজ সম্পত্তির এক শরীকের অংশ, আর আর শরীকগণের নিকট পৃথক্ করিয়া লইবার স্বত্ব প্রতিবাদিগণ অস্বীকার করে, এবং সাধারণতঃ এই আপত্তি করে যে, বাদিনীর নালিশের কারণ নাই।

অধঃস্থ জজ স্থির করেন যে, বাদিনী আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লইতে পারে। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপীল করে।

আমি বিবেচনা করি, নালিশের আরজীতে যে সকল ক্ষতি এবং অসুবিধার কথা লেখা হইয়াছে তাহা ঠিক কি প্রকারের এবং কি পরিমাণের ক্ষতি ও অসুবিধা, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও, বাদিনীর নালিশের প্রতি যে সকল পারিভাষিক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, আমরা তাহারই নিষ্পত্তি করিতে পারি, কারণ, যদি বাটোয়ারার অধিকারের প্রশ্ন বাদিনীর অনুকূলে নিষ্পন্ন হয়, তবে প্রতিবাদিগণ যে বাটোয়ারা করিয়া দিতে অস্বীকার করে, তাহাই নালিশের যথেষ্ট কারণ হইবে।

সাধারণ ইসু সম্বন্ধে আপেলাণ্ট আপত্তি করে যে, এমত কোন আইন নাই যে, লাখেরাজ সম্পত্তির যৌত মালিকগণকে বাটোয়ারায় সম্মতি দিতে বাধ্য করা যায়; তাহারা যেরূপে তাহাদের সম্পত্তি ভোগ করিয়া আসিয়াছে সেই রূপেই তাহারা তাহা ভোগ করিতে স্বত্ববান্; এবং বরাবর যেরূপ ঐ সম্পত্তির কর এজমালীতে আদায় হইয়া আসিয়াছে, বাদিনী কেবল তাহারই অংশ পাইবার স্বত্ব ক্রয় করিয়াছে।

আপেলাণ্টগণ আরো তর্ক করে যে, অধঃস্থ জজের ডিক্রী জারী হইতে পারে না, অতএব তাহা অসঙ্গত ডিক্রী; বাটোয়ারা করিবার জন্য আমীন পাঠাইতে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা নাই; এবং কালেক্টরই কেবল বাটোয়ারা করিতে পারেন।

এই আপত্তির পোষকতায় আমাদিগকে ভুক্ত-

সদর আদালতের এবং এই আদালতের অনেক নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে।

প্রথমতঃ, দিনাজপুরের কালেক্টর প্রতিবাদী, আপেলাণ্ট বনাম আনন্দময়ী চৌধুরিণী প্রভৃতি বাদিনী রেস্পণ্ডেণ্ট, ২২ এ জুলাই ১৮৫৭ সাল-সদর দেওয়ানী আদালত, রিপোর্ট, ১২৭৭ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তি। এ মোকদ্দমায় সদর আদালত স্থির করেন যে, "দশশালা বন্দোবস্তে "কোন শরীকী সম্পত্তির এজমালী মালিক-"গণের প্রতি যে সাধারণ দায়ের ভার "দেওয়া হইয়াছে, যদ্দ্বারা শরীকগণ তাহাদের "মধ্যে এক জনের ত্রুটিতে সমুদায় সম্পত্তি হারা-"ইতে পারে, তাহাই বাটোয়ারার আইনানুগত "স্বত্বের উপযুক্ত এবং প্রকৃত হেতু। কিন্তু "যে স্থলে ঐরূপ সাধারণ দায়িত্ব না থাকে, "এবং তাহা স্বতন্ত্র এবং নিরূপিত হইয়া, ঐ শরীক-"গণের দায়ের ন্যায় মালিকের দায় না থাকে, "তাহাতে আমাদের মতে, আর আর বিষয়ে "হয় এজমালীতে ভূমির কার্য্য নির্ব্বাহের অথবা "অংশ মত কর ভাগ করিয়া লইবার সাধারণ "স্বত্ব থাকিলে, ঐ প্রকারের মালিক আর আর "শরীকগণের নিকট হইতে ভূমি পৃথক এবং "বিভাগ করিয়া লইতে পারে না।"

আপেলাণ্টগণ এই বলিয়া তর্ক করে যে, যে ভূমির রাজস্ব গবর্ণমেণ্টে দেওয়া হয় তাহাতে যদি গবর্ণমেণ্টের সহিত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া শরীকগণ পরস্পরের রাজস্বের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়, এবং তন্নিবন্ধন তাহাদের বাটোয়ারা করিতে বাধ্য করার স্বত্ব বারিত হয়, তবে যে স্থলে সম্পত্তি লাখেরাজ হয় এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কোন কথাই না থাকে, সে স্থলে স্পষ্টই বাটোয়ারা করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

আমি বোধ করি, আমরা উপস্থিত মোকদ্দমায় এই নজীর উচিতমতে প্রয়োগ করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টে রাজস্ব-প্রদ সম্পত্তি, বাটোয়ারা সম্বন্ধে বিশেষ আইনের অধীন, এবং উক্ত বিচারপতিগণ তাঁহাদের সমীপস্থ মোকদ্দমার বিশেষ অবস্থা সকল (যে সকল অবস্থায়, পুরাতন আইন অনুসারে কোন এজমালী সম্পত্তির সমুদায় শরীক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্বন্ধে যে দায় ভোগ করিত, তাহা থাকে না) বিবেচনায় স্থির করেন যে, আর আর শরীকগণের সম্মতি ব্যতীত বাটোয়ারা করা যাইতে পারে না। উক্ত নিষ্পত্তি কেবল এক বিশেষ আইন অনুযায়ী, এবং আদালত উক্ত আইন সাধারণতঃ শরীকগণের অসুবিধা বা হানিজনক রূপে প্রয়োগ করিতে অস্বীকার করেন। উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা স্বতন্ত্র; এবং যে যুক্তিমতে বাটোয়ারার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে যদিও সদর আদালতের বিজ্ঞবর বিচারপতিগণের তর্ক গ্রহণ করা যাইতে পারে, তথাপি তাঁহাদের নিষ্পত্তি উপস্থিত মোকদ্দমার নজীর স্বরূপে দর্শান যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় যে নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে তাহা ৭ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৫১ পৃষ্ঠা-লিখিত দুর্গাকান্ত লাহিড়ী বনাম কালীমোহন গুহের মোকদ্দমায় হয়, এবং তাহাতে এই সংস্থাপিত হয় যে, যে সকল ভূমি এজমালীতে ভোগ করা হয়, এবং প্রত্যেক শরীক আপন আপন অংশের কর পায়, তাহা বাটোয়ারার আইন অনুসারে বিভক্ত হইতে পারে না।

এই নিষ্পত্তিও পূর্ব্বের মোকদ্দমার ন্যায় রাজস্ব-প্রদ সম্পত্তির সম্বন্ধেই হয়, এবং বাটোয়ারার আইনের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ রাখে। উক্ত জমিদারী অনেক তালুকে বিভক্ত হয়, এবং প্রত্যেক তালুকের রাজস্ব স্বতন্ত্র রূপে দেওয়া হয়। যে গতিকেই হউক, উপস্থিত মোকদ্দমার বাদিনী বাটোয়ারার আইন অনুসারে কোন বিভাগের প্রার্থনা করে না, এবং উক্ত আইনের কেবল রাজস্ব-প্রদ সম্পত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকায় এবং লাখেরাজ সম্পত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকায়, সে ঐ রূপ প্রার্থনা করিতেও পারে না।

তৃতীয় নিষ্পত্তি মুদ্রিত হয় নাই। ঐ মোক-

দ্দমা প্রধানতম বিচারালয়ে বিচারপতি মর্গ্যান এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত কোন এজমালী মালিকগণের জমিদারীর অবিভক্ত অংশের পত্তনীদারগণের বিবাদ সম্বন্ধে ১৮৬৫ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখে নিষ্পত্তি করেন। ঐ মোকদ্দমায় উভয় পত্তনীদারের অথবা পত্তনীদার ও জমিদারের মধ্যে বাটোয়ারা করিবার কোন চুক্তি না থাকায় স্থির হয় যে, এমত কোন আইন নাই যদনুসারে এক পত্তনীদার আর এক পত্তনীদারের বিরুদ্ধে বাটোয়ারার জন্য নালিশ করিতে পারে। এ মোকদ্দমায়ও ঐ জমিদারী রাজস্ব-প্রদ সম্পত্তি, এবং পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন জমিদারের অংশের পত্তনীদার, এবং উক্ত রায়ের যে অংশে বিচারপতিগণ বলেন যে, তাঁহারা ১৮১৪ সালের আইন (বাটোয়ারার আইন) ব্যতীত আর এমত কোন আইন থাকিবার বিষয় জানেন না, যদ্দ্বারা বাদী প্রতিপক্ষের কোন চুক্তি ব্যতীত, বাটোয়ারা করিতে বাধ্য করিতে পারে, এই অংশই কেবল আমাদের সমীপস্থ বিষয়ে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

আপেলাণ্ট যে আপত্তি করে যে, দেওয়ানী আদালতের স্বীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা বাটোয়ারা করিবার ক্ষমতা নাই, কালেক্টরের নিকট তাহা অর্পণ করিতে হইবে, কারণ, কেবল তাঁহারই তাহা করিবার উপায় আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের ১৮৫২ সালের সদর দেওয়ানী আদালত রিপোর্টের ৫৫০ পৃষ্ঠার লিখিত কীরতনাথ ওঝার মোকদ্দমা দর্শান হইয়াছে।

ঐ নিষ্পত্তি দ্বারা আমার বিবেচনায়, কিছুতেই আপেলাণ্টের সহায়তা হয় না। ঐ মোকদ্দমা রাজস্ব-প্রদ সম্পত্তির বাটোয়ারা করিতে কালেক্টরকে বাধ্য করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয়, এবং এই সংস্থাপিত হয় যে, এপ্রকারের মোকদ্দমায় মালসংক্রান্ত হাকিমগণের কর্তৃত্বের আবশ্যক। তাহাই আবশ্যক বটে, কারণ, রাজস্ব সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের লাভালাভ দেখিতে হয়, এবং উক্ত মোকদ্দমা ১৮১৪ সালের বাটোয়ারার আইনের অন্তর্গত হয়। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমার সম্পত্তি লাখেরাজ এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কোন লাভালাভ নাই। ঐ বিচারপতিগণ এমত সংস্থাপিত করেন নাই যে, বাটোয়ারার সমস্ত মোকদ্দমারই কেবল কালেক্টরের কর্তৃত্ব খাটিবে; কিন্তু তাঁহারা এই বলেন যে, যে সকল মোকদ্দমায় রাজস্বের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে তাহাতেই বাটোয়ারার বন্দোবস্ত কালেক্টরের করিতে হইবে।

পরিশেষে তর্কিত হয় যে, আমীন নিযুক্ত করিবার আইনে (১৮৫৬ সালের ১২ আইন) এই সকল কর্ম্মচারীকে বাটোয়ারা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, এবং দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২২৫ ধারায় কেবল কালেক্টরের দ্বারা সম্পত্তির বাটোয়ারা হইবার কথা বলা হইয়াছে।

আপেলাণ্টের আর আর আপত্তিতেও যে দোষ দেখা যায়, এই শেষ তর্কেও সেই দোষ আছে, কারণ, ইহাতেও যে সকল সম্পত্তির রাজস্ব দেওয়া হয় এবং যাহার রাজস্ব দেওয়া হয় না, তাহার মধ্যে প্রভেদ করা হয় নাই। ২২৫ ধারায় কেবল পূর্ব্ব প্রকারের সম্পত্তির কথা বলা হইয়াছে, এবং এরূপ তর্ক অসঙ্গত যে, আর কোন ধারায় অন্যান্য প্রকারের সম্পত্তি বাটোয়ারার বিধি নাই বলিয়া ঐ সকল প্রকারের সম্পত্তি কালেক্টরের দ্বারা ব্যতীত বাটোয়ারা হইতে পারিবে না।

এবং ১৮৫৬ সালের ১২ আইন সম্বন্ধে বোধ হয় উক্ত আইনের ৫ ধারার ২ প্রকরণে যাবতীয় আবশ্যকীয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, স্পষ্ট দেখা যায় যে, বাদিনী যে প্রতিকারের প্রার্থনা করে তাহার কোন লিখিত আইনানুগত প্রতিবন্ধক নাই। অতএব আমার বোধ হয় যে, সে তাহার শরীকগণের স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া, যে প্রকারে আপন ক্রীত সম্পত্তি ভোগ করা লাভ-জনক বোধ করে, সেই প্রকারেই তাহার তাহা ভোগ করিবার স্বভাব-সিদ্ধ স্বত্ব আছে। এ কথা ১২ বালম

উইক্লি রিপোর্টের ১১৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত শ্যামাসুন্দরী দেবী বনাম জার্ডিন স্কিনর এবং কোম্পনির মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ে বলা হইয়াছে। তাহাতে সংস্থাপিত হইয়াছে যে, "যাবতীয় এজমালী মালিকত্বের অবস্থায়" "প্রত্যেক শরীকের বাটোয়ারার দাবী করিবার" "এবং তাহা করাইয়া লইবার স্বত্ব আছে, অর্থাৎ" "বাক্যান্তরে, তাহার নিজের স্বত্ব স্বতন্ত্র রূপে" "এবং অন্য কাহার বাধা বা হস্তক্ষেপ ব্যতীত" "ভোগ করিবার উপযুক্তাবস্থায় অবস্থিত করিবার" "স্বত্ব আছে।"

এ মোকদ্দমার পক্ষগণ সহ-পত্তনীদার, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কোন কথার সহিত সংস্রব নাই।

৬ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৯২ পৃষ্ঠার মথুরচন্দ্র কর্ম্মকার বনাম মাণিকচন্দ্র বসু প্রভৃতির মোকদ্দমায় এই রূপ আর এক নিষ্পত্তি দৃষ্ট হইবে। ঐ মোকদ্দমার পক্ষগণ এক সিক্মী তালুকের শরীক ছিল, এবং তাহাতে এই স্থির হয় যে, সিক্মী তালুকদারের অংশ বিভাগ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের কোন ক্ষতি না হওয়ায় বাটোয়ারার জন্য নালিশ দেওয়ানী আদালতে চলিবে।

এবং ক্রেতা যাহা ক্রয় করে তাহাতে যে, সে দখল পাইতে পারে, এই নিয়ম ২য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের মোৎফরকা নিষ্পত্তির ৩০ পৃষ্ঠায় কুঙর বিজয়কেশব বনাম শ্যামাসুন্দরী দেবীর মোকদ্দমায় এই আদালতের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিতে আরো প্রশস্ত রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং এই মীমাংসা হইয়াছে যে, কোন মুসলমান কোন হিন্দুর আবাস-গৃহের এক অংশ ক্রয় করিলে সে তাহা বাটোয়ারা করিয়া লইয়া দখল করিতে পারে।

পরস্পর শরীক রাইয়তদের মধ্যে দেওয়ানী আদালত দ্বারা বাটোয়ারা করাইবার স্বত্বও ৯ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪৮৭ পৃষ্ঠা-লিখিত গৌরীশঙ্কর রায় বনাম আনন্দমোহন মিত্রের মোকদ্দমায় সংস্থাপিত হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, এ মোকদ্দমায় বাদীর আপন ক্রীত অংশ বাটোয়ারা করিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিবার স্বত্ব ছিল, এবং অধঃস্থ জজের তাহাকে ডিক্রী দেওয়া উচিতই হইয়াছে। আমার বোধ হয়, তাঁহার আপন কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বাটোয়ারা করিবার হুকুম দিবারও ক্ষমতা আছে।

এক্ষণে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যে, হৃদয়নাথ সান্যালের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে আমরা এই আপীলের নিষ্পত্তি পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে বাধ্য কি না। আমি বোধ করি না যে, আমাদের তাহা করিবার আবশ্যক আছে, কারণ, প্রথমতঃ উক্ত নিষ্পত্তিতে আইন-ঘটিত সিদ্ধান্ত বলিয়া এমত সংস্থাপিত হয় নাই যে, উভয় পক্ষের মধ্যে কোন চুক্তি না থাকিলে বাটোয়ারা হইতে পারে না; বরং ইদানীন্তন অনেক নিষ্পত্তিতে (যাহার এক নিষ্পত্তিতে বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে) তদ্বিপরীত মত সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং আমি বোধ করি এ মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ না করিয়া আমাদের ঐ সকল নিষ্পত্তিরই অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত।

আমি এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস করিতে চাহি।

বিচারপতি কেম্প।—আমারও ঐ মত। দেওয়ানী আদালত দ্বারা এই প্রকারের মোকদ্দমার বিচার পার্লিয়ামেণ্টের কোন আইন দ্বারা বা কোন কানুন (১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১ ধারা দ্রষ্টব্য) দ্বারা বারিত নহে। কালেক্টর ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের বিধান অনুসারে উক্ত বাটোয়ারা করিতে পারিতেন না। কেবল দেওয়ানী আদালতেরই তাহা করিবার অধিকার আছে, এবং উক্ত বাটোয়ারা হয় মুন্সেফ দ্বারা নচেৎ আদালতের কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা করিতে হইবে।

আমি এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে সম্মত হইলাম। (ব)

---

২১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৪৯২ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার প্রতিনিধি জজ তত্রত্য সদর মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২২ এ সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৯ ই আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে মোফরকা আপীল।

অম্বিকা দাসী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

চিরঞ্জীবপ্রসাদ বসু (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমানাথ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন দখলের ও ওয়াশীলাতের দাবীর মোকদ্দমায় কোন এক ব্যক্তি মূল প্রতিবাদিনী হয়, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সময় অপর এক ব্যক্তি আপন ইচ্ছায় আসিয়া মোজাহেম দেয়, এবং উক্ত ডিক্রীতে ঐ মূল প্রতিবাদিনীর স্থানে স্বেচ্ছা ক্রমে আপন নাম লেখায়।

এমত স্থলে এই শেষোক্ত ব্যক্তি ঐ ডিক্রী অনুযায়ী খরচা ও ওয়াশীলাতের নিমিত্ত দায়ী হইবে।

বিচারপতি হবহৌস।—আমাদের নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত যে, নিম্ন আপীল-আদালতের এক ডিক্রীর ব্যাখ্যাতে দায়ী অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টকে ঐ ডিক্রীমতে ওয়াশীলাৎ ও খরচার নিমিত্ত দায়ী করা উচিত হইয়াছে কি না।

উক্ত প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে ঐ ডিক্রীর শব্দের উপর নির্ভর করে, এবং জজের খাস আপেলাণ্টকে উক্ত ডিক্রী অনুসারে দায়ী স্থির করা যে উচিত হইয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন সন্দেহ নাই।

উক্ত মোকদ্দমার বাদী কোন ভূমির দখল এবং ওয়াশীলাতের দাবীতে নালিশ করে। নবলক্ষ্মী নাম্নী এক জন প্রথমে ঐ মোকদ্দমার মূল প্রতিবাদিনী ছিল; কিন্তু আমরা এক্ষণে যে ডিক্রীর ভাবোদ্ধার করিতেছি তাহাতে যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, সেই মোকদ্দমার বিচারের কালে উপস্থিত খাস আপেলাণ্ট আপন ইচ্ছায় এবং নিজে প্রার্থনা করিয়া মোজাহেম দেয়।

উক্ত ডিক্রীর মধ্যে মূল প্রতিবাদিনী নবলক্ষ্মীর স্থানে তাহাকে প্রতিবাদিনী বলিয়া উল্লেখ করা হয়। সেই সঙ্গে ডিক্রীদার অর্থাৎ উপস্থিত খাস রেস্পণ্ডেণ্টকে উক্ত ডিক্রীতে বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, এবং ডিক্রীতে লেখা হয় যে, উক্ত বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণ, ডিক্রীজারীর সময়ে যে ওয়াশীলাৎ স্থির হইবে তাহা সমেত দখল পাইবে, এবং মূল প্রতিবাদিনীর উপর খরচা বার হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রথমে নবলক্ষ্মী প্রতিবাদিনী ছিল, কিন্তু ডিক্রীতে উপস্থিত আপেলাণ্টের নাম তাহার নিজের প্রার্থনামতে নবলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে লেখা হয়। অতএব আমার মতে খাস আপেলাণ্ট উক্ত ডিক্রী অনুযায়ী ওয়াশীলাৎ এবং খরচার নিমিত্ত স্পষ্টই দায়ী।

এস্থলে এই দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে যে, খাস আপেলাণ্ট বেদখলের সমুদায় কালের ওয়াশীলাৎ দিবে, না যে অবধি সে স্বয়ং নবলক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে মোকদ্দমা-ভুক্ত হয়, কেবল সেই অবধি ওয়াশীলাৎ দিবে। উক্ত প্রশ্ন নিম্ন আদালতে উপস্থিত বা নিষ্পন্ন হয় নাই, অতএব বোধ হয় এ পর্য্যন্তও পক্ষগণের মধ্যে তাহার মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, তাহা নিশ্চয়ই এমত কোন প্রশ্ন নহে যে, তাহার এই অপরিপক্ক অবস্থায় খাস আপেলাণ্ট তৎসম্বন্ধে এই খাস আপীল আমাদের কোন মত পাইতে পারে।

এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

(ব)

২১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৭ সালের ৬২ নং মোকদ্দমা।

পূর্ব্বাংশ বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজের ১৮৬৬ সালের ২৩ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মেং জার্ডিনস্কিনর এণ্ড কোম্পানি (বাদী) আপেলাণ্ট।

ধনকৃষ্ণ সেন প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি, এলেন এবং বাবু বংশীধর সেন ও ভবানীচরণ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

মেং ডবলিউ বর্ক বারিষ্টর এবং বাবু শ্রীনাথ দাস ও রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে বিচারপতিদ্বয় কোন মোকদ্দমা পূর্ব্বে শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন এক জন তাহার পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিলে, তাহার আপীল পুনঃশ্রবণের কালে, উকীল উক্ত পুনর্ব্বিচার গ্রহণের হুকুমের ঔচিত্য সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। উক্ত হুকুম অন্যায় হইলেও সেই ভ্রম, পুনরায় পূর্ব্ব নম্বরভুক্ত আপীল শ্রবণার্থে যে অধিবেশন উপবিষ্ট হন তৎকর্ত্তৃক সংশোধিত হইতে পারে না।

রেস্পণ্ডেণ্টের কৌন্‌সেল বর্ক সাহেব যে প্রাথমিক আপত্তি উপস্থিত করেন যে, পুনর্ব্বিচার গ্রহণের পরে পুনঃশ্রবণের কালে তাঁহার এই তর্ক উত্থাপন করিবার অধিকার আছে যে, মিয়াদ অন্তে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট হেতু ছিল কি না, সেই আপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত হুকুম হয়:—

বিচারপতি লক।—বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র এই মোকদ্দমা পুনরায় নম্বরভুক্ত করিবার আদেশ করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করেন; অতএব বিচারপতি সিটনকার এবং দ্বারকানাথ মিত্রের ১৮৬৭ সালের ৫ ই আগষ্ট তারিখে এই মোকদ্দমা শ্রবণের পূর্ব্বে তাহার যে অবস্থা ছিল, এখনও তাহার সেই অবস্থা। বর্ক সাহেব রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে তর্ক করেন যে, মিয়াদ অন্তে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট হেতু ছিল কি না, এক্ষণে এই প্রশ্নে প্রবেশ করিবার তাঁহার অধিকার আছে। আমাদের বোধ হয় যে, আদালতের যে বিচারপতিদ্বয় এই মোকদ্দমা পূর্ব্বে শ্রবণ করেন তাঁহাদের মধ্যে যে বিচারপতি এখনও স্বীয় পদে আছেন তাঁহার কর্ত্তৃক যখন পুনর্ব্বিচার গৃহীত হইয়াছে, তখন তাহা গ্রহণ করিবার হুকুম উচিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে এক্ষণে রেস্পণ্ডেণ্টের কৌন্‌সেল আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন না। বর্ক সাহেব আপন তর্কের পোষকতায় ১ম বালম উইকলি রিপোর্টরের ১০২ এবং ১০৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত বিচারপতি বেলি এবং ফিয়ারের ১৮৬৮ সালের ৯ ই জানুয়ারির রায় দর্শান; তাহাতে, বর্ক সাহেব বলেন যে, এক মাত্র বিচারপতি বেলির অধিবেশনে যে পুনর্ব্বিচার গৃহীত হয়, তাহার পর উক্ত বিচারপতিগণ সেই পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। আমরা পক্ষগণের অনুরোধে মূল কাগজাত আনাইয়া দেখিলাম যে, বিচারপতি বেলির ১৮৬৭ সালের ২৯এ জুলাই তারিখের এই হুকুম আছে, যথা—

"এই মোকদ্দমা গৃহীত পুনর্ব্বিচারের মোকদ্দমা সমূহের নম্বরভুক্ত হউক। পরে আর আর বিষয়ের মধ্যে এই বিচার করিতে হইবে যে, পূর্ণাধিবেশনের ডিক্রীর ফল পূর্ব্বকালাবধি গণ্য হইবে কি না।"

আমার বোধ হয় যে, আইনে পুনর্ব্বিচার গ্রহণের যে সাধারণ মিয়াদ আছে সেই মিয়াদ অন্তে কোন পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, এতৎসম্বন্ধীয় তর্ক, উক্ত শব্দ গুলি দ্বারা, খণ্ডাধিবেশনের বিচারার্থে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে বিচারিত হইবে বলিয়া রহিয়াছিল; অতএব যখন বিচারপতি বেলি এবং ফিয়ার ঐ মোকদ্দমা শুনেন, তখন এই স্থির হয় যে,

মিয়াদ অন্তে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিবার যথেষ্ট কারণ দেখান হয় নাই।

আইনের শব্দ দৃষ্টে আমার বোধ হইতেছে যে, যে বিচারপতি বা বিচারপতিগণ মোকদ্দমা প্রথমে শুনেন পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত শ্রবণের সময়ে তাঁহারা আদালতে বর্ত্তমান থাকিলে তাঁহারাই কেবল তাঁহাদের পূর্ব্ব প্রদত্ত হুকুমের পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিতে পারেন, অতএব আমার বিবেচনায়, এই আপত্তি অগ্রাহ্য হইবে।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমার বিজ্ঞবর এবং মান্যবর সহযোগী এই মাত্র যে মত প্রকাশ করিলেন, আমি তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। মিয়াদ অন্তে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রহণ করিবার প্রশ্ন উক্ত দরখাস্ত গ্রহণ করিবার সময়ে আমি মীমাংসা করি; এবং, আইনে যখন বিধিবদ্ধ আছে যে, পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত গ্রহণ সম্বন্ধীয় হুকুম চূড়ান্ত হইবে, তখন আমার বিবেচনায়, রেস্পণ্ডেণ্টের কৌন্সেলের এত দীর্ঘকাল পরে, বিশেষতঃ, বর্ত্তমান অধিবেশনে, এই রূপ কোন আপত্তি উপস্থিত করিবার অধিকার নাই। যদি আমার পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করা অন্যায় হইয়া থাকে, তবে যে আপীল তাহার পূর্ব্ব নম্বর ভুক্ত হইয়াছে সেই আপীল শ্রবণ করিতে যে অধিবেশন নিযুক্ত হয়েন, ঐ অধিবেশন সেই ভ্রম সংশোধন করিতে পারেন না।

৯ম বালম, উইকলি রিপোর্টরের ১০২ পৃষ্ঠা হইতে যে নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি এই বলিতে চাহি যে, এক্ষণে আমাদের নিকট যে প্রশ্ন উপস্থিত, তাহা ঐ মোকদ্দমার বিচারের কালে উত্থাপিতও হয় নাই, অতএব আমার বোধ হয় না যে, উক্ত মোকদ্দমা ইহার নজীর স্বরূপ দর্শান যাইতে পারে। আমার বিজ্ঞবর সহযোগীই বলিয়াছেন যে, বিচারপতি বেলি পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিবার যে হুকুম দেন তাহাতে ঐ প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হইয়াছিল না, তাহা পশ্চাতে বিচারার্থে খোলা ছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, ১০২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত রায় হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উক্ত মোকদ্দমা কেবল রায়ের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত স্বরূপে ব্যবহৃত হয়, পুনরায় পূর্ব্ব নম্বর ভুক্ত আপীলের ন্যায় ব্যবহৃত হয় না। (ব)

---

২১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৫০৩ নং মোকদ্দমা।

চট্টগ্রামের জজ তত্রত্য সদর মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ৩০ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগস্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

গুরুদাস দত্ত (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট
উমাচরণ রায় (দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদিও ডিক্রীজারীর দরখাস্ত দাখিলের পর আদালতকে জারীর পরওয়ানা বাহির করিতে হয়, তথাপি আইনের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় এই যে, যখন ডিক্রীদার দেখে যে, আদালত ডিক্রীজারীর পক্ষে কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না, তখন মিয়াদ অতীত না হয় এজন্য ডিক্রীদারকে সচেষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আদালতে তদর্থে প্রার্থনা করিতে হইবে।

**বিচারপতি বেলি।**—এই খাস আপীল চট্টগ্রামের জজের ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগস্ট তারিখের হুকুমের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি স্থির করেন যে, ডিক্রীজারী এই হেতুবাদে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারা মতে বারিত হইয়াছে যে, খাস আপেলাণ্ট ১৮৬০ সালের

১৯ এ ডিসেম্বর তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে তাহার ডিক্রীজারী করিবার জন্য কিছুই করে নাই।

উক্ত ডিক্রী ১৮৫৫ সালের ১৭ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে হয়। ১৮৬৮ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, অর্থাৎ ঐ ডিক্রীর ১১ বৎসর ১১ মাস ২০ দিন পরে তাহা জারী করার বর্ত্তমান দরখাস্ত দাখিল হয়। ইহার মধ্যে ১৮৬১ সালের ২৮ এ জুন তারিখে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১৬ ধারা অনুসারে দায়ীর প্রতি এক নোটিস জারী হয়। তাহার পর ১৮৬২ সালের ৫ ই জুন পর্য্যন্ত আর কিছু করা হয় না; তখন ডিক্রীদার দায়ীর সম্পত্তি ক্রোক করিবার প্রার্থনা করে। ১৮৬২ সালের ২০ এ সেপ্টেম্বর তারিখে মোকদ্দমা নথী-খারিজ হয়। ১৮৬৩ সালের ১ লা মে তারিখে ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারীর নিমিত্ত আর এক দরখাস্ত করে; আদালত তাহা ১৮৬৪ সালের ৭ ই মে তারিখে কোন হুকুম না দিয়া নথী-খারিজ করেন। ১৮৬৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর তারিখে নিম্ন আদালত কোন কোন কাগজ তলব দেন। সেই তারিখ হইতে বর্ত্তমান দরখাস্তের তারিখ পর্য্যন্ত ডিক্রীদার তাহার ডিক্রী জারীর পক্ষে কিছুই করে নাই।

যদিও নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ে কিছু প্রকাশ পায় না, কিন্তু আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি যে, উকীল এই খাস আপীলে বলেন যে, মধ্যে কোন সময়ে অর্থাৎ ১৮৬৪ সালের ১ লা জুন তারিখে এক তৃতীয় পক্ষ এই সম্পত্তি ক্রোকের দরখাস্ত করে, এবং আদালত তাঁহার ১৮৬৪ সালের ১৫ ই আগস্টের হুকুমে যে রায় দেন তৎপ্রতি ডিক্রীদার আপত্তি করিয়া উক্ত সম্পত্তি খালাসের হুকুম প্রাপ্ত হয়। স্বীকৃত হইয়াছে যে, উক্ত রায় এবং ক্রোকের কার্য্য নথীতে নাই, এবং জজের নিকটে উপস্থিত হয় নাই। ১৮৬৩ সালের ১৫ ই আগস্টের হুকুমে যে, উক্ত ক্রোকের বা নিষেধক হুকুমের উল্লেখ হয় নাই তাহাও স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব আমরা আপীলের এই হেতু সম্বন্ধে একেবারে এই মীমাংসা করিতে পারি যে, নিম্ন আপীল-আদালতের সমক্ষে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত হয় নাই তদনুসারে তাঁহার এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করায় নিশ্চয়ই আইন ঘটিত ভ্রম হয় নাই।

তদনন্তর এই খাস আপীলের প্রধান আপত্তি আসিতেছে; তাহা এই যে, মিয়াদ অতীত হইবার দোষ কেবল আদালতের উপরেই বর্ত্তিতেছে, কারণ, ডিক্রীদার যখন ১৮৬৩ সালের ১ লা মে তারিখে ডিক্রীজারীর প্রথম দরখাস্ত করে, সেই সময় হইতে আদালত যখন ১৮৬৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর তারিখে কোন কোন কাগজ তলব করেন, তখন পর্য্যন্ত আদালত কোন কার্য্য করেন নাই; পরন্তু, ১৮৬৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর হইতে ১৮৬৪ সালের ৭ ই মে তারিখে যখন মোকদ্দমা নথী-খারিজ হয় তখন পর্য্যন্ত আদালত কিছুই করেন নাই; এবং কাজে কাজে খাস আপেলাণ্ট কিছুতেই উক্ত গৌণের জন্য দোষী নহে।

এই আপত্তির পোষকতায় ৭ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৩০ পৃষ্ঠা হইতে এক মোকদ্দমা দর্শান হইয়াছে। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আইন জারী হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারী করিবার পক্ষে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে।

এ স্থলে আমাদের স্থির করিতে হইবে যে, আপেলাণ্ট ১৮৬৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর হইতে ১৮৬৭ সালের ৩ রা মে অর্থাৎ পরের কার্য্যের তারিখ পর্য্যন্ত তাহার ডিক্রীজারী করিবার পক্ষে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছে কি না।

১৮৬৩ সালের ১৯ এ ডিসেম্বরের, এবং ১৮৬৪ সালের ৭ ই মে তারিখের কার্য্য নিশ্চয়ই আদালতের কার্য্য। তথাপি খাস আপেলাণ্টকে দেখাইতে হইবে যে, এই দুই তারিখের মধ্যে সে এমত কিছু করিয়াছে যাহাতে প্রকাশ পায় যে, সে তাহার ডিক্রীজারীর চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এ রূপ অভিপ্রায় খাস আপে-

জাণ্টের আচরণ দুইতে সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং উক্ত আচরণে প্রকাশ যে, সে ঐ দুই তারিখের মধ্যে তাহার ডিক্রীজারীর পক্ষে কোন উপায়ই অবলম্বন করে নাই। বিশেষ রূপে তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২ ধারার বিধান অনুসারে আদালতেরই পরওয়ানা জারী করা কর্ত্তব্য ছিল। সত্য বটে, আদালতের পরওয়ানা জারী করা কর্ত্তব্য, কারণ, আদালত ব্যতীত আর কাহারও পরওয়ানা জারীর হুকুম দিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু আইনে কিছুতেই নিষেধ নাই, বরং সম্পূর্ণ আদেশ আছে যে, ডিক্রীদারগণ যখন দেখিতে পায় যে, আদালত তাহাদের ডিক্রীজারীর পক্ষে কোন কার্য্য করিতেছেন না, তখন মিয়াদ অতীত না হয় এজন্য তাহাদের সচেষ্ট হইয়া আদালতের তদর্থে সময়ে সময়ে প্রার্থনা করিতে হইবে।

এ মোকদ্দমায় খাস আপেলাণ্ট স্পষ্টই ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার বিধানের অধীনে আসিতেছে। উক্ত ধারায় বলা হইয়াছে যে, কোন ডিক্রীজারী করিবার নিমিত্ত যে দরখাস্ত হয় তাহার পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে উক্ত ডিক্রী জারী রাখিবার পক্ষে কোন কার্য্য (যাহা ডিক্রীজারীর অভিপ্রায়ে প্রকৃত কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে) না করা হইলে, আদালতের কোন রায়, ডিক্রী বা হুকুম জারীর পরওয়ানা বাহির হইবে না।

এই মোকদ্দমার যে সকল বৃত্তান্ত উপরে বিস্তারিত বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহাতে আইনের উক্ত বাক্যগুলি প্রয়োগ করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, ডিক্রীদার তাহার শেষ দরখাস্তের পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে তাহার ডিক্রীজারী করিবার পক্ষে কোন ফলদায়ক কার্য্য করে নাই। আমাদিগকে ১৮৬৭ সালের ৩ রা মে তারিখের দরখাস্ত দেখিতে হইতেছে, এবং নথীস্থ বৃত্তান্ত দৃষ্টে ডিক্রীদারকে উক্ত দরখাস্তের পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে কোন কার্য্যই করিতে দেখা যায় না।

এতদর্থে আমাদের বিবেচনায়, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তিই শুদ্ধ হইয়াছে, অতএব আমরা এই মোৎফরুকা আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

---

২১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন
এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ১৭৫৬ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৭ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির-তর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৭ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মসম্মত কুশম (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

তফজ্জল হোসেন (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু এবং চন্দ্রমাধব ঘোষ
আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, সি, গ্রেগরী এবং মুন্সী মহম্মদ
ইউছফ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ক্রেতার নাম প্রবঞ্চকতা-পূর্ব্বক এবং ক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সার্টিফিকেটে লেখান হয়, তাহাতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬০ ধারা প্রয়োগ হয় না।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।—আমরা এই মোকদ্দমা দোষগুণ দৃষ্টে বিচারার্থে প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠাইতেছি।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬০ ধারা ইহাতে প্রয়োগ হয় না। উক্ত ধারায় লেখা আছে যে, "নীলামের সময়ে যাহাকে প্রকৃত খরীদার "বলিয়া প্রকাশ করা যায় তাহারই নাম সেই "সার্টিফিকেটে লিখিতে হইবে। ও যে খরীদা- "রের নাম সার্টিফিকেটে লেখা আছে সেই "লোক ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিমিত্তে ঐ জমি "খরীদ হইয়াছিল ও সার্টিফিকেটে যাহার নাম

"লেখা গেল তাহার সঙ্গে পূর্ব্বে কোন বন্দো-"বস্ত করিয়া তাহার নামে লেখা হইয়াছিল "বলিয়া, যদি সার্টিফিকেটে লেখা খরীদারের "নামে কোন মোকদ্দমা করা যায়, তবে তাহা "খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।" এস্থলে "পূর্ব্বে "বন্দোবস্ত করিয়া" সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ক্রেতার নাম লেখা হয় নাই, কিন্তু প্রতিবাদী তাহা তঞ্চকতা দ্বারা এবং ক্রেতার ইচ্ছার বিপরীতে সার্টিফিকেটে লেখাইয়াছে। প্রতিবাদী তঞ্চকতার নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে; অতএব ২৬০ ধারায় এমন কিছু নাই যাহাতে এই নালিশ গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

এই মোকদ্দমা বিচারার্থে ফেরৎ যাইবে, এবং ঐ বিচারের ফলানুসারে এই আপীলের খরচার আদেশ হইবে। (ব)

২৪ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হবৃহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২২৩৬ নং মোকদ্দমা।

শ্রীহট্টের অধঃস্থ জজ পারকুলের মুনসেফের ১৮৬৯ সালের ৬১ এ মার্চের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২৮ এ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কালীনাথ কর (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

দয়ালকৃষ্ণ দেব (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আশুতোষ ধর আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাদীর পিতা আপন মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিসন্ধিতে কৃত্রিম কার্য্য দ্বারা যে সম্পত্তি বেনামী করে, তাহার দাবীতে বাদী নালিশ উপস্থিত করায়, স্থির হইল যে, বাদী আপন পিতার তঞ্চকতা-মূলক কার্য্য দর্শাইয়া স্বত্ব সংস্থাপন করিতে পারে না।

বিচারপতি বেলি।—এই মোকদ্দমার বাদী ৩ নং রঘুরাম নামক তালুকের তিন পোয়া ভূমিতে আপন স্বত্ব সাব্যস্তের এবং দখলের দাবীতে নালিশ করে।

বাদী বলে যে, বিপক্ষকে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে যে এক ডিক্রী দেওয়া হয় তাহার দ্বারাই বাদী বিরোধীয় ভূমি হইতে বেদখল হয়। বাদী তাহার নালিশের আরজীতে আরও বলে যে, তাহার পিতা এই সম্পত্তি প্রতিবাদীর পিতা কাশীনাথকে এবং তাহার (বাদীর) নিজের পিতার দুই বন্ধু সন্তোষরাম এবং দুর্গাপ্রসাদকে বেনামীতে হস্তান্তর করে।

প্রতিবাদীর জওয়াব এই যে, বাদীর পিতা যে হস্তান্তর করে, তাহা উপযুক্ত মূল্যে ও সরল অন্তঃকরণে সাফ বিক্রয়, এবং সেই স্বত্ব অনুসারেই প্রতিবাদী উক্ত সম্পত্তি ভোগ করে।

প্রথম আদালত সপষ্টাভিধানে এই সকল ইস্যু করেন যে, এই মোকদ্দমা কৃত্রিম বিক্রয় এবং বেনামী ক্রয়ের প্রসঙ্গে চলিতে পারে কি না, এবং বাদীর পিতা, কাশীনাথ প্রভৃতির নিকট যথার্থই এবং সরল অন্তঃকরণে বিক্রয় করে, না তাহা তাহাদের নামে কৃত্রিম বিক্রয় মাত্র। এ মোকদ্দমায় উক্ত সম্পত্তির আরো কোন কোন অংশের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু আমাদের সমীপস্থ উকীলেরা সম্মত হইয়াছেন যে, আমাদিগকে এই খাস আপীলে কেবল প্রথম ॥০ আট আনা অংশের তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তির যে অংশ কাশীনাথ, সন্তোষরাম এবং দুর্গাপ্রসাদকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়ার সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহারই সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে।

প্রথম আদালত বোধ হয়, প্রথমতঃ এই সংস্থাপন করেন যে, কোন ব্যক্তিই তাহার নিজের

অন্যায় কার্য্যের উপকার লইতে পারে না, এবং এ বিষয় সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তি দর্শান; কিন্তু তাহার পরেই প্রথম আদালত এই বলিয়া রায় সমাপ্ত করেন যে, এ স্থলে কোন তঞ্চকতা হয় নাই, এবং বাদীকে এই আংশিক ডিক্রী দেন যে, সে বিরোধীয় তিন পোয়া ভূমির তিন অংশের দুই অংশে এজমালীতে দখল পাইবে।

আপীলে নিম্ন আপীল-আদালত এই ইসু ধার্য্য করেন যে, বাদী যে স্থলে স্বীকার করে যে, বিক্রয়-কার্য্য বেনামী এবং মহাজনদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়েই করা হয়, সে স্থলে সে ডিক্রী পাইতে পারে কি না। আদালত অতি দীর্ঘ, অনিশ্চিত এবং অসংসৃত বাক্যপূর্ণ রায়ে সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করেন এবং স্থির করেন যে, বাদী দখীলকার আছে, এবং তাহাকেই মালিক বিবেচনা করিতে হইবে; তাহার দাবী এবং দখলের বিষয় সে বিশ্বাস-যোগ্য সাক্ষি-দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছে; এবং প্রতিবাদীর আপন বর্ণনা মতে বাদী প্রতিনিধি বা গোমাস্তা স্বরূপে তহসীল করে, কিন্তু বাদী যে প্রতিবাদীর প্রতিনিধি বা গোমাস্তা বা অন্য কোন প্রকারের চাকর, তাহার কোন প্রমাণ নাই। নিম্ন আপীল-আদালত ইহাও স্থির করেন যে, উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চিত করণার্থেই হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু নিম্ন আপীল-আদালতের মতে বাদীর আচরণও যেরূপ, প্রতিবাদীর আচরণও সেই রূপ দূষণীয় হওয়ায় প্রথম আদালত বাদীকে যেরূপ ডিক্রী দেন, নিম্ন আপীল-আদালতও সেই রূপ ডিক্রী দেন।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৪৮ ধারা অনুসারে রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল আমাদিগের নিকট বলেন যে, তঞ্চকতার প্রসঙ্গের পোষকতায় বিধিমত প্রমাণ নাই। আমরা উকীলকে এ বিষয়ে তর্ক করিতে দিয়াছিলাম, কিন্তু সন্তোষরামের পুত্র দীপচন্দ্র শর্ম্মার সাক্ষ্য দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ৩ নং তালুক রঘুরাম এবং বিরোধীয় ভূমির যে অংশ ঐ তালুকের অন্তর্গত, তাহা এই অভিপ্রায়ে হস্তান্তর করা হয় যে, বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে না পারে, এবং প্রথম ।৵৹ অংশের তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে কাশীনাথ, সন্তোষরাম এবং দুর্গাপ্রসাদকে হস্তান্তর করিয়া ঐ উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। সত্য বটে, উক্ত সাক্ষ্য কিয়ৎ পরিমাণে অস্পষ্ট, কিন্তু তাহার আসল অংশ দেখিলে বোধ হয় যে, উক্ত সমগ্র তালুক (যাহা ক্রোক হইয়াছিল) সাধারণতঃ বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণগণের হস্ত হইতে রক্ষা করাই উক্ত হস্তান্তরের উদ্দেশ্য। অতএব তঞ্চকতা সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের নির্দ্দেশের পোষকতায় নথীতে প্রমাণ আছে।

তদনন্তর আসল প্রশ্ন এই যে, বাদী যে তাহার নালিশের আরর্জীতে বলে যে, উক্ত কার্য্য বেনামী এবং তঞ্চকতা-মূলক এবং নিম্ন আপীল-আদালত যে প্রমাণ দৃষ্টে এই বৃত্তান্ত স্থির করেন যে, উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়েই ঐ হস্তান্তর করা হয়, এই সকল বিষয় একত্রে দেখিলে বাদীকে উক্ত তঞ্চকতার উপকার লইতে দেওয়া যাইতে পারে কি না।

আমাদিগকে যে সকল পুরাতন নজীর দর্শান হইয়াছে তাহার একটি ১৮৫৯ সালের সদর দেওয়ানী আদালত-রিপোর্টের ১৬৩৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত ১৮৫৯ সালের ২৮ এ ডিসেম্বর তারিখের নিষ্পত্তি। তাহাতে স্থির হয় যে, লোকেরা উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম কবালা লিখিত পড়িত করিলে, যাহার নামে উক্ত কৃত্রিম লেখাপড়া করা হয় তাহারই করতলে থাকে, এবং পরে সেই কার্য্য বেনামী বলিয়া আপত্তি হইলে তাহা শুনা যাইবে না। উক্ত রায়ে অনিষ্ট উৎপাদনের প্রশ্ন সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, উক্ত আপত্তি এমত ব্যক্তির পক্ষ "হইতে হওয়া আবশ্যক যে, ঐ বেনামীর কোন "পক্ষ নহে, বা তাহাতে লিপ্ত নহে, কারণ,

"কোন ব্যক্তিই তাহার নিজের তঞ্চকতা দর্শা-
"ইয়া তাহার নিজের প্রদত্ত দলীল অসিদ্ধ
"করিতে পারে না।" আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমার বাদী তাহার পিতার তঞ্চকতা-ভুক্ত ছিল, কারণ, সে স্বীকৃতরূপেই তাহার পিতার নিকট হইতে দায়াধিকারী স্বরূপে স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং ঐরূপে তঞ্চকতা দ্বারা উপার্জ্জিত সম্পত্তি গ্রহণ করে। অতএব এ মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের সদর দেওয়ানীর রিপোর্টের ১৬৩৯ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তির অন্তর্গত হইতেছে।

তাহার পরের মোকদ্দমা ১৮৬৪ সালের ২ রা জুন তারিখে, বিচারপতি মর্গ্যান্ এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত বিচার করেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন উত্তমর্ণ কার্য্যতঃ প্রতারিত হউক বা না হউক, হস্তান্তরকারী আপন উত্তমর্ণগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য হস্তান্তর করে কি না, তাহাই বিশেষ রূপে দেখিতে হইবে। উক্ত মোকদ্দমায় পিতা উত্তমর্ণকে বঞ্চিত করিবার জন্য তাহার সম্পত্তি তাহার পুত্রগণকে হস্তান্তর করিয়া দেয়। উইক্লি রিপোর্টরের ফাঁকের সংখ্যার ২৬৫ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

পরের দুই মোকদ্দমা বাস্তবিকই অতি প্রবল। তাহার প্রথম মোকদ্দমায় ১৬৩৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত অভয়চরণ ঘটকের মোকদ্দমায় সদর আদালতের ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসের নিষ্পত্তি প্রদর্শিত এবং অনুমোদিত হইয়াছে, এবং তাহা ১৮৫৮ সালের সদর দেওয়ানীর নিষ্পত্তির ৫৪৩ এবং ৫৪৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত শুভদ্রা বিবীর মোকদ্দমা হইতে কত ভিন্ন তাহা দেখান হইয়াছে। আদালত তাহাতে স্পষ্টাভিধানে সংস্থাপন করিয়াছেন যে, "পুত্র আপন পিতার তঞ্চকতাই আপন নালিশের কারণ বলিয়া উত্তরাধিকারী স্বরূপে সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির দাবীতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইতে পারে না।" ঐ স্থলেও পুত্র স্বত্বের দ্বারা তাহার পিতার কার্য্যে লিপ্ত ছিল। সত্য বটে, উক্ত মোকদ্দমায় যে স্বীকার করা হয়, তাহা স্পষ্টাক্ষরেই করা হয়, কিন্তু আমার বিবেচনায়, নিম্ন আপীল-আদালত যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা এই মোকদ্দমার অবস্থা উহার সহিত এক রূপই হইতেছে।

পরে যে নজীর দর্শান হইয়াছে, তাহা ৩ য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৯২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং ক্যাম্বেলের নিষ্পত্তি। তাহাতে সংস্থাপিত হয় যে, কোন ব্যক্তি তাহার নিজের তঞ্চকতা দর্শাইতে বা তাহাই জওয়াব স্বরূপে উত্থাপন করিতে পারে না, অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ বা ঘরাও ক্রেতাগণও স্বয়ংই বঞ্চিত না হইয়া থাকিলে এবং বঞ্চনা হইতে উদ্ধারের প্রার্থনা না করিলে, তাহা করিতে পারে না। তাহাতে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ আরো বলেন যে, ১৮৫৯ সালের সদর দেওয়ানীর রিপোর্টের ১৬৩৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমায় এই আদালত যে নিষ্পত্তি করেন, তাঁহারা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত।

সময়ের ক্রমানুসারে, পশ্চাতে প্রদর্শিত নজীর ৪ র্থ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত বিচারপতি লক এবং গ্লবরের নিষ্পত্তি। উক্ত মোকদ্দমায়, আদালতের পূর্ব্বের কোন কার্য্যে মাতা এই স্বীকার করে যে, তাহার কন্যাকে যে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয়, তাহা নাম মাত্র, এবং তাহার স্বামীর উত্তমর্ণগণকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়েই তাহা করা হয়, এবং আদালত তাহাতে এই শব্দ গুলি দ্বারা রায় প্রদান করেন,—"সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক, তুই-
"জলতুন্নেসা আইনানুযায়ী কার্য্যে ঐ কথা স্বীকার
"করে, অতএব আমরা আদালতের বহুতর
"নজীর অনুসারে তাহাকে এবং তাহার স্থলা-
"ভিষিক্ত ব্যক্তিগণকে ঐ সকল স্বীকার দ্বারা
"বাধ্য স্থির করিব।"

এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, ১৮৫৯ সালের সদর দেওয়ানী আদালত-রিপোর্টের ১৬৩৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত যে নিষ্পত্তি এই আদালত তৎ-

পরের নিষ্পত্তি সকলে সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন এবং পর্য্যালোচনা করিয়াছেন তাহা মণ্টফিওরাই বনাম মণ্টফিওরাই এবং রবর্টস বনাম রবর্টসের মোকদ্দমা দৃষ্টে হইয়াছিল, অতএব এ স্থলে বলা উচিত যে, টেলর-কৃত প্রমাণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ১৮৫৮ সালের সংস্করণের ১ ম বালমের ১০০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, ঐ দুই মোকদ্দমা পরের নিষ্পত্তি সকল দ্বারা অন্যথা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ৮০ দফা এই—“এক্ষণে বোধ হয় স্পষ্ট রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি এই সপ্রমাণ করিয়া তাহার দলীল এড়াইতে বারিত নহে যে, তাহা প্রতারণা-মূলক ও আইন এবং ন্যায়-বিরুদ্ধ অভিপ্রায়ে লিখিতপড়িত হয়” এবং তাহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, “উৎকৃষ্ট মত এই বোধ হয় যে, সে স্থলে কোন দলীলের উভয় পক্ষ জানে বা তাহাদের জানিবার উপায় থাকে যে, তাহা অসদভিপ্রায়ে বা কোন আইনের কি রাজনীতির বিরুদ্ধে লিখিতপড়িত হইয়াছে, সে স্থলে যে সকল বৃত্তান্ত দ্বারা উক্ত দলীল আদৌই অকর্ম্মণ্য হয় তাহা তাহাদের কাহারও সপ্রমাণ করিবার বাধা হইবে না; কারণ, যদিও কোন কোন স্থলে কোন ব্যক্তি এই রূপে তাহার নিজের অন্যায় কার্য্যের সুবিধা লইতে পারিবে, তথাপি বিপরীত নিয়ম অবলম্বন করিলে যে স্পষ্ট আইন এড়ান হইবে, তাহার সহিত তুলনা করিলে ঐ দোষ অতি সামান্য;” এবং আরও দর্শান হইয়াছে যে, যদি স্থির করা যায় যে, কোন সম্পত্তি তঞ্চকতার সহিত হস্তান্তর করা হইলে সেই হস্তান্তর বাস্তবিকই অকর্ম্মণ্য হইবে, তবে যে বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণকে বঞ্চিত করিবার জন্য উক্ত হস্তান্তর করা হয় তাহার ঐ সম্পত্তি বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি স্বরূপে পাইবার বাধ হইতে পারে।

কিন্তু সে যাহা হউক, আমি উল্লিখিত মতের প্রতি যথোচিত সম্মান সহকারে বোধ করি যে, যখন গত দশ বৎসর যাবৎ আমাদের আদালত সমূহের, উভয় সদর আদালত এবং প্রধানতম বিচারালয়ের এক রূপ ধারাবাহিক নিষ্পত্তি দেখা যাইতেছে, এবং তাহার দুই তিনটি মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমার অবিকল অনুরূপ, তখন আমাদের ঐ সকল নিষ্পত্তির অনুবর্ত্তী হওয়াই উচিত। এ দেশের অবস্থা স্বতন্ত্র; এ দেশে বেনামী হস্তান্তরের যে মর্ম্ম গৃহীত হয়, তাহা ইংলণ্ডে প্রায় অজানিত, অথবা প্রিবি কৌন্সেল যেরূপ একাধিক বার বলিয়াছেন, তদনুসারে এ দেশের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে আমরা ইংলণ্ডীয় প্রমাণ সম্বন্ধীয় সমুদায় নিয়ম দ্বারা বিশেষ রূপে বাধ্য নহি। আমাদের আদালত-সমূহে এমত কোন নিষ্পত্তি হইবার বিষয়ও আমি অবগত নহি যাহাতে টেলরের গ্রন্থ-বর্ণিত উল্লিখিত নিষ্পত্তি অনুসারে চলা হইয়াছে; অথবা ১৮৫৯ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্তের যে সকল নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে তাহাতেও পরস্পর কোন অনৈক্যতা দেখা যায় না।

এমত অবস্থায়, আমি নিম্ন আদালতদ্বয়ের ডিক্রী রূপান্তর করিয়া নিম্ন আদালতদ্বয় যাহার ডিক্রী দেন তাহা সত্ত্বেও, কাশীনাথ, সন্তোষরাম এবং দুর্গাপ্রসাদকে বাদীর পিতা যে হস্তান্তর-পত্র লিখিয়া দেয়, তল্লিখিত ॥০ আনার তৃতীয়াংশ সম্বন্ধে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম।

উভয় পক্ষ এই আদালতের আপন আপন খরচা বহন করিবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমি স্বীকার করিতেছি যে, বিচারপতি বেলি এ মোকদ্দমার যে নিষ্পত্তি করিলেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন বোধ হইয়াছিল, কিন্তু সমুদায় দৃষ্টে আমি বোধ করি যে, এই আদালতের পূর্ব্বাপর নিষ্পত্তি, এবং এ দেশের অর্থি-

প্রত্যর্থীর মধ্যে মোকদ্দমার বিচার করিতে যাহা যাহা দেখা আমার নিকট অত্যাবশ্যকীয় বোধ হয়, তদ্দৃষ্টে বিচারপতি বেলি যে রায় দিয়াছেন তাহাতেই আমি সম্মতি দিতে বাধ্য। আমি বোধ করি যে সকল নজীর বিচারপতি বেলি দর্শাইয়াছেন, এবং যেগুলি তিনি দর্শান নাই, যাহা ৬ ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৮৭ পৃষ্ঠায়, এবং হের রিপোর্টের ৫২৮ পৃষ্ঠায় ১৮৬২ সালের ৩১ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তিতে দৃষ্ট হইবে, এ সমুদায় আমাদের সমীপস্থ বিষয় সম্বন্ধে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। উক্ত বিষয় কি, তাহাই প্রথমে আমি সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

বাদী আমাদের সমীপস্থ বিরোধীয় সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, তাহার পিতা যে তাহা উপস্থিত খাস আপেলাণ্টকে অর্থাৎ কাশীনাথের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিয়া দেয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা দ্বারা বাদীর উক্ত সম্পত্তি পাইবার পক্ষে যে বাধা জন্মে তাহা সে দূর করিতে বাধ্য হয়। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উপস্থিত খাস আপেলাণ্ট নিম্ন আদালত দ্বয়ে বলিয়াছে এবং এই প্রশ্ন উপস্থিত করিয়াছে যে, বাদীর পিতা যে কাশীনাথকে হস্তান্তর করিয়া দেয়, তাহা তাহার পিতার উত্তমর্ণগণকে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে করা হইয়াছে কি না, এবং তাহা হইলে এই হস্তান্তর সম্বন্ধে বাদীর নালিশ চলিবে কি না। এবং যখন আমি দেখিতেছি যে, নিম্ন আপীল-আদালত এ বিষয় সম্বন্ধে বাস্তবিকই প্রমাণ পাইয়াছেন, তখন আর আমার কোন সন্দেহ নাই যে, উক্ত আদালত যে সকল শব্দ ব্যবহার করেন তাহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ যে, আদালতের এই স্থির করিবার মনস্থ ছিল যে, বাদীর পিতার কৃত হস্তান্তর উত্তমর্ণগণকে বঞ্চিত করিবার জন্য, অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি যে সকল ঋণের নিমিত্ত আংশিক দায়ী ছিল তাহা না দেওয়ার জন্যই করা হয়। তদনন্তর আমাদের এই মীমাংসা করিতে হইবে যে, এই রূপ স্থির হওয়াতে নালিশ চলিবে কি না।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ বিষয় সম্বন্ধে এই আদালতের নজীর সকল দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার প্রত্যেক নজীরেই স্পষ্ট স্থির হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তিই তাহার নিজের তঞ্চকতা দর্শাইয়া দাবী সাব্যস্ত করিতে পারে না। উহার প্রত্যেক নিষ্পত্তিই এমত বৃত্তান্ত দৃষ্টে হয় যদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রকাশ যে, ইহাই এই আদালতের ভিন্ন ভিন্ন অধিবেশনের নিষ্পত্তি। কিন্তু আমাদের সমীপস্থ মোকদ্দমা এমত এক ব্যক্তির যে তাহার নিজের তঞ্চকতা দেখায় না; যাহার নিকট হইতে সে তাহার স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহার তঞ্চকতা অর্থাৎ আপন পিতার তঞ্চকতা দর্শায়; এবং কোন ব্যক্তি তাহার নিজের তঞ্চকতা দর্শাইয়া দাবী সাব্যস্ত করিতে পারে না, এই মত এমত কোন ব্যক্তির প্রতি খাটে কি না, যে নিজে উক্ত তঞ্চকতার মধ্যে নহে, এবং যে বাস্তবিক তাহাতে লিপ্তও ছিল না; কিন্তু যে ব্যক্তি উক্ত তঞ্চকতায় ছিল তাহার নিকট হইতে আপন স্বত্ব পায়, ইহাই আমার নিকট কঠিন বোধ হইয়াছিল। এ বিষয় সম্বন্ধে যদি এই আদালতের কোন নিষ্পত্তি না থাকিত, তবে আমি বোধ করি আমি যে মত স্থাপন করিতেছি তাহার পোষকতায় রায় দিতে আমি সহসা সম্মত হইতাম না; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, হের রিপোর্টের ৫২৮ পৃষ্ঠায়, ৩ য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩ পৃষ্ঠায়, এবং ৪ র্থ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নিষ্পত্তি সমস্ত স্পষ্ট এই বিষয়ে খাটে এবং ঐ সকল নিষ্পত্তি এবং তাহার পোষকতায় বিচারপতি বেলির রায় হওয়াতে, আমি তাহা হইতে ভিন্ন মতাবলম্বী হইতে পারি না; এবং আমি আরো বলিতে পারি যে, সমুদায় দৃষ্টে আমার বোধ হইতেছে যে, যত দূর আমার জানা আছে, তাহাতে এ দেশে বিশেষ রূপে খাটে এমত সকল অবস্থা আছে যাহাতে আমার নিকট ঐ সকল রায় যেমন আইন-সঙ্গত

সেই রূপ নীতি-সঙ্গত বোধ হয়। আমি বোধ করি ইহা এ দেশে অত্যন্ত প্রচলিত, এবং বাস্তবিক এমত একটি দিন প্রায় গত হয় না যাহাতে আমরা ইহার একটি না একটি নিদর্শন না পাই। যখন লোকেরা অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং উপস্থিত মোকদ্দমার ঘটনার ন্যায়, যথার্থ ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়া আপন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার উপক্রম হয়, তখন তাহাদের বিবেচনায় উক্ত সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত, তাহাদের আত্মীয় স্বজনের নামে, নচেৎ এমত সকল ব্যক্তির নামে হস্তান্তর করে, যাহারা তাহাদের বাধ্য এবং তাহাদের বিবেচনায় তাহাদের উপরই নির্ভর করে। ৬ ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টারের ২৮৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি, বিচারপতি জ্যাক্‌সনের রায়ে সম্মত হইয়া যে শব্দগুলি ব্যক্ত করেন, সেই সকল শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আমি বলি যে, এ দেশস্থ ব্যক্তিদিগের বুঝা উচিত যে, উত্তমর্ণগণকে বঞ্চিত করা প্রভৃতি প্রতারণা-মূলক অভিপ্রায়ে তাহাদের সম্পত্তি সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিতে গিয়া তাহারা অতি বিপদ্‌জনক উপায় অবলম্বন করে, এবং তাহাদের অসততায় তাহারা যে সকল বিপদে পতিত হয় তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য তাহারা আদালতের সাহায্যের প্রত্যাশা না করে।

অতএব উপস্থিত বিষয়ে আইন এবং নীতি বিবেচনায়, আমি বিচারপতি বেলির রায়ে সম্মত হইলাম। (ব)

---

২৫ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ৪১২ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২ রা সেপ্‌টেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

গোলোকচন্দ্র গুহ (আপত্তিকারক) আপেলাণ্ট।

মহিমচন্দ্র ঘোষ (দরখাস্তকারী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস এবং রমেশচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মাজিষ্ট্রেট যে টাকা ক্রোক করেন তাহার দাবীর নালিশে প্রতিবাদী বলে যে, সে বাণিজ্যে খাটাইবার জন্য উক্ত টাকা লইতে চাহে; নচেৎ তাহার হানি হইবে।

এমত স্থলে, প্রতিবাদীর উক্ত স্বীকার দ্বারাই স্পষ্ট প্রকাশ যে, উক্ত টাকা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৯২ ধারার মর্ম্মানুসারে হস্তান্তরিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; সুতরাং সে তাহা ঐ ক্রোক হইতে খালাস করিয়া লইতে পারে না।

বিচারপতি লক।—গত কল্য উভয় পক্ষ আমাদের সমক্ষে যে সকল তর্ক উত্থাপন করে, তাহা আমরা সাবধানে বিবেচনা করিয়াছি। নিম্ন আদালতে যে সকল প্রমাণ গৃহীত হয়, আমরা কিছুতেই তাহার উপর নির্ভর করি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, যে ৩৪০০০ টাকা সম্বন্ধে আমাদের নিকট এই আপীল হইয়াছে, তাহা বাদীর নালিশের নির্দ্দিষ্ট এক বাব, এবং তাহার যে অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে, এ কথায় আমরা রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইলাম। আপেলাণ্ট বলে যে, যে কারবারের দ্বারা ঐ সম্পত্তির এত লাভ হইত, তাহা মাজিষ্ট্রেট এই টাকা ক্রোক করাতে বন্ধ হয়; এবং সে আরো বলে যে, উক্ত ক্রোক ঐ টাকা হইতে উঠাইয়া লইলে, সে তাহা দ্বারা উক্ত কারবার করিতে ইচ্ছা করে। উক্ত বাণিজ্যে লাভ হইতে পারে; এবং তাহার লাভ প্রচুরও হইতে পারে। পক্ষান্তরে, উক্ত বাণিজ্যে লোকসানও হইতে পারে; তাহা হইলে এই সমুদায় টাকা ব্যয় হইয়া যাইবে, এবং বাদী যে নির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায়ে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহা

সাধিত হইবে না, অর্থাৎ আর আর বিষয়ের মধ্যে এক্ষণকার আমানতী ৩৪০০০ টাকা সে পাইতে পারিবে না। পক্ষগণের মধ্যে যে মোকদ্দমা চলিতেছে, এবং তাহাতে যে বহু ব্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা দেখিয়া আমার কিছু মাত্র অসম্ভব বোধ হয় না যে, এই টাকা কোন পক্ষের হাতে দিলেই, তাহা প্রকৃত বাণিজ্যে প্রয়োগ না হইয়া মোকদ্দমার খরচে প্রয়োগ হইতে পারে; এবং এই টাকা যখন ক্রোক হইয়াছে, তখন আমার বোধ হয় যে, উক্ত টাকা ক্রোকে রাখিলে, প্রতিবাদীর যে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা তাহা, ঐ টাকা একবার কোন গতিকে ব্যয় হইয়া গেলে তাহার নিকট হইতে আদায় করিতে যে কষ্ট হইতে পারে, তাহার সহিত তুলনা করিলে অতি অল্পই হয়। অতএব মোকদ্দমার সমস্ত অবস্থা দৃষ্টে আমার বোধ হয় যে, অধঃস্থ জজের হুকুম স্থির রাখাই উচিত।

উক্ত টাকা সম্বন্ধে আমরা এই হুকুম দিতেছি যে, তাহা আদালতে আনিয়া কোম্পানির কাগজ ক্রয় করা হয়, এবং আমরা এই হুকুমও দিতেছি যে, অধঃস্থ জজ নম্বরের ক্রমানুসারে না লইয়া অবিলম্বে এই মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া যত শীঘ্র হয়, ইহার নিষ্পত্তি করেন।

এই আপীল ডিস্মিস্ হইবে, এবং উভয় পক্ষ তাহাদের আপন আপন খরচা দিবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমার বিজ্ঞবর এবং মান্যবর সহযোগীর প্রস্তাবিত হুকুমে আমি সম্মত হইলাম। আমি কিছুতেই বলিতে পারি না যে, অধঃস্থ জজের হুকুম ভ্রান্তিমূলক। প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, সে ঐ টাকা লইয়া বাণিজ্যে খাটাইতে চাহে; এবং আমি বিবেচনা করি এই স্বীকারের দ্বারাই প্রকাশ যে, উক্ত টাকা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৯২ ধারার মর্ম্মানুসারে হস্তান্তরিত হইবার সম্ভাবনা আছে। মোকদ্দমা যদি সচরাচর টাকার দাবীর মোকদ্দমা হইত, তাহা হইলে তাহার স্বতন্ত্র অবস্থা হইত, কারণ, তাহা হইলে তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির দাবীর মোকদ্দমা হইত না, সুতরাং উক্ত সম্পত্তি নষ্ট বা হস্তান্তরিত হইতে পারে কি না, এমত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারিত না। উপস্থিত মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেটের জিম্মায় যে নির্দ্দিষ্ট টাকা আছে, তাহা লইয়া তর্ক উপস্থিত; এবং প্রতিবাদী যখন স্বীকার করে যে, সে উক্ত টাকা বাণিজ্যার্থে ব্যবহার করিতে চাহে, তখন তাহাতেই সপষ্ট প্রকাশ যে, সে তাহা হস্তান্তর করিতে চাহে। বাদী যদি এ মোকদ্দমায় পরিশেষে উক্ত টাকার ডিক্রী পায়, এবং প্রতিবাদীকে ইতিমধ্যে তাহা বাণিজ্যে খাটাইবার জন্য লইয়া যাইতে দেওয়া হয়, তবে সপষ্টই এই নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রী অকর্ম্মণ্য হইবে, অতএব অধঃস্থ জজ তাঁহার রায়ে যে সকল অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুসারে আমি বোধ করি না যে, প্রতিবাদীকে এই টাকা মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে লইয়া তাহার নিজের কার্য্যে ব্যবহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। (ব)

---

২৭ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

পাবনার ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

হরিশচন্দ্র শর্ম্মা, বাদী।

ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী, প্রতিবাদী।

বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদীর উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস প্রতিবাদীর উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে ডাক্তর দ্বারা কোন রোগীর চিকিৎসা করান হয়, এবং সেই বাবতে তাঁহার ফিস সম্বন্ধে তাঁহার সহিত সেই সময়ে কোন বন্দোবস্ত না হয়, সে স্থলে তাঁহাকে ঐ ফীসের

টাকা দেওয়ার চুক্তি অনুমানিত হইবে, এবং সেই চুক্তি-ভঙ্গের হেতুতে নালিশের তমাদীর কাল ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণ মতে তিন বৎসর গণ্য হইবে।

ডাক্তর আপন ফীসের টাকা অগ্রে না লইয়া চিকিৎসা করিলেই যে, পশ্চাতে ঐ টাকার দাবীতে তাঁহার নালিশের বাধা হইবে, এমত নহে।

এস্তমেজাজ।—বাদী কলিকাতার মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র; সে প্রতিবাদীর কনিষ্ঠ পুত্রের চিকিৎসা বাবৎ ১৮৬৭ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বর হইতে ১১ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ১৯ বিজিটের দরুন ৭৬৲ টাকার, প্রতিবাদীর ভ্রাতৃবধূ তাহার সহিত একান্নে বাস করায় তাহার চিকিৎসা বাবৎ ১৮৬৭ সালের ১০ ই নবেম্বর হইতে ২১ এ পর্য্যন্ত ৮ বিজিটের দরুন ৩২ টাকার, প্রতিবাদীর নিজের চিকিৎসা বাবৎ ১৮৬৮ সালের ৫ ই ডিসেম্বর হইতে ৭ ই পর্য্যন্ত ৩০ বিজিটের দরুন ১২ টাকার; এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের চিকিৎসা বাবৎ ১৮৬৮ সালের ৪ ঠা মার্চ হইতে ৯ ই পর্য্যন্ত ৭ বিজিটের দরুন ২৮ টাকার, দাবীতে, একুনে ৩৭ বিজিটের দরুন প্রতি বিজিট ৪ টাকা হিসাবে ১৪৮ টাকার দাবীতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশ করে।

প্রতিবাদী তাহার নিজের কারণ ৩ বিজিট এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কারণ ২ বিজিট স্বীকার করে, এবং অবশিষ্ট দাবী এই বলিয়া অস্বীকার করে যে, প্রথমতঃ, বাদী নালিশের কারণ উপস্থিতের তারিখ হইতে এক বৎসরের পর দাবী করায় তমাদী দোষে বারিত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, আইনের এক অনুমান আছে যে, যদি কোন ডাক্তর তখন তখন ফী না লইয়া কোন রোগীর চিকিৎসা করে, তবে এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে তাহা পাইবার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছে, অতএব দেওয়ানী আদালতে তাহার দাবীতে কোন নালিশ চলিবে না।

ইসু বা এস্তমেজাজের বিষয় এই ঃ—

১ ম। বাদীর দাবীর কোন অংশ তমাদী দ্বারা বারিত কি না?

২ য়। যদি কোন ডাক্তর অগ্রে ফী না লইয়া রোগীর চিকিৎসা করে, তবে সে তাহা পাইবার স্বত্ব ত্যাগ করিয়াছে এই আপত্তি দ্বারা দেওয়ানী আদালতে তাহার ঐ টাকার দাবীতে নালিশ বারিত হইবে কি না।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, ডাক্তরের ফিসের দাবী চুক্তি-সম্ভূত; সেই চুক্তি দুই প্রকার, স্পষ্ট এবং আনুমানিক। যে স্থলে চুক্তির সর্ত্ত সকল স্পষ্ট করিয়া সেই চুক্তি করিবার সময়েই ব্যক্ত এবং স্বীকৃত হয়, যথা, ক, খকে ৫৲ মণ চাউল দিবে; তাহাকেই স্পষ্ট চুক্তি বলে। আনুমানিক চুক্তি এই যে, যে স্থলে কোন ব্যক্তি আপন কোন কার্য্য করিতে বা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে কাহাকে নিযুক্ত করে, সে স্থলে এই অনুমানিত হয় যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি ইহা দ্বারা শেষোক্ত ব্যক্তিকে তাহার পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল দিবার ভার লয় বা চুক্তি করে।

যখন উপস্থিত মোকদ্দমার বাদী বলে যে, সে প্রতিবাদীর বাটীতে চিকিৎসা করণে নিযুক্ত হয়, এবং সেই সময়ে তাহার ফীর বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত হওয়া দৃষ্ট হয় না, এবং যখন প্রতিবাদী বাদীর কোন কোন চিকিৎসা স্বীকার করিয়াছে, তখন আনুমানিক চুক্তি দ্বারাই বাদীকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়; এবং সেই চুক্তি-ভঙ্গের হেতুতে নালিশ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণ অনুসারে তিন বৎসরের মধ্যে চলিবে। এমত অবস্থায়, বাদী নালিশের কারণ উপস্থিতের সময় হইতে তিন বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বে তাহার দাবী উপস্থিত করায়, তাহা তমাদি আইন দ্বারা বারিত নহে। প্রতিবাদী যে আপত্তি করে যে, এই মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ২ প্রকরণ অনুসারে

এক বৎসরের তমাদী প্রয়োগ হয়, তাহা গ্রাহ্য নহে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রতিবাদী আপন আপত্তির পোষকতায় কুইনসবেঞ্চ নামক আদালতের ১৮৬৬ সালের ১৫ ই এপ্রিলের এক নিষ্পত্তির উল্লেখ করে; কিন্তু সে তাহা আদালতে উপস্থিত করিতে পারে নাই। ইংলণ্ডে বারিষ্টর এবং ডাক্তরদিগের ফী সম্বন্ধে যে নিয়মই প্রচলিত থাকুক, তাহা ভারতবর্ষে যে সকল ডাক্তর চিকিৎসা করেন এবং যাঁহারা বাঙ্গালার মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্র, তাঁহাদের সম্বন্ধে খাটে না। এ দেশের প্রথা এই যে, অধিকাংশ স্থলেই চিকিৎসা সমাপ্ত হইলে ডাক্তরেরা ফী লয়েন, এবং তাঁহারা তাহা আপোসে লইতে না পারিলে আদালতের সহায়তা গ্রহণ করেন। ডাক্তরেরা টাকা পাইবার পূর্ব্বে চিকিৎসা করিয়া যদি পরে মোকদ্দমা দ্বারা তাঁহাদের ফী আদায় করিতে না পারেন, তবে এ দেশে উকীলেরা যে টাকা পাইবার পূর্ব্বে সওয়াল জওয়াব করেন সেই নিয়ম প্রয়োগ দ্বারা তাঁহারাও তাঁহাদিগের প্রাপ্য ফীর নিমিত্ত আদালতের সাহায্য পাইতে বারিত হইবেন। যখন উকীলেরা পরে তাঁহাদের ফীর দাবীতে নালিশ উপস্থিত করিতে পারেন, তখন ডাক্তরদিগকে কেন সেই স্বত্ব ভোগ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। এমত অবস্থায় আমি দেখিতেছি যে, প্রতিবাদীর এই আপত্তিও কোন কার্য্যের নহে। অতএব বাদীর দাবী উল্লিখিত দুই আপত্তির কোন আপত্তি অনুসারেই বারিত নহে।

এই মোকদ্দমায় যে সকল প্রমাণ এবং বৃত্তান্ত দর্শান হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমি স্থির করিয়াছি যে, বাদীর দাবী ৯৬৲ টাকা পর্য্যন্ত সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব উল্লিখিত দুই আইন-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের মত সাপেক্ষে আমি বাদীকে উক্ত টাকার এবং তৎপরিমাণ খরচার ডিক্রী দিলাম

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমা অতি পরিষ্কার, এবং প্রতিবাদীর যে উকীল আমাদের সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি স্বীকার করেন যে, তিনি প্রতিবাদীর আপত্তির পোষকতা করিতে পারেন না। অতএব ছোট আদালতের জজের মত স্থির থাকিবে। উকীলের ফী বাবতে বিপক্ষ ১০ টাকা পাইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

---

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

রাণাঘাটের প্রতিনিধি জজের এস্তমেজাজ।

অঘোরনাথ ঘোষাল, বাদী।

রূপচাঁদ মণ্ডল, প্রতিবাদী।

বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদীর উকীল।

প্রতিবাদীর উকীল নাই।

চুম্বক।—পূর্ব্বে প্রতিবাদী এক খতের দাবীতে নালিশ করায় তাহা এই হেতুবাদে ডিস্‌মিস্ হয় যে, বাদী উক্ত খত লিখিতপড়িত হওয়ার বিষয় সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয় নাই; বাদী পরে সেই টাকার দাবীতে খাতার বাকী বলিয়া নালিশ করে।

এ স্থলে, পূর্ব্বে যে নালিশের কারণের বিচার হয়, সেই কারণে এই দ্বিতীয় নালিশ উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং এ মোকদ্দমা আদালতের বিচার্য্য।

এস্তমেজাজ।—আমি প্রধানতম বিচারালয়ের মতের জন্য এই প্রশ্ন অর্পণ করিতেছি যে, এই মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২ ধারা মতে বারিত কি না।

বাদী তাহার খাতা দৃষ্টে বাকী ৯৯৮৩ টাকার দাবীতে নালিশ করে। সে ইতিপূর্ব্বে

এই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ১০০ টাকার খতের দাবীতে নালিশ করিয়াছিল; কিন্তু তাহা এই হেতুবাদে ডিস্‌মিস্ হয় যে, সে প্রতিবাদীর উক্ত খত লিখিয়া দিবার বিষয় সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। উক্ত মোকদ্দমায় সে এই বলিয়াছিল যে, ঐ খতের লিখিত টাকা পুরাতন খাতার বাকী; প্রতিবাদী তাহা দিতে না পারিয়া ঐ খত লিখিয়া দিয়াছে। উক্ত মোকদ্দমায় ঐ খত সপ্রমাণ না হওয়ায় আমি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করি। উপস্থিত মোকদ্দমায় সে বলে যে, এক্ষণে সে যে টাকার দাবীতে নালিশ করে, তাহা, ১৩৷৷/৯ টাকা তমাদী দ্বারা বারিত হওয়ায় তাহা বাদে ঐ খতের লিখিত টাকাই হইতেছে। তাহার উকীল তর্ক করেন যে, এই দুই মোকদ্দমার মধ্যে একটি খতের এবং অপরটি কর্জ্জা টাকার দাবীর নালিশ হওয়ায়, নালিশের কারণ এক নহে, এবং যদিও সে খত সপ্রমাণ করিতে পারে নাই, তথাপি সে মূল নালিশের কারণ, অর্থাৎ প্রতিবাদী যে টাকা কর্জ্জ করে, তাহা তাহার পরিশোধ করিবার দায় সাব্যস্ত করিতে পারে। এই তর্কের উদাহরণ স্বরূপে তিনি প্রজার করের নিমিত্ত ভূম্যধিকারীকে খত লিখিয়া দিবার কথা দর্শান, এবং এই জিজ্ঞাসা করেন যে, ভূম্যধিকারী খতের উপর নালিশে অকৃত-কার্য্য হইলে, ১০ আইনের নালিশ উপস্থিত করিয়া কি তাহার মুল করের দাবী সংস্থাপন করিতে পারিবে না? তিনি ৫ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ১৫ পৃষ্ঠার লিখিত ডয়েল বনাম ক্ষেদন মণ্ডলের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দর্শান।

আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারা দ্বারা বারিত, কিন্তু বাদীর প্রার্থনামতে আমি ইহার এস্তমেজাজ করিলাম।

বাদী এমত তর্ক করে না যে, উক্ত কর্জ্জা টাকা যদি খত দেওয়ার কালেই প্রদত্ত হইত, তবে সে খত সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হইলে কর্জ্জা টাকার দাবীতে আবার নালিশ করিতে পারিত। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রত্যেক খতের মোকদ্দমায় দুই নালিশ হইতে দেওয়া হইবে। খতের টাকা পূর্ব্বে প্রদত্ত ঋণ হইলে এবং খত লিখিতপড়িতের কালে প্রদত্ত ঋণ হইলে কি বিশেষ প্রভেদ হয়, তাহা আমি জানি না। আরো আমার বোধ হয় যে, ইহার যে কোন স্থলেই হউক, বাদীর তর্ক স্বীকার করিয়া লইলে যে নিয়ম দ্বারা উভয়পক্ষের মধ্যে তাহাদের মনোগত ভাবের লিখিত দলীল থাকিবার স্থলে লিখিত প্রমাণের পরিবর্ত্তে বাচনিক প্রমাণ গ্রহণের নিষেধ আছে, তাহা লঙ্ঘন করা হইবে।

আমি বিবেচনা করি, খত লিখিত পড়িত করায় নূতন নালিশের কারণ হয়, এবং পূর্ব্ব কারণ বিলুপ্ত ও তাহাতেই ভুক্ত হয়, এবং তাহা পুনর্জীবিত করা যাইতে পারে না। এতদর্থে আমি প্রধানতম বিচারালয়ের মত সাপক্ষে এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এ মোকদ্দমায় আমি ছোট আদালতের মতে সম্মত হইতে পারিলাম না, কারণ, আমার বোধ হইতেছে যে, বাদীর খাতা দৃষ্টে প্রাপ্য টাকার দাবীর নালিশ, পূর্ব্বের খতের উপর নালিশ নিষ্ফল হওয়া হেতু বারিত হয় না। বাদী পূর্ব্বের মোকদ্দমায় যে খত সপ্রমাণ করিতে পারে নাই, তদ্দৃষ্টে তাহার দাবী সপ্রমাণ করা অতি সহজ বিবেচনায় অথবা তমাদীর কোন দোষ না ঘটে এই জন্য, সে সেই খত অনুসারে নালিশ করিয়া থাকিতে পারে। সে যখন তাহার খতের উপর দাবী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই, তখন আমার বিবেচনায়, সে কেবল তাহার পূর্ব্বের ঋণ সম্বন্ধে পূর্ব্বের প্রতিকার অবলম্বন করিতে পারে। প্রথম মোকদ্দমায় যে নালিশের কারণ শ্রবণ এবং মীমাংসা করা হয়, তাহা প্রতিবাদীর খতের সর্ত্ত মতে টাকা দেওয়ার ত্রুটি; প্রতিবাদী বাদীর সহিত যে কারবার করে তাহার দরুন তাহার দেনা পরিশোধ করিতে না পারায়, দ্বিতীয় নালিশের কারণ উপস্থিত হয়। অতএব আমার

বোধ হয় যে, পূর্ব্বে পক্ষগণের মধ্যে যে নালিশের কারণের বিচার এবং মীমাংসা হইয়াছিল, দ্বিতীয় মোকদ্দমা সেই কারণে উপস্থিত হয় নাই; অতএব ইহা ছোট আদালতের বিচার্য্য।

এই এস্তমেজাজে যে উকীল উপস্থিত হইয়াছেন তিনি তাঁহার ফীর বাবৎ ৫৲ টাকা পাইবেন।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(ব)

---

২৬ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ এ গ্লবর।

ঢাকার ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

রাজচন্দ্র সাহা এবং অপর এক ব্যক্তি, বাদী।

গোবিন্দচন্দ্র কুলাল প্রভৃতি, প্রতিবাদী।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল বাদীর উকীল।

প্রতিবাদীর পক্ষে উকীল নাই।

চুম্বক।—কোন এক খাতার লিখিত হিসাব অনুসারে কর্জা টাকার দাবীতে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, তাহাতে উপযুক্ত ষ্টাম্প নাই বলিয়া তাহা প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণের প্রতি প্রতিবাদী আপত্তি করে। স্থির হইল যে, তাহা যে ষ্টাম্প কাগজে লেখা হয় না তাহা ষ্টাম্পের মূল্য এড়াইবার অভিসন্ধিতে হয় কি না, এ প্রশ্ন জজই ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ১৫ এবং ১৭ ধারা অনুসারে তাঁহার সমীপস্থ বৃত্তান্ত দৃষ্টে মীমাংসা করিতে সক্ষম; এবং এরূপ স্থলে প্রধানতম বিচারালয়ে জিজ্ঞাস্য কোন প্রশ্ন উপস্থিত নাই।

এস্তমেজাজ।—বাদীর খাতা-লিখিত হিসাব অনুসারে আসল ১০০ টাকার সুদ সমেত ১৫৭৸৶৯ টাকার দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত হয়। উপস্থিত প্রতিবাদিগণ উক্ত দাবী অস্বীকার করে, এবং ষ্টাম্পের আইন বাধা স্বরূপ দর্শায়।

যে হিসাব দৃষ্টে নালিশ হইয়াছে তাহা যে, ষ্টাম্পে লেখা উচিত ছিল, একথা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রশ্ন এই যে, উক্ত দলীল কি নিয়মিত জরিমানা লইয়া প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে? আমি বলিতে চাহি যে, বর্ত্তমান আইন অনুসারে আমার মতে তাহা স্পষ্টই গৃহীত হইতে পারে না। উক্ত হিসাব ষ্টাম্পে লেখা হয় নাই, ইহা ব্যতীত আর সর্ব্ব প্রকারেই তাহা রীতিমত খত; এবং উক্ত খাতায় যে কেবল এই হিসাব আছে এমত নহে, তাহাতে টাকা পরিশোধ করিবার তারিখ, সুদের সর্ত্ত ও হার, এবং খাতকগণের ও সাক্ষিগণের স্বাক্ষর সহ এই রূপ আরো ১১ টা হিসাব আছে; এবং তাহা সাদা কাগজে লিখিত এক তাড়া খত স্বরূপ।

বাদিগণ বলে না এবং বলিতেও পারে না যে, তাহারা আইন জানিত না, বা ষ্টাম্প পাওয়া গিয়াছিল না। "ষ্টাম্পের মূল্য এড়ান" এবং "গবর্ণমেণ্টকে ঠকানই" তাহাদের স্পষ্ট অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। যদি তাহারা আপোষে টাকা পাইত তবে তাহারা এক পয়সাও জরিমানা দিত না। অতএব বাদিগণ ১০ আইনের ১৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত উপকার পাইতে পারে না; বরং ইহাই তাহাদের সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মানিতে হইবে যে, তাহাদিগকে ৩ ধারা অনুসারে ফৌজদারীতে অর্পণ করা হয় নাই। অতএব আমার উপায়ান্তর নাই বলিয়া আমি প্রধানতম বিচারালয়ের মান্যবর বিচারপতিগণের মত সাপক্ষে এই দলীল গ্রহণ করা যাইতে পারে না বলিয়া অগ্রাহ্য করিলাম, এবং ডিস্‌মিসের হুকুম দিলাম—আমার ইহা করিবার বিশেষ কারণ এই যে, ষ্টাম্পের আইনের ১৫ ধারার ১ প্রকরণ এত স্পষ্ট সত্ত্বেও অনেক স্থলে তাহা অমান্য করা হয়।

### প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—দেখা যাইতেছে যে, এ এস্তমেজাজ এ আদালত গ্রহণ করিতে পারেন না, এবং ছোট আদালতের জজ যে বিষয় জিজ্ঞাসা

করিয়াছেন তাহা আইন-ঘটিত বিষয় নহে, সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার নিজের বিবেচনাধীন বিষয়।

জজের বাক্য মতে বাদী আপন খাতার এক পাতা-লিখিত হিসাব অনুসারে সুদ সমেত ১৫৭ টাকার দাবীতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত করে। তিনি বলেন, "প্রতিবাদী উক্ত দাবী অস্বীকার করে, এবং ষ্টাম্পের আইন বাধা স্বরূপ দর্শায়" তাঁহার এবাক্যের অর্থ আমার এই বোধ হয় যে, বাদী তাহার দাবী সপ্রমাণার্থে উল্লিখিত খাতা দাখিল করায়, প্রতিবাদী এই কারণে তাহা অগ্রাহ্য হইবার প্রার্থনা করে যে, তাহাতে উপযুক্ত ষ্টাম্প নাই। ষ্টাম্প আইনের যে ধারা (১৮৬২ সালের ১০ আইনের ১৫ এবং ১৭ ধারা) মতে আদালত কোন কোন স্থলে ষ্টাম্পের মুল্য এবং জরিমানা দেওয়া হইলে অনুপযুক্ত ষ্টাম্পে লিখিত দলীল প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন, ছোট আদালতের জজ তাহা দর্শান। যে স্থলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে আদালতের এমত হৃদয়ঙ্গম হয় যে, অনুপযুক্ত মুল্যের ষ্টাম্পে দলীল লিখিতপড়িত করা ষ্টাম্পের মুল্য এড়াইবার অভিসন্ধিতে হয় নাই, সে স্থলেই ষ্টাম্প দিবার বা কোন দলীল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিবার বিষয় ঐ সকল বিধানে আছে। এ মোকদ্দমায় ছোট আদালতের জজ তাঁহার সমীপস্থ ঘটনা হইতে অনুমান করেন যে, ঐ ব্যক্তির ষ্টাম্পের মুল্য এড়াইবারই অভিসন্ধি ছিল; সুতরাং তিনি ষ্টাম্প দিবার বা উক্ত দলীল প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিবার হুকুম দিতে পারেন না। এ প্রশ্ন তিনি তাঁহার সমীপস্থ প্রমাণ দৃষ্টে নিষ্পত্তি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। আমার বিবেচনায়, এই আদালতে এস্তমেজাজের যোগ্য কোন প্রশ্ন এস্থলে নাই। কাগজাৎ ছোট আদালতের জজের নিকট ফেরৎ যাইবে; তিনি এ বিষয়ে তাঁহার নিজের বিবেচনামত হুকুম দিবেন।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ গ্লবর।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজের এস্তমেজাজ।

মাধবচন্দ্র বিশ্বাস (প্রতিবাদী) দরখাস্তকারী।

অক্ষয়চন্দ্র বিশ্বাস (বাদী) প্রতিপক্ষ;

এবং

গোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) দরখাস্তকারী।

শ্রীকান্ত বসু (প্রতিবাদী) প্রতিপক্ষ।

চুম্বক।—যে স্থলে এক ব্যক্তি দুই ছোট আদালতের জজ হন এবং তিনি প্রতি মাসের প্রথম ১৫ দিন এক আদালতে এবং শেষ ১৫ দিন অপর আদালতে অধিবেশন করেন, তাহাতে তাহার প্রত্যেক "আদালতের পরের অধিবেশন" উক্ত জজ প্রথম যে তারিখে পুনরায় সেই আদালতে অধিবেশন করেন সেই তারিখে হইবে।

এস্তমেজাজ।—এই সকল মোকদ্দমায় আমি এই প্রশ্ন প্রধানতম বিচারালয়ের মতের জন্য অর্পণ করিতেছি যে, ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ২১ ধারায় "আদালতের পরের অধিবেশন" শব্দগুলি যে আছে, তাহার কি অর্থ হইবে। যে সকল আদালতের অধিবেশন বৎসরের সমুদায় কালই এক স্থানে হয়, তৎসম্বন্ধে ঐ শব্দগুলির অর্থ কঠিন নহে। কিন্তু এই আদালত প্রতি মাসের ১ লা হইতে ১৫ ই তারিখ পর্য্যন্ত এই স্থানে, এবং ১৫ ই হইতে মাসের শেষ পর্য্যন্ত রাণাঘাটে অধিবেশন করেন। এ মোকদ্দমা আদালতের কৃষ্ণনগরে অধিবেশনের শেষ তারিখে নিষ্পন্ন হয়। নুতন বিচারের দরখাস্তের নোটিস সাত দিনের মধ্যে ক্লার্কের নিকট দাখিল হয়, কিন্তু আসল দরখাস্ত পরের মাসের ১ লা তারিখের পরে ভিন্ন দাখিল হয় নাই; ঐ তারিখই আদালতের অধিবেশন কৃষ্ণনগরে হইবার প্রথম তারিখ।

এমত অবস্থায়, যে নিষ্পত্তির প্রতি আপত্তি হই-য়াছে তাহার পর আদালতের পরের অধিবেশনে দরখাস্ত না করায় দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে।

উকীলেরা তর্ক করেন যে, "আদালতের পরের অধিবেশন" শব্দে যে ১৫ দিন ঐক স্থানে আদা-লতের অধিবেশন হয়, সেই সমুদায় কাল বুঝায়; যথা, আদালত ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরে যে নিষ্পত্তি করিয়া রাণাঘাট উঠিয়া গিয়া তথায় ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত থাকিয়া আবার কৃষ্ণনগরে আগমন করত ১ লা জানুয়ারি হইতে ১৫ ই পর্য্যন্ত তথায় অধিবেশন করেন, সেই নিষ্পত্তির নূতন বিচারের প্রার্থনা করা হইলে ১ লা জানুয়ারি হইতে ১৫ ই তারিখ পর্য্যন্ত ১৫ দিবস একত্রে গ্রহণ করিয়া, তাহাই ১৫ ই ডিসেম্বরের পর কৃষ্ণনগরে আদালতের পরের অধিবেশন বলিয়া উক্ত দর-খাস্ত ১ লা জানুয়ারি হইতে ১৫ ই তারিখের মধ্যে যে কোন তারিখে দাখিল করা হউক, তাহাতেই তাহা মিয়াদ মধ্যে দাখিল করা হইবে, এমত তর্ক হইয়াছে।

উক্ত শব্দগুলির স্পষ্ট অর্থ হইতেই এই আপত্তি ভ্রান্তি-মূলক বোধ হয়। যাহা হউক, যে অর্থ লইয়া আপত্তি হইয়াছে তাহাও শুদ্ধ হওয়া অসম্ভব নহে; এবং যেহেতু এই প্রশ্ন সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে, যাহা বিচার করিতে সদাসর্ব্বদাই হইবার সম্ভাবনা, এবং উকীলগণ তাহা প্রধানতম বিচা-রালয়ের মতের নিমিত্ত অর্পণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, অতএব আমি তাহা অর্পণ করিলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এ মোকদ্দমা অতি স্পষ্ট। যদিও একই ব্যক্তি কৃষ্ণনগরের এবং রাণাঘাটের ছোট আদালতের জজ, তথাপি উক্ত দুই আদালত স্বতন্ত্র।

অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, জজ যিনি ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখে কৃষ্ণনগরের ছোট আদা-লতে অধিবেশন করেন, তিনি যদি ১৬ ই তারিখ হইতে মাসের শেষ পর্য্যন্ত রাণাঘাটে অধিবে-শন করিয়া ১ লা জানুয়ারিতে কৃষ্ণনগরে অধি-বেশন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাই ১৫ ই ডিসে-ম্বরের পর আদালতের পরের অধিবেশন হইবে, এবং প্রার্থী ঐ তারিখে তাহার দরখাস্ত করিতে পারিবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম

———                    (ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

পাবনার ছোট আদালতের জজের এস্ত-মেজাজ।

সিরাজদী প্রামাণিক প্রভৃতি, বাদী।

ইমাম্ বক্‌স বিশ্বাস, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—কোন ব্যক্তি ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ডিক্রী মতে কোন ভূমিতে দখল পাইলে তাহা তদুপরিস্থ শস্য সমে-তই প্রাপ্ত হয়, এবং সে তাহা কাটিয়া লইতে সম্পূর্ণ স্বত্ববান।

এস্তমেজাজ।—বাদিগণ পূর্ব্ব মাঘ মাসে গোরাই গ্রামে ৬/ বিঘা ভূমিতে যে ধান্য ও বিচালী চাষ করে, তাহা প্রতিবাদিগণ ১২৭৬ সালের ৯ ই আষাঢ় তারিখে বল-পূর্ব্বক কাটিয়া লওয়ায় সেই ধান্য এবং বিচালীর মূল্য বাবৎ বাদিগণ ১৮০ টাকার দাবীতে এই নালিশ উপ-স্থিত করে। প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, বাদি-গণ ঐ ধান্য বপন করে, এবং সে তাহা কাটিয়া লয়, কিন্তু সে এই তর্ক করে যে, যে ধান্য এবং বিচালী কাটিয়া লওয়া হয় তাহার যে মূল্য এবং পরিমাণ ধরিয়া নালিশ হইয়াছে তাহা অতিরিক্ত; সে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা অনু-যায়ী এক ডিক্রী অনুসারে উক্ত ভূমিতে দখল পায়, এবং বাদিগণ বল-পূর্ব্বক বপন করিয়া-ছিল বলিয়া সে উক্ত ধান্য কাটিয়া লয়, অত-এব বাদিগণের উক্ত শস্যে কোন স্বত্ব নাই।

অর্থী হইতে এই দুই ইসু উত্থিত হয়:—

১ ম।—প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা অনুসারে ঐ ভূমিতে দখল পাইবার পূর্ব্বে বাদিগণ তাহাতে যে ধান্য বপন করে, তাহা প্রতিবাদীর কাটিয়া লইবার বিধিমত স্বত্ব ছিল কি না?

২ য়।—বিরোধীয় ভূমিতে বাস্তবিক কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয়, এবং তাহার মূল্যই বা কি?

উভয় পক্ষই স্বীকার করে যে, বাদিগণ পূর্ব্ব মাঘ-মাসে ধান্য বপন এবং উৎপাদন করে, এবং প্রতিবাদী তাহা পরের (বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের) ৯ ই আষাঢ় তারিখে কাটিয়া লয়। প্রকাশ যে, পাবনার মুনসেফ ১৮৬৯ সালের ১৩ ই মে মোতাবেক ১২৭৬ সালের ১ লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রতিবাদীকে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা অনুসারে এক ডিক্রী দেন, এবং মুনসেফের আদালতের ডিক্রীর সহিত যে এক সার্টিফিকেট গাঁথা আছে, তাহাতে এই লেখা আছে যে, প্রতিবাদী ৮ ই আষাঢ় মোতাবেক ১৮৬৯ সালের ২১ এ জুন তারিখে বিরোধীয় ভূমিতে দখল পায়। প্রতিবাদী তর্ক করে যে, তাহার উক্ত ভূমির শস্যের উপর সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল, কারণ, সে আদালতের হুকুম অনুসারে ঐ ভূমিতে দখল পায়। এই আপত্তি অকর্ম্মণ্য। প্রতিবাদী কেবল উল্লিখিত ডিক্রী অনুসারে ঐ ভূমিতে দখল পায়, কিন্তু সে ঐ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের কিম্বা তাহার ফল সমেত দখল পায় নাই। ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারার অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ কোন প্রকারের হানির বিশেষ প্রতিকার প্রদান করা হয়। যাহাতে কোন বলবান ব্যক্তি দুর্ব্বলের হাত হইতে তাহার বহুকালের নির্ব্বিরোধ দখলের জমি কাড়িয়া লইতে না পারে, এবং উচ্ছেদিত ব্যক্তির উপর প্রমাণ-ভার নিক্ষেপ না করা হয়, এবং সেই ব্যক্তি বেদখলের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে তাহার ভূমির দাবীতে নালিশ করিতে পারে, উক্ত ধারায় এই বিধানই করা হইয়াছে। ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয়, এবং তাহা দ্বারা ১৮৪০ সালের ৪ আক্ট রদ হইয়াছে। এমত অবস্থায়, প্রতিবাদীর অনুকূলে যে ভূমিমাত্রের ডিক্রী দেওয়া হয়, তাহাতে বাদিগণ যে শস্য জন্মায় তাহা প্রতিবাদীর বিধি বিরুদ্ধে কাটিবার কোন স্বত্বই ছিল না। প্রতিবাদী ঐ ভূমিতে তাহার দখলের স্বত্ব সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে বাদিগণ তাহাতে নিরাপত্তিতে দখীলকার থাকিবার সময়ে শস্য জন্মায়। এমত অবস্থায় প্রতিবাদী কোন ক্ষমতা-প্রাপ্ত আদালতের সহায়তা ব্যতীত উক্ত ধান্য কাটিয়া আপন হস্তে আইন লইয়াছে। বাদিগণ উচিত মতেই হউক, বা অনুচিত মতেই উক্ত ভূমি দখল করিয়া থাকুক, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যে কাল পর্য্যন্ত উক্ত ভূমিতে শস্য ছিল, তাহার মধ্যে প্রতিবাদীর যে কোন ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা পূরণের দাবীতে প্রতিবাদীর উপযুক্ত আদালতে নালিশ করা উচিত ছিল। প্রতিবাদী উক্ত ডিক্রী দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইতে পারিত, সে এই রূপ বলপূর্ব্বক ধান্য কাটিয়া লওয়ায় তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। প্রতিবাদী আইন-বিরুদ্ধ বলপ্রকাশের অপরাধী হইয়াছে, এবং আদালত কিছুতেই এই রূপ আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎসাহ দিতে বাধ্য নহেন। অতএব এই মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয়ের হুকুম সাপক্ষে বাদিগণের অনুকূলে প্রদত্ত প্রমাণ অনুসারে পরিমাণমত খরচা সমেত ১০৯৷৷০ টাকার ডিক্রী দেওয়া গেল।

**প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তি।—**

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি এ মোকদ্দমায় ছোট আদালতের জজের যুক্তিতে একেবারেই সম্মতি দিতে পারিলাম না। যে ভূমির উপর বিরোধীয় শস্য জন্মান হয়, প্রতিবাদী তাহাতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ডিক্রীমতে দখল পায়। আমার বোধ হয় যে

স্পষ্টই উক্ত ভূমি তদুপরিস্থ শস্য সমেত প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং সে তাহা কাটিয়া লইতে সম্পূর্ণ স্বত্ববান। অতএব আমার বিবেচনায়, এই নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হওয়া উচিত ছিল।

বিচারপতি গ্লবর —আমারও ঐ মত। (ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

দানাপুরের দুর্গস্থ ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

দীপচাঁদ, বাদী।

গৌরী এবং বিহারী, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—কোন ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ যে হুকুম দেন তাহা ঐ আদালতের স্থায়ী জজ বিদায়ের পর ফিরিয়া আসিয়া আইন-বিরুদ্ধ বিবেচনায় প্রধানতম বিচারালয়ের হুকুমার্থে পাঠানে, স্থির হইল যে, প্রধানতম বিচারালয় এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ অনুসারে গ্রহণ করিতে পারেন না; কিন্তু ক্ষতি-গ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে হাইকোর্টের আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার্থে প্রধান-তম বিচারালয়ে দরখাস্ত করিতে পারে।

এস্তমেজাজ।—আমার বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিদায় গ্রহণানন্তর অনুপস্থিত থাকার কালে কাপ্তেন ওয়াকর আমার প্রতিনিধি স্বরূপে দুর্গস্থ মাজি-ষ্ট্রেট এবং ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হন। এই শেষোক্ত পদে তিনি আর আর মোকদ্দমার মধ্যে পার্শ্ব-লিখিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, এবং বাদীকে খরচা সমেত সম্পূর্ণ ডিক্রী দেন, কিন্তু তাহা কেবল প্রতিবাদী বিহারীর বিরুদ্ধে দেওয়া হয়।

দীপচাঁদ
বনাম
গৌরী এবং বিহারী

বাদীর দাবীর বর্ণনার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয় সকলের বর্ণনা দেখা যায়:—"প্রমিসরী নোট কেবল বিহারীর দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছে গৌরী বিহারীর পুত্র বলিয়া আমি গৌরীর প্রতি সমন করি।" (গৌরীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ফরিয়াদীর ২০ টাকা জরিমানা হয়)।

প্রতিনিধি জজ এই রূপে বাদীকে অন্যায় রূপে ২০ টাকা জরিমানা করেন; এবং কেবল এই নহে, এতদ্ব্যতীত সেই প্রকার অনিয়মিতরূপে এবং কোন হুকুম না লিখিয়া উক্ত টাকা চারি দিবস পরে, গৌরী প্রতিবাদীকে দেওয়া হয়।

উক্ত প্রমিসরী নোট দৃষ্টে দেখা যায় যে, যদিও তাহাতে উভয় বিহারী ও গৌরীর (পিতা এবং পুত্রের) স্বাক্ষর ছিল না, তথাপি তাহাদের নাম ঐ খতের গর্ভে বিরোধীয় ঋণ-গৃহীতা বলিয়া বর্ণিত আছে।

বাদী দীপচাঁদ এক্ষণে এই হেতুবাদে উক্ত জরিমানার ২০ টাকা ফেরৎ পাইবার প্রার্থনা করে যে, ঐ জরিমানা বিধি-বিরুদ্ধ রূপে করা হয়; এবং আমার বিবেচনায়, তাহাই হইয়া-ছিল; কিন্তু আমার এই বিষয়ের বিচার করি-বার ক্ষমতা নাই বলিয়া আমি আদালতের হুকুমার্থে কাগজাৎ পাঠাইলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমায় দানাপুরের দুর্গস্থ ছোট আদালতের জজ বিধি-নির্দ্দিষ্ট বিদায় লইয়া অনুপস্থিত থাকিবার সময় যে ব্যক্তি তাঁহার প্রতিনিধি হন্ তাঁহার প্রদত্ত এক হুকুম এই আদালতে উপস্থিত করিয়াছেন, এবং জজ বিবেচনা করেন যে, ঐ হুকুম আই-নের কোন বিধান ব্যতীত প্রদত্ত হয়; এবং তাঁহার এমত বিবেচনা করার দ্রষ্টব্য হেতুও আছে। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, আমরা এ মোকদ্দমা এই এস্তমেজাজ মতে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহি। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে, 'হাইকোর্টের আইনের' ১৫ ধারা অনুসারে তত্ত্বাবধান করিবার যে অতিরিক্ত ক্ষমতা এই

আদালতের আজ্ঞে তাহা পরিচালন দ্বারা ঐ হুকুম রহিত করিবার নিমিত্ত এই আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(ব)

———

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

যশোহরের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

মুজদ্দীন গাজী প্রভৃতি, বাদী।

দীনবন্ধু গোস্বামী প্রভৃতি, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—কোন অকৃতকার্য্য দাবীদার অস্থাবর সম্পত্তিতে আপন স্বত্ব সংস্থাপনের এবং তাহার মূল্য পাওয়ার দাবীতে নালিশ করিলে, সেই নালিশ ছোট আদালতের বিচার্য্য নহে।

এস্তমেজাজ।—কোন দাবীদার দাবীদারীতে অকৃতকার্য্য হইয়া নালিশের আরজীর তফসীল-লিখিত অস্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব সংস্থাপনার্থে এবং তন্মূল্যের দাবীতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে; অতএব প্রশ্ন এই যে, এরূপ মোকদ্দমা ছোট আদালতে চলিতে পারে কি না।

পার্শ্ব-লিখিত মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তি দ্বারা সন্দেহ উপস্থিত না হইলে আমি মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইতাম; উক্ত নিষ্পত্তিতে মান্যবর

> রামধন বিশ্বাস বনাম কেফাত বিশ্বাস প্রভৃতি প্রতিবাদী
> ১০ বালম উঃ রিঃ ১৪১ পৃষ্ঠা, দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

প্রধান বিচারপতি কহেন যে, "কোন ব্যক্তির "বিরুদ্ধে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা- "নুযায়ী হুকুম হইলে তাহাকে ঐ ধারামতে যে "নালিশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা "তাহার স্বত্ব সাব্যস্তের নালিশ, এবং এরূপ নালিশ "ছোট আদালতে চলিতে পারে না।"

কিন্তু এই নিষ্পত্তি সদরল্যাণ্ডের ২ য় বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ৪৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত উমেশচন্দ্র বসু বাদী আপেলাণ্ট বনাম মদনমোহন সরকার প্রভৃতি রেস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির, এবং সদরল্যাণ্ডের মফঃসল ছোট আদালতের এস্তমেজাজের রিপোর্টের ১১৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত আমার এস্তমেজাজ মতে প্রধানতম বিচারালয় যে মত স্থির করেন তাহার, বিপরীত দেখা যাইতেছে।

নালিশের আরজী-লিখিত প্রার্থনা যদি তল্লিখিত সম্পত্তিতে বাদীর কেবল স্বত্ব সংস্থাপনার্থে হইত, তবে আর কোন প্রতিকারের প্রার্থনা না থাকায়, উপস্থিত মোকদ্দমা ছোট আদালতে চলিত না; কিন্তু তাহাতে আরো এই প্রার্থনা আছে যে, ঐ সম্পত্তির মূল্য বাদীকে দেওয়া হয়; অতএব আমার বিবেচনায়, অকৃতকার্য্য দাবীদারের এরূপ নালিশ স্পষ্টই ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত; কারণ, যদি তাহা না হয়, তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, যে মোকদ্দমায় উপযুক্ত আপত্তি দ্বারা সম্পত্তির প্রতি স্বত্বের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহাই, সম্পত্তির মূল্য ৫০০ টাকার অনধিক হইলেও, ছোট আদালতে চলিবে না; কিন্তু এরূপ মোকদ্দমায় সর্ব্বদা সম্পত্তির প্রতি স্বত্বের ইসু, বিচার এবং মীমাংসা হইতেছে। আর একটা মোকদ্দমা দেখুন। মনে করুন, কোন ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়, এবং সে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা দিতে অসমর্থ বা অনিচ্ছু হয়; এমত স্থলে কি বলা যাইতে পারে যে, উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৫০০ টাকার অনধিক হইলে, সেই সম্পত্তির বা তাহার মূল্যের দাবীতে ঐ ব্যক্তির নালিশ ছোট আদালতে চলিবে না? আমার বিবেচনায় তাহা বলা

যাইতে পারে না। তদ্রূপ, উপস্থিত মোকদ্দমাও আমার মতে ছোট আদালতে চলিতে পারে; এবং যে সম্পত্তি খালাস দেওয়া হইয়াছে এবং যাহা কখনই দায়ীর প্রকৃত বা আনুমানিক দখলে ছিল না, সেই সম্পত্তিতে যে ব্যক্তি তাহার ঐ দায়ীর স্বত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য নালিশ করে, সুতরাং ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ঐ সম্পত্তির বা তাহার মূল্যের দাবীতে নালিশ করিতেছে এমত বলা যাইতে পারে না, তাহার মোকদ্দমা হইতে এ মোকদ্দমা স্পষ্টই ভিন্ন, এবং এ দুই মোকদ্দমার প্রতিকারের প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্ন; এবং যে মোকদ্দমা ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টর হইতে দর্শান হইয়াছে তাহাতে তাহা প্রদান করা যাইতে পারিত না।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—ছোট আদালত যে সকল নিষ্পত্তি দর্শাইয়াছেন এ মোকদ্দমায় আমাদের তাহার প্রথম নিষ্পত্তির অনুবর্ত্তী হওয়া উচিত। উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমার অবিকল অনুরূপ; এবং আমার বিবেচনায়, উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অতি শুদ্ধ। এই মোকদ্দমায় ছোট আদালতের জজ যে তর্ক করেন তাহা কেবল এই সাব্যস্ত করণার্থে হইয়াছে যে, প্রধানতম বিচারালয়ের উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অসঙ্গত; এবং এ মোকদ্দমায় বাদী যে অস্থাবর সম্পত্তিতে আপন স্বত্ব সংস্থাপন করিতে চাহে তাহা সে না পাইলে তৎপরিবর্ত্তে যে টাকা দিবার প্রার্থনা করে, তদ্দ্বারা ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমার বিবেচনায় ছোট আদালতের এ মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার নাই।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত। (ব)

---

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

পাব্‌নার অধঃস্থ জজের এস্তমেজাজ।

শম্ভুনাথ মজুমদার (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

কাশীশ্বরী দেবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

আপেলাণ্টের পক্ষে উকীল নাই।

বাবু মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাদিনী ও প্রতিবাদী কোন এক ডিক্রীর অংশী ছিল; এবং তাহাদের প্রত্যেকের অংশ ডিক্রীতে নির্দ্দিষ্ট ছিল; প্রতিবাদী দায়ীর নিকট হইতে আপোসে আপনার এবং বাদিনীর অংশের টাকা গ্রহণ করে। বাদিনী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্বীয় অংশের টাকার দাবীতে নালিশ করাতে প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, উক্ত টাকা বাদিনীকে দেওয়া হইয়াছে।

এমত স্থলে, প্রতিবাদী যদি বাদিনীর প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে এই চুক্তি থাকিবার কথা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, প্রতিবাদী বাদিনীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া তাহাকে তাহা নগদ দিবে বা তাহার নিকাশ দিবে; সুতরাং এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন।

যে অধঃস্থ জজের নিকট এই মোকদ্দমার আপীল হয়, তিনিই ছোট আদালতের জজ ছিলেন, এজন্য প্রধানতম বিচারালয়ে এ বিষয়ের এস্তমেজাজ না করিয়াই তিনি তাহার বিচার করিতে পারেন।

এস্তমেজাজ।—পাব্‌নার মুন্সেফ মৌলবী আলী আহম্মদ ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে এই আপীল উপস্থিত হয়।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এইঃ—

উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদিনী ও প্রতিবাদী এবং আর এক ব্যক্তি কোন এক ডিক্রীর (১৮৬২ সালের ৩২৭ নং) অংশী ছিল, যাহাতে উক্ত তিন ডিক্রীদারের আপন আপন অংশ নিশ্চিত রূপে বর্ণিত ছিল। প্রতিবাদী দায়ীর নিকট আপোসে তাহার নিজের অংশের ৭৭৷৴ এবং বাদিনীর পক্ষে তাহার অংশের ৫৬ টাকা লয়, এবং উক্ত মোকদ্দমা ১৮৬৬ সালের ১০ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঐ রূপে শেষ হইয়া যায়।

প্রতিবাদী বাদিনীর অংশের টাকা তাহাকে, না দেওয়ায় মুন্সেফ-আদালতে নালিশ হয়। প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, সে বাদিনীর অংশের উক্ত ডিক্রীর টাকা লইয়াছিল, কিন্তু আর আর আপত্তির মধ্যে এই হেতুবাদে তাহার দায়িত্ব অস্বীকার করে যে, উক্ত টাকা বাদিনীকে দেওয়া হইয়াছে। মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারে মুন্সেফ বাদিনীর অনুকুলে ডিক্রী দেন।

এই আদালতের প্রথম এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যে, এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন, না সাধারণ দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন।

প্রথম আদালতে তমাদীর ইসু উত্থাপিত না হইলে তাহা যেমন জাবেতা আপীল-আদালতের ধার্য্য করিবার ক্ষমতা আছে, সেই রূপে নিম্ন আদালত বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের বিচার না করিয়া থাকিলেও এই আদালতের তাহা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৫০ ধারা অনুসারে বিচার করিবার কোন বাধা নাই। দ্রষ্টব্য, ১১ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৮৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত তনু গাইতী আপেলাণ্টের মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয়ের ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রিলের নিষ্পত্তি। কালীনাথ রায় বনাম লীলারাম প্রামাণিকের মোকদ্দমার এস্তমেজাজে প্রধানতম বিচারালয় যে নিষ্পত্তি করেন ও যাহাতে আদালত পাবনার ছোট আদালতের এই মতে সম্মতি দেন, (১৮৬৭ সালের ১৮ ই জানুয়ারির ১৫৯ নং ) যে, কোন এজমালী ডিক্রীর এক অংশী তাহার অংশের অতিরিক্ত টাকা লইলে তাহার নামে ছোট আদালতে নালিশ হইবে না, তাহা, এবং ৩ য় বালম ওয়াইমানের রিপোর্টের ৬০ এবং ৩২ পৃষ্ঠা-প্রচারিত সাবো মাঝী বনাম নুরাই মোল্লার এবং শ্রীপতি রায় বনাম লোহারাম রায় প্রভৃতির মোকদ্দমার নিষ্পত্তি উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় না, কারণ, উল্লিখিত মোকদ্দমা সমস্তে অংশ স্থির করিবার আবশ্যক ছিল, কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহার কিছু আবশ্যক ছিল না, অংশ নির্দ্ধারণের পরেই ডিক্রীজারী হয়, এবং প্রতিবাদী তাহার বর্ণনা-পত্রে উক্ত অংশ নির্দ্দিষ্ট থাকার প্রতি কোন আপত্তি করে না। ১৮৬১ সালের ১০ ই ফেব্রুয়ারির দরখাস্ত যাহা প্রতিবাদী ডিক্রীজারীর সময়ে দাখিল করে, তাহাতে স্বীকার করা হয় যে, সে উক্ত ৫৬ টাকা বাদিনীর শরীক বলিয়া গ্রহণ করে নাই, বাদিনীর মোক্তার স্বরূপে তাহার পক্ষে উহা লয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, উভয় পক্ষই উক্ত দাবী নিশ্চিত এবং নির্দ্ধারিত টাকার দাবী হওয়া সম্বন্ধে সম্মত হইয়াছে।

নিম্ন আদালত যে মত প্রকাশ করেন যে, উভয় বাদিনী ও প্রতিবাদী এক সাধারণ ডিক্রীর এজমালী শরীক, তাহা ভ্রান্তিমূলক। নালিশের আরজী হইতে কেবল এই একমাত্র ইসু উত্থিত হইতে পারে যে, প্রতিবাদী ঐ টাকা বাদিনীর মোক্তার স্বরূপে তাহার পক্ষে আদায় করিয়া লয় কি না; কিন্তু প্রতিবাদী যখন স্বীকার করিয়াছে যে, সে উক্ত টাকা আদায় করিয়া বাদিনীকে দিয়াছে, তখন কেবল এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে হয় যে, প্রতিবাদী বাস্তবিকই ঐ টাকা দিয়াছে কি না। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এ মোকদ্দমা ঋণের দাবীর মোকদ্দমার ন্যায়, এবং প্রতিবাদীর বসতবাটী পাবনার ছোট আদালতের বিচারাধিকারের অন্তর্গত বিধায় এ মোকদ্দমার বিচার উক্ত আদালতেই হইবে। এ মোকদ্দমার দাবী ৫০০ টাকার ন্যূন বিধায় প্রধানতম বিচারালয়ে খাস আপীল হইবে না। অতএব এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য উক্ত আদালতের মান্যবর বিচারপতিগণের মত লওয়া অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে। অতএব প্রধানতম বিচারালয়ের হুকুমের সাপক্ষে এই আপীলের ডিক্রী দেওয়া গেল এবং নিম্ন আদালতের হুকুম অন্যথা করা গেল

প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তি :—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—পাবনার অধঃস্থ জজ আমাদের নিকট যে আইন-ঘটিত প্রশ্ন পাঠাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার বিবেচনায়, উক্ত আদালতের মীমাংসাই শুদ্ধ হইয়াছে, কারণ, উভয় পক্ষের বর্ণনা এবং মুন্সেফ-আদালতে যে সকল ইসুর বিচার হয়, তদ্দৃষ্টে অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কেবল এই বিষয় লইয়াই বিরোধ উপস্থিত যে, প্রতিবাদী যে টাকা বাদিনীর মোক্তার স্বরূপে তাহারই পক্ষে গ্রহণ করিবার বিষয় স্বীকার করে, তাহা সে বাদিনীকে দিয়াছে কি না। বোধ হয় নালিশের আরজীতে স্পষ্ট প্রকাশ নাই যে, প্রতিবাদী বাদিনীর মোক্তার স্বরূপে কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু নালিশের আরজী এবং প্রতিবাদীর বর্ণনা একত্রে লইলে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

৭ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৭৭ পৃষ্ঠা-প্রচারিত মোকদ্দমা যে পূর্ণাধিবেশনে নিষ্পত্তি হয়, তাহার রায়ের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, "ছোট আদালতের আইনের ৬ ধারায় "যে 'চুক্তি' শব্দ আছে, তাহাতে স্পষ্টই হউক "বা আনুমানিকই হউক, যথার্থ চুক্তি বুঝায়।" আমার মত এই যে, প্রতিবাদী যদি বাদিনীর মোক্তার স্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে এই চুক্তি থাকিবার বিষয় অনুমানিত হইবে যে, প্রতিবাদী বাদিনীর এই প্রাপ্য টাকা লইয়া তাহাকে দিবে, নচেৎ তাহাকে ঐ টাকার নিকাশ দিবে। অতএব আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন।

সেই সঙ্গে, আমার এই সন্দেহ আছে যে, উপস্থিত স্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আবশ্যক ছিল কি না, কারণ, পাবনার ছোট আদালতের জজ এবং অধঃস্থ জজ একই ব্যক্তি; সুতরাং যে ব্যক্তি এ মোকদ্দমায় বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় আপীলের বিচার করেন, এবং যাঁহার রায় ঐ সকল বৃত্তান্ত সম্বন্ধে চূড়ান্ত, তাঁহাকেই এই মোকদ্দমা ছোট আদালতের জজ স্বরূপে প্রথম বিচার করিতে হইত। অতএব আমার বোধ হয় যে, তিনি বৃত্তান্তের বিচার করিতে পারেন এবং তাঁহার বিবেচনায়, মুন্সেফের নিষ্পত্তি দোষগুণ সম্বন্ধে শুদ্ধ বোধ হইলে তিনি তাহা স্থির রাখিতে পারেন; নচেৎ পক্ষগণকে নিরর্থক বহুতর অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপ করিয়া পরিশেষে সেই আদালতেই যাইতে হয়।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

---

(ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ গ্লবর।

রাণাঘাটের ছোট আদালতের জজের এন্তমেজাজ।

শম্ভুচন্দ্র মৌলিক, বাদী।

প্রাণকৃষ্ণ মৌলিক প্রভৃতি, প্রতিবাদী।

বাবু অম্বিকাচরণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু তারকনাথ সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইট লইয়া যাওয়ায় তাহার ক্ষতিপূরণের দাবীর নালিশে প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, সে তাহা সরলান্তঃকরণে মূল্য দিয়া বাদীর পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে ক্রয় করে; বাদী উত্তরে বলে যে, হিন্দু-বিধবা তাহা বিধিমত প্রয়োজনাভাবে বিক্রয় করায় উক্ত বিক্রয় অসিদ্ধ।

এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন।

এন্তমেজাজ।—আমি এ মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয়ের নিষ্পত্তির জন্য এই প্রশ্ন অর্পণ করিতেছি যে, এ মোকদ্দমা বর্ত্তমান অবস্থায় ছোট আদালতে চলিবে কি না।

প্রতিবাদী বাদীর বাটীর এক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইট লইয়া যাওয়ায় বাদী তাহার ক্ষতিপূরণের দাবীতে প্রতিবাদীর নামে এই নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীর জওয়াব এই যে, সে বাদীর পূর্ব্ব-পুরুষের নিকট হইতে তাহা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে; বাদী তাহার এই উত্তর দেয় যে, উক্ত বিক্রয় অসিদ্ধ, কারণ, এক হিন্দুবিধবা বিধিমত প্রয়োজনাভাবে তাহার স্বামীর পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে। এইরূপ তর্ক হওয়ায় আমার প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল যে, প্রতিবাদী যদি উক্ত বিধবার নিকট হইতে ক্রয় করিবার বিষয় সপ্রমাণ করিতে পারে, তবে কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক উক্ত বিক্রয় অন্যথা না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালিশ হইতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিয়া আমার এই সন্দেহ হইতেছে, যে, সে যে প্রতিকারের প্রার্থনা করে তাহাকে তাহা না দিয়া তাহাকে দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার আমার ক্ষমতা আছে কি না। এই মোকদ্দমা ক্ষতিপূরণের দাবীতে উপস্থিত; অতএব তাহা নিশ্চয়ই ছোট আদালতের বিচারাধীন (১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারা); এবং আমি বিবেচনা করি এমত অবস্থায় যে প্রশ্ন আনুষঙ্গিকরূপে উত্থিত হয়, যথা বিধবা কর্তৃক বিক্রয় ন্যায্য হইতে পারে এমত প্রয়োজন ছিল কি না, এবং যাহার মীমাংসা মূল ইসুর বিচারার্থে আবশ্যক, এই আদালতের তাহার বিচার করিবার অধিকার আছে। দ্রষ্টব্য, ১৮৬৩ সালের ২৫ এ আগষ্ট তারিখের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি, রঘুরাম বিশ্বাস বনাম রামচন্দ্র দোবে।

বৃত্তান্ত দৃষ্টে আমি দেখিতেছি যে, উক্ত বিক্রয় বাস্তবিকই হইয়াছে, এবং মূল্য লইয়া বিক্রয় করা হইয়াছে; কিন্তু কিছুকাল পরেই উক্ত বিধবার অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্নাবস্থায় মৃত্যু হওয়া সপ্রমাণ হওয়ায়, এবং সে উক্ত বিক্রয় কার্য্যের সময় বহুতর ভূসম্পত্তিতে দখীলকার থাকায়, দীনাবস্থায় পড়িয়া যে ঐ বিক্রয় করা হইয়াছিল, একথা প্রতিপন্ন হয় না; পরন্তু, অতি অনুপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে।

আমি প্রধানতম বিচারালয়ের মত সাপক্ষে এই মোকদ্দমার ডিক্রী দিলাম।

**প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—**

**বিচারপতি জ্যাক্সন।**—আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ছোট আদালত এ মোকদ্দমার উচিত নিষ্পত্তিই করিয়াছেন। এ মোকদ্দমা নিঃসন্দেহ উক্ত আদালতের বিচারাধীন। প্রতিবাদী বাদীর এক প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইট লইয়া যাওয়ায় যে অন্যায় কার্য্য করে, বাদী তাহার ক্ষতিপূরণের দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, যে ব্যক্তি বাদীর পূর্ব্বে উক্ত সম্পত্তিতে বিধিমত দখীলকার ছিল তাহার নিকট হইতে প্রতিবাদী তাহা ক্রয় করায় ঐ সকল ইট তাহারই সম্পত্তি। এই জওয়াব অপ্রমাণ হয়, কিন্তু তাহা অপ্রামাণ্য হউক বা না হউক, তাহা বিচারাধিকারের প্রশ্ন নহে, যে প্রণালীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয় তাহারই উপর তাহা নির্ভর করে। বিপক্ষের উকীল এই শুননীর ফী ৮ টাকা পাইবেন।

**বিচারপতি গ্লবর।**—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজের এজলেজাজ।

গিরিজাভূষণ হালদার (প্রতিবাদী) দরখাস্তকারী।

অভয় নিকারী (বাদী) প্রতিপক্ষ।

**চুম্বক।**—কোন ছোট আদালত ৬ ই নবেম্বর তারিখে কোন মোকদ্দমার ডিক্রী দেন; ১২ ই হইতে ১৫ ই পর্য্যন্ত রবিবার ও নির্দ্দিষ্ট পর্ব্ব উপলক্ষে আদালত বন্ধ থাকায় নূতন বিচারের দরখাস্তের নোটিস ১৬ ই তারিখে দাখিল করা হয়।

এমত স্থলে, উক্ত নোটিস দেওয়ার জন্য আইনে

যে ৭ দিনের মিয়াদ দেওয়া হইয়াছে তাহার শেষ তারিখে আদালত বন্ধ থাকায় তাহার পর প্রথম যে তারিখে আদালত খোলে, সেই তারিখে দরখাস্তকারী ঐ নোটিস দিতে পারে।

এস্তমেজাজ।—এ মোকদ্দমায় বিপক্ষ উপস্থিত হইয়া আপত্তি করে, এবং ৬ ই নবেম্বর তারিখে তাহার ডিক্রী দেওয়া হয়। ১২ ই ও ১৩ ই তারিখে পর্ব্ব উপলক্ষে, ১৮ ই তারিখ রবিবার হওয়ায় এবং ১৫ ই তারিখে পর্ব্ব উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল। নূতন বিচারের দরখাস্তের নোটিস ১৬ ই তারিখে অর্থাৎ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সাত দিন গত হওয়ার পরে দাখিল হয়। আমি প্রধানতম বিচারালয়ের মতের জন্য এই প্রশ্ন অর্পণ করিতেছি যে, ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ২১ ধারা অনুসারে যে সাত দিনের মধ্যে নোটিস দাখিল করিতে হয়, তাহার মধ্যে আদালত যে চারি দিন বন্ধ ছিল তাহা দরখাস্তকারীকে ঐ ৭ দিন গণনায় বাদ দিতে দেওয়া যাইতে পারে কি না।

আমার মতে বিশেষতঃ তমাদীর আইনঅনুগত নিষ্পত্তি-সমূহে যাহা সংস্থাপিত হইয়াছে তদনুসারে সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে, গেজেটে নির্দিষ্ট পর্ব্বাহ এবং রবিবার ঐ গণনা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না; রাজকৃষ্ণ রায় বনাম দীনবন্ধু শর্ম্মা, ৩য় বালম উইকলি রিপোর্টর দেওয়ানী সম্পর্কীয় এস্তমেজাজ, ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, আপীল সম্বন্ধে স্বতন্ত্র এক নিয়ম সংস্থাপিত হওয়া দৃষ্ট হয়, (দ্রষ্টব্য উল্লিখিত নজীরের টীপ্পনী); এবং ৬ ষ্ঠ বালম উইকলি রিপোর্টরের ১৯ পৃষ্ঠা-প্রচারিত সাহজাদা উলাগোহরের মোকদ্দমায় স্থির হয় যে, যে মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৭৭ ধারার অন্তর্গত, তাহাতে দশহরার বন্ধের দিন গণিত হইবে না। কিন্তু তাহা ছোট আদালত সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় না।

এ মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি নূতন বিচারের প্রার্থনা করে, ৮ ই, ৯ ই, ১০ ই ও ১১ ই তারিখে আদালত খোলা থাকায়, তাহার কোন এক তারিখে সে তাহার নোটিস দাখিল করিতে পারিত, এবং তাহা হইলে ঐ দরখাস্ত ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ২১ ধারা অনুসারে মিয়াদ মধ্যেই হইত।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমার প্রশ্ন এই যে, ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ২১ ধারার শেষ অংশ অনুসারে নিষ্পত্তির তারিখ হইতে সাত দিনের মধ্যে যে দরখাস্তের নোটিস দাখিল করিবার নিয়ম আছে তাহা, সপ্তম দিবস এবং তাহার পরের কয়েক দিবস গেজেটনির্দিষ্ট পর্ব্বাহ হওয়ায় ঐ বন্ধের পর আদালত খুলিবার প্রথম তারিখে দাখিল করা হইলে মিয়াদ মধ্যেই দাখিল হওয়া গণ্য হইবে কি না।

আমার বিবেনায়, উক্ত নোটিস মিয়াদ মধ্যেই দাখিল হইয়াছে। এ মোকদ্দমায় ৬ ই নবেম্বর তারিখে রায় দেওয়া হয়, তাহার পর সপ্তম দিবস ১৩ ই তারিখে পড়ে; কিন্তু ১২ ই, ১৩ ই এবং ১৫ ই নির্দিষ্ট পর্ব্বাহ এবং ১৪ ই রবিবার ছিল। নূতন বিচারের দরখাস্তের নোটিস ১৬ ই তারিখে দাখিল হইয়াছে। জজ বলেন যে, উক্ত ব্যক্তি ৮ ই, ৯ ই, ১০ ই, ১১ ই তারিখে নোটিস দাখিল করিতে বা দিতে পারিত। সে তাহা করিতে পারিত বটে; কিন্তু আইনে যখন তাহাকে তন্নিমিত্ত সাত দিন সময় দেওয়া হইয়াছে, তখন সে তাহা করিতে বাধ্য ছিল না; এবং যদি সেই সাত দিনের শেষ দিন আদালত বন্ধ থাকে, তবে তাহা দরখাস্তকারীর দোষ নহে, এবং তাহার পর প্রথম যে তারিখে সে আদালত খোলা এবং তাহার নোটিস গ্রহণ করিতে প্রস্তুত দেখে সেই তারিখে সে তাহা দাখিল করিতে স্বত্ববান।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত। (ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং
এফ, এ, গ্লবর্।

১৮৬৯ সালের ৪৩৮ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ-পরগণার জজের ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা সেপ্‌টেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

জগমোহন বক্সী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী প্রভৃতি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

আপেলাণ্টের উকীল নাই।

বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন দুই ব্যক্তির এক ডিক্রী অনুসারে (পাল্‌টা ডিক্রী নহে) পরস্পরের নিকট কিছু টাকা পাওনা হয়, তাহাতে যাহার অল্প টাকা প্রাপ্য তাহাকে, যাহার অধিক টাকা প্রাপ্য তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে দেওয়া যাইতে পারে না; আদালত তাহার ওজেবাদ হইবার বা অধিক টাকাতে ঐ অল্প টাকা উসুল দিবার হুকুম দিতে পারেন।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমায় আপেলাণ্টের উকীল আমাদের নিকট উপস্থিত হন নাই, কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল উপস্থিত থাকায় এবং জজের নিষ্পত্তি ভ্রান্তি-মূলক বোধ হওয়ায় আমরা ঐ উকীলকে উক্ত রায়ের পোষকতা করিতে বলি। তিনি স্বীকার করেন যে, জজ যে হেতু লইয়াছেন, তদনুসারে উক্ত নিষ্পত্তি সমর্থিত হইতে পারে না। অতি স্পষ্ট দেখা যায় যে, যে স্থলে ডিক্রী অনুসারে খয়ের নিকট কয়ের কিছু টাকা পাওনা হয়, এবং কয়ের নিকট খয়ের কিছু পাওনা হয়, তাহাতে ক খয়ের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে প্রার্থনা করিলে, কয়ের নিকট খয়ের যে টাকা প্রাপ্য তাহা, তাহা হইতে বাদ দেওয়া উচিত। দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২০৯ ধারা দৃষ্টে বোধ হইবে যে, কেবল এক ডিক্রী থাকায়, এবং পাল্‌টা ডিক্রী না থাকায় যে ব্যক্তির অল্প টাকা প্রাপ্য তাহাকে, যাহার অধিক টাকা প্রাপ্য তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে দেওয়া যাইতে পারে না; সেই জন্য আদালত ঐরূপ বাদ দিতে অর্থাৎ ডিক্রীকৃত অধিক টাকা হইতে অল্প টাকার ভাগ কাটিয়া দিতে বাধ্য।

যাহা হউক, আর এক প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে যাহার মীমাংসা জজ করেন নাই। অতএব জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া এ মোকদ্দমা তাঁহার নিকট এই জন্য ফেরৎ পাঠান যাইতেছে যে, তিনি দেখেন যে, এই আপীলের অন্যান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে কি প্রকারের দায়িত্ব আছে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(ব)

---

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০

বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং
ডব্লিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৮৬৮ নং মোকদ্দমা।

সারণের অধঃস্থ জজ ছাপড়ার মুন্‌সেফের ১৮৬৮ সালের ১২ ই নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৫ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

জগদেব সিংহ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

সেখ মোলাজিম হোসেন এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে প্রতিবাদী নিম্ন আপীল-আদালতে প্রার্থনা করে যে, বাদীকে সাক্ষী স্বরূপ সমন করিয়া তাহার জবানবন্দী করা হয়, এবং সে বাদীর সাক্ষ্য দৃষ্টেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি

হওয়ে [illegible] হয়, কিন্তু পশ্চাতে আর এক দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা করে যে, বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যক নাই; সে স্থলে একমাত্র বাদীর সাক্ষ্য দ্বারাই প্রতিবাদীকে বাধ্য করা উচিত নহে; নথীস্থ অন্যান্য প্রমাণও পর্য্যালোচনা করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা আদালতের কর্ত্তব্য।

বিচারপতি বেলি।—এ মোকদ্দমায় বাদী কোন কট খালাস করিয়া দখলের দাবীতে নালিশ করে।

প্রতিবাদী বাদীর কট খালাস করিয়া লইবার স্বত্ব অস্বীকার করে।

প্রথম আদালত মোকদ্দমার সমস্ত প্রমাণ দৃষ্টে, কিন্তু বাদীর জবানবন্দী না লইয়া বাদীকে এই সর্ত্তে ডিক্রী দেন যে, তাহার আদালতে কতক টাকা আমানত করিতে হইবে।

নিম্ন আপীল-আদালত কেবল এই এক হেতুবাদে প্রতিবাদীর আপীল ডিস্‌মিস্ করেন যে, যখন প্রতিবাদী নিজেই বাদীকে সাক্ষী মানে, এবং বাদীর সাক্ষ্যেই বাধ্য হইতে সম্মত হয়, এবং যখন উক্ত বাদীর সাক্ষ্য প্রতিবাদীর বাক্যের বিরোধী, তখন প্রতিবাদীর আর কোন আপত্তি শুনা যাইতে পারে না। নিম্ন আপীল-আদালত কেবল এই হেতুবাদে এবং প্রতিবাদীর আর কোন প্রমাণ না দেখিয়া প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

খাস আপীলে প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, নিম্ন আপীল-আদালতের এই কার্য্য আইন-ঘটিত ভ্রম-মূলক, কারণ, যদিও ৫ ই মে তারিখে প্রতিবাদী বাদীকে এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত সমন করিতে আদালতে প্রার্থনা করে, কিন্তু বাদীর জবানবন্দী লইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২ ই মে তারিখে, প্রতিবাদীর এই বিশ্বাস জন্মে যে, সে, অর্থাৎ প্রতিবাদী পূর্ব্বে যে রূপ ভরসা করিয়াছিল, বাদী সেরূপ সত্য কথা বলিবে না; অতএব সে উক্ত তারিখে আদালতে দরখাস্ত করে যে, বাদীর সাক্ষ্য না লওয়া হয়, এবং আদালত স্বয়ং স্থানীয় তদন্ত করিয়া তদ্দৃষ্টে এবং মোকদ্দমার আর আর প্রমাণ দৃষ্টে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বাদীর জবানবন্দী লইবার পূর্ব্বে ১২ ই মে তারিখে যে দরখাস্ত করা হয় তাহা দ্বারাই ৫ ই মে তারিখের দরখাস্ত রূপান্তরিত হয়; এবং এমত অবস্থায় প্রতিবাদীর ৫ ই মে তারিখের প্রার্থনায়ই তাহাকে আবদ্ধ রাখা এবং উক্ত প্রার্থনা অনুসারে তাহাকে কেবল বাদীর জবানবন্দীতে সম্পূর্ণ রূপে বদ্ধ করা উচিত নহে। আমার বিবেচনায় এ মোকদ্দমার অবস্থা অনুসারে বাদীর নিজের জবানবন্দীর সহিত নথীস্থ আর আর প্রমাণ দেখিয়া সমস্ত প্রমাণ একত্রে বিবেচনা করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা নিম্ন আপীল-আদালতের কর্ত্তব্য ছিল।

আমাদিগকে দুইটি নজীর অর্থাৎ একটি খাস আপেলাণ্ট কর্ত্তৃক ১ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৯১ পৃষ্ঠা হইতে, এবং অন্যটি খাস রেস্পণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৩৪ পৃষ্ঠা হইতে দর্শান হয়। প্রথম নজীর সম্বন্ধে আমার মত এই যে, তাহার সহিত এ মোকদ্দমার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ, তাহা দ্রাবেতা আপীলের মোকদ্দমা, এবং এ মোকদ্দমার ন্যায় এক আদালতের নথী বদ্ধ হইয়া আর এক আদালতে উপস্থিত হইবার পর না হইয়া কেবল এক আদালতে যে সকল প্রমাণ প্রদত্ত এবং গৃহীত হয় তৎসম্বন্ধেই তর্ক উপস্থিত হয়।

খাস রেস্পণ্ডেণ্ট যে নজীর দর্শায় তাহা আমার বিবেচনায়, জবানবন্দী লওয়ার প্রণালী অর্থাৎ কোরাণের কোন এক বাক্যের উপর শপথ করাইয়া যে জবানবন্দী লওয়া হয়, তৎসম্বন্ধীয়। তাহা এস্থলে স্পষ্ট নজীর গণ্য হইতে পারে না।

অতএব বাদীর জবানবন্দী এবং নথীস্থ

আর আর প্রমাণ দেখিবার জন্য এবং সমুদায় প্রমাণ তুলনা করিয়া এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য আমরা এ মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালত ফেরৎ পাঠাইতেছি যে, বাদী তাহার প্রার্থনা অনুরূপ কট খালাস করিয়া ভূমিতে দখল পাইবার স্বত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে কি না।

বিচারপতি মার্কবি।—আমার বিবেচনায়ও এ মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। আমার বোধ হয়, প্রতিবাদীর অনুরোধে বাদীকে তলব দেওয়ায় তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করা নিম্ন আদালতের জজের উচিতই হইয়াছে, এবং এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে উক্ত সাক্ষীকে প্রধান সাক্ষী বিবেচনা করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত, এবং আমি বিবেচনা করি, বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে প্রতিবাদী যে তাহার জবানবন্দী না লইতে আদালতে প্রার্থনা করে তাহাতে কিছু ব্যতিক্রম হয় না। বিচারপতি বেলি যে দেখাইয়াছেন যে, ঐ জজ বাদীর সাক্ষ্য লইয়া আর আর প্রমাণের সহিত সেই প্রমাণ ঐক্য না করিয়া, (যাহা তাঁহার করা উচিত ছিল) কেবল সেই এক সাক্ষ্য দৃষ্টে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, তাহাতেই আমার মতে জজের ভ্রম হইয়াছে।

১ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৬৩ পৃষ্ঠা-প্রচারিত নিষ্পত্তিতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি, এবং আমি এই বলিতেছি যে, ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৮৪ পৃষ্ঠায় যে নিষ্পত্তি প্রচারিত হয়, তাহার ঔচিত্য সম্বন্ধে আমার অনেক সন্দেহ আছে, কিন্তু এক্ষণে উক্ত প্রশ্নে আর অধিক প্রবেশ করিবার আবশ্যক নাই; উল্লিখিত হেতুবাদেই আমি বিবেচনা করি এ মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। (ব)

২৭ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৩১০ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার প্রতিনিধি জজ চক্রবর্ত্তী প্রতিনিধি মুনসেফের ১৮৬৮ সালের ৬ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৯ ই জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

চন্দ্রকান্ত মিস্ত্রী (বাদী) আপেলাণ্ট।

ব্রজনাথ বশাখ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে উকীল নাই।

চুম্বক।—যে কোন পুরাতন দলীল লিখিত-পড়িত হওয়ার সাক্ষী জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তাহার সত্যতা সাব্যস্তে বর্ত্তমান মালিকের পূর্ব্বের কাহারও দখল দেখিবার আবশ্যক নাই। যাহার হাত হইতে উক্ত দলীল আদালতে আইসে, তাহাই যদি উক্ত দলীলের অভিপ্রায় এবং মোকদ্দমার আর আর অংশ দৃষ্টে ঐ দলীল থাকিবার প্রকৃত স্থান বোধ হয়, তবে উক্ত দলীল পক্ষগণের মধ্যে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইবার পক্ষে বিশ্বাস্য দলীল রূপে ব্যবহার করিতে হইবে। দলীল পুরাতন হইলেও তাহার অকৃত্রিমতার কিছু প্রমাণ আবশ্যক।

বিচারপতি ফিয়ার।—এ মোকদ্দমার বাদী তাহার নালিশের আরজী-লিখিত এক নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব অনুসারে কয়েক খণ্ড ভূমির দখলের দাবীতে নালিশ করে।

প্রতিবাদী দুইটি প্রামাণ্য হেতুবাদে তাহার দাবীর প্রতি বাধা দেয়—প্রথম হেতু এই যে, নালিশ তমাদী দোষে বারিত; এবং দ্বিতীয়তঃ বাদী যে স্বত্ব অনুসারে দাবী করে, তাহার সে স্বত্ব নাই।

১২০৩ সালে এই ভূমির তৎকালের মালিক তাহা বাদীর প্রপিতামহকে যে হস্তান্তর করিয়া দেয়, তদ্দ্বারাই এই স্বত্ব জন্মে; কিন্তু প্রতিবাদিগণ এই হস্তান্তরের প্রসঙ্গের প্রতি আপত্তি করে।

এই মোকদ্দমায় এই রূপ হস্তান্তরের দলীল স্বরূপ এক খানা দলীল দাখিল হয়; কিন্তু জজ বলেন যে, উক্ত দলীল দাখিল করা ব্যতীত আর কোন অবস্থা নাই, যাহাতে তাহা কোন প্রকারে সপ্রমাণ হইতে পারে; এবং এইহেতুবাদে তিনি বলেন যে, বাদী আপন দাবী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। তিনি আরো এই মত প্রকাশ করেন যে, বাদী আইন-নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে দখলের যে সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তাহা দ্বারা, বাদী যে উচ্ছেদের দাবীর মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হয় না।

প্রতিবাদীর আপত্তি এই যে, নথীতে এমত কোন প্রমাণ নাই, যাহাতে ১২০৩ সালের দলীলের কোন প্রসঙ্গ আছে। বাদী স্বয়ং সাক্ষ্য দেয় নাই, এবং এই দলীল কাহার নিকট ছিল, তাহা বা তাহা যে বাস্তবিক বর্ত্তমান ছিল, এ বিষয়ে কোন সাক্ষীই কোন কথা বলে নাই।

এমত অবস্থায়, উক্ত দলীল এমত সপ্রমাণ হয় নাই, যাহাতে তাহা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে, বাদীর দাবীর পোষকতায় কোন প্রমাণ হয়।

সত্য বটে, এই দলীল দেখিবামাত্রই অতি পুরাতন দলীল বোধ হয়; কিন্তু তাহাতেই যে তাহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই, এমত নহে। নিম্ন আদালতের জজ এই রূপ দলীল সপ্রমাণার্থে যাহা আবশ্যকীয় বিবেচনা করেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন; এবং আমি বিবেচনা করি, যে নিয়ম উচিত মতে প্রয়োগ হইতে পারে, তাহা তিনি সম্পূর্ণ শুদ্ধ রূপে বর্ণনা করেন নাই।

এই আদালত যে এক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, এবং যাহা ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১ ম পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে কোন পুরাতন দলীলের, অর্থাৎ এত পুরাতন যে তাহা লিখিতপড়িত হইবার সাক্ষী জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই এবং উপস্থিত করানও যাইতে পারে না, তাহার সত্যতা সংস্থাপনার্থে যাহা সাধারণতঃ আবশ্যক হয়, তাহা খণ্ডাধিবেশন বলিয়াছেন; এবং "আমি বিবেচনা করি যে, তাহাতে যে নিয়ম" বা ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ইংলণ্ডেও যেরূপ প্রয়োগ হয়, এ দেশেও সেই রূপই প্রয়োগ হয়। কিন্তু উক্ত মোকদ্দমায় এই মাত্র বলা হয় যে, যে দলীল প্রমাণ স্বরূপে দাখিল করিতে হইবে, তাহা যাহার হাত হইতে আইসে বা যাহার নিকট থাকে তৎসম্বন্ধে, বা উক্ত দলীল যে অকৃত্রিম এমত সিদ্ধান্ত করিবার পোষকতায় কোন ঘটনা সম্বন্ধে কোন সাক্ষীর শপথ পূর্ব্বক [illegible] দেওয়া আবশ্যক। যাহার নিকট হইতে উক্ত দলীল আদালতে আইসে তৎসম্বন্ধেই প্রমাণ দেওয়া সাধারণতঃ আবশ্যক। উক্ত সাক্ষী তাহা যাহার হাত হইতে আসিবার কথা বলে, তথায়ই যদি উক্ত দলীলের অভিপ্রায় এবং মোকদ্দমার আর আর অবস্থা দৃষ্টে তাহা থাকিবার প্রকৃত স্থান বোধ হয়, তবে উক্ত দলীল পক্ষগণের মধ্যে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবার পক্ষে বিশ্বাস্য দলীল স্বরূপে ব্যবহার করা উচিত।

জজ বোধ হয় এ মোকদ্দমায় বিবেচনা করেন যে, বর্ত্তমান মালিকের দখলের পূর্ব্বের দখল দেখা, এবং সকল স্থলেই উক্ত দলীলের সৃষ্টি হইতে তাহা যত হাত ঘুরিয়া আসিয়াছে তাহা দেখা আবশ্যক। জজের এ অভিপ্রায় হইলে আমি বোধ করি, তিনি অনেক দুর গিয়াছেন।

কিন্তু এ স্থলে স্পষ্টই বাদীর উকীলের স্বীকৃত মতে প্রথম আদালতে এমত কোন প্রমাণ দেওয়া হয় নাই, যাহাতে উক্ত দলীল কি প্রকারের এবং তাহা কাহার হাত হইতে আদালতের নথীতে আইসে তৎসম্বন্ধে আদালতের কোন মত স্থির হইতে পারে।

অতএব স্থলে জজের তাহা অগ্রাহ্য করা উচিতই হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিলেও, তিনি দখল সম্বন্ধে যে

নির্দ্দেশ করেন যাহা প্রমাণ দৃষ্টে বৃত্তান্ত-ঘটিত নিষ্পত্তি বিধায় আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না, তদ্দ্বারাই বাদীর নালিশের স্বত্ত্বের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইতেছে।

পুনর্দর্শিত কবালা-বর্ণিত ভূমির দখল দ্বারাই উক্ত দলীল সপ্রমাণ হয় বলিয়া তর্ক করিতে মনস্থ ছিল কি না, আমি জানি না, কিন্তু উকীলের মুখ হইতে যে একটি বাক্য নির্গত হইয়াছে, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, নিম্ন আদালতে বাদীর স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য দখল দেখাইবার মনস্থ ছিল; কিন্তু তাহা হইলে বাদীকে তাহার দখলের দ্বারা যে স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে হইত তাহা, সে যে ক্রয়ের কবালার উপর নির্ভর করে তাহা হইতেই উৎপন্ন স্বত্ব; সুতরাং তাহার সহিত বিশেষ প্রমাণের দ্বারা উক্ত দলীলের সম্বন্ধ না থাকিলে আমার মতে, তাহাতে কোন ফল হইত না। কেবল বাদী বা তাহার কোন গোমাস্তাই এই প্রকারের প্রমাণ দিলে দিতে পারিত; কিন্তু ঐ রূপ প্রমাণ নথীতে নাই।

অতএব এই সকল হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি যে, বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করা জজের উচিতই হইয়াছে, এবং এই আপীলও খরচা সমেত ডিস্মিস হওয়া উচিত।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—জজের ১২০৩ সালের কবালা কেবল এই হেতুবাদে প্রমাণ স্বরূপ নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত হইয়াছে কি না যে, উক্ত দলীল কাহার নিকট ছিল বা পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল কি না, বাদী তাহার কোন প্রমাণ দেয় নাই, তৎসম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, দখলের প্রশ্ন সম্বন্ধে জজের নির্দ্দেশ বাদীর মোকদ্দমার পক্ষে সাংঘাতিক। বাদী স্বত্ব সাব্যস্ত এবং দখলের দাবীতে নালিশ করে। প্রতিবাদী তমাদীর আপত্তি করে; অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদী যদি নালিশ উপস্থিতের পূর্ব্বে ১২ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে তাহার দখল সপ্রমাণ করিতে না পারে, তবে সে যে স্বত্ব সাব্যস্তের প্রার্থনা করে তাহা সে পাইতে পারে না।

অতএব আমি এই শেষ হেতুবাদে এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম।

(ব)

---

২৭ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

**বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।**

১৮৬৯ সালের ১৭০৪ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের প্রতিনিধি জজ তত্রস্থ অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৫ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মীর মোবারক খাঁ (বাদী) আপেলাণ্ট।

সুখসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ ধর রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—কোন ভূমি দখলের দাবীর মোকদ্দমায় বাদী পূর্ব্ব কোন সময় হইতে অন্যায় রূপে বেদখল হইবার বিষয় সপ্রমাণ করিতে না পারিলেও, নালিশ উপস্থিতের সময়ে তাহার দখল পাওয়ার স্বত্ব থাকিবার বিষয় সপ্রমাণ করিতে পারিলেই সে তৎসম্বন্ধে দখলের ডিক্রী পাইতে পারে।

**বিচারপতি জ্যাক্সন।**—এ মোকদ্দমায় জজ এই হেতুবাদে প্রথম আদালতের ডিক্রীর এক অংশ অন্যথা করেন যে, যদিও বাদী নিম্ন আদালতের মতে এই ভূমির ॥৵০ আনা অংশের দখলের স্বত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে, তথাপি সে এমত এক স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়াছে, যাহা ১২৭১ সালে ছিল, কথিত বেদখলের তারিখে অর্থাৎ ১২৬৮ সালে ছিল না। জজ বলেন—“বাদীর

"নালিশ এই যে, তাহার ৷৶ আনা অংশ ছিল "এবং সে ১২৬৮ সালে তাহা হইতে বেদখল "হয়। স্থির হইয়াছে এবং বাদীও ইহাতেই "সম্মত হইয়াছে যে, ১২৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "পূর্ব্বে তাহার কোন স্বত্ব ছিল না এবং সে "কখন দখল পায় নাই; এবং পরে তাহার "যে কোন স্বত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকুক, আমার "মতে এমত অবস্থায় ১ দাগের ষোল আনা "অংশ সম্বন্ধে তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হওয়া "উচিত ছিল।"

বোধ হয় প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি শুদ্ধ হইলে, বাদী ১২৭১ সালে অর্থাৎ যে সময়ে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সময়ে এবং তাহার অনেক পূর্ব্বে এই ভূমিতে দখল পাইতে স্বত্ববান ছিল। সে ১২৬৮ সাল হইতে তাহার বেদখল এবং কাজে কাজে প্রতিবাদিগণের অন্যায় দখল আরম্ভ হওয়ার কথা বলে। তাহা সপ্রমাণ হইলে প্রতিবাদিগণ তাহাকে ১২৬৮ সাল হইতে সমুদায় কালের ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য হইত; কিন্তু সপষ্ট বোধ হইতেছে যে, বাদী সমুদায় দাবী সপ্রমাণ করিতে না পারিলে সে কেবল ১৮৬৮ সাল হইতে ওয়াশীলাৎ পাইতে পারিত না, কিন্তু সে নালিশ উপস্থিত করিবার সময়ে ঐ ভূমির দখল পাইতে স্বত্ববান হইলে তৎসম্বন্ধে ডিক্রী পাইবার কোন হানি হইত না।

কিন্তু খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণের অনুকূলে বলা হইয়াছে যে, জজ এই আইন-ঘটিত হেতুবাদে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া বাদী এবং প্রতিবাদিগণের মধ্যে এই ৷৶ আনা সম্বন্ধীয় স্বত্বের প্রশ্নের তদন্ত করেন নাই। অতএব এ মোকদ্দমা এতদর্থে নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ যাওয়া উচিত যে, তিনি বাদীর বাক্য এবং সে যে সকল বৃত্তান্ত সপ্রমাণ করে, তদৃষ্টে বাদী এবং প্রতিবাদিগণের মধ্যে এই মীমাংসা করিবেন যে, বাদী, প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে এই ভূমির খাস দখল পাইতে পারে কি না; ইহাতে বাদী যাহা বলে এবং যাহা সপ্রমাণ করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বাদী এই মোকদ্দমায় জয়ী হইলে সে কি খরচা পাইতে পারে তাহা জজের স্থির করিতে হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(স)

---

২৭ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি ক্তিং, লক এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৭৬৪ নং মোকদ্দমা।

রাজসাহীর প্রতিনিধি জজ তত্রত্য মুনসেফের ১৮৬৮ সালের ২৬ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২৮ এ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

হরসুন্দরী বৈষ্ণবী (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

জয়দুর্গা বৈষ্ণবী প্রভৃতি (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ললিতচন্দ্র সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালিকার শরীরের জেম্মাদারী সম্বন্ধীয় দাবীসমস্ত জেলার আদ্য বিচারাধিকার-বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে; কেবল ঐ আদালতেরই ঐ দাবীর দরখাস্ত গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করিবার অধিকার আছে।

মোকদ্দমা চলিবার সময়ে ঐ বালিকা কাহার জেম্মায় থাকিবে তদ্বিষয়ে জেলার জজ তৎক্ষণাৎ যথোচিত হুকুম দিতে পারেন, এবং তৎপরে অবশেষে সে কাহার জেম্মায় থাকিবে তাহার বিহিত আদেশ করিতে পারেন।

বিচারপতি হবহৌস।—আমরা বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতদ্বয়ের কার্য্য বিচারাধিকারাভাবে হইয়াছে বলিয়া অন্যথা হইবে। এই মোকদ্দমায় বাদিনী তাহার দশ

বৎসর বয়সের এক কন্যার শরীর দখলের দাবীতে নালিশ করে। সে বলে যে, সে পীড়িত হইয়া স্থানান্তরে থাকিবার সময়ে সে এই অপ্রাপ্ত-ব্যবহার কন্যাকে কিছু দিনের জন্য প্রতিবাদিনী-গণের নিকট রাখে, এবং এক্ষণে সে ফিরিয়া আসায় তাহারা ঐ কন্যাকে দিতে চাহে না। তাহারা বলে যে, বাদিনী ঐ কন্যা তাহাদিগকে দান করিয়াছে। কিন্তু উভয় পক্ষ যাহাই বলুক না কেন, ইহা সত্য যে, তরুণ-বয়সের এক নাবালগ কন্যার জেম্মা লইয়া বিবাদ উপস্থিত। ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ২ ধারায় সাধারণতঃ বলা হইয়াছে যে, সমস্ত নাবালগের শরীর রক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয় দেওয়ানী আদালতের কর্তৃত্বাধীন। কিন্তু ১৮৬১ সালের ৯ আইনে নাবালগগণের জেম্মা এবং অভিভাবকতা সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট রূপে বলা হইয়াছে, এবং উক্ত আইনের ১ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, কোন নাবালগের কোন সম্পর্কীয় ব্যক্তির ঐ নাবালগের জেম্মা সম্বন্ধে কোন দাবী উপস্থিত করিতে হইলে সেই জেলার আদ্য বিচারাধিকার-বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে; জাবেতা নালিশের আকারে দরখাস্ত করা হইলে তাহা ঐ আদালতের বিচারাধীন হইবে। অতএব যখন ফলিতার্থে উক্ত বালিকার শরীরের জেম্মা সম্বন্ধে পক্ষগণের মধ্যে এই মোকদ্দমা উপস্থিত, তখন উক্ত জেলার আদ্য বিচারাধিকার-বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করা উচিত ছিল, এবং উক্ত আইন অনুসারে কেবল ঐ আদালতেরই এরূপ দরখাস্ত গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করিবার অধিকার ছিল। এমত অবস্থায়, আমারা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালত আপীলের বিচারাধিকারের, এবং মুনসেফ আদালত উক্ত জেলার আদ্য বিচারাধিকারের প্রধান দেওয়ানী আদালত নহে বিধায় তাঁহাদের উপস্থিত মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল না, অতএব উক্ত আদালতদ্বয় বিচারাধিকারাভাবে নিষ্পত্তি করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদের নিষ্পত্তি অন্যথা করিলাম।

তথাপি এই কথা ঠিকই আছে যে, এই দরখাস্ত বাস্তবিক নাবালগ স্ত্রীলোকের শরীরের জেম্মাদারী সম্বন্ধীয় দরখাস্ত; এবং প্রথম আদালতের কোন কোন সিদ্ধান্ত হইতে বোধ হইতেছে যে, উভয় পক্ষ হইতেই যেন উক্ত বালিকাকে দুশ্চরিত্রা করিবার উদ্দেশ্যে এই জেম্মাদারীর নিমিত্ত দরখাস্ত হইয়াছে। প্রথম আদালত স্থির করেন যে, "এই মোকদ্দমার পক্ষগণ প্রকাশ্য বেশ্যা, এবং তাহারা যে সকল কন্যাদান এবং গ্রহণ করে, তাহাদিগকেও বেশ্যা করিতে মনস্থ করা হয়;" এবং তদনন্তর আদালত বলেন যে, যদিও বাদিনী তাহার কন্যাকে প্রকাশ্য বেশ্যা করিবার অভিলাষেই চাহিতেছে, তথাপি সে ঐ বালিকার গর্ভধারিণী বিধায় তাহাকে আপন কন্যার শরীর রক্ষণের কার্য্য হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না। কিন্তু আমরা আইনের সেরূপ অর্থ করি না। নাবালগগণের শরীর রক্ষার ভার দেওয়ানী আদালতের প্রতি থাকিবার কথা আছে। এরূপ নাবালগগণের শরীর রক্ষণাবেক্ষণের এবং জেম্মার বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে যে, উক্ত আদালতের তাহাতে অধিকার আছে, তাহা ১৮৬১ সালের ৯ আইনে ব্যক্ত আছে, এবং বিশেষতঃ, উক্ত আইনের ৩ ধারায় ব্যক্ত আছে যে, তাহা সেই জেলার আদ্য বিচারাধিকারের প্রধান দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন। অতএব নিম্ন আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি বিচারাধিকারাভাবে হইয়াছে বলিয়া তাহা অন্যথা করত তৎসঙ্গেই আমরা এই আদেশ করিতেছি যে, এ নথী এতদর্থে আদ্য বিচারাধিকার-বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে অর্থাৎ সিবিল জজের নিকট পাঠান হয় যে, তিনি বাদিনীর দরখাস্ত ১৮৬১ সালের ৯ আইনের বিধান অনুযায়ী দরখাস্ত স্বরূপে গ্রহণ করেন, এবং উক্ত আইনের বিধান অনুসারে এই

নাবালগের জেম্মাদারীর প্রশ্নের মীমাংসা করেন।

আমরা জজকে এই দেখিতে বলিতেছি যে, উক্ত আইনের ২ ধারার বিধান অনুসারে এই মোকদ্দমা চলিবার কাল পর্য্যন্ত তাঁহার তৎক্ষণাৎ ঐ নাবালগের জেম্মাদারীর বিধান করিবার ক্ষমতা আছে, এবং উক্ত আইনের ৩ ধারার বিধান অনুসারে, আইনের লিখিত শব্দে বলা যাইতেছে যে, ঐ নাবালগের জেম্মাদারী সম্বন্ধে তিনি যে হুকুম উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তাহা তিনি দিতে পারেন।

এই মোকদ্দমা যে পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তৎসম্বন্ধে খরচার বিষয়ে আমরা বিবেচনা করি যে, উভয় পক্ষ তাহাদের সমস্ত আদালতের আপন আপন খরচা দিবে।

জজ নথীস্থ প্রমাণ এমত ভাবে ব্যবহার করিবেন, যে, তাহা কোন প্রমাণই নহে, এবং তাঁহার সমীপে এই বিষয় নূতন করিয়া তদন্ত করিবেন।

(ব)

---

২৭ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হবৃহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৮৩১ নং মোকদ্দমা।

কামরূপের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনর গোহাটীর মুনসেফের ১৮৬৯ সালের ১৭ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৭ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রাজারাম কলিতা ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

রূপাকাগাতী কলিতা ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অভয়চরণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—যে স্থলে বাদী কোন সময়ে বলপূর্ব্বক বেদখল হইবার কথা বলে, তাহাতে প্রতিবাদীকে কোন প্রমাণ দিতে বলিবার পূর্ব্বে বাদীকেই উক্ত বেদখল হইবার বিষয় সপ্রমাণ করিতে হইবে।

মৌজাদার ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট করিবার অযোগ্য পাত্র বিধায় তাহার রিপোর্ট দেওয়ানী আদালত অমান্য করিতে পারেন।

**বিচারপতি হবৃহৌস।**—উপস্থিত খাস আপীলে তিনটি হেতু উত্থাপিত হইয়াছে। প্রথম হেতু এই যে, যখন আদালতদ্বয় স্থির করেন যে, এই মোকদ্দমা তমাদী দোষে বারিত নহে, তখন প্রতিবাদীর উপর তাহার স্বত্ব সপ্রমাণের ভার নিক্ষেপ করা উচিত ছিল। কিন্তু এই মোকদ্দমায় বলা হয় যে, বাদীকে কোন এক সালে বলপূর্ব্বক বেদখল করা হয়। অতএব বাদী উক্ত বল-পূর্ব্বক উচ্ছেদের বিষয় সপ্রমাণ না করিলে প্রতিবাদীকে কোন বিষয় সপ্রমাণ করিতে বলিতেই হইবে, এমত নহে।

দ্বিতীয় হেতু এই যে, বিরোধীয় ভূমি সকল বাদীর পৈতৃক ভূমি কি না, তাহা উক্ত আদালতদ্বয় বিচার করেন নাই। আমাদের বিবেচনায়, এ আপত্তি বৃত্তান্ত-ঘটিত ভ্রম-মূলক। আমরা বিবেচনা করি, নিম্ন আপীল-আদালত প্রকৃতার্থে এ প্রশ্নের বিচার এবং মীমাংসা করিয়াছেন।

শেষ আপত্তি এই যে, নিম্ন আপীল-আদালত মৌজাদারের রিপোর্ট দেখেন নাই; ঐ রিপোর্ট দেওয়ানী আদালতের আমীনের রিপোর্টের প্রতিকূল, আবার এই আমীনের রিপোর্ট বাদীর দাবীর বিরোধী। আমরা বিবেচনা করি, আদালত উক্ত মৌজাদারের রিপোর্ট অমান্য করিলে ভালই করিতেন, কারণ উক্ত মৌজাদার যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৮০ ধারার মর্ম্মানুসারে মোকদ্দমার বিচারের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে

সক্ষম নহে, একথা অস্বীকৃত হয় নাই। সংক্ষেপে, সে কোন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আদালতের নিয়োজিত কোন কর্ম্মচারী নহে, অথবা সে ঐ রূপ কোন কর্ম্মচারীর অভাবে নিয়োজিত ব্যক্তিও নহে।

এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল। (ব)

---

২৮ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ্ এ গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৮৮৪ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৭ ই মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শ্রীনাথ চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদী)।

আপেলাণ্ট।

জন্ জেম্‌স্ গ্রে এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রচন্দ্র বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে বাদী এক পত্তনী লয়, এবং পত্তনী পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে তৎকালে প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তির উপর যে সকল ডিক্রী ছিল তাহা পরিশোধ করিতে সম্মত হয়। পরে তাহাদের মধ্যে আর এই এক চুক্তি হয় যাহাতে বাদী প্রতিবাদীকেই টাকা দিয়া উক্ত ডিক্রী পরিশোধ করিবার দায় হইতে মুক্ত হয়। পরে প্রতিবাদী মোকদ্দমা করিয়া তাহার এক ডিক্রীর দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়; বাদী তাহাতে উক্ত টাকা প্রতিবাদীর দিতে হয় নাই বলিয়া তাহা ফেরৎ পাওয়ার দাবীতে নালিশ করে।

স্থির হইল যে, উক্ত দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা যখন বাদী ঐ সকল ডিক্রীর দাবী-দাওয়া হইতে আপনাকে মুক্ত করে, তখন সে ঐ টাকা আর ফেরৎ পাইতে পারে না।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৭ ধারা অন্যান্য ডিক্রীর ন্যায় একতরফা ডিক্রীতেও প্রয়োগ হয়; তাহার মধ্যে কেবল এই দেখিতে হয় যে, নিম্ন আদালত সমুদায় প্রতিবাদীর প্রতি প্রযুজ্য এক সাধারণ হেতুর উপরে নিষ্পত্তি করেন কি না।

বিচারপতি গ্লবর।—এই খাস আপীলে তিনটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে:—

(১) দিনাজপুরের দেওয়ানী আদালতের এই মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার নাই।

(২) দাবী তমাদী দ্বারা বারিত।

(৩) যে টাকার দাবী হইয়াছে তাহা পত্তনীর যে পণ দেওয়া হয়, তাহার অংশ, এবং বাদীর তাহা জমিদারের নিকট হইতে পাইবার কোন স্বত্ব নাই।

আমি বিবেচনা করি, প্রথম দুই আপত্তি দেখিবার আবশ্যক নাই, কারণ, আমার মতে মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে খাস আপেলাণ্টের উত্তম জওয়াব আছে।

পক্ষগণের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয়:—বাদী প্রতিবাদীকে ৩২৫০০ টাকা পণ দিয়া এবং উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত আছে এবং ভবিষ্যতে উপস্থিত হইবে তাহার সমুদায় আপনার উপর লইতে সম্মতি দিয়া প্রতিবাদীর নিকট হইতে এক পত্তনী পাট্টা লয়। এই সকল দায়িত্বের মধ্যে জমিদারের বিরুদ্ধে ৮০০ এবং ৭৭৩ টাকার ডিক্রী ধরা হয় এবং তাহা বাদী পরিশোধ করিবার একরার লিখিয়া দেয়। যে দিন এই পত্তনী পাট্টা স্বাক্ষরিত হয়, সেই দিন সে এই দুই ডিক্রী সম্বন্ধে আর এক বন্দোবস্ত করে, তাহাতে ঐ দুই ডিক্রীর টাকা প্রতিবাদীকে দিয়া তাহার নিকট হইতে এক দলীল গ্রহণ করে, যাহাতে স্পষ্ট ব্যক্ত হয় যে, ঐ ডিক্রী সম্বন্ধে বাদীর দায়িত্ব আর রহিল না, এবং ঐ যে টাকা দেওয়া হইল তাহা দ্বারা প্রতিবাদীকেই স্বয়ং ঐ দুই ডিক্রী পরিশোধ করিতে হইবে। ইহার

কিছুকাল পরে ৭৮১ টাকার ডিক্রীদার মহেশ-নারায়ণ দায়ী-জমিদারের বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করে। জমিদার সপ্রমাণ করে যে, উক্ত ডিক্রী-জারী তমাদী দ্বারা বারিত হইয়াছে, এবং কিছু না দিয়াই ঐ দাবী হইতে অব্যাহতি পায়।

বাদী এক্ষণে এই টাকার অর্থাৎ ৭৮১ টাকার দাবীতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই হেতুবাদে নালিশ করে যে, সে, (বাদী) আপনাকে কেবল ডিক্রী পরিশোধের নিমিত্তই দায়ী করে, এবং তাহা যখন পরিশোধ করিতে হয় নাই, তখন ঐ টাকা তাহার ফেরৎ পাওয়া উচিত।

আমার বিবেচনায়, এই নালিশে তাহার কৃতকার্য্য হওয়া উচিত নহে। সে প্রতিবাদীর সহিত প্রথম যে চুক্তি করে তাহার মধ্যে পশ্চাতে যে প্রকার ঘটনা হইয়াছে তাহা গণ্য না হই-লেও (এই প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে চাহি না) তাহার দ্বিতীয় চুক্তির মধ্যে তাহা অবশ্যই গণ্য। সে এই সর্ত্তে উক্ত ৭৮১ টাকা দেয় যে, সে তদ্দারা মহেশনারায়ণের ডিক্রীর ববৎ সমস্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইল; অতএব সর্ত্তমতে কার্য্য হইয়া থাকিলে সে আর কিছু চাহিতে পারে না।

প্রতিবাদী ঐ ৭৮১ টাকা মহেশনারায়ণকে দিবার চুক্তি করে নাই; উক্ত ডিক্রী পরিশোধ করিবার এবং বাদীর নিকট যাহাতে উক্ত টাকা আর না চাওয়া হয়, তাহাই করিবার চুক্তি করে। তাহা সে করিয়াছে; অতএব সে কি প্রকারে তাহা করিয়াছে তাহা বাদী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। বাদীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে সে নির্দায়ী হইয়াছে, এবং তাহাকে উক্ত ডিক্রী পরিশোধ করিতে আর বলা হয় নাই, এবং কখন বলা যাইতেও পারিবে না। প্রতিবাদী যদি টাকা না দিয়া কৌশল দ্বারা তাহার ডিক্রীদারের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া থাকে, তবে, তাহার সহিত বাদীর কোন সম্বন্ধ নাই; যথা, মনে কর, প্রতিবাদী মহেশনারায়ণের সহিত আপোস-বন্দোবস্ত করিয়া তাহাকে ডিক্রীর অর্দ্ধেক টাকা লইতে সম্মত করে, তাহা হইলে বাদী কি আর অর্দ্ধেকের দাবীতে নালিশ করিতে পারে? আমার মতে, পারে না।

অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, বাদী যে টাকার দাবী করে তাহা ঐ পত্তনীর পণেরই এক অংশ, এবং প্রতিবাদী আপন চুক্তির কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছে।

নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া বাদীর মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিস্মিস্ করা গেল।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—এই মোকদ্দমার বাদী নিম্নলিখিত অবস্থা অনুসারে কতক টাকার দাবীতে নালিশ করে:—সে বলে যে, সে নিম্নলিখিত পণে অর্থাৎ নগদ ৩২০০০ টাকা দিয়া এবং কতিপয় ডিক্রী পরিশোধ করিবার দায় গ্রহণ করিয়া কোন ভূমি তাহার মালিক-প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে পত্তনী লয়; ঐ ডিক্রী সমস্তের মধ্যে এক্ষণকার বিরো-ধীয় টাকার এক ডিক্রী পত্তনী গ্রহণের কালে প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে অপরিশোধিত ছিল। তদনন্তর, বাদী বলে যে, যে সকল ডিক্রীর নিমিত্ত সে দায়ী ছিল, তাহার টাকা সে এই সর্ত্তে প্রতিবাদিগণকে নগদ দেয় যে, প্রতিবাদিগণ ঐ সকল ডিক্রীর টাকা ডিক্রীদারগণকে দিবে; তাহার পর প্রতিবাদিগণ এক জন ডিক্রীদারের সহিত মোকদ্দমা করিয়া টাকা দেওয়ার দায় হইতে অব্যাহতি পায়; এবং কাজে কাজে বাদী প্রতিবাদিগণের হাতে যে টাকা দেয়, তাহা তাহারা নিজেই রাখে; এবং এই সকল কার্য্য হেতু বাদী আপত্তি করে যে, প্রতিবাদিগণকে ডিক্রী পরিশোধার্থে নগদ যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা কোন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে আমানত স্বরূপ, এবং প্রতিবাদিগণ যখন সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করে নাই, অর্থাৎ তাহারা যখন ঐ টাকা না দিয়া আপনাদের নিকট রাখিয়াছে, তখন বাদী ঐ টাকা ফেরৎ পাইতে স্বত্ববান্।

নিম্ন আপীল-আদালত বাদীর প্রার্থনা মতেই চলিয়া তাহাকে ঐ টাকার ডিক্রী দেন।

খাস আপীলে মোকদ্দমা একেবারে না চলিবার অন্যান্য আপত্তির মধ্যে দোষগুণ সম্বন্ধে একটি আপত্তি হইয়াছে; তাহা আমি বোধ করি, বাদীর দাবীর পক্ষে সাংঘাতিক। প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টগণের উকীল তর্ক করেন যে, ঐ সকল টাকা, বরং ঐ সকল টাকা সম্বন্ধীয় ডিক্রী পরিশোধ করিবার দায়িত্ব, যে পণে বাদীকে উক্ত পত্তনী দেওয়া হয়, তাহারই এক অংশ; কিন্তু পরে বাদী এবং প্রতিবাদিগণের মধ্যে যে এক দলীল লিখিতপড়িত হয়, তাহাতে এই বিশেষ দেনা পরিশোধের দায়িত্ব সম্বন্ধে আপোস বন্দোবস্ত হয়, এবং বাদী কিছু টাকা দিয়া তাহা হইতে মুক্ত হয়; এমত অবস্থায়, বাদী প্রতিবাদিগণকে যে টাকা দেয়, তাহা ঐ ডিক্রী পরিশোধার্থে আমানত নহে, তাহাদিগকে বাদীর পত্তনীর পণের সেই অংশের দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়, যাহা দ্বারা উক্ত পত্তনী পাট্টায় বাদী ঐ ডিক্রীর টাকা আদায় করিবার দায় গ্রহণ করে। অতএব আমাদের বিচার্য্য এই যে, ১২৬৯ সালের ১লা চৈত্রের পত্তনী-পাট্টার এবং উভয় পক্ষের মধ্যে সেই তারিখে যে ফারখৎ লিখিতপড়িত হয়, তাহার ব্যাখ্যা অনুসারে উপস্থিত বিরোধীয় টাকা প্রতিবাদিগণকে একেবারে দেওয়া হয়, কি কেবল কোন কার্য্য নির্ব্বাহের ভার দিয়া এজেণ্ট স্বরূপে তাহাদের নিকট তাহা আমানত রাখা হয়।

আমি বোধ করি, উক্ত টাকা নিঃসন্দেহই প্রতিবাদিগণকে একেবারে দেওয়া হয়। পক্ষগণের মধ্যে প্রথম এই একরার হয় যে, উক্ত পত্তনী-পাট্টার পণের মধ্যে বাদীকে ডিক্রীর টাকার দায় গ্রহণ করিতে হইবে; কিন্তু উক্ত বন্দোবস্ত অবিকল অবস্থায় কোন পক্ষেরই সুবিধাকর হয় না। তাহাতে আর এক চুক্তি অর্থাৎ এই ফারখৎ লিখিতপড়িত হয়, এবং এই ফারখৎ দ্বারা বাদী কিছু টাকা দিয়া ঐ সকল ডিক্রী পরিশোধ করিবার দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়। ফারখতের শব্দ দৃষ্টে এই বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু মাত্রও সন্দেহ রহিতেছে না। উক্ত ফারখতে ঐ পাট্টার উল্লেখ করিয়া প্রতিবাদিগণের পক্ষে বলা হইয়াছে যে, বাদী উক্ত পাট্টায় আপনাকে যে সকল ডিক্রীর নিমিত্ত দায়ী করে, তাহা পরিশোধার্থে তাহারা কিছু টাকা পাইয়াছে, এবং ঐ সকল টাকা দেওয়ায় বাদী ঐ সকল ডিক্রী সম্বন্ধীয় দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই ফারখৎ লিখিতপঠিতের 'পর প্রতিবাদিগণের যদি এমত ভাগ্যোদয় হইয়া থাকে যে, তাহাদিগকে তাহার কোন এক ডিক্রীর টাকা একেবারেই দিতে হয় নাই; তাহাতে পক্ষগণের মধ্যের চুক্তি-পত্রের ভাবের কোন ব্যতিক্রম হয় না। প্রথম চুক্তি দ্বারা বাদী উক্ত ডিক্রীর টাকার নিমিত্ত দায়ী হইত, অথবা তাহাকে ঐ ডিক্রীর টাকা প্রদান সম্বন্ধে মোকদ্দমা করিতে হইত। কিন্তু সে সেই ভার এবং সেই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে না চাহিয়া কিছু টাকা দিয়া উক্ত ভার এবং দায়িত্ব হইতে মুক্ত হওয়া অধিক মনোনীত করে, অতএব সে আবার ফিরিয়া উক্ত ফারখতের একরার এড়াইয়া উক্ত টাকা ফেরৎ পাইবার দাবী করিতে পারে না। এতদভিপ্রায়ে আমি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করি যে, বাদী প্রতিবাদিগণের নিকট যে টাকার দাবী করে তাহা পক্ষগণের মধ্যে চুক্তির দেনা নহে; অতএব এ মোকদ্দমা সমস্ত আদালতের খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

আমি বলিতে পারি যে, বাদী রেস্পণ্ডেণ্ট আপত্তি করে যে, আমরা নিম্ন আদালতদ্বয়ের সম্পূর্ণ ডিক্রী অন্যথা করিতে পারি না, কারণ, একজন প্রতিবাদী কেবল এক্ষণে আমাদের সমীপে খাস আপেলাণ্ট, এবং অপর প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে; এবং খাস

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল বলিয়াছেন যে, এমত অবস্থায় উক্ত একতরফা ডিক্রী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ভিন্ন রহিত হইতে পারে না। যাহা হউক, আমার বিবেচনায়, এই বিষয়ে কি নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে উক্ত আইনের ৩৩৭ ধারার বিধান দৃষ্টেই সকল সন্দেহ দূর হয়। উক্ত ধারার শব্দগুলি এই:—"কোন মোকদ্দমার যদি দুই কি অধিক "জন ফরিয়াদী থাকে, কিম্বা দুই কি অধিক "জন আসামী থাকে, ও সকলের যাহাতে সম্পর্ক "থাকে, এমত মূল কারণ ধরিয়া যদি অধঃস্থ "আদালতের নিষ্পত্তি হয়, তবে ফরিয়াদীদের "কোন একজন ঐ সম্পূর্ণ ডিক্রীর উপর আপীল "করিতে পারিবে, ও আপীল-আদালত সকল "ফরিয়াদীর কি সকল আসামীর পক্ষে ঐ ডিক্রী "অন্যথা কি মতান্তর করিতে পারিবেন।"

এই ধারার বিধানে উভয় পক্ষের মধ্যের ডিক্রী এবং একতরফা ডিক্রীর মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই; এবং উপস্থিত মোকদ্দমা উক্ত ধারার বিধান দ্বারা শাসিত হইবে কি না, এই নির্দ্ধারণার্থে আমাদের কেবল এই মাত্র দেখিতে হইবে যে, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি সমুদায় প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রযুজ্য সাধারণ কোন হেতুবাদে হইয়াছে কি না। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে ঐ প্রকারের সাধারণ হেতুবাদে হইয়াছে তৎপ্রতি কোন আপত্তি নাই; অতএব আমার বিবেচনায় আমরা এই খাস আপীলে নিম্ন আদালতের সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে পারি। (ম)

---

২৮ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন।

যশোহরের সিবিল-কোর্ট-আমীন গঙ্গাধর রায়ের মোকদ্দমা।

মেং মণ্টি ও বারিষ্টর, দরখাস্তকারীর পক্ষের কৌন্সেল।

চুম্বক।—ফৌজদারী বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্তের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলে, উক্ত অপরাধের হেতুবাদে তাহাকে পদচ্যুত করা যাইতে পারে না; যদি তাহার পদচ্যুত হওয়ার উপযুক্ত চরিত্রগত আর কোন দোষ থাকে, তবে তাহা ব্যক্ত এবং সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

নিষ্পত্তি।—আমার বিবেচনায়, এই আমীনের সম্বন্ধে জজের হুকুম প্রতিপালিত হইতে পারে না। প্রকাশ যে, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতের আমীন গঙ্গাধর রায়কে আইন-বিরুদ্ধ পুরস্কার দেওয়াতে সেশন আদালতের বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। উক্ত আইন-বিরুদ্ধ পুরস্কার গ্রহণের প্রসঙ্গে গঙ্গাধরের নিজের নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ হয়, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সেশনে অর্পণ করিবার যথেষ্ট প্রমাণ না পাইয়া তাহাকে খালাস দিবার হুকুম দেন। কিন্তু জজ রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর বিচারে গঙ্গাধর রায়ের অসাক্ষাতে স্পষ্ট স্থির করেন যে, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তীর প্রতি যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিযোগ হয়, তাহা হইয়াছে এবং তন্নিবন্ধন জজ গঙ্গাধরকে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে বলেন যে, তদ্দৃষ্টে তিনি এই নিষ্পত্তি করিতে পারেন যে, তাহাকে তাহার আপন কর্ম্মে থাকিতে দেওয়া হইবে কি না। তিনি আমীনের জওয়াব শ্রবণ করেন এবং সে যে সকল সাক্ষী মানে তাহাদের জবানবন্দী লয়েন।

আমি বলিতে চাহি না যে, জজ উক্ত আমীনের সম্বন্ধে এই প্রকারের কোন হুকুম দিতে পারিতেন না যে, "আমীন আইন-বিরুদ্ধ পুরস্কার গ্রহণের অপরাধী সাব্যস্ত না হইতে পারিলেও তাহার আচরণ সম্বন্ধে এমত সকল অবস্থা আছে যাহাতে আমার মতে তাহার আমীনের পদে থাকা অন্যায়, কারণ, এ অতি

গুরুতর এবং বিশ্বাসের পদ এবং তাহার ন্যায় এরূপ অনিয়ম এবং অন্যায় কার্য্যকারকের উক্ত পদে থাকা উচিত নহে।* কিন্তু তাহা হইলে অনিয়ম এবং অন্যায় কার্য্য হেতু তাহার নামে স্পষ্ট অভিযোগ হওয়া এবং তাহার সাক্ষাতে প্রমাণ গ্রহণ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা উচিত ছিল।

এতৎ সম্বন্ধে জজের নিষ্পত্তি পড়িয়া আমার অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আমি যে প্রকারের অনিয়মিত এবং অন্যায় কার্য্যের কথা বলিলাম, তিনি তাহাকে তজ্জন্য অপরাধী পান নাই; কিন্তু বাস্তবিক আইন-বিরুদ্ধ পুরস্কার গ্রহণের অপরাধী পাইয়াছেন, এবং যদিও তিনি তাঁহার নিজের মনে আমীনকে উক্ত অভিযোগের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করেন, এবং সেই অভিযোগে তাহাকে পদচ্যুত করেন, তথাপি তিনি তাঁহার রায়ে লেখেন যে, তাঁহার নিকট যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয় তদ্দৃষ্টে আমীনকে ঐ অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে না। আমার বোধ হইতেছে যে, যদি কোন ব্যক্তিকে বিশেষ কোন অপরাধ করিবার হেতুবাদে পদচ্যুত করা হয়, তবে যে প্রমাণ দৃষ্টে বা যে উপায়ে তাহাকে তাহার নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করিতে হইবে, তাহা যে প্রমাণ দৃষ্টে বা যে উপায়ে সে ফৌজদারী বিচারে উক্ত অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে, তাহা হইতে পৃথক্ করিবার কোন উপায় নাই। আমার বোধ হইতেছে যে, এ মোকদ্দমায় জজকে গঙ্গাধরের বিরুদ্ধ প্রমাণ যেরূপ বিবেচনা করিতে দেখা যায়, সেই রূপই যদি তিনি তাহা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে এই জন্য উক্ত আমীনকে বিচারার্থে অর্পণ করিবার হুকুম দেওয়া উচিত যে, সে অপরাধী কি নিরপরাধী, তাহা চূড়ান্ত রূপে এবং উচিত মতে নিরূপিত হইতে পারে। আমি বোধ করি না যে, তিনি এক দিকে এ কথা বলিতে পারেন যে, তিনি যেরূপ প্রমাণ পাইয়াছেন, তাহাতে উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত হয় না, এবং সেই সঙ্গে আবার ইহাও বলিতে পারেন যে, উক্ত অপরাধের নিমিত্ত তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জজের এ কথা বলিবার কোন বাধা ছিল না যে, উক্ত আমীনের প্রতি যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা সপ্রমাণ না হইলেও এ মোকদ্দমায় আর আর যে সকল অবস্থা আছে, তদ্দৃষ্টে আমীনকে উক্ত পদে রাখা উচিত নহে। কিন্তু ইহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল অবস্থা স্পষ্ট রূপে বর্ণনা এবং পরিষ্কার রূপে সপ্রমাণ করা উচিত ছিল। অতএব আমি বিবেচনা করি, জজ যে হুকুম দ্বারা আমীনকে আইন-বিরুদ্ধ পুরস্কার গ্রহণের অপরাধে পদচ্যুত করেন, তাহা অন্যথা হইবে; কিন্তু জজ উচিতমত বিচার করিয়া অতঃপর যে কোন হুকুম দেওয়া উচিত বোধ করেন, তাহার কোন ব্যাঘাত আমাদের এই হুকুম দ্বারা হইবে না। (ব)

৩১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২২৯২ নং মোকদ্দমা।

নুরনগরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১১ ই মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ত্রিপুরার অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২১ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (বাদী) আপেলাণ্ট।

মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ললিতচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধের অভিযোগ হয়, সে তাহাতে অপরাধী

সাব্যস্ত হইলে, ঐ অভিযোগ ঈর্ষা-মূলক বলিয়া ঐ অভিযোক্তার বিরুদ্ধে ক্ষতি-পূরণের নালিশ করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি অভিযোগ করে, সে যদি ঐ অভিযোগ পুলিসের হস্তে থাকার কালে এবং মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে আসিবার পূর্ব্বে, তাহা পরিত্যাগ করে, তবে যখন সে প্রথমে পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সময় হইতে তাহার বিরুদ্ধে খেসারতের নালিশের হেতু পরিগণিত হইবে।

১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণে যে, "প্রকৃত টাকার ক্ষতি" শব্দ গুলি আছে, তাহা বাদীর সম্পত্তি সম্বন্ধে টাকার ক্ষতি বুঝায়।

কেবল শারীরিক ক্ষতির জন্য খেসারতের যে নালিশ হয়, তাহাতে ছোট আদালতের বিচারাধিকার নাই।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমরা বিবেচনা করি যে, তমাদীর হেতুতে এই মোকদ্দমা অধঃস্থ জজের ডিস্‌মিস্ করা উচিত ছিল না। আরজীতে লেখা আছে যে, প্রতিবাদী বাদীর চরিত্র কলঙ্কিত এবং দুর্নাম করার মনস্থে ঈর্ষা-পূর্ব্বক পুলিসে সংবাদ দেয় যে, বাদী একটি স্ত্রীলোকের ভ্রূণ হত্যা করাইয়াছে; এবং প্রতিবাদীর এই কার্য্যের কোন ন্যায্য হেতু ছিল না।

প্রথম আদালতে এই মোকদ্দমার বিরুদ্ধে তমাদীর আপত্তি উত্থিত হয় নাই, এবং ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, নালিশ উচিত সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমাদের নির্ণয় করার জন্য নথীতে যথেষ্ট বৃত্তান্ত নাই।

অধঃস্থ জজ অনুমান করিয়াছেন যে, যখন পুলিসে প্রথম সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তখনই নালিশের হেতু জন্মিয়াছিল। কিন্তু আরজীতে লেখা আছে যে, ঐ অভিযোগ ১৮৬৮ সালের ১৪ ই জানুয়ারি তারিখে অগ্রাহ্য হয়। ঐ অভিযোগ কোন্ তারিখে কি প্রকারে অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শক কোন প্রমাণ আদালতের সমক্ষে নাই। যদি তাহা উচিত রূপে এমন কোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইত যে, আদালতের ঐ বিষয়ের দোষগুণের বিচার করার ক্ষমতা আছে, তবে যেপর্য্যন্ত সেই সকল দোষগুণ উপস্থিত বাদীর অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট না হয়, সে পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই বাদীর নালিশের হেতু জন্মে না। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উপস্থিত হয় তাহাতে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে ঐ অভিযোগ ঈর্ষা-মূলক বলিয়া নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না; এবং তাহা শুদ্ধ যে কারণে হইতে পারে না তাহা এই যে, ন্যায্য এবং সম্ভাবনীয় কারণ ব্যতিরেকে অভিযোগ উপস্থিত হওয়াই নালিশের হেতুর এক আবশ্যকীয় অঙ্গ। কিন্তু অভিযোগ ন্যায্য কি না, তাহা যে আদালতের বিচার করার ক্ষমতা আছে তিনি যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তবে অভিযোগ ন্যায্য অথবা সম্ভাবনীয় হেতু ব্যতীত উপস্থিত হইয়াছিল, এমত বলা যাইতে পারে না; বিশেষতঃ, সাধারণের স্বত্ব রক্ষার্থে যে সকল ব্যক্তি অপরাধীদিগের নামে অভিযোগ করিয়া অপরাধ সাব্যস্ত করে, তাহাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যদি খেসারতের নালিশ চলে, তবে নিতান্ত ভয়ানক ঘটনা হইবে।

কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অভিযোগ কখন উপস্থিত না হইয়া থাকে, এবং অভিযোগ পুলিশের হস্তে থাকার কালেই তাহা অভিযোক্তা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তবে অধঃস্থ জজ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পুলিসে সংবাদ দেওয়ার সময় হইতেই বাদীর নালিশের হেতু উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গত।

যদি তমাদীর ইসু প্রথম আদালতে উত্থিত হইত, তবে পক্ষগণ এমন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারিত যদ্দ্বারা এই সকল বিষয় পরিষ্কৃত হইয়া যাইত। অতএব এই বিষয় সংক্রান্ত নথীর এই অসম্পূর্ণ অবস্থা দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, যখন পক্ষগণকে তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদ করার

কোন সুযোগ প্রদত্ত হয় নাই, তখন এই ইসুর উপরে নিম্ন আপীল-আদালতের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা উচিত হয় নাই। বস্তুতঃ, নথীর বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, নালিশের হেতু কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ হয় নাই, এবং ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ইহা পরিষ্কার করার জন্য পক্ষগণকে সুযোগও প্রদান করা হয় নাই।

এমত অবস্থায়, আমাদের মতে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারের জন্য মোকদ্দমা তাঁহার নিকট পুনঃপ্রেরিত হইবে। খরচা নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

রেস্পণ্ডেণ্ট যে প্রারম্ভিক আপত্তি উপস্থিত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি যে, আমরা বিবেচনা করি যে, আরজীতে যে নালিশের হেতু বর্ণিত হইয়াছে তাহা ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের শেষ ভাগের মর্ম্মান্তর্গত নহে। যে সমস্ত অহিত কার্য্যের দ্বারা প্রকৃত টাকার ক্ষতি হয়, তৎসম্বন্ধীয় মোকদ্দমা ভিন্ন শারীরিক হানির খেসারতের নালিশ সমস্ত ঐ প্রকরণমতে ছোট আদালতের বিচারাধিকার হইতে বর্জ্জিত হইয়াছে।

আমরা বিবেচনা করি যে, চরিত্র কলঙ্কিত করা হেতু খেসারতের নালিশ শারীরিক অনিষ্টের জন্য খেসারতের নালিশ। আমাদের মতে চরিত্রের প্রতি অপবাদ শারিরীক অনিষ্টের তুল্য; কিন্তু "অনিষ্টের দ্বারা প্রকৃত টাকার ক্ষতি না হইলে" এই বাক্যের অর্থ আমার বিবেচনায়, যে সকল ক্ষতি টাকার দ্বারা পূরণ করা যাইতে পারে, তাহা বুঝায় না। আইনমতে যে ক্ষতি টাকার দ্বারা পূরণ হইতে পারে না এমন কোন ক্ষতির জন্য খেসারতের নালিশ দেওয়ানী আদালতে চলিতে পারে না, অতএব এই প্রকরণের লিখিত "প্রকৃত টাকার ক্ষতি" শব্দগুলি যদি "যে সমস্ত ক্ষতি টাকার দ্বারা পূরণ হইতে পারে" শব্দগুলির সহিত সমব্যাপক হয়, তবে এই প্রকরণে ছোট আদালতের বিচারাধিকার হইতে শারীরিক অনিষ্টের খেসারত সম্বন্ধীয় কতক-গুলি নালিশ বর্জ্জিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রকার সকল নালিশ সেই বিচারাধিকার ভুক্ত হইবে; তাহা হইলে ঐ ধারার বিধান নিরর্থক পুনরুক্ত হইবে।

আমাদের বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক-সমাজের এমত মনস্থ ছিল না; এবং আমি যে সকল শব্দের উল্লেখ করিলাম এবং যাহা ঐ প্রকরণের প্রথম ভাগে যোগ করা হইয়াছে, তাহা শারীরিক অনিষ্ট হেতু খেসারতের কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নালিশ ঐ প্রকার সাধারণ নালিশ হইতে প্রভেদ করার মনস্থে যোগ করা হইয়াছিল। ঐ স্থলে "প্রকৃত টাকার ক্ষতি" শব্দগুলি যে প্রকার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায় বাদীর সম্পত্তির বা ইস্টেটের টাকার ক্ষতি সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। শারীরিক অনিষ্টের এই ফল হইতে পারে যে, তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কতক টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে অথবা তদ্দ্বারা তাহার সম্পত্তির মূল্য কতক ন্যূন হইয়া গিয়াছে, যাহা ঐ অনিষ্ট না হইলে হইত না।

এই মোকদ্দমায় বাদী ঐ প্রকার ক্ষতি হওয়ার কথা বলে না, এবং আরজীতে আমরা দেখিতেছি যে, কেবল কথিত শারীরিক অনিষ্টের জন্য খেসারত পাওয়ার নালিশ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক ধনহানির প্রসঙ্গে নালিশ হয় নাই।

আমরা বিবেচনা করি, এই মোকদ্দমা ছোট আদালতে চলিতে পারিত না, অতএব প্রধানতম বিচারালয়ে খাস আপীল চলিবে। (ব)

---

৩১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪০৭ নং মোকদ্দমা।

সারণের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

রায় গুদর সহায় ( বিচারাদিষ্ট দায়ী ) আপেলাণ্ট
অক্ষয়বট লাল ( ডিক্রীদার ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীকৃষ্ণ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ, তারকনাথ সেন ও বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—৯০ দিনের পরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত যদি এই হেতুতে গ্রাহ্য হয় যে, একই ডিক্রীর উপরে আর এক ব্যক্তির ডিক্রীজারীতে তুল্য হেতুবাদে যে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহা প্রধানতম বিচারালয় কর্ত্তৃক অন্যথা হইয়াছে, তবে সেই পুনর্ব্বিচার গ্রহণের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে এবং ঐ হুকুম অবৈধ বলিয়া অন্যথা হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমরা বিবেচনা করি, এই মোকদ্দমায় আপেলাণ্ট তাহার আপীলের হেতু সাব্যস্ত করিয়াছে। সারণের অধঃস্থ জজের পূর্ব্ব হুকুমের ৯০ দিবস পরে তিনি পুনর্ব্বিচার গ্রহণের জন্য যে হুকুম দেন তাহার বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে।

যে হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় তাহা ১৮৬৮ সালের ১২ ই ডিসেম্বর তারিখে এক ডিক্রী জারীর মোকদ্দমায় প্রদত্ত হয়। ১৮৬৯ সালের ২১ এ মে তারিখের পূর্ব্বে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয় নাই, এবং যে হেতুবাদে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত হয়, তাহা এই যে, আর এক ব্যক্তির ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় ( কিন্তু ঐ ডিক্রীর উপরেই ) অধঃস্থ জজের যে নিষ্পত্তি এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির তুল্য হেতুবাদে হইয়াছিল, তাহা প্রধানতম বিচারালয়-কর্ত্তৃক অন্যথা হইয়াছে। পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তে অন্য কোন হেতু লেখা নাই, এবং আমাদের সমক্ষেও অন্য কোন হেতু প্রদর্শিত হয় নাই।

কিন্তু অধঃস্থ জজ বিবেচনা করিয়াছেন যে, অবস্থামতে বিলম্বের ন্যায্য হেতুই ছিল, অতএব তিনি তাঁহার ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখের হুকুমের দ্বারা পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করেন।

আমরা বিবেচনা করি, এই মোকদ্দমায় ৯ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৮১ পৃষ্ঠার পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি খাটে; যাহাতে অবধারিত হইয়াছে যে, অন্য কোন মোকদ্দমার ডিক্রী অথবা হুকুম আপীল-আদালত-কর্ত্তৃক অন্যথা হওয়া, ৯০ দিবসের পরে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার হেতু হইতে পারে না, এবং এমন অবস্থায় পুনর্ব্বিচার গ্রহণের হুকুম হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে।

দুই নিষ্পত্তির, অর্থাৎ ১২ শ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৮৪ পৃষ্ঠায় ও ২ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ১৮৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নিষ্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে। এই দুই নিষ্পত্তির প্রথম নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আমার ইহার অধিক আর কিছু বলার আবশ্যক নাই যে, খণ্ডাধিবেশনের নিষ্পত্তি অপেক্ষা পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির দ্বারা এই মোকদ্দমায় আমাদের শাসিত হওয়া উচিত; এবং দ্বিতীয় নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, তাহা রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমা ছিল, এবং তাহাতে প্রধানতম বিচারালয় এই বলিয়া হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন যে, মুন্সেফের যে ক্ষমতা ছিল তাহাই তিনি ন্যায্য রূপেই হউক কিম্বা ভ্রমাত্মক রূপেই হউক, পরিচালন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পূর্ণাধিবেশনের মোকদ্দমার সহিত এই মোকদ্দমার কোন প্রভেদ আমার দৃষ্ট হয় না; অতএব ঐ নিষ্পত্তিতে যে বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসরণ করত আমি ইহা বলিতে বাধ্য হইলাম যে, অধঃস্থ জজ এই মোকদ্দমায় পুনর্ব্বিচার গ্রহণের যে হুকুম দিয়াছেন তাহা অন্যথা করিতে হইবে, এবং খরচা সমেত এই আপীল মঞ্জুর হইবে।

বিচারপতি বেলি।—আমি সম্মত হইলাম।

( গ )

৩১ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

ধনপত সিংহ, প্রার্থী।

ইন্দ্রচন্দ্র দুগড় প্রভৃতি, প্রতিপক্ষ।

মেং আর টি এলেন প্রার্থীর উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

**চুম্বক।**—দেঃ কার্য্য-বিধির ২৪৬ ধারান্তর্গত এক মোকদ্দমার কোন পক্ষকে জবানবন্দী দেওয়ার জন্য সমন করাতে সে উপস্থিত হয় না। আদালত বিবেচনা করেন যে, তাহার অনুপস্থিত থাকার কোন আইন-সঙ্গত হেতু নাই, অতএব তিনি ঐ কার্য্য-বিধির ১৭০ ধারা মতে বিচার্য্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন। ঐ হুকুম আইন-সঙ্গত প্রমাণাভাবে প্রদত্ত হইয়াছে হেতুবাদে তাহা অন্যথা করার জন্য বিক্‌টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ আইনের ১৫ ধারা মতে প্রধানতম বিচারালয়ে প্রার্থনা হওয়ায়,

স্থির হইল যে, এই প্রকার প্রার্থনা বাস্তবিক খাস আপীলের তুল্য, অতএব তাহা ২৪৬ ধারান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

**বিচারপতি লক।**—আমাদের নিকট এই হেতুবাদে রাজসাহীর অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ ডিসেম্বরের হুকুম অন্যথা করার জন্য প্রার্থনা হইয়াছে যে, জজের যে হুকুম ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭০ ধারা মতে প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আইন-সঙ্গত নহে, কারণ, তাহা কোন আইন-সঙ্গত প্রমাণ দৃষ্টে প্রদত্ত হয় নাই। এবং এই প্রার্থনার পোষকতায় ৭ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫২০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত গোবিন্দকুমার চৌধুরীর মোকদ্দমায় পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমরা দেখিতেছি যে, রাজসাহীর অধঃস্থ জজের সমক্ষে যে এক ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল, তাহাতে ধনপত সিংহ নামক এক জন মোজাহেমদারের সাক্ষ্য লওয়ার জন্য উক্ত জজ মুরসিদাবাদের জজের নিকট কমিসন প্রেরণ করেন। এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে কাছারীতে হাজির হওয়ার জন্য মুরসিদাবাদের জজ তাহার নামে সমন জারী করেন। ধনপত সিংহ এই বলিয়া অনুপস্থিত থাকে যে, সে অত্যন্ত পীড়িত, এবং সিবিল সরজনের এক সার্টিফিকেট দাখিল করে। ডিক্রীদার আপত্তি করে যে, ধনপত সিংহ অত্যন্ত পীড়িত নহে, এবং সিবিল সরজনের জবানবন্দী লওয়ার জন্য দরখাস্ত করে। সিবিল সরজনের জবানবন্দী লওয়ার পরে জজ পুনরায় ধনপত সিংহকে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সমনজারী করেন। কিন্তু যে কর্ম্মচারীর প্রতি সমনজারী করার ভার অর্পিত হয়, সে রিপোর্ট করে যে, সে তাহা জারী করিতে পারে নাই, কারণ, ধনপত সিংহ কলিকাতায় গমন করিয়াছে। মুরসিদাবাদের জজ অধঃস্থ জজের নিকট ঐ কমিসন পুনঃপ্রেরণ করেন, এবং তিনি ১৭০ ধারা মতে মোজাহেমদার ধনপত সিংহের অসাক্ষাতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

অধঃস্থ জজের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল, তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমা, এবং এই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীলের বিধি নাই; এবং দেখা যাইতেছে যে, আইনে যে মোকদ্দমায় আপীলের অনুমতি নাই, সে মোকদ্দমায় বিক্‌টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ আইনের ১৫ ধারার মর্ম্মানুসারে এই প্রধানতম বিচারালয় কর্ত্তৃক আপীল গৃহীত হওয়ার জন্য এই দরখাস্ত হইয়াছে।

মেং এলেন এই প্রার্থনার পোষকতায় যে নিষ্পত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিবেচনায়, এই মোকদ্দমায় খাটে না। অধঃস্থ জজের যে ক্ষমতা পরিচালন করার ক্ষমতা ছিল, তাহা সেই মোকদ্দমায় অধঃস্থ জজ পরিচালন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন; এবং তাহাতে

এই আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, যখন কোন কর্ম্মচারী স্বীয় আইনানুযায়ী ক্ষমতা পরিচালন করিতে অসম্মত হন, তখন হাইকোর্ট তাঁহাকে সেই ক্ষমতা পরিচালনে বাধ্য করিতে পারেন। উপস্থিত মোকদ্দমায় নিম্ন আদালত আপন ক্ষমতা পরিচালন করিতে অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু তাঁহার সাক্ষাতে যে প্রমাণ ছিল, তাহার উপরে তিনি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। অতএব পার্লিয়েমেণ্টের ঐ আইনের উক্ত ধারা মতে আমরা কি প্রকারে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি, তাহা আমাদের দৃষ্ট হয় না। অতএব আমরা এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম।

গ )

১ লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৪১৬ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের সদর মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৯ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ৩ রা জুন তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

গোদাই লাল ( ডিক্রীদার ) আপেলাণ্ট।

বিশ্বাসু কুঙর ( বিচারাদিষ্ট দায়ী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীকৃষ্ণ সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—১৮৬৫ সালের ৬ ই সেপ্টেম্বরের এক ডিক্রী জারীর দরখাস্ত ঐ তারিখ হইতে তিন বৎসর এক দিবসে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে দাখিল হয়, কারণ, ৬ ই তারিখ রবিবার ছিল। এমত স্থলে ঐ দরখাস্ত উচিত কালের মধ্যে দাখিল হওয়া গণ্য হইতে পারে না।

**বিচারপতি বেলি।**—আমার বিবেচনায়, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

ডিক্রীর তারিখ ১৮৬৫ সালের ৬ ই ডিসেম্বর। জারীর এক দরখাস্ত ১৮৬৮ সালের ৯ ই তারিখে দাখিল হয়, কিন্তু মোকদ্দমা তাহার পরে নম্বর-খারিজ হয়।

১৮৬৮ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে অর্থাৎ ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন বৎসর গত হওয়ার দিবসের পর দিবসে ডিক্রীজারীর জন্য পুনরায় এক দরখাস্ত হয়, কারণ, তৎপূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ ৬ ই সেপ্টেম্বর রবিবার ছিল।

এই সকল বৃত্তান্তের উপরে ৩ য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৫ ম পৃষ্ঠায় প্রচারিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি অনুসারে নিম্ন আপীল-আদালত নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই দরখাস্ত উচিত কাল গতে দাখিল হইয়াছে।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, ১৮৬৮ সালের ৬ ই জুলাই তারিখের দরখাস্ত যাহার দ্বারা ডিক্রী সজীব আছে, তাহা নিম্ন আপীল-আদালত দেখেন নাই; এবং দ্বিতীয়তঃ, উক্ত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় খাটে না, এবং শেষ দিবস রবিবার হওয়াতে সোমবার দিবসে দরখাস্ত দাখিল হওয়ায় তাহা উচিত সময়ের মধ্যেই দাখিল হইয়াছে।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে স্থলে দেখা যাইতেছে যে, জজ সেই দরখাস্তের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন, সে স্থলে তিনি যে তাহা দেখেন নাই এমত কখনই অনুমান করা যাইতে পারে না; এবং যে স্থলে নিম্ন আপীল-আদালত লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সমক্ষে উক্ত প্রথম আপত্তি উত্থিত হয় নাই, কিন্তু দ্বিতীয় আপত্তি যাহা আমরা এক্ষণে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইব তাহা উত্থিত হইয়াছিল, সে স্থলে ঐ আদালতের সমক্ষে তাহা তর্কিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে না।

৩ য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের পূর্ণাধি-

বেশনের নিষ্পত্তি যে অন্যথা হইয়াছে এমত প্রদর্শিত হয় নাই। কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, ১০ ম বালম উইকলি রিপোর্টরের ৫ ম পৃষ্ঠায় বিচারপতি ফিয়ার ও হব্‌হৌস নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দরখাস্তের তারিখ গণনা হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে, এবং এই বিধি অবলম্বন করিয়া ১৮৬৮ সালের ৭ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখ ছাড়িয়া দিলে ঐ দরখাস্ত ৩ বৎসরের মধ্যেই দাখিল হইয়াছে। কিন্তু এ মোকদ্দমার ঐ রূপ অর্থ অত্যন্ত সন্দেহ-জনক বোধ হয়, কারণ, রায়ে লেখা আছে যে, ঐ মোকদ্দমার ডিক্রীর তারিখ ১৮৬৪ সালের ৯ ই জুলাই এবং ডিক্রীজারীর দরখাস্তের তারিখ ১৮৬৭ সালের ৯ই জুলাই; এবং "দরখাস্তের পূর্ব্ব" এই শব্দের অর্থ দরখাস্তের তারিখের মধ্যে তিন বৎসর বুঝাইবে। দরখাস্তের তারিখের মধ্যে তিন বৎসর হইলে দরখাস্তের তারিখ ছাড়িয়া দিতে হইবে। কিন্তু সে যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের উক্ত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির অনুসরণ করিতে হইবে, এবং ঐ নিষ্পত্তিতে এমন কোন বিধি সংস্থাপিত হয় নাই যে, গণনা হইতে দরখাস্তের তারিখ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এই সকল হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি যে, ৭ ই সেপ্‌টেম্বরের দরখাস্ত উচিত সময়ের মধ্যে দাখিল হয় নাই, এবং যে স্থলে ১৮৬৫ সালের ৬ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখের ডিক্রী ছিল, সে স্থলে ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার তারিখ ছাড়িয়া দিলে ৬ ই সেপ্‌টেম্বরের তিন বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ৭ ই সেপ্‌টেম্বরের পূর্ব্বে কোন সময়ে ডিক্রীদারের দরখাস্ত করা কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু সে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার দরখাস্ত দাখিল করে নাই; অতএব তাহার বর্ত্তমান দরখাস্ত আমার বিবেচনায়, সময় অতীত হইয়া দাখিল হইয়াছে।

অতএব আমি খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিব।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। আমি বিবেচনা করি যে, ৩ য় বালম উইকলি রিপোর্টরের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি অনুসারে ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হওয়া মাত্রেই ডিক্রী বারিত হয়; অতএব এই ডিক্রী ১৮৬৮ সালের ৬ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে বারিত হইয়াছে। কেবল ১০ ম বালম উইকলি রিপোর্টরের ৫ ম পৃষ্ঠায় প্রচারিত নিষ্পত্তি দৃষ্টে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে; এবং যদিও ঐ রায়ের প্রথমভাগ যাহাতে গণনার নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝা কিঞ্চিৎ কঠিন, তথাপি আমার স্পষ্ট বোধ হয় যে, বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ যখন রায়ের সেই ভাগে আসিয়াছেন যেখানে তাঁহারা মোকদ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে ঐ নিয়ম প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন তাঁহারা ঠিক আমাদের ন্যায়ই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ ঐ মোকদ্দমায় বলিয়াছেন যে "এই মোকদ্দমার চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ "১৮৬৭ সালের ৯ ই জুলাই, অতএব আমাদের "বিবেচনায়, ঠিক ৩ বৎসরের মধ্যে এই দরখাস্ত "দাখিল হইয়াছে।" আমি বিবেচনা করি, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ বলেন যে, প্রার্থী ১৮৬৪ সালের ৯ ই জুলাই তারিখের এক ডিক্রী ১৮৬৭ সালের ৯ ই জুলাই তারিখে ঠিক সময়ের মধ্যেই জারী করিতে আসিয়াছে, তখন তাঁহাদের ইহাই বলা মনস্থ ছিল যে, সে তিন বৎসরের ঠিক শেষ দিবসে আসিয়াছে এবং ১০ ই জুলাই তারিখে দরখাস্ত করিলে তাহা সময়গতে হইত।

ঐ গণনা এই মোকদ্দমায় অবলম্বন করিলে আমি বিবেচনা করি যে, বর্ত্তমান দরখাস্ত ৭ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে সময় গতে দাখিল হইয়াছে; অতএব নজীর অনুসারে, ৬ ই সেপ্‌টেম্বর রবিবার হইয়াছে বলিয়া সেই সময় আমাদের বিস্তার করার ক্ষমতা নাই। (গ)

৩ রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল এস জ্যাক্‌সন এবং এফ এ গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ১১০৯ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের সদর আমীনের ১৮৬৮ সালের ২৬ এ মে তারিখের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২২ এ ফেব্রুয়ারিতে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গরিবুল্লা খাঁ প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

কেবললাল মিত্র প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মৌলবী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যাহারা সম্পত্তি এজমালীতে ভোগ করে কেবল তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধেই যে 'শরীক' শব্দ প্রয়োগ হয়, এমত নহে। এক বাসস্থানের মধ্যে যাহারা পৃথক্ পৃথক্ গৃহ দখল করে এবং উহার কোন গৃহের যে অংশীর আপন অংশ বিক্রয়ের দ্বারা সোফার স্বত্বের উৎপত্তি হয়, ইহারা শরার মর্ম্মানুসারে পরস্পর শরীক গণ্য।

জমিদারের সেরাস্তায় শরীকের নাম পৃথক্ পৃথক্ রেজিষ্টরী হওয়াই তাহাদের অংশ বিভক্ত হওয়ার প্রমাণ নহে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমাদের এই মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি অন্যথা করা উচিত।

বাদিগণ খোসাল খাঁ নামক এক ব্যক্তির বংশোদ্ভব, কিন্তু রহমান খাঁ ও তাহার আর এক পুত্রের বংশোদ্ভব। সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ খোসাল খাঁ হইতে যে এক জমা অধোগমন করে তাহার অন্তর্গত কতিপয় ভূমি রহমান খাঁ এবং বাদিগণ ভোগ করে, কিন্তু এই সকল ব্যক্তি যে ভূমি ভোগ করিত তাহার খাজানা জমিদারের সেরেস্তায় পৃথক্ রূপে রেজেষ্টরী হয়।

রহমান খাঁর মৃত্যুর পরে বাদী তাহার সম্পত্তির ।৶০ আনা অংশের দায়াধিকারী হয় এবং বাকী অংশ তাহার বিধবা স্ত্রী ও কন্যার হস্তে গমন করে। এই সকল স্ত্রীলোক তাহাদের অংশ এক হিন্দু প্রতিবাদীকে বিক্রয় করাতে বাদিগণ সোফার স্বত্ব উত্থাপন করে এবং সেই স্বত্বের উপরে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে।

অধঃস্থ জজ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যশোহর জেলার হিন্দু প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে সোফার ব্যবহার প্রচলিত আছে। ঐ জেলার অতিরিক্ত জজ-আদালতে যে এক নিষ্পত্তি হয় এবং যাহা খাস আপীলে প্রধানতম বিচারালয় কর্ত্তৃক স্থির থাকে, সেই নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করিয়াই ঐ নির্দেশ হইয়াছে এবং সেই নিষ্পত্তি উক্ত বিষয় সম্বন্ধীয় আর দুই নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করিয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি নির্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ ব্যবহার যশোহরে প্রচলিত থাকিলেও, বাদীর সোফার স্বত্ব নাই, কারণ, এই সকল ভূমি যে জমাভুক্ত, বাদী তাহার শরীক হইলেও রমজান খাঁ অথবা অন্যান্য বিক্রেতাগণের সহিত এজমালীতে বাদী আপন ভূমি ভোগ করে নাই।

আমি বিবেচনা করি, শরাতে 'শরীক' শব্দের যে ব্যাখ্যা আছে, ইহা তদপেক্ষা অতি সঙ্কুচিত ব্যাখ্যা। নিম্ন আদালত যে বলেন যে, শরীক শব্দ কেবল সেই স্থলে খাটে, যে স্থলে ব্যক্তিগণ বিরোধীয় ভূমি এজমালীতে ভোগ করে, তৎপোষক আমি কোন প্রমাণ অবগত নহি; বরং শরাতে দেখা যায় যে, এজমালী দখল আবশ্যকীয় নহে। বেলির সারসংগ্রহের ৪৭৭ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত বাক্য আছে, যথা "সাধারণের গমনাগমনের রাস্তা নহে এমন "পথের উপরে স্থিত এক বাসস্থান, যাহার "অনেক মালিক আছে, সেই বাসস্থানে এক "গৃহ দুই জনের সম্পত্তি ছিল, এবং তন্মধ্যে "এক ব্যক্তি আপন হিস্যা বিক্রয় করে। "সোফার স্বত্ব প্রথমে গৃহের শরীকের তৎপরে

"ঐ বাসস্থানের শরীকের এবং তাহার পরে ঐ "পথের লোকের প্রতি বর্ত্তে।"

অতএব বোধ হইতেছে যে, যদি ঐ বাক্য বিশুদ্ধ হয়, (এবং তাহা যে বিশুদ্ধ নহে এমন বলা হয় নাই) তবে শরার মর্ম্ম এই যে, যাহারা এক বাসস্থানে ভিন্ন ভিন্ন গৃহ দখল করে, যে ব্যক্তি তম্মধ্যস্থ কোন গৃহের আপন আপন অংশ বিক্রয় করে, তাহার সহিত একত্রে তাহারা শরীক বলিয়া পরিগণিত।

তর্কিত হইয়াছে যে, এই প্রকার অবস্থাস্থিত ব্যক্তিরা শরীক না হইয়া বরং প্রতিবাসী গণ্য হইতে পারে। কিন্তু এ কথার বিশেষ গুরুত্ব কিছু আমি দেখি না, কারণ, যে ব্যক্তি সোফার স্বত্ত্বের দাবী করে, সে যে বৃত্তান্তের উপরে তাহা দাবী করে তাহা যদি সে সম্যক্ রূপে ব্যক্ত করে, তবে সে আপনাকে প্রতিবাসী বলিয়া উল্লেখ না করিয়া শরীক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে বলিয়াই আদালতের তাহার দাবী অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। কিন্তু আমি যে বাক্যের উল্লেখ করিলাম তদ্দৃষ্টে আমার বোধ হয় যে, বাদী যথার্থই শরীক, অতএব শরা অনুসারে শরীকের যে সোফার স্বত্ব আছে, তাহা সে দাবী করিতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, বাদী এই মোকদ্দমার ডিক্রী পাইবে, এবং নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি সকল খরচা সমেত অন্যথা হইবে।

টীপ্পনী।—রায় প্রদত্ত হওয়ার পরে বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ বলিলেন যে, বাদী যে রহমান খাঁর সম্পত্তির ।৶০ আনা অংশ দায়াধিকারী সূত্রে পাইয়াছে এমত স্বীকৃত হয় নাই। যদি তাহা না হইয়া থাকে, তবে উকীলের তৎক্ষণাৎ অথবা খাস রেস্পণ্ডেন্টের পক্ষে সওয়াল-জওয়াবে তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য ছিল। তিনি তাহা সংশোধন করেন নাই। কিন্তু তাহাতে মোকদ্দমায় বড় ব্যতিক্রম হয় না, কারণ, বাদী ঐ প্রকার দায়ক্রমে সম্পত্তি পাইয়া থাকুক বা না থাকুক, সে এবং রহমান খাঁ উভয়েই খোসাল খাঁ অর্থাৎ প্রথমে যাহার সম্পত্তি ছিল, এবং যে সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বাদীতে এবং প্রতিবাদীর বিক্রেতাতে অধোগমন করিয়াছে, সেই খোসাল খাঁর বংশজাত।

বিচারপতি গ্লবর।—আমিও বিবেচনা করি যে, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, কিন্তু আমার বিবেচনায়, এই হেতুবাদে এই রায় প্রদান করা ভাল যে, নিম্ন আপীল-আদালত যথেষ্ট আইন-সঙ্গত প্রমাণের উপরে সিদ্ধান্ত করেন নাই যে, এই মোকদ্দমার পক্ষগণ মধ্যে অর্থাৎ সফী এবং প্রতিবাদীর বিক্রেতার পরস্পরের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ হইয়াছিল। জমিদারের সেরেস্তায় পক্ষগণের নাম পৃথক্ পৃথক্ রেজিষ্টরী হইয়াছিল বলিয়াই তাহা বিভাগের যথেষ্ট প্রমাণ বিবেচনা করা যাইতে পারে না। তাহাদের প্রত্যেকের দেয় খাজানা দেওয়ার সুবিধার জন্য ঐ রেজিষ্টরী হইয়া থাকিবে।

দ্রুষ্টব্য, বাদী ঐ সম্পত্তির শরীক, কারণ, সে রহমান খাঁর সম-দায়াধিকারী এবং সেই সূত্রে সে সম্পত্তির এক অংশ পাইয়াছে। এই অনুমান খণ্ডন করা প্রতিবাদীর কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহার তাহা করার সুযোগ থাকাতেও সে তাহা করে নাই। (গ)

---

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৩৪৬ নং মোকদ্দমা।

তাজপুরের মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৯ এ আগষ্টের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ত্রিহুতের জজ ১৮৬৯ সালের ১৪ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

আউধবিহারী লাল (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

ব্রজমোহন লাল ( বিচারাদিষ্টদায়ী )
রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর ই টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

মুন্সী মহম্মদ ইউছফ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এজমালী ডিক্রীর এজমালী ভাব পক্ষগণের আপনাদের মধ্যে পশ্চাতের কোন বন্দোবস্তের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না।

এজমালী ডিক্রীর কোন শরীকের দ্বারা ঐ এজমালী ডিক্রী জারীর জন্য ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারা মতে কোন প্রকৃত কার্য্য হইলে তদ্দ্বারাই সমুদায় ডিক্রী যথেষ্ট রূপে সজীব থাকে।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের মত এই যে, যেহেতু এই মোকদ্দমার নথীতে ডিক্রী এজমালী ডিক্রী স্বরূপ দৃষ্ট হইতেছে, এবং যেহেতু সেই এজমালী ডিক্রী পরিবর্ত্তন অথবা রূপান্তরকারক অন্য কোন ডিক্রী আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই, অতএব তাহা এজমালী ভাবেই দৃষ্টি করিতে হইবে।

আমাদের সমক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, প্রথম আদালত সম্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ডিক্রীদার এবং তাহার ঐ ডিক্রীর শরীক গোবর্দ্ধন লাল উভয়ে সম্মত হইয়া আদালতে দরখাস্ত দাখিল করে, এবং প্রত্যেকে ঐ ডিক্রী বিভাগ করিয়া আপন আপন অর্দ্ধাংশ পায়, কিন্তু নথীর কাগজের মধ্যে ঐ প্রকার দরখাস্ত অথবা হুকুম আমাদের নিকট প্রদর্শিত নাই। আমরা নিজের পক্ষে বলিতেছি যে, ডিক্রী সংশোধিত না হইলে ঐ প্রকার দরখাস্ত অথবা হুকুমের দ্বারা প্রথম ডিক্রীর এজমালী ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৬ সালের রিপোর্টের ২৪৮ পৃষ্ঠার এবং ১ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টারের মোৎফরকা নিষ্পত্তির ১ ম পৃষ্ঠার দুই নজীর আমাদের নিকট উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং তাহা কিয়ৎপরিমাণে খাস রেস্পণ্ডেণ্টের তর্কের প্রতিপোষক; কিন্তু আমার সম্পষ্ট মত এই যে, এই প্রধানতম বিচারালয়ে ইদানীন্তন যে সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার ফল এই যে, যে পর্য্যন্ত এমত প্রদর্শিত না হয় যে, মূল ডিক্রী অন্য এক ডিক্রীর দ্বারা সংশোধিত অথবা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত তাহা চূড়ান্ত ডিক্রী স্বরূপই থাকিবে, এবং ঐ এজমালী ডিক্রীদারগণের মধ্যে এক জন যদি ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার লিখিত সময়ের মধ্যে ঐ এজমালী ডিক্রীজারীর জন্য কোন কার্য্য করে, তবে তদ্দ্বারা সমুদায় ডিক্রীই যথেষ্ট রূপে সজীব থাকিবে।

অতএব আমার মত এই যে, নিম্ন আপীল-আদালত যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দ্বিতীয় ডিক্রীদার যে কার্য্য করিয়াছে, তদ্দ্বারা আপেলাণ্টের ডিক্রীর অংশ জীবিত নাই, তাহা অন্যথা করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয় ডিক্রীদারের কার্য্যের দ্বারা বর্ত্তমান ডিক্রী সজীব আছে কি না, তাহা স্থির করার জন্য মোকদ্দমা ঐ আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

প্রত্যেক পক্ষকেই আপন আপন প্রমাণ দাখিল করিতে দিতে হইবে।

আমরা বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমার অবস্থামতে এই আদালতের আপেলাণ্ট তাহার খরচা পাইতে পারে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও সম্পূর্ণ ঐ মত; এবং আমি ঐ হেতুবাদেই আমার রায় প্রদান করিলাম। আমার বোধ হয় যে, যখন ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার অন্তর্গত কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়, তখন মোকদ্দমায় প্রথমে যে ডিক্রী হয়, আদালতের তাহাই অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, এবং পক্ষগণ পশ্চাতে আপনাদের মধ্যে যে বন্দোবস্ত করে, আদালত তদবলম্বনে কার্য্য করিতে পারেন না। এবং আমি বিবেচনা করি যে, এই প্রধানতম বিচারালয়ের আধুনিক নিষ্পত্তি সমস্ত অনুসারে আমরা এই নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য যে এজ-

মালী ডিক্রীদারগণের মধ্যে যে কেহ ঐ ডিক্রীজারীর কোন প্রকৃত কার্য্য করে, তাহাতেই ঐ ধারা মতে, সমুদায় ডিক্রী সজীব থাকে। আমি এমন কথা বলি না যে, যদি ১ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরে ও ১৮৫৯ সালের সদর দেওয়ানী আদালতের রিপোর্টে প্রচারিত মোকদ্দমার ন্যায় পক্ষগণ যদি পশ্চাতে আপনাদের মধ্যে কোন বন্দোবস্ত করে, এবং আদালত যদি এমন বিবেচনা করেন যে, সেই বন্দোবস্তের দ্বারাই আদালতের তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া পক্ষগণের বিরোধের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে, তাহা হইলেও আদালত তাহা দেখিতে পারেন না; কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহা ঘটে নাই। উপস্থিত মোকদ্দমায় পক্ষগণের মধ্যে কোন বন্দোবস্ত হওয়ার কথা প্রমাণের দ্বারা উত্থিত হয় নাই।

আমাদের সমক্ষে সদর আদালতের যে নজীরের উল্লেখ হইয়াছে তাহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন বিধি-বদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে অন্য এক আইনমতে হয়। ১ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে, ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত উপস্থিত মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অনুরূপ নহে। সেই মোকদ্দমায় ডিক্রীদারদিগের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতে বিচারাদিষ্ট দায়ী সম্মত হইয়াছিল না, এবং প্রধানতম বিচারালয় বিশুদ্ধরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, যে বন্দোবস্তে বিচারাদিষ্ট দায়ী কোন পক্ষ ছিল না, তদ্দ্বারা তাহার উৎকৃষ্টতর অবস্থা হইতে পারে না, এবং যে সকল ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর কোন কার্য্য করে নাই তাহাদের বিরুদ্ধে সে তমাদীর আপত্তি করিতে পারে না; কিন্তু সে ঐ বন্দোবস্তে সম্মত হইলে তাহা করিতে পারিত। এই বাক্য রেস্পণ্ডেণ্টের তর্কের অনুকূল বটে; কিন্তু যে সকল বিচারপতি ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান সহকারে আমার মত এই যে, আমরা এইক্ষণে যে রায় ব্যক্ত করিলাম, তাহা এই প্রধানতম বিচারালয়ের আধুনিক নিষ্পত্তির অনুমোদিত। (গ)

৪ ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ গ্লবর এবং সর চারল্‌স হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১১২৫ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৯ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বালমুকুন্দ মোহন্ত (বাদী) আপেলাণ্ট।

রামহিত দাস প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর টি এলেন আপেলাণ্টের উকীল।

মেং ক্রে বারিষ্টর ও বাবু চন্দ্রমোহন সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ক্রোক জারী থাকার কালে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির যদি প্রকৃত ঘরাও বিক্রয় হয়, তবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকের সম্বন্ধেই ঐ বিক্রয় অকর্ম্মণ্য, এমত নহে; কেবল ঐ ক্রোককারী উত্তমর্ণ বা যাহারা তাহার সূত্রে দাবী করে, তাহাদের সম্বন্ধেই তাহা অকর্ম্মণ্য।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—এই মোকদ্দমায় আমাদের বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত আবশ্যকীয়, তাহা উভয় পক্ষই স্বীকার করিয়াছে, এবং তাহা এই:—মতিলাল দোবে নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থিত খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণের মধ্যে গোলাম মলানী সর্দ্দার রেস্পণ্ডেণ্টের দুই ডিক্রী ছিল। এই ডিক্রীজারীতে সে এই মোকদ্দমার বিরোধীয় স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে। এই ক্রোক জারী থাকার কালে অর্থাৎ ১২৭৫ সালের ২৬ এ ভাদ্র তারিখে বাদী ঐ ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তি ক্রয় করে। অনন্তর, ১৮৬৮ সালের ২৫ এ ডিসেম্বর মোতাবেক ১২৭৫ সালের ৮ ই পৌষ তারিখে অর্থাৎ বাদীর ক্রয়ের পরে, যে

দুই ডিক্রীমতে ক্রোককারী ডিক্রীদার গোলাম মলানী উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিল, তাহা পরিশোধিত হয়। ঐ দুই ডিক্রী পরিশোধিত হওয়ার পূর্ব্বে কিন্তু বর্ত্তমান বাদীর উক্ত ক্রয়ের পরে অর্থাৎ ১২৭৫ সালের ২৭ এ ভাদ্র তারিখে রামগতি নামক এক ব্যক্তি যাহার ঐ মতিলাল দোহের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী ছিল, সে তাহা জারী করিয়া ঐ সম্পত্তি ক্রোক করে। অনন্তর, এই শেষ ডিক্রী জারীতে বিরোধীয় সম্পত্তি আদালতের দ্বারা নীলাম হয় এবং সেই গোলাম মলানী তাহা ক্রয় করে। বাদীর ১২৭৫ সালের ২৬ এ ভাদ্র তারিখের ক্রয়ের দ্বারা যদি কোন স্বত্ব অর্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে উক্ত নীলামক্রয়ের দ্বারা স্পষ্টই সেই স্বত্বের হানি হইয়াছে; অতএব বিরোধীয় সম্পত্তিতে বাদী আপন ক্রয়ের স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করে।

প্রথম ক্রোককারী ডিক্রীদারের ডিক্রী যে পরিশোধিত হইয়াছিল এবং বাদীর ক্রয় যে না জানিয়া এবং মূল্য প্রদান করিয়া প্রকৃত ক্রয় হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে এইক্ষণে কোন আপত্তি নাই। এমত অবস্থায়, নিম্ন আপীল-আদালত আইন সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেহেতু যখন ঐ ক্রয় হয় তখন যে ডিক্রীর জন্য সম্পত্তি ক্রোক ছিল তাহা অপরিশোধিত ছিল, অতএব আইনানুসারে ঐ ক্রয় অবৈধ ও অকর্ম্মণ্য; সুতরাং রামগতির ডিক্রীজারীতে প্রতিবাদী গোলাম মলানী পশ্চাতে যে ক্রয় করে তাহাই বলবৎ থাকিবে; এপ্রযুক্ত ঐ আদালত বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস করেন।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, ২ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ৪৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি এই প্রশ্ন সম্বন্ধে চূড়ান্ত, এবং ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে বাদীর ১২৭৫ সালের ২৬ এ ভাদ্র তারিখের ক্রয় আইনমতে উৎকৃষ্ট। পক্ষান্তরে, তর্কিত হইয়াছে যে, ঐ মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ যে সমস্ত বৃত্তান্তের উপরে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা উপস্থিত মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অনুরূপ নহে, এবং যেহেতু ক্রোক জারী থাকার কালেই বাদী ক্রয় করিয়াছিল, অতএব ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪০ ধারামতে ঐ ক্রয় বাতিল ও অকর্ম্মণ্য।

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যে ব্যক্তি এই আপত্তি উপস্থিত করিয়াছে সে যদি সেই ক্রোককারী উত্তমর্ণ হইত, যাহার ক্রোক ২৬ এ ভাদ্র তারিখের বিক্রয়ের কালে জারী ছিল, তবে আমাদের সমক্ষে এই বিষয়ের কোন তর্কই হইতে পারিত না, এবং আইনানুসারে ঐ বিক্রয় বাতিল ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্ত হইয়া তাহা অন্যথা হইত। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায়, বিক্রয়ের কালে যে ক্রোক জারী ছিল তাহা এমন কোন ব্যক্তির ক্রোক নহে যাহা হইতে বর্ত্তমান নীলাম-ক্রেতা গোলাম মলানী আপন ক্রয়-জনিত স্বত্ব পাইয়াছে, কিন্তু গোলাম মলানীর নিজেরই ক্রোক ছিল, এবং সেই ক্রোক অন্য ডিক্রী-সূত্রে হইয়াছিল এবং সে সেই সূত্রে উপস্থিত বাদীর ক্রয়ের প্রতি আপত্তি করে না। অতএব আমাদের সমক্ষে যে প্রকৃত প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে তাহা এই যে, এক জন ক্রোককারী উত্তমর্ণের ক্রোকের দ্বারা পশ্চাতের আর এক জন ক্রোককারক এমন উপকার পাইতে পারে কি না যে, তদ্দ্বারা প্রথম ক্রোক জারী থাকার কালে যে বিক্রয় হয় তাহা দ্বিতীয় ক্রোকের অন্তর্গত নীলামক্রেতার অনুকূলে অকর্ম্মণ্য হইবে। আমি বিবেচনা করি, উল্লিখিত পূর্ণাধিবেশনের রায়ে এই কথা বর্ত্তমান বাদীর অনুকূলেই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্তের উপস্থিত মোকদ্দমার বৃত্তান্তের সহিত কিঞ্চিৎ প্রভেদ ছিল; কিন্তু সেই পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত প্রশ্ন আইন-ঘটিত প্রশ্ন ছিল, এবং তাহা এমন স্পষ্ট বাক্যে বর্ণিত হইয়াছিল যে, তাহা কি প্রশ্ন তদ্বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই এবং এইক্ষণে আমাদের যে

প্রশ্নের বিচার করিতে হইতেছে ঐ পূর্ণাধিবেশনের সমক্ষেও যে ঠিক সেই প্রশ্ন ছিল তদ্বিষয়েও আমার মনে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির জন্য যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছিল তাহা এই যে, "১৮৫৯ সালের "৮ আইনের বিধানমতে কোন সম্পত্তি ক্রোক "হইয়া মূল্য গ্রহণানন্তর প্রকৃত প্রস্তাবে ঘরাও "বিক্রয়ের দ্বারা হস্তান্তরিত হইলে, ঐ আইনের "২৪০ ধারা মতে সেই বিক্রয় কি কেবল ঐ "ক্রোককারী উত্তমর্ণ বা যাহারা তাঁহার সূত্রে দাবী "করে তাহাদের সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য, কি পৃথিবীস্থ "যাবতীয় লোকের সম্বন্ধেই অকর্ম্মণ্য, অথবা তাহা "আর কত দূর পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য?

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে পূর্ণাধিবেশনের বিচারপতিগণের মধ্যে অধিকাংশ বিচারপতিই প্রত্যেকে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন। ব্যবস্থাপক-সমাজের যে অভিপ্রায় ছিল এবং বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি অর্পিত প্রশ্নের যে উত্তর প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার রায়ের ৬৮ পৃষ্ঠায় লেখা আছে। তিনি বলেন যে, "আমার মতে যে সকল উত্তমর্ণ "ক্রোক করে এবং যে ডিক্রী মতে ক্রোক হয় সেই "ডিক্রী জারীতে যে সকল ব্যক্তি নীলাম ক্রয়ের "দ্বারা স্বত্ব পায়, কেবল তাহাদের সম্বন্ধে, যে "সকল উত্তমর্ণ অথবা ডিক্রীদার ক্রোক করে "নাই তাহাদের সম্বন্ধে নহে, ঐ বিক্রয় বাতিল "ও অকর্ম্মণ্য করা ব্যবস্থাপক সমাজের মনস্থ "ছিল।" অনন্তর অর্পিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, "আমাদের নিকট যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে তাহার উত্তর এই হইবে যে, ক্রোক জারী থাকার "কালে প্রকৃত ঘরাও হস্তান্তর কেবল ক্রোক- "কারী উত্তমর্ণ এবং যাহারা ঐ ক্রোকের অধীনে "এবং তৎসূত্রে দাবী করে তাহাদের সম্বন্ধে "বাতিল ও অকর্ম্মণ্য।"

অতএব তাঁহার রায়ে, উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় ক্রোক জারী থাকার কালে ঘরাও প্রকৃত হস্তান্তর যাবতীয় লোকের সম্বন্ধে বাতিল ও অকর্ম্মণ্য নহে, কেবল ক্রোককারী উত্তমর্ণ এবং যাহারা তাহার সূত্রে দাবী করে তাহাদের সম্বন্ধে বাতিল ও অকর্ম্মণ্য।

উপস্থিত মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী মল্লানী যে রামগতি হইতে স্বত্ব পাইয়াছে, বিক্রয়ের কালে সেই রামগতির ক্রোক জারী ছিল না, অথবা সে ক্রোককারী উত্তমর্ণের অথবা ঐ উত্তমর্ণের ক্রোক সূত্রেও কোন স্বত্ব পাইয়াছিল না।

এই প্রকার, বিচারপতি জ্যাক্সন ৬৯ ও ৭১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, তাঁহার মত এই যে, "২৪০ "ধারায় কেবল এক বাদী অথবা এক দল সহ- "বাদী এবং এক প্রতিবাদী বা একদল সহ-প্রতি- "বাদীর মধ্যে এক ডিক্রীজারীর কার্য্যপ্রণালীই "ব্যবস্থাপক সমাজের মনে ছিল;" এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, "কেবল ক্রোককারী উত্তমর্ণ "অথবা বিক্রয়ের কালে যে ক্রোক জারী ছিল "সেই ক্রোকমতে যে ব্যক্তি স্বত্ব প্রাপ্ত হয় সেই "ব্যক্তিই ঐ প্রশ্ন অর্থাৎ বিক্রয়ের বৈধতা "সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে।" অনন্তর তিনি অর্পিত প্রশ্নের তাঁহার উত্তর দিয়াছেন:—"আমার মত এই যে, ক্রোকের কালে "যে বিক্রয় হয় তাহা যাবতীয় লোকের সম্বন্ধে "অকর্ম্মণ্য নহে; ক্রোককারী উত্তমর্ণ এবং "যাহারা তাহার ক্রোকের অন্তর্গত স্বত্ব পাইয়াছে "কেবল তাহাদের সম্বন্ধেই অকর্ম্মণ্য।"

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন আরও স্পষ্ট রূপে বলিয়াছেন যে, "অর্পিত প্রশ্নের প্রধান "বিচারপতি যে উত্তর প্রদান করিয়াছেন, "এবং তৎপোষক যে সমস্ত হেতু তিনি প্রদর্শন "করিয়াছেন, তাহাতেই আমি সম্পূর্ণ রূপে "সম্মত। আমি বিবেচনা করি যে, এই মোক- "দ্দমার বৃত্তান্ত সমস্তের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া "কেবল সার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।"

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রও ৭১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, "আমি প্রধান বিচারপতির সহিত "এক মতে নির্দ্দেশ করিতেছি যে, ডিক্রীজারীতে

ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির ঘরাও হস্তান্তর কেবল "ক্রোককারী উত্তমর্ণের অথবা যাহারা তাহার সূত্রে দাবী করে, তাহাদের সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য, "অন্য কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য নহে।"

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, যে স্থলে এই কি ঐ মোকদ্দমার বৃত্তান্তের কথা ছাড়িয়া দিয়া পূর্ণাধিবেশনের বিচারপতিগণের মধ্যে অধিকাংশ বিচারপতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ডিক্রীজারীতে ক্রোক-কৃত সম্পত্তির প্রকৃত ঘরাও বিক্রয় কেবল সেই ক্রোককারী উত্তমর্ণের সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য যাহার ক্রোক বিক্রয়ের কালে জারী ছিল, অথবা যাহারা তাহার ও তাহার ক্রোকের সূত্রে দাবী করে, তাহাদের সম্বন্ধেও অকর্ম্মণ্য, কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে অকর্ম্মণ্য নহে, সে স্থলে আমার মত এই যে, ঐ পূর্ণাধিবেশনে যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছিল, আমাদের সমক্ষেও ঠিক সেই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে; অতএব আমাদেরও পূর্ণাধিবেশনের প্রদত্ত উত্তরের ন্যায় উত্তর দিতে হইবে। অর্থাৎ আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের এই বলিতে হইবে যে, বাদীর নিকট ১২৭৫ সালের ২৬ এ ভাদ্র তারিখে যে বিক্রয় হয় তাহা, রামগতি নামক আর এক জন ডিক্রীদারের পশ্চাতের ক্রোক এবং সেই পশ্চাতের ক্রোকের অন্তর্গত নীলামে প্রতিবাদী গোলাম মলানীর নিকট পশ্চাতে যে বিক্রয় হয়, তাহা সত্ত্বেও, বলবৎ থাকিবে।

অতএব আমি নিম্ন অপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ব্যক্ত করিব যে, বাদী বিরোধীয় সম্পত্তিতে স্বত্ববান্, এবং আমি বাদীকে এই আদালতের ও নিম্ন আপীল-আদালতের খরচা দিব।

**বিচারপতি গ্লবর।**—মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতি কর্ত্তৃকই বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

আমিও তাঁহার সহিত এক মতে বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা ১৮৬৮ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখে পূর্ণাধিবেশনের বিচারিত আনন্দলাল দাস বনাম রাধামোহন সাহার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির মর্ম্মান্তর্গত, এবং আমরা ঐ নিষ্পত্তি অনুযায়ী এই মোকদ্দমা খরচা সমেত বাদীর অনুকূলে ডিক্রী করিতে এবং নিম্ন আপীল-আদালতের হুকুম অন্যথা করিতে বাধ্য (গ)

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

**বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।**

১৮৬৯ সালের ১৬৩ নং মোকদ্দমা।

নদিয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই এপ্রিলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

দ্বারকানাথ বিশ্বাস (বাদী) আপেলাণ্ট।

রামচন্দ্র রায় (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ক্রোকের পরের কোন হস্তান্তর অকর্ম্মণ্য করার জন্য দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৪০ ধারার মতে ঐ ক্রোকের উপর নির্ভর করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, লিখিত হুকুমের দ্বারা অর্থাৎ আইনের লিখিত নিষেধক এস্তাহারের দ্বারা ঐ ক্রোক হইয়াছিল, এবং সেই এস্তাহার নির্গত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

**বিচারপতি জ্যাক্‌সন।**—ঈশানচন্দ্র রায় ও বনমালী ও রতনমালীর বিরুদ্ধ এক ডিক্রীজারীতে কতিপয় স্থাবর সম্পত্তির নীলামের মূল্য ৯৬৬৪ টাকা প্রতিবাদীর নিকট পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বাদী নালিশ করে। ঐ সম্পত্তি প্রতিবাদী গোপালচাঁদ শেঠ ক্রয় করে, এবং সে নিজেও উক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে আর এক ডিক্রীজারী করিতেছিল; অতএব সে আদালতে ক্রয়-মূল্য প্রদান না করিয়া ক্রয়-মূল্যের পরিমাণে তাহার স্বীয় ডিক্রীর প্রাপ্য টাকার বাবতে এক খানা রসিদ দাখিল করে।

বাদী নিজে সম্পূর্ণ ডিক্রীদার ছিল না; সে ঐ মোকদ্দমার মুল বাদিনী 'উমাময়ী' বর্ম্মণীর নিকট এক ডিক্রীর ।৶০ আনা অংশের বরাৎ প্রাপ্ত হয়। বাদীর নালিশের হেতু এই যে, তাহার প্রথম ক্রোক বিধায় অন্যান্য ক্রোক-কারী উত্তমর্ণের অগ্রে তাহার ডিক্রী সমুদায় পরিশোধিত করিয়া লইতে তাহার স্বত্ত্ব আছে।

এই মোকদ্দমা প্রথমে অধঃস্থ. জজের দ্বারা এই হেতুবাদে ডিস্মিস্ হয় যে, এই প্রকার মোকদ্দমা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৭০ ধারা মতে ডিক্রীর পক্ষগণের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে তাহা চলিতে পারে না; কিন্তু আপীলে ঐ নিষ্পত্তি এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশন কর্ত্তৃক অন্যথা হয়, এবং তাঁহারা এই বলিয়া মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে পুনঃপ্রেরণ করেন যে, ইদানীন্তন এক পূর্ণাধিবেশনে নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, বাদীর নালিশের ন্যায় নালিশ চলিতে পারে। অতএব উক্ত খণ্ডাধিবেশন আদেশ করেন যে, কেবল প্রথম ইসু ভিন্ন অন্য সকল ইসুর বিচারের জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবে; প্রথম ইসু এই ছিল যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭০ ধারা-লিখিত টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নুতন নালিশ চলিতে পারে কি না।

নিম্ন আদালতের পুনর্ব্বিচারের নিষ্পত্তি দৃষ্টে আমার বোধ হয় যে, ইহা অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, বাদী আপন আরজীর লিখিত বৃত্তান্ত সমস্ত সপ্রমাণ করিতে পারিলেই ডিক্রী পাইবে। কিন্তু প্রধানতম বিচারালয়ের পুনঃপ্রেরণের হুকুমের অথবা উল্লিখিত পূর্ণাধি-বেশনের নিষ্পত্তি যাহা ৯ ম বালম উইক্‌লি রিপো-র্টরের ৫১৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ঐ ফল হইতে পারে না। ঐ পূর্ণাধিবেশন নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বটে যে, ঐ প্রকার নালিশ চলিতে পারে, কিন্তু তাঁহারা এই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, যথা "আমাদের মত "এই যে, প্রশ্নের 'হুঁা' বলিয়া উত্তর দিতে "হইবে, কিন্তু এই প্রকার নালিশে বাদী যে, "সকলাবস্থায়ই পুনঃপ্রাপ্ত হইতে স্বত্ত্ববান্ "হইবে, এমত্ত আমরা বলি না। অনেক অবস্থা "হইতে পারে, যাহাতে সে ন্যায়ানুসারে পাইতে "পারে না, এবং যে আদালত মোকদ্দমার "বিচার করিবেন, তাঁহারই ইহা স্থির করিতে "হইবে যে, পক্ষগণের মধ্যে ন্যায়ানুসারে বাদী "পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে কি না।"

প্রথমে প্রতিবাদীর জওয়াব এই ছিল যে, বিরোধীয় সম্পত্তির এমন বৈধ ক্রোক হয় নাই, যদ্দ্বারা বাদী অন্যান্য সকল ক্রোককারী উত্তমর্ণের অগ্রে অথবা এককালেই কিছু পাইতে পারে। কিন্তু প্রতিবাদী আরও বলিয়া-ছিল যে, বাদী কর্ত্তৃক কোন ক্রোক হওয়ার পূর্ব্বে, বিচারাদিষ্টদায়িগণের স্বাক্ষরিত এক বন্ধকী দলীলের দ্বারা প্রতিবাদী সম্পত্তির উপর বৈধ এবং প্রকৃত স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল; এবং সে ঐ বন্ধকের উপরে এক ডিক্রী পায়, যাহাতে ব্যক্ত আছে যে, বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা তাহা পরিশোধিত হইবে; অতএব ঐ সম্পত্তির মূল্যের উপরে বাদীর কোন অগ্রগণ্য স্বত্ব নাই। সুতরাং এই স্থির করিতে হইবে যে, যদি বাদী ক্রোক সপ্রমাণ করে, এবং প্রতিবাদী তাহার বন্ধক এবং বন্ধকের উপরে ডিক্রী সাব্যস্ত করে, তবে মোকদ্দমার সমুদায় অবস্থা দৃষ্টে বাদী পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিবে কি না?

কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, এই মোকদ্দমায় আমাদের যে একটি ইসুর নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহা অতি সরল। তাহা এই যে, প্রতিবাদীর বন্ধকের পূর্ব্বে কি পরে বাদী বিরোধীয় ভূমি বাস্তবিক ক্রোক করিয়াছিল কি না। যদি তাহা না করিয়া থাকে, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ক্রয়-মুল্য হইতে তাহার টাকা পাওয়ার কোন দাবী থাকিতে পারে না; এবং তাহা হইলে প্রতিবাদীর স্বত্বের অপেক্ষা তাহার দাবী অগ্র-

গণ্য কি না, তাহার মীমাংসা করারও আবশ্যক হুইবে না।

নিম্ন আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ক্রোক বাস্তবিক হইয়াছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ঐ নির্দ্দেশ এক কালে অসম্পূর্ণ হেতুর উপরে হই-য়াছে। ক্রোকের পূর্ব্বে ক্রোক-কৃত সম্পত্তির হস্তান্তর অন্যথা করার জন্য ২৪০ ধারামতে ক্রোকের উপরে নির্ভর করার পূর্ব্বে, ইহা সপষ্ট রূপে দেখাইতে হইবে যে, "প্রতিবাদীকে সম্পত্তি "বিক্রয়, দান অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তা-"ন্তর করিতে ও অপর সাধারণকে তাহা বিক্রয় "দান অথবা অন্য প্রকারে গ্রহণ করিতে "নিষেধক হুকুম লিখিত হইয়া নির্গত ও প্রচারিত হওনানন্তর ক্রোক হইয়াছে।" কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, আদালত ক্রোক করার মনস্থ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই মনস্থ আইনের লিখিত এস্তাহার জারীর দ্বারা ব্যক্ত হওয়া কর্ত্তব্য। দরখাস্তমতে ঐ প্রকার এস্তাহার হইবে, এবং ঐ দরখাস্ত কার্য্য-বিধির ২১১ ধারা মতে করিতে হইবে এবং তাহাতে সম্পত্তির তালিকা থাকিবে, এবং রাজস্বপ্রদ সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ হইলে "ঐ দর-"খাস্তের সহিত সম্পত্তির মালগুজারীর এবং "যে সকল শরীকের নাম রেজিষ্টরী-কৃত আছে "তাহাদের নামের ও অংশের কালেক্টরের "সহীমোহর-যুক্ত এক তালিকা প্রদান করিতে "হইবে।"

এই রূপ ক্রোক যে হইয়াছিল, এমত বাদী আপেলাণ্ট আমাদিগকে দেখাইতে পারে নাই। নথীতে ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় যে সকল কাগজ আছে তাহা দুই পক্ষই ক্রমশঃ তদন্ত করিয়াছে, এবং যদিও ডিক্রীজারী সম্বন্ধে অনেক দরখাস্ত দাখিল এবং তাহার উপরে আদালতের হুকুম হইয়াছে, তথাপি বিরোধীয় সম্পত্তি সম্বন্ধে উক্ত নিষেধক হুকুম কখন জারী হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে, কতিপয় নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির সাধা-রণতঃ ক্রোকের জন্য হুকুম হওয়াতে আদালতের পেয়াদা যে কৈফিয়ৎ দেয় তাহা দ্বিধা-জনক; কারণ, সে বিরোধীয় সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছিল কি না, তাহা সে নিজেই বিবেচনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে আদালত অর্থাৎ নদিয়ার জেলার আদালত তাহাতে ১৮৬০ সালের ৮ ই আগষ্ট তারিখে এক হুকুম দেন যে, যেহেতু উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে কালেক্টরের রেজিষ্টরীর নকল দাখিল হয় নাই; অতএব ঐ সম্পত্তির ক্রোক বা নীলাম হইতে পারে না, সুতরাং নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ সকল আবশ্যকীয় কর্ম্ম সম্পন্ন করার জন্য ডিক্রীদারের প্রতি হুকুম হয়। দেখা যাইতেছে যে, এই সকল সম্পত্তি সম্বন্ধেই কালেক্টরের রেজিষ্টরী হইতে কতিপয় নকল ১৮৬১ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখে দাখিল হয়। তাহাতে হুকুম হয় যে, ক্রোক হওয়া উচিত। কিন্তু ঐ হুকুম ভিন্ন এই সম্পত্তির অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আর কোন কার্য্য হওয়া দৃষ্ট হয় না।

বাবু শ্রীনাথ দাস যিনি বাদীর পক্ষে আমা-দের সমক্ষ উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি প্রার্থনা করেন যে, মোকদ্দমার ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় সমু-দায় কাগজ পাঠাইবার জন্য ১৫ দিবস পূর্ব্বে এই আদালতের যে হুকুম হইয়াছিল তদনুযায়ী কাগজ আসা পর্য্যন্ত এই বিষয়ের নিষ্পত্তি স্থগিত থাকে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ঐ দরখাস্ত অনেক বিলম্বে হইয়াছে, এবং আদা-লত এমন হুকুম দেন নাই যে, কাগজ আসা পর্য্যন্ত বিচার মুলতবী থাকিবে। কিন্তু আমা-দের নিকট যে সমস্ত কাগজ আছে তদ-পেক্ষা যে তাহাতে কোন অতিরিক্ত কাগজ আছে এমন কথাও বলা হয় নাই, তাহা হইলেও বরং আমরা স্থগিত রাখিতাম। বাবু শ্রীনাথ দাস ইহা বলিয়াছেন বটে যে, ১৮৬১ সালের ২৪ এ এপ্রিলের দরখাস্তের উপরে আদালত যে হুকুম দেন তদনুযায়ী এক হুকুমনামা অবশ্য পাওয়া

যাইবে; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, নথীতে ঐ হুকুমনামার এক খণ্ড জাবেতা নকল আছে, কিন্তু তাহাতে বিরোধীয় ব্যক্তিগণের নাম লেখা নাই। অতএব ক্রোকের কোন প্রমাণ নাই, কেবল তাহাই নহে, কখন যে, কোন প্রমাণ ছিল তাহাও আমাদের অনুমান করার কোন হেতু নাই। পক্ষান্তরে, ইহা অনুমান করার অতি প্রবল কারণ আছে যে, আদালত যে ক্রোকের হুকুম দিয়াছিলেন তাহা কখন প্রতিপালিত হয় নাই। অতএব বাদীর নালিশ এককালে নিষ্ফল হইতেছে। কেবল এই হেতুবাদে, এবং নিম্ন আদালত যে হেতুবাদে তাঁহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ না করিয়া আমি বিবেচনা করি যে, বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত ছিল; অতএব এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(গ)

---

৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি।

১৮৬৯ সালের ৩৭৭ নং মোকদ্দমা।

গয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৪ ই জানুয়ারির হুকুম অন্যথা করত তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১ লা জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

আমনিত আলী (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

মসম্মত বিন্দু প্রভৃতি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মুন্‌সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—যদি বাদী খরচার এবং খরচার সুদের ডিক্রী পায় এবং প্রতিবাদীও খরচা বাবতে কিছু পাওয়ার হুকুম পায়, তবে বাদীর পাওয়ানা হইতে প্রতিবাদীর প্রাপ্য বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে তাহার উপরে বাদীর প্রাপ্য সুদ গণনা করিতে হইবে।

দোষগুণের উপরে পুনর্ব্বিচারের ন্যায় যদি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের বিচার হয়, তবে ঐ বিচারের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।

সুদের হিসাবে ভ্রম হইলে সেই ভ্রম সংশোধনের দরখাস্তের উপরে যে হুকুম হয় তদ্বিরুদ্ধে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারামতে আপীল চলিতে পারে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত সংক্ষেপে এই:—

১৮৫৭ সালের ২৬ এ মার্চ তারিখে বাদী খরচা ও ঐ খরচার উপরে সুদ সমেত ৪০০ টাকার ডিক্রী পায়, এবং প্রতিবাদীর দাবীর যে ভাগ সাব্যস্ত হইয়াছিল তাহার জন্য সে ৬০ টাকা খরচার হুকুম পায়।

১৮৬৮ সালে প্রতিবাদীর কতিপয় সম্পত্তি ঐ ডিক্রীজারীতে ক্রোক ও নীলাম হয় এবং নীলামের মূল্য আদালতে দাখিল হয়।

ডিক্রীর অন্তর্গত যে টাকা বাদীর প্রাপ্য ছিল তাহার ১৮৬৮ সালের ৩১ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সুদ সমেত ঐ তারিখে এক হিসাব প্রস্তুত হয় এবং ৬০ টাকা বাদে তাহা দেওয়ার জন্য হুকুম হয়।

৩১ এ ডিসেম্বর তারিখের যে হুকুম দ্বারা ১০৫৯॥৮ টাকা ডিক্রীদারকে দেওয়ার আদেশ হয় সেই হুকুমের বিরুদ্ধে বিচারাদিষ্ট দায়ী ১৮৬৯ সালের ১৪ ই জানুয়ারি তারিখে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে। সে তর্ক করে যে, ১৮৫৭ সালের ২৬ এ মার্চ তারিখের ডিক্রীতে বাদীকে যে টাকা এবং খরচা প্রদত্ত হয় তৎসমুদায়ের উপরে সুদ হিসাব করা উচিত হয় নাই; বাদীকে যে টাকা ও খরচা প্রদত্ত হয় তাহা হইতে প্রথমে প্রতিবাদীর ৬০ টাকা খরচা বাদ দিয়া বাকী টাকার উপরে ১৮৫৭ সালের ডিক্রীর তারিখ হইতে সুদ হিসাব করা উচিত ছিল।

অধঃস্থ জজ এই দরখাস্ত শ্রবণ করিয়া এই হুকুম দেন যে, "মোকদ্দমার নথীতে দেখা "যাইতেছে যে, ডিক্রী অনুযায়ী হিসাব প্রস্তুত "হইয়াছে, এবং প্রতিবাদী বিচারাদিষ্ট দায়ীর "প্রাপ্য টাকা বাদ দিয়া ডিক্রীদারকে বাকী "টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। হিসাবে কোন ভুল নাই। "প্রতিবাদীর যে টাকা পাওনা ছিল তাহা "বাদীর পাওনা টাকা হইতে বাদ দেওয়া "গিয়াছে। পুনর্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা "গেল।"

এই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জজের নিকট আপীল করাতে তিনি অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি এই বলিয়া অন্যথা করেন যে, "আপেলাণ্ট "যেমন দেখাইয়া দিয়াছে, হিসাবে সেই প্রকার "ভুল আছে। যদি প্রতিবাদী খরচার বাবৎ ৬০ "টাকা ওজেবাদ পাইতে পারে, তবে ডিক্রী-কৃত "টাকার সুদ হিসাব করার পূর্ব্বে তাহা হইতে "ঐ টাকা বাদ দেওয়া উচিত ছিল।"

জজের নিষ্পত্তিই যে বিশুদ্ধ, তাহা সপষ্টই দেখা যাইতেছে। প্রতিবাদীর ৬০ টাকা খরচা বাদে ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের ডিক্রীর দ্বারা বাদীকে ৪০০ টাকা ও খরচা প্রদত্ত হয়, এবং কেবল বাদীর পাওনা টাকার উপরেই সুদ হিসাব করা উচিত ছিল।

কিন্তু আমাদের সমক্ষে তর্ক হইয়াছে যে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি যাহা বাস্তবিক পুনর্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুর করার হুকুম, তাহার বিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল চলিতে পারে না। আমরা বিবেচনা করি যে, যে দরখাস্ত ১৪ ই জানুয়ারি তারিখে নিষ্পন্ন হয়, তাহা পুনর্বিচারের দরখাস্ত হইলেও খাস আপেলাণ্টের আপত্তি অকর্মণ্য হইবে, কারণ, সে যাহাকে পুনর্বিচারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করার হুকুম বলে, তাহার উপরে অধঃস্থ জজ মোকদ্দমার দোষগুণের পুনর্বিচারের শুননীর ন্যায় সমুদায় প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, এবং ৬ষ্ঠ বালম উঁইক্লি রিপোর্টরের ৩০১ পৃষ্ঠায়, প্রচারিত আহম্মদ হোসেন জান বনাম সর্ব্বানন্দ তেওয়ারীর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, ঐ প্রকার প্রদত্ত হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে। মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীতে নিয়মিতরূপে ঐ মোকদ্দমার নম্বর অঙ্কিত না করিয়া আদালত বেজাবেতা রূপে ঐ পুনর্বিচারের নিষ্পত্তি করিয়াছেন বলিয়াই আমাদের বিবেচনায়, কোন ব্যতিক্রম হয় না।

কিন্তু আর এক হেতুবাদে আমরা বিবেচনা করি যে, এই আপীল জজ কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ রূপেই গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৬৮ সালের ৩১ এ ডিসেম্বর তারিখের যে রুবকারীতে কেবল সুদের হিসাব করা হইয়াছে তাহা আদালতের ডিক্রী অথবা রায় নহে। ঐ রুবকারীর ভ্রম সংশোধন করার দরখাস্ত, ডিক্রীজারী সম্বন্ধে ডিক্রীর পক্ষগণের মধ্যে কার্য্য, এবং সেই দরখাস্তের উপরে আদালত যে হুকুম দেন তাহার বিরুদ্ধে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা মতে আপীল হইতে পারে। জজ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহা করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল, এবং তাহা বিশুদ্ধও হইয়াছে।

অতএব আমরা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্ট উপস্থিত না থাকাতে খরচা দেওয়া গেল না।　　　　(গ)

---

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান্ এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি।

১৮৬৯ সালের ৪৭৬ নং মোকদ্দমা।

সাহাবাদের প্রথম অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩রা এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বিবী মনিরন্ (বিচারাদিষ্ট দায়ী)
আপেলাণ্ট।

বিবী মচ্ছীহন ( ডিক্রীদার ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি গ্রেগরি রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে আদালত মোকদ্দমার বিচার করেন তাঁহারই খেসারতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে; ডিক্রীজারীতে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

প্রধানবিচারপতি নর্ম্যান্।—বাদিনী মসম্মত বিবী মচ্ছীহন শ্রীই বলিয়া নালিশ করেন যে, প্রতিবাদী যে বাঁধ অর্থাৎ কাত্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার সম্পত্তির অনিষ্ট হইয়াছে। তিনি এই মর্ম্মে এক ডিক্রী পান যে, তালবড়কা নামক দীঘী হইতে তিনি তাঁহার কতিপয় শালী ভূমিতে জলসেচন করিতে পারিবেন এবং ঐ তাল অর্থাৎ দীঘীতে জলের গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না, এবং প্রতিবাদী যে নূতন বাঁধ উঠাইয়াছে তাহা ভাঙ্গিতে হইবে, এবং বাদিনীর ফসলের যে হানি হইয়াছে তাহার খেসারতের পরিমাণ ডিক্রীজারীর কালে নির্ণীত হইবে, কিন্তু আরজীর লিখিত খেসারতের পরিমাণের অধিক খেসারত দেওয়া যাইবে না। আপীল হয়; কিন্তু তাহাতে ঐ ডিক্রীই স্থির থাকে।

ডিক্রীজারীতে যে কার্য্য হইয়াছে তৎসম্বন্ধে এইক্ষণে আমাদের সমক্ষে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। যে সম্পত্তি সম্বন্ধে ডিক্রী হয়, ডিক্রীতে অথবা আরজীতে তাহার কোন চৌহদ্দী না থাকায় সাহাবাদের অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ ডিক্রীজারী করা যাইতে পারে না।

আপীলে জজ নির্দ্দেশ করেন যে, আরজীতে চৌহদ্দী লেখা না থাকিলেও "৯৬ বিঘা ১৫ "কাঠার 'ওয়াশীলাতের দাবী' হইয়াছে তাহার "কিতা সমস্তের ও কৃষকদিগের নামের এক "বিস্তারিত ফর্দ্দ আরজীর নিম্নভাগে আছে।" তিনি বলেন, যে সমস্ত ভূমির ওয়াশীলাতের দাবী হইয়াছে এবং যে 'ছাত্তা ভাঙ্গিবার প্রার্থনা হইয়াছে তাহা একজন বুদ্ধিমান আমীন অনায়াসেই নির্ণয় করিতে পারে। তিনি বিবেচনা করেন যে, বিচারাদিষ্ট দায়ী যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছে তাহা অকর্ম্মণ্য, এবং তিনি হুকুম দিয়াছেন যে, সাসিরামের আমীন ঐ তদন্তের জন্য নিয়োজিত হয় এবং ডিক্রীজারী করার জন্য তাহাকে যথোচিত সহায়তা করা হয়। অতএব জজের বিবেচনায় ডিক্রী অসম্পূর্ণ নহে, এবং ডিক্রীজারীতে খেসারত নির্ণয় করা যাইতে পারে।

১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৯৯ পৃষ্ঠার মসম্মত বিন্দা বিবী বনাম লালা র মশরণ সিংহের মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, আধুনিক কয়েকটী মোকদ্দমায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নিম্ন আদালত সমস্ত নিজে খেসারত নির্ণয় না করিয়া তাহা ডিক্রীজারীতে নির্ণীত হওয়ার জন্য রাখিয়া দেন। ইহা তিনি বলেন যে, স্পষ্টই অন্যায়। তিনি বলেন যে, "ডিক্রীজারীতে ওয়াশীলাৎ নির্ণয় করার জন্য "যেমন ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৯৭ ধারায় "অনুমতি আছে, সেই প্রকার সচরাচর খেসা- "রতের মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীতে খেসারত নির্ণয় "করার জন্য দেওয়ানী কার্য্য বিধিতে কোন "ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই।" প্রধান বিচারপতি অনন্তর বলিয়াছেন যে, "এই মোকদ্দমার এক "জন আমীন প্রেরিত হইয়াছিল এবং ডিক্রী- "জারীতে আমীনে যে প্রকার খেসারত নির্ণয় "করিত, এই আমীনও সেই প্রকার নির্ণয় করিতে "পারিত, এবং তাহা হইলে অতিরিক্ত ব্যয় "বাঁচিত।" প্রধান বিচারপতি তাহার পরে বলেন যে, এই বিষয়ে অপীলের হেতু নাই, কিন্তু নিম্ন আদালত সমস্তকে এই অনিয়ম দেখাইয়া দেওয়ার জন্য তিনি ঐ কথা বলিলেন। ঐ মোকদ্দমায় যে মত ব্যক্ত হইয়াছে যে, যে আদালত মোকদ্দমার বিচার করেন তাঁহারই খেসারত নির্ণয় করিতে হইবে, ডিক্রীজারীতে তাহা নির্ণীত হইবে না, ইহাতে আমি সম্পূর্ণরূপে সম্মত হইলাম।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র আমাদের সমক্ষে তর্ক করিয়াছেন যে, উপস্থিত ডিক্রী অসম্পূর্ণ। আমি বিবেচনা করি, এই তর্ক সমূলক, এবং এই ডিক্রী অসম্পূর্ণ বিধায়ই তাহা আদালত সম্পূর্ণ করিতে পারেন। খেসারতের পরিমাণ ডিক্রীজারীর কালে নির্ণয় করার যে আদেশ আছে তাহা অশুদ্ধ। বাদীর খেসারত পাওয়ার স্বত্ব ডিক্রীতে সাব্যস্ত হইয়াছে। মূল ডিক্রীতেই খেসারত নির্ণয় করা উচিত ছিল; কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদের সমক্ষে কোন আপীল উপস্থিত নাই।

অনেক মোকদ্দমায়, পক্ষগণের স্বত্ব নির্ণয়ার্থে বহু ব্যয় ও বিলম্বজনক তদন্তে আমীন প্রেরণ করার পূর্ব্বে সেই স্বত্ব নির্ণয় করা সুবিধাজনক হয়। এই প্রধানতম বিচারালয়ের আদ্য বিভাগে, কারবারের শরিকী উঠাইয়া দেওয়ার এবং নিকাশের ডিক্রী হইলে ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত প্রত্যেক শরীকের পাওনা নির্ণয় করা সর্ব্বদা সুবিধা-জনক কার্য্য বলিয়া অনুভূত হয়; কিন্তু বিচারান্তে পক্ষগণের স্বত্ব নিশ্চিতরূপে বর্ণন করত এবং কতকালের নিকাশ হইবে তাহা স্থির করত ডিক্রী না দিয়া ঐরূপ তদন্ত করা হয় না। খেসারতের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৮০ ধারায় আবশ্যকীয় তদন্তের বিধান আছে, এবং পক্ষগণের স্বত্ব উপরিউক্ত প্রকারে সাব্যস্ত হওয়ার পরে ঐরূপ তদন্ত হইতে পারে।

বাদিনীর ফসলের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা ডিক্রীজারীর কার্য্য হইবে না, কিন্তু ১৮০ ধারার অন্তর্গত তদন্তের কার্য্য হইবে অর্থাৎ চূড়ান্ত ডিক্রী হওয়ার প্রাথমিক তদন্ত হইবে। খেসারতের পরিমাণ সম্বন্ধে আমীনের রিপোর্ট আদালতে আনিতে হইবে। আবশ্যক হইলে তৎসম্বন্ধে পক্ষগণের আপত্তি শুনিতে হইবে এবং সেই রিপোর্টের উপরে ইহার পরে আদালত খেসারতের পরিমাণ নির্ণয় করিবেন, এবং খরচা ও খেসারতের শেষ চূড়ান্ত ডিক্রীতে ঐ রূপে নির্দ্দিষ্ট টাকা প্রদানের হুকুম হইবে।

সাসীরামের আমীনের সমক্ষে তদন্ত হওয়ার জন্য জজ যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা সংশোধন করিয়া আমরা এই হুকুম দিতেছি যে, ঐ আমীন আদালতে তাহার রিপোর্ট দাখিল করে।

ডিক্রীর অপর ভাগ সম্বন্ধে জজের নিষ্পত্তি অশুদ্ধ বিবেচনা করার কোন কারণ আমি দেখি না। ডিক্রীর আদেশ মতে আমীন বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিবেন।

আপেলাণ্ট যে হেতুবাদে এই আদালতে আপীল করিয়াছে তাহাতে সে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, কিন্তু যেহেতু ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, জজের বর্ত্তমান হুকুম সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ নহে, অতএব আমরা হুকুম করিতেছি যে, প্রত্যেক পক্ষ এই আপীলের আপন আপন খরচা বহন করিবে। বাদিনীকে নিম্ন আদালত সমস্তের খরচা দেওয়ার জন্য নিম্ন আদালতের হুকুম স্থির থাকিবে।　　(গ)

৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি।

১৮৬৯ সালের ৪৪০ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের সদর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৪ ই এপ্রিলের হুকুম স্থিরতর রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ৯ ই সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ননহীকুঁওর (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

কস্তুরী কুঁওর প্রভৃতি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গোপাললাল মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল ও বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দখলের যে ডিক্রী জারী করার জন্য নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ মধ্যে কোন কার্য্য হয় নাই, তাহা

জারীর নিমিত্ত ডিক্রীর তারিখের তিন বৎসর পরে ডিক্রীদার এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে, সে ঘরাও আপোসের দ্বারা দখল পাইয়াছে, এবং প্রার্থনা করে যে, কালেক্টরের তৌজীতে তাহার নাম রেজিষ্টরী করার হুকুম হয়। ইহাতে দেওয়ানী আদালত নামখারিজের জন্য কালেক্টরের উপরে এক হুকুমনামা জারী করেন।

প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিলেন যে, ঐ হুকুমনামা ডিক্রীজারীর এক-কার্য্য বিধায় তাহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারা মতে জারী হইতে পারে না।

১৭৯৩ সালের ৪৮ কানুনের ২৪ ধারার ২ প্রকরণ মতে যদি ঐ প্রকার ডিক্রী কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়, তবে নাম-খারিজ করা উচিত কি না, তাহা তাঁহারই তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা উচিত। কিন্তু যদি কোন নাম কালেক্টরের রেজিষ্টরীতে লেখার জন্য দেওয়ানী আদালত তাঁহার উপরে হুকুমনামা জারী করেন, তবে কালেক্টর তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

**প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।**—কস্তুরীকুওর মৌজা শিবপুর ও অন্য তিন মৌজার এক আনা অংশের দখল পাওয়ার জন্য ও বাবু রাসবিহারী সিংহের কন্যা ও দায়াধিকারিণী বলিয়া তাহার নাম রেজিষ্টরী করার জন্য ১৮৬১ সালের ২০ এ জুলাই তারিখে এক ডিক্রী পায়। রাসবিহারী সিংহের ভ্রাতা ব্রজবিহারী সিংহ এবং মসম্মত নন্হী কুওর যিনি বাবু রাসবিহারী সিংহের বিধবা স্ত্রী এবং দায়াধিকারিণী বলিয়া দাবী করেন, ইহাঁরা ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদী ছিলেন। ঐ ডিক্রী ১৮৬৪ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রদত্ত হয়। উক্ত ডিক্রীতে কস্তুরী কুওরের স্বত্ব ও লাভ পশ্চাতে কৃষ্ণদেবনারায়ণের নিকট হস্তান্তরিত হয়।

১৮৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে কস্তুরী কুওর এই বলিয়া ঐ ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে যে, সে এক ঘরাও আপোস-বন্দোবস্তের দ্বারা ঐ তিন মৌজার দখল পাইয়াছে এবং সে প্রার্থনা করে যে, কালেক্টরীর তৌজীতে তাহার নাম রেজিষ্টরী করার হুকুম হয়। দেখা যাইতেছে যে, ঐ দরখাস্ত ডিক্রীর তারিখের তিন বৎসর পরে দাখিল হয়, এবং দরখাস্তের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারী করার জন্য কোন কার্য্য হয় নাই।

ত্রিহুতের সদর মুন্সেফ হুকুম দেন যে, রাসবিহারী সিংহের পরিবর্ত্তে কস্তুরী কুওরের নাম রেজিষ্টরী করার জন্য কালেক্টরের উপরে এক হুকুমনামা জারী হয়।

২৪ এ নবেম্বর তারিখে প্রতিবাদী নন্হী কুওর এবং ব্রজবিহারী ঐ হুকুমের প্রতি এই আপত্তির দরখাস্ত দাখিল করে যে, প্রথমতঃ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১৬ ধারামতে তাহাদের উপরে কোন নোটিস জারী হয় নাই, এবং দ্বিতীয়তঃ, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার বিধানমতে কালেক্টরের উপর হুকুমনামা জারী করার স্বত্ব বারিত হইয়াছে, কারণ, ইহা ১৮৬৪ সালের ৩ রা ফেব্রুয়ারির ডিক্রী জারী করার কার্য্য; অতএব তাহা ডিক্রীর তারিখের তিন বৎসরের মধ্যে না হওয়াতে হুকুমনামা জারী করার স্বত্ব বারিত হইয়াছে। কস্তুরীকুওর যে বলে যে, সে দখল পাইয়াছে এবং প্রতিবাদিগণ তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে, তাহাও তাহারা অস্বীকার করে।

সদর মুন্সেফ এই সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করেন এবং আপীলে ত্রিহুতের জজ এই নির্দ্দেশ করিয়া ঐ নিষ্পত্তিই স্থির রাখেন যে, ডিক্রীদার দরখাস্ত না করিলেও ডিক্রীদারের নাম রেজিষ্টরী করার জন্য নিম্ন আদালত কালেক্টরের উপরে হুকুমনামা জারী করিতে বাধ্য ছিলেন, এবং আদালত যদি তাহা না করিয়া থাকেন তবে ঐ হুকুমনামা প্রেরণ করার জন্য যে কোন সময়ে হউক আদালতে দরখাস্ত করিতে ডিক্রীদারের ক্ষমতা আছে। জজ আরও বলেন যে, "এই মোকদ্দমার সহিত তমাদীর আইনের কোন সম্বন্ধ নাই।"

এইনিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রধানতম বিচারালয়ে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে। আমি বিবে-

চনা করি যে, রাসবিহারীর পরিবর্ত্তে কস্তুরী কুঁওরের নাম রেজিষ্টরীতে লেখার জন্য কালেক্টরের প্রতি যে হুকুমনামা প্রচার হয় তাহা যে আদালত ১৮৬৪ সালে ঐ প্রকার নাম খারিজের ডিক্রী দেন সেই আদালতের ডিক্রীজারী করার কার্য্য। যদি ১৭৯৩ সালের ৪৮ কানুনের ২৪ ধারার ২ প্রকরণমতে ঐ ডিক্রীর এক খণ্ড প্রতিলিপি ডিক্রী হওয়া মাত্রে অথবা তাহার পরে কোন সময়ে কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হইত, তাহা হইলে নামখারিজ করা উচিত কি না, তাহা কালেক্টর নিজে তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিতেন। যদি ডিক্রী উচ্চরিত হওয়া মাত্রেই তাহার প্রতিলিপি কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কালেক্টর রাসবিহারীর স্থানে কস্তুরীকুঁওরের নাম বসাইতেন। কিন্তু বিলম্ব হইয়া থাকিলে (যে বিলম্বের দ্বারা পক্ষগণের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওয়া অনুভূত হইতে পারে) কালেক্টর আদালতের ডিক্রী পাইয়া নিজে হয়ত ইহা নির্ণয় করিতেন যে, ডিক্রী হওয়ার পরে এমন কোন ঘটনা হইয়াছে কি না, যদ্দ্বারা পক্ষগণের স্বত্বের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি নিজে তাঁহার বিবেচনা পরিচালন করিতেন। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় সদর মুনসেফ কস্তুরী কুঁওরের নাম লেখার জন্য কালেক্টরের প্রতি হুকুমনামা জারী করাতে পক্ষগণ যে কালেক্টরের সমক্ষে এই প্রকার কোন আপত্তি উপস্থিত করিবে তাহার পথ-রুদ্ধ করিয়াছেন। যে ডিক্রী তিন বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে প্রদত্ত হয়, বস্তুতঃ তাহা জারী করার জন্যই এই কার্য্য হইয়াছে। অতএব সদর মুনসেফ যে ঐ হুকুমনামা জারী করিয়াছেন, তাহা তিনি ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারামতে জারী করিতে বারিত।

অতএব জজ যে, নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তমাদীর আইনের দ্বারা এ মোকদ্দমার কোন ব্যতিক্রম হয় না, তাহা অন্যথা হইল, এবং এই আদালতের ও নিম্ন দুই আদালতের খরচা সমেত, কালেক্টরের নিকট প্রথম আদালতের হুকুমনামা জারী করার আদেশ রহিত হইল।

বিচারপতি বেলি।—নিম্ন আপীল-আদালতের হুকুম অন্যথা করিতে আমিও সম্মত হইলাম। ইহা স্বীকৃত যে, ডিক্রীর তারিখের ৩ বৎসর পরে নিম্ন আপীল-আদালত কালেক্টরের প্রতি এক জনের নাম রেজিষ্টরী করার নিমিত্ত হুকুমনামা জারী করিয়াছেন। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীদার কোন কার্য্য করে নাই। ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারা, দ্রষ্টব্য। আমি বিবেচনা করি যে, কালেক্টরের প্রতি আদালতের ঐ হুকুম-নামা জারী করা ডিক্রীর তিন বৎসর পরে ডিক্রীদারের দরখাস্ত মতে হইয়াছে। অতএব আদালতের ঐ হুকুম ২০ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ।

তর্কিত হইয়াছে যে, আদালতের নিজের হুকুম আদালতেরই উচিত সময়ের মধ্যে জারী করা উচিত ছিল; এবং ডিক্রীদার ডিক্রীজারী করার ভার তাহার নিজের হস্তে লইতে পারে না, অতএব ডিক্রীদারের কোন ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু প্রথমতঃ, এই তর্ক বিশুদ্ধ হইলেও, ডিক্রীদার যদি দেখে যে, যে সময়ের মধ্যে হুকুম-জারী করার বিধান আছে, সেই সময়ের মধ্যে আদালত তাহা নিজে জারী করিলেন না, (যদিও আদালতকে তৎক্ষণাৎ এবং উচিত সময়ের মধ্যে তাঁহার নিজের হুকুম জারী করিতে বাধ্য করার জন্য আদালতের উপরে ডিক্রীদারের কোন ক্ষমতা না থাকে,) তবে কি জন্য ডিক্রীর নকল জারী করত ডিক্রীর লিখিত রেজিষ্টরী করার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে সে আদালতে প্রার্থনা করিয়া আদালতের গোচর করিবে না, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। ডিক্রীদারকে তাহার ডিক্রী-জারী করার প্রকৃত কার্য্য করার নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ১৩ আইনের ২০ ধারায় কেবল ৩ বৎসর

সময় প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ডিক্রীদার যে, আইনের এই বিধানানুযায়ী কোন কার্য্য করিয়াছে, তাহা এই মোকদ্দমায় আমাদের দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু আমার মত এই যে, কালেক্টর যখন দেওয়ানী আদালতের ১৮৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখের হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার ঐ হুকুম প্রতিপালন করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য ছিল না। কালেক্টরের নিকট দেওয়ানী আদালতের যে সমস্ত ডিক্রী ও হুকুম প্রতিপালনার্থে প্রেরিত হয়, তাহা তিনি পালন করিতে বাধ্য। ১৮৬৩ সালের ডিক্রীর তারিখ হইতে ১৮৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত এত অধিক বিলম্ব হওয়ার কথা যে, কালেক্টর সদর মুনসেফকে জানাইতে পারিতেন, ইহা আমি অস্বীকার করি না; কিন্তু তাহা করিয়াও ঐ বিষয়ে দেওয়ানী আদালত যে হুকুম দিয়াছিলেন, তাহা কালেক্টরের প্রতিপালন করা উচিত হইত। (গ)

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

রাণাঘাটের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

মহিম মণ্ডল, বাদী।

কালাচাঁদ নায়েক, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—ডিক্রীদার ও তাহার বিচারাদিষ্ট দায়ীর পরস্পরের মধ্যে আদালতের বাহিরে যে ঘরাও বন্দোবস্ত হয় তাহাতে দায়ী ডিক্রীদারকে কতিপয় সম্পত্তি অর্পণ করে, এবং ডিক্রীদার দায়ীকে ডিক্রীর সমস্ত দায় হইতে মুক্ত করিবার করার করে। পশ্চাতে ডিক্রীদার ঐ বন্দোবস্ত অস্বীকার করত দায়ীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করে, কিন্তু সে দায়ীর কোন সম্পত্তি ক্রোক অথবা তাহার কোন ক্ষতি করে নাই। ডিক্রীজারী চালাইবার ত্রুটি হেতু ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা নম্বর-খারিজ হয়। তাহাতে দায়ী ডিক্রীদারকে যে সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিল তাহার মূল্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ছোট আদালতে নালিশ করে।

এ স্থলে, প্রতিবাদীর কার্য্যের দ্বারা বাদী কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায় বাদীর ঐ নালিশ চলিতে পারে না।

এস্তমেজাজ।—প্রতিবাদী এই আদালতে বাদীর বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পায়, এবং ডিক্রীজারী করে। কথিত হইয়াছে যে, ঐ ডিক্রীজারী চলিবার কালে এক বন্দোবস্ত হয় (আদালতের দ্বারা অথবা আদালতে সার্টিফিকেট দাখিল করিয়া হয় না) যদ্দ্বারা বাদী কতিপয় সম্পত্তি প্রতিবাদীকে অর্পণ করে, এবং প্রতিবাদী বাদীকে ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত সকল দায় হইতে মুক্ত করিবার করার করে। তাহার পরে প্রতিবাদী ঐ বন্দোবস্ত অস্বীকার করত বাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সে তাহার কোন সম্পত্তি ক্রোক বা নীলাম অথবা তাহাকে গেপ্তার বা তাহাকে কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করে নাই। ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা ত্রুটি হেতু নম্বর-খারিজ হয়। অতএব বাদী যে সম্পত্তি প্রতিবাদীকে অর্পণ করিয়াছিল তাহার সমুদায় মূল্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য সে এই আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

প্রশ্ন এই যে, এই নালিশ চলিবে কি না?

আমার মত এই যে, ইহা উচিত সময়ের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহা চলিতে পারে না; অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথিত চুক্তিভঙ্গের দ্বারা যে পর্য্যন্ত বাদীর বাস্তবিক কোন ক্ষতি না হয়, সে পর্য্যন্ত নালিশ উপস্থিত করা যাইতে পারে না।

জমীর মণ্ডল বঃ ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী, সদরল্যাণ্ডের ছোট আদালতের এস্তমেজাজের ৭৩ পৃষ্ঠা। আলমজা বিবী বঃ গুরুচরণ রায় ১১৮ পৃঃ।

পার্শ্বের লিখিত মোকদ্দমা সমস্ত উপস্থিত বিষয়ে খাটে; বিশেষতঃ, শেষোক্ত দুই মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ডিক্রীদার

ভায়া ভজনাথ সাহা বঃ কুমাউন, ৭ ম বাঃ উঃ রিঃ ১৩৪ পৃঃ।

সুজান মণ্ডল বঃ উজীর মণ্ডল, ওয়াইমানের ছোট আদালতের এস্তমেজাজের ২২ পৃঃ।

ভগবান তাতী বঃ গোবিন্দচন্দ্র রায়, ৯ ম বাঃ উঃ রিঃ ২১০ পৃঃ।

যদি আদালতে তাহার ডিক্রী পরিশোধ হওয়ার সার্টিফিকেট দাখিল করার চুক্তিভঙ্গ করে, অথবা প্রতারণা করিয়া সার্টিফিকেট দাখিল না করে, তবে বিচারা-দিষ্ট দায়ী খেসারতের নালিশ করিতে স্বত্ববান হইবে। কিন্তু ঐ দুই মোকদ্দমায়, ডিক্রীদার কেবল দায়ীর সহিত বন্দোবস্ত অস্বীকার করিয়াছিল এমত নহে, ডিক্রীজারীতে দায়ীর সম্পত্তিও ধৃত করিয়াছিল।

উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদীর নিজের বাক্য মতেই দেখা যাইতেছে যে, তাহার বাস্তবিক কোন ক্ষতি হয় নাই। তাহার বিরুদ্ধে এক ডিক্রী ছিল, কিন্তু সে বলে যে, তাহা সে পরিশোধ করিয়াছে। প্রতিবাদী ঐ পরিশোধ অস্বীকার করিয়া তাহার দাবী পুনরুত্থাপন করিয়াছে, কিন্তু আর কিছু করে নাই। কিন্তু উক্ত দুই মোকদ্দমায় (সুজান মণ্ডল এবং ভগবান তাঁতী) অর্থাৎ যাহার উপরে নির্ভর করিয়া বাদী আপন নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে দায়ীর সম্পত্তি ধৃত হইয়াছিল, এবং দায়ীর তদ্দ্বারা খরচ হইয়াছিল। বাদী যে বন্দোবস্তের কথা কহে তাহা সত্য হইলে প্রতিবাদী নিশ্চয়ই লোকতঃ অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছে; কিন্তু আমি হাইকোর্টের যে সকল নজীরের উল্লেখ করিলাম, তাহাতে এতদূর বিধি নাই যে, দায়ীর প্রকৃত ক্ষতি না হইলে ডিক্রীদারের চুক্তি-ভঙ্গের হেতুতে নালিশ চলিতে পারে। অতএব আমি মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমরা বিবেচনা করি যে, যে স্থলে প্রতিবাদীর কার্য্য দ্বারা বাদী এই মোকদ্দমায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; সে স্থলে তাহাতে ৬ ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত সুজান মণ্ডল বঃ উজীর মণ্ডলের মোকদ্দমার ও ৯ ম বাঃ উঃ রিঃ ২১০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত ভগবান তাঁতী বঃ গোবিন্দচন্দ্র রায়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি খাটে না; অতএব ছোট আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা ন্যায্য রূপেই ডিস্‌মিস্ হইয়াছে। (গ)

---

৯ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

যশোহরের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

উদয়চাঁদ হালদার, বাদী।

গুরুচরণ মজুমদার ও আর এক ব্যক্তি, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—হিন্দুদিগের আপনাদের পরস্পরের মধ্যে কারবার ও চুক্তি সম্বন্ধে, সাধারণ দেওয়ানী আদালত সম্বন্ধে যে আইন খাটে, তাহা ছোট আদালত সম্বন্ধেও খাটে।

এস্তমেজাজ।—প্রত্যহ এক টাকার হিসাবে সুদ সমেত ১২৭৫ সালের ২৫ এ ভাদ্র তারিখে ৫৫ টাকা আদায় করার সর্ত্তে ঐ সনের ১২ ই ভাদ্র তারিখের এক রেজেষ্টরী-কৃত তমঃসুকের উপরে ২৯৭ টাকা ছাড়িয়া দিয়া ২২০ পাওয়ার জন্য এই জাবেতা নালিশ উপস্থিত হয়; এবং ঐ তমঃসুক, টাকা আদায়ের ত্রুটি হইলে ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫২ ও ৫৩ ধারা মতে সরাসরী রূপে আদায় করার সর্ত্তে বিশেষ রেজিষ্টরী হয়, এবং তমঃসুকের শেষ ভাগে লেখা আছে যে, "আদায় তক পর্য্যন্ত উক্ত সুদ হিসাবে "টাকা আদায় করিয়া লইবেন।"

প্রতিবাদিগণ যাহাদের নিজের হস্তে সমনজারী হয়, তাহারা হাজির না হওয়াতে আমি নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রধানতম বিচারালয়ের

রায়ের অধীনে, খরচা সমেত দাবী-কৃত সমুদায় টাকার একতরফা ডিক্রী দিলাম:—

এই নালিশ হিন্দুদিগের মধ্যে উপস্থিত হওয়াতে হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রানুযায়ী, কি ১৮৫৫ সালের ২৭ আইন অনুসারে বিচারিত হইবে।

আমার বোধ হয় যে, হিন্দু-শাস্ত্র খাটিবে না, কারণ, ১৭৯৩ সালের ৪ কানুনের ১৫ ধারার ও ৮ কানুনের ৩ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ৩ কানুনের ২৬ ধারার বিধানমতে, কেবল "উত্তরাধিকার, দায়াধিকার, বিবাহ, জাতি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আচার-ব্যবহারের বিষয়ে" মুসলমানের সম্বন্ধে শরা ও হিন্দুর সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্র অনুযায়ী মফঃসলের আদালতের সাধারণতঃ নিষ্পত্তি করিতে হইবে; কিন্তু এমত বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু মফঃসলের ছোট আদালত সম্বন্ধে ঐ কানুন বিস্তারিত হয় নাই, অতএব ঐ সকল আদালতের হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু ইহার উত্তরে আমি বলি যে, এই বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট বিধান না থাকায় এই সকল আদালত যাহার বিচার কার্য্য উভয় আইন ও ন্যায়ের অনুবর্ত্তী, তাহাদের অন্যান্য মফঃসল আদালতে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

১২ শ বালম উইক্লি রিপোর্টরের হাইকোর্টের আদিম বিভাগের আপীলের ১০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত রামলাল মুখোপাধ্যায় (বাদী) আপেলাণ্ট বনাম হারাণচন্দ্র প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতির রায়ে দেখা যায়, ও মেং টমসনের বন্ধকী আইনের ২০৫ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ আছে, যথা, "এমত বলা যাইতে পারে যে, বোম্বাইয়ের হাই-"কোর্টের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, হিন্দু-"শাস্ত্রানুসারে আসলের অধিক সুদ একদা "আদায় করা যাইতে পারে না, এবং বোম্বা-"য়ের ১৮২৭ সালের ৫ম কানুনের ১২ ধারা "রদ করিয়া অথবা অন্য কোন প্রকারে, ১৮৫৫ "সালের ২৮ আইন হিন্দু-শাস্ত্রের এই বিধি "পরিবর্ত্তন করে নাই;" এবং ২০৭ পৃষ্ঠায় লেখা আছে "ইহা বলা বাহুল্য যে, সুদ দেও-"য়ার যে সাধারণ নিয়ম আছে তাহা মুসলমান "অর্থাৎ যাহার ধর্ম্মে ও শরায় সুদ দেওয়া "লওয়ার নিষেধ আছে তাহাদের সম্বন্ধেও "অবলম্বন করিতে হইবে। এই বিষয়ে শরা-"নুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে না, কারণ, কানু-"নের আদেশ এই যে, কেবল ভূমি সম্পত্তির "দায়াধিকার ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় নালিশে "পক্ষগণের আপন আপন জাতীয় আইন "খাটাইতে হইবে, কিন্তু এই মোকদ্দমায় ঐ "সকল বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই;" এবং মেং ব্রাউটন তাঁহার দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৯৪ পৃষ্ঠায় বলেন যে, "আসলের অধিক সুদ "এক সময়ে আদায় করা যাইতে পারিবে না "বলিয়া হিন্দু-শাস্ত্রের যে বিধি আছে তাহা "১৮৫৫ সালের ২৮ আইনের পরিবর্ত্তন করে "নাই।" আমি ইহা স্বীকার করি যে, রাজকীয় সনন্দের দ্বারা যে সমস্ত আদালত সংস্থাপিত হয় নাই তাহাতে হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে নালিশে চুক্তি সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের যুক্তি অবলম্বন করা যাইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমার অনেক সন্দেহ ছিল; কিন্তু মৌলট ও রায়েণের বিধি ও হুকুম সমস্তের ১ম বালমের ৬৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত ৩য় জর্জের ২১ আইনের ৭০ অধ্যায়ের ১৭ ধারার দ্বারা আমার সেই সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে যে, "এই বিধিবদ্ধ হইল যে, উক্ত রাজ-"কীয় সনন্দের লিখিত বিধানমতে উক্ত কলি-"কাতা নগরবাসী সকল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির "বিরুদ্ধ নালিশ শুনিবার ও নিষ্পত্তি করিবার "জন্য বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর "সুপ্রীমকোর্ট নামক বিচারালয়ের সম্পূর্ণ "ক্ষমতা থাকিবে। কিন্তু তাহাদের ভূমি সম্প-"ত্তির দায়াধিকার, উত্তরাধিকার, ও খাজানা

ও অস্থাবর দ্রব্য এবং পক্ষগণের মধ্যে চুক্তি "এবং কারবার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের মধ্যে "শরা অনুসারে ও হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু- "ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে, এবং কেবল এক "পক্ষ মুসলমান কি হিন্দু হইলে প্রতিবাদীর ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে বিচারিত হইবে।" ১৮৬২ সালের ১৪ ই মে তারিখের রাজকীয় সনন্দের ১৮ ধারায় লেখা আছে যে, "আমরা আরও "হুকুম দিতেছি যে, বাঙ্গালার ফোর্ট উইলি- "য়ম রাজধানীর হাইকোর্ট নামক বিচারা- "লয়ের আদিম বিভাগের দেওয়ানী বিচারা- "ধিকারে যে সকল নালিশ উপস্থিত হয় তাহাতে "যে আইন বা যুক্তি খাটাইতে হইবে তাহা "সেই আইন ও যুক্তি হইবে যাহা এই রাজ- "কীয় সনন্দ জারী না হইলে উক্ত সুপ্রীমকোর্ট "দ্বারা খাটান হইত।" এবং ১৮৬৫ সালের ২৮ এ ডিসেম্বরের রাজকীয় সনন্দের ১৯ ধারায় লেখা আছে যে, "এবং আমরা আরও হুকুম "দিতেছি যে, বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম রাজ- "ধানীর হাইকোর্ট নামক বিচারালয়ের আদিম "বিভাগের বিচারাধিকারে যে সকল নালিশ "উপস্থিত হয় তাহাতে যে সকল আইন এবং "যুক্তি খাটাইতে হইবে তাহা সেই আইন "ও যুক্তি হইবে যাহা এই রাজকীয় সনন্দ জারী "না হইলে উক্ত হাইকোর্ট দ্বারা খাটান "হইত।" সুতরাং প্রধান বিচারপতি যে বলি- য়াছেন যে, "হিন্দু-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায় সর "ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নাটন যাহা বলিয়াছেন তাহার "দ্বারা, ৩ য় জর্জের ২১ আইনের ৭০ অধ্যায়ের "১৭ ধারায় যে স্পষ্ট বিধান আছে যে, হিন্দু- "দিগের মধ্যে চুক্তি ও কারবার সম্বন্ধে আদা- "লত হিন্দু-শাস্ত্রানুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন, "তাহা খণ্ডিত হয় নাই।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু- দিগের মধ্যে চুক্তি ও কারবার সম্বন্ধীয় সকল মোকদ্দমায় আদিম বিভাগের আদালত হিন্দু- শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন করিয়া নিষ্পত্তি করি- বেন; কিন্তু ইহা মফঃসল আদালত সম্বন্ধে খাটে না, কারণ, কানুন সমস্তে পক্ষগণের পরস্পরের মধ্যে চুক্তি অথবা কারবারের কোন উল্লেখ নাই, কেবল এই লেখা আছে যে, "দায়াধি- "কার, উত্তরাধিকার, বিবাহ, জাতি ও লৌকিক "আচার ব্যবহার" সম্বন্ধে মুসলমানদিগের মধ্যে শরা অনুযায়ী ও হিন্দুদিগের মধ্যে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ঐ সকল আদালতের নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

যদি এমত বলা যায় যে, হিন্দুব্যবহার-শাস্ত্র খাটিবে, তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুর বচন সমস্ত এই বিষয়ের আইন বলিয়া মান্য, কারণ, যে কোন বিধি মনুর বচনের বিপরীত তাহা গ্রাহ্য নহে, এবং সর্ উইলিয়ম জোন্স তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রের ভূমিকার ১২ পৃষ্ঠায় বেদের যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে লেখা আছে যে, "মনু যাহা কিছু উচ্চারণ করিয়া- "ছেন, তাহা আত্মার ঔষধ স্বরূপ।" এবং মহর্ষি বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, "ব্যবস্থা- "পকের মধ্যে মনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কারণ, তিনি "তাঁহার সংহিতায় বেদের সমুদায় ভাব প্রকাশ "করিয়াছেন, এবং যে কোন বিধি তাহার "বিপরীত, তাহা গ্রাহ্য নহে, এবং অন্যান্য "শাস্ত্র এবং ব্যাকরণ অথবা ন্যায়ের গ্রন্থ সমস্ত "যে পর্য্যন্ত মনুর প্রতিদ্বন্দী না হয়, সেই পর্য্যন্ত "তাহার শোভা থাকে; মনুই ন্যায্য ধন, ধর্ম্ম "এবং চরম সুখ অর্জ্জনের পথ-প্রদর্শক।"

ব্যাসও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "বেদ ও ছয় "বেদাঙ্গ, আয়ুর্ব্বেদ, পুরাণ এবং মনুসংহিতা এই "চারি গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং তাহা কেবল "মনুষ্যের তর্কের দ্বারা খণ্ডিত হওয়া উচিত "নহে।"

কোলব্রুকের গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ২ য় পরিচ্ছেদের ২ য় ধারার ৪১ দফায় নিম্নলিখিত বচন আছে, যথা, মনু কহেন, "নির্দ্দিষ্ট সুদে

" যে কর্জ্জদাতা এক মাসের জন্য অথবা দুই
" তিন মাসের জন্য কর্জ্জ দেয়, সে যেন এক
" বৎসরের অধিক কালের জন্য ঐ সুদ গ্রহণ
" করে না, অথবা অন্যায় সুদ অথবা পূর্ব্ব
" করার মতে সুদের সুদ অথবা আসলের
" অধিক সময়ে সময়ে প্রদত্ত সুদ, অথবা যখন
" কোন সাধারণের বিপদ্ ও দুর্ভিক্ষ না থাকে,
" তখন ঋণীকে টাকা দিলে, তাহা হারাইবার
" আশঙ্কা আছে বলিয়া অধিক সুদ অথবা
" সুদ স্বরূপ যদি কিছু আবদ্ধ রাখা হয়,
" তবে তাহা হইতে অন্যায় উপস্বত্ব যেন গ্রহণ
" করা হয় না।"

৪২ দফায়, মনু কহেন, " আইন-সঙ্গত সুদের
" হার অপেক্ষা অধিক সুদ এবং নিম্নলিখিত
" হার অপেক্ষা অন্য হার হইলে তাহা অবৈধ।
" বিজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহাকে অন্যায় সুদ খাওয়া
" বলেন। অধিক হইলেও কর্জ্জ-দাতা শতকরা
" পাঁচ পাইতে পারে।"

৪৩ দফায়, " টাকার যে সুদ এক কালে
" পাওয়া হয়, বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে
" অথবা দিবসে দিবসে পাওয়া যায় না, তদ্দ্বারা
" কখন ঋণ দ্বিগুণ করিতে দেওয়া যাইতে পারে
" না, অর্থাৎ এক কালে আসলের অধিক সুদ
" দেওয়া যাইতে পারে না।" * *

যদি প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ নির্দ্দেশ করেন যে, হিন্দু শাস্ত্রের বিধি খাটিবে, তবে বাদী আসল টাকার অধিক টাকা পাইতে পারিবে না, সুতরাং ডিক্রী তদনুযায়ী ন্যূন করিতে হইবে।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমায় কেবল এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এপ্রদেশের সাধারণ দেওয়ানী আদালত-সমূহে এই বিষয়ে যে আইন প্রয়োগ হয়, ছোট আদালতও তাহারই অনুযায়ী হইবেন। (গ)

---

৯ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

বরিষালের, ছোট আদালতের জজের এস্ত-মেজাজ।

অভয়চরণ দত্ত, বাদী।

হরচন্দ্র দাস বক্সী, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—বাটোয়ারা আমীনের তাহার অধীন কর্ম্মচারিগণের বেতন কালেক্টরী হইতে লওয়ার ক্ষমতা ছিল, কিন্তু সে টাকা লইয়া তাহার এক জন মোহরেরের বেতন না দেওয়ায়, ঐ মোহরের সেই টাকার দাবীতে তাহার নামে নালিশ করাতে

স্থির হইল যে, ঐ মোহরের ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ২ য় প্রকরণান্তর্গত " কর্ম্মচারী " নহে, অতএব তাহার যে প্রাপ্য টাকা প্রতিবাদী লইয়াছিল, তাহা পাওয়ার নালিশ বিধায় ইহাতে ৬ বৎসরের তমাদীর বিধান খাটিবে।

এস্তমেজাজ।—এই মোকদ্দমায় বাদী অভয়চরণ দত্ত ১৮৬৬ সালের সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের প্রাপ্য বেতন পাওয়ার জন্য ৩০ টাকার নালিশ করে। সে বলে যে, সে বাকরগঞ্জের কালেক্টরের দ্বারা প্রতিবাদীর অধীনে মাসিক ১০ টাকা বেতনের এক মোহরেরের পদে নিয়োজিত হয়। প্রতিবাদী বাটোয়ারার আমীন; কালেক্টরী হইতে তাহার অধীন সমুদায় কর্ম্মচারীর বেতনের মোট টাকা লইয়া কর্ম্মচারিগণকে বণ্টন করিয়া দেওয়ার তাহার ক্ষমতা ছিল। উপরোক্ত ক্ষমতানুসারে প্রতিবাদী ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে তাহার আমলাগণের উক্ত তিন মাসের বেতন বাহির করিয়া লয়, কিন্তু বাদীকে তাহার প্রাপ্য টাকা দেয় না; বাদী মালের কর্ম্মচারীর নিকট ঐ টাকা পাওয়ার জন্য বারম্বার নিরর্থক দরখাস্ত করিয়া অবশেষ এই নালিশ উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রতিবাদী এই বলিয়া মোকদ্দমা শ্রবণের প্রতি আপত্তি করে যে, নালিশের হেতু উত্থাপিত হওয়ার তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক কাল পরে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, এবং সে তর্ক করে যে, উক্ত তিন মাসের বেতন কালেক্টরী হইতে গঙ্গাচরণ সেন নামক এক ব্যক্তি লয়, কিন্তু সে সেই টাকা না দেওয়াতে তাহার নামে নালিশ হইয়া ডিক্রী হইয়াছে, কিন্তু ঐ ডিক্রী এ পর্য্যন্ত অপরিশোধিত রহিয়াছে। বাদী ইচ্ছা করিলে, প্রতিবাদী তাহাকে ঐ ডিক্রী জারী করিয়া লইতে দিতে সম্মত আছে।

নথীতে দেখা যায় যে, বাদী গত নবেম্বর মাসের ৩০ এ তারিখে এই নালিশ উপস্থিত করে, এবং ১৮৬৬ সালের সেপ্‌টেম্বর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসের বেতনের দাবী করে; অর্থাৎ বেতন প্রাপ্য হওয়ার ২ বৎসর ১০ কি ১২ মাস পরে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। বাদী বলে যে, ১৮৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে যখন ডেপুটি কালেক্টর তাহাকে জাবেতা নালিশ করিতে আদেশ করেন, তখনই তাহার নালিশের হেতু উত্থিত হয়। কিন্তু ডেপুটি কালেক্টরের হুকুম যাহা এই মোকদ্দমার আবশ্যকীয় কথা নহে, তাহা নালিশের হেতু বলিয়া বিবেচনা করিতে এই আদালতের অনেক সন্দেহ আছে, কারণ, ঐ হুকুম আইন-সঙ্গত এমন কোন নিষ্পত্তি নহে যে, তাহা হইতে তমাদীর কাল গণনা করা যাইতে পারে। যে তারিখে বেতন প্রাপ্য হয়, অথবা যে তারিখে প্রতিবাদী বাদীর পাওনা টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, সেই তারিখ হইতে নালিশের হেতু যথার্থ উত্থিত হইয়াছে।

এ আদালতের বিবেচনায়, এই মোকদ্দমা অন্যায় রূপে আত্মসাৎকৃত টাকা ফেরৎ পাওয়ার মোকদ্দমা, কারণ, পক্ষগণের মধ্যে চাকর মনিবের সম্পর্ক ছিল না, এবং বাদী কেবল পদোপলক্ষে প্রতিবাদীর অধীন ছিল। প্রতিবাদী যদি কালেক্টরের নিকট ক্ষমতা পাইয়া থাকে, তবে কেবল এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, বাদী প্রতিবাদীর দ্বারা সরকারী ধনাগার হইতে বেতন পাইবে, অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি টাকা পাইবে, তাহাদের জন্য সরকারী টাকা আনিবার নিমিত্ত প্রতিবাদী কেবল জেম্মাদার স্বরূপ। মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিলে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১৬ প্রকরণ মতে আদালতের নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, এই মোকদ্দমায় ৬ বৎসরের তমাদী খাটিবে, এবং ঐ আইনের ১ ধারার ২ য় প্রকরণে বেতন সম্বন্ধে তমাদীর যে বিধি আছে, তাহা খাটিবে না। কিন্তু যেহেতু ঐ দুই ধারার কোন্ ধারা খাটিবে, তদ্বিষয়ে আদালতের সন্দেহ আছে, অতএব ১৮৬৭ সালের ১০ আইনের বিধান মতে এই প্রশ্ন প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ের জন্য অর্পণ করা গেল।

## প্রধানতন বিচারালয়ের রায় :—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ২ য় প্রকরণের লিখিত তমাদী এই মোকদ্দমায় খাটিবে না, কারণ, প্রথমতঃ, বাদী যে প্রতিবাদীর অধীনে মোহরের ছিল, সে ঐ দফায় লিখিত "কর্ম্মচারী", শব্দের মর্ম্মান্তর্গত নহে। ছোট আদালতের জজের জ্ঞাপনার্থে আমরা ৬ ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ১১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নিত্যগোপাল ঘোষ বনাম এ, বি, ম্যাকিন্‌টসের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উল্লেখ করিলাম।

বিশেষতঃ, দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদী এ স্থলে বাদীর মনিব ছিল না, কিন্তু কেবল তাহার উচ্চতর কর্ম্মচারী ছিল, এবং তাহাদের পরস্পরের ও উভয়ের মনিবের বন্দোবস্ত অনুসারে কালেক্টরের নিকট হইতে বাদীর যে টাকা প্রাপ্য ছিল, তাহা সে প্রতিবাদীর দ্বারা পাইত। অতএব প্রতিবাদী নিজে, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি

যাহার জন্য প্রতিবাদী দায়ী ছিল, তাহার দ্বারা যদি বাদীর প্রাপ্য বেতন লওয়া হইয়া থাকে, এবং কাজে কাজে প্রতিবাদী তাহার জন্য বাদীর নিকট দায়ী থাকে, তবে বাদীর যে টাকা প্রতিবাদী লইয়াছিল, ইহা সেই টাকার দাবীর মোকদ্দমা, এবং ইহাতে ৬ বৎসরের তমাদীর বিধান খাটিবে। টাকা ঐ রূপে লওয়ার তিন বৎসরের মধ্যে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহা তমাদীর দ্বারা বারিত নহে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

( গ )

৯ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ এ গ্লবর।

বীরভূমের জজের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই ডিসেম্বরের এস্তমেজাজ।

লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ( প্রতিবাদী ) আপেলাণ্ট।

রায়মোহন দাস ( বাদী ) ও আর এক ব্যক্তি ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় ও ললিতচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দুর্গাদাস দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—রাম তাঁহার গোমাস্তা শ্যামের নিকট নিকাশের ও পাওনা টাকার দাবীতে মাল আদালতে নালিশ করে। ঐ মোকদ্দমার রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদী এক আপোসের দরখাস্ত দেয় যাহার মর্ম্ম এই যে, সে কিস্তীবন্দীর দ্বারা তাহার সমুদায় দেনা টাকা পরিশোধ করিবে, কিন্তু তাহার এক কিস্তী খেলাফ হইলে সমুদায় টাকা এক কালে সুদ সমেত আদায় হইবে। ঐ রফার সর্ত্তমতেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।

এমত স্থলে, বাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিধানমতেই ডিক্রী জারীর দ্বারা প্রতিকার পাইবে, দেওয়ানী আদালতে নূতন নালিশের দ্বারা পাইবে না।

এস্তমেজাজ।—নিম্ন আদালত এই মোকদ্দমার ডিক্রী দেওয়াতে তদ্বিরুদ্ধে আপীল উপস্থিত হইয়াছে।

বাদী-রেস্পণ্ডেণ্টের নালিশ এই যে, তাহার বিক্রেতা ২ নং প্রতিবাদী যুগলকিশোর দাস, ১ নং প্রতিবাদী লক্ষ্মীনারায়ণ দাস আপেলাণ্টের নামে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে টাকা ও নিকাশের জন্য নালিশ করিয়া নিম্নলিখিত হুকুম সম্বলিত মাল আদালতে ডিক্রী পায়, যথা, “ রফার “ সর্ত্ত অনুযায়ী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হউক ” এবং আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, রফায় এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে যথা, “ গোমাস্তা- “ গিরী কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বরখাস্ত হওয়া পর্য্যন্ত “ সুদে আসলে ও এই মোকদ্দমার খরচা সমেত “ ৩২৫ টাকা বাদীর প্রাপ্য হইয়াছে, এবং তাহা “ আমি স্বীকার করিলাম। এই টাকা আমি “ নীচের লিখিতমতে আদায় করিব, যথা—

| | | |
|---|---|---|
| ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে | ... | ২৫৲ |
| ” ফাল্গুণ মাসে | ... | ১০০৲ |
| ১২৭৫ সালের ফাল্গুণ মাসে | ... | ১০০৲ |
| ১২৭৬ সালের ফাল্গুণ মাসে | ... | ১০০৲ |

“ যদি আমি ইহার কোন কিস্তী খেলাফ “ করি, তবে তৎক্ষণাৎ সমুদায় টাকা আমার “ নিকট আদায় হইতে পারিবে, এবং আমি মাসিক “ শতকরা ৷৷০ আনার হিসাবে সুদ দিব, এবং “ ইহাও ডিক্রী হইয়াছে যে, আমি গোমাস্তা “ স্বরূপে বাদীর পিতার নিকট হিসাবের বাকীর “ দরুন্ ১২৭৩ সালের ৩ রা ফাল্গুণ তারিখে “ ৯৯ টাকার জন্য যে এক তমঃসুক লিখিয়া “ দিয়াছিলাম এবং বাদীর ভ্রাতার জামাতাকে “ ৯৯ টাকায় যে আর এক খত লিখিয়া দিয়াছি, “ তাহা সমেত মোট ১৯৮ টাকা এবং তাহার সুদ “ উপরোক্ত ৩২৫ টাকার ঋণ ভুক্ত ; অতএব প্রার্থনা “ যে, তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। ”

প্রতিবাদী লক্ষ্মীনারায়ণ রায় অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ দলীল লিখিয়া দেয় তাহার নামে বাদী

এই হেতুবাদে সুদ সমেত ৩২৫ টাকা পাওয়ার জন্য নালিশ করিয়াছে যে, কিস্তী অনুসারে টাকা দেওয়া হয় নাই, এবং কালেক্টরীতে সে ডিক্রী জারী করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবাদীর জামিনদারগণ আপত্তি করায় এই জেলার এক জন ডেপুটি কালেক্টর ১৮৬৮ সালের ২২ এ এপ্রিল তারিখে তাহা নম্বর-খারিজ করেন; তিনি নির্দেশ করেন যে, "কমিসনরের ১৮৬৫ সালের "২৩ এ সেপ্টেম্বরের ৩৮ নং সরকুলর অর্ডরমতে "দেখা যাইতেছে যে, ১০ আইন সংক্রান্ত মোক- "দ্দমায় ডিক্রী পরিশোধ করার জন্য কিস্তীবন্দী "হইতে পারে না, এবং যদি দুই পক্ষই এমন "বন্দোবস্ত করে, তবে তাহাদের তাহার ফল সহ্য "করিতে হইবে। বিশেষতঃ দেখা যাইতেছে যে, "যে ডিক্রী জারীর জন্য দরখাস্ত হইয়াছে তাহাতে "লেখা আছে যে, মোকদ্দমা রফার সর্ত্ত অনুযায়ী "নিষ্পত্তি হইবে। অতএব এই ডিক্রী জারী করা "সঙ্গত নহে।"

আদালত নির্দেশ করিয়াছেন যে, এই চুক্তির প্রকৃত ভাব এই যে, যদি এক কিস্তী খেলাফ হয়, তবে ঐ চুক্তির উপরে বাদীকে যে ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে সেই ডিক্রীজারীতে বাদী সমুদায় কিস্তীর টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে; অতএব প্রতিবাদী কিস্তী খেলাফ করিলে যে প্রকারে বাদী ঐ চুক্তি বলবৎ করিয়া প্রতিকার পাইতে পারিবে তাহা ঐ চুক্তির সর্ত্তেই ব্যক্ত আছে; সেই প্রতিকার স্পষ্টই ডিক্রীজারী দ্বারা হইবে, দেও- য়ানী আদালতে নালিশের দ্বারা নহে। প্রধান- তম বিচারালয় (৭ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) স্থির করিয়াছেন যে, সাধা- রণ নিয়ম এই যে, মাল আদালত ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে যে সকল ডিক্রী প্রদান করেন তাহা জারী করার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না; ১০ আইনে যে প্রকার বর্ণিত আছে সেই প্রকারেই ঐ রূপ ডিক্রীজারী হইতে পারে। এই মোকদ্দমা এমন কোন বিশেষ ভাবের মোকদ্দমা নহে যদ্দ্বারা ঐ সাধারণ বিধি অতিক্রম করিয়া দেওয়ানী নালি- শের দ্বারা বাদীর ঐ স্বত্ব পরিচালন করিতে হইবে।

ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি কমিসনর ১৮৬৫ সালের ২৩ এ সেপ্টেম্বর তারিখে ৩৮ নং যে সরকুলর জারী করেন তাহার কি ভাব, তাহা আদালত বলিতে পারেন না, কারণ, তাহা আদা- লতের সমক্ষে উপস্থিত নাই। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই মোকদ্দমায় সুবিচারের ত্রুটি হইয়াছে, কারণ, ডেপুটি কালেক্টরের সমক্ষে প্রতিবাদী যে ঋণ স্বীকার করিয়া লয়, তাহা বাদী সেই আদালতের দ্বারা আদায় করিয়া লইতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, এবং নিরর্থক দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হইয়াছে, এবং ডেপুটি কালে- ক্টর মৌলবী আলী আহম্মদ যিনি সুরতি দ্বারা এক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ধরা পড়িয়া- ছিলেন, তাঁহার দ্বারা যখন ১৮৬৭ সালের ২৩ এ সেপ্টেম্বর তারিখে বাদীর আলের ডিক্রীজারী করার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হয় তখন বাদীর যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা এইক্ষণে হয়ত তাহার অধিক অপকৃষ্ট অবস্থা হইয়াছে।

নিম্ন আদালতের হুকুম অন্যথা এবং আপীল খরচা ও সুদ সমেত ডিক্রী হইল, কিন্তু এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকাতে এই প্রকার মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের দ্বারা গৃহীত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রধানতম বিচারা- লয়ের রায় জানিবার জন্য রেস্পণ্ডেণ্টের অনু- রোধ ক্রমে আমি ১৮৬৯ সালের ২৩ আইনের ২৮ ধারামতে এই এস্তমেজাজ করিলাম। এই আদালত যে হুকুম দিলেন তাহা কাজে কাজে এই এস্তমেজাজের উপরে প্রধানতম বিচারা- লয়ের হুকুমের অধীন থাকিবে।

### প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—কিস্তীবন্দীর উল্লেখে টাকা পাওনা বলিয়া ৪০৮ টাকার

এক নালিশের উপরে জেলা বীরভূমের জজ-আদালতে যে এক জাবেতা আপীল উপস্থিত হয়, তৎসম্বন্ধে উক্ত জজ কর্ত্তৃক এই এস্তমেজাজ হইয়াছে।

বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে, যুগলকিশোর দাসের লক্ষ্মীনারায়ণ রায় নামক যে এক জন গোমাস্তা ছিল তাহার নিকট নিকাশ ও টাকা পাওয়ার জন্য যুগলকিশোর দাস মাল আদালতে এক নালিশ উপস্থিত করে। সেই মোকদ্দমার রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে প্রতিবাদী যে, এক রফার দরখাস্ত করে তাহাতে লেখা হয় যে, ইতিপূর্ব্বে সে যে দুই তমঃসুক দিয়াছে তাহার টাকা সমেত এবং চাকরী সম্বন্ধে প্রতিবাদীর নিকট বাদীর মোট ৩২৫ টাকা পাওনা হইয়াছে, এবং এই টাকা ৪ কিস্তীতে পরিশোধ করার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত হয় যে, এই কিস্তীর কোন কিস্তী খেলাফ হইলে সমুদায় ঋণ এক-কালে মাসিক ৷।৹ আনা শতকরা হিসাবে সুদ সমেত আদায় হইবে; এবং ঐ সকল সর্ত্তানুযায়ী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়ার প্রার্থনা হয়। তন্নিবন্ধন মাল আদালত এই প্রকার ডিক্রী দেন যে, "এই রফা অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হউক।" আর কিছু লেখেন নাই।

তাহার পরে যুগলকিশোর দাস তাহার এই ডিক্রীর স্বত্ব বর্ত্তমান বাদী রামমোহন দাসকে বরাৎ দেয়, এবং রামমোহন দাস ঐ ডিক্রী-জারীর জন্য মাল আদালতে প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই আদালত এই বলিয়া ঐ ডিক্রীজারী করিতে অস্বীকার করেন যে, রিবেনিউ কমিসন-রের এক সরক্যুলর মতে মাল আদালত সমস্ত কিস্তীবন্দীর ডিক্রীজারী করিতে পারেন না।

রামমোহন দাস এইক্ষণে মূল প্রতিবাদী ও বিচারাদিষ্ট দায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের নামে, যুগলকিশোরকে জাবেতামত প্রতিবাদী করিয়া উক্ত রফার অন্তর্গত টাকা পাওয়ার জন্য নালিশ করিয়াছে।

জজের মত এই যে, এই নালিশ চলিবে না, এবং ৭ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২১৬ পৃষ্ঠার এক মোকদ্দমা এবং অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বনাম উমাময়ী দেবীর মোকদ্দমার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি বলেন যে, "সাধারণ নিয়ম এই যে, "১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে মাল আদালত "সমস্তের যে ডিক্রী হয় তাহা প্রবল করার জন্য "দেওয়ানী আদালতে নালিশ চলিতে পারে না। "এই সকল ডিক্রী কেবল ঐ ডিক্রীজারীর দ্বারা "পরিচালিত হইতে পারে; এবং ঐ প্রকার "ডিক্রীজারীতে তমাদীর যে বিধান খাটে তাহা "উক্ত ১০ আইনেই বর্ণিত আছে।"

তদনন্তর প্রধান বিচারপতি বলেন যে, "তাহার "পরে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, মোকদ্দমায় "এমন কোন নূতন চুক্তি আছে কি না, যদ্দ্বারা "বাদী দেওয়ানী আদালতে নালিশের দ্বারা "তাহা পরিচালন করিতে পারে? যদি প্রতি-"বাদীর চুক্তি কেবল ইহাই হইয়া থাকে যে, "বাদী তাহার ক্রোক উঠাইয়া লইয়াছে বলিয়া "প্রতিবাদী ডিক্রীর কতক অংশ পরিশোধ "করিবে, এবং বাকী টাকা দুই কিস্তীতে দিবে, "তবে চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে ত্রুটি করিলে "বাদী ঐ চুক্তি প্রবল করার জন্য দেওয়ানী "আদালতে নালিশ করিতে পারে, এবং সেই "টাকা যদি ছোট আদালতের বিচারাধিকারের "মধ্যে হয়, তবে সে সেই আদালতে নালিশ "করিতে পারে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় প্রতি-"বাদী যে কিস্তীমতে টাকা দিতে চুক্তি করে "তাহার খেলাফ করিলে যে প্রকারে টাকা "আদায় করিতে হইবে তাহা চুক্তিতেই বিশেষ "রূপে প্রদর্শিত আছে। চুক্তিতে লেখা আছে "যে 'যদি কিস্তী মোতাবেক টাকা দেওয়া না "হয়, তবে তুমি সেই ডিক্রীজারীতে, ডিক্রীজারী "করিয়া সুদ সমেত সমুদায় কিস্তীর টাকা "আদায় করিয়া লইবে'। অতএব যে চুক্তির

"দ্বারা প্রতিবাদী কিস্তীর টাকা দিবার করার "করে তাহাতেই, কিস্তী খেলাফ করিলে যে "উপায়ের দ্বারা চুক্তি প্রবল করিতে হইবে তাহা "প্রদর্শিত হইয়াছে। ডিক্রীজারীই সেই উপায়, "দেওয়ানী আদালতে নালিশ সেই উপায় "নহে।"

কিন্তু আমাদের সমক্ষে অদ্য বাদীর পক্ষে যে উকীল উপস্থিত হইয়াছেন তিনি ঐ মোকদ্দমার সহিত উপস্থিত মোকদ্দমার এই এক প্রভেদ দেখাইয়াছেন যে, ঐ মোকদ্দমার পক্ষগণ নির্দ্দিষ্ট রূপে করার করিয়াছিল যে, ডিক্রীজারীতে সেই উপায় থাকিবে, কিন্তু এ স্থলে ঐ প্রকার কোন নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত নাই, অতএব এই মোকদ্দমায় এমন একটি নুতন চুক্তি আছে, যাহা বাদী দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া প্রবল করিতে পারে।

প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে, জজ কয়েকটি বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া এক আইন-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের নিকট এস্তমেজাজ করিয়াছেন। তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, চুক্তির সর্ত্ত বাস্তবিক এই যে, যদি কিস্তী খেলাফ হয় তবে ঐ চুক্তির উপর প্রদত্ত ডিক্রীজারীতে বাদী সেই ডিক্রীজারী করিয়া সুদ সমেত সমুদায় কিস্তীর টাকা আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

তর্কিত হইয়াছে যে, জজ এই চুক্তি অথবা রফার যে অর্থ করিয়াছেন তদ্দ্বারা আমরা বাধ্য নহি; আমরা নিজে তাহার অর্থ করিতে পারি। এই কথা যে বিশুদ্ধ, এমত আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, কিন্তু যদি তাহা বিশুদ্ধও হয়, তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, যে প্রকার কার্য্য হইয়াছে তদৃষ্টে জজের অর্থই বিশুদ্ধ বিবেচনা করার উৎকৃষ্ট হেতু দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ, ইহা ডিক্রী হওয়ার পরের রফা অথবা করার নহে। রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে এই রফা হয় এবং এই রফা রায়ভুক্ত হইবে, ইহাই পক্ষগণের মনস্থ ছিল। কেবল তাহা নহে; আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, যে ব্যক্তি এসাইনমেণ্ট অর্থাৎ বরাতের দ্বারা বাদীর ডিক্রীর স্বত্ব পায় (সে তাহাই লইয়াছিল এবং তদ্ধেতুই সে এই মোকদ্দমা চালাইতেছে) সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঐ ডিক্রীজারী করিয়া তাহা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং সে যে ডেপুটি কালেক্টরের নিকট ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে, তিনি ভ্রমাত্মক হেতুবাদে তাহা জারী করিতে অস্বীকার করাতেই সে তাহার প্রাপ্য টাকা আদায় করার নিমিত্ত আদালতে নুতন নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

আমি বিবেচনা করি যে, ডিক্রীজারী না করাতে ডেপুটি কালেক্টরের ভ্রম হইয়াছে, কারণ, ইহা কিস্তীবন্দীর ডিক্রীজারী করার প্রার্থনা নহে। যদি ঐ ডিক্রীর কোন অর্থ থাকে, তবে ইহা সমুদায় পাওনা টাকার ডিক্রী, কিন্তু তাহাতে কেবল এই সর্ত্ত ছিল যে, সে সকল কিস্তী দ্বারা টাকা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয় প্রতিবাদিগণ তাহার কোন কিস্তী খেলাফ না করিলে সমুদায় টাকার জন্য ডিক্রীজারী হইবে না, কিন্তু প্রতিবাদী কিস্তী খেলাফ করিলে, তখন বাদী তাহার ডিক্রীজারী করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

৭ম বালম উইক্লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি কেম্পের প্রদত্ত রায়ের সহিত আমি কোন প্রকারেই অনৈক্য নহি। কিন্তু প্রথমতঃ, আমি বিবেচনা করি যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে এবং পরে চুক্তি হওয়ার মোকদ্দমা সমস্তের পরস্পর প্রভেদ আছে এবং আমি ইহাও বিবেচনা করি যে, বাদী অথবা তাহার বরাৎ-গৃহীতার এই প্রকার চুক্তির উপরে নুতন নালিশের হেতু পাওয়ার জন্য ইহা দেখান উচিত যে, উক্ত চুক্তির দ্বারা মূল দাবী শেষ হইয়াছে, কারণ, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বাদীর এক সময়ে দুই নালিশের হেতু থাকিতে পারে না,

এবং সে এক সময়ে তদুভয় সম্বন্ধেই মোকদ্দমা করিতে পারে না।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, উপরি উক্ত রূপে জারী করা যাইতে পারে, এমন এক ডিক্রী পাওয়াই পক্ষগণের মনস্থ ছিল, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের লিখিত প্রণালীতে ডিক্রী জারী করাই বাদীর প্রতিকারের উপায় ছিল, নূতন নালিশের দ্বারা নহে। উপস্থিত বাদী যে, অন্যের মোকদ্দমা ক্রয় করিয়াছে সে আমাদের অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে না; এবং সে যদি ভ্রম করিয়া থাকে এবং ডেপুটি কালেক্টরের রায়ে সম্মত হইয়া তাহার সেই হুকুম অন্যথা করার জন্য আপীল না করিয়া স্বতন্ত্র নালিশ করিয়া থাকে, তবে সেই নালিশ চলিতে না পারিলে তাহার নিজেরই দোষ। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় জজের রায়ই বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে।

প্রতিপক্ষের উকীল ২০ টাকা ফিস পাইবেন।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।—আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে বন্দোবস্তের উপরে ১০ আইনের ডিক্রী হয় সেই বন্দোবস্ত অনুসারে টাকা আদায় করিয়া লওয়াই পক্ষগণের মনস্থ ছিল। অতএব তাহাই পক্ষগণের মনস্থ থাকায়, যে ব্যক্তি সেই ডিক্রী পায় বাদী তাহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নূতন নালিশ চালাইতে পারে না। (গ)

---

৯ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এ জি ম্যাক্‌ফার্সন এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ৩৩৮ নং মোকদ্দমা।

সাহাজাদপুরের মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২ রা নবেম্বরের হুকুম অন্যথা করিয়া রাজসাহীর প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১২ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

যাদবচন্দ্র নাই (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

দিননাথ দাস (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোচবিহারের দেওয়ানী আহেলকারের আদালত ব্রিটিশ রাজ্যের অন্তর্গত আদালত নহে, সুতরাং ঐ আদালতের ডিক্রীজারী করিতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৪ ধারা মতে ব্রিটিশ রাজ্যান্তর্গত কোন মুন্সেফ-আদালতের ক্ষমতা নাই।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—দেখা যাইতেছে যে, খাস রেস্পণ্ডেণ্ট দিননাথ দাস সরকার, কোচবিহারের দেওয়ানী আহেল্‌কারের আদালতে খাস আপেলাণ্ট যাদবচন্দ্র নাইয়ের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পায়, এবং তাহার দরখাস্ত মতে ঐ ডিক্রী জারীর জন্য রাজসাহীর জজের নিকট প্রেরিত হয়। রাজসাহীর জজ তাহা সাহাজাদপুরের মুন্সেফের নিকট প্রেরণ করেন। বিচারাদিষ্ট দায়ীর প্রতি নোটিস জারী হয় এবং তাহার সম্পত্তি ক্রোক হয়। সে তাহাতে আপত্তি করে যে, ঐ ডিক্রী কোচবিহারের স্বাধীন রাজ্যের আদালত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হওয়ায়, তাহা রাজসাহীর আদালত সমস্তের দ্বারা জারী হইতে পারে না। মুন্সেফ নির্দ্দেশ করেন যে, এই আপত্তি বিশুদ্ধ এবং কোচবিহারের দেওয়ানী আহেলকারের আদালত ব্রিটিশ ভারতবর্ষের কোন ভাগের দেওয়ানী আদালত নহে, এবং তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৪ ধারার বিধানানুযায়ী ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরেলের হুকুমমতে পররাষ্ট্রে সংস্থাপিত আদালতও নহে; সুতরাং তাঁহার অর্থাৎ সাহাজাদপুরের মুন্সেফের ঐ ডিক্রীজারী করার কোন অধিকার নাই।

আপীলে রাজসাহীর জজ, মুন্সেফের হুকুম অন্যথা করেন। তিনি বলেন যে, কোচবিহার

ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যগত এবং কোচবিহারের দেওয়ানী আহেলকারের ও জেলা রঙ্গপুরের আদালতের মধ্যে পরস্পর ডিক্রীজারী হইয়া আসিয়াছে; অতএব তিনি ডিক্রীজারী করিবার হুকুম দেন।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, জজের ভ্রম হইয়াছে এবং দেওয়ানী আহেলকারের আদালত যে, ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ রাজ্যের মধ্যগত, তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই। তাহা কোচবিহারের স্বতন্ত্র রাজ্যের আদালত; এবং যে পর্য্যন্ত তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৪ ধারার মর্ম্মান্তর্গত আদালত না হয়, সে পর্য্যন্ত মুন্সেফ ঐ ডিক্রীজারী করিতে পারেন না।

আমরা বিবেচনা করি যে, মুন্সেফের রায়ই বিশুদ্ধ। যে আদালত ডিক্রী প্রদান করেন তিনি ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্তৃক ডিক্রীজারী করার যে সকল নিয়ম আছে, তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৪ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে। কোচবিহারের দেওয়ানী আহেলকারের আদালত যে, ভারতবর্ষীয় ব্রিটিশ রাজ্যের এক আদালতে, এমত নির্দ্দেশ করা রাজসাহীর জজের ভ্রম। তাহা কোচবিহারের এদেশীয় রাজআধীন আদালত, এবং তাহা যে, "গবর্ণর জেনরেলের হুকুমের দ্বারা" ঐ পররাষ্ট্রে "সংস্থাপিত হইয়াছে," ইহাও দেখান হয় নাই। ডিক্রীদারের ইহা দেখাইতে হইবে যে, এই ডিক্রীজারী করিতে সাহাজাদপুরের মুন্সেফের ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৪ ধারামতে ক্ষমতা আছে। সে তাহাতে একেবারেই কৃতকার্য্য হয় নাই এবং তাহার উকীলও এ বিষয়ে আমাদের তৃপ্তি জন্মাইতে পারেন নাই।

অতএব রাজসাহীর জজের প্রদত্ত হুকুম অন্যথা হইবে। ডিক্রীদার নিম্ন আদালতের ও এই আদালতের সমুদায় খরচা দিবে।　　　　(গ)

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

### বিচারপতি জে, বি ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ৫৩৪ নং মোকদ্দমা।

চট্টগ্রামের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২২এ মে তারিখের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

ষষ্ঠীচরণ রায় (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

চট্টগ্রামের কালেক্টর (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ডিক্রীজারীতে ওয়াশীলাৎ নির্ণীত হওয়ার অনুজ্ঞাসহ দখলের জন্য এক পাপরের নালিশের ডিক্রী হয়, এবং এই হুকুমও হয় যে, ওয়াশীলাৎ নির্ণীত হওয়ার পরে বাদী ও প্রতিবাদী হারাহারী রূপে গবর্ণমেণ্টের ষ্টাম্পের মুল্য ও মোকদ্দমার খরচা দিবে। কিন্তু পক্ষগণ ওয়াশীলাতের তদন্ত না করাতে গবর্ণমেণ্টের দরখাস্তক্রমে আদালত পক্ষগণকে হাজির হইতে হুকুম দেন এবং তাহারা হাজির হইতে অস্বীকার করায় ষ্টাম্প্ মুল্য সম্বন্ধে প্রথমে যে হুকুম হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া আদালত ব্যক্ত করেন যে, তাহা দুই পক্ষের নিকট হইতে একত্রে আদায় হইবে।

এ স্থলে, গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে আদালতের ঐ দ্বিতীয় হুকুম প্রদান করার কোন ক্ষমতা ছিল না, এবং তদনুযায়ী ডিক্রীজারীতে যে কার্য্য হইয়াছে তাহা আইন-বিরুদ্ধ এবং বৃথা।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমরা দেখিতেছি যে, এই মোকদ্দমায় অধঃস্থ জজের দুই ভ্রম হইয়াছে। এই মোকদ্দমা যাহা পাপরের মোকদ্দমা ছিল তাহার নিষ্পত্তিতে তিনি বাদিগণকে বাটীর দখল লইতে এবং প্রতিবাদী ষষ্ঠীচরণ রায়ের নিকট হইতে সুদ সমেত, ডিক্রীকৃত টাকার পরিমাণে খরচা আদায় করিয়া লইতে হুকুম দেন।

তিনি আরও হুকুম দেন যে, দাবী যে পরিমাণে ডিস্‌মিস্ হয় তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদীর খরচা বাদীর প্রাপ্য ওয়াশীলাৎ হইতে বাদ যাইবে। এবং তিনি হুকুম দেন যে, বাদীর প্রাপ্য ওয়াশীলাৎ ডিক্রীজারীতে নির্ণীত হইবে। অবশেষে তিনি ব্যক্ত করেন যে, ষ্টাম্পের বাবতে গবর্ণমেণ্টের ২৫০ টাকা প্রাপ্য।

নিম্ন আপীল-আদালত তদনন্তর বলেন, "যেহেতু ওয়াশীলাতের পরিমাণ ডিক্রীজারীতে "নির্ণীত হওয়ার হুকুম হইয়াছে, অতএব কোন্ "পক্ষের নিকট ষ্টাম্পের মুল্যের কোন্ ভাগ প্রাপ্য "তাহা বলা দুঃসাধ্য, কারণ, তাহার পরিমাণ নির্ণীত "হয় নাই; ডিক্রীজারীর সেরেস্তায় তাহা নির্ণীত "হইলে, বাদীর যে টাকা পাওনা হইবে সেই "পরিমাণে প্রতিবাদী দিবে, এবং যে পরি- "মাণে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ হয় তদনুযায়ী "বাদী দিবে।"

আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে, আদালত, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩০৯ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালনে এই ডিক্রীতে এই হুকুম দেওয়া উচিত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ষ্টাম্পের দরুন্ গবর্ণমেণ্টের যে ২৫০ টাকা প্রাপ্য, তাহা ওয়াশীলাৎ নির্ণীত হইলে বাদী ও প্রতিবাদী প্রত্যেকে যে অংশ পাইবে তদনুযায়ী হারাহারী রূপে ঐ মুল্য দিবে। আদালত আপন হইতে গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে ইহার অধিক আর কোন হুকুম দিতে মনস্থ করেন নাই, এবং যদি পক্ষগণ ডিক্রীজারীতে ওয়াশীলাৎ নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইত, তবে পক্ষগণ, প্রত্যেকে ষ্টাম্পের মুল্যের কে কোন্ ভাগ দিবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না।

৩০৯ ধারামতে যে এই প্রকার সর্ত্তী হুকুম উচিত রূপে প্রদান করা যাইতে পারে, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু তাহা উচিত হউক বা না হউক, আদালত পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমার যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করেন তাহাতে তিনি অন্য কোন হুকুম দেন নাই। যদি ইহা ৩০৯ ধারার অন্তর্গত হুকুম হইয়া থাকে, তবে ইহা নিতান্ত শোচনীয়, এবং আমি বিবেচনা করি, এই বিষয়ে ইহাই অধঃস্থ জজের প্রথম ভ্রম। কারণ, ইহা ঘটিয়াছে যে, পক্ষগণ ওয়াশীলাতের তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে নাই, এবং পক্ষগণ যেপর্য্যন্ত আপন আপন মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছা করে তাহার অতিরিক্ত মোকদ্দমা চালাইবার জন্য তাহাদিগকে বাধ্য করার যে কোন আইন এ দেশে আছে এমত আমি অবগত নহি। এই মোকদ্দমায় বাদিগণ দখলের ডিক্রী পাইয়া, ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে তাহাদের যে দাবী ছিল তাহা তাহাদের পরিত্যাগ করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে এবং যদি তাহাই তাহারা করে, তবে প্রতিবাদী যে সন্তুষ্ট চিত্তে চুপ করিয়া থাকিবে এবং আদালতকে উত্তেজনা করিতে ক্ষান্ত থাকিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অধঃস্থ জজ যে প্রকারে ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন তদ্দ্বারাই গবর্ণমেণ্ট এই অবস্থাস্থিত হইয়াছেন, অর্থাৎ ওয়াশীলাৎ নির্ণীত ও জারী না হইলে গবর্ণমেণ্ট কোন পক্ষের নিকট কিছুই পাইতে পারিবেন না।

এমত অবস্থায়, গবর্ণমেণ্ট ন্যায্য অথবা ভ্রমাত্মক রূপেই হউক, আদালতে দরখাস্ত করেন এবং আদালত গবর্ণমেণ্টের দরখাস্তমতে ওয়াশীলাতের বিষয় তদন্ত করাইবার জন্য উভয় বাদী ও প্রতিবাদীকে আদালতে হাজির হইতে আজ্ঞা করেন। তাহারা দুই জনেই হাজির হইতে অস্বীকার করে, এবং অধঃস্থ জজ বোধ হয় এক দিকে গবর্ণমেণ্টের তাগাদায় এবং পক্ষান্তরে, পক্ষগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া আপনাকে এই অদ্ভুত অবস্থা হইতে উদ্ধার করার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন তাহাই আমি তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রম বলিয়া বর্ণনা করিলাম; এবং তাহা এই যে, গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ষ্টাম্পের রসুম

সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম হুকুম পরিবর্ত্তন করত তিনি ব্যক্ত করেন যে, তাহা উভয় পক্ষের নিকট একত্রে আদায় হইবে।

মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির উপরে তিনি যে হুকুম দেন তাহাতে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির বিধান উচিত রূপে প্রতিপালিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, আমি বিবেচনা করি যে, ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার পূরে এবং যখন কেবল ওয়াশীলাতের পরিমাণ নির্ণয় করা ভিন্ন পক্ষগণের মধ্যে আর কোন কথার বিচার বাকী ছিল না, তখন গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে এই দ্বিতীয় হুকুম যাহা বাস্তবিক একটি নুতন হুকুম, তাহা তাঁহার প্রদান করার কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কেবল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই শেষ হুকুমই জারী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অধঃস্থ জজ গবর্ণমেণ্টের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

আমার ইহা বলিবার কোন বাধা নাই যে, প্রদিবাদীর বিরুদ্ধে এই দ্বিতীয় হুকুম জারী করার জন্য যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহা আমার বিবেচনায় আইন-বিরুদ্ধ। ঐ সকল কার্য্য বৃথা হইবে, এবং প্রতিবাদীর এই সকল কার্য্যে এবং এই আপীলে যে খরচা হইয়াছে এবং যাহার পরিমাণ আমি ১৬ টাকা স্থির করিলাম তাহা গবর্ণমেণ্টের দিতে হইবে।

অধঃস্থ জজের প্রথম নিষ্পত্তিতে গবর্ণমেণ্টের অনুকূল যে হুকুম হইয়াছিল তাহার উপকার প্রাপ্ত হওয়ার যদি কোন উপায় থাকে, তবে তাহার কি উচিত উপায়, তদ্বিষয়ে আমি কোন রায় ব্যক্ত করিলাম না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (গ)

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১০৮ নং মোকদ্দমা।

সারণের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

ভববল সিংহ (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

রাজেন্দ্রপ্রতাপ সহায় (বাদী) এবং আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, টি এলেন ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—আদালতের ডিক্রী যে পর্য্যন্ত রহিত না হয় সে পর্য্যন্ত পক্ষগণের মধ্যে তাহাদের স্বত্ত্ব ও তাহারা যে ভাবে নালিশ করে তৎসম্বন্ধে, চূড়ান্ত গণ্য হইবে; অতএব কোন পক্ষ ইহা দেখাইতে পারে না যে, সে কাহার উপকারের জন্য নালিশ চালাইয়াছে; যথা, প্রতিবাদী এমত দেখাইতে পারে না যে, সে নিজেই বাদী ছিল।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমায় বাদীর দাবী কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু আরজীতে ও আমাদের সমক্ষে মেং এলেনের বক্তৃতায় আমরা দেখিতেছি যে, তাহার মূল কথা এই:—সে বলে যে, জীতনলাল ও অদ্বৈতনারায়ণ নামক ব্যক্তিদ্বয় প্রথমে মৌজা মকনারের ॥০ আনা হিস্যার মালিক ছিল। জীতনলালের পুত্রগণের স্বত্ত্ব অর্থাৎ ।০ আনা হিস্যা এক ডিক্রীজারীতে আদালত কর্ত্তৃক ১৮৫৯ সালের ৭ ই মার্চ তারিখে নীলাম হয়। বাদী ক্রয় করিয়া দখল লয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে জীতনলাল এবং অদ্বৈতনারায়ণ

শম্ভু তেওয়ারী নামক এক ব্যক্তিকে এক বন্ধকী খত লিখিয়া দেয় এবং শম্ভু তেওয়ারী তাহার স্বত্বের এক অর্দ্ধাংশ তোয়াগলীকে এবং অপর অর্দ্ধাংশ তিলককে বিক্রয় করে।

১৮৬৩ সালে দুই নালিশ উপস্থিত হয়, একটি বর্ত্তমান বাদী রাজেন্দ্রপ্রতাপ সহায় এবং অন্য তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তোয়াগলী কর্ত্তৃক, এবং দ্বিতীয় নালিশ ঐ সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে তিলক কর্ত্তৃক উপস্থিত হয়। কেবল বাদী ভিন্ন আর অন্য সকল বিষয়েই এই দুই মোকদ্দমা একই প্রকারের ছিল। তিলক এবং তোয়াগলী প্রত্যেকে শম্ভু তেওয়ারীর বন্ধক যাহার বয়সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা ক্রয় করিয়াছে বলিয়া মৌজা মকনারের চারি চারি আনা হিস্যা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করে। প্রত্যেক নালিশেই এই বন্ধক তঞ্চকতা-মূলক বলিয়া জওয়াব দাখিল হয়।

এই সকল নালিশ চলিবার কালে অর্থাৎ ১৮৬৩ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর তারিখে তিলক এবং তোয়াগলী প্রত্যেকে আপন আপন স্বত্ব বর্ত্তমান মোকদ্দমার ১ ম প্রতিবাদী ভববল সিংহের নিকট বিক্রয় করে। তিলক ও তোয়াগলীর প্রত্যেকের নামের পরিবর্ত্তে ভববল সিংহের নাম বসান হয়, এবং মোকদ্দমা চলিতে থাকে।

১৮৬৪ সালের প্রারম্ভে এই সকল মোকদ্দমার চূড়ান্ত শুনানীও নিষ্পত্তি হয় এবং প্রত্যেক মোকদ্দমায় ভববল সিংহ বর্ত্তমান বাদী রাজেন্দ্রপ্রতাপ সহায় এবং অন্যান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়। ঐ ডিক্রীদ্বয়ের তারিখ ১৮৬৪ সালের ১৩ ই জানুয়ারি এবং ১৮৬৪ সালের ১৯ এ জানুয়ারি। ডিক্রীজারী ও ওয়াশীলাৎ নির্ণীত হয় এবং ভববল সিংহকে দখল দেওয়া হয়। মোকদ্দমার কাগজ সমস্ত আমাদের সমক্ষে আছে, এবং তাহাতে মোকদ্দমার রফা হওয়ার কিছু মাত্র চিহ্ন নাই।

বর্ত্তমান বাদী রাজেন্দ্রপ্রতাপ সহায় বলে যে, ভববল সিংহের নামে যে ক্রয় হইয়াছিল তাহা সে নিজে তাহার চাকর ভববল সিংহের নামে ক্রয় করে; ও মোকদ্দমার বাস্তবিক রফা হয় এবং চাকর তাহার মনিবের উপকারের জন্য ডিক্রী পাইবে, কেবল এই উদ্দেশ্যেই চাকরের নামে মোকদ্দমা চলিতে দেওয়া হইয়াছিল। পরন্তু সম্পত্তি ভববল সিংহের নামে থাকিলেও ভববল সিংহ কখনও সম্পত্তির দখীলকার ছিলনা। পরে সে বলে যে, ভববল সিংহ ও তাহার মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ভববল সিংহ এই সম্পত্তি তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া দখল করার জন্য এই প্রতারণা-মূলক দাবী উপস্থিত করিয়াছে।

১৮৬৭ সালের ২২ এ এপ্রিল তারিখে চতুর্ভুজ দাস অর্থাৎ ২ নং প্রতিবাদী যে ভববল সিংহের উত্তমর্ণ উল্লেখে ডিক্রী পাইয়াছিল, সে সেই ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিয়া এই সম্পত্তি ক্রোক করে। বাদী বলে যে, ইহা চতুর্ভুজ ও ভববল সিংহের প্রতারণা-মূলক কার্য্য, এবং বাদী প্রধান সদর আমীনের আদালতে অর্থাৎ যে আদালতে ঐ ডিক্রী ছিল তথায় দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৪৬ ধারা মতে এই বলিয়া ঐ সম্পত্তির ক্রোক খালাসের জন্য দরখাস্ত করে যে, তাহা ভববল সিংহের সম্পত্তি নহে, তাহার নিজের সম্পত্তি। প্রধান সদর আমীন সম্পত্তি খালাস দিতে অস্বীকার করেন।

বাদী তাহার পরে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে; তাহাতে তাহার প্রার্থনা এই যে, মৌজা মকনারের ॥০ আনা হিস্যায় তাহার স্বত্ব ও দখল সাব্যস্ত করা হয় এবং ১৮৬৭ সালের ২২ এ এপ্রিলের ডিক্রীর উপরে চতুর্ভুজ যে সকল কার্য্য করিয়াছে তাহা অন্যথা করিয়া ডিক্রীজারী হইতে তাহার সম্পত্তি মুক্ত করা হয় এবং তাহার নাম কালেক্টরীর বহীতে মালিক বলিয়া রেজিষ্টরী হয়। ভববল সিংহের বেনামীতে বাদীর ১৮৬৮ সালের ২৮ এ মার্চ্চের ক্রয়ের উপরে বাদী আপন দাবীকৃত

স্বত্ব স্থাপন করে। দুই প্রতিবাদীই তাহাদের লিখিত বর্ণনা-পত্রে বলে যে, ইহা ভববল সিংহের সম্পত্তি, বাদীর সম্পত্তি নহে; এবং যে ডিক্রী দ্বারা বর্ত্তমান বাদীর বিরুদ্ধে ভববল সিংহ সম্পত্তির দখল পুনঃপ্রাপ্ত হয়, দুই প্রতিবাদীই সেই ডিক্রীর উপরে নির্ভর করে।

১৮৬৮ সালের ১০ ই ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার ইসু সমস্ত ধার্য্য হয়। অধঃস্থ জজ কর্তৃক নিম্নলিখিত ইসু নির্দ্ধারিত হয়।

১ ম।—বাদী বিরোধীয় সম্পত্তিতে দখীলকার ছিল কি না, যদি দখীলকার না থাকিয়া থাকে, তবে দখল স্থিরতর রাখার দাবী সংস্থাপিত হইতে পারে কি না?

২ য়।—প্রতিবাদী ভববল সিংহ বিরোধীয় সম্পত্তির বাস্তবিক ক্রেতা ছিল, কি কেবল নাম মাত্র ক্রেতা এবং বাদীর চাকর ছিল?

প্রতিবাদী আর দুইটি ইসু নির্দ্ধারণ করার জন্য অধঃস্থ জজের নিকট প্রার্থনা করে, যথা—

বাদীর নালিশ ১৮৬৪ সালের ১৩ ই জানুয়ারি ও ১৮৬৪ সালের ১৯ এ জানুয়ারির ডিক্রীর দ্বারা বারিত কি না?

বাদীর নালিশ চলিতে পারে কি না?

অধঃস্থ জজ এই দুই ইসু যোগ করিতে অস্বীকার করেন। নির্দ্ধারিত ইসু সমস্তের উপরে অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করেন যে, ১৮৬৩ সালের ক্রয় হইতে বাদী বরাবর দখীলকার ছিল। তিনি আরও নির্দ্দেশ করেন যে, ভববল সিংহ বিরোধীয় সম্পত্তির বাস্তবিক ক্রেতা নহে, সে বাদীর জন্য কেবল নামমাত্র ক্রেতা ছিল। এই নির্দ্দেশের উপরে তিনি এই ব্যক্ত করিয়া এক ডিক্রী দেন যে, যে বিরোধীয় সম্পত্তিতে বাদীর পূর্ব্ব-মত দখল স্থির রাখা উচিত এবং সে কালেক্টরীতে তাহার নাম রেজিষ্টরী করিয়া লইবে, এবং "এই" আদালতের সরাসরী হুকুম (বোধ হয় যে, সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য প্রধান সদর আমীনের হুকুম) অন্যথা হইবে।

প্রতিবাদী চতুর্ভুজ এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করে নাই, অতএব তাহার বিরুদ্ধে উহা চূড়ান্ত হইয়াছে।

অপর প্রতিবাদী ভববল সিংহ আপীল করিয়াছে। তাহার আপীলের প্রথম হেতু এই যে, ১৮৬৪ সালের ১৩ ই জানুয়ারির ও ১৮৬৪ সালের ১৯ এ জানুয়ারির ডিক্রী দ্বারা বাদীর দাবী বারিত হইয়াছে কি না, এই ইসুর বিচার না করা অধঃস্থ জজের অন্যায়।

অধঃস্থ জজ এই ইসু উত্থাপন না করিয়া স্পষ্টই অন্যায় করিয়াছেন, এবং তিনি কি জন্য ইহা করেন নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। অতএব ইহার যে প্রকার প্রস্তাব হইয়াছিল, আমরা তদনুসারে তাহা উত্থাপন করত তাহার উপরে সওয়ালজওয়াব শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করি যে, তাহা প্রতিবাদী ভববল সিংহের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এক পক্ষে বাদী যে এই সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে চাহে, এবং পক্ষান্তরে প্রতিবাদী যে ঐ স্বত্ব অস্বীকার করে, কেবল তাহাদের মধ্যেই এই মোকদ্দমা এইক্ষণে উপস্থিত আছে। প্রতিবাদী ভববল সিংহের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকারের প্রার্থনা হয় নাই। বাদী নিজে বলে যে, সে এ কাল পর্য্যন্ত তাহার স্বত্বে সম্পূর্ণ রূপে ভোগবান আছে, এবং যে সকল কার্য্যে ভববল সিংহ কোন পক্ষ নহে, তাহাই অন্যথা করা মাত্র এই মোকদ্দমার প্রতিকারের প্রার্থনা হইয়াছে। এই সকল কার্য্য প্রতিবাদিদ্বয় এক যোগে প্রতারণা করিয়া করিয়াছে বলিয়া যে আপত্তি উপস্থিত হয়, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এমত অবস্থায়, প্রধানতম বিচারালয় বারম্বার যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদীর প্রতিকার পাওয়ার স্বত্ববান্ হওনোপযোগী কোন কার্য্য না হইলে স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার নালিশ চলিতে পারে না, এই বিধিমতে বর্ত্তমান নালিশ চলিতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ

আছে। কিন্তু এই বিষয় তর্কিত হয় নাই, এবং তাহার উপরে আমি আমার নিষ্পত্তি স্থাপন করিলাম না। আমি কেবল ইহা দেখাইবার জন্য ঐ কথার উল্লেখ করিলাম যে, যে বাদীর দখলের ব্যাঘাত হয় নাই, সে যদি তাহার স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রীর প্রার্থনা করে, তবে সেই স্বত্ব কি, তাহা তাহার পরিষ্কার ও নির্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত করিতে হইবে।

প্রতিবাদীর তর্ক এই যে, আমরা ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের ডিক্রী দ্বারা নির্দেশ করিতে বাধ্য যে, ভববল সিংহ ঐ তারিখে রাজার বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তি তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া ভোগ করিতে স্বত্ববান্ ছিল, এবং ডিক্রীর পূর্ব্বে রাজার যে কিছু স্বত্ব ছিল, ঐ ডিক্রী দ্বারা তাহার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সে এমত তর্ক করে না যে, রাজা যদি এমন কোন স্বত্বের দাবী করেন, যাহা ডিক্রীর পরে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে তৎপ্রতি ঐ ডিক্রী বাধা স্বরূপ হইবে, কিন্তু সে তর্ক করে যে, ঐ ডিক্রী দ্বারা ডিক্রীর পূর্ব্ব দাবী সমস্ত বারিত। তর্কিত হইয়াছে যে, ডিক্রীর পক্ষগণ সম্বন্ধে, কে প্রকৃত বাদী এবং কে প্রকৃত প্রতিবাদী, তাহার কোন তদন্ত হইতে পারে না, অর্থাৎ তাহাদের মধ্যে ঐ ডিক্রীই চূড়ান্ত গণ্য।

দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৫৯ এবং ২৬০ ধারার অন্তর্গত ভিন্ন এপ্রদেশে বেনামী কার্য্য প্রদর্শন করার স্বত্বের প্রতি যে, কোন বাধা আছে, ইহা বাদী অস্বীকার করে, এবং সে তর্ক করে যে, ডিক্রী চূড়ান্ত হওয়ার যে বিধি আছে, তাহা কোন্ ব্যক্তির উপকারের জন্য নালিশ চলিয়া আসিয়াছে, তাহা দেখাইবার স্বত্বের অধীন।

এই কথার উপরেই আমাদের রায় বিশেষ রূপে নির্ভর করিবে। আদালতের ডিক্রী পক্ষগণের মধ্যে চূড়ান্ত, এই বিধির কোন সাধারণ [illegible] কথা নাই। যদি নথীস্থ প্রতিবাদী দেখাইতে পারিত যে, বাস্তবিক সে প্রতিবাদী নহে, সে বাদী, এবং তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী না হইয়া বাস্তবিক সে নিজেই ডিক্রী পাইয়াছে, তাহা হইলে, অসীম গোলমাল উপস্থিত হইত। বেনামীর প্রথা এত দূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হওয়ার একটি দৃষ্টান্তও আমাদের সমক্ষে উল্লেখ করা হয় নাই, এবং যদিও এই অহিতজনক প্রথা যত দূর সংস্থাপিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা এইক্ষণে আর প্রধানতম বিচারালয় রহিত করিতে পারেন না, তথাপি যে সকল ঘটনায় ঐ বেনামীর প্রথা খাটান হয় নাই, তাহাতে তাহা অবলম্বন না করাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ।

কোন তৃতীয় ব্যক্তি যাহার নাম নথীতে প্রকাশ নাই, সে যে সকল মোকদ্দমায় আসিয়া দেখায় যে, নালিশ তাহারই উপকারের জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত মোকদ্দমা যে বর্ত্তমান মোকদ্দমা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা দেখাইয়া দেওয়া বাহুল্য। যে সকল মোকদ্দমায় নথীস্থ কোন ব্যক্তি দেখায় যে, যে ব্যক্তি মোকদ্দমার পক্ষ নহে, বাস্তবিক তাহারই বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, সে সকল মোকদ্দমা হইতেও ইহা বিভিন্ন। ইহা অত্যন্ত অসুবিধাজনক প্রথা হইলেও তাহা বারম্বার চলিয়া আসিয়াছে, এবং সেই সকল ঘটনায় বর্ত্তমান মোকদ্দমা খাটে না।

যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী প্রদত্ত হয়, সে ব্যক্তিকে যে যে হেতুবাদে কোন কোন স্থলে ডিক্রীজারী হইতে না দিবার কারণ দর্শাইতে দেওয়া যায়, তাহাও আমাদের এই মোকদ্দমায় পর্য্যালোচনা করার আবশ্যক নাই। এপ্রকার প্রশ্ন এ স্থলে উপস্থিত নাই।

আমি ইহাই বলি যে, ডিক্রী অন্যথা না হওয়া পর্য্যন্ত পক্ষগণের স্বত্ব ও তাহারা যে ভাবে নালিশ করে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে তাহা চূড়ান্ত।

অতএব বাদী ১৮৬৩ সালের ক্রয়ের স্বত্ব নির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার যে দাবী করে, এবং যাহা ১৮৬৪ সালের ডিক্রী সম্বন্ধের সহিত সম্পূর্ণ

অসংলগ্ন, তাহা ঐ সকল ডিক্রীর দ্বারা বারিত।

"কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল ডিক্রী হওয়ার পরে বাদী যে সকল স্বত্ব পাওয়ার দাবী করে, তাহা ঐ সকল ডিক্রী দ্বারা বারিত নহে; এবং যদি বাদীর নালিশ সত্য হয়, তবে কি প্রকারে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অনায়াসেই দেখা যায়। অতএব বাদীর প্রকৃত দাবী কি, তাহা আমি নিশ্চয় না জানাতে, এবং আপীলেও আমরা বাদীকে ঠিক তাহার আরজীর প্রার্থনা সকলে বাধ্য না করিয়া, তর্ক-বিতর্কের কালে মেং এলেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, ঐ ডিক্রীর পরে অর্জ্জিত কোন নূতন স্বত্বের উপরে তিনি নির্ভর করেন কি না। তিনি স্পষ্ট উত্তর করিয়াছেন যে, তাহা তিনি করেন না, কিন্তু ১৮৬১ সালের ক্রয়ের উপরে এবং ডিক্রীর পরে ভববল সিংহ যে সকল কার্য্যের দ্বারা সেই স্বত্ব স্থির রাখিয়াছে, তাহার উপরে, তিনি নির্ভর করেন। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদী বোধ হয় উৎকৃষ্ট হেতুবাদেই ১৮৬১ সালের স্বত্বের উপরেই নির্ভর করিতে চাহে; কিন্তু আমার বিবেচনায়, সে তাহা করিতে পারে না।

অতএব বৃত্তান্তের বিচার করার কোন আবশ্যক নাই। আমি বিবেচনা করি যে, ১৮৬৪ সালের ডিক্রী সমস্তই বাদীর দাবীর যথেষ্ট উত্তর, এবং এই হেতুবাদেই নিম্ন আদালতের ডিক্রী অন্যথা এবং বাদীর নালিশ খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে হইবে।

নিম্ন আদালতে উত্থাপিত ও বিচারিত বৃত্তান্ত সমস্তের তদন্ত করিতে এবং আমাদের নিষ্পত্তি প্রিবি কৌন্সিল দ্বারা অন্যথা হওয়ার সর্ত্তে তাহার নিষ্পত্তি করিতে, আমাদের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে। আমি জানি যে, কয়েক মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সিল এই প্রকার প্রণালীতে কার্য্য করার আদেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিবেচনা হইতেছে যে, এ প্রকার মোকদ্দমায় আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করার যে ক্ষমতা আছে, তাহা হইতে প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ আমাদিগকে বঞ্চিত করার মনস্থ করেন নাই; এবং আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা অতি সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখার অতি প্রবল হেতু আছে।

বিচারপতি বেলি।—আমি বিবেচনা করি যে, আমরা ১৮৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের ডিক্রীর পূর্ব্বে যাইতে পারি না, এবং তদ্দ্বারাই বাদীর নালিশ বারিত হইয়াছে। যে প্রতিবাদীর অনুকূলে ডিক্রী আছে, সেই ডিক্রী তাহার বিরুদ্ধে পরিবর্ত্তন করিয়া, যে বাদীর কোন ডিক্রী নাই, তাহাকে তাহা অর্পণ করত পক্ষগণের পরস্পরের অবস্থা রূপান্তর করার জন্যই আমাদের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত হুকুমে আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ৫১২ নং মোকদ্দমা।

হুগলির জজের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ সেপ্টেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

ক্ষেত্রমণি দেবী (প্রার্থী) আপেলাণ্ট।

মাধবচন্দ্র রায় প্রভৃতি (মোজাহেমদার) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও নীলমাধব বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মহেন্দ্রলাল সোম ও তারকনাথ সেন রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের অন্তর্গত সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইবার পরে,

এক ব্যক্তি আপনাকে প্রকৃত দায়াধিকারী বলিয়া এই দরখাস্ত করে যে, অপর ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া সার্টিফিকেট লইয়াছে, সে স্থলে জজের উচিত যে, দাবীদার যে দায়াধিকারী হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তি, ইহা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি প্রতিপক্ষকে আদেশ করেন।

বিচারপতি কেম্প।—বৈকুণ্ঠনাথ রায় যাহার ১২৭৫ সালের ১১ ই কার্ত্তিকে মৃত্যু হয়, আপেলাণ্ট তাহারই কন্যা। ঐ কন্যার অসাক্ষাতে প্রতিপক্ষ ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের অন্তর্গত সার্টিফিকেট লয়। তাহাদের সার্টিফিকেটের দরখাস্তে কন্যা থাকার কথা এককালেই লেখা নাই, এবং সেই কন্যা যে, আপন পিতার দায়াধিকারিণী হওয়ার অযোগ্যা, এমতও কিছু লেখা নাই। কন্যা প্রত্যাগমন করত উপস্থিত হইয়া এই হেতুতে সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করে যে, সে প্রকৃত দায়াধিকারিণী, এবং সে অযোগ্যা না হইলে সে যে প্রকৃত দায়াধিকারিণী এ কথা প্রতিপক্ষও অস্বীকার করে না। সে আরও স্পষ্ট রূপে বলে যে, প্রতিপক্ষেরা প্রতারণা করিয়া এবং যথার্থ অবস্থা গোপন করিয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছে।

প্রতিপক্ষেরা পশ্চাতে যে বলে যে, কন্যা ব্যভিচারিণী, সুতরাং দায়াধিকারিণী হওয়ার অযোগ্যা, জজ এই কথা সত্য কি মিথ্যা, তাহার তদন্ত না করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম অন্যথা করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, এবং যে ব্যক্তিরা সার্টিফিকেট লইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ হইতে পারে না বলিয়া, তিনি আপেলাণ্টের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কারণ, সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের প্রথম দরখাস্তে তাহারা কন্যা থাকার কথা এবং যে হেতুতে সেই কন্যা দায়াধিকারিণী হওয়ার অযোগ্যা তাহা ব্যক্ত করিয়াছে।

জজের নিকট যে প্রথম দরখাস্ত হয়, তদ্দৃষ্টে নিঃসন্দেহই দেখা যাইতেছে যে, তাহাতে কন্যা থাকার অথবা তাহার অযোগ্যতার কোন প্রসঙ্গ নাই। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, যে স্থলে আপেলাণ্ট ক্ষেত্রমণি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছে যে, প্রতারণা হইয়াছে, সে স্থলে আপেলাণ্ট ক্ষেত্রমণির ব্যভিচার সপ্রমাণ করার জন্য প্রতিপক্ষকে আদেশ করা জজের কর্ত্তব্য ছিল, কারণ, জজের নিষ্পত্তিতে দেখা যাইতেছে যে, কেবল ঐ কারণেই ক্ষেত্রমণি দায়াধিকারিণী হইতে পারে না। যদি জজের প্রতীত হয় যে, তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম মোকদ্দমার যথার্থ অবস্থা অবগত না হইয়া এবং কন্যা থাকার কথা গোপন করার গতিকে প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং যদি ইহা তাঁহার প্রতীত হয় যে, প্রতিপক্ষেরা ক্ষেত্রমণি আপন পিতার দায়াধিকারিণী হওয়ার অযোগ্যা বলিয়া তাহার প্রতি যে অভিযোগ করে, তাহা তাহারা সব্যস্ত করিতে পারে নাই, তবে তিনি আপেলাণ্টের অসাক্ষাতে এবং স্পষ্টই তাহার বর্ত্তমান থাকার কথা গোপন করাতে, হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ নিয়মানুসারে সে তাহার পিতার দায়াধিকারিণী হওয়ার প্রতিকূলে পূর্ব্বে যে হুকুম দিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বিবেচনায়, তাঁহার অন্যথা করার কোন বাধা নাই।

অতএব কন্যার দায়াধিকারের স্বত্বের প্রতি যে ব্যক্তি আপত্তি করে, তাহার উপর প্রমাণভার নিক্ষেপ করিয়া, জজ সম্পূর্ণ রূপে এই মোকদ্দমার তদন্ত করত অবস্থা দৃষ্টে যে হুকুম উচিত বোধ করেন, তাহা প্রদান করিবেন।

প্রতিপক্ষ-রেস্পণ্ডেণ্টগণ এই আপীলের খরচা দিবে। (গ)

---

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ৪৩৭ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের জজ তত্রত্য সদর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারির হুকুম স্থির রাখিয়া

১৮৬৯ সালের ৯ ই জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

প্রিয়লাল গোস্বামী ( দায়ী ) আপেলাণ্ট।

জ্ঞানতরঙ্গিণী দাসী ( ডিক্রীদার ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস এবং বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মহেন্দ্রলাল শীল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন পত্তনী-তালুকের নীলাম অন্যথা করিবার দাবীর মোকদ্দমায় ১৮১৯ সালের ৮ম কানুনের ১৪ ধারা অনুসারে ক্রেতাকে সহ-প্রতিবাদী করা হয়, এবং এই ডিক্রী হয় যে, ক্রেতা তাহার ক্রয়-মূল্য জমিদারের নিকট পাইতে পারে; সে স্থলে ক্রেতা আর কোন নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়াই, তাহার ঐ ডিক্রীজারী করিতে পারে।

যদি উক্ত ক্রয়-মূল্য কালেক্টরীতে আমানত থাকে, এবং জমিদার-দায়ী উক্ত বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণের প্রাপ্য আদায়ে সাহায্য না করে, তবে সে উক্ত সমুদায় টাকার সুদের জন্য দায়ী হয়।

বিচারপতি কেম্প।—আমরা বিবেচনা করি জজ এ মোকদ্দমায় যে হুকুম দিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ। প্রকাশ যে, কোন এক পত্তনীর নীলাম অন্যথা করিবার দাবীতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; উক্ত নীলাম ১৮৫৬ সালের ২৮এ মে তারিখে হইয়াছিল। এ মোকদ্দমায় ১৮১৯ সালের ৮ম কানুনের ১৪ ধারার বিধান মতে জমিদার ও ক্রেতাকে পক্ষ করা হয়। উক্ত নীলাম ১৮৫৭ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর তারিখে অন্যথা হইয়া এই হুকুম হয় যে, উক্ত মোকদ্দমার বাদী পত্তনীতে দখল পাইবে, এবং জমিদার-প্রতিবাদী সুদ সমেত খরচা দিবে। আর ইহাও ডিক্রী হয় যে, উক্ত মোকদ্দমার সহ-প্রতিবাদী অর্থাৎ ক্রেতা যে ৭২৫ টাকা ক্রয়-মূল্য দেয়, তাহা সে জমিদার-প্রতিবাদীর নিকট ফেরৎ পাইবে। আপীলে আপত্তি হইয়াছে যে, দরখাস্তকারী মূল মোকদ্দমায় জমিদারের সহ-প্রতিবাদী থাকায়, এই ডিক্রী জমিদার খাস আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে জারী করিতে পারে না; তাহাকে স্বতন্ত্র নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে। আমরা বিবেচনা করি, এই আপত্তির কিছু মাত্র বল নাই। ক্রেতাকে মোকদ্দমার পক্ষ করা হয়, এবং ঐ ডিক্রীতে ক্রয়-মূল্য ফেরৎ দিবার আদেশ হয়। ইহা ১৮১৯ সালের ৮ম কানুনের ১৪ ধারার বিধান অনুযায়ী; তাহাতে স্পষ্ট বিধিবদ্ধ আছে যে, ঐ প্রকারের মোকদ্দমায় ক্রেতাকে পক্ষ করিতে হইবে, এবং আদালত সাবধানে ক্রেতাকে ক্ষতি হইতে রক্ষা করিবেন।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ঐ ডিক্রী জারী হইতে পারে, এমত স্বীকার করিয়া লইলেও খাস আপেলাণ্ট আদালত হইতে নীলামের উদ্বৃত্ত টাকার মধ্যে যে ৮২ টাকা লয়, সে কেবল তাহারই সুদ দিতে বাধ্য স্থির করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায়, এই আপত্তিরও কোন হেতু নাই। খাস আপেলাণ্ট খাস রেস্পণ্ডেণ্টকে ক্রয়-মূল্য ৭২৫ টাকা দিতে বাধ্য। তাহার তাহা নগদ দিয়া শোধ করা উচিত ছিল, নচেৎ উক্ত টাকা কালেক্টরীতে আমানত থাকিলে, এবং ক্রেতাকে দিবার জন্য সহজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে আদালত দ্বারা উক্ত টাকা আনাইয়া দিতে পারিত, অথবা আর যে কোন গতিকে হয়, খাস রেস্পণ্ডেণ্টকে তাহার উচিত প্রাপ্য আদায়ে সহায়তা করিতে পারিত। ঐ টাকার জন্য কালেকটরীতে দরখাস্ত করা খাস রেস্পণ্ডেণ্টের কার্য্য নহে, এবং যে কোন দরখাস্ত করিলেও দেওয়ানী আদালতের হুকুম ব্যতীত তাহা নিষ্ফল হইত। সুদ বৃদ্ধি হওয়া খাস আপেলাণ্টের নিজেরই দোষ। যদি সে ডিক্রীর টাকা দিত, অথবা বিক্রয়-মূল্যের উদ্বৃত্ত টাকা খাস রেস্পণ্ডেণ্টকে দেওয়ার জন্য কালেক্টরকে অনুমতি করিতে দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিয়া উক্ত টাকা পাওয়ার পক্ষে খাস রেস্পণ্ডেণ্টকে সহায়তা করিত তাহা হইলে এই ঘটনা হইত না।

অতএব এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল। (ব)

---

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৩১৪ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজ তত্রত্য প্রতিনিধি অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারির হুকুম অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৭ ই জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

নীমধারী সিংহ প্রভৃতি (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

কাঞ্চন সিংহ এবং অপর এক ব্যক্তি (দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি গ্রেগরি এবং বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কালেক্টরের রেজিষ্টরী বহীতে কি রূপে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ফল লিখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে জেলার জজের কালেক্টরের প্রতি কোন হুকুম দিবার অধিকার নাই।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমা ১৮৬০ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখের এক ডিক্রীর কার্য্য হইতে উত্থিত হয়। ঐ ডিক্রী নরোত্তম সিংহ প্রভৃতি বাদিগণের অনুকূলে কাঞ্চন সিংহ এবং হরত্তর সিংহ প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়। আশর্য্যের বিষয় যে উক্ত ডিক্রী আমাদের সমক্ষে উপস্থিত নাই; কিন্তু স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ ডিক্রী প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে খরচা ও সুদ সমেত কতিপয় টাকার নিমিত্ত প্রদত্ত হয়; তাহাতে কোন স্থাবর সম্পত্তিতে বাদিগণের স্বত্ব সাব্যস্ত হয় এবং আর এই এক আদেশ হয়, যে কালেক্টর তাঁহার তৌজীতে উক্ত সম্পত্তির মালিক স্বরূপে বাদিগণের নাম রেজিষ্টরী করিবেন।

যে আদালত ডিক্রী দেন সেই আদালতে ১৮৬৫ সালের ৮ ই জানুয়ারি তারিখে এই এক দরখাস্ত হয় যে, উক্ত ডিক্রীর আদেশ অনুসারে বাদিগণের নাম কালেক্টরের তৌজীতে রেজিষ্টরী করিবার জন্য তাঁহার প্রতি হুকুম জারী করা উচিত। প্রতিবাদিগণকে না জানাইয়া একতরফা ডিক্রী দেওয়া হয়, এবং তাহা কালেক্টরের নিকট ১৮৬৫ সালের ১৮ই এপ্রিলের ডিক্রীর সহিত পাঠান হয়। ১৩ ই মে তারিখে প্রতিবাদিগণ আদালতে উপস্থিত হইয়া এই হেতুবাদে উক্ত হুকুমের প্রতি আপত্তি করে যে, তাহা ডিক্রীজারীর কার্য্য, যাহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার বিধান অনুসারে বারিত হইয়াছে। ইহা আদালতে জানান হইলে প্রধান সদর আমীন ৭ ই জুন তারিখে তাঁহার পূর্ব্বের হুকুম রদ করেন, এবং কালেক্টরকে জানান যে, তাহা যেন প্রতিপালিত না হয়। বাদিগণ যাহারা এই শেষ দরখাস্তের প্রতিবাদ করে, তাহাদের প্রতি খরচা দিবার হুকুম হয়।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, কালেক্টর উক্ত ডিক্রী অনুসারে ২৪ এ জুন তারিখে বাদিগণের নাম মালিক স্বরূপে তাঁহার তৌজীতে লেখেন, অতএব তিনি প্রধান সদর আমীনকে জানান যে, তিনি তাহা করিয়াছেন।

বাদিগণ প্রধান সদর আমীনের পূর্ব্ব হুকুম রদের আদেশের বিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল করে; উক্ত আপীল ১৮৬৫ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর তারিখে খরচা সমেত ডিস্মিস্ হয়।

এই সকল কার্য্য ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত এই অবস্থায়ই থাকে; তখন প্রতিবাদিগণ প্রতিনিধি অধঃস্থ জজের নিকট (যে প্রধান সদর আমীন পূর্ব্বের ঐ সকল হুকুম দেন তাঁহার পদে পরে যিনি নিযুক্ত হন তাঁহার নিকট) দরখাস্ত করে যে, উক্ত প্রধান সদর

আমীন ১৮৬৫ সালের ২৭ এ জুন তারিখে এবং জজ ১৮৬৫ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাদিগণের প্রতি যে সকল খরচার হুকুম দেন, তাহাদিগকে তাহার নিমিত্ত গ্রেপ্তার করা হয়। প্রতিবাদিগণ সেই সঙ্গে দরখাস্ত করে যে, কালেক্টরের তৌজীতে বাদিগণের নামের পরিবর্ত্তে তাহাদের নাম লিখিতে কালেক্টরের নিকট হুকুম পাঠান হয়।

অধঃস্থ জজ কালেক্টরের নিকট হুকুম পাঠাইতে অস্বীকার করত খরচার জন্য গ্রেফ্তার করিবার হুকুম দেন।

প্রতিবাদিগণের আপীলে জজ কালেক্টরের প্রতি এই হুকুম দেন যে, তাঁহার তৌজীতে ১৮৬৫ সালের ১৮ ই এপ্রিল তারিখে ভ্রম বশতঃ যে সকল নাম লেখা হয় তাহা কাটিয়া তখন তাহাতে যাহাদের নাম ছিল তাহাই পুনঃ লেখা হয়।

বাদিগণ এক্ষণে এ আদালতে এই হেতুবাদে আপীল করে যে, জজ কালেক্টরের প্রতি যে হুকুম দেন, তাহা তাঁহার দিবার অধিকার নাই।

আমার বিবেচনায় এটি আপীলের উত্তম হেতু। ঐ পক্ষগণ আইনের কোন্ বিধানের উপর নির্ভর করে তাহা তাহারা দেখাইতে পারে নাই। এই বিষয় সম্বন্ধে আমি কেবল ১৭৯৩ সালের ৪৮ কানুনের ২৪ ধারায় এবং ১৭৯৩ সালের ৪ কানুনের ৯ ধারায় যে কিছু বিধান দেখিতে পাই, তাহাতে জেলা ও রাজধানীস্থ আদালত সমুহকে তাঁহাদের ডিক্রী সকল কালেক্টরের নিকট পাঠাইতে নিশ্চয়রূপে আদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল আদালতকে কালেক্টরের প্রতি এমত কোন হুকুম দিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই যে, ঐ সকল ডিক্রীর ফল তাঁহাকে কি প্রকারে তাঁহার বহীতে লিখিতে হইবে। অতএব জজের যে হুকুমের দ্বারা কালেক্টরকে কোন কোন নাম কাটিয়া দিবার আদেশ হইয়াছে, তাহা অধিকার, বহির্ভূত বিধায় অন্যথা হইবে, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে আমি খরচা দিব না এই সকল কার্য্য-প্রণালী বুঝিতে বরাবর ভ্রম হইয়াছে।

বিচারপতি বেলি।—আমি বোধ করি, জজের ভ্রম হইয়াছে, কারণ, জজ যে তাঁহার ১৮৬৫ সালের ১৮ ই এপ্রিলের হুকুমের বিপরীতে ১৮৬৯ সালের ৭ ই জুন তারিখের হুকুম দেন, তাহা তিনি ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারা মতে দিতে পারেন না। (ব)

১১ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৪১০ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১১ ই আগস্টের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মধুমতী দেবী ওরফে ঋতু দেবী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

ধনপত সিংহ (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং, জি, সি, পল বারিষ্টর এবং বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, টি, এলেন এবং বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ডিক্রীজারীর জন্য যে কার্য্য করা হয়, যাহাতে ডিক্রীদার ন্যায্য রূপে কৃতকার্য্য হইতে পারে না, এবং যাহার পর তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন কার্য্য হয় না, তাহা যে, সরলান্তঃকরণে করা হইয়াছিল, এমত বলা যাইতে পারে না।

ডিক্রীদার ও দায়ী উভয়ে সম্মত হইয়া ডিক্রীজারী কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিলেও, যে তারিখে সেই ডিক্রীজারীর দরখাস্ত দাখিল হয় তাহার পরের কোন তারিখ পর্য্যন্ত তাহা বিস্তারিত হইবে না।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমাদের নিকট

এই মাত্র প্রশ্ন উপস্থিত যে, ডিক্রীদার রেস্পণ্ডেণ্ট যখন ১৮৬৯ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখে তাহার ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করে, তখন ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার বিধানমতে তাহার মিয়াদ ছিল কি না।

পল সাহেব আপেলাণ্টের পক্ষে তর্ক করেন যে, ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্ত ১৮৬৬ সালের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে হয়। কিন্তু আমরা এ মোকদ্দমার যে ভাব গ্রহণ করিয়াছি তাহাতে তাহাই হইয়াছে কি না হইয়াছে, এ কথা বলা অনাবশ্যক বিধায় তাহা কিছু না বলিয়া এলেন সাহেব রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে যে তর্ক করেন যে, ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ তারিখে জারীর শেষ দরখাস্ত করা হয়, আমরা তাহাই গ্রহণ করিব। ১৮৬৯ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া আইন অনুসারে তিন বৎসর পশ্চাতে গণনা করত স্পষ্ট দেখা যায় যে, আর সকল ছাড়িয়া দিয়া, ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চের দরখাস্ত আইনের শব্দ অনুসারে উপস্থিত দরখাস্তের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে হয় নাই।

কিন্তু এলেন সাহেব দর্শান যে, আদালত এই দরখাস্ত দৃষ্টে যে সকল কার্য্য করেন তাহা ১৮৬৬ সালের ৩ রা মের পূর্ব্বে শেষ হয় না, এবং তিনি তর্ক করেন যে, এই সকল কার্য্য সম্বন্ধে আদালত যাহা করেন, তাহা তাহার নিজের কার্য্য স্বরূপে গণ্য হইবে, অতএব তিনি ঐ সকল কার্য্যের তারিখ, যথা, ১৮৬৬ সালের ৩ রা মে, তাঁহার মওক্কেলের শেষ কার্য্যের তারিখ স্বরূপ গণনা করিতে পারেন। তিনি তাঁহার এই তর্কের পোষকতায় ৬ ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৯৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নজীরের উপর নির্ভর করেন। তিনি টমসন-কৃত তমাদীর আইনের ১৮৬৬ সালের সংস্করণের ২১১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমার উপরেও নির্ভর করেন। এই দুই নজীর একত্রে বা স্বতন্ত্র রূপে ধরিয়াও বোধ হয় তাহাতে এই বলা হইয়াছে যে, ডিক্রীদার বা তাহার দরখাস্ত মতে আদালত জারীর যে কোন কার্য্য করে বা করেন তাহার শেষ তারিখ হইতে ডিক্রীদার তাহার শেষ দরখাস্তের তারিখ গণনা করিতে পারে, কিন্তু উক্ত কার্য্য সরলান্তঃকরণে অর্থাৎ ডিক্রীদারের ডিক্রীজারী করার মনস্থে হওনাবশ্যক। অতএব এই বিবেচনা করা আবশ্যক যে, ডিক্রীদার ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ তারিখে যে দরখাস্ত করে সে দরখাস্ত কি, এবং টমসন-কৃত তমাদীর আইনের ২১১ পৃষ্ঠা-লিখিত নিষ্পত্তির শব্দমতে, আদালত "উক্ত দরখাস্তের কার্য্য সাধনার্থে কি প্রকৃত কার্য্য করেন," যাহার উপর ডিক্রীদার নির্ভর করিতে পারে।

২০ এ মার্চ তারিখের দরখাস্ত এই:—ডিক্রীদার বলে যে, অন্য এক আদালতে দায়ীর প্রাপ্য কিছু টাকা ছিল, এবং তাহার প্রার্থনা এই যে, জারীর আদালত উক্ত অপর আদালতে এই রুবকারী করেন যে, ঐ টাকা তাহার মোক্তারকে দেওয়া হয়। এই দরখাস্তের উপর এবং এই দরখাস্তের তারিখে আদালত হুকুম দেন যে, নথী তলব দেওয়া হয়, এবং দরখাস্ত অর্থাৎ জারীর দরখাস্ত নথী-সামিল হয়।

তাহার পর আমরা এই অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, উক্ত নথী আসিয়াছিল, এবং তাহা আসিলে আদালতের এক কর্ম্মচারী তাহার রীতিমত রিপোর্ট করে; এবং আদালত তদনন্তর ১৮৬৬ সালের ৩ রা মে তারিখে প্রায় এই বাক্যে রায় দেন যে, যেহেতু উক্ত টাকা অন্য এক আদালতে এই ডিক্রীদার ক্রোক দিয়া রাখিয়াছে, অতএব আদালত উক্ত টাকা ডিক্রীদারের মোক্তারকে দিবার হুকুম দিতে পারেন না, এবং যেহেতু ডিক্রীদার এ বিষয় সম্বন্ধে আর কিছু করে নাই, অর্থাৎ তাহার ডিক্রীজারী করণার্থে ২০ এ মার্চের দরখাস্তের তারিখ অবধি স্পষ্টই কোন উপায় অবলম্বন করে

নাই, অতএব আদালত উক্ত প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া এই হুকুম দেন যে, উক্ত জারীর কার্য্য নথী-খারিজ হয়।

এক্ষণে এই সকল কার্য্য দৃষ্টে আমার বোধ হয় যে, আদালত বাদীর ডিক্রীজারীর দরখাস্তের সম্বন্ধে যাহা কিছু করিয়াছেন বলা যাইতে পারে তাহা এই মাত্র যে, আদালত ডিক্রীদারের দরখাস্তের হুকুম দিবার নিমিত্ত মোকদ্দমার নথী তলব দেন। অতএব আদালতের কার্য্যের তারিখ হইতে ডিক্রীদারকে তাহার ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্তের তারিখ গণনা করিতে হইলেও আদালত যে তারিখে নথী তলবের হুকুম দেন সেই তারিখ হইতেই গণনা করিতে হইবে, উক্ত হুকুমের তারিখ দরখাস্তের তারিখের সহিত একই দেখা যায়, অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ; অতএব তাহাতেও ডিক্রীজারীর মিয়াদ অতীত হইয়াছে।

কিন্তু ইহা না হইলেও, আমি এই স্থির করিতাম যে, উক্ত দরখাস্ত ডিক্রীজারী করণার্থে সরলান্তঃকরণ-মূলক কার্য্য নহে। আমি ইহা দুইটি কারণে বলিতেছি, প্রথমতঃ, আমি বিবেচনা করি যে, উক্ত হুকুমে যে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্দৃষ্টে ডিক্রীদার নিজে উক্ত সম্পত্তি অর্থাৎ ঐ টাকা যখন জজের আদালত হইতে আদায়ের বাধা দিতেছিল, তখন সে অবশ্যই জানিত যে, অন্য এক ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় অন্য এক আদালতের হুকুম দ্বারা ঐ টাকা সে পাইতে পারিবে না। পরন্তু, ডিক্রীদারের এই কার্য্য দ্বারা যেমন প্রকাশ পাইতেছে তদ্রূপ তাহার ডিক্রীজারী করিবার যদি যথার্থ অভিপ্রায় থাকিত, তবে সে অবশ্য এই কার্য্য চালাইতে থাকিত, অথবা অন্ততঃ, ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ বা (তাহার অনুকূলে যত দূর হইতে পারে তাহা ধরিয়া) ১৮৬৬ সালের ৩ রা মে, এবং ১৮৬৯ সালের ২৪ এ এপ্রিলের মধ্যে উক্ত ডিক্রী সম্বন্ধে যে কি করিয়াছে তদ্বিষয়ে তাহার নিকট কোন না কোন জওয়াব পাওয়া যাইত।

জাবেতা আপীলের আদালত স্বরূপ উপবিষ্ট বলিয়া আমাদিগকে এই নির্দ্ধারণ করিতে হইতেছে যে, ডিক্রীদারের ১৮৬৬ সালের মার্চ মাসের কার্য্য যথার্থই তাহার ডিক্রীর টাকা আদায়ের অভিপ্রায়ে হয় কি না। অতএব যখন আমরা দেখিতেছি যে, উক্ত কার্য্য দ্বারা তাহার কৃতকার্য্য হইবার কোন কারণ ছিল না, এবং তৎসম্বন্ধে পরে আর কোন কারণ দর্শান হয় নাই, এবং প্রথম দরখাস্তের পর তিন বৎসরের মধ্যে তাহার নিজের পক্ষ হইতে আর কোন কার্য্য হয় নাই, তখন আমার বিবেচনায়, ইহা বলা অসম্ভব যে, উক্ত কার্য্য তাহার ডিক্রীর টাকা আদায়ের অভিপ্রায়ে সরলান্তঃকরণ-মূলক কার্য্য।

এমত অবস্থায়, আমি বিবেচনা করি যে, যখন উক্ত ডিক্রীজারীর উপস্থিত দরখাস্ত করা হয় তখন ডিক্রীদার তমাদীর আইন দ্বারা বারিত হইয়াছিল।

পল সাহেব আপেলাণ্টের পক্ষ হইতে আমাকে স্মরণ করিয়া দিয়াছেন যে, যে হেতুবাদে নিম্ন আদালত ডিক্রী দেন তাহা এই আদালত স্পর্শ করেন নাই; এবং তাহা নিশ্চয়ই বটে। আমার এই সংস্কার ছিল যে, এলেন সাহেব রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে উক্ত হেতুবাদে এই নিষ্পত্তির পোষকতা করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ, আমার বোধ হয় তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৮৬৯ সালের ২০৪ নং মোৎফরকা আপীলে কৃষ্ণকমল সিংহ বনাম হীরু সরদারের মোকদ্দমায় পূর্ণাধিবেশনের ১৮৬৯ সালের ৪ঠা সেপ্টম্বর তারিখের নিষ্পত্তি এই বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত। উক্ত প্রশ্ন এই সকল বৃত্তান্ত হইতে উৎপন্ন হয়। ডিক্রীদার ১৮৬৬ সালের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে জারীর দরখাস্ত করে। তদনন্তর, সেই তারিখেই দায়ী এবং সে উভয়েই এই মর্ম্মে দরখাস্ত করে যে, উক্ত কার্য্য দুই মাস পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা

হয়। অতএব ইহাতে উক্ত কার্য্য ১৮৬৬ সালের ২৬ এ এপ্রিল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এবং নিম্ন আদালত স্থির করেন যে, উভয় পক্ষের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিবার এই চুক্তি ডিক্রীদারের কার্য্য; এবং তাহাতে তাহার ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্ত ১৮৬৬ সালের ২৬ এ এপ্রিল পর্য্যন্ত বিস্তারিত হয়, এবং সেই জন্য তৎপরে ১৮৬৯ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখে যে দরখাস্ত হয় তাহা হইতে গণনা করিয়া তাহা মিয়াদ মধ্যেই হয়।

আমি বিবেচনা করি যে, আইনের শব্দগুলি এমত আপত্তির বিরুদ্ধে একেবারে চূড়ান্ত, কিন্তু তাহা না হইলেও, আমি যে পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি দর্শাইলাম তাহা স্পষ্টই চূড়ান্ত।

হুকুম হইল যে, নিম্ন আদালতের ডিক্রী অন্যথা হয়, এবং ডিক্রীদার ডিক্রীজারী করণে বারিত হয়, এবং এই আদালতের ও নিম্ন আদালতের খরচা দেয়। (ব)

---

১১ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে বি ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৮৪৬ নং মোকদ্দমা।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত অধঃস্থ জজ বাজিতপুরের মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৪ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৯ ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বৈদ্যনাথ দে (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

রামকিশোর দে (বাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু নীলমাধব সেন আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পাণ্ডেণ্টের পক্ষে উকীল নাই।

**চুম্বক।**—কোন নাবালগ যে চুক্তি করে তাহা বাতিল হওয়ার যোগ্য মাত্র, কিন্তু তাহা যে অবশ্যই বাতিল, এমন নহে; এবং ঐ চুক্তি যদি এমত কোন মূল্য লইয়া হইয়া থাকে যাহা উক্ত নাবালগের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য, তাহা হইলে তাহা বাতিলের যোগ্যও নহে।

যদি কোন নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ চুক্তি অন্যথা করিবার জন্য কোন কার্য্য না করিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকে, তবে তাহার চুপ করিয়া থাকিবার কারণ না দেখাইলে বা উক্ত চুক্তির অবস্থা সম্বন্ধে কোন দোষ প্রদর্শিত না হইলে, একুটির আদালত এই অনুমান করিতে বাধ্য যে, উক্ত মূল্য এমত প্রকারের যে সে তাহা দ্বারা বাধ্য, অথবা সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উক্ত চুক্তি মঞ্জুর করিয়াছে।

**বিচারপতি ফিয়ার।**—এ মোকদ্দমার বাদী স্বীকার করে যে, সে এক্ষণে প্রতিবাদীর নিকট যে সম্পত্তি ফেরৎ পাইবার দাবী করে তাহা সে বিক্রয় করিয়াছে, এবং ক্রয়-মূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সে বলে যে, যখন সে তাহা বিক্রয় করে, তখন সে নাবালগ ছিল, সুতরাং উক্ত চুক্তি অকর্ম্মণ্য বিধায় ঐ প্রকারে যে সম্পত্তি সে বিক্রয় করে তাহা সে এক্ষণে প্রতিবাদীর নিকট হইতে ফেরৎ পাইতে স্বত্ববান।

নিম্ন আপীল-আদালত স্থির করেন যে, সে ঐ রূপে বিক্রীত সম্পত্তি ফেরৎ পাইতে পারে; এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সেই মর্ম্মে ডিক্রী দেন; এবং যেহেতু এই ডিক্রীর সঙ্গে এমত কোন হুকুম নাই যে, বাদী যে ক্রয়-মূল্য নিশ্চয়ই লইয়াছে তাহা তাহার ফেরৎ দিতে হইবে; অতএব তাহার এই ফল হইবে যে, উক্ত ডিক্রী থাকিতে দিলে, অপহরণের তুল্য কার্য্য আইনসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করা হইবে। ইহা স্পষ্টই অন্যায় হইবে। বৃত্তান্তগুলি দেখা যাউক।

নিম্ন আপীল-আদালতের রায় অনুসারে বাদী যদিও বিক্রয়ের সময়ে নাবালগ ছিল, তথাপি তাহার তখন বয়ঃপ্রাপ্তির অতি অল্প কাল বিলম্ব ছিল, এবং তাহার পর এত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়াছে যে, উপস্থিত মোকদ্দমা দায়ের হইবার কেবল এক মাস বাকী আছে। বাক্যান্তরে, বাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ১২ বৎসর

পর্য্যন্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, এক্ষণে সে যে চুক্তি অন্যথা করিবার চেষ্টা করিতেছে, তদনুসারে সে প্রতিবাদীকে বিরোধীয় ভূমি নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে দিয়াছে।

কোন নাবালগ যে চুক্তি করে তাহা বাতিল হওয়ার যোগ্য মাত্র, কিন্তু তাহা যে অবশ্যই বাতিল, এমত নহে; এবং ঐ চুক্তি যদি এমত মুল্য লইয়া করা হয় যাহা উক্ত নাবালগের প্রয়োজনীয় বস্তুর মধ্যে গণ্য, তাহা হইলে তাহা বাতিলের যোগ্যও নহে। আমি বিবেচনা করি, যে স্থলে (এই মোকদ্দমার ন্যায়) কোন নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর ১১ বৎসর এবং চুক্তির পর ১১ বৎসর ১১ মাস পর্য্যন্ত তাহা অন্যথা করিবার জন্য কিছু না করিয়া চুপ করিয়া থাকে, সে স্থলে এই দীর্ঘকাল চুপ করিয়া থাকিবার কোন কারণ না দর্শাইলে, বা তাহার নাবালগতা ভিন্ন মুল চুক্তি অবস্থা সম্বন্ধে অন্য কোন হেতুবাদে তৎপ্রতি আপত্তি না হইলে, একুটীর আদালত ঐ নাবালগের বিরুদ্ধে এই অনুমান করিতে বাধ্য যে, ঐ চুক্তি যে মুল্য লইয়া করা হয় তাহা এমত প্রকারের যে সে তদ্দ্বারা বাধ্য, বা সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ঐ চুক্তি মঞ্জুর করিয়াছে।

এ মোকদ্দমায় এমত কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই যে, বাদীর এই দীর্ঘকাল চুপ করিয়া থাকার বিশেষ কারণ ছিল, বা উক্ত বিক্রয়-কার্য্য প্রতিবাদীর পক্ষে প্রকৃত নহে।

অতএব আমার মতে উক্ত বিক্রয়-কার্য্য অন্যথা করায় নিম্ন আপীল-আদালতের অন্যায় হইয়াছে। উক্ত বিক্রয়ের চুক্তির প্রবলতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইবার উত্তম হেতু থাকিলেও, ক্রয়মুল্য বাদীর ফেরৎ দেওয়ার সর্ত্তে ভিন্ন তাহা অন্যথা হওয়া উচিত ছিল না। আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমার মতে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যায়; এবং তাহা অন্যথা হওয়া উচিত, অতএব তাহা এই আদালত এবং নিম্ন আদালতের খরচা সমেত অন্যথা হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম।

বাদীর মোকদ্দমা যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১৬ প্রকরণের বিধান দ্বারা বারিত নহে, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নহি। সত্য বটে, বাদী "স্থাবর" সম্পত্তির দাবীতে নালিশ করে; কিন্তু উক্ত সম্পত্তির উপর তাহার যে স্বত্ব আছে, তাহা যে, বিক্রয়-কার্য্য দ্বারা উক্ত সম্পত্তি প্রতিবাদীকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয় তাহা অন্যথা করিবার স্বত্বের অধীন। আইনে এ প্রকারের বিক্রয় অন্যথা করণের নালিশ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত কোন মিয়াদ নির্দ্দিষ্ট নাই, অতএব আমার বোধ হইতেছে যে, উক্ত বিক্রয়-কার্য্য অন্যথা করা সম্বন্ধে বাদীর নালিশ উল্লিখিত প্রকরণের বিধান দ্বারা বারিত হইবে; এবং সে উক্ত বিক্রয়-কার্য্য অন্যথা করিতে না পারিলে তাহার উক্ত স্থাবর সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার দাবীও অকর্ম্মণ্য হইবে।

কিন্তু আমি বলিতে চাহি যে, আমি এই বিষয়ে আমার বিজ্ঞবর সহযোগীর মতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি যে, বাদী ১১ বৎসর চুপ করিয়া থাকায় এবং তাহার কোন কারণ প্রদর্শন না করায় উক্ত বিক্রয়-কার্য্য মঞ্জুর করিয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে, সুতরাং সে এই মোকদ্দমায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

নিম্ন আপীল-আদালতের ডিক্রী খরচা সমেত রহিত হইবে। (ব)

১১ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হবৃহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৪৭৩ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের প্রতিনিধি জজ্ তত্রত্য অধঃস্থ

জজের ১৮৬৯ সালের ৩১ ই আগষ্টের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৪ঠা অক্‌টোবর তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মধুমতী দেবী (দায়ী) আপেলাণ্ট।

ধনপত সিংহ (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, টি, এলেন এবং বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—জজের নিকট এক উকীলের দ্বারা এক আপীল দাখিল করিয়া তৎপরের দিবস অপর এক উকীলের দ্বারা ঐ আপীল উঠাইয়া লওয়া হয়। পরে, ঐ আপীল পুনরায় নথীস্থ করিবার জন্য এই হেতুবাদে দরখাস্ত হয় যে, উক্ত দ্বিতীয় উকীল ঐ আপীল উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন না। জজ এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

এ স্থলে, জজের এই শেষোক্ত হুকুমের বিরুদ্ধে খাস আপীল চলে না, কারণ, এই হুকুম, আপীল উঠাইয়া লইতে দিবার প্রথমোক্ত হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের উপরে প্রদত্ত হইয়াছে।

আর, যেহেতু উকীলের নিকট ডাক যোগে প্রেরিত এক দরখাস্তের বলেই, জজের নিকট ঐ প্রার্থনা হয়, অতএব প্রতারণার প্রসঙ্গ শপথ পূর্ব্বক উত্থাপন না করিলে জজকে এ বিষয়ে আর কোন তদন্ত করিতে সনন্দের ১৫ ধারা অবলম্বনে আদেশ করা যাইতে পারে না।

বিচারপতি গ্লবর।—আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমার খাস আপীল চলে না। দায়ী ১৮৬৯ সালের ১২ ই আগষ্ট তারিখে জজের নিকট এক আপীল করে, কিন্তু অন্য এক উকীল দ্বারা তাহা পর দিবস, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ১৩ ই আগষ্ট তারিখে ঐ আপীল উঠাইয়া লয়। কিছু কাল পরে উক্ত আপীল পুনরায় নথীস্থ করিতে জজের নিকট এই হেতুবাদে এক দরখাস্ত করা হয় যে, দ্বিতীয় উকীল তাহা উঠাইয়া লইতে আপন মওক্কেলের নিকট ক্ষমতা পাইয়াছিলেন না। জজ ঐ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে এই বিবেচনায় অসম্মত হন যে, আপীল উঠাইয়া লইবার প্রথম হুকুম রহিত করিতে আইনানুসারে তাঁহার ক্ষমতা নাই। এ হুকুম জজের পূর্ব্বের ১৩ ই আগষ্টের হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের উপরে প্রদত্ত হয়, সুতরাং এই হুকুমের বিরুদ্ধে স্পষ্টই খাস আপীল চলে না।

কিন্তু সনন্দের ১৫ ধারা-প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন দ্বারা, মধুমতী দেবীর উত্থাপিত প্রতারণার প্রসঙ্গ জজকে তদন্ত করিতে বলিবার জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে। প্রতারণা করিবার বিষয় অনুমান করিবার কোন কারণ আমাদিগকে দেখান হয় নাই। আপেলাণ্ট স্বয়ং আসিয়া তাহার দরখাস্তের সত্যতা সম্বন্ধে শপথ করে নাই, অথবা সে মোক্তার ওকালৎ-নামা দেয়, তাহাকেও উপস্থিত করান হয় নাই বা মোক্তারনামাও দাখিল করা হয় নাই। উক্ত স্ত্রীলোক (আপেলাণ্ট) ডাকে তাহার উকীলের নিকট যে এক দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, কেবল তদৃষ্টেই চলিবার জন্য জজের নিকট প্রার্থনা হয়। এমত অবস্থায়, এই বিষয় সম্বন্ধে জজকে আর কোন কার্য্য করিতে আদেশ করা অনুচিত

আমি এ কথা বলি না যে, জজের নিকট যে প্রথম দরখাস্ত হইয়াছিল, তদনুসারে তিনি এ মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহা করিতে, এবং উক্ত মোক্তার কথিত মতে দ্বিতীয় উকীল নিযুক্ত করায় প্রবঞ্চকতা-মূলক কার্য্য করিয়াছে কি না, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে উক্ত মোক্তারকে হাজির হইতে এবং মোক্তারনামা দাখিল করিতে বলিতে পারিতেন না। আমি এমন কোন আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যের বিষয় জানি না, যাহা এই উপায় অবলম্বন করিলে করা হইত; অতএব তিনি উচিত বিবেচনা করিলে, এবং আপেলাণ্ট প্রতারণার বিষয় প্রবল রূপে সপ্রমাণ

করিলে, কেন যে তাঁহার উক্ত প্রশ্ন এক্ষণেও গ্রহণ করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করা উচিত নহে, তাহারও কোন কারণ আমি দেখি না।

আমার বিবেচনায়, এই খাস আপীল উকীলের ফী ৩২ টাকা ধরিয়া খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমি এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করণে বিচারপতি গ্লবরের প্রদর্শিত হেতুবাদেই সম্মত হইলাম।

আমি এই মাত্র বলিতে চাহি যে, জজ যদি এই হেতুবাদে প্রতারণার তদন্ত করিতে অসম্মত হইয়া থাকেন যে, তাহা বিচারপতি গ্লবরের বর্ণনা মতে অতি অসম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ উক্ত বাক্য সম্বন্ধে কেহ কোন শপথ করে নাই, এবং কোন এক স্ত্রীলোক ডাকে যে এক খানা কাগজ পাঠায় বলিয়া অনুমানিত হয়, তাহাতে ব্যক্ত আছে, তবে আমি বিবেচনা করি, তিনি উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কোন তদন্ত না করিলে তাঁহার উচিত কার্য্যই হয়; এবং এই অধিবেশনে যাহা বলা হইল, তদ্দৃষ্টে যদি জজের নিকট অতঃপর কোন তদন্তের প্রার্থনা হয়, তবে আমি বিবেচনা করি যে, বিশেষ রূপে শপথ পূর্ব্বক প্রদর্শিত কোন স্পষ্ট হেতু না দেখিলে এরূপ কোন তদন্ত করিতে আদেশ দেওয়া তাঁহার উচিত হইবে না। (ব)

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং এইচ, বি, বেলি।

১৮৬৯ সালের ৮৯৩ নং মোকদ্দমা।

ময়মনসিংহের অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ২৫ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া, তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৮ সালের ২৯ এ ডিসেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ভৈরবনাথ ভাই প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

মহেশচন্দ্র ভাদুড়ি প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার ও অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দায়াধিকারী-সূত্রে কোন সম্পত্তির দখলের নালিশে আদালত যদি অন্য এক ব্যক্তিকে সেই সম্পত্তিতে স্বার্থ-বিশিষ্ট অনুমান করিয়া প্রতিবাদী করেন, এবং মোকদ্দমায় জওয়াব দেওয়ার জন্য তাহার প্রতি আদেশ হইলে সে, যদি তাহার দাবী বর্ণনা করে, তবে বাদী যে স্থলে ঐ অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পত্তি লইতে চাহে, সে স্থলে বাদীর উপরেই আপন স্বত্বের প্রমাণ-ভার অর্শে।

শূদ্র-জাতির মধ্যেও দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে কেবল দান ও গ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পাদিত হয়, এবং দত্তক-বৈধ বলিয়া সংস্থাপনার্থে ঐ সকল যাগযজ্ঞ আবশ্যকীয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিচারপতি লক।—হরিকুমারের দত্তক-পুত্র বাণীচন্দ্রের দায়াধিকারী-সূত্রে বাদী বিরোধীয় সম্পত্তির দাবী করে। প্রতিবাদী এই বলিয়া দাবী করে যে, হরিকুমারের আইন-সঙ্গত দায়াধিকারী গদাধরের নিকট সে ক্রয় করিয়াছে। প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, বাণীচন্দ্র দত্তক-পুত্র বটে, কিন্তু তর্ক করে যে, বাদী অপেক্ষা গদাধর উৎকৃষ্টতর দায়াধিকারী।

ইসু নির্দ্ধারিত হওয়ার পরে শিবচন্দ্রকে প্রতিবাদী করা হয়, কারণ, গদাধরের নিকট ক্রয় করিয়াছে বলিয়া সে এই সম্পত্তির কিয়দংশের দাবী করে। সে তর্ক করে যে, বাণীচন্দ্রকে বৈধ রূপে দত্তক-গ্রহণ করা হয় নাই।

ইহা বলা আবশ্যক যে, শিবচন্দ্র, কেদারনাথের দ্বারা গদাধরের নিকট ক্রয় করে বলিয়া যে সম্পত্তির দাবী করে, তাহা লইয়া শিবচন্দ্র ও কালীচন্দ্রের মধ্যে এক মোকদ্দমা হইয়াছিল,

(২য় বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৮১ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য)। সেই মোকদ্দমায় বাণীচন্দ্রের দত্তক-গৃহীত হওয়া সপ্রমাণ হয় নাই। বর্ত্তমান মোকদ্দমা যাহাতে ভৈরবনাথ বাদী এবং যাহাতে সে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে যে, সে বাণীচন্দ্রের অব্যবহিত জ্ঞাতি ও দায়াধিকারী, তাহা ঐ মোকদ্দমার সহিত অধঃস্থ জজ কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়।

নিম্ন আদালত যে প্রণালীতে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধে ভৈরবনাথ প্রধানতম বিচারালয়ে আপীল করে, এবং এই মোকদ্দমার পক্ষগণের প্রদত্ত প্রমাণের উপরে, আর এক মোকদ্দমায় যাহাতে বাদী পক্ষ ছিল না, সেই মোকদ্দমার রায়ের উপরে নহে, দত্তক-গ্রহণের প্রশ্নের বিচার করার জন্য ১৮৬৭ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে এই মোকদ্দমা জজের নিকট পুনঃপ্রেরিত হয়।

দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন আদালতের হুকুম অনুসারে শিবচন্দ্রকে বর্ত্তমান মোকদ্দমায় পক্ষ করা হয়, কারণ, তাহার বিরুদ্ধে কালীচন্দ্র কর্তৃক যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে সে বাণীচন্দ্রের দত্তক-গৃহীত হওয়ার প্রতি আপত্তি করিয়াছিল, অতএব নিম্ন আদালত অনুমান করিয়াছিলেন যে, তাহার এই মোকদ্দমায় স্বার্থ আছে। ইহা নিতান্ত শোচনীয় যে শিবচন্দ্রকে পক্ষ করা হইয়াছে, কারণ, তদ্দ্বারা মোকদ্দমায় নূতন কথা প্রবিষ্ট করান হইয়াছে, এবং তাহা না করিলে, শিবচন্দ্রের স্বত্বের কোন ক্ষতি না করিয়াও মূল পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমা অনায়াসে নিষ্পন্ন হইতে পারিত।

পুনঃপ্রেরণের পরে জজ নির্দ্দেশ করেন যে, দত্তক অবৈধ, কারণ, তাহা উচিত ক্রিয়া দ্বারা গৃহীত হয় নাই; অতএব বাণীচন্দ্রের দায়াদ-সূত্রে বাদীর দাবী অকর্ম্মণ্য।

খাস আপীল হইয়া আমাদের সমক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে,—

১ম।—বাণীচন্দ্রের দত্তক গৃহীত হওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে বাদীকে বলা পূর্ব্বে জজের উচিত ছিল যে, শিবচন্দ্র ঐ দত্তকের প্রতি আপত্তি করাতে তাহাকে আপন বাক্য সপ্রমাণ করিতে তিনি আদেশ করেন; এবং এই তর্কের পোষকতায় উকীল উইক্‌লি রিপোর্টরের ১০ ম বালমের ৫৩ পৃষ্ঠার এক মোকদ্দমা দর্শাইয়াছেন।

২য়। শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়া সমস্ত উচিত রূপে সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া দত্তক অগ্রাহ্য করা জজের অন্যায় হইয়াছে, কারণ, শূদ্র জাতির মধ্যে দত্তক গ্রহণে কেবল সম্প্রদান ও গ্রহণ ভিন্ন অন্য ক্রিয়া আবশ্যকীয় নহে।

৩য়। দত্তক সপ্রমাণ না হইলেও, কালীচন্দ্রের বিরুদ্ধে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা উচিত ছিল না, কারণ, কালীচন্দ্র দত্তক গ্রহণ করার কথা স্বীকার করিয়াছে।

৪র্থ। গদাধর ১২৬৭ সালের ৭ ই চৈত্র মোতাবেক ১৮৬১ সালের ১৯ এ মার্চ তারিখে দেওয়ানী আদালতে যে আরজী দাখিল করে এবং যাহাতে সে স্বীকার করে যে, কালীচন্দ্র দত্তক গৃহীত হইয়াছিল, জজ দত্তক গ্রহণের প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সেই কথা পর্য্যালোচনা করেন নাই। সে বলে যে, হরিকুমারের পরে তাহার দত্তকপুত্র বাণীচন্দ্রের ও বাণীচন্দ্রের মৃত্যুর পরে তাহার প্রাপ্য ঋণ আদায় করার জন্য নালিশ হয়। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, দত্তক গ্রহণের পোষকতায় হরিকুমারের ভগিনী স্বর্ণময়ীর দরখাস্ত হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, জজ তৎসম্বন্ধে ভ্রম করিয়াছেন, কারণ, জজের নির্দ্দেশ অনুযায়ী স্বর্ণময়ীকে মোকদ্দমায় স্বার্থবিশিষ্টা বলা যাইতে পারে না।

প্রথম হেতু সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, উপস্থিত মোকদ্দমার সহিত ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫৩ পৃষ্ঠার মোকদ্দমার প্রভেদ আছে। উপস্থিত মোকদ্দমায় শিবচন্দ্রের নিজের প্রার্থনা ব্যতীত তাহাকে আদালত প্রতিবাদী করেন, এবং

সে সওয়াল-জওয়াব করিতে অনুমতি পাইয়া, তাহার বিরুদ্ধে কালীচন্দ্র যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাতে সে বাণীচন্দ্র আইন-সঙ্গত রূপে দত্তক গৃহীত হয় নাই বলিয়া যে জওয়াব দিয়াছিল, এই মোকদ্দমায়ও সে সেই প্রকার জওয়াব দেয়। উল্লিখিত মোকদ্দমায় মোজাহেমদার নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক বাদীর দাবীর প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মোকদ্দমায় শিবচন্দ্রের নিজের হস্তক্ষেপ করার দ্রষ্টব্য ইচ্ছা না থাকায়ও সে তাহাতে প্রতিবাদ করিতে আদালতের দ্বারা বাধ্য হয়।

শিবচন্দ্রের অবস্থা এই যে, সে এবং প্রতিবাদী কালীচন্দ্র, গদাধরের সূত্রে দাবী করে; কিন্তু সে বলে যে, হরিকুমারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গদাধর হরিকুমারের সম্পত্তির দায়াধিকারী হইয়া, ১২৬০ সালে তাহা কেদারনাথকে বিক্রয় করে, এবং কেদারনাথ ১২৬৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবচন্দ্রকে বিক্রয় করে। পক্ষান্তরে, কালীচন্দ্র বাণীচন্দ্রের দত্তক গ্রহণ উৎকৃষ্ট স্বীকার করিয়াও বলে যে, বাণীচন্দ্রের মৃত্যুর পর বাণীচন্দ্রের অব্যবহিত আইন-সঙ্গত দায়াধিকারী সূত্রে গদাধর উত্তরাধিকারী হয় এবং ১২৬৭ সালের শ্রাবণ মাসে তাহাকে সেই সম্পত্তি বিক্রয় করে। অতএব শিবচন্দ্রের ইহা দেখান অত্যন্ত আবশ্যক যে, দত্তক গৃহীত হয় নাই, এবং গদাধর যখন ১২৬০ সালে কেদারনাথকে সম্পত্তি বিক্রয় করে তখন গদাধরই তাহার আইন-সঙ্গত দখীলকার ছিল। যদি সে তাহা দেখাইতে পারে, তবে সে কেবল তাহার নিজের ক্রয়-স্বত্ব রক্ষা করিবে এমত নহে, বাদী যে দত্তক পুত্রের দায়াধিকারী সূত্রে দাবী করে, তাহার স্বত্ব এক কালে বিলুপ্ত করিবে। যে স্থলে শিবচন্দ্র যে বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করে, তাহার হস্ত হইতে বাদী সম্পত্তি লইতে চাহে, সে স্থলে বাদীরই আপন স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে, এবং জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

কিন্তু দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়াছে যে, জজ যে বিবেচনা করিয়াছেন যে, শূদ্রদিগের মধ্যে দত্তক গ্রহণে কেবল সম্প্রদান ও গ্রহণ ভিন্ন অন্য যাগযজ্ঞের আবশ্যক, তাহা তাঁহার ভ্রম। ঐ প্রকার যাগযজ্ঞ যে কেবল উচ্চজাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে আবশ্যক তাহা সপ্রমাণ করার জন্য কতিপয় বচনের উল্লেখ করা হইয়াছে; এবং আমরা দেখিতেছি যে, বাণীচন্দ্রকে দত্তক গ্রহণের জন্য যে সকল যাগযজ্ঞের আবশ্যক ছিল তাহা করা হইয়াছে বলিয়া দেখাইবার জন্য বাদী এই মোকদ্দমায় প্রমাণ দিয়াছে, এবং তদ্দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে, শূদ্রদিগের মধ্যেও পক্ষগণের বিবেচনা মতেই দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে কেবল সম্প্রদান ও গ্রহণ ভিন্ন আরো কিছু ক্রিয়ার আবশ্যক।

ষ্ট্রেঞ্জের হিন্দুশাস্ত্রের কতিপয় পরিচ্ছেদের উপরে আপেলাণ্ট বিশেষ নির্ভর করিয়াছে। ১ ম বালমের ৯৫ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "কোন "প্রকাশ্য ক্রিয়ার দ্বারা দান ও গ্রহণ দেখাইতে "হইবে। তদ্ভিন্ন, আইন মতে যে, আর কোন "ক্রিয়া নিতান্ত আবশ্যকীয়, এমত দৃষ্ট হয় না; "কারণ, রাজাকে সংবাদ দেওয়া ও জ্ঞাতি কুটুম্ব"দিগকে নিমন্ত্রণ করা এরূপ আবশ্যকীয় নহে, "কারণ, দত্তক গ্রহণের কথা অধিক প্রচার "করিয়া উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ "দূর করার মনস্থেই ঐ রূপে সংবাদ দেওয়া "ও নিমন্ত্রণ করা হয়। পারলৌকিক মঙ্গলার্থে "হোম অত্যন্ত আবশ্যকীয় হইলেও তাহা কেবল "ব্রাহ্মণের জন্য আবশ্যকীয়, কারণ, মূল গ্রন্থ "ও টীকা সমস্তে সর্ব্বদাই, যাহারা পবিত্র অগ্নি "রাখে এবং যাহারা রাখে না, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ "এবং অন্যান্য জাতির মধ্যে প্রভেদ করা "হইয়াছে, কেবল ব্রাহ্মণেরাই বেদ উচ্চারণ "করিয়া দত্ত-হোম করিতে পারেন। * * * অন্যান্য "বর্ণ, বিশেষতঃ, শূদ্র বর্ণ এই সকল ক্রিয়ায় "পুরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া উহার প্রতিরূপ

"যজ্ঞ করে। যদিও ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে তাহাদের পার-
"লৌকিক উপকারের জন্য তাহা স্বীকার করা
"যায়, তথাপি আইন-সঙ্গত প্রয়োজনের জন্য
"দত্তকগ্রহণের হোম আবশ্যকীয় নহে, বরং
তাহার বিপরীতই অনুমান করিয়া লইতে হইবে
"এবং এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, দত্তক
"গ্রহণের বৈধতার জন্য আবশ্যকীয় পক্ষগণের
"সম্মতি, ও দত্তক-গৃহীতার তৎকালে পুত্রসন্তান
"না থাকা এবং দত্তকপুত্রের উপযুক্ত বয়ঃক্রম
"থাকা এবং সে তাহার জনকের একমাত্র পুত্র
"অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্র না হওয়াই আবশ্যক;
"বিধিমত যাগযজ্ঞ আবশ্যকীয় নহে।"

তাহার পরে যে পরিচ্ছেদের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ষ্ট্রেঞ্জের ২য় বালমের ৮৭ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা, "পণ্ডিতের নিকট "প্রশ্ন হয় যে, শূদ্রবর্ণের মধ্যে দত্তক গ্রহণে "কি কি আবশ্যক? তদুত্তরে, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ- "বর্ণের মধ্যে দত্তকগ্রহণে যে সকল যাগযজ্ঞের "আবশ্যক, তাহার বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছেন "যে, 'কেবল হোম ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের মধ্যে "একই প্রকার ক্রিয়া সমস্ত সম্পাদিত হয়।" পণ্ডিতের ব্যবস্থার উপরে ৮৯ পৃষ্ঠায় মেং এলিশ টীকা করিয়াছেন যে, "শূদ্র সম্বন্ধে মাধব্যের "দত্তকমীমাংসা যাহা এই বিষয়ে এবং সাধারণ "মীমাংসা সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ "গ্রন্থ, তাহাতে লেখা আছে যে, শূদ্রবর্ণের "দত্তক নাই; ইহাতে বুঝা যায় যে, এই বর্ণের "মধ্যে এতৎসম্বন্ধে কোন যাগযজ্ঞ নাই; কিন্তু "কেবল প্রকাশ্য স্বীকার ও ঘোষণা দ্বারাই তাহা "যথেষ্ট রূপে বৈধ হয়। শূদ্রের মধ্যে দত্তক "গ্রহণ সম্বন্ধে যাগযজ্ঞের আবশ্যক হইতে পারে "না, কারণ দত্ত-হোমের দ্বারা দত্তকপুত্র জনক- "পিতার গোত্র হইতে দত্তকগৃহীতা পিতার "গোত্রান্তরিত হয়, কিন্তু শূদ্রদিগের গোত্র নাই। "শূদ্রেরা দত্তহোম করিতে পারে না, যদিও তাহারা "পুরাণোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তৎপ্রভৃতিরূপ "যজ্ঞ করিতে পারে। যে সকল বর্ণে তাহাদের "অনুষ্ঠানাদিতে বেদ উচ্চারণ করিতে পারে, "কেবল তাহারাই দত্ত-হোম করিতে পারে, এবং "দক্ষিণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন "বর্ণে ঐ সকল মন্ত্র অর্থাৎ বেদ উচ্চারণ করিতে "পারে না"

উক্ত বচন সমস্ত উপস্থিত বিষয়ে চূড়ান্ত বোধ হইতে পারে; কিন্তু তর্কিত হইয়াছে এবং আমার বিবেচনায় ন্যায্যরূপেই তর্কিত হইয়াছে যে, ষ্ট্রেঞ্জ যে ব্যবস্থা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ নহে, অর্থাৎ তাহা ভারতবর্ষের এই ভাগ সম্বন্ধে খাটে না; এবং সর টমাস্ ষ্ট্রেঞ্জ যাহা লিখিয়াছেন তাহা বাবু শ্যামাচরণ সরকার তাঁহার ২য় বার মুদ্রাঙ্কিত ব্যবস্থাদর্পণের ৮৭৩ পৃষ্ঠায় সপষ্টাক্ষরে খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, ষ্ট্রেঞ্জ ও কোলব্রুক দত্তকমীমাংসার ও দত্তক-চন্দ্রিকার কতিপয় বচন পর্য্যালোচনা করিতে ত্রুটি করিয়াছেন। তিনি যে সকল বচনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দত্তকমীমাংসার ৫ম অধ্যায়ের ৪৫, ৪৬, ৫৫ ও ৫৬ দফা এবং দত্তক-চন্দ্রিকার ২য় অধ্যায়ের ১৭ দফা। দত্তকমীমাংসার ৫৬ দফার বাক্যগুলি উদ্ধৃত হইল, যথা, "অতএব ইহা সংস্থাপিত হইয়াছে যে, দত্তক- "পুত্রের সহিত তাহার দত্তক পিতার সম্পর্ক "দান, গ্রহণ ও হোম ইত্যাদি উচিত যাগযজ্ঞের "দ্বারা হয়, এবং যদি ইহার কোন বিষয়ের "ত্রুটি হয়, তবে সম্পর্ক বৃথা হয়।" এবং সদরল্যাণ্ড দত্তক সম্বন্ধীয় ঐ গ্রন্থদ্বয়ের যে সারসংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ৩য় অধ্যায়ের ৪ দফায় তিনি লিখিয়াছেন যে, "দত্তক গ্রহণের জন্য যে "সকল নিয়মের বিধান আছে, তাহা না করিয়া "যদি দত্তকগ্রহণ করা হয় তবে পিতার সম্পর্ক "সংস্থাপিত হইবে না, কিন্তু দত্তকের বিবাহের "জন্য যে ব্যয় আবশ্যক, তাহা সে পাইবে।"

এমত বলা যাইতে পারে যে, এই সকল যাগযজ্ঞ কেবল তিন শ্রেষ্ঠবর্ণ সম্বন্ধে আবশ্যকীয়।

তাহা হইতে পারে; কিন্তু সকলের জন্যই যে, তাহা আবশ্যক ইহা দেখাইবার জন্য আমি উক্ত পরিচ্ছেদের উল্লেখ করি নাই; উচ্চবর্ণ সম্বন্ধেও যে সর টমাস ষ্ট্রেঞ্জের লিখিত ব্যবস্থা বিশুদ্ধ নহে, তাহা দেখাইবার জন্যই আমি তাহার উল্লেখ করিয়াছি। তৎসম্বন্ধে উল্লিখিত ১ম বালমের ৯৫ পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ দত্তকের বিষয়ে তিনি বলেন যে, "কোন প্রকাশ্য ক্রিয়ার দ্বারা "দান ও গ্রহণ দেখাইতে হইবে, তদ্ভিন্ন বোধ "হয়, বিধিমতে আর কোন কার্য্যের নিতান্ত "আবশ্যক নাই।" অনন্তর তাহার পরের পরিচ্ছেদে তিনি বলেন যে, "যদিও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে "পারলৌকিক উপকারের জন্য তাহা স্বীকার "করা যায়, তথাপি আইন-সঙ্গত প্রয়োজনের "জন্য দত্তক গ্রহণার্থে হোম আবশ্যকীয় নহে, "বরং তাহার বিপরীতই অনুমান করিয়া লইতে "হইবে।" এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরেই তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, "যে সকল যাগযজ্ঞের বিধান আছে তাহা নিতান্তই আবশ্যকীয়, এমত নহে;" কারণ, আবশ্যকীয় পক্ষগণের সম্মতি এবং দত্তকগৃহীতার তৎকালে পুত্র সন্তান না থাকা ইত্যাদি, হইলেই দত্তক বৈধ হয়। কিন্তু আমি দত্তকমীমাংসার যে বচনের উল্লেখ করিলাম, তাহা উচ্চবর্ণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়া থাকিলেও তাহাতে অভ্রান্তরূপে বিধি-বদ্ধ হইয়াছে যে, দান, গ্রহণ ও হোম ইত্যাদি যাহা ৫ম অধ্যায়ের পূর্ব্ব ভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উচিতরূপে সম্পাদন না করিলে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না; এবং তাহার পরে তিনি বলিয়াছেন যে, ইহার কোন ক্রিয়ার ত্রুটি হইলে ঐ সম্বন্ধ বৃথা হয়।

প্রথম বর্ণের দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে সর টমাস ষ্ট্রেঞ্জের মত যে বিশুদ্ধ নহে, এবং কেবল দান ও গ্রহণ ব্যতীত আরও কিছু ক্রিয়া যে আবশ্যকীয়, তাহা আমি দেখাইয়াছি; এইক্ষণে আমি, বাবু শ্যামাচরণ সরকারের ২য় বার মুদ্রাঙ্কিত ব্যবস্থা-দর্পণের ৮৭৫ পৃষ্ঠা হইতে এক বচনের উল্লেখ করিব। সর টমাস ষ্ট্রেঞ্জ যে বলেন যে, দত্তকগ্রহণের সময়ে শূদ্রেরা দত্তহোমের প্রতিরূপ পুরাণ হইতে এক যাগ করে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, "পরন্তু, যদিও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্যক্তি স্বয়ং "বেদমন্ত্র পাঠ করিতে ও তদ্দ্বারা ক্রিয়া করিতে "প্রতিষিদ্ধ, তথাপি ঐ সকল জাতীয় ব্যক্তিরা "নিজ নিজ নিমিত্তে তৎক্রিয়া করিতে ব্রাহ্মণ "নিযুক্ত করিতে পারে, এবং যথার্থতঃ করিয়াও "থাকে। অপিচ এতদ্দেশে প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রা-"নুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় আর আর জাতীয় "ব্যক্তিদেরও হোম করা আবশ্যক হওয়াতে "এদেশে কোন গুরুতর ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপ "সম্পন্নের নিমিত্তে শূদ্রদের পক্ষেও ব্রাহ্মণ দ্বারা "হোম করান বিহিত হইয়াছে, তাহা বক্ষ্যমাণ "প্রমাণে প্রকাশ। "বশিষ্ঠঃ—'ন স্ত্রী পুত্রং "দদ্যাৎ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্বা অন্যত্রানুজ্ঞানাদ্ভর্ত্তুঃ। "পুত্রং প্রতিগ্রহীষ্যন্ বন্ধূনাহূয় রাজনি নিবেদ্য "নিবেশনস্য মধ্যে ব্যাহৃতিভির্হুত্বা প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ। "অত্র স্ত্রিয়াঃ পত্যনুমত্যা দানগ্রহণশ্রুতেঃ প্রতি-"গৃহে হুত্বেতি শ্রবণাৎ ব্রতাদি প্রতিষ্ঠাবৎ "ব্রাহ্মণদ্বারা হোমেনাবিরুদ্ধং জ্ঞেয়ং এবং শূদ্রাণা-"মপীতি"—দত্তকনির্ণয়ঃ। শূদ্রাণামপীতি "কথনাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং ব্রাহ্মণদ্বারা হোম "করণাধিকারো দণ্ডাপূপন্যায়েন সিদ্ধ এব। "অস্যার্থঃ "বশিষ্ঠ কহিয়াছেন—'ভর্ত্তার অনুজ্ঞা-"ব্যতিরিক্ত স্ত্রী পুত্র দান করিবে না প্রতিগ্রহও "করিবে না। পুত্র প্রতিগ্রহ করণেচ্ছু ব্যক্তি বন্ধু-"গণকে আহ্বান ও রাজাকে নিবেদন করিয়া "নিবেশন মধ্যে ব্যাহৃতি হোম করণপূর্ব্বক গ্রহণ "করিবে।" এ স্থলে পতির অনুমতি ক্রমে "পত্নীকর্তৃক দান ও গ্রহণ হওয়া শ্রুত হওয়াতে ও 'প্রতিগ্রহে হোম করিবে' ইহা শ্রুত হওয়াতে "ব্রতাদি প্রতিষ্ঠাবৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইলে "অবিরুদ্ধ হয়, ইহা জ্ঞাতব্য। শূদ্রদেরও এই-"রূপ।"—দত্তকনির্ণয়।

আমার বোধ হয় যে, এই বিষয়ে খাস

আপেলাণ্টের তর্ক প্রামাণ্য নহে, কারণ, ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, শূদ্র জাতির মধ্যে কেবল দান ও গ্রহণ ব্যতীত ব্রাহ্মণেরা এমন অনেক যাগ-যজ্ঞ করিয়া থাকেন, যাহা দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব ঐ সকল যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন হওয়া সম্বন্ধে বাদী যে সকল প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা অবিশ্বাস করত জজ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, আবশ্যকীয় যাগ-যজ্ঞ নির্ব্বাহিত হয় নাই, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।

যেহেতু আপেলাণ্ট ১ ম ও ২ য় হেতুতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে, অতএব তৃতীয় হেতুতেও সে অকৃতকার্য্য হইবে; কারণ, আপেলাণ্ট আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে, কালীচন্দ্র, বাণীচন্দ্রের দত্তক-গ্রহণ অস্বীকার না করিলেও আপেলাণ্ট কালীচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে না, এবং গদাধরের নিকটে শিবচন্দ্র ক্রয় করার পরে গদাধর তাহার এক নালিশের আরজীতে যাহা কিছু বলিয়া থাকুক, তাহা শিবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, এবং স্বর্ণময়ী আদালতে যে দরখাস্ত দেয় তাহাতে সে যে কিছু বলিয়া থাকুক তাহাও দত্তক-গ্রহণের অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল প্রমাণ বলা যাইতে পারে না, কারণ, স্বর্ণময়ীর সাক্ষী স্বরূপ জবানবন্দী লওয়া হয় নাই।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, উপরি উক্ত হেতুবাদে এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি বেলি।—আমি সম্মত হইলাম। যে সমস্ত নজীর উপরে প্রদর্শিত হইল, তাহা বঙ্গদেশে বিশেষ রূপে প্রচলিত। তাহা ছাড়া, উভয় পক্ষ যে প্রমাণ দিয়াছে তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের বিবেচনায়ও দত্তক-গ্রহণ সম্বন্ধে কেবল দান এবং গ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য যাগ-যজ্ঞের আবশ্যক।

১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৬০৪ নং মোকদ্দমা।

নবিগঞ্জের মুন্‌সেফের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া শ্রীহট্টের জজ ১৮৬৯ সালের ২৪ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

দুর্গাচরণ সাহা (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

রামনারায়ণ দাস (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—নাবালগের হস্তান্তর সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অন্যথা করিতে পারে; কিন্তু যদি সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে তৎপ্রতি আপত্তি না করে, তবে সে তাহা মঞ্জুর করিয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে।

যে স্থলে মোকদ্দমার পক্ষগণ কর্তৃক এই এক মাত্র প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হিন্দু-বিধবা যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহা ভাবী দায়াধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না, সে স্থলে ঐ প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া, ঐ বিক্রয় বাস্তবিক হইয়াছিল কি না, তাহা আদালতের তদন্ত করা উচিত নহে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমাদের বিবেচনায়, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখা যাইতে পারে না।

বাদী স্বত্বের দুই মূল সূত্রে দাবী করে, এবং প্রতিবাদী সেই সূত্রেই তৎপূর্ব্বের এক স্বত্ব উত্থাপন করিয়াছে।

বাদী যে সকল কবালার উপরে নির্ভর করে, তাহা সে সপ্রমাণ করিয়াছে কি না, তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, জজ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী তাহার

দুই শ্রেণীর স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে অকৃত-কার্য্য হইয়াছে, তাহা বিশুদ্ধ নহে, অন্ততঃ এক শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্পত্তি অশুদ্ধ হইয়াছে।

আমাদের বোধ হয় যে, প্রতিবাদীর উত্থাপিত কবালা সম্বন্ধে নিম্ন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। সম্পত্তির এক ভাগ স্বরূপের দ্বারা এবং আর এক ভাগ বিষ্ণুদাসীর দ্বারা তাহার নিকট হস্তান্তরিত হয়।

কিন্তু জজ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, স্বরূপ নাবালগ ছিল, এবং সেই হেতু তিনি বলেন যে, প্রতিবাদীকে সে যে কবালা লিখিয়া দেয় তাহা অকর্ম্মণ্য।

আমাদের বিবেচনায়, এই কথা অশুদ্ধ। নাবালগের বিক্রয় এই পর্য্যন্ত অসম্পূর্ণ যে, নাবালগ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে তাহা অন্যথা করিতে সক্ষম হইতে পারে; কিন্তু সে যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে ঐ বিক্রয় অন্যথা করার জন্য কোন কার্য্য না করে, তবে ইহাই মানিয়া লইতে হইবে যে, সে তাহা বহাল রাখিয়াছে।

নথীতে এক বিন্দু প্রমাণও নাই, যদ্দ্বারা দেখা যাইতে পারে যে, স্বরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া মাত্রে অথবা তাহার ন্যায্য কাল পরে প্রতিবাদীর ঐ ক্রয় অন্যথা করার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। সে ক্রয়-মূল্য ফেরৎ দিতে না চাহিয়া সরলভাবে তাহার আপন কার্য্য অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহার এরূপ করার বিষয় কেহই মনে করে নাই। বাদী যে তাহার কবালার উপরে নালিশ করিয়াছে, এবং সুতরাং সে অন্য কোন স্বত্ত্বের উপরে নির্ভর করে না, সেও প্রতিবাদীকে ক্রয়-মূল্য ফেরৎ দিবার প্রস্তাব করে নাই। এবং জজ বাদীকে যে ডিক্রী দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাদীকে সম্পত্তির সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিতে দিয়াছেন, কিন্তু নালিশের প্রায় ৩।। কিম্বা ৪ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিবাদী যে টাকা দিয়াছিল, তাহার জন্য তাহার ক্ষতি-পূরণের কোন হুকুম দেন নাই।

ইহা যে নিতান্ত অন্যায়, তাহা আমাদের বলা বাহুল্য। স্বরূপ যদি সম্পত্তি ফেরৎ পায়, এবং সে যে টাকায় বিক্রয় করিয়াছিল, তাহা যদি তাহার ফেরৎ না দিতে হয়, তবে তাহা স্পষ্টই অন্যায় হইবে, এবং বাদী যে স্বরূপ হইতে উৎকৃষ্ট অবস্থাম্বিত, এমত দেখাইবার জন্য এই মোকদ্দমায় কোন কথা নাই। প্রতিবাদীর নিকট স্বরূপের বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া নিম্ন আদালত নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য ছিলেন। যদি বিক্রয়ের সময়ে স্বরূপ নাবালগ না থাকিত, তবে সে তাহার পরে কখন আপন কার্য্য অন্যথা করিতে পারিত না। যদি সে তৎকালে নাবালগ থাকিয়া থাকে, (কিন্তু তাহার নাবালগ থাকা সম্বন্ধে জজের নির্দ্দেশেও সন্দেহ আছে,) তবে যে প্রকারে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এবং মোকদ্দমার সকল অবস্থা দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, স্বরূপ আপন বিক্রয় বহাল রাখিয়াছে, এবং সে তাহা অন্যথা করিবার কোন উপায় অবলম্বন করে নাই।

বিষ্ণুদাসীর নিকট প্রতিবাদী যে, সম্পত্তি পায়, তৎসম্বন্ধে জজের এরূপ নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত হইয়াছে যে, বিচার্য্য বিষয় প্রতিবাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করার জন্য আদালতে কবালা দাখিল করার আবশ্যক ছিল।

দেখা যাইতেছে যে, বিক্রয় হওয়ার কথা অস্বীকৃত নহে, কিন্তু বাদী কেবল এই তর্ক করে যে, হিন্দু-বিধবার দ্বারা এমন অবস্থায় ঐ বিক্রয় হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা ভাবী দায়াধিকারী আবদ্ধ হইতে পারে না। বিষ্ণুদাসীর বিক্রয় ভাবী দায়াধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না, জজের কেবল এই প্রশ্নেরই বিচার করা উচিত ছিল; পক্ষগণ যে এক মাত্র প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাহা অতিক্রম করিয়া, ঐ বিক্রয় বাস্তবিক হইয়াছিল কি না, তাহার তদন্ত করা জজের উচিত ছিল না।

আমরা বিবেচনা করি যে, স্বরূপ কর্ত্তৃক যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, তৎসম্বন্ধে দুই নিম্ন

আদালতেরই নিষ্পত্তি অন্যথা ও বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে। কিন্তু বিষ্ণুদাসী কর্ত্তৃক হস্তান্তরিত সম্পত্তি সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া, এমন প্রয়োজনে ঐ বিক্রয় হইয়াছিল কি না যে, তাহা ভাবী দায়াধিকারীর উপর বাধ্যকর হইতে পারে, অথবা তৎকালের অব্যবহিত ভাবী দায়াধিকারী ঐ বিক্রয়ে সম্মত হইয়াছিল কি না, এই ইসুর বিচারার্থে মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

আমাদের বিবেচনায়, প্রতিবাদীর উভয় নিম্ন আদালতেরও এই আদালতের খরচার তৃতীয়াংশ বাদীর দিতে হইবে। অবশিষ্ট খরচা পুনঃপ্রেরণের পরে নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

(গ)

১৫ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ১৮৯১ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ২ রা মার্চের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য অতিরিক্ত জজ ১৮৬৯ সালের ১৫ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

যোগেশ্বর সহায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

গোপাললাল প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর ই টুইডেল ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রমাধব ঘোষ, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং মহেশচন্দ্র চৌধুরী আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি গ্রেগরি ও বাবু কালীমোহন দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের প্রাপ্য খাজানার জন্য জমিদারীর অংশ পাট্টাদারের বিরুদ্ধে নীলাম করিতে হইলে, তাহা ক্রোক করার আবশ্যক নাই, এবং কালেক্টরের নীলামের পূর্ব্বে তাহা ক্রোক করার ক্ষমতাও নাই।

বিচারপতি কেম্প।—বাদী এই মোকদ্দমায় খাস আপেলাণ্ট। সে এই বলিয়া নালিশ করে যে, স্বয়ম্বর সিংহ নামক এক বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধ এক ডিক্রীজারীতে ১৮৬৬ সালের ১০ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক তাহার স্বত্ব ও লাভ নীলাম হওয়ায় বাদী সেই তারিখে ঐ সকল স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করে। তদনন্তর সে বলে যে, ঐ নীলাম মঞ্জুর হয় এবং ১৮৬৬ সালের ২৬ এ এপ্রিল তারিখে সে দখল পায়। ঐ ডিক্রীমতে যে সম্পত্তির নীলাম হয় তাহা হুওয়াত বেরলী নামক জমিদারীর ৵৪ গণ্ডা হিস্যা। প্রতিবাদী খাস রেস্পণ্ডেণ্ট ও এক জন ক্রেতা। স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদীর ক্রয়ের পরে সে ১৮৬৬ সালের ২৪ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে কালেক্টরের আদালতে ক্রয় করে। বাদী কহে যে, দেওয়ানী আদালত তাহাকে দখল দেওয়া সত্ত্বেও কালেক্টরের নীলাম-ক্রেতা কালেক্টরের নিকট এক হুকুম প্রাপ্ত হইয়া বাদীকে বেদখল করে এবং তদ্ধেতুই এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে, যে, ১৮৬৬ সালের ১০ ই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ যে তারিখে বাদী ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে সেই তারিখের পূর্ব্বে কালেক্টর অধঃস্থ জজকে সংবাদ দেন যে, তাঁহার আদালত হইতে এক ক্রোক জারী হইয়াছে এবং সেই ক্রোক তখনও বলবৎ আছে, অতএব অধঃস্থ জজকে তাঁহার আদালতের নীলাম স্থগিত রাখিতে কালেক্টর অনুরোধ করেন। কিন্তু অধঃস্থ জজ তাহা করিতে অস্বীকার করেন, এবং নীলাম হয়।

কালেকটরের আদালতের পূর্ব্ব এক আইন-

সঙ্গত ক্রোক থাকার হেতুতে, জজের নির্দ্দেশ মতে দেওয়ানী আদালতের নীলাম অবৈধ ও বৃথা হইয়াছে কি না, এই কথা ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু জজ এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করেন নাই।

প্রথমতঃ, জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৯১ ধারার বিধানমতে, দেওয়ানী আদালতে নালিশ চলিবে না। আপীলে হাইকোর্ট নির্দ্দেশ করেন যে, জজ ভ্রমাত্মক রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নালিশ চলিবে না, অতএব দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করার জন্য মোকদ্দমা জজের নিকট প্রেরিত হয়। জজ এই ক্ষণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেহেতু দেওয়ানী আদালতের ক্রোকের পূর্ব্বে কালেক্টরের এক ক্রোক হইয়াছিল, অতএব দেওয়ানী আদালতের নীলাম যাহাতে বাদী আপন স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বাতিল ও অকর্ম্মণ্য; অতএব জজ মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করেন। জজ তাঁহার রায়ে আরও দেখাইয়াছেন যে, প্রধানতম বিচারালয় যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কালেক্টর যে নীলাম করেন তাহা অধীন জমার নীলাম, ঐ নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক। জজের ঐ কথা শুদ্ধ। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারা মতে কালেক্টর যে ঐ নীলাম করেন তাহা বিক্রয়যোগ্য অধীন জমার নীলাম নহে; জমিদারের এক অংশের নীলাম। দেখা যাইতেছে যে, পাট্টাদার স্বরূপে স্বয়ম্বর সিংহের নিকট প্রাপ্য খাজানার জন্য তাহার বিরুদ্ধে দরভাঙ্গার রাজার পক্ষে কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের এক ডিক্রী ছিল। বিরোধীয় সম্পত্তি এক জমিদারীর ৷/৪ হিস্যা, এবং তাহা ঐ পাট্টাদার কর্ত্তৃক আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল বিধায় তাহা কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের প্রাপ্য খাজানার জন্য কালেক্টর কর্ত্তৃক নীলাম হয়। অতএব বিক্রীত সম্পত্তি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারা-বর্ণিত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত সম্পত্তি অথবা জমা ছিল। ইহা জমিদারীর এক অংশ, অতএব বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল নিয়ম ও প্রণালী প্রচলিত আছে, তদনুযায়ী ইহার নীলাম হয়, সুতরাং ইহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের বিধান মতে নীলাম হয়। ঐ আইনানুসারে ক্রোকের আবশ্যক ছিল না, এবং আইনসঙ্গতরূপে কোন ক্রোকও জারী ছিল না। অতএব দেওয়ানী আদালতের ক্রোক তৎকালে জারী এবং বৈধ থাকায় এবং বাদীর ক্রয় প্রতিবাদীর অগ্রে হওয়া স্বীকৃত থাকায়, আমাদের বিবেচনায়, ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, জজ যে হেতুবাদে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন সেই হেতুবাদে তাহা ডিস্‌মিস্‌ করা আইনানুসারে অন্যায় হইয়াছে।

অতএব মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যাহা আমাদের পুনঃপ্রেরণের হুকুমানুসারে জজের বিচার করা আবশ্যক ছিল এবং যাহা তাঁহার অবশ্যই বিচার করিতে হইবে, তাহার বিচার বাকী আছে। যেহেতু প্রমাণে প্রবেশ করা হয় নাই, অতএব ঠিক কোন্‌ ইসুর উপরে মোকদ্দমার দোষগুণের বিচার নির্ভর করিবে, তাহা আমরা ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু অতিরিক্ত জজকে আমরা কেবল এই দেখাইতে চাহি যে, যে এক কথা প্রথম আদালতে নিষ্পন্ন হয় এবং জজ যাহার কোন উল্লেখই করেন নাই, অর্থাৎ বাদী তাহার নিজের স্বত্বে ক্রয় করিয়াছে কি সে বিচারাদিষ্ট দায়ীর বেনামদার, এই কথা পরিষ্কার রূপে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। জজ সমুদায় প্রমাণ শ্রবণ করিয়া এই বিষয়ে সাবধানে নির্দ্দেশ করিবেন।

স্বয়ম্বর সিংহের বিরুদ্ধে কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস যে ডিক্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার ভাব সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন আছে, অর্থাৎ ঐ ডিক্রী কি কেবল টাকার ডিক্রী, কি বিরোধীয় সম্পত্তি যাহা কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের অধীন পাট্টা-গৃহীতার জামিন স্বরূপে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল তাহা ঐ

ডিক্রীর জন্য দায়ী কি না, তাহা ব্যক্ত করার ডিক্রী।

দোষগুণ সম্বন্ধে অন্য যে সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তাহা জজই অবশ্য বিচার করিবেন। আমাদের সমক্ষে সওয়াল-জওয়াবে প্রধানতঃ যে সকল করার উল্লেখ হইয়াছে আমরা কেবল তাহাই দেখাইয়া দিলাম; জজ সমুদায় দোষগুণের বিচার করিয়া এবং সাবধানে প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া মোকদ্দমার এমন নিষ্পত্তি করিবেন যাহাতে আর মোকদ্দমা করার অথবা পুনঃপ্রেরণ করার আবশ্যক না থাকে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি বলি যে, জজের এমত অনুমান করা ভ্রম যে, দেওয়ানী আদালতের নীলামের পূর্ব্বে কালেক্টরের কোন বাস্তবিক ক্রোক ছিল। যদি নীলামের পূর্ব্বে কালেক্টর ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিয়া থাকেন, তবে তিনি আমার জানিত কোন আইনের কোন ধারামতে তাহা ক্রোক করিতে পারেন না, এবং কালেক্টরের নীলাম-ক্রেতার উকীল, এমন কোন আইনের কোন ধারা দেখাইতে পারেন নাই যদ্দ্বারা কালেক্টরের এই প্রকার ক্রোক করার ক্ষমতা আছে। অতএব জজ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কালেক্টরের ক্রোক অধঃস্থ জজের ক্রোকের অগ্রে হইয়াছিল, তাহা অকর্ম্মণ্য। কালেক্টর ক্রোক করিয়া থাকিলেও তাঁহার ক্রোক বৃথা। অতিরিক্ত জজ কালেক্টরের ক্রোক উল্লেখে কি বলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তিনি বোধ হয়, বিবেচনা করেন যে, কালেক্টরের ক্রোক, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪০ ধারার অন্তর্গত দেওয়ানী আদালতের ক্রোকের [illegible] প্রবল। আমার স্পষ্ট বোধ হয় যে, কালেক্টরের এই প্রকার ক্রোক করার কোন ক্ষমতা নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪০ ধারামতে দেওয়ানী আদালতের ক্রোক এবং সেই ক্রোকানুসারে পশ্চাতে যে নীলাম হয় তদ্দ্বারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত নীলাম বারিত হয় না। যদি কোন ভূম্যধিকারী তাহার রাইয়তের নামে তাহার জমার খাজানার জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হয়, তবে ইতিমধ্যে দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রীজারীতে অন্য কোন ব্যক্তি সেই প্রজার স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করিলেও, ঐ ভূম্যধিকারী তাহার সেই জমা নীলাম করিতে পারে। দেওয়ানী আদালতের নীলাম-ক্রেতা কেবল প্রজার স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করে, এবং প্রজা যেরূপ জমার খাজানার জন্য দায়ী ছিল, ঐ ক্রেতাও ঠিক তদ্রূপ দায়ী হইবে। আমার বোধ হয় যে, দুই নীলাম হইয়াছে বলিয়া তাহা যে পরস্পরের ব্যাঘাতজনক হইবে, এমন কোন কথা নাই। দুই নীলামই সম্পূর্ণ রূপে আইন-সঙ্গত হইতে পারে, এবং দুই নীলাম-ক্রেতাই তদন্তর্গত স্বত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। এই মোকদ্দমায় যে তাহাই ঘটিয়াছে, এমত আমি বলি না। এই দুই নীলামের প্রত্যেকের কি ফল, এবং তদন্তর্গত ক্রেতারা কে কি স্বত্ব পাইয়াছে, তাহা জজেরই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

আমি বিবেচনা করি যে, অতিরিক্ত জজের উচিত যে, তিনি দোষগুণের উপরে এই মোকদ্দমার বিচার করেন, এবং প্রতিবাদিগণকে বাদী এই সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ করিতে পারে কি না, তাহা তিনি স্থির করেন। এই প্রকার মোকদ্দমায় আমার বোধ হয় যে, যে স্থলে জজের রায় প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির রায়ের সহিত বিভিন্ন হইয়াছে, সে স্থলে তাঁহার মত আইন সম্বন্ধে বাদীর প্রতিকূলে হওয়াতেও তাঁহার ঐ মোকদ্দমার দোষগুণের বিচার করা উচিত ছিল। তিনি যদি তাহা করিতেন, তবে তাঁহার নিষ্পত্তি অন্যথা হইলে, পুনঃপ্রেরণ যাহাতে পক্ষগণের এবং গবর্ণমেণ্টেরও অনেক ব্যয় হয় এবং সকলের কালক্ষয় এবং কষ্ট হয়, তাহার আবশ্যক দূর হইত। (গ)

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং
দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৫৬২ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ ১৮৬৯ সালের ২০ এ মার্চ তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রামকানাই চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি (বাদী)
আপেলাণ্ট।

প্রসন্নকুমার সেন প্রভৃতি (প্রতিবাদী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও কালীমোহন দাস
আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার, গোপাললাল মিত্র এবং নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন না।

উপযুক্ত ক্ষমতা-বিশিষ্ট কোন আদালত দেঃ কার্য্য-বিধির ১৫ ধারামতে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা পরিচালন করিয়া স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী প্রদান করিবার পরে, যে আপত্তি দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না, এবং যাহা প্রথম আদালতের ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার কালে উত্থাপিত হয় নাই, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া আপীল-আদালত ঐ কার্য্য-বিধির ৩৫০ ধারামতে সেই ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমার বিবেচনায়, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে।

বর্ত্তমান মোকদ্দমা চলিবার পক্ষে ঐ আদালত যে প্রথম আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে প্রথম আদালত পূর্ব্বেই মোকদ্দমার দোষগুণ বিচার করিয়া বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দিয়াছেন, এবং যে স্থলে অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পক্ষ করার আপত্তিতে মোকদ্দমার দোষগুণের অথবা আদালতের বিচারাধিকারের কোন ব্যতিক্রম হয় না, সে স্থলে নিম্ন আপীল-আদালত এমন আপত্তির উপর নির্ভর করিয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫০ ধারামতে প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে পারেন না।

নিম্ন আপীল-আদালত যে দ্বিতীয় আপত্তির উপরে নির্ভর করেন তাহা এই যে, বাদী স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান নহে, কারণ, সে সরবে ডিপার্টমেণ্টের রিবেন্যিউ কর্ম্মচারিগণের সমক্ষে উচিত রূপে তাহার দাবী উপস্থিত করে নাই। এই আপত্তি সম্বন্ধেও আমার মত এই যে, আপীলে প্রথম এই আপত্তি গ্রহণ করিতে জজের ক্ষমতা ছিল না। এই প্রকার কোন আপত্তি প্রথম আদালতে উপস্থিত হয় নাই, এবং প্রতিবাদিগণ বাদীর স্বত্বের দাবী খণ্ডন করিতে অকৃতকার্য্য হওয়ার পরে প্রতিবাদিগণকে ঐ আপত্তির উপকার লাভ করিতে দেওয়া নিতান্ত অন্যায় ও অনুচিত হইবে। ইহা সত্য বটে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৫ ধারা মতে, স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী প্রদান করা না করা সম্পূর্ণরূপে আদালতের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতার অধীন, কিন্তু উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক এই ক্ষমতা একবার পরিচালিত হইবার পরে, এই প্রকার আপত্তি যাহাতে ডিক্রীর দোষগুণের কোন ব্যতিক্রম করে না এবং যাহা ডিক্রী প্রদান করার কালে উত্থিত হয় নাই, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া সেই ডিক্রী অন্যথা করিতে নিম্ন আপীল-আদালতের ক্ষমতা নাই। ৮ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৬৪ পৃষ্ঠায় বাবু মতিলালের মোকদ্দমা কোনরূপেই

বর্ত্তমান মোকদ্দমায় খাটে না। সেই মোকদ্দমায় প্রথম আদালত তাঁহার রায়ের লিখিত হেতুবাদে ১৫ ধারামতে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা পরিচালন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, অতএব বাদী যে স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার জন্য নালিশ করিয়াছিল, তাহা মোকদ্দমার অবস্থাদৃষ্টে সে পাইতে স্বত্ববান ছিল কি না, তাহা দেখিতে প্রধানতম বিচারালয়ের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

তর্কিত হইয়াছে যে, এই নালিশ ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত, কারণ, আরজীতে নালিশের কোন হেতু ব্যক্ত নাই। কিন্তু এই তর্ক স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। বাদী কহে যে, তাহার জমিদারীভুক্ত কতিপয় ভূমি প্রতিবাদিগণ তঞ্চকতার দ্বারা তাহাদের নিজের জমিদারীর মধ্যে থাক করিয়া লইয়াছে। এই কথা সত্য হইলে তাহাই নালিশের উৎকৃষ্ট হেতু; অতএব নালিশ কি জন্য চলিতে দেওয়া যাইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, বিরোধীয় ভূমির অন্ততঃ এক ভাগ সম্বন্ধে এ প্রকার কোন থাক হয় নাই; কিন্তু যে স্থলে এই আপত্তি নিম্ন আদালতে উত্থাপিত হয় নাই, এবং যে স্থলে প্রতিবাদিগণ বাদীর সহিত এই ভূমি সমস্ত সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়াছে, সে স্থলে আমি বিবেচনা করি যে, এত বিলম্বে তাহারা ঐ আপত্তি উঠাইতে পারে না। যদি উচিত সময়ে ঐ আপত্তি উত্থিত হইত, তবে সেই সকল ভূমি সম্বন্ধে বাদী যে ন্যায্যরূপে এই মোকদ্দমা করিতে উপস্থিত করিতে পারে, তাহা সে দেখাইতে পারিত।

এই সকল হেতুবাদে আমি নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিব। খরচা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

বিচারপতি লক।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ৩৭ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ২৬ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

বরদাকণ্ঠ রায়বাহাদুর (বাদী) আপেলাণ্ট।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সুন্দরবনের কমিসনর (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আশুতোষ ধর এবং দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন বাজেয়াপ্তকারী কর্ম্মচারী ১৮১৯ সালের ২ য় কানুনের ১৫ ধারার আদেশ মতে বাজেয়াপ্তীর মোকদ্দমায় তাঁহার বিবেচনা মতে কোন ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার যে সকল কারণ দর্শান তাহার এক নকল প্রতিবাদীকে দেওয়া হয়; এবং পরে প্রতিবাদীর অসাক্ষাতে উক্ত ভূমি কর সংস্থাপনের যোগ্য বলিয়া স্থির করা হয়; এ স্থলে, প্রতিবাদী স্বয়ং বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত না হওয়ায় উক্ত আইনের ১৬ ধারা অনুসারে তাহাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া অসম্ভব হওয়াতে তাহা না করায় উক্ত কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ হয় নাই।

বিচারপতি লক।—বাদীর কথিত মতে, কালেক্টরের তৌজীর ২৬২ নম্বর-ভুক্ত বাদীর স্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল পরগণা সাহসের অন্তর্গত মৌজে বারিখালী ওরফে পৎখালী এবং মৌজে বারৈখালী ওরফে খলমতের সামিল ৭০০/ বিঘা ভূমিতে স্বত্ত্ব সাব্যস্তের এবং দখলের দাবীতে, এবং নদীয়া বিভাগের রিবেনিউ কমিসনর ১৮৬৭ সালের ২৬ এ মার্চের যে হুকুম দ্বারা ঐ সকল ভূমি সুন্দরবনের ২২২ নং লাটের সামিল বলিয়া তাহার কর সংস্থাপনের হুকুম

দেন, তাহা অন্যথা করার দাবীতে বাদী এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে।

বাদী স্বীকার করে যে, ঐ সকল ভূমি সুন্দরবনের ২২২ নং লাটের অংশ বলিয়া চিহ্নিত হয়। ১৮২৯ সালে সুন্দরবনের কমিসনর ড্যাম্পিয়ার সাহেব ১৮২৮ সালের ৩ কানুনের বিধান মতে ঐ রূপ চিহ্নিত করেন, এবং ঐ সকল ভূমি পরে কাপ্তেন হজেস্ ২২২ নং লাটের অংশ স্বরূপে জরিপ করেন।

আমাদের সমীপস্থ আপত্তি দুই ভাগে বিভক্ত:—১ ম, নিম্ন আদালতের জজের বাদীর প্রদত্ত অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণে অস্বীকার করা উচিত হইয়াছে কি না; এবং দ্বিতীয়তঃ, উক্ত ভূমির কর সংস্থাপিত হইবার হুকুম বিধিমত প্রদত্ত হইয়াছে কি না।

বাদী বলে যে, সুন্দরবনের সীমা ধার্য্য হইবার পর গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল ভূমির প্রতি দাবী উপস্থিত করেন, কিন্তু খাস কমিসনর তাহা ১৮৪২ সালের ১৯ এ আগষ্ট তারিখে বাদীকে ছাড়িয়া দেন; সাহা মহম্মদ সুয়াজ ১৮১৫ সালে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে এক নালিশ উপস্থিত করায়, কোর্ট-আপীল তাহা বন্দোবস্তী জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; এবং বলা হইয়াছে যে, যে ভূমি গবর্ণমেণ্টের দাবী হইতে দুই বার ছাড়িয়া দেওয়া হয়, রিবেনিউ কমিশনর ১৮৬৭ সালের ২৬ এ মার্চের যে হুকুমের দ্বারা তাহার কর সংস্থাপনের আদেশ করিয়াছেন, তাহা আইন-বিরুদ্ধ, এবং অধঃস্থ জজের ঐ সকল দলীলের নকল এ মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা, এবং নিম্ন আদালতের রায়ে লিখিত হেতুবাদে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করা অন্যায় হইয়াছে।

বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল ভূমি সম্বন্ধে বর্ত্তমান বাজেয়াপ্তীর কার্য্য ১৮৫২ সালে আরম্ভ হয়, এবং ১৮৬৬ সালে শেষ হয়। আমরা দেখিতেছি যে, এক জন ডেপুটি কালেক্টর ১৮৫৯ সালের ২৪ এ মার্চ তারিখে তাহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে প্রথম অনুরোধ করেন। সুন্দরবনের কমিশনর ১৮৫৯ সালের ৩০ এ এপ্রিল তারিখে তাহার এক নক্‌সা প্রস্তুত করিবার হুকুম দেন। তাহা করা হয়, কিন্তু ঐ সকল ভূমির প্রতি দাবী উপস্থিত হওয়ায় তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণার্থে ১৮৬১ সালের ৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ঐ নথী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট ফেরৎ পাঠান হয়। ডেপুটি কালেক্টর বাবু রজনলাল এই হুকুম প্রতিপালন করিয়া ১৮৬৪ সালের ২১ এ জানুয়ারি তারিখে দাবীদারের প্রতি এই নোটিস জারী করেন যে, সে এক নির্দ্দিষ্ট তারিখে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা হাজির হয়, নচেৎ ভবিষ্যতে কোন আপত্তি শুনা যাইবে না। এই নোটিস জারী হওয়ার সংবাদ ২২ এ জানুয়ারি তারিখে দেওয়া হয়; এবং ২৭ এ জানুয়ারি তারিখে বাদীর পক্ষে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় ডেপুটি কালেক্টর রিপোর্ট করেন; এবং সুন্দরবনের কমিসনর উক্ত রিপোর্ট এবং নথীস্থ আর আর কাগজাৎ দৃষ্টে ১৮৬৬ সালের ১৩ ই জানুয়ারি তারিখে এক রুবকারী করেন, এবং তাহাতে তাঁহার মতে ঐ সকল ভূমির কর সংস্থাপিত হইবার কারণ দর্শান। এই রুবকারীর এক নকল বাদীর (উক্ত বাজেয়াপ্তীর মোকদ্দমার প্রতিবাদীর) উপর জারী করা হয়; ইহা ১৮৬৬ সালের ১১ ই ফেব্রুয়ারির রিটর্ণে প্রকাশ আছে; এবং প্রতিবাদী (উপস্থিত মোকদ্দমার বাদী) হাজির না হওয়ায় সুন্দরবনের কমিশনর ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ তারিখে ঐ সকল ভূমির কর সংস্থাপনের হুকুম দেন, এবং তাঁহার রুবকারী রিবেনিউ কমিশনরের নিকট পাঠান; তিনি তাহা ১৮৬৭ সালের ২৬ এ মার্চ তারিখে মঞ্জুর করেন।

এই মোকদ্দমার বাদী যে তাহার বিরুদ্ধে উক্ত বাজেয়াপ্তীর কার্য্য সুন্দররূপে অবগত ছিল, এবং তাহার উপর যে, আইন অনুসারে

রীতিমত নোটিস জারী হইয়াছিল; তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু যদিও উক্ত কার্য্য ১৫ বৎসরের অধিক কাল চলিয়াছিল, তথাপি ১৮৫৪ সালের ১১ ই এপ্রিল তারিখে সে যে এক দরখাস্ত দাখিল করে, এবং তাহার নিজের অনুরোধে উক্ত বাজেয়াপ্তীর মোকদ্দমায় তাহাকে প্রতিবাদী করা হয় এবং পাঁচ দিনের মধ্যে তাহার দলীলাদি দাখিল করিতে বলা হয় (যে হুকুম সে প্রতিপালন করে নাই) তদ্ব্যতীত সে কখন নিম্ন আদালতে উপস্থিত হয় নাই।

কিন্তু বলা হইয়াছে যে, সুন্দরবনের কমিশনর ঐ সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত হইবার যোগ্য বলিয়া হুকুম দিবার পূর্ব্বে ১৮১৯ সালের ২ য়ম কানুনের আদেশ মতে বাদীকে (তখনকার প্রতিবাদী) সতর্ক করিয়া দেন নাই যে, তাহার দলীলাদি দাখিল না হইলে পরে আর গ্রহণ করা হইবে না, এবং উক্ত কর্ম্মচারীর ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ তারিখের রুবকারীর প্রতি এই দোষ দেওয়া হয় যে, তাহাতে একথা নাই যে, প্রতিবাদীকে রীতিমত সতর্ক করা হইয়াছে; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বাজেয়াপ্তকারী কর্ম্মচারী ১৮৬৬ সালের ১৩ ই জানুয়ারীর রুবকারীতে যে সকল হেতুবাদে ঐ সকল ভূমি বাজেয়াপ্ত করিবার যোগ্য বিবেচনা করেন, তিনি ১৮১৯ সালের ২ য়ম কানুনের ১৫ ধারার আদেশ অনুসারে বাদীকে (তৎকালের প্রতিবাদী) তাহার এক নকল দেন, এবং পরে বাদী স্বয়ং বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত না হওয়ায় তিনি তাহার অসাক্ষাতে ১৮৬৬ সালের ২০ এ মার্চ তারিখে ঐ সকল ভূমির কর সংস্থাপনের হুকুম দেন। বাদী উপস্থিত না হওয়ায় তাহাকে বাজেয়াপ্তকারী কর্ম্মচারী ১৮১৯ সালের ২ য়ম কানুনের ১৬ ধারার প্রয়োজনানুসারে সতর্ক করিয়া দিতে পারেন নাই। সুন্দরবনের কমিশনরের কার্য্য মঞ্জুর হইবার পূর্ব্বে উক্ত নথী বৎসরাবধি রিবেনিউ কমিশনরের নিকট থাকে, কিন্তু বাদী তাহার দলীলাদি দাখিল করিতে পারিবার জন্য উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট কোন দরখাস্ত করে না।

বাজেয়াপ্তকারী আদালত সকলের কার্য্য-প্রণালী আদ্যোপান্তই আইন-সঙ্গত বোধ হইতেছে। ১৮১৯ সালের ২ য়ম কানুনের ২২ ও ২৪ ধারা রূপান্তরিত হইয়া ১৮২৮ সালের ৩ কানুনের যে ৩ এবং ১০ ধারা বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে ব্যক্ত আছে যে, বাজেয়াপ্তকারী কর্ম্মচারিগণের হুকুমের আপত্তিতে দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত আদালত বাচনিকই বা দলীল ঘটিতই হউক, এমত কোন প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহা কালেক্টরের নিকট বা বোর্ডে দাখিল হইবার বিষয় এবং পরে অযথেষ্ট হেতুবাদে অগ্রাহ্য হইবার বিষয় প্রকাশ না পায়, বা যে প্রমাণ ইসু সম্বন্ধীয় এমত কোন গুরুতর বৃত্তান্ত নির্দ্ধারণার্থে অবশ্য প্রয়োজনীয় না হয় যাহা পূর্ব্বের তদন্তে বিশেষ রূপে দেখা হয় নাই। বাদী কোর্ট-আপীলের ১৮১৫ সালের রায়ের এবং খাস কমিশনরের ১৮১২ সালের রায়ের যে দুই নকল দাখিল করিতে চাহে, তাহা গ্রহণ করণার্থে আমাদিগকে এই ধারার শেষোক্ত শব্দগুলি দেখিতে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে, বাদীর প্রতি কোন অনুগ্রহ দেখান যাইতে পারে না, কারণ, সে বাজেয়াপ্তের কার্য্য উপস্থিত থাকিবার বিষয় বিশেষ রূপে অবগত থাকিয়া, এবং সে এক্ষণে যে সকল দলীল দাখিল করিতে চাহে তাহা তাহার নিকটে থাকাতে এবং দাখিল করিতে সমর্থ থাকাতেও, এক্ষণে আদালতে যে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করণার্থে সে বরাবর বাজেয়াপ্তকারী কর্ম্মচারিগণের নিকটে উপস্থিত হইতে, এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে অমনোযোগ করিয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, ঐ সকল দলীল আমাদের নিকট পঠিত হইয়াছে, কিন্তু তদ্দৃষ্টে বোধ হয় না যে,

তাহা এক্ষণকার বিরোধীয় সম্পত্তি সম্বন্ধীয়, এবং এ বিষয় সম্বন্ধে যদি সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া যায়, তবেই কেবল আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি। তাহা না পাওয়াতে আমরা তাহা গ্রহণ করিলাম না, এবং আমরা এই বিবেচনা করি যে, অধঃস্থ জজের তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করা উচিতই হইয়াছে।

অপর, বলা হইয়াছে যে, বাজেয়াপ্তকারী কর্ম্মচারী বিরোধীয় ভূমিসকল কর সংস্থাপিত হইবার যোগ্য বলিবার পূর্ব্বে, ১৮১৯ সালের ২ য়ম কানুনের ৭ ধারামতে তদন্ত করেন নাই। আমরা বিবেচনা করি যে, দশসালা বন্দোবস্তের সময়ে উক্ত সম্পত্তির কি অবস্থা ছিল, তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইলে, বাদীই দখীলকার থাকাতে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে বাজেয়াপ্তের কর্ম্মচারিগণকে সাহায্য করিবার উপযুক্ত পাত্র ছিল, অতএব সে কখনই উক্ত কর্ম্মচারিগণের কার্য্য-প্রণালীর প্রতি আপত্তি করিতে পারে না। কিন্তু ১৮২৮ সালের ৩ কানুনের ১১ ধারার শব্দ দৃষ্টে আমাদের বোধ হয় যে, উক্ত তদন্তের আবশ্যক ছিল না। কমিশনর ড্যাম্পিয়ার সাহেব ১৮২৯ সালে ১৮২৮ সালের ৩ কানুনের ১৩ ধারার ২ প্রকরণের বিধান অনুসারে সুন্দরবনের সীমা ধার্য্য করেন; এবং স্বীকার করা হইয়াছে যে, এক্ষণকার বিরোধীয় ভূমি সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল এবং তাহার সামিল বলিয়া জরিপ হয়, এবং বাদী বা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ আইন-নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ মধ্যে, বা ১৮৫৪ সালের পূর্ব্বে, ঐ সীমা নির্দ্ধারণের সময় হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে কোন প্রকার দাবী উত্থাপন করে নাই। এই পক্ষগণের মধ্যে ঠিক এই প্রকারের এক মোকদ্দমা, কিন্তু সুন্দরবনের আর আর ভূমি সম্বন্ধে, যাহা বাদী তাহার জমিদারী পরগণা সাহসের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করে, প্রিবি কৌন্সিল কর্ত্তৃক ১৮৬৯ সালের ১৮ ই জানুয়ারি তারিখের রায়ে নিষ্পন্ন হয়, এবং তাহাতে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করিবার যে সকল কারণ বর্ণিত আছে তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায়ও প্রয়োগ হয়।

আমরা এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

---

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ১৮৩৬ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৬ সালের ৩১ এ আগস্টের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২৭ এ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

লাল রঙ্গপাল সিংহ (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেঃ, আর, টি, এলেন এবং বাবু নীলমাধব সেন আপেলাণ্টের উকীল।

মেঃ, জি, সি, পল বারিষ্টর এবং আর ই, টুইডেল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—তমাদীর আইন প্রয়োগার্থে ইংরেজী পঞ্জিকা অনুসারে মিয়াদের কাল গণনা করিতে হইবে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—আমার স্পষ্ট মত এই যে, এ মোকদ্দমা এই হেতুবাদে ডিস্‌মিস্ হইবে যে, তাহা তমাদী দ্বারা বারিত। বাদী ১৮৬৩ সালের প্রারম্ভে যে এক হস্তী বিক্রয় করে তাহার মূল্যের দাবীতে নালিশ করে। এই নালিশ ১৮৬৬ সালের ৩ রা জুলাই তারিখে উপস্থিত হয়। বাদী তমাদীর আপত্তি খণ্ডনার্থে প্রতিবাদীর স্বাক্ষরিত রসিদ স্বরূপে ফসলী ১২৭০ সালের ৮ ই আষাঢ় মোতাবেক ১৮৬৩ সালের

৯ ই জুন তারিখের এক স্বীকার-পত্র দাখিল করে; তাহাতে এই লেখা আছে যে, "হস্তীর মূল্য সম্বন্ধে বলা যাইতেছে যে, উক্ত মূল্য কিঞ্চিৎ কাল পরে দেওয়া যাইবে।" উক্ত পত্রের তারিখ হইতে এই মোকদ্দমার আরম্ভ পর্য্যন্ত (যাহা ১৮৬৬ সালের ৩ রা জুলাই তারিখে হয়) তিন বৎসরের অধিককাল অতীত হইয়াছে। কিন্তু বাদী বলে যে, ফসলী সালের গণনা অনুসারে উক্ত পত্র ১২৭০ সালের ৮ ই আষাঢ় তারিখযুক্ত; এবং এই মোকদ্দমা ১২৭৩ সালের ৫ ই আষাঢ় তারিখে (১৮৬৬ সালের ৩ রা জুলাই) উপস্থিত হওয়ায়, ফসলী সালের গণনা অনুসারে হিসাব করিলে এ মোকদ্দমা তিন বৎসরের মধ্যেই উপস্থিত হইয়াছে। ফসলী ১২৭৩ সালের আষাঢ় মাস, ১২৭০ সালের আষাঢ়ের পরে পড়িবার কারণ এই যে, ১২৭৩ ফসলী সালে দুই জ্যৈষ্ঠ মাস (প্রথম এবং দ্বিতীয় জ্যৈষ্ঠ) ছিল, কিন্তু ফসলী ১২৭০ সালে দুই শ্রাবণ মাস ছিল।

ইংরেজী পঞ্জিকামতে এবং দিন গণনা করিয়া উক্ত পত্র লেখার তারিখ হইতে মোকদ্দমা উপস্থিতের তারিখ পর্য্যন্ত ১১২০ দিন হওয়ায়, উক্ত পত্র-লিখিত ঋণ স্বীকারের তারিখ হইতে তিন বৎসর অন্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের মত এই যে, তমাদীর আইন কার্য্য-বিধির আইন বিধায়, কি হিসাবে মিয়াদ গণনা করিতে হইবে তাহা দেখিতে যে আদালতে দাবী উপস্থিত হয়, সেই আদালতের কার্য্য-প্রণালী যে পঞ্জিকা দৃষ্টে এবং যে হিসাবে গণনা করা হয়, তাহাই ধরিতে হইবে, এবং তাহা আমরা বোধ করি ইংরেজী পঞ্জিকা দৃষ্টেই হইয়া থাকে।

১৪ আইনের এক স্থলে অর্থাৎ ৮ ধারাতে ইংরেজী পঞ্জিকা ভিন্ন অন্য প্রকারে মিয়াদ গণনা করিবার বিধি আছে। যে স্থলে বণিকদিগের মধ্যে পরস্পর খাতা থাকে, তাহার বাকী আদায়ের নালিশে কি প্রকারে বৎসর গণনা করিতে হইবে, অর্থাৎ ঐ সকল খাতার সহিত ঐক্য করিয়া গণনা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ঐ ধারায় বিশেষ বিধান থাকায় তদ্দ্বারাই প্রকাশ পায় যে, যে সকল স্থলে তমাদীর মিয়াদ গণনা করিতে ইংরেজী সাল ভিন্ন অন্য কোন সাল ধরিতে হইবে, তাহাতে ব্যবস্থাপক সমাজ স্পষ্ট বিধানই করিয়াছেন। আমাদের মতে, তমাদীর আইনে যে মিয়াদ লিখিত হইয়াছে, তাহা ফসলী সালে এক মাস অধিক হওয়ায় বর্দ্ধিত হইতে পারে না।

তিন বৎসরে ১০৯৫ দিন হয়, বা ঐ তিন সনের মধ্যে কোন সনে ফেব্রুয়ারি মাসের এক দিন বাড়িলে জোর ১০৯৬ দিন হইতে পারে। উপস্থিত মোকদ্দমায় উক্ত স্বীকারের পত্র লেখার তারিখ হইতে ১১২০ দিবস অন্তে নালিশ উপস্থিত হয়। অতএব এ মোকদ্দমা তমাদী দ্বারা বারিত। এ প্রশ্ন জজের নিকট আপীলে বা এই আদালতে ফেরৎ পাঠাইবার পূর্ব্বে উত্থাপিত না হওয়ায় আপেলাণ্ট এই আপীলের এবং জজের নিকট ফেরৎ পাঠাইবার পরে দ্বিতীয় শুনানীর খরচা দিবে। এই মোকদ্দমা খরচা সমেত ও জজের নিকট প্রথম আপীলের খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমিও বিবেচনা করি, এই মোকদ্দমা উল্লিখিত হেতুবাদে তমাদী দ্বারা বারিত হইয়াছে, এবং আমিও আমার বিজ্ঞবর সহযোগীর সহিত একমতে বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

---

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২১৬ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই জুনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে খাবেতা আপীল।

সৈয়দ মহম্মদ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

ওমদা খানম প্রভৃতি (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং কালীমোহন দাস আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে জজ মোকদ্দমার রায় দেন, তাঁহার কর্ত্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দী এবং প্রমাণ গৃহীত না হইয়া থাকিলে, এই দোষ উভয় পক্ষের সম্মতি দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমাদের বিবেচনায় নিম্ন আদালতের রায়ই শুদ্ধ। বাদিনীর প্রদত্ত প্রমাণ এবং প্রতিবাদীর পক্ষের প্রমাণ যে পরস্পর বিপরীত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং আমাদের নিকট যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত তর্কিত হইয়াছে, তদনুযায়ী বাদিনী ও প্রতিবাদীর উভয়ের বাক্যের মধ্যেই সন্দেহ-জনক বিষয় অনেক থাকিতে পারে।

কিন্তু কমিসন দ্বারা খাজে আবদুলগণীর যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা যদি বিশ্বাস করা যায়, তবে তাহা দ্বারা বাদিনীর দাবী সংস্থাপিত হয়, এবং প্রতিবাদীর দাবীর এক কালে ধ্বংশ হয়।

সত্য বটে, ১৮৬৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রতিবাদী, প্রতিবাদীর ভ্রাতা, আবদুলগণী এবং অন্যান্যের সাক্ষাতে মৌলবী আবদুল লতীফ বাদিনীর এবং আজীজুন্নেসার স্বামীর নিকট এই প্রার্থনা করে যে, প্রতিবাদীর স্ত্রীর দেন-মোহরের প্রাপ্য হইতে প্রতিবাদীকে রেহাই দেওয়া হয়। আমাদের বিবেচনায়, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, প্রতিবাদীর স্ত্রী প্রতিবাদীর কথিত মতে তিন বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশ্য রূপে মূল চুক্তি-পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাহার স্বামীকে তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত করে।

আবদুলগণীর বাটীতে যাহা হইবার বিষয় সে বলে, এবং প্রতিবাদী যাহা আদালতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বলে, এ দুইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য দেখা যায়।

সত্য বটে, অন্নদাপ্রসাদ বাবু অত্যন্ত কৌশলের সহিত এমত সকল আনুমানিক প্রতিজ্ঞা উত্থাপন করেন, যাহা দ্বারা, উক্ত খাজে তাহার বাটীতে যে ঘটনা হইবার কথা বলে, তাহার সহিত প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় যে জওয়াবের উপর নির্ভর করে, তাহা পরস্পর ঐক্য করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল আনুমানিক প্রতিজ্ঞা সংস্থাপিত হয় নাই; এবং তাহা সত্য হইলে আবদুলগণীকেই জেরা করিয়া তাহা সংস্থাপিত হইতে পারিত, এবং অবশ্যই হইত। তাহার বাটীতে যে ঘটনা হয়, তাহার এরূপ ভাব উদ্ধারের নিমিত্ত তাহার প্রতি কোন প্রশ্ন করা হয় নাই, যে ভাবে তাহা এক্ষণে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে; অথবা ঐ সময়ে উক্ত খাজে যে দুই ব্যক্তির উপস্থিত থাকিবার কথা বলে, প্রতিবাদী উক্ত খাজের বাক্য খণ্ডন করিবার বা বুঝাইবার জন্য তাহাদের কাহাকেও সাক্ষী স্বরূপে ডাকে নাই।

আবদুলগণীর প্রতি যে সকল প্রশ্ন হয়, তাহার সে যে সকল উত্তর দেয়, তাহা যে প্রকৃত বাক্য এবং তাহা হইতে প্রতিবাদীর অনুকূল কোন ভাবোদ্ধার করা যায় না, এ সিদ্ধান্ত এড়ান সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হয়; এবং তাহা হইলে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রতিবাদীর এ বাক্যও বিশ্বাস করা অসম্ভব যে, এই ঘটনার তিন বৎসর পূর্ব্বে উক্ত কাবিন-নামা সকলের সাক্ষাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া উক্ত চুক্তি রহিত করা হইয়াছিল।

অতএব আমার বিবেচনায়, নিম্ন আদালত উক্ত কাবিন-নামা গ্রাহ্য করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহা শুদ্ধ।

যে জজ নিম্ন আদালতে রায় দিয়াছেন, তাঁহার বিচারাধিকার সম্বন্ধে এই মোকদ্দমার প্রারম্ভে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। নথী দৃষ্টে বোধ হয় যে, যে জজ সাক্ষিগণের জবানবন্দী শুনিয়া-

ছিলেন, ইনি সেই জজ নহেন; এবং আমার মনোগত ভাব এই যে, যেহেতু এ দেশের প্রথম আদালত সকলে যে সকল বাচনিক প্রমাণ দেওয়া হয় বা সংস্থাপন করা হয় তদ্দৃষ্টে, বা সেই প্রমাণার্থে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির বিশেষ বিধান অনুসারে যে সকল জবানবন্দী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা হয়, তদ্দৃষ্টে তাঁহাদিগকে অর্থি-প্রত্যর্থীর মধ্যে বিরোধীয় বিষয় মীমাংসা করিতে হয়, অতএব আমি যে প্রণালীতে প্রমাণ দাখিল করিবার কথা বলিলাম, তদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রণালীতে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয়, তদ্দৃষ্টে প্রথম আদালতের কোন জজ যে নিষ্পত্তি করেন তাহা আইন অনুসারে উচিত নিষ্পত্তি হইবে না।

কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ের মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই, কারণ, ঐ প্রকারের কোন দোষ পক্ষগণের সম্মতি দ্বারাই সংশোধিত হয়, এবং নিশ্চয়ই সর্ব্বদা এরূপ হইয়া থাকে যে, কোন বিচারপতি নিজে যে বাচনিক প্রমাণ লন নাই, এবং যাহা অন্য এক বিচারপতির নিকট গৃহীত হইয়া তাঁহার নিকট কেবল জবানবন্দীর আকারে আইসে, সেই প্রমাণ দৃষ্টে উক্ত বিচারপতি পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমার যে বিচার করেন তাহাতেই তাঁহারা সম্মত হয়; এবং এই মোকদ্দমা যখন আমাদের নিকট রীতিমত প্রণালীতে আসিয়াছে, এবং যখন প্রমাণ দৃষ্টে এমন কিছু প্রকাশ পায় না যে, যে উপায় অবলম্বিত হইয়াছে তাহাতে পক্ষগণ নিজে আপত্তি করিয়াছে, তখন বোধ করি, আমি উচিতমতে এই অনুমান করিতে পারি যে, তাহা আমাদের নিকট উচিত মতেই আসিয়াছে, এবং নিম্ন আদালতের জজ যখন এই মোকদ্দমা পক্ষগণের মধ্যে নিষ্পত্তি করেন, তখন তিনি বাস্তবিক বিচারাধিকারেই কার্য্য করিয়াছেন। পরন্তু, যে গতিকেই হউক, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি এই আপীলের যথেষ্ট হেতু হইবে, এবং যে জজ নিম্ন আদালতে রায় দিয়াছেন তিনিই যেন বাস্তবিক এ মোকদ্দমায় প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, এই ভাবে আমাদের এক্ষণে আপীল-আদালত স্বরূপে পক্ষগণের মধ্যে সদ্বিচার করিবার সম্পূর্ণ সুবিধা আছে।

এতদর্থে আমরা বিবেচনা করি যে, আমরা যে এ মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছি, তাহা আমাদের গ্রহণ করা, এবং বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় যে প্রশ্ন কেবল আদালতই উদ্ভাবনা করিয়াছেন, কোন পক্ষ-কর্ত্তৃক উত্থিত হয় নাই, তাহা না দেখিয়াই মোকদ্দমার মীমাংসা করা উচিত।

আমার বিবেচনায়, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি আমার বিজ্ঞবর সহ-যোগীর প্রস্তাবিত রায়ে সম্মত হইলাম।

আমি এ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, ভূতপূর্ব্ব জজ কর্ত্তৃক প্রমাণ গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়াই রাইট সাহেবের রায় একেবারে অকর্ম্মণ্য এবং বৃথা।

মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, প্রতিবাদীর জওয়াব একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। খাজে আবদুল গণী যাহার সত্যপরায়ণতার প্রতি আপেলাণ্টের উকীল দোষারোপ করিতে চেষ্টাও করেন নাই, তাহার সাক্ষ্য আমার নিকট চূড়ান্ত বোধ হইতেছে। যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রতিবাদীর তাহার পিতার এবং তাহার ভ্রাতার সাক্ষাতে প্রতিবাদীর ভ্রাতৃবধূ আজীজুন্নেসার অনুকূলে মৃত সাহজাদী বেগমের প্রাপ্য দেনমোহরে ঐ আজীজুন্নেসার অংশের দাবী উপস্থিত হইয়াছিল, এবং প্রতিবাদী তখন এ কথা বলে নাই যে, দেনমোহর পাওনা ছিল না, তবে সে যে এক্ষণে কাবিননামা ছিঁড়িয়া ফেলিবার কথা বলে, তাহা কাল্পনিক।

বলা হইয়াছে যে, প্রতিবাদীর ভ্রাতা তাহার

স্ত্রীর অনুকূলে তাহার উক্ত কাবিননামার অংশের দাবী উপস্থিত করিলেও, প্রতিবাদীর সাক্ষিগণ যে সময়ের কথা বলে, তখন সাহজাদী বেগম উক্ত কাবিননামা ছিঁড়িয়া ফেলা অসম্ভব নহে। কিন্তু খাজে আবদুলগণী যে সাক্ষ্য দেন, তাহার সহিত এই অনুমান একেবারে ঐক্য হয় না; এবং আমার ইহা কাল্পনিক বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে কোন সন্দেহ নাই।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইল।

( ব )

---

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং এফ বি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২১৩ নং মোকদ্দমা।

সাহাবাদের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৯ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

দীনদয়াল সিংহ প্রভৃতি ( প্রতিবাদী ) আপেলাণ্ট।

বাণী রায় ( বাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং কালীকৃষ্ণ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর, টি এলেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কালেক্টর কর্ত্তৃক ডিক্রীজারীর নীলাম প্রতারণা দ্বারা হইয়াছে বলিয়া সপ্রমাণ হইলে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক অন্যথা হইতে পারে; এমত স্থলে, যে ব্যক্তি বলে যে, প্রতারণা হইয়াছে, প্রমাণ-ভার তাহারই উপর বর্ত্তে।

বাদী বা প্রতিবাদী আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণার্থে যে সাক্ষী আবশ্যকীয় বিবেচনা করে, তাহাকে আদালতে উপস্থিত করা ও তাহার জবানবন্দী হইল কি না, তাহা দেখা ঐ বাদী বা প্রতিবাদীরই কর্ত্তব্য। এরূপ সাক্ষী উপস্থিত আছে বলিয়া নাজীর রিপোর্ট দিলেও বাদী বা প্রতিবাদীর ঐ রূপ দেখা উচিত।

বিচারপতি কেম্প।—পরগণে আড়ার অন্তর্গত মৌজা সিংহবনওয়ারীর সামিল যে ৫৭ বিঘা ১৪ কাঠা ১৪॥ ধূর "খাস্ত" জমি কালেক্টর ১৮৬৯ সালের ২৪ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে নীলাম করেন, তাহা এই হেতুবাদে অন্যথা করিয়া দখলের দাবীতে নালিশ হইয়াছে যে, প্রথমতঃ বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার আদেশ মতে রীতিমত নীলামের এস্তাহার জারী না করিয়া প্রতারণা-পূর্ব্বক নীলাম করা হইয়াছে বলিয়া তাহা অন্যথা করা উচিত; দ্বিতীয়তঃ, উক্ত বিক্রীত ভূমির উচিত মূল্য ৬০০০০ টাকা, কিন্তু প্রতিবাদী ডিক্রীদার তাহা কেবল ২৮৫ টাকায় ক্রয় করে। নালিশের আরজীতে আরো বলা হইয়াছে যে, বাদী মাল সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট প্রতিকারের প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা এই হেতুবাদে তাহাকে কোন প্রতিকার প্রদান করিতে পারেন নাই যে, তাহার দরখাস্ত আইন-নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ মধ্যে করা হয় নাই।

প্রতিবাদী বাদীর নালিশের বাধাজনক অনেক ইসু উত্থাপিত করে, যাহার সম্বন্ধে তাহার উকীল এই আদালতে কোন তর্ক করেন নাই, এবং তাহা সে বাস্তবিক ছাড়িয়া দিয়াছে।

দোষগুণ সম্বন্ধে, বাদী উক্ত জমির যে মূল্য ধরে তাহা প্রতিবাদী স্পষ্টই অস্বীকার করে। আরো বলা হয় যে, অবিকল আইন অনুসারে এবং কোন প্রতারণা ব্যতীত উপযুক্ত এস্তাহার প্রচার এবং জারী করিয়া নীলাম হইয়াছিল।

সাহাবাদের প্রথম অধঃস্থ জজ যিনি এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, তিনি বাদীকে ডিক্রী দিয়াছেন। তাঁহার মত এই যে, বাদীর উপরেই এই প্রমাণের ভার বর্ত্তে যে, আইন অনুযায়ী এস্তাহার রীতিমত জারী হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার বিধান অনুসারে নীলামের পাঁচ খানা স্বতন্ত্র এস্তাহার জারীর আবশ্যক। তিনি বলেন, তাহার তিন

খানা অর্থাৎ যে খানা জেলার কালেক্টরীতে লটকাইয়া দিতে হইবে, যে খানা যে জমি বিক্রয়ার্থে বিজ্ঞাপন হয় তাহাতে লটকাইয়া দিতে হইবে, এবং যে খানা নিকটস্থ গ্রামে আবশ্যক, এই তিন খানা রীতিমত জারী হয় নাই। প্রতিবাদী রীতিমত নীলামের এস্তাহার জারীর যে সকল সাক্ষী দেয়, অধঃস্থ জজ তাহাদের সাক্ষ্য বিবেচনা না করিয়াই বলেন যে, তাহারা যে প্রণালীতে এবং যে ভাবে সাক্ষ্য দেয়, তাহাতে তাহারা প্রতিবাদিগণের "মিথ্যা এবং শিক্ষিত লোক" প্রকাশ পায়। অতএব তিনি এই সাক্ষিগণের সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। পক্ষান্তরে, তিনি বলেন যে, বাদীর সাত জন সাক্ষী সম্ভ্রান্ত লোক ও তাহাদের বাক্য পরস্পর ঐক্য এবং বিশ্বাস্য; তাহারা উক্ত ভূমিতে বা গ্রামে কোন এস্তাহার জারী না হইবার বিষয় যথেষ্ট রূপে সংস্থাপন করে; বাদী ফসলী ১২৭৫ সালের ১৪ ই এবং ১৫ ই মাঘে যখন উক্ত ভূমিতে ও গ্রামে এস্তাহার জারী হইবার বিষয় বলা হয়, তখন ঐ গ্রামে আপন বাটীতে ছিল; এমত অবস্থায় বাদী যখন তাহার বাটীতে ছিল, তখন ঐ সকল এস্তাহার বাস্তবিক জারী হইলে, নীলাম হওয়ার সংবাদ পাইয়া সে যে এত অল্প মূল্যে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইতে দিবে তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব অধঃস্থ জজের এই মত হয় যে, বাদীর সম্পত্তি তাহার অনবগতিতে নীলাম হয়; সুতরাং তাহাতে সে নীলামের সংবাদ পাইবার বিধিমত উপায় এবং সময় পায় নাই, এবং তাহাতেই সে মোজাহেম দিয়া ডিক্রীর টাকা পরিশোধ করিয়া নীলাম ক্ষান্ত করিতে পারে নাই। অধঃস্থ জজ এই সকল কারণে উক্ত নীলাম অন্যথা করিয়া বাদীকে ডিক্রী দেন।

এ বিষয়ে কোন আপত্তি নাই এবং বাস্তবিক উভয় পক্ষের উকীলই স্বীকার করেন যে, কোন কালেক্টর ডিক্রীজারীতে যে নীলাম করেন তাহা প্রতারণাপূর্ব্বক হইয়াছে এমত দেখাইতে পারিলে দেওয়ানী আদালত তাহা অন্যথা করিতে পারেন। প্রথমতঃ আমাদের বোধ হয় যে, অধঃস্থ জজের ইহা স্থির করা স্পষ্ট অন্যায় যে, প্রতারণা না হওয়ার বিষয় সপ্রমাণ করিবার ভার প্রতিবাদীর উপর ছিল। বাদী যে প্রতারণা হওয়ার কথা বলে, বাদীই তাহা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য ছিল। অধঃস্থ জজ এ মোকদ্দমা এমত ভাবে ব্যবহার করেন যেন নীলাম করিতে অনিয়ম হইলেই তাহাতে বাদীর কোন প্রকৃত হানি হউক বা না হউক, নীলাম দূষিত হইবে। উভয় [বাদি-প্রতিবাদীর সমস্ত প্রমাণ আমাদের নিকট পঠিত হইয়াছে এবং উভয়পক্ষের উকীল তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিয়াছেন, এবং আমরা দেখিতে পাই যে, প্রতিবাদীর প্রদত্ত সাক্ষিগণের ভাবভঙ্গী সম্বন্ধে অধঃস্থ জজ যাহা বলেন তাহার কোন কোন স্থল একেবারে বুঝা যায় না, এবং কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত দেখা যায়। তাহার একটি স্থল এই যে, ৪ নং সাক্ষী বন্ধু চামার যে প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং যে ঢেঁড়রা দিয়া ঘোষণা করে, তাহার সম্বন্ধে অধঃস্থ জজ বলেন যে, "উক্ত সাক্ষী সামান্য চামার।" আমাদের মতে, এই হেতুতে এ সাক্ষীর বর্ণনা অবিশ্বাস্য হয় না, কারণ, ঐ প্রকারের লোকই সচরাচর নীলামের এস্তাহার জারীর সময়ে ঢেঁড়রা দেওয়ার জন্য নিযুক্ত হয়।

তদনন্তর, বাদীর প্রমাণে তাহার সাক্ষিগণকে এই বলিতে দেখা যায় যে, তাহারা মৌজা সিংহে বাস করে, ১২৭৫ সালের ১৪ ই এবং ১৫ ই মাঘ তারিখে তাহারা ঐ গ্রামে ছিল, কিন্তু ঢোল পিটিয়া নীলামের কোন এস্তাহার জারী করিতে শুনে নাই, এবং যদি বাস্তবিকই উক্ত ভূমিতে বা তাহার নিকটে ঢোল পিটান হইত, তবে তাহারা অবশ্য শুনিত।

প্রতিবাদীর পক্ষে দীনদয়াল নিজে, যে পিয়াদা নীলামের এস্তাহার জারী করে, যে প্রকৃত ব্যক্তি

দায়ীকে দেখাইয়া দিতে যায়, যে ৭ নং সাক্ষী ঐ গ্রামবাসী লোক যাহাকে অধঃস্থ জজ উত্তম এবং ঠিক সাক্ষী জ্ঞান করেন, ও ঘোরান দাস এবং গোকুলদাস নামে ঐ গ্রামের দুই জন পাটওয়ারী এবং ঐ গ্রামের দুইজন প্রজা, ইহারা সকলে সাক্ষ্য দেয়। "এই সাক্ষিগণ স্পষ্টরূপে শপথ করিয়া বলে যে, বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ৪ ধারার আদেশ মতে রীতিমত এস্তাহার জারী হইয়াছে। ঐ পিয়াদা বলে যে, সে বাদী বাণী রায়ের বাটীতে পশ্চিম দরওজায় এস্তাহার লটকাইয়া দেয়, এবং আরো বলে যে, সে তাহা গোবর দিয়া আঁটে। ইহা কল্পিত বাক্য বোধ হয় না। উক্ত সাক্ষী আরো বলে যে, যে ভূমি-বিক্রয়ের এস্তাহার জারী হয় তথায় সে বড় এক চিপি মাটীর উপর আঁটিয়া নীলামের এস্তাহার জারী করে। এই বৃত্তান্তও আমাদের নিকট সম্ভাবনীয় বোধ হয়।

বাদীর উকীল এই বৃত্তান্তটি বিশেষ করিয়া বলেন যে, উক্ত এস্তাহার জারীর সংবাদ ঐ গ্রামের পাটওয়ারীগণ না লিখিয়া দিয়া অনন্তলাল লিখিয়া দেয়। কিন্তু এই ঘটনা উক্ত পাটওয়ারীগণের সাক্ষ্য দ্বারা সন্তোষকর রূপে বুঝান হইয়াছে। তাহারা বলে যে, তাহারা সেই দিবস প্রাতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঐ গ্রামে ছিল বটে, কিন্তু তাহার পর তাহারা কার্য্যান্তরে অন্যত্রে যায়, সুতরাং উক্ত রিটর্ণ লিখিয়া দিতে পারে নাই। বাদী তাহার জবানবন্দীতে বলে যে, সে সেই দিবস অথবা সমুদায় মাঘ মাসে অনন্তলালকে ঐ গ্রামে দেখে নাই; সে জানিত না, অনন্তলাল মাঘ মাসে কোথায় ছিল। কিন্তু সে তাহার পরেই স্বীকার করে যে, উক্ত গ্রামের যে এক বাটোয়ারা সেই সময়ে হইতেছিল তাহার সহিত অনন্তলালের কিছু সম্বন্ধ ছিল; এবং ঐ বাটোয়ারা অগ্রহায়ণ মাসে আরম্ভ হয় এবং ফাল্গুণের পূর্ব্বে শেষ হয় না। অতএব ইহা অতি সম্ভব যে, অনন্তলাল যে সময়ের কথা বলে সে তখন মৌজা শিংহে থাকিয়া উক্ত বাটোয়ারা দেখিতেছিল, যাহা মাঘের শেষে অথবা ফাল্গুণের প্রথমে ভিন্ন সমাপ্ত হয় নাই।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল এলেন সাহেব আমাদের মতে এই সকল কথার উত্তরে কিছুই সংস্থাপন করেন নাই। তিনি আদালতের অনুগ্রহের প্রার্থনা করেন, এবং প্রতিবাদীর সামাজিক অবস্থার সহিত বাদীর মর্য্যাদার তুলনা করেন, এবং বলেন যে, প্রতিবাদী এক দরিদ্র প্রজা, এবং বাদী বৃহৎ জমিদার। এলেন সাহেব তাঁহার তর্কের মধ্যে যে নজীর দর্শান, তাহা ১ বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের* ৫৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। * আমরা উক্ত নজীর পড়িয়াছি, কিন্তু তাহা আমাদের বিবেচনায়, উপস্থিত মোকদ্দমায় একেবারেই প্রয়োগ হয় না। উক্ত মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি দর্শান যে, ইংলণ্ডে ডিক্রীজারীর দুই প্রণালী আছে :—একটি দ্বারা সম্পত্তি ডিক্রীদারকে দেওয়া হয় যে, সে তাহার কর আদায় করিয়া আপন ডিক্রীর প্রাপ্য গ্রহণ করে; এবং অপরটি দ্বারা সেরিফকে প্রতিবাদীর বিত্ত ও বস্তু ক্রোক এবং নীলাম করিয়া টাকা আদায় করিতে আদেশ করা হয়। প্রধান বিচারপতি তদনন্তর বলেন যে, "শেষোক্ত "প্রণালীতে নীলামের এক মোকদ্দমায় কমন "প্লির আদালতে স্থির হয়, এবং তর্কের পর "কিংস বেঞ্চ আদালত ভ্রম বশতঃ সংস্থাপন "করেন যে, কোন ডিক্রী অনুসারে নিষ্কপট "ক্রেতার নিকট যে বিক্রয় করা হয়, পরে উক্ত "ডিক্রী অন্যথা হইলে, তাহার কোন ক্ষতি হয় "না। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীমতে ডিক্রীদারকে "সম্পত্তি দেওয়া স্বতন্ত্র কথা, এবং এই স্থির "হয় যে, উক্ত ডিক্রী অন্যথা হইলেই বাদীর "ঐ স্বত্বের লোপ হয়।" উপস্থিত স্থলে ডিক্রীদারকে ঐ সম্পত্তি দেওয়া হয় নাই যে, সে কর

* ৩ য় ভাগ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ১৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

আদায় করিয়া তাহার ডিক্রী পরিশোধ করিয়া লইতে পারে। পক্ষান্তরে, উক্ত সম্পত্তির নীলামের বিজ্ঞাপন হয়, যথার্থই নীলাম হয়, এবং ডিক্রীদার তাহা ক্রয় করে। ডিক্রীদার প্রথমে যে ডিক্রী পায় তাহা আপীলে রূপান্তরিত হইয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু ঐ ক্রয় সরল অন্তঃকরণে হইয়া থাকিলে উক্ত রূপান্তরের দ্বারা ঐ নীলামের সিদ্ধতার কোন ব্যাঘাত হয় না। এ মোকদ্দমায় দেখান হইয়াছে এবং প্রতিবাদীর দাবীর সরলতা সম্বন্ধে বলিতে হইবে যে, তাহার (প্রতিবাদীর) ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০৫ ধারা অনুসারে দায়ীকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। যে অধীন স্বত্ব বিক্রয়-যোগ্য, তাহার কর প্রাপ্য হওয়ায়, প্রতিবাদী বাদীকে গ্রেপ্তার করিবার পরওয়ানা বাহির না করিয়াই দরখাস্ত করিয়া উক্ত জমি নীলাম করাইতে পারিত।

সমুদায় মোকদ্দমা দৃষ্টে আমাদের মত এই যে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যায় এবং তাহা অন্যথা হইবে। বাদীর ইসমনবিশী লিখিত যে কএক সাক্ষীকে উক্ত ভূমির মূল্য বাদীর কথিত মতে ৬০০০ টাকা হওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে মান্য করা হয়, আমাদের নিকট তাহাদের জবানবন্দী লইবার প্রার্থনা হইয়াছে। মোকদ্দমার এই বিষয়টি অতি গুরুতর, কারণ, এমত নিঃসন্দেহই হইতে পারে যে, যে স্থলে ডিক্রীদার নিজে ক্রেতা, তাহাতে মূল্য অতি ন্যূন হইলে ডিক্রীদারের প্রতারণার অনুমান হইবে। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, বাদী যে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৬০০০ টাকা হইবার কথা বলে, ডিক্রীদার তৎপ্রতি মনোযোগ করে নাই, কারণ, সে তাহার বর্ণনা-পত্রে স্পষ্ট রূপে উক্ত বাক্য অস্বীকার করে। বাদী যে উক্ত সম্পত্তির মূল্য ৬০০০ টাকা বলে, তাহা প্রতিপন্ন করণার্থে নথীতে বাদীর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রতিবাদীর এমত প্রমাণ আছে, যাহার সহিত তাহার এই বর্ণনা ঐক্য হয় যে, প্রতিবাদী এই সম্পত্তির যে মূল্য দিয়াছে, ঐ গ্রামের অন্যান্য ভূমিও প্রায় সেই মূল্যেই বিক্রীত হইয়াছে। বাদীর যদি বাস্তবিকই উক্ত ভূমির মূল্য সম্বন্ধে আপন বাক্য সপ্রমাণ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষী মান্য করা এবং তাহাদের জবানবন্দী লওয়ান বাদীর কর্তব্য ছিল। এই মাত্র দেখা যায় যে, নাজীর রিপোর্ট করে যে, অমুক অমুক সাক্ষী উপস্থিত ছিল। ইহা নাজীর সকল স্থলেই করিয়া থাকে। বাদী বা প্রতিবাদী যে হউক, তাহার মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে যে সকল সাক্ষী দেওয়া সে আবশ্যকীয় বোধ করে, তাহাদিগকে উপস্থিত করা ও তাহাদের জবানবন্দী হইল কি না, তাহা দেখা, ঐ বাদী বা প্রতিবাদীরই কর্তব্য। এ মোকদ্দমার বাদীর তাহা করিবার সুবিধা থাকাতেও তাহা না করায় আমরা এইক্ষণে বাদীর মানিত সাক্ষিগণের জবানবন্দী লইতে মোকদ্দমা স্থগিত রাখিতে পারি না।

অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল, এবং বাদীর মোকদ্দমা বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ সমেত এই আদালতের এবং নিম্ন আদালতের খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল। (ব)

---

১৭ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং এফ, বি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ১৮৪৭ নং মোকদ্দমা।

সারণের মুনসেফের ১৮৬৮ সালের ২৫ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ১৫ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শিবযতন রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদীর মধ্যে কয়েক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

আনওর আলী (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আনন্দগোপাল পালিত, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—সফী-খলীত অর্থাৎ পথ ও জলের স্বত্বের শরীক অপেক্ষা বিক্রীত মুল সম্পত্তির শরীক অগ্রগণ্য; এবং যে মোকদ্দমায় বাদী শরীক স্বরূপে নালিশ করে, তাহাতে নিম্ন আদালতের এই ইসু উত্থাপন করা উচিত নহে যে, সে সফী-খলীত স্বরূপে দাবী করে কি না।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায়, খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস্‌ হইবে।

খাস আপীলের প্রথম হেতু পরিত্যক্ত হইয়াছে; এবং দ্বিতীয় হেতু, অর্থাৎ বিহার প্রদেশস্থ হিন্দুদিগের মধ্যে সোফার স্বত্ব প্রচালিত আছে কি না, তৎসম্বন্ধে ১ ম বালম সিলেক্‌ট রিপোর্টের ১১ পৃষ্ঠার টীকায় ১৭৯৬ সাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই আদালতের অনেক নজীর আছে যাহাতে প্রকাশ যে, বিহার প্রদেশস্থ হিন্দুরা মুসলমানের নিকট সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধ কোন নজীর আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই; বিশেষ, খাস আপীলের দরখাস্তে এই আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।

তদনন্তর তর্কিত হইয়াছে যে, প্রতিবাদী নিম্ন আদালতে যে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিল তাহা এই যে, এই মোকদ্দমা বাদী তাহার নিজের জন্য উপস্থিত করে নাই; পূর্ব্ব এক মোকদ্দমার বাদী সাবীর হোসেনের উত্তেজনায় উপস্থিত করিয়াছে; কিন্তু নিম্ন আপীল-আদালত ইহার প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। নিম্ন আপীল-আদালতের নির্দ্দেশে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা দেখা যাইতে পারে যে, ঐ আদালতে এই আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। আপীলের লিখিত হেতু সমস্তে তাহা লেখা থাকিলেই এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, জজ তাহার তদন্ত করিতে ত্রুটি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ছাড়াও, এমন কোন প্রমাণ নাই যদ্দ্বারা দেখা যাইতে পারে যে, বাদী যে তাহার শরীকের সম্পত্তি ক্রয় করার প্রাথমিক সফল কার্য্য সমাধা করিয়াছে এবং যাহার ঐ ক্রয়ে অধিক স্বার্থ ছিল, সে তাহার নিজের জন্য নালিশ উপস্থিত না করিয়া অন্য এক ব্যক্তির অনুরোধে এবং সেই ব্যক্তিরই লাভের জন্য নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

অতএব আমি খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম।

বিচারপতি কেম্প।—আমারও ঐ মত। এই মোকদ্দমায় যে সকল ইসু নির্দ্ধারিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমি কএকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। দুই অধঃস্থ জজই সম্ভ্রান্ত মুসলমান, এবং দুই জনই বিবেচনা করিয়াছেন যে, বাদী সফী-খলীত স্বরূপে দাবী করিয়াছে। প্রথম আদালতে এবং নিম্ন আপীল-আদালতেও এই ইসু হয় যে, বাদী সফী-খলীত কি না। কিন্তু বাদী সফী-খলীত অর্থাৎ পথ ও জলের স্বত্বের শরীক স্বরূপে দাবী করে নাই, শরীক অর্থাৎ বিক্রীত মুল সম্পত্তির শরীক বলিয়া দাবী করিয়াছে। বেলীর মহম্মদীয় ব্যবহারসংগ্রহে, মুল সম্পত্তির শরীক, জল ও পথের শরীক অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর গণ্য হইয়াছে। এমত বলা যাইতে পারে যে, বেলির গ্রন্থ অনুবাদ মাত্র, মুল গ্রন্থ নহে; কিন্তু ঐ সংগ্রহের ৪৭৬ পৃষ্ঠার নিম্ন ভাগে যে টিপ্পনী আছে তাহাতে লেখা আছে যে, কিসে শরীক ও কিসে সফী-খলীত হয়, তাহার ব্যাখ্যা ৪ র্থ বালম হেদায়া হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, পক্ষগণ যে ভাবে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে যে ইসু উত্থাপিত হয় নাই তাহা নিম্ন আদালতদ্বয়ের উত্থাপন করা উচিত ছিল না।

নির্দ্দিষ্ট বৃত্তান্ত দৃষ্টে আমিও বিবেচনা করি যে, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইবে। (গ)

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৭৫০ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের মুনসেফের ১৮৬৮ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য অতিরিক্ত জজ ১৮৬৯ সালের ৩০ এ এপ্রিলে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গিরিশচন্দ্র রায় প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

ভগবানচন্দ্র রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীমোহন দাস ও কাশীকান্ত সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—আইনের চক্ষে প্রজার দখলই তাহার ভূম্যধিকারীর দখলের তুল্য।

মৌরসী পাট্টার ন্যায় দলীল সমস্ত সাক্ষীর দ্বারা তজদীক করার আবশ্যক নাই।

যখন কোন দলীলের অকৃত্রিমতা সাব্যস্ত করিতে হয়, তখন লেখকের অথবা যে ব্যক্তি ঐ কাগজ লিখিতে বা দস্তখত করিতে দেখিয়াছে তাহার সাক্ষ্যই এক মাত্র প্রমাণ নহে। হস্তাক্ষরের ঐক্যতার প্রমাণও তজদিকী সাক্ষীর সাক্ষ্যের ন্যায় তুল্যরূপে গ্রাহ্য।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—এই মোকদ্দমার বাদিগণ ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে বাকী খাজানার জন্য রাইয়ত-প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে নালিশ করে, কিন্তু ঐ আইনের ৭৭ ধারা মতে ওজরদার-প্রতিবাদিগণ ঐ নালিশের প্রতি আপত্তি করে। ডেপুটি কালেক্টর বাদিগণকে ডিক্রী দেন; কিন্তু ওজরদার প্রতিবাদিগণের আপীলে কালেক্টরের যে এক মাত্র প্রশ্নের বিচার করার অধিকার ছিল, অর্থাৎ ওজরদারেরা বাস্তবিক খাজানা পাইত এবং ভোগ করিত কি না, তৎসম্বন্ধে যদিও কালেক্টরের মতে ওজরদার প্রতিবাদিগণ তাহা পাওয়া ও ভোগ করা সপ্রমাণ করিতে বা তাহা পায় ও ভোগ করে বলিয়া কহিতেও পারে নাই, তথাপি তিনি ডেপুটি কালেক্টরের ডিক্রী অন্যথা করিয়াছেন। অতএব বাদিগণ তাহাদের দখল স্থির রাখার জন্য বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, এবং প্রতিবাদী উদয়চাঁদ রায় বাঙ্গালা ১২৫২ সালে প্রতিবাদিগণের মৃত পিতাকে যে মৌরসী পাট্টা দেয় তাহার উপরে তাহারা আপনাদের স্বত্ব স্থাপন করে।

ওজরদার প্রতিবাদিগণ জওয়াব দেয় যে, বাদিগণ কখন দখীলকার ছিল না, এবং প্রতিবাদী উদয়চাঁদ কখনও বিরোধীয় ভূমির সম্পূর্ণ মালিক ছিল না, এবং তাহারা অর্থাৎ ওজরদার প্রতিবাদিগণ উক্ত উদয়চাঁদের সহিত এজমালীতে স্বত্ববান ছিল, এবং উদয়চাঁদের তাহাতে যে সকল স্বত্ব ছিল, তাহা তাহারা ক্রয় করিয়াছে, এবং উদয়চাঁদ কথিত মৌরুসী পাট্টা দস্তখত করার তারিখে নাবালগ ছিল, এবং ইহা সম্ভব নহে, যে, নাবালগী অবস্থায় উদয়চাঁদ এই পাট্টা দস্তখত করিয়াছে।

প্রতিবাদী উদয়চাঁদ রায় এবং রাইয়ত প্রতিবাদিগণও ওজরদার প্রতিবাদি গণের জওয়াবের পোষকতা করে।

যে মুন্সেফ প্রথমে এই মোকদ্দমার বিচার করেন, তিনি বাদিগণকে ডিক্রী দেন, কিন্তু ওজরদার প্রতিবাদিগণের আপীলে জজ সেই ডিক্রী অন্যথা করিয়াছেন।

আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমার তদন্তে জজের কয়েকটি ভ্রম হইয়াছে, এবং এই সকল ভ্রমের দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারে ভ্রম হইয়া থাকিতে পারে।

প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে, জজ এই বিবেচনা করিয়া ভ্রম করিয়াছেন যে, খাজানার নালিশে বাদিগণ অকৃত-কার্য্য হওয়ায় উপস্থিত নালিশ চলিতে পারে না, কারণ, ইহা কেবল দখল স্থির রাখার জন্য নালিশ। ইহা সকলেই স্বীকার

করিয়াছে যে, কেবল রাইয়ত প্রতিবাদিগণই বিরোধীয় ভূমির বাস্তবিক দখীলকার। বাদিগণ কহে যে, ঐ সকল প্রতিবাদী তাহাদের প্রজা, অতএব তাহারা তাহাদের নিকট খাজানা আদায় করিতে স্বত্ববান্। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, বাদিগণ এখনও দখীলকার আছে, কারণ, আইন মতে, প্রজার দখলের দ্বারাই তাহার ভূম্যধিকারীর দখল হয়। ইহা সত্য বটে যে, কালেক্টর বাদীর খাজানার দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ওজরদার প্রতিবাদিগণ ইহা দেখাইতে পারে নাই যে, তাহারা বাস্তবিক ঐ খাজানা পাইয়া ও ভোগ করিয়া আসিয়াছে। জজ বলেন যে, কালেক্টরের নিষ্পত্তির তারিখ হইতে বাদিগণ যে, খাজানা আদায় করিয়াছে তাহা তাহারা দেখাইতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তিনি এমন বৃত্তান্তের নির্দ্দেশ করেন নাই যে, ওজরদার প্রতিবাদিগণ তাহা করিয়াছে। বাদিগণ তাহাদের দখল স্থির রাখার প্রার্থনায় কেবল এই প্রকার নির্ণায়ক ডিক্রীর প্রার্থনা করিয়াছে যে, প্রতিবাদিগণ তাহাদের প্রজা এবং তাহাদের নিকট তাহারা খাজানা আদায় করিতে স্বত্ববান্; এবং যদি আরজীর কথা সমস্ত বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহারা কি জন্য ঐ প্রকার নির্ণায়ক ডিক্রী পাইবে না, তাহার কোন কারণ নাই। রাইয়ত প্রতিবাদিগণ বাদিগণের স্বত্ব অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে; কিন্তু যদি বাদিগণ এখনও তাহাদিগকে তাহাদের প্রজা বলিয়া ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করে ও প্রস্তুত থাকে, তবে প্রজাদিগকে অথবা ওজরদার প্রতিবাদিগণকে ইহা বলিতে দেওয়া যাইতে পারে না যে, ঐ অস্বীকারের দ্বারা প্রজা-স্বত্বের লোপ হইয়াছে।

অনন্তর, বাদী যে সকল বাচনিক সাক্ষ্য দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জজ একটি গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "বাদী যে কয়েক "খানা চালান ও কবুলিয়ৎ দাখিল করিয়াছে, "তদ্দ্বারা এবং তাহার সাক্ষিগণের বাচনিক "সাক্ষ্যে দেখা যাইতেছে যে," বাদী কোন না "কোন সময়ে এবং আদালত যত দূর দেখিতে- "ছেন, তাহাতে সময়ে সময়ে দখীলকার ছিল।" এই কথা বিশুদ্ধ নহে। বাদীর সাক্ষিগণকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে কি না, খাস আপীলে সেই প্রশ্নের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই; কিন্তু আমি ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তদ্বিষয়ে কি জন্য মুন্সেফের রায় অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যদি ঐ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করা যায়, এবং জজ যে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এমত জজের নিষ্পত্তিতে দৃষ্ট হয় না, তবে বাদিগণ যে কেবল এই দেখাইয়াছে যে, তাহাদের পিতা এবং তাহার মৃত্যুর পরে তাহারা নিজে গত ২২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত মৌরুসীদার সূত্রে দখীলকার আছে, এমত নহে; কিন্তু তাহারা ইহাও দেখাইয়াছে যে, রাইয়ত প্রতিবাদিগণ তাহাদের প্রজা এবং প্রতিবাদী উদয়চাঁদ রায় যে এইক্ষণে ওজরদার প্রতিবাদীর পোকষতা করিতেছে, সে পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া আসিয়াছে যে, প্রতিবাদিগণের পিতাকে সে এক মৌরুসী পাট্টা দিয়াছে। অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদীর সাক্ষিগণ যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে জজ ভ্রম করিয়াছেন, এবং এই মোকদ্দমা নূতন নিষ্পত্তির জন্য তাঁহার নিকট পুনঃপ্রেরিত হইবে।

তর্কিত হইয়াছে যে, যেহেতু যে মৌরুসী পাট্টা বাদিগণের স্বত্বের মূল, তাহার দস্তখতী সাক্ষিগণকে বাদিগণ হাজির করে নাই, অতএব অতিরিক্ত তদন্তের জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করা বৃথা। আমার বিবেচনায়, এই তর্ক অকর্ম্মণ্য। এই প্রকার দলীল সমস্তের দস্তখতের সাক্ষী যে আবশ্যক, এমন কোন আইন নাই, অতএব দস্তখতের সাক্ষী হাজির না করিলেই

যে, দলীলের বৈধতা সাব্যস্ত হইবে না, এমন কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। ইংলণ্ড দেশেও স্পষ্ট আইনানুসারে যে সকল দলীলের দস্তখতের সাক্ষীর আবশ্যক, কেবল সেই সকল দলীলেরই দস্তখতী সাক্ষীদিগকে হাজীর করিতে হয়, এবং আইনের এক স্পষ্ট বিধান আছে যে, অন্যান্য দলীল সম্বন্ধে এ প্রকার সাক্ষী নিতান্তই আবশ্যকীয় নহে। মেং টেলর তাঁহার প্রমাণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের ২ য় বালমের ১৫৪০ পৃষ্ঠায় কহিয়াছেন যে, "পূর্ব্বে "এই বিধি প্রচলিত ছিল যে, যদি কোন দলীল "দাখিল হইলে দেখা যাইত যে, তাহার দস্ত- "খতের সাক্ষী আছে, তবে অন্ততঃ তাহার "এক জন সাক্ষীকে ঐ দলীল দস্তখত হওয়ার "কথা সপ্রমাণ করার জন্য তলব করিতে হইত, "কিন্তু এই বিধির দ্বারা ক্রমাগত কয়েক বৎ- "সর পর্য্যন্ত অনেক অবিচার হওয়াতে তাহা "পরিশেষে ব্যবস্থাপকগণের দ্বারা রদ হইয়াছে। "কমন্ লর কার্য্য-বিধির ১৮৫৪ সালের আইনে "অন্যান্য উৎকৃষ্ট বিধানের মধ্যে লেখা আছে "যে, 'যে সকল দলীল বৈধ হওয়ার জন্য দস্ত- "খতের সাক্ষীর প্রয়োজন নাই, সেই সকল "দলীল সপ্রমাণ করার জন্য দস্তখতের সাক্ষী "হাজির করার আবশ্যক নাই, এবং এই "প্রকার দলীল সমস্ত দস্তখতের সাক্ষী দ্বারা "অথবা দস্তখতের সাক্ষী যেন ছিল না এমত "ভাবে অন্য সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিতে "হইবে'।" ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যখন কোন দলীল দাখিল হয়, এবং তাহার অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ করার আবশ্যক হয়, তখন স্বয়ং লেখককে অথবা যে ব্যক্তি সেই কাগজ লিখিত অথবা স্বাক্ষরিত হইতে দেখিয়াছে তাহাকে উপস্থিত করাই তাহা সপ্রমাণ করার অতি সহজ উপায়। কিন্তু যদিও এমন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর অভাব হইলে এবং তাহার অভাব হওয়ার কারণ আদালতের সন্তোষজনক রূপে প্রদর্শিত না হইলে, প্রবঞ্চকতার অনুমান হইতে পারে, তথাপি আইন-সঙ্গত রূপে এমত বলা যাইতে পারে না যে, কেবল ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ভিন্ন তাহা সপ্রমাণ হইতে পারে না। উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদিগণ প্রথম আদালতে যে দরখাস্ত দেয় তাহাতে তাহারা বলে যে, বিরোধীয় মৌরুসী পাট্টার দস্তখতী সমুদায় সাক্ষীরই মৃত্যু হইয়াছে, অতএব এমত বলা নিঃসন্দেহই অন্যায় যে, "কি জন্য পাট্টার দস্তখতী সাক্ষীদিগকে অথবা লেখককে উপস্থিত করা হয় নাই, তাহার কোন হেতু ব্যক্ত হয় নাই।" ইহা সত্য বটে যে, দস্তখতী সাক্ষীদিগের মৃত্যু হওয়ার কথা আইন-সঙ্গত রূপে বাদিগণের সপ্রমাণ করা উচিত ছিল, কিন্তু যে সকল উকীল মুন্‌সেফের আদালতে ওকালতী করেন তাঁহাদের নিকট এত দূর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না, এবং আমি মুন্‌সেফের নিষ্পত্তিতে দেখিতেছি যে, তাঁহার সমক্ষে পাট্টার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে বিশেষ তর্ক উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জজ ভ্রমাত্মক রূপে অনুমান করিয়াছেন যে, দস্তখতী সাক্ষী উপস্থিত না করার যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হয় নাই, এবং তিনি যদি এই ভ্রম না করিতেন, তবে যে, তিনি ঐ সকল সাক্ষীর মৃত্যুর বিষয়ে প্রমাণ দাখিল করিতে দিতেন না, এমত বলা দুঃসাধ্য।

ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, নথীতে এমন অন্য কোন প্রমাণ নাই, যদ্দ্বারা জজ নির্দ্দেশ করিতে পারেন যে, বিরোধীয় পাট্টা অকৃত্রিম দলীল। এই তর্কও শুদ্ধ নহে। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, বাদিগণের দাখিলী বাচনিক সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে, তদ্দ্বারাই তাহাদের মোকদ্দমার সকল আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত পর্য্যাপ্ত রূপে সপ্রমাণ হয়, অতএব ঐ সকল বৃত্তান্ত হইতে আদালত কি জন্য পাট্টার অকৃত্রিমতা অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন না, তাহার কোন কারণ আমি দেখি না। এমত বলা যাইতে পারে যে, ঐ সকল বৃত্তান্তে এমন কিছু নাই।

যাহার সহিত বাদিগণের দাখিলী দলীলের কোন সম্পর্ক আছে; কিন্তু আইন মতে এই প্রকার সম্পর্কের নিতান্তই আবশ্যক আছে কি না, তদ্বিষয়ে কোন মত ব্যক্ত না করিয়াও আমার বোধ হয় যে, অন্ততঃ ঐ বিষয়ের কিঞ্চিৎ প্রমাণ আছে। বাদিগণ কহিয়াছিল যে, পাট্টার দস্তখত এবং তাহার সমুদায় প্রতিবাদি-উদয়চাঁদের নিজের হস্তে লিখিত, অতএব তাহারা তাহাকে আপনাদের পক্ষে সাক্ষী মান্য করে। উদয়চাঁদ জবানবন্দী দেয়, এবং যদিও সে পাট্টা দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, কিন্তু ঐ লেখা যে ঠিক তাহার হাতের লেখার অনুরূপ ইহা সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। হস্তাক্ষরের সাদৃশ্যের প্রমাণ আমাদের আদালত সমস্তে গ্রাহ্য, এবং আইনে এই প্রমাণের সহিত যে সকল সাক্ষী দলীল লিখিতে দেখে, তাহাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের কোন প্রভেদ নাই। মেং টেলর ২ য় বালমের ১৫৫৫ পৃষ্ঠায় বলেন যে, "যখন এই প্রকার প্রমাণ "(অর্থাৎ দলীলের প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য) "পাওয়া না যায়, তখন যে সকল ব্যক্তি "বিরোধীয় দলীল লেখকের হস্তাক্ষর অবগত "থাকে, তাহাদের সাক্ষ্য লওয়া যাইতে "পারে, অথবা অন্য যে কোন লিপি অকৃ-"ত্রিম বলিয়া জজের সন্তোষকর রূপে সপ্র-"মাণ হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধীয় দলীল "ঐক্য করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত "প্রকারের প্রমাণ সকল মোকদ্দমায়ই প্রথমে "প্রদর্শন করা যাইতে পারে, কারণ, আইন-"মতে তাহার সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের কোন "প্রভেদ নাই।"

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে হস্তাক্ষরের সাদৃশ্যের প্রমাণ ও দস্তখতী সাক্ষিগণের সাক্ষ্য তুল্য। অতএব ইহা কখন বলা যাইতে পারে না যে, এই মোকদ্দমার নথীতে এমন কোন প্রমাণ নাই যাহার উপরে নির্ভর করিয়া জজ নির্দ্দেশ করিতে পারেন যে, বাদিগণের দাখিলী পাট্টা অকৃত্রিম। আমি ইহা স্বীকার করি যে, কেবল হস্তাক্ষরের সাদৃশ্যের প্রমাণ অতি দুর্ব্বল; কিন্তু যে স্থলে উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় সেই প্রমাণ অন্য বৃত্তান্ত দ্বারা প্রতিপোষিত হয়, সে স্থলে কি জন্য জজ তাহা পর্য্যালোচনা করিবেন না, তাহার কোন কারণ আমার দৃষ্ট হয় না। ইহা সত্য বটে, যে কয়েকটি ইংলণ্ডীয় মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যখন কোন সাক্ষীকে হাতের লেখা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ডাকা যায়, তখন তদ্বিষয়ে তাহার কি বিশ্বাস তাহা তাহার ব্যক্ত করা উচিত; অতএব এমত তর্ক হইতে পারে যে, প্রতিবাদী উদয়চাঁদ রায় হাতের লেখার ঐক্যতা বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহা গ্রাহ্য নহে, কারণ, সে, স্পষ্ট বাক্যে শপথ করিয়া বলিয়াছে যে, ঐ লেখা, তাহার হাতের লেখা নহে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ইংলণ্ডেও এই বিষয়ে মতের অনেক অনৈক্যতা আছে, অতএব প্রতিবাদী উদয়চাঁদের কথার এক ভাগ অবিশ্বাস্য বলিয়া অগ্রাহ্য করত আদালত তাহার অন্য ভাগ কি জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যখন কোন পটু সাক্ষী শপথ করিয়া বলে যে, তাহার বিশ্বাস এই যে, বিরোধীয় লেখা অমুক ব্যক্তির হস্তের লেখা, তখন সেই লেখা তাহার বিবেচনায় ঐ ব্যক্তির লেখার সদৃশ, এই কথা ভিন্ন সে আর কিছু বলে না, এবং যখন এক লেখার সহিত অন্য লেখার তুলনা করা যায়, তখন আদালতকেও অন্য কিছু বলা হয় না। এমত অবস্থায় যখন স্বীকৃত অন্য কোন অকৃত্রিম কাগজ অথবা দলীলের লেখার সহিত বিরোধীয় পাট্টার লেখা ঐক্য করিলে তুল্য ফলই হইত, তখন হস্তাক্ষরের ঐক্যতার প্রমাণ সম্বন্ধে আদালত কি জন্যে প্রতিবাদী উদয়চাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ

করিবেন না, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

এই সকল হেতুবাদে, মোকদ্দমার দোষগুণ দৃষ্টে নূতন বিচারের জন্য আমি এই মোকদ্দমা জজের নিকট পুনঃ প্রেরণ করিব।

বিচারপতি লক।—আমার সহবিচারপতি যে পুনঃপ্রেরণের হুকুম দিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। (গ)

---

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৮ সালের ৩৩৩৪ নং মোকদ্দমা।

মুরসিদাবাদের অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৩১ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৮ সালের ৭ ই নবেম্বর তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মেসার্স জার্ডিন স্কিনর এবং কোম্পানি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি, এলেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় ও মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৮ ধারার বিধানানুসারে নালিশের হেতু সমস্ত যোগ করিতে ত্রুটি হইলেই যে, ৭ ধারা-বর্ণিত দণ্ড হইবে, এমত হইতে পারে না।

স্বত্ত্ব নালিশের হেতু নহে, স্বত্ত্বের ব্যাঘাত-জনক কার্য্যই নালিশের হেতু; এবং দুই মোকদ্দমার উত্থিত স্বত্ব একই স্বত্ত্ব হইলেই যে, ঐ দুই নালিশ একই হেতুর উপরে উপস্থিত হওয়া গণ্য হইবে, এমত নহে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—এই মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭ ধারার বিধান মতে বারিত কি না, এই খাস আপীলে তাহাই এক মাত্র বিচার্য্য প্রশ্ন।

আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতদ্বয় যে সকল বৃত্তান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এমন প্রচুর নহে যে, তদ্দ্বারা আমি এই বিষয়ের সন্তোষকর নিষ্পত্তি করিতে পারি।

পূর্ব্ব নালিশ উপস্থিত করার কালে বিরোধীয় ভূমির কতক অংশ বর্ত্তমান ছিল, এ কথা কোন পক্ষেই আবশ্যকীয় নহে, কারণ, দুই মোকদ্দমার নালিশের হেতু এক কি না, তাহাই প্রকৃত বিচার্য্য প্রশ্ন।

পূর্ব্ব মোকদ্দমা-ভুক্ত ভূমি হইতে বাদী যে তারিখে বেদখল হয়, সেই তারিখ ভিন্ন অন্য তারিখে যদি প্রতিবাদিগণ উপস্থিত মোকদ্দমা-ভুক্ত ভূমি দখল করিয়া থাকে, তবে ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এই দুই নালিশের হেতু পরস্পর স্বতন্ত্র, এবং যদিও বাদিনী ইচ্ছা করিলে এক নালিশে ঐ দুই হেতু যোগ করিতে পারিত, তথাপি সে যে আইন মতে তাহাই করিতে বাধ্য ছিল, এমত নহে। একই পক্ষের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন নালিশের হেতু যাহাতে একই আদালতের বিচারাধিকার আছে, তাহা ৮ ধারার বিধান-মতে এক নালিশে যোগ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা না করিলেই যে, ৭ ধারার লিখিত দণ্ড হইবে, এমত হইতে পারে না।

তর্কিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান নালিশ যে স্বত্ত্ব অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ঠিক সেই স্বত্ব অবলম্বন করিয়াই পূর্ব্ব মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন তারতম্য হয় না। যে স্বত্ত্বের উপরে কোন পক্ষ নির্ভর করে, তাহাই নালিশের হেতু নহে, কিন্তু তাহার ব্যাঘাত হইলেই নালিশের হেতু উত্থিত হয়। অতএব এমত বলা যাইতে পারে না যে, এক স্বত্ত্বের উপরে নির্ভর করিয়া দুই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা এক নালিশের হেতুর উপরে উপস্থিত হইয়াছে।

যেমন, মনে কর, কোন ব্যক্তির কোন এক খণ্ড ভূমি দখল করার অধিকার এক স্বত্বের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু যদি সে ঐ ভূমির ভিন্ন ভাগ হইতে ভিন্ন কার্য্যের দ্বারা বেদখল হয়, তবে ঐ প্রত্যেক বেদখলের কার্য্য এক এক পৃথক্ নালিশের হেতু হইবে। তাহা না হইলে, ঐ রূপেই তর্ক করা যাইতে পারে যে, প্রথম বেদখলের তারিখ হইতে সে কেবল এক তমাদীর কাল গণিতে স্বত্ববান্ হইবে। এক ব্যক্তি কোন বাটীর একটি ঘর হইতে এক তারিখে বেদখল হইতে পারে, এবং সেই বাটীর আর এক ঘর হইতে সে তাহার ১২ বৎসর পরে বেদখল হইতে পারে। কিন্তু যদি তাহার ঐ দুই ঘরের স্বত্ব এক প্রকার স্বত্ব বলিয়া উক্ত দুই বেদখলের কার্য্য এক নালিশের হেতু বিবেচনা করা যায়, তবে দ্বিতীয় ঘরের জন্য নালিশ করার আবশ্যক হওয়ার পূর্ব্বেই সেই নালিশে তমাদী ঘটিবে।

উপস্থিত মোকদ্দমার বৃত্তান্তে দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন দুই আদালতের এক আদালতের দ্বারাও এই বিষয়ের তদন্ত হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব মোকদ্দমায় বিরোধীয় ভূমির অংশ সম্বন্ধে ১৮৫৫ সালে, ১৮৪০ সালের ৪ আক্ট মতে এক হুকুম হয়। বাদিনী কহে যে, বর্ত্তমান মোকদ্দমায় দাবীকৃত ভূমি যাহা নূতন পয়বস্ত চর, তাহা বাঙ্গালা ১২৬৬ সালে প্রথম পয়বস্ত হয়। যদি এই কথা সত্য হয়, তবে ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান নালিশ-ভুক্ত ভূমি সম্বন্ধে বাদিনীর নালিশের হেতু, ৪ আক্টের হুকুমান্তর্গত ভূমি সম্বন্ধীয় নালিশের হেতুর সহিত একেবারে বিভিন্ন। ৪৫০ বিঘা ১১ কাঠার আর এক খণ্ড ভূমি ছিল যাহা পূর্ব্ব মোকদ্দমায় দাবীকৃত হয়। কিন্তু এই ভূমি-খণ্ড কখন্ পয়বস্ত হয় এবং তাহা হইতে বাদিনী কখন্ বেদখল হয়, তাহা কিছুতেই দৃষ্ট হয় না। প্রতিবাদিগণ যে তারিখে এবং যে কার্য্যের দ্বারা বর্ত্তমান মোকদ্দমা-ভুক্ত ভূমি দখল করে, যদি বাদিনী ঐ ৪৫০ বিঘা ১১ কাঠা ভূমি হইতে সেই তারিখে এবং সেই কার্য্যের দ্বারা বেদখল হইয়া থাকে, তবে দুই মোকদ্দমায়ই তাহার এক নালিশের হেতু হইবে, নচেৎ তাহা হইবে না।

আর এক কথারও পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। পূর্ব্ব মোকদ্দমার আরজীতে আমি দেখিতেছি যে, খাস আপেলাণ্টগণ ভিন্ন, পরেশনারায়ণ রায়, ও রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী ও মেং ডালরিম্পল প্রভৃতি অন্যান্য কয়েক ব্যক্তিকে সেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করা হইয়াছিল। অতএব ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এক খণ্ড ভূমি সম্বন্ধে ক ও খ নামক দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক নালিশের হেতু, অপর এক খণ্ড ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কেবল এক জনের বিরুদ্ধে নালিশের হেতুর সহিত এক হইতে পারে না, এবং বাদী একই তারিখে ঐ দুই খণ্ড ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলেও তাহা হইতে পারে না। এবং ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের কোন বিধান মতেই ঐ প্রকার দুই নালিশের হেতু এক মোকদ্দমায় যোগ করা যাইতে পারে না। অতএব পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে বেদখলের নালিশ হয়, তাহা কি কেবল বর্ত্তমান প্রতিবাদিগণ কর্ত্তৃক, কি অন্যান্য ব্যক্তির সহিত একত্রে হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যক। যদি তদন্তের দ্বারা প্রকাশ পায় যে, পূর্ব্ব মোকদ্দমা-ভুক্ত ভূমি হইতে বর্ত্তমান প্রতিবাদিগণ অন্য ব্যক্তির সহিত একত্রে বাদিনীকে বেদখল করিয়াছিল, তবে, যে স্থলে কেবল বর্ত্তমান প্রতিবাদিগণ উপস্থিত নালিশ-ভুক্ত ভূমি হইতে বাদিনীকে বঞ্চিত করিতেছে, সে স্থলে ৭ ধারার অন্তর্গত আপত্তি অবশ্যই অগ্রাহ্য হইবে। কিন্তু যদি পক্ষান্তরে, এমত দেখা যায় যে, দুই মোকদ্দমার লিখিত অনিষ্ট-জনক কার্য্য একই ব্যক্তিগণের দ্বারা একই তারিখে হইয়াছিল, তাহা হইলে নালিশ ঐ ধারা মতে ডিস্মিস্ হইবে।

এই সকল কারণে, নিম্নলিখিত বিষয়ের তদন্ত করার জন্য আমি এই, মোকদ্দমা প্রথম আদালতে পুনঃপ্রেরণ করিব।

১ ম। ১৮৪০ সালের ৪ আক্টের হুকুম-ভুক্ত ভূমি হইতে যে তারিখে এবং যে কার্য্যের দ্বারা বেদখল করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান নালিশ-ভুক্ত ভূমি হইতেও প্রতিবাদিগণ সেই তারিখে ও সেই কার্য্য দ্বারা বেদখল করিয়াছে কি না?

২ য়। উল্লিখিত ৪৫০ বিঘা ১১ কাঠা ভূমি হইতে যে তারিখে এবং যে কার্য্যের দ্বারা বেদখল করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান বিরোধীয় ভূমি প্রতিবাদিগণ সেই তারিখে এবং সেই কার্য্যের দ্বারা দখল করিয়াছে কি না?

৩ য়। যে সকল ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাদিনী পূর্ব্ব মোকদ্দমা-ভুক্ত ভূমি হইতে বেদখল হয়, সেই প্রতিবাদিগণই বাদিনীকে বর্ত্তমান মোকদ্দমা-ভুক্ত ভূমি হইতে বেদখল করিয়াছে কি না?

এই সকল বিষয়ে দুই পক্ষকেই প্রমাণ দর্শাইতে দিতে হইবে, কারণ, দুই নিম্ন আদালত কর্ত্তৃকই যে তদন্তের হুকুম হইয়াছিল, তাহাতে এই বিষয়ের তদন্ত হয় নাই।

বিচারপতি লক।—আমি এই পুনঃপ্রেরণের হুকুমে সম্মত হইলাম। (গ)

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন।

দরভাঙ্গার মুন্সেফের প্রার্থীকে নাজিরী পদে নিযুক্ত করার হুকুম স্থির রাখিতে অস্বীকার করিয়া ত্রিহুতের জজ যে হুকুম দেন, তাহা অন্যথা করার জন্য দরখাস্ত।

উলফৎ হোসেন, প্রার্থী।

মেং আর, ই, টুইডেল প্রার্থীর উকীল।

চুম্বক।—১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের মর্ম্ম এই যে, অধঃস্থ বিচারপতিদিগের সেরেস্তার আমলাদিগকে নিযুক্ত করার ভার ঐ সকল বিচারপতির হস্তেই থাকিবে; জেলার জজ কেবল সেই নিয়োগে আপন সম্মতি বা অসম্মতি প্রদানের ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। নিয়োজিত ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি থাকে, তবেই জজ তাহার নিয়োগ মঞ্জুর করণে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এমন হুকুম দিতে পারেন না, যদ্দ্বারা অধঃস্থ বিচারপতিগণ তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—দরভাঙ্গার মুন্সেফের আদালতের নাজিরী পদে প্রার্থীকে নিযুক্ত করার হুকুম স্থির রাখিতে ত্রিহুতের জজ অস্বীকার করিয়া যে হুকুম দেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থী এই আপীল করিয়াছে।

নাজিরী পদ শূন্য হওয়াতে, ঐ পদাকাঙ্ক্ষিগণকে মুন্সেফ দরখাস্ত করিতে আদেশ করেন, এবং পরে ভিন্ন ভিন্ন প্রার্থীর দাবী পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি উপস্থিত প্রার্থীকে মনোনীত করত ঐ পদে নিযুক্ত করেন। লালা বদ্রিনাথ নামে ঐ কর্ম্মের আর এক জন প্রার্থী ছিল, এবং সে ভূত-পূর্ব্ব নাজীরের জামাতা এবং সেরেস্তার এক জন তাইদনবিস ছিল। মুন্সেফ তাহাকে ঐ পদে নিযুক্ত না করার এই কারণ দর্শাইয়াছেন যে, তিনি অবগত হইয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তির পেয়াদাদিগের তলবানা আত্মসাৎ করিবার অভ্যাস ছিল।

লালা বদ্রিনাথ জজের নিকট আপীল করে। জজ ঐ আপীল শুনিয়া বলেন যে "এই আপীল "কোন আমলার জরিমানা, বা কর্ম্ম হইতে "স্থগিত অথবা কর্ম্মচ্যুত হওয়া সম্বন্ধে না হওয়ায়, ইহা ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ৯ ধারা "মতে গৃহীত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে কিছু "সন্দেহ ছিল। কিন্তু ১১ খালম উইকলি "রিপোর্টরের ১৫৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত এক নজীর "যাহাতে এই প্রকার দরখাস্ত গ্রহণ করার "জন্য জেলার জজের প্রতি হুকুম হয় তদ্দ্বারা "ঐ সন্দেহ দূর হইয়াছে, যদিও তাহার পরে

" অবধারিত হইয়াছে যে, মুন্সেফ কোন ব্যক্তিকে
" কোন পদে নিযুক্ত করিলে জজ কেবল তাহা
" মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, অন্য
" কোন প্রার্থীকে নিযুক্ত করার হুকুম দিতে
" পারেন না। "

লালা বদ্রিনাথকে মুন্সেফ সে সকল হেতুবাদে নাজিরী পদে নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করেন, জজ তাহা পর্য্যালোচনা করত, ঐ সকল হেতু অকর্ম্মণ্য, এবং লালা বদ্রিনাথ পূর্ব্বে ভাইদনবিসী করাতে তাহার ঐ কর্ম্ম পাওয়ার উৎকৃষ্ট দাবী আছে, বিবেচনা করিয়া উলফৎ হোসেনের নিয়োগ মঞ্জুর করিতে অসম্মত হন।

ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না যে, ১১ শ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৫৮ পৃষ্ঠার নজীর জজের এই হুকুমের কিঞ্চিৎ প্রতিপোষক। সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত সম্পূর্ণ রূপে প্রচারিত হয় নাই, এবং কি বৃত্তান্ত দৃষ্টে জজের হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক বোধ হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত নাই। কিন্তু সেই বিজ্ঞবর বিচারপতির ( বিচারপতি লক ) পশ্চাতের নিষ্পত্তি যাহা জেলার জজ উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহা উইক্লি রিপোর্টরের সেই বালমের ৩৫৪ পৃষ্ঠায় * প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে প্রথমোক্ত নিষ্পত্তি অনেক রূপান্তরিত হইয়াছে, এবং তাহাতে ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতি আইন সম্বন্ধে তাঁহার রায় স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, " ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের
" ৯ ধারার বিধানে স্পষ্ট দেখা যায় যে,
" মুন্সেফ-আদালত সমূহের কর্ম্মচারী মনোনীত
" ও নিয়োগ করার ভার জেলার জজের অনুমোদন
" সাপেক্ষ করিয়া, মুন্সেফদিগের প্রতিই অর্পিত
" হইয়াছে। মুন্সেফ যে কর্ম্মচারীকে মনোনীত
" ও নিয়োগ করেন, জেলার জজ যদি তাহাকে
" পছন্দ না করেন, তবে তিনি ঐ নিয়োগে স্বীয়
" সম্মতি প্রদান না করিতে পারেন, কিন্তু অন্য
" কোন ব্যক্তিকে মুন্সেফ-আদালতের কর্ম্মচারীর
" পদে নিয়োগ করিতে আইনে জজকে কোন ক্ষমতা
" দেয় নাই।"

আমি নিজেও এমত সকল মোকদ্দমায় নির্দ্দেশ করিয়াছি ( আমি সেই রায় পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ দেখি না ) যে, মুন্সেফ যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, জজের কেবল তাহাকে পছন্দ করা না করার ক্ষমতা আছে, কিন্তু নিয়োজিত ব্যক্তির নিজ সম্বন্ধে কোন আপত্তির উল্লেখ না করিয়া তিনি তাঁহার সম্মতি প্রদানে অস্বীকার করিতে পারেন না। আইনের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, অধঃস্থ বিচারপতিগণের সেরেস্তার আমলাগণকে মনোনীত ও নিযুক্ত করার ভার সেই সকল বিচারপতিগণের হস্তেই থাকিবে, কারণ, তাঁহাদের আপন আপন সেরেস্তার কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাঁহারাই নিজে দায়ী; অতএব তাঁহাদের হুকুম পালনার্থে ও সেরেস্তার কাগজ-পত্র সমস্ত সাবধানে রাখার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করার ভার তাঁহাদের উপরে দেওয়াই উচিত, কিন্তু তাঁহারা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করেন, এই দেখিবার জন্য জেলার জজের প্রতি মঞ্জুরীর ভার অর্পিত হইয়াছে। এক জন প্রার্থী অপেক্ষা আর এক জন উৎকৃষ্ট, জজ এমত রায় ব্যক্ত করিয়া তিনি যে ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করেন তাহাকে নিযুক্ত করার জন্য অধঃস্থ বিচারপতিকে বাধ্য করিতে পারেন না। এই মোকদ্দমায় জজ কেবল কথায় মুন্সেফের কৃত নিয়োগ অগ্রাহ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুন্সেফ যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা উচিত বিবেচনা করেন নাই, মুন্সেফকে নিশ্চয়ই আভাসে জানাইয়াছেন যে, তাহাকে নিযুক্ত করাই তাঁহার ( জজের ) মত ও ইচ্ছা।

অতএব আমার বিবেচনায়, এই মোকদ্দমায় জজের হুকুম ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের মর্ম্মের ও বিধানের বিরুদ্ধ, এবং তিনি যে

* বাঃ সাঃ রিঃ ৪ র্থ ভাগ, দেঃ নিষ্পত্তি, ৪১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সম্মতি প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা আইন-সঙ্গত নহে; অতএব তাঁহার হুকুম অবৈধ হইয়াছে এবং তাহা অন্যথা হইবে। মুন্সেফ যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহাকে তিনি নিযুক্ত করিবেন, এবং আমার বোধ হয় যে, উপস্থিত প্রার্থীর নিজের কোন দোষ না থাকিলে, তাহার নিয়োগই স্থির রাখিতে হইবে। (গ)

---

২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ বি কেম্প এবং ই জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ২২৫ নং মোকদ্দমা।

কটকের জজের ১৮৬৯ সালের ১৭ ই মে তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

বাসু ধল (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

কৃষ্ণচন্দ্র গীর গোস্বামী (বাদী) এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মিত্র এবং মহেন্দ্রলাল মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং অভয়চরণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে সম্পত্তি সমগ্র ও সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানার্থে উৎসর্গ হয় তাহা বিক্রীত হইতে পারে না; কিন্তু যে স্থলে ঐ সম্পত্তির উপস্বত্বের কিয়দংশ উক্ত অনুষ্ঠানার্থ ব্যয় হইবার সর্ত্ত থাকে, সে স্থলে ঐ সর্ত্তের দায় সম্বলিত তাহা বিক্রীত হইতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—মৌজা লক্ষাপাড়া, ইত্যাদির অন্তর্গত ২৫ বাটী ১৭ মাস লাখেরাজ ভূমির অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে এই মোকদ্দমা উপস্থিত। বাদী কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর গুরু ভুবনেশ্বর গোস্বামী এই সকল ভূমি বিক্রয় করাতে বাদী এই হেতুবাদে ঐ বিক্রয় অন্যথার দাবীতে নালিশ করে যে, তাহা জগন্নাথ দেবের ভোগ এবং অন্যান্য ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত উৎসর্গ হওয়ায় তাহা বিক্রয় করা আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে। এই এক আপত্তিও হয় যে, ভুবনেশ্বরের অজ্ঞানাবস্থায় ঐ বিক্রয় করা হয়, অতএব এই জন্যও তাহা অসিদ্ধ।

প্রতিবাদী এই উত্তর দেয় যে, বাদী বিবাহ করায় এবং অন্যান্য শাস্ত্র-বিরুদ্ধ আচরণ করায় গোস্বামীর পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে, এবং ঐ বিক্রয় জগন্নাথ দেবের কোন কোন ভোগ দিবার অধীন হইলেও তাহা আইন-সঙ্গত বিক্রয়, এবং ঐ বিক্রীত সম্পত্তি সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য উৎসর্গ হয় নাই। ঐ সম্পত্তি এক্ষণে ক্রেতার দখলে থাকায় বাদীকেই তাহা ফেরৎ পাইবার উৎকৃষ্ট স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে হইবে।

জজের এ কথা বলা অন্যায় হইয়াছে যে, বাদী এই সকল ভূমি দানের মুল সনন্দ দাখিল করিয়াছে। স্বত্বের যে সকল দলীলের উপর বাদী নির্ভর করে, তাহা সেই সময়ের শাসন-কর্ত্তাদিগের দ্বারা ঐ দান স্বীকারের পত্র মাত্র। তাহার প্রথম খানা কটকের মাল সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি মহারাষ্ট্র গবর্ণমেণ্টের ১৭২৬ সালের হুকুম। তাহাতে মুল দান-পত্রের লিখিত বিষয়ের গৌণ প্রমাণ আছে। তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বুধগীর গুরু নামক এক ব্যক্তি এই সকল ভূমির মুল মালিক ছিল, সে তাহা খোস কবালায় খরিদ করে; সে তাহার উপরে জগন্নাথের ভোগের বাবৎ বার্ষিক ৩০০ কাহন কৌড়ী অর্থাৎ ৮০ টাকা প্রদানের দায় স্থাপন করে, এবং বন্দোবস্ত করে যে, ঐ সকল ভূমির অবশিষ্ট উপস্বত্ব বলভগীর নামক এক ব্যক্তি লইবে। ১৭৯৪ সালের যে গবর্ণমেণ্ট ছিলেন সেই গবর্ণমেণ্ট যে এক ছাড় দেন তাহাতে এই সকল ভূমি সম্বন্ধে ঐ রূপ বাক্যই ব্যক্ত হয়। তাহা হইতে ৮০ টাকা জগন্নাথের সেবার জন্য এবং অবশিষ্ট উক্ত গোস্বামীর নিজের ব্যবহারের

জন্য থাকিবার কথা বলা হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা অতিথি সেবার কথাও বলা হইয়াছে।

মূল দান-পত্রের সর্ত্ত সম্বন্ধে এই সকল দলীল হইতে যে প্রমাণ পাওয়া যায় তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই সকল বিরোধীয় ভূমি সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্মার্থে উৎসর্গ হয় নাই, অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তির সমুদায় উপস্বত্ব ধর্ম্মার্থে প্রদত্ত হয় নাই। কিছু টাকা বর্ষে বর্ষে এক ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত দেওয়ার দায় উক্ত ভূমির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট উপস্বত্ব উক্ত গোস্বামীর হস্তে, তাহার নিজের ব্যবহারার্থে নচেৎ তাহার ইচ্ছামতে দানাদির জন্য রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিবার ক্ষমতার বিচার এই কথার উপর নির্ভর করে যে, উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ রূপে ধর্ম্ম কার্য্যে প্রদত্ত হইয়াছে, না তাহার উপস্বত্বের কিয়দংশ মাত্র তদর্থে প্রদত্ত হইয়াছে। মার্সেলের রিপোর্টের ৩০৩ পৃষ্ঠা এবং ১০ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৯৯ পৃষ্ঠা হইতে যে সকল নজীর দর্শান হইয়াছে, তাহাতে এবং ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানী আদালতের যে সকল নজীর এই সকল নিষ্পত্তির শেষ নিষ্পত্তিতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্ট এই নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, কোন সম্পত্তির উপর কোন টাকা দিবার ভার থাকিলেও, তাহা যে বিক্রীত হইতে পারে না, এমন নহে। উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় হইলে তাহার পূর্ব্ব দায় সমেত বিক্রয় হয়। বিপক্ষের যে সকল নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে তাহা এমত সকল মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যাহাতে সমগ্র সম্পত্তিই উৎসর্গ হইয়াছিল, তাহার এক অংশ নহে।

অতএব আমরা এ সম্পত্তির বিক্রয়ে এমত কিছু দেখিতে পাই না যাহা আইন-বিরুদ্ধ, এবং এমন কিছু সপ্রমাণ হয় নাই যাহাতে আদালত উক্ত বিক্রয় অন্যথা করিতে পারেন। এমত অবস্থায় বাদীর নালিশ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধীয় কোন প্রশ্নের বিচারের আবশ্যক নাই; তাহা আবশ্যক হইলে, আমরা এমত কোন প্রমাণ পাই নাই, যদ্দৃষ্টে আমরা এই বলিতে পারি যে, সে কোন প্রকারে গুরুর পদ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে।

অবশিষ্ট বিষয় সম্বন্ধেও, এমত সন্দেহের কোন কারণ নাই যে, ভুবনেশ্বর গোস্বামী যখন প্রকৃত মানসিক অবস্থায় ছিল না এবং এ প্রকারের দলীল লিখিয়া দিতে অশক্ত ছিল, তখনই উক্ত বিক্রয় কার্য্য হয়।

জজ যে নিষ্পত্তি দ্বারা উক্ত বিক্রয় কার্য্য অন্যথা করেন তাহা রহিত হইবে এবং বাদীর মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিস্‌মিস হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—আমারও ঐ মত। এই সম্পত্তি প্রথমে ক্রয়ই করা হয়; কি কি সর্ত্তে মূল দান হইয়াছিল, তাহা আমাদিগকে দেখান হয় নাই। বাদী যে সকল ছাড় দাখিল করে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই সম্পত্তির উপর এক দায় ছিল, অর্থাৎ জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য দুই অংশে বার্ষিক ৮০ টাকা করিয়া দেওয়ার ভার ছিল। এমত কোন প্রমাণ নাই যে, সমগ্র সম্পত্তিই সেই জন্য বা অন্য কোন কার্য্যের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। অতএব ক্রেতা উল্লিখিত দায় সহ উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, এবং বিচারপতি ই, জ্যাক্‌সনের প্রদর্শন মতে জজের নিষ্পত্তি স্পষ্টই ভ্রান্তিমূলক। (ব)

---

২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ বি কেম্প এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ২১৪ নং মোকদ্দমা।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৪ ই জুনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

বৈষ্ণবচরণ দিগাপতি (বাদী) আপেলান্ট।

গোবিন্দপ্রসাদ তেওয়ারী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেন্ট।

বাবু তারকনাথ দত্ত আপেলান্টের উকীল।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেন্টের উকীল।

চুম্বক।—কাহার দায় সংস্থাপনার্থে যে নালিশ হয়, তাহা মুল দায়িগণের মধ্যে এক জনের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এবং কালেক্টরীতে নীলামের উদ্বর্ত্ত যে টাকা জমা থাকে, তাহার উপর দাবী প্রবল্ল করণার্থে, উপস্থিত হইলে, রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫৩ ধারার বিধানান্তর্গত হইতে পারে না।

বিচারপতি কেম্প।—এই আপীলের নিষ্পত্তি কেবল এই একটি সামান্য প্রশ্নের উপর নির্ভর করে যে, বাদীকে রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫৩ ধারানুসারে খরচা দেওয়া অর্থাৎ উক্ত ধারার বিধান অনুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত না হয় তাহার নালিশের আরজীর নির্দ্দিষ্ট মুল্যের চতুর্থাংশ খরচা দেওয়া নিম্ন আদালতের উচিত হইয়াছে কি না। এই বিষয় যাহা বাদীর আপীলের অন্তর্গত, তৎসম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতের অন্যায় হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, ৫৩ ধারানুসারে বাদীর নালিশ উপস্থিত না হইবার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে, মোকদ্দমা মুল দায়িগণের মধ্যে এক জনের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কালেক্টরীতে যে নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা জমা আছে তাহার উপর বিধিমত দাবী সংস্থাপনার্থে উক্ত নালিশ উপস্থিত হয়। এই দুই কারণে উক্ত মোকদ্দমা রেজেষ্টরী আইনের ৫৩ ধারার বিধানের অন্তর্গত নহে।

খরচা সম্বন্ধে অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল; বাদী এ আদালতের খরচা সমেত সম্পূর্ণ খরচা পাইবে।

প্রতিবাদিগণের পাল্টা আপীল এই যে, তাহারা খরচার নিমিত্ত দায়ী নহে, কারণ, উক্ত সম্পত্তির নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা কালেক্টরীতে জমা ছিল এবং তাহারা ইচ্ছুক ছিল যে, বাদী উক্ত টাকা হইতে তাহার প্রাপ্য আদায় করিয়া লয়; তাহার দ্বারা যথেষ্ট রূপেই ঐ ঋণ আদায় হইতে পারিত। এই বাক্য সপ্রমাণার্থে তাহারা বাদীর পুত্রকে সাক্ষী মানে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তাহার সাক্ষ্য পাঠে আমরা দেখিতে পাই না যে, তাহার দ্বারা কোন প্রকারে প্রতিবাদিগণের বাক্য সপ্রমাণ হয়। পক্ষান্তরে, তাহার সাক্ষ্য বিশ্বাস্য হইলে, (এবং প্রতিবাদিগণ যখন তাহাকে সাক্ষী মানিয়া তাহার উপর নির্ভর করে, তখন ঐ সাক্ষ্য অবশ্যই বিশ্বাস করা যাইতে পারে) স্পষ্ট দেখা যায় যে, কালেক্টর ঐ নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা দিতেন না। অতএব বাদীর আর বিলম্ব না করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করা সম্পূর্ণ উচিতই হইয়াছে।

এই পাল্টা আপীল সম্বন্ধে আপেলাণ্টের যে খরচা হইয়া থাকে, তাহা সমেত ইহা ডিস্মিস্ করা গেল। (ব)

---

২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ৮৫ নং মোকদ্দমা।

নদীয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

তারিণীপ্রসাদ ঘোষ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

রাঘবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেন্টের উকীল।

চুম্বক।—বাকী খাজানার জন্য কোন পত্তনীর নীলাম হইলে ঐ পত্তনীর এক জন শরীক তদ্বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া নীলাম অন্যথা করার ডিক্রী পায়। ইতিমধ্যে ঐ নীলাম-ক্রেতা খাজানা না দেওয়ায় ঐ পত্তনীর পুনরায় নীলাম হওয়াতে

উক্ত প্রথম নীলাম রদের ডিক্রী পত্তনীর দখল লইয়া জারী করা অসাধ্য হয়। এ প্রযুক্ত এই ডিক্রীদার, প্রথম নীলাম-ক্রেতা ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে, দ্বিতীয় নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকার অংশ পাওয়ার জন্য নালিশ করিয়া তাহা প্রাপ্ত হয়, এবং তৎপরে ওয়াশীলাতের নালিশ করিয়া তাহাও পায়। তৎপরে সে ক্ষতিপূরণের দাবীতে আর এক নালিশ উপস্থিত করে।

এমত স্থলে, প্রথম নীলাম হইতে যে দাবী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা একই নালিশের মধ্যে ভুক্ত করা উচিত ছিল, সুতরাং সেই একই নালিশের হেতুতে পশ্চাতে ক্ষতিপূরণের জন্য পৃথক্ নালিশ চলিতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই আপীলে প্রথম যে দুই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তদতিরিক্ত কিছুর বিচার করা অনাবশ্যক।

এ মোকদ্দমায় বাদী আপন নালিশের আরজীতে যে দাবী উপস্থিত করে, তাহা আমার নিকট যার পর নাই অসম্ভব বোধ হইতেছে। যে সকল শরীক জমিদারের কর না দেওয়ায় তাহাদের পত্তনী তালুক নীলাম হয়, এবং প্রতিবাদী তারিণীপ্রসাদ ঘোষ ক্রয় করে, বাদী তাহাদের এক জন স্বরূপে দাবী করে। তাহাদের এক জন শরীক পরে নীলামের পূর্ব্ব কার্য্যের অনিয়মের হেতুবাদে উক্ত নীলাম অন্যথা করিবার দাবীতে নালিশ করে, এবং সেই হেতুবাদে উক্ত নীলাম পরিশেষে অন্যথা হয়।

তারিণীপ্রসাদ উক্ত নীলাম নিয়মিত রূপেই হইবার বিষয় প্রতিপন্ন করিতে ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদ করায় যে, তাহার প্রতি তাহার নিজের খরচা দিবার আদেশ হয়, তাহাতে সে এই আদালতে উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে, এবং উক্ত আপীল আদালতে চলিবার কালে সে কর দিতে ত্রুটি করায় উক্ত পত্তনীর পুনরায় নীলাম হয় এবং এক তৃতীয় ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে।

উক্ত দ্বিতীয় নীলামের পরে তারামণি নাম্নী যে এক স্ত্রীলোক প্রথম নীলাম রদের মোকদ্দমায় কোন পক্ষ ছিল না, কিন্তু যাহার তাহাতে স্বার্থ থাকিবার বিষয় বলা হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হওয়ায়, তাহার স্বত্ব ও লাভ বিহারিলাল নামক এক স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিতে বর্ত্তে। ঐ বিহারিলালের বিরুদ্ধে উপস্থিত বাদীর এক ডিক্রী থাকাতে সে উক্ত ডিক্রী পরিশোধার্থে তারামণির ঐ প্রকারে বর্ত্তিত স্বত্ব নীলাম করায় এবং নিজেই ৬ টাকা দিয়া ক্রয় করে।

উক্ত পত্তনীর দখল লইয়া ঐ নীলাম অন্যথা করিবার ডিক্রী জারী করা দ্বিতীয় নীলামের গতিকে অসম্ভব হওয়ায় এই বাদী দ্বিতীয় নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকার মধ্যে কিয়দংশ পাইবার আশয়ে প্রথমতঃ, তারিণীপ্রসাদ এবং আর কয়েক ব্যক্তির নামে নালিশ করে, এবং বোধ হয় সে তাহার ডিক্রীও পায়। তদনন্তর সে উক্ত পত্তনী যত দিন তারিণীপ্রসাদের দখলে ছিল তাহার ওয়াশীলাতের ঐ রূপ অংশের দাবীতে নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিয়া লয়; এবং এক্ষণে সে বোধ হয় সেই নালিশের কারণেই, উক্ত পত্তনীর মূল্য ৬১০০০০ টাকা ধরিয়া, এবং যে ৯৮০০০ টাকায় ঐ পত্তনী নীলামে বিক্রয় হয় তাহা হইতে তাহার কর বাবৎ কালেক্টরী হইতে জমিদার যে ৩৭০০০ টাকা লয় তাহা উহার সহিত ধরিয়া ক্ষতিপূরণের দাবীতে অপর এক নালিশ করে, এবং এই দুই টাকা একত্রে ধরিয়া, সে যে ৬ টাকা দিয়া ক্রয় করে, তাহার হিস্যার বাবৎ সুদ সমেত ১৮২৯৮ টাকার দাবী করে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই নালিশের আরজী ডিক্রীজারীর নীলামের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করা সত্ত্বেও নীলামের সার্টিফিকেট ব্যতীত দাখিল হইয়াছে। নীলামের সার্টিফিকেট নথীতে নাই। অতএব উক্ত দলীল উপস্থিত না থাকাতে বাদী কিছু ক্রয় করিয়াছিল কি না, এবং সে কি ক্রয় করিয়াছিল, তাহা আমা-

দের বলা সহজ নহে। যাহা হউক, স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত পত্তনীর দখল পাইবার সমুদায় স্বত্ব অন্যগত হইবার পর সে এই ক্রয় করে, এবং ঐ স্বত্ব অন্যগত হইয়াছিল বলিয়াই যে সে এত অসম্ভাবিত ন্যূন মূল্যে তাহা ক্রয় করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমার বোধ হয় যে, বাদী উক্ত ক্রয় হেতু এবং উল্লিখিত ডিক্রী অনুসারে এই সকল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যাহা পাইতে পারে, তাহা একই নালিশের কারণ-ভুক্ত, এবং উক্ত নালিশের কারণে সে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহাতে, তাহার যে কিছু স্বত্ব ছিল তৎসমুদায়ই ভুক্ত করা উচিত ছিল।

বাদী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল উক্ত দুই মোকদ্দমার বিষয়, অর্থাৎ ওয়াশীলাৎ এবং ক্ষতিপূরণ দুই স্বতন্ত্র বিষয় রূপে বা দুই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হেতুবাদে একই প্রার্থনা রূপে গণ্য করিবেন, তৎসম্বন্ধে তিনি অনেক সন্দেহ দর্শাইয়াছেন, কিন্তু সে যাহা হউক, তাহা নিতান্ত অনাবশ্যকীয় কথা, কারণ, স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত নীলাম হইতে যে দাবী উৎপন্ন হয়, তাহা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ধরিয়াই হউক বা দুই ভিন্ন ভিন্ন নামে একই বিষয়ই হউক, বাদী তাহা এক নালিশের মধ্যে ধরিতে বাধ্য ছিল। বাদী যখন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই নালিশের কারণে তাহার প্রথম মোকদ্দমা উপস্থিত করে, তখন সে এক্ষণকার দাবী-কৃত ক্ষতিপূরণের দাবী না করায়, এক্ষণে আর তাহাকে তাহার নিমিত্ত স্বতন্ত্র নালিশ চালাইতে দেওয়া যাইতে পারে না। তাহা হইলে এই এক স্বত্ব হইতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অসংখ্য মোকদ্দমা চলিতে পারে। আমি বিবেচনা করি, ঐ হেতুতেই বাদী উপস্থিত মোকদ্দমায় কিছু পাইতে পারে না; অতএব আর আর বিষয় দেখিবার কোন আবশ্যক নাই। নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা হইবে, এবং বাদীর মোকদ্দমা সমুদায় খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

পাল্টা আপীল গ্রহণ করা যাইতে পারে না, কারণ, যে পরিমাণ ষ্ট্যাম্প দিলে তাহা শুনা যাইতে পারে, বাদী তাহা দেয় নাই।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

### প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১১ নং মোকদ্দমা।

বিচারপতি এফ বি, কেম্প এবং এফ এ গ্লবর ১৮৬৯ সালের ১৪৪১ নং খাস আপীলে ১৮৬৯ সালের ২৭ এ নবেম্বর তারিখে যে রায় দেন তাহাতে তাঁহাদের মতভেদ হওয়ায় সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের সনন্দের ১৫ ধারানুযায়ী আপীল।

শিবসুকয় লাল প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

সৈয়দ ওয়াজেদ আলী খাঁ (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর টি এলেন এবং বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল এবং সি গ্রেগরি রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে পক্ষগণ আদালতের অন্যায় রূপে অবধারিত ইসুই গ্রহণ করে, সে স্থলে তাহাদিগকে তাহার দ্বারাই বাধ্য স্থির করিতে হইবে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—খরীত সূত্রে সোফার স্বত্বে মৌজা হজুরীপুরের ১৬ আনার মধ্যে ।০ আনা অংশের দখলের দাবীতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত। নালিশের আরজী উক্ত প্রকারে লিখিত হওয়ায় সিওয়ানের মুন্সেফ সৈয়দ কাজিম হোসেন ইসু ধার্য্য করিতে, বোধ

হয় বাদী যে, খরীত অর্থাৎ দাবীকৃত সম্পত্তির এক শরীক ছিল তাহা সপ্রমাণার্থে সে কোন প্রমাণ দেয় নাই স্থির করিয়া এই ইসু ধার্য্য করেন যে, দাবীকৃত মৌজা ঘরাঁও বিভাগের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল কি না, অথবা বাদী বিক্রেতার শরীক বলিয়া সোফার স্বত্বের দাবী করিতে পারে কি না।

উক্ত ইসু ধার্য্য হওয়া সত্ত্বেও বাদী আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য ছিল। বাদী শরীক থাকিবার যে এক মাত্র প্রমাণ দেয়, তাহা তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য, যাহারা বলে যে, উক্ত মৌজা এজমালীতে ছিল। তাহারা এজমালী দখল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু না বলিয়া কেবল এই মাত্র বলে যে, উক্ত মৌজা এজমালী ছিল।

বিক্রেতা যে বাদীর শরীক ছিল না, তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদীর প্রমাণ এই যে, উক্ত মৌজা হিস্যামতে ভোগ হইয়াছে। প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হয়। তাহারা যে, তক্‌সীম্ শব্দ ব্যবহার করে, তাহাতে প্রকাশ যে, বিভাগ হইয়াছিল; এবং সাক্ষিগণ যে বিভাগ হইবার কথা বলে তাহার পোষকতায় প্রতিবাদী পট্টী খাসের ॥০ আনা অংশের মালিক স্বরূপ বাদীকে জগ উপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির প্রদত্ত ১৮৩৯ সালের এক কবুলিয়ৎ দাখিল করে। উক্ত কবুলিয়তে প্রকাশ যে, জগ উপাধ্যায় ১২৬০ এবং ১২৬১ সালে ঐ মৌজা পট্টী খাসের অন্তর্গত ৮॥২ বিঘা গম এবং ধানী জমির বার্ষিক ২১৬০ টাকা জমা দিবে। তফসীলে ঐ জমির বিবরণ এবং প্রত্যেক বিঘার হার এবং তাহার স্থানের বিবরণ আছে। সে ১৮৫৪ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসের কালেক্টরের এক কার্য্যবিবরণও দাখিল করে, তাহাতে বাদী উক্ত কবুলিয়ৎ লিখিত প্রজা জগ উপাধ্যায়ের নামে নালিশ করে। এবং তাহার বিরুদ্ধে উক্ত কবুলিয়ৎ লিখিত ভূমির করের নিমিত্ত ডিক্রী পায়। প্রতিবাদী তাহার পূর্ব্ব স্বত্বাধিকারি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাইয়তী ভূমির ১৮৬২ সালের ৩ রা জুলাই তারিখের এক জমাবন্দীও দাখিল করে। এই জমাবন্দীতে আট জন প্রজার নাম আছে, এবং তাহাদের প্রত্যেকের নামে স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড আছে, যাহার পরিমাণ মোট ৬৴ বিঘা হইবে।

এই দলীল-ঘটিত প্রমাণ প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের এই বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয় যে, উক্ত ভূমি বিভক্ত হইয়াছিল, এবং বাদী ও বিক্রেতা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভূমিখণ্ড ভোগ করিতেছিল, এবং বাদীর বর্ত্তমান আপত্তি প্রামাণ্য হইলে, যদিও সে জানিত যে, কোন শরীক যে দাবী উপস্থিত করিতে পারে, তাহাতে তাহার হক-সোফার দাবী অতি বলবৎ, তথাপি এতৎসম্বন্ধে সন্দেহ ভঞ্জনার্থে সে তাহার নালিশের আরজীতে একথা বলিতে বা এতৎপ্রতি শপথ করিতে সাহস করে নাই যে, সে বিক্রেতার শরীক ছিল। এমত অবস্থায়, আমার বোধ হয় যে, সারণের জজ যে প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া এই নিষ্পত্তি করেন যে, "মৌজা হস্তুজী-পুরের মোট ১৬ আনা অংশ স্পষ্টই পরস্পরের বিভাগ অনুসারে প্রত্যেকের ॥০ আনা অংশে দুই স্বতন্ত্র পট্টীতে বিভক্ত হইয়াছিল," তাহা উক্ত প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হয়; ঐ দুই ॥০ আনার পট্টীর প্রজাগণের কর স্বতন্ত্ররূপে আদায় হয়, এবং যে সম্পত্তির প্রতি সোফার দাবী হইয়াছে তাহা যে পট্টীর অন্তর্গত তাহার সহিত বাদীর কোন সংস্রব ও সম্বন্ধ নাই। অন্ততঃ, তাঁহার এই নিষ্পত্তি উচিতই হইয়াছে যে, বাদী যে, বিক্রেতার শরীক তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। এতাবতা, এই নিষ্পত্তির জন্য আমি যে অনুমান করিতেছি যে, বাদীকে তাহার নালিশের আকার পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া প্রথম আদালতের উচিত হইয়াছে, তাহা করিলেও, প্রথম আদালত বাদীকে যে মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে দিয়াছেন তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।

অতএব আমি বিচারপতি গ্লবরের মতে সম্মত হইয়া বলিতেছি যে, আমরা অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। কিন্তু আমি এই বলি না যে, অধঃস্থ জজের বৃত্তান্ত-ঘটিত নিষ্পত্তি কোন প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হইলে আমরা খাস আপীলে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না, কারণ, আমার বিবেচনায় অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি প্রমাণ দৃষ্টে শুদ্ধ হইয়াছে।

অতএব আমার মতে, যে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে, তাহা অন্যথা হইবে, এবং বাদীর মোকদ্দমা সমস্ত আদালতের খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

বিচারপতি বেলি।—আমি বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করণের হুকুমে সম্মত হইলাম; কিন্তু আমার মতে প্রথম আদালত যে দ্বিতীয় ইসু ধার্য্য করেন, আরজী দৃষ্টে, তাহাতে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে।

বাদী তাহার নালিশের আরজীতে ঠিক "সফী-খলিত" শব্দদ্বয় ব্যবহার দ্বারা তাহার এ মোকদ্দমার দাবীর ভাব প্রকাশ করিয়াছে। ম্যাকনাটন-কৃত মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রের ৪৭ পৃষ্ঠায় অতি স্পষ্ট রূপে তিন প্রকারের সোফার স্বত্বাধিকারিগণের মধ্যে প্রভেদ দেখান হইয়াছে; তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সফী-শরীক প্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাবীদার; তাহার পর সফী-খলীত; এবং সর্ব্ব শেষে প্রতিবাসীর দাবী আইসে; এবং বেলি কৃত সারসংগ্রহের ৪৭৬ পৃষ্ঠায় সফী-শরীককেই প্রাধান্য বা প্রথম স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ, সে মূল সম্পত্তির শরীক; সফী-খলীতকে দ্বিতীয় পদ প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ, সে রাস্তা ও জল প্রভৃতি কতিপয় আনুষঙ্গিক স্বত্বের শরীক মাত্র; এবং প্রতিবাসীকে সর্ব্বশেষ এবং অধম স্বত্ব দেওয়া হইয়াছে। আমরা বাদীকে নালিশের আরজীতে এমত একটি শব্দও বলিতে দেখি না, যাহাতে প্রকাশ যে, সে প্রথমোক্ত স্বত্বের দাবী করে, অথবা নথীতে ১২৫ এবং ১২৬ ধারা মতে আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে পক্ষগণের উপর কোন প্রশ্ন করিয়া এমত কোন বিষয়ও বাহির করা হয় নাই, যদ্দ্বারা প্রকাশ যে, বাদীর উক্ত সম্পত্তির শরীক থাকিবার হেতুবাদে সফী-শরীকের স্বত্বের উপরেই তাহার মোকদ্দমা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা ছিল। পক্ষান্তরে, কাগজের বহীর ১৫ পৃষ্ঠার ৫ দফায় প্রকাশ যে, বাদী নিম্ন আদালতে স্বয়ং বলে যে, সে উক্ত উভয় প্রাথমিক কার্য্যই এক সঙ্গে করিয়াছে, এবং তাহার উভয় কার্য্যেই সাক্ষী এক, এবং ঐ সকল সাক্ষী উক্ত প্রাথমিক কার্য্যের প্রমাণ দিত, যে প্রমাণ সফী-শরীকের সম্বন্ধে যেমন আবশ্যক সফী-খলীতের সম্বন্ধেও সেই রূপ আবশ্যক। তাহাতে বলা হয় নাই যে, সাক্ষিগণ সম্পত্তি এজমালীতে থাকিবার বিষয় সপ্রমাণ করিবে। কিন্তু পক্ষগণ যখন প্রথম আদালতের ঐ রূপ অন্যায় রূপে ধার্য্য ইসু গ্রহণ করিয়াছে, তখন আমার বিবেচনায়, তাহাদিগকে তাহা দ্বারা বাধ্য স্থির করিতে হইবে।

এতদর্থে আমি প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতির এই রায়ে সম্মত হইয়েছি যে, নিম্ন আপীল-আদালত যে বৃত্তান্ত-ঘটিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আমরা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না; অতএব আমি এই খাস আপীল ও বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করণে বিচারপতি গ্লবরের মতে সম্মতি দিলাম।

বিচারপতি হব্হৌস।—আমি বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতির রায়ে সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। (ব)

---

২২ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ৫০ নং মোকদ্দমা।

বিষ্ণুপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২ রা মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

বিষ্ণুচরণ ভূষণ ও আর এক ব্যক্তি (বিচারা-দিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

কৃষ্ণগোপাল মিশ্র (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—ডিক্রী জারীতে আদালত ডিক্রী-ক্রেতাকে গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আদালত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা যদি এমন আপত্তি থাকে যাহার তিনি মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি সেই আপত্তির বিচার করিতে পারেন, এবং সেই বিচারের ফল দৃষ্টে ক্রেতাকে ডিক্রীজারী চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—ডিক্রীজারীর মোক-দ্দমায় এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুচরণ ভূষণ, তারাচাঁদ ভূষণ ও গুরুগোবিন্দ ভূষণ নামক তিন ভ্রাতার বিরুদ্ধে কৈলাসচন্দ্র পাল নামক এক ব্যক্তি আদৌ ডিক্রী পায়। ঐ ডিক্রী-জারীতে কৃষ্ণগোপাল মিশ্র নামক এক ব্যক্তি ঐ ডিক্রী ক্রয় করিয়াছে বলিয়া ডিক্রীদারের পরি-বর্ত্তে ডিক্রীজারী করার অনুমতির প্রার্থনা করে। দায়িগণ এই বলিয়া ডিক্রীজারীর প্রতি আপত্তি করে যে, ঐ ক্রয় বাস্তবিক কৃষ্ণগোপাল মিশ্রের ক্রয় নহে; ঐ তিন ভ্রাতার টাকার দ্বারা তারাচাঁদ ভূষণ নামক তাহাদেরই মধ্যে এক জন তাহা ক্রয় করিয়াছে।

প্রথম আদালত এই প্রশ্নের তদন্ত করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ ক্রয় বেনামী। প্রথম ডিক্রীদারের সাক্ষ্য ও বিচারাদিষ্ট দায়িগণের মানিত অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য দৃষ্টে, এবং কৃষ্ণগোপাল মিশ্রকে ও তাহার পিতা দায়ী তারা-চাঁদ ভূষণের উকীলকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করাতে তাঁহারা ফাঁকে থাকিয়া জবানবন্দী না দেওয়াতে মুন্সেফ ঐ সিদ্ধান্ত করেন। মুন্সেফের রায়ে দায়ীদিগের কথাই সত্য, এবং তাহারা ডিক্রী ক্রয় করিয়াছে।

কৃষ্ণগোপাল মিশ্র তাহার পরে জজের নিকট আপীল করে। জজ বলেন যে, তাঁহার বিবেচনায়, ডিক্রীজারীতে এই প্রশ্নের বিচার হইতে পারে না, এবং যে স্থলে বিক্রয়-পত্র দাখিল ও রেজিষ্টরী হইয়াছে, সে স্থলে যে ব্যক্তির নামে ডিক্রী বিক্রীত হইয়াছে তাহাকেই ডিক্রীজারী করিতে অনুমতি দেওয়া উচিত, এবং প্রতিবাদিগণ তদ্দ্বারা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা পূরণের জন্য তাহারা যখন ইচ্ছা নালিশ উপস্থিত করিতে পারে। জজ যে সকল তর্কের উপরে এই সিদ্ধান্ত করি-য়াছেন তৎসমুদায়ই আইন সম্বন্ধে ভ্রমমূলক বোধ হয়। তিনি বলেন যে, তিনি যদি এই বেনামীর কথার বিচার করেন, তবে ইহার পরে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা মতে যে দেওয়ানী নালিশ উপস্থিত হইবে তাহাতে ঐ কথার তদন্ত হইতে পারিবে না, বরং ঐ নালিশই চলিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ ধারায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহাতে কেবল ডিক্রীজারীতে ওয়া-শীলাৎ ও তাহার ন্যায় অন্যান্য কথার উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু এই ডিক্রী ক্রয় করার প্রশ্নের ন্যায় যে প্রশ্ন তাঁহার বিচার করিতে হইত তৎ-সম্বন্ধে তাহা খাটে না। যদি এ কথা সত্য হয় যে, প্রতিবাদিগণ নিজেই তাহাদের এক জন সহ-প্রতিবাদী তারাচাঁদ ভূষণের দ্বারা এই ডিক্রী ক্রয় করিয়াছে, তবে ডিক্রী বাস্তবিক পরিশো-ধিত হইয়া গিয়াছে। ডিক্রী পরিশোধিত হই-য়াছে কি তাহা এখনও জারী হইতে পারে, তাহাই বিচার্য্য প্রশ্ন, এবং জজের তাহার বিচার করা নিতান্তই আবশ্যক ছিল।

যদি কোন ডিক্রী, ডিক্রীদার কর্ত্তৃক তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হয়, তবে আদালত ঐ

তৃতীয় ব্যক্তিকে ডিক্রীজারী করিতে অনুমতি দিতে বাধ্য নহেন। যদি সেই তৃতীয় ব্যক্তির স্বত্ব সম্বন্ধে বিরোধ থাকে, তবে তাহাকে তাহার স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য দেওয়ানী নালিশ করিতে বলাই উচিত প্রণালী। যদি এইরূপ কোন বিরোধ না থাকে, তবে ডিক্রীজারীতে দেওয়ানী আদালত তাহাকে গ্রাহ্য করিতে পারেন; অথবা যদি সেই বিরোধ এমন হয় যে, তিনি তাহার মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি তাহা বিচার করিতে পারেন এবং সেই বিচারের ফলানুসারে ক্রেতাকে মূল ডিক্রীদারের ডিক্রীজারী করিতে অনুমতি দিতে পারেন; কিন্তু এই মোকদ্দমায় জজ এক জন তৃতীয় ব্যক্তিকে ডিক্রীজারী করিতে দিয়াছেন, কিন্তু সেই ব্যক্তি বাস্তবিক ডিক্রীদারের নিকট ক্রয় করিয়াছে কি না, তাহার তদন্ত না করিয়াই তাহাকে ডিক্রীজারী করিতে দিয়াছেন। প্রথম আদালত কৃষ্ণগোপাল মিশ্রকে তলব করেন যে, সে আদালতে উপস্থিত হইয়া নিজে সাক্ষ্য দেয় যে, সে ঐ ডিক্রী ক্রয় করিয়াছে কি না, কিন্তু সে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দেয় নাই। এমত অবস্থায়, কৃষ্ণগোপাল মিশ্রকে ডিক্রীদার-সূত্রে ডিক্রীজারী করিতে দিতে অস্বীকার করা প্রথম আদালতের পক্ষে অতি ন্যায্যই হইয়াছে, এবং কৃষ্ণগোপাল যেরূপ আদালতকে অবজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের জন্য প্রেরণ করার কোন আবশ্যক নাই। যে স্থলে সে হাজির হইয়া এই ক্রয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় নাই, সে স্থলে তাহাই, সে যে বাস্তবিক ডিক্রী ক্রয় করে নাই, তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, ও প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি স্থির থাকিবে। সকল আদালতের খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে।

(গ)

২২ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ৫১৩ নং মোকদ্দমা।

হুগলীর অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য অতিরিক্ত জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

পূর্ণানন্দ সরখেল প্রভৃতি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

হরসুন্দরী দেবী ও আর এক ব্যক্তি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ ধর ও আনন্দচন্দ্র ঘোষাল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাদী কতিপয় ভূমি তাহার মাল ভূমি বলিয়া তাহার জমাবন্দী করার স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলে, প্রতিবাদিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৯ ধারা মতে দরখাস্ত করিয়া ঐ ডিক্রী অন্যথা করার জন্য প্রার্থনা করে। অবশিষ্ট প্রতিবাদিগণকে পক্ষ করিয়া ডিক্রী অনেক রূপান্তরিত হয়।

এমত স্থলে প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিলেন যে, যেহেতু ডিক্রীদার তাহার মূল ডিক্রী স্থির রাখার চেষ্টা করিতেছিল, অতএব তাহাই ডিক্রী সজীব রাখার কার্য্য বলিতে হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—বিচারাদিষ্ট দায়ী আপেলাণ্ট। ডিক্রীদার কতিপয় ভূমি তাহার মাল-ভূমি বলিয়া দাবী করত সেই সকল ভূমির জমাবন্দী করার স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য প্রথমে ৬ জন প্রতিবাদীর নামে এক নালিশ করে। ১৮৬১ সালের ২৩ এ ডিসেম্বর তারিখে সে এই সমুদায় ৬ জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে খরচা সমেত ডিক্রী পায়। ঐ ৬ জন প্রতিবাদীর মধ্যে ৩ জন মোক-

দমায় উপস্থিত হয়, এবং আমরা যত দূর দেখিতেছি তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, তাহারা ১৮৬৩ সালের ২৩ এ ডিসেম্বরের ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করে নাই। বাকী দুই জন প্রতিবাদী এই বলিয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৯ ধারার বিধানানুযায়ী দরখাস্ত করে যে, তাহাদের উপরে নোটিস জারী হয় নাই, এবং তাহারা প্রার্থনা করে যে, ঐ ডিক্রী যে পর্য্যন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে হইয়াছে, তাহা অন্যথা হয়। অবশিষ্ট প্রতিবাদিগণকে ঐ দরখাস্তের পক্ষ করা হয়, এবং তাহার পরে ১৮৬৫ সালের ২৭ এ নবেম্বর তারিখে মূল ডিক্রী অনেক রূপান্তরিত হয়। যে দুই জন প্রতিবাদী ১১৯ ধারা মতে দরখাস্ত করে তাহারা মুক্তি পায় এবং এই ব্যক্ত হয় যে, তাহাদের স্বত্বের পরিমাণ ৮০ আনা। অবশিষ্ট প্রতিবাদিগণকে অনর্থক পক্ষ করা হইয়াছিল বলিয়া তাহারা খরচা পায়। ঐ চারি জন বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত ১৮৬৮ সালের ১৯ এ আগষ্ট তারিখে হয়। প্রথম আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, যেহেতু এই চারি জন বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে ১৮৬৩ সালের ২৩ এ ডিসেম্বর তারিখে প্রদত্ত ডিক্রী ১৮৬৮ সালের ১০ ই আগষ্টের পূর্ব্বে জারী করার প্রার্থনা হয় নাই, অতএব ঐ দরখাস্ত বারিত হইয়াছে।

জজ প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে স্থলে ১১৯ ধারা মতে মোকদ্দমা চলিতেছিল, সে স্থলে ডিক্রীদার তাহার মূল ডিক্রী জারী করিতে পারিত না, এবং অতিরিক্ত জজ বলেন যে, "মালের মোকদ্দমায় "তাহাদের যে বিরোধ হইতেছিল তাহা ডিক্রী "সজীব রাখার কার্য্য।" অতএব তিনি অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন।

দুই পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া আমাদের বিবেচনায়, জজের রায়ই বিশুদ্ধ। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ১৮৬৩ সালের ২৩ এ ডিসেম্বরের মূল ডিক্রী ১৮৬৫ সালের ২৭ এ নবেম্বরের ডিক্রীর দ্বারা রূপান্তরিত হয়। তাহা এই পর্য্যন্ত রূপান্তরিত হয় যে, তাহাতে ব্যক্ত হয় যে, প্রতিবাদিগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ডিক্রীর দায়ে দায়ী নহে এবং ৮০ আনার উপরে তাহাদের স্বত্ব। ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীদার যাহার অনুকূলে মূল ডিক্রী প্রদত্ত হয়, সে ঐ মূল ডিক্রী অন্যথা না হইয়া সমুদায় ৬ জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্থির থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, ২০ ধারার ন্যায্য মর্ম্মানুসারে, সে ডিক্রী সজীব রাখার কার্য্য করিতেছিল, বলিতে হইবে। ১৮৬৫ সালের নবেম্বর মাসে এই স্থির হয় যে, উক্ত দুই জন প্রতিবাদী দায়ী নহে, এবং যেহেতু ডিক্রীদার সেই তারিখের পরে ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারী করিয়াছিল, অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, তাহার দরখাস্ত উচিত সময়ের মধ্যেই দাখিল হইয়াছে।

আমরা খরচা সমেত এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব) (গ)

---

২২ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৯৮৪ নং মোকদ্দমা।

আটিয়ার মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৬ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ময়মনসিংহের অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শিবশঙ্কর নিয়োগী প্রভৃতি (বাদী)
আপেলাণ্ট।

হরসুন্দরী গুপ্তা প্রভৃতি (প্রতিবাদী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—বাদী নালিশ করে যে, কতিপয়

অন্যান্য ব্যক্তির সহিত এক সম্পত্তিতে তাহার এজমালী স্বত্ব আছে; সেই মোকদ্দমা তাহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হওয়াতে সে পুনরায় এই দাবীতে সেই মোকদ্দমার প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সেই সম্পত্তির দাবী করিয়া নালিশ করে যে, অন্য এক ব্যক্তির সহিত অন্য এক তালুক ভুক্ত বলিয়া ঐ সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব আছে।

প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিলেন যে, প্রথম নালিশ উপস্থিত করার কালে বাদীর যে কোন স্বত্ব ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া সে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২ ও ৭ ধারা মতে ঐ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দখল পাওয়ার জন্য আর নালিশ করিতে পারে না।

**বিচারপতি ফিয়ার।**—আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আপীল-আদালত ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৪২৬ পৃষ্ঠার নজীর এই মোকদ্দমায় ন্যায্য রূপেই খাটাইয়াছেন।

বাদীর নালিশের হেতু এই যে, বাদী যে সম্পত্তি ভোগ করিতে স্বত্ববান্, তাহা হইতে প্রতিবাদী তাহাকে অন্যায় রূপে বেদখল করিয়া রাখিয়াছে।

উপস্থিত মোকদ্দমায় সে বলে যে, এই সম্পত্তি ১৩৪ নং তালুকভুক্ত সম্পত্তি সূত্রে সে তাহা অন্য এক ব্যক্তির সহিত একত্রে ভোগ করিতে স্বত্ববান্। আর এক মোকদ্দমায় সে বলিয়াছিল যে, ২৩৪ নং তালুক-ভুক্ত সম্পত্তি বলিয়া সে অন্য কয়েক ব্যক্তির সহিত এজমালীতে ভোগ করিতে স্বত্ববান্।

প্রথম নালিশ তাহার প্রতিকূলে নিষ্পন্ন হয়; এবং দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২ ও ৭ ধারার ফল এই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর সম্বন্ধে, সেই নালিশ উপস্থিত করার কালে বাদীর যে কিছু স্বত্ব ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়া সে আর সেই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে দখল পাইতে পারে না। যখন সে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে, সেই ব্যক্তি তাহাকে তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, তখন তাহার কি স্বত্ব আছে, তাহা আদালতে যাওয়ার পূর্ব্বে তাহার নির্ণয় করা উচিত। একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই নালিশের হেতুর উপরে তাহাকে ক্রমান্বয়ে বহুতর মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

অতএব আমাদের বিবেচনায়, এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে। (গ)

২৩ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

**প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান্ এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি ও সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।**

১৮৬৯ সালের ১২ নং মোকদ্দমা।

১৮৬৯ সালের ২৫৮ নং মোৎফরকা জাবেতা আপীলে হাইকোর্টের বিচারপতি এফ বি কেম্প ও এফ এ গ্লবর ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর তারিখে যে রায় দেন তাহাতে তাঁহাদের মতভেদ হওয়ায় তদ্বিরুদ্ধে রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারা মতে আপীল।

নন্দীপত্ মাহতা ( ডিক্রীদার ) আপেলাণ্ট।

আলেকজাণ্ডর স অর্কুহার্ট ( বিচারাদিষ্ট দায়ী ) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরি ও আর ই টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

মেং কাউএল রেস্পাণ্ডেণ্টের কৌন্সেল।

**চুম্বক।**—যে স্থলে হাইকোর্টের কোন খণ্ডাধিবেশনের দুই বিচারপতির মতভেদ হয়, সে স্থলে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৩ ধারামতে অপর এক বা অধিক বিচারপতির নিকট তাহা অর্পিত এবং পুনরায় তর্কিত হওয়ার পরিবর্ত্তে, ১৮৬৫ সালের সনন্দের ৩৬ ধারানুযায়ী কার্য্যপ্রণালী এই যে, ১৫ ধারার বিধানের অধীনে, উক্ত ভিন্ন মতাবলম্বী দুই বিচারপতির মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির মত প্রবল হইবে। ঐ ১৫ ধারার বিধান এই যে, যে স্থলে হাইকোর্টের কোন খণ্ডাধিবেশনের দুই বা অধিক বিচারপতির তুল্যাংশে মতভেদ হয়, সে স্থলে ঐ মতের অর্থাৎ

জ্যেষ্ঠ বিচারপতির প্রবল রায়ের বিরুদ্ধে হাই-কোর্টে আপীল চলিবে। এই সকল বিধি দ্বারা দেঃ কার্য্যবিধির ২৫৭ ধারার বিধান রূপান্তরিত হয়। হাইকোর্টে ঐ রূপ আপীল হইলে সেই আপীলের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে।

যে স্থলে কোন খণ্ডাধিবেশনের দুই বিচারপতিই কোন এক বিষয়ে এক মত অবলম্বন করেন, সে স্থলে সনন্দের ১৫ ধারানুযায়ী আপীলে হাই-কোর্টের সেই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নাই।

অনিয়মের হেতুতে ডিক্রীজারীর নীলাম অন্যথা করিতে হইলে দায়ীর কেবল ইহা দেখাইলেই হইবে না যে, তাহার ক্ষতি হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা দেখাইতে হইবে যে, ঐ অনিয়মের গতিকে সে বাস্তবিকই ক্ষতি সহ্য করিয়াছে।

ডিক্রীজারীর কার্য্যে দায়ীর পক্ষে ওকালতী করিয়া পশ্চাতে ডিক্রীদারের সহিত যোগ করত ডিক্রীজারীর নীলামে বিক্রীত সম্পত্তি ক্রয় করা উকীলের পক্ষে অতি অসঙ্গত।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—রায় নন্দীপত মাহতা অর্কুহার্টের বিরুদ্ধে ৪৩০০০ টাকার এক ডিক্রী পায়। সেই ডিক্রীজারীতে সে ১৮৬৭ সালের নবেম্বর মাসে পুপ্‌রী কুঠীতে অর্কুহার্টের লাভ ও স্বত্ব বর্ণনা করিয়া তাহা ক্রোক করার জন্য দরখাস্ত করে। দরখাস্তের তফ্‌সিলে সম্পত্তির প্রত্যেক দফা বিশেষ রূপে বর্ণিত ছিল, এবং তন্মধ্যে অধিক দফাই পুপ্‌রী কুঠীর সামিল, কিন্তু কএক দফা স্পষ্টই ঐ কুঠী-ভুক্ত ছিল না। ডিক্রীজারীর ঐ দরখাস্ত মুলতবী থাকার কালে অর্কুহার্ট ২৪৩ ধারামতে এক জন তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করার প্রার্থনা করে। অর্কুহার্টের ঐ দরখাস্ত মেৎ লিংহাম নামক এক জন উকীল যিনি উহার পূর্ব্বে রায় নন্দীপত মাহতার উকীল ছিলেন তাঁহার দ্বারা দাখিল হয়। ডিক্রীদার রায় নন্দীপত মাহতা কোন আপত্তি না করায়, তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করার হুকুম হয়, এবং যে ব্যক্তি তত্ত্বাবধারকের পদে নিয়োজিত হয়, সম্পত্তি ১৮৬৮ সালের শেষ পর্য্যন্ত তাহার তত্ত্বাবধারণে ছিল। ১৮৬৯ সালের প্রথমে রায় নন্দীপত মাহতা এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে, সম্পত্তির মুল্য ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া যাইতেছে, এবং সম্পত্তি ঐ প্রকার তত্ত্বাবধারণে থাকিলে তাহার ডিক্রী পরিশোধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই; অতএব সে ঐ তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করার হুকুম উঠাইয়া লইয়া ঐ সম্পত্তি নীলাম করার জন্য আদালতে প্রার্থনা করে। ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারি তারিখে নীলামের হুকুম হয়, এবং মেৎ লিংহাম যিনি এইবারও দায়ীর পক্ষে উকীল ছিলেন, তিনি ঐ নীলামের হুকুমে সম্মতি প্রদান করত বলেন যে তফসীল অনুযায়ী সম্পত্তির নীলাম করার জন্য নীলামের এক দিন স্থির করা উচিত। নীলামের জন্য ১৫ ই ফেব্রুয়ারি দিন স্থির হয়। ২৪৯ ধারামতে এস্তাহার জারী হয়, এবং ১৩ ই জানুয়ারি তারিখের ইংলিসম্যান সংবাদ পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। ইংলিসম্যানের বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল যে, পুপ্‌রী কুঠী তাহার সমুদায় লাভ ও স্বত্ব সমেত নীলাম হইবে, কিন্তু ২৪৯ ধারামতে যে এস্তাহার প্রচারিত হয় তাহাতে বিচারপতি কেম্প ও বিচারপতি গ্লবর দেখিয়াছেন (এবং তাহাই সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে) যে, প্রত্যেক খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নম্বরওয়ারী হইয়াছিল, এবং এস্তাহার যে প্রকার জারী হইয়াছিল তাহাতে বোধ হইতে পারে যে, ঐ সকল খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ রূপে নীলাম হওয়ার কথা ছিল।

নীলামের পূর্ব্ব দিবসে সম্পত্তির ভিন্ন ভিন্ন অংশের নীলাম হওয়ার প্রতি ২৪৬ ধারামতে এই হেতুবাদে আপত্তি উপস্থিত হয় যে, তাহা পুপ্‌রী কুঠীর সামিল নহে, এবং অর্কুহার্ট যাহার বিরুদ্ধে এই ডিক্রীজারী করার প্রার্থনা হইয়াছে তাহার ঐ সকল সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব নাই, কারণ, তাহার স্বত্ব হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে। অধঃস্থ জজ হুকুম দেন যে, যে তিন খণ্ড সম্পত্তি সম্বন্ধে আপত্তি হয় তাহা ছাড়িয়া ১৫ ই

ফেব্রুয়ারি তারিখের নীলাম হইবে; এবং ঐ দাবীর তদন্ত করার জন্য তিনি ২ রা মার্চ দিন স্থির করেন।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নীলাম হয়। উক্ত হুকুমের দ্বারা যে সম্পত্তি খালাস হয় তাহা বাদে অবশিষ্ট সম্পত্তি এক লাটবন্দী হইয়া ৩৭০০০ টাকায় নীলাম হয়। ডিক্রীদারই ক্রয় করে। দেখা যাইতেছে যে, ঐ ১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিক্রীদার নন্দীপত মাহতা নীলাম ডাকার জন্য ও মূল্যের টাকা আমানতের পরিবর্ত্তে তাহার এক রসীদ দাখিল করার নিমিত্ত অনুমতি পাওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে, এবং হুকুম হয় যে, যদি নীলাম বহাল হওয়ার পরে তাহার নগদ টাকা দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে তাহার নগদ টাকা দিতে হইবে। ২৪৬ ধারা মতে যে সম্পত্তির প্রতি আপত্তি হয় তন্মধ্যে বনগ্রামের কুঠী ২ রা মার্চ তারিখে নীলাম হইয়া ৭৫০০ টাকায় বিক্রীত হয়। নীলামের পরে, ঐ নীলাম করিতে এবং তাহার এস্তাহার জারী করিতে অনিয়ম হইয়াছে বলিয়া দায়ী ঐ নীলাম অন্যথা করার জন্য আদালতে দরখাস্ত করে, এবং ত্রিহুতের প্রতিনিধি অধঃস্থ জজ বাবু ভূপতি রায়ের সমক্ষে ১৮৭১ সালের ২০এ মার্চ তারিখে ঐ আপত্তির শুনানী হয়।

অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করেন যে, অনিয়ম হয় নাই, এবং সমুদায় কন্‌সরন্‌ এক লাটে নীলাম হওয়াতে তাহা এমন অনিয়ম নহে, যদ্দ্বারা নীলাম অসিদ্ধ হইতে পারে। তাঁহার সমক্ষে যে সকল আপত্তি হয় তাহার মধ্যে একটি আপত্তি এই যে, কুঠীর বাটী স্বতন্ত্র রূপে নীলাম করা উচিত ছিল, এবং তাহা ঐ রূপ বিক্রীত হইলে কেবল তদ্দ্বারাই ডিক্রীদারের দাবী পরিশোধ হইতে পারিত। অধঃস্থ জজ বলেন যে; "আপত্তিকারক যে দুই সাক্ষীর "জবানবন্দী দেওয়াইয়াছে, তাহারা আপত্তি- "কারকের কথা সপ্রমাণ করে না। তাহারা "এই প্রকার সাক্ষ্য দিয়াছে, যথা, সমুদায় "কনসরন্‌ যে যে মূল্যে ডাক হইয়াছে তদপেক্ষা "তাহার অধিক মূল্য, কিন্তু সমুদায় কন্‌সরন্‌ এক "লাটে বিক্রীত হওয়াতেই যে, অল্প মূল্য হইয়াছে "এমত তাহারা কহে না।" তিনি আরও বলেন যে, "আপত্তিকারক নিজে তাহার উকী- "লের সহিত তাহার সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়ার "কালে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সে তাহাদিগকে "সওয়াল করিয়া, কেবল কুঠীর বাটী বিক্রয় করি- "লেই যে, ডিক্রীর দেনা পরিশোধিত হইত, এমত "সপ্রমাণ করাইতে চেষ্টা করে নাই।" তিনি বলেন যে, প্রথম আপত্তি অকর্ম্মণ্য।

অধঃস্থ জজ তৎপরে দ্বিতীয় আপত্তির বিচার করিয়াছেন। সেই আপত্তি এই যে, নীলাম-ক্রয়েচ্ছুগণের (যাহারা নীলাম ক্রয় করার জন্য তথায় উপস্থিত ছিল, অধঃস্থ জজ বোধ করি তাহাদেরই কথা বলিয়াছেন) "বিশ্বাস ছিল যে, "কুঠীর বাটীর নীলাম হইবে; অতএব সমু- "দায় কন্‌সরন্‌ এক লাটে বিক্রয় করাতেই "এমত অনিয়ম হইয়াছে যদ্দ্বারা মূল্য অল্প হই- "য়াছে।" তিনি বলেন যে, ক্রেতাগণের মনে কোন সন্দেহ থাকিলে তাহা ইংলিসম্যান সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনের দ্বারাই দূরীকৃত হইয়াছিল। যাহাদের ক্রয় করার ইচ্ছা ছিল দায়ী তাহা- দিগকে সাক্ষী মান্য করে নাই এবং তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারা সপ্রমাণ করে নাই যে, সমুদায় কন্‌সরন্‌ এক লাটে বিক্রয় হওয়াতে তাহার কোন বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বলেন যে, "ইহা অতি সন্তোষকর রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সমুদায় কন্‌সরন্‌ এক লাটে বিক্রয় হওয়াতে দায়ীর কোন ক্ষতি হয় নাই।"

অতএব অধঃস্থ জজ দায়ীর দরখাস্ত অগ্রাহ্য করত নীলাম বহাল রাখেন। সেই নীলাম বহালী হুকুমের বিরুদ্ধে এই আদালতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৭ ধারা মতে এক আপীল হয়।

ঐ আপীল বিচারপতি কেম্প ও বিচারপতি প্লবর কর্তৃক শ্রুত হয়। বিচারপতি কেম্প নিষ্পত্তি করেন যে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে। সেই নিষ্পত্তি অর্থাৎ বিচারপতি কেম্পের নিষ্পত্তিই ১৮৬৫ সালের রাজকীয় সনন্দের ৩৬ ধারা মতে প্রবল হয়; সুতরাং অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হয়।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ১৮৬৫ সালের রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারার বিধানানুযায়ী এই আদালতে আপীল উপস্থিত হইয়াছে।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে মেং কাউয়েল যে এক প্রাথমিক আপত্তি করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে। তিনি তর্ক করেন যে, ২৫৭ ধারামতে যদি আপত্তি অগ্রাহ্য হয় এবং নীলাম বহাল রাখার হুকুম হয়, তবে আপীল হইতে পারে, কিন্তু আপীলে যে হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত। মেং কাউয়েল ঐ ধারার উল্লেখ করিয়া তর্ক করিয়াছেন যে, বিচারপতি কেম্পের হুকুম যাহা ১৮৬৫ সালের রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারার বিধানানুযায়ী প্রবল হইয়াছে তাহা আপীলে প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব তাহাই ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৭ ধারামতে চূড়ান্ত।

আমাদের বিবেচনায়, এই আপত্তি গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। ১৮৬৫ সালের সনন্দের পূর্ব্বে যদি দুই বিচারপতির অধিবেশনে আইন-ঘটিত কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে রায়ের অনৈক্যতা হইত, তবে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৩ ধারা মতে, যে বিষয়ে ঐ বিচারপতিগণের মতভেদ হইত, তাহা তাঁহাদের ব্যক্ত করিতে হইত, এবং তদ্বিষয়ে ঐ মোকদ্দমা অন্য এক কিম্বা অধিক বিচারপতির সমক্ষে পুনরায় তর্কিত হইয়া যে সকল বিচারপতি ঐ আপীল শুনেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বিচারপতির রায় অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইত।

যে সকল আদালত রাজকীয় সনন্দের দ্বারা সংস্থাপিত নহে, তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সহজ করার জন্য ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও তৎসংশোধক ১৮৬১ সালের ২৩ আইন প্রচারিত হইয়াছে। ১৮৬২ সালের সনন্দের ৩৭ ধারা দ্বারা এই প্রধানতম বিচারালয়ের কার্য্য-প্রণালী ঐ আইন দ্বয়ের অধীন হয়। ১৮৬২ সালের সনন্দ ১৮৬৫ সালের শেষে রহিত হয়, এবং ১৮৬৫ সালের সনন্দের ৩৭ ধারায় বিধিবদ্ধ হয় যে, প্রধানতম বিচারালয়ের সমক্ষে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিচারালয়ের কার্য্য-প্রণালীর বিধান করার জন্য ঐ প্রধানতম বিচারালয় সময়ে সময়ে নিয়ম সংস্থাপন করিতে পারিবেন; "কিন্তু প্রধানতম "বিচারালয় সেই সকল নিয়ম সংস্থাপন করিতে "দেওয়ানী কার্য্য-বিধি নামে মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত "গবর্ণর জেনরেলের কৃত ১৮৫৯ সালের ৮ আই- "নের অথবা ভারতবর্ষের উপযুক্ত ব্যবস্থাপক "সমাজ উক্ত আইন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন "করার জন্য যে সকল আইন প্রচার করিয়াছেন "তাহার, যথাসাধ্য অনুসরণ করিবেন।"

১৮৬৫ সালের ২৮ এ ডিসেম্বর তারিখে প্রধানতম বিচারালয় যে কতিপয় নিয়ম প্রচার করেন, তাহাতে হুকুম হয় যে, প্রধানতম বিচারালয়ে যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হইবে, (কেবল নাবিক সম্বন্ধীয় ও উইল দ্বারা পরিত্যক্ত ও উইল ব্যতীত পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা ভিন্ন) তাহার সমুদায় কার্য্য-প্রণালী, উক্ত রাজকীয় সনন্দ প্রচলিত হওয়ার কালে উক্ত প্রধানতম বিচারালয়ের কার্য্য-প্রণালী শাসন করার জন্য ১৮৫৯ সালের ৮ আইন ও ১৮৬১ সালের ২৩ আইন অথবা অন্য কোন আইন কিম্বা ঐ বিচারালয়ের যে নিয়ম সমস্ত প্রচলিত ছিল, তাহার যে সকল বিধান উক্ত সনন্দের বিধানের বিরুদ্ধ নহে, তদ্দ্বারা শাসিত হইবে।

কিন্তু ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৩ ধারা ১৮৬৫ সালের রাজকীয় সনন্দের ৩৬ ধারার সহিত

অনৈক্য; অতএব যখন দুই বিচারপতির পরস্পর মতভেদ হয়, তখন অন্য এক বা অধিক বিচারপতির নিকট অর্পণ অথবা তর্কবিতর্ক করার পরিবর্তে ৩৬ ধারামতে কার্য্য-প্রণালী এই যে, জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায় প্রবল হইবে, কিন্তু তাহা ১৫ ধারার বিধানের অধীন হইবে, অর্থাৎ যখন হাইকোর্টের অথবা কোন খণ্ডাধিবেশনের দুই বিচারপতির রায় তুল্যাংশে অনৈক্য হইবে, তখন সেই রায়ের অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টেই আপীল চলিবে। অতএব অপর এক কি অধিক বিচারপতির সমক্ষে পুনঃ তর্কবিতর্ক করার যে প্রণালী ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের দ্বারা প্রচলিত ছিল, তৎপরিবর্তে ১৮৬৫ সালের সনন্দের দ্বারা বিধিবদ্ধ হয় যে, প্রথমে দুই বিচারপতির দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে, কিন্তু ঐ সনন্দের ১৫ ধারায় মতে তাহার আপীল চলিবে। ঐ সমস্ত বিধানের দ্বারা আমার বিবেচনায়, ২৫৭ ধারার বিধান রূপান্তরিত হইয়াছে। হাইকোর্টে ঐ আপীল হইলে তাহার যে শেষ নিষ্পত্তি হয়, তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

বিচারপতি কেম্প ও গ্লবরের সমক্ষে বাস্তবিক দুইটি প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে বাস্তবিক দুইটি ইসু ছিল:—প্রথম ইসু এই যে, নীলামের কোন অনিয়ম হইয়াছিল কি না; এবং দ্বিতীয়, প্রার্থী আদালতের সন্তোষকর রূপে সাব্যস্ত করিয়াছে কি না যে, ঐ অনিয়মের দ্বারা সে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ইহা দুইটি পৃথক্ পৃথক্ ইসু এবং দুইটি পৃথক্ পৃথক্ প্রশ্ন। এই দুই প্রশ্নের এক প্রশ্নেরও সিদ্ধান্ত প্রার্থীর বিরুদ্ধ হইলেই তাহার আপীল ডিস্‌মিস্ হইত।

প্রথম প্রশ্ন, অর্থাৎ নীলামে বাস্তবিক অনিয়ম হইয়াছে কি না, এতৎসম্বন্ধে ঐ বিচারপতি দ্বয়ের মধ্যে মতভেদ হয় নাই। তাঁহারা বৃত্তান্তে প্রবেশ করিয়া দলীল সমস্ত তদন্ত করার পরে তাঁহাদের প্রতীতি হয় যে, নীলাম করায় অনিয়ম হইয়াছিল। কথিত অনিয়ম এই যে, ২৪৯ ধারা মতে যে প্রকার এস্তাহার হয় যে, সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিক্রীত হইবে, তাহা না হইয়া সম্পত্তি এক লাটে নীলাম হইয়াছে।

আমার ইহা বলা উচিত যে, যদি সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিক্রীত হওয়ার বিজ্ঞাপন হয়, তাহা হইলে তাহা এক লাটে বিক্রয় করার সংবাদ না দিয়া তাহা এক লাটে বিক্রয় করা অনিয়মিত কার্য্য। যে সম্পত্তি বিক্রীত হইবে, তাহার বর্ণনা দেওয়ার জন্য ২৪৯ ধারায় যে বিধান আছে, তাহা যে যে দফার সম্পত্তি বিক্রীত হইবে, তাহারই বর্ণনা বুঝায়, এবং সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করা ও দফা দফা অর্থাৎ সেই সমুদায় সম্পত্তির পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড বিক্রয় করা সমান কথা নহে।

এমন অনেক স্থল ঘটিতে পারে, যাহাতে যে সম্পত্তি পৃথক্ পৃথক্ লাটে বিক্রয় করার এস্তাহার হইয়াছে, তাহা সমুদায় পক্ষগণের উপকারের জন্য এক লাটে বিক্রয় করা উচিত হয়। এই প্রকার নীলাম অনিয়মিত হইলেও তাহা সরলান্তঃকরণে এবং দায়ীর উপকারের জন্য হইতে পারে। কিন্তু পক্ষান্তরে, ইহাও হইতে পারে যে, ঐ প্রকার নীলামের দ্বারা দায়ীর যার পর নাই ক্ষতি হইতে পারে।

যদি নীলামের এই এস্তাহার হয় যে, সম্পত্তি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাটে বিক্রীত হইবে, তাহা হইলে কেবল যে সকল ক্রেতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাট ক্রয় করিতে পারে তাহারা সংবাদ পাইবে এবং যে সকল ব্যক্তি সমুদায় লাট একত্রে ক্রয় করিতে পারে তাহারা হয়ত নীলামে উপস্থিত হইবে না, কারণ, তাহারা সমুদায় সম্পত্তি হস্তগত করার ইচ্ছায় অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাট ক্রয় করার নিমিত্ত অন্যের সহিত ডাক বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা না করিতে পারে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর, এক হাজার একর ভূমি এমারত নির্ম্মাণের জন্য ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র লাটে

বিক্রয় করার এস্তাহার হয়; তাহা হইলে যে সকল ধনী সমুদায় সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারে, দায়ীর উপকারের উদ্দেশে ২৪৯ ধারায় যে সংবাদ প্রচারের অনুজ্ঞা আছে ঐ সংবাদ তাহারা পাইবে না, এবং হয়ত নীলামে তাহারা উপস্থিত থাকিবে না। উপস্থিত মোকদ্দমায় ঠিক কি ভাবের এস্তাহার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে। বিচারপতি কেম্প ও গ্লবর সমুদায় দলীল তদন্ত করিয়া দুই জনেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এস্তাহার অনুযায়ী নীলাম হয় নাই। অতএব এই প্রশ্নের অথবা ইসুর তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

১৮৬৫ সালের সনন্দের ৩৬ দফায় লেখা আছে যে, "যদি কোন বিষয়ের কি নিষ্পত্তি "করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে জজদিগের মতভেদ "হয়, তবে অধিক জজ থাকিলে অধিকাংশের "রায় অনুসারে সেই বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে; "কিন্তু যদি জজদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকের এক "রায় এবং দ্বিতীয় অর্দ্ধেকের আর একরায় "হয়, তবে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায় প্রবল হইবে।"

বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয়ের যে বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে তাহা এই যে, ঐ অনিয়মের দ্বারা প্রার্থী বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে কি না। যখন এই প্রকার দুই জজের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে ১৫ ধারায় আপীলের বিধান আছে।

১৫ ধারার অর্থ সম্বন্ধে যে মোকদ্দমা প্রধান বিচারপতি ও দুই জন বিচারপতির সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, রায়ের যে ভাগ সম্বন্ধে বিচারপতিদ্বয়ের মতভেদ হয় কেবল তাহার বিরুদ্ধেই আপীল চলিবে।

সেই মোকদ্দমায় রায় বিভক্ত হইতে পারিত, কারণ, তাহা সম্পত্তির পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড সম্বন্ধে প্রদত্ত হয়। উপস্থিত মোকদ্দমায়ও তাহা বিভক্ত হইতে পারে, কারণ, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ইসুর উপরে প্রদত্ত হয়, এবং তাহার প্রত্যেকের সম্বন্ধে ডিক্রীদারের অনুকূল নিষ্পত্তি হইতে পারিত। আমরা বিবেচনা করি যে, বৃত্তান্ত-ঘটিত যে ইসু ঐ দুই বিচারপতি-কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহাতে তাঁহাদের মতভেদ না হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে না, এবং সেই পৃথক্ ইসুর তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব আমাদের কেবল এই প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে যে, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে কি না যে, ঐ অনিয়মের দ্বারা প্রার্থী বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিচারপতি কেম্প বলেন যে, "যদি "এই দুই কুঠী পৃথক্ পৃথক্ রূপে বিক্রীত "হইত, তবে প্রত্যেক লাটের জন্য ক্রেতা যে, "পাওয়া যাইত না, এমত বলা যাইতে পারে "না।"

কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ইহা যথেষ্ট নির্দ্দেশ নহে। প্রার্থীর ক্ষতি হইয়া থাকিবে, কেবল ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট হয় না। তাহার ইহা নির্দ্দিষ্ট রূপে আদালতকে দেখাইতে হইবে যে, ঐ অনিয়মের দ্বারা তাহার বাস্তবিক ক্ষতি হইয়াছে; অতএব সম্পত্তি পৃথক্ পৃথক্ লাটে বিক্রীত হইলে ক্রেতা পাওয়া যাইত, এই কথায় যদি সন্দেহ থাকে, এবং তদ্বিষয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা বোধ হয় বিচারপতি কেম্পও স্বীকার করিয়াছেন, তবে ঐ নির্দ্দেশের দ্বারা নীলাম রদ করা যাইতে পারে না।

অল্প মূল্যে সম্পত্তি বিক্রীত হওয়ার প্রমাণ আমার বিবেচনায়, নিতান্ত অসন্তোষকর। যে সাক্ষীর উপরে প্রার্থী অধিক নির্ভর করে সে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, দুই কি তিন বৎসর পূর্ব্বে সে এই কুঠীর ।০ আনা অংশ ৪০০০০ টাকায় বিক্রয় করিয়াছে। তৎকালে কুঠী অত্যন্ত উন্নত অবস্থায় ছিল। ৩৫০০ বিঘার চাষ ছিল এবং কুঠী যদি এইক্ষণে সেই অবস্থায় থাকিত, এবং তৎকালের ন্যায় নীলের যদি এইক্ষণেও

তদ্রূপ আশা থাকিত, তবে মোট মূল্য ১৬০০০০ টাকা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল”। কিন্তু সাক্ষীকে জেরা করা হইয়াছিল, এবং জেরা-সওয়ালে সে স্বীকার করে যে, কুঠীর অন্য মূল্য ছিল, এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সে ও মেং অর্কুহার্ট সমুদায় কুঠী ৬০০০০ টাকায় ক্রয় করিয়াছিল; কিন্তু তাহা ১৮৫৯ সালের কথা। তৎকালে ১৮০০ বিঘার চাষ ছিল। সে স্বীকার করিয়াছে যে, কুঠীর মূল্য এক্ষণে অনেক ন্যূন হইয়া গিয়াছে। যদিও কুঠীর মূল্য এইক্ষণে ন্যূন হইয়া গিয়াছে তথাপি এখনও ১৮০০ বিঘার চাষ আছে কি না, তদ্বিষয়ে তাহাকে জেরার পরে পুনরায় সওয়াল করার কালে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। ১৮৫৯ সালে যে মূল্য ছিল এখনও যে সেই মূল্যই আছে, তাহা দেখাইবার কোন প্রমাণ নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, এইক্ষণে কুঠীর কি মূল্য, তাহাতে সে উত্তর করে যে, সে তাহা জানে না, কিন্তু ১৮৬৯ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে পুপ্‌রী কুঠী যে ৩৭০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে তাহার বিবেচনায়, তাহা অতি অল্প মূল্য।

১৫ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে যাহা বিক্রীত হয়, তাহাই যদি পুপ্‌রী কুঠী হয়, তবে তাহা ৩৭০০০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছে। সাক্ষী যে পুপ্‌রী কুঠীর কথা বলিয়াছে যে, তাহা ৩৭০০০ টাকায় অতি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে, তাহাতে যদি বনগাঁর কুঠী যাহা ২ রা মার্চ তারিখে নীলাম হয়, তাহাও ভুক্ত থাকে, তবে সমুদায় সম্পত্তি ৪৪৫০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে।

কুঠীর প্রকৃত মূল্য কি এবং তদন্তর্গত ভূমি সমস্ত জমিদারীর ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিক্রয় করিলে কত মূল্য হইতে পারিত, তাহা প্রার্থী অনায়াসেই দেখাইতে পারিত। সে বহু বৎসরাবধি দখীলকার ছিল, কত বিঘা ভূমিতে চাষ হয়, এবং পার্শ্ববর্তী এই রূপ ভূমির কি খাজানা এবং প্রজাদিগকে তাহা ভিন্ন ভিন্ন লাটে ইজারা দিলে, সে কত টাকা পাইতে পারিত, তাহা সে অবশ্যই অবগত ছিল। কিন্তু এই সকল বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদত্ত হয় নাই, অতএব আমার বোধ হয় যে, দায়ীর প্রধান সাক্ষীর সাক্ষ্য উত্তম রূপে অনুধাবন করিলে আমরা কোন মতেই এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, কুঠী ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিক্রয় না করিয়া এক লাটে বিক্রয় করাতে দায়ীর বাস্তবিক ক্ষতি হইয়াছে।

ফল এই যে, আমার বিবেচনায়, বিচারপতি কেম্পের রায় অন্যথা হইবে এবং দায়ী এই আদালতের ও নিম্ন আদালতের খরচা দিবে।

মেং কাউয়েল আমাদের সমক্ষে আর যে এক কথা উপস্থিত করিয়াছেন তাহার উপরে আমরা কিছু রায় ব্যক্ত না করিয়া পারি না। আমরা দেখিতেছি যে, এই সম্পত্তি ডিক্রীদার কর্তৃক ক্রীত হইয়াছে, এবং অধঃস্থ জজ দায়ীর আপত্তি অগ্রাহ্য করিবার পরে ডিক্রীদার দরখাস্ত করে যে, মেং লিংহামের নাম।৵ আনার শরীক বলিয়া লেখার আদেশ হয়। ঐ দরখাস্ত রায় নন্দীপত মাহতার দ্বারা ৫ ই এপ্রিল তারিখে দাখিল হয়। ৩ য় বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১৪ পৃষ্ঠার মোৎফরকা নিষ্পত্তিতে প্রধান বিচারপতি যে বলিয়াছেন যে, ডিক্রীজারীর নীলামের প্রতি সর্ব্বদা অতি সাবধানে দৃষ্টি করা আবশ্যক, বিশেষতঃ, যখন দেখা যায় যে, সম্পত্তি তাহার উচিত মূল্যের অনেক ন্যূন মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে এবং যখন ডিক্রীদারই নিজে তাহা ক্রয় করে, তখন তাহা বিশেষরূপে দেখা আবশ্যক, ইহাতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত। এবং যে স্থলে এমত দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তি বিচারাদিষ্ট দায়ীর উকীল তাহার নাম ডিক্রীদারের সহিত ক্রেতা বলিয়া যোগ হয়, সে স্থলে আরও অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক হয়।

এটর্ণী সম্বন্ধীয় এক মোকদ্দমায় হৌস্ অব্ লর্ডসের সমক্ষে এই প্রকার এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় এবং তাহা ৬ ষ্ঠ বালম ক্লার্ক ও ফিনেলীর

রিপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। অষ্টিন নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে নীলাম হয়। চেম্বরস নামক তাহার এটর্ণী উপস্থিত হইয়া অতি উচ্চ ডাক করাতে ক্রেতা বলিয়া গ্রাহ্য হয় এবং সে ক্রয়-মূল্য দেয়। সেই নীলাম ১৭৯৫ সালে হয়। ঐ নীলাম অন্যথা করার জন্য চ্যান্সরী আদালতে নালিশ উপস্থিত হয়।* নালিশের ঠিক তারিখ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু যে জওয়াব তাহার কিয়ৎকাল পরেই দাখিল হয় তাহা ১৮৩০ সালের ফেব্রুয়ারি তারিখে অর্থাৎ নীলামের ৩৫ বৎসর পরে প্রদত্ত হয়। হৌস অব্ লর্ডস বলেন যে, "নীলামের বিরুদ্ধে আপেলাণ্টের "পক্ষে দুই আপত্তি হইয়াছে; তাহার এক "আপত্তি এই যে, যখন সম্পত্তির মালিক "দেখিল যে, নীলাম হইবে, তখন সে মেৎ "চেম্বরস্‌কে উপস্থিত হইয়া তাহার এজেণ্ট "স্বরূপে ক্রয় করিতে বলে। দ্বিতীয় আপত্তি "এই যে, মেৎ চেম্বরস্ তাহার এজেণ্ট বিধায় "আপন মওক্কেলের যত দূর উপকার করিতে "পারে তাহা তাহার করা উচিত ছিল, অতএব "সে তাহার মওক্কেলের যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহা সে রক্ষা করিতে পারে না।" লর্ড কটেন-হ্যাম বলেন "আমার ইহা বলিবার কোন বাধা "নাই যে, যদি এই দুই প্রস্তাবের কোন প্রস্তাবেরই "হাঁ বলিয়া উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তবে "মেৎ চেম্বরস্ ইতিমধ্যে সম্পত্তির উপরে যে "টাকা ব্যয় করিয়াছে তাহা তাহাকে ফেরৎ "দিয়া আপেলাণ্ট সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে "স্বত্ববান হইবে, কারণ, ন্যায়পরতার যুক্তি "অনুসারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, নীলামের "সময় যে ব্যক্তি ক্রেতার এজেণ্ট স্বরূপ কার্য্য "করে, সে তাহা তাহার নিজের উপকারের "জন্য ক্রয় করিতে পারে না।"

শেষে হৌস অব্ লর্ডস্ কয়েকটি ইসুর বিচার করিতে আদেশ করেন এবং তাহার মধ্যে একটি ইসু এই যে, ক্রয়ের সময়ে চেম্বরস্ অষ্টিনের মোক্তার ছিল কি না, এবং জুরি সেই ইসু বাদীর অনুকূলে নির্দ্দেশ করেন। অতএব এমত অবস্থায় এটর্ণী যে ক্রয় করিয়াছিল তাহা ৩৫ বৎসর পরে অন্যথা হয়।

উপস্থিত মোকদ্দমায়, ইহা সত্য বটে যে, মেৎ লিংহাম্ মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় অর্কু-হার্টের উকীল থাকা প্রকাশ নাই; অতএব আমি তাঁহাকে সেই কথার উপকার লাভ করিতে দিলাম। তিনি অর্কুহার্টের সাধারণ উকীল ছিলেন না। কিন্তু ডিক্রীজারীর কার্য্যে তিনি তাহার পক্ষে কার্য্য করেন। তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করার হুকুম লওয়ার জন্য তিনি নিয়োজিত হন। উপরি উক্ত প্রকারে নীলাম করার সম্মতি দেওয়ার জন্য তিনি অর্কুহার্টের পক্ষে কার্য্য করেন। তিনি নীলামের সময় পর্য্যন্ত যে অর্কু-হার্টের উকীল ছিলেন না তাহা দেখাইবার কোন প্রমাণ নাই, এবং আমি বিবেচনা করি যে, অর্কুহার্টের স্পষ্ট সম্মতি ভিন্ন তিনি নীলাম ডাকিতে পারেন না। ডিক্রীদারের এক যোগে তিনি ক্রেতা হওয়াতে, ডিক্রীদারের মোকদ্দমার উপরে অনেক সন্দেহের হেতু হইয়াছে। মেৎ লিংহাম তাঁহার ক্রয়ের পোষকতা করিতে পারেন কি না, এবং দায়ীর স্বত্ব রক্ষা করা দায়ীর যে উকীলের কর্ত্তব্য ছিল, সেই উকীলের এক যোগে রায় নন্দীপত মাহতা দায়ীর ক্ষতি করিয়া যে নীলাম ক্রয় করিয়াছে তাহা সে স্থির রাখিতে পারে কি না, এবং এই দুই জনের কি তন্মধ্যে এক জনের সম্বন্ধে নীলাম অন্যথা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র নালিশ উপস্থিত হইলে সেই নালি-শেই তাহার মীমাংসা হইবে। সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিক্রীত না হইয়া এক লাটে বিক্রীত হওয়াতে ন্যূন মূল্যে বিক্রীত হওয়ার যদি কোন বাস্তবিক প্রমাণ থাকিত, তবে ডিক্রীদার ও দায়ীর উকীলকে একত্রে দেখিয়া আমি বিবেচনা করি-তাম যে, ঐ প্রমাণের উপরে অনায়াসে নির্ভর

করা যাইতে পারে। কিন্তু যে স্থলে এমন প্রমাণ নাই যে, সম্পত্তি অন্য প্রকারে বিক্রীত হইলে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত, সে স্থলে ডিক্রীদার দায়ীর উকীলের যোগে ক্রয় করিয়াছে, কেবল এই কথার উপরে আমি অনুমান করিয়া লইতে পারি না যে, ভিন্ন ভিন্ন লাটে বিক্রীত হইলে অধিক মূল্য হইত। ডিক্রীদার মেং লিংহামের এক যোগে ক্রয় করিয়াছে বলিয়া প্রার্থীর যদি মেং লিংহামের বিরুদ্ধে অথবা ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পাওয়ার স্বত্ব থাকে, তবে তাহা ২৫৭ ধারামতে পরিচালিত হইতে পারে না। তাহা জাবেতা নালিশের দ্বারা পরিচালন করিতে হইবে।

বিচারপতি বেলি।—আমারও ঐ মত, অর্থাৎ বিচারপতি কেম্পের রায় অন্যথা করত বিচারপতি গ্লবরের রায় স্থির রাখিতে হইবে।

আমাদের তিন কথার মীমাংসা করিতে হইবে। প্রথমতঃ রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে মেং কাউয়েল যে তর্ক করেন তদনুসারে এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৭ ধারা দৃষ্টে আমাদের সমক্ষে আপীল চলিতে পারিবে কি না। প্রধান বিচারপতি যে কারণ দর্শাইয়াছেন তদ্দৃষ্টে আমি তাঁহার সহিত একমতে বলিতেছি যে আপীল চলিবে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যদিও খণ্ডাধিবেশনের বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয় বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই নীলামে অনিয়ম হইয়াছিল, তথাপি আমরা এইক্ষণে স্থির করিতে পারি কি না যে, এ প্রকার অনিয়ম হয় নাই। আমার বিবেচনায়, তাহা আমরা পারি না; এবং যে স্থলে খণ্ডাধিবেশনের দুই জন বিজ্ঞ বিচারপতি একমতে কোন এক কথার নির্দ্দেশ করেন, সেই স্থলে সেই নির্দ্দেশের প্রতি আপীলে আমাদের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা নাই।

১৮৬৫ সালের সনন্দের ৩৬ ধারার বাক্যগুলি অতি পরিষ্কার ও অভ্রান্ত, এবং যদি মোকদ্দমার সমুদায় বিষয়ের বিরুদ্ধে আপীল লওয়া ঐ সনন্দের অভিপ্রেত হইত, তবে আমি বোধ করি যে, "যে বিষয়ে" মতভেদ হইবে, তৎসম্বন্ধে এই প্রকার স্পষ্ট ও নির্দ্দিষ্ট শব্দ কখন ব্যবহৃত হইত না। বিচারপতি গ্লবরের রায়ে ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল এক বিষয়ের বিরুদ্ধে আমাদের নিকট আপীল হইয়াছে। বিচারপতি গ্লবর বলেন যে, "বিক্রীত সম্পত্তি সম্বন্ধে বিচার- "পতি কেম্প যাহা বলিয়াছেন তাহাতে আমি "সম্মত এবং ইস্তাহার অনুযায়ী সম্পত্তি ভিন্ন "ভিন্ন লাটে বিক্রয় না করিয়া এক লাটে বিক্রয় "করাতে যে নীলামের অনিয়ম হইয়াছে "তাহাতেও আমি সম্মত; কিন্তু তিনি তাঁহার "রায়ের যে ভাগে বলেন যে, ঐ অনিয়মের দ্বারা "বিচারাদিষ্ট দায়ীর ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে "আমি সম্মত হইতে পারি না।" অতএব এমত অবস্থায়, আমি বিবেচনা করি যে, বিচারপতিদ্বয়ের পরস্পরের যে বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে তাহা ভিন্ন অন্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা আপীল শুনিতে পারি না।

তৃতীয় কথা এই যে, নীলামের ঐ অনিয়ম দ্বারা বিচারাদিষ্ট দায়ী অর্থাৎ এই মোকদ্দমায় আপত্তিকারকের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না। এই প্রশ্নের মীমাংসা কেবল প্রমাণের উপরে নির্ভর করে, এবং পুপুরী কুঠীর অবস্থা ও নীলের সাধারণ বাজার দর সম্বন্ধে প্রদত্ত প্রমাণের দ্বারা মোকদ্দমার যে অবস্থা ব্যক্ত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে, এবং বন্ধকের এক ডিক্রীজারীতে যে, এই নীলাম হইয়াছে তাহাও দৃষ্টি করিয়া, যে মন্নুলালের সাক্ষ্যের উপরে বিচারাদিষ্ট দায়ী নির্ভর করে তাহার অথবা মেং এলিসের জবানবন্দীতে এমন কিছু দেখা যায় না যে, বাজার দর হইতে সম্পত্তি ন্যূন মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে। মন্নুলাল বলে যে, তাহার বিবেচনায় ঐ সম্পত্তি যে ৩৭০০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছে তাহা উহার উচিত মূল্য অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিন্তু তাহা কত ন্যূন অথবা ৩৭০০০ [illegible] কত অধিক উহার প্রকৃত মূল্য, তাহা সে ব[illegible] পারে নাই। ঐ

কল্পরণের কত মুল্য তাহা মেৎ এলিশও বলিতে পারেন না। ইহা সত্য বটে যে, এই সম্পত্তি অধিক মুল্যের যোগ্য বলিয়া কয়েক ব্যক্তি ব্যক্ত করিয়াছে, কিন্তু তাহারা যে সকল হেতু বিবেচনায় তাহা বলিয়াছে সেই সকল হেতু সচরাচর থাকে না। এক জন সাক্ষী যে মুল্য ব্যক্ত করে, সে তাহা ঐ ভূমির উৎকৃষ্ট ও নির্ব্বিরোধ স্বত্ব থাকার সর্ত্তে ব্যক্ত করে।

সমুদায় দৃষ্টে আমি বিবেচনা করি যে, নথীতে এমন কোন প্রমাণ নাই যদ্দ্বারা এই আদালত নির্দ্দেশ করিতে পারেন যে, নীলামের অনিয়মের গতিকে বিচারাদিষ্ট দায়ীর বাস্তবিক কোন ক্ষতি হইয়াছে।

বিচারাদিষ্ট দায়ী অর্কুহার্টের পক্ষের উকীল ডিক্রীজারীর কার্য্যে ওকালতী করার পরে ডিক্রীদারের সহিত যোগ করিয়া সম্পত্তি ক্রয় করা অনুচিত বলিয়া বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি যে যে রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতেও আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত।

প্রতিপক্ষের উপরে নোটিস জারী না করিয়া অধঃস্থ জজ কি প্রকারে এই মোকদ্দমার ২৭ এ জুন তারিখের দরখাস্তের উপরে হুকুম দিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—প্রধান বিচারপতির মতে আমি সম্মত হইলাম। (গ)

---

২৪ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৩৬৩ নং মোকদ্দমা।

সাহাবাদের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৯ এ মে তারিখের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরক্কা আপীল।

মেঘনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

রাধাপ্রসাদ সিংহ (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মুল ডিক্রীদারের পরিবর্ত্তে ডিক্রীক্রেতার নাম বসাইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করিবার হুকুম দিতে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২০৮ ধারামতে দেওয়ানী আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে; এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা যাহা যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে কেবল তৎপক্ষগণ সম্বন্ধীয় বিবাদ সমস্তে খাটে, সেই ধারার বিশেষ বিধানান্তর্গত ভিন্ন ঐ প্রকার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে না।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—আমাদের বিবেচনায়, এই মোকদ্দমা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

মহেশ্বর বক্‌স সিংহ এই মোকদ্দমায় ডিক্রীদার ছিল। কতিপয় স্থাবর সম্পত্তির দখলের জন্য ডিক্রী হয়। ১৮৬৯ সালের ২২ এ জানুয়ারি তারিখে রাধাপ্রসাদ সিংহ নামক এক ব্যক্তি যে মহেশ্বর বক্‌স সিংহের পুত্র বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সে ডিক্রীজারীর জন্য প্রার্থনা করে এবং প্রিবি কৌন্সিলে আপীল চলিতেছে বলিয়া জামিন দিতে চাহে। বিচারাদিষ্ট দায়ী এই হেতুবাদে এই দরখাস্তের প্রতি আপত্তি করে যে, রাধাপ্রসাদ আপন পিতার পরিবর্ত্তে ডিক্রীদার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কারণ, পিতা, রাধাপ্রসাদকে আইন-সঙ্গত রূপে ডিক্রী হস্তান্তর করে নাই। নিম্ন আদালত, মহারাজ মহেশ্বর সিংহের কৈফিয়ৎ তলব করেন এবং মহারাজ যে, কৈফিয়ৎ দেন যে, তিনি রাধাপ্রসাদকে ডিক্রী অর্পণ করিয়াছেন তাহা প্রাপ্ত হইয়া আদালত দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২০৮ ধারামতে, পুত্র রাধাপ্রসাদকে পিতার পরিবর্ত্তে ডিক্রীদার বলিয়া পরিগণিত হওয়ার হুকুম দেন।

এই হুকুমের বিরুদ্ধে বিচারাদিষ্ট দায়িগণ এই বলিয়া আপীল করিয়াছে যে, মুল ডিক্রীদার,

রাধাপ্রসাদের নিকট ডিক্রী হস্তান্তর করা সম্বন্ধে নথীতে ২০৮ ধারার মর্ম্মান্তর্গত কোন বিধিমত প্রমাণ নাই।

প্রথম যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে তাহা এই যে, ২০৮ ধারার অন্তর্গত হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে কি না? সেই ধারায় লেখা আছে যে, "ডিক্রী যদি বরাতক্রমে কিম্বা আইন- "মতের কার্য্যবলে আসল ডিক্রীদার হইতে "অন্য কোন লোককে দেওয়া যায়, তবে যাহার "হস্তগত হইল, সেই লোক কিম্বা তাহার উকীল "ডিক্রীজারী হইবার ঐ দরখাস্ত করিতে পারিবে। "ও আদালত যদি সেই দরখাস্ত গ্রাহ্য করা "উচিত বোধ করেন, তবে আসল ডিক্রীদারের "সেই দরখাস্ত হইবার মতে ঐ ডিক্রীজারি হইতে "পারিবে।"

তাহার পরে ৩৬৪ ধারায় ব্যক্ত যে, "ডিক্রীর "পরে, ও ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় যে কোন হুকুম "করা যায়, তাহার উপর কোন আপীল হইবে "না। কেবল যে স্থলে এই আইনে স্পষ্টরূপে "বিধান হইয়াছে সেই স্থলে হইতে পারিবে।"

অনন্তর, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারায়, ডিক্রীদার ও বিচারাদিষ্ট দায়ীর মধ্যে যে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তাহার বর্ণনা করিয়া লেখা আছে যে, এই সকল বিষয়ে, ও "যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে সেই মোক- "দ্দমার পক্ষগণের মধ্যে ঐ ডিক্রীজারী সম্প- "র্কীয় অন্য কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহা "স্বতন্ত্র মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি না হইয়া ঐ ডিক্রী- "জারীকারক আদালতের হুকুমমতে নিষ্পত্তি "হইবে, ও ঐ আদালতের সেই হুকুমের উপর "আপীল হইতে পারিবে।"

এই তিন ধারা একত্রে পাঠ করিয়া আমার স্পষ্ট বোধ হয় যে, ২০৮ ধারামতে আদালত আপন ইচ্ছামতে উপস্থিত প্রকারের দরখাস্ত গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। "আদা- "লত যদি উচিত বিবেচনা করেন," এই বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। অপিচ ৩৬৪ ধারায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিশেষ বিধানানুযায়ী না হইলে, এই প্রকার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে না। আইনের বাক্যে স্পষ্ট দেখা যাই- তেছে যে, ঐ সকল বিধান "যে মোকদ্দমায় ডিক্রী "হইয়াছে তাহার পক্ষগণের মধ্যে" সীমাবদ্ধ হইয়াছে। অতএব ডিক্রীজারীর কার্য্যে আপীল হওয়ার পূর্ব্বে যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছিল তৎপক্ষগণের মধ্যে কোন বিবাদ উত্থিত হওয়া আবশ্যক। এইক্ষণে আপেলাণ্ট আমাদের সমক্ষে যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া- ছিল, তাহাতে রাধাপ্রসাদ পক্ষ ছিল না; অতএব আমরা যদি আইনের অবিকল অর্থ করি এবং আমি বিবেচনা করি যে, আমরা তাহাই করিতে বাধ্য, তবে আমাদের মতে, উপস্থিত হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিতে পারে না। কিন্তু আপে- লাণ্টের উকীল ১১ বালম উইক্লি রিপোর্ট- রের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় এক নজীরের উল্লেখ করি- য়াছেন। ঐ মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর বিচারপতিগণের রায়ে যে বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে ঐ মোকদ্দমার ঠিক বৃত্তান্ত সমস্ত যে আমি বুঝিতে পারিয়াছি এমত আমি নিশ্চিত রূপে বলিতে পারি না; কিন্তু বোধ হয়, তাঁহারা এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যদি কোন মোকদ্দমায় বিচারা- দিষ্ট দায়ীর স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হয়, তবে সে মূল মোকদ্দমায় পক্ষ না থাকিয়া থাকিলেও, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিধান মতে তাহার আপীল করার স্বত্ব আছে। এই বিষয়ে বিজ্ঞবর বিচারপতি জ্যাক্সন বলেন যে, "আমার বিবে- "চনায়, ব্যবস্থাপক সমাজের এমত অভিপ্রায় "কখনই বোধ হয় না যে, যে সকল ব্যক্তি "পূর্ব্বে মোকদ্দমার পক্ষ ছিল না, এবং যাহারা "ডিক্রীর পরে স্থলাভিষিক্ত রূপে পক্ষ হয়,

"তাহাদের সম্বন্ধে ডিক্রীজারীর মধ্যে যে হুকুম "দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা তাহাদের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইতে "পারিবে, অথচ তাহারা ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে "উপরিস্থ আদালতে আপীল করিতে পারিবে "না। অতএব আমি বোধ করি না যে, আমা- "দিগের এমত বলা উচিত যে, জজ এ স্থলে "আপীল গ্রহণ করিতে ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।" বিচারপতি জ্যাক্সনের এই রায়, এবং ইহাতে দ্বিতীয় বিচারপতিও সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি আমরা ইহাও নির্দ্দেশ করি যে, সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত উপস্থিত মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অনুরূপ, সুতরাং ঐ নজীর এ স্থলে খাটে, তথাপি এক জন বিজ্ঞবর বিচারপতি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এই কথা অন্ততঃ উইক্লি রিপো- র্টরের ঐ বালমের ১ ম পৃষ্ঠায় পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির অধিকাংশ বিচারপতিগণের রায়ের বিরুদ্ধ। কিন্তু বস্তুতঃ আমি বিবেচনা করি যে, সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত উপস্থিত মোকদ্দ- মার বৃত্তান্তের অনুরূপ নহে, কারণ, এ স্থলে আপেলাণ্টের তর্ক এই যে, রেস্পণ্ডেণ্ট মোকদ্দ- মার এই অবস্থায় পক্ষ নহে; অতএব যে স্থলে সে পক্ষ নহে বলিয়া ব্যক্ত করাই আপীলের উদ্দেশ্য, সে স্থলে আপীলের জন্য তাহাকে পক্ষ বিবেচনা করা সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক, আইনের স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, ইহাতে আপীল চলিতে পারে না, কারণ, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছিল, তাহাতে যাহারা পক্ষ ছিল না, তাহাদের মধ্যেই এই বিবাদ উত্থিত হইয়াছে।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আপীল চলিবে না, সুতরাং আমি খরচা সমেত এই আপীল ডিস্মিস্ করিব।

বিচারপতি বেলি।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

২৪ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৪৬১ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের সদর আমীনের ১৮৬৮ সালের ২৭ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ১৮ ই আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

লালচাঁদ রায় (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

বৃন্দাবনচন্দ্র রায় (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গোপাললাল মিত্র ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন ও বাবু শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যে এক ফৌজ- দারী অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রতিবাদী সেই সাক্ষ্য দাখিল করাতে, তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমায় অবিশ্বাস্য হইয়াছে বলিয়াই আদালত তাহা অগ্রাহ্য করায়, স্থির হইল যে, এই কার্য্য অন্যায় হইয়াছে।

বিচারপতি গ্লবর।—বাদী এই মোকদ্দমায় এই বলিয়া ৮৭২ টাকার জন্য নালিশ করে যে, সে তাহার চাকর সূত্রে প্রতিবাদীকে যে কতিপয় দ্রব্য বিক্রয় করিতে দিয়াছিল, এবং যাহা প্রতি- বাদী লভ্যের সহিত বিক্রয় করত ১৬৭০৷৵৬ টাকা পায়, সেই টাকার মধ্যে ঐ ৮৭২ টাকা বাকী আছে।

বাদী কহে যে, এই মোট টাকার মধ্যে সে কেবল ৭৯৮৷৷০ পাইয়াছে, এবং প্রতিবাদীর নিকট তাহার এখনও ৮৭২ টাকা প্রাপ্য।

প্রতিবাদী কহে যে, সে চাকর নহে, এক ক্ষুদ্র অংশের ভাগী। কিন্তু সে দ্রব্যের মূল্য ও লভ্য ১৬৪৬ টাকা পাওয়া স্বীকার করিয়া মূল

জওয়াব এই দেয় যে, সে বাদীকে এই সমুদায় টাকা দিয়াছে, সুতরাং সে দায়ী নহে।

দেখা যাইতেছে যে, এই নালিশ উপস্থিত থাকার কালে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ফৌজদারী আদালতে বাদি-কর্তৃক নালিশ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে নিম্ন আদালতে প্রতিবাদী অপরাধী সাব্যস্ত হয়। কিন্তু সে এই হেতুবাদে হাইকোর্টের দ্বারা মুক্তি পায় যে, সে বাদীর শরীক, অতএব সে অপরাধী নহে।

উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রথম আদালত এই দীর্ঘ ও কিছু জড়িত ইসু নির্দ্ধারণ করেন যে, প্রতিবাদী বাদীর শরীক কি না, এবং সে বাদীর কথিত টাকা পাইয়াছে কি না, এবং প্রতিবাদী নিজে যে প্রকার বলে, সেই প্রকার সে বাদীকে টাকা দিয়াছে কি না?

তিনি প্রমাণ দৃষ্টে নির্দ্দেশ করেন যে, টাকা পরিশোধিত হইয়াছে; এবং বখ্রার প্রশ্ন তিনি যে সমস্ত হেতুবাদে বিচার করিতে অস্বীকার করেন, তাহা তাঁহার রায়ে বর্ণিত আছে।

আপীলে জজ বিবেচনা করেন যে, টাকা দেওয়া না দেওয়ার কথাই পক্ষগণের মধ্যে আসল ইসু, এবং প্রমাণ দৃষ্টে তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, ৭৯৮৷৷৹ টাকা দেওয়ার কথা সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব তিনি বাকী টাকার জন্য বাদীকে ডিক্রী দেন।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, যে স্থলে আপেলাণ্ট বাদীর বখ্রাদার ছিল, সে স্থলে উপস্থিত নালিশ নিকাশের জন্য না হওয়ায় চলিতে পারে না।

এই আপত্তি আমাদের সমক্ষে প্রবল রূপে উত্থাপিত হয় নাই। আপেলাণ্ট যে মূল আপত্তি সম্বন্ধে তর্ক করে, (যদিও সে তাহা তাহার আপীলের হেতুতে লেখে নাই) তাহা এই যে, বখ্রার হিসাবের বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত নালিশের নিষ্পত্তি হইতে পারে না, এবং যে স্থলে প্রথম আদালত বখ্রাদারীর ইসু উত্থাপন করিয়াছিলেন, সে স্থলে জজের সেই ইসুর বিচার করা উচিত ছিল।

কিন্তু প্রথম আদালত বখ্রাদারীর ইসু উত্থাপন করিয়া থাকিলেও তাহার নিষ্পত্তি করেন নাই, এবং এই কারণে তাহা করেন নাই যে, যদিও প্রতিবাদী বখ্রাদার বলিয়া দাবী করিয়াছিল, তথাপি সে তাহার অংশের কোন টাকা লয় নাই, এবং মুন্সেফ বিবেচনা করিয়াছেন যে, কেবল আনুষঙ্গিক রূপেই তাহার বখ্রাদারীর প্রসঙ্গের উল্লেখ হইয়াছিল; কিন্তু টাকা দেওয়া না দেওয়াই আসল বিচার্য্য প্রশ্ন। আমাদের বোধ হয় যে, তাহাই পক্ষগণের মধ্যে বিচার্য্য প্রশ্ন ছিল, এবং জজ যদি তাহা উচিত রূপে বিচার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার যাহা কিছু করা আবশ্যক ছিল, তাহা তিনি করিয়াছেন। কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, জজ এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে প্রতিবাদীর তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যে এই বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে বিশ্বাসঘাতকতার যে অভিযোগ হয়, তাহাতেই তাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়া অবিশ্বাস্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা জজের আইন-ঘটিত ভ্রম। যদি জজ এই প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে বটে, এবং তাঁহার নিষ্পত্তির বাক্যগুলি দ্বারা খাস আপেলাণ্টের তর্ক প্রতিপন্ন হইতেছে।

খাস রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে মেং এলেন কর্ত্তৃক তর্কিত হইয়াছে যে, এই সাক্ষ্য ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক অবিশ্বাস্য পরিগণিত হইয়াছিল, বলিয়া জজের তাহা অগ্রাহ্য করার ইচ্ছা ছিল না, জজ কেবল আনুষঙ্গিক রূপে ঐ কথা কহিয়াছিলেন; এবং জজের রায়ের নিম্নলিখিত শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, যথা, "সমুদায় "সাক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহাকে টাকা "দেওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ বলিতে পারি না।"

অপিচ, "সমুদায়ের উপরে আমি বিবেচনা "করি যে, বাদী যে টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার "করিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক টাকা দেওয়ার "কথা প্রতিবাদী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।" কিন্তু জজের সমুদায় রায় পাঠ করিয়া আমি ইহা ভিন্ন আর কিছু সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, সেশন জজ ঐ তিন সাক্ষীর জবানবন্দী অবিশ্বাস্য বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়াই জজ তাহাদিগকে সাক্ষীর শ্রেণী হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন; এবং তাহা যদি হইয়া থাকে, তবে প্রতিবাদীর মোকদ্দমা সুন্দর ও সম্পূর্ণ রূপে বিচারিত হয় নাই। এই সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করা উচিত ছিল, এবং জজ স্বীকার করেন যে, তাহা তিনি করেন নাই।

যে টাকার ডিক্রী হইয়াছে তৎপ্রতি আর এক আপত্তি উত্থিত হইয়াছে। তর্কিত হইয়াছে যে, যে স্থলে প্রতিবাদী যত টাকা পাওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছে, জজ কেবল সেই কথার উপরে এবং বাদীর নিকট তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ না লইয়াই নিষ্পত্তি করিয়াছেন, সে স্থলে তাহার উপরেই তাঁহার হিসাব করা উচিত ছিল।

প্রতিবাদী স্বীকার করিয়াছে যে, সে দ্রব্যের মূল্য ও তাহার লভ্য সমেত ১৬৪৬ টাকা পাইয়াছে। বাদী স্বীকার করিয়াছে যে, সে ৭৯৮ টাকা পাইয়াছে, অতএব তাহার ৮৪৮ টাকা বাকী থাকিবে, ৮৭২ টাকা বাকী থাকিবে না। প্রতিবাদীর ঐ তিন জন সাক্ষীর জবানবন্দী পর্য্যালোচনা করার পরেও যদি জজের রায়ে টাকা দেওয়া সপ্রমাণ হয়, তবে তিনি ঐ কথা স্মরণ রাখিবেন। নথীর সমুদায় প্রমাণের উপরে এই ইসুর বিচার করার জন্য জজের নিকট এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইল। খরচা নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

২৫এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ, বি, বেলি।

১৮৬৯ সালের ৪৫৩ নং মোকদ্দমা।

গয়ার প্রতিনিধি জজের ১৮৬৯ সালের ১লা জুলাই তারিখের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মসম্মত এতওয়ারী (প্রার্থী) আপেলাণ্ট।

রামনারায়ণ রাম (প্রতিপক্ষ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বুধসেন সিংহ আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

**চুম্বক।**—নাবালগের শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিতা-কর্তৃক অভিভাবক নিয়োজিত হইলেও, আদালত ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে, নাবালগের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থে অন্য এক ব্যক্তিকে অভিভাবক নিযুক্ত করিতে পারেন।

**প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।**—দেবীদয়াল এবং মহাদেব লাল নামে ৫ ও ২॥ বৎসর বয়স্ক দুই নাবালগের মাতা মসম্মত এতওয়ারী, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে ঐ নাবালগদ্বয়ের সম্পত্তির অভিভাবিকা ও কার্য্যাধ্যক্ষা স্বরূপে সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রার্থনা করে। সে বলে যে, ঐ নাবালগদ্বয়ের পিতা সম্পত্তির অপচয় করিতেছে, এবং অবশিষ্ট সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য এবং পিতা যে সমস্ত সম্পত্তির অপচয় করিয়াছে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করার নিমিত্ত তাহার ঐ অভিভাবিকার পদে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। প্রতিনিধি জজ বলেন যে, পিতা কেবল সুরাপানে রত বলিয়া তাহা তাহার স্বাভাবিক কর্তৃত্ব হইতে পুত্রদিগকে উঠাইয়া লওয়ার কারণ হইতে পারে না।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ৩৭ ধারার বিধান এই যে, যে নাবালগের পিতা বর্তমান আছে এবং নাবালগ নহে তাহাদের শরীর

রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই আইনের দ্বারা অভিভাবক নিযুক্ত হইবে না।

নাবালগের কেবল শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করিতে ঐ আইনে যে নিষেধ আছে তাহাতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, নাবালগের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে তাহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করার নিমিত্ত আদালতকে নিষেধ করার মনস্থ ছিল না।

৪র্থ ধারায় লেখা আছে যে, যে নাবালগের সম্পত্তি সম্বন্ধে ঐ প্রকার সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয় নাই, তাহার কোন আত্মীয় বা বন্ধু নাবালগের শরীরের এবং সম্পত্তির ভারগ্রহণার্থে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার জন্য দেওয়ানী আদালতে প্রার্থনা করিতে পারে।

৬ ধারায় লেখা আছে যে, যখন নাবালগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণ করার দাবীদার কোন ব্যক্তি অথবা নাবালগের কোন আত্মীয় বা বন্ধু দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত করিবে, তখন আদালত ঐ দরখাস্ত শ্রবণ করার জন্য এক দিন স্থির করিবেন। ঐ নির্দ্দিষ্ট দিবসে আদালত মোকদ্দমার অবস্থা সরাসরী রূপে তদন্ত করিয়া হুকুম দিবেন।

৭ ধারা অতি আবশ্যকীয়। ইহার এই বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে যে, "নাবালগের সম্পত্তির ভার লইবার দাওয়াদার কোন লোক "উইল বা দলীলক্রমে সেই দাওয়ার স্বত্ববান "বটে ও সেই সম্পত্তির ভার লইতে চাহে "এমত দৃষ্ট হইলে আদালত তাহাকে সরবরাহ "করিবার সার্টিফিকেট দিবেন।"

অতএব যদি সম্পত্তির দাতা অথবা পিতা, তাহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা পরিচালন করত কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তবে সেই ব্যক্তি উচিত রূপে নিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া আদালত তাহাকে গ্রাহ্য করিবেন। তাহার পরে ঐ ধারায় লেখা আছে যে, "যদি কোন লোক সেই প্রকারে নিয়োজিত না হইয়া থাকে," অর্থাৎ উইল বা দলীল ক্রমে নিয়োজিত না হইয়া থাকে, "কিম্বা যদি সে ঐ "কর্ম্মের ভার লইতে না চাহে, ও ঐ নাবাল"গের কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব যদি সেই সম্পত্তির "জেম্মা লইতে চাহে, ও উপযুক্ত হয়, তবে আদা"লত তাহাকে সার্টিফিকেট দিতে পারেন।" অনন্তর লেখা আছে যে, "যদি পিতা কোন "অভিভাবক নিযুক্ত না করিয়া গিয়া থাকেন, "তবে আদালত উচিত বোধ করিলে সেই "পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে বা নাবালগের সেই জ্ঞাতিকে "বা অন্য কোন জ্ঞাতি কুটুম্বকে কি বন্ধুকে "ঐ নাবালগের অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করিতে "পারিবেন।"

অতএব পিতা কর্ত্তৃক নাবালগের শরীর রক্ষণাবেক্ষণের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া থাকিলেও, আদালত তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে পারেন।

উপস্থিত মোকদ্দমায় দেখা যাইতেছে যে, গয়ার প্রতিনিধি জজ নাবালগের শরীরের তত্ত্বাবধারক ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করায় যে প্রভেদ আছে, তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। যদি এই পরিবার মিতাক্ষরার অধীন হয়, তবে নাবালগেরা তাহাদের জন্ম-সূত্রেই যে সম্পত্তিতে তাহাদের পিতার সহিত এজমালীতে স্বত্ববান হইয়াছে, তাহা তাহাদের পিতাকে অপচয় করিতে নিবারণ করার জন্য আদালতে তাহাদের দরখাস্ত করার স্বত্ব আছে; অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, নাবালগের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ও নালিশ উপস্থিত করার জন্য আদালতের অভিভাবক নিযুক্ত করার ক্ষমতা আছে, এবং পিতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি সেই অভিভাবক হইতে পারে। এবং ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ৪, ৬ ও ৭ ধারা অতি সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, নাবালগের স্বত্ব রক্ষার জন্য

ঐ আইন মতে অভিভাবক নিযুক্ত করা যাইতে পারে।

পিতা এই সকল নাবালগের সম্পত্তির অপচয় করিতেছে কি না, এবং তাহাদের রক্ষার্থে নালিশ করার জন্য ও ভবিষ্যতে অপচয় নিবারণ করার জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করার আবশ্যক আছে কি না, তাহার তদন্তের নিমিত্ত জজের নিকট মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবে। (গ)

২৫এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ, বি, বেলি।

১৮৭০ সালের ৪ নং মোকদ্দমা।

সারণের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৮ই মে তারিখের হুকুম স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

ঘানু সিংহ (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

রামগোবিন্দ সিংহ ও আর এক ব্যক্তি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর, টি, এলেন ও বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—খাজানার এক ডিক্রী জারী করার জন্য ডেপুটি কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত হওয়াতে বিচারাদিষ্ট দায়ী তাহার জমার নীলাম নিবারণের জন্য ঐ আদালতে টাকা দাখিল করে, এবং ডিক্রীদার তাহা বাহির করিয়া লয়। যখন দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ের মোকদ্দমা হইতেছিল যে, ঐ ডিক্রীজারী তমাদীর দ্বারা বারিত কি না, তখন ঐ টাকা দেওয়া লওয়া হয়। দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে ঐ ডিক্রী বারিত বলিয়া স্থির হয়।

এ স্থলে বিচারাদিষ্ট দায়ীর ঐ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংক্রান্ত খাজানার এক মোকদ্দমায় ঔদেশ-কুঙর নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক ডিক্রী হয়। ডিক্রীদারের ডিক্রীতে স্বত্ব ও লাভ রেস্পণ্ডেণ্টের নিকট বিক্রীত হয়। রেস্পণ্ডেণ্ট ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে। ঔদেশ কুঙর আপত্তি করে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা মতে ঐ ডিক্রী তমাদীর দ্বারা বারিত। সেই দরখাস্ত অনুসারে ডেপুটি কালেক্টর স্থির করেন যে, ডিক্রী জারী হইতে পারে না। রেস্পণ্ডেণ্ট তাহার ঐ ডিক্রী জারী করার স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ উপস্থিত করে, এবং তাহার ঐ স্বত্ব আছে বলিয়া মুন্সেফের আদালতে ডিক্রী পায়। সেই ডিক্রী আপীলে জজের দ্বারা স্থির থাকে, কিন্তু খাস আপীলে ১৮৬৮ সালে হাইকোর্ট কর্তৃক অন্যথা হয়। সেই নিষ্পত্তি ৯ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৪৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে।

ঔদেশ কুঙর তাহার হাইকোর্টের ডিক্রীর অন্তর্গত স্বত্ব বর্তমান আপেলাণ্টকে বিক্রয় করে। দেওয়ানী মোকদ্দমা আপীলে জজের নিকট উপস্থিত থাকার কালে, রেস্পণ্ডেণ্ট, দেওয়ানী আদালতের যে ডিক্রীতে ব্যক্ত হয় যে, কালেক্টরের ডিক্রীজারী করিতে তাহার স্বত্ব আছে, সেই ডিক্রী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট দাখিল করিয়া ঔদেশ কুঙরের সম্পত্তির বিরুদ্ধে খাজানার নালিশের ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে। ঔদেশ কুঙর তাহার জমার নীলাম নিবারণার্থে আদালতে টাকা দাখিল করে, এবং রেস্পণ্ডেণ্ট সেই টাকা বাহির করিয়া লয়।

আপেলাণ্ট অর্থাৎ ঔদেশ কুঙরের নিকট ক্রেতা দেওয়ানী আদালতে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করে যে, ঔদেশ কুঙর আদালতে যে টাকা

দেয়, এবং যাহা কালেক্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমার ডিক্রী মতে আদালত হইতে রেস্পণ্ডেণ্ট লইয়াছে, তাহা আপেলাণ্টকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

জজ বলেন যে, ঐ টাকা কোন প্রকারেই এই আদালতের দ্বারা ফেরৎ হইতে পারে না; এবং তিনি আপীলে প্রথম আদালতের নিস্পত্তি স্থির রাখিয়া ঐ টাকা ফেরৎ পাওয়ার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন।

আমাদের বিবেচনায়, জজের হুকুম সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ। কালেক্টরের হুকুম দ্বারা রেস্পণ্ডেণ্ট ঐ টাকা আদায় করে, এবং যদি টাকা ফেরৎ দেওয়ার হুকুম দিতে কালেক্টরের ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁহার নিকটই দরখাস্ত করা উচিত ছিল, কারণ, তাঁহার আদালতে যে কার্য্য হয়, তাহার জন্য কেবল তিনিই দায়ী। কিন্তু বোধ হয়, দেখা যাইবে যে, ঐ টাকা ফেরৎ দেওয়ার হুকুম দিতে কালেক্টরের ক্ষমতা নাই; এবং যদি তাহা হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রেস্পণ্ডেণ্ট অন্যায় করিয়া আপেলাণ্টের নিকট যে টাকা লইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে আপেলাণ্টের তাহা ফেরৎ পাওয়ার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশই এক মাত্র উপায় আছে। দেওয়ানী নালিশ উপস্থিত করার পূর্ব্বে, কালেক্টরের আদালতে যে হুকুম হয় তাহা অন্যথা করার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করার আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আমাদের সেই কথায় প্রবেশ করার আবশ্যক নাই। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই মোকদ্দমায় টাকা ফেরৎ দেওয়ার হুকুম দিতে দেওয়ানী আদালতের কোন ক্ষমতা নাই। অতএব আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল এবং উকীলের ফী দুই মোহর দিবার হুকুম দেওয়া গেল। (গ)

২৫ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

### প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান ও বিচারপতি এইচ বি বেলি।

১৮৬৯ সালের ৫৩৭ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের জজের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ নবেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

শিবপ্রসন্ন সিংহ (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

বলধারী লাল (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—জজ যদি কোন একতরফা হুকুম দেন, তবে যে সকল ঘটনায় ঐ প্রকার হুকুম দিতে তাঁহার স্পষ্ট ক্ষমতা আছে তাহা ভিন্ন অন্য ঘটনায়, যে ব্যক্তির অসাক্ষাতে ঐ হুকুম হইয়া থাকে সে তাহা রহিত করার জন্য দরখাস্ত করিতে পারে, এবং জজ যদি দেখেন যে, ঐ হুকুম অন্যায় হইয়াছিল, তবে তিনি উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিয়া সেই হুকুম উঠাইয়া লইতে পারেন।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমায় ত্রিহুতের অধঃস্থ জজ সৈয়দ ইমদাদ আলীর আদালতে এক ডিক্রী, জারীর জন্য উপস্থিত ছিল।

ত্রিহুতের জেলার জজ মেং পিয়ার্সনের নিকট দায়ী এই হেতুবাদে, ঐ মোকদ্দমা দ্বিতীয় অধঃস্থ জজ ভূপতি রায়ের আদালতে অর্পিত হওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে যে, ঐ দ্বিতীয় অধঃস্থ জজের আদালতে অন্য এক মোকদ্দমায় দায়ীর সম্পত্তির এক জন সরবরাহকার নিয়োজিত হইয়াছে। জজ মেং পিয়ার্সন কেবল বিচারাদিষ্ট দায়ীর দরখাস্ত অনুসারে এবং ডিক্রীদারের আপত্তি না শুনিয়া অথবা তাহার উপরে নোটিস

জারী না করিয়া, প্রার্থনানুযায়ী হুকুম প্রদান করেন। ইহা ১১ ই নবেম্বর তারিখে হয়।

ডিক্রীদার উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করে যে, ১১ ই নবেম্বরের ঐ হুকুম অন্যথা হয়। জজ উভয় পক্ষকে শুনিয়া তাঁহার প্রথম হুকুম অন্যথা করেন। এই দ্বিতীয় হুকুমের বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল হইয়াছে।

মার্সেলের রিপোর্টের ১১৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত এক মোকদ্দমায় এই আদালতের এব খণ্ডাধিবেশন এই রায় ব্যক্ত করেন যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা মতে, ডিক্রীর পরে অর্থাৎ বিচারের পরে এবং যখন কেবল ডিক্রীজারীর জন্য মোকদ্দমা মুলতবী থাকে, তখন অধঃস্থ জজের আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে জেলার জজের ক্ষমতা নাই। উপস্থিত মোকদ্দমায় জজ কেবল তাঁহার নিজের হুকুম উঠাইয়া লইয়াছেন। আমার বোধ হয় যে, জজ যদি একতরফা হুকুম দেন, তবে যে সকল ঘটনায় ঐ প্রকার হুকুম দিতে তাঁহার স্পষ্ট ক্ষমতা আছে তাহা ভিন্ন অন্য ঘটনায়, যে ব্যক্তির অসাক্ষাতে ঐ হুকুম হইয়া থাকে, সে তাহা অন্যথা করার জন্য দরখাস্ত করিতে পারে, এবং জজ যদি দেখেন যে, ঐ হুকুম অন্যায় হইয়াছিল, তবে তিনি উভয় পক্ষকে শ্রবণ করিয়া তাহা উঠাইয়া লইতে পারেন। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, হয় প্রথম হুকুম দেওয়ায় জজের কোন ক্ষমতাই ছিল না, অথবা যদি বিবেচনা করা যায় যে, উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা মতে ঐ হুকুম প্রবল রাখা যাইতে পারে, তথাপি যে জজ তাহা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার কর্তৃকই তাহা অন্যথা ও উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অতএব আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

( গ )

২৫ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি।

১৮৭০ সালের ৮ নং মোকদ্দমা।

সাসিরামের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৯ ই জানুয়ারির হুকুম অন্যথা করিয়া সাহাবাদের অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৮ এ সেপ্‌টেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মসম্মত বাণু ( প্রার্থী ) আপেলাণ্ট।

নারায়ণ সাহু ( প্রতিপক্ষ ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রাজেন্দ্র মিশ্র আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আনন্দগোপাল পালিত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারায় যে বিধি আছে যে, ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের অন্তর্গত ছোট আদালতের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমার জাবেতা আপীলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে খাস আপীল চলিবে না, তাহা ঐ আইনান্তর্গত ছোট আদালত সমস্তের বিচার্য্য সমুদায় মোকদ্দমায়, এবং দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩২৭ ধারা মতে যে সকল মোকদ্দমা বিচার্য্য হইয়াছে অর্থাৎ ঘরাও সালিশের রোয়দাদ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায়ও খাটে।

বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে, বাদী এক তমঃসুকের পাওনা বলিয়া সুদ ছাড়া যে ১০৪ টাকার দাবী করে, তাহা বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ে দুই জন সালিশের নিষ্পত্তির জন্য অর্পণ করিতে ১৮৬৭ সালের মার্চ মাসে আপনাদের মধ্যে ঘরাও বন্দোবস্ত করে। ১৮৬৮ সালের আগষ্ট মাসে, তন্মধ্যে এক জন সালিশ রোয়দাদে ব্যক্ত করে যে, বাদী সুদ ও আসলে ২৪৭।৶০ টাকা পাইবে।

বাদী ঐ রোয়দাদ আদালতে দাখিল হওয়ার

জন্য ৩২৭ ধারা মতে৹ সাসিরামের মুন্সেফের নিকট দরখাস্ত করে, এবং প্রতিবাদী ঐ রোয়দাদের বৈধতার প্রতি আপত্তি করাতেও মুন্সেফ তাহা দাখিল করিয়া লওয়ার হুকুম দেন।

মুন্সেফের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সাহাবাদের অধঃস্থ জজের নিকট আপীল হয়। অধঃস্থ জজ এই নির্দ্দেশ করিয়া মুন্সেফের হুকুম অন্যথা করেন যে, যাহা রোয়দাদ উল্লেখে দাখিল হইয়াছে তাহা দুই জন সালিশের মধ্যে এক সালিশের দ্বারা প্রদত্ত হওয়াতে, রোয়দাদ নহে।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদি-কর্ত্তৃক এই আদালতে খাস আপীল হইয়াছে। রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে বাবু আনন্দগোপাল পালিত ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার বিধান মতে আপত্তি করিয়াছেন যে, আপীল চলিতে পারে না।

আমার বিবেচনায়, এই আপত্তি উৎকৃষ্ট। ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৮৫ পৃষ্ঠার এক মোকদ্দমায় এই আদালত কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, যে পরিমাণ ঋণের দাবী ছোট আদালতের দ্বারা বিচারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধীয় ঘরাও সালিশের রোয়দাদ দাখিল করিয়া লওয়ার দরখাস্ত ঐ আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩২৭ ধারামতে গ্রাহ্য করিতে পারেন। এই স্থলে দেখা যাইতেছে যে, এই রোয়দাদ যে দাবী সম্বন্ধে প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ ১০৪ টাকার দাবী, সুদ ও খরচা সমেত ২৪৭ টাকা, তাহা স্পষ্টই ছোট আদালতের বিচার্য্য। উপরোক্ত ২৭ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, "১৮৬০ "সালের ৪২ আইনের অন্তর্গত ছোট আদা- "লতের বিচার্য্য মোকদ্দমা সমন্ধে" আবেতা আপীলে যে কোন নিষ্পত্তি অথবা হুকুম প্রদত্ত হয় তাহার বিরুদ্ধে খাস আপীল চলিবে না। আমরা বিবেচনা করি যে, ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের দ্বারা যে সকল মোকদ্দমা বিচার্য্য হইয়াছে কেবল তাহাই ঐ বিধি-ভুক্ত, এমত নহে, ঐ আইন দ্বারা সংস্থাপিত ছোট আদালতের বিচার্য্য সমুদায় মোকদ্দমা সম্বন্ধেই তাহা খাটে। অতএব যদিও অনুমান করা যায় যে, ঘরাও সালিশের রোয়দাদ সম্বন্ধীয় নালিশ ১৮৬০ সালের ৪২ আইনের কোন স্পষ্ট বিধি দ্বারা বিচার্য্য না হইয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩২৭ ধারার দ্বারা ছোট আদালতের বিচার্য্য হইয়াছে তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে, তাহা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারার মর্ম্মান্তর্গত।

ফল এই যে, আমাদের বিবেচনায় এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

আপেলাণ্ট তর্ক করে যে, সাহাবাদের জজের নিকট আপীল চলা উচিত ছিল না। সেই বিষয়ে আমরা কোন রায় ব্যক্ত করিলাম না। সে যে বিবেচনা করে যে, সে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ৩৬ ধারান্তর্গত প্রতিকার পাইতে স্বত্ববান, তাহা আমরা তাহাকে অবলম্বন করিতে দিলাম। মোকদ্দমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা বলিতে পারি না যে, অধঃস্থ জজের ভ্রম হইয়াছে, কারণ, বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যদি তাঁহার নির্দ্দেশ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে কোন রোয়দাদই হয় নাই।

বিচারপতি বেলি।—এই মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৭ ধারামতে খাস আপীল চলিতে পারে না।

(গ)

---

২ রা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ২১৪৪ নং মোকদ্দমা।

ধামনগরের মুন্‌সেফের ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া কটকের জজ ১৮৬৯ সালের ১ লা জুনে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মজহরল হক (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

পুহরাজ দিভারি মহাপাত্র (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং, সি, গ্রেগরি ও বাবু ভবানীচরণ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গোপাললাল মিত্র এবং দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—শরা অনুসারে, ভূমি ওখ্‌ফ করার মূল উদ্দেশ্য এই যে, তদ্দ্বারা মস্‌জিদ রক্ষিত ও তৎসংক্রান্ত অর্চ্চনার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। ওখ্‌ফ সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে অন্য কোন কোন বিষয় যাহা কিছু কাল পরেই শেষ হইয়া যাইবে, এবং যাহা শেষ হইয়া গেলে সমুদায় উপস্বত্বই ওখ্‌ফের জন্য ব্যবহৃত হইবে, তাহার জন্য ব্যয়ের আদেশ থাকিলে শরা অনুসারে ঐ ওখ্‌ফ অবৈধ হয় না।

বিচারপতি কেম্প।—বিরোধীয় সম্পত্তি যে ওখ্‌ফ সম্পত্তি, ইহা জানিয়াই বাদী খাস রেস্পণ্ডেণ্ট তাহা ক্রয় করে। তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নাই। বিক্রয়-কবালাতে এই কথার স্পষ্ট বর্ণনা আছে, এবং বাদী স্বীকার করে যে, সে দখল পাইতে পারে নাই।

বাদীর বিক্রেতা যে এই সম্পত্তি প্রথমে ওখ্‌ফ করে, সে এই বলিয়া উক্ত বিক্রয়-কবালার অন্তর্গত বাদীর দখলের প্রতি আপত্তি করে যে, সে বিক্রয়-কবালা লিখিয়া দেওয়ার কথা স্বীকার করে বটে, কিন্তু সে সমুদায় বিক্রয়-মূল্য পায় নাই। সে আরও বলে যে, তাহার জন্য বাদী মস্‌জিদের অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় ভূমি লইয়া দেওয়ার করার করিয়াছিল, কিন্তু তাহা সে লইয়া দেয় নাই।

আমাদের সমুখস্থিত খাস আপেলাণ্ট মোকদ্দমায় মোজাহেম দিয়া বলে যে, ১৮৬৩ সালের ২৬ এ ডিসেম্বর তারিখের এক তৌলিয়তনামার দ্বারা সে মতওল্লীর পদে নিয়োজিত হইয়াছে, এবং ঐ বিক্রয় একেবারে অবৈধ। যে দলীলের দ্বারা সে মতওল্লী নিয়োজিত হয়, তাহা সে দাখিল করিয়া মোকদ্দমার পক্ষ হওয়ার অনুমতি চাহে, এবং তাহাকে পক্ষ করা হয়।

যে দলীলের উপরে সে আদালতে উপস্থিত হয় এবং কেবল যাহার গতিকেই সে এই মোকদ্দমার পক্ষ হয় তাহার কোন ইসু হয় নাই, এবং দেখা যাইতেছে যে, ঐ দলীল সপ্রমাণ করার জন্য তাহাকে যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হয় নাই।

প্রথম আদালত নির্দেশ করেন যে, সমুদায় বিক্রয়-মূল্য দেওয়া লওয়া হইয়া গিয়াছে, এবং ভূমি এওজ করিবার কোন করার ছিল না। এবং মোজাহেমদার খাস আপেলাণ্ট যে দলীল সূত্রে আদালতে উপস্থিত হয় যদিও তাহার সম্বন্ধে কোন ইসু হয় নাই, এবং তাহা সপ্রমাণ করার জন্য খাস আপেলাণ্টকে সুযোগ দেওয়া হয় নাই, তথাপি ঐ আদালত উক্ত দলীলের অকৃত্রিমতার বিরুদ্ধে রায় ব্যক্ত করেন।

জজ বাদীর নালিশ ডিক্রী করিয়া মোজাহেমদার খাস আপেলাণ্টকে দুই হেতুবাদে অগ্রাহ্য করিয়াছেন; তাহার প্রথম হেতু এই যে, ভূমি ওখ্‌ফ করা হয় নাই, এবং তাহা হস্তান্তরিত হইতে পারে; এবং দ্বিতীয় হেতু এই যে, মোজাহেমদার যে দলীলের উপরে আপন দাবী স্থাপন করে তাহা রেজিষ্টরী না হওয়ায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না, অতএব মোকদ্দমায় মোজাহেমদারের কোন স্থান নাই, এবং তাহার আপত্তি শুনা যাইতে পারে না।

আমাদের সমক্ষে এই পর্য্যন্ত স্বীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৬৩ সালের ২৬ এ ডিসেম্বরের তৌলিয়তনামা জজ যে হেতুবাদে, অর্থাৎ তাহা রেজিষ্টরী হয় নাই বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক। নূতন রেজিষ্টরী আইনের দ্বারা রেজিষ্টরী অবশ্য-কর্ত্তব্য হওয়ার পূর্ব্বে এই দলীল লিখিতপঠিত হওয়াতে, জজের এই

নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক যে তাহা, রেজিষ্টরী হয় নাই বলিয়া প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু খাস রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, এই দলীল প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইলেও তাহা সপ্রমাণ করার জন্য নথীতে কোন প্রমাণ নাই। আমরা বিবেচনা করি যে, যে স্থলে দলীলের বিষয়ে ইসু উত্থাপিত হয় নাই, এবং দলীল সপ্রমাণ করার জন্য মোজাহেমদার খাস আপেলাণ্টকে উচিত সময় দেওয়া হয় নাই, সে স্থলে দলীল সপ্রমাণ করার জন্য খাস আপেলাণ্টকে সময় দিয়া এই দলীলের সত্যাসত্যের বিষয়ে অতিরিক্ত তদন্ত করিতে হইবে।

ইহা ওখ্‌ফ নহে বলিয়া জজ যে রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, দলীলের বর্ণনা সমস্ত দৃষ্টে তাহা শরা অনুযায়ী বৈধ ওখ্‌ফই বোধ হয়। মসজিদ রক্ষা করা এবং তাহাতে যে অর্চ্চনা হয় তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করাই শরা অনুসারে ভূমি ওখ্‌ফ করার মূল উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যেই মুসলমানেরা ভূমি ওখ্‌ফ করে। স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ মস্‌জিদ ঐ ওখ্‌ফ ভূমির উপরে বহুকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। প্রথমে লেখা আছে যে, ওখ্‌ফ ভূমির উপস্বত্ব হইতে মস্‌জিদ মেরামত এবং নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বাহে তাহা আলোকিত এবং সুসজ্জিত করিতে হইবে। পথিকগণকে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মস্‌জিদ হইতে যাইতে দেওয়া হইবে না। এক জন মওজ্জন এবং মস্‌জিদের অন্যান্য আবশ্যকীয় কর্ম্মচারী রাখিতে হইবে, ফকীরদিগকে ভিক্ষা দিতে হইবে, কয়েক জন দরিদ্র ছাত্রদিগকে আরব্য ভাষায় শিক্ষা দান করিতে হইবে, সুতরাং তাহার জন্য এক জন শিক্ষক রাখারও আবশ্যক হইবে, এবং শেষে লেখা আছে যে, বাকী উপস্বত্ব হইতে মতওল্লী মজহরুঅল্‌হকের পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের বিবাহ সমাধি এবং ছুন্নতের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। যে মূল উদ্দেশ্যে ওখ্‌ফ করা হয়, এবং যাহা উপরে বর্ণনা করা গেল তাহা সম্পূর্ণ রূপে নির্ব্বাহিত হইবার পরে এই সকল কার্য্য করিতে হইবে।

আমরা বিবেচনা করি যে, কয়েক বিষয়ের ব্যয় যাহা সময়ের গতিতে অবশ্য শেষ হইয়া যাইবে, এবং যাহা এক পরিবারের এবং নির্দ্দিষ্ট প্রয়োজনের জন্য নির্দ্ধারিত হয়, এবং যাহা শেষ হইয়া গেলে ওখ্‌ফ সম্পত্তির সমুদায় উপস্বত্বই ওখ্‌ফের মূল উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয় হইবে, তদ্দ্বারা শরা অনুসারে ওখ্‌ফ অবৈধ হয় না। এক ব্যক্তি এই সর্ত্তে সম্পত্তি ওখ্‌ফ করিতে পারে যে, সে তাহার জীবদ্দশায় তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবে, কিন্তু তাহার জীবনান্তে তৎসমুদায় দরিদ্র ব্যক্তিদিগের ভরণপোষণার্থে ব্যয় হইবে; কারণ, শরার মর্ম্ম এই যে, ওখ্‌ফ সম্পত্তির উপস্বত্ব এমন কোন কার্য্যে অর্পিত হইবে যাহা নিত্য বর্ত্তমান থাকে। দরিদ্র ব্যক্তিরা নিত্যই আছে, অতএব যে ব্যক্তি এই সর্ত্তে ওখ্‌ফ করে যে, সে যত দিন জীবিত থাকিবে তত দিন সে তাহার উপস্বত্ব ভোগ করিবে, এবং তাহার জীবনান্তে তাহা দরিদ্র পালনের জন্য অর্পিত হইবে, সেই ব্যক্তি ইহার দ্বারা অনিত্য অথবা অনিশ্চিত প্রয়োজনের জন্য ওখ্‌ফ করে না।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, জজ ভ্রমাত্মক রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা বৈধ ওখ্‌ফ নহে; এবং ঐ তৌলিয়ৎনামা যাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য, এবং খাস আপেলাণ্টেরই সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য, তদনুসারে সে যদি সপ্রমাণ করিতে পারে যে, সে মতওল্লীর পদে নিয়োজিত হইয়াছে, তবে যে স্থলে বাদী ঐ ওখ্‌ফের কথা জানিয়া শুনিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, এবং যে স্থলে খাস আপেলাণ্ট ওখ্‌ফের মূল উদ্দেশ্য স্থির রাখিতে চেষ্টা করিয়া বাদীকে দখল দেয় নাই, সে স্থলে বাদী ডিক্রী পাইতে পারে না, কারণ, শরা অনুসারে এই প্রকার

ওখ্‌ফ সম্পত্তির হস্তান্তর অবৈধ। ১৮৬৩ সালের ২৬ এ ডিসেম্বরের তৌজিয়ৎনামা সপ্রমাণ করিতে মোজাহেমদার খাস্ আপেলাণ্টকে সুযোগ প্রদানার্থে এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবে। আমরা বিবেচনা করি যে, যদি সে তাহার মতওল্লীর স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে, তবে সে তৎসূত্রে মোজাহেম দিয়া, যে মূল উদ্দেশ্যে ঐ সম্পত্তি ওখ্‌ফ করা হইয়াছিল, তদ্ভিন্ন অন্য প্রয়োজনে তাহার উপস্বত্বের ব্যয় নিবারণ করিতে যত্নবান হইবে। খরচা নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গ)

২ রা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১১৪ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ জাবেতা আপীল।

চৌধুরী মহম্মদ মমিন প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

লতাফৎ হোসেন (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেৎ জি, সি, পল বারিষ্টর ও সি, গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

মেৎ আর, ই, টুইডেল, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও মুন্সী মহম্মদ ইউছফ, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যখন কোন বাদীর নালিশ এক কালে ডিস্‌মিস্ হয়, তখন ঐ রায়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ কোন কথা ব্যক্ত থাকিলেও, ঐ পক্ষগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ কোন মোকদ্দমায়, তদ্দ্বারা প্রতিবাদীর স্বত্বের কোন ক্ষতি হইতে পারে না।

বিচারপতি লক।—এই আপীল শ্রবণের প্রতি এই মর্ম্মে এক প্রাথমিক আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে যে, যেহেতু ডিক্রী একেবারেই প্রতিবাদীর অনুকূল, অতএব তাহাতে তাহার বিরুদ্ধ কোন কোন কথা ব্যক্ত থাকিলেও সেই রায়ের বিরুদ্ধে সে আপীল করিতে পারে না; এবং এই তর্কের পোষকতায় উইক্‌লি রিপোর্টরের ১৩ বালমের ১ম পৃষ্ঠায় প্রচারিত এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশনের রায় আমাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই রায়ে আমরা সম্মত। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা যাহা এক কালে ডিস্‌মিস্ হইয়াছে, তাহাতে নিম্ন আদালতের রায়ে যে কোন কথা ব্যক্ত থাকুক, তদ্দ্বারা ঐ পক্ষগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর স্বত্বের ক্ষতি হইতে পারে না।

আমাদের বিবেচনায়, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে। (গ)

৩ রা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

সেখ গণী মহম্মদ, প্রার্থী।

বাহারুল্লা, প্রতিপক্ষ।

বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় প্রার্থীর উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং মোহিনীমোহন রায় প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—বাদী বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিয়া প্রার্থনা করে যে, যদি টাকা প্রদত্ত না হয়, তবে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করিতে হইবে; ডেপুটি কালেক্টর তাহাকে যে ডিক্রী দেন, তাহাতে তিনি লেখেন যে, ঐ প্রার্থনা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৮ ধারার অন্তর্গত কার্য্যের জন্য হইয়াছে, এবং তিনি হুকুম দেন যে, ঐ ধারা মতে ডিক্রীজারী হইবে। এমত স্থলে, ঐ হুকুম উচ্ছেদের হুকুমই হইয়াছে।

যে স্থলে ডিক্রীদার ডিক্রীজারীতে খাস দখল লয়, এবং তাহার পরে বিচারাদিষ্ট দায়ীর নিকট ক্রেতা, ডিক্রীর অন্তর্গত বাকী খাজানা দিতে চাহে, সে স্থলে ঐ দুই ব্যক্তির অর্থাৎ ঐ ক্রেতাও ডিক্রীদারের মধ্যে এমন কোন ন্যায়ানুগত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না, যদ্দ্বারা ডিক্রীদারের দখল রহিত করা যাইতে পারে।

বিচারপতি হবহৌস।—আমি বিবেচনা করি, এই রুল অর্থাৎ হুকুম মঞ্জুর করিতে হইবে।

প্রার্থী গণী মহম্মদ বাকী খাজানার জন্য চণ্ডীপ্রসাদ দোবের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া প্রার্থনা করে যে, যদি বাকী আদায় না হয়, তবে প্রতিবাদীকে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৮ ধারার বিধান মতে উচ্ছেদ করিতে হইবে। ১৮৬৮ সালের ২৮ এ জুলাই তারিখে গণী মহম্মদ একতরফা ডিক্রী পায়। খাজানা আদায় না হওয়াতে গণী মহম্মদ ডিক্রীজারী করিয়া ৭৮ ধারার বিধান মতে সম্পত্তির খাস দখল লয়। ১৮৬৯ সালের ৩০ এ মার্চ তারিখে বাহারুল্লা অর্থাৎ উপস্থিত প্রতিপক্ষ ডেপুটি কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়া বলে যে, সে জোত বিচারাদিষ্ট দায়ী চণ্ডীপ্রসাদের নিকট ক্রয় করিয়াছে, এবং প্রার্থনা করে যে, উক্ত একতরফা ডিক্রী মতে ঐ জোতের জন্য বিচারাদিষ্ট দায়ীর নিকট যে বাকী খাজানা পাওনা আছে, তাহা তাহাকে পরিশোধ করার অনুমতি হয়, এবং সে বিরোধীয় জোতের দখল পায়। ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চ তারিখে ডেপুটি কালেক্টর ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। আমাদের সম্মুখস্থিত প্রার্থী প্রার্থনা করে যে, ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চের হুকুম অন্যথা হয়, কারণ, তাহা বিচারাধিকার ব্যতীত প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রতিপক্ষের উকীল এমন তর্ক করেন না যে, কালেক্টরের এই হুকুম দেওয়ার অধিকার ছিল, কিন্তু তিনি বলেন যে, আদৌ ১৮৬৮ সালের ২০ এ জুলাই তারিখে এমন কোন ডিক্রী প্রদত্ত হয় নাই, যাহা জারী হইতে পারে, এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ হুকুমের প্রতি আমাদের হস্তক্ষেপ ও তাহা অন্যথা করার ক্ষমতা থাকিলেও, ন্যায়মতে তাহা আমাদের করা উচিত নহে।

ডিক্রী পরিষ্কার রূপে লেখা হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে আমরা বিবেচনা করি যে, তাহা যথেষ্ট পরিষ্কার। আমরা এমত আশা করি না যে, ডেপুটি কালেক্টরেরা যে সমস্ত ডিক্রী প্রদান করেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হইবে; কিন্তু যদি তাহা কার্য্য চালাইবার মত পরিষ্কার হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট, এবং এই মোকদ্দমায় যে স্থলে ডিক্রীতে লেখা আছে যে, ৭৮ ধারানুযায়ী কার্য্যের জন্য প্রার্থনা হইয়াছে, এবং যে স্থলে হুকুম এই হইয়াছে যে, ঐ ধারা মতে ডিক্রীজারীর কার্য্য হইবে, সে স্থলে, উক্ত ধারায় উচ্ছেদের স্পষ্ট বিধান থাকাতে দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীর হুকুম উচ্ছেদের জন্যই হইয়াছিল। ইহাতেই প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্কিত হইয়াছে যে, যে স্থলে প্রতিপক্ষ বিচারাদিষ্ট দায়ীর নিকট ক্রয় করিয়াছে, এবং যে স্থলে সে ডিক্রীর অন্তর্গত টাকা পরিশোধ করিতে চাহিয়াছে, সে স্থলে তাহার ও ডিক্রীদারের মধ্যে পরস্পরের এমন ন্যায়ানুগত সম্বন্ধ হইয়াছে যদ্দৃষ্টে, ডিক্রীদার যে হুকুমের দ্বারা তাহার সম্পত্তি হইতে বেদখল হইয়াছে, তৎপ্রতি আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। যদি ডিক্রীদার তাহার ডিক্রী জারী করার এবং তদন্তর্গত দখল পাওয়ার পূর্ব্বে ঐ টাকা দিতে চাহিত, তবে এই তর্কে কিছু বল থাকিত। কিন্তু যে স্থলে আমরা দেখিতেছি যে, ডিক্রীজারীতে ডিক্রীদার দখল পাওয়ার দশ দিনের পরে ভিন্ন টাকা লইতে সাধাও হয় নাই, সে স্থলে ডিক্রীদার এবং প্রতিপক্ষের পরস্পরের মধ্যে এমন কি ন্যায়ানুগত সম্বন্ধের সৃষ্ট হইয়াছিল যে তদ্দৃষ্টে, ডিক্রীদারের অনুকূলে যে স্বত্বের ডিক্রী হইয়াছিল, এবং যাহা সে পাইয়াছিল তাহাতে তাহাকে পুনঃস্থাপিত করিতে আমরা নিবারিত হইব, তাহা আমাদের দৃষ্ট হয় না।

আমরা ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চের হুকুম অন্যথা করিয়া আদেশ করিতেছি যে, বিচারাদিষ্ট দায়ী ঐ বিরোধীয়

স্রোতে পুনঃস্থাপিত হইবে, এবং প্রতিপক্ষ এই আদালতের ও নিম্ন আদালতের খরচা দিবে। ডিক্রীদারকে দেওয়ার জন্য বাকী খাজানার বাবতে প্রতিপক্ষ যে টাকা আমানত করিয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা সে নিম্ন আদালতে দরখাস্ত করিয়া অবশ্য ফেরৎ পাইতে পারে।　　　　(গ)

---

৩ রা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৪৮৮ নং মোকদ্দমা।

কান্দির মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া মুরসিদাবাদের অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুন তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গুরুপ্রসাদ রায় ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদীর মধ্যে দুই জন) আপেলাণ্ট।

রামলোচন পাঁড়ে (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দেবত্র ভূমির দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার মোকদ্দমায় বাদী কহে যে, সে পূজারীর নিকট হইতে মৌরসী পাট্টা পাইয়াছে, কিন্তু সেই পূজারী তখন পদস্থ ছিল না। প্রধান প্রতিবাদী বর্ত্তমান পূজারীর নিকট পাট্টা পাইয়া দাবী করে।

এমত স্থলে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার অন্তর্গত দখলের স্বত্বের প্রমাণাভাবে বাদী মোকদ্দমায় জয়ী হইতে পারে না, এবং যেহেতু যে ব্যক্তির ঐ ভূমিতে কেবল সঙ্কুচিত অথবা অস্থায়ী স্বত্ব ছিল, বাদী সেই ব্যক্তির নিকট স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সে স্থলে বাদীর ঐ স্বত্ব অপকৃষ্ট।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিবেচনায়, নিম্ন আদালতদ্বয়ের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে।

বাদীর মোকদ্দমা এই যে, সে কপিল ঠাকুরের সেবার কতিপয় দেবত্র ভূমির এক মৌরসী পাট্টা পায়, এবং সেই পাট্টা ১২০৫ সালে তৎকালের পূজারীর দ্বারা অথবা তাহার অনুমতিক্রমে প্রদত্ত হয়। সে বলে যে, যে পূজারী ঐ পাট্টা দেয়, সে এইক্ষণে পূজারীর কর্ম্মে নিযুক্ত নাই, কিন্তু বর্ত্তমান পূজারী কিছু কাল পর্য্যন্ত বাদীর নিকট খাজানা লইয়াছে; কিন্তু প্রধান প্রতিবাদী বর্ত্তমান পূজারীর প্রদত্ত এক পাট্টা সূত্রে, বাদীর ঐ ভূমি দখল করার স্বত্ব থাকাতেও ১২৭১ সালে তাহাকে দখল দিতে অস্বীকার করে, অতএব সে এই মোকদ্দমা ১২৭৫ সালে উপস্থিত করিতে বাধ্য হইয়াছে।

আমি বোধ করি, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, এ স্থলে বাদী যে পাট্টা দাখিল করিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া সে ঐ ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন আদালতদ্বয় বাদীর দখল সম্বন্ধে আরজীর লিখিত এক বাক্য ব্যবহার করিয়া তাহার উপরে এই ইসু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, বিরোধীয় ভূমিতে বাদীর দখলের স্বত্ব আছে কি না, এবং সেই দখলের স্বত্বের বলে সে প্রতিবাদিগণের নিকট দখল পাইতে পারে কি না। অধঃস্থ জজ যিনি এই মোকদ্দমার আপীল শ্রবণ করেন, তিনি মুন্সেফের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দখলের স্বত্ব আছে, এবং সেই স্বত্বের বলে বাদী ডিক্রী পাইতে পারে।

বাদী যদি দখলের স্বত্বের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে, (কিন্তু সে যে তাহা করিয়াছিল, তাহা আমি অত্যন্ত সন্দেহ করি) তবে সে এই অবস্থা মতে নির্ভর করিয়াছে। সে তাহার ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করে নাই, কিন্তু এক তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে অর্থাৎ বর্ত্তমান

পুজারীর পাট্টা-গৃহীতার বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়াছে। দখল হারাইবার ৪ বৎসর পরে এক অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী নালিশ করিয়া বাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার লিখিত দখলের স্বত্বের উপরে নির্ভর করিতে পারে কি না, তাহা আমাদের এ স্থলে মীমাংসা করার আবশ্যক নাই। দেখা যায় যে, বাদী বল-পূর্ব্বক বেদখলের কথা বলে না; সুতরাং সে তাহার পূর্ব্ব দখলের বলে অথবা প্রতিবাদীর দ্বারা সেই দখলের বল-পূর্ব্বক ব্যাঘাত হওয়ার হেতুতে পুনঃদখল পাওয়ার প্রার্থনা করে না। সে তাহার পাট্টার বলে এবং তাহার দখলের যে স্বত্ত্ব আছে, তাহার উপরে দাবী করে, অতএব সে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার লিখিত স্বত্ব যাহা ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে রাইয়ত দাবী করিতে পারে, সেই স্বত্বের উপরে দাবী করে কি না, তদ্বিষয়ে আমি সন্দেহ করি।

কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, আমার বোধ হয় যে, বাদী আর এক কারণে অকৃতকার্য্য হইবে; কারণ, বাদী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি ৬ ধারার অন্তর্গত কোন প্রমাণ দিয়াছেন কি না, কিন্তু ঐ প্রকার প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে কি না, তাহা তিনি বলিতে পারিলেন না। যদি মোকদ্দমায় এই প্রকার প্রমাণ থাকে তবে আমাদের সমক্ষে তাহা দর্শান তাঁহারই উচিত ছিল। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ইসু সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।

এমত অবস্থায়, এবং যে স্থলে ঐ ভূমিতে যে ব্যক্তির কেবল সঙ্কুচিত ও অস্থায়ী স্বত্ত্ব ছিল তাহার নিকট হইতে বাদী স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার স্বত্ত্ব অপকৃষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে আমি বিবেচনা করি যে, সে এই নালিশে জয়ী হইতে পারে না, এবং তাহার মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হওয়া উচিত ছিল। অতএব নিম্ন আদালতদ্বয়ের রায় অন্যথা, এবং বাদীর নালিশ খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল।

বিচারপতি গ্লবর।—বাদীর নালিশ ডিস্মিস্ করার রায়ে আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

---

৩রা মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ্ এ গ্লবর।

যশোহরের জজের ১৮৬৯ সালের ১০ ই নবেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

১৮৭০ সালের ১৯ নং মোকদ্দমা।

বসন্তকুমারী দাসী (প্রার্থী) আপেলাণ্ট।

যশোহরের কালেক্টর ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিপক্ষ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর টি এলেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

১৮৭০ সালের ২০ নং মোকদ্দমা।

চন্দ্রকুমার রায় (প্রার্থী) আপেলাণ্ট।

যশোহরের কালেক্টর ও অন্যান্য (প্রতিপক্ষ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন জেলার জজ এক বিধবা স্ত্রীকে তাহার মৃত স্বামীর সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট দিতে হুকুম দেন, কিন্তু তাহার পরে কালেক্টরের প্রার্থনামতে এবং যে সকল ব্যক্তি দাবী ও আপত্তি করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার ঐ হুকুম রহিত করত কালেক্টরকে ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন।

এ স্থলে যদিও জজ বলেন যে, তিনি ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারা মতে ঐ আদেশ

দিয়াছেন, তথাপি তাহা বাস্তবিক ২১ ধারা মতে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ঐ ধারা মতে জজের তাহা দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—মৃত উমেশচন্দ্র রায়ের কতিপয় নাবালগ পুত্রের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ সম্বন্ধে এই মোকদ্দমা উপস্থিত।

দেখা যাইতেছে যে, উমেশচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী বসন্তকুমারীর দরখাস্তমতে জেলার জজ তাঁহাকে গত ৩১ এ মে তারিখে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে এক সার্টিফিকেট দেওয়ার হুকুম দেন; কিন্তু বসন্তকুমারী সেই সার্টিফিকেট লইতে কিছু বিলম্ব করেন। ২১ এ আগষ্ট তারিখে কালেক্টর জজকে লেখেন যে, বসন্তকুমারী ঐ সার্টিফিকেট লইতে ইচ্ছা করেন না, অতএব কালেক্টরের বিবেচনায়, চন্দ্রকুমারকে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত, কারণ, সে মৃত উমেশচন্দ্রের সাক্ষাৎ খুড়তাত ভ্রাতা।

তাহাতে জজ ঐ বিধবাকে ২রা অক্‌টোবর তারিখে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি সার্টিফিকেট লইবেন কি না। ঐ বিধবা ৬ ই নবেম্বর তারিখে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তিনি তাহা লইতে প্রস্তুত আছেন। উমেশচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কালিদাসও হাজির হইয়া চন্দ্রকুমারকে সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতি আপত্তি করে। ১১ ই নবেম্বর তারিখে জজ সকল পক্ষের কথা শুনিয়া, বসন্তকুমারীকে সার্টিফিকেট দেওয়ার হুকুম উঠাইয়া লইয়া তাহার নাবালগ পুত্রের সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে কালেক্টরের প্রতি আদেশ করেন।

এই হুকুমের বিরুদ্ধে দুই আপীল অর্থাৎ এক আপীল বসন্তকুমারীর দ্বারা এবং দ্বিতীয় আপীল চন্দ্রকুমারের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে।

আমার বোধ হয় যে, জজ ঐ আইনের যেরূপ উল্লেখ করিয়া তাঁহার এই হুকুম দেওয়ার ক্ষমতার কথা বলেন, তাহা বিশুদ্ধ নহে। তিনি বলেন যে, তিনি ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারা মতে ঐ হুকুম দিয়াছেন। আমি অন্যান্য মোকদ্দমায়ও বলিয়াছি, এবং এই মোকদ্দমায়ও পুনরায় বলিতেছি যে, ৯ ধারার লিখিত বৃত্তান্ত সমস্তে আদালতের কি করা কর্ত্তব্য তাহার যে সমস্ত বিধান ৯ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে, ১২ ধারা তাহারই এক বিধান, এবং "যদি উইল বা "দলীলক্রমে দাবীদার কোন ব্যক্তি দ্বারা সার্টি- "ফিকেট পাওয়ার স্বত্ব আদালতের সন্তোষকর "রূপে সাব্যস্ত না হয়, এবং নাবালগের সম্প- "ত্তির ভার গ্রহণের উপযুক্ত ও ইচ্ছুক কোন "নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি না থাকে," তাহা হইলে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করার জন্য কেবল ১২ ধারা মতে কালেক্টরের প্রতি উচিত রূপে আদেশ করা যাইতে পারে। আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমার হুকুম বাস্তবিক ২১ ধারা মতে প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ, তদ্দ্বারাই, দেওয়ানী আদালত কোন যথেষ্ট কারণে ঐ আইন মতে সার্টিফিকেট দেওয়ার হুকুম উঠাইয়া লইতে পারেন, এবং কালেক্টরকে সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিতে পারেন, অথবা সরকারী কিউরেটর বা অবস্থাবিশেষে অন্য কোন ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

বসন্তকুমারী সার্টিফিকেট লন নাই, কিন্তু দেওয়ানী আদালত তাঁহাকে সার্টিফিকেট দিতে হুকুম দিয়াছিলেন, এবং দেওয়ানী আদালত আমার বিবেচনায় যথেষ্ট হেতুতেই ঐ সার্টিফিকেট উঠাইয়া লইয়াছেন, অর্থাৎ সার্টিফিকেট দেওয়ার তাঁহার হুকুম রহিত করিয়াছেন।

বসন্তকুমারীর আপীল সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, তাহার কোন হেতু নাই। তিনি কালেক্টরকে যে এক পত্র লেখেন, এবং যাহাতে তিনি ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে তাঁহার নিজের অক্ষমতা ও অনিচ্ছা স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই পত্রের বুনিয়াদে জজ ঐ হুকুম দেন, এবং সেই পত্রে কালেক্টরের প্রতি সম্পত্তির ভার অর্পণ করার কথায় তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। ভদ্ভিন্ন দেখা যাইতেছে যে, জজের

নিকট এই মোকদ্দমার শুনানীর কালে তাঁহার উকীল আদালতকে অবগত করেন যে, এই প্রকার হুকুম হইলে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, তিনি এইক্ষণে আপীল করিয়া জজের হুকুম অন্যথা করার প্রার্থনা করিতে পারেন না।

অনন্তর, চন্দ্রকুমারের আপীল সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, এই মোকদ্দমায় তাঁহার কোন স্থানই নাই। তিনি জ্ঞাতি বটেন। তিনি ৯ ধারার লিখিত নিকট জ্ঞাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন কি না, তাহা আমার বলিবার আবশ্যক নাই; কারণ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার অপেক্ষা নিকটতর জ্ঞাতি আছে। প্রথমতঃ, মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী আছেন, দ্বিতীয়তঃ, মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আছেন, এবং তাঁহাদের ছাড়া, খুল্লতাত রাধাচরণ আছেন, এবং ইঁহারা সকলেই জীবিত আছেন। তাঁহাদের মধ্যে এইক্ষণে দুই জন সার্টিফিকেট লইতে প্রস্তুত আছেন। বোধ হয়, কালিদাস সার্টিফিকেট লওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু তিনি তাহা চন্দ্রকুমারকে দিতে আপত্তি করেন, এবং বোধ হয়, তিনি এইক্ষণে তাহা লইতেও সম্মত হন। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, চন্দ্রকুমার সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য জেদ করিতে পারেন না। অতএব দুই আপীলই খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

---

৩ রা মার্চ, ১৮৭০।

**প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি জি, লক।**

১৮৬৯ সালের ৫৫৫ নং মোকদ্দমা।

সাহাবাদের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৪ এ সেপ্‌টেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

চুয়া সাহু প্রভৃতি (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

ত্রিপুরা দত্ত ও আর এক ব্যক্তি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমানাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—কতক টাকায় সমুদায়ের স্বত্ত্ব আছে বলিয়া, পাঁচ ব্যক্তির অনুকুলে ডিক্রী হয়, কিন্তু ঐ টাকার অর্দ্ধ উহার তিন জনকে ও অপর অর্দ্ধ বাকী দুই জনকে অর্পিত হয়।

এ স্থলে ঐ নিষ্পত্তির ফল দুই স্বতন্ত্র এবং পৃথক্ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় গণ্য, এবং যে ডিক্রীদারের প্রতি এক অর্দ্ধ অর্পিত হয়, তাহার কোন কার্য্যের দ্বারা দ্বিতীয় অর্দ্ধের ডিক্রীদারের ডিক্রী সজীব থাকিতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—আমার বিবেচনায়, এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি বিশুদ্ধই হইয়াছে। মুল ডিক্রীতে মবলগ ৯১১১ টাকা, মোট টাকা স্বরূপে এবং তাহাতে সকলে এজমালীতে স্বত্ববান্ বলিয়া পাঁচ ব্যক্তির অনুকূলে ডিক্রী হয়, কিন্তু তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ ৪৫৫৮৸৹ তাহাদের মধ্যে তিন ব্যক্তি চুয়া সাহু, চুনী সাহু এবং শিবরতন সাহুকে এবং বাকী অর্দ্ধ ৪৫৫৮৸৹ টাকা বিচক ও রামদীনকে অর্পিত হয়।

এই নিষ্পত্তির ফল দুই স্বতন্ত্র এবং পৃথক্ ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার ন্যায়ই হয়। বিচক এবং রামদীন ১৮৬৯ সালের ৫ ই জানুয়ারি তারিখে তাহাদের ৪৫৫৮৸৹ টাকার ডিক্রীজারী করে। চুয়া, চুনী এবং শিবরতন ১৮৬৯ সালের ১ লা জুলাই তারিখে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে, এবং তাহাদের দরখাস্তের প্রতি এই আপত্তি হয় যে, তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রী (অর্থাৎ ডিক্রীতে তাহাদের অংশ) জারী করার জন্য কোন কার্য্য হয় নাই।

নিম্ন আদালতে এবং এইক্ষণে আমাদের সমক্ষে আপীলেও তাহারা তর্ক করে যে, বিচক

ও রামদীন তাহাদের ডিক্রীর অংশ জারী করার জন্য যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছে তাহারা তাহারই উপকার লাভ করিতে পারে।

আমাদের বিবেচনায়, এই তর্কের কোন মুল নাই। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে যে ভিন্ন ভিন্ন টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ রূপে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। বিচক এবং রামদীনের ডিক্রীর অংশে উপস্থিত প্রার্থিগণের কোন স্বার্থ নাই। প্রার্থীরা যে ডিক্রী পাইয়াছে তদন্তর্গত তাহাদের স্বত্বের কোন হানি, বিচক ও রামদীনের কোন কার্য্যের দ্বারা হইতে পারিত না। দুই পৃথক্ পৃথক্ মোকদ্দমায় ডিক্রী হওয়ার ন্যায় এই দুই ডিক্রী পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। প্রার্থীরা ভিন্ন এক মোকদ্দমায় ডিক্রীদারের কার্য্যের যেরূপ উপকার লাভ করিতে পারে না, সেই প্রকার বিচক ও রামদীনের কার্য্যেরও উপকার লাভ করিতে পারে না।

এক নজীরের উল্লেখ হইয়াছে যাহাতে লেখা আছে যে, এক কি অধিক ডিক্রীদার যদি ডিক্রীর কিয়দংশ জারী করে তবে তদ্দ্বারা, যে সকল ব্যক্তির ঐ ডিক্রীতে স্বত্ব আছে, তাহাদের সমুদায়েরই উপকার হয়। যদি সমুদায় স্বত্ববান্ ব্যক্তিদিগের উপকারার্থে সমুদায় ডিক্রী জারীর চেষ্টায় কিয়দংশের জারী হয়, তবে নিঃসন্দেহই সমুদায় ডিক্রী সজীব থাকিতে পারে। কিন্তু আমি ইহা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, ডিক্রীতে যে ব্যক্তির কেবল এক অংশের, মনে কর যেন এক আনার স্বত্ব আছে, তাহাকে যদি অন্যায় করিয়া ডিক্রীর সেই অংশ জারী করিতে দেওয়া যায়, (আমি দেখিতেছি যে, ১৮৫৯ সালের ৮-আইনে তাহা করার কোন বিধান নাই) তাহা হইলে এমন কোন নিয়ম অথবা যুক্তি নাই যদ্দ্বারা বলা যাইতে পারে যে, ঐ কিয়দংশের জারীর দ্বারা বাকী ৸৶০ আনার স্বত্ববান ব্যক্তিরা উপকার লাভ করিতে পারিবে।

১১ শ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪২১ পৃষ্ঠায় মসম্মত ধনেশ্বরী বনাম উদর সহায়ের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিশুদ্ধতার প্রতি আমার সন্দেহ আছে।

আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

**বিচারপতি লক।**—আমিও বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতের হুকুম বিশুদ্ধ হইয়াছে। সপষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই ডিক্রী দুই স্বতন্ত্র ডিক্রীর ন্যায় দেখিতে হইবে, এবং প্রার্থিগণের উচিত সময়ের মধ্যে তাহাদের ডিক্রীর অংশ জারী করা কর্ত্তব্য ছিল। যে ডিক্রীদারের প্রতি অপর অর্দ্ধ অর্পিত হইয়াছিল তাহাদের কোন কার্য্যের দ্বারা আপেলান্টের উপকারের জন্য ডিক্রী সজীব থাকিতে পারে না।

আপীল ডিস্‌মিস্ হইল। (গ)

---

৩ রা মার্চ, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ বি বেলি।

১৮৬৯ সালের ১৫৩ নং মোকদ্দমা।

মৌলমিনের রেকর্ডরের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মৌলমিন বিভাগের একজেকিউটিব্ এন্‌জিনিয়ার জে ডবলিউ ইংলিছের স্থলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ার সেক্রেটরী অব্ ষ্টেট (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

মুতু স্বামী ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

এড্‌বোকেট জেনরেল আপেলাণ্টের কৌন্সেল। মেং জি সি পল বারিষ্টর ও এস্ বরটানেস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—যদি একতরফা দরখাস্ত ও এজ্‌হারের উপরে আপীলের রেজিষ্টরীতে কোন আপীল দাখিল হয়, তবে সেই আপীল শ্রবণের কালে প্রতিপক্ষ দেখাইতে পারে যে, উচিত সময়ের পরে তাহা দাখিল করিয়া লওয়ার কোন উৎকৃষ্ট হেতু নাই।

হাইকোর্টে আপীলের জন্য যে ৯০ দিবস সময় প্রদত্ত আছে, তাহা, যে তারিখে ডিক্রী ও রায়ের নকলের জন্য ষ্টাম্প কাগজ দাখিল হয় এবং যে তারিখে আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মচারী কৈফিয়ৎ দেয় যে, নকল প্রস্তুত হইয়াছে, এই দুই তারিখের মধ্যবর্ত্তী কাল বাদ দিয়া, গণনা করিতে হইবে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—১৮৬৩ সালের ২১ আইনের ২৭ ধারা মতে মৌলমিনের রেকর্ডরের এক ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে। ১৮৬১ সালের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে রেকর্ডরের রায় প্রদত্ত হয় এবং গত ১২ ই জুলাই তারিখে আপীল দাখিল হইয়া বিশেষ প্রার্থনাক্রমে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। আপীলের দরখাস্তের উপরে হুকুম হয় যে, "এই আপীল দাখিল হউক।"

গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি সোলিসিটর মেৎ কলিসের এজহারের উপরে এই হুকুম হয়; সেই এজহারে লেখা আছে যে, মৌলমিনের রেকর্ডরের রায়ের নকলের উপরে যে এক ইয়াদদস্ত আছে তদ্দৃষ্টে তাঁহার বিশ্বাস এই যে, ১৮৬৯ সালের ২৯ এ মার্চের পূর্ব্বে রায়ের নকল পাওয়া যায় নাই; এবং ঐ নকল এবং অন্যান্য কাগজ পত্র মৌলমিন হইতে রাঙ্গুন নগরে ব্রিটিস ব্রহ্মের প্রধান কমিসনরের সমীপে প্রেরিত হয় এবং তাহার পরে ঐ প্রধান কমিসনরের দ্বারা ১২ ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা নগরে গবর্ণমেণ্টের সোলিসিটরের নিকট প্রেরিত হয়, এবং গবর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধি সোলিসিটর মেৎ কলিস ঐ কাগজপত্র পাইয়া ২১ এ এপ্রিল তারিখে এড্‌বোকেট জেনরেলের মতের জন্য অর্পণ করেন, এবং আপীল করার পরামর্শ সম্বলিত এডবোকেট জেনরেলের রায় মেৎ কলিস ১৮ ই জুন তারিখে প্রাপ্ত হন এবং আপীল করার অনুমতি পাওয়ার জন্য মেৎ কলিস সেই তারিখেই ব্রিটিস ব্রহ্ম রাজ্যের প্রধান কমিসনরের নিকট টেলিগ্রাফ করেন; ২৪ এ জুন তারিখে তাহার উত্তর প্রেরিত হয়, কিন্তু ৩ রা জুলাই তারিখের পূর্ব্বে মেৎ কলিস তাহা কলিকাতায় প্রাপ্ত হন নাই।

এই এজহার ৮ ই জুলাই তারিখে শপথ পূর্ব্বক দাখিল হয়, এবং ১২ ই জুলাই তারিখে এই আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার হুকুম হয় এবং আপীল সেই তারিখেই দাখিল হয়।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে মেৎ পল এই হেতুবাদে আপীল শ্রবণের প্রতি এক প্রাথমিক আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩১ ধারা-লিখিত সময়ের মধ্যে দাখিল হয় নাই এবং ইহারা পূর্ব্বে কি জন্য তাহা দাখিল হয় নাই তাহার যথেষ্ট হেতু মেৎ কলিসের এজহারে প্রদর্শিত হয় নাই।

প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ ও বিচারপতি কেম্প এক মোকদ্দমায় এই নিষ্পত্তি করেন যে, আপীল দাখিল ও রেজিষ্টরী করিয়া লইলেও প্রতিপক্ষের উপরে তাহার নোটিস জারী করিলে পরে, আপীল-আদালত সেই আপীল শ্রবণ করার কালে, আপীল উচিত সময়ের মধ্যে দাখিল না হওয়ার হেতুবাদে তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সেই মোকদ্দমা ৮ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৪১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। মেৎ পল তর্ক করেন যে, ঐ বিধি খাটে না, এমন অনেক স্থল দেখান যাইতে পারে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, আপীল আদালত আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার পরেও, যদি প্রতিপক্ষ দেখাইতে পারে যে, আপেলাণ্ট মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা অথবা কোন বৃত্তান্ত গোপন করিয়া আপীলের অনুমতি পাইয়াছে, অথবা যদি সে দেখাইতে পারে যে, কোন প্রকার যথেষ্ট হেতু ছিল না, অথবা আপেলাণ্ট কোন প্রতারণা না করিলেও আপীল-আদালত ভ্রমাত্মক রূপে আপীল দাখিল করিয়া লইয়াছেন, তাহা হইলে বোধ হয় আদালত আপন হুকুম রহিত করিয়া

রেজিষ্টরী হইতে আপীল খারিজ করার আদেশ করিতে পারেন।

এই প্রকার এক মোকদ্দমা বিচারপতি ফিয়ার ও হব্‌হৌসের সমক্ষে উপস্থিত ছিল, এবং তাহা ১০ ম বালম উইকলি রিপোর্টরের ১৭৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে।

আমার ইহা বলিলেই হইবে যে, মেং পল এমন কোন কারণ দেখাইতে পারেন নাই যদ্দ্বারা আমরা অনুমান করিতে পারি যে, প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ভ্রম বশতঃ এই আপীল লইয়াছেন, অথবা তাঁহারা যে প্রণালীতে তাহা লইয়াছেন তাহা ভ্রমাত্মক হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, ২৩ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিক্রী প্রদত্ত হয়। ২৪ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রার্থী ডিক্রীর নকলের দরখাস্ত করে। সে ২৯ এ মার্চের পূর্ব্বে নকল পায় নাই, এবং মেং পল দেখাইতে পারেন নাই, এবং দেখাইবারও কিছু নাই যে, তাহার পূর্ব্বে নকল পাওয়া যাইত; অতএব আমার অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, প্রার্থীর কোন ত্রুটি হয় নাই, এবং নকল প্রস্তুত হওয়া মাত্রেই সে তাহা আদালত হইতে পাইয়াছে। অতএব যদি ২৪ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ২৯ এ মার্চ পর্য্যন্ত কাল ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে দৃষ্ট হইবে যে, প্রার্থী ১২ ই জুলাই তারিখে তাহার আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিয়া উচিত সময়ের ১২ কি ১৩ দিবস পরে দাখিল করিয়াছে।

এই বিলম্ব অনুচিত কি না, এবং তাহার পূর্ব্বে আপীল দাখিল না করার যথেষ্ট হেতু ছিল কি না, তাহা পর্য্যালোচনা করার জন্য আমাদের এই মোকদ্দমার পক্ষগণের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। যদিও এই মোকদ্দমা মৌলমিন ডিবিজনের একজেকিউটিব এঞ্জিনিয়র মেং ইংলিছের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে (কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তাঁহার বিরুদ্ধে আরজীতে নালিশের কোন হেতু ব্যক্ত নাই) তথাপি ইহা বাস্তবিক মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ার সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে। আমি মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের নাম উচ্চারণ করিলাম, কারণ, তিনিই প্রকৃত প্রতিবাদী এবং তাঁহাকেই প্রতিবাদী করা উচিত ছিল, এবং যে টাকার দ্বারা ডিক্রী পরিশোধিত হইবে তাহা সরকারী টাকা এবং গবর্ণমেণ্টের দেয়, এবং পক্ষগণ সম্মত হইয়াছে যে, মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের বিরুদ্ধে নালিশের ন্যায় এই আপীল চলিবে।

এই মোকদ্দমা মৌলমিনে বিচারিত হয়। রাঙ্গুন যেখানে প্রধান কমিসনর বাস করেন, তথায় মৌলমিন হইতে এস্তমেজাজ করার আবশ্যক হয়, এবং প্রধান কমিসনরের, কলিকাতায় গবর্ণমেণ্ট সোলিসিটরকে লিখিয়া এড্‌বোকেট জেনরেল যিনি আইন সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ষ্টেট সেক্রেটরীর পরামর্শ-দাতা, তাঁহার মত লওয়ার আবশ্যক হয়, অতএব এই সকল অবস্থায় যে বিলম্ব হয় যাহা সচরাচর প্রতিবাদিগণের হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহা ছাড়া যখন দেখা যাইতেছে যে, আপীল চালাইবার জন্য অনুমতি করিয়া মেং কলিসকে যে টেলিগ্রাম প্রেরিত হয় তাহা পথে ১০ দিবস বিলম্ব হয়, তখন আমরা বিবেচনা করি যে, প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ন্যায্য রূপেই বিবেচনা করিয়াছেন যে, ৯০ দিবসের মধ্যে আপীল দাখিল না করার যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।

মিথ্যা কথার দ্বারা অথবা ভ্রমে প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র এই আপীল গ্রহণ করার হুকুম দিয়াছিলেন কি না, এবং আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার প্রতি এইক্ষণে কোন আপত্তি শুনা যাইতে পারে কি না, এই সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মেং কলিসের এজ-

হারে এমত যথেষ্ট হেতু ছিল যদ্দ্বারা প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যে হুকুম দিয়াছেন তাহা তাঁহারা দিতে পারিতেন এবং তাঁহারা আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার যে হুকুম দিয়াছেন তাহার ন্যায্যতার প্রতি আমরা এইক্ষণে সন্দেহ করিতে পারি না।

এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, আমাদের এই আপীল শ্রবণ করা উচিত।—

* * *

বিচারপতি বেলি।—মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে আমি প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতির মতে সম্মত হইলাম।

আমিও বিবেচনা করি যে, উচিত কাল অতিক্রম করিয়া আপীল দাখিল করার জন্য ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৩ ধারানুযায়ী যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। আমি কেবল এই আদালতের যে নিয়ম আছে যে, আপীল উচিত সময়ের পরে দাখিল হইলে খণ্ডাধিবেশনের অনুজ্ঞা না লইয়া ডেপুটি রেজিষ্ট্রার তাহা দাখিল করিয়া লইতে পারেন না, সেই নিয়ম দৃষ্টেই প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এই আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার হুকুম প্রদত্ত হইয়াছে। এই মোকদ্দমায় খণ্ডাধিবেশনের অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের কেবল এই হুকুম হয় যে, আপীল দাখিল হউক, তাহার অধিক কোন হুকুম হয় নাই। প্রতিপক্ষের আপত্তি শ্রবণ না করিয়া (এই মোকদ্দমায় ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষের আপত্তি শ্রবণ করা হয় নাই) যদি এই মোকদ্দমার ন্যায় কেবল একতরফা এজহার ও দরখাস্তের উপরে আপীল দাখিল করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আপীল শ্রবণের কালে প্রতিপক্ষ কি জন্য এই তর্ক করিতে পারিবে না যে, উচিত সময়ের পরে আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার যথেষ্ট হেতু নাই, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

আমি আরও বিবেচনা করি যে, নিম্নলিখিত বিধি এই আদালতে ও মফঃসল আদালতে প্রচলিত হইয়াছে, অর্থাৎ, এই আদালতে আপীল করার জন্য যে ৯০ দিবসের বিধান আছে, তাহা, যে তারিখে প্রার্থী রায় ও ডিক্রীর নকলের জন্য ষ্টাম্প কাগজ দাখিল করে, এবং যে তারিখে আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মচারী কৈফিয়ৎ দেয় যে, নকল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে, এই দুই তারিখের মধ্যবর্ত্তী সময় বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে।

উপস্থিত মোকদ্দমায় ব্রিটিস ব্রহ্মের ব্যবধানতা ও তথা হইতে সংবাদ আসা যাওয়ার যে কষ্ট তাহা দৃষ্টে ও আপীল করার জন্য প্রধান কমিসনরের অনুমতির আবশ্যক বিবেচনায়, এবং আপীলের সময় থাকিতেও টেলিগ্রাফের দ্বারা সংবাদ আনয়ন করার যে যত্ন প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এবং টেলিগ্রাফের ত্রুটি দৃষ্টে আমি বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদীর এই ১২ দিবস বিলম্ব হওয়ার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। (গ)

---

৪ ঠা মার্চ ১৮৭০।

প্রতিনিধি বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২২৫৩ নং মোকদ্দমা।

মুঙ্গেরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৩ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করত ভাগলপুরের অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৯এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রামচরণ লাল ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

হাডী মাহতুন ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—সরকারী বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতার বিরুদ্ধে লাখেরাজের স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার ও দখল স্থির রাখার নালিশে বাদীর ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে ঐ ভূমি নিষ্কর ভোগ হইয়া আসিয়াছে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে, প্রতিবাদিগণ যাহারা বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতা তাহারা এই মর্ম্মে বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ৯ ধারামতে ডেপুটি কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিল যে, বর্ত্তমান বাদিগণ তাহাদের দখলী কতক ভূমি জরীপ করিতে ঐ প্রতিবাদিগণকে বাধা দিতেছে। ডেপুটি কালেক্টর তদ্বিষয়ের তদন্ত করিয়া জরীপ করার হুকুম দেন; সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বর্ত্তমান বাদিগণ ঐ আইনের ১০ ধারামতে এই বলিয়া জেলার জজের নিকট আপীল করে যে, তাহারা ঐ ভূমি লাখেরাজ সূত্রে ভোগ করে। জজ ডেপুটি কালেক্টরের হুকুম এই নির্দ্দেশে স্থির রাখেন যে, বর্ত্তমান বাদীরা যে, ঐ ভূমি লাখেরাজ সূত্রে ভোগ করে এমন কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই।

তাহাতে বাদিগণ তাহাদের লাখেরাজ স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার ও দখল স্থির রাখার জন্য নালিশ উপস্থিত করে। দেখা যাইতেছে যে, তাহারা ১৮২৮ সাল হইতে খাজানা না দেওয়ার কিছু প্রমাণ দিয়াছে এবং তাহারা ঐ ভূমি লাখেরাজ সূত্রে দখল করিতেছে হেতুবাদে পূর্ব্ব জমিদারের খাজানার দাবীর প্রতি সর্ব্বদা আপত্তি করিয়া আসিয়াছে। ঐ ভূমির যে, কখন খাজানা দেওয়া হইয়াছিল, প্রতিবাদিগণ তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারে নাই বলিয়া অধঃস্থ জজ প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া হুকুম দেন যে, বাদিগণের দখল স্থির থাকিবে।

আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অশুদ্ধ হইয়াছে, এবং তাহা অবশ্য অন্যথা হইবে। বাদিগণের লাখেরাজ সূত্রে ভূমি ভোগ করার স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রী পাইতে হইলে, অন্ততঃ তাহাদের এমন প্রমাণ দেখাইতে হইবে যে, প্রতিবাদিগণ যাহারা বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতা তাহাদের বিরুদ্ধে বাদিগণের স্বত্ব আছে। প্রতিবাদিগণ ইহার পরে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১৪ প্রকরণমতে কর বসাইবার জন্য যে কোন দাবী করে তাহা খণ্ডন করার জন্য বাদিগণের ইহা সপ্রমাণ করা আবশ্যক যে, তাহারা স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে নিষ্কর ভোগ করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বাদিগণ তাহা সপ্রমাণ করে নাই। প্রতিবাদীরা যাহারা বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতা তাহারা যদি ভূমির উপর কর বসাইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিত, তবে বিচার্য্য প্রশ্ন স্বতন্ত্র হইত। কথিত লাখেরাজদারেরা এই ভূমি লাখেরাজ সূত্রে ভোগ করে বলিয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। তাহারা ঐ কথা বলে, সুতরাং তাহা তাহাদেরই সপ্রমাণ করা উচিত ছিল। তাহারা তাহা সপ্রমাণ করিতে সম্পূর্ণ অকৃতকার্য্য হইয়াছে অতএব আমরা অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করত সকল আদালতের খরচা সমেত বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিলাম।

(গ)

---

৪ ঠা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ২৩২ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের জজের ১৮৬৯ সালের ২ রা জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

রামধন পাল ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কি প্রতিকারের প্রার্থনা করা হয়, কি বিষয়ের দাবী করা হয়, নালিশের হেতু কি এবং তাহা কখন উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদায়, আরজীতে লিখিতে হইবে, এবং ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়, কি প্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে। এই প্রদেশে নালিশের আরজীতে ইংলণ্ড দেশের নিয়ম সমস্ত খাটে না।

বিচারপতি কেম্প।—এই মোকদ্দমার বাদী জেলা বীরভূমের অন্তর্গত গোপালপুরের মুন্সেফ-আদালতের এক জন উকীল, সে কুলীন ব্রাহ্মণ এবং তাহার পিতা বর্ত্তমান আছে। পিতাপুত্র দুই জনেই বাণিজ্য করে, এবং পুত্র মুন্সেফ আদালতের উকীল। প্রতিবাদী ঐ গ্রামের এক জন কৃষক। দেখা যাইতেছে যে, ওয়াশীলাতের দাবী সম্বন্ধীয় যে এক নালিশে বাদী উকীল ছিল, তাহাতে প্রতিবাদী লিপ্ত ছিল। বিপিনবিহারীর দোকানে দুই পক্ষের সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রতিবাদী ওয়াশীলাতের মোকদ্দমার খবর জিজ্ঞাসা করে। ঐ উকীল যে প্রকার মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন, বোধ হয় প্রতিবাদী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিল যে, সে ভরসা করে যে, পূর্ব্বের এক সালিশী মোকদ্দমা যাহাতে বাদীই উকীল ছিল, তাহা যে প্রকার নিষ্পন্ন হইয়াছিল, সেই প্রকার এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবে না। প্রতিবাদী এই কথা কি মনস্থে বলিল তাহা বাদী তাহাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলে যে, সেই মোকদ্দমায় সালিশদিগের মধ্যে গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি ভিন্ন আর সকলে অসৎ ছিল। বাদী তাহাতে বলে যে, তাহার পিতা এক জন সালিশ ছিলেন, এবং তাহার পিতার ও গ্রামের অন্যান্য ভদ্রলোকের চরিত্রের বিরুদ্ধে ঐ প্রকার কুবাক্য ব্যবহার করা প্রতিবাদীর অন্যায় কার্য্য হইয়াছে, এবং যদি সে পুনরায় ঐ রূপ বাক্য ব্যবহার করে, তবে, প্রতিবাদী তাহার নিজের ও তাহার পিতার সুখ্যাতি রক্ষা করার জন্য প্রতিবাদীর নামে নালিশ করিতে বাধ্য হইবে; তাহাতে প্রতিবাদী অতি কুৎসিত বাক্য উচ্চারণ করত একটি জ্বালানী কাষ্ঠ তুলিয়া লয়; সেই কাষ্ঠ সে অন্বেষণ করিয়া লয় নাই, কিন্তু তাহা তখন তথায় পড়িয়াছিল; এবং প্রতিবাদী সেই কাষ্ঠ লইয়া বলে যে, তদ্দ্বারা সে বাদীর মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং রামেশ্বর চৌকীদার তাহাকে নিবারণ না করিলে সে তাহা করিত। বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। কথোপকথনের যে ভাগে সালিশদিগের উৎকোচ গ্রহণ করার কথা হয় তাহা বাদী বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু প্রতিবাদী যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল তাহা অবিকল না লিখিয়া বাদী আপন আরজীতে কেবল এই কথা বলিয়াছে যে, প্রতিবাদী ঈর্ষাপূর্ব্বক তাহাকে কুবচন বলে এবং তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয় এবং তদ্দ্বারা ভদ্র সমাজে তাহার সম্মানের হানি এবং মনোবেদনা হইয়াছে। ২০০ টাকার খেসারতের দাবী করা হইয়াছে, এবং বাদী বলে যে, প্রতিবাদী তাহা দিতে যথেষ্ট সমর্থ আছে।

প্রতিবাদী আরজীর প্রতি এই বলিয়া আপত্তি করে যে, তাহা যথেষ্ট রূপে পরিষ্কার নহে, কারণ, বাদীর প্রতি যে কুবচন ব্যবহার করার কথা বলা হইয়াছে, তাহা অবিকল লেখা হয় নাই; এবং সে তাহার পরে বলে যে, বাদী যে বলে যে, প্রতিবাদী তাহার প্রতি কুবচন প্রয়োগ করে, এবং তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়, তাহা সমুদায় মিথ্যা।

আরজীতে যে লেখা আছে যে, প্রতিবাদী "ঈর্ষা-পূর্ব্বক বাদীর প্রতি শ্রুতি-কটু বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে," তাহা বীরভূমের জজ মেং

টুগুড অগ্রাহ্য করিয়াছেন। জজ, এডিসনের টর্ট বিষয়ক গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ৭১৪ পৃষ্ঠা ও শেষ সংস্করণের ৮০৩ পৃষ্ঠার উল্লেখ করিয়াছেন। আঘাত সম্বন্ধে জজ বলেন যে, বাদী যদি অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিত, এবং অন্যের জন্য বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত না হইত, তবে প্রতিবাদী ঐ প্রকার কার্য্য করিত না, এবং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদী প্রতিবাদীর ক্রোধোৎপাদন করিয়াছিল, এবং তাহার জন্যই প্রতিবাদী ঐ প্রকার কার্য্য করিয়াছে। নিম্ন আদালত বাদীকে ক্ষতি-পূরণ স্বরূপ ॥০ আনার ডিক্রী দিয়া প্রত্যেক পক্ষকে আপন আপন খরচা দিতে হুকুম দেন।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদী আপীল করিয়াছে। ইংলণ্ডে "লিপি দ্বারা অথবা বাক্যের "দ্বারা গ্লানি-সূচক অপবাদ প্রচার করার নালি- "শের আরজীতে সেই লিপি অথবা বাক্য- "গুলি অবিকল ব্যক্ত করিতে হয়; কারণ, তদ্দ্বারা "আদালতকে দেখান যাইতে পারে যে, ঐ "বাক্যের দ্বারা যে অপবাদ অথবা গ্লানি হই- "য়াছে বলিয়া কথিত হয়, তাহা তদ্দ্বারা হইতে "পারে; এবং প্রতিবাদীও অভিযোগ নিশ্চিত "রূপে বুঝিয়া সাধারণরূপে অথবা ঐ গ্লানি "করার ন্যায্য হেতু আছে বলিয়া জওয়াব "দিতে পারে; এবং এই ত্রুটি রায়ের দ্বারা "সংশোধিত হইতে পারে না।"

এ প্রদেশে, কি প্রতিকার পাওয়ার প্রার্থনা হয়, কি বিষয়ের দাবী হয়, নালিশের হেতু কি, এবং কখন্ তাহা জন্মিয়াছে, তাহা আরজীতে লিখিতে হয়। ক্ষতি-পূরণের নালিশে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কি রূপ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা আবশ্যক। আমরা বিবেচনা করি যে, বাদী আপন আরজী আরও পরিষ্কার করিয়া লিখিতে পারিত; কিন্তু আমরা এমন কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, ইংলণ্ডীয় আইনের নিয়ম এ দেশের আরজীতে অবিকল খাটিবে। পরন্তু, যদি জজ বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, আরজী যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল না, তবে এডিসনের গ্রন্থ অন্বেষণ করত এক পরিচ্ছেদ উদ্ধার না করিয়া বাদীকে তাহার আরজী সংশোধন করার জন্য ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ, আরজীর লিপির ব্যতিক্রমে প্রতিবাদীর কোন হানি হয় নাই। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই জবানবন্দী লওয়া হয়, এবং প্রতিবাদী বিলক্ষণ জানিত যে, বাদী তাহার কথিত কোন্ কথার প্রসঙ্গ করিয়াছিল, অতএব সে এমন কথা বলিতে পারে না যে, কি অভিযোগ হইয়াছে, তাহা সে নিশ্চিত জানে না। সমুদায় প্রমাণ পাঠ করিয়া আমাদের নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে, প্রতিবাদী যে বাক্য ব্যবহার করিয়াছে, তদ্দ্বারা বাদী অত্যন্ত অবমানিত হইয়াছে। সেই বাক্যগুলি অতি গ্লানি-সূচক এবং যখন বিনা কারণে, এক জন সামান্য ব্যক্তি দ্বারা তাহা এক জন কুলীন ব্রাহ্মণ ও মুন্সেফ আদালতের উকীলের প্রতি ব্যবহৃত হইয়াছে, সে স্থলে তাহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।

যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর পিতার প্রতি সালিশ সূত্রে অসদ্ব্যবহার করার দোষারোপ করিয়াছে, সে স্থলে জজ বাদীকে যে অন্যের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করার এবং অন্যের জন্য বিবাদ করিতে প্রস্তুত হওয়ার কথা বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। আমি নিজে যত দূর জানি তাহাতে আমার বিশ্বাস এই যে, যখন এদেশীয় ভদ্রলোকেরা আদালতের দ্বারা নিয়োজিত না হইয়া আপনারা গ্রাম্য বিবাদ ভঞ্জনার্থে পঞ্চায়ত হন, তখন তাঁহারা যথোচিত নিরপেক্ষ রূপে কার্য্য করেন। আমি শুনিয়াছি যে, এ প্রদেশে পঞ্চায়ত দ্বারা বিচারের পদ্ধতি প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অতএব যে স্থলে বাদীকে বলা হইয়াছে যে, তাহার পিতা যাঁহাকে বাদীর বয়স দৃষ্টে প্রাচীন

বোধ হইতেছে, তিনি গ্রামের পঞ্চায়ত হইয়া উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে স্থলে তদ্দ্বারা তাঁহাকে নিতান্ত অবমাননা করা হইয়াছে, এবং পুত্র তাহাতে ন্যায্য রূপেই রাগ করিতে এবং তাঁহার সম্মান রক্ষার জন্য উপায় অবলম্বন করিতে পারে; এবং তাহাতেও বাদী কেবল প্রতিবাদীকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছে যে, সে পুনরায় বলিলে বাদী আইনের সহায়তা গ্রহণে বাধ্য হইবে। প্রতিবাদী যে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছে তাহা আমাদের উচ্চারণ করার আবশ্যক নাই, তাহা নথীতে আছে এবং তাহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত গ্লানি-সূচক।

প্রতিবাদীর প্রমাণ দুই জন সাক্ষীর সাক্ষ্য; তন্মধ্যে এক জন স্বাধীন এবং উভয় পক্ষের নিসম্পর্কীয় ব্যক্তি, এবং তিনি বাদীর নালিশেরই পোষকতা করিয়াছেন; দ্বিতীয় সাক্ষী প্রতিবাদীর এক জন বান্ধব, এবং সে যে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহা অন্যান্য সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে একেবারে বিভিন্ন।

আমরা বাদীকে ৫০ টাকা খেসারতের ডিক্রী দিলাম; মোকদ্দমার সম্পূর্ণ মূল্যের উপরে প্রতিবাদী সকল আদালতের খরচা দিবে। (গ)

---

৪ ঠা মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

সুকুমার সিংহ ও আর এক ব্যক্তি, প্রার্থী।

কাশী সিংহ প্রভৃতি, প্রতিপক্ষ।

মেং সি গ্রেগরি প্রার্থীর উকীল।

মেং জি সি পল বারিষ্টর ও আর ই টুইডেল প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—কোন নীলাম অন্যথা করার দরখাস্তে দেং কার্য্য-বিধির ২৫৭ ধারার লিখিত হেতু সমস্ত বিশেষ রূপে বর্ণিত না থাকিলে, সেই বর্ণনার অভাব হেতু আদালতের তাহার তদন্ত করার অধিকার বিলুপ্ত হয় না।

এই প্রকার ঘটনায়, জজ নীলামের অনিয়ম এবং নীলামের দ্বারা বাস্তবিক অনিষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়া সেই নীলাম অন্যথা করার হুকুম দিলে তাহাই চূড়ান্ত হয় এবং হাইকোর্ট স্বীয় অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিয়া সেই হুকুমের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারার বিধানানুযায়ী অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালন করার জন্য আমাদের নিকট এই দরখাস্ত হইয়াছে। মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই যে।—

কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ নামক এক জন ও অন্যান্য কয়েক জন বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে প্রার্থীর এক ডিক্রী ছিল। সেই ডিক্রীজারীতে সে সকল বিচারাদিষ্ট দায়ীর সাধারণ কতিপয় স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করে। ঐ সকল সম্পত্তি ১৮৬৮ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখে নীলাম হয়, এবং প্রার্থী তাহা ক্রয় করে; কিন্তু যে তারিখে নীলাম সমাপ্ত হয় সেই তারিখে উল্লিখিত কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ আদালতে উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত দ্বারা নিম্নলিখিত বর্ণনা ও প্রার্থনা করে। সে আদালতকে অবগত করে যে, যখন নীলাম হইতেছিল তৎকালেই সে আদালতকে জানাইয়াছিল যে, তাহার ঋণ পরিশোধ করার টাকা সংগ্রহের জন্য সে চেষ্টা করিতেছে, এবং সে প্রার্থনা করে যে, তাহাকে এই টাকা সংগ্রহ করার অবকাশ দেওয়ার জন্য নীলাম কিছু কাল ক্ষান্ত থাকে। সে আরও ব্যক্ত করে যে, আদালত তাহাকে কিঞ্চিৎ সময় দিয়াছিলেন, কিন্তু সে টাকা হস্তে করিয়া প্রত্যাগমন করত দেখিল যে নীলাম সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, এবং ডিক্রীদার ক্রেতা হইয়াছে। এমত অবস্থায় সে আদালতকে ঐ টাকা লইতে এবং ডিক্রীদারের নিকট যে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা অন্যথা করিতে প্রার্থনা করে। আদালত তাহাতে ১৮৬৮ সালের ৩ রা নবেম্বর তারিখে নীলাম

অন্যথা করিয়া, তাহা করার নিম্নলিখিত হেতু লিপিবদ্ধ করেন। তিনি কৃষ্ণপ্রসাদের দরখাস্তের লিখিত বৃত্তান্ত সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, নীলাম অন্যথা করার ঐ সকল বৃত্তান্তই প্রথম কারণ, এবং তাঁহার রায়ের ক্রোড়পত্রের ন্যায় ঐ নীলাম অন্যথা করার দ্বিতীয় কারণ স্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্য লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে লেখা আছে যে, নথীতে দেখা যাইতেছে যে, নীলামের জন্য ২৮এ নবেম্বর মোতাবেক ২৮এ অগ্রহায়ণ দিন স্থির হয়, কিন্তু ভুলক্রমে এই ২৮এ নবেম্বর ২৮এ অক্টোবর বলিয়া পঠিত হয়, কিন্তু ২৮এ অক্টোবর তারিখে আদালত বন্ধ ছিল এবং ঐ ভুলের দ্বারা, ছুটীর পরে অদ্যকার তারিখে আদালত প্রথম খোলার দিবসে নীলাম হয়। অতএব আদালত নির্দ্দেশ করেন য, নীলামের নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে নীলাম করা অন্যায় হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা বিচারাদিষ্ট দায়ীর ক্ষতি হইয়াছে। অতএব এই সকল এবং অন্যান্য হেতুবাদে আদালত নীলাম অন্যথা করেন।

নীলাম অন্যথা করার হুকুম কি জন্য রহিত হইবে না, এবং তৎপরিবর্ত্তে কি জন্য এই আদালতের কোন উচিত হুকুম হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য প্রতিপক্ষের উপরে প্রার্থীর উকীল মেং গ্রেগরি আমাদের হুকুম প্রাপ্ত হন।

প্রতিপক্ষের পক্ষে মেং পল অদ্য কারণ দর্শাইয়াছেন, অতএব ঐ হুকুম অন্যথা করিতে কি স্থির রাখিতে হইবে, তাহা এইক্ষণে আমাদের বিচার করিতে হইবে।

মেং গ্রেগরির তর্ক এই যে, নিম্ন আদালতের বিরোধীয় হুকুম বিচারাধিকার ব্যতীত প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং তিনি এইরূপ তর্ক করেন, যথা, তিনি বলেন যে, বিচারাধিকার জন্মিবার জন্য, যে আদালত নীলাম করেন তাঁহার নিকট এক বিশেষ প্রকারের দরখাস্ত করিতে হইবে, এবং সেই দরখাস্তের উপরে কতিপয় বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এবং যে পর্য্যন্ত ঐ রূপ দরখাস্ত এবং নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত নীলাম অন্যথা করার জন্য আদালতের অধিকার জন্মিতে পারে না।

আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৬ ও ২৫৭ ধারার মর্ম্ম এই যে, মেং গ্রেগরি যে দরখাস্তের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে আদালত নীলাম করেন তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইবে। আইনের বিধান এই যে, "ঐ নীলামের ঘোষণা করাতে "কিম্বা নীলামের কার্য্যে কোন গুরুতর অনি- "য়ম হইয়াছে বলিয়া ঐ নীলামের তারিখ "হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সেই নীলাম রহিত "করিবার দরখাস্ত আদালতে হইতে পারিবে," এবং ২৫৭ ধারার শব্দে "এই প্রকার দরখাস্তের" কথা আছে।

আমিও বিবেচনা করি যে, ঐ আইনের লিখিত হেতু সম্বলিত কোন দরখাস্ত আদালতে এই মোকদ্দমায় দাখিল হয় নাই, কিন্তু অবিকল ঐ রূপ দরখাস্ত না হইলেও নীলাম অন্যথা করার জন্য দরখাস্ত হইয়াছিল, এবং আমরা দেখিতেছি যে, আদালত এই দরখাস্ত, অনিয়ম প্রযুক্ত বাস্তবিক ক্ষতি হওয়ার হেতুবাদে নীলাম অন্যথা করার দরখাস্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই দরখাস্ত যে, ২৫৬ ও ২৫৭ ধারার অন্তর্গত অবিকল দরখাস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল তাহা নথীতে আদালতের নির্দ্দেশের দ্বারাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রার্থীর পক্ষে মেং গ্রেগরি যে প্রথম আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহার ইহাতেই মীমাংসা হইল।

দ্বিতীয় আপত্তি, অর্থাৎ অনিয়মের দ্বারা যে, বিচারাদিষ্ট দায়ীর ক্ষতি হইয়াছে এমন কোন নির্দ্দেশ হয় নাই, তৎসম্বন্ধে আমার বোধ হইতেছে যে, এই তর্ক দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে।

প্রথম তর্ক এই যে, নথীতে যদিও জজের ঠিক এই নির্দ্দেশযুক্ত এক নিষ্পত্তি আছে, তথাপি নথীতে যে এক রুবকারী আছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি এই নির্দ্দেশ অতিক্রম করিয়াছেন, এবং ঐ নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক হইয়াছিল। মেং গ্রেগরি যেরূপ তর্ক করেন, রুবকারীর ফল সেই প্রকার হইলেও মেং গ্রেগরি আমাদিগকে তাহা দেখিতে বলিতে পারেন না। মুন্সেফ জেলার জজকে যে কৈফিয়ৎ দেন তাহার উপরে ঐ রুবকারী হয়, এবং আমি বিবেচনা করি যে, এই প্রকার কৈফিয়তের দ্বারা মোকদ্দমার পূর্ব্ব রায় রূপান্তরিত বা রহিত হইতে পারে না। আমি যে পর্য্যন্ত আইন জানি, তাহাতে আমি বিবেচনা করি যে, ঐ রায় কেবল জজ নিজে পুনর্ব্বিচার করিয়া অন্যথা করিতে পারিতেন, এবং যে আদালতের এই কৈফিয়ৎ তলব করার ক্ষমতা ছিল না যদি ইহা বলা যায় যে, সেই কৈফিয়তের দ্বারা জজ তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহা হইলে এই তর্ক কখনই আইন-সঙ্গত হইতে পারে না।

কিন্তু মেং গ্রেগরি আরও তর্ক করেন যে, জজ তাঁহার ১৮৬৮ সালের ৩ রা নবেম্বরের রায়ে যে সকল বৃত্তান্তের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নথীর প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। অতএব তিনি তর্ক করেন যে, আমরা ঐ সকল বৃত্তান্ত তদন্ত করত তাহা নথীতে সত্য কি মিথ্যা লেখা আছে তাহা স্থির করিতে পারি। এই তর্কের পোষকতায় মেং গ্রেগরি আমাদিগকে কোন আদালতের নিষ্পত্তি দেখাইতে পারেন নাই, এবং মেং গ্রেগরি তাঁহার তর্কের দ্বিতীয় ভাগের পোষকতায় যে আইনের উপর নির্ভর করেন, এই তর্ক তাহার বিপরীত বোধ হইতেছে। ২৫৬ ধারার বিধানমতে জজের যে সকল বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করার আবশ্যক ছিল, তাহা এই যে, প্রথমতঃ, নীলাম করাইতে বা তাহার ঘোষণা করাতে বাস্তবিক অনিয়ম হইয়াছিল কি না; এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ অনিয়মের দ্বারা বিচারাদিষ্ট দায়ীর বাস্তবিক ক্ষতি হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে কি না। জজ নিঃসন্দেহই ঐ সকল বিষয়ের স্পষ্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, নীলাম ২৮ এ নবেম্বর তারিখে না হইয়া ৩ রা নবেম্বর তারিখে হইয়াছিল, অর্থাৎ উচিত সময়ের পূর্ব্বে হওয়াতে অনিয়ম হইয়াছে, এবং তাহার পরে তিনি বলেন যে, ঐ অনিয়মের গতিকে প্রতিবাদীর বাস্তবিক ক্ষতি হইয়াছে। অনন্তর, ২৫৭ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, দরখাস্ত করা হইলে এবং আপত্তি গ্রাহ্য হইলে আদালত ঐ অনিয়মের হেতুতে নীলাম অন্যথা করার হুকুম দিবেন; এবং পরে ঐ ধারামতে লেখা আছে যে, আপত্তি গ্রাহ্য হইলে, "নীলাম অন্যথা করার যে হুকুম "হয়, তাহা চূড়ান্ত হইবে।" অতএব আমি দেখিতেছি যে, নিষ্পত্তির জন্য যে দুই বৃত্তান্ত স্থির করা আবশ্যক তাহা অনিয়ম, ও সেই অনিয়মের দ্বারা ক্ষতি হওয়ার কথা; এবং আইনের বিধান এই যে, যদি আদালত ঐ বৃত্তান্ত বিচারাদিষ্ট দায়ীর অনুকূলে নির্দ্দেশ করেন এবং তদনুযায়ী নীলাম অন্যথা করেন, তবে সেই হুকুম চূড়ান্ত হইবে। অতএব আমার বিবেচনায়, ব্যবস্থাপক সমাজের এই মনস্থ ছিল যে, নীলাম অন্যথা করার জন্য জজ ঐ সকল বৃত্তান্তের যে নির্দ্দেশ করিবেন তাহা চূড়ান্ত হইবে, এবং যদি ঐ নির্দ্দেশ চূড়ান্ত হয়, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জজ যে বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ভিন্ন আমরা নথী দেখিয়া অন্য বৃত্তান্তের নির্দ্দেশ করিতে পারি না। আমি বিবেচনা করি যে, মেং গ্রেগরি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, জজের ৩ রা নবেম্বর তারিখের হুকুম বিচারাধিকার-বহির্ভূত; অতএব আমার বিবেচনায় এই রুল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি বেলি।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

৪ ঠা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

ক্ষেত্রমোহন বাবু, প্রার্থী।

রাসবিহারী বাবু প্রভৃতি, প্রতিপক্ষ।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রার্থীর উকীল।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু ও আশুতোষ ধর প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—যে তমঃসুক ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন অথবা ১৮৬৬ সালের ২০ আইনমতে বিশেষ রেজিষ্টরীকৃত হইয়াছে, সেই তমঃসুক-গৃহীতা যদি ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫৩ ধারামতে ঐ তমঃসুক জারী করিবার দরখাস্ত করে, তবে সে ঐ তমঃসুক ও বিশেষ একরার আদালতে দাখিল করিলে, তমঃসুকের সমুদায় টাকার ডিক্রী পাইবে; এবং আদালতের এই তমঃসুকের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করার কোন ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ তিনি তমঃসুকের সর্ত্তের বিপরীতে এমন ডিক্রী দিতে পারেন না যে, সমুদায় টাকা এককালে আদায় না হইয়া কিস্তীবন্দীর দ্বারা আদায় হইবে; এবং করার অনুযায়ী সুদের হারও আদালত কমাইতে পারেন না।

বিচারপতি বেলি।—প্রার্থী ক্ষেত্রমোহন বাবু ১৮৬৯ সালের ২১ এ ডিসেম্বর তারিখে এই প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করে যে, বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজের গত ২ রা অক্টোবর তারিখের হুকুম অন্যথা করিয়া তাহার দরখাস্তের লিখিত তমঃসুকের স্পষ্ট সর্ত্তের সহিত ঐক্য করা হয়।

কারণ দর্শাইবার জন্য প্রতিপক্ষকে তলব করা হয়, এবং তদনুসারে, উভয় পক্ষের উকীলের সমক্ষে অদ্য মোকদ্দমা শ্রবণ করা গেল।

মোকদ্দমার স্বীকৃত বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে, প্রার্থীর বরাবর, রাসবিহারী বাবু ও সূর্য্যকুমারী বিবী ১২৭২ সালের ১৮ ই ভাদ্র তারিখে ৪০০০ টাকার এক তমঃসুক লিখিয়া দেয়। সেই তমঃসুকে এই সর্ত্ত থাকে যে, ১২৭৬ সালের শ্রাবণ মাসের মধ্যে যদি সমুদায় টাকা ১২ টাকা শতকরা সুদ সমেত পরিশোধিত না হয়, তবে তাহা বিনা নালিশে আদায় হইবে। "ডিক্রী জারী হইবে," বাক্য ব্যবহৃত আছে। তমঃসুক ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের বিধান মতে রেজিষ্টরী হয়। করার মতে টাকা পরিশোধিত না হওয়ায় তমঃসুক-গৃহীতা ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের বিধান মতে তমঃসুক জারী করার জন্য ১৮৬৯ সালের ১ লা আগষ্ট তারিখে বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজের নিকট দরখাস্ত করে। অধঃস্থ জজ আদেশ করেন যে, যে টাকা অপরিশোধিত রহিয়াছে, তাহা বার্ষিক শতকরা ৬ টাকার হিসাবে সুদ সমেত কিস্তিবন্দীর দ্বারা আদায় হইবে।

করার অনুযায়ী সুদের ন্যূন হারে সুদ দেওয়ার ও কিস্তিবন্দী মতে টাকা আদায় করার হুকুম প্রদান দ্বারা খতের স্পষ্ট সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করিতে অধঃস্থ জজের ক্ষমতা ছিল কি না, তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

সুদ সম্বন্ধে প্রতিপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে যে, তমঃসুকে যে হার লিখিত আছে, সেই হারে অর্থাৎ বার্ষিক শতকরা ১২ টাকার হারে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত সুদ দিতে সে প্রস্তুত আছে।

দ্বিতীয় বিষয়, অর্থাৎ কিস্তিবন্দীর দ্বারা তমঃসুকের দেনা পরিশোধ করার হুকুম দিতে অধঃস্থ জজের ক্ষমতা সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, তাঁহার সেই ক্ষমতা ছিল না। বোধ হয়, অধঃস্থ জজ এই হুকুম দেওয়ার কালে তাঁহার মনে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৯৪ ধারার বিধান উপস্থিত ছিল; তাহাতে লেখা আছে যে, যথেষ্ট হেতু থাকিলে, আদালত কোন ডিক্রীর টাকা বিনা সুদে অথবা সুদ সমেত কিস্তিবন্দীর দ্বারা পরিশোধ করার হুকুম দিতে পারেন; কিন্তু তাহা সামান্য ডিক্রীজারী সম্বন্ধে খাটে, ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের ৫১ ধারার

অন্তর্গত বিশেষ রেজিষ্টরী সম্বন্ধে খাটে না। ইহাও বলা যাইতে পারে যে, আদালতের ইচ্ছানুযায়ী কি প্রকারে ডিক্রী হইতে পারে, ৮ আইনের ১৯৪ ধারায় তাহারই বিধান আছে; কিন্তু সেই ডিক্রী যে প্রকারে জারী হইবে, তৎসম্বন্ধে ঐ বিধান খাটে না। এ স্থলে ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের ৫১ ধারা দ্রষ্টব্য।

ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, তমঃসুকেই লেখা আছে যে, বিনা নালিশে টাকা আদায় হইবে, এবং পক্ষগণ ঐ ধারা মতে তাহাদের একরার লিপিবদ্ধ করে। পরন্তু, ৫২ ধারায় আমরা দেখিতেছি যে, "কোন টাকা আদায়ের তমঃসুক অব্যব- "হিত শেষোক্ত ধারায় বর্ণিত করার সম্বলিত "রেজিষ্টরী হইলে, ঐ প্রকার খতের উপর "নালিশের বিচার করিতে যে আদালতের "অধিকার থাকে, সেই আদালতের দ্বারা ঐ "খত নালিশ ব্যতীত প্রবল হইতে পারে।"

এই তমঃসুক ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের ৫১ ধারামতে রেজিষ্টরী হয়, কিন্তু করার অনুযায়ী সময়ে টাকা পরিশোধিত না হইলে যে সময়ে তাহা আদায় হওয়ার সর্ত্ত ছিল, তখন ১৮৬৬ সালের ২০ আইন প্রচলিত হয়।

১৮৬৪ সালের ১৬ আইনমতে যে সকল কার্য্য হইয়াছে তাহা ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার দ্বারা স্থির রাখা হইয়াছে, কিন্তু শেষোক্ত আইনে কার্য্যপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কারণ, ঐ আইনের ৫২ ধারায় লেখা আছে যে, "ঋণ শোধনের নিবন্ধ-পত্র "ক্রমে যদি নিবন্ধ-গৃহীতা ও নিবন্ধ ব্যক্তি সম্মত "হইয়া নিয়ম করেন যে, ঐ নিবন্ধ-পত্রানুসারে "নিয়মিত রূপে কার্য্য সাধন না হইলে ঐ পত্রের "সংশিত টাকা সরাসরীমতে আদায় হইতে "পারিবে, এবং ঐ নিবন্ধ-পত্র রেজিষ্টর "করিবার সময়ে যদি রেজিষ্টরির কার্য্যকারকের "নিকটে সম্মতি-পত্রও লিপি বদ্ধ করিতে প্রার্থনা "করেন, তবে রেজিষ্টরীর কার্য্যকারক যে যে "অনুসন্ধান করা উচিত বোধ করেন তাহা "করণানন্তর ৬৯ ও ৬৮ ধারাতে যে পৃষ্ঠা- "লিপির সংশিত-পত্রের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার "তলভাগে ঐ সংসুব লিপিবদ্ধ করিয়া, তিনি "ও নিবন্ধ ব্যক্তি তাহাতে স্বাক্ষর করি- "বেন;" এবং তদনন্তর ৫৩ ধারায় লেখা আছে যে, "ঐ নিবন্ধ-পত্র এবং পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষ- "রিত উক্ত লিপি আদালতে উপস্থিত করা "গেলে প্রার্থক ঐ প্রার্থনা-পত্রের লিখিত টাকার "অনধিক টাকার, এবং সুদের হার অবধা- "রিত হইলে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত সেই হারে "সুদের, ও খরচা স্বরূপ আদালতে অবধার্য্য "টাকার ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবেন।"

৫১ ও ৫২ ধারার বিধানে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ তমঃসুক বিনা নালিশে জারী করিতে হইবে। এই বিষয়ের যে করার লিপিবদ্ধ আছে তদপেক্ষা আর কিছু পরিষ্কার হইতে পারে না, অতএব আমি বিবেচনা করি যে, উক্ত আইনের বিধানমতে, তমঃসুকের লিখিত একরার পরিবর্ত্তন করিতে অধঃস্থ জজের কোন ক্ষমতা ছিল না। এই তমঃসুকই ডিক্রী, এবং আইনের বিধানানুযায়ী ইহা এমন ডিক্রী যে, তাহা প্রদান অথবা জারী করার কালে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। তমঃসুকে লেখা আছে যে, টাকা যদি করারের মধ্যে পরিশোধিত না হয়, তবে ঐ তমঃসুক ডিক্রীর ন্যায় জারী হইবে, এবং ঐ প্রকার জারী হইয়া ঋণীর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, অধঃস্থ জজ ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারামতে রেজিষ্টরীকৃত এই তমঃসুক চূড়ান্ত ডিক্রী স্বরূপ ভিন্ন অন্য কিছু জ্ঞান করিতে পারেন না, এবং ঐ টাকা কিস্তিবন্দীর দ্বারা পরিশোধ করার অথবা যে সুদের করার হইয়াছে তাহার ন্যূন হারে সুদ দেওয়ার হুকুম দিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই।

অতএব আমি অধঃস্থ জজের হুকুম অন্যথা

করিয়া ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের ৫১ ও ৫২ ধারার ও ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫২ ধারার বিধানানুযায়ী নিষ্পত্তি করার জন্য মোকদ্দমা তাঁহার নিকট পুনঃপ্রেরণ করিব। প্রার্থী তাহার এই আদালতের খরচা পাইবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস। বিচারপতি বেলি এই মোকদ্দমায় যে হুকুম দিলেন, তাহাতে আমি সম্মত। আমি দেখিতেছি যে, এই তমঃসুক ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের ৫১ ধারার বিধানানুযায়ী বিশেষ রেজিষ্টরী হয় এবং ঐ বিশেষ রেজিষ্টরীর নিয়মানুসারে এই একরার লিপিবদ্ধ হয় যে, করারের লিখিত সময়ের মধ্যে তমঃসুকের দেনা পরিশোধিত না হইলে তৎপরের লিখিত বিধানমতে তাহা বিনা নালিশে আদায় হইবে। সেই পরের লিখিত বিধান ঐ আইনের ৫২ ধারায় লিখিত হইয়াছে। সেই ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, যে আদালতের ঐ মোকদ্দমার বিচারাধিকার আছে, বিনা নালিশে সেই আদালত কর্তৃক ডিক্রী জারীর নিয়মানুসারে ঐ তমঃসুক ডিক্রীর ন্যায় জারী হইবে। কি প্রকারে ঐ তমঃসুক জারী করার দরখাস্ত করিতে হইবে তাহার বিধান ঐ ধারায় আছে। কিন্তু ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন মতে উচিতরূপে যে সকল কার্য্য হইয়া গিয়াছে তাহা ভিন্ন ঐ আইনের কার্য্য ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের দ্বারা রদ হয়। অনন্তর ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫৩ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, যে প্রকার তমঃসুকের বিষয় আমরা এইক্ষণে বিচার করিতেছি (অর্থাৎ যাহা ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন অথবা এই আইন মতে বিশেষ রেজিষ্টরী হইয়াছে) সেই তমঃসুক-গৃহীতা তমঃসুক জারী করার পূর্ব্বে তাহার বিচারাধিকারবিশিষ্ট আদালতে এক দরখাস্ত করিবে।

এই দরখাস্ত দেওয়া হইলে পরে এই ধারার অন্তর্গত এক কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইবে যদ্দারা ঐ তমঃসুক এবং একরার দাখিল হইলে প্রার্থী, ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত তমঃসুকের লিখিত হারে সুদ সমেত দরখাস্তের লিখিত টাকার অনধিক টাকার ডিক্রী পাইতে পারিবে। অতএব এই তমঃসুক ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের বিধানান্তর্গত কার্য্যের দ্বারা ডিক্রীর ন্যায় পরিচালিত হইতে পারে, কারণ, তমঃসুকের সমুদায় টাকা এক নির্দ্দিষ্ট তারিখে পরিশোধিত না হইলে ডিক্রী জারীর ন্যায় জারীর দ্বারা আদায় হওয়ার করার আছে। ১৮৬৪ সালের ১৬ আইনের এই সকল বিধান ছিল। তমঃসুকের টাকা নির্দ্দিষ্ট তারিখে পরিশোধিত হয় নাই, অতএব উক্ত আইনের বিধান মতে ঐ তারিখে পরিশোধ না হওয়ার মুহূর্ত্ত হইতে আদালতের ডিক্রীর ন্যায় ঐ দলীল ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা তৎক্ষণাৎ জারী হইতে পারে। কিন্তু ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের বিধানের দ্বারা ঐ কার্য্যপ্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমি বোধ করি যে, প্রার্থী এই আইন মতে, তমঃসুক এককালে ডিক্রীর ন্যায় জারী করার জন্য প্রার্থনা করিতে পারে না। কিন্তু তমঃসুকের করার সম্বন্ধে ঐ আইনের বিধান মতে আদালতে তাহার ঐ তমঃসুক দাখিল করিতে হইবে, এবং যদিও সে তমঃসুকের লিখিত টাকার ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান হইবে, কিন্তু আদালত তাহাকে ঐ ডিক্রী না দেওয়া পর্য্যন্ত, সে সেই টাকা আদায় করিতে পারে না। কিন্তু তজ্জন্য আদালত আমার বিবেচনায়, তমঃসুকের সর্ত্তমতে তাহাকে ডিক্রী না দিয়া পারেন না। তমঃসুকে লেখা আছে যে, যদি টাকা এক নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে পরিশোধিত না হয়, তবে সমুদায় টাকা পাওনা হইল বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, ঐ টাকা পাওনা হইয়াছে বলিয়া আদালত ব্যক্ত করিতে বাধ্য ছিলেন, এবং সেই টাকা এককালে পরিশোধ করার হুকুম না দিয়া কিস্তিবন্দীর দ্বারা পরি-

শোধ করার হুকুম দিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। (গ)

---

৭ ই মার্চ, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান এবং বিচারপতি জি, লক্।

১৮৬৯ সালের ৫৪৮ নং মোকদ্দমা।

সারণের জজের ১৮৬৯ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

শিবপ্রসন্ন চোবে ( প্রতিপক্ষ ) আপেলাণ্ট।

সারণের কালেক্টর ( প্রার্থী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেৎ আর, টি, এলেন ও বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—জজ যদি ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন-মতে, কোন নাবালগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে কালেক্টরকে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার সেই হুকুম নিজে অন্যথা করেন, তবে নাবালগের পক্ষে তাহার কোন এক বন্ধু ২৮ ধারা মতে তদ্বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে।

যদি কোন আদালত দেখেন যে, মিথ্যা বর্ণনা অথবা যথার্থ বৃত্তান্ত গোপন করার গতিকে তিনি কোন হুকুম দিয়াছেন, তবে তাহা উঠাইয়া লওয়ার কোন প্রকাশ্য নিষেধ না থাকিলে অথবা তাহা উঠাইয়া লওয়া অনাবশ্যক না হইলে, তাহা তিনি উঠাইয়া লইতে পারেন।

প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান।—সারণের জজ মেৎ হোপের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে। দেখা যাইতেছে যে, নকছেদীপ্রসাদ চোবে নামক এক নাবালগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার গ্রহণার্থে এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগের নিমিত্ত ঐ নাবালগের এক কর্ম্মচারী শিবপ্রসন্ন পাঁড়ে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ৪ ধারা মতে গত ১৪ ই জুন তারিখে জজের নিকট দরখাস্ত করে। দরখাস্তের শেষ ভাগে এক তালিকায় সম্পত্তি বর্ণিত হয়। ১০ ই জুলাই তারিখে ঐ জেলার কালেক্টর তজ্জন্য দরখাস্ত করেন। কালেক্টরকে ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে জজ ১৯ এ জুলাই তারিখে হুকুম দেন। কালেক্টর তালিকার লিখিত সম্পত্তির এক ভাগ অর্থাৎ মহাল পরসার ৵৮ সম্বন্ধে বিরোধ আছে দেখিয়া, ঐ সম্পত্তি বাদে নাবালগের অন্যান্য সম্পত্তির ভার গ্রহণার্থে জজের নিকট দরখাস্ত করেন। জজ ন্যায্য রূপেই কালেক্টরকে সম্পত্তির এক ভাগের ভার গ্রহণ করার হুকুম দিতে অস্বীকার করেন, এবং কালেক্টরকে নাবালগের সম্পত্তির ভার গ্রহণের জন্য ১৯ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম হইয়াছিল তাহা উঠাইয়া লওয়ার জন্য কালেক্টর ৩ রা আগস্ট তারিখে জজের নিকট দরখাস্ত করেন। তাঁহার ঐ দরখাস্তের হেতু এই যে, মৌজা পরসার ৵৮ আনা অংশ যাহা নাবালগের পক্ষে দাবী করা হইয়াছে, তাহা তাহার সম্পত্তি নহে, নাবালগের পিতা শিবপ্রসাদ পাঁড়ে যে কয়েক ব্যক্তির কর্ম্মচারী ছিল, তাহাদের জন্য সে তাহা বেনামী ক্রয় করে।

কালেক্টর বলেন যে, যখন ১৯ এ জুলাই তারিখের হুকুম হয়, তখন আদালতের সমক্ষে যথার্থ বৃত্তান্ত সমস্ত উপস্থিত ছিল না, এবং মিথ্যা কথার দ্বারা তাঁহার নিজেরই ভ্রম হইয়াছিল, কারণ, নাবালগের বন্ধুগণ প্রতারণা করিয়া বৃত্তান্ত সকল তাঁহার নিকটে গোপন করিয়াছিল, এবং মহাল পরসার ৵৮ অংশ সম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহাতে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের সহায়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাহারা তাঁহাকে ঐ সম্পত্তির দখল লইতে লওয়াইয়াছিল।

জজ সেই কথা বিশ্বাস করিয়া ১৯ এ জুলাই তারিখের হুকুম অন্যথা করেন, কিন্তু আদালত তাহা করিয়া, নাবালগের রক্ষণাবেক্ষণের কোন

উপায় করেন নাই তাহার সম্পত্তির ভার গ্রহণের জন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন নাই, এবং নাবালগের উপকারের জন্য আদালতের দ্বারা তাহার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের জন্য কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক কি না, তাহার তদন্ত করেন নাই।

এই হুকুমের বিরুদ্ধে নাবালগের বন্ধু শিবপ্রসন্ন চোবে যে প্রথমে নাবালগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের জন্য এক জন উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করার নিমিত্ত ৪ ধারামতে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে আপীল করিয়াছে।

আমাদের সমক্ষে যে প্রথম প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে তাহা এই যে, জজের ১৮৬৯ সালের ১০ ই সেপ্টেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে শিবপ্রসন্ন আপীল করিতে পারে কি না? আমরা বিবেচনা করি যে, বাস্তবিক নাবালগের পক্ষে এই আপীল হইয়াছে এবং নাবালগের অবশ্যই তাহার নিকট বন্ধুর দ্বারা ঐ আইনের ২৮ ধারামতে আপীল করার ক্ষমতা আছে।

নাবালগেরই এ বিষয়ে স্বার্থ আছে। সে কেবল তাহার নিকট বন্ধুর দ্বারা নালিশ করিতে পারে, এবং ২৮ ধারার যদি এই অর্থ না হয় যে, হুকুমের দ্বারা যে নাবালগের স্বার্থের ক্ষতি হয়, সে আপীল করিতে পারিবে, তবে তাহার কিছু অর্থ হইতে পারে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, জজের ১৯ এ জুলাই তারিখের হুকুম উঠাইয়া লওয়ার ক্ষমতা ছিল না। আমাদের স্পষ্ট বোধ হয় যে, ঐ প্রকার হুকুম উঠাইয়া লওয়ায় কোন প্রকাশ্য নিষেধ না থাকিলে, অথবা যদি এমন কোন উপায় না করা হয় যদ্দ্বারা এই ক্ষমতার পরিচালন অনাবশ্যক হয়, তবে প্রতারণা বা মিথ্যা কথা দ্বারা অথবা প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন করিয়া ঐ হুকুম পাওয়া সপ্রমাণ হইলে সকল আদালতেরই তাহা উঠাইয়া লওয়ার ক্ষমতা আছে। আমি বিবেচনা করি যে, এক জন অভিভাবক অথবা অন্য ব্যক্তি যে এক বার নাবালগের সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে তাহা সহজে পরিত্যাগ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

উপস্থিত মোকদ্দমায় দেখা যাইতেছে যে, কালেক্টর নাবালগের সম্পত্তির বাস্তবিক দখল গ্রহণ করেন নাই এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইস্তাফা দেওয়ার জন্য আদালতে উপস্থিত হইয়াছেন। ২৩ ধারায় স্পষ্ট রূপে বিধিবদ্ধ আছে যে, কোন কোন ঘটনায়, আদালত সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তাহার জেম্মা পরিত্যাগ করিতে অনুমতি দিতে পারেন। বোধ হয় ঐ ধারা ঠিক এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খাটে না, কিন্তু আদালত কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করিয়া হুকুম দেওয়ার পরে তাহা যে তাঁহার উঠাইয়া লওয়ার ক্ষমতা আছে, তাহা ঐ ধারাতেই স্বীকৃত।

অতএব নাবালগের সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে কালেক্টর এক বার সম্মত হইবার পরে তাঁহাকে অসম্মত হইতে দিতে এবং কালেক্টরকে সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করার হুকুম উঠাইয়া লইতে আমাদের বিবেচনায়, জজের ক্ষমতা ছিল।

কিন্তু আপেলাণ্টের উকীল বলেন যে, কালেক্টরের ইস্তাফা গ্রাহ্য হওয়ায় নাবালগের সম্পত্তি অরক্ষিত রহিয়াছে। অতএব এই হেতুতে আমরা বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমা জজের নিকট পুনঃ-প্রেরিত হইবে; তিনি ৬ ধারা মতে তদন্ত করিয়া নির্ণয় করিবেন যে, নাবালগের এমন কোন নিকট বন্ধু আছে কি না যে, সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে পারে এবং ইচ্ছা করে, এবং যদি এমন ব্যক্তি না থাকে, তবে নাবালগের সম্পত্তি রক্ষার জন্য আদালতের দ্বারা উপায় অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক কি না, তাহা আদালত তদন্ত করিবেন এবং আবশ্যক হইলে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১০, ১১ ও ১২ ধারামতে উপায় অবলম্বন করিবেন।

আমাদের বিবেচনায়, প্রত্যেক পক্ষ এই দরখাস্তের আপন আপন খরচা দিবে।

(গ)

---

৭ ই মার্চ, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৮ সালের ১৭৯২ নং মোকদ্দমা।

পাবনার প্রতিনিধি সদর আমীনের ১৮৬৮ সালের ২০ এ মার্চের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৮ সালের ৮ ই আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

হরসুন্দরী দাসী (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

কৃষ্ণমণি চৌধুরিণী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—জমার কিয়দংশের নীলাম সম্বন্ধে বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারা খাটে না।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—আমার বিবেচনায়, মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে:—

প্রথম আদালত পত্তনী এবং নিম্ন আপীল-আদালত মৌরসী তালুক বলিয়া যে স্বত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে শিবচন্দ্র রায়, নিদানচন্দ্র রায় ও রামচন্দ্র রায় মৌজা আগিহাটা এবং কুন্দান সংযুক্ত ৮৮ নং এক মহালের দখীলকার ছিল।

এই সম্পত্তির তৃতীয়াংশের এক কট-কবালা যাদবেন্দু নামক এক ব্যক্তিকে দেওয়া হয় এবং সে বয়বাত করিয়া ডিক্রী ও দখল পায়।

কমললোচন নন্দীকে শিবচন্দ্র এবং নিদানচন্দ্র বিরোধীয় মহালের বাকী দুই অংশের পত্তনী দেয়। কমললোচনের বিরুদ্ধ এক ডিক্রীজারীতে তাহার জমার চতুর্থাংশ কালীকান্ত লাহিড়ীর নিকট বিক্রীত হয়, এবং বাকী তিন অংশ চন্দ্রনাথ ও হরনাথের নিকট বিক্রীত হয়, অতএব এই দুই ব্যক্তি বিরোধীয় মৌজার ॥০ আনার দখল পায়।

চন্দ্রনাথের ।০ আনা হিস্যা বাদী ১২৫৪ সালের ৩০ এ আষাঢ় তারিখে ক্রয় করে। বাদী ১৮৬৬ সালের ২০ এ নবেম্বর তারিখে প্রতিবাদিনী কৃষ্ণমণি চৌধুরিণী কর্ত্তৃক বেদখল হয়।

প্রতিবাদিনী কহে, যে, তাহার দখলের স্বত্ব এইরূপে উপস্থিত হইয়াছে, যথা—জমিদার শ্রীশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি নিদানচন্দ্রের বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রীজারীতে নিদানচন্দ্রের স্বত্ব ও লাভ অর্থাৎ বিরোধীয় ভূমির ।৴৬॥= নীলাম করায় এবং প্রতিবাদিনী কৃষ্ণমণি তাহা ক্রয় করে।

কথিত হইয়াছে যে, ঐ নীলাম ১৮৬৫ সালের ৮ আইন মতে হয়।

অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করেন যে, ডিক্রীদারের দরখাস্ত মতে, বিরোধীয় ভূমিতে নিদানচন্দ্রের স্বত্ব ও লাভ নীলাম করার প্রার্থনা হয় এবং বিক্রয়ের সার্টিফিকেটে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, ঐ স্বত্ব ও লাভ বিক্রীত হইয়াছে; এবং নথী ও বিক্রয়ের সার্টিফিকেটের দ্বারা আমাদের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছে যে, এই নির্দ্দেশ বিশুদ্ধ।

কিন্তু অধঃস্থ জজ বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারার উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বিধিবদ্ধ আছে যে, "যখন কোন ব্যক্তি "এই আইন মতে বিক্রীত কোন পেটাও তালুক ক্রয় "করেন, তখন সেই পেটাও তালুকের পাট্টাধারী "কোন ব্যক্তির কি তাঁহার প্রতিনিধিদের কি "আসেনিদের কোন ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন অন্য "সকল দায় হইতে মুক্ত অধিকার তাঁহার হইবে, "কেবল ঐ পেটাও তালুকের সৃষ্টি যে লিখিত বন্দো- "বস্ত ক্রমে হইয়াছিল, কিম্বা তৎসৃজনকারি ব্যক্তি "কি তাঁহার প্রতিনিধিরা কি আসেনিরা পশ্চাৎ যে "লিখিত অনুমতি দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা যদি সেই

"প্রকারের দায় স্বীকার করিবার স্বত্ব পাট্টাদারকে "স্পষ্টাক্ষরে দত্ত হইয়া থাকে, তবে সেই দায় "হইতে ঐ অধিকার মুক্ত হইবে না।"

তিনি বলেন যে, যে ব্যক্তির অর্থাৎ কমললোচনের সূত্রে বাদী দাবী করে তাহাকে ঐ ভূমি পত্তনী দিতে নিদানচন্দ্র প্রভৃতিকে অনুমতি দেওয়ার কোন প্রমাণ নাই, অতএব তিনি বিবেচনা করেন যে, প্রতিবাদিনী কৃষ্ণমণি ঐ সম্পত্তি সকল দায় মুক্তাবস্থায় ক্রয় করিয়াছে, অতএব তিনি প্রথম আদালতের রায় স্থির রাখিয়া বাদিনীর নালিশ ডিসমিস্ করেন।

অধঃস্থ জজ বলেন যে, ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারায় সমুদায় মহালের ক্রেতার সহিত কিয়দংশের ক্রেতার কোন প্রভেদ করা হয় নাই।

তাহার কারণ এই যে, উক্ত ধারায় জমার কিয়দংশের বিক্রয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে ঐ ধারা খাটে না।

যেমন কোন গ্রামের এক বাটীর ক্রেতা সমুদায় গ্রামের ক্রেতা নহে, সেই রূপ কোন এক অধীন জমার কিয়দংশ ক্রেতা সমুদায় অধীন জমার ক্রেতা গণ্য হইতে পারে না। অধঃস্থ জজের ভ্রম অতি বিস্ময়জনক বোধ হয়, কারণ, কালেক্টর স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঐ অধীন জমাতে নিদানচন্দ্রের যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহাই তিনি নীলাম করিয়াছিলেন। আমরা বিবেচনা করি যে, নিদানচন্দ্রের স্বত্ব ও লাভ বিক্রয় হওয়াতে ক্রেতা কৃষ্ণমণি চৌধুরিণী কেবল সেই স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করিয়াছেন, যাহা নীলামের কালে নিদানচন্দ্রের ছিল; অতএব নিদানচন্দ্র কমললোচনকে যে পত্তনী দিয়াছিল সেই পত্তনীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণের স্বত্বের অধীনে কৃষ্ণমণি ঐ সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন।

ইহার ফল এই হইবে যে, আপীল ডিক্রী হইয়া এই আদালতের ও নিম্ন আপীল-আদালতের খরচা সমেত নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে।

অবশিষ্ট ইসুর বিচারের জন্য মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

(গ)

---

৭ই মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ৮৭ নং মোকদ্দমা।

নদিয়ার জজের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

তারিণীপ্রসাদ ঘোষ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

ক্ষুদমণি দেবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক পত্তনী তালুক বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইয়া তারিণীর দ্বারা ক্রীত হয়। পূর্ব্ব পত্তনীদারেরা নালিশ করিয়া ঐ নীলাম অন্যথা করণে কৃতকার্য্য হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তারিণী নিজে বাকীদার হওয়ায় পুনরায় নীলাম হওয়াতে নীলামের কতক উদ্বর্ত্ত টাকা তারিণীপ্রসাদের নামে কালেক্টরীতে জমা থাকে। এই অবস্থায়, যে ডিক্রীর দ্বারা ঐ নীলাম অন্যথা হয় তাহাতে পূর্ব্ব পত্তনীদারের স্বত্ব ও লাভ ক্ষুদমণির দ্বারা ক্রীত হয়, এবং ক্ষুদমণি ওয়াশীলাতের জন্য এক নালিশ করত ডিক্রী পাইয়া তারিণীপ্রসাদের সহিত রফা করে। ইহার পরে ক্ষুদমণি তারিণীপ্রসাদের নামে নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকার জন্য স্বতন্ত্র নালিশ করিয়া দাবীকৃত টাকার অধিকাংশ টাকার ডিক্রী পায়। তাহার পরে ক্ষুদমণি, প্রতিবাদী তারিণীপ্রসাদ প্রতারণা পূর্ব্বক জমিদারের যে খাজানা দিতে ত্রুটি করিয়াছিল তাহা পরিশোধ করার নিমিত্ত উক্ত নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকার যে অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহার খেসারতের জন্য তারিণীর বিরুদ্ধে নালিশ করে:—

এস্থলে, এই নালিশ দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৭ ধারার দ্বারা বারিত, কারণ, দাবী-কৃত টাকা

সেই টাকার এক অংশ যাহা প্রথম নালিশের দাবীতেই ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—রাঘবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক এই তারিণীপ্রসাদ ঘোষের বিরুদ্ধে আর এক মোকদ্দমার ৮৫ নং আপীলে গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে আমরা যে নিষ্পত্তি করিয়াছিলাম তাহার সহিত উপস্থিত মোকদ্দমার অনেক সাদৃশ্য আছে। একটি পত্তনী তালুক শশিমুখী বর্ম্মণী প্রভৃতির সম্পত্তি ছিল। সেই পত্তনী তালুক বাকী খাজানার জন্য নীলাম হইয়া প্রতিবাদী তারিণীপ্রসাদ ঘোষের দ্বারা ক্রীত হয়। পূর্ব্ব পত্তনীদারেরা জজের আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া কতিপয় অনিয়মের হেতুতে নীলাম অন্যথা করণে কৃতকার্য্য হয়। ইতিমধ্যে তারিণীপ্রসাদ নিজে বাকীদার হওয়ায় পুনরায় নীলাম হওয়াতে ঐ পত্তনী তালুক ৯৮০০০ হাজার টাকায় বিক্রীত হয়। সেই টাকার মধ্যে জমিদার তাহার প্রাপ্য খাজানা বলিয়া ৩৭০০০ টাকা লয়, এবং বাকী ৬০০০০ টাকা তারিণীপ্রসাদের নামে কালেক্টরীতে জমা থাকে।

এই অবস্থায়, যে ডিক্রী দ্বারা পূর্ব্বলিখিত নীলাম অন্যথা হয় তাহাতে শশিমুখী বর্ম্মণী প্রভৃতির ঐ পত্তনীতে যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহা নীলাম হইয়া ক্ষুদুমণি কর্তৃক ক্রীত হয়। অতএব তিনি দেওয়ানী আদালত হইতে উক্ত স্বত্ব ও লাভের ক্রেতা বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৮৬৪ সালের ২৮ এ ডিসেম্বর তারিখে ইহা হয়।

ইহা বলা আবশ্যক যে, বাদিনী কর্তৃক এই ক্রয় হওয়ার পূর্ব্বে এই পত্তনীর ওয়াশীলাতের প্রতি শশিমুখীর যে স্বত্ব ছিল তাহা ঘরাও ভাবে বেণীমাধব নামক এক ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হয়।

বাদিনী এই সকল স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া শশিমুখীর ওয়াশীলাতের ভাগ যাহা বেণীমাধব ইতিপূর্ব্বেই আদায় করিয়া লয় তাহা বাদে, প্রথমতঃ ওয়াশীলাতের নালিশ করেন এবং তাহাতে ডিক্রী হইয়া তাহার বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল হয়; পরে সেই মোকদ্দমা তারিণীপ্রসাদের সহিত ৮৫০০ টাকায় রফা হয়। বাদিনী ১৮৬৬ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে তারিণীপ্রসাদের নামে আর এক নালিশ উপস্থিত করেন এবং তাহার শিরোভাগে লেখা আছে যে, "নীলামের উদ্বর্ত্ত ৪৩,৮৫৪।/৯ টাকার দাবী।" তারিণীপ্রসাদের ক্রয়, তাহার বাকীদার হওয়া, পুনরায় নীলাম হওয়া, জমিদারকে খাজানা দিয়া বাকী টাকা কালেক্টরীতে জমা থাকা, এবং বাদিনী কর্তৃক শশিমুখী প্রভৃতির স্বত্ব ও লাভ ক্রীত হওয়া, এই সমস্ত কথা আরজীতে লেখা আছে, এবং বাদিনী তাঁহার ক্রয়ের বলে ঐ আমানতী টাকার এক অংশ অর্থাৎ ৪৩৮৫৪ /৯ টাকা প্রাপ্ত হওয়ার স্বত্ব সাব্যস্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন।

দেখা যাইতেছে যে, সেই মোকদ্দমায় কতিপয় ব্যক্তি অর্থাৎ শশিমুখীর শরীকেরা বাদিনীর ক্রয় সূত্রে টাকা পাওয়ার স্বত্বের প্রতি আপত্তির দরখাস্ত করে, কিন্তু সেই সকল আপত্তি অগ্রাহ্য হয় (কি প্রকারে তাহার তদন্ত হয় তাহা দৃষ্ট হয় না,) এবং বাদিনী তারিণীপ্রসাদের বিরুদ্ধে যে টাকার দাবী করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশের ডিক্রী পান; কিন্তু খরচা পান নাই; কারণ, বাদিনী যে অংশ ক্রয় করেন বলিয়া কথিত হয়, তাহা বিশুদ্ধরূপে বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু যাহারা মোজাহেম দিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে খরচার হুকুম হয় এবং দেখা যাইতেছে যে, বাদিনী যে টাকার ডিক্রী পাইয়াছিলেন তাহা তিনি বাহির করিয়া লন।

তিনি এইক্ষণে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে তৃতীয় মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন; তিনি বলেন যে, "উক্ত প্রতিবাদী বিরোধীয় পত্তনী মহালে "১২৬৮ সালে দখীলকার ছিল, দরপত্তনীদারের "নিকট খাজানা আদায় করিয়া লইয়াছে,

"তাহার বিরুদ্ধে খাজানার ডিক্রী পাইয়াছে
"এবং পরে সেই ডিক্রীর ফলভোগ করিয়াছে,
"তথাপি সে প্রতারণা পূর্ব্বক জমিদারের খাজানা
"দিতে ত্রুটি করিয়াছে। উক্ত খাজানা খরচা
"ও সুদ সমেত নীলামের টাকা হইতে আদায়
"হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের রসুমও তাহা হইতে
"কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। নীলামের মূল্য
"হইতে এই যে সকল টাকা আদায় হইয়াছে
"তাহা, শশিমুখী বর্ম্মণী এবং তাঁহার শরীকের
"উক্ত তালুকের প্রকৃত মূল্য হইতে প্রতি-
"বাদী বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে বলিতে
"হইবে, কারণ, প্রথম নীলাম অন্যথা করার
"ডিক্রী দ্বারা পূর্ব্ব পত্তনীদারেরা ঐ মহালের
"দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার যে স্বত্ব প্রাপ্ত হই-
"য়াছিল, তাহা প্রতিবাদীর প্রতারণার হেতু
"দ্বিতীয় নীলামের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া কেবল
"নীলামের মূল্য পাওয়ার স্বত্বে পরিণত হই-
"য়াছে। অতএব প্রতিবাদীর উল্লিখিত প্রতা-
"রণা-মূলক, অন্যায় ও অনুচিত আচরণের
"গতিকে নীলামের মূল্য হইতে যে টাকা
"কর্ত্তন হইয়াছে, উক্ত পূর্ব্ব পত্তনীদারেরা প্রতি-
"বাদীর নিকট তাহার ক্ষতি-পূরণ পাইতে
"পারিত। অতএব উক্ত নীলামের মূল্য হইতে
"যে ৩৭০৯১।৶৮ টাকার কর্ত্তন হইয়াছে, তন্মধ্যে
"আমি, শশিমুখীর ৶১৩। — অংশের ক্রেতা
"বিধায় ৬,১৬৮৶১ ও সুদ ও খরচা ৪৪৪১৷৷৹
"মোট ১০৬০৯৷৷৯ টাকা পাইতে পারি।" অত-
এব বাদিনী সেই টাকা প্রতিবাদীর নিকট দাবী
করেন।

আমি পূর্ব্বেই সওয়াল জওয়াবের সময় ব্যক্ত
করিয়াছি যে, মোকদ্দমায় বাদিনীর বিরুদ্ধে বহু
কণ্টক আছে, এবং এই আরজী মতে কিছু
মাত্র টাকা পাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহার ৪।৫টি
প্রবল আপত্তি খণ্ডন করিতে হইবে; কিন্তু এই
মোকদ্দমায় আমাদের যে প্রকৃত প্রশ্নের মীমাংসা
করিতে হইবে তাহা এই যে, দেওয়ানী কার্য্য-
বিধির ৭ধারা মতে এই মোকদ্দমা বারিত হই-
য়াছে কি না।

আমার মতে মোকদ্দমা ঐ রূপে বারিত হই-
য়াছে। আমি বিবেচনা করি যে, ওয়াশীলাতের
দাবী এবং নীলামের মূল্যের কোন ভাগের
জন্য দাবী বাদিনীর নালিশের একই হেতু ভুক্ত।
কিন্তু ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে তাহা হউক বা না হউক,
ইহা অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদিনী
এই নালিশে যে টাকার দাবী করিয়াছেন, তাহা
নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকার জন্য তাঁহার প্রথম নালি-
শের দাবী-ভুক্ত ছিল। বাদিনী এইক্ষণে যে
৩৭০০০ টাকার এক ভাগের দাবী করেন, তাহা
পত্তনী তালুকের ক্রয়-মূল্যের অংশ স্বরূপে
প্রতিবাদী তারিণীপ্রসাদের নামে জমা ছিল,
এবং তাহাকে দেওয়া হয়। বাদিনীর প্রথম
নালিশে ইহা স্বীকৃত হইয়াছিল যে, জমিদারের
খাজানা দিয়া নীলামের মূল্যের যে অংশ বাকী
ছিল, তাহাই পত্তনীর মূল মালিকেরা পাইতে
স্বত্ববান্ ছিল, অতএব বাদিনী সেই মোকদ্দমায়
কেবল সেই বাকী টাকার এক অংশের প্রতি
দাবী করিয়াছিলেন। বাদিনী ঐ ৩৭০০০ টাকা
অথবা তাহার কোন অংশের ন্যায্য রূপেই
দাবী করিয়াছিলেন, অথবা সেই দাবী অন্যায্য
ছিল। যদি সেই টাকার দাবী ন্যায্য হইয়া
থাকে, তবে বাদিনীর তাহা প্রথম নালিশেই দাবী
করা উচিত ছিল, এবং যদি তিনি তৎ-
কালে দাবী করিতে ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে
তাঁহার নালিশ ঐ আইনের ৭ধারার অন্তর্গত
হইয়াছে, এবং তৎকালে তাঁহার যে অং-
শের জন্য দাবীর হেতু উপস্থাপিত হইয়াছিল
তাহা তিনি তখন ত্যাগ করাতে অথবা চাহিতে
ত্রুটি করাতে তাহার জন্য পুনরায় তাঁহার নালিশ
শুনা যাইতে পারে না।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল অতি কৌশল্য ও বলের
সহিত তর্ক করিয়াছেন যে, নালিশের হেতু পৃথক্
পৃথক্ ছিল। ইহাও কথিত হইয়াছে যে, পক্ষগণও

এক নহে ; এবং বাদিনীর দাবী এমত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে যাহার কোন প্রসঙ্গও প্রথম আদালতে হয় নাই। প্রতিবাদীর ঋণ পরিশোধ করার জন্য বাদিনীর টাকার এক অংশ অন্যায় রূপে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহা ফেরৎ পাওয়ার দাবী স্বরূপে বাদিনীর দাবী এক্ষণে বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, ইহাই বাদিনীর বর্ত্তমান নালিশের হেতু এবং ইহা পূর্ব্ব নালিশের হেতু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমার বিবেচনায়, এই তর্ক অকর্ম্মণ্য ; টাকা কোথায় গেল অথবা টাকা কি হইল, তাহার সহিত বাদিনীর কোন সংস্রব নাই। মূল ক্রয়ের বলে বাদিনী ন্যায্য অথবা অন্যায্য রূপেই হউক, যে টাকার দাবী করিতে পারেন, তাহারই এক ভাগের দাবী প্রথম নালিশে এবং আর এক ভাগের দাবী এই নালিশে উপস্থিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, প্রথম নালিশ অন্ততঃ, ডিক্রী তারিণীপ্রসাদের বিরুদ্ধে হয় নাই। এই কথাও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। এই আরজী যে কেবল "৪৩০০০ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার দাবী" বলিয়া লিখিত হইয়াছে এবং কেবল তারিণীপ্রসাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে, এমত নহে, তারিণীপ্রসাদের নামে কালেক্টরীতে যে টাকা জমা ছিল তাহা হইতেই বাদিনী টাকা পাওয়ার নালিশ করিয়াছেন।

১ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১১৯ পৃষ্ঠায় এক নজীর প্রদর্শিত হইয়াছে। তর্কিত হইয়াছে যে, তাহা এই মোকদ্দমার অনুরূপ, এবং তাহাতে এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশন নির্দ্দেশ করেন যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭ ধারা এই স্থলে খাটে না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তাহার সহিত এই মোকদ্দমার অনেক প্রভেদ আছে। যে বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয় তাহার নিষ্পত্তি করেন তাঁহারা বলেন যে, "বাকী খাজানার জন্য জমিদারের দ্বারা যে তালুকের "নীলাম হয় তাহাতে বাদী ও প্রতিবাদী প্রথমে "শরীক ছিল। যে বাকী খাজানার জন্য "নালিশ হয়, এবং তাহার পূর্ব্ব বৎসরের যে "খাজানার জন্য জমিদারের ডিক্রী ছিল, তাহা "বাদ দিয়া নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা শরীক-"গণের মধ্যে বিভক্ত হয়। ১২৬৩ সালে এক "ডিক্রীজারীর নীলামে বাদী ঐ তালুকের ৵০ "আনা ক্রয় করে।" বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয় অনন্তর বলেন যে, "তালুক নীলাম হওয়ার পরে "বাদী নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকায় তাহার অংশ "পাওয়ার জন্য কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা "করে, কিন্তু বাদীর নিকট যে বিক্রয় হইয়াছিল "তাহা রেজিষ্টরী না হওয়াতে কালেক্টর তাহাকে "দেওয়ানী নালিশের দ্বারা তাহার ঐ উদ্বর্ত্ত "টাকার অংশের প্রতি স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে "বলিয়া দেন ; তদনুসারে বাদী এবং বর্ত্তমান "প্রতিবাদিগণ ঐ উদ্বর্ত্ত টাকায় তাহাদের ৵ আনা "স্বত্ব সাব্যস্ত করে। জমিদারের প্রাপ্য বাকী "খাজানা পরিশোধ করিয়া যে টাকা বাকী "ছিল তাহাই ঐ উদ্বর্ত্ত টাকা।" অপিচ, তাঁহারা বলেন যে, "এই মোকদ্দমায় বিচার্য্য প্রশ্ন এই "যে, বাদীর প্রথম নালিশের দ্বারা তাহার এই "নালিশ বারিত হইয়াছে কি না।" অনন্তর, তাঁহারা বলেন যে, "ঐ ধারার ঠিক বিধান "যাহাই হউক, আমরা বিবেচনা করি যে, "তদ্দ্বারা বাদীর বর্ত্তমান নালিশ বারিত নহে। "কালেক্টরের আদেশমতে প্রথম নালিশ উপ-"স্থিত করার আবশ্যক হয়, কারণ, তিনি "বলেন যে, নালিশের দ্বারা বাদী তাহার স্বত্ব "সাব্যস্ত না করিলে তিনি কালেক্টরীতে অমানতী "টাকা দিতে পারেন না।" অতএব সেই মোকদ্দমা শরীকদের বিরুদ্ধে বাদীর স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য বাদী ও শরীকগণের মধ্যে উপস্থিত হয়। রায়ে তাহার পরে লেখা আছে যে, "ঐ "অমানতী টাকার ৵০ আনা হিস্যার দাবী ভিন্ন "১২৬৩ সালের খাজানা যাহা বাদীর হিস্যা হইতে

“দেওয়া হইয়াছিল, সেই টাকার জন্য পুরাতন “মালিকদিগের বিরুদ্ধে বাদীর নিজের দাবী “ছিল।” অতএব তাহা স্পষ্টই স্বতন্ত্র নালিশের বিষয় ছিল। শরীকদিগের বিরুদ্ধে বাদীর নিজের দাবী ছিল, এবং তাহা সে ঐ আমানতী টাকা অথবা শরীকগণের অন্য সম্পত্তি হইতে আদায় করিতে পারিত। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায়, বাদিনী এক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এক নালিশের হেতুর উপরে এক দাবীর ভিন্ন ভাগ পরিচালন করার জন্য দুই নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এই প্রকার বিরক্তি-জনক মোকদ্দমা হইতে প্রতিবাদী রক্ষিত হইতে পারে এবং কেবল সেই হেতুবাদেই এই নালিশ ডিস্‌মিস্ করা উচিত ছিল; সুতরাং রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীলকে অন্যান্য কথার তর্ক করিতে বলিয়া তাহার বিচার করার আবশ্যক নাই। আমি বিবেচনা করি, উক্ত হেতুবাদে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা ও সমুদায় খরচা সমেত বাদিনীর নালিশ ডিস্‌মিস হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(গ)

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৬৮ সালের ১৭৮২ নং মোকদ্দমা।

পাবনার প্রতিনিধি সদর আমীনের ১৮৬৭ সালের ২৫ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া রাজসাহীর অধঃস্থ জজ ১৮৬৮ সালের ৪ ঠা এপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ব্রহ্মময়ী দেবী প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

বরকত সর্দ্দার প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—শ্যাম ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতে এক নালিশ করত ডিক্রী পাইয়া দখল লয়। তাহার পরে, রাম এই বলিয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৩০ ধারামতে দরখাস্ত করে যে, সে দখীলকার ছিল, এবং শ্যাম তাহাকে অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধ এক ডিক্রীজারীতে বেদখল করে। প্রথম আদালত রামের অনুকূলে ডিক্রী দেন। হাইকোর্ট স্থির করিলেন যে, ঐ শেষোক্ত দরখাস্ত পূর্ব্ব মোকদ্দমার অন্তর্গত কার্য্য নহে, অতএব ইহার উপরে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে দেঃ কার্য্য-বিধির ২৩১ ধারামতে আপীল হইতে পারে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—বরকত সর্দ্দার, উজীর সর্দ্দার এবং হারু সর্দ্দার এই হেতুবাদে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতে ৩২ বিঘা ভূমির পুনঃদখল পাওয়ার জন্য নালিশ করে যে, তাহারা উহাতে তাহাদের জোতসূত্রে দখীলকার ছিল, এবং ওমর প্রামাণিক ও আহ্লাদী প্রামাণিক বল-পূর্ব্বক তাহাদিগকে বেদখল করে, এবং ফসল কাটিয়া লয়। তাহারা ১৮৬৭ সালের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক ডিক্রী পায়। সেই ডিক্রীজারীতে বরকত সর্দ্দার প্রভৃতি দখল পায়। ১৮৬৭ সালের ৪ ঠা এপ্রিল তারিখে ব্রহ্মময়ী ও অন্যান্য এই প্রসঙ্গে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৩০ ধারামতে আদালতে দরখাস্ত করে যে, তাহারা উক্ত ৩২ বিঘার দখীলকার ছিল, এবং বরকত সর্দ্দার ও হারু সর্দ্দার, ওমর প্রামাণিক প্রভৃতির বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে তাহাদিগকে বেদখল করে। মুন্সেফ ব্রহ্মময়ীর অনুকূলে মোকদ্দমার ডিক্রী দেন।

আপীলে অধঃস্থ জজ কয়েকটি ইসু নির্দ্ধারণ করেন; তন্মধ্যে প্রথম ইসু এই যে, ব্রহ্মময়ীর

নালিশ করার স্বত্ব ছিল কি না; এবং চতুর্থ ইসু এই যে, বাদিগণ যে বলে যে, প্রতিবাদিগণ তাহাদিগকে এক কবুলিয়ৎ দিয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে কি না, এবং প্রতিবাদীরা বিরোধীয় ভূমিতে ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত দখীলকার ছিল কি না, এবং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না। তাঁহার যে প্রকার সরল ইসু উত্থাপন করা উচিত ছিল তাহা তিনি করেন নাই; অর্থাৎ তাঁহার এই ইসু নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল যে, ডিক্রীজারীর কালে দাবীদার ব্রহ্মময়ী প্রভৃতি ভূমিতে বাস্তবিক দখীলকার ছিল কি না, এবং ডিক্রীদারেরা আপনাদের ডিক্রীজারীতে তাহাদিগকে বেদখল করিয়াছে কি না। তিনি যে প্রকার ইসু নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার তদন্ত করিয়া তিনি দেখেন যে, বাদিনী ব্রহ্মময়ী প্রভৃতি বলে যে, প্রতিবাদী বরকত সর্দ্দার প্রভৃতি ৯ বৎসরের এক কবুলিয়তের দ্বারা তাহাদের অধীনে প্রজা সূত্রে দখীলকার ছিল, এবং সেই ৯ বৎসর ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে শেষ হয়। সেই কবুলিয়তের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, “বাদিগণ তাহাদের নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনের “জন্য অল্প দিন হইল, তাহা প্রস্তুত করিয়াছে;” তাহার পরে তিনি তদন্ত করিয়াছেন যে, বাদিগণ যে বলে যে, কবুলিয়ৎ শেষ হওয়ার পরে তাহারা দখীলকার ছিল, তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে কি না; এবং তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, তাহারা যে দখীলকার ছিল, এমত কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ থাকার বিষয় দেখাইবার কোন কথা নাই।

আমরা দেখিতেছি যে, কেবল দুই জন সাক্ষী জবানবন্দী দিয়াছে যে, ডিক্রীজারীর কালে অথবা তৎপূর্ব্বে বাদিগণ দখীলকার ছিল। তাহাদের দুই জনের জবানবন্দী পরস্পর অনৈক্য। তাহার মধ্যে এক জন বলে যে, বাদিগণ ভূমি প্রজা বিলি করিয়াছিল, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে যে, বাদীরা নিজেই ফসল লইত। প্রজাদিগকে হাজির করা হয় নাই। [illegible] যে, বাদিগণ নিজে ভূমি চাস করিত, সে বাদীরা কোন্ কোন্ ভূমিখণ্ড চাস করিত, তাহা বলিতে পারে নাই। অধঃস্থ জজের সমক্ষে বাস্তবিক এমন কোন প্রমাণ ছিল না যদ্দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন যে, ডিক্রীজারীর সময়ে বাদিগণ প্রকৃত প্রস্তাবে দখীলকার ছিল। যেহেতু বাদিগণের উপরে প্রমাণ-ভার ছিল, এবং তাহারা তাহাদের মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই, অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধঃস্থ জজ ন্যায্য রূপেই নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

আপেলাণ্টের উকীল আর এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। আদি মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমা বিধায় তিনি তর্ক করেন যে, ২৩০ ধারানুযায়ী দরখাস্ত সেই মোকদ্দমারই কার্য্য; এবং তিনি ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৬ ধারার উল্লেখ করিয়া তর্ক করেন যে, অধঃস্থ জজের নিকট আপীল চলিতে পারে না, কারণ, ঐ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারার অন্তর্গত কোন নালিশে যে হুকুম অথবা নিষ্পত্তি হয় তাহার বিরুদ্ধে আপীল, অথবা তাহার পুনর্ব্বিচার চলিবে না। ঐ তর্কের উত্তর এই যে, ঐ কার্য্য ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতে হয় নাই, ৮ আইনের ২৩০ ধারা মতে হইয়াছে। এই ধারা মতে ঐ দরখাস্ত নম্বর ও রেজিষ্টরীভুক্ত হইয়াছে এবং ঐ রেজেষ্টরীকৃত দরখাস্তের উপরে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা ২৩১ ধারা মতে ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল সম্বন্ধীয় সমুদায় নিয়মের অধীন করা হইয়াছে। ২৩০ ধারার অন্তর্গত নিষ্পত্তি ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারান্তর্গত কোন মোকদ্দমার হুকুম বা নিষ্পত্তি নহে; অতএব ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৬ ধারা উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটে না।

আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

[illegible] ।—উভয় বিষয়ে খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করিতে আমি নিতান্ত সম্মত হইলাম। আমি বিবেচনা করি যে, অধঃস্থ জজের নিকট আপীল হইতে পারে, এবং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করার কোন যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হয় নাই। আদালতের সমক্ষে যে প্রমাণ দাখিল হইয়াছিল তদ্দৃষ্টেই আদালত দখলের প্রশ্নের মীমাংসা করেন। আদালতে কথিত হইয়াছে যে, ঐ প্রমাণের উপরে জজের এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল না, কিন্তু নথীতে দেখা যায় যে, আদালতের সমক্ষে কেবল সেই প্রমাণই উপস্থিত ছিল। (গ)

---

৭ ই মার্চ, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং বিচারপতি জি লক।

১৮৬৯ সালের ৫০৭ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজের ১৮৬৯ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মসম্মত বিবী বুধন আপেলাণ্ট।

জান খাঁ রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরী ও মুন্সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—১৮৬০ সালের ২৭ আইনের মর্ম্ম মতে, প্রাপ্য ঋণের ভগ্নাংশ আদায় করার জন্য পৃথক্ পৃথক্ সার্টিফিকেট দেওয়া যাইতে পারে না।

শরা অনুসারে, জারজ পুত্র পিতার পরিবারের সহিত সম্পর্কের দাবী করিতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—জহুর আলীর সম্পত্তির পাওনার ছয় অংশের পাঁচ অংশ আদায় করার নিমিত্ত পাটনার জজ, জানআলীকে যে সার্টিফিকেট দিবার হুকুম দেন তাহার বিরুদ্ধে মসম্মত বিবী বুধন এই আপীল উপস্থিত করিয়াছেন।

মোকদ্দমার প্রারম্ভেই আমরা [illegible] যে, এই হুকুম অন্যায় হইয়াছে। ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের মর্ম্ম এই নহে যে, ঋণের [illegible] আদায় করার জন্য সার্টিফিকেট বিভাগ করা যাইতে পারে।

সৈয়দ মহম্মদ নূরের খুড়া ও মৃত জহুরআলীর ভ্রাতা সূত্রে জানআলী দাবী করে। মসম্মত বুধন বলেন যে, জানআলী, জহুর আলীর পিতার জারজ পুত্র। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে জহুর আলীর পাওনা আদায় করার জন্য জানআলী যে স্বত্ব উত্থাপন করিয়াছে তদনুসারে সে কখন সার্টিফিকেট পাইতে অথবা নাবালগ সৈয়দ মহম্মদ নূরের অভিভাবক হইতে স্বত্ববান হইতে পারে না। জারজ পুত্রেরা শরা অনুসারে পিতার পরিবারের সহিত কোন সম্পর্কের দাবী করিতে পারে না। ম্যাকনাটনের মহম্মদীয় ব্যবহার গ্রন্থের ৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জারজত্বের প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া জজ, জানআলীকে যে সার্টিফিকেট দিয়াছেন তাহা যথেষ্ট হেতুতে প্রদত্ত হয় নাই এবং পক্ষগণ আদালতের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রফা করিতে সম্মত না হইলে, আমরা ঐ বিষয়ের তদন্তের জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে বাধ্য হইতাম।

যে সর্ত্ত স্বীকৃত হইল তাহা এই যে, জানআলী জহুরআলীর পাওনা আদায় করার জন্য এক সার্টিফিকেট ও নাবালগের সম্পত্তির ভার গ্রহণ করার জন্য ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে এক সার্টিফিকেট পাইবে। আপেলাণ্ট মসম্মত বিবী বুধন শরা অনুযায়ী অভিভাবিকা বিধায় তাঁহার কথা সত্য হইলে, জানআলী অপেক্ষা তিনিই নাবালগের শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে স্বত্ববতী হইবেন। তিনি নাবালগের শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করার ভার প্রাপ্ত হইবেন।

এই বিষয় সম্বন্ধে শরার বিধান ম্যাক্‌নাটনের পুস্তের ৬৩ পৃষ্ঠায় আছে।

মসম্মত বুধনকে সম্পত্তির ৬ ভাগের এক ভাগের সার্টিফিকেট দেওয়ার পরিবর্ত্তে এই বন্দোবস্ত হইল যে, ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট জানআলী পাইবে। জানআলী স্বীকার করিয়াছে যে, মসম্মত বিবী বুধন শাশুড়ী বিধায় সম্পত্তির ৬ ভাগের এক ভাগে স্বত্ববর্তী।

অতএব তদনুসারে নিম্ন আদালতের হুকুম রূপান্তর করিয়া উপরি উক্ত হুকুম অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন খরচা দিবে। (গ)

৭ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ বি কেম্প এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ২৬২ নং মোকদ্দমা।

মানভূমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনরের ১৮৬৯ সালের ১৩ ই আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

দাড়িম্ব দেবী (প্রতিবাদিনী) আপেলাণ্ট।
নীলমণিসিংহ দেব (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত ও ক্ষেত্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ ও ভবানীচরণ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—খাজানার নালিশে যখন প্রতিবাদী এই জওয়াব দেয় যে, বাদী খাজানা আদায় করার জন্য যে তহশীলদার নিযুক্ত করিয়াছে তাহাকে সে খাজানা দিয়াছে, তখন ঐ কথার ইসু করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে, প্রতিবাদীকে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে বলা উচিত নহে।

**বিচারপতি কেম্প।**—১২৭৫ সালের আশ্বিন ও কার্ত্তিকের কিস্তীর ও অগ্রহায়ণের কিস্তীর এক দিবসের খাজানা সুদ সমেত আদায়ের জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। বাদী জমিদার এবং প্রতিবাদিনী পত্তনীদার। প্রতিবাদিনী কবুলিয়ং অস্বীকার করেন না। পক্ষগণের মধ্যে বিচার্য্য প্রশ্ন কেবল এই যে, বাদী আশ্বিনের কিস্তীর প্রারম্ভ হইতে রাইয়তের নিকট খাজানা উসুল করার জন্য এক জন তহশীলদার নিযুক্ত করিয়াছিল কি না। প্রতিবাদিনী বলেন যে, বাদী তাহা করিয়াছিল এবং প্রতিবাদিনী আশ্বিনের প্রারম্ভ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম তারিখ পর্য্যন্ত খাজানার জন্য দায়ী নহেন। প্রতিবাদিনী তাঁহার বর্ণনা-পত্রে এই প্রশ্ন অতি স্পষ্ট রূপে উত্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহার ক্ষমতা-প্রাপ্ত এজেণ্টও স্বীয় জবানবন্দীতে তাহা ব্যক্ত করিয়াছে।

পক্ষগণের মধ্যে যে প্রকৃত ইসু হয়, অর্থাৎ বাদী তহশীলদার নিযুক্ত করিয়া রাইয়ৎদিগের নিকট হইতে খাজানা আদায় করিয়াছে কি না, এবং করিয়া থাকিলে কোন্ সময় হইতে কত টাকা আদায় করিয়াছে, নিম্ন আদালত তাহা নির্দ্ধারণ না করিয়া এই ইসু নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, "বাদী কত টাকা প্রাপ্ত হইতে পারে।"

এই ইসু ব্যাপক বটে, এবং তাহাতে প্রকৃত বিচার্য্য প্রশ্ন নিঃসন্দেহই ভুক্ত হইতে পারে, কিন্তু ডেপুটি কমিসনরের নিষ্পত্তিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি ঐ বিষয়ের বিচার করিতে ত্রুটি করিয়াছেন।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল অতি ন্যায্য রূপেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ডেপুটি কমিসনর আইন সম্বন্ধে যে রায় করিয়াছেন যে, তহশীলদার নিয়োজিত হইয়া থাকুক বা না থাকুক, এবং সে খাজানা আদায় করিয়া থাকুক বা না থাকুক, বাদী দাবীকৃত সমুদায় টাকার ডিক্রী পাইবে এবং প্রতিবাদিনী দেওয়ানী আদালতে স্বতন্ত্র নালিশ করিয়া প্রতিকার পাইতে পারে, ঐ উকীল এই রায়ের পোষকতা করিতে পারেন না।

মোকদ্দমা আইন-সঙ্গত রূপে বিচারিত হওয়ার জন্য পুনঃপ্রেরিত হইবে। নিম্ন আদালতের দেখিতে হইবে যে, রাইয়তদিগের নিকট খাজানা আদায় করার জন্য বাদী ১লা আশ্বিন হইতে তহসীলদার নিযুক্ত করিয়াছিল কি না, এবং যদি তাহা হয়, তবে কত টাকা পর্য্যন্ত আদায় করার জন্য তাহা করিয়াছিল। তাঁহার আরও দেখিতে হইবে যে, কিস্তিবন্দী অনুযায়ী প্রতিবাদিনী অগ্রহায়ণ মাসের এক দিবসের খাজানার জন্য দায়ী কি না, কারণ, তদ্বিষয়েও আপত্তি হইয়াছে।

খরচা নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গ)

৮ ই মার্চ, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি জি, লক।

১৮৬৯ সালের ১৫২৭ নং মোকদ্দমা।

পাবনার প্রতিনিধি সদর আমীনের ১৮৬৭ সালের ৩১ এ আগষ্টের নিষ্পত্তি অন্যথা করত রাজসাহীর অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ১২ ই এপ্রিল তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বনওয়ারীলাল রায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

মহিমাচন্দ্র কুলাল প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও ভগবতীচরণ ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু ও মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন পত্তনী-পাট্টা অবৈধ ব্যক্ত করার স্বত্ব নির্ণয়ের ও খাস দখল পাওয়ার মোকদ্দমায়, বাদী, ভূত-পূর্ব্ব মালিকের বিধবা স্ত্রীর দত্তক-পুত্র স্বরূপে দাবী করে; ঐ পাট্টা ভূত-পূর্ব্ব মালিকের মাতার দ্বারা প্রদত্ত হয়। এ স্থলে, যদিও খাজানা লইয়া দাখিলা দেওয়া হইয়াছে, এবং দত্তক-গৃহীতা মাতা এবং দত্তক-পুত্র, পত্তনী বৈধ হইলে যে প্রকার মোকদ্দমা হইতে পারে, সেই প্রকার মোকদ্দমা করিয়াছে, তথাপি দত্তক-পুত্র, ঐ স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাইতে পারে, কারণ, সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ ছিল না, তদ্দ্বারাই ঐ পাট্টা প্রদত্ত হইয়াছিল।

রাইয়ত অথবা মধ্যবর্ত্তী প্রজা যেই হউক, যদি কোন ব্যক্তি খাজানা দিয়া আইন-সঙ্গত রূপে দখীলকার থাকে, তবে তাহার দখলের স্বত্ব আইন-সঙ্গত প্রণালীতে সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী খাস দখলের নালিশ করিতে পারে না। রাইয়তের ন্যায়, মধ্যবর্ত্তী প্রজাকেও যথোচিত নোটিস না দিয়া উচ্ছেদিত করা যাইতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান্।—বাদী এই বলিয়া কতিপয় সম্পত্তির জন্য নালিশ করিয়াছে যে, যে গৌরসুন্দরের বিধবা স্ত্রী কর্ত্তৃক সে দত্তক-গৃহীত হয়, তাহার নিকট হইতে ঐ সম্পত্তি তাহাতে বর্ত্তিয়াছে। বাদী কহে যে, তাহার অনুমতি ক্রমে ঐ সম্পত্তি ১২৭৩ সাল পর্য্যন্ত তাহার গৃহীতা-মাতা ব্রজেশ্বরীর দখলে ছিল, কিন্তু সে যখন ১২৭৩ সালে দখল লইতে যায়, তখন প্রতিবাদী তাহাকে দখল লইতে দেয় নাই। অতএব সে নালিশ করিয়া প্রার্থনা করে যে, তাহাকে খাস দখল দেওয়া হয়, এবং কথিত পত্তনী পাট্টা অবৈধ বলিয়া ব্যক্ত করা হয়। সে ওয়াশীলাতেরও প্রার্থনা করে।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই:—গৌরসুন্দর তাহার এক বিধবা স্ত্রী ব্রজেশ্বরীকে ও তাহার মাতা হেমলতা চৌধুরিণীকে রাখিয়া ১২৪০ সালে পরলোক গমন করে। ব্রজেশ্বরী ১২৫২ সালে বাদীকে দত্তক লয় এবং বাদী ১২৬২ সালে অর্থাৎ ১৮৫৫ সালে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। এই নালিশ ১৮৬৭ সালে অর্থাৎ বাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার ১২ বৎসর অথবা প্রায় ১২ বৎসর পরে উপস্থিত হয়। প্রতিবাদীর অনুকূলে প্রথম আপত্তি এই যে, নালিশে তমাদী ঘটিয়াছে।

এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদিও ঐ পত্তনী পাট্টা গৌরসুন্দরের মাতা হেমলতা চৌধুরিণী

কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয় এবং নিম্ন আদালতদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সম্পত্তিতে হেমলতার কোন স্বত্ব ছিল না, তথাপি প্রতিবাদী বহু বৎসর পর্য্যন্ত ব্রজেশ্বরীকে খাজানা দিয়াছিল এবং দেখা যাইতেছে যে, ব্রজেশ্বরী ১৮১৯ সালের ৮ম কানুন জারী করিয়া প্রতিবাদীর নিকট হইতে ১২৫৭, ১২৫৮, ১২৫৯ ও ১২৬০ সালের খাজানা আদায় করিয়াছিলেন। ১২৬২ সালে যখন বাদী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে খাজানা আদায় হইয়া আসিয়াছে; অতএব বাস্তবিক প্রশ্ন এই যে, হেমলতা চৌধুরিণী যে পত্তনী পাট্টা দিয়াছিলেন তাহা বাদী বনওয়ারীলাল বহাল রাখিয়াছে কি না, কি পত্তনী অবৈধ সাব্যস্ত করার জন্য যে নালিশ উপস্থিত, তাহা ম্যাদী দ্বারা এইক্ষণে বারিত হইয়াছে।

আমরা এই বিষয় যথোচিত পর্য্যালোচনা করত দেখিলাম যে, ঐ পত্তনী পাট্টা অবৈধ সাব্যস্ত করার নালিশ বারিত হয় নাই।

ঐ পত্তনী পাট্টা অর্থাৎ যাহাকে পত্তনী পাট্টা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (কারণ, আমি দেখিতেছি যে, ইহা যে, বাস্তবিক হেমলতা চৌধুরিণী কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী কোন প্রমাণ দেয় নাই) তাহা এমন এক ব্যক্তির দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে যাহার ঐ সম্পত্তিতে কোন প্রকার স্বত্ব ছিল না, এবং প্রতিবাদীও কোন প্রকার স্বত্বের দাবী করে না। যে ব্যক্তির কেবল পাট্টা দেওয়ার কোন স্বত্ব ছিল না এমন নহে, সম্পত্তিতে কোন অধিকারও ছিল না ও তৎসম্বন্ধে সে নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি ছিল, এমন ব্যক্তির নিকটে প্রতিবাদী পাট্টা লইয়াছে। ব্রজেশ্বরী যাঁহার ঐ ভূমি সম্পত্তি ছিল, সে বৎসর বৎসর খাজানা লইয়াছেন। ইহা সত্য বটে যে, তাঁহার দত্তক পুত্র করার পরে তিনি যে সকল দাখিলা দিয়াছেন তাহা পত্তনী তালুকের খাজানার দাখিলা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, এবং উহা বৈধ পত্তনী, এবং তিনি তাহার খাজানা পাইতে পারেন বলিয়া তিনি মোকদ্দমা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বোধ হইতেছে যে, এই সকল দাখিলা এবং ঐ সকল মোকদ্দমা কেবল পত্তনী বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ মাত্র, কিন্তু বৃত্তান্ত সমস্ত তদন্ত করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, পত্তনী একেবারেই ছিল না এবং বাস্তবিক জমিদার ও পত্তনীদারের সম্পর্ক ছিল না, এবং যে প্রমাণ আছে তাহা খণ্ডিত না হইলে, জমিদার ও পত্তনীদারের সম্পর্ক থাকার কথা কেবল অনুমান করিয়া লওয়া যাইত; কিন্তু বৃত্তান্ত সমস্ত নির্ণীত হওয়ার পরে আমরা দেখিতেছি যে, ঐ সম্পর্ক নাই। ব্রজেশ্বরীর দাখিলার দ্বারা প্রতিবাদীর যে কোন ভ্রম হইয়াছিল, এবং তাহার গতিকেই যে সে তাহার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব যে স্থলে বৈধ পত্তনী নাই, সে স্থলে ব্রজেশ্বরীর অথবা বর্ত্তমান বাদীর বিরুদ্ধে কি জন্য আমরা তাহা অনুমান করিয়া লইব, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। বনওয়ারীলালের নাবালগ থাকার কালে যখন ব্রজেশ্বরী তাহার প্রতিনিধি ছিলেন তখন প্রতিবাদীর সহিত তাহার কি সম্পর্ক ছিল? তাহা এই মাত্র যে, ব্রজেশ্বরীকে প্রতিবাদী খাজানা দিতেছিল, অতএব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা রূপ সম্পর্ক ভিন্ন আর কিছু ছিল না। বনওয়ারীলালের বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরে ঐ পত্তনী পাট্টা অবৈধ সাব্যস্ত করার জন্য নালিশ করার স্বত্ব ও যোগ্যতা ছিল; কিন্তু সে পত্তনী পাট্টা অন্যথা করার জন্য নালিশ করে নাই বলিয়াই পত্তনী পাট্টা বৈধ হইতে পারে না। বাদীর নাবালগী অবস্থায় পক্ষগণের যে পরস্পর সম্পর্ক ছিল এখনও সেই সম্পর্কই আছে। প্রতিবাদী খাজানা দিত এবং বনওয়ারীলাল তাহা লইত। বনওয়ারীলালের কোন কার্য্য অথবা ত্রুটি দ্বারা

স্থির রাখার কিছুই ছিল না। পত্তনী পাট্টা যাহা প্রথমেই অবৈধ হইয়াছিল, তাহা নালিশ হওয়ার সময় পর্য্যন্ত অবৈধই ছিল, এবং আমার বোধ হয় যে, পত্তনী পাট্টা অবৈধ ব্যক্ত করার জন্য যে প্রার্থনা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমরা এই ব্যক্ত করিতে পারি যে, সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির কোন স্বত্ব ছিল না, পত্তনী পাট্টা তদ্দ্বারা প্রদত্ত হওয়াতে তাহা অবৈধ, এবং তাহা বাদী বনওয়ারীলাল রায়ের উপরে বাধ্যকর নহে।

তদনন্তর প্রশ্ন এই যে, বাদী বাস্তবিক খাস দখলের ও ওয়াশীলাতের ডিক্রী পাইতে পারে কি না? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পক্ষগণের মধ্যে যে আইনসঙ্গত সম্পর্ক ছিল তাহা ভূম্যধিকারী ও প্রজারূপ সম্পর্ক, এবং প্রজা রাইয়ৎ সূত্রে অথবা মধ্যবর্ত্তী জমা-গৃহীতা সূত্রেই হউক, যদি খাজানা দিয়া আইন-সঙ্গত রূপে দখীলকার থাকে, তবে দখলের স্বত্ব যাহা যত কাল ভূম্যধিকারী এবং প্রজারূপ সম্পর্ক থাকে তত কাল থাকে, তাহা আইন-সঙ্গত রূপে সমাপ্ত না হইলে ভূম্যধিকারী দখলের জন্য নালিশ করিতে পারে না। যদি কোন ভূম্যধিকারী দখলের জন্য নালিশ করে, তবে সে ইহা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য যে, নালিশ উপস্থিত করার পূর্ব্বে সে দখল পাইতে স্বত্ববান ছিল।

বাবু শ্রীনাথ দাস স্বীকার করিয়াছেন যে, রাইয়ৎ সম্বন্ধে অনেক মোকদ্দমায় এই প্রকার বিধি সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহা সহজে দেখান যাইতে পারে যে, ঐ যুক্তি মধ্যবর্ত্তী জমা সম্বন্ধেও খাটে। রাইয়ৎ সম্বন্ধে যদি ভূম্যধিকারী বৎসরের মধ্যকালে দখলের নালিশ চালাইতে পারে এবং নোটিস জারী না করিয়া হঠাৎ জমা শেষ করিতে পারে, তবে সে রাইয়তের সমস্ত বৎসরের ব্যয় ও পরিশ্রমের ফল এক কালে বিলুপ্ত করিতে পারে। সেই প্রকার, মধ্যবর্ত্তী জমা সম্বন্ধে যদি ভূম্যধিকারী ভূমিতে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ ঐ মধ্যবর্ত্তী প্রজাকে উঠাইয়া দিতে পারে, তবে ঐ প্রজা তাহার রাইয়তের নিকট খাজানার কিস্তী আদায় করার সময়ের পূর্ব্ব ক্ষণেও তাহাকে উঠাইয়া দিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা সমস্ত বৎসর কিস্তীবন্দী তাহার নিজের খাজানা দিতে যে ব্যয় হয় তাহা আদায় করিয়া লওয়ার উপায়ে সে বঞ্চিত হইবে। ভূম্যধিকারী কোন সংবাদ না দিয়া ঐ প্রজার কর্ম্মচারিগণকে বহিষ্কৃত, এবং তাহার হিসাব-পত্র সমস্ত উপযুক্ত স্থানে লইয়া যাইবার অবকাশ না দিয়া তাহা তাহার কাছারী ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া তাহার যার পর নাই অসুবিধা জন্মাইতে পারে। প্রজা সম্পত্তির উন্নতির জন্য টাকা ব্যয় করিয়া থাকিতে পারে; অতএব জমিদার যদি নোটিস না দিয়া তাহার জমা সমাপ্ত করিতে পারে, তবে হয়ত সে যে টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাহা আর তাহার পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার কোন উপায় থাকে না।"

আমরা বোধ করি যে, রাইয়ত সম্বন্ধে যে যুক্তি খাটে, মধ্যবর্ত্তী প্রজা সম্বন্ধেও তাহা খাটে, এবং জমিদার উচিত নোটিস অর্থাৎ যে নোটিসের মিয়াদ আমাদের বিবেচনায় বৎসরের শেষ ভিন্ন সমাপ্ত হইবে না, তাহা না দিয়া মধ্যবর্ত্তী প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারে না। নোটিস না দিয়া এই নালিশ উপস্থিত করা হইয়াছে, অতএব বাদী যে দখলের ও ওয়াশীলাতের ডিক্রী চাহে তাহা সে পাইতে পারে না।

যে স্থলে বাদী এই বিষয়ে কৃত-কার্য্য হইল না, এবং তাহাই তাহার মোকদ্দমার প্রধান কথা, এবং যে স্থলে তাহার মাতা ও তাহার নিজের সহিত যে প্রকার কার্য্য হইয়া আসিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রজারা অনুমান করিয়া থাকিবে যে, তাহাদের পাট্টা বৈধ, এবং তাহাদের বাস্তবিক কি ভাবের স্বত্ব তাহা তাহারা সহজে অবগত হইতে পারে নাই, সে স্থলে আমি বিবেচনা করি যে, বাদী তাহার এই মোকদ্দমার খরচা

পাইবে না। প্রত্যেক পক্ষ সকল আদালতের আপন আপন খরচা দিবে। (গ)

———

৮ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ১৯২ নং মোকদ্দমা।

২৪-পরগণার দ্বিতীয় অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ মে তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মেরায়াম বেগম ( প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি ) আপেলাণ্ট।

রাইচরণ দত্ত ( বাদী ) ও অন্যান্য ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তারকনাথ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ডিক্রীজারীর নীলাম-ক্রেতা ভূমির দখল পাওয়ার নালিশ করিলে প্রতিবাদী যদি তমাদীর আপত্তি করে, এবং বাদী এমন সকল বৃত্তান্ত সপ্রমাণ করে যদ্দ্বারা আদালত নিজে আইনঘটিত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তবে যে পর্য্যন্ত নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশের হেতু উপস্থাপিত হওয়া দৃষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত বাদীকে তাহার আরজীর লিখিত নালিশের হেতুতে বাধ্য করিয়া রাখা উচিত নহে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—কলিকাতা সহরের অন্তঃপাতী মাণিকতলা-স্থিত আন্দাজ ২২ বিঘার একখণ্ড ভূমির ৸০ আনা অংশ বলিয়া যে সম্পত্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহার দখল প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। এই ৸০ আনা এক সময়ে কমীরুল আল্লা মিঞা ওরফে কম্বরআলী নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল; এবং কতকগুলি উত্তরাধিকারী রাখিয়া তাহার মৃত্যু হইলে, সম্পত্তি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়, এবং পরে তাহা আংশিক একত্রিত হয়, এবং সমুদায় সম্পত্তি ষোল আনা ধরিয়া সেই একত্রিত অংশ এই মোকদ্দমার বিচারের জন্য ।০, ।৴০ ও ।৵০ অংশ বলা যাইতে পারে। ঐ ।০ ও ।৴০ অর্থাৎ মোট ।।৴০ অংশ যাহা কয়েক ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল, তাহার স্বত্ব ও লাভ ভূতপূর্ব্ব সুপ্রীম কোর্টের এক ডিক্রীমতে সরিফের দ্বারা নীলাম হইয়া ১৮৫৪ সালে বাদী কর্ত্তৃক ক্রীত হয়, এবং বাকী ।৵০ আনা সে কম্বর আলীর পৌত্রীদিগের নিকট ঘরাও বিক্রয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।

বাদী কহে যে, প্রতিবাদিনী মেরায়াম বেগমের এই সম্পত্তির কোন অংশে স্বত্ব না থাকাতেও তিনি অন্যান্য প্রতিবাদীকে তাহার ইজারা দিয়াছেন, এবং তাহাদের দ্বারা ও তাহাদের যোগে বাদীকে দখল হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। ঐ ।।৴০ আনার মধ্যে বাদী যে ।০ আনা পূর্ব্বে ক্রয় করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মেহেরুন্নেছা বেগম নাম্নী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক বেদখলের নালিশে যে ডিক্রী হয় তাহার তারিখ অর্থাৎ ১৮৬৩ সালের ১৪ ই মে তারিখ হইতে বাদীর নালিশের হেতু উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিবাদিগণ নানা প্রকার জওয়াব দেয়; তাহার প্রথম এই যে, এই সমুদায় দাবীতে তমাদী ঘটিয়াছে।

যে চারি আনা ওয়ারিশ হোসেন আলী নামে কম্বর আলীর এক পুত্রের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ২৪ পরগণার ২ য় অধঃস্থ জজ ঐ তমাদীর আপত্তি গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ।৴০ ও ।৵০ আনা সম্বন্ধে তমাদীর আপত্তি অগ্রাহ্য হইয়াছে, এবং বাদী এই দুই অংশের অর্থাৎ সমুদায় ষোল আনার মধ্যে ৸০ আনার ডিক্রী পাইয়াছে।

প্রতিবাদিনী ঐ ।৵০ আনার প্রতি তাহার

দাবী পরিত্যাগ করিয়া, বাকী ।৴০ আনা যাহা কম্বরআলীর কন্যা ফাহরতুন্নিছা এবং ঐ কন্যার পুত্র আলী হোসেনের অংশ, তৎসম্বন্ধে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল করিয়াছে, এবং তর্কিত হইয়াছে যে, ঐ অংশ সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি আইন ও বৃত্তান্ত উভয় সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক হইয়াছে।

এই আপীলে আমাদের প্রধান বিচার্য্য কথা এই যে, এই ।৴০ আনা সম্বন্ধে বাদীর নালিশ বারিত হইয়াছে কি না? স্পষ্ট দেখা যাইতেছে (এবং বাদীও আপত্তি করে নাই) যে, ১৮৫৪ সালে তাহার ক্রয়ের তারিখ হইতে সে কখন এই ভূমি সম্বন্ধে আপন দখলের স্বত্ব পরিচালন করে নাই, ও ইহার কোন খাজানা পায় নাই এবং ইহার দ্বারা কোন উপকারও প্রাপ্ত হয় নাই; কিন্তু সে বলে যে, ১২৭৩ সালের শ্রাবণ মাসে কম্বরআলীর পুত্র হোসেনআলীর বিধবা স্ত্রী শরীফুন্নিছা যে তৎকালে এই অংশের দখীলকার ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে কিন্তু যাহার ইহাতে কোন স্বত্ব ছিল না, সে বাদীকে খাজানা দিতে প্রজাগণকে আদেশ করিয়া বাদীকে আপোসে দখল দেয়। কিন্তু মেরায়াম বেগম প্রতিবাদিনী যদিও ঐ অংশের কখন দখীলকার ছিলেন না (অথবা বিরোধীয় বাগিচার কোন অংশের দখীলকার ছিলেন না) তথাপি তিনি প্রতিবাদিগণের সহিত কুমন্ত্রণা করিয়া বাদীর দখলের প্রতি আপত্তি করেন।

এইক্ষণে বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, প্রথমতঃ, এই সকল বৃত্তান্ত সত্য কি না; এবং দ্বিতীয়তঃ, যদি তাহা সত্য হয়, তবে প্রতিবাদিনীর এইরূপ দখলের দ্বারা বাদী তাহার নালিশ চালাইবার হেতু পাইতে পারে কি না?

এই প্রশ্নদ্বয়ের মধ্যে শেষ প্রশ্নের বিচার প্রথমে করাই সুবিধাজনক হইবে।

আমি সমুদায় দৃষ্টে বিবেচনা করি যে, যদি বাদী আমার সন্তোষজনক রূপে ইহা সপ্রমাণ করিতে পারে যে, শরীফুন্নিছা তৎকালে বিরোধীয় অংশে অন্যায় দখীলকার থাকিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার দখল পরিত্যাগ করত তাহার যত দূর শক্তি ছিল তত দূর বাদীকে দখল দিয়াছিল এবং প্রতিবাদিনী মেরায়াম বেগম বাদীকে ঐ দখল লইতে বাধা দিয়াছে, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই বাদীর এমন নালিশের হেতু হয়, যদ্দ্বারা ঐ বাধার তারিখ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে বাদী তাহার নালিশ চালাইতে পারে। ইহা সত্য বটে যে, আরজীতে নালিশের হেতু উত্থাপিত হওয়ার যে সময় বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঐ সময় নহে। আরজীতে লিখিত হইয়াছে যে, সেই হেতু উচ্ছেদের মোকদ্দমার ডিক্রী হওয়ার কালে উত্থাপিত হয়; (কি প্রকারে উত্থিত হয় তাহা স্পষ্ট নহে) কিন্তু তথাপি যদি বাদী এমন কথা বলে এবং এমন সমস্ত বৃত্তান্ত সপ্রমাণ করে যদ্দ্বারা আদালত নিজে আইনঘটিত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি বিবেচনা করি যে, যে পর্য্যন্ত নালিশের হেতু নালিশ উপস্থিত হওয়ার তারিখের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে উত্থাপিত হয়, সে পর্য্যন্ত বাদীর লিখিত নালিশের হেতুতে বাদীকে বাধ্য করিয়া রাখা উচিত নহে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, বাদী যদি এই সকল বৃত্তান্ত সন্তোষজনক রূপে সপ্রমাণ করে তবে সে দখল পাইতে পারে।

কিন্তু ফলতঃ আমি ঐ সকল বৃত্তান্ত বিশ্বাস করিতে পারি না। ঐ বিষয়ের যে প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে অথবা নিম্ন আদালত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তহা আমি গ্রাহ্য করিতে পারি না। ইহা আমার নিতান্ত অবিশ্বাস্য বোধ হয় যে, শরীফুন্নিছা তাহার পুত্র ফরজন্দআলীর উত্তরাধিকারিণী সূত্রে বিনা স্বত্বে ১২৭৩ সালের শ্রাবণ মোতাবেক ১৮৬৬ সালের জুলাই এবং আগষ্ট পর্য্যন্ত এই সম্পত্তির দখীলকার থাকিয়া, অর্থাৎ যে সময়ে এই সম্পত্তির দখল পুনঃপ্রাপ্ত

হওয়ার জন্য বাদীর নালিশ সম্পূর্ণরূপে বারিত হইত, সেই সময়ে বিনা কারণে শরীফুন্নিছা বাদীকে তাহার দখল পরিত্যাগ করিবে। আমার বোধ হয় যে, এই বিষয়ের প্রমাণ যাহা অতি উৎকৃষ্ট রূপে সন্তোষজনক না হইলে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, তাহা এই মোকদ্দমায় সন্তোষকর নহে। অপিচ, বাদী যে সমস্ত বৃত্তান্তের কথা বলে তাহা প্রমাণের দ্বারা আমার তৃপ্তিকররূপে সাব্যস্ত হয় নাই, অর্থাৎ শরীফুন্নিছা যে ঐ সময় পর্য্যন্ত খাজানা আদায় করিয়াছিল এবং বাদীকে যে দখল দেওয়ান হইয়াছিল, অথবা বাদী কোন দখলের স্বত্ব পরিচালন করিয়াছিল এবং মেরায়াম বেগম তাহাতে আপত্তি করিয়া তাহার দখলের প্রতি বাধা দিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করার কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই; বরং আমার বোধ হয় যে, বাদী যে ।৵০ আনার ডিক্রী পায় তৎসম্বন্ধে সে তৎকালে ঐ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত রফা করার উদ্যোগে থাকিয়া ।৵০ আনা অংশ সম্বন্ধে এই নালিশ উপস্থিত করার হেতুর জন্য সেই সময়ে কেবল নামমাত্র দখল পাওয়ার নিমিত্ত শরীফুন্নিছার সম্মতি এবং সহায়তা লয়।

ইহাও দেখা যাইতেছে যে, বাদী সেই উদ্দেশ্যে রাইয়তদিগের নামে ২৪ পরগণার কালেক্টরীতে কয়েকটি খাজানার মোকদ্দমা উপস্থিত করে, এবং সেই সকল মোকদ্দমায় মেরায়াম বেগম মোজাহেম দেন এবং বাদী ও মোজাহেমদারের মধ্যে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারামতে বিচার হইয়া মোজাহেমদারের অনুকূলেই নিষ্পত্তি হয়। নালিশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে এই দুই ব্যক্তির অর্থাৎ বাদী ও মোজাহেমদারের মধ্যে কে খাজানা পাইত, এই ইসুর বিচার হয়। সেই ইসু সম্বন্ধে ডেপুটি কালেক্টর নিম্নলিখিত বাক্যে নির্দ্দেশ করেন, যথা, "অনন্তর সে তাহার "জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছে যে, ১৮৫৪ "সালে তাহার এই ভূমি ক্রয় করণাবধি সে "প্রতিবাদীর নিকট কখন খাজানা আদায় "করে নাই, বরং এই ১৪ বৎসর প্রতিবাদী, "মোজাহেমদারদিগকে খাজানা দিয়াছে, এবং "তাহার নিকট ১২৭৩ সালের খাজানা লইয়াও তাহারা তাহাকে দাখিলা দিয়াছে। "অতএব এই পক্ষগণের অর্থাৎ বাদী ও মোজাহেমদারের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি বিরোধীয় ভূমির "খাজানা পাইয়া আসিয়াছে, তাহার আর "অধিক তদন্ত করার আবশ্যক নাই।" আমার বোধ হয়, এই মোকদ্দমায় যে সকল দাখিলা দাখিল ও সাক্ষী উপস্থিত হইয়াছে, মাল আদালতের উক্ত নির্দ্দেশ ঐ প্রকার বহু দাখিলার ও বহু সাক্ষীর সাক্ষ্যের তুল্য, এবং আমার ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কালেক্টরীর মোকদ্দমার পরে শরীফুন্নিছা হইতে ।৵০ আনা অংশের ঐ রূপ নামমাত্র দখল লওয়া এই নালিশের তমাদীর আপত্তি এড়াইবার অভিসন্ধিতে হইয়াছিল। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, ।৵০ আনা অংশ সম্বন্ধে অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা ও সেই পরিমাণে খরচা সমেত বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমিও বিবেচনা করি যে, সম্পত্তির ।৵০ আনা অংশ সম্বন্ধে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে। (গ)

---

৮ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৭১৯ সালের ১৭৮ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৭ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মেং জে, পি, ওয়াইজ (বাদী) আপেলাণ্ট।

গরীব হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর ও সি গ্রেগরি, বাবু শ্রীনাথ দাস ও রমেশচন্দ্র মিত্র আপেলান্টের উকীল।

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নৃসিংহচন্দ্র মিত্র ও যোগেন্দ্রনাথ বসু রেস্পণ্ডেন্টের উকীল।

চুম্বক।—কতিপয় সম্পত্তি কয়েকটি ডিক্রীর দেনার জন্য দায়ী সাব্যস্ত করার মোকদ্দমায় বাদী কহে যে, সমুদায় সম্পত্তিই তাহার বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি এবং দায়ীর স্বীকৃত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির হস্তে অবিকল গমন করিয়াছে; অন্যান্য প্রতিবাদী কেবল নামমাত্র, এবং মুল প্রতিবাদী প্রতারণা করিয়া তাহাদিগকে দৃষ্টব্য ক্রেতা বলিয়া উপস্থাপন করিয়াছে।

এ স্থলে, প্রকৃতার্থে বাদীর কেবল একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে একমাত্র নালিশের হেতু ছিল, এবং তাহার আরজীতে বহু নালিশের হেতু থাকিলেও মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে তাহা এমত অনিয়ম নহে, যদ্দ্বারা তাহার নালিশ অগ্রাহ্য হইতে পারে।

বিচারপতি হব্‌হোস।—এই মোকদ্দমার তর্ক সমস্ত উত্তমরূপে বুঝিবার জন্য ইহা বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান প্রতিবাদী গরীব হোসেনের পিতা জকী চৌধুরীর বিরুদ্ধে ৫ টি ডিক্রী অপরিশোধিত ছিল। এই সকল ডিক্রীর তারিখ ১৮৫২ সালের ২৮ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৫ সালের ১৩ ই আগস্ট ১৮৪৩ সালের ৩১ এ মে, এবং আর একটি ডিক্রীর তারিখ ১৮৫৫ সালের ১১ ই আগস্ট এবং পঞ্চম ডিক্রীর তারিখ ১৮৫৩ সালের ১৯ এ আগস্ট। বাদী এই সকল ডিক্রী ক্রয় করে, এবং তাহার আরজীর তালিকায় লিখিত সম্পত্তি সমস্ত উক্ত ডিক্রী সমস্তের জন্য দায়ী সাব্যস্ত করার নিমিত্ত সে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই সকল সম্পত্তি প্রথমে বিচারাদিষ্ট দায়ী জকী চৌধুরীর সম্পত্তি ছিল। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, গরীব হোসেন জকী চৌধুরীর পুত্র ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি, এবং ইহা অস্বীকৃত নহে যে, যদি উক্ত গরীব হোসেন ঐ সকল সম্পত্তির বর্ত্তমান দখীলকার ও উপস্বত্বভোগী সাব্যস্ত হয়, তবে ঐ সম্পত্তির পরিমাণে সে জকী চৌধুরীর বিরুদ্ধ ঐ ডিক্রী সমস্ত পরিশোধ করিতে বাধ্য। কিন্তু এই মোকদ্দমায় কেবল গরীব হোসেনই প্রতিবাদী নহে; অন্যান্য প্রতিবাদীও আছে যাহারা ঐ সম্পত্তির ন্যূনাধিকরূপে দৃষ্টব্য মালিক, এবং তাহারা তর্ক করে যে, নানাকারণে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলিতে পারে না। প্রথমতঃ, তাহারা বলে অর্থাৎ তাহারা নিম্ন আদালতে বলিয়াছে যে, যে ডিক্রী সমস্তের বুনিয়াদে বাদী নালিশ করে, তৎসমুদায় তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত, অতএব আদালতে বাদীর কোন স্থান নাই।

তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, মোকদ্দমায় বহু নালিশ জড়িত বিধায় তাহা চলিতে পারে না, এবং শেষ আপত্তি এই যে, বাদী ইহা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই যে, বিরোধীয় সম্পত্তিতে গরীব হোসেনই এক্ষণে দখীলকার ও ভোগবান্।

নিম্ন আদালত বাদীর বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ করিয়া এই আপত্তি সমূহের প্রত্যেকের ও সমুদায়ের উপরে তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন, এবং সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদী এইক্ষণে এই আদালতে জাবেতা আপীল করিয়াছে।

প্রকৃত বিচার্য্য প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মোকদ্দমা পরিষ্কার করণার্থে আমাদের ইহা বলিতে হইবে যে, বাদী আপেলান্টের কৌন্সেল মেং পল স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৮৫৩ সালের ১৯ এ আগস্ট তারিখের ডিক্রী তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হওয়া দৃষ্ট হয়, এবং দোষগুণ সম্বন্ধে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজনারায়ণ সেন নামক ১ নং তালুক যে, প্রতিবাদী গরীব হোসেনের দখলে ও ভোগে আছে তাহাও তিনি সপ্রমাণ করিতে পারেন না।

আমরা এই মোকদ্দমায় আর যে নিষ্পত্তিই করি, আমাদের ইহা এককালে বলিতে হইবে যে, প্রথমতঃ, বাদী যে সকল ডিক্রীর বলে নালিশ করিয়াছে তাহার জন্য ১ নং তালুক রাজনারায়ণ সেন দায়ী হইতে পারে না; এবং দ্বিতীয়তঃ, ১৮৫৩ সালের ১৯ এ আগষ্টের ডিক্রীর জন্য বিরোধীয় কোন সম্পত্তি দায়ী হইতে পারে না।

গত ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমা প্রথম শ্রবণের কালে, বাদী যে সকল ডিক্রীর উপরে তাহার নালিশ স্থাপন করে তাহা তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ ছিল; অতএব আমরা ঐ সকল ডিক্রীজারীর নথী তলব করিয়াছিলাম। এইক্ষণে সেই সকল নথী পাইয়া দুই পক্ষের উকীল কৌন্সেলদিগকে তাহা দৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করণানন্তর বলিতেছি যে, যেমন আপেলাণ্টের বিজ্ঞবর কৌন্সেল স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৮৫৩ সালের ১৯ এ আগষ্টের ডিক্রী তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত, সেই রূপ পক্ষান্তরে, আমরা দেখিতেছি যে, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলেরাও স্বীকার করিতেছেন যে, বাদী যে অন্যান্য ডিক্রীর উপরে নির্ভর করে তাহা ঐ প্রকারে বারিত নহে।

বহু নালিশ জড়িত হওয়ার আপত্তি এক্ষণে বিচার্য্য। এই বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলেরা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার যে বাক্যগুলির প্রতি নির্ভর করেন তাহা এই যে, "একি পক্ষের নামে বিপক্ষের "নালিশ করিবার নানা কারণ থাকিলে, ও "সেই সেই কারণ একি আদালতে বিচার "হইতে পারিলে, সেই সকল কারণ একি মোক- "দ্দমায় ধারা যাইতে পারিবে। কিন্তু ইহাতে "প্রয়োজন যে, ঐ মোকদ্দমাতে যত টাকা কি "সম্পত্তির যত মুল্য লইয়া সম্পূর্ণ দাওয়া হয় "সেই মুল্যের দাওয়া ঐ আদালতের বিচার "করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।"

এই ধারার বিধানমতে, ভিন্ন ভিন্ন নালিশের হেতুজনিত মোকদ্দমা সমস্ত এক মোকদ্দমায় ধরিতে হইলে ঐ সকল হেতু একই ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে একই আদালতের বিচার্য্য, এবং নালিশের মোট মুল্য ঐ আদালতের বিচারাধিকারান্তর্গত হওয়া আবশ্যক। এ স্থলে, ইহা সত্য বটে যে, এক অর্থে, পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন, এবং সেই পক্ষগণের বিরুদ্ধে নালিশের হেতু একেবারে এক নহে; কিন্তু বাস্তবিক বাদীর নালিশে বহু মোকদ্দমা জড়িত নহে। সে কহে যে, ঐ সকল ডিক্রীমতে জকী চৌধুরীর নিকট তাহার কতক টাকা প্রাপ্য আছে। সে আরও বলে এবং প্রতিপক্ষও অস্বীকার করে না যে, বাদী তাহার ডিক্রীর জন্য যে সকল সম্পত্তি দাবী করিতে চাহে তাহা জকী চৌধুরীর সম্পত্তি ছিল। সে আরও বলে যে, ঐ সম্পত্তি সমুদায় জকী চৌধুরীর নিকট হইতে জকী চৌধুরীর স্বীকৃত স্থলাভিষিক্ত গরীব হোসেনে অবিকল বর্ত্তিয়াছে; এবং গরীব হোসেন সেই স্থলাভিষিক্ত সূত্রে ঐ সকল সম্পত্তিতে দখীলকার আছে, এবং মোকদ্দমার অন্যান্য প্রতিবাদিগণ কেবল নামমাত্র, বাদীর ডিক্রীর পাওনা টাকা বাদীকে আদায় করিতে না দিবার অভিসন্ধিতে গরীব হোসেন প্রতারণা পূর্ব্বক এই সকল ব্যক্তিকে উত্থাপন করিয়াছে, এবং তাহারা উক্ত সম্পত্তির দ্রষ্টব্য মালিক বলিয়া উত্থাপিত হওয়াতেই বাদী তাহাদিগকে প্রতিবাদী করিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক এই মোকদ্দমায় কেবল গরীব হোসেনই একমাত্র পক্ষ। অতএব যদি বাদী সপ্রমাণ করিতে পারে যে, গরীব হোসেন ভিন্ন অন্যান্য প্রতিবাদী কেবল নাম মাত্র, তবে ইহা বলা যাইতে পারে না যে, ভিন্ন ভিন্ন পক্ষগণের বিরুদ্ধে সে এক মোকদ্দমায় ভিন্ন ভিন্ন নালিশের হেতু যোগ করিয়াছে; কারণ বস্তুতঃ, এক মাত্র গরীব হোসেনেরই বিরুদ্ধে বাদী এক নালিশের হেতু উত্থাপন করিয়াছে; অন্যান্য প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে তাহার যে এক

মাত্র নালিশের হেতু আছে তাহা এই যে, তাহারা গরীব হোসেনকে মিথ্যা করিয়া তাহাদিগকে সম্পত্তির প্রকৃত মালিক বলিয়া উত্থাপন করিতে দিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক কেবল গরীব হোসেনই বিরোধীয় সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। আমরা বিবেচনা করি যে, এই তর্ক অতি সঙ্গত, এবং আমরা তাহা সঙ্গত বিবেচনা না করিলেও, যাহা বহু মোকদ্দমা বলিয়া কথিত হইয়াছে তদ্ধেতু বাদীকে এক কালে আদালত হইতে বহিষ্কৃত করা আমাদের উচিত নহে। ইহা হইতে পারে যে, বাদী নানা ব্যক্তিকে এক মোকদ্দমায় পক্ষ করিয়া অনিয়মিত কার্য্য করিয়াছে, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই মোকদ্দমার অবস্থায় সে আর কি প্রকারে কার্য্য করিতে পারিত তাহা আমরা জানি না ; এবং যে প্রকারেই হউক, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫০ ধারা দৃষ্টে আমরা এমত বলিতে পারি না যে, উহা ত্রুটি হইলেও তদ্দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের অথবা আদালতের বিচারাধিকারের ব্যতিক্রম হইয়াছে। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, বহু মোকদ্দমা জড়িত হওয়ার আপত্তি এমন যথেষ্ট আপত্তি নহে যদ্দ্বারা আমরা এই মোকদ্দমার দোসগুণের বিচার করিতে নিবারিত হইতে পারি।

এই মোকদ্দমার দোষগুণ সংক্ষেপে এই :—

*　　*　　*

আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া আদেশ করিতেছি যে, বাদী তাহার ১৮৫২ সালের ২৮ এ ফেব্রুয়ারি ও ১৮৪৩ সালের ৩১ এ মে তারিখের ডিক্রীর এবং ১৮৫৫ সালের ১৩ ই আগষ্টের দুই ডিক্রীর পাওনার জন্য বিরোধীয় সম্পত্তির মধ্যে কেবল ১ নং তালুক রাজনারায়ণ সেন ব্যতীত আর সমুদায় সম্পত্তি দায়ী করিতে স্বত্ববান্। আমাদের বিবেচনায়, নিম্নলিখিত প্রতিবাদিগণ ব্যতীত আর সকল প্রতিবাদী আদালতের খরচা দিবে। তালুক রাজনারায়ণ সেন সম্বন্ধীয় রেস্পণ্ডেণ্ট এবং রেস্পণ্ডেণ্ট দিননাথ নিম্ন আদালতের ও এই আদালতের খরচা বাদীর নিকট পাইবে।　　( গ )

—

৯ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ২২৭৬ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের জজ সিউড়ীর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৯ ই জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গোপাল স্বর্ণকার ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

গয়ারাম সরকার এবং অপর এক ব্যক্তি ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাদী যে টাকা প্রতিবাদিগণের জন্য দেয় তাহা ফেরৎ পাওয়ার নালিশ ছোট আদালতের আইনের ৬ ধারা-বর্ণিত ক্ষতিপূরণের দাবীর মোকদ্দমার ন্যায় গণ্য।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমা যে, ছোট আদালতের বিচার্য্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু দেখা যায় না ; অতএব এ আদালতে তাহার খাস আপীল চলে না। এ মোকদ্দমা ১৮ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবীতে উপস্থিত হইয়াছে, বাদী বলে যে, সে তাহা প্রতিবাদিগণের নিমিত্ত দেয়, অতএব সে তাহা তাহাদের নিকট ফেরৎ পাওয়ার দাবী করে। ইহা স্পষ্টই ছোট আদালতের আইনের ৬ ধারা-বর্ণিত ক্ষতিপূরণের দাবীর মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমা।

এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস হইল।　　( ব )

৯ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং জে, বি, ফিয়ার।

রাণাঘাটের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ কর্তৃক এস্তমেজাজ।

গোলাম আস্‌গর, বাদী।

রুক্মিণী দেবী প্রভৃতি, প্রতিবাদিনী।

**চুম্বক।**—কোন ডিক্রীজারীর নীলামের সময়ে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ অর্থাৎ তমাদীর দ্বারা বারিত হইলে ঐ নীলাম অকর্ম্মণ্য হয়।

**এস্তমেজাজ।**—বাদী, রামধন মদকের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী পায়, এবং পরে বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনীগণের যে এক ডিক্রী ছিল তাহার জারীতে তাহারা উক্ত মদকের বিরুদ্ধে বাদীর যে ডিক্রী ছিল তাহা ক্রয় করে। ইতিমধ্যে বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনীগণের যে এক ডিক্রী ছিল, তৎসম্বন্ধে বাদী এবং প্রতিবাদিনীগণের মধ্যে মোকদ্দমা চলে, এবং তাহা পরিশেষে তমাদী দ্বারা বারিত সাব্যস্ত হয়; কিন্তু ইহা সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে প্রতিবাদিনীগণ উক্ত মদকের বিরুদ্ধে বাদীর ডিক্রী নীলাম করাইয়া স্বয়ং ক্রয় করে। বাদী এক্ষণে সুদ সমেত উক্ত ডিক্রীর টাকার নিমিত্ত তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে।

প্রতিবাদিনীগণ উপরোক্ত বৃত্তান্ত সমস্ত স্বীকার করিয়া জওয়াব দেয় যে, বাদীর বিরুদ্ধে তাহাদের যে ডিক্রী ছিল যাহার জারীতে উক্ত মদকের বিরুদ্ধে বাদীর ডিক্রী বিক্রয় হয় এবং প্রতিবাদিগণ ক্রয় করে, তাহা তমাদী দ্বারা বারিত সাব্যস্ত হওয়ায় তাহার জারীতে যাহা কিছু করা হয়, এবং আর আর সকলের মধ্যে উক্ত মদকের বিরুদ্ধে ডিক্রী প্রতিবাদিনীগণ যে বিক্রয় করিয়া স্বয়ং ক্রয় করে, তাহা কাজে কাজেই অকর্ম্মণ্য হয়; বাদী তাহার পূর্ব্বের ডিক্রীদারের পদ আবার প্রাপ্ত হয়, এবং উক্ত মদকের ডিক্রীর কোন অংশই পরিশোধিত না হওয়ায় এবং তাহা এখনও সম্পূর্ণ রূপে সজীব থাকায় বাদী তাহা জারী করিতে পারে, এবং তাহা করায় প্রতিবাদিনীগণের কোন আপত্তি হইতে পারে না; অতএব বাদীর বাস্তবিক কোন ক্ষতি হয় নাই।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, প্রতিবাদিনীগণের ডিক্রী বারিত হওয়ায়, তাহা জারী করিয়া উক্ত মদকের বিরুদ্ধে বাদীর ডিক্রী যে বিক্রয় করা হয়, তাহা কাজেকাজেই অকর্ম্মণ্য হয় কি না, এবং বাদী পূর্ব্ববৎ তাহার উক্ত ডিক্রীদারের অবস্থা প্রাপ্ত হয় কি না। তাহা হইলে এ আদালতে তাহার নালিশের কোন স্বত্ব নাই, কারণ, উক্ত মদকের বিরুদ্ধে তাহার ডিক্রী এখনও জারী না হওয়ায় এবং তমাদী দ্বারা বারিত না হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে তাহার পূর্ব্ব অবস্থাই থাকিবে, এবং প্রতিবাদিনীগণের কার্য্য দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় নাই। কিন্তু তমাদী সম্বন্ধীয় নিষ্পত্তি সত্ত্বেও নীলাম সিদ্ধ থাকিলে সে তাহার ডিক্রীর সমুদায় ফল হইতে বঞ্চিত হইত। আমার মতে প্রতিবাদিনীগণের বাদীর বিরুদ্ধে যে ডিক্রী ছিল, তাহা চূড়ান্ত রূপে তমাদী দ্বারা বারিত সাব্যস্ত হওয়াতে, তাহা জারী করিয়া বাদীর উক্ত মদকের বিরুদ্ধের ডিক্রী যে বিক্রয় হয় সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হয় না।

৭ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩১২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত চন্দ্রকান্ত শর্ম্মা বনাম বিশ্বেশ্বর শর্ম্মার মোকদ্দমায় প্রধানতম বিচারালয় কহেন যে, কোন ডিক্রীজারীতে নিষ্কপট ক্রেতার নিকট যে বিক্রয় হয়, তাহা উক্ত ডিক্রী আপীলে অন্যথা হইলেও সিদ্ধ; এবং উক্ত মোকদ্দমার দৃষ্টান্ত মতে ১০ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৫৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত জান আলী বনাম জান আলী চৌধুরীর মোকদ্দমায় স্থির হয় যে, যে ডিক্রী পুনর্ব্বিচারে অন্যথা হয় সেই ডিক্রী-

জারীতে নিষ্কপটে যে বিক্রয় হইয়া থাকে তাহাও বাধ্যকর। এই সকল নজীর উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয়। প্রতিবাদিনীগণ বাদীর বিরুদ্ধের ডিক্রীজারী করিয়া বাদীর উক্ত মদকের বিরুদ্ধে যে ডিক্রী ছিল তাহা যে ক্রয় করে তাহা নিষ্কপট ক্রয়। যে ডিক্রী পরে বারিত সাব্যস্ত হয় তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যে নীলাম হওয়াতেই তাহাদের নিষ্কপট ক্রয়ে কোন দোষ বর্ত্তে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যে ডিক্রীজারীতে উক্ত মদকের বিরুদ্ধে বিক্রয় হয়, সেই ডিক্রী পরে অন্যথা হইলেও উক্ত বিক্রয়-কার্য্য সিদ্ধ বিবেচনা করিলে, বাদী কি এই আদালতে নালিশ করিয়া প্রকৃত প্রতিকার পাইবে, না সে ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা দ্বারা বারিত? যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তরে না বলা যায়, তবে বাদীকে স্পষ্টই এমত কোন অন্যায় সহ্য করিতে হইয়াছে, যাহার জন্য সে কোন না কোন আদালতে প্রতিকার পাইবে। তর্কিত হইয়াছে যে, তমাদী সম্বন্ধে নিষ্পত্তির পর উক্ত নীলাম রদের দাবীতে তাহাকে মুন্সেফের নিকট দরখাস্ত করা উচিত ছিল, তাহা হইলে সে পুনরায় উক্ত মদকের বিরুদ্ধে পূর্ব্ববৎ ডিক্রীদারের অবস্থা প্রাপ্ত হইত; এবং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহাকে এ আদালতে প্রতিবাদিনীগণের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে দিলে, উক্ত নীলাম অন্যথা হইলে তাহার যে অবস্থা হইত তাহা অপেক্ষা হয়ত উত্তম অবস্থা হইতে পারে, কারণ, উক্ত মদকের এক কড়ারও ক্ষমতা না থাকিতে পারে, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রী নাম মাত্র হইত, কিন্তু প্রতিবাদিনীগণ ধনী লোক হইলে বাদী উক্ত সমুদায় টাকা আদায় করিতে পারে।

এই বিষয় সম্বন্ধে, অর্থাৎ নীলাম রদের দাবীতে মুন্সেফের নিকট দরখাস্ত করাই বাদীর পক্ষে উপযুক্ত উপায় ছিল, কি এই আদালতে নালিশ করা উপযুক্ত উপায় এতৎসম্বন্ধে আমি ঠিক কোন নজীর পাইলাম না। দুইটি নিষ্পত্তি আছে যাহাতে এই সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যে ডিক্রী অন্যথা হয়, তাহা অগ্রে জারী করিয়া যে টাকা আদায় করা হয়, তাহা লইয়া স্বতন্ত্র মোকদ্দমা হইতে পারে না; (নৃসিংহচরণ সেন ২ য় বালম উইক্লি রিপোর্টের ২৭৫ পৃষ্ঠা, এবং যদুনাথ গোস্বামী ৪ র্থ বালম উইক্লি রিপোর্টের ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) কিন্তু আমি বোধ করি না যে, ইহা উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয়, কারণ, ইহা অন্যায় রূপে যে টাকা আদায় হয় তাহা ফেরৎ পাওয়া অপেক্ষা বেশী কিছুর দাবীর মোকদ্দমা।

এ মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া আমি বোধ করি যে, যে ডিক্রী জারীতে উক্ত নীলাম হয় তাহা অন্যথা হওয়ায়, উক্ত নীলাম অকর্ম্মণ্য হইতে পারে না, এবং এমত অবস্থায় বাদীর নালিশ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিধানের অন্তর্গত হইতে পারে না। অতএব আমার বিবেচনায়, বাদী এই আদালতে নালিশ করিতে পারে; কিন্তু প্রতিবাদীর উকীলের দরখাস্ত অনুসারে আমি উল্লিখিত দুই প্রশ্ন প্রধানতম বিচারালয়ের মতের নিমিত্ত অর্পণ করিলাম।

### প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমায় রাণাঘাটের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজ যে দুই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন তাহার কেবল প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। ঐ প্রশ্ন এই যে, প্রতিবাদিনীগণের ডিক্রীজারীতে উক্ত মদকের বিরুদ্ধে বাদীর ডিক্রী যে বিক্রয় করা হয়, তাহা প্রতিবাদিনীগণের ডিক্রী অসিদ্ধ হওয়ায়, অকর্ম্মণ্য হয় কি না।

মোকদ্দমার অবস্থা এই যে, মদকের বিরুদ্ধে বাদী গোলাম আসগরের এক ডিক্রী ছিল, এবং লক্ষ্মীমণি প্রভৃতি প্রতিবাদিনীগণের বাদী গোলাম আসগরের বিরুদ্ধে এক ডিক্রী থাকায় তাহারা তাহা জারী করিয়া উক্ত মদকের বিরুদ্ধে প্রথমোক্ত ডিক্রী বিক্রয় করিয়া আপনারাই

ক্রয় করে। পরে গোলাম আস্গরের বিরুদ্ধে লক্ষ্মীমণি প্রভৃতির ডিক্রী তমাদীর দ্বারা বারিত সাব্যস্ত হয়। অতএব প্রশ্ন এই যে, যে ডিক্রী-জারীতে উক্ত নীলাম হয়, তাহার জারী তমাদী দ্বারা বারিত হওয়ায়, উক্ত ডিক্রীজারীতে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ কি না।

আমার অতিস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তাহা অসিদ্ধ। ছোট আদালতের জজ যে সকল নিষ্পত্তি দর্শান তাহার বৃত্তান্ত স্বতন্ত্র; ঐ সকল মোকদ্দমায় যে ডিক্রীজারীতে নীলাম হয়, তাহা নীলামের কালে প্রবল এবং সিদ্ধ ছিল, সুতরাং আদালত উক্ত সম্পত্তি নীলাম করার ক্ষমতা অনুসারেই কার্য্য করিয়াছিলেন; এবং উক্ত ডিক্রী পরে আপীলে অথবা ঐ নিষ্পত্তির পুনর্ব্বিচারে অন্যথা হওয়ায়, তাহা অন্যথা হইবার পূর্ব্বে উক্ত ডিক্রীজারীতে যাহা করা হয়, তাহা দূষিত হয় না, বা আদালত যাহা করিয়াছেন তাহা তাঁহার বিচারাধিকার-বহির্ভূত হয় না। উপস্থিত মোকদ্দমায় যে ডিক্রীজারীতে নীলাম হয় তাহার জারী ঐ নীলামের কালে তমাদী দ্বারা বারিত ছিল। অতএব আদালত উক্ত ডিক্রীজারী করিতে অথবা তদনুসারে কিছু করিতে অক্ষম ছিলেন। অতএব স্বভাবতঃই উক্ত নীলাম, ঐ রূপ অবস্থায় এবং তমাদী দ্বারা বারিত হইবার পর যাহা কিছু হয় তাহার ন্যায়, অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। এমত অবস্থায়, যাহা কিছু করা হইয়াছে তাহাতে বাদীর স্পষ্টই কোন হানি হয় নাই, সুতরাং প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে তাহার কোন নালিশের কারণ নাই।

বিচারপতি ফিয়ার।—পূর্ব্বে আমার বোধ হইয়াছিল যে, যে ডিক্রীজারী নীলামের সময়ে সিদ্ধ থাকে তাহার জারীতে যে নীলাম হয়, তাহা হইতে, যে ডিক্রীজারী পরে কোন উপযুক্ত আদালত উক্ত নীলামের সময়ে অসিদ্ধ থাকিবার কথা বলেন, তাহার নীলাম বিভিন্ন। যে সকল বিশেষ মোকদ্দমায় এই প্রভেদ করা হইয়াছে, আমি এখানে তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না, কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে, উহার একাধিক মোকদ্দমা আমাদের রিপোর্টে প্রচারিত হইয়াছে। আমি বিচারপতি জ্যাক্সনের রায়ে সম্মত হইলাম। (ব)

---

৯ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং জে, বি, ফিয়ার।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের প্রতিনিধি জজের এস্তমেজাজ।

গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, ডিক্রীদার।

রমজান সরদার এবং অপর এক ব্যক্তি, দায়ী।

চুম্বক।—যদিও ভূমিতে সংলগ্ন ফসল রেজিষ্টরী আইনের অভিপ্রায় সাধনার্থে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি তাহা স্থাবর সম্পত্তির শ্রেণীভুক্ত।

এস্তমেজাজ।—১৮৬৭ সালের ১০ আইনের ১ ধারামতে আমি নিম্নলিখিত প্রশ্ন প্রধানতম বিচারালয়ের মান্যবর বিচারপতিগণের মতের জন্য অর্পণ করিলাম ঃ—

ডিক্রীদার তাহার দায়ীর ৩৮০ বিঘা জমির তিসী এবং ৪।৪ বিঘার অড়হর ক্রোক করিবার দাবীতে, নালিশ করে। প্রশ্ন এই যে, যে ফসল ভূমিতেই সংলগ্ন আছে তাহা ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ১৯ ধারামতে পরসনেল্ বা অস্থাবর সম্পত্তিগণ্য হইতে পারে কি না যে, এই আদালত হইতে তাহা ক্রোকের হুকুম জারী হইতে পারে। প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিয়াছেন যে, এ ধারার পরসনেল্ ও অস্থাবর এই দুই শব্দের একই অর্থ জ্ঞান করিতে হইবে, এবং অস্থাবর সম্পত্তির অর্থে যে সম্পত্তি তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় স্থানান্তরিত হইতে পারে, তাহাই বুঝায়।—(রাজচন্দ্র বসু বনাম ধর্ম্মচন্দ্র বসু, ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টের ৪১৬ পৃষ্ঠা)। যে ফসল

ভূমিতে সংলগ্ন আছে এবং স্থানান্তরিত করিবার পূর্ব্বে কাটিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ইহা খাটে না, এবং বোম্বাই হাইকোর্টের ৫ ম বালুম রিপোর্টের ৯০ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত করিয়া ৪ র্থ বালম মান্দ্রাজ জুরিষ্টের ৪৫৪ পৃষ্ঠায় বোম্বাই হাইকোর্টের যে নিষ্পত্তি প্রচারিত হয় তাহাতে ব্যক্ত যে, " যে " সকল ফসল ভূমি হইতে পৃথক্ করা হয় নাই, " তাহা ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ১৯ ধারার " মর্ম্মান্তগত অস্থাবর সম্পত্তি নহে। ১ লা জুলাই " ১৮৬৮। "

কিন্তু ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ২ ধারায় ভূমিতে সংলগ্ন ফসলও অকর্ত্তিত বৃক্ষ ইত্যাদিকে অস্থাবর সম্পত্তি বলা হইয়াছে। তথাপিও আমার মত এই যে, আমি যে প্রশ্নের প্রস্তাব করিলাম তাহার উত্তরে 'না' বলিতে হইবে, এবং ইহা একটি আবশ্যকীয় প্রশ্ন, এবং সদা-সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া আমি ইহা প্রধানতম বিচারালয়ের মতের জন্য অর্পণ করিলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজের প্রশ্নের উত্তরে আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ভূমিতে সংলগ্ন ফসল স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে নহে, এবং জজ নিজে যে নিষ্পত্তি দর্শাইয়াছেন তাহারই অনুবর্ত্তী হইবেন। এই নিষ্পত্তিতে যে ভাব গৃহীত হইল তাহার পোষকতায় আমি ১৮৬৮ সালের ১ আইনের অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের 'সাধারণ প্রকরণের আইনের' শব্দ দর্শাইতেছি; তাহার ২ ধারার ৫ ম দফায় ব্যক্ত যে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরেলের প্রচারিত যে সকল আইনে স্থাবর সম্পত্তির কথা আছে, তাহাতে এই আইন জারী হইবার পরে, স্থাবর সম্পত্তি শব্দে " ভূমি, ভূমির উপস্বত্ব এবং মৃত্তিকায় " সংলগ্ন অথবা মৃত্তিকায় সংলগ্ন বস্তুতে স্থায়ী " রূপে সংযুক্ত বস্তু বুঝাইবে " এবং ষষ্ঠ দফায় ব্যক্ত আছে যে, " অস্থাবর সম্পত্তি শব্দে " স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত আর যাবতীয় প্রকা-" রের সম্পত্তি বুঝাইবে।" ব্যবস্থাপক সমাজ যদিও রেজিষ্টরী আইনের অভিপ্রায় সাধনার্থে ভূমিতে সংলগ্ন ফসল অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে ধরিয়াছেন, তথাপি তাহা দ্বারা এই মর্ম্মের ব্যতিক্রম হয় না। (ব)

---

৯ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং জে, বি, ফিয়ার।

যশোহরের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

কাজী কয়বতুল্লা, বাদী।

মতি পেশাকর প্রভৃতি, প্রতিবাদিনী।

চুম্বক।—যে ব্যক্তি ফৌজদারী আদালতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া আপীলে খালাস পাইয়া কারাগার হইতে মুক্ত হয়, সে যদি এমত সপ্রমাণ করিতে না পারে যে, ঐ ফৌজদারী অভিযোগের কোন ন্যায্য বা সম্ভাবিত হেতু ছিল না, তবে সে আপন মর্য্যাদার ক্ষতিপূরণের দাবীতে ঐ অভিযোক্তার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে না।

এস্তমেজাজ।—বাদী তাহার আরজীতে বর্ণিত নিম্নলিখিত অবস্থা অনুসারে প্রতিবাদিনীগণের বিরুদ্ধে ৫০ টাকার দাবীতে নালিশ করে ঃ—

" বাদী নিজের মানের হানির প্রসঙ্গে " ৫০ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবীতে এই " নালিশ উপস্থিত করে। প্রথম প্রতিবাদিনী " সাহামতুল্লা খোন্দকারের স্ত্রী, কুমন্ত্রণাকারিণী " প্রতিবাদিনীগণের প্রলোভন এবং কুপরামর্শে " উক্ত খোন্দকারের প্রদত্ত কতিপয় গহনা লইয়া " তাহার বাটী পরিত্যাগ করিয়া ২ নং প্রতি-" বাদিনীর গৃহে বাস করে। তাহাতে উক্ত " খোন্দকার ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া থানায় " নালিশ করে, এবং বাদী তাহার বিরুদ্ধে " সাক্ষ্য দেওয়ায় প্রথম প্রতিবাদিনী আর আর

" প্রতিবাদিনীগণের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া
" বাদী এবং উক্ত সাহামতুল্লার নামে তাহার
" গহনা চুরির দাবীতে গত ৯ ই ডিসেম্বর তারিখে
" এক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে। পরে
" উক্ত মোকদ্দমার বিচারে বাবু শীতলনাথ বসু
" ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ৪ ঠা জানুয়ারি তারিখে
" বাদী এবং সাহামতুল্লাকে ছয় মাস কয়ে-
" দের দণ্ডাজ্ঞা দেন; অতএব তাহাদের উভয়কেই
" জেলে দেওয়া হয়; তথায় ২০ এ জানুয়ারি
" পর্য্যন্ত কষ্ট এবং অসুবিধা ভোগ করিয়া
" তাহারা মাজিস্ট্রেটের নিকট আপীল করে,
" এবং তাঁহার নিষ্পত্তিতে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত
" হওয়ায় তাহারা সেই তারিখে খালাস পায়।
" বাদী তাহার নিজের জাতির মধ্যে মর্য্যাদাপন্ন
" এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, এবং তাহার অনেক
" বাজেআপ্তী তালুক, মৌরসী এবং গাঁতি জমা
" ইত্যাদি আছে, এবং সে সচ্চরিত্র এবং
" ধনাঢ্য ব্যক্তি, এবং তাহার সম্পত্তি হই-
" তেই উপজীবিকা নির্ব্বাহিত হয়; অতএব
" প্রতিবাদিনীগণ বাদীর বিরুদ্ধে চুরির মিথ্যা
" অভিযোগ উপস্থিত করায় বাদীকে মান-
" সিক এবং শারীরিক কষ্ট সহ্য এবং
" জেলের যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছে এবং
" তাহার নিজের মর্য্যাদার হানি হইয়াছে।
" বাদীর মর্য্যাদার ক্ষতিপূরণের দাবী ৫০০
" টাকা হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবাদিনীগণের
" নিকট হইতে তত টাকা আদায় হইবার সম্ভা-
" বনা না থাকায় বাদী তাহার ক্ষতিপূরণের
" নিমিত্ত ৫০ টাকার দাবী করে, এবং তাহা
" প্রমাণ দৃষ্টে মোকদ্দমার খরচা সমেত প্রতি-
" বাদিনীগণের নিকট হইতে আদায় করিয়া দিবার
" প্রার্থনা করে।"

এরূপ মোকদ্দমা ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের ৩ য় বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত কি না, এবং সেই জন্য ছোট আদালতের বিচার্য্য কি না, এতৎসম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের মান্যবর বিচারপতিগণের মত সাপক্ষে আমি এই নালিশের আরজী গ্রহণ করিলাম।

আমি বিবেচনা করি, উক্ত বর্জ্জিত বিধির "পরসনেল্ ইঞ্জুরি" (শারীরিক হানি) শব্দ দ্বয়ের যে অর্থ হইবে তাহারই উপর বিচারাধিকার সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

রবিন্সন সাহেব কৃত আইন-ঘটিত ও অন্যান্য শব্দের অভিধানে "পরসনেল ইঞ্জুরি" শব্দ-দ্বয়ের এই অর্থ আছে, যথা, শারীরিক হানি। গায়ে চোট বা আঘাত। অতএব যদি উল্লি-খিত ধারায় উক্ত শব্দদয় ভারতবর্ষীয় এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে আমি বোধ করি, যেরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাহা নিশ্চয়ই ছোট আদালতের বিচার্য্য এবং শারীরিক হানি শব্দে স্পষ্ট শরীর সম্বন্ধীয় হানি বা শরীরের প্রতি হানি, যথা, আঘাত বা মার-পিট বুঝায়; এবং যাহাতে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের বা কোন ব্যক্তির মর্য্যাদার বা সুখ্যা-তির হানি হয়, বা কোন মোকদ্দমা ব্যতীত কয়েদ রাখাতে যে হানি হয়, তাহা বুঝায় না।

ইংলণ্ডীয় আইন সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলে "শরী-রের প্রতি হানি" শব্দগুলি যেভাবে ব্যব-হৃত হইয়াছে, "পরসনেল্ ইঞ্জুরী" শব্দদ্বয়ও যদি সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে আমি বিবেচনা করি, টাকার ক্ষতি না দর্শা-ইলে মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচার্য্য হয় না; শরীরের প্রতি হানি প্রথমতঃ আঘাত এবং আক্রমণ স্বরূপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক, অথবা অমনোযোগ বা অন্য কিছু হইতে যে ফলোৎপন্ন হয় তাহা হইতেই হউক, শারীরিক অনিষ্ট বুঝায়; দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য বা সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি হানি করা বুঝায়; এবং তৃতীয়তঃ যে হানি দ্বারা শারীরিক স্বাধী-নতার ব্যাঘাত হয় তাহা বুঝায়।

যে স্থলে নালিশের আরজীতে টাকার ক্ষতি হইবার কথা বলা হয় না, তাহাতে কোন

কথিত "শারীরিক হানির" নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের দাবীর নালিশ কোন্ আদালতে হইবে তৎসম্বন্ধে প্রধানতম বিচারালয়ের অনৈক্য নজির সকল দেখা যায়। যে মোকদ্দমা * পার্শ্বে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল, তাহাতে বিচারপতি কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন স্থির করেন যে, বাদীর বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী আদালতে যে মিথ্যা এবং বিদ্বেষমুলক অভিযোগ উপস্থিত হয় তদ্ধেতু ক্ষতিপূরণের দাবী ছোট আদালতের বিচার্য্য নহে; কিন্তু আর যে এক মোকদ্দমা † পার্শ্বে উদ্ধৃত হইল যাহা কেবল গালাগালি বা নিন্দাজনক ভাষা ব্যবহারের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের দাবীতে উপস্থিত হয়, তাহাতে বিচারপতি গ্লবর যদিও বিচারপতি ম্যাকফার্সনের সহিত এই হেতুবাদে আপীল ডিসমিস্ করিতে সম্মত হন যে, বাদী ক্ষতির কোন প্রমাণ ব্যতীত কেবল গালাগালির অর্থাৎ নিন্দাসূচক ভাষা ব্যবহারের নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের হুকুম পাইতে পারে না, তথাপি তিনি বলেন,—"কিন্তু আমি আর এই "বিবেচনা করি যে, পাল্টা আপীলে যে আপত্তি "হইয়াছে যে, ইহা ক্ষতিপূরণের নালিশ বিধায় "ছোট আদালতের আইনের ৬ ধারার অন্তর্গত "হওয়ায় নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে "এই আদালতে খাস আপীল হইতে পারে না; "ইহা সঙ্গত আপত্তি। আমার স্পষ্ট বোধ "হইতেছে যে, উক্ত ধারায় যে "ক্ষতি" শব্দ "আছে, এই প্রকারের মোকদ্দমা তাহারই "অন্তর্গত, কারণ, প্রতিবাদীর অধিক হইলেও "এই করিবার বিষয় বলা হইয়াছে যে, সে "বাদিনীকে গালাগালি দিয়া এক খানা যষ্টি "লইয়া ভয় দেখাইয়াছিল। কেবল "শারী- "রিক অনিষ্টের" নিমিত্ত ক্ষতিপূরণের প্রার্থ- "নাই ৬ ধারার বর্জিত বিধিতে আছে। এ "মোকদ্দমায় আমি বোধ করি, কেবল এক "খানা লাঠী লইয়া ভয় দেখাইলে "শারীরিক "অনিষ্ট" হয় না; অতএব আমার মত এই "যে, এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারা- "ধীন, এবং এ আদালতে তাহার খাস আপীল "চলে না।" এবং ১২ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ৩৭৩ পৃষ্ঠা-প্রচারিত ধর্ম্মদাস কুণ্ড বনাম কৈলাসবাসিনী দাসীর মোকদ্দমায় বিচারপতি মার্কবি এই মত হয় যে, চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করা হেতু ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায় এই অনুমান হওয়া আবশ্যক যে, প্রকৃত অর্থ-ঘটিত ক্ষতি হইয়াছে। অতএব উক্ত মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন; কারণ, তিনি বলেন,—"এ মোকদ্দমায় "প্রথম প্রশ্ন এই যে, অপবাদ করা হেতু "৫০০ টাকার ক্ষতিপূরণের দাবীতে এই মোক- "দ্দমা উপস্থিত হওয়ায় ইহার খাস আপীল "চলিবে কি না? ইতিপূর্ব্বে আমার এবং বিচার- "পতি কেম্পের নিকট দুইটি মোকদ্দমায় অবি- "কল এই রূপ প্রশ্ন উত্থিত হয়, এবং আমরা "তখন মফঃসলের ছোট আদালতের আইনের "৬ ধারার ৩ য় প্রকরণের শব্দ দৃষ্টে স্থির করি "যে, এই প্রকারের মোকদ্দমা কথিত ব্যক্তি "বিশেষের অনিষ্ট সম্বন্ধীয়; এবং এই অনু- "মান করিতে হইবে যে, উক্ত অনিষ্ট হইতে প্রকৃত "অর্থ-ঘটিত হানি হয়, নচেৎ নালিশ উপস্থিতই "হইতে পারে না; অতএব তাহা উক্ত বর্জ্জিত "বিধির অন্তর্গত, অর্থাৎ ছোট আদালতের "বিচারাধিকারের অধীন। ইহার কোন মোক- "দ্দমাতেই কোন নজীর দর্শান হইয়াছিল না; "কিন্তু এক্ষণে আমাদিগকে জানান হইয়াছে "যে, ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১১৪ "পৃষ্ঠায় প্রচারিত এক মোকদ্দমায় ইহার

* প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম নদীয়ার চাঁদ চট্টোপাধ্যায়, ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১১৫ পৃষ্ঠা।

† কুঙ্গবাসী কুঙর বনাম পার্জন সিংহ, ১২ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের দেওয়ানী নিষ্পত্তির ৩৬৯ পৃষ্ঠা।

"বিপরীত সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমি এক্ষণে "বলিতে পারি না যে, আমার মত পরিবর্ত্তিত "হইয়াছে, কারণ, আমরা এ মোকদ্দমার দোষ- "গুণ সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় করিতেছি তাহাতে "এবং এই মোকদ্দমার জন্য উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে "কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা আবশ্যকীয় নহে। "আমি কেবল এই মাত্র বলিতে চাহি যে, "আমি যদি জানিতাম যে, অন্য এক খণ্ডাধি- "বেশন ছোট আদালতের আইনের এই ধারা "সম্বন্ধে অন্য রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তবে "উক্ত দুই মোকদ্দমায় এই বিষয় সম্বন্ধে আমি "যত চিন্তা করিয়াছি তাহা অপেক্ষা আমি "অধিক বিবেচনা করিয়া দেখিতাম।"

বিচারপতি মার্কবি যে অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইবার জন্য আমি স্বীকার করি যে, নালিশের আরজীতে যথেষ্ট বিষয় আছে, কারণ, দেখা যায় যে, বিচার হইয়া অপরাধ সাব্যস্ত এবং তদ্বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে, অতএব বাদী নিশ্চয়ই কারাগার হইতে খালাস পাইবার প্রয়োজনীয় খরচ বাবৎ অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হইয়াছে, এবং দেখা যাইতেছে যে, পার্শ্বলিখিত মোকদ্দমায়* স্থির হয় যে, আইন-বিরুদ্ধ গেপ্তার হেতু অর্থ সম্বন্ধীয় ক্ষতি হইলে সেই ক্ষতি-পূরণের নালিশ ছোট আদালতে হইবে।

* তুলসীরাম বনাম নন্দকিশোর লাল এবং অপর এক ব্যক্তি, ১২ বালম উইক্লি রিপোর্টর দেওয়ানী নিষ্পত্তি ৪৭১ পৃষ্ঠা

১৮৬৭ সালের ১০ আইন মতে আমি আমার মত বলিতে বাধ্য বিধায়, আমার মত এই যে, এই নালিশ ছোট আদালতের বিচারাধীন।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় :—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ মোকদ্দমায় আমার বোধ হইতেছে যে, যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে এবং যাহা ছোট আদালতের জজ আমাদের নিকট অর্পণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই উত্থিত হয় না। বাদীর নিজের মর্য্যাদার যে ক্ষতি করা হয় তৎপূরণার্থে নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, এবং যদিও বলা হইয়াছে যে, বাদীকে মানসিক এবং শারীরিক কষ্ট সহ্য করিতে এবং জেলে যাইতে হইয়াছে, তথাপি সে যাহা পূরণের প্রার্থনা করে তাহা তাহার নিজের মর্য্যাদার হানি স্বরূপে দ্বিগুণ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং উক্ত ক্ষতি তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক এমত এক অভিযোগ হেতু হইবার কথা বলা হইয়াছে যাহা এক্ষণে মিথ্যা বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, যাহার জন্য বাদী যশোহরের জেলার এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক ফৌজদারী অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হয়, জেলে প্রেরিত হয়, এবং মিয়াদ খাটে, কিন্তু পরে আপীলে জেলার মাজিষ্ট্রেট উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত অন্যথা করায়, খালাস পায়।

আমার বোধ হইতেছে যে, যদি এমত বলা এবং সপ্রমাণ করা না হয় যে, বাদীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর উক্ত অভিযোগ করিবার কোন যুক্তিসিদ্ধ এবং সম্ভাবিত কারণ ছিল না, তবে বাদী এরূপ হেতুবাদে কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। নালিশের আরজীতে ঐরূপ কোন কথা বলা হয় নাই। বাস্তবিকই এমত অনুমান করা কঠিন যে, এরূপ কোন কথা বলা যাইতে পারে, অথবা বলা হইলে সমর্থন করা যাইতে পারে, কারণ, এক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট-কর্ত্তৃক অপরাধ সাব্যস্ত হওয়াতেই প্রকাশ যে, বাদীর বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার প্রতি সেই অপরাধ দেওয়ার অবশ্যই কোন না কোন ন্যায্য কারণ ছিল; অতএব নালিশের আরজীতে নালিশের যথেষ্ট কারণ প্রকাশ পায় না। অতএব যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে, যথা, এরূপ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন কি না, তাহা দেখিবার কোন আবশ্যক নাই।

বিচারপতি ফিয়ার ।—আমি সম্মত হইলাম । (ব)

---

৯ ই মার্চ, ১৮৭০

বিচারপতি এল, এস, জ্যাকসন এবং এফ এ গ্লবর ।

বরিষালের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ ।

কেলারাম মাঝি, বাদী ।

নারায়ণ দাস, প্রতিবাদী ।

চুম্বক ।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৫ ধারায় এমত বিধি নাই যে, বাদী যদি ডিক্রী পায়, তবে তখন সেই ডিক্রী সহজে জারী হইবার জন্য, মোকদ্দমার রায় প্রদানের পূর্ব্বে সে প্রতিবাদীকে গেপ্তারের ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া লইতে পারিবে ; কিম্বা উক্ত আইনের ৭৮ ধারা মতে, প্রতিবাদিগণ সাধারণতঃ জামিন দিতে বাধ্য নহে। যে স্থলে আদালতের এই বিশ্বাস হয় যে, প্রতিবাদী বাদীকে এড়াইবার বা গৌণ করাইবার মনস্থে আদালতের বিচারাধিকার পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে, বা আপন সম্পত্তি হস্তান্তর কি স্থানান্তর করিয়াছে, সেই স্থলেই ৭৫ ধারার বিধান খাটে, এবং যে স্থলে প্রতিবাদী জামিন দাখিল বা যথেষ্ট টাকা আমানত না করে, সে স্থলেই ৭৮ ধারা খাটে।

যে স্থলে এই সকল ধারামতে প্রতিবাদীকে জেলে আবদ্ধ করা হয়, সে স্থলে আদালত তাহার জবানবন্দী লওয়ার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করাইতে চাহিলে, ১৮৬৯ সালের ১৫ আইনের বিধান অবলম্বন না করিয়া, প্রতিবাদীকে আদালতে হাজির করণার্থে একেবারে জেলরের উপর হুকুম জারী করিলেই হইতে পারে।

এস্তমেজাজ ।—বাদী এ মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর নামে এক খতের পাওয়ানার দাবীতে নালিশ করে, এবং সে ডিক্রী পাইলে সহজে তাহা জারী হইবার জন্য, রায় প্রদানের পূর্ব্বে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৫ ধারামতে গেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া লয়। প্রতিবাদী দীনাবস্থা নিবন্ধন আইনের বিধানমতে জামিন দিতে অসমর্থ হওয়ায় ৭৮ ধারামতে তাহাকে জেলে আবদ্ধ করা হয়। তদনন্তর, সমনের লিখিত নির্দ্ধারিত দিবসে মোকদ্দমার বিচার হয়, কিন্তু প্রতিবাদী জেলে আবদ্ধ থাকায় জওয়াব দিবার জন্য স্বয়ং বা উকীল দ্বারা উপস্থিত হইতে পারে না। আদালত যথার্থ নিষ্পত্তি করণার্থে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৪২ ধারা এবং হাইকোর্টের ১৮৫৯ সালের ২৯এ জুলাই তারিখের ২৩ নং সরকুল্যর অর্ডরের ২৬ দফা অনুসারে প্রতিবাদীর নিজের জবানবন্দীর জন্য এবং তাহাকে বিপক্ষের প্রতিবাদ করিতে আদালতে উপস্থিত হইবার সুযোগ প্রদানার্থে মোকদ্দমা স্থগিত রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৫ আইনের বিধানমতে আসামীকে আদালতে উপস্থিত করিতে জেলরের প্রতি এক হুকুম প্রচার করেন, এবং তাহাতে স্বাক্ষর করাইবার জন্য তাহা জেলার জজের নিকট পাঠান; কিন্তু উক্ত আইনমতে জেলার জজের যে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে, তদনুসারে তিনি তাহা স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন। তদনন্তর উক্ত মোকদ্দমায় রায় দিবার পূর্ব্বে যে সকল অবস্থায় প্রতিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করাইবার আবশ্যক হয়, তাহা তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার স্বাক্ষরের নিমিত্ত আবার প্রার্থনা করা হয়। তাহা আরো একবার পাঠান হয়, কিন্তু জজ প্রত্যেকবারেই উক্ত আদালতের প্রার্থনায় সম্মতি দিতে অস্বীকার করেন, এবং মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১১ ধারামতে একতরফা নিষ্পত্তি করিতে প্রকারান্তরে বলেন।

আদালত তথাপি জেলার জজের প্রদর্শিত পথে চলিতে সন্দেহ বোধ করেন, কারণ, এ প্রকারে সর্ব্বদা কার্য্য করা হইলে তাঁহার বিবেচনায়, সাধারণতঃ অর্থহীন প্রতিবাদিগণের সম্বন্ধে নিতান্ত অনিষ্টকর হইবে ; তাহাদিগকে অনায়াসে জেলে দেওয়া হইতে পারিবে, এবং তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা যে পর্য্যন্ত তাহাদের

জওয়াব ব্যতীত নিষ্পন্ন এবং ডিক্রীজারী না হইবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে জেলে রাখা হইবে। অতএব আদালতের বিবেচনায়, দুষ্ট-মতি বাদিগণের নিমিত্ত অত্যাচারের এক দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিবে, এবং তাহারা দলে দলে আসিয়া তাহাদের দুর্ভাগা বিপক্ষগণকে হাজতে দিতে প্রার্থনা করিবে, সুতরাং তাহাদিগের দুষ্টাভিসন্ধি সহজেই সম্পন্ন হইবে।

যে হুকুম জেলার জজের স্বাক্ষরার্থে তাঁহার নিকট পাঠান হয় তাহা তিনি এই হেতুবাদে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন যে, ১৮৬৯ সালের ১৫ আইনে কেবল সাক্ষিগণের উপস্থিত হইবার কথা বলা হইয়াছে, প্রতিবাদিগণের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু উক্ত আইনের ভূমিকার শব্দগুলিতে সহজে প্রমাণ গ্রহণ করিবার এবং আসামীগণকে আদালতে উপস্থিত করাইবার এবং তাহাদের উপর হুকুমনামা জারী করিবার স্পষ্ট বিধান আছে। উক্ত ভূমিকায় ব্যবস্থাপক সমাজের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত, তাহা আমার বোধ হয় পক্ষগণের এবং সাক্ষিগণের উপস্থিত করণ সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়, এবং বিশেষ কোন বিধান না থাকায় কেবল সাক্ষিগণের প্রতি প্রয়োগ হয় না।

জেলার জজের নিকট যে সকল পত্র পাঠান হয় এবং যে সকল হুকুম স্বাক্ষরার্থে অর্পণ করা হয়, তাহা তাঁহার আদেশ সমস্তের সহিত এই সঙ্গে পাঠান গেল।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—ইহা এক অদ্ভুত প্রকারের এক্তমেজাজ। প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে তমঃ-সুকের পাওয়ানার দাবীতে নালিশ হয়, এবং তাহাতে বরিষালের ছোট আদালতের জজ বলেন যে, "বাদী ডিক্রী পাইলে সহজে তাহা জারী " হইবার জন্য, রায় প্রদানের পূর্ব্বে ১৮৫৯ সালের " ৮ আইনের ৭৫ ধারামতে গ্রেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট " বাহির করিয়া লয়। প্রতিবাদী দীনাবন্ধু " নিবন্ধন আইনের বিধানমতে জামিন দিতে " অসমর্থ হওয়ায় ৭৮ ধরামতে তাহাকে জেলে " আবদ্ধ করা হয়।"

আমি বোধ করি, জজ এ মোকদ্দমায় স্পষ্ট-রূপে ইংরেজী ভাষায় আপন ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, কারণ, ৮ আইনের ৭৫ ধারায় এমত বিধিবদ্ধ হয় নাই যে, বাদিগণ ডিক্রী পাইলে সেই ডিক্রী অনায়াসে জারী হইবার জন্য, রায় দিবার পূর্ব্বে তাহারা গ্রেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া লইতে পারিবে, অথবা উক্ত বিধির ৭৮ ধারা অনুসারেও প্রতিবাদিগণ সাধারণতঃ জামিন দিতে বাধ্য নহে। ৭৪ ধারামতে দরখাস্ত হইলে দরখাস্তকারীর জবানবন্দী লইয়া এবং আর যে কোন তদন্ত করা আবশ্যকীয় বোধ হয়, তাহা করিয়া আদালতের যদি এই মত হয় যে, এরূপ বিশ্বাসের সম্ভাবনীয় কারণ আছে যে, প্রতিবাদী বাদীকে এড়াইবার বা গৌণ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বিচারাধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, বা সে ডিক্রীজারীর প্রতি বাধা জন্মাইবার বা তাহার গৌণ করাইবার অভিপ্রায়ে তাহার সম্পত্তি বা তাহার কোন অংশ হস্তান্তর বা উক্ত আদালতের বিচারাধিকার হইতে স্থানান্তর করিয়াছে, তবে আদালত ৭৫ ধারামতে ঐ ব্যক্তিকে এই কারণ দেখাইবার জন্য আদালতে উপস্থিত করিতে উপযুক্ত কর্ম্মচারীর নিকট ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন যে, কেন সে তাহার হাজিরীর জন্য উত্তম এবং যথেষ্ট জামিন দিবে না; এবং প্রতিবাদী জামিন বা যথেষ্ট টাকা আমানত না করিলে ৭৮ ধারা অনুসারে তাহাকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত অথবা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হইলে, আদালত হুকুম করিলে ডিক্রীজারী পর্য্যন্ত আবদ্ধ রাখা যাইতে পারে।

যাহা হউক, প্রতিবাদীকে তদনুসারে জেলে দেওয়া হয়। তাহাতে মোকদ্দমা চলিতে থাকে এবং শ্রবণের তারিখ উপস্থিত হয়। পরে বোধ

হয় জজের এই বিবেচনা হয় যে, প্রতিবাদী জেলে থাকায় উচিত রূপে মোকদ্দমার জওয়াব দিতে অসমর্থ হইতে পারে। অতএব তিনি প্রতিবাদীকে আদালতে উপস্থিত করিতে মনস্থ করেন, এবং তিনি মনে করেন যে, তাহা কেবল ১৮৬৯ সালের ১৫ আইনের বিধান অনুসারেই করা যাইতে পারে, এবং সেই জন্য তিনি জেলরের উপর এক হুকুম লিখিয়া জেলার জজের নিকট স্বাক্ষরার্থে পাঠান।

জজ এ মোকদ্দমায় ছোট আদালতকে উচিত পথ না দর্শাইয়া, প্রতিবাদীর সাক্ষ্য এ মোকদ্দমায় আবশ্যকীয় কি না, তৎসম্বন্ধে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হন, এবং প্রতিবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণের আবশ্যক নাই, এই মত হওয়ায় তিনি উক্ত হুকুমে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়া তাহা ছোট আদালতে ফেরৎ পাঠান।

তাহাতে ছোট আদালতের জজ এই বলিয়া উক্ত আইনের ১৫ ধারা অনুসারে প্রতিবাদীর উপর সমন জারী করিবার হুকুম দেন যে, ঐ ধারামতে প্রতিবাদীর উপর সমন জারী না হইলে, তাহার হাজির হওয়া অসম্ভব হইবে কি না, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিবেন না; তিনি বলেন যে, তাহার পর অন্য হুকুম দেওয়া যাইবে।

তাহাতে ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক জজকে এক পত্র লিখিয়া জানান যে, প্রতিবাদীর উপর ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৪১ ধারামতে সমন এবং সেই আইনের ২৪ ধারা * মতে ওয়ারেণ্ট জারী করা হইয়াছিল, এবং উক্ত আইনের ৭৮ ধারা অনুসারে জামিন দিতে না পারায় প্রতিবাদীকে কয়েদ করা হইয়াছে। তাহাতে ছোট আদালত জজের নিকট আর এক প্রার্থনা করেন, এবং আবার এই অনুরোধ করেন যে, জজ প্রতিবাদীকে জেল হইতে হাজির করার হুকুম স্বাক্ষর করিবেন। জজ আবার নিম্নলিখিত শব্দে অস্বীকার করেন, যথা, "যে সকল "স্থলে প্রতিবাদী স্বয়ং বা উকীল দ্বারা হাজির "হয় না, তাহাতে স্বতন্ত্র ক্ষমতা আছে" (দ্রষ্টব্য "১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১১ ধারা)। "১২৫ ধারায় এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, আদা- "লত মোকদ্দমার কোন পক্ষের বা তাহার "উকীলের জবানবন্দী লইতে পারেন, উক্ত "জবানবন্দী লওয়া তাঁহার স্বেচ্ছাধীন। ১৮৫৯ "সালের উল্লিখিত সরক্যুলর অর্ডর ১৮৫৯ সালের "৮ আইন জারী হইবার পূর্ব্বে বাহির হয়। "প্রতিবাদীকে জেল হইতে তলব করিবার আব- "শ্যক নাই, অতএব এই আদালত এ হুকুম "স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন।" অতএব সপষ্টই জেলার জজ বিবেচনা করেন যে, কোন মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ডিক্রী দিবার পূর্ব্বে তাহার তাহাতে জওয়াব দিবার কোন আবশ্যক রাখে না; এবং তাহাতে ছোট আদালতের জজ এমত অবস্থায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে রায় দিতে স্বভাবতঃ অনিচ্ছুক হইয়া এই আদালতের হুকুমের জন্য দরখাস্ত করেন।

এ মোকদ্দমার প্রতিবাদী দণ্ডপ্রাপ্ত আসামী নহে, বাদীর নালিশের জওয়াব দিবার জন্য ছোট আদালতের ওয়ারেণ্ট অনুসারে দেওয়ানী জেলে তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। আমার অতি সপষ্ট বোধ হইতেছে যে, এমত অবস্থায় ১৮৬৯ সালের ১৫ আইনের বিধান অবলম্বন করিবার কোন আবশ্যক ছিল না, জজের জেলরের প্রতি আসামীকে তাঁহার নিকট হাজির করিবার হুকুম দিলেই হইত। কেন এরূপ অবস্থায় এমত চিঠী পত্র লেখালেখি হয়, কেন জজ ছোট আদালতের হুকুমে স্বাক্ষর করিতে বা যে যথার্থ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দিতে অস্বীকার করেন, তাহা বুঝা যায় না। আমি বিবেচনা করি, ছোট আদালতের জজের পত্রের উত্তরে আমাদিগকে এই হুকুম দিতে

* উক্ত পত্রে এই বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয় ৭৫ ধারাই মনে করা হইয়াছে।

হইবে যে, যে আসামীকে তাঁহার পূর্ব্ব ওয়ারেণ্ট অনুসারে কয়েদ করা হয়, তাহার জওয়াব দিবার জন্য বা উপযুক্ত উকীল নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে তিনি জেলরের উপর ওয়ারেণ্ট জারী করিবেন।

আমরা ইহাও আদেশ করিতেছি যে, এই মোকদ্দমা যত শীঘ্র হয় নিষ্পত্তি করিতে হইবে; এবং যে প্রণালীতে কার্য্য হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি বিবেচনা করি যে, এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবামাত্রেই এই আদালতে উক্ত কাগজাত পরিদর্শনার্থে পাঠাইতে হইবে। আর এই রায়ের এক নকল বাকরগঞ্জের জজের নিকট যাইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

১১ ই মার্চ ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২২৩৭ নং মোকদ্দমা।

পাটনার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২০ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২২ এ জুনে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

নেহালুন্নেছা ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) আপেলাণ্ট।

ধমুলাল চৌধুরী ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং, সি, গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

মুন্সী মহম্মদ উইছফ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন পাট্টা-দাতা তাহার পাট্টা-গৃহীতাকে দর-পাট্টা দিতে ক্ষমতা দেয়, তবে দর-পাট্টা-গৃহীতা উপরোক্ত পাট্টা-দাতা ও পাট্টা-গৃহীতার বিরুদ্ধে যে স্বত্ব পায় তাহা তাহার নিজের সম্মতি ভিন্ন বিলুপ্ত হইতে পারে না। পাট্টা-গৃহীতা তাহার জমা ইস্তাফা করিলেও দর-পাট্টা-গৃহীতার স্বত্বের হানি হইতে পারে না।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমি বিবেচনা করি, জজ এই রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বকসীর নিকট কটকিনাদার যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা সে ইচ্ছা-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করে নাই, এবং প্রথম আদালতও মোকদ্দমা অতি সাবধানে পর্য্যালোচনা করত তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জজ ভ্রমাত্মক রূপে বিবেচনা করিয়াছেন যে, আইনমতে, বকসী তাহার জমা ইস্তাফা করাতেই রেস্পণ্ডেণ্টের স্বত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, অতএব বক্সীর ইস্তাফার পরে বাদী দ্বিতীয় প্রতিবাদীর জমা স্বীকার করিয়াছে কি না, তাহা তিনি তদন্ত করিতে আপনাকে বাধ্য বিবেচনা করিয়াছেন; কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, তাহার কোন আবশ্যক ছিল না। যে স্থলে বাদী বক্সীকে তাহার পাট্টায় দর-পাট্টা দিতে ক্ষমতা দিয়াছিল, এবং বক্সীও তদনুযায়ী দর-পাট্টা দিয়াছিল, সে স্থলে দর-পাট্টাদার দুই জনের বিরুদ্ধেই যে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তাহার নিজের সম্মতি ভিন্ন বিলুপ্ত হইতে পারে না। বক্সীর ইস্তাফায় তাহার ক্ষতি হইতে পারে না। অতএব আমাদের রায় এই যে, বাদী পশ্চাতে দ্বিতীয় প্রতিবাদীর স্বত্ব স্বীকার করিয়াছে কি না, সেই কথা পরিত্যাগ করিয়া, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল।

(গ)

১১ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

আহম্মদ রেজা, প্রার্থী

মৃত এনাএত হোসেনের স্থলাভিষিক্ত খজুরন্নেছার নাবালগ পুত্রের পক্ষে খজুরন্নেছা, ও অন্যান্য, প্রতিপক্ষ।

মেং জি, সি পল বারিষ্টর ও সি গ্রেগরি
প্রার্থীর উকীল।

মেং জে ডবলিউ বি মণি বারিষ্টর ও আর
ই টুইডেল প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—বিচারাদিষ্ট দায়ী এই হেতুবাদে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর নীলাম ক্ষান্ত থাকার জন্য প্রার্থনা করে যে, ঐ নীলামের জন্য যে দিন অবধারিত হইয়াছে তাহা রাজস্ব দেওয়ার অবধারিত দিবসের এত নিকট যে, সেই দিবসে নীলাম হইলে তাহার বিস্তর ক্ষতি হওয়ার সম্ভব।

ইহা নীলাম ক্ষান্ত রাখার জন্য যথেষ্ট ও উৎকৃষ্ট হেতু নহে।

বিচারপতি বেলি।—আমি বিবেচনা করি, এই দরখাস্ত খরচা সমেত ডিসমিস্ হইবে।

এই দরখাস্তে সত্যতা পাঠ লেখা হয় নাই অথবা ইহা এফিডেবিট অর্থাৎ হলফান এজহারের দ্বারাও প্রতিপোষিত হয় নাই। সত্যতা লেখা সম্বন্ধে প্রার্থীর পক্ষে মেং পল কর্তৃক কথিত হইয়াছে যে, তিনি প্রায় দশ দিবস পূর্ব্বে প্রতিপক্ষের উকীল মেং টুইডেলকে ঐ দরখাস্ত দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রার্থী তাহাতে সত্যতা পাঠ লেখে নাই বলিয়া তিনি কোন আপত্তি করেন নাই। প্রতিপক্ষের এই ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া যে, মেং টুইডেলের কর্ত্তব্য ছিল অথবা মেং টুইডেল যে প্রথমে এই ত্রুটির কথা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই।

যে নীলাম আগামী ২১ এ মার্চ তারিখে হওয়া স্থির হইয়াছে তাহা ক্ষান্ত রাখার জন্যই এই দরখাস্ত হইয়াছে। যে সমস্ত হেতু উত্থাপিত হইয়াছে তাহা এই যে, প্রথমতঃ, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল হইয়াছে, এবং সেই আপীলের হেতু অতি উৎকৃষ্ট; দ্বিতীয় হেতু এই যে, এই আদালতের বিচারপতি লক ও গ্লবর ১৮৬৮ সালের ১৩ ই আগষ্ট তারিখে যে পুনঃপ্রেরণের হুকুম দেন তাহাতে ওয়াশীলাৎ হইতে কতিপয় দরবার-খরচ বাদ দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তাহা বাদ দেওয়া হয় নাই, এবং তৃতীয় হেতু এই যে, ২৮ এ মার্চ সরকারী রাজস্ব দেওয়ার শেষ দিবস, অতএব ২১ এ তারিখে নীলাম হইলে ঐ রাজস্ব দেওয়ার জন্য খাজানা আদায় হইতে পারিবে না, সুতরাং প্রার্থীর বিস্তর ক্ষতি হইবে।

প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, আইনের এক প্রসিদ্ধ যুক্তি এই যে, নিম্ন আদালতের রায় যে পর্য্যন্ত ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ না হয় অথবা তাহা দেখিবামাত্রই ভ্রমাত্মক বোধ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা বিশুদ্ধ বলিয়াই অনুমান করিয়া লইতে হইবে; কিন্তু ঐ রূপ কিছুই আমাদিগকে দেখান হয় নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আমি বলি যে, বিচারপতি লক ও গ্লবরের পুনঃপ্রেরণের হুকুমানুযায়ী দরবারখরচ যে বাদ দেওয়া হয় নাই, এমত দরখাস্তে প্রদর্শিত হয় নাই। এই আপত্তির পোষকতায় কোন ইসমনবিসী অথবা অন্য দলীল উপস্থিত করা হয় নাই।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, ২৮ এ মার্চ তারিখে ৭২০০০ টাকা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে হইবে, সুতরাং নীলাম ক্ষান্ত না রাখিলে প্রার্থীর বিস্তর ক্ষতি হইবে। মেং পল তাঁহার সওয়াল-জওয়াবে এই আপত্তি অনেক বাহুল্যরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দরখাস্তে এমন কোন কথা লেখা নাই যে, প্রার্থী এই কারণে তাহার দেয় রাজস্ব দিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ আপত্তি তাহার শরীক ডিক্রীদারের সম্বন্ধেও তুল্যরূপে খাটিতে পারে, কারণ, তাহারও ঐ সময়ে রাজস্ব বাবতে তত্তুল্য বরং ততোধিক টাকা দিতে হইবে।

অপিচ, ডিক্রীজারীর নীলাম ২১ এ মার্চ তারিখে হইলে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের জন্য প্রার্থী দায়ী হইবে কি না, বা কি পরিমাণে হইবে

তাহা সন্দেহের স্থল ; কিন্তু সে যাহা হউক, আমি বিবেচনা করি যে, প্রার্থী যে গবর্ণমেণ্টের ৭২০০০ টাকা পরিশোধ করিতে পারিবে না অথবা তাহার এমন বিশেষ ক্ষতি হইবে যে, আইনমতে ডিক্রীদারের বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি নীলাম করিয়া আপন পাওনা আদায় করিয়া লওয়ার প্রতি আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি, এরূপ কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

পরন্তু, যদি আমরা এইক্ষণে এই যুক্তি গ্রহণ করি যে, ডিক্রীজারীর নীলামের তারিখ রাজস্ব দেওয়ার তারিখের নিকট হইলে, রাজস্ব দেওয়ার অসুবিধা ডিক্রীজারীর নীলাম স্থগিত রাখার এক উৎকৃষ্ট হেতু হয়, তবে যখন এই আপত্তি উত্থিত হইবে যে, কিয়ৎকাল পরেই প্রার্থীর রাজস্বের জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনেক টাকা দিতে হইবে, তখনও আমরা ডিক্রীজারীর নীলাম ক্ষান্ত রাখিতে অস্বীকার করিতে পারিব না।

এতদ্ভিন্ন, আমার প্রধান সন্দেহ এই যে, এই মোকদ্দমার অবস্থা সমস্তে, ডিক্রীজারী ক্ষান্ত রাখার জন্য ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারার মর্ম্মান্তর্গত এমন "যথেষ্ট হেতু" ব্যক্ত আছে কি না, যদ্দ্বারা ইহা ঐ ধারার প্রথমভাগের বর্জ্জিত বিধানের মধ্যে আসিতে পারে। সেই ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, "কোন ডিক্রীর "উপর আপীল হইয়াছে, কেবল এই কারণে "ডিক্রীজারী স্থগিত হইবে না। কিন্তু উপযুক্ত "কারণ দর্শান গেলে আপীল-আদালত ডিক্রী- "জারী স্থগিত হইবার হুকুম করিতে পারিবেন।" অতএব ঐ ধারার বিধান এই যে, নীলাম হওয়াই নিয়ম, কিন্তু আদালত ইচ্ছা করিলে ঐ ডিক্রী জারী ক্ষান্ত রাখিতে পারিবেন এবং প্রত্যেক মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে বিচার করত আদালতের সেই ইচ্ছাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে হইবে।

মেং পল তর্ক করেন যে, ডিক্রীদার প্রথমে ২৫০০০০ টাকার দাবী করে, তাহার পরে সে তাহা ন্যূন করিয়া ১৩৬,০০০ টাকার এবং এই ক্ষণে সে ৯৪০০০ টাকার দাবী করিয়াছে, এবং তিনি বলেন যে, আর একবার ডিক্রীজারী ক্ষান্ত রাখিলেই তাহার দাবী আরও কিছু ন্যূন হইতে পারে, কিন্তু এই তর্ক প্রতিপক্ষের দিকেও খাটিতে পারে, কারণ, দেখা যাইতেছে যে, কেবল ৪৪০০০ টাকার জন্য এই আদালতে আপীল হইয়াছে ; অতএব প্রার্থী যে টাকার বিরুদ্ধে অর্থাৎ বাকী ৫০০০০ টাকার বিরুদ্ধে আপীল করে নাই, সুতরাং যাহা সে তাহার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিবেচনা করিয়াছে, তাহা তাহার ডিক্রীদারকে দেওয়া উচিত ছিল। অপিচ, ডিক্রীদারের অনুকূলে বলা হইয়াছে যে, সে প্রথমে যে টাকার দাবী করিয়াছিল তাহা যদিও সে পরে অনেক ন্যূন করিয়াছে, তথাপি ১৮৫৮ সালের মার্চ মাস অবধি তাহার ওয়াশীলাতের ডিক্রী ছিল, কিন্তু এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৮৭০ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত তাহার কিছুই পরিশোধিত হয় নাই।

মেং পল তর্ক করিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমার বিলম্ব ডিক্রীদার নিজে নিম্ন আদালতের কর্ম্মচারী ও জজকে ওয়াশীলাৎ নির্ণয় করার জন্য প্রতারণা পূর্ব্বক ইজারার লভ্য ধরিতে না দিয়া ইজারার জমা ধরিতে দেওয়াতেই হইয়াছে। আদালতের কর্ম্মচারী কেবল আদালতের হুকুম প্রতিপালন করিতে পারে, এবং ঐ কর্ম্মচারীর হিসাব জজের দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহার দায় ডিক্রীদারের উপরে ছিল না। আমি ইহা স্বীকার করি যে, ডিক্রীদারের কার্য্য কোন রূপে প্রতারণা-মূলক প্রদর্শিত হইলে তাহা নীলাম ক্ষান্ত রাখার যথেষ্ট হেতু হইত ; কিন্তু মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে আমি আদালতের কর্ম্মচারীর অথবা ডিক্রীদারের কোন প্রতারণা দেখি না, এবং ডিক্রীর নীলামের তারিখ গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের শেষ দিবসের নিকটে অবধারিত হইয়াছে বলিয়া নীলাম ক্ষান্ত রাখার যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হয় নাই।

এমত অবস্থায়, আমি বিবেচনা করি যে, ডিক্রী জারী ক্ষান্ত রাখার জন্য এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্তে ৩৩৮ ধারার মর্ম্মান্তর্গত "যথেষ্ট হেতু" প্রদর্শিত হয় নাই; অতএব আমি এই দরখাস্ত খরচা সমেত অগ্রাহ্য করিলাম। (গ)

---

১৯ এ মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস ব্যারণেট।

১৮৬৯ সালের ২১৫ নং মোকদ্দমা।

সাহাবাদের জজের ১৮৬৯ সালের ৬ ই আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

ছত্রলাল সিংহ প্রভৃতি (প্রতিবাদিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

সেবকরাম (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র চৌধুরী আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জি সি পল বারিষ্টর ও বাবু অমরনাথ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টরের নিকট এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে, অপর এক ব্যক্তি তাহার দায়াধিকারী, এবং প্রার্থনা করে যে, তাহার নামের পরিবর্ত্তে তাহার সম্পত্তির মালিক স্বরূপে ঐ অপর ব্যক্তির নাম কালেক্টরীর তৌজীতে লেখা হউক, তবে ঐ দরখাস্ত দান-পত্রের স্বরূপ গণ্য হইবে।

যদি এই দরখাস্তের এমন অর্থ হয় যে, তদ্দ্বারা সম্পত্তি পুত্রের বিধবা স্ত্রীকে এককালে দান করা হইয়াছে, এবং দান-গৃহীতা যদি তাহা দখল করিয়া থাকে, তবে, হস্তান্তর করার নিষেধ না থাকায়, হিন্দুশাস্ত্রের কোন ব্যবস্থা বা কোন প্রথা দ্বারা ঐ বিধবা তাহা হস্তান্তর করণে নিবারিত নহে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—পক্ষগণের কথা বর্ণনা করার পূর্ব্বে, যে বংশাবলী দুই পক্ষই বিশুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং যাহাতে, যে পরিবার হইতে বিরোধীয় সম্পত্তি আসিয়াছে, নালিশ উপস্থিত হওয়ার কালে ও তৎপূর্ব্বে তাহাদের কি অবস্থা ছিল তাহা দৃষ্ট হইবে, তাহার বর্ণনা করা উচিত। রায় হরিনারায়ণ মুল ধনী ছিলেন। কালিকাপ্রসাদ নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল; এই ব্যক্তি রাণী ধনকুঙর নাম্নী এক বিধবা স্ত্রী ও মসম্মত সীতাবু ও মসম্মত দুলারু নাম্নী দুই কন্যা রাখিয়া আপন পিতার পূর্ব্বে লোকান্তর গমন করে। হরিনারায়ণের পরে মসম্মত দুলারু সেবকরাম নামক এক পুত্র যিনি এই মোকদ্দমায় বাদী, তাঁহাকে রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। কালিকাপ্রসাদের বিধবা স্ত্রী রাণী ধনকুঙর এই নালিশ উপস্থিত হওয়ার সময়ে জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই আপীল হওয়ার পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সেবকরাম যে বংশোদ্ভূত, তাহার ঐ অবস্থা। এই ক্ষণে এই আপীলের আপেলাণ্ট প্রতিবাদী চৌধুরী ছত্রলাল সিংহ, বাবু মোহিতনারায়ণ সিংহ ও ফতে নারায়ণ সিংহের কি অবস্থা ছিল তাহাও বর্ণন করা আবশ্যক। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহারা মুল্য প্রদান করিয়া উক্ত রাণী ধনকুঙরের নিকট ১২৬০ সালে বিরোধীয় সম্পত্তি বাস্তবিক ক্রয় করে, এবং তাহারা তাহাদের ক্রয়ের পরে একাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিরোধে দখীলকার ও ভোগবান আছে, এবং এই নালিশ ১৮৬৫ সালের ২৯ এ এপ্রিল মোতাবেক ১২৭৫ সালে উপস্থিত হয়। আরজীতে তাহার পরে লেখা আছে যে, প্রতিবাদিগণের নিকট যখন ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হয়, তখন বাদী নাবালগ ছিল এবং সে ফসলী ১২৭২ সালের ১১ ই জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ১৮৬৫ সালের ২১ এ মে তারিখে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব বাদীর নালিশের হেতু সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছে।

আরজীতে তদনন্তর লেখা আছে যে, রায়

হরিনারায়ণ বিরোধীয় সম্পত্তি রাখিয়া ১৮৪৮ সালে লোকান্তর গমন করেন, এবং নথীর ১৮৩০ সালের ১৬ ই এপ্রিল ও ১৬ ই আগষ্টের দরখাস্ত মতে, সম্পত্তির উপস্বত্ব যাবজ্জীবন ভোগ করার সর্ত্তে রাণী ধনকুওর, রায় হরিনারায়ণের সমুদায় স্থাবরঅস্থাবর সম্পত্তির দখীলকার হন। এবং বাদী উক্ত দরখাস্তের মর্ম্মানুসারে রায় হরিনারায়ণের সম্পত্তির ভাবী দায়াধিকারী ছিল এবং প্রতিবাদিনী অর্থাৎ রাণী ধনকুওরের ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর এবং অপচয় করার কোন ক্ষমতা ছিল না; এবং হস্তান্তর করারও কোন আবশ্যক ছিল না, অতএব বিক্রেতা রাণী ধনকুওর সম্পত্তি এই প্রকার হস্তান্তর করিয়া অন্যায় ও স্বক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিয়াছেন, অতএব বাদীর প্রার্থনা এই যে, প্রতিবাদী অর্থাৎ উপস্থিত আপেলাণ্টদিগকে যে বিক্রয়-কবালা লিখিয়া দেওয়া হয়, তাহা অন্যথা করত বিরোধীয় সম্পত্তিতে বাদীর ভাবী দায়াধিকারিত্ব স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রী প্রদত্ত হয়।

প্রতিবাদিগণের বর্ণনা-পত্রের সারভাগ এই, যথা, তাহাদের প্রথম জওয়াব এই যে, আরজী বহু মোকদ্দমা-জড়িত বিধায় অপকৃষ্ট। তাহাদের দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, এই নালিশ উপস্থিত করার কালে বাদীর ২৩ বৎসর বয়ঃক্রম ছিল, অতএব তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তিন বৎসরের মধ্যে সে নালিশ উপস্থিত করিতে ত্রুটি করিয়াছে, সুতরাং তাহার দরখাস্ত তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে। তাহাদের তৃতীয় জওয়াব এই যে, যে স্থলে রায় কালিকাপ্রসাদ আপন পিতা হরিনারায়ণের জীবদ্দশায় লোকান্তরগত হয়, সে স্থলে রায় হরিনারায়ণের সম্পত্তিতে রাণী ধনকুওরের অথবা বাদীর দায়াধিকারী সুত্রে কোন স্বত্ব ছিল না। তাহাদের চতুর্থ জওয়াব এই যে, বাদী যে দরখাস্তের উপরে নির্ভর করে, তদনুসারে রায় হরিনারায়ণ আপন জীবদ্দশায় বিক্রীত সম্পত্তি প্রতিবাদিগণের বিক্রেতা ধনকুওরকে দান করিয়াছিলেন; ঐ দরখাস্ত অনুযায়ী উক্ত রাণী ঐ সম্পত্তির সম্পূর্ণ মালিক হইয়াছিলেন, অতএব প্রতিবাদিগণের নিকট তাঁহার তাহা বিক্রয় করার ক্ষমতা ছিল। তাহাদের শেষ জওয়াব এই যে, রাণী ধনকুওর আইন-সঙ্গত প্রয়োজনের নিমিত্ত অর্থাৎ পৈতৃক ঋণ পরিশোধার্থে ও তীর্থযাত্রার এবং অন্যান্য ব্যয় নির্ব্বাহ করার জন্য তাহাদের নিকট উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন, এবং তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তদন্ত করিয়া এবং সম্পূর্ণ মূল্য দিয়া সরলান্তঃকরণে তাহা ক্রয় করিয়াছে।

পক্ষগণের মধ্যে এইক্ষণে যে সকল ইস্যু আছে তাহার বিচারের জন্য পথ পরিষ্কার করার নিমিত্ত আমাদের ইহা বলা আবশ্যক যে, প্রতিবাদিগণ এইক্ষণে বহু মোকদ্দমা জড়িত হওয়ার আপত্তি করে না, এবং জজ যে দুই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে তাহারা আমাদের নিকট আপীল করে নাই; জজের সেই দুই নির্দ্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দ্দেশ এই যে, পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করার জন্য অথবা আইন-সঙ্গত প্রয়োজনে ব্যয় করার জন্য সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার বিন্দু মাত্রও প্রমাণ নাই; এবং দ্বিতীয় নির্দ্দেশ এই যে, ঐ হস্তান্তরের জন্য সঙ্গত প্রয়োজন ছিল কি না, তাহা অবগত হওয়ার জন্য প্রতিবাদিগণ উচিত সতর্কতার সহিত কার্য্য করে নাই। অতএব এই সকল কথা যাহা নিম্ন আদালতে বিচার্য্য ইস্যু ছিল, তাহা আর এইক্ষণে বিচার্য্য না থাকাতে কেবল দুই কথার বিচারের আবশ্যক। প্রথম কথা এই যে, নালিশ তমাদীর আইনের (১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১১ ধারার) দ্বারা বারিত কি না; এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, রায় হরিনারায়ণ যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা রাণী ধনকুওরকে বিরোধীয় সম্পত্তি এমন সম্পূর্ণ রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল কি না, যদ্দ্বারা তিনি তাহা হস্তান্তর করিতে পারেন; ঐ দরখাস্তের

দ্বারা রাণী ধনকুঙরকে কেবল উল্লিখিত সম্পত্তিতে আজীবন-স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার ঐ সকল সম্পত্তি হস্তান্তর করার কোন বিধিমত ক্ষমতা ছিল না।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমরা জজের সহিত ঐক্য হইয়া বলিতেছি যে, বাদী যে ১২৫৪ সালের ১০ ই জ্যৈষ্ঠ তারিখেই জন্মিয়াছিল, সুতরাং উচিত সময়ের মধ্যেই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা সে সপ্রমাণ করিয়াছে। আমরা দেখিতেছি যে, এই বিষয় সপ্রমাণ করার জন্য যে সাক্ষিগণকে হাজীর করা উচিত তাহারা সাক্ষ্য দিয়াছে। সাক্ষী জোনাক পণ্ডিত এক জ্যোতির্বেত্তা এবং বাদীর পৈতৃক গৃহের নিকট বাস করে। সে বলে যে, বাদীর পিতা তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া বাদীর জন্মকালে উপস্থিত থাকিতে ডাকেন, এবং সে বাদীর জন্ম কালে উপস্থিত ছিল, এবং সে ঐ জন্মের ক্ষণ, স্থান, তারিখ, মাস এবং বৎসর লিখিয়া লইয়া কয়েক দিবস পরে তাহার এক জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করে। সে ঐ জন্ম-পত্রিকার সত্যতার বিষয়ে শপথ করিয়াছে, এবং যদিও ইহা সত্য বটে যে, জেরা-সওয়ালে ইহা স্পষ্ট রূপে প্রকাশ হইয়াছে যে, বাদীর অথবা বাদীর পরিবারের সহিত তাহার কোন ঘনিষ্ট সম্পর্ক নাই, কিন্তু জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করার জন্য সে ঘনিষ্ট সম্পর্কীয় জ্যোতির্বেত্তাকেই ডাকা আবশ্যক, এমত আমরা অবগত নহি, এবং জন্মের মুল সময় এবং জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করা সম্বন্ধে জেরা-সওয়ালে এই সাক্ষীর কোন অনৈক্য বাক্য নাই।

শ্যামলাল নামক এক ব্যক্তি আর এক সাক্ষী; সে পূজক-পাঠক অর্থাৎ শাস্ত্র পাঠ করে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সে বলে যে, তাহার ব্যবসায়ের নিমিত্ত সে বাদীর পরিবারের বেতন-ভোগী চাকর, এবং তন্নিমিত্ত সে বাদীর জন্মের পূর্ব্বে ও পরে বাদীর পৈতৃক গৃহে গমনাগমন করিত, এবং যখন পূর্ব্বোক্ত সাক্ষী ঐ জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করে, তখন সে উপস্থিত ছিল, এবং বাদীর জন্মকালেও সে উপস্থিত ছিল, এবং প্রতিবৎসর বাদী তাহার জন্ম-তিথিতে পূজার জন্য তাহার নিকট আইসে এবং সেই গতিকে তাহার ঐ জন্মের তারিখ উত্তম রূপে স্মরণ আছে। সে আরও বলে যে, সে সাধারণতঃ বাদীর পরিবারের সকল ক্রিয়া কলাপে উপস্থিত ছিল। ইহা সত্য বটে যে, জেরা-সওয়ালে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বাদীর গৃহের কোন্ ঘর কোন্ দিকে আছে, তাহা এই সাক্ষী অধিক অবগত নহে, কিন্তু এমত ব্যক্তির নিকটে তাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। এই সাক্ষী যে উক্ত ক্রিয়া সমস্তের জন্য ঐ গৃহে গমনাগমন করিত, এবং সেই সমস্ত ক্রিয়ার জন্য যে, সে বেতন-ভোগী চাকর ছিল, এবং সে যে বাদীর জন্ম কালে উপস্থিত ছিল, ইহা জেরা-সওয়ালের দ্বারা মিথ্যা সাব্যস্ত হয় নাই।

তৃতীয় সাক্ষী তুলসীদাস বলে যে, সে মোহন্ত, পূজক-পাঠক, মহাজন অর্থাৎ টাকা কর্জ্জ দেওয়ার ব্যবসায়ী এবং বাদীর এক জন প্রতিবাসী। সে বলে যে, প্রতিবাসী, পূজক-পাঠক ও মোহন্ত বলিয়া সে বাদীর পরিবারের সকল জন্ম তারিখে ও ভোজ এবং উৎসবাদিতে উপস্থিত থাকিত, এবং বাদীর যে দিবস জন্ম হয়, সেই সময়ে সে উপস্থিত ছিল, এবং সে ঐ জন্মের তারিখ শপথ করিয়া বলিয়াছে। সাক্ষী রামলোচন, গঙ্গাপ্রসাদ এবং শিবসহায়ও ঐ প্রকার জবানবন্দী দিয়াছে, এবং শেষোক্ত দুই সাক্ষী আরও বলে যে, তাহারা বাদীর পরিবারের ভৃত্য ছিল; সুতরাং তাহারা বাদীর জন্মের সময়ে উপস্থিত ছিল; এবং ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, আমি যে শেষোক্ত চারি সাক্ষীর নাম উচ্চারণ করিলাম তাহারা যে তারিখে বাদীর জন্ম হওয়ার কথা বলিয়াছে তাহা সত্য কি না, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে জেরা করা হয় নাই। এই বর্ণনা খণ্ডন করার জন্য প্রতিবাদি-

গণ কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। ইহা হইতে পারে যে, ঐ প্রকার প্রমাণ প্রদর্শিতই হয় নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয় দেখা যাইতেছে যে, তাহা হইয়া থাকিলেও আপেলাণ্টের উকীলেরা তাহা এমন অকর্ম্মণ্য বিবেচনা করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষ তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইতে বলাতেও তাঁহারা তাহা দেখাইতে পারেন নাই। অতএব আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি যে, বাদী অতি সন্তোষজনক রূপে সপ্রমাণ করিয়াছে যে, ১২৫৪ সালের ১০ ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে তাহার জন্ম হয়, অতএব তাহার বর্ত্তমান নালিশ তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত নহে।

আমরা এইক্ষণে মোকদ্দমার প্রকৃত দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম; এবং এ স্থলেও মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারার্থে পথ পরিষ্কার করার নিমিত্ত, বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরের অবস্থা সম্বন্ধে কি কি বৃত্তান্ত স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা উচিত। নিম্ন আদালতে যে কিছু তর্ক হইয়া থাকুক, এইক্ষণে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে স্থলে কালিকাপ্রসাদ, তাঁহার পিতা ও মুলধনী হরিনারায়ণের জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হইয়াছিলেন, সে স্থলে বাদী বা তাহার মাতা অথবা তাহার মাতামহী হরিনারায়ণের দায়াধিকারী নহেন, এবং বাদী যে দরখাস্তের উপরে নির্ভর করে, তদ্দ্বারা ঐ সম্পত্তি তাঁহাদিগকে দান করা না হইয়া থাকিলে তাঁহারা কোন প্রকারেই তাহা লইতে পারিতেন না। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদী ১৮৬৫ সালের ২১ এ মে তারিখে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াও ১৮৬৮ সালের ২৯ এ এপ্রিলের পূর্ব্বে এই নালিশ করে নাই; অতএব যখন সে এই নালিশ উপস্থিত করে, তখন তাহার নালিশে তমাদী ঘটিবার কয়েক দিবস মাত্র বাকী ছিল। বাদী অবশ্য ইহা দেখাইতে পারিত যে, তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির কাল হইতে এই নালিশ উপস্থিত করার সময় পর্য্যন্ত সে তাহার সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য দ্বারাও অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, অথবা সে কোন না কোন উৎকৃষ্ট কারণে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করার পূর্ব্বে ঐ প্রকার চেষ্টা করিতে পারে নাই, অথবা তাহার স্বত্ব জন্মিবার পরে সে কি জন্য ৩ বৎসরের মধ্যে ২ বৎসর ১১ মাস চুপ করিয়াছিল, তাহার কোন ন্যায্য হেতু দেখাইতে পারিত। কিন্তু বাদী ইহার কোন হেতু দর্শায় নাই, অতএব এই বিষয়ে বাদীর কার্য্য আমাদের নিকট সঙ্গত বোধ হইতেছে না। পক্ষান্তরে, প্রতি- বাদীর অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে তাহা উৎকৃষ্টতর বোধ হয়। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, প্রতিবাদী মুল্য প্রদান করত এবং কোন সংবাদ না পাইয়া ক্রয় করিয়া নালিশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত সম্পত্তিতে নির্ব্বিরোধে দখীলকার ছিল, এবং এই ১৫ বৎসরের শেষে তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবাদিগণের বাদীর বিরুদ্ধে দখলে ছিল, এবং তাহার মধ্যে কোন সময়ে হউক, বাদী ইচ্ছা করিলে প্রতিবাদিগণকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু বাদী তাহাদের উচ্ছেদ করে নাই, অথবা সে যে তদ্বিষয়ের জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নথীতে নাই। অতএব আমাদের বিবেচনায়, প্রতিবাদীর সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বাদী এমন অপকৃষ্ট ভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়াছে যে, সে যে স্বত্বের বলে প্রতিবাদিগণকে বেদখল করিতে চাহে, তৎসম্বন্ধে তাহার অতি দৃঢ় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে হইবে।

সেই স্বত্বের এক মাত্র প্রমাণ কেবল ১৮৩০ সালের ১৬ ই আগষ্টের দরখাস্ত; ঐ দরখাস্তের বর্ণনা মুদ্রিত বহীর ১৪ ও ১৫ পৃষ্ঠায় আছে এবং যাহা কিঞ্চিৎ বাদ দিয়া নিম্নে অনুবাদ করা গেল, তাহা বিশুদ্ধ। "বিহার প্রদেশা- "ন্তর্গত সমুদায় লাখেরাজ ও খেরাজী সম্পত্তি "ও বাগিচা এবং ঘাট তোয়াগী, রাইয়তখানা "ও আসবাব ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি

আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ হইতে ক্রমান্বয়ে অধো-
"গমন করাতে পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা ও সদর
"আদালতের নিষ্পত্তি মতে, আমার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
"রাজা বসন্তরাম মহারাজা রামনারায়ণের জামাতা
"হইয়াছিলেন, সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী রাণী
"ময়না বিবীর নিকট হইতে শেষ আমি পাই-
"য়াছি এবং তাহা সমুদায় এইক্ষণে আমার
"দখলে আছে। কিন্তু যেহেতু ১২২৯ সালে
"আমার পুত্র কালিকাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে,
"এবং ১২৩৭ সালে আমার কনিষ্ট ভ্রাতা
"রায় গঙ্গাপ্রসাদ এবং তাঁহার স্ত্রী সন্তান না
"রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং
"আমার স্ত্রী তাহাদের পূর্ব্বেই মরিয়াছেন এবং
"মৃত পুত্র কালিকাপ্রসাদের বিধবা স্ত্রী এক্ষণে
"জীবিত আছেন, এবং মসম্মত বিবী সীতাবু
"ও বিবী দুলারু নাম্নী তাঁহার দুই কন্যা আছে
"অন্য কোন সন্তান অথবা দায়াধিকারী নাই,
"অতএব আমি তাঁহাকে অর্থাৎ রাণী ধন-
"কুঙরকে আমার দায়াধিকারিণী ব্যক্ত করি-
"লাম, এবং যে স্থলে উক্ত রাণী ধনকুঙর ভিন্ন
"আমার আর কোন দায়াধিকারী অথবা মালিক
"নাই এবং থাকিতেও পারে না, এবং এই
"বিষয় আমি আমার ১৮৩০ সালের ১১ ই
"এপ্রিলের দরখাস্তে বলিয়াছি, এবং যেহেতু
"জীবন অস্থায়ী, অতএব আমি প্রার্থনা করি
"যে, আমার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী রাণী ধন-
"কুঙরের নাম এই দরখাস্তের নিম্নলিখিত
"জেলা পাটনাস্থিত খেরাজী ও লাখেরাজ
"সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার নামের পরিবর্ত্তে
"কালেক্টরীর নামখারিজের বহীতে মালিক
"ও মালগুজার বলিয়া রেজিষ্টরী হয়।"

"অপিচ, যেহেতু রাণী ধনকুঙরের দুই কন্যা
"আছে যাহাদের বিবাহের পরে ঈশ্বরের
"কৃপায় সন্তান হইতে পারে, অতএব তাহারা
"ও তাঁহাদের সন্তানেরা দায়াধিকারী ও মালিক
"আছে এবং হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি
"জীবিত আছি সে পর্য্যন্ত আমার সংসারের
"ভার আমার আপন হস্তে রাখিব এবং পূর্ব্ব-
"মত আমার দেহাতের সকল কার্য্যের তত্ত্বাব-
"ধারণ করিব।"

এই দরখাস্ত সাহাবাদের কালেক্টরীতে দাখিল হয়, এবং দরখাস্তকারী হরিনারায়ণের নামের পরিবর্ত্তে তাহার সদর তাহুতি সম্পত্তির মালিক ও মালগুজার বলিয়া কালেক্টরীর নাম খারিজের বহীতে রাণী ধনকুঙরের নাম রেজিষ্টরী করাই স্বীকৃত ও নিঃসন্দেহ রূপে ঐ দরখাস্তের উদ্দেশ্য ছিল। ইহার ফল এই যে, রায় হরিনারায়ণের সদর তাহুতী সম্পত্তির মালিক ও সেই সম্পত্তির দেয় রাজস্বের জন্য দায়ী বলিয়া হরিনারায়ণের নামের পরিবর্ত্তে উক্ত রাণী ধনকুঙরের নাম কালেক্টরীর বহীতে লিখিত হয়। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এই প্রকার দরখাস্তের কেবল ঐ রূপ ফলই হইবে, কিন্তু ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এই দেশে এক সাধারণ প্রথা আছে যে, যখন কোন ব্যক্তি আপন সম্পত্তি অন্য কাহাকে হস্তান্তর করিতে ইচ্ছা করে, তখন সেই সম্পত্তি যে জেলায় স্থিত সেই জেলার আদালতের কোন এক হাকিমের অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারীর, কিন্তু প্রায়ই কালেক্টরের নিকট, দরখাস্ত করিয়া তাহা করে। এই প্রথার ফল এই যে, এই প্রদেশের আদালতের অনেক নিষ্পত্তি আছে যাহাতে এই প্রকার দরখাস্ত সমস্ত দরখাস্তকারীর উইলের ন্যায় পরিগণিত হইয়াছে। উপস্থিত মোকদ্দমায়ও উভয় পক্ষই তর্ক করিয়াছেন যে, এই দরখাস্ত হরিনারায়ণের উইল স্বরূপ, কিন্তু এক পক্ষের তর্ক এই যে, এই উইলের দান সীমাবদ্ধ ছিল, এবং প্রতিপক্ষে তর্ক করে যে, তাহার সম্পূর্ণ দান হইয়াছিল।

এই প্রকার দরখাস্ত সমস্ত দরখাস্তকারীদিগের কেবল ইচ্ছা ও অভিপ্রায় প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু আইন-সঙ্গত রূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে; কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় এই

কথায় আমাদের সেই সন্দেহ ভঞ্জন হইতেছে যে, প্রার্থীর ইচ্ছা কেবল ব্যক্ত হইয়াছিল, এমত নহে, কিন্তু সেই ইচ্ছা সম্পূর্ণ করার প্রাথমিক কার্য্যের ন্যায় প্রার্থীর নিজের নামের পরিবর্ত্তে তাহার সদর তাহুতী সম্পত্তির মালিক বলিয়া গবর্ণমেণ্টের তৌজীতে রাণী ধনকুঙরের নাম লিপিবদ্ধ করার জন্যও প্রার্থনা হইয়াছিল।

এই উপায় যাহা ঐ দরখাস্তকারী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা হইতে যদি তিনি পশ্চাতে পরাঙ্মুখ না হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার নিজের নিকট হইতে রাণী ধনকুঙরকে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করার জন্য ইহা অত্যন্ত প্রবল এবং চূড়ান্ত উপায় হইয়াছিল, অতএব এই দরখাস্ত উক্ত রাণীকে কোন না কোন প্রকারের দান করার ইচ্ছা-প্রকাশক দলীল ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। তবে ইহা কি ভাবের দান হইয়াছিল ? ঐ দরখাস্তকারী প্রথমে, তাঁহার সমুদায় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল এবং যে স্থানে তাহা স্থিত ছিল তাহার বর্ণনা করিয়াছেন ; তাহার পরে লেখা আছে যে, এই সকল সম্পত্তি তৎকালে তাঁহারই দখলে ছিল, তাহার পরে লেখা আছে যে, তাঁহার পুত্র কালিকাপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছে, এবং কতিপয় অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা দায়াধিকারী হইত তাহাদেরও নিঃসন্তান মৃত্যু হইয়াছে, এবং তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী এবং তাহার দুই নিঃসন্তানা কন্যা জীবিত আছে। এই প্রকার বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া ঐ দরখাস্তকারী বলেন যে, "অতএব আমি "তাহাকে ( রাণী ধনকুঙরকে ) আমার দায়াধি- "কারিণী ব্যক্ত করিলাম, এবং যে স্থলে উক্ত "রাণী ধনকুঙর ভিন্ন আমার আর কোন "দায়াধিকারিণী অথবা মালিক নাই, এবং "থাকিতেও পারে না, এবং যেহেতু জীবন "অস্থায়ী," অতএব তিনি প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার সম্পত্তির মালিক ও মালগুজার বলিয়া তাঁহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী রাণী ধনকুঙরের নাম কালেক্টরীর নামখারিজের বহীতে রেজিষ্টরী হয়। যদি তিনি কেবল ঐ কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেন তবে তাঁহার কি মনস্থ ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিত না ; কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, তাহার অব্যবহিত পরের পরিচ্ছেদে কেবল প্রথম পরিচ্ছেদের অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মায়, এমত নহে ; প্রথম পরিচ্ছেদে রাণী ধনকুঙরকে যে দান করা হইয়াছে তাহা সঙ্কুচিত বা সীমাবদ্ধ করে। রেস্পণ্ডেণ্টের বিজ্ঞবর কৌন্সেলের মেং পল যে কথাগুলির উপরে নির্ভর করেন, তাহা এই যে, "অপিচ, যেহেতু রাণী ধন "কুঙরের দুই কন্যা আছে যাহাদের বিবা- "হের পরে ঈশ্বরের কৃপায় সন্তান হইতে "পারে, অতএব তাহারা ও তাহাদের সন্তানেরা "দায়াধিকারী ও মালিক আছে এবং হইবে। "কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি জীবিত আছি, সে পর্য্যন্ত "আমার সংসারের ভার আমার আপন হস্তে "রাখিব এবং পূর্ব্ব মত আমার দেহান্তের সকল "কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিব।"

এই পরিচ্ছেদের বলে মেং পল তর্ক করেন যে, রাণী ধনকুঙরকে কেবল আজীবন দান করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই কন্যা এবং তাহাদের মৃত্যুর পরে তাহাদের দায়াধিকারী অর্থাৎ বাদী পাইবেন।

পক্ষান্তরে, বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের পক্ষে তর্ক করেন যে, দলীলের শেষ ভাগ অধিক হইলেও দাতার ইচ্ছা ও অভিপ্রায় প্রকাশ ভিন্ন আর কিছু নহে, যে ইচ্ছা এবং অভিপ্রায় উক্ত উইলের প্রথম ভাগ অনুসারে রাণী ধনকুঙরের অতিক্রম করিবার ক্ষমতা ছিল। বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আরও তর্ক করেন যে, বাস্তবিক ইহার ব্যাকরণানুযায়ী অর্থ করিলে এবং ইহার মূল ভাগের সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, দাতার নিজের দায়াধিকারী কে ছিল তাহা ব্যক্ত করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, কিন্তু

রাণী ধনকুঙরের দায়াধিকারী কে ছিল, তাহাই ইঙ্গিত করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল। যদি দাতা এমন বাক্য ব্যবহার করিয়া ব্যক্ত করিতেন যে, রাণী ধনকুঙরের দুই কন্যা ও তাহাদের সন্তানেরা তাঁহার (দাতার) দায়াধিকারী ছিল এবং হইবে, তবে ঐ পরিচ্ছেদের অস্পষ্টতা কতক অংশে দূর হইত, কিন্তু শব্দ গুলির অবিকল অনুবাদ এই যে, "দায়াধিকারী এবং মালিক" আছে এবং হইবে;" অতএব দাতা সপষ্টাক্ষরে বলেন না যে, তিনি ঐ কন্যাদ্বয়কে এবং তাহাদের যে সন্তান হইবে তাহাদিগকে তাঁহার নিজের দায়াধিকারী এবং মালিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কি রাণী ধনকুঙরের দায়াধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; অতএব ঐ পরিচ্ছেদ কোন পক্ষেরই অনুকূলে বা প্রতিকূলে প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু অনুকূল বাবু তর্ক করেন যে, যে স্থলে দাতা তাঁহার দান-পত্রের প্রথম ভাগে সপষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, রাণী ধনকুঙর তাঁহার দায়াধিকারিণী এবং ঐ রাণী ভিন্ন তাঁহার আর কোন দায়াধিকারিণী নাই এবং থাকিতেও পারে না, সে স্থলে ইহা বলা দুঃসাধ্য যে, যখন তিনি তাহার অব্যবহিত পরেই রাণী ধনকুঙরের কন্যাদ্বয়ের ও তাহাদের সম্ভাবিত সন্তানদিগের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন তিনি তাহাদিগকে তাঁহার নিজের দায়াধিকারী বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। এই অর্থ-কূট দূর করা প্রায় অসাধ্য বোধ হইতেছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অর্থাৎ যাহার উপরে মেং পল নির্ভর করেন তাহা প্রথম দৃষ্টি করিয়া আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, ইহার কোন উদ্দেশ্য থাকিবে, এবং মেং পল যে উদ্দেশ্য থাকার কথা কহিয়াছেন তাহা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্য আমাদের বোধ হয় নাই, সুতরাং আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, প্রথম পরিচ্ছেদের লিখিত সম্পূর্ণ দান দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের লিখিত সর্তের অধীন হইবে। কিন্তু অধিক পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, ঐ পরিচ্ছেদ তথায় লিখিত হইবার অথচ মেং পল যে প্রকার তর্ক করেন তদ্রূপ তাহার অর্থ না হইবার উৎকৃষ্ট হেতু আছে।

আমরা দেখিতেছি যে, রাণী ধনকুঙরকেই সম্পত্তি সম্পূর্ণ দান করা হইয়া থাকুক, অথবা প্রথমে তাঁহাকে এবং তাঁহার পরে তাহার কন্যাদ্বয়কে এবং তৎপরে তাহাদের দায়াধিকারিগণকে দিয়া দান সঙ্কুচিত করা হইয়া থাকুক, উভয় ঘটনাতেই এই সর্ত ছিল যে, যে পর্য্যন্ত দাতা জীবিত থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার সম্পত্তি নিজ হস্তে রাখিবেন এবং পূর্ব্বমত তত্ত্বাবধারণাদি সকল নির্ব্বাহ করিবেন। অতএব ইহা নিতান্ত সম্ভব যে, হয়ত তিনি এক দুর্ঘটনার জন্য অর্থাৎ তাঁহার অগ্রে রাণী ধনকুঙরের মৃত্যু হইলে, তাহার উপায় করিতেছিলেন। তাহা হইলে, তাঁহার সঙ্গত রূপেই ইচ্ছা হইতে পারে যে, রাণী ধনকুঙরের কন্যারা এবং তাহাদের সন্তানেরা দায়াধিকারী ও মালিক হইবে। যে পর্য্যন্ত দাতা নিজে জীবিত থাকিবেন, সে পর্য্যন্ত রাণী ধনকুঙর সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবেন না, এবং যদি দাতার অগ্রে ধনকুঙরের মৃত্যু হয়, তবে তিনি স্বভাবতঃই ইচ্ছা করিতে পারেন যে, ধনকুঙরের কন্যারা এবং তাহাদের যে সন্তান হয় তাহারা দায়াধিকারী ও মালিক হইবে। ইহাই আমাদের বিবেচনায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ন্যায্য অর্থ, এবং প্রথম পরিচ্ছেদের বাক্যগুলি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বাক্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, মেং পল যে অর্থ করেন তদপেক্ষা ইহাই সঙ্গত অর্থ। উপরি-উক্ত সম্বন্ধ ভিন্ন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সহিত প্রথম পরিচ্ছেদের যদি অন্য কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে আমাদের বোধ হয় যে, প্রথম পরিচ্ছেদে রাণী ধনকুঙরকে সম্পত্তি এমন

সম্পূর্ণ দান করা হইয়াছে যে, তদ্দারা তিনি তাহা হস্তান্তর করিতে স্বত্ববতী হইতে পারেন, কারণ, দাতা স্পষ্ট বাক্যে উক্ত রাণীকে তাঁহার এক মাত্র দায়াধিকারিণী ও মালিক বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন; এবং তিনি কেবল তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, এমত নহে, তিনি ঐ কথা সম্পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন যে, এমন কার্য্য করা হয় যদ্দারা রাণী তাঁহার দায়াধিকারিণী এবং মালিক বলিয়া পৃথিবীতে জানিত হন; এবং ঐ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ভাগের দ্বারা প্রথম ভাগের দানের উপরে যদি কোন সর্ত্ত রক্ষিত না হইয়া থাকে, তবে সে স্থলে বাদিকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে যে, রাণী ধনকুঙর সমুদায় স্থাবরঅস্থাবর সম্পত্তির দখল পাইয়াছিলেন, এবং যে স্থলে হস্তান্তর করিতে তাঁহার প্রতি কোন নিষেধ ছিল না, সে স্থলে তিনি, হিন্দু পরিবারের উপর বাধ্যকর কোন আইন ও প্রথা দ্বারা ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে নিবারিত ছিলেন না। দুই পক্ষই অনেক নজীর ও প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা অতি সাবধানে এই সকল নজীর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, তাহা খাটে না, এবং তদ্দারা এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে আমাদের কোন সহায়তা হয় না। আমরা বিবেচনা করি যে, যে দলীলের উপর নির্ভর করা হইয়াছে তদ্দারা বিরোধীয় সম্পত্তি রাণী ধনকুঙরকে সম্পূর্ণ দান করা হয়, তিনি ঐ দানক্রমে ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ ভোগের সময় তিনি তাহার কতক অংশ বিক্রয় করিয়াছেন, এবং যেহেতু এই দানের উপরে কোন সর্ত্ত ছিল না, অতএব তিনি প্রতিবাদী আপেলাণ্টদিগকে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে স্বত্ববতী ছিলেন।

এই অভিপ্রায়ে, আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া উভয় আদালতের খরচা সমেত বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিলাম। (গ)

---

২১ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৮৯৫ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজ তত্রত্য সদর মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ১১ ই নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২১ এ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

দমরী সেখ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

বিশ্বেশ্বর লাল (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মুন্সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল এবং বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দখলের স্বত্বাধিকারী প্রজার মকররী পাট্টা দিবার স্বত্ব আছে; কিন্তু সে তৃতীয় ব্যক্তিকে যে পাট্টা দেয় তাহার সর্ত্ত কেবল তাহার ও ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যেই বাধ্যকর হয়। ভূম্যধিকারীর স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না; এবং ভূম্যধিকারী আইনের আদেশ ব্যতীত প্রজার পাট্টা-গৃহীতাকে বেদখল করিলে অনধিকার-প্রবেশের অপরাধী হন।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায় এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বাদী এই বলিয়া কোন বাস্তু জমির দখলের দাবীতে এবং বাসের স্বত্বের দাবীতে নালিশ করে যে, তাহার পাট্টা-দাতা অঘোর সেন এক খানা ঘর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে এক মকররী পাট্টা দেয়, এবং এক শরীকের গোমাস্তা দমরী প্রতিবাদী যে পর্য্যন্ত তাহাকে উচ্ছেদ করিয়া ঐ ঘরের টাটী এবং অন্যান্য মাল-মসালা না লইয়া গিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত সে উক্ত পাট্টা অনুসারে দখীলকার ছিল।

প্রতিবাদীর জওয়াব এই যে, অঘোর সেনকে

প্রজা বলিয়া ঐ ঘরে বাস করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু উক্ত ঘর পূর্ব্বের মালিকের ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রথম আদালত নিম্নলিখিত ইসু সকল ধার্য্য করেন :—

১ ম।—সাধারণ প্রথা অনুসারে প্রজাগণের আপন আবাস-বাটী এবং দখলের স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা আছে কি না?

২ য়। উক্ত বাটী এবং বাগান অঘোর সেন প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, কি মৌজা তেওরীর পূর্ব্ব মালিকগণের ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়?

৩ য়।—ঐ সকল টালী ২ নং প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক অন্যায় রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না?

৪ র্থ।—প্রতিবাদী অঘোর সেন এই মোকদ্দমায় দায়ী কি না?

এই সকল ইসু সম্বন্ধে প্রথম আদালত প্রমাণ দৃষ্টে স্থির করেন যে, বাদী ডিক্রী পাইতে পারে।

প্রতিবাদী জজের নিকট আপীল করে, এবং জজ স্থির করেন যে, পাট্টাদারের দখলের সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর অনধিকার-প্রবেশ করার স্বত্ব দূরে থাকুক, পাট্টাগৃহীতার স্বত্বের প্রতি আপত্তি করিবারও কোন স্বত্ব প্রতিবাদী দেখায় নাই; যদিও সে গোমাস্তা বলিয়া পরিচয় দেয়, তথাপি সে বলে নাই যে, সে হুকুম মতে কার্য্য করে, অথবা সে যে গোমাস্তা ছিল ইহা সে তাহার মুনিবের দ্বারা সপ্রমাণ করে নাই; বস্তুতঃ, দমরীর তাহার মুনিবের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হইবার অথবা তাহার মুনিবের পক্ষে স্বয়ং আইনের কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ইসু সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালত মুন্সেফের নিষ্পত্তির সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইয়া এই সিদ্ধান্ত করেন যে, বাদীর পাট্টাদার ঐ বাটীর মালিক থাকাতে বাদীর এমত স্বত্ব ছিল, যাহা, প্রতিবাদী আপন উৎকৃষ্ট স্বত্ব দেখাইতে না পারায়, নষ্ট করিতে পারে না। নিম্ন আপীল-আদালত প্রতিবাদীর আপীল ডিস্‌মিস্ করায় প্রতিবাদী খাস আপীল করে।

খাস আপীলে খাস আপেলাণ্টের উকীল মোকদ্দমার ভাব একেবারে পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি কহেন যে, অঘোর সেনের দখলের স্বত্ব ছিল কি না, তাহার মীমাংসা না করায় জজের অন্যায় হইয়াছে।

প্রথমতঃ, অঘোর সেনের দখলের স্বত্ব সম্বন্ধে প্রথম আদালতে কোন ইসু ধার্য্য হয় নাই। পক্ষান্তরে, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অঘোর সেনের বর্ত্তমান দখলের স্বত্ব বাদীকে হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধেই ইসু হয় এবং উভয় পক্ষই সেই ইসু গ্রহণ করে। নিম্ন আপীল-আদালতের আপীলের হেতুর মধ্যে দখলের স্বত্ব পাট্টা দ্বারা হস্তান্তর করার ক্ষমতা সম্বন্ধেই প্রশ্ন উত্থিত হয়, এবং তথায়ও এমত কোন প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই যে, দখলের স্বত্ব ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে প্রথম আদালতের ইসু ধার্য্য এবং নিষ্পত্তি না করায় অন্যায় হইয়াছে। অপর, খাস আপীলের প্রথম এবং তৃতীয় হেতুতে স্পষ্ট অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, দখলের স্বত্ব ছিল; এবং ঐ দখলের স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার প্রতিই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। অতএব আমরা খাস আপীলের সার্টিফিকেটের এবং প্রকৃত বৃত্তান্তের বিরুদ্ধে, এস্থলে যেরূপ চেষ্টা করা হইয়াছে, তদ্রূপ, মোকদ্দমার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে দিতে পারি না।

খাস অপীলের অন্যান্য হেতু সম্বন্ধে আমরা দেখিতেছি যে, জজ স্থির করেন যে, ২ নং প্রতিবাদী দমরী এক জন গোমাস্তা, এবং সে যে নালিশ করিয়াছে তাহা করিতে তাহার ক্ষমতা নাই, এবং সে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করে নাই যে, তাহার মুনিব তাহাকে আদালতে তাহার মুনিবের স্থলাভিষিক্ত হইতে বা সে যে কার্য্য করে তাহা করিতে দিয়াছে। প্রমাণ দৃষ্টে যে বৃত্তান্ত-ঘটিত নিষ্পত্তি হইয়াছে তদ্বিরুদ্ধে আমা-

দিগকে কোন আইন-ঘটিত ভুল এবং বাস্তবিক খাস আপেলাণ্টের উকীল কর্ত্তৃক কোন প্রমাণ দর্শান হয় নাই।

আমরা এইক্ষণে বৃত্তান্ত-ঘটিত ইসু দেখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এ স্থলে আমরা দেখিতেছি যে, দ্বিতীয় ইসু সম্বন্ধে অর্থাৎ অঘোর সেন কি পূর্ব্ব মালিক ঐ বাটী নির্ম্মাণ করে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের ন্যায় প্রমাণ দৃষ্টে বৃত্তান্ত-ঘটিত নিষ্পত্তি করিয়াছেন। নিম্ন আপীল-আদালত আরো স্থির করেন যে, উক্ত কথিত গোমাস্তা কোন ক্ষমতা না পাইয়া ঐ ঘরের মালমশালাদি আত্মসাৎ করে, এবং ঐ গৃহ উক্ত শরীক নির্ম্মাণ করে নাই, অঘোর সেনই নির্ম্মাণ করিয়াছে।

অঘোর সেনের পাট্টা দ্বারা দখলের স্বত্ব হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ছিল কি না, এই বিষয় সম্বন্ধে এক দিকে তাহার দখল-স্বীকার এবং তাহাকে পাট্টা দেওয়ার বিষয় দেখা যায়; এবং পক্ষান্তরে, এমত কোন প্রমাণ নাই যে, অঘোর সেন ঐ বাটী নির্ম্মাণ করায় এবং তাহার স্বীকৃত দখলের স্বত্ব থাকায়, সে আপন স্বত্ব বাদীকে পাট্টা দ্বারা হস্তান্তর করিতে পারে না। তর্কিত হইয়াছে যে, অঘোর সেনকে কেবল কৃষিকার্য্য করিবার জন্য উক্ত বাটীতে রাখা হইয়াছিল; কিন্তু নির্দ্ধারিত বৃত্তান্ত সম্পূর্ণরূপে এই তর্কের বিরোধী; এবং তাহা খাস আপেলাণ্টের উকীলের প্রদর্শনমতে লইলেও অনায়াসে এই উদ্ভাবিত হইতে পারে যে, তাহাকে যদি ঐ বাটীতে কৃষিকার্য্যের জন্য রাখা হইয়া থাকে, এবং নালিশের পূর্ব্বে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত সে তথায় থাকিয়া থাকে, তবে সে কেবল তাহারই দ্বারা কোন স্বীকৃত দখলের স্বত্ব ব্যতীতও উক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার স্বত্ব পাইতে পারে।

অতএব যে ভাবেই ধরা যাউক, আমার বিবেচনায়, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমারও ঐ মত। অঘোর সেনের দখলের স্বত্ব ছিল কি না, এ প্রশ্ন এত বিলম্বে উত্থিত হইতে পারে না। প্রথম আদালতের ইসু এবং এই আদালতের আপীলের হেতুতেই স্পষ্ট প্রকাশ যে, অঘোর সেনের যে দখলের স্বত্ব ছিল তৎপ্রতি খাস আপেলাণ্ট আপত্তি করিতে পারে না।

অপর প্রশ্ন অর্থাৎ দখলের স্বত্বাধিকারী কোন প্রজা আপন ভূম্যধিকারীর সম্মতি না লইয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে মকররী পাট্টা দিতে পারে কি না, এতৎসম্বন্ধে কেন যে সে তাহা পারিবে না, তাহার কোন কারণ দেখা যায় না। দখলের স্বত্বাধিকারী কোন প্রজা নিশ্চয়ই অন্যকে দরপাট্টা দিতে পারে, এবং সে তৃতীয় ব্যক্তিকে যে পাট্টা দেয় তাহার সর্ত্ত কেবল তাহাদেরই মধ্যে বাধ্যকর হইতে পারে। ভূম্যধিকারীর যে বিধিমত স্বত্ব থাকে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হয় না; কিন্তু সে যদি আইনের বিধান অবলম্বন না করিয়া প্রজার পাট্টাগৃহীতাকে বেদখল করে, তবে সে অনধিকার-প্রবেশের অপরাধী হয়।

জজ এ মোকদ্দমায় স্থির করিয়াছেন যে, বাদী উক্ত রূপেই প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক বেদখল হইয়াছে; অতএব বাদীকে ঐ সম্পত্তি দখলের এবং ক্ষতিপূরণের ডিক্রী দেওয়া উচিতই হইয়াছে। (ব)

২১ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাকসন।

১৮৬৯ সালের ২০৮ নং মোকদ্দমা।

বীরভূমের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২ রা জুনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

উমাসুন্দরী দাসী ( প্রতিবাদিনী ) আপেলাণ্ট।

বিপিনবিহারী রায় প্রভৃতি ( বাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস এবং ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বীরভূমের কালেক্টরীতে করের এক নালিশ ডিক্রী হইয়া জারীর জন্য বর্দ্ধমানের কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হয়, কারণ, তাঁহার এলাকার মধ্যে বিরোধীয় তালুক ছিল। বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর ঐ তালুক নীলাম করেন এবং ডিক্রীদারই ক্রয় করে। দায়ী কালেক্টরের ও কমিসনরের নিকট আপীলে অকৃতকার্য্য হইয়া দখলের দাবীতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করত এই বলিয়া ডিক্রী পায় যে, যে কালেক্টর করের মোকদ্দমার ডিক্রী দেন, তাঁহার তাহা দিবার অধিকার ছিল না, সুতরাং সেই ডিক্রীজারীর নীলাম অন্যথা হইবে।

এ স্থলে, এত অধিক কার্য্য হইয়া যাওয়ার পরে বিচারাধিকারের প্রতি আপত্তি গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বিচারপতি কেম্প।—প্রতিবাদী এই মোকদ্দমার আপেলাণ্ট। বাদিগণ যাহারা পাপরে নালিশ করে, তাহারা নালিশের আরজীর তফসিললিখিত পলারা প্রভৃতি ১১ মৌজার অন্তর্গত ৪০৩৬ বিঘা ১৯ কাঠা ১৩ গণ্ডা ভূমির ৸৵ আনা অংশের দাবীতে নালিশ করে। মোকদ্দমার দাবী ১৫৭৫০ টাকা। বাদিগণ বলে যে, এই তালুকের জমা সিক্কা ২৩৫ টাকা; প্রতিবাদিনীর স্বামী করবৃদ্ধির এক নালিশ উপস্থিত করিয়া কর স্থাপনের ডিক্রী পায়; ঐ ডিক্রীর পরে, বীরভূমের কালেক্টরীতে করের দাবীতে এক নালিশ উপস্থিত হইয়া ডিক্রী হয়; বর্দ্ধমান জেলায় সম্পত্তি থাকায় ডিক্রীজারীতে উক্ত মোকদ্দমা তথাকার কালেক্টরের নিকট প্রেরিত হইলে, বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর সীমা ধার্য্য না করিয়া ১৮৬৬ সালের ২২ এ ডিসেম্বর তারিখে উক্ত জমিদারী নীলাম করেন; বাদিগণ আপত্তি করায় ঐ জেলার কালেক্টর ১৮৬৭ সালের ১০ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত নীলাম রহিত করেন; উক্ত জমি বর্দ্ধমানের ডেপুটি কালেক্টর কর্ত্তৃক পুনরায় ১৮৬৭ সালের ২২ এ এপ্রিল তারিখে নীলাম হয়, এবং ডিক্রীদার প্রতিবাদিনী তাহা ২১২৫ টাকায় ক্রয় করে; বাদিগণ কালেক্টর এবং কমিশনরের নিকট আপীল করে, এবং উক্ত উভয় কর্ম্মচারীই তাহাদের আপীল অগ্রাহ্য করেন; আর ঐ নীলাম প্রতারণা দ্বারা আইন এবং সাধারণ নিয়মের বিরুদ্ধে হইয়াছে।

প্রতিবাদিনী প্রথমতঃ, এই আপত্তি করে যে, ঐ সকল জমি বাকী করের ডিক্রীজারীতে ১৮৬৫ সালের ৮ আইনমতে নীলাম হওয়ায় সেই নীলাম রদের দাবীর নালিশ দেওয়ানী আদালতে হইবে না; নালিশের আরজীতে এমত কোন তঞ্চকতার কারণ দর্শান হয় নাই, যাহাতে উক্ত মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতের বিচারাধীন হয়; উক্ত নীলাম সম্বন্ধে আইন-বিরুদ্ধ বা নিয়মবিরুদ্ধ কিছু নাই, তাহা রীতিমত প্রণালীতে এবং আইনের আদেশ অনুসারেই হইয়াছে; এবং প্রতিবাদিনী নিষ্কপটে ক্রয় করিয়াছে।

বীরভূমের অধঃস্থ জজ তিনটি ইসু ধার্য্য করেন:—প্রথমতঃ, মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে চলিবে কি না; দ্বিতীয়তঃ, উক্ত নীলাম সম্বন্ধীয় কার্য্য বাস্তবিক আইন-বিরুদ্ধ কি না, এবং তাহা হইলে সেই হেতুতে উক্ত নীলাম রহিত হইতে পারে কি না, এবং তৃতীয়তঃ, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে কি না যে, নীলামের এস্তাহার বাস্তবিক জারী হয় নাই এবং তঞ্চকতা করিয়া এক মিথ্যা রসিদ দাখিল করা হইয়াছে; এবং বিরোধীয় সম্পত্তি অনুপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে কি না।

প্রথম ইসুতে যে বিচারাধিকারের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তৎসম্বন্ধে অধঃস্থ জজের রায় অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি বলেন, "বাদিগণ যখন তঞ্চকতার অভিযোগ করে, তখন মোকদ্দমা নিশ্চয়ই দেওয়ানী-আদালতের গ্রাহ্য।" অধঃস্থ জজ তদনন্তর তর্কবিতর্ক অতি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করেন, কিন্তু তিনি দোষগুণ সম্বন্ধে অর্থাৎ নীলামের এস্তাহার জারী হইয়াছে কি না এবং তঞ্চকতা

হইয়াছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন নিষ্পত্তি করেন নাই। তিনি যে নিষ্পত্তি করেন তাহা কেবল বিচারাধিকারের প্রশ্ন সম্বন্ধীয়। অধঃস্থ জজ স্থির করেন যে, যে করের ডিক্রী জারীতে নীলাম হয় তাহা বীরভূমের কালেক্টরের ডিক্রী বিধায়, কিন্তু উক্ত জমীদারী বর্দ্ধমানের কালেক্টরীর অন্তর্গত থাকায়, বীরভূমের কালেক্টরের ডিক্রী বিচারাধিকারাভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব উক্ত ডিক্রীজারীতে যে নীলাম হয় তাহা অন্যথা হইতে পারে। অতএব মোকদ্দমার ডিক্রী হয়, এবং নীলাম অন্যথা হয়, এবং বাদিগণ খরচা সমেত ৸৶০ আনা অংশে দখলের হুকুম পায়।

দেখা যায় যে, বাদিগণের দখলী জমির কর আদায়ের দাবীতে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনী অর্থাৎ পত্তনীদার এক নালিশ উপস্থিত করে, এবং ১৮২৩০ সালে দেওয়ানী আদালত এই জমির কর বৃদ্ধির এক ডিক্রী দেন এবং তাহার কর ধার্য্য হয়। পরে প্রতিবাদিনী বাদিগণের বিরুদ্ধে ১৮৬৩ সাল হইতে ১৮৬৭ সাল পর্য্যন্তের করের দাবীতে নালিশ করে, এবং বীরভূমের কালেক্টর দেওয়ানী আদালতের নির্দ্ধারিত বর্দ্ধিত হারে ১২৬৪ সাল হইতে ১২৬৭ সাল পর্য্যন্তের করের ডিক্রী দেন। কালেক্টর তাঁহার ডিক্রীতে বলেন যে, ১৮১২ সালের ৫ম কানুনের ৯ ধারার বিধান মতে রীতিমত নোটিস জারী, এবং বাদী ১০ আইনের মোকদ্দমায় যে পরিমাণে কর বৃদ্ধির দাবী করে তাহার স্বত্ব দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা স্পষ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে। ১০ আইনের মোকদ্দমায় বীরভূমের কালেক্টরের বিচারাধিকার সম্বন্ধে কোন আপত্তি হয় নাই, এবং প্রথমে কালেক্টর কর্ত্তৃক ঐ নীলাম অন্যথা হওয়ার স্থলে বা নীলাম সমাধা হওয়ার পরে কালেক্টর বা কমিসনরের নিকট আপীলে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি হয় নাই, এবং উক্ত ১০ আইনের নিষ্পত্তি বিচারাধিকারাভাবে হইয়াছে বলিয়াও তদ্বিরুদ্ধে জেলার জজের নিকট আপীল হয় নাই। এই নালিশের আরজীতেও বিচারাধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, অথবা অধঃস্থ জজ যে সকল ইসু ধার্য্য করেন তাহাতেও বীরভূমের কালেক্টরের বিচারাধিকার সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই। দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার সম্বন্ধে এক ইসু আছে, কিন্তু উক্ত ইসুতে কেবল তঞ্চকতার প্রসঙ্গ আছে। অতএব আমাদের বিবেচনায়, এ প্রশ্ন এক্ষণে উত্থিত হইতে পারে না।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদিগণ প্রতিবাদিনীকে একেবারেই কর দেয় নাই, এবং যদিও প্রতিবাদিনী তাহার উকীলের দ্বারা প্রকাশ করে যে, উক্ত সম্পত্তিতে ক্রয় দ্বারা তাহার যে কোন স্বত্ব হইতে পারে, বাদিগণ তাহার ডিক্রীকৃত কর দিলে, সে তাহা আপন ইচ্ছায় ছাড়িয়া দিবে, তথাপি বাদিগণ তাহা দিতে অস্বীকার করে; আসল কথা এই যে, তাহারা ঐ করও দিবে না, বা কর দিয়া উক্ত তালুক ফেরতও লইবে না।

তঞ্চকতার প্রশ্ন অধঃস্থ জজ বিচার করেন নাই বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত প্রমাণ আমাদের নিকট আছে। উক্ত প্রমাণ আমাদের নিকট পঠিত হইয়াছে, এবং আমাদের মতে এ মোকদ্দমায় কোন তঞ্চকতা সপ্রমাণ হয় নাই। পক্ষান্তরে, আমরা বিবেচনা করি, ডিক্রীদার-প্রতিবাদিনীর কার্য্য সকল সরলান্তঃকরণমূলক এবং অকপট, এবং বাদিগণ ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহার কর দেয় নাই, এবং তাহার যথার্থ দাবী পরাভূত করণার্থে যাবতীয় তঞ্চকতামূলক আপত্তি উত্থাপন করে। নালিশের আরজীতে, অনুপযুক্ত মূল্য নীলাম রদের একটি কারণ স্বরূপ কথিত হওয়ায়, আমরা বলিতে পারি যে, সুদ ও খরচা ছাড়াও নীলামের সময়ে ঐ তালুকের কর ১০,০০০ টাকার অধিক বাকী

ছিল, এবং উক্ত তালুকের কর বৃদ্ধির হুকুম হইয়াছিল। অতএব এ তালুক নীলাম করিয়া যে মূল্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অধিক টাকায় যে কেহ তাহা ক্রয় করিত এমন সম্ভাবনা ছিল না।

সমুদায় দৃষ্টে আমাদের মত এই যে, তঞ্চকতা সপ্রমাণ হয় নাই, এবং অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে। বাদিগণের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হইয়া এই আপীলের ডিক্রী হইবে, এবং বাদী রেস্পণ্ডেণ্টগণ খরচা দিবে।

(ব)

---

২২ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

সেখ হোসেন আলী, প্রার্থী।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থীর উকীল।

চুম্বক।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারামতে, রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হইবার পরে ডিক্রী জারী হইতে পারে না।

ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্তের পূর্ব্ব তিনবৎসরের মধ্যে কোন প্রকৃত কার্য্য দ্বারা ডিক্রী সজীব রাখার স্বত্ব ৫০০ টাকার ন্যূন দাবীর ডিক্রী সম্বন্ধে খাটে না।

বিচারপতি বেলি।—ডিক্রীজারীতে কালেক্‌টর ক্ষমতা-বহির্ভূত হুকুম দিয়াছেন বলিয়া তাহা অন্যথা করার জন্য এই দরখাস্ত হয়। ঐ হুকুমের সার মর্ম্ম এই যে, যেহেতু রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, অতএব ডিক্রীজারী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা দ্বারা বারিত, কারণ, ডিক্রী ৫০০ টাকার ন্যূন, সুতরাং পরওয়ানা নির্গত হইতে পারে না। এই হুকুমে যে, ক্ষমতা পরিচালন করিতে অস্বীকার করা হইয়াছে, এমত আমার দৃষ্ট হয় না। বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, কালেক্‌টর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা দিতে অস্বীকার করিয়া বিধিমত কার্য্য করিয়াছেন কি না। কিন্তু যদি ইহাও অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, কালেক্‌টরের যে হুকুম দিবার অধিকার ছিল তাহা তিনি দেন নাই, তথাপি আমি নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সমস্তের উল্লেখ করিতে চাহি। ডিক্রী ১৮৬৬ সালের ১৮ ই মে তারিখে হয়। ১৮৬৯ সালের ১৭ ই মার্চ তারিখে ডিক্রীজারীর প্রথম দরখাস্ত হয়। বিচারাদিষ্ট দায়ীর মৃত্যু হওয়াতে মোকদ্দমা ১৮৬৯ সালের ৯ ই এপ্রিল নম্বর-খারিজ হয়। ১৮৬৯ সালের ২৮ এ এপ্রিল তারিখে ডিক্রীজারীর এক নূতন দরখাস্ত হয়, এবং মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রীদিগের নামে পরওয়ানা জারী করার প্রার্থনা হয়। ১৮ ই মে তারিখে ঐ বিধবাদিগের নাম লেখাইয়া দেওয়ার জন্য আদেশ হয়। তাহাতে প্রার্থী বলে যে, মৃত ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামবাসী বিধায়, সে বিধবাদিগের নাম দিতে পারে না, অতএব সে প্রার্থনা করে যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হয়। সেই তারিখেই এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়। তাহার পরে ডিক্রীদার মৃত ব্যক্তির দুই বিধবা স্ত্রীর নাম দেওয়াতে ১৮৬৯ সালের ২৯ এ অক্টোবর তারিখে কতক অস্থাবর সম্পত্তির নীলাম হইয়া ডিক্রীর কিয়দংশ পরিশোধিত হয়।

১৮৬৯ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখে ডিক্রীদার প্রার্থনা করে যে, ডিক্রীর যে ভাগ তৎকাল পর্য্যন্ত অপরিশোধিত রহিয়াছে তাহা জারী হয়, এবং ১৮৭০ সালের ৩ রা জানুয়ারি তারিখে ডেপুটি কালেক্‌টর এই বলিয়া তাহা জারী করিতে অস্বীকার করেন যে, ডিক্রী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা মতে বারিত হইয়াছে।

তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৭০ সালের মার্চ মাসের বেঙ্গল ল রিপোর্টের ৮৩ পৃষ্ঠার পূর্ণাধি-

বেশনের নজীর অনুযায়ী এই ডিক্রী বারিত হয় নাই, এবং ডিক্রীজারী করা উচিত। ঐ পূর্ণাধিবেশনের মোকদ্দমায় অধিকাংশ বিচার-পতিগণের সহিত আমার মতভেদ হয়, কিন্তু তথাপি আমি সেই নজীরের দ্বারা বাধ্য। সেই মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট হয় যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারার সঙ্গত অর্থ করিতে হইবে, অবিকল শব্দার্থ করা উচিত নহে; এবং অর্পণকারী বিচারপতিগণের বর্ণনা মতে সেই মোকদ্দমার প্রধান বৃত্তান্ত এই যে, ডিক্রী জারী হইতে পারে নাই, কারণ, তাহা প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত সদর আমীনের দ্বারা ক্রোক হইয়াছিল। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় ডিক্রী জারী করার জন্য ডিক্রীদারের পথে এমন কোন বাধা ছিল না, যদ্দ্বারা তাহা ঐ পূর্ণাধি-বেশনের নিষ্পত্তির মর্ম্মান্তর্গত হইতে পারে। ১৮৬৯ সালের ২৯ এ অক্টোবর হইতে ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই মোকদ্দমার ডিক্রী-দার তাহার ডিক্রীজারীর পক্ষে কোন কার্য্য করে নাই, এবং এই সময়ের মধ্যে তমাদীর কাল অতীত হইয়া গিয়াছে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা উক্ত পূর্ণাধি-বেশনের মোকদ্দমার অনুরূপ নহে, এবং যে স্থলে রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসরের অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে ডেপুটি কালেক্টর বিশুদ্ধ রূপেই নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন যে, ৯২ ধারামতে এইক্ষণে ঐ ডিক্রীজারী চলিতে পারে না।

এমত অবস্থায়, আমি এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিব।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমা-রও ঐ মত। যদি প্রার্থীর উকীলের তর্ক বিশুদ্ধ হয়, তবে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা নিঃসন্দেহই ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, ১৮৬৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বরের দরখাস্ত যাহা মূল ডিক্রীর তারিখের তিন বৎ-সর পরে দাখিল হইয়াছে বলিয়া স্বীকৃত হই-য়াছে, তদনুসারে ডেপুটি কালেক্টর ডিক্রীজারী করিতে যে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা অস-ঙ্গত কি না; এবং যে এক মাত্র হেতুবাদে তর্কিত হইয়াছে যে, কালেক্টরের অন্যায় হইয়াছে, তাহা এই যে, ডিক্রীদার ১৮৬৪ সালের ১৭ ই মার্চ হইতে ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্তের তারিখ পর্য্যন্ত, তাহার ডিক্রী সজীব রাখার জন্য বাস্ত-বিক চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। এই হেতুবাদে প্রার্থীর মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

কথিত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমা ৪ র্থ বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ৮৩ পৃষ্ঠার পূর্ণাধি-বেশনের মোকদ্দমার অধীন; কিন্তু এই তর্ক স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। যে বিচারপতিগণ ঐ মোক-দ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত আমি এক মতে বিবেচনা করি যে, ডিক্রীদার যদি অনিবার্য্য কারণে ডিক্রীজারী করিতে না পারে, অথবা উচিত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি আদালত নিজ হস্তে বহু কার্য্য থাকার গতিকে অথবা অন্য কোন কারণে তাহার কোন হুকুম দিতে না পারেন, তবে রায়ের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের অধিক কাল অতীত হইয়া গেলেও ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারী করিতে স্বত্ববান হইবে। এক ঘট-নায় ডিক্রীদারের হস্ত অনিবার্য্য কারণে বদ্ধ থাকে; দ্বিতীয় ঘটনায় সে আইন জারী করার জন্য তাহার সাধ্য মত যত্ন করিয়াছে, এবং যদি আদালতের তদ্বিষয়ে হুকুম দেওয়ার অসামর্থ্য হেতু কোন বিলম্ব হয়, তবে সুবিচার ও ন্যায়-পরতার যুক্তি মতে ডিক্রীদার তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না।

উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা পৃথক্; এই মোকদ্দমায়, ডিক্রীজারী করার জন্য আইনে যে সময় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অতীত হইবার পরে

ডিক্রীদার তাহা জারী করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং ৯২ ধারার বিধান এড়াইবার জন্য কেবল এই এক হেতু উত্থাপিত হইয়াছে যে, শেষ দরখাস্তের পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে প্রকৃত কার্য্য দ্বারা ডিক্রী সজীব রাখা হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সমাজ এই স্বত্ব কেবল ৫০০ টাকার অধিক ডিক্রীদারদিগকেই দিয়াছেন, অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ৫০০ টাকার ন্যূন ডিক্রীদারের যদি ঐ স্বত্ব থাকে, তবে এই দুই শ্রেণীর ডিক্রী সম্বন্ধে তমাদীর আইনের কোন প্রভেদ থাকিবে না। কিন্তু তাহা যে, ব্যবস্থাপক সমাজের মনস্থ নহে, তাহা ৯২ ধারার শব্দেই দেখা যাইতেছে, এবং যে স্থলে আমরা ব্যবস্থাপক সমাজের প্রত্যেক আইনের সঙ্গত অর্থ করিতে বাধ্য, সে স্থলে আমরা যদি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারার এমন অর্থ করি, যদ্দ্বারা ঐ ধারা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তাহা হইলে নিতান্ত অন্যায় হয়।

এই সকল কারণে আমিও এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম। (গ)

---

২৪ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৬৪৮ নং মোকদ্দমা।

আলীপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৮ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ২৪ পরগণার প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১৫ ই জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শিবচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

হরিদাস ভট্টাচার্য্য (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রূপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কয়েক জন বিচারাদিষ্ট দায়ীর মধ্যে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হইয়া ডিক্রীর সমুদায় টাকা আদায় হওয়াতে সে তাহার অন্যান্য সহ-দায়ীদিগের নামে অংশ মত টাকা পাওয়ার জন্য নালিশ করিলে তাহারা জওয়াব দেয় যে, ডিক্রী জারীর কোন কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে না হওয়াতে ঐ টাকা পরিশোধ করার কালে ডিক্রী বারিত হইয়াছিল।

এ স্থলে প্রতিবাদিগণ যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে তাহা ডিক্রীজারীতে অবশ্যই পর্য্যালোচিত হইয়াছিল, এবং আদালত যে, ন্যায্য রূপেই ডিক্রীজারীর হুকুম দিয়াছেন তাহা অবশ্য অনুমান করিয়া লইতে হইবে; অতএব যে স্থলে বাদী যৌত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে স্থলে সে আপন দেয় অংশের অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ পাইতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি বিবেচনা করি, খাস আপীলে যে তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে তাহা এ স্থলে উত্থিত হয় না। বাদী এক ডিক্রীর অন্তর্গত কয়েক জন যৌত দায়ীর মধ্যে এক ব্যক্তি। তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হয় এবং তাহার ঐ যৌত ঋণ পরিশোধ করিতে হয়, অতএব সেই দায়ের অংশের জন্য সে প্রতিবাদিগণের নামে নালিশ করে।

প্রতিবাদীর জওয়াব এই যে, বাদী সহ-ঋণী যে সময়ে ডিক্রী পরিশোধ করে, সেই সময়ে ডিক্রীজারী বাস্তবিক বারিত হইয়াছিল; এবং সে এই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, ডিক্রী সজীব রাখার জন্য যে এক কার্য্য হয় তাহা প্রকৃত কার্য্য না হওয়ায় ডিক্রীদার তৎকালে তাহার ডিক্রী জারী করিতে স্বত্ববান ছিল না।

সেই বিষয়ে নিম্ন আদালত প্রতিবাদীর প্রতিকূলে এবং বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। প্রতিবাদীর এক্ষণে চেষ্টা এই যে, ঐ কার্য্য প্রকৃত কার্য্য হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা বিচার করি।

আমার বোধ হয় যে, আমরা সেই প্রশ্নের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। আমি বিবেচনা করি, ঐ প্রশ্ন অবশ্যই ডিক্রী জারীতে পর্য্যালোচিত হইয়াছিল, এবং আমাদের অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, আদালত বিশুদ্ধ রূপেই ডিক্রী জারী করিতে হুকুম দিয়াছিলেন, এবং বাদী ঐ যৌত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল বলিয়া প্রতিবাদীরা প্রত্যেকে আপন আপন অংশ মতে বাদীকে টাকা দিতে বাধ্য।

আমার বিবেচনায় এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

২৪ এ মার্চ ১৮৭০।

বিচারপতি, এল, এস, জ্যাক্‌সন্ এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৭০ সালের ৩৪ নং মোকদ্দমা।

মুরসিদাবাদের জজের ১৮৬৯ সালের ১১ ই ডিসেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় (প্রতিপক্ষ) আপেলাণ্ট।

বসন্তকুমার ঘোষ (প্রার্থী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে নিয়োজিত অভিভাবক আদালতের হুকুম না লইয়া তাহার ও নাবালগের এজমালী সম্পত্তি আবদ্ধ করত এক তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছে বলিয়া, তাহা তাহাকে ঐ পদচ্যুত করার যথেষ্ট হেতু হইতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাকসন।—আমি বিবেচনা করি, জজ ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে প্রদত্ত সার্টিফিকেট যথেষ্ট কারণ ব্যতীত উঠাইয়া লইয়াছেন। প্রার্থী নিজে এক জন শরীক এবং নাবালগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। দেওয়ানী আদালতের অনুমতি না লইয়া প্রার্থী কতিপয় এজমালী স্থাবর সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া দুর্গা বিবী নাম্নী এক ব্যক্তিকে এক তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

জজ বলেন যে, এই প্রকার তমঃসুক দেওয়া ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১৮ ধারার বিরুদ্ধ কার্য্য। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, তাহা ঐ ধারার বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, কারণ, দেওয়ানী আদালতের হুকুম না লইয়া ঐ প্রকার তমঃসুক প্রদত্ত হওয়ায় তাহা অবৈধ। কিন্তু তজ্জন্য এমন হইতে পারে না যে, যে দলীল আইনমতে বলবৎ থাকিবে না তাহা এক ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে বলিয়া, সে যে অভিভাবকের পদে নিয়োজিত হইয়াছে তাহা হইতে তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইবে। আমি বিবেচনা করি, ইহা সপষ্ট রূপে সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক যে, অভিভাবক দুরভিসন্ধিতে ঐ তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছে অথবা নাবালগের স্বত্বের হানি করিয়াছে, অথবা হানি করার মনস্থ করিয়াছিল। সে যে জানিয়া শুনিয়া ঐ ধারার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, তাহাও দৃস্ট হয় না; যাহা হউক, দেখা যাইতেছে যে, ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে সে এই তমঃসুক লিখিয়া দেয় এবং তাহার পরে দেওয়ানী আদালতের সম্মতিতে সে যে পত্তনী দিয়াছে তদ্দ্বারা ঐ তমঃসুক অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব আমার বোধ হয় যে, সার্টিফিকেট রহিত করার যথেস্ট হেতু ছিল না।

নাবালগের যে অভিভাবকেরও তত্ত্বাবধারকের নিজেরও ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিতে স্বার্থ আছে, এমন ব্যক্তিকে ঐ পদচ্যুত করার জন্য উৎকৃষ্ট হেতু সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক। অতএব আমি বিবেচনা করি, জজের হুকুম খরচা সমেত অন্যথা হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমিও বিবেচনা করি যে, জজ এই মোকদ্দমার অবস্থার অতি সঙ্কুচিত ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, এবং অভিভাবককে যে সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইয়াছে তাহা উঠাইয়া লওয়ার যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হয় নাই। (গ)

২৪ এ মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

ব্রজনাথ মিত্র, প্রার্থী।

বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম প্রার্থীর উকীল।

চুম্বক।—কালেক্টরের হস্তে গচ্ছিত টাকার উপর দাবীর মীমাংসা করার জন্য দেওয়ানী আদালতের প্রতি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৩৭ ধারা দ্বারা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই, এবং ক্রোকী টাকার উপর দাবীর মীমাংসা করার জন্যেও ঐ আইনের ২৪২ ধারা দ্বারা কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি বিবেচনা করি, আদালতের এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

বিচারাদিষ্ট দায়ীর নামে কালেক্টরের বহীতে যে টাকা জমা ছিল, প্রার্থীর দরখাস্ত মতে জজ তাহা ক্রোক করেন। ঐ টাকা প্রার্থী-ডিক্রীদারকে দেওয়ার হুকুম হইলে কালেক্টর বলেন যে, ঐ টাকার জন্য অন্যান্য দাবীদার আছে। সরকারী কার্য্যের জন্য গৃহীত ভূমির মুল্য বাবতে বিরোধীয় টাকা জমা ছিল, এবং দেখা যাইতেছে যে, ঐ ভূমির মুল্য কি হইবে, তাহা তদন্ত করার কালে অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি ঐ টাকার প্রতি দাবী করে, এবং তাহাদের দরখাস্ত নথীতে আছে। তাহাতে জজ ঐ বিষয়ে অতিরিক্ত হুকুম দিতে অস্বীকার করেন, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ীর ঐ টাকাতে স্বত্ব আছে কি না, তাহা স্থির করার জন্য জজ প্রার্থীকে নালিশ করিতে আদেশ করেন। জজকে ঐ বিষয়ের তদন্ত করিতে হুকুম দেওয়ার জন্য আমাদের নিকট এইক্ষণে দরখাস্ত হইয়াছে। দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৩৭ ধারায় লেখা আছে যে, "পরন্তু যদি সেই টাকা কি নিদর্শন পত্র কোন "আদালতে আমানত থাকে, তবে কোন বরাৎ "কি ক্রোকের বলে কি প্রকারান্তরে সেই "টাকাতে কি নিদর্শন-পত্রেতে সম্পর্কের দাওয়া "যে করে, আসামী ছাড়া এমত অন্য ব্যক্তির "সঙ্গে ডিক্রীদারের অধিকারের কি অগ্রগণ্যতার "কোন বিবাদ হইলে, যে আদালতে ঐ টাকা "কি নিদর্শন পত্র আমনত থাকে, সেই আদা-"লত ঐ বিবাদের নিষ্পত্তি করিবেন।" উহাতে দেখা যাইতেছে যে, কেবল দেওয়ানী আদালতে টাকা জমা থাকিলেই আদালত ঐ প্রকার সরাসরী তদন্ত করিতে পারেন। এই স্থলে, টাকা কালেক্টরের হস্তে ছিল, অতএব ঐ ধারায় এই প্রকার টাকার দাবীর মীমাংসা করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই।

২৪২ ধারারও উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু আমার বিবেচনায়, তাহা এই মোকদ্দমায় খাটে না। তদ্দ্বারা, ক্রোকী টাকা অথবা তাহার কোন অংশ প্রদান করিতে আদালতের প্রতি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকার টাকার কোন দাবীর মীমাংসা করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই। অতএব আমার বিবেচনায়, এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত। (গ)

২৫ এ মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি ই জ্যাক্সন এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৩৮০ নং মোকদ্দমা।

শিবসাগরের মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ৭ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করত ত্রক্ত্যা তে

কমিশনর ১৮৬৯ সালের ২৬ এ জুন তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রঙ্গ কপছুয়া (বাদী) আপেলাণ্ট।

দেহাছর মুসলমান ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অভয়চরণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—যে রাইয়ত কালেক্টরের খাস দখলী ভূমির জোত ভোগ করিয়া কালেক্টরকে এক নির্দ্দিষ্ট খাজানা দেয়, সে ১৭৯৯ সালের ৭ম কানুনের ২৫ ধারার মর্ম্মান্তর্গত "পেটাও জোতদার;" অতএব যদি ঐ রাইয়ত খাজানা দিতে ত্রুটি করে, তবে বৎসরের শেষে তাহার ভূমি কালেক্টর উচিত মতেই নীলাম করিতে পারেন।

বিচারপতি জ্যাকসন।—শিবসাগরের ডেপুটি কমিসনরের নিষ্পত্তি যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে, এমত নির্দ্দেশ করার কোন কারণ নাই।

কালেক্টরের খাস তত্ত্বাবধারণাধীন সম্পত্তির রাইয়ত সম্বন্ধে ১৭৯৯ সালের ৭ম কানুনের ২৫ ধারামতে ঐ কানুনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ খাটে। এই মোকদ্দমার বাদী এক জন রাইয়ত। সে তাহার জোতের খাঁজানা না দেওয়াতে বৎসরের শেষে তাহার জোত অন্য এক ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হয়। এই প্রকার জোত বিক্রয় করার ক্ষমতা কালেক্টরের প্রতি ২৩ ধারার ৬ প্রকরণের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, বাদী যে খাজানা পাইবে তাহা কালেক্টর অগ্রে ক্রোক করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই ব্যক্তি ইজারদার নহে, রাইয়ত; অতএব ক্রোক করার কিছুই ছিল না। কালেক্টর যে, ঐ কানুনমতে রাইয়তের ক্ষেত্র ক্রোক করিয়া তাহা চাস করিতে বাধ্য ছিলেন, এমত আমার বোধ হয় না। বৎসরের শেষে নীলাম করার যে প্রণালী কালেক্টর অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই ঐ কানুনের বিধি। এই মতে বিশুদ্ধ হইলে নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তিও বিশুদ্ধ হইয়াছে; অতএব আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি হবহৌস।—বিচারপতি জ্যাকসনের রায়ে আমি সম্পূর্ণ সম্মত। আমি বিবেচনা করি যে, সংক্ষেপে মোকদ্দমা এই: স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদীর ভূমি কালেক্টরের খাস দখলে আছে, এবং বাদী-রাইয়ত যে জোত ভোগ করে, তাহার এক নির্দ্দিষ্ট খাজানা সে কালেক্টরকে দেয়। অতএব সে স্পষ্টই ১৭৯৯ সালের ৭ম কানুনের ২৫ ধারার মর্ম্মান্তর্গত "পেটাও জোতদার" অনন্তর ঐ কানুনে লেখা আছে যে, সদর ইজারদার বাকীদার হইলে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, "পেটাও জোতদার" বাকীদার হইলেও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। ঐ কানুনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণে লেখা আছে যে, "যদি "কোন ভূমির ইজারদারের দেয় খাজানা চলিত "সালের সমাপ্তিতে বাকী থাকে, তবে ঐ "বাকীদারের বা তাহার জামিনদারের অধিকৃত "কোন ভূমি বা সম্পত্তি যত শীঘ্র হইতে "পারে প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় হইবে।" এই ভূমি নিঃসন্দেহই বাকীদারের ভূমি ছিল; এবং বাদী তাহাই ব্যক্ত করিয়াছে, সে তাহা নিজের ভূমি বলিয়া দাবী করে। সে স্বীকার করে এবং আদালতও তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সে ১২৭৪ সালে খাজানা দেয় নাই; অতএব ঐ বৎসরের শেষে তাহার নিকট খাজানা বাকী ছিল এবং ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে নীলাম হয়। অতএব বৎসরের শেষে তাহার নিকট খাজানা বাকী ছিল, এবং সেই বাকীর জন্য বৎসরের শেষের পরে তাহার সম্পত্তি বিক্রীত হয়। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এই নীলাম বৈধ এবং তাহা অন্যথা হইতে পারে না। (গ)

৩০ এ মার্চ্চ ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, ও দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৩৩৫ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের প্রতিনিধি মুন্সেফের ১৮৬৭ সালের ১৭ ই আগষ্টের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৯ এ জুন তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ভগবানচন্দ্র ঘোষ ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

রাজকুমার গুহ প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ভবানীচরণ দত্ত ও কাশীকান্ত সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অখিলচন্দ্র সেন ও অম্বিকাচরণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে আপীল-আদালত পক্ষগণের অথবা তাহাদের মোক্তারের সমক্ষে নূতন সাক্ষ্য লন, সে স্থলে তিনি যে কারণে তাহা লন, তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই বলিয়াই আপীলে ঐ প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু বিচারকগণের ঐ রূপ সাক্ষ্য লওয়ার হেতু সর্ব্বদাই লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং উপকারজনক।

বিচারপতি লক।—প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টগণ এই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, যখন বাদীকে রামদয়াল ও করুণাময়ী পাট্টা দেয়, তখন করুণাময়ীর স্বামী রাজকিশোর জীবিত ছিল, সুতরাং তৎকালে করুণাময়ী পাট্টা দিতে সক্ষম ছিলেন না। যে নূতন প্রমাণ দৃষ্টে অধঃস্থ জজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাজকিশোর পূর্ব্বেই লোকান্তর গমন করিয়াছিলেন, অধঃস্থ জজ মোকদ্দমার আপীলের বিচার করার কালে সেই প্রমাণ লওয়ার কোন হেতু লিপিবদ্ধ না করিয়া তাহা লওয়াতে তৎপ্রতি প্রতিবাদিগণ আপত্তি করিয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, অধঃস্থ জজের কার্য্যের দ্বারাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধঃস্থ জজ নথীস্থ প্রমাণ এই বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বিবেচনা করেন নাই; অতএব নূতন প্রমাণ লওয়ার হেতু লিপিবদ্ধ না করিয়া তাঁহার তাহা লওয়া উচিত ছিল না, এবং যদি সেই প্রমাণ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে বাদীর পাট্টা অকর্ম্মণ্য হইবে। এই তর্কের পোষকতায় খাস আপেলাণ্টেরা ৭ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১০ ও ২৫ পৃষ্ঠায় প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি, ১০ ম বালমের ২২৮ ও ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ও ১১ শ বালমের ৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নজীরের উল্লেখ করিয়াছে।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ প্রথমোক্ত মোকদ্দমায় বলিয়াছেন যে, "যে এই ক্ষমতা "অর্থাৎ আপীল-আদালতের সাক্ষীর জবানবন্দী "লওয়ার ক্ষমতা পরিচালন করার হেতু সমস্ত "সর্ব্বদা নথীতে লিপিবদ্ধ করা উচিত।" অপিচ, সেই বালমের ২৫ পৃষ্ঠায় গঙ্গাগোবিন্দ মণ্ডল আপেলাণ্টের মোকদ্দমায়, বিচারপতিগণ বলেন যে, "দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে যে বিধান আছে "যে, বিচারকগণ আপীলে নূতন প্রমাণ হইলে "তাহার হেতু সমস্ত লিপিবদ্ধ করিবেন, তাহা "যদিও এমত নহে যে, ঐ প্রকার প্রমাণ লও- "য়ার পূর্ব্বে অবশ্যই হেতু লিপিবদ্ধ করিতে "হইবে, তথাপি তাহা সর্ব্বদাই প্রতিপালন "করা উচিত। মোকদ্দমার শেষাবস্থার উচিত "বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ লইবার প্রথা "দমনার্থে ইহা একটি উপকার-জনক বিধি, "এবং হেতু লিপিবদ্ধ করিলে বিশ্বাস জন্মে "এবং আপত্তি দূর হয়।" এই আদালতের খণ্ডাধিবেশন সমস্ত এই প্রকারে গৃহীত প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন; কিন্তু প্রিবি কৌন্সিলের রায় দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি, যে স্থলে ঐ প্রমাণ লওয়া হইয়াছে, সে স্থলে তাহা লওয়ার হেতু লিপিবদ্ধ হয় নাই বলিয়াই তাহা অগ্রাহ্য

হইতে পারে না। প্রিবি কৌন্সিলের বিচার-পতিগণ যে সকল হেতু ব্যক্ত করিয়াছেন, তদনুসারে ঐ বিধি প্রতিপালন করা নিঃসন্দেহই কর্ত্তব্য, এবং অধঃস্থ জজ এই মোকদ্দমায় তাঁহার হেতু লিপিবদ্ধ না করিয়া প্রমাণ লওয়াতে অন্যায় করিয়াছেন। তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, ইহা প্রমাণ নহে বলিয়া অগ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ, ইহা পক্ষগণ অথবা তাহাদের মোক্তারের সমক্ষে লওয়া হইয়াছিল, এবং তাহারা সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে পারিত। আমি বিবেচনা করি, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। ( গ )

৩০ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ২৫৯৮ নং মোকদ্দমা।

বিষ্ণুপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৭ ই জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করত পশ্চিম বৰ্দ্ধমানের জজ ১৮৬৯ সালের ২৭ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

হরগোবিন্দ বিশ্বাস ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

দময়ন্তী দেবী ( প্রতিবাদিনী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মহেন্দ্রলাল সোম ও ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যখন কোন জমা বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ১০ আইনমতে ডিক্রীজারীতে নীলাম হয়, তখন সেই নীলামের কালে ঐ জমার কোন ভাগ বৰ্জ্জিত না হইলে সমগ্র জমাই ঐ নীলাম দ্বারা বিক্রীত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—পাট্টাদার ও দাঁড়ামত প্রতিবাদিনী দময়ন্তীর এক নালিশে ১ ও ২ নং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রীজারীতে বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের বিধানুযায়ী নীলামে বাদী খাস আপেলাণ্ট এক জমা ক্রয় করে। ১৮৬৭ সালের ২৭ এ অক্টোবর তারিখে ঐ ক্রয় হয়। বাদী কহে যে, নীলামে সে যে জমা ক্রয় করে তাহার কেবল এক অংশে সে দখল পাইয়াছে, এবং তাহার অপর ভাগ হইতে পূর্ব্ব প্রজারা তাহাকে বেদখল করিয়াছে। অতএব সে পূর্ব্ব-প্রজাদিগকে প্রধান প্রতিবাদী ও জমিদারকে ও পাট্টাদার দময়ন্তীকে দাঁড়ামত ( নাম মাত্র ) প্রতিবাদী করিয়া ঐ অংশের দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করিয়াছে। প্রথম দুই প্রতিবাদী বলে যে, বিরোধীয় ভূমির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই, কারণ, তাহা ডিক্রীজারীর নীলামে বাদীর নিকট বিক্রীত হইয়াছে, এবং তাহারা বাদীকে বেদখল করে নাই। জমিদার কোন জওয়াব দেয় নাই। পাট্টাদার বলে যে, বিরোধীয় ভূমি প্রথমে ঐ জমা-ভুক্ত থাকিলেও এক্ষণকার দাবী-কৃত ভূমি বৰ্জ্জিত রাখিয়া কতক ভূমির নীলাম হয়।

প্রথম আদালত এই নির্দ্দেশে বাদীর নালিশের ডিক্রী দেন যে, সমগ্র জমাই বিক্রীত হইয়াছে, এবং তাহার কোন ভাগ বৰ্জ্জিত ছিল না, এবং পাট্টাদার কি রূপে খাস দখল পায় তাহা প্রদর্শিত অথবা সপ্রমাণ হয় নাই, কারণ, পূর্ব্ব প্রজাদিগের ইস্তাফা দেওয়া সপ্রমাণ হয় নাই।

পূর্ব্ব প্রজাদ্বয় অথবা জমিদার আপীল করে নাই, কিন্তু পাট্টাদার দময়ন্তী আপীল করিয়াছে; এবং জজ এই বলিয়া বিষ্ণুপুরের মুন্সেফের রায় অন্যথা করিয়াছেন যে, জঙ্গল ভূমি যাহার কখন কোন কর আদায় হয় নাই তাহা যদি করদ ভূমি বলিয়া কালেক্টরের নীলাম করার ইচ্ছা

থাকিত, তাহা হইলে আদালত ঐ রাস্তা সীমা বলিয়া ব্যক্ত করিতেন; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ঐ ৪৮ বিঘা আবাদী ভূমির অব্যবহিত পশ্চিমে উইয়ের ঢিপী আছে, অতএব যদিও জজ স্বীকার করিয়াছেন যে, ঐ রাস্তায়ও উইয়ের ঢিপী আছে, তথাপি ঐ ঢিপী সকলই সীমা নহে। সাধারণ নিয়ম এই যে, যদি কোন জমা ডিক্রীজারীতে ১৮৬৫ সালের ১০ আইন মতে নীলাম হয়, তবে ঐ নীলামের কালে উক্ত জমার কোন ভাগ বর্জ্জিত না হইলে সমুদায় জমাই নীলাম হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই স্থলে কোন ভূমি বর্জ্জিত রাখা হইয়াছিল না। ইহা স্বীকৃত যে, বয়নামাতে যে উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব সীমা লিখিত আছে তাহা কবুলিয়তের লিখিত সীমার সহিত মিলে। কবুলিয়তে ঐ রাস্তা পশ্চিম সীমা বলিয়া লেখা আছে। কবুলিয়তে কোন উইয়ের ঢিপী সীমা বলিয়া লেখা নাই, এবং ঐ প্রকার সীমা লেখা থাকারও কোন সম্ভাবনা নাই। ২১ বৎসর গত হইল যখন কবুলিয়ৎ লেখা হয়, তখন কতক ভূমি আবাদ হয় এবং সেই সকল ভূমির উপরে এক এক জমা নির্দ্ধারিত হয়। অবশিষ্ট ভূমি যাহা তখন পতিত ছিল তাহার পরিমাণ অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হয়, এবং পাট্টাদাতা ও পাট্টা-গৃহীতার মধ্যে এই চুক্তি হয় যে, পাট্টা-গৃহীতা যত জঙ্গলা ভূমি পরিষ্কার করিয়া অবাদ করিবে তাহা সে তিন বৎসর পর্য্যন্ত নিষ্কর ভোগ করিবে, কিন্তু ৪র্থ বৎসরে প্রত্যেক বিঘায় ।৶০ হারে খাজানা দিবে। অতএব কবুলিয়তের সর্ত্ত অনুযায়ী কবুলিয়তের লিখিত চৌহদ্দীর অন্তর্গত ভূমি সমস্ত তল্লিখিত পরিমাণের ন্যূন বা অধিক হউক, তাহা প্রজারা ভোগ করিতে স্বত্ববান ছিল, এবং ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ পরিমাণ অনুমানের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছিল। যে বয়নামার দ্বারা ঐ জমা বাদীকে হস্তান্তরিত হয় তাহাতে, নীলামের কালে যত ভূমি আবাদ ছিল এবং কবুলিয়তের সর্ত্ত অনুযায়ী তাহার জন্য যে খাজানা৷৷ দিতে হয় তাহা লেখা আছে। কবুলিয়তে তিন দিকের অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব সীমা লেখা আছে এবং কেবল পশ্চিম দিক সম্বন্ধে এক আনুমানিক সীমা অর্থাৎ উইয়ের ঢিপী সীমা বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, কবুলিয়তে যে রাস্তা সীমা বলিয়া লেখা আছে তাহাতে উইয়ের ঢিপী আছে, এবং আমরা প্রথম আদালতের সহিত সম্মত হইয়া বলিতেছি যে, কবুলিয়তের সর্ত্ত মতে পূর্ব্ব প্রজারা যাহা ভোগ করিত, বাদীও তাহা ভোগ করিতে স্বত্ববান, কারণ ঐ নীলামের দ্বারা পূর্ব্ব প্রজার স্বত্ব বাদীর নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে এবং নীলামের সময়ে কোন ভূমি বর্জ্জিত ছিল না।

আমরা জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করত প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি বার্ষিক শতকরা ৬ টাকা হারে সুদ সহ সমুদায় আদালতের খরচা সমেত স্থির রাখিলাম। (গ)

---

৩০ এ মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্‌সন এবং এফ এ গ্লবর।

বাকরগঞ্জের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

নন্দকুমার সাহা, বাদী।

গৌরশঙ্কর ও আর এক ব্যক্তি, প্রতিবাদী।

চুম্বক।—দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৯২ ধারা-ন্তর্গত নিষেধক হুকুমের নালিশ ৯৬ ধারা মতে ক্ষতিপূরণের হুকুম না হইয়া ডিস্‌মিস্ হওয়াতে, বাদী আপীল করে, এবং প্রতিবাদীও আপীল-আদা-লতে এই বলিয়া ৩৪৮ ধারামতে আপত্তি করে যে, 'খেসারত দেওয়া হয় নাই। আপীল ডিস্‌মিস্ হয় এবং প্রতিবাদীর আপত্তি অসম্পূর্ণ ষ্টাম্পে

লিখিত হইয়া দাখিল হওয়ায় তাহার বিচার হয় না। প্রতিবাদী তাহার পরে খেসারতের জন্য পূর্ব্ব বাদীর বিরুদ্ধে নালিশ করে। এস্থলে, ৯৬ ধারানুযায়ী খেসারত দিতে অস্বীকার করা হইয়াছিল বলিয়াই উপস্থিত নালিশের বাধা হইতে পারে না।

প্রতিবাদীর প্রার্থনানুযায়ী অন্যায় নিষেধক হুকুম দ্বারা যখন বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনই বাদীর নালিশের হেতু জন্মে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই নিষেধক হুকুম জারী থাকে সেই পর্য্যন্ত ঐ হেতুও বর্ত্তমান থাকে, এবং ঐ নিষেধ সমাপ্ত হইলেই তমাদীর কালের আরম্ভ হয়।

এস্তমেজাজ।—প্রতিবাদীর পূর্ব্বাধিকারী মৃত জীবন সিংহ মুন্সেফের আদালতে বাদীর বিরুদ্ধে যে নালিশ উপস্থিত করিয়া ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯২ ধারা মতে ১৮৬৮ সালের ২৪ এ জুলাই তারিখে এক নিষেধক হুকুম বাহির করে, তাহা এই আইনের ৯৬ ধারা মতে বাদীকে খেসারত না দিয়া ১৮৬৮ সালের ১৮ ই আগস্ট তারিখে ডিস্‌মিস্ হয়। মুনসেফের ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ও বাদী উভয়েই আপীল করে। প্রতিবাদী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া আপীল করে; এবং বাদী খেসারত পায় নাই বলিয়া আপীল করে। দুই আপীলই ১৮৬৯ সালের ২৩ এ নবেম্বরে ডিস্‌মিস্ হয়, এবং বাদীর পাল্টা আপীলের দরখাস্ত কেবল ॥০ মুল্যের ষ্টাম্প কাগজে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অগ্রাহ্য হয়। বাদী আপীল-আদালতে খেসারত না পাইয়া ১৮৬৯ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর তারিখে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে, এবং তাহা তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে বলিয়া ঐ মাসের ৩১ তারিখে ডিস্‌মিস্ হয়। বাদী তাহার পরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে।

দুই পক্ষের উকীলেরাই স্বীকার করিয়াছেন যে, এই খেসারতের নালিশ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ২ প্রকরণ মতে এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে, কিন্তু কোন্ তারিখে নালিশের হেতু উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ হইতেছে। বাদীর উকীল তর্ক করেন যে, খেসারত পাওয়ার আপীল যখন ১৮৬৯ সালের ২৩ এ নবেম্বর তারিখে ডিস্‌মিস্ হয়, সেই সময়েই নালিশের হেতু জন্মিয়াছিল, কারণ, ঐ তারিখের পূর্ব্বে তাহা পাওয়ার আশা শেষ হয় নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষের উকীল তর্ক করেন যে, ১৮৬৮ সালের ১৮ ই আগস্ট তারিখে অথবা তাহার কিয়ৎকাল পরেই বাদীর খেসারতের নালিশ উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল, কারণ, মুন্সেফ তাহাকে খেসারত দিতে অস্বীকার করাতেই তাহার তাহা উপযুক্ত আদালতের সহায়তার দ্বারা পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত ছিল।

আমার এই মোকদ্দমায় যে দুই বিষয়ে সন্দেহ আছে তাহাতে আমি সবিনয়ে হাইকোর্টে রায় প্রার্থনা করিতেছি। প্রথম কথা এই যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯২ ধারামতে বে-আইনী নিষেধক হুকুম বাহির করিয়া লওয়ার গতিকে যে ক্ষতি হয় তাহার খেসারত পাওয়ার প্রশ্ন একবার আপীল-আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট হেতুবাদে অগ্রাহ্য হইলে, সেই খেসারতের জন্য পশ্চাতে নূতন নালিশ উপস্থিত হইতে পারে কি না; এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, যদি আপীল-আদালত কর্ত্তৃক দোষগুণ বিচারিত না হওয়ার হেতুবাদে ঐ নালিশ গ্রাহ্য হয়, তবে নালিশের হেতু ১৮৬৮ সালের ১৮ ই আগস্ট অর্থাৎ মুন্সেফের নিষ্পত্তির তারিখে, কি ১৮৬৯ সালের ২৩ এ নবেম্বর অর্থাৎ বাদীর আপীল ডিস্‌মিস্ হওয়ার তারিখে উত্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

হাইকোর্টের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমার বাদী মুন্সেফের আদালতের এক দেওয়ানী নালিশে প্রতিবাদী ছিল। সেই মোকদ্দমার বাদী দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৯২ ধারামতে এক নিষেধক হুকুমের প্রার্থনা করে, কিন্তু সেই নালিশ, প্রতিবাদীকে কোন খেসারত দেওয়ার হুকুম না হইয়া, পশ্চাতে ডিস্‌মিস্ হয়।

বাদী অর্থাৎ যাহার নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়, সে ঐ ডিস্‌মিসের বিরুদ্ধে আপীল করে, এবং প্রতিবাদী ৩৪৮ ধারামতে, তাহাকে খেসারত দেওয়া হয় নাই বলিয়া আপত্তি করে। বাদীর আপীল ডিস্‌মিস্ হয়, এবং প্রতিবাদী কেবল ।।০ আনার কাগজে দরখাস্ত করিয়াছে বলিয়া জজ তাহার আপত্তির বিচার করিতে অস্বীকার করেন। প্রতিবাদী এইক্ষণে পূর্ব্ব বাদীর নামে খেসারতের নালিশ করিয়াছে।

ছোট আদালতের জজ আমাদের নিকট যে, প্রশ্নের এস্তমেজাজ করিয়াছেন তাহা এই যে, প্রথমতঃ, পূর্ব্ব মোকদ্দমা ও কার্য্য সমস্ত হওয়ার পরে আবার এই নালিশ চলিতে পারে কি না; এবং দ্বিতীয়তঃ, যদি ইহা চলে এবং ছোট আদালতের বিচারাধিকার থাকে, তবে কোন্ সময় হইতে নালিশের হেতু উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

আমি বিবেচনা করি যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৯৬ ধারানুযায়ী খেসারত দিতে অস্বীকার করা হেতুই ছোট আদালত এ মোকদ্দমা গ্রহণে বারিত হইয়াছেন, এমত বলা যাইতে পারে না। ৯৬ ধারার বিধান এই যে, "ঐ "নিষেধ করিবার দরখাস্ত অনুপযুক্ত কারণে "হইয়াছে, ইহা যদি আদালত বুঝিতে পান, "কিম্বা যদি ফরিয়াদীর দাওয়া ডিস্‌মিস্ হয়, "কিম্বা ত্রুটি প্রযুক্ত কি অন্য কারণে তাহার "বিপক্ষে ডিক্রী হয়, ও মোকদ্দমা করিবার "কোন সম্ভাবিত হেতু ছিল না, ইহা যদি আদালত বুঝিতে পান, তবে সেই নিষেধক আজ্ঞা "জারী হওয়াতে তাহার যে ক্ষতি কি খরচ "হইয়াছে, তাহার পরিশোধে আসামীর দর-"খাস্তমতে আদালত হাজার টাকা পর্য্যন্ত "যত টাকা উচিত বোধ করেন ফরিয়াদীর তত "টাকা দিবার হুকুম ডিক্রীতে লিখিবেন। "পরন্তু, খেসারতের নালিশে ঐ আদালত যত "টাকার ডিক্রী করিতে পারেন এই ধারামতে "আসামীর ক্ষতি পূরণের জন্যে তাহার অধিক "টাকার হুকুম করিবেন না। এই ধারামতে "ক্ষতি পূরণের হুকুম হইলে ঐ নিষেধক আজ্ঞা-"জারী হওনের সম্পর্কে খেসারতের কোন নালিশ "হইতে পারিবেক না।" প্রথম মোকদ্দমায় মুন্সেফ কি হেতুতে খেসারত দিতে অস্বীকার করেন, তাহা এই এস্তমেজাজে দৃষ্ট হয় না। খেসারত দিতে অস্বীকারের হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আপীল করিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রতিবাদী যে কখনও খেসারতের প্রার্থনা করিয়াছিল এমত দৃষ্ট হয় না। আমি বিবেচনা করি যে, যে স্থলে ঐ ধারার বিধান এই যে, খেসারতের হুকুম হইলেই খেসারতের জন্য আর নালিশ হইতে পারিবে না, সে স্থলে প্রতিবাদী খেসারতের দরখাস্ত করিয়া অকৃতকার্য্য হইলে সেই খেসারতের জন্য পশ্চাতে নালিশ করিতে বারিত হইবে না। এই মোকদ্দমা ছোট আদালতে চলিবে কি না, সেই প্রশ্ন আমাদের সমক্ষে উপস্থিত নাই।

অর্পিত দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে, পক্ষগণ বিপরীত কথায় সম্মত না হইলে, আমি বিবেচনা করিতাম যে, এই মোকদ্দমা তমাদীর আইনের ১ ধারার ২ প্রকরণের অধীন হইবে না, কিন্তু যেহেতু ঐ প্রশ্ন আমাদের নিকট অর্পিত হয় নাই, অতএব তাহার নিষ্পত্তি করার আবশ্যক নাই। কিন্তু নালিশের হেতু উপস্থিত হওয়ার সময় সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের তর্কই ভ্রমাত্মক হই-

য়াছে। আমি বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদীর প্রার্থনানুযায়ী অন্যায় নিষেধক হুকুমের দ্বারা যখন বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তখনই ঐ মোকদ্দমার নালিশের হেতু উপস্থিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত সেই নিষেধক হুকুম জারী ছিল সেই পর্য্যন্ত নালিশের হেতুও বর্ত্তমান ছিল। ঐ নিষেধ শেষ হওয়া মাত্রেই তমাদীর কাল আরম্ভ হইবে। অতএব আমার বোধ হয় যে, মুন্সেফের অথবা আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি বাদীর নালিশের হেতুর আরম্ভ নহে। এই রায় সম্বলিত মোকদ্দমার কাগজপত্র ছোট আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

**বিচারপতি গ্লবর।**—ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজে যে উত্তর দেওয়ার প্রস্তাব হইল, তাহাতে আমি সম্মত। (গ)

---

২০এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

কৃষ্ণনগরের ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ।

দিননাথ মুখোপাধ্যায়, বাদী।

দেবনাথ মল্লিক ও আর এক ব্যক্তি, প্রতিবাদী।

বাবু দুর্গাদাস দত্ত বাদীর উকীল।

বাবু রাসবিহারী ঘোষ প্রতিবাদীর উকীল।

**চুম্বক।**—প্রদত্ত পাট্টার জন্য নজর বা সেলামী বলিয়া পাট্টা-গৃহীতা কর্ত্তৃক যে টাকা দেয়, তাহা খাজানা নহে; তাহা চুক্তির উপরে প্রাপ্য ঋণ বিবেচনা করিতে হইবে, এবং তাহা ছোট আদালতে নালিশের দ্বারা আদায় করা যাইতে পারে। যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী না হওয়াতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে, তল্লিখিত কোন চুক্তিও প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে।

**এস্তমেজাজ।**—বাদী এক কিস্তিবন্দী তমঃসুকের উপরে প্রতিবাদীর নামে ৮১ টাকার নালিশ করে। প্রতিবাদিগণ ঐ খত স্বাক্ষর করার কথা স্বীকার করত নানাপ্রকার জওয়াব দিয়া কয়েক বিষয়ে হাইকোর্টে এস্তমেজাজ করার প্রার্থনায় এক দরখাস্ত দিয়াছে। বাদী প্রতিবাদীকে যে এক ভূমির পাট্টা দেয় এবং যাহাতে প্রতিবাদী দুই বৎসরের জন্য বার্ষিক ৩৩৫ টাকার হিসাবে খাজানা দেওয়ার করার করে, সেই পাট্টার সহিত একই সময়ে এই তমঃসুক স্বাক্ষরিত হয়। তমঃসুকে লেখা আছে যে, বাদী প্রতিবাদীকে তৎকালে নগদ যে টাকা দেয় এবং যাহা প্রতিবাদিগণ কিস্তিবন্দীর দ্বারা পরিশোধ করার সর্ত্ত করে তজ্জন্য এই তমঃসুক প্রদত্ত হয়, কিন্তু আরজীতে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, তৎকালে নগদ টাকা দেওয়া হয় নাই, ঐ পাট্টার নজরের পরিবর্ত্তে এই তমঃসুক প্রদত্ত হয়। এই বিষয়ে বাদীর নিজের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে এবং সে বলে যে, ইহা সেলামীর বাবতে প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রতিবাদীরা যে কয়েক জন সাক্ষী দিয়াছে তাহারা বলে যে, পাট্টায় লিখিত খাজানার অতিরিক্ত খাজানার পরিবর্ত্তে ঐ তমঃসুক লিখিয়া দেওয়া হয়। আমার বিবেচনায় প্রমাণের এই অনৈক্যতায় অধিক আইসে যায় না। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, প্রতিবাদিগণ বাদীর ভূমি জমা লওয়া সম্বন্ধে ঐ তমঃসুক দেওয়া হয়, এবং তাহা নজর কি সেলামী অথবা অতিরিক্ত খাজানার বাবতেই দেওয়া হইয়া থাকুক, প্রতিবাদীরা তাহা দেখিয়াশুনিয়াই দিয়াছে এবং কেহ বলপূর্ব্বক তাহাদের দ্বারা তাহা লেখাইয়া লয় নাই। অনন্তর, তাহাদের আপন প্রদর্শনমতেই দেখা যাইতেছে যে, তাহারা ঐ তমঃসুকের মূল্যের সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিয়াছে, কারণ, তাহারা ঐ ভূমির দখল পাইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট দুই বৎসরের জন্য তাহা ভোগ করিয়াছে।

আমি হাইকোর্টে যে প্রথম কথার এস্তমে-

জাজ করিতেছি তাহা এই যে, এই কিস্তিবন্দী তমঃসুকের উপর নালিশ এই আদালতের কি মাল্ আদালতের বিচারাধীন? আমার রায় (যাহা আমি ব্যক্ত করিতে বাধ্য) এই যে, ঐ তমঃসুকের উপর নালিশে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার আছে।

এই মোকদ্দমার অনুরূপ এক মোকদ্দমা (ভবসুন্দরীবঃ নওয়াব আবদীন), ৮ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩১১ পৃষ্ঠায় আছে। তাহাতে বার্ষিক ৫৮০০ টাকার এক পাট্টা ছিল। ঐ পাট্টা ও কবুলিয়তের একই সময়ে প্রতিবাদী এক স্বতন্ত্র একরার লিখিয়া দেয় যে, প্রতি বৎসর সে বাদীকে কতিপয় দ্রব্য দিবে এবং যদি সে তাহা না দেয়, তবে বাদী তাহার মুল্যের জন্য নালিশ করিতে পারিবে। আমি বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদিগণ নির্দ্দিষ্ট কতক টাকার তমঃসুক লিখিয়া দিয়া তাহাদের আপন কার্য্য দ্বারাই ঐ টাকা খাজানার শ্রেণী হইতে বাহির করিয়া লইয়াছে। তাহা খাজানা হইলে কি জন্য পাট্টা ও কবুলিয়তে লেখা হয় নাই? ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, তমঃসুক ও কবুলিয়ৎ এই দুই দলীলের মুল্যই এক বিষয় হইতে উত্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ পাট্টার ভূমি হইতে প্রতিবাদীরা যে উপকার পাইবে তাহা হইতে উত্থিত হইয়াছে। তাহারা বাদীকে দুই স্বতন্ত্র প্রকারে টাকা দিবার করার করে, অর্থাৎ কতক কবুলিয়ৎ অনুযায়ী খাজানার স্বরূপে ও কতক টাকা তমঃসুক পরিশোধের দ্বারা দিবার করার করিয়াছে।

এই রায়ের প্রতিপোষক আর একটি নজীর ২য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৫ পৃষ্ঠায় রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বনাম মহম্মদ আলীর মোকদ্দমায় আছে। তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, বাকী খাজানার জন্য প্রদত্ত এক কিস্তিবন্দী খত কেবল ঋণ মাত্র, এবং তজ্জন্য ছোট আদালতে নালিশ চলিতে পারে।

আমার দ্বিতীয় এজমেজাজ এই যে, আরজীর লিখিত কথায় ও প্রমাণে এমন অনৈক্যতা আছে কি না, যদ্দ্বারা নালিশ ন্যায্য রূপে ডিস্‌মিস্ করা যাইতে পারে? প্রতিবাদীর উকীল তর্ক করেন যে, যে স্থলে আরজীতে তাহা নজর বলিয়া লেখা আছে এবং বাদী আপন জবানবন্দীতে তাহা সেলামী বলিয়াছে, অতএব এই অনৈক্যতার গতিকে নালিশ ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত। আমি বিবেচনা করি, এই অনৈক্যতা, (যদি তাহা অনৈক্যতা বলা যাইতে পারে) কোন কাজের নহে, কারণ, ঐ দুই শব্দেই সাধারণতঃ এক বিষয় বুঝায়। উইলসনের ভারতবর্ষীয় শব্দের অভিধানে নজরের অর্থ এই রূপ লিখিত হইয়াছে, যথা—"অধীন "ব্যক্তি তাহার উচ্চ ব্যক্তিকে কোন পবিত্র ব্যক্তিকে "অথবা রাজাকে যে উপঢৌকন দেয়, এবং "কোন কর্ম্মে নিয়োজিত হইলে অথবা কোন "সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলে রাজাকে অথবা "রাজার, স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে যে টাকা বা "কি দিতে হয় এবং তাহা সাধারণতঃ উপঢৌকন "বুঝায়।" এবং "সেলামী" শব্দে অবধান "ও তোষ-বাক্য সম্বন্ধে ভেট উপঢৌকন, যে "ব্যক্তির দ্বারা কোন পদে অভিষিক্ত হওয়া "যায় তাহাকে ঐ কর্ম্মের প্রথম উপার্জ্জিত অর্থ প্রদান, উচ্চ পদ-বিশিষ্ট "ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলে তাঁহাকে "যে ভেট দেওয়া যায়, পাট্টা পাওয়ার "জন্য অথবা খাজানার বন্দোবস্তের জন্য "অথবা কোন বাস্তবিক বা আনুমানিক উপকার "পাওয়ার জন্য যে টাকা দেওয়া হয়, নিষ্কর "জমা ভোগ করার জন্য বার্ষিক যে টাকা "দেওয়া হয়," এই সকল বুঝায়।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, তমঃসুকের লিখিত টাকা এমত আবওয়াব কি না, যাহা আদায় হইতে পারে না। আমার বিবেচনায় এরূপ মর্ম্ম গ্রহণ অসঙ্গত। উক্ত ৮ ম বালম উইক্লি

রিপোর্টরের ৩১৩ পৃষ্ঠায় ভবসুন্দরীর মোক্দমায় উল্লিখিত দ্রব্য সমস্ত দেওয়ার একরার যেমন আবওয়ার নহে, তদ্রূপ এই তমঃসুকের লিখিত টাকাও আবওয়াব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; বিশেষতঃ, প্রতিবাদিগণ পাট্টামতে দখল লওয়ার পূর্ব্বে ইচ্ছা করিয়া ঐ টাকা দিবার করার করিয়াছে।

প্রতিবাদিগণ তাহাদের দরখাস্তে হাইকোর্টে পাঁচটি বিষয়ের এস্তমেজাজের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক উল্লিখিত তিন বিষয় ভুক্ত।

আর একটি আপত্তি আছে, যৎসম্বন্ধে আমি নিজেই এস্তমেজাজ করা উচিত বিবেচনা করি। বাদীর দাবী আইন-বিরুদ্ধ নহে এবং তাহা এই আদালতে চলিবে অনুমান করিলেও, প্রতিবাদিগণ নানা প্রকারে টাকা পরিশোধ করার অর্থাৎ ওজেবাদের জওয়াব দিয়াছে ঐই যে সকল টাকা প্রতিবাদীরা বাদ দেওয়ার দাবী করে, তাহার কতক অংশ বাদী খাজানার বাবতে উসুল দিয়াছে, কতক বাদীর কতিপয় নিজাবাদে এবং কতক খাজানা তহশীলের ও মোকদ্দমা ইত্যাদির বাজে খরচে ব্যয় হয়। প্রতিবাদিগণ এই সকল করাতে যে টাকা মিনাহ পাওয়ার দাবী করে, তাহা সমুদায় তাহাদের নামে উসুল দিলে পাট্টার অন্তর্গত খাজানা এবং বিরোধীয় তমঃসুকের টাকা, উভয়ই পরিশোধিত হইয়া যায়; কিন্তু বাদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরের মধ্যে যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ দেওয়া লওয়া হয়, তাহাই খাজানা, হইতে ঐ সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার ক্ষমতার মুল। পাট্টা দাখিল হয় নাই, এবং স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহা রেজিষ্টরী হয় নাই, এবং কবুলিয়ৎ যাহা ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ২ ধারার মর্ম্মানুসারে অবশ্য রেজিষ্টরী করিতে হইবে তাহা তদভাবে ঐ আইনের ৪৯ ধারা ও ১৭ ধারার ৪ প্রকরণমতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। বাদী প্রতিবাদিগণের নামে ইতিপূর্ব্বে যে মাল আদালতে বাকী খাজানার জন্য এক নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল, সেই আদালত কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী হয় নাই বলিয়া ঐ নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

অতএব এই সকল বাদ দেওয়ার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আমার এস্তমেজাজ এই যে, যে স্থলে প্রতিবাদীর কথিত ওজেবাদ দেওয়ার অনুমতি-সূচক মুল দলীল প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য নহে, সে স্থলে বাচনিক সাক্ষ্য দ্বারা ঐ অনুমতি সপ্রমাণ করা যাইতে পারে কি না?

১০ আইনের মোকদ্দমায়, কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী হয় নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে বাচনিক প্রমাণ গৃহীত হইতে পারে না বলিয়া নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়। প্রতিবাদীরা আইনের যে অর্থ দ্বারা সেই মোকদ্দমায় দায়ী হয়, তাহা এই মোকদ্দমায় তাহাদের জওয়াবের পক্ষে সাংঘাতিক হইবে। উভয় পক্ষের জন্যই ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, তাহারা পাট্টা কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী করিয়া লয় নাই। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, প্রমাণ হইতে এই সকল দলীল বর্জ্জিত হওয়ায় উভয় পক্ষের প্রতি সুবিচারের ব্যাঘাত হইতেছে।

শেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার রায় এই যে, বাচনিক প্রমাণ লওয়া যাইতে পারে না। রেজিষ্টরী না হওয়াতে পাট্টা এবং কবুলিয়ৎ উভয়ই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে, এবং এই প্রকার অবস্থায় হাইকোর্ট অনেক স্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গৌণপ্রমাণ অগ্রাহ্য (দেখ রহমতুল্লা বনাম সরিয়তুল্লা বাগচী, ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির ৫১ পৃষ্ঠা)। আইনের যুক্তি এই যে, লোকে যে চুক্তি লিখিতপড়িত করে তৎসম্বন্ধে সেই লিখিত দলীলের পরিবর্ত্তে বাচনিক প্রমাণ লওয়া যাইতে পারে না। এই প্রকার স্থলে ঐ লেখাই সর্ব্বোপরি সপ্রমাণ করিতে হইবে। ঐ লেখা বিরোধীয় প্রশ্নের কেবল আনুসঙ্গিক

হইলে, সে স্বতন্ত্র কথা হইত। কিন্তু এ স্থলে পক্ষগণ এই একরার লিখিতপড়িত করে যে, এক নির্দ্দিষ্ট প্রকারে অর্থাৎ বাদীর জন্য নিজাবাদ ভূমি চাস করিয়া এবং তাহার জন্য অন্যান্য বাবতে ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া খাজানা পরিশোধিত হইবে। এই প্রকার কোন একরার না দেখাইলে প্রতিবাদিগণ বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে ওজেবাদ দিতে পারে না, এবং আমি বিবেচনা করি, যে স্থলে উভয় পক্ষই সম্মত হইয়া ঐ একরার লিখিতপড়িত করিয়াছে, সে স্থলে তাহারা ঐ লিখিত দলীল ভিন্ন (আইনের উল্লিখিত যুক্তি অনুসারে) অন্য প্রকার প্রমাণ অবলম্বন করিতে আপনারাই নিবারিত হইয়াছে।

প্রতিবাদিগণ ১০ আইনের মোকদ্দমায় ঐ যুক্তির সম্পূর্ণ উপকার লাভ করিয়াছে; এবং আমি বিবেচনা করি যে, ন্যায়পরত্ব, বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আইন অনুসারে তাহা এই মোকদ্দমায়ও অবলম্বন করা উচিত।

হাইকোর্টের রায়ের অধীনে আমি বাদীকে ডিক্রী দিলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমায় জজ ৪ টি প্রশ্ন হাইকোর্টের রায়ের জন্য অর্পণ করিয়াছেন; তন্মধ্যে তিনটি প্রশ্ন প্রতিবাদীর প্রার্থনামতে এবং চতুর্থটি জজের আপন ইচ্ছামতে অর্পিত হইয়াছে। প্রথম তিন কথার মধ্যে, প্রতিবাদীর পক্ষে এই আদালতে যে উকীল উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি কেবল এক কথা সম্বন্ধে তর্ক করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, এবং তাহা এই যে, এই মোকদ্দমা বিচার করিতে ছোট আদালতের ক্ষমতা আছে কি না।

আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই মোকদ্দমা ছোট আদালতে চলিতে পারে। দাবী কৃত টাকা প্রতিবাদীর দস্তখতী এক তমঃসুকের অন্তর্গত টাকা, এবং তাহাতে ঐ টাকা কর্জ্জা টাকা বলিয়া বর্ণিত আছে। আরজীতে লেখা আছে যে, ইহা নজর স্বরূপে দেয় ছিল, এবং বাদী আপন জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, ইহা সেলামীর টাকা। পাট্টাগৃহীতা ঐ পাট্টা পাইবার জন্য যে টাকা প্রদান করে, ঐ দুই শব্দেই তাহা বুঝায়, এবং দেখা যাইতেছে যে, এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী বাদীর নিকট হইতে এক জমা লয় এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ দেওয়ালওয়া হয়। প্রতিবাদী তর্ক করে যে, এই টাকা খাজানার বাবতে দেওয়ার করার হয়। আমার বিবেচনায় ইহাকে খাজানা বলা যাইতে পারে না; ইহা কেবল এক চুক্তির (বজ্জিত প্রকারের চুক্তি নহে) উপরে প্রতিবাদীর দেয় ঋণ; অতএব তাহা ছোট আদালতের দ্বারা আদায় হইতে পারে।

যে দ্বিতীয় প্রশ্ন জজের দ্বারা অর্পিত হইয়াছে এবং যাহা আমাদের সমক্ষে তর্কিত হয় নাই, আমাদের তাহার উত্তর দিতে হইলে মোকদ্দমার দোষ গুণের বিচার করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধেও প্রতিবাদীর উকীল এই আদালতে তর্ক করেন নাই এবং না করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্যই করিয়াছেন। দাবী-কৃত টাকা আবওয়াব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

চতুর্থ প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বিবেচনায়, জজের রায়ই বিশুদ্ধ। বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদিগণ ওজেরাদ দিতে চাহে, এবং তাহারা বলে যে, পক্ষগণের মধ্যে যে এক বিশেষ চুক্তি হয়, সেই চুক্তিমতেই তাহাদের ঐ ওজেবাদ দেওয়ার স্বত্ব আছে। সেই চুক্তি ঐ তমঃসুকে লেখা নাই, কিন্তু তাহা লিখিত হইয়াছে, এবং তাহা পাট্টা ও কবুলিয়তে আছে। এই দুই দলীল রেজিষ্টরী না হওয়াতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং রেজিষ্টরীর অভাবে বাদী প্রতিবাদীর একরার সপ্রমাণ করিতে অকৃতকার্য্য হওয়ায়, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদীর খাজানার নালিশ ডিস্-

মিস্ হইয়াছে। এমত অবস্থায় ঐ চুক্তি মতে প্রতিবাদীরা যে ওজেবাদ দেওয়ার দাবী করে তাহা তাহাদিগকে উত্থাপন ও সপ্রমাণ করিতে দিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, বাদীর অনুকুলেই সকল প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে; বাদী এই এস্তমেজাজের খরচা পাইবে। উকীলের ফিস ১৬ টাকা নির্দ্ধারিত হইল।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম;

(গ)

---

৩১ এ মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ৬ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জজের ১৮৬৯ সালের ২ রা অক্‌টোবরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

শ্রীনাথ মজুমদার (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

ব্রজনাথ মজুমদার (বিচারাদিষ্ট দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ভগবতীচরণ ঘোষ ও শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ভূমি ও অস্থাবর সম্পত্তির দখলের এক ডিক্রী হওয়াতে, প্রতিবাদী, কেবল অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে আপীল করে, এবং আপীল-আদালতে ভূমির বিষয়ে কোন কথা উত্থিত হয় না। অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে আপীল-আদালত নিম্ন আদালতের ডিক্রী কিঞ্চিৎ রূপান্তর করিয়া ডিক্রী দেন।

এস্থলে, আপীল-আদালতে ঐ কার্য্য দ্বারা ভূমির দখলের ডিক্রী সজীব থাকে না।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—বাদী এই মোকদ্দমায় কতিপয় ভূমির ও অস্থাবর সম্পত্তির দখল অথবা ঐ অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করে। ১৮৬৬ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখে সে ঐ ভূমির ও অস্থাবর সম্পত্তির জন্য ডিক্রী পায়।

ভূমি সম্বন্ধে উভয় পক্ষই এই ডিক্রীতে সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রতিবাদী হাইকোর্টে আপীল করে।

ভূমি সম্বন্ধে হাইকোর্টে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই এবং তৎসম্বন্ধে প্রথম আদালতের ডিক্রীর প্রতি হস্তক্ষেপ করারও কোন চেষ্টা হয় নাই। ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চ তারিখে হাইকোর্ট ঐ অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে এক সংশোধিত ডিক্রী প্রদান করেন। ১৮৬৯ সালের ২৬ এ এপ্রিল তারিখে উপস্থিত আপেলাণ্ট অর্থাৎ ডিক্রীদার তাহার ডিক্রী-কৃত ভূমির দখল পাওয়ার জন্য ডিক্রীজারীর প্রথম দরখাস্ত করে, কিন্তু নিম্ন আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, ডিক্রীর এই ভাগ তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে, এবং তাহা জারী করিতে অস্বীকার করেন।

আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, এই ডিক্রী এক ডিক্রী বিবেচনা করিতে হইবে, অতএব ডিক্রীর প্রকৃত তারিখ ১৮৬৬ সালের ২৪ এ এপ্রিল নহে, ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চ; এবং যে স্থলে ডিক্রীদার ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চের পরে তিন বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত করিয়াছে, সে স্থলে সে উচিত সময়ের মধ্যেই আছে।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ভূমির দখলের ডিক্রী ১৮৬৬ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখে প্রদত্ত হয় এবং ঐ ভূমির দখল সম্বন্ধে অন্য কোন ডিক্রী বর্ত্তমান নাই। অতএব আমাদের বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, ভূমির দখলের ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য কোন কার্য্য হইয়াছে কি না, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ২৬ এ এপ্রিল তারিখের

এই দরখাস্তের পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে ঐ ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য কোন কার্য্য করা হইয়াছে কি না? ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের পূর্ব্বে এই ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য কোন কার্য্য করা হয় নাই।

কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, হাইকোর্টের যে আপীল ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চ তারিখে সমাপ্ত হয়, তাহাতে ডিক্রীদার উপস্থিত থাকাতে তাহাই ১৮৬৬ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখের ডিক্রী বলবৎ রাখার কার্য্য হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের ২৪ এপ্রিলের ডিক্রী ভূমির দখলের জন্য প্রদত্ত হয়। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি হয় তাহার সহিত ডিক্রীর যে ভাগে ভূমির দখলের কথা আছে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল ডিক্রীর যে ভাগে অস্থাবর সম্পত্তির কথা ছিল তাহার সহিত ঐ নিষ্পত্তির সম্বন্ধ ছিল। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য যে কার্য্য হইয়াছিল তাহা আমরা ভূমি সম্বন্ধীয় ডিক্রী বলবৎ রাখার কার্য্য বলিতে পারি না। ১৮৬৬ সালের ২৪ এ এপ্রিল তারিখের ডিক্রীতে দুই পৃথক্ পৃথক্ কথা ছিল। প্রথম কথা অর্থাৎ ভূমির দখল সম্বন্ধে, ডিক্রীদারের নিজের প্রদর্শন মতেই দেখা যাইতেছে যে, এই দরখাস্তের পূর্ব্বে সে অন্য কোন কার্য্য করে নাই। দ্বিতীয় কথা অর্থাৎ অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে যদিও ডিক্রীদার কিছু কার্য্য করিয়াছে, তথাপি তাহা কোন প্রকারেই ভূমির দখল সম্বন্ধীয় কার্য্য বলা যাইতে পারে না। আমরা বিবেচনা করি যে, ডিক্রীর তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ভূমির দখল সম্বন্ধীয় ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য ডিক্রীদার যে, কোন কার্য্য করিয়াছে, এমত সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই; অতএব সে আদালতে আসিতে পারে না।

খরচা সমেত আমরা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। উকীলের ফীস ২ মোহর দেওয়া গেল।　　　　(গ)

## বিচারপতি এল এস জ্যাক্‌সন এবং এফ এ গ্লবর।

ওম্‌রাও বেগম এবং আর এক ব্যক্তি, প্রার্থী।

মেৎ আর টি এলেন প্রার্থীর উকীল।

চুম্বক।—হাইকোর্টের খণ্ডাধিবেশনের বিচারপতিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হইলে, রাজকীয় সনন্দের ১৫ দফা মতে হাইকোর্টে আপীল করিতে লোকের যে স্বত্ব আছে, তাহা কেবল আপীলের চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে মতভেদ হইলেই পরিচালিত হইতে পারে; কিন্তু আপীলে উত্থাপিত প্রসঙ্গ সমস্তের মধ্যে দুই এক কথায় মতভেদ হইলে সেই স্বত্বের উদ্ভব হয় না।

কেবল এমত সকল স্থলেই হাইকোর্ট কারণ দর্শাইবার হুকুম দিতে পারেন, যাহাতে, যে ব্যক্তি ঐ হুকুম প্রার্থনা করে সে যে তর্ক উপস্থিত করে তাহা প্রতিপক্ষের দ্বারা খণ্ডিত না হইলে তদ্দ্বারাই সেই হুকুম চূড়ান্ত হইতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—বিচারপতি লক ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের এক অধিবেশনের গত ২৬ এ এপ্রিল তারিখের এক নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারা মতে কি জন্য আপীল গৃহীত হইতে পারিবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য প্রতিপক্ষের উপরে হুকুম জারী হওয়ার নিমিত্ত মেৎ এলেন আমাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।

এই দরখাস্ত যাহা মেৎ এলেন আমাদের নিকট দিয়াছেন তাহাতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করার বিলম্বের কারণ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল কারণের বিচার করার আবশ্যক নাই, কারণ, আমি বিবেচনা করি যে, অন্যান্য কারণেই এই হুকুম জারী করা উচিত নহে।

১৫ ধারার বিধি এই যে, "হাইকোর্টের "এক জন জজের রায় (কোন ফৌজদারী

"মোকদ্দমায় যে দণ্ডের হুকুম হয় তাহা নহে)
"অথবা ঐ হাইকোর্টের কোন খণ্ডাধিবেশনের
"কোন এক জজের অথবা উক্ত হাইকোর্টের
"দুই বা অধিক জজের রায়ের বিরুদ্ধে অথবা
"কোন খণ্ডাধিবেশনের জজগণের তুল্যাংশে
"মতভেদ হইলে কিন্তু সেই মত উক্ত হাইকোর্টের
"সমুদায় জজের মধ্যে অধিকাংশ জজের মত না
হইলে তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।"

এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই যে, এই সকল প্রার্থী যে আপীল করে তাহাতে কয়েকটি আইন-ঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হয়। ঐ সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে এক প্রশ্ন যাহা এই ক্ষণে মোকদ্দমার মূল প্রশ্ন বলিয়া কথিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে কনিষ্ঠ বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র প্রার্থীদিগের বিরুদ্ধে অতি স্পষ্ট রায় ব্যক্ত করেন। বিচারপতি লক রায় প্রদান করার কালে বলেন যে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ঐ দ্বিতীয় বিজ্ঞবর বিচারপতি যাহা বলিয়াছেন, 'তিনি তত দূর বলিতে চাহেন না, কিন্তু তিনি সমুদায় দৃষ্টে আপীল ডিস্‌মিস্ করার রায়েই সম্মত।

এইক্ষণে তর্কিত হইয়াছে যে, জ্যেষ্ঠ বিচারপতি লক ঐ কথা বলাতেই তাঁহার সহিত দ্বিতীয় বিচারপতির মতভেদ হওয়ার কথা ব্যক্ত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; অতএব এই মতভেদের হেতুতেই পরাজিত পক্ষ ১৫ ধারা মতে আপীল করিতে স্বত্ববান হইয়াছে।

আমার মতে তাহা নহে। আমি বিবেচনা করি যে, দুই জন জজের অথবা তুল্য সংখ্যক বিচারপতিগণের মধ্যে মতভেদ হইলে লোকের হাইকোর্টে আপীল করার যে স্বত্ব আছে তাহা কেবল আপীলের চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে মতভেদ হইলেই পরিচালিত হইতে পারে; আপীলে উত্থিত প্রসঙ্গ সমস্তের মধ্যে কেবল দুই এক কথায় মতভেদ হইলে সেই স্বত্বের উদ্ভব হইতে পারে না। যদি ইহার বিরুদ্ধ অর্থ প্রবল হয় তাহা হইলে অসংখ্য আপীল হইবে, কারণ, সর্ব্বদা এমন ঘটে যে, খণ্ডাধিবেশনের বিচারপতিগণ আপীলের মূল নিষ্পত্তিতে সম্মত হইয়াও কোন না কোন কথায় পরস্পর ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন হেতু দর্শাইয়া নিষ্পত্তি করেন। এই মোকদ্দমায় যে কথা সম্বন্ধে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণের মতভেদ হইয়াছিল তাহাই প্রধান বিষয় হইলেও এবং তাহাতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্বন্ধেও মতভেদ হওয়া উচিত হইলেও আমার বিবেচনায়, কোন ইতরবিশেষ হয় না। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বিচারপতি লক তদ্রূপ বিবেচনা করেন নাই, এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন ভ্রম হইয়া থাকিলে হাইকোর্টে আপীলের দ্বারা তাহার সংশোধন হইতে পারে না।

মেং এলেন তর্ক করেন যে, এই প্রশ্ন নূতন এবং নিতান্ত আবশ্যকীয়, অতএব আপীলে তাহা তর্কিত হওয়ার জন্য তাঁহাকে প্রার্থিত হুকুম দেওয়া আমাদের উচিত; এবং তিনি বলেন যে, তিনি আপনাকে দায়গ্রস্ত করিয়া এই প্রার্থনা করিতেছেন, এবং তিনি আপীলে অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহারই খরচা দিতে হইবে। আমি বিবেচনা করি যে, কেবল এমত সকল স্থলেই আমাদের ঐ রূপ হুকুম দেওয়া উচিত যাহাতে, যে ব্যক্তি ঐ হুকুম প্রার্থনা করে, সে যে তর্ক উপস্থিত করে, তাহা প্রতিপক্ষের দ্বারা খণ্ডিত না হইলে তদ্দ্বারাই ঐ হুকুম চূড়ান্ত হইতে পারে। কিন্তু এই মোকদ্দমার অবস্থা সেরূপ নহে; অতএব আমার বিবেচনায়, এই প্রার্থনা গ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

১ লা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং জে, পি, নর্ম্যান।

১৮৭০ সালের ৩৫ নং মোকদ্দমা।

গয়ার মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ৬ ই নবেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ৮ ই নবেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মেওয়া সিংহ প্রভৃতি (ডিক্রীদার)
আপেলাণ্ট।

আজীজুদ্দীন খাঁ প্রভৃতি (বিচারাদিষ্ট দায়ী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল আপেলাণ্টের
উকীল।

বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক নালিশের ডিক্রী হওয়ার পরে প্রতিবাদিগণ আপীল করে, কিন্তু দুই পক্ষই আপোস নিষ্পত্তি করিয়াছে বলিয়া আপীল-আদালতে দরখাস্ত করাতে আপীল নথী-খারিজ হয়। বাদিগণ এইক্ষণে তাহাদের মুল ডিক্রী জারী করার জন্য দরখাস্ত করাতে, স্থির হইল যে, যেহেতু আপীল-আদালত প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন নাই, অতএব প্রথম আদালতের ডিক্রী এখনও বলবৎ রহিয়াছে; সুতরাং বাদী ডিক্রীদারগণ আপনাদের একরারের দ্বারা ঐ ডিক্রীজারী করিতে যত দূর নিবারিত হইয়াছে, তাহা বাদে তাহারা ঐ ডিক্রী জারী করিতে পারে।

বিচারপতি নর্ম্যান্।—বাদিগণের অসম্মতিতে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যে দুই জলপ্রণালী খোলা হইয়াছে তাহা বন্ধ করার প্রার্থনায় বাদিগণ প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে এক নালিশ উপস্থিত করে।

বাদিগণের ঘোষিয়া গ্রাম হইতে প্রতিবাদিগণের কুড়া গ্রামে জল লইয়া যাওয়ার জন্য ঐ জলপ্রণালী প্রস্তুত হয়। ১৮৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিক্রী হইয়া ব্যক্ত হয় যে, বাদিগণ তাহাদের নিজের ব্যয়ে ঐ দুই জলপ্রণালীই বন্ধ করিতে স্বত্ববান, এবং তাহারা প্রতিবাদিগণের নিকট খরচা আদায় করিতে পারে।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদিগণ প্রধান সদর আমীনের নিকট আপীল করে, এবং আপীল-আদালতে মোকদ্দমা মুলতবী থাকার কালে দুই পক্ষই ১৮৬২ সালের ১১ ই ডিসেম্বর তারিখে দুই দরখাস্ত করে যে, তাহাদের মধ্যে বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, পাইনের জল যাহা উত্তরদিক হইতে দক্ষিণে যায় এবং যাহা বাদিগণ কড়া বলিয়া ডাকে, তদ্দ্বারা প্রথমে বাদীর ভূমিতে জলসেচন হইবে এবং তাহার পরে জলের কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে সেই উদ্বৃত্ত জল প্রতিবাদীর মৌজার মধ্য দিয়া তাহার ভূমিতে জলসেচন করার নিমিত্ত যাইতে দেওয়া হইবে; এবং আরও বন্দোবস্ত হইয়াছে যে, মোকদ্দমা নথী-খারিজ হইবে এবং মৌজা ঘোষিয়ার পাইন সুক্কা অর্থাৎ আহীর যাহা মুল জলাধার, তাহার উপরে প্রতিবাদীর কোন দাবী থাকিবে না। এই দরখাস্ত অনুসারে আপীল নথী-খারিজ হয়।

বাদিগণ এইক্ষণে প্রথম আদালতের ডিক্রীজারী করিতে প্রার্থনা করিয়াছে। প্রধান সদর আমীন প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন নাই এবং বাদীরা তাহাদের আপন একরারের দ্বারা ডিক্রীজারী করিতে যত দূর নিবারিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ডিক্রী বলবৎই আছে। খরচা সম্বন্ধে ডিক্রীজারী হইয়াছে। পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমের জলপ্রণালী সম্বন্ধে ডিক্রী ঐ একরারের দ্বারা অন্যথা হয় নাই, অতএব তাহা এইক্ষণে জারী হইতে পারে। উত্তরদিক হইতে দক্ষিণের জলপ্রণালীর ডিক্রী সম্বন্ধে প্রতিবাদিগণ জেদ করিতে পারে যে, তাহা বাদি-কর্ত্তৃক জারী হইতে পারিবে না; কিন্তু ঐ জলপ্রণালী সম্বন্ধে প্রতিবাদিগণ যদি বাদিগণকে ডিক্রীজারী করিতে নিবারণ করিতে চাহে, তবে তাহাদের দেখাইতে হইবে যে, সেই জল-প্রণালী সম্বন্ধে তাহাদের পক্ষের চুক্তিও তাহারা সম্পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছে, অর্থাৎ বাদীর নিজের ভূমির জলসেচনের জন্য বাদীকে তাহারা প্রথমে ঐ মৌজার কড়া

হইতে জল লইয়া যাইতে দিতে প্রস্তুত আছে। যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদিগণ তাহা করিবে, সে পর্য্যন্ত আদালত বাদিগণকে তাহাদের একরারের বিরুদ্ধে উত্তর দক্ষিণ প্রণালীর জল বন্ধ করিয়া উদ্বৃত্ত জলের দ্বারা প্রতিবাদিগণের ভূমিতে জলসেচন নিবারণ করিতে দিবেন না।

অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অশুদ্ধ হইয়াছে, কারণ, তিনি বিবেচনা করিয়াছেন যে, ঐ আপোসের দরখাস্তের গতিকেই ডিক্রী এইক্ষণে জারী হইতে পারে না।

প্রতিবাদিগণকে ঐ একরারমতে আইনের উত্তর দক্ষিণ প্রণালীর উদ্বৃত্ত জল ব্যবহারে নিবারণ করিতে বাদিগণ যে চেষ্টা করিতেছে, এমত অনুমান করার হেতু আছে।

যেহেতু দুই পক্ষেই কিছু কিছু দোষ আছে, অতএব ডিক্রী জারীর মোকদ্দমার প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন খরচা বহন করিবে। (গ)

---

১ লা এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং জে, পি, নর্ম্যান্।

১৮৭০ সালের ৩৯ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ ডিসেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

দেবীপ্রসাদ সিংহ (প্রার্থী) আপেলাণ্ট।

সৈয়দ দেলাওর আলী (প্রতিপক্ষ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরি ও বাবু কালীকৃষ্ণ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—খাজানার মোকদ্দমার ডিক্রীতে কালেক্টর এমন নির্দ্দিষ্ট হুকুম দিতে পারেন না যে, বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ ডিক্রী জারী হইয়া টাকা আদায় হইবে।

বিচারপতি নর্ম্যান্।—এই মোকদ্দমায় খাস আপীল চলে না। আমি বিবেচনা করি যে, এই বিষয়ে অনেক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে যাহা কখনই হওয়া উচিত ছিল না। ছোট আদালতে এক ডিক্রী হয় যে, গোলা নামক গঞ্জের ভাড়াটিয়ার গোমাস্তা, বাদীকে তাহার দাবী-কৃত টাকা দিবে এবং তাহার ঐ ডিক্রী উক্ত ভাড়াটিয়া দেবীপ্রসাদের নিজের সম্পত্তির বিরুদ্ধে জারী হইবে। ঐ ডিক্রী শুদ্ধ কি অশুদ্ধ হউক, তাহা যে ১০ আইনমতে ডেপুটি কালেক্টর প্রদান করিতে পারিতেন, এমত দৃষ্ট হয় না। ঐ ডিক্রীতে টাকা আদায়ের যে প্রণালী ব্যক্ত হইয়াছে, খাজানার ডিক্রীতে ঐরূপ বিশেষ আদেশ প্রদানে কালেক্টরের ক্ষমতা নাই। যখন ছোট আদালতের এই ডিক্রী, মুন্সেফের নিকট জারীর জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তখন তাহাই জারী করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। ডিক্রী দৃষ্টে ইহা বলা অসম্ভব যে, যে আদালত অর্থাৎ ছোট আদালত কর্ত্তৃক ইহা প্রদত্ত হয় তাঁহার তাহা প্রদানের ক্ষমতা ছিল না। মুন্সেফ ছোট আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল শুনিতে প্রবৃত্ত হওয়ায় আপন পদ ও ক্ষমতা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৮ ধারামতে যখন কোন আদালত কোন ডিক্রী জারী করেন, তখন যদি ঐ ডিক্রী দৃষ্টেই তাঁহার এমত বোধ না হয় যে, যে আদালত ডিক্রী প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার তাহা প্রদান করার ক্ষমতা ছিল না, তবে তাঁহার ঐ ডিক্রী জারী করিতে হইবে। যদি ডিক্রীতে কোন ভুল থাকে, অথবা তাহা যে আদালত প্রদান করেন, তিনি যদি তাঁহার বিচারাধিকার অতিক্রম করত তাহা প্রদান করিয়া থাকেন, তবে হাইকোর্টে আপীল করিয়া বা রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারামতে দরখাস্ত করিয়া তাহা অন্যথা করান যাইতে পারে।

খরচা সমেত আপীল ডিস্‌মিস্ হইল। (গ)

---

১ লা এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৬৫ নং মোকদ্দমা।

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই এপ্রিলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

হরসুন্দরী চৌধুরিণী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শশিভূষণ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ইন্দ্রমণি এক তমঃসুক লিখিয়া দেওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রমণির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি লয়। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্পত্তির দখীলকার থাকার কালে তমঃসুক-গৃহীতারা তাহাদের টাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করিয়া ডিক্রী পায়। ডিক্রীদারেরা যখন তাহাদের ডিক্রীজারী করিতে চেষ্টা করে, তখন ইন্দ্রমণির এক নাতি রাজকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া তাহার দত্তকত্ব অন্যথা করত সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। রাজকৃষ্ণ ঐ রূপ দখল পাওয়ার পরে ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ তমঃসুকের ডিক্রী অন্যথা করার জন্য নালিশ করিয়া জয়ী হন। পরে, মুল তমঃসুক-গৃহীতার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ ঐ তমঃসুকের টাকা পাওয়ার জন্য রাজকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করায়,

স্থির হইল যে, বাদীর নালিশের স্বত্ব রাজকৃষ্ণের অনুকুল শেষ ডিক্রীর তারিখ হইতে উত্থিত হয় নাই; যখন তমঃসুকের সর্ত্তমতে টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল সেই সময় হইতেই তাহা উত্থিত হইয়াছে।

বিচারপতি ফিয়ার।—ইন্দ্রমণি কর্ত্তৃক ১২৪৪ সালের ফাল্গুণ মাসে প্রদত্ত এক তমঃসুকের প্রাপ্য আদায়ের জন্য, মুল তমঃসুক-গৃহীতার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক, রাজকৃষ্ণ যিনি দায়ক্রমে ইন্দ্রমণির সম্পত্তি পাইয়াছেন তাঁহার বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। এই নালিশের দ্বারা যে টাকা আদায়ের চেষ্টা হইতেছে তাহা যথার্থই প্রাপ্য হইলে ১২৫৬ সালে প্রাপ্য হইয়াছিল, এবং আরজীর তারিখ ১৮১৮ সালের ২১ এ জুলাই, যখন ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ৯ ও ১০ ধারা প্রচলিত ছিল। ঐ দুই ধারামতে, নালিশের তারিখের পূর্ব্ব ৩ বৎসরের মধ্যে ঋণ প্রাপ্য না হইলে এই প্রকার নালিশে তমাদী ঘটে। কথিত হইয়াছে যে, বাদী এই সময়ের মধ্যে অন্য এক ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ টাকা আদায় করার চেষ্টা করিয়াছিল, অতএব তদ্দ্বারাই তমাদীর দোষ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। ইন্দ্রমণি আপন জীবদ্দশায় দত্তকগ্রহণের কোন এক প্রণালীমতে শ্রীকৃষ্ণ নামক এক ব্যক্তিকে দত্তক-গ্রহণ করেন এবং ইন্দ্রমণির মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণ লয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন সম্পত্তির দখীলকার ছিল, তখন সে নাবালগ থাকায় তমঃসুক-গৃহীতারা ইন্দ্রমণির সম্পত্তি হইতে ঐ ঋণ আদায় করিয়া লওয়ার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্থলাভিষিক্ত অভিভাবকের বিরুদ্ধে ১২৭৪ সালের কার্ত্তিক মাসে নালিশ করে, এবং বাদী সেই নালিশে যে ডিক্রী পায় তাহা এই আদালত ১২৬৯ সালের শ্রাবণ মাসে স্থির রাখেন। এই ডিক্রীর বলে বাদী ইন্দ্রমণির সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু সেই সম্পত্তি ঐ ডিক্রীজারীর কালে রাজকৃষ্ণের হস্তে আসিয়াছিল। রাজকৃষ্ণ ইন্দ্রমণির নাতি ছিলেন এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের দত্তকত্ব অসিদ্ধ ও বৃথা করার জন্য ১২৫৩ সালে নিম্ন আদালতে এক নালিশ উপস্থিত করেন।

ঐ নালিশ ডিস্‌মিস হয়, কিন্তু তিনি দ্বিতীয়

বার নালিশ উপস্থিত করত জয়ী হন। তিনি ঐ দত্তক অসিদ্ধ বলিয়া যে ডিক্রী পান তাহা সদর আদালত ১২৬৭ সালে বহাল রাখেন, এবং তাহার বলে তিনি সম্পত্তির দখল লন। তৎপরে রাজকৃষ্ণের হস্তগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত তমঃসুকগৃহীতারা তাহাদের ডিক্রীজারী করিতে চেষ্টা করাতে, তমঃসুকগৃহীতারা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তি নীলাম করার জন্য যে ডিক্রী পাইয়াছিল তাহা রাজকৃষ্ণের নিজের সম্বন্ধে অন্যথা করার নিমিত্ত রাজকৃষ্ণ নালিশ করিয়া অবশেষে হাইকোর্টে ডিক্রী পান। অতএব তমঃসুকের উপরে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাদী যে ডিক্রী পাইয়াছিল, তাহা সে রাজকৃষ্ণের হস্তগত ইন্দ্রমণির সম্পত্তির বিরুদ্ধে জারী করিতে অকৃতকার্য্য হয়; এ প্রযুক্ত সে এইক্ষণে বলে যে, যে স্থলে সে হাইকোর্টের সেই ডিক্রীর দ্বারা ইন্দ্রমণির সম্পত্তির উপর শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধ ডিক্রী জারী করণে বঞ্চিত হইয়াছে, সে স্থলে সেই ডিক্রীর তারিখ হইতেই তাহার বর্ত্তমান নালিশের হেতু উত্থিত হইয়াছে। এবং এই তর্কের পোষকতায় রেস্পণ্ডেণ্ট প্রিবি কৌন্সিলের এক আধুনিক নিষ্পত্তির * উল্লেখ করিয়াছে।

কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ঐ নিষ্পত্তি উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটে না। সেই মোকদ্দমায় জমিদারের প্রাপ্য খাজানা বাকী পড়িয়াছিল, এবং জমিদারের হয় ঐ জমা নীলাম করার নচেৎ ঋণ স্বরূপ ঐ খাজানা আদায়ের জন্য নালিশ উপস্থিত করার ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি প্রথমোক্ত উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রজার সম্পত্তি নীলাম করার ক্ষমতা অনুসারে তিনি তাহা নীলাম করিয়া আপন বাকী খাজানা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন। নীলামের মুল্যের টাকা হইতে অর্থাৎ ঋণীর সম্পত্তি হইতে ঋণ পরিশোধিত হয়। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ঐ জমার নীলাম যাহার প্রতি আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অনিয়মের হেতুতে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অন্যথা হয়, এবং ক্রেতার নিকট জমিদার যে মুল্য পাইয়াছিলেন তাহা ক্রেতাকে ফেরৎ দিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হয়। অতএব সেই সময় পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার ঋণীর সম্পত্তি হইতে আপন প্রাপ্য টাকার শোধ পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এক অপর ব্যক্তিকে ঐ টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য হওয়াতে প্রিবি কৌন্সিল নির্দ্দেশ করেন যে, তখনই প্রথম তিনি এমত অবস্থাস্থিত হন যেন ঋণী তাঁহার টাকা পরিশোধ করে নাই, অতএব ঐ প্রকার অবস্থাস্থিত হওয়ার সময়েই তাঁহার নালিশের হেতু উত্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার নালিশের হেতু সম্বন্ধে হাইকোর্ট ঐ প্রকার রায় করিয়াছিলেন না; এপ্রযুক্ত হাইকোর্টের ডিক্রী অন্যথা হয়।

কিন্তু আমি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে, এই মোকদ্দমায় বাদী যে ঋণ আদায় করিয়া লইতে চাহে তাহা ইন্দ্রমণির ১২৪৪ সালের তমঃসুকের অন্তর্গত ঋণ, এবং ১২৫৬ সালে যখন ঐ ঋণ প্রাপ্য হয় সেই তারিখ হইতে নালিশ উপস্থিত করার তারিখ পর্য্যন্ত বাদী ইন্দ্রমণির সম্পত্তি হইতে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার উহার কোন টাকা প্রাপ্ত হয় নাই। আমাদের নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে, বাদী যে ঋণ আদায় করিয়া লইতে চাহে, তাহা ১২৫৬ সালে তাহার যে ঋণ প্রাপ্য ছিল তদ্ভিন্ন অন্য কোন ঋণ নহে। আমি ইহাও বলিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বাদী যে তারিখে নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল সেই তারিখ হইতে, ১২৭৪ সালের হাইকোর্টের ডিক্রী দ্বারা মোকদ্দমা সমাপ্ত হওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত যে সময় হয় তাহা বাদ দিলেও বাদীর নালিশে তমাদী ঘটিয়াছে।

অতএব আমাদের বিবেচনায়, বাদীর নালিশ ডিস্মিস্ হইবে, কারণ, তাহা তমাদীর দ্বারা বারিত

* বাঃ লাঃ রিঃ ৪র্থ ভাগ, প্রিবি কৌঃ নিষ্পত্তি, ৬ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

হইয়াছে। কিন্তু মোকদ্দমার সমুদায় অবস্থা দৃষ্টে বিশেষতঃ, যে স্থলে এক বৈধ দলীলের উপরে বাদী টাকা পাওয়ার দাবী করিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি মুল ঋণীর দুষ্টব্য স্থলাভিষিক্ত ছিল তাহার বিরুদ্ধে সরলান্তঃকরণে নালিশ করিয়াই বাদীর সময় নষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন খরচা দিবে। (গ)

---

১ লা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি রেলি এবং জে পি নর্ম্যান্।

পাটনার জজের ১৮৬৯ সালের ৬ ই নবেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মল্লিক এনাএত আলী (বিচারাদিষ্ট দায়ীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

ওয়াহেদ আলী (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ডিক্রী জারীর নীলাম মঞ্জুর করাইবার জন্য ডিক্রীদার যদি কোন কার্য্য না করে, তবে আদালতের দ্বারা সেই নীলাম বহাল থাকিলে তাহা ডিক্রী সজীব রাখার জন্য ডিক্রীদারের কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

বিচারপতি নর্ম্যান্।—এক ডিক্রীজারীর জন্য পাটনার জজের নিকট ১৮৬৯ সালের ৫ ই জুলাই তারিখে এই দরখাস্ত হয়। বিচারাদিষ্ট দায়ী জারীর পরওয়ানা বাহির হওয়ার প্রতি এই বলিয়া আপত্তি করে যে, ডিক্রীজারীর এই দরখাস্তের তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্ব তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রী সজীব রাখার জন্য কোন কার্য্য করা হয় নাই।

জজ নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ পরওয়ানা জারী করার স্বত্ব ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার দ্বারা বিলুপ্ত হয় নাই। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিচারাদিষ্ট দায়ী আপীল করিয়াছে।

বৃত্তান্ত সমস্ত এই:—যে বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে এই ডিক্রী জারী করার চেষ্টা হইতেছে, ডিক্রীজারীতে তাহার কতিপয় ভূমি সম্পত্তি ১৮৬৬ সালের ২ রা জুনে নীলাম হয়। ক্রোক ও নীলামকৃত সম্পত্তি ভূমি বিধায় দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৫৬ ধারার বিধানমতে, আদালতের দ্বারা মঞ্জুর না হওয়া পর্য্যন্ত নীলাম চূড়ান্ত হইতে পারে না। ডিক্রীদার নিজেই নীলাম ক্রয় করে, এবং আদালতে মোট ৬২৯/ আনা দাখিল করে; তাহা পূর্ব্বের এক জন ডিক্রীদার আপন দাবী পরিশোধ করার জন্য বাহির করিয়া লয়। ডিক্রীদার অবশিষ্ট মুল্য দ্বারা তাহার ডিক্রী পরিশোধিত হইল বলিয়া আদালতে ১৫২৯ টাকার এক রসিদ দাখিল করে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, নীলাম যে পর্য্যন্ত মঞ্জুর না হইয়াছিল সে পর্য্যন্ত ভূমিতে ডিক্রীদারের স্বত্ব বা দখলের ক্ষমতা জন্মে নাই, এবং যদি নীলামের পরে ৩০ দিবস গতে অথবা কোন উচিত ও অল্প কালের মধ্যে ডিক্রীদার তাহার নীলাম মঞ্জুরের প্রার্থনায় দরখাস্ত করিত, তবে এই আদালতের দুই তিনটি বিরুদ্ধ নজীর, অর্থাৎ ৮ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৫৯ পৃষ্ঠার ও ১১ শ বালমের ১৭৭ পৃষ্ঠার এবং ১৩ শ বালমের ৩৮ পৃষ্ঠার নজীর সত্ত্বেও আমি বিবেচনা করিতাম যে, নীলাম মঞ্জুরীর জন্য দরখাস্ত করাতে ডিক্রীদার এই মোকদ্দমায় তাহার ডিক্রীজারী করার কার্য্য করিয়াছিল।

কিন্তু নীলাম মঞ্জুরীর হুকুম যাহার তারিখ ১৮৬৬ সালের ৮ ই আগষ্ট, তদ্দৃষ্টে এমন কিছু দেখা যায় না যে, ডিক্রীদার নিজে অথবা তাহার উকীলের দ্বারা ঐ নীলাম মঞ্জুর করাইবার জন্য কোন কার্য্য করিয়াছিল, অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের এই নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, ডিক্রীদার সম্বন্ধে ডিক্রী অন্ততঃ ৩০

দিবসের পরে অর্থাৎ ১৮৬৬ সালের ২ রা জুলাই তারিখে মঞ্জুর হয়, এবং যেহেতু উপস্থিত দরখাস্ত ঐ তারিখের তিন বৎসর পরে দাখিল হইয়াছে, অতএব, ডিক্রীদার ২৫৬ ধারার যে রূপ অর্থ করার জন্য তর্ক করে, তাহা করিলেও ১৮৬৯ সালের ৮ ই জুলাই তারিখের ডিক্রীজারীর দরখাস্ত উচিত সময়ের পরে দাখিল হইয়াছে।

কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পাল্টা আপীলসূত্রে এক আপত্তি সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন যে, মল্লিক এনাএত আলী প্রভৃতির বিরুদ্ধ ওয়াহেদ আলীর ডিক্রী যাহা এইক্ষণে জারী করার চেষ্টা হইতেছে, তাহা মসম্মত ভতুর বিরুদ্ধে জারী হয়, এবং তৎসম্বন্ধে এই আদালতে ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আপীল শ্রুত হয়। যদি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত আমাদের নিকট বিশুদ্ধ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে, এবং সেই বৃত্তান্তের উপরে আমরা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, এনাএত আলীর বিরুদ্ধ ডিক্রী তাঁহার ও মসম্মত ভতু প্রভৃতির বিরুদ্ধে এজমালী ডিক্রী ছিল, তাহাও যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে আমরা বিবেচনা করি যে, মসম্মত ভতু প্রভৃতির বিরুদ্ধে ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য যে মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা উপস্থিত বিচারাদিষ্ট দায়ী মল্লিক এনাএত আলীর বিরুদ্ধে ডিক্রী বলবৎ রাখার জন্য পর্য্যাপ্ত কার্য্য হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু এই আদালতে প্রেরিত নথীর মধ্যে মুল ডিক্রী নাই, অতএব আমরা এই বিষয়ে যথেষ্ট রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।

অতএব মোকদ্দমা জজের নিকট ফেরৎ যাইবে, এবং এই ডিক্রী যৌত ডিক্রী কি না এবং তাহা হইলে উক্ত কার্য্যের দ্বারা তাহা বলবৎ আছে কি না, তাহা তিনি স্থির করিবেন। যদি তাহাই হয়, তবে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার বিধান দ্বারা এই ডিক্রীজারীর প্রার্থনার কোন ব্যাঘাত হইবে না।

এই আপীলের ও জজের নিষ্পত্তির খরচা জজের উক্ত বিষয়ের নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গ)

৪ ঠা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান্ এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ২৫২ নং মোকদ্দমা।

মেদিনীপুরের জজের ১৮৬৯ সালের ৩রা জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে খাবেতা আপীল।

রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

কুমারনারায়ণ পাটনাএক প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মহেন্দ্রলাল সোম আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী ও আশুতোষ ধর রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—৩৮২০ বিঘা ভূমির দাবীতে ৩৪ জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশ হওয়ায়, ১৩ জন প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকে দাবীকৃত ভূমির আপন আপন অংশ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব দেয়। বহু মোকদ্দমা জড়িত হওয়ার হেতুতে নালিশ ডিস্মিস্ হয়। নালিশ যে পর্য্যন্ত ডিস্মিস্ হইয়াছিল, জজ তাহার ৫৪৪০ টাকা মুল্য ধরিয়া সেই পরিমাণে প্রত্যেক প্রতিবাদীকে সম্পূর্ণ খরচা দেন, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিবাদীকে ২৫৭ টাকা উকীলের ফিস দেন, কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই বিরোধীয় সম্পত্তির মুল্যেরও অধিক হয়।

এস্থলে, ইহা ফিসের হুকুম দেওয়ার ন্যায্য প্রণালী নহে; যে প্রতিবাদীর ভূমিখণ্ড ৪০ বিঘার অধিক তাহাকে ৫ মোহর ও যাহার ভূমি ২০ বিঘার অধিক কিন্তু ৪০ বিঘার ন্যূন, তাহাকে ৩ মোহর এবং যাহার ভূমি ২০ বিঘার ন্যূন তাহাকে দুই মোহর ফিস দেওয়া উচিত ছিল।

**বিচারপতি নর্ম্যান।**—বাদী ৭৯৪০৻ টাকা মূল্যের ৩৮২০ বিঘা নিষ্কর ভূমি পাওয়ার জন্য ৩৪০ জন লোককে প্রতিবাদি-শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করে। ১১ জন প্রতিবাদী হাজির হইয়া প্রত্যেকে দাবী-কৃত ভূমির আপন আপন অংশ সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথক্ জওয়াব দেয় এবং তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার জওয়াব কেবল ২ বিঘা সম্বন্ধীয়। ইহার প্রত্যেক প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, মোকদ্দমায় ভিন্ন ভিন্ন নালিশের হেতু এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমির দখলের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাবী থাকায়, তাহা চলিতে পারে না। অনেক প্রতিবাদী তাহাদের ভোগাধীন ভিন্ন ভিন্ন ভূমি খণ্ডে বাদীর স্বত্ব স্বীকার করিয়া রাজীনামা দেয়। উক্ত ১১ জন প্রতিবাদী মোকদ্দমায় প্রবিষ্ট হয় এবং তদ্ভিন্ন রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রত্নমালা দেবী ও কুমারনারায়ণ পাটনাএক যাহারা বিরোধীয় সম্পত্তিতে স্বার্থ আছে বলিয়া দাবী করে, তাহারাও প্রতিবাদি-শ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয়। বাদীর প্রমাণ শ্রবণ করিয়া জজ এই হেতুবাদে বহু নালিশ-জড়িত বলিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে নালিশের হেতু সম্পূর্ণ বিভিন্ন; সুতরাং তাহা এক নালিশে যোগ করা যাইতে পারে না; অতএব তিনি প্রতিবাদিগণকে খরচার ডিক্রী দেন।

কি নিয়মে খরচার হিসাব করিতে হইবে তদ্বিষয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। জজ নির্দ্দেশ করেন যে, ২২০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদিগণ ডিক্রীতে সম্মত হইয়াছে; অতএব নালিশ যত দূর ডিস্‌মিস্ হইয়াছে তাহার মূল্য তিনি ৫৪৪০ টাকা ধরিয়াছেন। তাহা করিয়া তিনি প্রত্যেক প্রতিবাদীকে মোট ৫৪৪০ টাকার উপরে খরচা দিয়াছেন অর্থাৎ ১৫ জন প্রতিবাদীর প্রত্যেককে ২৫৭ টাকা করিয়া উকীলের ফিস দিয়াছেন। বস্তুতঃ, দেখা যাইতেছে যে, যে সকল প্রতিবাদী জয়ী হইয়াছে তাহাদের দাবী-কৃত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য অপেক্ষা উকীলের ফিস অনেক স্থলেই অধিক হইয়াছে; অতএব এই আদালতের নিয়মানুযায়ী ইহাকে খরচা দেওয়ার ন্যায্য প্রণালী বলা যাইতে পারে না। প্রতিবাদীরা এই প্রকারে মোট ৭৯,৬০০ টাকা মূল্যের উপরে খরচা পাইয়াছে, এবং তাহাতেও তাহারা প্রথম ৫০০০ টাকার উপরে ৫ টাকা শতকরা, তাহার পরের ১৫০০০ টাকার উপরে ২ টাকা শতকরা এবং তাহার পরের ৩০,০০০ হইতে ৫০,০০০ টাকার উপরে ১৲ টাকা শতকরা এবং ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত ২৯,৬০০ টাকার উপরে ৷৷০ আনার হিসাবে খরচা পায় নাই, কিন্তু প্রত্যেক প্রতিবাদী ৫৪৪০ টাকার প্রথম ৫০০০ টাকার উপরে সর্ব্বোচ্চ ৫ টাকা শতকরা হিসাবে খরচা পাইয়াছে।

যদি ভিন্ন ভিন্ন স্বত্ব-বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদী পৃথক্ পৃথক্ জওয়াব দিয়া কৃতকার্য্য হইত, অর্থাৎ জজ যদি বহু মোকদ্দমা জড়িত হওয়ার আপত্তি সত্ত্বেও মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দোষগুণ দৃষ্টে প্রত্যেক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ সমুদায় নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতেন, তবে হাইকোর্টের প্রচারিত ৭ ম নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক প্রতিবাদী তাহার আপন স্বত্বের মূল্যের পরিমাণে ১ ম নিয়মের তফসীল অনুযায়ী খরচা পাইত।

কথিত হইয়াছে, এবং ইহা কতক সত্যও বটে যে, প্রত্যেক প্রতিবাদী যে ভূমি ভোগ করে, বাদী তাহা দেখাইয়া ঐ প্রতিবাদীর নিকট তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার নালিশ না করিয়া যে প্রণালীতে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে তদ্দ্বারাই প্রতিবাদিগণের ব্যয়ের আধিক্য হইয়াছে।

কিন্তু ইহার সন্দেহ নাই যে, বাদীর আরজীর দোষ সত্ত্বেও, তাহাই তাহার মনস্থ ছিল এবং প্রতিপক্ষেরাও তাহাই বুঝিয়াছিল। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, বাদী যদি প্রত্যেক প্রতিবাদীর ভোগাধীন ভূমি সম্বন্ধে দাবী করিত

তাহা হইলে প্রত্যেক প্রতিবাদী যে খরচা পাইত তদপেক্ষা তাহারা অধিক পাইতে পারে। কিন্তু ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমির মালিকেরা জজের আদালতে উকীলকে যে টাকা দিয়াছে তাহা হইতে জজ তাহাদিগকে অধিক টাকা পাওয়ার হুকুম দিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি যে, এই প্রকার মোকদ্দমায় প্রথমে ভূমির যে মুল্য ধরা হয়, তাহার দ্বিগুণ মুল্য ধরিয়া তদনুযায়ী প্রত্যেক জয়ী প্রতিবাদীর অংশের পরিমাণে তাহাকে খরচা দেওয়াই সুবিধাজনক হইত। আমাদের বিবেচনায়, যে সকল প্রতিবাদী ৪০ বিঘার অধিক ভূমির সম্বন্ধে জওয়াব দিয়া জয়ী হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককে উকীলের ফীস বাবৎ ৫ মোহর, এবং যে প্রতিবাদী ২০ বিঘা হইতে ৪০ বিঘা পর্য্যন্ত ভূমি সম্বন্ধে জওয়াব দিয়া জয়ী হইয়াছে, তাহার প্রত্যেককে ৩ মোহর এবং যে প্রতিবাদী ২০ বিঘার ন্যূন ভূমি সম্বন্ধে জয়ী হইয়াছে তাহাকে ২ মোহর দেওয়া সুবিধাজনক হইবে। দেখা যাইতেছে যে, মোজাহেমদারেরা স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া মোকদ্দমায় উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের স্বত্বের কোন বিচার হয় নাই এবং তাহারা কি জন্য খরচা পাইবে তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। এতদনুসারে নিম্ন আদালতের ডিক্রী সংশোধিত হইবে। প্রত্যেক পক্ষ এই আপীলের আপন আপন খরচা দিবে। (গ)

---

৫ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান্ এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ২৪৫৩ নং মোকদ্দমা।

হুগলীর প্রথম অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১৯ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২১ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

হেমচন্দ্র গোস্বামী ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেৎ জি, সি, পল বারিষ্টর ও বাবু অভয়চরণ বসু ও মহেন্দ্রনাথ মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

মেৎ জে, ডবলিউ বি মণি বারিষ্টর ও বাবু মহেন্দ্রলাল সোম রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যৌত সম্পত্তির কোন শরীক যদি সেই সম্পত্তি এমন ভাবে ভোগ করে যে, তদ্দ্বারা তাহার অপর শরীকের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তৎপ্রতি একুটির আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু যদি তদ্দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট এবং সপষ্ট স্বত্বের ক্ষতি করা হয় তাহা হইলে ঐ যুক্তি খাটিবে না।

বিচারপতি নর্ম্যান্।—বাদী এবং প্রতিবাদী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত পরস্পর সম্মত হইয়া পরিবারস্থ এক গৃহের স্বতন্ত্র ভাগ দখল করিয়াছেন। প্রতিবাদী গোপীকৃষ্ণ ঐ বাটীর উত্তর ভাগ, এবং বাদীর পিতা গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামী দক্ষিণভাগ ভোগ করিতেন। বাদিগণ এই বলিয়া নালিশ করেন যে, এই গৃহ পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা প্রতিবাদী এবং গঙ্গাপ্রসাদ গোস্বামী দায়ক্রমে পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিভাগ না হওয়াতে ঐ ভ্রাতৃদ্বয় আপন আপন সুবিধার জন্য উক্ত গৃহ ও পরিবারস্থ যৌত সম্পত্তি পৃথক্‌ভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, এবং তাঁহারা ঐ গৃহের বাহির এবং অন্দরের কয়েক কুঠরী পৃথক রূপে ব্যবহার করিতেন, কিন্তু আর কতক কামরা বারেন্দা, সিঁড়ি এবং রাস্তা উভয়ে এজমালীতে ব্যবহার করিতেন। বাদিগণ কহেন যে, বাদিগণ ও প্রতিবাদীর যৌত ব্যবহারাধীন দোতালার কয়েকটি কুঠরীর সংলগ্ন বারেন্দা যাহাতে বাদীর ও প্রতিবাদীর সমান স্বত্ব আছে তাহা প্রতিবাদী বাদীর সম্মতি না লইয়া বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়াছেন এবং তাহার কড়ি ও বরগা কাটিয়া বারেন্দার দ্বার সমস্ত এমন রূপে বন্ধ করিয়াছেন

যে, তদ্দ্বারা যাওয়াআসার পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং বাদিগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাহা আর ব্যবহার করিতে পারেন না; অতএব প্রতিবাদীকে আর অধিক ক্ষতি করিতে নিবারণের জন্য এবং বারেন্দা পূর্ব্বমত পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দেওয়ার নিমিত্ত প্রতিবাদীর উপরে হুকুম হওয়ার জন্য বাদী প্রার্থনা করিয়াছেন।

জমাদী সম্বন্ধে, ও যে বারেন্দা ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহা পৃথক্ রূপে প্রতিবাদীকে অর্পিত হইয়াছিল কি না, এবং প্রতিবাদীর ইহা ভাঙ্গিবার গতিকে বাদীর নালিশের হেতু হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয় সম্বন্ধীয় ইসুর উপরে মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে বিচারিত হয়; ঐ সকল ইসু এস্থলে বিস্তারিত রূপে বর্ণনের আবশ্যক নাই। এই সকল ইসুর উপরে প্রতিবাদী তর্ক করেন যে, প্রমাণ-ভার তাঁহার উপরেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অতএব তাঁহারই প্রথমে আরম্ভ করার স্বত্ব আছে। অতএব বাস্তবিক দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদীর তর্কের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে যে, আরজীতে নালিশের হেতু ব্যক্ত আছে এবং তাঁহারও জওয়াব দেওয়ার কথা আছে। বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উপরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়। আরজীর ভাবানুসারে বাদিগণ এবং বোধ হয় নিম্ন আদালতদ্বয়ও এই অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন যে, যদি ইহা প্রদর্শিত হয় যে, ঐ বারেন্দা দুই ভ্রাতার যৌত সম্পত্তি, তবে প্রতিবাদী বারেন্দা আর ভগ্ন করিতে না পারেন এই নিষেধক হুকুম দেওয়ার জন্য ও পূর্ব্বমত তাহা পুনরায় প্রস্তুত করিয়া দিতে তাঁহার উপর হুকুম দেওয়ার নিমিত্ত বাদিগণ অবশ্যই আদালতে প্রার্থনা করিতে স্বত্ববান হইতে পারেন।

আমাদের সম্মুখে মেং পল তর্ক করিয়াছেন যে, আরজী ও আদালতের সমক্ষে যে প্রমাণ আছে, তদ্দ্বারা এমন প্রদর্শিত হয় নাই যে, বাদিগণ আদালতকে হস্তক্ষেপ করিতে প্রার্থনা করিতে পারেন। যৌত সম্পত্তির শরীকগণের মধ্যে যদি কোন শরীক এমন ভাবে সেই যৌত সম্পত্তি ব্যবহার করে যে ভাবে মালিক তাহা সঙ্গত রূপে ব্যবহার করিতে পারে, অথবা যতক্ষণ সেই ব্যবহারের দ্বারা সম্পত্তি অন্যায় রূপে অথবা ইচ্ছা করিয়া বিনষ্ট করা না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত সেই ব্যবহারের দ্বারা অন্য শরীকের ক্ষতি হওয়া প্রদর্শিত না হয়, সে পর্য্যন্ত একুটির আদালতের তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ না করার যে যুক্তি আছে, তাহা মেং পল ব্যক্ত করিয়াছেন। ইংলণ্ডে যে সকল স্থলে যৌত সম্পত্তির এই রূপ ব্যবহার করিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহার কতিপয় স্থলে কাটিবার যোগ্য বৃক্ষ সকল কাটিতে শরীকগণকে অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ প্রকার স্থলে যদিও বৃক্ষে আর এক শরীকের যৌত অধিকার আছে এবং যদিও সে বলে যে, ভূমির শোভার জন্য ঐ সকল বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে এবং তাহা তাহার অনুমতি না লইয়া কাটা হইয়াছে, তথাপি তাহা কর্ত্তন করা নিবারণার্থে সে একুটি আদালতের সহায়তা পাইতে পারে না। কিন্তু যদি সম্পত্তি অপচিত অথবা ঈর্ষা পূর্ব্বক বিনষ্ট করা হয়, যেমন, যদি এক শরীক বৃক্ষের চারা সকল অথবা বৎসরের যে সময়ে বৃক্ষ কাটা উচিত তখন না কাটিয়া অনুপযুক্ত সময়ে কাটে, তবে আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন।

মেং পল তর্ক করেন যে, আরজী ও এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে, ঐ বারেন্দাতে বাদিগণের কোন স্বত্ব অথবা লভ্য ছিল না, এবং প্রতিবাদী এই বারেন্দা ভাঙ্গিয়া এমত যৌত সম্পত্তি ভাঙ্গিয়াছেন যাহাতে কেবল তাঁহারই স্বার্থ ছিল। কিন্তু মেং মণি দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ বারেন্দায় বাদিগণের স্বার্থ ছিল এবং ঐ বারেন্দা দিয়া বাদীর পরিবারের স্ত্রীলোক বাদীর বাটীর পূজার দালানে পূজা দেখিবার জন্য চিক বারেন্দায় যাইতেন, এবং যাইবার তাঁহাদের স্বত্বও ছিল। এবং তিনি আরও

দেখাইয়া দিয়াছেন যে, পরিবারের যে সকল স্ত্রীলোক বাদী কি প্রতিবাদীর নিজ পরিবারস্থ নহেন, অর্থাৎ প্রতিবাদীর ভগিনী ও বাদীর পিশিরা ঐ বারেন্দার উত্তর দিকের কুঠরীতে বাস করেন, এবং ঐ বারেন্দার ও বাদীর দখলী কতিপয় রন্ধনশালার মধ্যস্থানে যে কুয়া আছে তাহাতে ঐ স্ত্রীলোকেরা গমনাগমন করেন; এবং তিনি আরও দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ১৮৬১ সালের ২ রা সেপ্‌টেম্বরে শালিশের যে বন্দোবস্ত হয় এবং ৪ আক্‌টের মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রদত্ত দরখাস্তে যাহার উল্লেখ আছে, তাহাতে লেখা আছে যে, ঐ যৌত বাটীর উত্তরাংশ যাহা মেং গ্যারেট, মেং নিউমার্চ এবং মেং পলের স্বাক্ষর যুক্ত নক্সায় ৪, ৫, ৬ এবং ৭ নম্বরের দ্বারা চিহ্নিত আছে, তাহা বহু বৎসর পূর্ব্বে প্রতিবাদীকে অর্পিত হয়, এবং প্রতিবাদীও তদবধি তাহা দখল করিয়া আসিতেছেন; এবং দক্ষিণের অংশ যাহা ঐ নক্সায় ১, ২, ৩ নং দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে তাহা বাদিগণকে অর্পিত হয় এবং বাদিগণ তাহা দখল করিয়া আসিতেছেন। ইহা সত্য বটে যে, কোন স্পষ্ট ও চূড়ান্ত এবং বাধ্যকর বিভাগ হয় নাই, কিন্তু ঐ যে বন্দোবস্ত হয়, তদ্দ্বারা পক্ষগণ স্বীকার করেন যে, কতিপয় সর্ত্ত যাহা অদ্য পর্য্যন্ত সম্যকরূপে প্রতিপালিত হয় নাই, তাহার অধীনে পক্ষগণ প্রত্যেকে অর্দ্ধেক অংশে বাটী ভোগ করিবেন, এবং সেই বন্দোবস্তে ইহা স্বীকৃত হয় যে, যে পর্য্যন্ত প্রতিবাদী গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর পরিবার ও স্ত্রীলোকদের জন্য তাঁহার নূতন বাটী প্রস্তুত না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ নক্সায় লাল রঙ্গের (জি) চিহ্নিত ঐ বাটীর যে অংশ ও কুঠরী সমস্ত বিরোধীয় উত্তরের বারেন্দার সংলগ্ন, তাহা তিনি ব্যবহার করিতে পারিবেন।

অতএব ঐ বন্দোবস্তমতে প্রতিবাদী কেবল কিছু কালের জন্য ঐ বারেন্দার উত্তরদিকে নক্সায় লালরঙ্গের (জি) চিহ্নিত অংশ ব্যবহারের স্বত্ব পাইয়াছিলেন। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদী ঐ বারেন্দা ভাঙ্গিয়া বাদিগণের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রথমতঃ, ঠিক বারেন্দায় যাওয়ার বাদিগণের পথের স্বত্ব নষ্ট করিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ, (জি) চিহ্নিত অংশে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করেন, তাঁহাদের নিকট বাদীর পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের গমনাগমনের যে পথ থাকা উচিত, তাহা তিনি অবরুদ্ধ করিয়াছেন; এবং তৃতীয়তঃ, বাদীর পিতা এবং প্রতিবাদীর মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয়, সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী বাদী যে অংশ ভোগ করিতে স্বত্ববান, এবং যাহা কতিপয় সর্ত্ত এবং সীমাবদ্ধ স্বত্ব অনুসারে প্রতিবাদী কেবল কিছু কালের জন্য ভোগ করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই অংশে গমনাগমনের পথও বন্ধ করিয়াছেন।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মেং পল যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন এবং যাহাতে প্রদর্শিত যে, যে প্রকারে কোন মালিক আপন সম্পত্তি ভোগ করে, সেই প্রকারে যৌত সম্পত্তির শরীক সেই যৌত সম্পত্তি ভোগ করার জন্য অন্য শরীকের ক্ষতি না করিয়া যে স্থলে সঙ্গতরূপে কার্য্য করে, এবং যে সকল স্থলে ঐ প্রকার শরীক তাহার নিজ ভোগাধীন সম্পত্তির অংশের কোন বৃক্ষচ্ছেদন করে, অথবা প্রাচীর ভাঙ্গে, বা দ্বার নির্ম্মাণ করে, সে স্থলে একুটির আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না, ঐ সকল দৃষ্টান্ত উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটে না। শরীকের বাস্তবিক ক্ষতি না হইলে একুটির আদালত এই প্রকার মোকদ্দমা সমস্তে হস্তক্ষেপ করিবেন না, ইহা বলা এক কথা, এবং বিরোধীয় বারেন্দা যাহা আমাদের বিবেচনায়, প্রতিবাদী বাদীর বিরুদ্ধে স্বত্ব পাইবার অথবা বাদীর ক্ষতি করার মানসে ইচ্ছা এবং অভিসন্ধি

করত ভাঙ্গিয়াছেন, তাহার ন্যায় বাদীর কোন পরিষ্কার ও নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব নষ্ট হইলে আদালত যে হস্ত তুলিয়া থাকিবেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

এই সকল কারণে আমার বিবেচনায় নিম্ন আদালতের রায় স্থির থাকিবে; এবং আরজীতে নালিশের হেতু যথোচিত রূপে ব্যক্ত না হইয়া থাকিলেও, বাদীর কি মনস্থ ছিল তাহা প্রতিবাদীর বুঝিবার জন্য যথেষ্ট লেখা আছে।

এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমারও ঐ মত।

( গ )

৬ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৭০ সালের ৫৩ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ পরগণার জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

প্রিয়নাথ সরকার প্রভৃতি, আপেলাণ্ট।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল আপেলাণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ব্যক্তি আপন কোম্পানির কাগজের সুদ লওয়ার জন্য উইলে অপর এক ব্যক্তিকে টুষ্টি নিযুক্ত করিয়া যাওয়ার পর উক্ত টুষ্টির মৃত্যু হওয়ায় এবং নাবালগ দায়াদ বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, যাহারা ঐ সুদ লইতে স্বত্ববান, তাহারা তাহা লইবার জন্য ১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় দরখাস্ত করে। তাহাতে জজ এই হুকুম দেন যে, তাহারা উক্ত মৃত টুষ্টির সম্পত্তি সম্বন্ধে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করিতে পারে।

এ স্থলে দরখাস্তকারিগণের উক্ত টুষ্টির সম্পত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অপর কোন ব্যক্তি ইহাদের অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট স্বত্ব দেখাইতে না পারিলে, ইহাদের দরখাস্ত মতেই জজের সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—বৈদ্যনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তির সম্পত্তির কতিপয় গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির (কোম্পানির কাগজের) সুদ লওয়ার সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় উপস্থিত আপেলাণ্ট জেলার জজের নিকট দরখাস্ত করে।

বৈদ্যনাথ সরকার আপন উইলে এই সকল গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির সম্বন্ধে কার্য্য করণার্থে তারকচন্দ্র ঘোষকে নিযুক্ত করে। তারকচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হওয়ায় এবং সে যে নাবালগ দায়াদের টুষ্টী ছিল, সে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, যে ব্যক্তিগণ ঐ সকল সিকিউরিটির সুদ লইতে স্বত্ববান তাহারা স্বয়ং তাহা লইতে চাহে। ট্রেজরিতে দরখাস্ত করায়, তাহারা আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট দাখিল না করিলে তাহাদিগকে উক্ত সুদ দিতে অস্বীকার করা হয়। তাহাতে তাহারা জজের নিকট দরখাস্ত করে; জজ এই দরখাস্তে হুকুম দেন যে, তাহারা তারকচন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি সম্বন্ধে সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিতে পারে।

এই ব্যক্তিগণের তারকচন্দ্রের সম্পত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, এবং ইহারা তৎসম্বন্ধে সার্টিফিকেট চাহে নাই। তাহারা উক্ত আইনের ৮ ধারার বিধান অনুসারে মৃত বৈদ্যনাথ সরকারের সম্পত্তির গবর্ণমেণ্ট-সিকিউরিটির সুদ লইতে পারিবার সার্টিফিকেটের প্রার্থনায়ই দরখাস্ত করে, এবং তাহারই সহিত তাহাদের সম্বন্ধ। যদি উক্ত সার্টিফিকেট ঐ ব্যক্তিগণেরই প্রাপ্য হয়, এবং আর কেহ উৎকৃষ্টতর স্বত্ব না দেখায়, তবে জজের তাহাদিগকেই সার্টিফিকেট দেওয়া কর্ত্তব্য। যে স্থলে এই দরখাস্তের প্রতি কোন আপত্তি হয় নাই, সে স্থলে সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করত উক্ত ব্যক্তিগণকে এই আদালতে আপীল করিবার ব্যয়ে এবং কষ্টে ফেলা অতি শোচনীয় কার্য্য হইয়াছে।

জজের হুকুম রহিত করিয়া তাঁহাকে এই আদেশ করা গেল যে, উক্ত ব্যক্তিগণ যে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করে, তাহা তাহারা পাইতে পারে কি না, তাহার তদন্ত করিয়া, পাইতে পারিলে তাহাদিগকে তাহা দিবেন।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

( ব )

---

৬ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং এফ, বি, কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৯৬৭ নং মোকদ্দমা।

সারণের জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ২৯ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রামেশ্বর দয়াল সিংহ এবং অপর এক ব্যক্তি ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

রাজকিশোর সিংহ এবং অপর এক ব্যক্তি ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি, গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দুর্গাদাস দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫০ ধারামতে, আপীল-আদালত দাবীর মুল্য সম্বন্ধীয় এমত কোন ভ্রম হেতু কোন ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন না, যাহাতে যে আদালত উক্ত মোকদ্দমার প্রথম বিচার করেন তাঁহার বিচারাধিকারের ব্যতিক্রম হয় না।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায় এ মোকদ্দমায় নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যায় হইয়াছে, এবং তাহা রহিত হইবে।

বাদীর মোকদ্দমা জেলার অধঃস্থ জজের নিকট উপস্থিত হয়। মোকদ্দমার দাবী যতই হউক, উক্ত অধঃস্থ জজের তাহার বিচার করিবার অধিকার ছিল। মোকদ্দমার দাবীর পরিমাণ এবং ষ্ট্যাম্প শুদ্ধ কি না, তৎসম্বন্ধে প্রথম আদালতে এক প্রশ্ন উপস্থিত হয়। ষ্ট্যাম্পের মুল্য কয়েক টাকা মাত্র কম হয়, কিন্তু তাহা সংশোধন করিয়া সম্পূর্ণ মুল্যের ষ্ট্যাম্প দেওয়া হয়, এবং পক্ষগণ এই জ্ঞানে মোকদ্দমার বিচার হইতে দেয়, যে মুল্য কম ধারার আপত্তি এই রূপেই মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে।

দাবী কম করিয়া ধারার বিষয়ে প্রথম আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহার বিরুদ্ধে খাস রেস্পণ্ডেণ্ট আপীল করে না, কিন্তু জজ আপনা হইতে উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, যে বিক্রয়-কবালা অন্যথা করিবার দাবীতে নালিশ হয় তাহা যখন ৫৭৪৫ টাকা মুল্যের হইতেছে, এবং প্রতিবাদিগণ যখন কতকগুলি জরিপেসগীর দেনা পরিশোধ করিয়াছে, তখন এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, অন্ততঃ, ঐ সকল দেনার, কিয়দংশ সম্পত্তির মুল্যের অংশ স্বরূপে বিবেচিত হইবে কি না। জজ তদনন্তর বলেন যে, আপেলাণ্টের উকীলেরা স্বীকার করেন যে, "তাঁহারা ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের "( বি ) চিহ্নিত তফসীলের ( এ ) চিহ্নিত টীকা "ভ্রমবশতঃ দেখেন নাই; সুতরাং মোকদ্দমার মুল্য কম ধরা হইয়াছে।" অতএব জজ মোকদ্দমার দাবী ৫০০০ টাকার অধিক বিবেচনা করিয়া বিচারাধিকার অস্বীকার করেন, কিন্তু উভয় পক্ষকে আপন আপন খরচা দিবার হুকুম দেন।

বাদী খাস আপীল করিয়া বলে যে, ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের ৬ ধারার ( বি ) চিহ্নিত তফসীলের ( এ ) চিহ্নিত টীকা দৃষ্টে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের দশগুণ মুল্য ধরাই শুদ্ধ হইয়াছে। খাস আপেলাণ্ট আরো বলে যে, জরিপেসগীর দেনা পরিশোধ করাতে মোকদ্দমার দাবী বর্দ্ধিত হইবে না, এবং এমত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, ( এ ) চিহ্নিত টীকার বিধানের বিরুদ্ধে মুল্য ধরা হইয়াছে। স্বীকৃত হইয়াছে যে, মোকদ্দমার

মুল্য সদর জমার দশগুণ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। (এ) চিহ্নিত টীকায় ব্যক্ত আছে যে, "বিরুদ্ধ "প্রমাণ প্রদর্শিত না হইলে বা তাহা প্রদর্শিত "না হওয়া পর্য্যন্ত, সদর তাহুতী স্থাবর সম্পত্তি "সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় ঐ সম্পত্তি মেয়াদী বন্দোবস্তী "হইলে তাহার রাজস্বের ৮ গুণ ও স্থায়ী বন্দোবস্তী "হইলে ১০ গুণ, এবং যে স্থাবর সম্পত্তি "সদর তাহুতী নহে, তৎসম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় ঐ "সম্পত্তির বার্ষিক নীট লভ্যের ২০ গুণ, "তাহার বাজার চলিত মুল্য বলিয়া গণিত "হইবে।"

পরে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫০ ধারায় দেখা যায় যে, "ঐ নিষ্পত্তিতে অধঃস্থ আদা-"লতের ডিক্রী মঞ্জুর কি অন্যথা কি মতান্তর "হইতে পারিবে। কিন্তু ঐ ডিক্রীতে, কিম্বা "মোকদ্দমার দোষগুণের কি আদালতের এলা-"কার হানি যাহাতে না হয়, মোকদ্দমা চলি-"বার সময়ে এমত যে কোন হুকুম করা যায়, "সেই হুকুমে কোন চূক কি ত্রুটি কি দাঁড়ার "ব্যতিক্রম হইলে তৎপ্রযুক্ত অধঃস্থ আদালতের "কোন ডিক্রী অন্যথা কি মতান্তর হইবে "না, কিম্বা তৎপ্রযুক্ত মোকদ্দমা অধঃস্থ আদা-"লতে ফিরিয়া পাটান যাইবে না।" ১ম বালম বোম্বাই হাইকোর্টের রিপোর্টের এক নিষ্পত্তিতে মীমাংসিত হইয়াছে যে, "কোন "দাবীর মুল্য ধরিবার ভ্রম এমত কোন ভ্রম, "ত্রুটি বা দাঁড়ার ব্যতিক্রম নহে, যাহাতে "মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি দোষ স্পর্শে; "এবং আপীল-আদালত এই ধারা (৩৫০) "অনুসারে এমত কোন ভ্রম হেতু কোন ডিক্রী "অন্যথা করিবার হুকুম দিতে পারেন না, "যাহাতে যে আদালতে মোকদ্দমার প্রথম "বিচার হয় তাঁহার বিচারাধিকারেরও ব্যতিক্রম "হয় না।"

এস্থলে যে আদালত এই মোকদ্দমার প্রথম বিচার করেন, তাঁহার যে, তাহা করিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, এতৎপ্রতি কোন আপত্তি নাই।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আপীল না হওয়াতে নিম্ন আপীল-আদালতের তাহা গ্রহণ করা অন্যায় হইয়াছে, অতএব আমরা উক্ত আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া দোষগুণ দৃষ্টে বিচারার্থে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম। এই আপীলের খরচা ঐ পুনর্ব্বিচারের ফলের অনুগামী হইবে।

(ব)

---

৬ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৭০০ নং মোকদ্দমা।

মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ১লা মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৭ই আগষ্টে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

উমাশঙ্কর চৌধুরী (বাদী) আপেলাণ্ট।

মনসুর আলী খাঁ বাহাদুর, বাঙ্গালার নবাব নাজিম (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—১৮৬৮ সালের ১৬ আইনমতে, ১০০০ টাকার ন্যুন দাবীর মোকদ্দমা জেলার জজ কর্ত্তৃক অর্পিত না হইলে, অধঃস্থ জজের তাহার বিচার করিবার অধিকার নাই।

যদি কোন পক্ষ বিরোধীয় সম্পত্তির মুল্য সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করে, তবে যে আদালত ঐ মোকদ্দমা শ্রবণ করেন, তিনিই ঐ বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমার বাদী কোন ভুমির দখলের দাবীতে নালিশ করে,

যাহার কতক অংশে এক বাগান ছিল; এবং সে বার্ষিক নীট লভ্যের বিশ গুণ ধরিয়া দাবীর মুল্য ২০০০ টাকা ধরে।

প্রতিবাদী আপত্তি করেন যে, মোকদ্দমার মূল্য অনেক অধিক ধরা হইয়াছে, কারণ, বাদী তাহার নিজের বাক্যমতেই বিরোধীয় ভূমি ৩৭১ টাকায় ক্রয় করে।

অধঃস্থ জজের মতে প্রতিবাদীর এতৎ সম্বন্ধীয় আপত্তি সপমাণ না হওয়ায় তিনি উক্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া মোকদ্দমার দোষগুণ দৃষ্টে বিচার করত বাদীর অনুকূলে রায় দেন।

জেলার জজের নিকট আপীলে মুল্য সম্বন্ধীয় এই প্রশ্ন পুনরায় উত্থিত হয়, এবং জজ আপীলের ঐ হেতু প্রামাণ্য স্থির করেন। তিনি বলেন:—"বাদী আপন নালিশের "আরজীতে বলে যে, সে বিরোধীয় ভূমি "৩৭১ টাকায় ক্রয় করে, এবং তাহার প্রথম "সাক্ষী বলে যে, ইহাই উক্ত ভূমির উচিত "মল্য; সুতরাং এই টাকাই উক্ত ভূমির "বাজার দর, এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের "৬ ধারা মতে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীস্থ আদালতে "এই মোকদ্দমা উপস্থিত করা উচিত ছিল, "এবং সেই আদালত ১৮৬৮ সালের ১৬ আইন "মতে, মুন্সেফের আদালত। আমার সপষ্ট "বোধ হইতেছে যে, যে স্থলে বাজার দরের "কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাহাতেই "কেবল ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের (বি) "চিহ্নিত তফসীলের ১১ দফা (এ) চিহ্নিত "টীকা মতে অগত্যা নীট লভ্যের বিশগুণ মূল্য "ধরা যাইতে পারে।"

জেলার জজের এই বাক্য আইনের প্রকৃত বর্ণনা নহে। ১৮৬৭ সালের ২৬ আইন প্রচার হইবার পূর্ব্বে যে আইন প্রচলিত ছিল, তদনুসারে যে মোকদ্দমার দাবী ৩০০ টাকার অনধিক তাহার বিচারাধিকার মুন্সেফের ছিল; এবং সদর আমীনের ১০০০ টাকার অনধিক দাবীর মোকদ্দমার বিচারাধিকার ছিল। দাবীর মুল্য সম্বন্ধে প্রধান সদর আমীনের বিচারাধিকারের সীমা ছিল না। এমত অবস্থায়, আদালত সমূহের সুবিধার্থে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার বিধানের ন্যায় এরূপ বিধি সংস্থাপন করিবার আবশ্যক ছিল যে, সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীর আদালত সমূহের যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার আছে, সাধারণতঃ সেই সকল মোকদ্দমার বিচার সেই শ্রেণীস্থ আদালতেই হইবে, অর্থাৎ তাহা এই জন্য হইবে যে, প্রধান সদর আমীন-আদালতের যদিও ১০০০ টাকার কম দাবীর মোকদ্দমা সকলে বিচারাধিকার আছে, তথাপি সেই সেই প্রকারের মোকদ্দমায় ঐ আদালত পরিপূর্ণ না হয়। কিন্তু ১৮৬৮ সালের ১৬ আইন দ্বারা উক্ত বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং অধঃস্থ জজ ঐ আইনের ১৬ ধারামতে মুন্সেফের ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইলে, কেবল উক্ত আইন অনুসারে জেলার জজের অনুমতি পাইলেই ১০০০ টাকার ন্যূন দাবীর মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন। সুতরাং এই মোকদ্দমারদোবী যদি ১০০০ হাজারের অধিক না হয়, তবে জেলার জজ অধঃস্থ জজের নিকট তাহা অর্পণ না করিলে অধঃস্থ জজের তাহার বিচার করিবার অধিকার হইতে পারে না। এই মোকদ্দমা আরম্ভ হইবার সময়ে যে ষ্ট্যাম্প আইন (১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের (এ) টীপ্পনীর ১১ দফা, (বি) তফসীল) প্রচলিত ছিল, তাহার বিধি এই যে, "স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায়, বিরোধীয় সম্পত্তির বাজার দর অনুসারে ষ্টাম্পের মুল্য গণিত হইবে। বিরুদ্ধ "প্রমাণ প্রদর্শিত না হইলে বা তাহা প্রদর্শিত "না হওয়া পর্য্যন্ত সদর তাহুতী স্থাবর সম্পত্তি "সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায়, ঐ সম্পত্তি মেয়াদী "বন্দোবস্তী হইলে তাহার রাজস্বের ৮ গুণ, এবং "স্থায়ী বন্দোবস্তী হইলে তাহার রাজস্বের ১০ গুণ "এবং যে স্থাবর সম্পত্তি সদর তাহুতী নহে

"তৎসম্বন্ধীয় মোকদ্দমায়, ঐ সম্পত্তির বার্ষিক "নীট লভ্যের ২০ গুণ, ঐ সকল সম্পত্তির বাজার "দর বলিয়া পরিগণিত হইবে।" পরে, ঐ দফার আর এক টীপ্পনীতে লেখা আছে যে, "(এ) "টীপ্পনীতে বর্ণিত কোন সম্পত্তির বাজার দর "বা বার্ষিক নীট লভ্য নির্ণয়ার্থে, আদালত "আপনা হইতে অথবা মোকদ্দমার কোন "পক্ষের প্রার্থনা মতে কোন যোগ্য ব্যক্তির "প্রতি এই আদেশে এক কমিসন অর্পণ করিতে "পারেন যে, সে স্থানীয় বা অন্য আবশ্যকীয় "তদন্ত করিয়া তদ্বিষয়ে আদালতে রিপোর্ট দেয়; "এবং বাজার দর বা বার্ষিক নীট লভ্য সম্বন্ধে "আদালত যে মীমাংসা করেন তাহাই চূড়ান্ত "হইবে।"

ব্যবস্থাপক সমাজের এই সকল বিধান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাম্প রসুমের ক্ষতি না হয়; কিন্তু তাহা বলিয়া লোককে তাহাদের বিপক্ষগণকে কষ্ট দিবার জন্য বিরোধীয় সম্পত্তির অযৌক্তিক উচ্চ মূল্য ধরিতে দেওয়া যাইবে না, এবং সেই জন্যই আদালতকে কোন পক্ষের প্রার্থনা মতে কমিসন নিযুক্ত করিয়া বিরোধীয় সম্পত্তির বাজার দর বা নীট লভ্য তদন্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; এবং এই বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, উক্ত প্রশ্ন সম্বন্ধে ঐ আদালতের নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে। সুতরাং আমার বোধ হয় যে, যদি কোন পক্ষ বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্য সম্বন্ধে কোন তর্ক উপস্থিত করে, তবে যে আদালত উক্ত মোকদ্দমা শ্রবণ করেন, সেই আদালতের প্রতিই ঐ বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, আমার বোধ হয় যে, জজ এই বিষয় সম্বন্ধে অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া যে নিষ্পত্তি করেন, তাহার যথেষ্ট হেতু ছিল না। নালিশের আরজীতে বলা হইয়াছে বটে যে, বিরোধীয় বিষয় বাদী ৬৭১ টাকায় ক্রয় করে এবং সাক্ষীও বলিয়াছে যে, বাদী ঐ সম্পত্তি উচিত মূল্যেই ক্রয় করিয়াছে; কিন্তু বাদী ১২৭৪ সালে অর্থাৎ নালিশ উপস্থিতের এক বৎসর পূর্ব্বে যে দরে ক্রয় করে, তাহারই কথা বলা হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তির মূল্য যে ইতিমধ্যে এত দূর বৃদ্ধি হয় নাই যাহাতে বাদী তাহার যে দর দেয় সেই দর বা প্রায় সেই দর হইতে পারে না, এমত নহে। প্রতিবাদী যদি মোকদ্দমা উপস্থিতের সময়ে সম্পত্তির মূল্য সম্বন্ধে আপত্তি করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে সেই মূল্য কি তৎসম্বন্ধে তাঁহার প্রমাণ দাখিল করা উচিত ছিল, নচেৎ স্থানীয় তদন্ত করিতে আদালতে প্রার্থনা করা উচিত ছিল। আমি বিবেচনা করি, প্রধান সদর আমীন এবিষয় সম্বন্ধে অতি যুক্তিসিদ্ধ নিষ্পত্তিই করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার রায় জজের অন্যথা করিবার অধিকার থাকিলেও তাহা করা উচিত ছিল না। অতএব আমার বিবেচনায়, "নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, এবং দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে মোকদ্দমা তথায় ফেরৎ যাইবে। বাদী এই আপীলের খরচা পাইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমিও বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা এই হেতুবাদে ফেরৎ যাইবে যে, মোকদ্দমার মূল্য যে অধিক ধরা হইয়াছে, এবিষয়ের প্রমাণের ভার প্রতিবাদীর উপরই ছিল, কিন্তু প্রতিবাদী একেবারেই সেই ভার নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই।　　　(ব)

---

৬ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং এফ, বি, কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৮২৯ নং মোকদ্দমা।

গয়ার প্রতিনিধি জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বিবী হাফেজা এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

আজহর হোসেন প্রভৃতি (বাদী) রেস্প-ণ্ডেণ্ট।

মেং, সি, গ্রেগরি এবং মুন্সী মহম্মদ ইউ-ছুফ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, ই, টুইডেল এবং বাবু নীল-মাধব সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন বিক্রয়-কবালা-লিখিত মুল্যের অবশিষ্ট টাকা পাওয়ার দাবীতে বাদী এই বলিয়া নালিশ করে যে, ঐ কবালা এই সর্ত্তে ২ নং প্রতিবাদীর নিকট গচ্ছিত রাখা হয় যে, ক্রেতা ১ নং প্রতিবাদী সমুদায় মুল্য দিলে ঐ কবালা তাহাকে দেওয়া হইবে, কিন্তু ১ নং প্রতিবাদী অবশিষ্ট মুল্য না দিয়া তঞ্চকতা পূর্ব্বক ২ নং প্রতিবাদী হইতে ঐ দলীল হস্তগত করিয়াছে।

এ স্থলে, ২ নং প্রতিবাদীর জেম্মায় যে দলীল রাখা হয়, তাহা সাবধানে না রাখিবার যথেষ্ট হেতু সে দর্শাইতে না পারিলে দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে পারে না।

যদি বাদী নিম্ন আপীল-আদালতে উপস্থিত থাকে, তবে ঐ আদালত তাহার সাক্ষ্য আবশ্যকীয় বোধ করিলে আপন ইচ্ছামতে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ সাক্ষ্য গ্রহণের হেতু স্বরূপে আদালত যদি এই লেখেন যে, তাহা সদ্বিচারার্থে আবশ্যক, তাহা হইলেই আইনের আদেশ প্রতিপালিত হয়।

বিচারপতি বেলি।—এই মোকদ্দমার বাদী ১৮৬৫ সালের ২৮এ এপ্রিল তারিখের বিক্রয়-কবালার বাবতে আসল ২১০০ এবং সুদ ৪০০ একুনে ২৫০০ টাকার দাবীতে প্রতিবাদিনীর নামে নালিশ করে। বাদীর বক্তব্য এই যে, বিক্রয়-মুল্য ৩০০০ টাকার মধ্যে কেবল ৯০০ টাকা দেওয়া হয়, উক্ত বিক্রয়-কবালা এই সর্ত্তে ২ নং প্রতিবাদী আলতাফ করীমের নিকট রাখা হয় যে, ক্রেতা দুই মাসের মধ্যে অবশিষ্ট টাকা দিলে তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে; ক্রেতা উক্ত সর্ত্তমত টাকা না দিয়া ২ নং প্রতিবাদী আলতাফ করীমের নিকট হইতে তঞ্চকতা পূর্ব্বক ঐ বিক্রয়-কবালা লইয়া যায়। বাদী বলে যে, যে দুই মাসের মধ্যে সমুদায় টাকা দেওয়ার করার ছিল, তাহা অতীত হইলেই তাহার নালিশের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

প্রতিবাদিনীগণ প্রথমতঃ বলে যে, বাদীর দাবী তমাদী দ্বারা বারিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের নিকট স্বীকার করা হইয়াছে যে, এ মোকদ্দমায় তমাদীর প্রশ্ন উত্থিত হয় না; দ্বিতীয়তঃ, বাদী যে ৯০০ টাকা নগদ প্রদত্ত হইবার কথা বলে, তাহা প্রকৃত নহে, ৯৫০ টাকা দেওয়া হয়; তৃতীয়তঃ, যে ১০৫০ টাকা ২ নং প্রতিবাদীর নিকট জরিপেস্‌গীর দাবীর বাবৎ আমানত করা হয়, তাহা কোন কোন পাট্টা ও ইজারা দেওয়া হইলে পর দেওয়ার সর্ত্ত ছিল; এবং সর্ব্বশেষ আপত্তি এই যে, প্রকৃত মুল্য ২২০০৲ টাকা ধার্য্য হয়, এবং কোন কোন সোফার দাবী এড়াইবার জন্য আর ৮০০ টাকা যোগ করা হয়।

প্রথম আদালত এই ইসু ধার্য্য করেন যে, প্রকৃত মুল্য ৩০০০ টাকা, কি ২২০০ টাকা ধার্য্য হয়, এবং জরিপেস্‌গীর বাবৎ ১০৫০ টাকা দেওয়া হয় কি না; এবং বাদীর কথিত মত ৯০০ টাকা, কি প্রতিবাদিনীর কথিত মতে ৯৫০ টাকা নগদ দেওয়া হয়? আর এই এক প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, বাদী চুক্তিভঙ্গ করায় ওয়াশীলাতের বাবতে ২০০ টাকা ওজেবাদ দেওয়া যাইতে পারে কি না।

প্রথম আদালত ক্রয়-মুল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে প্রতিবাদিনীর বর্ণনা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন এবং স্থির করেন যে, তাহার প্রদর্শিত প্রমাণের উপর একেবারে নির্ভর করা যাইতে পারে না। জরিপেস্‌গী সম্বন্ধে ১০৫০ টাকা দেওয়ার কথাও অগ্রাহ্য হয়। অতএব প্রথম আদালত বাদীকে

নালিশ উপস্থিতের তারিখ হইতে শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ সমেত আসলের অবশিষ্ট ২১৫০ টাকার ডিক্রী দেন।

আপীলে নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের রায় স্থির রাখেন।

নিম্ন আপীল-আদালত স্থির করেন যে, প্রতিবাদিনী তাহার দ্বিতীয় এবং চতুর্থ আপত্তি সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধে প্রথম আদালতে বাদীর জবানবন্দী না হওয়ায় নিম্ন আপীল-আদালত তাহার জবানবন্দী লয়েন, এবং প্রতিবাদিনী যে এক পত্রের উপর নির্ভর করে, বাদী তাহা লিখিবার কথা স্পষ্ট অস্বীকার করে। নিম্ন আপীল-আদালত মোট মোকদ্দমা সম্বন্ধে স্থির করেন যে, বাদীর প্রমাণ প্রতিবাদিনীর প্রমাণ হইতে অধিক প্রামাণ্য। অতএব তিনি আপীল ডিস্‌মিস্ করেন।

খাস আপীলে আমাদের নিকট চারিটি হেতু উত্থাপিত হয়। প্রথম হেতু এই যে, "বাদী দখল প্রদান দ্বারা উক্ত কার্য্য সমাধা "না করায় সে যে টাকার দাবীতে নালিশ করে, "তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই। সে আদা- "লতে দখল দেওয়াইবার প্রার্থনা করিলে এবং "বেদখলের কালের উসুলী টাকা আদালতে "দাখিল করিলে এবং তাহার হাতে যে টাকা "ছিল তাহা দিতে চাহিলেই কেবল চুক্তি প্রবল "করিবার মোকদ্দমা চালাইতে পারিত, অথবা "তাহা কত টাকা আদালত তাহার তদন্ত করিয়া "বাদীকে সেই টাকার ডিক্রী দিতে পারি- "তেন।"

ইহার প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নিম্ন আদালতে এ রূপ তর্ক হয় নাই। যাহা হউক, আমাদিগকে বলা হয় যে, নিম্ন আদালতে আপীলের তৃতীয় হেতু এবং বর্ণনা-পত্রের তর্কবিতর্ক এই হেতুর তুল্য; কিন্তু আমি তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিবেচনা করি। নিম্ন আদালতে এই তর্কিত হয় যে, কোন প্রমাণ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে এই আপত্তি হইয়াছে যে, আইনমতে নালিশই চলিতে পারে না।

তদনন্তর, প্রথম আপত্তির দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি যে, এই বিষয়ের সহিত বাদীর মোকদ্দমার কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ, আমাদিগকে এই মাত্র মীমাংসা করিতে হইবে যে, বাদী নিম্ন আদালতের মীমাংসানুসারে টাকা পাইবে কি না। প্রতিবাদিনীর আর যে কোন দাবী থাকুক, তাহা আমাদিগকে এ মোকদ্দমায় মীমাংসা করিতে হইবে না। অতএব আমরা এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিলাম।

খাস আপীলের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, নিম্ন আপীল-আদালত কোন কারণ না দর্শাইয়া আপীলে অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারেন না। এই আপত্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বাদী স্বয়ং আদালতে উপস্থিত ছিল, এবং আদালত তাহার সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় বোধ করিলে আপন ইচ্ছামতে তাহার জবানবন্দী লইতে পারেন। জজ স্পষ্ট বলেন যে, তিনি বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন অর্থাৎ সদ্বিচারার্থে আবশ্যক বোধ করেন; এবং আমার বিবেচনায়, ইহাতেই এস্থলে আইনের আদেশ যথেষ্ট সিদ্ধ হইতেছে। আমি বলিতে পারি যে, উক্ত পত্রের সত্যতা পরীক্ষার্থে উৎকৃষ্ট প্রমাণের আবশ্যক, এবং উক্ত পত্র-লেখক বাদীর সাক্ষ্যই উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, বাদীর আলতাফ হোসেনের বিরুদ্ধে কোন নালিশের কারণ ছিল না, অতএব তাহাকে দায়িত্ব হইতে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। বোধ হয়, আলতাফ হোসেনের হস্তে প্রতিবাদিনী কর্তৃক ১০৫০ টাকা আমানৎ রাখিবার কথা বলা হয়, এবং বাদী বলে যে, সে তাহার নিকটেই উক্ত বিক্রয়-কবালা রাখে যাহা পরে ১ নং প্রতিবাদিনীর হস্তে যায়। প্রথম আদালত স্থির করেন যে, উভয় প্রতিবাদীই বাদীর দাবী বিফল করিতে চেষ্ট

করে। যদিও ২ নং প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, সে বাদীর নিকট বিক্রয়-কবালা পায়, এবং বলে যে, ১ নং প্রতিবাদিনী তাহার নিকট ১০৫০ টাকা আমানত রাখে, তথাপি সে দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবার কোন কারণ দর্শায় নাই, কারণ, যে দলীল তাহার নিকট রাখা হয়, তাহা সাবধানে না রাখিবার কারণ সন্তোষরূপে দর্শান হয় নাই। প্রথম আদালত ইহাও স্পষ্ট স্থির করেন যে, এই মোকদ্দমায় ২ নং প্রতিবাদীই বাস্তবিক মূলাধার, এবং উক্ত নির্দ্দেশ নিম্ন আপীল-আদালতও স্থির রাখেন, কারণ, তিনি বলেন যে, প্রথম আদালতের নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন কারণ তিনি দেখেন না। অতএব আমরা এ আপত্তিও অগ্রাহ্য করিলাম।

সুদ সম্বন্ধীয় শেষ আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের মত এই যে, যে ৯০০ টাকা দেওয়া হয় তাহার সুদ না ধরিয়া অবশিষ্ট যে আসল টাকা অর্থাৎ ২১০০ টাকা বাদীর পাওয়ানা থাকে, তাহারই কেবল সুদ ধরিতে হইবে।

এতদর্থে আমরা এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

---

৭ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং ই, জ্যাক্‌সন।

১৮৭০ সালের ৪৭ নং মোকদ্দমা।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা সেপ্‌টেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২০ এ নবেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা খাস আপীল।

নীলকমল রায় (দায়ী) আপেলাণ্ট।

রোহিণী দাসী এবং অপর এক ব্যক্তি (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ডিক্রী অশুদ্ধ রূপে লিখিত হইলে যে আদালত সেই ডিক্রী দেন তাঁহারই তাহা সংশোধন করিতে হইবে। যে আদালতে তাহা জারীর জন্য পাঠান হয়, সেই আদালত তল্লিখিত খরচা ব্যতীত আর কোন খরচার জন্য তাহা জারী করিতে পারেন না।

বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমায় আপেলাণ্ট স্পষ্টই কৃত-কার্য্য হইবে। বৃত্তান্ত এই:—বাদিনী প্রতিবাদীর অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে এক নালিশ করে। উক্ত মোকদ্দমা প্রধান সদর আমীন-আদালতে খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হয়, তাহাতে বাদিনী জজের নিকট আপীল করে। তিনি উক্ত আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করেন। বাদিনী হাই-কোর্টে খাস আপীল করে, এবং তাহাতে জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হয়, এবং উক্ত মোকদ্দমার খরচা সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া তাহা প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠান হয়। দ্বিতীয় বিচারেও প্রধান সদর আমীন আবার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন। আপীলে জজ প্রধান সদর আমীনের এই নিষ্পত্তি খরচা সমেত অন্যথা করেন। উক্ত ডিক্রীর খরচার হিসাব করিতে, ডিক্রীর সহিত যে খরচার তফসীল গাঁথিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে প্রধান সদর আমীন-আদালতের দ্বিতীয় বিচারের খরচা এবং জজের নিকট দ্বিতীয় আপীলের খরচাই কেবল লেখা হয়। উক্ত মোকদ্দমা জারীর জন্য জজের আদালত হইতে পশ্চিম বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজ বাবু রামতারক রায়ের আদালতে প্রেরিত হয়। ঐ অধঃস্থ জজ কোন না কোন কারণে ঐ ডিক্রী-জারীতে খাস আপীলের খরচা ধরেন। কিন্তু তিনি বলেন যে, পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজের রায়ে ডিক্রীদারকে প্রথম জাবেতা আপীলের খরচা দিবার কোন হুকুম নাই, সুতরাং প্রথম জাবেতা আপীলের খরচা পাইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইতে পারে না। উক্ত নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীদার-গণ জজের নিকট আপীল করে। জজ বলেন,

"যখন এই আদালত অধঃস্থ জজের রায় খরচা "সমেত অন্যথা করেন, তখন ঐ হুকুম দ্বারাই, "যে সকল আদালতে উক্ত দাবী সম্বন্ধে মোক- "দ্দমা হয়, সেই সকল আদালতের খরচা আপে- "লাণ্ট পাইবে, এবং হাইকোর্ট কর্ত্তৃক "মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবার পূর্ব্বের খরচা "হইতে সে বঞ্চিত হইতে পারে না, "কারণ, রায় লিখিবার সময় উক্ত খরচার "কথা ভ্রমবশতঃ লেখা হয় নাই;" এবং তিনি তদনন্তর বলেন—"আমি এই আপীলের "ডিক্রী দিলাম এবং এই মোকদ্দমা জারীর "জন্য অধঃস্থ জজের নিকট ফেরৎ পাঠাইলাম।" জজের এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল হইয়াছে।

প্রথম আপত্তি এই যে, অধঃস্থ জজ জজের ডিক্রীজারী করিতে উক্ত ডিক্রী পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না, বা জজ ঐ ডিক্রীজারী করণার্থে পাঠাইবার পূর্ব্বে খরচার হিসাব করিয়া দিবার সময়ে যে সকল খরচা ধরেন নাই তাহাও অধঃস্থ জজ দিতে পারেন না। ব্রাউটন সাহেব দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১৮৯ ধারার যে টীকা করেন, তাহাতে স্পষ্ট লেখা আছে, যে, যে ডিক্রী অশুদ্ধ রূপে লিখিত হয়, তাহা যে আদালত প্রদান করেন তাঁহারই তাহা সংশোধন করিতে হইবে। অতএব অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধঃস্থ জজের নিকট জারীর জন্য যে ডিক্রী পাঠান হয়, তাহাতে যে সকল খরচা ধরা হয় তাহা ব্যতীত তিনি অন্য কোন খরচার নিমিত্ত তাহা জারী করিতে পারেন না।

মোকদ্দমার প্রথম শুনানী এবং প্রথম জাবেতা আপীলের খরচা সম্বন্ধে হাইকোর্ট কোন হুকুম না দেওয়ায় জজের সেই সকল খরচা দিবার ক্ষমতা আছে কি না, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে আমাদের কোন মত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। যদি ডিক্রীদারগণ বিবেচনা করে যে, তাহারা এমত এক মোকদ্দমা সাব্যস্ত করিতে পারে যাহাতে জজ এই সকল খরচা দিয়া উক্ত ডিক্রী সংশোধন করিবেন, তবে তাহারা ঐ রূপ দরখাস্ত করিতে পারিবে। কিন্তু বর্ত্তমান ডিক্রী ঐ সকল খরচার জন্য জারী করা যাইতে পারে না।

জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল। রেস্পণ্ডেণ্ট এই আপীলের খরচা দিবে। (ব)

---

৭ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৮২১ এবং ২৮২২ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অধঃস্থ জজ মাগুরার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২৮ এ জুনের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

নবকৃষ্ণ কুণ্ড (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

গৌরীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মহেন্দ্রলাল সোম আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বংশীধর সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যখন কোন ব্যক্তি কেবল দেওয়ানী আদালতেই প্রকৃত প্রতিকার পাইতে পারে, তখন সে এক জন প্রতিবাদীর নামে মাল আদালতে নালিশ করিয়া আংশিক প্রতিকার পাইতে পারিলেও, দেওয়ানী আদালতেই তাহার নালিশ করা কর্ত্তব্য।

বিচারপতি গ্লবর।—এ মোকদ্দমা বাদীর জমিদারীর অন্তর্গত কতিপয় জমির খাস দখলের দাবীতে এই হেতুবাদে উপস্থিত হয় যে, প্রতিবাদী দেবনাথ রায়ের সহিত বাদীর যে

চুক্তি হয় তাহা দেবনাথ ভঙ্গ করিয়াছে, কারণ, সে আপন কবুলিয়তের সর্ত্তের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে অর্থাৎ এই মোকদ্দমার ২ নং প্রতিবাদীকে উক্ত ভূমি হস্তান্তর করিয়াছে।

দেওয়ানী আদালতের এই মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার সম্বন্ধে এবং এই ব্যক্তিগণের মধ্যে আর যে যে মোকদ্দমা মাল এবং অন্যান্য আদালতে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহার ফল সম্বন্ধে আমাদের নিকট অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে; কিন্তু বিচারাধিকার ব্যতীত আর আর সকল প্রশ্নের বিচারের আবশ্যক নাই, কারণ, খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণের উকীল তর্কের সময় স্বীকার করিয়াছেন যে, উক্ত ভূমির পূর্ব্ব মালিকের নিকট হইতে খাস আপেলাণ্ট নিশ্চয়ই যে সকল পাট্টা পাইয়াছে, তদনুসারে সে যত দিন কর দিবে, তত দিন সে ঐ ভূমি দখল করিতে পারিবে, এবং সে কর দিলে বাদী তাহাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না।

আমাদের বিবেচনায়, বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় আপত্তি রক্ষা পাইতে পারে না। প্রতিবাদী নবকৃষ্ণকে অনধিকার-প্রবেশক বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে দখলের দাবীতে বাদী নালিশ করে, অতএব স্পষ্ট দেখা যায় যে, সে কেবল দেওয়ানী আদালতেই তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে। নবকৃষ্ণ বাদীর প্রজা থাকিবার বিষয় বাদী অস্বীকর করে, অতএব ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে নালিশ চলে না। এবং অপর প্রতিবাদী দেবনারায়ণ সম্বন্ধে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সে দখীলকার না থাকায় বাদী তাহার নামে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৫ প্রকরণ মতে নালিশ করিয়া কোন প্রকৃত প্রতিকার পাইতে পারিত না, কারণ, পাট্টার সর্ত্ত লঙ্ঘন করায় তাহা রহিত হইতে পারিলেও দেবনারায়ণের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া বাদী দখল পাইতে পারিত না; এবং সে দখলই চাহিয়াছিল। কেবল দেওয়ানী আদালতই তাহাকে প্রকৃত প্রতিকার দিতে পারিতেন; অতএব যদিও সে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে নালিশ করিয়া এক জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আংশিক প্রতিকার পাইতে পারিত, তথাপি তাহার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করাই উচিত হইয়াছে।

অতএব আর এই মাত্র প্রশ্ন আছে যে, এই সকল পাট্টার অন্তর্গত কত জমি আছে; এ প্রশ্নের মীমাংসা নিম্ন আদালত দ্বয়ের কোন আদালতেই হয় নাই। অতএব আমাদের বিবেচনায়, এই বিষয়ের অর্থাৎ খাস আপেলাণ্টকে যে সকল পাট্টা দেবনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবার বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিরোধীয় জমির কি পরিমাণ জমি আছে, তাহার বিচারার্থে মোকদ্দমা প্রথম আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে। প্রতিবাদী যে পর্য্যন্ত কর দিবে সেই পর্য্যন্ত উক্ত পরিমাণে সে দখীলকার থাকিবে, এবং বাদী খাস দখল পাইতে পারিবে না।

ফল দৃষ্টে খরচার আদেশ হইবে। (ব)

---

৭ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি ই, জ্যাক্সন এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৫১৪ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি অধঃস্থ জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া, ১৮৬৯ সালের ৩ রা জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

জাদ মহম্মদ এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদী) আপেলাণ্ট।

রাধাচরণ বোলিয়া প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ক্রয় বিক্রয়ের চুক্তি সমাধা হইলেই সোফার স্বত্ব উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত চুক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পরে ভঙ্গ হইলেও ঐ সোফার স্বত্বের ব্যতিক্রম হয় না, বা সেই স্বত্ব রহিত হয় না।

হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্রের হকসোফার বিধান অবলম্বন করিলে, মুসলমানেরাও ঐ হিন্দুদের বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব পরিচালন করিতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—বাদী এই বলিয়া এই নালিশ উপস্থিত করে যে, সে তাহার বাটীর এবং জমির সংলগ্ন দুই খণ্ড ভূমি সোফার স্বত্বে ক্রয় করিতে স্বত্ববান, কিন্তু উক্ত ভূমিখণ্ড দ্বয় ১ নং প্রতিবাদী ২ নং প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

মোকদ্দমায় অনেক ইসু হয়, কিন্তু প্রথম আদালত বাদীর দাবীর ডিক্রী দেন। দ্বিতীয় আদালত আপীলে তাহা এই হেতুবাদে ডিস্‌মিস্ করেন যে, বাদীর সোফার স্বত্ব থাকুক বা না থাকুক, উভয় প্রতিবাদীর মধ্যে যে ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি হয় তাহা এই নালিশ উপস্থিতের পরে রহিত হইয়াছিল, সুতরাং বাদীর 'সোফার স্বত্ব গিয়াছে। আপীল-আদালত স্থির করেন যে, এই সকল অবস্থায় হকসোফার দাবী সদ্বিচার-সম্মত নহে, এবং শরার ব্যবস্থা অনুযায়ীও নহে।

এই খাস আপীলে আমাদের নিকট প্রথম এইকথা বলা হয় যে, আপীল-আদালতের সংস্থাপিত এই মত শরার বিরুদ্ধ; সোফার স্বত্ব একবার উৎপন্ন হইলে যাহাদের দ্বারা উক্ত স্বত্বের সৃষ্টি হয়, তাহাদের কার্য্য দ্বারা তাহা রহিত হইতে পারে না। হেদায়ার ৩৮ অধ্যায়ের ৩ পরিচ্ছেদের ৫৯২ পৃষ্ঠায় হকসোফার বিষয়ে লেখা আছে যে, "কোন ব্যক্তি মূল্য দিয়া কোন "ভূসম্পত্তি লইলে তৎসম্বন্ধে সোফার স্বত্ব জন্মে, "কারণ, উক্ত সর্ত্ত নির্ব্বাহ করা সফীর ক্ষমতা-"ধীন।" এবং ৫৯৮ পৃষ্ঠায় সংস্থাপিত হইয়াছে যে, "ক্রেতা ও বিক্রেতা চুক্তিভঙ্গ করিতে "সম্মত হইলেও সফীর সোফার স্বত্ব সংস্থাপিত "হয়; কারণ, ঐ সকল স্থলে কেবল বিক্রেতা "এবং ক্রেতার সম্বন্ধে ঐ চুক্তি ভঙ্গ হয়, কারণ, "তাহারা তাহাদের নিজের কর্ত্তা, এবং ঐ "চুক্তি-ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক তথাপি অপরের "সম্বন্ধে তাহা ভঙ্গ নহে, বরং তাহা নূতন "বিক্রয় স্বরূপ, যেহেতু উভয় পক্ষের পরস্পর "সম্মতিতে সম্পত্তি দিয়া সম্পত্তি গ্রহণ করা যে, "বিক্রয়ের লক্ষণ, তাহা তাহাতে আছে; এবং "সফী অপর ব্যক্তি বিধায় তাহার সম্বন্ধে তাহা "বিক্রয়ের তুল্য, অতএব তাহার সোফার স্বত্ব "স্বীকার করিতে হইবে।"

আপীল-আদালত সোফার স্বত্বভঙ্গ সম্বন্ধে যে বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। আমরা এই মাত্র যে ব্যবস্থা দর্শাইলাম তাহাতে স্পষ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে যে, ক্রয় ও বিক্রয়ের চুক্তি সমাধা হইলেই সোফার স্বত্ব উৎপন্ন হয়, এবং পরে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে চুক্তিভঙ্গ হইলে ঐ সোফার স্বত্বের ব্যতিক্রম হয় না বা তাহা রহিত হয় না। এই বিষয় সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, এবং অধঃস্থ জজের সমক্ষে আর আর যে বিষয় সম্বন্ধে আপীল হইয়াছে তাহার নিষ্পত্তির জন্য এই মোকদ্দমা তাঁহার নিকট ফেরৎ যাইবে।

তর্কবিতর্কের সময়ে এই মোকদ্দমার প্রতি আর এই এক আপত্তি হয় যে, উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়েই হিন্দু হওয়ায়, এবং যে ব্যক্তি সোফার দাবী করে, সে মুসলমান হওয়ায়, তাহাদের মধ্যে হক্‌সোফার বিধান প্রবল হইতে পারে না। এই আপত্তির পোষকতায় ১৩ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২১ পৃষ্ঠা-প্রচারিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে। কিন্তু

যে দেশে হকসোফার প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই, তথাকার মোকদ্দমার কথাই কেবল উক্ত নিষ্পত্তিতে বলা হইয়াছে; রঙ্গপুরের অন্তর্গত যে স্থান হইতে এই মোকদ্দমা আসিয়াছে, তথাকার হিন্দুদিগের মধ্যে যদি হকসোফার প্রথা প্রচলিত না থাকে, তবে বাদী মুসলমান বিধায় হিন্দুদিগের পরস্পরের কার্য্যে বাদীর সোফার স্বত্ব হইতে পারে না। হিন্দুরা মুসলমানের সোফার আইনে বাধ্য হইবে না। কিন্তু এ মোকদ্দমায় বাদী বলিয়াছে যে, হকসোফার প্রথা হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত আছে। অতএব যদি তাহারা তাহাদের মধ্যে মুসলমানের ব্যবহার-শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে, তবে মুসলমানেরও উক্ত স্বত্ব তাহাদের বিরুদ্ধে পরিচালন করণে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

এ মোকদ্দমার তর্কবিতর্কে এমত দৃষ্ট হয় না যে, হিন্দু ক্রেতা ও বিক্রেতা এমত কোন আপত্তি করিয়াছে যে, তাহাদের মধ্যে হকসোফার প্রথা খাটে না, অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে মুসলমানের সোফার স্বত্ব নাই।

নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইল, এবং আপীলে আর আর যে সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহার বিচারার্থে এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান গেল। ফল দৃষ্টে খরচার আদেশ হইবে। (ব)

---

৭ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ এ গ্লবর এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৯৩৬ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অধঃস্থ জজ তত্রত্য সদর আমীনের ১৮৬৮ সালের ২৯ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

উমাময়ী ব্রহ্মাণী (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

বকু বেহারা (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে উকীল নাই।

চুম্বক।—চাকর স্বরূপে কোন ভূমিতে ১২ বৎসর দখীলকার থাকিলে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারা মতে দখলের স্বত্ব উৎপন্ন হয় না; তদর্থে সেই কালের কর দেওয়ার বিষয় সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

বিচারপতি গ্লবর।—আমাদের বিবেচনায় এ মোকদ্দমা এই মীমাংসার্থে ফেরৎ যাইবে যে, বাদী নালিশ উপস্থিতের পূর্ব্ব ১২ বৎসর পর্য্যন্ত কর আদায় করিয়া উক্ত ভূমিতে দখীলকার ছিল কি না, যাহাতে সে দখলের স্বত্বাধিকারী প্রজার অবস্থাপিত হইতে পারে।

পাট্টা সম্বন্ধে নিম্ন আদালতের এই নিষ্পত্তিতে আমরা অসম্মত নহি যে, যদিও এই দলীল বহুকালের বিধায় তাহা বাদী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ করিতে পারে না, তথাপি বাদী অন্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারিত যে, যত কাল সে কর দিবে, তত কাল তাহার উক্ত ভূমিতে থাকিবার স্বত্ব থাকিবে, কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা করণে অধঃস্থ জজ কেবল দখল দেখিয়াছেন; কর দিয়া দখল করা হইয়াছে কি না, তাহা দেখেন নাই।

বাদী কেবল এই দেখাইয়া ১২ বৎসর দখলের প্রসঙ্গের উপকার লাভ করিতে পারে যে, সে ভূম্যধিকারীকে ঐ কালের কর দিয়াছে। তাহা হইলে তাহার দখলের স্বত্ব হয়, এবং সে ভূমি হইতে উচ্ছেদিত হইতে পারে না, কিন্তু এই বিষয়ে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অসম্পূর্ণ। অতএব আমরা এ মোকদ্দমা এই জন্য উক্ত আদালতে ফেরৎ পাঠাইতেছি যে, তিনি

প্রমাণ লইয়া স্থির করিবেন যে, বাদী আপন বর্ণনানুযায়ী প্রজা স্বরূপে কর দিয়াছে কি না।

বাদী কর আদায় সপ্রমাণের অভিপ্রায়ে বহুতর দাখিলা দাখিল করে ; কিন্তু ঐ সকল দাখিলার সত্যতা সপ্রমাণার্থে তাহার কখন জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, অথবা সে তাহা সপ্রমাণার্থে সাক্ষীও উপস্থিত করে নাই। আমরা বিবেচনা করি, বাদীকে এই বিষয় সম্বন্ধে জবানবন্দী দিতে এবং ঐ সকল দাখিলার-পোষকতায় সাক্ষীও দিতে বলিতে হইবে। প্রতিবাদিনীও ইচ্ছা করিলে বিপরীত প্রমাণ দিতে পারিবে।

ফল দৃষ্টে খরচার আদেশ হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে সম্মত হইলাম। প্রতিবাদিনী চাকরাণী স্বরূপে কি প্রজা স্বরূপে দখীলকার ছিল, তাহার তদন্ত না করিয়া বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করা নিম্ন আপীল-আদালতের স্পষ্টই অন্যায় হইয়াছে। চাকর স্বরূপে ১২ বৎসর দখল থাকিলে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামতে দখলের স্বত্ব উৎপন্ন হয় না ; অতএব নিম্ন আপীল-আদালতকে এই মীমাংসা করিতে হইবে যে, প্রতিবাদিনী প্রজা স্বরূপে, না চাকরাণী স্বরূপে দখীলকার ছিল। (ব)

---

৮ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি ই, জ্যাক্‌সন এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৬৫৫ নং মোকদ্দমা।

মানভূমের প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৫ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

নফর মাইতী (বাদী) আপেলাণ্ট।

মনোহর সরদার প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—যে স্থলে প্রজা ভূম্যধিকারীর নামে কেবল দখলের দাবীতে নালিশ না করিয়া ওয়াশীলাতের দাবীতেও নালিশ করে, এবং ভূম্যধিকারি-সহ আর আর ব্যক্তিগণকে প্রতিবাদী করে, তাহাতে উক্ত নালিশ ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে উপস্থিত হইতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—নিম্ন আপীল-আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, দেওয়ানী আদালতের এই মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার নাই, কারণ, এক প্রজা আপন জমার দখলের দাবীতে তাহার ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। নিম্ন আপীল-আদালতের মত এই যে, এ মোকদ্দমা কেবল ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার বিধান মতে উপস্থিত হইতে পারে ; কিন্তু এই নালিশের আরজী যখন কেবল জমি দখলের নিমিত্ত হয় নাই, ওয়াশীলাতের দাবীতেও উপস্থিত হইয়াছে, এবং ভূম্যধিকারি-সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণকে প্রতিবাদী করা হইয়াছে, এবং যেহেতু ওয়াশীলাতের দাবীর এবং ভূম্যধিকারী ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধের নালিশ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে উপস্থিত হইতে পারে না, অতএব এই মোকদ্দমাও উক্ত আইন অনুসারে উপস্থিত হইতে পারে না। দেওয়ানী আদালতের এই মোকদ্দমার বিচারাধিকার ছিল। অতএব এই মোকদ্দমা বিচারের জন্য নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ পাঠান গেল।

মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি অনুসারে এই আদালতের খরচার আদেশ হইবে।

---

(ব)

৯ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারুণেট।

১৮৬৯ সালের ২২৮৪ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের অধঃস্থ জজ তত্রত্য সদর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২০ এ মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৫ ই জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ঈশানচন্দ্র সাহা (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

হাতে মুজ্জমা খোন্দকার এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি, এলেন এবং বাবু ভবানীচরণ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার এবং ললিতচন্দ্র সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—কোন ভূমি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে মুক্ত করিতে হইলে এই দেখান আবশ্যক যে, তাহা স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে লাখেরাজ স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল; কেবল ১২ বৎসর নিষ্কর ভোগ দর্শাইলেই হইবে না।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—এই মোকদ্দমার অবস্থা কিছু অদ্ভুত। বাদী এবং প্রতিবাদী এক রাজস্ব-প্রদ মহালের শরীক। তাহারা ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের বিধানমতে উক্ত মহালের বাটোয়ারার প্রার্থনায় কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে। কালেক্টর তদনুসারে বাটোয়ারা করেন, এবং যে পরিমাণ রাজস্ব যে মালিকের দেয় স্থির হয়, তাহা তাহার নামে ধরেন। পরে, বাদী অর্থাৎ উপস্থিত খাস রেস্পণ্ডেণ্ট এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। সে বলে যে, কালেক্টর ঐ মহালের যে বাটোয়ারা করেন তাহাতে তিনি ৫০/ বিঘা ভূমি মাল-জমি বলিয়া তাহার কর স্থাপন করেন; কিন্তু বাদী বলে যে, তাহা লাখেরাজ ভূমি, সুতরাং তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায় হইতে পারে না।

কালেক্টরকে মোকদ্দমার পক্ষ করা হয় নাই, সুতরাং কি কি অবস্থায় উক্ত বাটোয়ারা করা হয়, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু অন্ততঃ, আমাদিগকে এই অনুমান করিতে হইবে যে, পক্ষগণ কালেক্টরের নিকট বাটোয়ারার জন্য দরখাস্ত করে, এবং বাটোয়ারা করিতে তাহারা ইচ্ছুক ছিল। কালেক্টরের অসাক্ষাতে বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে এই ইসু হয় যে, ঐ সকল ভূমি মাল কি লাখেরাজ; বাদীর নালিশের ভাব এই যে, উক্ত ভূমি লাখেরাজ বলিয়া ব্যক্ত হয়।

কালেক্টর উক্ত জমি মাল জমি বলিয়া তাহার রাজস্ব ধরাতে উপস্থিত বাদীর বর্ত্তমান আকারে বিশেষতঃ কালেক্টরের অসাক্ষাতে নালিশ উপস্থিত করিবার কোন হেতু জন্মে কি না, তাহাতে আমার অত্যন্ত সন্দেহ আছে। কিন্তু তর্কের জন্য যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া হয় যে, উক্ত নালিশ চলিতে পারে, এবং কালেক্টরের অসাক্ষাতেই চলিতে পারে, তাহা হইলেও বাস্তবিক বাদীর নালিশের কারণ কি? তাহা এই যে, যে জমির কর আদায় হইবে না, কারণ, তাহা বাস্তবিক লাখেরাজ, কালেক্টর মাল জমি স্বরূপে তাহার কর ধার্য্য করিয়াছেন।

আমার বোধ হয় যে, উক্ত জমি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে মুক্ত করিতে হইলে স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে তাহা লাখেরাজ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকার বিষয় দেখাইতে হইবে; কারণ, এই সকল জমি সেই সময়ে লাখেরাজ স্বরূপ না থাকিয়া থাকিলে মাল সংক্রান্ত আইন অনুসারে তাহার অবশ্যই কর ধার্য্য হইতে পারে।

তদনন্তর, আমি বাদীর নালিশের ভাবের বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি। বিরোধীয় ভূমি কি প্রকারের লাখেরাজ তাহা কোন স্থলেই বর্ণিত দৃষ্ট হয় না। উক্ত স্বত্ব ১২ বৎসর ভোগের দ্বারা

উৎপন্ন হয়, কি ঐ মহালের এক জন তালুকদার তাহা সৃজন করে এবং কাজে কাজে প্রতিবাদী অর্থাৎ অপর তালুকদার বা সহ-তালুকদার তাহা অন্যথা করিবার আশা করিতে পারে না, অথবা তাহা কি স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ছিল, বাদী ইহার কোন নিদর্শন দেয় নাই। কিন্তু খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল গত কল্য আমাদিগকে যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা হইতে এই সংগ্রহ করিতেছি যে, তিনি ইহা বলিতে ইচ্ছা করেন নাই যে, উক্ত লাখেরাজ দশ-সালা বন্দোবস্তের সময়ে ছিল। তবে আদালত কি স্থির করেন? তিনি এমত স্থির করেন নাই যে, তাহা ঐ প্রকারেরই জমি; তিনি এই মাত্র স্থির করেন যে, তাহা লাখেরাজ জমি, এবং বাদী তাহা লাখেরাজ স্বরূপে ১২ বৎসরের অধিক কাল দখল করে। অতএব আদালত স্থির করেন যে, তাহা এপ্রকারের স্বত্ব যে, প্রতিবাদী তাহাতে বাধ্য এবং প্রতিবাদীর সম্বন্ধে তাহা প্রবল স্বত্ব। উক্ত নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ স্বত্ব প্রতিবাদীর সম্বন্ধে প্রবল হইতে পারে, এবং খাস রেস্পণ্ডেণ্ট যে কয়েক নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করে তাহাতেও বোধ হয় তাহাই বলা হইয়াছে। কিন্তু বাদীর নালিশ দৃষ্টে আমার মত এই যে, ১২ বৎসর ভোগের দ্বারা তাহার যে স্বত্ব জন্মে, তাহার অধিক এরূপ মোকদ্দমায় দাবী করা আবশ্যক, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালেক্টর যে কার্য্য দ্বারা হুকুম দেন যে, এই জমির কর ধার্য্য হইবে, তাহাই এই নালিশের কারণ। অতএব কালেক্টরের সম্বন্ধে, উক্ত জমির কর সংস্থাপন নিবারণার্থে তাহা দশ-সালা বন্দোবস্তের সময়ে থাকিবার বিষয় দেখাইতে হইবে, সুতরাং এই দেখাইলেই হইবে না যে, বাদী তাহা ১২ বৎসর পর্য্যন্ত দখল করিয়াছে বলিয়াই তাহা সিদ্ধ লাখেরাজ।

অতএব আমি বিবেচনা করি, যে সকল নজীর আমাদিগকে দর্শান হইয়াছে তাহার অবস্থা এই মোকদ্দমার অবস্থা হইতে এত ভিন্ন যে, ঐ সকল নজীর এস্থলে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে আর এই মাত্র বিচার্য্য যে, এ মোকদ্দমা যে ভাবে উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে তাহা চলিবে কি না। আমি বোধ করি, তাহা চলিবে না। কালেক্টর বিরোধীয় জমি মাল বলিয়া যে নির্দ্দেশ করেন, তাহাই এই নালিশের কারণ স্বরূপে ব্যক্ত হওয়ায়, আমি বোধ করি যে, নালিশের আরজীতে এমত কোন স্বত্ব ব্যক্ত বা সংস্থাপিত হয় নাই, যাহা আমরা ঐ রূপ নালিশের কারণে স্থির রাখিতে পারি; বাদী এমত প্রকাশ করে না যে, এই স্বত্ব দশ-সালা বন্দোবস্তের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, এবং বাদী তাহা নিম্ন আদালতের কোন আদালতেও উত্থাপন করে নাই।

এই হেতুতে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত ছিল, অতএব আমি নিম্ন ~~আপীল-~~আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করত প্রথম আদালতের রায় স্থির রাখিব, এবং বাদী এই আদালতের ও নিম্ন আপীল-আদালতের খরচা দিবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি অধঃস্থ জজের রায় এই হেতুবাদে অন্যথা করিতে সম্মত যে, বাদী নালিশের কোন হেতু দর্শায় নাই। আমি আরো বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমার পক্ষ করার ত্রুটিতেও বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইতে পারিত। এ প্রকারের মোকদ্দমা কোন অবস্থায়ই চলিতে পারে কি না, তাহাতেও আমার সন্দেহ আছে। যাহা হউক, ঐ সকল প্রশ্নে প্রবেশের আবশ্যক নাই, কারণ, যে প্রথম প্রশ্ন আমাদের সমক্ষে তর্কিত হইয়াছে, তাহাতেই আমি বিচারপতি হবহৌসের মতে সম্মত হইলাম। (ঘ)

১৮ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং
দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৯৬৩ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ পরগণার প্রতিনিধি জজ তত্রত্য মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২৭ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ঠাকুরচরণ রায় ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

চব্বিশ পরগণার কালেক্টর ও অন্যান্য
( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুলকৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন তালুক এক কালেক্টরী হইতে অন্য কালেক্টরীতে খারিজ হইয়া যায়, এবং তালুকদার তাহার নোটিস পাইয়াও তাহার রাজস্ব পূর্ব্ব কালেক্টরীতে দেয়, তবে তাহা ঐ রাজস্ব আদায় স্বরূপে গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সে যদি নোটিস পাওয়ার পূর্ব্বে ঐ রূপ দেয় এবং তাহার রসিদ পায়, তবে আদায় গণ্য হইতে পারে।

রাজস্ব বাকী না থাকিবার হেতুবাদে ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুযায়ী নীলাম রদের দাবীর মোকদ্দমা, কমিসনরের নিকট অগ্রে আপীল না করিয়াই দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করা যাইতে পারে।

বিচারপতি গ্লবর।—চব্বিশ পরগণার কালেক্টর ১৮৫৯ সালের ১১ আইন মতে যে নীলাম করেন তাহা এই হেতুবাদে রহিত করার দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত হয় যে, রাজস্ব বাকী ছিল না, অতএব উক্ত নীলাম আইনবিরুদ্ধ।

দেখা যায় যে, হুগলীর কালেক্টরীর সামিল ৫/০ টাকা রাজস্বে বাদীর এক ক্ষুদ্র তালুক ছিল। রিবেনিউ বোর্ডের হুকুম অনুসারে উক্ত তালুক ১৮৬৬ সালের ১লা মে তারিখে চব্বিশ পরগণার কালেক্টরীতে খারিজ হইয়া আসে, এবং ঐ জেলার কালেক্টর ১৮৬৭ সালের রাজস্ব তাঁহার ট্রেজরীতে দাখিল হয় নাই দেখিয়া উক্ত তালুক রীতিমত নীলামের এস্তাহার দেন, এবং সেই সালের ২৯ এ জুলাই তারিখে তাহা ২ নং প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় করেন। কিন্তু স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদী পূর্ব্বেই ২২ এ মার্চ তারিখে তাহার ১৮৬৭ সালের রাজস্ব হুগলীর ট্রেজরীতে দিয়া রসীদ লইয়াছে, এবং ঐ স্থানেই সে তাহা বরাবর দিয়া আসিয়াছে।

জওয়াব এই যে, দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার নাই, এবং বাদী ঐ তালুক খারিজ হইয়া যাওয়ার রীতিমত সংবাদ পাইয়াছে। অতএব সে তাহার ১৮৬৭ সালের রাজস্ব চব্বিশ পরগণার ট্রেজরীতে দিতে বাধ্য ছিল, এবং তাহা না দেওয়ায় তাহার তালুক ১৮৫৯ সালের ১১ আইন অনুসারে উচিতমতে এবং বিধিমতেই বাকী রাজস্বের জন্য নীলাম হইয়াছে।

মুন্সেফ এই বলিয়া বাদীকে ডিক্রী দেন যে, ঐ খারিজের নোটিস বাদীকে দেওয়া হয় নাই, সুতরাং সে যখন তাহার দেয় সমুদায় রাজস্ব হুগলীর কালেক্টরীতে দিয়াছে, তখন এমন কিছু বাকী ছিল না, যাহার নিমিত্ত তাহার তালুকের নীলাম হইতে পারে।

জজ আপীলে বিবেচনা করেন যে, যেহেতু বাদী হুগলির কালেক্টরীতে যে টাকা দেয় তাহা সে চব্বিশ পরগণার কালেক্টরীতে খারিজ করিয়া লইবার কোন চেষ্টা করে নাই এবং ঐ রূপ খারিজের রসীদ দাখিল করে নাই, অতএব নীলামের সময়ে রাজস্ব বাকীই ছিল। অতএব তিনি স্থির করেন যে, দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার নাই।

জজ এরূপ নিষ্পত্তি করায় আমার বোধ হয় যে, যে বিষয়ের উপর সমগ্র মোকদ্দমাটি নির্ভর

করে তাহা দেখেন নাই। কর বাকী ছিল কি না, এই প্রশ্ন, বাদী তাহার সম্পত্তি হুগলি হইতে চব্বিশ পরগণায় খারিজ হইয়া যাওয়ার নোটিস পাইয়াছিল কি না, এই বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যদি সে তাহা পাইয়া থাকে, তবে তাহার রীতিমত ট্রান্সফর রসীদ না থাকিলে, যে ট্রেজরিতে ঐ টাকা দাখিল হইবে না সে জানিত, সেই ট্রেজরিতে তাহা দিয়া ওয়াসীল লইতে পারে না; সে যদি নোটিস না পাইয়া থাকে, তবে তাহার সম্পত্তির রাজস্বের বাকী পড়িয়াছিল বলা যাইতে পারে না। হুগলির কালেক্টর তাহার রাজস্ব লইয়া তাহাকে রসিদ দিয়াছেন, এবং এমত অবস্থায় তাহাতেই গবর্ণমেণ্টের ১৮৬৭ সালের রাজস্বের সমুদায় দাবীর শেষ হয়। বাদী ঐ রাজস্ব যেখানে বরাবর দিত এবং যেখানে তাহার দিবার হুকুম ছিল সেই স্থানেই দিয়াছে। কালেক্টর তাহার টাকা লইয়াছেন, এবং ইহা ঐ তালুক খারিজ হইয়া যাওয়ার অনেক মাস পরে হওয়াতেও কালেক্টর তাহাকে এমন কিছু জানান নাই যে, সে ট্রেজরিতে তাহার ঐ টাকা দেওয়া উচিত নহে, সেই ট্রেজরিতেই সে তাহা দিল; অতএব এমত স্থলে কর বাকী ছিল বলা যারপর নাই

যদি ঐ সময়ে রাজস্ব বাকী না থাকিয়া থাকে, তবে ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৬৬ পৃষ্ঠা-প্রচারিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি এ স্থলে খাটে, এবং তাহা দ্বারাই দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকারের প্রশ্ন মীমাংসিত হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৫ এবং ৩৩ ধারার ফল সম্বন্ধে জজ যাহা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে, উক্ত পূর্ণাধিবেশনেই মীমাংসিত হইয়াছে যে, কমিশনরের নিকট আপীল যাহা দেওয়ানী আদালতে নালিশের পূর্ব্ব কার্য্য, তাহা কেবল কার্য্য-প্রণালী, অর্থাৎ নীলাম বেজাবেজা কি না, তৎসম্বন্ধীয়, এবং রাজস্ব বাকী ছিল কি না, তদ্দৃষ্টে নীলামের সিদ্ধাসিদ্ধতার বিচার করাইতে কমিশনরের নিকট অগ্রে আপীল করা আবশ্যকীয় নহে।

আমি বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমা এই মীমাংসার্থে জজের নিকট ফেরৎ যাইবে যে, বাদী ঐ তালুক খারিজ হইয়া যাওয়ার নোটিস পাইয়াছিল কি না। প্রথম আদালত এবিষয় বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করেন; এবং উক্ত নিষ্পত্তি শুদ্ধ হইলে বাদীর ডিক্রী পাওয়া উচিত। তাহার প্রতি এ ঘটনা নিতান্ত পীড়া-দায়ক হইয়াছে, এবং হুগলির কালেক্টরীর কর্ম্মচারিগণ যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা অতি দূষণীয়।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

১১ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১১৮৩ নং মোকদ্দমা।

পাটনার অধঃস্থ জজ তত্রত্য প্রতিনিধি মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শ্রীচাঁদ (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

নিমচাঁদ সাহু (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি এলেন এবং মহেশচন্দ্র চৌধুরী, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও নৃসিংহচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি, গ্রেগরি এবং বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন প্রজা সকল শরীকের নিকট হইতে স্বত্ব পাইয়া যে ভূমি ভোগ করে, এক শরীক আর আর সকল শরীকের সম্মতি ব্যতীত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

বিচারপতি মার্কবি।—আমার বোধ হয় যে, এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে কথার উপর নির্ভর করে, তাহা আদালত অনেক পূর্ব্বে রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলকে জানাইবাতেও, ঐ উকীল এই আপীলের তর্কবিতর্কে তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক এড়াইয়াছেন।

এই মোকদ্দমার অন্তর্গত অনেক বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিবারই আবশ্যক নাই। প্রথম আদালতে মুন্সেফ স্থির করেন যে, বাদী এ মোকদ্দমা চালাইতে পারে না। প্রতিবাদী যে সম্পত্তিতে দখীলকার ছিল, তাহাতে বাটী এবং আম্রের বাগান প্রস্তুত করত তাহা ভোগ করিতে তাহাকে নিবারণ করার জন্য এবং বাটী স্থগিত এবং প্রাচীর ও বৃক্ষাদি স্থানান্তর করণার্থে এই নালিশ হইয়াছে। প্রতিবাদীর দখলের স্বত্বের প্রতি আপত্তি হয় নাই, এবং বলা হইয়াছে যে, সে কতিপয় ঠীকাদারের নিকট হইতে তাহার স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহারা তাহাদের স্বত্ব বাদীর শরীকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতএব আদালত এই মত স্থির করেন যে, কোন এক শরীক আর আর শরীকের সম্মতি ব্যতীত প্রতিবাদীর এমত সম্পত্তির ভোগে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, যাহার স্বত্ব ঐ প্রতিবাদী সকলের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ক্রোড়পত্রের ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমার প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি গ্লবর যে নিষ্পত্তি করেন তাহার সহিত এই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, কিন্তু উক্ত নিষ্পত্তি যাহা আবশ্যকীয়, তাহা কেন ক্রোড়পত্রে দেওয়া হইয়াছে, তাহার কারণ দেখা যায় না। সত্য বটে, উক্ত মোকদ্দমা এমত দুই শরীকের মধ্যে উপস্থিত হয়, যাহারা স্বয়ং সম্পত্তি ভোগ করিতেছিল, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, যে স্থলে অনেক শরীকের মধ্যে এক জন সকলের সাধারণ প্রজার সম্পত্তি ভোগে বাধা দেয়, তাহাতে মূলে সেই নিয়মই প্রয়োগ হয়। শরীকগণের মধ্যে ভূমি ব্যবহারের প্রণালী সম্বন্ধেই উভয় মোকদ্দমায় তর্ক হয়। মুন্সেফ কেবল এই ত্রুটি করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী উক্ত ভূমির কোন ক্ষতি করিতেছিল কি না, তৎসম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু বাদী ঐ রূপ কোন ক্ষতির কথা বলে নাই, এবং আমিও দেখিতেছি যে, কোন ক্ষতি হইতে পারে না; অতএব এই মোকদ্দমা উল্লিখিত নিষ্পত্তির সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে, এবং ঐ নিষ্পত্তিতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত। আমি আরো বলিতে চাহি যে, সেই সময়ে যে এক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, এবং যাহা ১২ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৬৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে আমি এই মত প্রকাশ করি যে, কোন ক্ষতি করা হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে সেই নিয়মই প্রয়োগ হইবে। এ মোকদ্দমায় উক্ত বিষয়ের মীমাংসা করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমার উল্লেখ হওয়াতে আমি এই মাত্র বলিলাম যে, আমি তাহাতে যে মত প্রকাশ করিয়াছি এখনও আমার সেই মত।

নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া বাদীর নালিশ খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল।

বিচারপতি বেলি।—আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমা বেঙ্গল ল রিপোর্টের ক্রোড়পত্রের ৬৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত প্রধান বিচারপতি এবং বিচারপতি গ্লবরের নিষ্পন্ন মোকদ্দমা দ্বারা শাসিত হইবে; তাহার মধ্যে কেবল প্রভেদ এই যে, উক্ত মোকদ্দমায়, শরীকগণেরই স্বার্থ ছিল, এই মোকদ্দমায় শরীকগণের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থ আছে। অন্যান্য বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই। এ মোকদ্দমায় কোন ক্ষতির কথা বলা হয় নাই, এবং বস্তুতঃ, এ মোকদ্দমায় এক জন শরীক আর আর শরীকের সম্মতি ব্যতীত সকল শরীকের এজমালী জমি হইতে

কোন কোন বৃক্ষ উঠাইয়া এবং প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিতে প্রার্থনা করে।

আমি বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে এবং নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি এই আদালতের এবং নিম্ন আপীল-আদালতের খরচা সমেত অন্যথা করিতে সম্মত হইলাম। (ব)

---

১৩ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

হুগলির ছোট আদালতের জজের ১৮৭০ সালের ১৬ ই মার্চের এস্তমেজাজ।

সৌদামিনী দাসী, ডিক্রীদার।

যজ্ঞেশ্বর সুর, দায়ী।

চুম্বক।—কোন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক দ্বারা ডিক্রীজারী করণার্থে, যে ঘরে বা বাক্‌সের মধ্যে উক্ত সম্পত্তি থাকে, নাজীর তাহার চাবী ভাঙ্গিয়া উক্ত সম্পত্তি উচিতমতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাতে আপন চাবী দিতে পারিবেন।

এস্তমেজাজ।—ডিক্রীদার এই প্রার্থনায় এই আদালতে এক ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করে যে, সে দায়ীর যে যে সম্পত্তি দেখাইয়া দিবে তাহা ক্রোক করিয়া তাহার ডিক্রী পরিশোধার্থে নীলাম করা হয়।

আদালত উক্ত দরখাস্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১৪ ধারার শেষ ভাগের অন্তর্গত জ্ঞান করিয়া যে স্থানে প্রতিবাদীর সম্পত্তি পাওয়া যাইবে, তথায় তাহা ডিক্রী এবং খরচার পরিমাণে ক্রোক করিবার আদেশে নাজীরের প্রতি এক পরওয়ানা দেন। নাজীর উক্ত পরওয়ানা জারী করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রিপোর্ট করেন যে, ডিক্রীদার দায়ীর যে অস্থাবর সম্পত্তি দেখাইয়া দেয় তাহা "গোলাজাত" চূণ, এবং তাহা বন্ধ থাকায় ক্রোক দিবার জন্য উক্ত গোলার দরওয়াজা ভাঙ্গিতে বিশেষ ক্ষমতা পাওয়ার নিমিত্ত আদালতের নিকট প্রার্থনা করেন।

কোন দেওয়ানী আদালতের ক্রোকের হুকুম জারীতে কোন ঘরের দরওয়াজা ভাঙ্গা যাইতে পারে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ হওয়ায় আমি এতৎ সম্বন্ধে হাইকোর্টের আদেশের প্রার্থনা করি।

১৮৬৫ সালের ১১ আইনে বা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনে এমন কোন স্পষ্ট বিধান নাই, যদনুসারে ছোট আদালত কোন ঘরের দরওয়াজা ভাঙ্গিবার হুকুম দিতে পারেন; কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কোন দরওয়াজায় চাবি বন্ধ থাকিলেই যদি আদালতের হুকুম জারী হইতে না পারে, তবে দায়ী আপন সম্পত্তি ক্রোকের হুকুম হইবার সংবাদ পাইলেই সমুদায় দ্রব্য ঘরে চাবী দিয়া রাখিয়া তাহা ক্রোক হইতে এড়াইতে পারে। কিন্তু কর আদায়ের নিমিত্ত সরাসরী কার্য্য সম্বন্ধে পুরাতন আইনের (১৭৯৩ সালের ১৭ কানুনের) ন্যায় আদালতের ঐ রূপ ক্ষমতা থাকা উচিত হইলেও, ঘরের দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া কি প্রণালীতে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে তাহার অনুমতি বা বিধান দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে না থাকায় আমি এই মত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছুক যে, উপরোক্ত প্রণালীতে ক্রোক করা যাইতে পারে না।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমায় ছোট আদালতের জজ যে প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তরে 'হাঁ' বলা যাইতে পারে, এবং নাজীর সম্পত্তি ক্রোক দিবার জন্য কোন গোলার দরওয়াজার চাবী ভাঙ্গিতে পারেন। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৩৩ ধারা যাহা সম্পত্তি ক্রোক দিয়া টাকার ডিক্রীজারী করিবার বিধানের এক অংশ, তাহাতে বিধিবদ্ধ আছে যে, "সেই "সম্পত্তি যদি আসামীর নিকট থাকা মাল কি "জিনিস কি অবস্থার অন্য দ্রব্য হয়, তবে তাহা "নিতান্ত হস্তগত করিয়া সেই ক্রোক করা যাইবে,

"ও মাজির কিম্বা অন্য আমলা আপনার জেম্মায়
"কিম্বা আপনার তাবেদার লোকের জেম্মায় সেই
"দ্রব্য রাখিবেক, ও তাহা উচিত মতে রক্ষা করি-
"বার বিষয়ে দায়ী হইবেক।"

আমার বোধ হয় যে, উক্ত আইনে যে প্রকৃত আটক দ্বারা ক্রোক করিবার আবশ্যকতা এবং ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে নাজীরকে বা আদালতের অন্য কোন কর্ম্মচারীকে যে গতিকেই হউক উক্ত সম্পত্তি আপন অধিকারে আনিতে যাহা করিবার আবশ্যক হয় তাহাই করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; এবং তাহার যখন উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজের জেম্মায় বা তাহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের জেম্মায় রাখিবার আদেশ আছে এবং তাহার জেম্মার জন্য সে দায়ী, তখন সে কাজে কাজেই কোন দরওয়াজার চাবী খুলিতে বা যে কোন সিন্দুকাদিতে সম্পত্তি থাকে তাহার চাবী খুলিতে পারিবেক, এবং সে উক্ত সম্পত্তি উচিত-মতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাতে তাহার নিজের চাবী দিতে পারিবে। জজই দেখাই-য়াছেন যে, আইন এরূপ না হইলে দায়ী তাহার সমুদায় সম্পত্তি একটি মাত্র চাবী দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিয়া অনায়াসে তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক দ্বারা ডিক্রীজারী বারণ রাখিতে পারিবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

১৩ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

হুগলির ছোট আদালতের জজের ১৮৭০ সালের ১১ ই এপ্রিলের এস্তমেজাজ।

সাহজাদা হালিমুজ্জমা, বাদী।

হুগলির মিউনিসিপেল কমিশনরগণের চেয়ার-ম্যান ও বাইস চেয়ার-ম্যান ও অপর এক ব্যক্তি প্রতিবাদী।

বাদীর উকীল নাই।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ প্রতিবাদীর উকীল।

চুম্বক।—যে মিউনিসিপেল কমিশনর বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইন অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনি মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে বিচার দ্বারা যে কোন বিধিমত কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধে তিনি ১৮৫০ সালের ১৮ আইন দ্বারা রক্ষিত; এবং যে পর্য্যন্ত তিনি উক্ত ক্ষমতা অতিক্রম না করিয়া সরলান্তঃকরণে কার্য্য করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে তৎ- সম্বন্ধীয় কোন ক্ষতিপূরণের দাবীতে ছোট আদালতে নালিশ চলিবে না।

এস্তমেজাজ।—বাদী বলে যে, সহর হুগলি ও চুঁচড়া প্রভৃতির মিউনিসিপেল কমিশনর-গণের চাকর প্রতিবাদী প্যারু বাদীর প্রতি বিদ্বেষ-ভাবে মিউনিসিপেল কমিশনরগণের নিকট এই এক মিথ্যা সংবাদ দেয় যে, বাদী চুঁচড়ার সহরের অন্তর্গত এক বক্র গলিতে এলাহী জান নামক এক ব্যক্তির বাটীর সম্মুখে এক সরকারী নর্দ্দামায় (যাহাতে তাহার কোন স্বত্ত্ব না থাকিবার কথা সে বলে) বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিয়াছে; তাহাতে বাদীর বিরুদ্ধে নালিশ হইয়া তাহার কোন আপত্তি না শুনিয়াই তাহাকে বিধি ও রীতির বিরুদ্ধে ৫০৲ টাকা জরিমানা করত তাহার নিকট হইতে তাহা আদায় করিয়া লওয়া হয়; এবং সে বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৩ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারা মতে উক্ত মিউনি-সিপেল কমিশনরগণের উপর এক নোটিস জারী করে, কিন্তু তাঁহারা তাহার কোন প্রতিবিধান করেন না। অতএব বাদী ক্ষতিপূরণের জন্য উক্ত টাকার দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে।

১ নং প্রতিবাদী অর্থাৎ মিউনিসিপেল কমিশনরগণের চেয়ার-ম্যান আপন উকীলের দ্বারা এই আপত্তি করেন যে, মিউনিসিপেল কমিশনরগণের চেয়ার-ম্যান বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৭৬ ধারামতে মাজি-ষ্ট্রেট স্বরূপে প্রমাণ গ্রহণ এবং স্থানীয় তদন্ত

করত যে জরিমানা করেন বাদী তাহা ফেরৎ পাওয়ার দাবীতে নালিশ করায় এই নালিশ চলিতে পারে না; এবং মিউনিসিপেলিটির চেয়ার-ম্যান এবং মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে ১ নং প্রতিবাদীর স্বাক্ষরিত উক্ত মোকদ্দমার রুবকারীর এক নকল দাখিল করা হইয়াছে।

অতএব এ মোকদ্দমায় বিচার্য্য এই যে, এই প্রকারের মোকদ্দমা চলিবে কি না।

আমার মতে বাদীর নালিশ চলিবে না। মিউনিসিপেল আইনের ৬৬ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, "যে ব্যক্তি কোন রাজপথের মধ্যস্থিত "বা তন্নিকটবর্ত্তী বাটীর বাসেন্দা হইয়া ২৪ ঘণ্টার "অধিক কোন ময়লা, গোবরাদি, হাড়, ছাই, বিষ্ঠা "বা অপরিষ্কৃত দ্রব্য, অথবা কোন ঘৃণাজনক "বা অনিষ্টকর পদার্থ উপযুক্ত পাত্রে না রাখিয়া "উক্ত বাটীর মধ্যে বা উপরে বা তাহার বাহি- "রের বাটীতে, উঠানে বা সেই বাটীর অন্তর্গত "বা সংলগ্ন কোন ভূমিতে রাখে বা রাখায়, "অথবা সেই পাত্র ময়লা বা ঘৃণিত অবস্থায় "রাখিতে দেয়, কিম্বা তাহা পরিষ্কার করিতে "উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করে, তবে তাহার "৫০ টাকার অনধিক জরিমানা হইতে পারিবে।" ঐ আইনের ৬ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, উক্ত আইন আনুসারে যে ব্যক্তি মিউনিসিপেল কমিশনর নিযুক্ত হন, তিনি উক্ত আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৩ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন। অতএব বাদী যে কার্য্য সম্বন্ধে অভিযোগ করে তাহা ১ নং প্রতিবাদী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় করেন এবং তাহা তাঁহার আইন অনুসারে করিবার অধিকার ছিল। দেওয়ানী নালিশে এরূপ কোন কার্য্যের প্রতি আপত্তি করিতে দিলে যে অভিপ্রায়ে মিউনিসিপেল আইন জারী হয় তাহা নিষ্ফল হইবে।

প্রধানতম বিচারালয়ের এক পূর্ণাধিবেশনে উজ্জ্বলমণি দাসী বনাম চন্দ্রকুমার নিয়োগীর যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় (৪র্থ বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ১৮ সংখ্যার ২৪ পৃষ্ঠা) তাহাতে সংস্থাপিত হয় যে, কোন মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২০ অধ্যায়ের ৩০৮ ধারামতে অপকারজনক বস্তু সম্বন্ধে যে হুকুম দেন, তাঁহার অন্যথার দাবীতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবে না। আমার বিবেচনায়, উক্ত নিষ্পত্তির যুক্তি উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয়।

মাজিষ্ট্রেটের রুবকারীর নকল এতৎসমভি- ব্যাহারে প্রেরণ করা গেল।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—যে উকীল প্রতিবাদিগণের পক্ষে উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহাকে কষ্ট দিবার আবশ্যক নাই।

মিউনিসিপেল কমিশনরগণের চেয়ার-ম্যান এবং বাইস্ চেয়ার-ম্যান এবং মিউনিসিপেল কমিশনরগণের চাকর সেখ পাঁচুর বিরুদ্ধে চুঁচড়াবাসী হালিমুজ্জমা এই মোকদ্দমা ছোট আদালতে উপস্থিত করে।

বাদী বলে যে, সে এলাহীজান নামক এক ব্যক্তির বাটীর সম্মুখে সরকারী নর্দ্দামায় বিষ্ঠা ফেলিয়াছে বলিয়া শেষোক্ত প্রতিবাদী মিথ্যা রিপোর্ট করায় বাদীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া বাদীকে আইন-বিরুদ্ধ এবং রীতি-বিরুদ্ধ রূপে ৫০ টাকা জরিমানা করা হয়; সে ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারামতে উক্ত কমিশনরগণের উপর নোটিস দেয়, কিন্তু তাঁহারা কোন প্রতিবিধান না করায় সে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত টাকার দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে।

এস্তমেজাজের লিপির সহিত অপরাধ সাব্যস্তের যে সহীমোহরের নকল প্রেরিত হইয়াছে, তদৃষ্টে প্রকাশ যে, হুগলির মাজিষ্ট্রেট যিনি মিউনিসিপেল কমিশনরগণের চেয়ার-ম্যানও ছিলেন এবং উক্ত বিষয়ে মিউনিসিপেল কমিশনর স্বরূপে কার্য্য করেন, তিনি বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৬৬ ধারান্তর্গত

অপরাধে বাদীকে জরিমানা করেন। উক্ত মিউনিসিপেল কমিশনরের রায়ে ব্যক্ত আছে যে, অভিযোগ হয়, উক্ত মিউনিসিপেল কমিশনর স্থানীয় তদন্ত করেন, এবং প্রমাণ লওয়া হয়; এবং এই বলিয়া আইনের চরম অর্থদণ্ড করা হয় যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছিল, সে সর্ব্বদাই মিউনিসিপেল আইন লঙ্ঘন করিত।

এই আইনের অভিপ্রায় সাধনার্থে মিউনিসিপেল কমিশনর ৬ ধারা দ্বারা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তিনি ঐ রূপ মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে বিধিমতে যে কোন কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে তিনি ব্যবস্থাপক সমাজের ১৮৫০ সালের ১৮ আইন দ্বারা রক্ষিত। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত মিউনিসিপেল কমিশনর স্বীয় বিচারাধিকারের মধ্যে এবং সরলান্তঃকরণে কার্য্য করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার হুকুমমতে যে জরিমানা হয়, ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহার দাবীতে ছোট আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন নালিশ হইবে না।

অতএব আমার বিবেচনায়, ছোট আদালতের জজের মত সম্পূর্ণ শুদ্ধ এবং এই নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

১৪ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৪৮৭ নং মোকদ্দমা।

সাহাবাদের প্রথম অধঃস্থ জজ আড়ার মুঙ্গেফের ১৮৬৮ সালের ১৫ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৯ ই মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

চুণিলাল সাহু (বাদী) আপেলাণ্ট।

মন্নুলাল প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং, জি, সি, পল বারিষ্টর এবং বাবু তুলসীদাস শীল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী এবং কালীকৃষ্ণ সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাদী এক সম্পত্তি ক্রয় করত তাহা পাওয়ার জন্য নালিশ করিয়া ঐ সম্পত্তির যে অংশ এক জন প্রতিবাদী পূর্ব্বে ক্রয় করে এবং তাহার বয়নামা তাহার নিকট থাকে, সেই অংশ সম্বন্ধে অকৃতকার্য্য হয়। বাদী তদনন্তর উক্ত বিক্রয় অন্যথা করিবার দাবীতে নালিশ করাতে, স্থির হইল যে, এ মোকদ্দমা পূর্ব্ব মোকদ্দমা হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং ইহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারা দ্বারা বারিত নহে।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমায় ১ নং প্রতিবাদী ১৮৫৮ সালের ৭ ই জুন তারিখে কোন সম্পত্তিতে কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতির অংশ ক্রয় করে। বাদী ১৮৬০ সালের ৫ ই মার্চ তারিখে কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ, রঘুনাথপ্রসাদ এবং আর কয়েক ব্যক্তির অংশ ক্রয় করে, অর্থাৎ ১ নং প্রতিবাদী যে যে অংশ ক্রয় করে তাহা এবং আরও কয়েক অংশ ক্রয় করে।

১ নং প্রতিবাদীর নিকট যে বিক্রয় হইয়াছিল তাহা ১৮৬১ সালের ২ রা মার্চ তারিখে অন্যথা হয়, কিন্তু জজের নিকট আপীলে, ১ নং প্রতিবাদী এবং কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহের মধ্যে আপোস হওয়ায় প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইতে দেওয়া হয়।

পরে, ১ নং প্রতিবাদীর নিকট ১৮৫৮ সালের ৭ ই জুন তারিখে যে বিক্রয় হয়, বাদী তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া, ১৮৬০ সালের ৫ ই মার্চ তারিখে সে নিজে যে সম্পত্তি ক্রয় করে, তৎসমুদায়ের দাবীতে এক নালিশ উপস্থিত করে।

কৃষ্ণপ্রসাদের অংশের অতিরিক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে বাদী কৃতকার্য্য হয়, কিন্তু অবশিষ্ট সম্বন্ধে অকৃতকার্য্য হয়, কারণ, আদালত বিবেচনা করেন যে, যত কাল ১ নং প্রতিবাদীর নিকট ১৮৫৮ সালের ৭ ই জুন তারিখের বিক্রয় রহিত না হইবে, তত কাল কৃষ্ণপ্রসাদের অংশ বাদী পাইতে পারিবে না।

বর্ত্তমান মোকদ্দমা বাস্তবিক এই সংস্থাপনার্থে উপস্থিত করিবার বিষয় আমাদের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ঐ বিক্রয় রহিত হইয়াছে, এবং উক্ত বিক্রয় হইতে অব্যাহতি পাওয়াই এই মোকদ্দমায় জয়ী হইবার ফল হইবে।

নিম্ন আপীল-আদালত এই হেতুবাদে এই মোকদ্দমার আপীল শ্রবণে অস্বীকার করেন যে, এই মাত্র যে মোকদ্দমার কথা বলা হইল তাহাতেই বাদীর নালিশের কারণ শ্রুত এবং মীমাংসিত হওয়ায় উপস্থিত দাবী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারামতে বারিত হইয়াছে।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল এই আদালতের দুইটি নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করেন; তাহার একটি * ৩য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ৪২১ পৃষ্ঠায় এবং অপরটি † ১০ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪২৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। আমাদের বোধ হয়, উপস্থিত মোকদ্দমা উক্ত উভয় নিষ্পত্তির সহিতই অনৈক্য। উক্ত উভয় মোকদ্দমাই যখন প্রথম উপস্থিত হয়, তখন বাদীর দাবী-কৃত সম্পত্তি পাওয়ার সম্পূর্ণ স্বত্ব ছিল। কেবল সেই স্বত্ব সাব্যস্ত করার প্রণালী সম্বন্ধেই এক মাত্র প্রভেদ ছিল। এ স্থলে যে নিষ্পত্তি বা হুকুম দ্বারা কৃষ্ণপ্রসাদের অংশ সম্বন্ধে বাদীর নালিশ ডিস্মিস্ হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে, যে পর্য্যন্ত ১ নং প্রতিবাদীর ১৮৫৮ সালের ৭ ই জুনের বয়নামা থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আর কেহই উক্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব পাইবে না। বাদী উক্ত বিক্রয় হইতে অব্যাহতি পাইবার নিমিত্তই এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। অতএব আমাদের বোধ হয় যে, বাদী পূর্ব্বে আপনার তৎকালের স্বত্ব অনুসারে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা হইতে এ মোকদ্দমা ভিন্ন। অতএব নিম্ন আপীল-আদালতের রায় অন্যথা হইল, এবং এই মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারার বিধানমতে বারিত না হওয়ায়, দোষগুণ দৃষ্টে ইহার বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য ইহা উক্ত আদালতে ফেরৎ পাঠান গেল। (ব)

* বাঃ লাঃ রিঃ ৫ ম ভাগ, দেঃ নিষ্পত্তি, ৩৫০ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

† বাঃ লাঃ রিঃ ৪ র্থ ভাগ, দেঃ নিষ্পত্তি, ৩ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

২০ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ্, বি, বেলি, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২০৪৬ নং মোকদ্দমা।

ত্রিপুরার প্রতিনিধি জজ কুমিল্লার সদর মুন্সেফের ১৮১৮ সালের ৩১ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৩ রা জুনে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

আস্কার ( প্রতিবাদী ) আপেলাণ্ট।

রামমাণিক্য রায় প্রভৃতি ( বাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু করুণাদাস বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—অধিক কাল দখলের দ্বারা ব্যবহারের স্বত্ব জন্মিতে পারে; কিন্তু সেই দখল স্বত্ব সম্মতির বলে না হইয়া স্বত্বের বলে অর্থাৎ অধিপতি স্বরূপে, বা পথ ঘাট ইত্যাদির স্বত্বের স্থলে যে ভূমির উপরে ঐ স্বত্বের দাবী হয়, তাহার মালিকের বিরুদ্ধভাবে হওয়া আবশ্যক।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—এক

হাটের অন্তর্গত ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমি সম্বন্ধে এই মোকদ্দমা উপস্থিত। বাদী এই জমির স্বীকৃত মালিক; প্রতিবাদী তাহাতে এক চালা নির্ম্মাণ করায় তাহা ভাঙ্গিয়া ঐ জমি দখলের দাবীতে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করে।

প্রতিবাদীর জওয়াব এই যে, তাহার পূর্ব্বাপর ব্যবহার দ্বারা উক্ত জমির উপর ঐ চালা রাখিবার এবং হাটের দিবসে পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থে তাহা ব্যবহার করিবার স্বত্ত্ব আছে।

মোকদ্দমা পুনঃ প্রেরণের পরে, নিম্ন আপীল-আদালত এক্ষণে স্থির করিয়াছেন যে, প্রতিবাদীর ঐ রূপ স্বত্ব জন্মে নাই, অতএব বাদীর অনুকূলে ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে।

খাস আপীলে আমাদের নিকট আপত্তি হইয়াছে যে, এই নিষ্পত্তি আইন সম্বন্ধে ভ্রমমূলক, কারণ, উভয় পক্ষেই স্বীকার করে যে, প্রতিবাদী এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষেরা বাদীকে খাজানা বা অন্য কোন প্রকারের শুল্ক না দিয়া উক্ত চালা প্রায় ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছে। আমাদের মতে এই আপত্তি প্রামাণ্য নহে। সত্য বটে, ব্যবহারের স্বত্ব অধিক কাল দখলের দ্বারা হইতে পারে; কিন্তু উক্ত স্বত্ব জন্মাইতে হইলে স্বত্বের বলে ঐ দখল হওয়া আবশ্যক। কোন ব্যক্তি তাহার বাটীতে তাহার বন্ধুকে যত বৎসর হউক থাকিতে দিতে পারে, কিন্তু উক্ত দখলের বন্ধুত্ব অর্থাৎ সম্মতি-জনিত ভাব বরাবরই তাহার ব্যবহারের স্বত্বের প্রতিবন্ধক হইবে।

এদেশে ব্যবহারজনিত স্বত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সমাজের কোন স্পষ্ট আইন নাই; কিন্তু এই সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যে স্থলে কোন জমি অধিপতি স্বরূপ দখল করা হয়, অথবা পথ ঘাট ইত্যাদির স্বত্ত্বের স্থলে, যে ভূমির উপরে ঐ স্বত্ত্বের দাবী হয়, তাহা তাহার মালিকের বিরুদ্ধে যে স্থলে ভোগ করা হয়, কেবল সেই স্থলেই ন্যূনাধিক কিয়ৎকাল নিরবচ্ছিন্ন দখলের দ্বারা ব্যবহারের স্বত্ব জন্মে। উপস্থিত মোকদ্দমার প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, বাদী ঐ জমির মালিক, কিন্তু তাহার জওয়াবে সে যে সকল উদ্দেশ্য দর্শাইয়াছে তাহারই নিমিত্ত সে বহুকাল ভোগ হেতু ব্যবহারের স্বত্ত্বের দাবী করে। কিন্তু সে যে সকল প্রমাণ দেয় তাহাতে কিছুতেই প্রকাশ পায় না যে, ঐ ভূমি বাদীর বিরুদ্ধে ভোগ করা হইয়াছে। সত্য বটে, তাহার সাক্ষিগণ বলিয়াছে যে, বাদীকে কোন প্রকার কর বা শুল্ক দেওয়া হয় নাই, কিন্তু তাহাদের সমুদায় সাক্ষ্য দ্বারা এই প্রকাশ পায় যে, উক্ত ব্যবহার বাস্তবিক সম্মতি-জনিত। প্রতিবাদী যে স্বত্ত্বের দাবী করে তাহা অসাধারণ, এবং এই প্রকার ঘটনায়, ঐ হাটে বা নিকটবর্ত্তী অথবা অন্যত্রের কোন হাটে কি প্রকারে ঐ রূপ স্বত্ব উপার্জ্জিত হয়, তাহা সে আমাদিগকে দেখায় নাই।

এরূপ অবস্থায় আমরা বলিতে পারি না যে, নিম্ন আপীল-আদালতের সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক; অতএব আমরা এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম। (ব)

---

২৩ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৮৪৬ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৯ই মার্চের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মোখা হরকরাজ যোশী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

বিশ্বেশ্বর দাস (বাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মণিলাল সান্যাল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন স্বীকৃত মোক্তার আপন মুনিবগণের পক্ষে, নিজ নামে বাদী স্বরূপে কোন নালিশ উপস্থিত করিতে, বা প্রতিবাদী স্বরূপে কোন নালিশের জওয়াব দিতে পারে না। যে কুঠী বর্ত্তমান নাই, সুতরাং তাহার কারবার চলিতেছে না, তাহার দেনা-পাওয়ানা পরিষ্কার না হইয়া থাকিলেও, সেই কুঠীর স্বীকৃত গোমাস্তা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১৭ ধারার ২ প্রকরণের মর্ম্মান্তর্গত স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—বাদী এই মোকদ্দমার নথীতে এদেশীয় কএক জন বণিকের গোমাস্তা বলিয়া পরিচয় দেয়। যে আদালতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার স্থানীয় সীমার বাহিরে তাহারা বাস করে, কিন্তু নালিশের আরজীতে লিখিত হইয়াছে যে, উক্ত সীমার মধ্যে তাহাদের এক কুঠী বা কারবার-স্থান আছে। প্রতিবাদী এই হেতুবাদে বাদীর এই নালিশ উপস্থিত করিবার ক্ষমতার প্রতি আপত্তি করে যে, বাদী যে কারবারের কথা বলে তাহা নালিশের আরজী দাখিলের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে বন্ধ হইয়াছে।

উভয় নিম্ন আদালতই স্থির করেন যে, এই আপত্তি এই হেতুবাদে প্রামাণ্য নহে যে, উক্ত কুঠী না থাকিলেও, বাদী ১৭ ধারার ২ প্রকরণ মতে এই মোকদ্দমা করিতে পারে, কারণ, উক্ত কুঠীর সমুদায় পাওয়ানা এখনও আদায় হয় নাই।

আমাদের মতে এই নিষ্পত্তি আইন সম্বন্ধে ভ্রম-মূলক। তর্কচ্ছলে যদিও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বাদী এখনও ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে স্বীকৃত গোমাস্তা স্বরূপে বিবেচিত হইতে পারে, তথাপি তাহার আপন নামে বাদী স্বরূপে এই মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা নাই। স্বীকৃত গোমাস্তার অবস্থা ১৬ ধারায় এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা:—"কোন দেওয়ানী আদালতে যে সকল "দরখাস্ত করিতে হয় তাহা দরখাস্তকারী আপনি "কিম্বা আপনার স্বীকৃত মোখ্‌তারের দ্বারা কিম্বা "আপনার তরফে কার্য্য করিতে উচিত মতে নিযুক্ত "উকীলের দ্বারা দাখিল করিবেক। ও কোন "দেওয়ানী আদালতে যে সকল পক্ষের হাজির "হইতে হয়, তাহারা নিজে হাজির হইবেক, "কিম্বা তাহাদের স্বীকৃত মোখ্‌তারের দ্বারা কিম্বা "তাহাদের তরফে কার্য্য করিতে উচিতমতে "নিযুক্ত উকীলের দ্বারা হাজির হইবেক। কিন্তু "যদি এই আইনে সেই বিষয়ের অন্য প্রকারের "স্পষ্ট বিধান থাকে তবে সেই বিধান বহাল "থাকিবে।"

অতএব এই ধারামতে স্বীকৃত গোমাস্তা কেবল দরখাস্ত দাখিল করিতে, অথবা তাহার মুনিবের পক্ষে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এই দুই ক্ষমতার কোন ক্ষমতা অনুসারেই সে বাদী স্বরূপে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে বা প্রতিবাদী স্বরূপে কোন মোকদ্দমার জওয়াব দিতে পারে না। রীতিমত নিয়োজিত উকীলগণকেও ঐ সকল ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কোন উকীলের নিজের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার নিজ নামে কোন মোকদ্দমা চালাইতে পারেন না।

আমাদের মতে, বাদী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১৭ ধারার ২ প্রকরণের মর্ম্মানুসারে স্বীকৃত মোক্তার স্বরূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে না। উক্ত ধারায় ব্যক্ত আছে যে, "আদালতের "এলাকার মধ্যে নাই এমত ব্যক্তিগণের পক্ষে "বা নামে যে সকল ব্যক্তি বাণিজ্য বা কারবার "করিতেছে, তাহারা কেবল সেই বাণিজ্য বা কার- "বার সম্বন্ধীয় বিষয়েই" ১৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় স্বীকৃত হইয়াছে যে, উক্ত কুঠী এক্ষণে নাই; অতএব যে কুঠী বর্ত্তমান নাই, বাদীকে কি প্রকারে এক্ষণে বিধিমতে সেই কুঠীর গোমাস্তা স্বরূপে জ্ঞান করা যাইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। উক্ত কুঠীয়াল-

দের এখনও দেনা দেওয়া বা পাওয়ানা আদায় করা বাকী আছে বলিয়াই, ঐ কুঠী এক্ষণে বর্ত্তমান না থাকার কথার কোন ব্যতিক্রম হয় না। উক্ত ধারায়, "বাণিজ্য বা কারবার করিতেছে" শব্দগুলি আছে। অতএব এমত বলা অসম্ভব যে, বাদী এখনও উক্ত বাণিজ্য বা কারবার করিতেছে, অথবা ইহাও বলা অসম্ভব যে অবর্ত্তমান কুঠীর গোমাস্তা স্বরূপে তাহার কার্য্য এখনও স্থগিত হয় নাই। পাওয়ানা বাকী থাকিলেও, বাদী এমত কোন প্রমাণ দেয় নাই যে, সে তাহা আদায় করিবার ক্ষমতা পাইয়াছে।

এ আপত্তি পারিভাষিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। এ মোকদ্দমার নথীতে এমন কি প্রমাণ আছে যে, বাদীর কথিত মুনিবেরা সেই নালিশের কারণে আবার প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশ করিবে না? এবং এই মোকদ্দমায় ঐ ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর অনুকূলে যদি কোন হুকুম হয় তাহাই বা প্রতিবাদী কি প্রকারে জারী করিবে? এ মোকদ্দমার বাদী কড়ার ভিকারী হইতে পারে, সুতরাং এই মোকদ্দমা চলিতে দিলে প্রতিবাদীর প্রতি নিশ্চয়ই অন্যায় হইবে।

তর্কিত হইয়াছে যে, বাদীর কথিত মুনিবদিগকে মোকদ্দমার পক্ষ করিতে দিয়া মোকদ্দমা সংশোধন করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এ প্রার্থনা এক্ষণে খাস আপীলে গ্রাহ্য হওয়া উচিত নহে। মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায়ই ঐ আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, সুতরাং বাদীর স্বেচ্ছামত সংশোধন করিবার যথেষ্ট সময় ছিল। এখন আর এই প্রার্থনা শুনা যাইতে পারে না, এবং তাহা শুনিলে যে সুবিধা হইতে পারে, বাদীর মুনিবগণের নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেও সেইরূপ সুবিধা হওয়ার সম্ভব।

উপরোক্ত হেতুবাদে আমরা নিম্ন আদালত দ্বয়ের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া বাদীর নিজের বিরুদ্ধে (তাহার কথিত মুনিবগণের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে নহে) সমুদায় খরচা সমেত এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

২০ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং জে, পি নর্ম্যান।

১৮৬৯ সালের ৩৯ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজের ১৮৬৮ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

টুণ্ডন সিংহ (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

পঙ্কনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং এড্‌বোকেট জেনরেল ও জে ডবলিউ বি মনি বারিষ্টর ও মৌলবী সৈয়দ মহম্মত হোসেন ও মুন্সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জি সি পল বারিষ্টর ও বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, মহেন্দ্রলাল সোম, গিরিজাশঙ্কর মজুমদার ও বুধ সেন সিংহ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাকী রাজস্বের প্রকৃত নীলামক্রেতার নালিশে বেনামী ক্রেতার জওয়াব দেওয়ার যে স্বত্ব ছিল তাহা ১৮৪৫ সালের ১ আইনের দ্বারা ১৮৪১ সালের ১২ আইন রদ হওয়াতেই রহিত হইয়াছে।

এজমালী হিন্দুপরিবারের কর্ত্তা তাঁহার আপন নামে, কিন্তু সেই এজমালী পরিবারের জন্য ১৮৪৫ সালের ১ আইনের অন্তর্গত বাকী রাজস্বের নীলামে যে ক্রয় করেন, তাহাতে ঐ আইনের ২১ ধারা খাটে না, এবং ঐ ধারায় বিরুদ্ধ যে বিধানই থাকুক, কেবল ঐ কর্ত্তার নাম বয়নামায় ক্রেতা বলিয়া লেখা থাকিলেও ঐ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি ঐ ক্রয়ের দ্বারা তাহাদের প্রাপ্ত স্বত্ব পরিচালনার্থে ঐ কর্ত্তার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে।

বিচারপতি নর্ম্যান।—পাটনার জজ মেং এনলীর নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে।

বাদিগণ কহে যে, তাহাদের পিতামহ ওমরাও সিংহের গরসহায়, রামসহায়, টুণ্ডন (প্রধান প্রতিবাদী) ভিকারী এবং তক্ষণ নামক পাঁচ পুত্র ছিল, এবং ঐ পিতামহের জীবদ্দশায়, এবং পরে বাদিগণের পিতাদিগের জীবদ্দশায়) ঐ পাঁচ ভ্রাতা এক যৌত পরিবারস্বরূপে একান্নে ছিল, এবং প্রতিবাদী টুণ্ডনের উপরে দরবারের কার্য্য তত্ত্বাবধারণের, দলীলাদি প্রস্তুত করার ও খাজানা দেওয়ার ভার ছিল, এবং বাদিগণ পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত ও ইজারার সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করিত; এবং সময়ে সময়ে এজমালী টাকা হইতে বহু সম্পত্তি ক্রীত হয়; এবং ১২৬৮ সালের ২৬ এ মাঘ তারিখে যখন প্রতিবাদী মাছসার এক বাটীতে বাস করিতে আরম্ভ করে সেই পর্য্যন্ত বাদিগণ এবং প্রতিবাদী বরাবর ঐ সকল সম্পত্তিতে এজমালীতে দখীলকার ছিল; প্রতিবাদী টুণ্ডন সিংহ ১৮৬১ সালের জুন মাসে মৌজা মহম্মদপুরে বাদিগণের দখল থাকার প্রতি আপত্তি করে, এবং প্রতিবাদী টুণ্ডন সিংহ, বাদী কাশী সিংহ, বাদী পঙ্কনারাণের পিতা গরসহায় সিংহ ও তক্ষণ সিংহের নিকট শান্তিরক্ষার মুচলকা লওয়া হয়।

বাদিগণ ৪১ খানা মহালের এবং তদ্ভিন্ন ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং অন্যান্য প্রকারের বাটীর দখলের এবং ৬ বৎসরের ১০৯৪১০ টাকা ওয়াশীলাৎ সমেত আরো ১১ খানা মহালের দখলের দাবী করে।

প্রতিবাদী টুণ্ডন সিংহ আপন জওয়াবে বলে যে, ওমরাও সিংহ তাহার চারি পুত্র গরসহায় সিংহ, যক্ষণ সিংহ, ভিকারী সিংহ ও টুণ্ডন সিংহ এবং রামসহায় সিংহের পুত্র কাশী সিংহ নামক এক পৌত্র দায়াধিকারী রাখিয়া ফসলী ১২৪৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমায় পরলোক গমন করে; তাহার শ্রাদ্ধের পরে এক বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং ১২৪৩ সালের ১৫ ই মাঘ তারিখে ঐ পরিবার, ঐ চারি পুত্র নিজে এবং কাশী সিংহ তাহার মাতা ও অভিভাবিকা মসম্মত নলাসু দ্বারা পৃথক্ হইয়া যায়; এবং তাহারা আপনাদের মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লয়; এবং প্রত্যেকে আপন আপন অংশ লয়, এবং স্বীয় স্বীয় খাজানা তহশীল করে; এবং প্রত্যেকে আপন আপন বাসস্থান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস করে; এই প্রকারে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্পর্ক ছিল না।

টুণ্ডন তদনন্তর বলে যে, ওমরাও সিংহের মৃত্যু এবং বিষয় কার্য্য বিভক্ত হওয়ার পরে, সে পাটনার মীর আবদুল্লা নামক এক প্রসিদ্ধ কুঠীওয়ালের নিকট কার্য্য করত কিছু সঙ্গতি করিয়া ১২৪৩ সালের এক নীলামে মৌজা বাজীদপুর ভাওয়াঁ ১৫৩ টাকাতে ক্রয় করে, (যাহার খাজানা বাদীর বাক্য মতে এক হাজার টাকার অধিক) এবং শুভাদৃষ্টক্রমে তাহার কার্য্যের দিন দিন উন্নতি হয়, এবং সে টাকা কর্জ্জ করিয়া বাদিগণের অথবা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের ধন না লইয়া নিজে বিরোধীয় এবং অন্যান্য সম্পত্তি সকল উপার্জ্জন করে।

জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ১২৪৩ সালের বিভাগ সপ্রমাণ হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহাই এই আপীলের প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রশ্ন।

বাদিগণের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে যে, উভয় পক্ষ ১২৬৮ সাল পর্য্যন্ত যৌত ছিল। সাক্ষিগণের মধ্যে অনেকে পরিবারের নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তি, এবং কেহ কেহ টুণ্ডন ও তাহার ভ্রাতৃগণের সহিত বিরোধীয় কোন কোন সম্পত্তির শরীক। পরিবারের ভদ্রাসন-বাটী সাএস্তাপুরে ছিল। টুণ্ডন যখন পাটনায় না থাকিতেন, তখন তিনি ঐ বাটী যাহা তাঁহার পিতার ছিল, তাহাতে বাস করিতেন, এবং ঐ রূপ ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত বাস করেন, এবং যদিও তিনি সেই বৎসর তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রীকে লইয়া মাছসার বাটীতে গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার জ্যেষ্ঠা স্ত্রী ঐ ভদ্রাসন

বাটীতেই বাস করেন, এবং পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরাও সেই বাটীর অন্য অন্য গৃহে বাস করে। বঙ্কুলাল ঐ যৌত পরিবারের দেওয়ান স্বরূপে যে হিসাব-পত্র রাখিয়াছিল, তাহা বাদিগণ দাখিল করিয়াছে। ঐ হিসাবে লেখা আছে যে, বিরোধীয় সম্পত্তি এজমালী সম্পত্তির একভাগ ছিল।

প্রতিবাদীর পিতার মৃত্যুর পরে দুই মাসের মধ্যে প্রতিবাদী এবং তাহার ভ্রাতারা যে ১২৪৫ সালে পৃথক্ হইয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ করার জন্য প্রতিবাদী সাক্ষী ডাকিয়াছে। কিন্তু জজ এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী অবিশ্বাস করেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, যে সময়ে পৃথক্ হওয়ার বিষয় কথিত হইয়াছে, তখন কোন বিবাদ অথবা পৃথক্ হওয়ার কোন কারণ ছিল না, এবং পক্ষগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি অর্থাৎ কাশী এবং তরুণ নাবালগ ছিল, এবং টুণ্ডন নিজে তৎকালে ২০ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক ছিল; এবং সাক্ষিগণের জবানবন্দীতে অনৈক্যতা আছে, এবং যে সকল সম্পত্তি পৃথক্ ছিল বলিয়া, এইক্ষণে কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েক সম্পত্তি সম্বন্ধে যে সকল কার্য্য হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তিনি দেখাইয়াছেন যে, পৃথক্ সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহা হইতে পারে না।

বাদিগণের কথা এই যে, সাএস্তাপুরের এজমালী ধনাগার হইতে পাটনায় টাকা প্রেরিত হইত, এবং সেই টাকা দিয়া টুণ্ডন ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে, এবং তাহারই উপস্বত্ব হইতে সমুদায় বিরোধীয় সম্পত্তি উপার্জ্জিত হয়। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, টুণ্ডন সিংহ এমন কথা বলে না যে, সে কোন কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া আপন পরিশ্রমের বেতন অথবা অন্য প্রকার উপার্জ্জনের দ্বারা ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিল। সে তাহার ধন হওয়ার বিষয় যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছে, তাহা অদ্ভুত। সে বলে যে, ১২৪৩ সালে সে ১৫৩ টাকায় বাজীদপুর ক্রয় করিয়াছিল।

তাহার সাক্ষী জীবন সিংহ বলে যে, "আমি "টুণ্ডন সিংহকে জানি। সে মীর আবদুল্লার "বাটীতে থাকিত। সে তথায় বিদ্যাশিক্ষা "করিত, এবং ঐ পরিবারের এক জন বন্ধু ছিল। "বরহুয়ার অকমন সিংহ বক্তিয়ারপুর হইতে "আমার নিকট আসিয়া বলে যে, সে মীর আব- "দুল্লার নিকট হইতে আন্দোলীর ইজারা লইতে "যাইতেছে। আমরা দুই জনেই আসিয়া দুলি- "ঘাটে মীর রোজা আলীর বাটীতে ছিলাম। "আমরা দুই জনেই মীর আবদুল্লার নিকট "গমন করি। আমি টুণ্ডন সিংহকে বলিলাম "তুমি কি অকমন সিংহের জন্য আন্দোলীর "পাট্টা লও? সে পাট্টা লয়, এবং অকমন "সিংহ তাহাকে পারিতোষিক স্বরূপ ১০০ কি "১২৫ টাকা দেয়। সেই সময়ে উরাণপুরের "গেন্দন সিংহ বথুয়ানার পাট্টা লয়, এবং সে "টুণ্ডন সিংহকে তাহার পরিশ্রমের জন্য ১৫০ "টাকা দেয়। আমি ঐ উভয় টাকাই দিতে "দেখিয়াছি। টুণ্ডন সিংহ বলে যে, বাজীদপুর "ক্রয় করার জন্য এই টাকা উত্তম সময়ে হস্ত "আসিয়াছে।"

বুধন সিংহ প্রায় ঠিক ঐ কথা বলিয়াছে।

যে ঘটনার কথা বলা হইয়াছে, তাহা ১২৪৩ সালের অর্থাৎ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বের কথা। টুণ্ডন সিংহ, যে তখন অতি অল্প বয়স্ক ছিল, এবং মীর আবদুল্লার বাটীতে বাস করিত, কিন্তু সে মীর আবদুল্লার মোক্তার বা গোমাস্তা অথবা অন্য কোন কর্ম্মচারী ছিল না, সে যে মীর আবদুল্লার পাট্টা-গৃহীতাগণের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ অধিক টাকা পাইয়াছিল, তাহা বড় সম্ভাবনীয় নহে; এবং সে যে এক দিবসে দুই ব্যক্তির নিকট দুই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের নিমিত্ত দুই থোকে এত টাকা পাইয়াছিল, তাহা আরো চমৎকার-জনক।

এই দুই জন সাক্ষী যাহারা প্রত্যেকে ঐ দুই বার টাকা দেওয়ার কালে উপস্থিত থাকার

কথা বলিয়াছে, তাহাদের সাক্ষ্য দৃষ্টেই ঐ কথা বিশ্বাস করার জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা হইয়াছে।

অকমন সিংহের সম্বন্ধে সাক্ষী বুধন সিংহ বলে যে, উহার এবং জীবন সিংহের সহিত তাহার সম্পর্ক আছে, এবং বক্তিয়ারপুর হইতে অকমন সিংহ তাহার নিকট আসিয়া বলে যে, সে আন্দোলীর পাট্টা লইতে যাইতেছে, এবং তাহারা একত্রে পাটনায় যায়। গেন্দন সিংহ যখন মীর আবদুল্লার নিকট পাট্টা পায়, এবং প্রতিবাদীকে ১০০ কি ১২৫ টাকা দেয়, তখন তাহারা কি জন্য তথায় উপস্থিত ছিল, তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই। অকমন সিংহের সহিত বুধন সিংহের কথিত সম্পর্ক ব্যতীত, টাকা-গৃহীতা টুণ্ডন কিম্বা টাকা-দাতা অকমন এবং গেন্দন অথবা কুঠিওয়াল মীর আবদুল্লার সহিত সাক্ষিগণের কোন সম্পর্ক নাই।

সাক্ষিগণ এবং অকমন ও গেন্দন সকলেই পাটনা হইতে দূরে বাস করিত। সাক্ষিগণের বাসস্থান গেন্দন সিংহের অথবা অকমন সিংহের বাসস্থানের নিকট ছিল না। ৩৩ বৎসর পরে সাক্ষ্য দিয়া তাহারা প্রায় অবিকল এক বাক্যেই সেই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছে।

জীবন সিংহের স্মরণ আছে যে, টুণ্ডন সিংহ টাকা পাইয়া বলিয়াছিল যে, বাজীদপুর ক্রয় করার জন্য উত্তম সময়েই টাকা হস্তে আসিয়াছে। কিন্তু ইহা নিতান্ত অসম্ভব যে, যে সকল ব্যক্তি মীর আবদুল্লার নিকটে লভ্যজনক পাট্টা লইতে আসিয়াছিল, তাহাদের নিকট টুণ্ডন সিংহ বলিবে যে, যে সম্পত্তির বৎসর ১০০০ টাকা আয়, তাহা সে ২৫০ টাকায় ক্রয় করিতে যাইতেছে।

কিন্তু ইহাই কথার শেষ নহে। জীবন বলে যে, শ্রাবণ মাসে এই কথোপকথন হয়। ১২৪৩ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ দিবস ২৬ এ আগষ্ট। কিন্তু নথীতে দেখা যাইতেছে যে, ৫ ই অক্‌টোবরের পূর্ব্বে বাজীদপুর বিক্রয় হয় নাই। এই সকল কার্য্য সপ্রমাণ করার জন্য টুণ্ডন সিংহ জজের অথবা অধঃস্থ জজের সমক্ষে নিজে জবানবন্দী দিতে সাধে নাই। ইহা অতি আশ্চর্য্যের কথা যে, বাজীদপুর অথবা অন্য যে সকল সম্পত্তি পৃথক্ বলিয়া কথিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় কোন হিসাব-পত্র টুণ্ডন সিংহ দাখিল করে নাই। সে এক প্রসিদ্ধ কুঠীওয়ালার ঘরে প্রতিপালিত হইয়াছে এবং বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছে, এবং সে সময়ে সময়ে যে নানাবিধ মূল্যবান সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে তাহার যে সে কোন হিসাব-পত্র রাখে নাই, ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

সাএস্তাপুরে পরিবারের সাধারণ ধনাগারে যে সকল খাজানা আদায় হয় এবং বঙ্কুলাল তাহার যে হিসাব-পত্র রাখিয়াছিল কেবল তাহাই দাখিল হইয়াছে। স্বীকৃত হইয়াছে যে, বিরোধীয় সকল সম্পত্তি সম্বন্ধেই এই হিসাবে জমা-খরচ আছে। তাহাতে টুণ্ডন সিংহের আপন হস্তাক্ষরে জমা খরচ লেখা আছে বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা থাকুক বা না-থাকুক, এই সকল খাতা যে পরিবারের হিসাব; ইহা সে নিজে সাক্ষ্য দিয়া শপথ পূর্ব্বক অস্বীকার করে নাই, অথবা বঙ্কুলাল যে, এখনও তাহার এক জন কর্ম্মচারী বলিয়া কথিত হইয়াছে, অথবা অন্ততঃ, সে এখনও জীবিত আছে এবং যাহাকে পাওয়া যাইতে পারে, তাহাকেও সাক্ষী স্বরূপ তলব করে নাই।

জজ অতি সাবধানে এই মোকদ্দমার বিচার করিয়াছেন। বাদীর কি প্রতিবাদীর কথা সত্য, তাহা পরীক্ষা করার জন্য তিনি সম্পত্তির কতিপয় বিশেষ অংশ সম্বন্ধে পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের কার্য্য সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত তদন্তের দ্বারা তাঁহার এই বিশ্বাসের আধিক্য হইয়াছে যে, প্রতিবাদীর কথিত ১২৪৩ সালে পৃথক্ হওয়ার

কথা যে বাদিগণ অস্বীকার করিয়াছে, সেই অস্বীকারই যাথার্থ।

কতিপয় ক্রয় যে পৃথক্ ভাবে হইয়াছিল ইহা দেখাইবার জন্য মেং মণি সেই সকল ক্রয়ের বিস্তারিত বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক জাফের চক, গরসহায় এবং প্রতিবাদী টুণ্ডন সিংহের নামে ক্রীত হয়। কিন্তু ঐ সম্পত্তি প্রথমে মুলধনী ওম্‌রাও সিংহের নিকট বন্ধক ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার চারি পুত্র ও পৌত্র কাশীর নামে যে এক নালিশ উপস্থিত হয়, তাহাতে ঐ বন্ধক অসিদ্ধ বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ভ্রাতারা আপীল করে। ঐ আপীল মুলতবী থাকার কালে, গরসহায় এবং টুণ্ডন, সেই মোকদ্দমার বাদীর অর্থাৎ রেস্পণ্ডেণ্টের স্বত্ব ক্রয় করে। কিন্তু তাহারা তাহাদের সহ-আপেলাণ্টের স্বত্ব ক্রয় করে নাই। অতএব ইহার দ্বারা অনুমান হইতে পারে যে, তাহারা যৌত পরিবারের জন্যই ক্রয় করিয়াছিল।

নরছোয়ারের ক্রয়ের বিষয় জজ কর্ত্তৃক বিচারিত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আমাদের আর কিছু বলিবার কথা নাই। মেং মণি আর যে সকল ক্রয়ের বিষয়ে তর্ক করিয়াছেন তন্মধ্যে এক ক্রয় যাহার সম্বন্ধে প্রমাণ কৃত্রিমরূপে প্রস্তুত হওয়া বোধ হইতেছে, তাহা ভিন্ন অন্য সকল ক্রয় সম্বন্ধেই ঐ প্রকার অনুমান হইতেছে।

কেবল দখলই টুণ্ডনের অনুকূলে প্রবল কথা। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় বটে যে, তাহাকে ১৮৬১ সাল হইতে ১৮৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে এই মোকদ্দমা উত্থাপিত হওয়া পর্য্যন্ত, বিরোধীয় সকল ভূমিতে বিনা আপত্তিতে দখল রাখিতে দেওয়া হইয়াছে। গরসহায়ের মৃত্যুর পূর্ব্বে এই নালিশ উপস্থিত হয় নাই, এবং নালিশ উপস্থিত হইলেও ভ্রাতৃগণের মধ্যে যে তক্ষণ মাত্র জীবিত আছে, সে ঐ নালিশে সহ-বাদী হয় নাই, কিন্তু সে তাহার পরে এক পৃথক্ নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। যদি প্রতিবাদীর কথা সত্য হয় যে, তাহারা ১৮৬১ সালে বেদখল হইয়াছিল, তবে ইহা আশ্চর্য্যের কথা যে, তাহারা তাহার পরে পরস্পর সদ্ভাবে ছিল এবং প্রতিবাদীর কথিত প্রকারে তাহারা এজমালীতে ১৮৬৪ সালে চক আল্‌রিকী ক্রয় করিয়াছিল। এমত হইতে পারে যে, সে তাহার অধিক পরিশ্রম এবং উপায়ের দ্বারা এবং সমুদায় সম্পত্তি তাহার স্বীয় নামে ক্রয় করিয়া এবং সরকারী খাজানা স্বীয় নামে দিয়া সম্পত্তির প্রজাদিগের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়াছিল যে, সেই এক মাত্র মালিক। এবং এই নালিশ উপস্থিত করিতে যে এত বিলম্ব হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় এই কারণে হইয়াছিল যে, ভ্রাতারা তাহাদের পরিবারস্থ যে ব্যক্তির সুবুদ্ধি ও চতুরতা দ্বারা তাহাদের বর্ত্তমান সম্পদ হওয়া বিবেচনা করিয়াছিল তাহার নামে তাহারা নালিশ করিতে অনিচ্ছুক ছিল।

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, পরিজনেরা এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বেদখলে সম্মত থাকার গতিকে প্রতিবাদীর অনুকূলে অনুমানের উদ্ভব হয়। কিন্তু যখন ইহা বিবেচনা করা যায় যে, এদেশস্থ পরিবারের মধ্যে এক জন কর্ত্তার হস্তে সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব ভারার্পণ করার প্রথা আছে, তখন জজ যে প্রমাণের উপরে তাঁহার নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ঐ প্রকার অনুমান প্রবল হইতে পারে না।

বাকী রাজস্বের নীলামে টুণ্ডন সিংহ তাহার স্বনামে যে সম্পত্তি ক্রয় করে, তৎসম্বন্ধে এড্‌বোকেট জেনরেল যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন তাহাই বিচারের বাকী আছে।

১৮৪১ সালের ১২ আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে ১৮২২ সালের ১১ কানুনান্তর্গত বাকী রাজস্বের নীলামে ১৮৪১ সালে মাহুসার ॥০ আনা রকম ১ নং ক্রীত হয়। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ কানুনের এমন কোন বিধান নাই যদ্দ্বারা এই মোকদ্দমায় বাদীর স্বত্বের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে

পারে। ঐ কানুনের ১৯ ও ২০ ধারামতে, বেনামী ক্রয় হইলে নীলাম বাতিল ও অন্যথা করিয়া ক্রেতাকে বেদখল করিতে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা ছিল।

১৮৪১ সালের ১২ আইনের ২১ ধারায়, ঐ আইন প্রচলিত হওয়ার পরে যে সকল ক্রয় হইবে তৎসম্বন্ধে লেখা আছে যে, "সার্টিফিকেট- "প্রাপ্ত ক্রেতাকে উচ্ছেদ করার জন্য কোন "মোকদ্দমা যদি এই হেতুবাদে উপস্থিত হয় যে, "সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ক্রেতা ভিন্ন অন্য ব্যক্তির "পক্ষে ক্রয় হইয়াছিল, তবে পরস্পর বন্দো- "বস্তের দ্বারা সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ক্রেতার নাম "ব্যবহৃত হইয়া থাকিলেও, ঐ রূপ নালিশ খরচা "সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।" ১৮৪১ সালের ১২ আইন ১৮৪৫ সালের ১ আইনের দ্বারা রদ হয়, এবং আমরা বিবেচনা করি যে, ১১ শ বালম উইক্‌লি রিপোর্টারের ৩৮২ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের দ্বারা অতি ন্যায্য রূপেই নিষ্পত্তি হইয়াছে যে, প্রকৃত নীলাম- ক্রেতার নালিশে বেনামী ক্রেতার জওয়াব দেওয়ার যে স্বত্ত্ব ছিল তাহা ঐ রদের দ্বারা উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে।

১৮৪৫ সালের ১ আইন প্রচলিত হওয়ার পরে সরকারী রাজস্ব বাকীর নীলামে প্রতিবাদী টুণ্ডন সিংহ মহেশপুরের যে।৶ রকম ক্রয় করে তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন অতঃপর বিচার্য্য।

এজমালী হিন্দু-পরিবারের কর্ত্তার ঐ পরিবারের জন্য নিজ নামে, রাজস্ব বাকীর নীলাম ক্রয় করা সম্বন্ধে ১৮৪৫ সালের ১ আইনের ২১ ধারায় কোন স্পষ্ট বিধান নাই, এবং ঐ বিষয় কেবল জোর করিয়া ঐ ধারার মর্ম্মান্তর্গত করা যাইতে পারে। ঐ ধারা দণ্ড-সূচক, অতএব তাহার অবিকল অর্থ করিতে হইবে।

আমি বিবেচনা করি যে, বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অবশ্য এই নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, টুণ্ডন সিংহ হিন্দু এজমালী পরিবারের কর্ত্তা স্বরূপে তাহার নিজের ও পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তির জন্য এই ক্রয় করিয়াছিল। টুণ্ডন সিংহ নিজের জন্য ক্রয় না করিয়া অন্যের জন্য বেনামী ক্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত হয় নাই। অন্য ব্যক্তির তাহাতে স্বার্থ থাকিলেও, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, টুণ্ডন সিংহ তাহার নিজের পক্ষেই তাহা ক্রয় করিয়াছিল। তাহাকে উচ্ছেদ করার জন্য এই নালিশ হয় নাই, কিন্তু তাহার সহিত শরীকগণের এজমালী দখলের স্বত্ত্ব সাব্য- স্তের জন্য হইয়াছে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৬ ধারার মর্ম্মের সহিত ১৮৪৫ সালের ১ আই- নের ২১ ধারার মর্ম্মের প্রভেদ আছে। প্রথ- মোক্ত আইনে যে সমস্ত বাক্য আছে তাহাতে বোধ হয় এজমালী পরিবারের কর্ত্তা আপন নামে ক্রয় করার বিষয় ভুক্ত থাকিতে পারে।

সমুদায় দৃষ্টে আমাদের রায় এই যে, হিন্দু এজমালী পরিবারের কর্ত্তা তাঁহার আপন নামে, কিন্তু সেই এজমালী পরিবারের জন্য ১৮৪৫ সালের, ১ আইনের অন্তর্গত বাকী রাজস্বের নীলামে যে ক্রয় করেন, তাহাতে ঐ আইনের ২১ ধারা খাটে না, এবং ঐ ধারায় যে বিধানই থাকুক, কেবল ঐ কর্ত্তার নাম বয়নামায় ক্রেতা বলিয়া লেখা থাকিলেও, ঐ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি ঐ ক্রয়ের অন্তর্গত তাহাদের স্বত্ত্ব পরিচা- লনার্থে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে।

ফল এই যে, আমার বিবেচনায়, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি বেলি।—সম্মত। (গ)

---

২০ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২০২১ নং মোকদ্দমা।

পাটনার সদর মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য

জজ ১৮৬৯ সালের ১৪ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সৈয়দ জাফর হোসেন ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) আপেলাণ্ট।

সেখ মহম্মদ আমীর প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর ই টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

মুন্সী মহম্মদ ইউছফ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—আপেলাণ্ট আপীল দাখিল সম্বন্ধে তঞ্চকতা করিয়া থাকুক বা না থাকুক, আপীল দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৪১ ধারামতে রেজিষ্টরী হইলে পরেও জজের তাহা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আছে, কারণ, আপীল উচিত সময়ের মধ্যে দাখিল হইয়াছে কি না, এবিষয় ঐ রেজিষ্টরীর কার্য্য দ্বারাই পক্ষগণ সম্বন্ধে চূড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন হয় না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—যে সমস্ত বৃত্তান্ত হইতে ঐ খাস আপীলের উদ্ভব হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এই, যথা—

পাটনার অধঃস্থ এক আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে খাস আপেলাণ্ট তত্রত্য জজের নিকট জাবেতা আপীল করে; আপীল নিয়মিত রূপে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৪১ ধারামতে রেজিষ্টরী হয়, এবং রেস্পণ্ডেণ্টকে তাহার ডিক্রীর পোষকতা করিতে তলব হয়। বিচারের দিবসে জজকে দেখান হয় যে, নিম্ন আদালতের রায়ের নকল পাওয়ার জন্য যে তারিখে ষ্টাম্প কাগজ দাখিল হয় তদ্বিষয়ে তঞ্চকতা হইয়াছে, এবং যদি প্রকৃত তারিখ লওয়া যায়, তবে সময়াতীত হওয়ার পরে আপীল দাখিল হইয়াছে। জজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাহাই সত্য; অতএব তিনি খরচা সমেত আপীল ডিস্মিস্ করিয়াছেন।

খাস আপেলাণ্ট তর্ক করে যে, আপীল ৩৪১ ধারামতে একবার রেজিষ্টরী হইলে জজের তাহা ডিস্মিস্ করার ক্ষমতা নাই, এবং সে আরও তর্ক করে যে, ষ্টাম্প দাখিলের তারিখ সম্বন্ধে জজের নির্দেশ বিশুদ্ধ হইলেও, আপীল উচিত সময় মধ্যেই হইয়াছে, কারণ, জজের ইয়াদদস্তে তাহা দাখিলের যে তারিখ দেখা যাইতেছে, তাহার বাস্তবিক অনেক পূর্ব্বে তাহা দাখিল হইয়াছিল।

আমরা বিবেচনা করি যে, এই দুই আপত্তিই অকর্ম্মণ্য।

প্রথমতঃ, এই প্রকার ঘটনায় খাস আপীল চলিতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহা সত্য বটে যে, জজ লিখিয়াছেন যে, "আমি আপীল ডিস্মিস্ করিলাম," কিন্তু তাঁহার হুকুমের আসল মর্ম্ম এই যে, অনুচিত রূপে অর্থাৎ আইনের লিখিত সময় অতীত হওয়ার পরে আপীল দাখিল হওয়াতে তাহা নথী-খারিজ হইল। দোষগুণ সম্বন্ধে আপীল বিচারিত হয় নাই; অতএব নিম্ন আপীল-আদালত আইন-সম্বন্ধে এমন ভ্রম করেন নাই যদ্দৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, "মোকদ্দমার দোষগুণের নিষ্পত্তিতে ভ্রম হইয়াছে।"

কিন্তু ইহাকে আমরা খাস আপীলই বলি বা মোসনই বলি, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, খাস আপেলাণ্ট যে প্রতিকার চাহে তাহা সে পাইতে পারে না।

আমাদের সমক্ষে এই মোকদ্দমার বৃত্তান্তের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা দেখিবার জন্য আমরা প্রথমে দ্বিতীয় আপত্তির মীমাংসা করিব।

এই আপত্তি সম্বন্ধে আমরা দেখিতেছি যে, খাস আপেলাণ্ট তৎপোষক কোন প্রমাণ দাখিল করে নাই। বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কোন হলফান এজাহার উপস্থিত নাই, কেবল উকীল এই বিষয়ের তদন্ত করার জন্য আমাদের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত নিম্ন আদালতে উত্থিত হয় নাই, কারণ, জজের সমক্ষে কেবল ষ্টাম্প কাগজ দাখিল করার তারিখ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হয়। আপীলের দরখাস্তের পৃষ্ঠের ইয়াদদস্ত তাহা দাখিলের তারিখ সম্বন্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ হউক,

বা না হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপস্থিত নথীতে তাহা খণ্ডন করার কোন প্রমাণ নাই। ৩৪১ ধারার দৃঢ় অনুজ্ঞা এই যে, প্রত্যেক আপীল দাখিলের তারিখ আপীলের দরখাস্তের পৃষ্ঠে লিখিত হইবে, এবং সেই ধারার বিধান মতেই তাহা লেখা হইয়াছে। এই লেখা বিশুদ্ধ না হওয়ার যে কোন সঙ্গত হেতু আছে, তাহাও খাস আপেলাণ্ট দেখাইতে চেষ্টা করে নাই, অতএব আপীল যে, বাস্তবিক নিয়মিত সময় গতে দাখিল হইয়াছিল তাহা ভিন্ন অন্য কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না।

খাস আপীলের প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমরা দেখিতেছি যে, ইহা দুই পৃথক্ পৃথক্ প্রশ্নে বিভক্ত হয়; প্রথমতঃ, আপেলাণ্ট কোন প্রতারণা করে নাই অনুমান করিলে, আপীল ৩৪১ ধারা মতে একবার রেজিষ্টরী হইলে জজের তাহা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা আছে কি না; এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যদি জজের সেই ক্ষমতা থাকে, তবে আপেলাণ্ট বাস্তবিক ঐ প্রকার প্রবঞ্চকতা করিয়া তারিখ পরিবর্ত্তন করার অপরাধ করিয়াছে কি না?

আমাদের বিবেচনায়, এই উভয় প্রশ্নেরই 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দেওয়া উচিত।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আপীল ৩৪১ ধারামতে রেজিষ্টরী করা আমলার কার্য্য মাত্র। ইহা সত্য বটে যে, আপীলের রেজিষ্টরীতে তাহা রেজিষ্টরী করার পূর্ব্বে তাহা উচিত সময়ের মধ্যে দাখিল হইল কি না, তদ্বিষয়ে ঐ ধারা মতে তদন্ত করিতে হয়, কিন্তু হয় আপীল-আদালতের জজের দ্বারা, নচেৎ সেই আদালতের কোন কর্ম্মচারী যাহার প্রতি কেবল আমলাগিরির কার্য্য-ভার আছে তাহার দ্বারা ঐ তদন্ত হইতে পারে। ঐ ধারার শব্দগুলি এই, যথা, "আপীলের খোলাসা যদি নির্দ্দিষ্ট "দাঁড়া মতে ও নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল "করা যায়, তবে আপীল-আদালত কিম্বা ঐ "আদালতের উপযুক্ত আমলা ঐ খোলাসা দাখিল "করিবার তারিখ তাহার পিঠে লিখিবেন, ও "আপীলের রেজিষ্টর বলিয়া যে একখানা বহী "থাকিবেক তাহাতে ঐ আপীল রেজিষ্টর "করিবেন।"

তবে আমরা কি জন্য এমন অনুমান করিয়া লইব যে, আপীল উচিত সময়ের মধ্যে দাখিল হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে, উক্ত রেজিষ্টরী করাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। অপিচ, সর্ব্বপ্রসিদ্ধ যে নিয়ম আছে যে, কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে যে কোন হুকুম হউক, সে ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করিয়া অনুপস্থিত না থাকিয়া থাকে, তবে সেই হুকুমের দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, এই নিয়মের সহিত ঐ সিদ্ধান্ত কি প্রকারে ঐক্য করা যাইতে পারে? আইনের অনুজ্ঞা এই যে, আপীল সমস্ত এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, এবং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যে, এই অনুজ্ঞা আপীল-আদালতের, অথবা ৩৪১ ধারামতে যে কর্ম্মচারীর উপরে আপীল রেজিষ্টরী করার ভার থাকে তাহার সুবিধার জন্য প্রচারিত হয় নাই; অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিবার কষ্ট ও চিন্তা হইতে রেস্পণ্ডেণ্টের রক্ষিত হওয়ার ন্যায্য স্বত্ব থাকায় তাহারই সুবিধার জন্য তাহা প্রচারিত হইয়াছে। অতএব তাহার অসাক্ষাতে আদালতের কর্ম্মচারী ভ্রমবশতঃ বা অন্য প্রকারে যে কোন কার্য্য করে তদ্দ্বারা রেস্পণ্ডেণ্ট কেন ঐ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে? মনে কর, নিম্ন আদালতের এক রায়ের তারিখের ১২ বৎসর পরে আপীল দাখিল হয়, এবং মনে কর, উপযুক্ত কর্ম্মচারী ভুল অথবা যোগ-সাজসক্রমে তাহা রেজিষ্টরী করে, তবে কি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এমন মোকদ্দমায়ও রেস্পণ্ডেণ্ট আসিয়া বলিতে পারিবে না যে, আপীল রেজিষ্টরী করা কখন উচিত ছিল না? ইহা এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু ৩৪১ ধারানুযায়ী

রেজিষ্টরী করার প্রকৃত ফল কি, তাহা ইহার দ্বারা প্রদর্শিত হইতেছে।

কিন্তু আমরা এই হেতুর উপরে আমাদের নিষ্পত্তি স্থাপন করিব না, কারণ, এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশনের নিষ্পন্ন এক মোকদ্দমা আছে যাহা আমাদের এই রায়ের কতক বিরুদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে। উপরি উক্ত বৃত্তান্ত অনুসারে, তঞ্চকতা সম্বন্ধে জজ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎপ্রতি আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, এবং যদি আমরা একবার তাহা অবলম্বন করি, তবে এই আপীল অবশ্যই বিফল হইবে। সকল আদালতেরই আপন আপন রেজিষ্টরী পবিত্র রাখার স্বাভাবিক স্বত্ব আছে। এমন ক্ষমতা না থাকিলে, তাঁহাদের কার্য্য সকল অকর্ম্মণ্য হইত এবং প্রতারক ব্যক্তিরা যাহা ইচ্ছা তাহা দ্বারাই তাঁহাদের রেজিষ্টরী পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারিত। ৬ষ্ঠ বালম মূরের ২০৭ পৃষ্ঠার শিবনারায়ণ ঘোষ বনাম হলধর দাসের মোকদ্দমার বিধি আমার বিবেচনায়, এই বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত। সেই মোকদ্দমায় এক একতরফা দরখাস্তের উপরে আপেলাণ্ট প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করার জন্য বিশেষ অনুমতি পায়। রেস্পণ্ডেণ্ট তাহার পরে উপস্থিত হইয়া এই হেতুবাদে ঐ আপীল ডিস্‌মিস্ করার জন্য প্রিবি কৌন্সিলে এক পাল্টা দরখাস্ত করে যে আপেলাণ্টের দরখাস্তের লিখিত বৃত্তান্ত সমস্ত মিথ্যা। লর্ডগণ নির্দ্দেশ করেন যে, রেস্পণ্ডেণ্টের অবশ্যই এই প্রকার পাল্টা দরখাস্ত করার স্বত্ব আছে, এবং তাঁহারা আপীলের দোষগুণের বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ আপীল ডিস্‌মিস্ করেন। ইহা সত্য বটে যে, সেই মোকদ্দমায় সময়ের প্রশ্ন উত্থিত হয় নাই, কিন্তু যুক্তি এক। আদালতের অতি প্রধান কার্য্যও তঞ্চকতার দ্বারা বিনষ্ট হয়, এবং যে সকল হুকুম প্রতারণার দ্বারা নির্গত হয়, তাহার প্রতারণা প্রকাশ পাওয়া মাত্রেই তাহা অকর্ম্মণ্য ও বৃথা হইয়া যায়। এই বিষয়ে প্রিবি কৌন্সিলের ও এ প্রদেশস্থ সাধারণ বিচারালয়ের ক্ষমতার কোন প্রভেদ নাই। উল্লিখিত মোকদ্দমায় ঐ লর্ডগণের হুকুম যদি ন্যায্য ও উচিত হইয়া থাকে, তবে উপস্থিত মোকদ্দমায় নিম্ন আপীল-আদালতের হুকুমও তুল্য রূপে ন্যায্য এবং উচিত হইয়াছে। আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে যে প্রতারণার অভিযোগ হইয়াছে, সে যে তদ্বিষয়ে দোষী, তাহার কোন সন্দেহ নাই, এবং আমরা বিবেচনা করি যে, আপীল দাখিল করার তারিখ সম্বন্ধে তাহার জওয়াব কেবল সেই বিষয়ে জজের নির্দ্দেশ এড়াইবার ছল মাত্র।

আমরা খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। (গ)

২০ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান ও জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

অযোধ্যার ফাইনেন্‌সিয়াল কমিসনরের এস্তমেজাজ (১৮৭০ সালের ৯ ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ১০১৮ নং চিঠী) —

বাদি-প্রতিবাদীর নাম নাই।

চুম্বক।—কোন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট যে সকল চুক্তি-পত্র লেখাইয়া লন, তাহাতে ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ২ য় তফসীলের ১১ দফা মতে ॥০ আনা মূল্যের ষ্টাম্প লাগিবে।

চুক্তিকারকের দ্বারা চুক্তির কার্য্য নির্ব্বাহিত হওয়ার জন্য তাহার জামিনদারেরা যে খত দেয়, তাহাতে ঐ আইনের ১ ম তফসীলের ৫ ম দফা অনুযায়ী ষ্টাম্প লাগিবে।

এস্তমেজাজ।—পব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট তাঁহাদের কণ্ট্রাক্টর অর্থাৎ যাহারা তাঁহাদের নিকট কার্য্যের চুক্তি করে, তাহারা যে কণ্ট্রাক্ট দেয় তাহার সহিত আনুষঙ্গিক জামিনী খত লইয়া থাকেন। যখন ১৮৬২ সালের ১০

আইন প্রচলিত ছিল, তখন ঐ সকল দলীলে কোন্ দফার অন্তর্গত ষ্টাম্প হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। ঐ আইনের (এ) চিহ্নিত তফসীলের ১৮ দফায়, কোন কার্য্য করার একরারের ন্যায় ঐ সকল দলীলের বিধান ছিল, এবং সর্ত্ত অনুযায়ী টাকা দেওয়ার তমঃসুকের ন্যায় জামিনী খতে (এ) চিহ্নিত তফসীলের ১২ দফার লিখিত ষ্টাম্পের বিধান ছিল।

(২) চুক্তি সম্বন্ধে ষ্টাম্প-বিষয়ক ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের বিধান সমস্ত তত পরিষ্কার নহে, এবং দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান আইনানুসারে উক্ত দলীল সমস্তের ষ্টাম্প ১৮৬২ সালের ১০ আইন-লিখিত ষ্টাম্প অপেক্ষা অনেক ন্যূন হইয়াছে।

(৩) ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, পব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট আনুষঙ্গিক জামিনীর যে খত লইয়া থাকেন, তাহাতে সকল স্থলেই এক রূপে ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ২ য় তফসীলের ২০ দফা-বর্ণিত ২ টাকার ষ্টাম্প লাগিবে।

(৪) কিন্তু মূল কণ্ট্রাক্ট সম্বন্ধে কাঠিন্য বোধ হইতেছে, এবং প্রশ্ন এই যে, ১ ম তফসীলের ১২ দফার লিখিত মতে কোন কর্ম্ম করার খতের ন্যায় (পুরাতন আইনের লিখিত কার্য্য করার জন্য নহে) ঐ সকল খতের ষ্টাম্প লাগিবে, কি যে সকল একরারের জন্য কোন বিধান হয় নাই, তাহার ন্যায় দ্বিতীয় তফসীলের ৪ দফা-লিখিত ষ্টাম্প লাগিবে।

যেহেতু সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্টের বরাবর অনেক চুক্তির দলীল লেখাইয়া লওয়া হয়, এবং সর্ব্বদা তদ্বিষয়ে আদালতে বিচারও হয়, অতএব তাহার ষ্টাম্পের মূল্য এমন আবশ্যকীয় কথা যে, তদ্বিষয়ে আইনের তুল্য বাধ্যকর নিষ্পত্তির জন্য আমি ন্যায্য রূপেই প্রার্থনা করিতে পারি।

## হাইকোর্টের রায়ঃ—

বিচারপতি নর্ম্যান।—আমার বোধ হয়, আবাধ্যার ফাইনেন্সিয়াল কমিসনরের ১০১৮ নং পত্রের ৪ র্থ দফার লিখিত কার্য্য সমস্তের জন্য যে সকল কণ্ট্রাক্ট লওয়া হয়, তাহা ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ২ য় তফসীলের ১১ দফার অন্তর্গত, এবং তাহা ॥০ মূল্যের ষ্টাম্প কাগজে লিখিতে হইবে।

ঐ পত্রের ৩ য় দফার লিখিত খত সমস্ত ২ য় তফসীলের ২০ দফার অন্তর্গত নহে।

ঐ দফা কেবল এমত সকল স্থলে খাটে, যাহার কার্য্য সম্পাদন করার নিমিত্ত পূর্ব্বেই কোন দলীল প্রদত্ত হইয়াছে। যদি কণ্ট্রাক্টদারের নিকট কোন খত লওয়া হয়, এবং তাহার পোষকতায় কোন জামিনদারের নিকট জামিনী খত লওয়া যায়, তবে ঐ ধারা খাটিবে। এই প্রকার স্থলে মূল খতে উল্লিখিত টাকার পরিমাণানুযায়ী ষ্টাম্প লাগিবে, এবং জামিনদারদিগের খতে ২ টাকার ষ্টাম্প দিতে হইবে। কোন কার্য্য করার কেবল এক একরারের দ্বারা সেই কার্য্য করার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইতে পারে না।

আমার বোধ হয় যে, ফাইনেনসিয়াল কমিসনর যে ঘটনার কথা লিখিয়াছেন, তাহাতে যদি কণ্ট্রাক্টর শুদ্ধ একটি একরার দেয়, এবং সেই একরার অনুযায়ী কার্য্য করার জন্য তাহার জামিনদারেরা খত লিখিয়া দেয়, তবে ঐ সকল খতে ১ ম তফসীলের ৫ দফার লিখিত ষ্টাম্প লাগিবে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমারও ঐ মত। কিন্তু যেহেতু ঐ চুক্তি কি আকারে হয়, তাহার প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরিত হয় নাই, অতএব তাহা কোন্ বিধানের অন্তর্গত হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই সকল ঘটনায়, চুক্তিকারক সর্ব্বদাই তাহার মূল দলীলের দ্বারা, চুক্তির সর্ত্ত পালিত না হইলে কোন দণ্ড দিতে স্বীকার করিয়া আপনাকে আপনি বাধ্য করে, এবং তাহা হইলে ঐ চুক্তি-পত্রে, তমঃ-

স্টকের ন্যায় অথবা যে প্রমিসরি নোটের টাকা দাবী করা মাত্রেই দেয় হয় না, তাহার ন্যায়, টাকার পরিমাণে ষ্টাম্প দিতে হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমারও ঐ মত। (গ)

---

২০ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন ও এফ এ গ্লবর।

২৪-পরগণার ২ য় অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৫ ই আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

প্রসন্নচন্দ্র রায় চৌধুরী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

জ্ঞানচন্দ্র বসু ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পেণ্ডণ্ট।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও আশুতোষ ধর রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।— ক উইলের দ্বারা তাহার সমুদায় সম্পত্তি তাহার ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিয়া এই সর্ত্তে তাহার এক কন্যাকে ৪০০০ টাকা দেয় যে, ঐ কন্যার পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা পরিবারের ধনাগারে আমানত থাকিবে, এবং সে তাহার সুদ পাইবে, কিন্তু তাহার পুত্রসন্তান হওয়ার পরেই সে ঐ টাকা এবং ২০০ বিঘা ভূমি পাইবে। কয়ের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই ঐ কন্যার পুত্র জন্মে, কিন্তু তাহার মাতা ঐ ৪০০০ টাকা অথবা ভূমি না লইয়া পরলোক গমন করে, এবং কয়ের পরিবারের সম্পত্তির কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ পুত্রকে তাহার প্রাপ্য টাকা ও ভূমি দিতে অস্বীকার করা হেতু সে নালিশ করাতে স্থির হইল যে,—

ইহা উইলক্রমে-দত্ত সম্পত্তি পাওয়ার জন্য নালিশ; এবং টাকার দাবী সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১১ প্রকরণ খাটে এবং ঐ পুত্র ভুমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই তাহার মাতা ঐ ৪০০০ টাকা ও ভূমি পাইতে স্বত্ববতী হইয়াছিলেন, অতএব বাদীর নালিশের হেতু তৎকালেই উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং এই নালিশ উচিত কাল মধ্যে না হওয়ায় বারিত হইয়াছে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—মৃত রায় কালীনাথ চৌধুরীর দুই কন্যার মধ্যে ভুবনমোহিনী নাম্নী এক কন্যার পুত্রদ্বয় জ্ঞানচন্দ্র বসু এবং মোহিতচন্দ্র বসু এই নালিশ উপস্থিত করে। তাহারা মৃত রায় মথুরানাথ চৌধুরীর নাবালগ দত্তক পুত্রের অভিভাবক প্রসন্নচন্দ্র রায় চৌধুরীর বিরুদ্ধে রায় কালীনাথ চৌধুরীর উইল অনুসারে ৪০০০ টাকা ও ২০০ বিঘা ভূমি ও মাসিক ৫০ টাকা করিয়া খোরাকী তাহাদের প্রাপ্য বলিয়া তাহা পাওয়ার জন্য নালিশ করিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, রায় কালীনাথ চৌধুরী তাঁহার ১২৪৭ সালের ৩০ এ কার্ত্তিকের উইলের দ্বারা, তাঁহার স্ত্রী এবং কন্যা ও কন্যাদিগের সম্ভাবিত পুত্র যাহারা হিন্দুব্যবহার শাস্ত্র অনুযায়ী তাঁহার দায়াধিকারী হইত, তাহাদিগকে বর্জ্জিত করিয়া সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে প্রদান করেন, কিন্তু তিনি অনুমতি করেন যে, তাঁহার বিধবা স্ত্রী এবং দুই কন্যা "নিম্নলিখিত মাসিক খোরাকী পাইবে," এবং বাদীর মাতা ভুবনমোহিনীর জন্য তিনি বিধান করেন যে, সে ৪০০০ টাকা পাইবে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার পুত্র সন্তান না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ টাকা সরকারে অর্থাৎ পরিবারের ধনাগারে আমানত থাকিবে এবং সে কেবল সুদ পাইবে, এবং যখন তাহার পুত্রসন্তান হইবে, তখন সে আর ২০০ বিঘা ভূমি পাইবে।

আরজীতে লেখা আছে যে, উইলকর্ত্তা উইল করার কিয়ৎকাল পরে লোকান্তর গমন করেন, এবং ১২৪৭ সালে অর্থাৎ উইলের তারিখের পরে প্রায় ৬ সপ্তাহের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাদী জ্ঞানচন্দ্রের জন্ম হয়, এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানচন্দ্র যখন জন্মে, সেই সময় হইতে এক্‌জিকিউটরেরা উই-

লের লিখিত মাসিক খোরাকী দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে যে, বাদীর মাতা কখন ঐ আসল টাকা, অথবা চিহ্নিত করিয়া ঐ ২০০ বিঘা ভূমিও লয় নাই, এবং বাঙ্গালা ১২৫৬ সালে তাহার মৃত্যু হয়, এবং পুত্রেরা ঐ উইলমতে এই রূপ স্বত্ববান হইয়া মৃত মথুরানাথ রায় চৌধুরীর কর্ম্মাধ্যক্ষ্যের নিকট বারম্বার তাহাদের পাওনানা টাকা চাহিয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদী তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছে; এবং আরজীর শেষ ভাগে লিখিত হইয়াছে যে, ১২৪৭ সালের পৌষ মাসে জ্ঞানচন্দ্রের জন্ম হইতে প্রার্থিগণের নালিশের হেতু উত্থিত হইয়াছে; অতএব নালিশে তমাদী ঘটে নাই, কারণ, তাহা ৩০ বৎসরের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। পরন্তু, ইহাও কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবাদী ট্রুষ্টী বিধায় নালিশে তমাদী ঘটিতেই পারে না।

স্বীকৃত হইয়াছে গে, রায় কালীনাথ ঐ উইল করিয়া যান; অতএব এই মোকদ্দমার প্রকৃত বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, নালিশে তমাদী হইয়াছে কি না? অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নালিশ বারিত হয় নাই, অতএব তিনি বাদিগণকে ৪০০০ টাকার ও ২০০ বিঘা ভূমির ডিক্রী দেন এবং বলেন যে, প্রতিবাদিগণের দখলে যে কোন বৃহৎ লাখেরাজ ভূমি থাকে তাহা হইতে ঐ ভূমি দিতে হইবে এবং ডিক্রীজারীর কালে তাহা চিহ্নিত হইবে; কিন্তু তিনি খোরাকীর দাবী অগ্রাহ্য করেন।

প্রতিবাদী এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করিয়া তর্ক করে যে, নালিশ বারিত হইয়াছে।

অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করেন যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১৫ প্রকরণান্তর্গত তমাদী খাটে না। তিনি আরও নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতিবাদী যেপর্য্যন্ত বাদিগণের দাবীর প্রতি আপত্তি না করিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নালিশের হেতু উত্থিত হয় নাই, এবং প্রতিবাদী কেবল অল্প দিন হইল, ঐ প্রকার বাধা দিয়াছে, এবং ঐ প্রকার আপত্তির তারিখের পরে ১২ বৎসরের মধ্যে বাদীর নালিশ উপস্থিত হইয়াছে বিধায়, তাহা বারিত হয় নাই; এবং পরিশেষে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা ট্রুষ্ট অর্থাৎ জেম্মার মোকদ্দমা, এবং নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য একজেকিউটর অথবা ট্রুষ্টীর বিরুদ্ধে এই নালিশ হওয়ায় ইহা তমাদীর আইনের ২ ধারার বিধানের দ্বারা রক্ষিত।

আমার বোধ হয় যে, ইহা উইলক্রমে দত্ত বস্তু পাওয়ার নালিশ, সুতরাং টাকার দাবী সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১১ প্রকরণ খাটে। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কালীনাথ চৌধুরীর উইলের সর্ত্ত অনুযায়ী তাঁহার কন্যা ভুবনমোহিনীর পুত্র জ্ঞানচন্দ্রের (এক জন বাদী) জন্ম হওয়া মাত্রেই তিনি ঐ সম্পত্তি হইতে আসল ৪০০০ টাকা পাইতে ও ২০০ বিঘা ভূমির দাবী করিতে স্বত্ববতী হইয়াছিলেন।

ইহা দেখাইবার চেষ্টা হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমা বাস্তবিক ১ ধারার ১৫ প্রকরণান্তর্গত এবং এই তর্ক "আমানত" শব্দ অবলম্বন করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তর্কিত হইয়াছে যে, যে সকল ব্যক্তি অথবা একজেকিউটর ঐ সম্পত্তি লইয়াছে তাহারা ঐ আমানত শব্দের দ্বারা কন্যার উপকারার্থে ট্রুষ্টী অর্থাৎ জেম্মাদার হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, কন্যার যেপর্য্যন্ত পুত্র সন্তান না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি কি প্রকারে ঐ ৪০০০ টাকা ভোগ করিবেন তাহাই দেখাইয়া দেওয়া ঐ আমানত শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ। উইলকর্ত্তার এই মনস্থ ছিল যে, কন্যার পুত্রসন্তান না হইলে অথবা যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত সে কেবল সুদ পাইবে, কিন্তু পুত্র জন্মিলে, ঐ আসল টাকায় ও ২০০ বিঘা ভূমিতে স্বত্ববতী হইবে। আমি বিবেচনা করি না যে, ইহার দ্বারা উইল-কর্ত্তার ভ্রাতারা ট্রুষ্টী অথবা জেম্মাদার হইয়াছিলেন। আমার বোধ হয় যে, প্রথম হইতেই

পক্ষগণ পরস্পর বিরুদ্ধ ছিল। কন্যাদিগকে দায়াধিকার হইতে বর্জ্জন করা এবং উইল-কর্ত্তার সমুদায় সম্পত্তি তাঁহার ভ্রাতাদিগকে দান করাই উইলের মূল উদ্দেশ্য ছিল; অতএব কোন একজেকিউটর অথবা উইলানুযায়ী বিতরিত সম্পত্তির অবশিষ্টের ভাগী যেরূপ ট্রুষ্টী গণ্য হয়, তদতিরিক্ত কোন অর্থে ঐ ভ্রাতৃগণকে ট্রুষ্টী বলা যাইতে পারে না।

তদনন্তর তর্ক করা হইয়াছে যে, ২ য় ধারার বিধানমতে এই নালিশ রক্ষিত। এই নালিশ উইল-কর্ত্তার ভ্রাতাদিগের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে। যদি তাহাদিগকে ট্রুষ্টী বলা যায়, তবে ২য় ধারার মধ্যে আসিবার জন্য, জেম্মার নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি পাওয়ার নিমিত্ত ঐ স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইবে। কিন্তু এই নালিশে কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির প্রতি দাবী হয় নাই। বাদী জেম্মার নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তির দাবী করে নাই; সম্পত্তি হইতে ৪০০০ টাকা এবং অনির্দ্দিষ্ট ২০০ বিঘা ভূমি পাওয়ার দাবী করিয়াছে।

অপিচ, বলা হইয়াছে যে, টাকা প্রাপ্য হওয়ার কালে নালিশের হেতু উত্থিত হয় নাই, কিন্তু যখন জেম্মাদার তাহার জেম্মার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, তখনই সেই হেতুর উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু বাদিগণের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহারা তাহাদের আরজীতেই স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছে যে, জ্ঞানচন্দ্রের জন্ম হওয়া মাত্রেই অর্থাৎ যে সময়ে তাহাদের মাতা ঐ আসল টাকা এবং ২০০ বিঘা জমিতে চূড়ান্ত রূপে স্বত্ববতী হইয়াছিল, তখনই নালিশের হেতু উত্থিত হয় এবং হইয়াছে। যদি বাদিগণকে এইক্ষণে ইহা বলিতে আমরা অনুমতি প্রদান করি যে, তাহারা খোরাকীর বাবতে সুদ এবং সম্পত্তি হইতে অন্য প্রকার উপকার পাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু সম্পত্তির দখীলকারেরা হঠাৎ এমন ব্যবহার করিয়াছে যদ্দ্বারা তাহাদের স্বত্বেরও ঐ জেম্মার বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছে, তাহা হইলে আমাদের এক কালে নূতন মোকদ্দমা সংস্থাপন করা হয়। বাদিগণ তাহাদের আরজীতে যে মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে তাহাদের জয়-পরাজয় তাহারই উপর নির্ভর করিবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, নালিশ বারিত হইয়াছে, এবং অধঃস্থ জজের ডিক্রীর যে ভাগে বাদিগণকে দাবীকৃত টাকা ও ভূমি দেওয়ার হুকুম হইয়াছে, তাহা অন্যথা হইবে।

অনন্তর, বাদিগণ দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৪৮ ধারামতে আপত্তি করিয়াছে যে, তাহারা যে খোরাকীর দাবী করিয়াছে তাহা নিম্ন আদালত দিতে অনুমতি করেন নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তাহারা এই উইলের অন্তর্গত খোরাকী পাইতে পারে না। উইলে সাধারণতঃ লেখা আছে যে, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও কন্যারা নিম্ন-লিখিত প্রকারে প্রতি মাসে মোসাহেরা এবং খোরাকী পাইবে। এই সকল সাধারণ বাক্যের অর্থ ও ফল নিম্নে বর্ণিত হইয়াছে। ভুবনমোহিনীর সম্বন্ধে সেই অর্থ এই যে, কতক টাকা থাকিবে যাহার সুদ সে তাহার পুত্রসন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত পাইবে, কিন্তু পুত্রসন্তান হওয়া মাত্রেই সে ঐ টাকা এবং কতক ভূমি পাইবে। তাহার জন্য আর কোন বিধান ছিল না, এবং আমি বিবেচনা করি যে, সে আর কিছু দাবী করিতেও পারিত না। বিশেষতঃ, খোরাকীর সাধারণ দাবী সম্বন্ধে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তমাদীর আইনের ১ ধারার ১৩ প্রকরণের দ্বারা বাদিগণ বারিত হইবে। অতএব আমার বিবেচনায় এই আপত্তি অগ্রাহ্য এবং বাদীর সমুদায় নালিশ ডিস্মিস্ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও মত এই যে, নালিশ তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে। তাহা হওয়া অত্যন্ত শোচনীয় বটে, কারণ, প্রতিবাদিগণের জওয়াব বিশ্বাসযোগ্য নহে। (গ)

২২এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি, এইচ্‌, বি, বেলি, এবং ডবলিউ, মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২৮০১ নং মোকদ্দমা।

সেওয়ানের মুনসেফের ১৮৬৯ সালের ১০ই মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া সারণের অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগষ্টে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মসম্মত ইদু ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) আপেলাণ্ট।

সেখ হেফাজত হোসেন প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি, গ্রেগরী ও মুন্সী মহম্মদ ইউছক আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু তারকনাথ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যখন কোন আরজী কোন মুন্সেফের আদালতে দাখিল হয়, এবং তাহার পরে (প্রথম আদালতে বা নিম্ন আপীল-আদালতে অথবা হাইকোর্টেই হউক) যদি দেখা যায় যে, মোকদ্দমার মূল্য মুন্সেফের বিচারাধিকার-বহির্ভূত, তাহা হইলে, বাদী ঐ আরজীতে যে ষ্টাম্প দিয়াছে তাহা সে হারাইবে না; অতিরিক্ত ষ্টাম্প বসাইয়া উচিত মূল্যের আরজী দাখিল করার জন্য তাহাকে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমরা বিবেচনা করি যে, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে, কারণ, অতি দুর্ব্বল প্রমাণের উপরে এবং বাদীর উকীলের এক অসাবধান এবং অনাবশ্যকীয় বাক্যের উপরে হইলেও, ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মোকদ্দমার মূল্য মুন্সেফের বিচারাধিকার-বহির্ভূত; অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মুন্সেফের কার্য্য নিম্ন আপীল-আদালত অতি ন্যায্যরূপেই অন্যথা করিয়াছেন।

কিন্তু আর একটি প্রশ্ন আছে যাহার সহিত এই খাস আপীলের কোন সম্পর্ক নাই। বাদী আপেলাণ্ট বলে যে, তাহার আরজীর জন্য সে যে ষ্টাম্প দিয়াছে তাহার উপকার সে লাভ করিতে পারে, এবং অতিরিক্ত ষ্টাম্প দিয়া উচিত আদালতে তাহা দাখিল করার জন্য তাহাকে আরজী ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল।

আমার বোধ হয় যে, এই প্রার্থনা আমাদের গ্রাহ্য করা উচিত, এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০ ধারামতে তাহা আমাদের গ্রাহ্য করার ক্ষমতা আছে। আমার বিবেচনায়, ঐ ধারার প্রকৃত অর্থ এই যে, যখন আরজীতে কোন ভুল থাকা প্রকাশ পায়, তখন যে ব্যক্তি ঐ আরজী দাখিল করে, সে তাহার প্রদত্ত ষ্টাম্প মূল্যের উপকার লাভে বঞ্চিত হইবে না; কিন্তু উচিত রূপে তাহা দাখিল করার জন্য আরজী তাহাকে ফেরৎ দিতে হইবে। ইহা সত্য বটে যে, খাস আপীলের দরখাস্তে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহার সহিত এই খাস আপীলের কোন সম্পর্ক নাই। কেবল ৮ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৪৭ পৃষ্ঠায় বিচারপতি সিটনকার এবং ম্যাকফর্সনের এক নিষ্পত্তির দ্বারা এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইতেছে, কিন্তু বোধ হয় তাহা মত প্রকাশ মাত্র, কোন তর্কের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় নাই।

১১ শ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫৪২ পৃষ্ঠায় বিচারপতি বেলি ও হব্‌হৌসের বিচারিত এক মোকদ্দমায় যাহাতে এই কথা তর্কিত হয়, তাহাতে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ বলেন যে, আপীল-আদালতের এই প্রকার হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা আছে; এবং যদি নিম্ন আপীল-আদালতের ঐ ক্ষমতা থাকে, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই আদালতের নিম্ন আদালতের সমস্ত ক্ষমতা থাকায় ঐ ক্ষমতাও আছে। শেষোক্ত নজীর আমাদের এই রায়ের সম্পূর্ণ প্রতিপোষক, অতএব সেই নজীর অনুযায়ী আমাদের মত এই যে, খাস আপেলাণ্টের উকীলের তর্ক বিশুদ্ধ, এবং যখন ঐ ভুল প্রকাশ হইয়াছিল, সেই ভুল

প্রথম আদালতেই প্রকাশ হইয়া থাকুক কি আপীলে নিম্ন আপীল-আদালতে অথবা এই আদালতে প্রকাশ হইয়া থাকুক, তখনই বাদীকে আরজী ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল।

আমরা এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম; কিন্তু আমরা আদেশ করিতেছি যে, আরজী উচিত মতে দাখিল করার জন্য বাদীকে ফেরৎ দেওয়া হয়। (গ)

---

২২ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৩৯৭ নং মোকদ্দমা।

রাজসাহীর প্রতিনিধি জজের ১৮৬৯ সালের ২ রা আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বৈকুণ্ঠনাথ সান্ন্যাল ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

কালীচরণ পাল ও আর এক ব্যক্তি ( প্রতিবাদী ) রেষ্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীমোহন দাস ও কাশীকান্ত সেন, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রেষ্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—প্রতিবাদীকে জমিদারের মোক্তার স্বরূপে বাদী খাজানা দেয়, কিন্তু জমিদার তাহার পরে বাদীর নামে নালিশ করিয়া ঐ খাজানার ডিক্রী পান, কারণ, আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, মোক্তারকে টাকা প্রদান দ্বারা জমিদার বাধ্য হইতে পারেন না। অতএব যে মোক্তার টাকা লইয়াছিল, বাদী পশ্চাতে তাহার নামে নালিশ করে।

ইহা খেসারতের নালিশ এবং ইহাতে দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার আছে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—নিম্নলিখিত অবস্থা মতে ৬১৩ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এই নালিশ হইয়াছে। বাদী তাহার জমিদারের নিকট ১২৭১ সালের বাকী খাজানার জন্য দায়ী ছিল। সে বলে যে, সে প্রতিবাদীকে জমিদারের খাজানা আদায় করার ও দাখিলা দেওয়ার ক্ষমতাপন্ন মোক্তার জানিয়া তাহাকে ঐ টাকা দেয়। তাহার পরে অর্থাৎ ঐ টাকা দেওয়ার পরে জমিদার ঐ খাজানার জন্য বাদীর নামে নালিশ করেন, এবং যদিও বাদী আপত্তি করিয়াছিল যে, খাজানা লইতে জমিদার যাহাকে ক্ষমতা দিয়াছিলেন, তাহাকে বাদী খাজানা দিয়াছে, তথাপি আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ রূপ টাকা প্রদানের দ্বারা জমিদার বাধ্য হইতে পারেন না, অতএব তাঁহারা জমিদারকে ডিক্রী দেন। তাহাতে যে মোক্তার প্রথমে টাকা লইয়াছিল, তাহার নামে বাদী নালিশ করে।

জজ বলেন যে, এই মোকদ্দমা তাঁহার আদালতে চলিবে না; ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার শেষ ভাগের বিধান মতে মাল আদালতে চলিবে।

আমরা ২৩ ধারার বিশেষতঃ, তাহার শেষ ভাগের বিধান সমস্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম; কিন্তু এই মোকদ্দমার সহিত যে, তাহার কোন সম্পর্ক আছে, এমত আমাদের দৃষ্ট হইল না। এই মোকদ্দমা খেসারতের নালিশ ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এবং এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে দেওয়ানী আদালতের স্পষ্ট ক্ষমতা আছে। খাস রেষ্পণ্ডেণ্টের উকীল স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ইহার বিরুদ্ধ তর্ক করিতে পারেন না।

অতএব নথীর প্রমাণ দৃষ্টে দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করার জন্য আমরা এই মোকদ্দমা জজের নিকট পুনঃপ্রেরণ করিলাম।

বাদী তাহার এই আপীলের খরচা পাইবে।

(গ)

---

২২ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৩৮৯ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজ সূর্য্যগড়ার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৮ ই মার্চের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১২ ই জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কুণ্ডলসাহু প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

গুরুবক্স কুঙর প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি, গ্রেগরি এবং বাবু নীলমাধব সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাদী আপন দখল স্থির রাখার ও নাম জারী করার জন্য এই বলিয়া নালিশ করে যে, তাহার খাজানা আদায়ে বাধা দিয়া প্রতিবাদী তাহার দখলের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে; তাহাতে এক তৃতীয় পক্ষ এই বলিয়া মোজাহেম দেয় যে, বিরোধীয় সম্পত্তি তাহারই দখলে আছে, এবং বাদী যাহাদের সূত্রে দাবী করে, তাহাদের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব বা স্বার্থ ছিল না।

এ স্থলে, ঐ তৃতীয় পক্ষকে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৩ ধারা মতে প্রতিবাদী শ্রেণী-ভুক্ত করা অসঙ্গত নহে; এবং ঐ ব্যক্তিকে ঐ রূপে প্রতিবাদী করা হেতু, বাদীর প্রমাণ-ভার ঐ ব্যক্তির উপর নিক্ষিপ্ত হয় না; কারণ, বাদী আপন নালিশ সপ্রমাণ করিতে বাধ্য।

বিচারপতি গ্লবর।—বাদিগণ আমাদের সমীপস্থ খাস আপেলাণ্ট। জেলা মুঙ্গের এবং বিহারের অন্তর্গত মৌজা রহুয়া, চক্ রহুয়ার জমিদারীর ৫৴ দাম ভূমি সম্বন্ধে তাহাদের নাম রেজিষ্টরী এবং দখল সাব্যস্তের প্রার্থনায় এই মোকদ্দমা উপস্থিত। যতি কুঙর প্রভৃতি প্রতিবাদিনীগণ বাদিগণের কর আদায়ে হস্তক্ষেপ করায় বাদিগণের দখলের বাধা হওয়াই তাহাদের নালিশের হেতু বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, এবং এই বাধা ১২৭৬ সালের কার্ত্তিক মাসে হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

বাদিগণ যে বিক্রয়-কবালা অনুসারে উক্ত ভূমির স্বত্বের দাবী করে, মুল প্রতিবাদিনী যতি কুঙর তাহা লিখিত-পড়িত হওয়ার বিষয় অস্বীকার করে; এবং আর এক ব্যক্তি গুরুবক্স যে আসিয়া মোজাহেম দেয়, এবং যাহাকে প্রথম আদালত দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৭৩ ধারা মতে মোকদ্দমার প্রতিবাদী করেন, সে বলে যে, উক্ত ভূমি তাহার; সে তাহাতে দখীলকার ছিল; এবং বাদিগণ যাহাদের হইতে দাবী করে, তাহাদের উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব বা লাভ ছিল না।

প্রথম আদালত স্থির করেন যে, বাদিগণের ১২২০ সালের ১১ ই চৈত্রের কবালা সপ্রমাণ হইয়াছে; প্রথম প্রতিবাদিনীগণের অর্থাৎ যতি কুঙর প্রভৃতির পূর্ব্বপুরুষেরা ১২২৪ সালে উক্ত বিক্রয় স্বীকার করিয়া একরার-নামা দিয়াছে; উক্ত সম্পত্তির যে অংশ মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত তৎসম্বন্ধে নাম-খারিজ দাখিল হয়; এবং ঐ তালুকের পাটওয়ারীর ও অন্যান্য সাক্ষিগণের জবানবন্দী এবং দাখিলা, কবুলিয়ৎ ও জমিদারী কাগজ প্রভৃতি দলীল-ঘটিত প্রমাণ দ্বারা চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ যে, বাদিগণ তাহাদের কবালার তারিখ হইতে বরাবর বিরোধীয় জমিতে দখীলকার ছিল।

অধঃস্থ জজ আপীলে মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত ভূমি সম্বন্ধে প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখেন। তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, বাদিগণের দাখিলী বিক্রয়-কবালা এবং একরার-নামা সপ্রমাণ হইয়াছে; এবং তিনি এই হেতুবাদে ঐ নিষ্পত্তি করেন যে, বাদিগণ তাহাদের বিক্রয়-কবালার তারিখ হইতে বরাবর দখল দেখাইয়াছে। কিন্তু জেলা বিহারের অন্তর্গত ভূমি-খণ্ড সম্বন্ধে তিনি বিবেচনা করেন যে, বাদিগণের দখলের যথেষ্ট প্রমাণ নাই; এবং যদিও উক্ত বিক্রয়-কবালা প্রাচীন কালের, এবং কোন কোন বিষয়ে আপনা হইতেই সপ্রমাণ হয়, তথাপি দখলের প্রমাণ দ্বারা তাহার অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করা আবশ্যক। সাক্ষিগণের তৎসম্বন্ধীয়

প্রমাণ পরস্পর বিরোধী হওয়ায়, এবং অন্য কোন দলীল-ঘটিত প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত না হওয়ায় তিনি তাহা অসন্তোষকর বিবেচনা করেন। অতএব উক্ত আপীলের ফল এই হয় যে, বাদিগণ মুঙ্গেরের সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহাদের দখল সাব্যস্তের ডিক্রী পায়, এবং তালুকের যে অংশ বিহারের অন্তর্গত, তৎসম্বন্ধে তাহাদের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয়।

উভয় পক্ষই এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করে। উপস্থিত মোকদ্দমায় আমাদের কেবল বাদিগণের আপীল দেখিতে হইবে। তাহাদের খাস আপীলের তিনটি হেতু :— প্রথমতঃ, গুরুবকস্‌কে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৭৩ ধারা অনুসারে মোকদ্দমার পক্ষ করা উচিত ছিল না; দ্বিতীয়তঃ তাহাকে পক্ষ করা হইলে, প্রমাণ-ভার বাদিগণের উপর না দিয়া তাহার উপরেই দেওয়া উচিত ছিল; এবং তৃতীয়তঃ, মৌখিক প্রমাণ দৃষ্টে অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্তের বিপরীত।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৭৩ ধারা মতে গুরু বকস্‌কে মোকদ্দমার পক্ষ করা মুন্সেফের উচিতই হইয়াছে। তর্কিত হইয়াছে, এবং ৭ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২০১ পৃষ্ঠা এবং ১০ ম বালমের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমা দৃষ্টে দর্শান হইয়াছে যে, গুরু বকসের যখন মোকদ্দমায় কোন সম্বন্ধ ছিল না, এবং এ মোকদ্দমায় যে ডিক্রী হইত তাহাতে যখন তাহার স্বত্বের কোন হানি হইত না, তখন তাহাকে মোকদ্দমার পক্ষ করা উচিত ছিল না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, এই সকল নিষ্পত্তি দ্বারা অধিক হইলেও এই সংস্থাপিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে এই ধারা মতে কোন মোকদ্দমার পক্ষ করা হয়, তাহার মোকদ্দমার মুল বিষয়ে এবং ফলে সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; এবং আমার বিবেচনায়, ইহা বলা যাইতে পারে না যে, গুরু বকসের এই মোকদ্দমার ফলে কোন স্বার্থ ছিল না। বাদিগণ ঐ সম্পত্তির মালিক স্বরূপে তাহাদের নাম জারী করিবার প্রার্থনা করে, এবং তাহারা নাম জারী করিতে পারিলে গুরু বকস যাহাকে এই তর্কের নিমিত্ত ঐ ভূমির মালিক স্বরূপে দখীলকার বলিয়া অনুমান করিতে হইবে, সে কি অন্যন্ত. কঠিন অবস্থায় পতিত হইত না? এমন অনেক ঘটনা হইতে পারে, যাহাতে বাদিগণের নাম জারী হইলে বিরোধীয় ভূমিতে গুরুবকসের স্বত্বের হানি হইতে পারে। যথা, কালেক্টরের রেজিষ্টরিতে অন্য ব্যক্তিগণের নাম মালিক স্বরূপে লিখিত হইলে, সে সম্পত্তি বিক্রয় করিতে চাহিলে তাহার মূল্যের বিশেষ হানি হইত, এবং পরে মোকদ্দমা না করিয়া সে এরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে পারিত না; তাহার অবশ্যই এই হুকুমের জন্য জাবেতা নালিশ করিতে হইত যে, বাদিগণের নাম মালিক স্বরূপে লিখিত হইয়া থাকিলেও তাহারা বাস্তবিক মালিক নহে। অতএব আমার বোধ হয়, এ মোকদ্দমার মুল বিষয়ে এবং ফলে গুরু বকসের সপষ্ট সম্বন্ধ ছিল; তাহার মোজাহেম দেওয়া উচিত হইয়াছে, এবং নিম্ন আদালতেরও তাহাকে ৭৩ ধারা মতে পক্ষ করা উচিত হইয়াছে।

আমার বিবেচনায়, দ্বিতীয় আপত্তি একেবারে তিষ্ঠিতে পারে না, এবং খাস আপেলাণ্টের উকীল আমাদিগকে তাঁহার এই আপত্তির কোন নজীর দেখাইতে পারেন নাই, অথবা কেন যে প্রমাণভার বাদিগণের উপর হইতে প্রতিবাদীর উপর পড়িবে, তিনি তাহারও কোন কারণ দেখাইতে পারেন নাই। মোজাহেমদার প্রতিবাদী যাহাই বলিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাদিগণ ডিক্রী পাইবার পূর্ব্বে আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য। নচেৎ যে কোন মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে ৭৩ ধারা মতে পক্ষ করা হয় তাহাতেই, বাদী যাহা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য তাহার প্রমাণ-ভার অন্যের

উপর ফেলিয়া আপনার সুবিধা করিয়া লইবে।

তৃতীয় আপত্তি বৃত্তান্ত-ঘটিত ভ্রম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অধঃস্থ জজ তাঁহার রায়ে যাহা বলেন, খাস আপেলাণ্টগণের উকীল তাহার এই অর্থ গ্রহণ করেন যে, সম্পত্তির যে অংশ বিহারের অন্তর্গত, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পরস্পর বিরোধী। উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে এক সাক্ষী এক কথা বলে, এবং আর এক সাক্ষী এই দুই সম্পত্তি সম্বন্ধে তাহার বিপরীত কথা বলে। বোধ হয় অধঃস্থ জজ সাক্ষিগণের জবানবন্দী পড়িয়া স্থির করেন যে, কোন কোন সাক্ষী বাদীর দখল সম্বন্ধে একরূপ সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং আর আর স্বাক্ষী উক্ত দখল সম্বন্ধে আর একরূপ কহিয়াছে। অতএব তিনি এই রূপ প্রমাণের বিরোধ হেতু স্বভাবতঃই অতি কাঠিন্য বোধ করিয়া, যে সাক্ষ্য দলীল-ঘটিত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষিত হয় নাই, তাহা অগ্রাহ্য করেন। আমি একথা বলি না যে, তাঁহার তর্ক ন্যায়ানুগত; কিন্তু তাহাতে কোন আইন-ঘটিত ভ্রম দেখা যায় না।

অতএব আমার বিবেচনায়, এই খাস আপীলের কোন হেতুই স্থির থাকিতে পারে না; সুতরাং ইহা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—আমারও ঐ মত, এবং আমি খাস আপেলাণ্টের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হেতু সম্বন্ধে আমার বিজ্ঞবর সহযোগীর রায়ের অতিরিক্ত কিছু বলিতে চাহি না। প্রথম হেতু অর্থাৎ নিম্ন আদালত গুরু বক্‌সকে উচিত মতে মোকদ্দমার পক্ষ করিয়াছেন কি না, তৎসম্বন্ধেও আমি বিবেচনা করি যে, আমার সহযোগীর প্রদর্শিত হেতুবাদে তাহাকে পক্ষ করা উচিতই হইয়াছে।

আমি দেখিতেছি যে, এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে যদি এই বলা হইত যে, উক্ত সম্পত্তির যে অংশ জেলা বিহারের অন্তর্গত, তাহার মালিক স্বরূপে বাদীর নাম কালেক্টরীর তৌজিতে লিখিত হইতে পারিবে,—কিন্তু বাস্তবিক বাদী তাহার মালিক নহে, গুরু বক্‌স প্রতিবাদীই মালিক—তাহা হইলে বাদীর অনুকূল ঐ নিষ্পত্তি প্রতিবাদীর স্বত্বের হানিকর হইত।

কিন্তু আমার বিবেচনায়, ইহা ব্যতীতও আর দুইটি অতি বলবৎ কারণ আছে, যাহা স্পষ্টই খাস আপেলাণ্টের উকীলের প্রদর্শিত মোকদ্দমাদ্বয়ে প্রয়োগ হয় না, এবং তাহা যে বিচারপতিগণ উক্ত মোকদ্দমাদ্বয়ের বিচার করেন তাঁহাদিগকে জানান হয় নাই, বা তাঁহাদের কর্ত্তৃক বিচারিতও হয় নাই। প্রথমতঃ, আমি গুরু বক্‌সকে মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করণ সম্বন্ধে বাদীর নিজের আচরণ এবং আইনের যে সকল বিধান দ্বারা খাস আপীল সমস্ত শাসিত হয়, এবং যাহা উপস্থিত খাস আপীলে প্রয়োগ হয়, তাহার কথা বলিতেছি।

এ মোকদ্দমার বাদী কখনই গুরু বক্‌সকে মোকদ্দমায় পক্ষ করিবার প্রতি আপত্তি করে নাই; বরং সে তাহাকে পক্ষ করিতে দিয়াছে, এবং বাস্তবিক তাহার বিরুদ্ধে নিজের অনুকূল ডিক্রী পাইয়াছে; আবার সে তাহাকে নিম্ন আপীল-আদালতে খাস আপেলাণ্ট স্বরূপে উপস্থিত হইতে দিয়াছে, এবং তখন তাহাকে উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী করণের প্রতি কোন আপত্তি করে নাই। এবং যদি খাস আপেলাণ্ট নিম্ন আদালতে অকৃতকার্য্য না হইত, তবে সে হয় ত এই ব্যক্তি এমোকদ্দমার প্রতিবাদী থাকা হেতু তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী-জারী করিত। অতএব যে স্থলে সে শেষ আদালতে এই আপত্তি কেবল আইন-ঘটিত বিষয় বলিয়া উপস্থিত করে, সে স্থলে তাহা করিবার উৎকৃষ্ট কারণ না থাকিলে আমাদের তাহাকে উহা উপস্থিত করিতে দেওয়া উচিত নহে। আমাদিগকে ঐ রূপ কোন কারণ দেখান হয় নাই।

পরন্তু, খাস আপীলের আপত্তির হেতু এই

যে, নিম্ন আদালত এই মোকদ্দমার বিচারে আইন-ঘটিত গুরুতর ভ্রম ও দোষ করিয়াছেন, এবং উক্ত গুরুতর দোষ ও ভ্রম হেতুই খাস আপেলাণ্ট এক্ষণে আমাদের নিকট এক মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু আইনে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, মোকদ্দমার বিচারে ঐ রূপ গুরুতর দোষ ও ভ্রম থাকিলেও; "মোকদ্দমার "দোষ গুণ সম্বন্ধীয় বিচারে ভ্রম বা দোষ না "হইয়া থাকিলে," আমরা তাহার প্রতিকারার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না।

এস্থলে এমত বলা যাইতে পারে না যে, উক্ত বিশেষ ভ্রম হেতু মোকদ্দমার দোষ গুণ সম্বন্ধীয় নিষ্পত্তিতে কোন ভ্রম বা দোষ হইয়াছে। পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমার উচিত মত বিচার হইয়াছে; তাহারা যে ইসুর উপর তর্ক করে, তাহা তাহারা বেস জানিত, এবং উক্ত ইসু সম্বন্ধে যে পক্ষের যে প্রমাণ ছিল তাহা দেওয়া হইয়াছে; উক্ত আদালত উপযুক্ত ক্ষমতা-প্রাপ্ত আদালত, এবং ঐ আদালত দোষগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, এবং তাহা আইন সম্বন্ধে উত্তম নিষ্পত্তি। অতএব যদি আমরা এক্ষণে জাবেতা সম্বন্ধীয় এই পারিভাষিক ভ্রম দৃষ্টে এই হুকুম দেই যে, আদালতের যে নিষ্পত্তি দ্বারা বাদী এবং এই বিশেষ প্রতিবাদীর মধ্যে বিরোধীয় বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা কোন ফলদায়ক নহে এবং কোন পক্ষ তদ্দ্বারা বাধ্য নহে, তাহা হইলে বাস্তবিক আমাদের কি করা হইবে? আমাদিগকে কেবল উক্ত আদালতে সেই প্রমাণ দৃষ্টে সেই হুকুমের বিচারার্থে মোকদ্দমা অর্পণ করা হইবে, এবং হয়ত আবার সেই ফলই হইবে, এবং যখন পক্ষগণ আমাদের নিকট এমত ভাবে উপস্থিত যে, মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, তখন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না করিয়া, ফলে এই হুকুম দেওয়া হইবে যে, এই বিষয় সম্বন্ধে পক্ষগণের যে ব্যয় ও কষ্ট হইয়াছে, তৎসমুদায় তাহাদের পক্ষে কোন ফলদায়ক হয় নাই, তাহাদের প্রত্যেককে এই বিশেষ মোকদ্দমার আপন আপন খরচা দিতে হইবে, এবং তদনন্তর আবার ঠিক সেই মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করিতে হইবে।

আমার বোধ হয়, ইহা করিলে, ব্যবস্থাপক সমাজ আমাদিগকে খাস আপীলে যে ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার নিতান্ত অপব্যবহার করা হইবে, এবং বাস্তবিক আমি পূর্ব্বে যেমন দেখাইয়াছি তদনুসারে, খাস আপীল আদালত স্বরূপে আমাদের ক্ষমতা পরিচালনের যে সীমা ব্যবস্থাপক সমাজ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা আমাদের অতিক্রম করা হইবে। (ব)

---

২২ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৬০ নং মোকদ্দমা।

চট্টগ্রামের জজের ১৮৬৯ সালের ১৮ ই মার্চের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

ষোড়শীবালা দেবী এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদিনী) আপেলাণ্ট।

নন্দলাল সেন (বাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর ও ক্ষেত্রনাথ বসু, যাদবচন্দ্র শীল, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জে, টি, উড্রুফ বারিষ্টর এবং বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কট-কবালার যে সমস্ত সর্ত্ত পালন করিবার পরে কট-দাতা কটের সম্পত্তি খালাস করিতে স্বত্ববান হইতে পারে, তাহা পালনার্থে ঐ কবলায় যে "নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ" লেখা থাকে, ১৭৯৮ সালের ১ কানুনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩৪ কানুনের ১২ ধারা-বর্ণিত "নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ" শব্দে, সেই সম্পূর্ণ মিয়াদ বুঝায়; সুতরাং কটদাতা ঐ সকল সর্ত্ত পালন করুক বা না করুক,

কবালা-লিখিত সেই নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ সম্পূর্ণ অতীত না হইলে, কটগৃহীতা বয়বাতের প্রার্থনা করিতে পারে না।

বিচারপতি ফিয়ার।—এই মোকদ্দমার যে সকল বৃত্তান্ত আমাদের রায় বুঝাইবার জন্য আবশ্যক, তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারে।

১৮৬৩ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ষোড়শীবালা দেবী এবং তাহার পুত্র হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় চট্টগ্রামের কতিপয় ভূসম্পত্তির এক কটকবালা গোবিন্দচন্দ্র সেন নামক এক ব্যক্তিকে লিখিয়া দেয়। উক্ত কবালা ইংরেজী আদর্শে লেখা হয়, এবং তাহা দ্বারা উক্ত সম্পত্তি এই সর্ত্তে গোবিন্দচন্দ্রকে একেবারে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কটদাতাগণ গোবিন্দচন্দ্রকে ১৮৬৮ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে আসল ৫৪,৪৩৭৸৶৪ টাকা দেয়, এবং ইতিমধ্যে ষাণ্মাসিক দুই কিস্তিতে অর্থাৎ বৎসরের ৪ ঠা মার্চ এবং ৪ ঠা সেপ্টেম্বর বার্ষিক শতকরা দশ টাকা হারে সুদ আদায় করে, তাহা না দিলে বার্ষিক কর দেয়, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ইত্যাদিও দেয়, তবে এবং তাহা হইলেই গোবিন্দ ঐ সম্পত্তি ফেরৎ দিবে।

কটদাতাগণ উক্ত কটের সর্ত্তমতে দেয় সমুদায় সুদ না দেওয়ায় গোবিন্দচন্দ্র ১৮৬৬ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বর তারিখে ১৮০৬ সালের ১৭ কানুনের ৮ ধারার বিধানমতে উক্ত কটের বয়বাত জারী করণার্থে চট্টগ্রামের জজের নিকট দরখাস্ত করে। তাহাতে জজ কট-দাতাগণের প্রতি রীতিমত নোটিস জারী করেন।

এই দরখাস্ত এবং নোটিসের বলে গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র নন্দলাল সেন (তাহার পিতার ইতিমধ্যে মৃত্যু হওয়ায়) ১৮৬৮ সালের ১৫ ই এপ্রিল তারিখে সম্পূর্ণরূপ ক্রয় সংস্থাপনার্থে ও তদনুসারে কটের সম্পত্তিতে দখল পাওয়ার জন্য বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৬৬ সালের ৪ ঠা ডিসেম্বরে, যখন চট্টগ্রামের জজের নিকট দরখাস্ত দেওয়া হয়, অথবা ১৮৬৮ সালের ১৫ ই এপ্রিল তারিখে যখন এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, ইহার কোন সময়েই উক্ত কট-কবালা-লিখিত আসল টাকা আদায়ের মিয়াদ অতীত হইয়াছিল না; অতএব এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, উক্ত কারণে এ মোকদ্দমা উচিত সময়ের অগ্রে উপস্থিত হইয়াছে কি না।

জেলার আদালত যদি ইংলণ্ডের চান্সরি আদালতের নিয়ম দৃষ্টে ঠিক এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিতেন, এবং তাঁহার তাহা করিবার উপায় থাকিত, তবে এ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে আসল টাকা আদায়ের সর্ত্তমত মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বেও বাদীর নালিশের স্বত্ব হইত; কারণ, যখন এমত ঘটনা হয় যাহার জন্য কট-দাতা উক্ত কবালা অনুসারে তাহার সম্পত্তি ফেরৎ পাইবার স্বত্ব হারায়, এবং একুটি আদালত তখনও তাহাকে ফেরৎ লইবার যে স্বত্ব দেন কেবল তাহা দ্বারাই সে উক্ত সম্পত্তি ফেরৎ পাইতে পারে, তখন উক্ত আদালত কট-গৃহীতাকে উপস্থিত হইয়া এই আপত্তি করিতে দেন যে, কটদাতা হয়, এই ফেরৎ পাইবার স্বত্ব পরিচালন করিবে, নচেৎ বয়সিদ্ধ হইবে। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, এই কট সম্পূর্ণ ইংরেজী ধরণে হইয়া থাকিলেও তাহা ১৮০৬ সালের ১৭ কানুনের বিধানের অন্তর্গত। এদেশে যে কট সচরাচর প্রচলিত এবং যাহাতে কটের সম্পত্তি ফেরৎ দিবার একরারনামা লইয়া সম্পূর্ণরূপ বিক্রয়-কবালা লিখিয়া দেওয়া হয়, ইহা সর্ব্বপ্রকারেই তাহার তুল্য; এই প্রকারের কট বরাবরই উক্ত কানুনের অধীন বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ভূমিকায় "সর্ত্তী বিক্রয়" শব্দগুলির যে ব্যাখ্যা আছে তাহা এত প্রশস্ত যে, ঐ প্রকারের কট তাহার অন্তর্গত হয়, এবং যে অনিষ্ট নিবারণার্থে তাহা বিধিবদ্ধ হয়, ঐ কট তাহারই অন্তর্গত।

এমত অবস্থায়, কেবল উল্লিখিত কানুনের ৮ ধারার বিধান অনুসারেই কট-গৃহীতা বয়সিদ্ধ করিতে পারে। এবং কট-গৃহীতা কখন্ বয়বাৎ জারীর দরখাস্ত প্রথম করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে উক্ত ধারায় কিছু দ্বিধা-জনক শব্দ থাকিলেও, তাহা পূর্ব্ব ধারা দৃষ্টে পরিষ্কার হয়। ৭ ধারার শেষ প্রকরণ এই :—

"১৭৯৮ সালের ১ কানুনের ২ ধারা এবং "১৮০৩ সালের ৩৪ কানুনের ১২ ধারার সম্পূর্ণ "বিধান কট খালাসের নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ সম্বন্ধে "যেরূপ প্রয়োগ হয়, এই কানুন দ্বারা কট খালা- "সের জন্য যে অনুগ্রহের এক বৎসর মিয়াদ "দেওয়া যায়, তাহাতেও সেই রূপ প্রয়োগ হয়।" ইহাতেই প্রকাশ যে, কট-গৃহীতা বয়বাত জারীর দরখাস্ত করিলে যে নোটিস দেওয়া হয়, এবং তাহা হইতেই যে অনুগ্রহের বৎসর আরম্ভ হয়, তাহা, ব্যবস্থাপক সমাজের অভিপ্রায়ে, কটকবালায় কট খালাসের যে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ লিখিত থাকে তদতিরিক্ত এক বৎসর; অতএব উক্ত "নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ" অতীত হইবার পূর্ব্বে দরখাস্ত করা যাইতে পারে না।

ব্যবস্থাপক সমাজ এই কানুনে কট খালা- সের যে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, কট-কবালা-লিখিত যে সমস্ত সর্ত্ত পালনের পরে কট-দাতা কটের সম্পত্তি ফেরৎ পাইতে স্বত্ত্ববান হইবে, তাহা পালনার্থে ঐ কবা- লায় যে কাল নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সম্পূর্ণ কাল বুঝায়। আমাদের বোধ হয় না যে, তাহাতে কোন স্থলেই তাহা হইতে ন্যূন বুঝায়, অথবা কটদাতা সমুদায় সর্ত্ত পালন করে কি না, তাহার উপর উহা নির্ভর করে। এমত অনুমানের কোন কারণ নাই যে, ব্যবস্থাপক সমাজ ঐ শব্দগুলি দ্বারা তাহার প্রকৃতার্থে, কট খালাসের জন্য কট- কবালা-লিখিত মিয়াদের কথা না বলিয়া, যে অল্প কালের মধ্যে কটদাতা সমুদায় সর্ত্ত পালন করিয়া উক্ত কবালা-লিখিত খালাসের স্বত্ব রক্ষা করিতে পারে, কেবল তাহারই কথা বলিয়া- ছেন।

উক্ত কানুনের অভিপ্রায় দৃষ্টেই প্রকাশ যে, তৎপ্রণেতাগণের মনে এমত এক কটদাতার বিষয় সপষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে, আপন কট খালাস করিবার স্বত্ব লাভের জন্য আবশ্যকীয় সর্ত্ত সমস্ত পালন না করে; এবং তাঁহারা যদি "নির্দ্দিষ্ট মিয়াদের" অর্থে এমত মিয়াদ মনে করিতেন যে, তাহা কটদাতা প্রথম সর্ত্ত ভঙ্গ করিলেই অতীত হয়, তবে তাঁহারা আরো সপষ্ট বাক্যে তাঁহাদের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেন।

অতএব আমাদের সমীপস্থ মোকদ্দমায়, আমাদের অভিপ্রায় অনুসারে, উক্ত "নির্দ্দিষ্ট মিয়াদ" ১৮৩৮ সালের ৪ ঠা সেপ্‌টেম্বরের পূর্ব্বে অতীত হয় নাই, অতএব বয়বাত জারীর দরখাস্ত এবং এই নালিশের আরজী উভয়ই এমত সময়ে দাখিল হইয়াছে যখন কট-গৃহীতার কট খালাসের স্বত্ব রহিত করণার্থে কোন উপায় অবলম্বন করি- তেই কট-গৃহীতার স্বত্ব জন্মিয়াছিল না। অতএব এ বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু করা হইয়াছে তৎ- সমুদায়ই অকর্ম্মণ্য; এ মোকদ্দমার বিধিমত হেতু নাই, সুতরাং ইহা ডিস্‌মিস্ হইবে।

বাদীর কৌন্সেল তর্ক করেন যে, কটের সর্ত্ত অনুসারে, যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বাদী কট-গৃহীতা স্বরূপে বিরোধীয় ভূমিতে অন্ততঃ দখল পাইতে পারে। কিন্তু সে যে নালি- শের কারণে নালিশ করে, তাহা হইতে ইহা স্বতন্ত্র, এবং আমাদের বিবেচনায়, এক্ষণে তাহাকে তাহার নালিশের আরজী-বহির্ভূত কথা বলিতে দেওয়া উচিত নহে।

যদিও আমরা বিবেচনা করি যে, বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে, তথাপি আমাদের মতে তাহাকে প্রতিবাদিনীর খরচা দিতে হইবে না। ষোড়শী-বালা আপন জওয়াবে যে প্রতারণার কথা বলে, তাহা যে কেবল অপ্রমাণ হইয়াছে, এমত নহে, কিন্তু তাহা এত ঘৃণিত রূপে

মিথ্যা যে, আদালতের খরচা প্রদান সম্বন্ধে আপন বিবেচনা মত কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা আছে, সে তাহার উপকার পাইবার সমস্ত স্বত্ব হারাইয়াছে। আদালত উক্ত কানুনের যে অর্থ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তদনুসারে প্রতিবাদিনী বাদিগণের দাবী হইতে কিয়ৎকালের জন্য মুক্তি পাইয়াছে, যাহা সে পাইবার যোগ্য নহে; অতএব তাহা পাওয়ার খরচা বহন করিতে আদালত তাহাকে বাধ্য করিলে সে ন্যায্য রূপে কোন আপত্তি করিতে পারে না।

জজের ডিক্রী অন্যথা করিয়া বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করা গেল। প্রত্যেক পক্ষই উভয় আদালতের নিজ নিজ খরচা বহন করিবে।

( ব )

---

২২ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৮ নং মোকদ্দমা।

রাজসাহীর জজের ১৮৬৮ সালের ১৫ ই সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

কালীপ্রসাদ মজুমদার, প্রভৃতি ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

ময়মনসিংহের কালেক্টর ও অন্যান্য ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস, রমেশচন্দ্র মিত্র ও তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর ও বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদয়াল রায়, আনন্দচন্দ্র ঘোষাল এবং শশিভূষণ সেন, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ক্রমশঃ পয়বস্তু বা সিকস্তপয়বস্ত অথবা নদী বা সমুদ্রে জজিরা স্বরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে ভূমি উৎপন্ন হয়, তাহা আদৌ যে সময়ে পয়বস্তু বা উৎক্ষিপ্ত হইয়া সম্পত্তি স্বরূপে চাস ও দখলের যোগ্য হয়, সেই সময়ে তাহার কি অবস্থা ছিল, তাহার তদন্ত করিয়া ঐ ভূমিতে দখলের স্বত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। যদি তাহা নৌকা বা জাহাজ গমনাগমনের যোগ্য নদীতে এক দ্বীপ স্বরূপে সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তবে পশ্চাতে তাহার এবং ঐ নদীর তটের মধ্যস্থিত সোতা শুষ্ক হইলেও, ঐ দ্বীপাকারে থাকার কালে যে ব্যক্তি তাহাতে স্বত্ব ও দখল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার স্বত্ব নষ্ট হইতে পারে না। তাহার স্বত্ব সঙ্গত, এবং গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর যাবতীয় লোকের বিরুদ্ধেই সেই স্বত্ব প্রবল গণ্য।

বিচারপতি নর্ম্যান।—রাজসাহীর জজ মেং বেল্সাইর নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে।

বাদী মৌজা বিয়ারার পয়বস্তী বলিয়া ৮০০০/ বিঘা জমির দাবীতে নালিশ করে। সে বলে যে, জমুনাই নদী ক্রমে উক্ত মৌজার পূর্ব্বদিক হইতে অনেক জমি ভাঙ্গিয়া লইয়া আবার ১৮৬৮ সালে পূর্ব্বদিকে সরিয়া যায়, এবং যে জমী ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তাহারই স্থানে বিরোধীয় ভূমি মৌজা বিয়ারার অন্তর্গত আসলী ভূমির লখত্ পয়বস্ত হয়, এবং ১২৭১ সালের আবাদের যোগ্য হয়; বাদী তাহা প্রজাবিলি করিতে উদ্যত হওয়ায় প্রতিবাদিগণ তাহাতে বাধা দেয়।

প্রতিবাদী খাজে এনাএত উল্লা আপন বর্ণনাপত্রের তৃতীয় দফায় বলে যে, ১২ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে বিরোধীয় জমি পয়বস্ত হয়, এবং সে যে সকল পয়বস্ত জমির দাবী করে, তৎসমুদায় সে এবং তাহার শরীকগণ পয়বস্তের সময় হইতে ছোট প্যারী এবং নওদা প্যারী ইত্যাদির সামিল বলিয়া ভোগ করে; অতএব সে এই আপত্তি করে যে, বাদীর দাবী তমাদী দ্বারা বারিত।

৬ দফায় সে বলে যে, জমুনাই নদী ছোট প্যারী এবং নওদা প্যারীর পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হয়; ঐ দুই মহালের যে সকল জমি ঐ নদীর পশ্চিমদিকে স্থিত, তাহা ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া

যায়, এবং অনেক জমি ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর ১২৫৩ এবং ১২৫৪ সালে ঐ দুই মহালের সিকস্তী জমির স্থানে চর পড়ে, এবং ছোট প্যারীর সামিল বলিয়া দখলী-কৃত হয়; ঐ চরের পশ্চিমে যে সোঁতা ছিল, তাহার পশ্চিম দিক ছোট প্যারীর অবশিষ্ট জমি ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিয়া লয়, এবং তাহার পূর্ব্ব পার্শ্বে উক্ত চরের সহিত সংলগ্ন হইয়া পয়বস্ত হয়। পরিশেষে উক্ত সোঁতার মুখ ভরাট হইয়া ক্ষরার কালে বন্ধ হইয়া যায়। বর্ষা কালে ঐ সোঁতা নদীর সহিত মিলিত হইয়া প্রবল হয়; এমত অবস্থায়, ছোট প্যারীর সাবেক অবশিষ্ট জমি ১২৬০ এবং ১২৬১ সালে সম্পূর্ণ রূপে ভাঙ্গিয়া যাইয়া সোঁতার পূর্ব্ব-ধারে প্রতিবাদীর দখলে যে চড়া জমি ছিল, তাহার সহিত পয়বস্ত হয়; বিরোধীয় জমি পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ হয়, বাদীর কথিত মতে পশ্চিমদিক হইতে হয় না।

অন্যান্য প্রতিবাদিগণও তাহাদের দখলের ভূমি সম্বন্ধে ঐ রূপ জওয়াব দেয়। জজ এই সকল মোকদ্দমা পৃথক্ পৃথক্ বিচারিত হইবার আদেশ করেন।

জজ বলেন, আসল ইসু এই যে, উক্ত চরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাদীর বাক্যই সত্য, না প্রতিবাদীর বাক্য সত্য?

বাদী যে প্রমাণ দেয় তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন যে, বাদীর দাবী অকর্ম্মণ্য হইলে, প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের চরিত্র এবং বিশ্বাস-যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করিবার আবশ্যক হইবে না, এবং তিনি বিবেচনা করেন যে, বাদীর দাবী নিম্নলিখিত কারণে রক্ষা পাইতে পারে না।

তিনি বলেন,—"আমীনের নক্সায় প্রকাশ "যে, উক্ত ভূমি সকল অসমান অর্থাৎ উচনীচা, "এবং পশ্চিমাংশ অপেক্ষা পূর্ব্বাংশের জমি "অধিক উচ্চ; ইহাতেই বোধ হইতে পারে যে, "তাহা পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বর্দ্ধিত হইয়াছে, "পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে নহে।"

"উক্ত চর এবং পশ্চিম তীরের মধ্যস্থিত "দামসের জলের গভীরতাই উক্ত চর পূর্ব্বে "জলে পরিবেষ্টিত দ্বীপ থাকিবার আর এক "প্রমাণ; এই দামসের দক্ষিণ সীমা যে স্থানে "বাদীর বিয়ারা এবং মনগ্রাম মৌজা হয় "মিলিত হইয়াছে, এবং উত্তরদিকে পুড়িয়া-"ভেড়ির সম্মুখে ব্যতীত, আর সকল স্থানেই "হাঁটিয়া পারাপার হওয়া যায় না, এবং আমার "বোধ হয় যে, বাদীর কথিত মতে হঠাৎ "নদী সরিয়া গেলে এক হ্রদ হইয়া থাকিত না, "কিন্তু নদীর স্রোতঃ পশ্চাদ্ভাগে সরিয়া গেলে "স্বভাবতঃই হ্রদ হইয়া থাকে। আমীন যে, বৃক্ষ "না থাকিবার কথা বলে, তাহার উত্তর এই যে, "চড়া জমিতে বৃক্ষ হওয়া কঠিন।"

"যাহা হউক, কেবল প্রাকৃতিক লক্ষণ দৃষ্টে "তর্ক না করিয়া প্রকৃত বিষয়ে প্রবেশ করিয়া "আমি বিবেচনা করি যে, দক্ষিণ চরের যে এক "অংশ খাস সাপুরী স্বরূপে গবর্ণমেণ্টের দখলে "আছে, যে বিষয় বাদীর সাক্ষিগণ অবশ্য "জ্ঞাত আছে, কিন্তু তাহারা একেবারেই জানে "না বলে,—তাহা বাদীর মোকদ্দমার অখণ্ড-"নীয় প্রতিবন্ধক। গবর্ণমেণ্ট কি প্রকারে এই "জমি প্রাপ্ত হন? ময়মনসিংহের কালেক্ট-"রের জওয়াব এই যে, ১৮৩৬ সালে খাস "সাপুরী খাস করিয়া লওয়া হয়, এবং তখন "গবর্ণমেণ্ট ২১০ বিঘা কয়েক কাঠা জমি লইয়া "অবশিষ্ট জমি সাপুরীর মালিককে ছাড়িয়া "দেন। এই হুকুম পরিপালনার্থে কালেক্ট-"রীর আমীন ১৮৫২ সালে এক নক্সা প্রস্তুত "করে, এবং ১৮৫৮ সালে ময়মনসিংহের "মাল সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণ পুনঃ এক বন্দো-"বস্ত করেন।"

"এ তারিখ অতি আবশ্যকীয়, কারণ, যদি "১৮৫৮ মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৬৫ সালে গবর্ণ-"মেণ্টের চর খাস সাপুরী বর্ত্তমান থাকিয়া "থাকে, তবে বাদীর এই কথা বিশ্বাস করা

"অসম্ভব যে, ১২৬৮ সালে নদী বিয়ারা পর্য্যন্ত "ভাঙ্গিয়া গিয়া তথায় দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্থির "থাকার পর ঐ চর পড়ে। ইহা বিশ্বাস করিতে "হইলে এই অনুমান করিতে হইবে যে, খাস "সাপুরী, সাপুরী, ছোট প্যারী এবং বড় প্যারী, "এসমস্ত মৌজা এক বৎসরে ভাঙ্গিয়া যায়—এ "অনুমান প্রমাণ ব্যতীত আমি গ্রহণ করিতে "পারি না; বিশেষতঃ, বাদীর সাক্ষিগণ এত বড় "চারি মৌজা একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবার কথা "বলে না, যদিও উপরোক্ত অনুমান গ্রহণ করিতে "হইলে তাহাই অবশ্য হইয়া থাকিবে; কিন্তু "তাহারা কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত নদী ক্রমে "ভাঙ্গিয়া আসিবার কথা বলে।"

"অতএব উল্লিখিত হেতুবাদে আমার মত "এই যে, উক্ত চরের কোন অংশ সম্বন্ধেই বাদীর "দাবী সপ্রমাণ হয় নাই।"

অতএব জজ বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদী এই আদালতে আপীল করে; এবং উভয় পক্ষের উকীল বাচনিক ও দলীল-ঘটিত প্রমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পর্য্যালোচনা এবং তর্কবিতর্ক করিয়াছেন

নথীস্থ প্রমাণ দৃষ্টে বোধ হয় যে, ১৮৫৩ সালে এবং তাহার পূর্ব্বে নদী এরূপ গতিতে প্রবাহিত হয় যাহার মধ্যে এক্ষণকার বিরোধীয় ভূমির পূর্ব্বাংশ পড়িয়াছিল। উক্ত জমির পূর্ব্বাবস্থার নক্সায় দেখান হইয়াছে যে, প্রতিবাদীর ছোট প্যারীর এক অংশ ঐ নদীর পূর্ব্ব ধারে ছিল। বিরোধীয় জমীর বর্ত্তমান পূর্ব্ব সীমা যে স্থান পূর্ব্বে নদীর গতির পশ্চিম সীমা ছিল, তাহার পূর্ব্বদিকে স্থিত। ১৮৫৩ সালের পূর্ব্বে নদী যে অবস্থায় ছিল তাহার প্রায় মধ্যস্থল, নদীর বর্ত্তমান গতির পশ্চিম সীমা।



১৮৫২ সালের নকসার সহিত ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসের থাকবস্তার নকসা ঐক্য করিলে, কখন্ সিকস্ত আরম্ভ হয় তাহা স্পষ্ট দেখা যায়।

১৮৫২ সালের এবং ১৮৫৩ সালের প্রারম্ভে নদীর পশ্চিম ধারে খাস সাপুরী নামে, মৌজা সাপুরীর সামিলে বাজেয়াপ্তী ১৩ খানা জমি গবর্ণমেণ্টের দখলে ছিল; এবং ১৮৫২ সালে বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে নকসা প্রস্তুত হয় এবং যাহা এই মোকদ্দমায় দাখিল হইয়াছে, তাহাতে খাস সাপুরীর চতুঃসীমা বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৫৩ সালের থাকবস্তার নকসায় প্রকাশ যে, নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইতেছিল, এবং সেই সময় খাস সাপুরীর সমুদায় জমি ভাঙ্গিয়া আসলী সাপুরীরও অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া যায়। ১৮৫৩ সালে নওদা প্যারীর যে থাকবস্তার নক্সা প্রস্তুত হয়, তাহাতে লেখা আছে যে, নদী অতি প্রবলরূপে মুন্সেফের এবং জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের কাছারী ভাঙ্গিয়া লইতেছে, সেই সময়ের ছোট প্যারীর থাকবস্তার নকসায় লেখা হয় যে,—"এই মৌজার ভিন্ন ভিন্ন পল্লী ৯০ একর জমি বিস্তীর্ণ; নদী, খাল, ও "বালুচড়া প্রায় ৪৫০ একর; ঝাউবন অনুমান "৬০ একর।"

প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে, অনুমান ২৫ বৎসর পূর্ব্বে যমুনাই নদী মৌজা বড় প্যারী এবং ছোট প্যারীর পূর্ব্বদিকে ছিল; এবং ২৩। ২৪ বৎসর হইল, এই দুই মৌজার স্থানে চর পড়ে। নদীর মধ্যস্থানে ঐ চর পড়ে। ইহাতেই ১৮৫২ সালের জানুয়ারির পূর্ব্বের নকসা সকলে উক্ত নদীর পূর্ব্বদিকে ছোট প্যারীর এক অংশ থাকিবার কারণ প্রকাশ পায়।

তাহারা বলে যে, এক সময়ে (যাহা তাহাদের কেহ কেহ ১৬। ১৭ বৎসর হইল বলে, এবং কেহ কেহ ১৩। ১৪ বৎসর হইল বলে) এই নদীর পশ্চিম তীরে ভাঙ্গন লাগিয়া মৌজা ছোট প্যারী এবং বড় প্যারীর অবশিষ্ট মৌজা ভাঙ্গিয়া নদী বিয়ারা গ্রাম পর্য্যন্ত আইসে। যাহা হউক, উক্ত সময় তালেশ্বর সরকারের সাক্ষ্য দ্বারা স্থির

হইয়াছে। ছোট প্যারী এবং বড় প্যারীর কেবল একবার থাক হয়, অর্থাৎ ভাঙ্গন আরম্ভ হইবার পরে, কিন্তু সমুদায় ভূমি ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্বে হয়।

প্রতিবাদীর সকল সাক্ষীই বলে যে, উক্ত ভূমি ক্রমে এক স্থান হইতে ভাঙ্গিয়া আর এক স্থানে পয়বস্ত হয়। দলু সরকার বলে যে, একদিকে যেমন ভাঙ্গিয়া যায় অপর দিকে অমনি চর পড়ে। অনেক সাক্ষী বলে যে, উল্লিখিত চরের সঙ্গে চর পড়ে। কিন্তু সকলেই এই কথা বলে যে, পূর্ব্বদিকে চর পড়িতে আরম্ভ হয়, এবং ভূমি ক্রমে পশ্চিমদিকে বাড়িয়া যায়। যে আমীন জজের আদেশ মতে উক্ত জমি জরিপ করে তাহার নকসা এবং রিপোর্ট হইতে যাহা প্রকাশ পায় তাহা এই সাক্ষিগণের এই বিষয় সম্বন্ধীয় বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য। উক্ত রিপোর্ট এবং নক্সা দৃষ্টে প্রকাশ যে, ঐ ভূমি অসমান এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে অধিক উচ্চ। আমরা এই নক্সায় দেখিতে পাই যে, এই ভূমির অবয়ব দৃষ্টে প্রকাশ যে, তাহা প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের বাক্যমতে অবশ্যই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বর্দ্ধিত হয়; বাদীর সাক্ষিগণের বর্ণনামতে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে চর পড়িয়া আইসে নাই।

তালেশ্বর সাক্ষী, যাহার আর এক বিষয় সম্বন্ধে সত্যনিষ্ঠতা আমরা ১৮৫৩ সালের এপ্রিলের নকসা দৃষ্টে পরীক্ষা করিয়াছি, সে বলে যে, সাপুরী ছোটপ্যারীর পূর্ব্বে ভাঙ্গিয়া যায়; তাহার চর পড়িতে দুই তিন বৎসর লাগিয়াছিল। আর আর সাক্ষিগণ বলে, সাপুরী এবং ছোট প্যারী এক বৎসরের মধ্যেই ভাঙ্গিয়াছিল, এবং এক সময়েই পুনঃ চর পড়িয়াছিল।

প্রতিবাদীর সাক্ষী বাবাজী মৃধা খাঁ বলে, ঐ চর নদীর মধ্যস্থলে পড়ে। তাহার চতুর্দ্দিকে নদী ছিল। কেহই তাহা হাঁটিয়া পার হইতে পারিত না; প্রতিবাদিগণ তাহা সিকস্ত পয়-বস্ত বলিয়া দখল করে। খাস সাপুরী ছোট প্যারী এবং বড় প্যারীর এক সঙ্গেই চর পড়ে। চর পড়া অবধি ।৶০ আনার জমিদারেরা (কেনিড়ি এবং এনাএত উল্লা) এবং ইজারদার দখীলকার ছিল। গবর্ণমেণ্ট খাস সাপুরী বারী সাহেবকে ইজারা দিয়া দখীলকার আছেন। সে বলে, তাহার বাটী পূর্ব্বের ছোট প্যারীতে ছিল; তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে সে নূতন পয়বস্তী জমিতে বাড়ী করে।

বিরোধীয় জমিতে ন্যূনাধিক ১২৫ ঘর প্রজা আছে। কয়েক জন প্রজা বলে, তাহারা ১৬।১৭ বৎসর ঐ চরে বাস করিতেছে; আর আর সকলে বলে তাহারা ১৫।১৬ বৎসর বাস করিতেছে।

প্রতিবাদীর প্রমাণ আমাদের বিবেচনায়, বিশ্বাস-যোগ্য, এবং তাহা আবশ্যকীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে নকসা এবং অন্যান্য দলীল-ঘটিত প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, বাদীর সাক্ষিগণের প্রমাণ অত্যন্ত অসন্তোষকর। বাদীর কথা এই যে, নদী ১৮৬১ সালে পূর্ব্বদিকে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করে; বিরোধীয় ভূমি ক্রমে পয়বস্ত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং ১৮৬৪ সালে চাসের যোগ্য হয়।

তাহার সাক্ষিগণের প্রমাণ যারপর নাই অনি-শ্চিত। উক্ত চর যাহা বাদীর কথা মতে অতি অল্প দিন হইল পড়িয়াছে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন তারিখ তাহারা বলে। কেহ বলে, ৫।৬ বৎসর হইল; কেহ বলে ৭।৮ বৎসর হইল। কেহ কেহ বলে ৮।৯ বৎসর হইল। এই সকল সাক্ষী যে সময়ের কথা বলে, তখন কোন বৃহৎ ভূমি সিকস্ত বা পয়বস্ত হওয়ার কিছু মাত্র দলীল ঘটিত প্রমাণ নাই। তাহাদের প্রমাণের তুলনা প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের প্রমাণের সহিত হইতে পারে না, এবং ভূমির বর্ত্তমান আকার-প্রকার ও নক্সা হইতে যে অনুমান হয়, ঐ প্রমাণ তাহারও বিরুদ্ধ। পয়বস্তী খাস সাপুরীর মালিক স্বরূপে গবর্ণমেণ্টের, এবং বিরোধীয় ভূমির মালিক স্বরূপে প্রতিবাদিগণের ইজারদার ও প্রজা-দিগের বহুকাল দখলের স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা বাদীর প্রমাণ প্রবল রূপে খণ্ডিত হইয়াছে।

আমার বিবেচনায় ইহা স্পষ্ট এবং সন্তোষকর রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বিরোধীয় জমি বাদিগণের কথিত মতে ১৮৬১ সালে বা তাহার পরে পয়বস্ত হয় নাই, কিন্তু ১৮৫৩ সালে নদীর পশ্চিম পার ভাঙ্গিবার কিছু কাল পরেই তাহা পয়বস্ত হয়; এবং উক্ত নদীতে যে সকল চর পড়ে তাহা চাসের যোগ্য হইবামাত্রেই প্রতিবাদিগণ এবং তাহাদের ইজারদার ও প্রজাগণ দখল করিয়া ভোগ করে।

বর্ত্তমান মোকদ্দমা ১৮৬৭ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর তারিখে উপস্থিত হয়।

বাদী তর্ক করে যে, উক্ত জমি বহতী নদীতে দ্বীপের স্বরূপে উৎপন্ন হওয়ায়, এবং যে দামুস বা কোল্ বিরোধীয় ভূমি মৌজা বিয়ারা হইতে পৃথক্ করে, তাহা গত কয়েক সনের মধ্যে হাটিয়া পার হওনের যোগ্য হওয়ায়, যে সময়ে উক্ত দামুস ঐ রূপ পার হওয়ার যোগ্য হয়, সেই সময় হইতে উক্ত জমি মৌজা বিয়ারার সামিল বিবেচিত হইবে।

ইহার অনেক উত্তর আছে। প্রথমতঃ, বাদী তাহার নালিশের আরজীতে ঐ কথা বলে না। সে এ কথা বলে না যে, বিরোধীয় ভূমি প্রথমতঃ ঐ নদীতে দ্বীপ স্বরূপে উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত দ্বীপ এবং নদীর তটের মধ্যে যে সোঁতা ছিল তাহা পশ্চাতে হাঁটিয়া পার হওয়ার যোগ্য হওয়ায় সে ৩ প্রকরণের বিধান মতে তাহার তালুকের সংলগ্ন বলিয়া ঐ জমিতে স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। সে এই বলে যে, বিরোধীয় ভূমি মৌজা বিয়ারার সিকস্তীর পয়বস্তী জমি, ঐ মৌজার আসলী জমির লখ্ত পয়বস্ত হইয়াছে, এবং ইহা ১৮২৫ সালের ১১ কানুনের ৪ ধারার ১ প্রকরণের বিধানান্তর্গত। অতএব বাদী যে স্বত্বের বলে আদালতে উপস্থিত হয় তাহা সে একেবারেই সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। দ্বিতীয়তঃ, এখনও বিয়ারার ভাটীতে কেবল একটি মাত্র স্থানে ঐ দামুস যে হাটিয়া পার হওয়া যায়, তাহার অনেক প্রমাণ আছে, এবং তদ্বিপরীত কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু উক্ত বিষয় সম্পূর্ণ বিচারিত না হওয়ায়, আমি বাদীর মোকদ্দমার এই বিষয় সম্বন্ধে তাহার প্রমাণের ত্রুটির উপরে আমার রায় স্থাপন করিতেছি না।

জজ এই এক ইসু করেন যে, মোকদ্দমা তমাদী দ্বারা বারিত কি না; এবং আমি নিশ্চয়ই বোধ করি যে, আমি যদি উক্ত হেতুবাদে নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইতাম, তবে আমি বলিতে পারিতাম যে, বাদী ইহা সপ্রমাণ করে নাই যে, যখন প্রতিবাদিগণ, ও তাহাদের ইজারদার ও প্রজাগণ বিরোধীয় জমি বা ঐ সকল ভূমির পূর্ব্ব দিকের অংশ যাহার সহিত আর সমুদায় পরে পয়বস্ত হয়, দখল করে, সেই সময় হইতে ১২ বৎসরের মধ্যে বাদী যাহার নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৫৩ সালের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ নালিশ উপস্থিতের ১৪ বৎসর ৮ মাস পূর্ব্বে, বড় ভাঙ্গন লাগিয়াছিল। সপ্রমাণ হইয়াছে যে, নদীর পশ্চিম পারের জমি ভাঙ্গিবার সময়েই পূর্ব্ব দিকে চর পড়িতে থাকে, তাহা স্পষ্টই দ্বীপাকার ধারণ করে, এবং ছোট প্যারীর পূর্ব্ব জমিতে প্রজাগণের যে বাটী ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তাহারা তখনই গিয়া উক্ত দ্বীপে বাস করে।

বাদী তর্ক করে যে, উক্ত জমি দ্বীপ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছিল অনুমান করিলেও, যখন উক্ত দ্বীপ এবং তাহার জমির মধ্যের সোঁতা হাটিয়া পার হওয়ার যোগ্য হয়, তখনই তাহার নালিশের স্বত্ব জন্মিয়াছিল, অতএব সে তমাদী দ্বারা বারিত নহে।

উক্ত তর্ক সমূলক হইলে, এই অসম্ভব ফল হইবে যে, যে জমি প্রথমতঃ দ্বীপ স্বরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা ২০। ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ দখল ও চাস আবাদ হইলেও তাহার ও নদীর তটের মধ্যস্থ সোঁতা শুষ্ক হইয়া গেলে উক্ত দ্বীপের দখীলকারের স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে, এবং নদীর ঐ তটের মালিকের দখলের এমত স্বত্ব হইবে যাহা উক্ত সোঁতা শুষ্ক হওনাবধি ১২ বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সে নালিশ উপস্থিত করিয়া

প্রবল করিতে পারিবে। আমরা আপেলাণ্টের কৌন্সেলকে এই ফল দর্শাইয়াছি, এবং তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহার তর্কের ঐ ফলই হইবে। আমার বিবেচনায়, প্রকৃত নিয়ম এই যে, যে ভূমি ক্রমশঃ পয়বস্ত বা সিকস্তপয়বস্ত অথবা কোন নদীতে বা সমুদ্রে জজিরা স্বরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহা আদৌ যে সময়ে পয়বস্ত বা উৎপন্ন হয় বা উৎক্ষিপ্ত হইয়া সম্পত্তি স্বরূপ এবং চাস ও দখলের যোগ্য হয়, সেই সময়ে তাহার কি অবস্থা ছিল তাহার তদন্ত করিয়া ঐ ভূমিতে দখলের স্বত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। রোমীয় আইনের সারসংগ্রহের ১২ অধ্যায়ের ২৬ ও ৩০ এবং ৩৮ ধারায় ইহার উত্তম উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রথম দখীলকারের কোন প্রকারের স্বত্ব অবশ্যই হইবে। উক্ত ভূমি উৎপন্ন হইয়া চাসের যোগ্য হইবার পর যদি কেহ তাহা দখল করিয়া ভোগ করে, তবে তাহার দখল অন্ততঃ অন্য কাহারও দখলের বিরুদ্ধ হইবে।

যে স্বত্ব একবার উৎপন্ন হয় তাহা যে ভূমি সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়, তাহার নিকটবর্ত্তী ভূমির অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারা ঐ স্বত্ব কি প্রকারে বিলুপ্ত হইতে পারে, তাহা বুঝা সুকঠিন; অতএব এই বোধ হইবে যে, যদি উক্ত ভূমি বহতী নদীর মধ্যে দ্বীপ স্বরূপ উৎপন্ন হইয়া সম্পত্তি রূপে পরিণত হয়, তবে তাহার এবং নদীর তটের মধ্যস্থিত সোঁতা পরে শুষ্ক হইলে, তাহা দ্বীপ স্বরূপ থাকিবার সময়ে কোন ব্যক্তির তাহাতে যে সম্পত্তি বা দখলের স্বত্ব ছিল তাহার ধ্বংস হয় না। যখন তাহা দ্বীপ স্বরূপ ছিল, তখন গবর্ণমেণ্টের অধীনেই থাকিবার বিষয় অনুমান করিতে হইবে। তাহা কেহ দখল করিয়া চাস করিলে তাহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব হইতে পারে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অন্য লোকের বিরুদ্ধে তাহার দখল সঙ্গত হয় এবং স্বত্ব জন্মে। নদীর তট এবং দ্বীপের মধ্যস্থিত সোঁতা পরে শুষ্ক হইলে, গবর্ণমেণ্ট বা আর যে ব্যক্তি তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব দেখাইতে পারে তদ্ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার দখল করিবার স্বত্বের ব্যাঘাত হয় না। ১৮২৫ সালের ১১ কানুনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণে এমন কিছু নাই যাহা এই মর্ম্মের বিরুদ্ধ। কোন নদীতে যে দ্বীপ উৎপন্ন হয়, যাহা ভোগ বা চাষের যোগ্য অর্থাৎ সম্পত্তি স্বরূপ হইবার সময়ে তাহার নিকটবর্ত্তী ভূমি হইতে গভীর সোঁতা দ্বারা পৃথক্ থাকে, তাহার বিষয়ে উক্ত প্রকরণে এতদ্ভিন্ন আর কোন বিধান নাই যে, উক্ত দ্বীপ গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি তাহাতে কোন দাবী না করেন, তবে তাহা ৪ ধারার ৫ প্রকরণের অন্তর্গত হইবে; তাহাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, অন্যান্য যাবতীয় স্থলে, অর্থাৎ "নদী বা "সমুদ্র সরিয়া যাওয়ায় বা পয়বস্তী দ্বারা যে "ভূমি উৎপন্ন হয় এবং যাহার বিষয়ে এই "কানুনে কোন বিশেষ বিধান করা হইল না, "তৎসম্বন্ধে বিবাদ বা দাবী হইলে, আদালত "উক্ত দাবী বা বিবাদের মীমাংসা করিতে, "তাহাতে কোন স্থানীয় প্রথা প্রয়োগ হইলে "ঐ স্থানীয় প্রচলিত প্রথা সম্বন্ধে যে উৎকৃষ্ট "প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে তদনুসারে চলিবেন, "নচেৎ ন্যায়পরতা ও সুবিচারের সাধারণ যুক্তি "অনুসারে চলিবেন।"

১৮৪৭ সালের ৯ আইনমতে গবর্ণমেণ্টের দখলের দাবী করার স্বত্ব পুনর্ব্বার জরিপের সময় পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে। কিন্তু দখীলকার এবং গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির মধ্যে কোন বিরোধে ঐ আইন কি প্রকারে প্রয়োগ হয় তাহা বুঝা কঠিন।

৩ য় বাল্যম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত ওয়াইজ বনাম আমীরুন্নিসা খাতুনের মোকদ্দমায় যে এই নিয়ম সংস্থাপিত হওয়ার বিষয় অনুমিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট দাবীদার না হইলে অন্য বিরুদ্ধ দাবীদারগণের মধ্যে

বিরোধের মীমাংসা করিতে জমির পুনর্ব্বার জরিপের সময়ের অবস্থা দেখিতে হইবে, আমি তাহাতে সম্মতি দিতে পারিলাম না।

উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হইতে পারে, এমত কোন বিশেষ স্থানীয় প্রথার প্রমাণ নাই।

প্রতিবাদীর মোকদ্দমা যে রূপ সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা এই, যথা, তাহার যে সকল মৌজা ভাঙ্গিয়া যায় তাহার স্থানে ১৪ বৎসরের অধিক কাল গত হইল পুনরায় এক চর পড়ে। ঐ রূপ চর পড়িবার পরেই সে তাহা দখল করে, এবং তখন গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর কেহ ছিল না যে, তাহার দাবীর প্রতি আপত্তি করিতে পারিত; এবং ঐ সময়ে তাহার ছোট প্যারী মৌজার অবশিষ্ট ভূমিই ঐ চরের সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক সংলগ্ন ছিল। যে চর ঐ রূপ দখলীকৃত হয় তাহা বহুকাল পরে, প্রতিবাদীর ছোট প্যারীর অবশিষ্ট জমি ক্রমে ভাঙ্গিয়া গিয়া এবং (বাদীর কথা মানিয়া লইলে এবং উপস্থিত তর্কের নিমিত্ত আমি তাহা মানিয়া লইলাম) ঐ চরের এবং বাদীর বিয়ারা নামক তালুকের মধ্যস্থিত সোঁতা ভরট হইয়া, বাদীর জমির নিকটবর্ত্তী হয়।

এই দুই দাবীদারের মধ্যে ন্যায়পরতা এবং সুবিচারের সাধারণ যুক্তি অনুসারে আমি অনায়াসে বলিতে পারি যে, প্রতিবাদীই বিরোধীয় চরের জমি পাইতে স্বত্ববান।

অতএব এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমিও এই আপীল ডিস্‌মিস্ করণে সম্মত হইলাম। বাদী আদালতে যে দাবী উপস্থিত করে তাহা সে একেবারে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই; এবং আমি বোধ করি না যে, সে এক্ষণে ১৮২৫ সালের ১১ কানুনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণের উপর তাহার দাবী স্থাপন করিতে পারে। এ বিষয়ে কোন ইসু হয় নাই এবং কোন প্রমাণও দেওয়া হয় নাই। আমি এ বিষয়ে কোন মত দিলাম না। (ব)

২৩ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৪৩ নং মোকদ্দমা।

পূর্ণিয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা সেপটেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

রাণী খেজুরন্নেছা (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

রাণী রুইছন্নেছা বেগম (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জে ডবলিউ বি মণি বারিষ্টর ও আর টি এলেন, আর ই টুইডেল ও মুন্সী আমীর আলী আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি গ্রেগরি রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—শরা অনুসারে, মাজ্জীল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয় যৌতুক না দিলে স্বামী বিবাহের ফল সম্পূর্ণ করিতে স্বত্ববান হইতে পারেন না।

যৌতুকের দাবী সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন খাটে, কারণ, শরাতে যৌতুক ঋণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

তৎক্ষণাৎ দেয় যৌতুক সম্বন্ধে প্রিবি কৌন্সিল যে বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন যে, স্ত্রী পূর্ব্বে যৌতুকের দাবী না করিলেও নালিশ করিতে পারে, এবং সে তৎক্ষণাৎ অথবা তাহার স্বামীর জীবদ্দশায় নালিশ করিতে বাধ্য নহে, এই বিধি এমত স্ত্রীর মোকদ্দমায় খাটে না, যে স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত বহুকাল পৃথক্ থাকার পরে এবং পুনঃমিলিত হওয়ার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ার পরে প্রকাশ্যরূপে তাহার যৌতুকের দাবী করে। যে স্ত্রী এই প্রকার দাবী করে, অপর ব্যক্তির লিখিত চুক্তি পরিচালন করিতে আইনমতে যে সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে বাধ্য, সেই স্ত্রীরও সেই সময়ের মধ্যেই তাহার নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে।

কোন স্ত্রীর যৌতুকের জন্য তাহার স্বামীর নামে পাপর সূত্রে নালিশ করার অনুমতি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত শুদ্ধ নোটিস বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে; তাহা প্রকাশ্য কাছারীতে স্পষ্ট দাবী করার ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে,' এবং স্বামী তৎকালে ঐ দাবী পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিলে তাহাই স্ত্রীর নালিশের হেতু বিবেচনা

করিতে হইবে, এবং সেই অস্বীকারের তারিখ হইতেই ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণমতে তমাদীর কাল গণিত হইবে।

বিচারপতি লক।—যৌতুকের জন্য এই নালিশ হইয়াছে। বাদিনী রাণী রুইছন্নেছার সহিত পূর্ণিয়া সহরে হিজরী ১২৫৪ সালের ৮ ই রবিওছ্ছানী (মোতাবেক মুলকী ১২৪৬ সালের ১৮ ই আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৩৮ সালের ১ লা জুলাই) তারিখে রাজা এনাএত হোসেনের বিবাহ হয়; এবং বাদিনী কহে যে, সেই তারিখে এবং বিবাহের সময়ে তাহার স্বামী রাজা এনাএত হোসেন তাহাকে এক লক্ষ টাকার এক কাবিন-নামা অর্থাৎ যৌতুক-পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। ঐ দলীলে উক্ত যৌতুকের চতুর্থাংশ মাজ্জীল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয়, বলিয়া এবং বাকী মওয়াজ্জীল অর্থাৎ পশ্চাতে দেয় বলিয়া লেখা ছিল। বাদিনী কহে যে, মুলকী ১২৭৫ সালের ১৫ ই ভাদ্র মোতাবেক ১৮৬৭ সালের ৩০ এ আগষ্ট তারিখে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয় এবং সেই তারিখে তাহার যৌতুক পাওয়ার নালিশের হেতু উপস্থিত হয় এবং তাহার স্বামীর জীবদ্দশায় নানা সময়ে সে তাহার মাজ্জীল যৌতুকের মধ্যে তাহার স্বামীর নিকট ২০০০ টাকা পাইয়াছে, অতএব তাহার স্বামীর সম্পত্তির ষোল আনার ৵০ আনা ভাগ যাহাতে সে স্বামীর এক জন দায়াধিকারিণী সূত্রে শরামতে স্বত্ববতী তাহা বাদে, উক্ত উভয় প্রকার যৌতুকের অবশিষ্ট সমুদায় টাকা পাওয়ার জন্য সে নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

প্রধান প্রতিবাদিনী রাণী খেজুরন্নেছা যিনি রাজা এনাএত হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রী এবং যিনি নিজের পক্ষে এবং তাঁহার নাবালগ পুত্র সৈয়দ আতা হোসেনের পক্ষে এই আপীল উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহার প্রধান জওয়াব এই যে—

১ ম, যৌতুকের দাবীতে তমাদী ঘটিয়াছে, কারণ, বাদিনী যখন এই নালিশের ২২ বৎসর পূর্ব্বে তাহার স্বামীর সহিত পৃথক্ হইয়াছিল, তখনই তাহার ঐ যৌতুকের জন্য নালিশের হেতু উত্থিত হয়।

২ য়। মাজ্জীল যৌতুকের দাবীতেও তমাদী ঘটিয়াছে, কারণ, বাদিনী আইনের লিখিত সময়ের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করে নাই।

৩ য়। তাহার মওয়াজ্জীল যৌতুকের দাবীতেও তমাদী ঘটিয়াছে, কারণ, তাহার পাপরের দাবী যখন ১৮৬২ সালের ২৭ এ জানুয়ারি তারিখে অগ্রাহ্য হয় সেই তারিখের পরে ছয় বৎসরের মধ্যে তাহার নালিশ উপস্থিত হয় নাই।

৪ র্থ। তাহার নালিশে তমাদী হইয়াছে, কারণ, রাজার বিরুদ্ধে সে যে খোরাকীর দাবী করিয়াছিল তাহা যে তারিখে মাজিষ্ট্রেট অগ্রাহ্য করেন এবং সেই হুকুম সেশন জজ স্থির রাখেন, সেই তারিখ হইতে আইনের লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার নালিশ উপস্থিত হয় নাই।

৫ ম। তাহার কেবল ৫০০০ টাকা যৌতুক ছিল, এবং সে তাহার অধিক টাকা পাইয়াছে।

৬ ষ্ঠ। রাজা এনাএত হোসেন বাদিনীর অনুকূলে কোন কাবিন-নামা লিখিয়া দেন নাই, এবং বাদিনী যে কাবিননামা দাখিল করিয়াছে তাহা কৃত্রিম।

অধঃস্থ জজ অতি সাবধানে প্রমাণের বিচার করিয়া তমাদীর আপত্তি অগ্রাহ্য করত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদিনীর কাবিননামা অকৃত্রিম; অতএব তিনি তাহাকে খরচা সমেত ডিক্রী দেন।

প্রতিবাদিগণের মধ্যে কেবল রাণী খেজুরন্নেছা এই আদালতে আপীল করিয়াছে।

আপীলের হেতু এই যে—

১ ম, মাজ্জীল যৌতুকের দাবী তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে।

২ য়, মওয়াজ্জীল যৌতুকের দাবীও তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে।

৩ য়, বাদিনী যে কাবিননামা দাখিল করিয়াছে এবং যাহার উপরে সে নির্ভর করে তাহা জাল দলীল, এবং তাহা রাজা এনাএত হোসেন কখন স্বাক্ষর করেন নাই।

রাজা এনাএত হোসেনের সহিত বাদিনীর বিবাহ হওয়ার কথা অস্বীকৃত নহে। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, সে মুলকী ১২৫৯ মোতাবেক ১৮৫১ সালে তাহার স্বামীর সহিত পৃথক্ হইয়াছিল, এবং যদিও দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইয়াছিল না, তথাপি তাহার স্বামীর যখন ১৮৬৭ সালে মৃত্যু হয় তখন সে তাহা হইতে পৃথক্ বাস করিতেছিল। রাজা এনাএত হোসেনের মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই।

আপীলের হেতু সমস্ত যে প্রণালী মতে উপরে লিখিত হইল আমরা তদনুসারেই তাহার বিচার করিব, এবং প্রথমে মাজ্জীল যৌতুকের দাবীর বিচার করিব।

কাবিন-নামার সর্ত্তে দেখা যাইতেছে যে, যৌতুকের চতুর্থাংশ বিবাহের সময়ে অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয় ছিল। শরা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সমস্তের মধ্যে, হেদায়ার ১ ম বালম, ১৫০ পৃষ্ঠায়, ১৭৯১ সালের সংস্করণে, দেখা যাইতেছে যে, কেবল মাজ্জীল যৌতুক প্রদান করিলেই স্বামী বিবাহ সম্পূর্ণ করিতে স্বত্ববান হইতে পারে, এবং তাহা যে পর্য্যন্ত প্রদত্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রী তাহার স্বামীকে তাহার সহিত সহবাস করিতে দিতে অস্বীকার করিতে পারে, এবং যদি সে সহবাসও করে, অথবা তাহার সহিত এককালে নির্জ্জনে থাকিয়া থাকে, তথাপি সে সমুদায় মাজ্জীল যৌতুক পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে। ম্যাক্‌নাটন, শরার সারসংগ্রহের বিবাহের অধ্যায়ের ২০ বিধিতে কহিয়াছেন যে, "যৌতুক বিবাহের "চুক্তির আবশ্যকীয় অঙ্গ; যৌতুকের সর্ব্বোচ্চ "পরিমাণ কি তাহা স্থির নাই, কিন্তু তাহা "১০ দ্রামের ন্যূন হইবে না, এবং বিবাহ সম্পূর্ণ, "অথবা স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কাহারও মৃত্যু "অথবা দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হইলেই "তাহা প্রাপ্য হয় (কিন্তু তাহার কোন অংশ "বিলম্বে দেওয়ার চুক্তি করার প্রথা আছে)।" বেলির সারসংগ্রহের ১২৪ পৃষ্ঠায়, হানিফিয়ার, (এই বিষয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই) ঠিক ঐ মতই লেখা আছে যে, "যৌতুকের যে অংশ মাজ্জীল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ "দেয়, তাহা পাওয়ার উপায়ের জন্য স্ত্রী "তাহার স্বামীকে আপনার নিকট আসিতে দিতে "অস্বীকার করিতে পারে, এবং স্বামী যে পর্য্যন্ত "ঐ টাকা না দেয়, সে পর্য্যন্ত তাহার স্ত্রীকে "বাটীর বাহিরে যাইতে অথবা ভ্রমণ করিতে "অথবা তীর্থপর্য্যটনে গমন করিতে বারণ "করিতে পারে না।" অপিচ, ১২৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, "যখন ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, "যৌতুকের এত অংশ মাজ্জীল, তখন সেই "অংশ তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে হইবে। * * * "কিন্তু যদি এমন সর্ত্ত থাকে যে, সমুদায় যৌতু- "কই মাজ্জীল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয় হইবে, তবে "তাহার বিরুদ্ধ প্রথা থাকিলেও তাহা তৎক্ষণাৎ "দিতে হইবে।" অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপরে উদ্ধৃত বাক্য গুলি অনুসারে, মাজ্জীল যৌতুক দেওয়ার বিলম্বের কোন সর্ত্ত ও করার না থাকিলে, তাহা বিবাহের কালেই প্রাপ্য হয়। এবং তখনই তাহা দিতে হয়।

আপেলাণ্টের পক্ষে মেং মণি উচিত রূপেই আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, মৌলবীরা শরার যে রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ম্যাক্‌নাটনের গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইয়াছে। ঋণ বা যৌতুক অথবা অন্য কোন দাবী সম্বন্ধে শরায় তমাদীর বিধান নাই। ১৭৯৩ সালের কানুন সমস্ত এবং ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের দ্বারা তমাদীর যে বিধি প্রচারিত হয় তাহা সচরাচর ঋণ সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে, অতএব যৌতুক যাহা শরার ঋণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে তাহাতে কেন ঐ আইন খাটিবে না, তাহার কোন কারণ নাই। অতএব আপেলাণ্টের পক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, যেহেতু মাজ্জীল যৌতুক বিবাহের তারিখেই দেয় হইয়াছিল, সুতরাং তাহার টাকা আদায় করার

জন্য ১৭৯৩ সালের কানুন মতে সেই তারিখের পরে ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু যদি আদালত, উইকলি রিপোর্টরের ফাঁক নম্বরের ২৫২ পৃষ্ঠায় জমীলার ও ৬ ষ্ঠ বালম মুয়রের ২১১ পৃষ্ঠার আমিরুন্নেছার মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি দৃষ্টে, বিবেচনা করেন যে, যেহেতু কোন দাবী করা হয় নাই, অতএব বিবাহের তারিখ হইতে তমাদী চলিবে না; তাহা হইলে, যখন ১৮৬১ সালে বাদিনী কাবিননামার উপরে যৌতুকের জন্য তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে পাপরে নালিশ করার দরখাস্ত করিয়াছিল, তখনই তাহার স্পষ্ট দাবী করা হইয়াছিল। তাহার স্বামী ঐ দাবী এবং কাবিননামা দস্তখত করার কথা অস্বীকার করেন, এবং বাদিনীর দরখাস্ত ১৮৬২ সালের ২৭ এ জানুয়ারি তারিখে অগ্রাহ্য হয়।

তৎক্ষণাৎ দেয় যৌতুকের দাবী সম্বন্ধে তমাদীর আইন খাটে বলিয়া সিলেক্ট রিপোর্ট হইতে দুই নজীর প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম নজীর অর্থাৎ মীর নজীবুল্লার মোকদ্দমা ১ম বালম সিলেক্ট রিপোর্টের ১০৩ পৃষ্ঠায় আছে। যে সকল বিচারপতি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, তাঁহারা বলেন যে, "যৌতুকের দলীল সম্বন্ধে "নির্দ্দিষ্ট হয় যে, যৌতুকের তিন ভাগের দুই "ভাগ যাহা দাম্পত্যাবস্থায় দেয় ছিল না, অর্থাৎ "যাহা স্বামীর মৃত্যু হইলে দেয় হইত, তাহার "সম্বন্ধে তমাদীর কানুনের বিধি খাটে না, কারণ, "নালিশ আরম্ভের কালে স্বামীর মৃত্যুর পরে "১২ বৎসর অতীত হয় নাই। কিন্তু বাকী তৃতীয়াংশ "'যাহা, দাবী করা মাত্রেই দেয়' হইবে বলিয়া "বর্ণিত হইয়াছে তাহা ঐ কানুনের দ্বারা বারিত "বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কারণ যে তারিখে তাহা "প্রাপ্য হয় তাহার পরে কোন দাবী উপস্থিত "না হইয়া অতি দীর্ঘকাল (প্রায় ৪০ বৎসর) "অতীত হইয়া গিয়াছে।" ঐ মোকদ্দমা অনেক প্রকারে উপস্থিত মোকদ্দমার অনুরূপ। সেই মোকদ্দমায় স্বামী তাহার স্ত্রীকে ৫০০০ মোহর (৪০০০০ টাকা) যৌতুক দেওয়ার বন্দোবস্ত করে; তাহার তৃতীয়াংশ মাজ্জীল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয় ছিল, এবং বাকী অংশ দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকার কালে দেয় ছিল না। কাজীরা ব্যবস্থা দেন যে, "শরা অনুসারে যৌতুকের দাবী কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীমাবদ্ধ নাই, এবং যে ভাগ দাবী করা মাত্রেই দেয় হয় এবং যে ভাগ দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকা পর্য্যন্ত দেয় হয় না, ঐ দুই ভাগই স্বামীর সম্পত্তি হইতে আদায় হইতে পারে।" এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিচারপতিগণ নির্দ্দেশ করেন যে, মাজ্জীল যৌতুকের দাবীতে তমাদী ঘটিয়াছে, কারণ, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন দাবী করা হয় নাই।

দ্বিতীয় নজীর অর্থাৎ নুরন্নেছা বেগম আপেলাণ্টের মোকদ্দমা, ৭ম বালম সিলেক্ট রিপোর্টের ৪০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ১ম বালমের নিষ্পত্তিরই অনুগামী। এই মোকদ্দমায় স্বামী জীবিত ছিল, এবং স্ত্রীর মাজ্জীল যৌতুকের দাবী তমাদী আইনের দ্বারা বারিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ, নির্দ্দিষ্ট হয় যে, স্বামীর মৃত্যু অথবা দাম্পত্য সম্বন্ধ রহিত না হইলে যে যৌতুক দেয় হয় না, তাহার জন্য ঐ সময়ে দাবী হইতে পারে না। এই মোকদ্দমায় দুই পক্ষই পৃথক্ পৃথক্ বাস করিতেছিল বটে, কিন্তু দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিত্যক্ত হওয়ার কোন প্রমাণ ছিল না; অতএব সেই আপীল ডিস্মিস্ হয়।

এইক্ষণে আমরা মুয়রের ভারতবর্ষীয় আপীলের ৬ বালমের ২১১ পৃষ্ঠায় প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পন্ন আমীরন্নেছার মোকদ্দমার প্রতি দৃষ্টি করিব। এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদিনী মোরাদন্নেছা তাহার স্বামী সৈয়দ মুস্তাফার সম্পত্তি হইতে ৪১০০০ টাকার যৌতুকের দাবী করে। ঐ মোকদ্দমায় বাদী সৈয়দ আবদুল্লা যিনি আইনসঙ্গত দায়াধিকারী ছিলেন, তিনি কহেন যে,

তাঁহার ভ্রাতা মুস্তাফার সহিত মোরাদন্নেছার কখন বিবাহ হয় নাই, এবং তিনি আরও তর্ক করেন যে, মোরাদন্নেছা যে কাবিন-নামা উপস্থাপন করিয়াছে, তদ্দ্বারা এমত এক ঋণ সংস্থাপিত হইয়াছে, যাহা তৎক্ষণাৎ দাবী করা যাইতে এবং আদায় হইতে পারিত। অতএব ঐ দাবীতে ১৭৯৩ সালের ৩ কানুনের ১৪ ধারা অনুসারে তমাদী হইয়াছে, কারণ, কথিত বিবাহের পরে ১২ বৎসরের অধিক কাল গত হইয়া গিয়াছে। এই আপীলের নিষ্পত্তি করিতে প্রিবি কৌন্সিলের লর্ডগণ ঐ ধারার শেষোক্ত বাক্যগুলির উল্লেখ করিয়া কহিয়াছেন যে, "ঐ শেষ ভাগ অবলম্বন "করিয়া এই মোকদ্দমার বিচার করা যাইতে "পারে; এবং উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট হেতু থাকিতে "পারে, কিন্তু লর্ডগণ সেই হেতুবাদে নিষ্পত্তি "করিতে চাহেন না।" দলীলে লেখা আছে যে, "যখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী দাবী করিবে।" তাহার পরে, যে সকল ঋণ দাবী করিলে দেয় হইবে, এবং যে সকল ঋণ দাবী করিলে দেয় হওয়ার কোন সর্ত্ত না থাকিলে তৎক্ষণাৎ দেয় হয়, তাহার উল্লেখ করিয়া এবং ইংলণ্ডীয় আদালতে কতিপয় মোকদ্দমায় যে বিধি হইয়াছে যে, প্রকাশ্য দাবী না করিলে নালিশ চলিতে পারে না, তাহার উল্লেখ করিয়া লর্ডগণ বলিয়াছেন যে, "এই স্থলে দাবী করার কোন আব- "শ্যক ছিল না। স্বামী তাহার স্ত্রীর বরাবর "যে কাবিন-নামা লিখিয়া দেয় তাহাতে, এবং "পক্ষগণের যে মনস্থ ছিল, তদ্দ্বারা স্ত্রীকে ৪৬০০০ "টাকা যৌতুক দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল, এবং "ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, এই প্রকার "দলীলের উপরে স্ত্রীর যদি স্বামীর নামে নালিশ "করিতে হয়, তবে কত দূর অসুবিধা ঘটে; "তাহা হইলে দাম্পত্য সুখের সমূহ ব্যাঘাত "হয়; অতএব এই দলীলের প্রকৃত ব্যাখ্যার উপরে "আমরা বিবেচনা করি যে, পূর্ব্বে দাবী না "করিলেও স্ত্রীর নালিশের স্বত্ব ছিল, এবং "তৎক্ষণাৎ অথবা স্বামীর জীবদ্দশায় স্ত্রী তাহার "স্বামীর নামে নালিশ করিতে বাধ্য ছিল না। "লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, ঐ কানুনের দ্বারা "তাহার দাবীতে তমাদী ঘটে নাই, অতএব "ঐ জওয়াব অকর্ম্মণ্য।"

মেং মণি তর্ক করেন যে, এই মোকদ্দমায় কাবিন-নামার লিখিত "যখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী দাবী করিবে," এই বিশেষ বাক্যের উপরে লর্ডগণের রায় নির্ভর করে। ঐ মোকদ্দমায় দাবী করার কথা ছিল, অতএব দাবী করার তারিখ হইতে নালিশের স্বত্ব উত্থিত হইবে; কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় কেবল "মাজ্জীল" ও মওয়াজ্জীল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং মাজ্জীল যৌতুক তদণ্ডেই দেয় ছিল। উহা এমত খতের ন্যায় নহে, যাহাতে লেখা থাকে যে, "দাবী করার মাত্রেই আমি দিতে অঙ্গীকার করিতেছি" কিন্তু তাহার লেখা এই যে, "আমি দিতে অঙ্গীকার করিতেছি;" অতএব দাবী করার কোন আবশ্যক ছিল না।

লর্ডগণের বাক্যগুলির প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখা যাইতেছে যে, যদিও কাবিন-নামায় লেখা ছিল যে, "যখন আমার বিবাহিতা স্ত্রী দাবী করিবে," তথাপি স্ত্রীর নালিশের হেতুর জন্য দাবী করার আবশ্যক ছিল না, কারণ, তাহারা বলেন যে, "কাবিন নামার প্রকৃত ব্যাখ্যানুযায়ী আমরা বোধ করি যে, পূর্ব্বে দাবী না করিলেও তাহার নালিশের স্বত্ব আছে।" অনন্তর, তাঁহারা বলেন যে, যদিও স্ত্রীর এই স্বত্ব ছিল, এবং সে তাহা যে কোন সময়ে ইচ্ছা, পরিচালন করিতে পারিত, তথাপি "সে তাহার জন্য তৎক্ষণাৎ অথবা তাহার স্বামীর জীবদ্দশায় নালিশ করিতে বাধ্য ছিল না।" এবং তাঁহারা আরও নির্দ্দেশ করেন যে, তমাদীর আইন দ্বারা ঐ মোকদ্দমা বারিত হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না? কারণ, বিবাহিতা স্ত্রীর যদি তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে এই প্রকার দলীলের উপরে নালিশ করিতে হয়, তবে নিতান্ত

অসুবিধা হইবে, এবং তাহা হইলে দাম্পত্য সুখের সম্পূর্ণ বিঘ্ন জন্মিবে। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, দলীলের লিখিত শব্দগুলির উপরে লর্ডগণ তাঁহাদের রায় স্থাপন করেন নাই, কিন্তু যৌতুক মাজ্জীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, যাহার জন্য দাবী না করিয়াও নালিশ উপস্থিত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাঁহারা দাম্পত্য সুখের জন্য নির্দ্দেশ করেন যে, যৌতুকের দাবীর নালিশ স্বামীর জীবদ্দশায় উপস্থিত করার আবশ্যক নাই, সুতরাং তৎকালের প্রচলিত তমাদীর আইন খাটে না। ইহা ভিন্ন লর্ডগণের বাক্যের যে অন্য কোন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এমত আমার দৃষ্ট হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে বর্ত্তমান তমাদীর আইন অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন যাহা এই মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ার কালে প্রচলিত ছিল, এবং যাহার বিধান সমস্ত পূর্ব্ব আইনের বিধান হইতে অধিক কঠিন, তাহা দ্বারা বিচার্য্য প্রশ্নের কোন ব্যতিক্রম হয় না, কারণ, লর্ডগণ যে হেতুবাদে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোরাদন্নেছার দাবী বারিত হয় নাই, তাহা তদ্দ্বারা খণ্ডিত হয় না। ইহা সত্য বটে যে, স্বামী ও স্ত্রী দীর্ঘকাল পরস্পর পৃথক্ ছিল, কিন্তু তথাপি তাহারা পুনঃমিলিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং প্রতিবাদিনীর প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, মৃত রাজা পুনঃমিলিত হওয়ার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তিনি মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অঙ্গীকার করেন যে, তাঁহার স্ত্রী যদি তাঁহার বাটীতে পুনরাগমন করেন, তবে তিনি তাঁহাকে খোরপোষ দিবেন। যদি ঐ স্ত্রী পৃথক্ হইয়া পৃথক্ হওয়ার এবং বিরোধ করার পরেই কোন সময়ের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করিত, তবে পুনঃমিলিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, এই স্থলে স্বামীর জীবদ্দশায় বাস্তবিক এক নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে যৌতুকের জন্য দাবী করা হয়; অতএব এমত অবস্থায়, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণের লিখিত সময়ের মধ্যে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করা কর্ত্তব্য ছিল।

তর্কের এই অংশের বিচার করার পূর্ব্বে উইক্লি রিপোর্টরের ফাঁক নম্বরের ১৯৯ ও ২৫২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত অপর দুই মোকদ্দমার উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম মোকদ্দমায় অর্থাৎ হোসেনুদ্দীন চৌধুরীর মোকদ্দমায় বিচারপতি ট্রেবর ও গ্লবর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় যে, শরা অনুসারে, "মাজ্জীল যৌতুক বিবাহ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে "স্ত্রীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে কোন সময়ে হউক "দাবী করা মাত্রেই দেয় হয়।" * * স্ত্রীর "জীবদ্দশায় যে সময়েই হউক, মাজ্জীল যৌতুকের "দাবী করিলেই তাহা দেয়, কিন্তু তাহার দায়া- "ধিকারীরা অন্য ব্যক্তির ন্যায় নালিশ করার "স্বত্ব পাওয়ার পরে ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ "করিতে বাধ্য। আপেল্যাণ্টেরা যে বলে যে, "বিবাহ সম্পূর্ণ হইলেই নালিশের হেতু জন্মে, "ইহা শরার ও ৬বালম মুয়রের ২২৯ পৃষ্ঠার "আমীরুন্নেছা বনাম মোরাদন্নেছার মোকদ্দমায় "প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ। ইহার "কোন সন্দেহ নাই যে, আফসারুন্নেছাকে সেই "তারিখেই যৌতুক দেয় ছিল, এবং তিনি ইচ্ছা "করিলেই তখন তাহার দাবী করিতে পারি- "তেন, কিন্তু জেম্মাদার স্বরূপ তাঁহার স্বামীর "হস্তে তাহা থাকিতে দিতেও তাঁহার সমতুল্য "স্বত্ব ছিল, এবং যেহেতু তাঁহার যে সময়ে "ইচ্ছা দাবী করার যে স্বত্ব ছিল, তাহা তাঁহার "মৃত্যু হইলেই বিলুপ্ত হইয়াছিল, অতএব বাদিনী "রেস্পণ্ডেণ্টের নালিশের হেতু তৎকালেই উপস্থিত "হইয়াছিল, যৌতুকের প্রথম দাবী করার কালে "উপস্থিত হয় নাই।"

দ্বিতীয় মোকদ্দমা যাহা উইক্লি রিপোর্টরের ফাঁক নম্বরে প্রচারিত হইয়াছে, অর্থাৎ জমীলা বিবীর মোকদ্দমার নিষ্পত্তি, আমীরন্নেছার মোক-

দমায় প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তির অনুগামী। জমীলার মোকদ্দমায় কাবিন-নামা ছিল না। বিবাহের কালে যৌতুক বাচনিক প্রদত্ত হয়, এবং তাহা মাজ্জীল কি মওয়াজ্জীল তদ্বিষয়ে তখন কিছু স্থির হয় নাই। শরার বিধান এই যে, (ম্যাক্‌নাটনের সারসংগ্রহের যৌতুকের ৭ ম অধ্যায়ের ২২ বিধি দ্রষ্টব্য;) যৌতুক মাজ্জীল কি মওয়াজ্জীল, তাহা যদি স্পষ্ট ব্যক্ত না থাকে, তবে সমুদায় যৌতুকই দাবী করা মাত্র প্রাপ্য স্থির করিতে হইবে। যে বিচারপতিগণ জমীলার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন যে, কি প্রকারের যৌতুক তাহার বর্ণনা না থাকাতে, শরা মতে তাহা তৎক্ষণাৎ দেয় হইলেও দুই পক্ষেরই কার্য্য দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, তাহারা তাহা মওয়াজ্জীল বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল; অতএব জমীলা তাহার স্বামীর সহিত পৃথক্ এবং অসদ্ভাবে থাকাতেও নালিশ করে নাই, কারণ, সে বিবেচনা করিয়াছিল যে, স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে যৌতুকের দাবী হইতে পারে না। বিচারপতিগণ এই বলিয়া তাঁহাদের রায় সমাপ্ত করিয়াছেন, যথা, "যেহেতু ঐ যৌতুক মাজ্জীল "কি মওয়াজ্জীল তাহা বিবাহের কালে স্থির "হয় নাই, অতএব তাহা শরা মতে মাজ্জীল "বিবেচনা করিতে হইবে, সুতরাং দাম্পত্য "সম্বন্ধ স্থির থাকার কালে, যে কোন সময়ে "হউক, স্বামীর নিকট তাহার দাবী ও তাহা "আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে, এবং "দাম্পত্য সম্বন্ধ রহিত হইলে, অথবা স্বামীর "মৃত্যুর পরে আইনের লিখিত তমাদীর কালের "মধ্যে নালিশ উপস্থিত করিয়া তাহা স্বামীর "সম্পত্তি হইতে লওয়া যাইতে পারে; এবং "প্রিবি কৌন্সিল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "এই প্রকার দাবী প্রাপ্য হইলেও তৎক্ষণাৎ "অথবা স্বামীর জীবদ্দশায় তাহার নালিশ করার "আবশ্যক নাই; এবং যেহেতু দাম্পত্য সম্বন্ধ "পরিত্যাগ সপ্রমাণ হয় নাই, অতএব আমরা "বিবেচনা করি যে, বাদিনী উচিত সময়ের মধ্যেই "তাহার নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।" জমীলার মোকদ্দমায় তর্কিত হয় যে, তাহাতে আমীরুন্নেছার মোকদ্দমার প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি খাটে না, কারণ, স্বামীস্ত্রী একত্রে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া পৃথক্ হওয়ায় দাম্পত্য সুখের বিঘ্ন হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। এই তর্ক সম্বন্ধে বিচারপতিগণ বলিয়াছেন যে, "ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রিবি কৌন্সিলের বিচার- "পতিগণ যদি ইহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন "যে, দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকার কালে কোন "সময়ের মধ্যে মাজ্জীল যৌতুকের দাবী করা "যাইতে পারিলেও, স্বামী জীবিত থাকিতে তাহার "নালিশ করার আবশ্যক নাই, এবং আমরা "বিশ্বাস করি যে, তাহাই ঐ আদালতের রায় "ছিল, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায়, যদিও "বাদিনীর স্বামীর কুব্যবহারের দ্বারা বাদিনী "পৃথক্ হইতে বাধ্য হওয়ায় তাহার দাম্পত্য "সুখ বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি সে তাহার "স্বামীর মৃত্যুর পরে নালিশ উপস্থিত করিতে "বারিত হয় নাই।" তদনন্তর আদালত দেখাইয়াছেন যে, কি জন্য পক্ষগণের আচরণের দ্বারা শরার বিধান সত্ত্বেও, ঐ মোকদ্দমায় যৌতুক মাজ্জীল না হইয়া মওয়াজ্জীল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

অন্য কথার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে ইহা নির্ণয় করা উচিত যে, ম্যাক্‌নাটন তাঁহার গ্রন্থের ৭ ম অধ্যায়ের ২২ বিধিতে "দাবী করিলেই প্রাপ্য হইবে" এই বাক্য কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। তাহা মাজ্জীল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয়, কি উপরিউক্ত রায়ে তাহা যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ টাকার দাবী করিলেই যে টাকা প্রাপ্য হয়, তদর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

ঐ গ্রন্থের ২৯ মোকদ্দমার এক টীকায় তিনি বলেন যে, "যে কাবিননামায় লেখা না থাকে "যে, যৌতুক মাজ্জীল কি মওয়াজ্জীল, তাহাতে

"যৌতুক তৎক্ষণাৎ বা পশ্চাতে দেওয়ার সর্ত্ত থাকিতে "পারে, অথবা তাহা তৎক্ষণাৎ কি পশ্চাতে দিতে "হইবে, তাহা লেখা না থাকিতে পারে।' প্রথম ও "শেষোক্ত ঘটনায় ও প্রচলিত নিয়ম এই যে, ঐ সমু- "দায় যৌতুকই তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, "দাবী করিলে দেয় হইবে" এই বাক্যের অর্থে তৎক্ষণাৎ দেয় বুঝায়। অপিচ, ৩০ নং মোকদ্দমার টীকায় ম্যাক্‌নাটন বলেন যে, "এই প্রকার বিরোধ সম্বন্ধে দেশাচারই আইন-সঙ্গত বিধি। যৌতুক মাজ্জীল কি মওয়া- জ্জীল তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলে, সমুদায় যৌতুকই মাজ্জীল বিবেচনা করিতে হইবে।"

আমীরুন্নেছার মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সিল যে নিষ্পত্তি করেন তাহা এই যে, কোন স্ত্রীর যৌতুক মাজ্জীল হইলেও সে তৎক্ষণাৎ অথবা তাহার স্বামী জীবিত থাকিতে তাহার জন্য নালিশ করিতে বাধ্য নহে। অতএব মেৎ বেলি তাঁহার হানিফার সারসংগ্রহের ৯২ পৃষ্ঠায় বলেন যে, ইহা অনুমান করিতে হইবে যে, দাম্পত্য সম্বন্ধ বিনষ্ট না হইলে স্ত্রীর মাজ্জীল যৌতুকের দাবীর তমাদীর কাল আরম্ভ হয় না। কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, আমীরুন্নেছার মোক- দ্দমায় প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি অথবা জমীলার মোকদ্দমায় এই আদালতের নিষ্পত্তি, এই মোক- দ্দমায় খাটে না, কারণ, ঐ দুই মোকদ্দমার কোন মোকদ্দমায়ই যৌতুকের দাবী করা হইয়া- ছিল না। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদিনী ১৮৬১ সালে স্পষ্ট দাবী করিয়াছিল এবং প্রতি- বাদী তাহা স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকার করে, এবং সেই টাকা পাওয়ার জন্য পাপর সূত্রে নালিশ করার দরখাস্ত ১৮৬২ সালের জানুয়ারি মাসে অগ্রাহ্য হয়।

দাম্পত্য সম্বন্ধ বিনষ্ট না হইলে কি জন্য মাজ্জীল যৌতুকের দাবীতে নালিশ করার আব- শ্যক নাই, প্রিবি কৌন্সিল তাহার এক হেতু দর্শাইয়াছেন, এবং তাহা এই যে, যদি স্ত্রী দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকার সময়ের মধ্যে এই প্রকার দাবী করিতে বাধ্য হয়, তবে দাম্পত্য সুখের বিঘ্ন হওয়ার সম্ভব। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় বাদিনীর ঐ রূপ দাবী করার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না এবং তিনি নিবারিতও হন নাই। তিনি তাঁহার স্বামী হইতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পৃথক্ ছিলেন এবং যদিও স্বামী তাঁহার সহিত পুনঃমিলিত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া স্বামী জীবিত থাকিতেই সমুদায় যৌতুকের দাবী করেন। প্রিবি কৌন্সিল যে রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকিতে মাজ্জীল যৌতুকের দাবী করার আবশ্যক নাই, এবং দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকার সময়ের মধ্যে মওয়াজ্জীল যৌতুকের দাবী করা যাইতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলেও, যদি কোন স্ত্রী তাহার স্বামী জীবিত এবং দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকিতে যৌতুকের দাবী করে, তবে কি সে তমাদীর আইনের বিধানান্তর্গত হয় না? এবং এই প্রকার মোকদ্দমা সমস্ত উপস্থিত করার জন্য আইনে যে সময় নির্দ্ধারিত আছে তাহার মধ্যে যদি মাজ্জীল যৌতুকের দাবী উপস্থিত না হয়, তবে কি অন্য দাবীর ন্যায় তাহাও বারিত হইবে না? যদি ইহাই আইন হয়, তবে পুনঃ- মিলন দুষ্কর হইয়া উঠে, এবং আমীরুন্নেছার মোক- দ্দমার নিষ্পত্তির ফল বৃথা হইয়া যায়। স্ত্রীপুরুষে বিরোধ করিয়া থাকে এবং স্ত্রী ক্রোধবশতঃ তাহার যৌতুকের দাবী করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পুনরায় সদ্ভাব হইয়া স্ত্রীপুরুষে নির্ব্বিরোধে বাস করে। এই প্রকার ঘটনায় কি ইহা বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রী নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার মাজ্জীল যৌতুকের দাবী না করিলে তাহার স্বত্ব হারাইবে? স্ত্রী- পুরুষের মধ্যে সর্ব্বদাই এই রূপ কলহ এবং পুনর্ম্মিলন হয়, কিন্তু যদি স্ত্রী তাহার যৌতুকের দাবী করিতে বাধ্য হয়, তবে পুনর্ম্মিলনের প্রতি অখণ্ডনীয় বাধা জন্মিবে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহার দায়াধিকারীরা আপত্তি করিতে

পারে যে, স্বামীর জীবদ্দশায় দাবী করা হইয়াছিল কিন্তু তাহার পরে উচিত সময়ের মধ্যে নালিশ হয় নাই; এবং তদ্দ্বারা বিধবার মাজ্জীল যৌতুকের দাবী পরাভূত করিতে পারে।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ যখন আমীরুন্নেছার মোকদ্দমায় ঐ সাধারণ বিধি স্থাপন করেন, তখন উপস্থিত মোকদ্দমার ঘটনার ন্যায় ঘটনা অর্থাৎ যাহাতে স্ত্রী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার স্বামী হইতে পৃথক্ থাকিয়া আদালতে নিয়মিত রূপে স্বামীর নিকট যৌতুকের দাবী করে, এমন ঘটনার কথা তাঁহাদের মনে উদয় হইয়াছিল কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। আমাদের সমক্ষে যে প্রশ্ন উপস্থিত, তাহাই যদি লর্ডগণের সমক্ষে উপস্থিত হইত, তবে হয়ত তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতেন যে, ঐ সকল অবস্থান্তর্গত মাজ্জীল যৌতুকের দাবী তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে। যাহা হউক, আমার বিবেচনায়, আমীরুন্নেছার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই মোকদ্দমায় সম্পূর্ণ রূপে খাটে না। মাজ্জীল যৌতুক সম্বন্ধে তাঁহারা কেবল এই বিধি স্থাপন করেন যে, 'পূর্ব্বে দাবী না করিলেও স্ত্রীর নালিশের স্বত্ব আছে, এবং তৎক্ষণাৎ অথবা স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রী নালিশ করিতে বাধ্য নহে।' সাংসারিক কোন বিরোধের পরে ক্ষণিক ক্রোধ (যাহা যেমন শীঘ্র প্রজ্বলিত হয় তেমন শীঘ্রই নির্ব্বাণ হয়) বশতঃ যৌতুকের যে দাবী হয় ও যাহার দ্বারা দাম্পত্য সুখের কোন স্থায়ী ব্যাঘাত জন্মে না, যদি কোন স্ত্রী সেই প্রকার দাবী না করিয়া বহু বৎসর পর্য্যন্ত পৃথক্ থাকিয়া পুনঃ মিলনের সকল চেষ্টা বৃথা হওয়ার পরে, দাবী করে, এবং সেই দাবী প্রকাশ্য রূপে এবং পরামর্শ করিয়া করা হয়, তবে আমার বিবেচনায়, প্রিবি কৌন্সিলের ঐ বিধি তাহাতে খাটে না, এবং অপরাপর ব্যক্তির যে সময়ের মধ্যে লিখিত চুক্তি পরিচালনার্থে নালিশ করিতে হয় ঐ স্ত্রীও সেই সময়ের মধ্যে তাহার যৌতুকের দাবী পরিচালনার্থে নালিশ করিতে বাধ্য।

কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, কোন দাবী করা হয় নাই; পাপরের সূত্রে নালিশ করার জন্য বাদিনীর ১৮৬১ সালের দরখাস্ত কেবল নোটিস মাত্র, তাহা দাবী নহে। ১৮৬১ সালের ৩ রা মে তারিখে বাদিনী প্রধান সদর আমীনের আদালতে এই মর্ম্মে দরখাস্ত করেন যে, তাঁহার সহিত রাজা এনাএত হোসেনের বিবাহের সময় ঐ রাজা তাঁহাকে এক লক্ষ টাকার এক কাবিননামা লিখিয়া দেন; এই কাবিনের চতুর্থাংশ মাজ্জীল এবং বাকী তিন অংশ মওয়াজ্জীল ছিল; ঐ মাজ্জীল যৌতুকের মধ্যে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নানা সময়ে ২০০০ টাকা দিয়াছেন এবং বাকী টাকার জন্য তিনি এই নালিশ করিয়াছেন; কিন্তু যেহেতু তাঁহার ষ্টাম্প ফীস দেওয়ার উপায় নাই, অতএব তাঁহার প্রার্থনা এই যে, পাপর সূত্রে নালিশ উপস্থিত করিতে তাঁহার প্রতি অনুমতি হয়। তৎপরের ১লা জুলাই তারিখে, রাজা এনাএত হোসেনের পক্ষে তাঁহার ক্ষমতা-প্রাপ্ত উকীল মুন্সী আফজুল আলী, মেৎ চার্লস চ্যাপমান ও মুন্সী ফরজন্দ আলী এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত দাখিল করেন যে, বাদিনী পাপর নহেন; রাজা তাঁহাকে বিবাহের সময় ১১০০০ টাকা মূল্যের অলঙ্কার ও নগদ টাকা দিয়াছিলেন; বাদিনী যে কাবিননামা দাখিল করিয়াছিল, তাহা কৃত্রিম; বাদিনীর যৌতুক কখনও এক লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয় নাই; ঐ প্রকার দলীল লিখিত অথবা দস্তখত হয় নাই; কিন্তু পরিবারের প্রথানুসারে বাদিনীর যৌতুক মৌখিক ৫০০০ টাকায় নির্দ্ধারিত হয়। ঐ দলীলের প্রতি এই আপত্তিও হয় যে, তাহাতে রাজার মোহর নাই এবং তাহাতে যে কাজীর মোহর আছে তাহা ঐ কাজীর সহিত বাদিনীর বন্ধুগণ যোগ-সাজস করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বাদিনীর মাজ্জীল যৌতুকের দাবী তমাদীর দ্বারা

বারিত হইয়াছে, কারণ, বিবাহের পরে ১২ বৎসরের মধ্যে তাহা উপস্থিত হয় নাই, এবং অবশিষ্ট যৌতুকের দাবী উচিত সময়ের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে কখন মাজ্জীল যৌতুকের টাকার কোন অংশ প্রদান করিয়াছেন, ইহা তিনি অস্বীকার করেন, এবং তর্ক করেন যে, ঐ প্রকার কোন টাকা দেওয়া হইলে, দলীল অকৃত্রিম হইলে তাহার পৃষ্ঠেই উসুল থাকিত, এবং তিনি আরও বলেন যে, কেবল তমাদীর আইনের ফল এড়াইবার জন্য ঐ টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ হইয়াছে।

১৮৬২ সালের ৭ ই জানুয়ারি তারিখে প্রধান সদর আমীন রাজা এনাএত হোসেনের জবানবন্দী লন এবং তাঁহাকে যে, প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয় তাহা এই যে, "আপনি আপ-"নার জওয়াবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আপনি "রাণী রুইছন্নেছাকে ১০,০০০ টাকা মূল্যের "অলঙ্কার দিয়াছেন, এবং তাহার মধ্যে ৬০০০ "টাকা মূল্যের কতক অলঙ্কার রাণী এক জন "মহাজনের নিকট ৩০০০ টাকায় বন্ধক দিয়া-"ছিলেন, কিন্তু আপনি পশ্চাতে তাহা উদ্ধার "করত রাণীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। "আপনি কখন্ তাহা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, "এবং তাহা এইক্ষণে বাদিনীর হস্তে আছে, "কি তিনি তাহা বিক্রয় করিয়াছেন?" রাজা, তাঁহার ১৮৬১ সালের ১ লা জুলাই তারিখের দরখাস্তে যে সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন তদ্রূপ এই প্রশ্নের উত্তরেও বলেন, এবং ইহাও বলেন যে, বাদিনী আপন ভ্রাতা সৈফুল্লার নিকট ২৫ টাকা মাসিক খোরাকী পাইয়া থাকেন। এই জবানবন্দীর পরে প্রধান সদর আমীন ১৮৬২ সালের ২৭ এ জানুয়ারি তারিখে এই রুবকারী করেন যে, বাদিনী হিজরী ১২৫৪ সালের ৮ ই রবিওস্সানী মোতাবেক মুলকী ১২৪৬ সালের ১৮ ই আষাঢ় তারিখের এক কাবিননামার অন্তর্গত যৌতুক পাওয়ার জন্য নালিশ উপস্থিত করত পাপর সূত্রে তাহা চালাইবার অনুমতির প্রার্থনা করিয়াছেন; বাদিনীর উকীল মুন্সী আহম্মদ ও প্রতিবাদীর উকল মুন্সী আফজুল আলী ও মুন্সী ফর্জন্দ আলী ও মেং চ্যাপমানের সম্মুখে মোকদ্দমার শুনানী হয়; নথী পাঠ ও তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিয়া হুকুম হইল যে, বাদিনীর পাপর সূত্রে নালিশ করার অনুমতির প্রার্থনা খরচা সমেত অগ্রাহ্য হয়। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০৫ ধারামতে এই সকল কার্য্য হয় এবং তাহা কেবল বাদিনী পাপর কি না, তৎসম্বন্ধেই হয়, এবং তাহা তাঁহার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়; কিন্তু এই সকল কার্য্য দ্বারা এই পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে যে, রাজা এনাএত হোসেনের উকীলেরা ১৮৬১ সালের ১ লা জুলাই তারিখে তাঁহার পক্ষে যে দরখাস্ত করিয়াছিলেন তাহাতে যাহা কিছু লেখা ছিল তাহা তিনি স্বীকার এবং গ্রাহ্য করিয়াছেন বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। তিনি তাহার কোন কথা অস্বীকার করেন নাই, এবং যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা হয় যে, আপনি আপনার ১৮৬১ সালের ১ লা জুলাই তারিখের জওয়াবে বলিয়াছেন, তখন তিনি সেই দরখাস্তের লিখিত বাক্য সমস্ত ব্যক্ত করিয়াই জওয়াব দেন এবং তাহাতে তিনি বাদিনীর দাবী অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি কথিত হইয়াছে যে, যেহেতু বাদিনীর পাপর সূত্রে নালিশ করার দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়াছিল, অতএব তাহা তাহার দাবী নহে, নোটিস মাত্র।

কিন্তু আমি ঐ দরখাস্ত সেরূপ বিবেচনা করি না। ইহা এক জাবেতা মোকদ্দমার আরজীর ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং তাহার নিম্ন ভাগে পাপরের অনুমতির জন্য যে প্রার্থনা ছিল তাহা গ্রাহ্য হইলে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০৮ ধারামতে ঐ দরখাস্ত নম্বরওয়ারী রেজিষ্টরী হইয়া নালিশের আরজী স্বরূপ পরিগণিত হইত। ১ ম বালম হেজ রিপোর্টের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় এই প্রধানতম বিচারালয় গোলোক-

নাথ দত্তের মোকদ্দমায় নির্দ্দেশ করেন যে, পাপর সূত্রে নালিশ করার অনুমতির প্রার্থনায় যখন দরখাস্ত দাখিল হয়, তখনই নালিশ আরম্ভ হয়, এবং ৪ র্থ বালম বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের আপীল-বিভাগের রিপোর্টের ৩৯ পৃষ্ঠায় এক দেওয়ানী মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট হয় যে, যে তারিখে পাপরের দরখাস্ত দাখিল হয় সেই তারিখেই তমাদী সম্বন্ধে ঐ নালিশের আরম্ভ গণ্য হয়; যে তারিখে তাহা গ্রাহ্য হইয়া নম্বরওয়ারী ও রেজিষ্টরী হয় সেই তারিখে আরম্ভ হয় না। এমত বলা যাইতে পারে না যে, রাজা এনাএত হোসেন এই দাবীর কথা অবগত ছিলেন না, অথবা ১৮৬১ সালের ১লা জুলাই তারিখের দরখাস্ত যাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বাদিনীর দাবী অস্বীকার করেন তাহা তাঁহার অবগতি অথবা সম্মতি ব্যতীত লেখা হইয়াছিল, কারণ, দেখা যাইতেছে যে, তাহা তাঁহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত উকীল কর্ত্তৃক দাখিল হয় এবং যখন বাদিনীর দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তখন তাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এবং মোকদ্দমায় বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, এবং প্রধান সদর আমীন রাজার যে জবানবন্দী লইয়াছিলেন তাহাতে রাজা ঐ জওয়াবের সমুদায় কথা বিস্তারিত বর্ণনা না করিলেও তাহা আপন জওয়াব বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব রাণীর পাপর সূত্রে নালিশ করিবার অনুমতির জন্য দরখাস্ত, আদালতে তাঁহার যৌতুক পাওয়ার স্পষ্ট দাবী (যে দাবী রাজাও স্পষ্টরূপে অস্বীকার করিয়াছেন) স্বরূপে জ্ঞান করত আমি বিবেচনা করি যে, তাঁহার মাজ্জীল যৌতুক সম্বন্ধীয় দাবীতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণমতে তমাদী ঘটিয়াছে, কারণ, নালিশের হেতুর তারিখের অর্থাৎ রাজা ঐ দাবীর টাকা দিতে যে তারিখে অস্বীকার করেন, সেই তারিখের পরে তিন বৎসরের মধ্যে নালিশ উপস্থিত হয় নাই।

আপীলের দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের রায় আপেলাণ্টের বিরুদ্ধ, কারণ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, শরা এবং নজীর সমস্ত অনুসারে কেবল স্বামীর মৃত্যুর দ্বারা অথবা দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিত্যাগের দ্বারা ঐ সম্বন্ধের শেষ হইলেই মওয়াজ্জীল যৌতুক প্রাপ্য হয়। কিন্তু যদি দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকার অবস্থায় স্ত্রী আপন মওয়াজ্জীল যৌতুকের দাবী উপস্থিত করে, তবে তাহা উচিত সময়ের পূর্ব্বে উপস্থিত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে, এবং স্বামী ঐ দাবী অস্বীকার করিলে তৎক্ষণাৎ স্ত্রীর নালিশের এমন হেতু জন্মে না যাহা হইতে তমাদী গণনা করা যাইতে পারে, কারণ, মওয়াজ্জীল যৌতুকের দাবী কোন প্রকারেই দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থির থাকার সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে না।

কাবিননামা, যাহার সত্যতার প্রতি আপত্তি হইয়াছে, তাহা আমরা এইক্ষণে পর্য্যালোচনা করিব। আপেলাণ্টের কৌন্সেল বলেন যে, তাহা জাল দলীল। সাবধানে প্রমাণ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নিম্ন আদালতের সহিত একমতে বলিতেছি যে, ইহা অকৃত্রিম দলীল এবং মৃত রাজা এনাএত হোসেনের দ্বারা স্বাক্ষরিত। ইহা কয়েক জন সাক্ষি-দ্বারা তজদিক হইয়াছে; তন্মধ্যে হকীম জয়নদ্দীন এখনও জীবিত আছেন এবং তিনি এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, যৌতুকের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হওয়ার ও কাবিননামা লিখিত ও দস্তখত হওয়ার, এবং বিবাহের পর দিবস প্রাতঃকালে তাহা কাজী আমজদ আলীর দ্বারা রেজিষ্টরী হওয়ার কালে, তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সাক্ষ্যের প্রতি এই বলিয়া আপত্তি হইয়াছে যে, তৎকালে তিনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং তাঁহাকে দলীল তজদিক করিতে বলিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না; এবং ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, তিনি যে বলিয়াছেন যে, তত প্রাতে মোহরের বাজার-দর নির্ণয় করার জন্য বাজারে লোক প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাও অসম্ভব এবং তদ্দৃষ্টে তাঁহার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য

হইতে পারে না। কিন্তু এই সাক্ষী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; তাঁহার চরিত্রের প্রতি কোন দোষারোপ হয় নাই এবং বিবাহের কালে তাঁহার উপস্থিত থাকাও অসম্ভব হইতে পারে না, কারণ, তিনি তাঁহার খুড়া হকীম নজীমদ্দীনের সহিত গিয়াছিলেন, এবং নজীমদ্দীন পীড়িত বিধায় তথায় কিছু কাল মাত্র থাকিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি যে প্রকার জবানবন্দী দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি তৎকালে তরুণবয়স্ক ছিলেন, এবং তরুণবয়স্ক হইলেও তাঁহাকে সাক্ষী হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করা অসম্ভব নহে, কারণ, তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারস্থ ব্যক্তি; এবং যদিও তাঁহার এইক্ষণকার দস্তখতের সহিত ঐ কাবিন-নামায় তাঁহার দস্তখতের প্রভেদ আছে, বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়াতে সেই সাক্ষ্যের প্রতি আপত্তি হইয়াছে, তথাপি তদ্দ্বারা তাঁহার সাক্ষ্য আমরা অবিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ, যদি ঐ দলীল ইদানীন্তন প্রস্তুত হইত, তবে এই সাক্ষীর দস্তখতে কোন প্রভেদ হইত না; এবং মোহরের বাজার দর নির্ণয় করণার্থে অতি প্রত্যূষে লোক প্রেরণ করা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদিও আপাততঃ কিঞ্চিৎ অসম্ভব বোধ হয়, তথাপি যখন বিবেচনা করা যায় যে, যৌতুক ১ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তখন ঠিক ঐ এক লক্ষ টাকার জন্য মোহরের চলিত মুল্য নির্ণয় করার আবশ্যকই ছিল; এবং যখন ইহাও বিবেচনা করা যায় যে, আষাঢ় মাসে অর্থাৎ গ্রীষ্ম কালে যখন এ প্রদেশস্থ লোকেরা অতি প্রত্যূষে তাহাদের কারবার আরম্ভ করে, তখন এই বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে, ঐ আপত্তি অকর্ম্মণ্য। এই প্রকার কোন ঘটনা না হইয়া থাকিলে সাক্ষী কখন তাহার জবানবন্দীতে ঐ কথার উল্লেখ করিতেন না। বাদিনীর কৌন্সেল যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা গ্রহণ করিলেও এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ঐ সাক্ষী নির্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহার জবানবন্দীতে বাড়াইয়া বলিয়া থাকিলেও তদ্দ্বারা তাহার সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য হইতে পারে না।

তাহার পরে, আগা সৈফুল্লার জবানবন্দী আছে; তিনি বাদিনীর ভ্রাতাও অতি সম্ভ্রান্ত বংশজাত ব্যক্তি, এবং অধঃস্থ জজ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহার জবানবন্দী লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে এই প্রতিষ্ঠা-সূচক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন যে, "তিনি অতি সৎ এবং সরলভাবে জবানবন্দী "দিয়াছেন, এবং কোন কথা গোপন না করিয়া "মুক্তকণ্ঠে এবং শান্তভাবে সমুদায় প্রশ্নের "উত্তর দিয়াছেন।" এই ব্যক্তি বাদিনীর ভ্রাতা এবং মোকদ্দমায় কিছু স্বার্থ-বিশিষ্ট হইলেও তাঁহার সাক্ষ্যের সত্যতার প্রতি সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। তিনি জবানবন্দী দিয়াছেন যে, তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সময় তিনি ১০ কি ১১ বৎসর বয়স্ক ছিলেন, তিনি বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, এবং বিবাহের পরে কাবিননামা দস্তখত হইতে দেখিয়াছিলেন, এবং মীর কাছিম আলী, মীর কুরম আলী, রাজা দিদার হোসেন, মছিয়তুল্লা, মীর গোলাম হয়দর, বাবু কীর্ত্তি সিংহ এবং হকীম জয়নদ্দীন উপস্থিত ছিলেন। কাজী আমজদ আলী দ্বারা বিবাহের কল্‌মা পাঠ করান হইয়াছিল। তিনি জানেন যে, ১ লক্ষ টাকায় যৌতুক নির্দ্ধারিত হয়, কারণ, তাঁহার ভগিনীর উকীল মমিন আলী যখন তাঁহার ভগিনীর নিকট তিনি কত টাকা যৌতুকের দাবী করিবেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনিও তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, এবং মমিন আলী ১ লক্ষ টাকার যৌতুকের দাবী করেন, এবং রাজা এনাএত হোসেন তাহাই দিতে স্বীকার করেন। তাহার পরে নেকা পঠিত এবং দলীল স্বাক্ষরিত হয়, এবং দস্তখত হওয়ার পরে তাহা কন্যার পিতার হস্তে প্রদত্ত হয়, এবং এই সাক্ষী যখন আপন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, তখন তাঁহার অন্যান্য কাগজের মধ্যে তিনি ঐ কাবিননামা পাইয়াছেন। যৌতুক

সিক্কা টাকায় নির্দ্ধারিত হয়, এবং তন্মধ্যে ১২৫০ থান মোহরের কথা ছিল। তিনি বিবাহের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া এবং কাবিননামা পাঠ করিয়া ঐ টাকার কথা অবগত হইয়াছেন। যদি আমরা এই সাক্ষ্য বিশ্বাস করি, ( এবং ইহার কোন ভাগ অবিশ্বাস করার কারণ আমি দেখি না ), তবে ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এই কাবিননামা যাহার তজদিকী সাক্ষিগণের মধ্যে কেবল সাক্ষী জয়নদ্দীন হোসেন জীবিত আছেন, এবং যাহার দ্বারা বাদিনীকে এক লক্ষ টাকার যৌতুক দেওয়ার করার হয়, তাহা নিয়মিত রূপে রাজা এনাএত হোসেন কর্ত্তৃকই দস্তখত হইয়াছিল।

ঐ দলীল সম্বন্ধে এই আপত্তি হইয়াছে যে, তাহাতে সাক্ষিগণের কেবল নাম লেখা আছে, এবং তাহাদের বাসস্থান ইচ্ছা করিয়া লেখা হয় নাই। যদি সাক্ষিগণের মৃত্যুর পরে ইদানীন্তন ঐ দলীল প্রস্তুত হইয়া থাকিত, তবে তাহাতে সাক্ষিগণের নিবাস লেখা কঠিন হইত না, কারণ, তাহারা পূর্ণিয়ার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিল।

কাজী আমজদ আলী কর্ত্তৃক ঐ দলীল রেজিষ্টরী হওয়া সম্বন্ধে এই বলিয়া আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে যে, ঐ কাজী তাহার পরে সেশন আদালতে অর্পিত হইয়াছিল এবং ১৮৩৮ সালের রেজিষ্টরী বহী যাহাতে এই দলীল নকল হয়, তাহা পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দলীলের রেজিষ্ট্রারের এক কর্ম্মচারী যাহার জেম্মায় পরগণার কাজীদের পুরাতন রেজিষ্টরী বহী সমস্ত অর্পিত হয়, তাহার এক কৈফিয়তে দেখা যাইতেছে কোন কাজী কর্ত্তৃক ঐ সালের রেজিষ্টরী বহী প্রেরিত হয় নাই, এবং পূর্ব্ব ও পরের কএক সনের রেজিষ্টরী বহী আছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ১৮৩৮ সালের সরকুলর অর্ডর অনুযায়ী এই সকল রেজিষ্টরী বহীর প্রতি উচিত যত্ন ছিল না এবং তাহা নিয়মিত রূপে প্রেরিত হইত না। অতএব ঐ সনের রেজিষ্টরী বহীর অভাবহেতু বৈধ রূপে ঐ দলীলের অকৃত্রিমতার প্রতি আপত্তি করা যাইতে পারে না। ঐ দলীলের রেজিষ্টরীর ইয়াদদস্ত যে কাজী আমজদ আলীর হস্তাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে ইহা অস্বীকৃত হয় নাই, এবং ইহাতে যে মোহর আছে তাহা তাহারই মোহর; এবং এই লেখা এবং মোহর যে পরে হইয়াছিল তাহার কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই, এবং বিবাহের বহুবৎসর পরে কাজী অন্য এক অপরাধ করায় সেশনে অর্পিত হইয়াছিল বলিয়াই এই দলীল অপ্রামাণ্য হইতে পারে না, এবং তাহা হইলেও, সেই সেশন আদালতের মোকদ্দমার বিচারের কি ফল হইয়াছিল, তাহা আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই।

অনন্তর কথিত হইয়াছে যে, যৌতুকের দাবী অত্যন্ত অধিক; ঐ পরিবারের ৫০০০ টাকা যৌতুক দেওয়ার রীতি আছে এবং রাজা এনাএত হোসেনের দ্বিতীয় স্ত্রীর যৌতুক তাহাই হইয়াছিল। ঐ স্ত্রী নিজে কত যৌতুক পাইয়াছিলেন তাহা তিনি আপন বর্ণনা-পত্রে ব্যক্ত করেন নাই; কিন্তু কয়েক জন সাক্ষী যাহা বলিয়াছে তদনুসারে তাঁহার যৌতুক ৫০০০ টাকা হইলেও এমত সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, দ্বিতীয় স্ত্রীর যৌতুক প্রথম স্ত্রীর যৌতুকের তুল্য উচ্চ হইবে, এবং আমরা ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, তাহা কদাচিৎ হয়। পরিবারের ৫০০০ টাকা যৌতুক দেওয়ার প্রথা ছিল বলিয়া যে সমস্ত প্রমাণ দর্শান হইয়াছে তাহা আমাদের বিবেচনায় সন্তোষকর নহে; বরং আমরা ইহাই জানি যে, স্বামীর যত টাকা দেওয়ার সাধ্য থাকে তাহার অনেক অতিরিক্ত টাকার যৌতুক সচরাচর নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। উপস্থিত স্থলে উচ্চ যৌতুক হওয়ার অনেক কারণ আছে, এবং পক্ষগণের অবস্থা ও সঙ্গতি দৃষ্টে বাদিনী যত টাকার যৌতুকের কথা বলিয়াছেন, তাহা অতিরিক্ত বিবেচনা হয় না। এক দিকে, স্ত্রী অতি

সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা যাহার সহিত বিবাহ হওয়া অতি সম্মানের বিষয় ছিল। পক্ষান্তরে, বর ঐ জেলার অতি প্রধান জমিদার রাজা দিদার হোসেনের পুত্র, ধনশালী ও পদস্থ ছিলেন। ইহা হইতে পারে যে, রাজা দিদার হোসেন তাঁহার পুত্রের অতি সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহের জন্য কন্যাকে অধিক টাকার যৌতুক দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, এবং কন্যার পিতাও তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে, অথবা তাহার স্বামী তাহাকে কোন ছলে পরিত্যাগ করিলে তাহার ভরণপোষণার্থে, আপন বংশের গৌরবে অধিক টাকার যৌতুক লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রকার অধিক টাকার যৌতুক স্থির করা যে কত সুবুদ্ধির কার্য্য হইয়াছিল, তাহা এই সকল ঘটনা দ্বারাই দেখা যাইতেছে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, কেবল এত অধিক টাকা দেওয়ার ভয়েই দাম্পত্য সম্বন্ধ একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই। যখন রাণী তাঁহার স্বামীর বাটীতে পুনরাগমন করিতে অস্বীকার করিয়া খোরাকীর জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরে পাপর সূত্রে নালিশ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন রাজা যে, ঐ ৫০০০ টাকা যাহা তিনি অনায়াসে দিতে পারিতেন, তাহা দিয়া ঐ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতেন না, তাহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। কেবল ১ লক্ষ টাকা দিতে হইবে বলিয়াই তিনি তাহা করেন নাই। অতএব অধিক টাকার যৌতুক লওয়ার যথেষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে; এবং তাহা এই মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে অধিক বোধ হয় না; এবং যেহেতু আমরা জানি যে, অনায়াসে দাম্পত্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করা নিবারণার্থেই এই প্রদেশে অধিক টাকার যৌতুক দাবী করার ও দিতে সম্মত হওয়ার প্রথা আছে, অতএব অধিক টাকার যৌতুক বলিয়াই এই কাবিননামা কৃত্রিম বলা যাইতে পারে না। ঠিক বিবাহের সময়ে যে যৌতুকের পরিমাণ নির্ণীত হইয়াছিল, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। আমাদের ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বিবাহের পূর্ব্বে সকল কথা স্থির হইয়াছিল, এবং বিবাহের সময়ে যাহা হইয়াছিল তাহা শরা মতে কেবল বিবাহের নিয়ম প্রতিপালন মাত্র হইয়াছিল; এবং নেকা পাঠ হওয়ার অব্যবহিত পরক্ষণেই এই প্রকারের দলীল লিখিত ও দস্তখত হওয়া অসম্ভব বলিয়া যে তর্ক হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমরা বলি যে, কোন সাক্ষীই ইহা শরার বিরুদ্ধ বলিয়া ব্যক্ত করে নাই, এবং এই প্রকার দলীল যাহা বড় বৃহৎ নহে, এবং যাহা এক আদর্শ অনুসারে পূর্ব্বে মুসাবিদা করিয়া লেখা হয়, তাহা লেখা অধিক কঠিন কার্য্য নহে, এবং সাক্ষীরা বলিয়াছে যে, ঐ বিবাহে ঐ প্রকার মুসাবিদা প্রস্তুত হইয়াছিল।

আর একটি কথা আছে, যদ্দ্বারা এই দলীলের অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ হইতেছে, এবং তাহা এই যে, যে ষ্টাম্প কাগজে কাবিননামা লেখা হয়, তাহা এক জন সামান্য ষ্টাম্প বিক্রেতার নিকট ক্রীত হয় নাই, কিন্তু তাহা অধিক টাকার কাগজ বিধায় তৎসময়ের বিধি অনুযায়ী কালেক্টর নিজে তাহা ষ্টাম্প দারোগার হস্তে প্রদান করেন, এবং ষ্টাম্প দারোগা নিজে তাহা রাজা দিদার হোসেনের মোক্তারকে বিক্রয় করে। ষ্টাম্পকালেকটর মেং ম্যাকিণ্টসের দস্তখত আছে, এবং তাঁহার লিপিতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি ১৮৩৮ সালের ৩০ এ জুন তারিখে ষ্টাম্প-দারোগাকে তাহা প্রদান করেন, এবং দলীল তাহার পর দিবস লিখিতপড়িত হয়। দিদার হোসেনেরই ঐ ষ্টাম্প দেওয়া কর্ত্তব্য ছিল, এবং বিক্রয়ের সার্টিফিকেটে ক্রেতা বলিয়া যে ভোলানাথ রায়ের নাম আছে, সেই ব্যক্তি যে দিদার হোসেনের মোক্তার ছিল না, এমত কোন স্থানে প্রদর্শিত হয় নাই। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ষ্টাম্প যে তারিখে বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া লেখা আছে, সেই তারিখেই প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা বিক্রীত হয়, এবং এই দলীল যে এক খানা পুরাতন ষ্টাম্পের উপরে পশ্চাতে লেখা হইয়াছে,

অথবা বাদিনীর সহিত রাজা এনাএত হোসেনের বিবাহের সময়ে উক্ত রাজা যে তাহা দস্তখত করেন নাই, এমত কোন প্রমাণ নাই।

এমত অবস্থায়, আমার বোধ হইতেছে যে, তৎক্ষণাৎ দেয় অর্থাৎ মাজ্জীল যৌতুকের দাবী ভিন্ন এই আপীল ডিস্মিস্ হইবে; এবং আপীলের যে ভাগের ডিক্রী হইল, আপেলাণ্ট তাহার খরচা পাইবেন, কিন্তু তিনি যে ভাগে পরাজিত হইলেন, রেস্পণ্ডেণ্টকে তাঁহার সেই ভাগের খরচা দিতে হইবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—ভ্রাতা লকের রায়ে আমি সম্মত হইলাম।

আমি বিবেচনা করি যে, যৌতুকের যে ভাগ মাজ্জীল তাহাতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণ মতে তমাদী ঘটিয়াছে।

ঐ আইনের ভূমিকায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, অন্য বিরুদ্ধ আইন থাকিলেও, সকল মোকদ্দমা ঐ ১৪ আইনের লিখিত তমাদীর অধীন হইবে।

স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে লিখিত চুক্তি রেজিষ্টরী হয় নাই, তাহার উপরে এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, এবং ঐ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, এই প্রকার মোকদ্দমায় চুক্তি-ভঙ্গের তারিখ হইতে তিন বৎসরের তমাদীর বিধান খাটিবে।

এই স্থলে হয় বিবাহের সময়ে, নচেৎ অন্ততঃ বাদিনী যখন ঐ চুক্তি অনুসারে যৌতুকের দাবী করিয়াছিলেন, এবং স্বামী তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেই সময়েই চুক্তি-ভঙ্গ হইয়াছিল।

তাহা ১৮৬১ সালে হয়, এবং ১৮৬৮ সালে নালিশ উপস্থিত হয়; অতএব মাজ্জীল যৌতুক সম্বন্ধে তাহা উচিত সময়ের মধ্যে হয় নাই।

কাবিননামা সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, যৌতুকের টাকার উপযুক্ত ষ্টাম্প বিবাহের পূর্ব্ব দিবসে কালেক্টরের হস্ত হইতে নির্গত হয়, এবং তাহা যে ব্যক্তি বরপক্ষের মোক্তার বলিয়া অস্বীকৃত হয় নাই, তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। পুরাতন কাগজের উপরে নূতন লেখার চিহ্নের ন্যায় যে ঐ দলীলে কোন চিহ্ন আছে, এবং উহাতে যে কাজীর তস্‌দীক আছে, তাহা যে সেই ব্যক্তিরই তস্‌দীক নহে, এরূপ কোন প্রমাণ দর্শান হয় নাই। ১৮৩৮ সালের কাজীর রেজিস্টরী বহী সমস্ত কি জন্য পাওয়া যায় নাই, তাহার সন্তোষ-জনক কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ দলীলের সাক্ষিগণের মধ্যে যে এক ব্যক্তি জীবিত আছেন, তিনি বরের ও অন্যান্য ছোট বড় ব্যক্তির দস্তখতের বিষয়ে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন। ঐ সকল ব্যক্তির কি তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির দস্তখত কৃত্রিম হইলে তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিত; কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি বিবাহের ও ঐ দলীলের সাক্ষী হইয়াছিল, তাহারাই ঐ বিষয়ের সাক্ষী হওয়ার যোগ্য পাত্র ছিল। বর ও কন্যার সঙ্গতি ও অবস্থা বিবেচনায় যত টাকার যৌতুক হওয়া উচিত ছিল, তাহাই হইয়াছিল। কন্যার পিতা তৎকালে গবর্ণমেণ্টের অধীনে অনরেরী মাজিষ্ট্রেট, এবং সম্ভ্রান্ত বংশজাত ছিলেন। তিনি অল্প যৌতুকে তাঁহার কন্যাকে কখন বিবাহ দিতেন না। তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা বৃহৎ বৃহৎ যৌতুক লইয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। বরও স্বভাবতঃই অধিক যৌতুক দিতেন, এবং তাহাই তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। স্বামীর যদিও এই যৌতুকের কথা অস্বীকার করার সুযোগ ছিল, তথাপি তিনি তাহা শপথ পূর্ব্বক কখন অস্বীকার করেন নাই। কাবিননামা যাহার হস্তে ছিল, তাহার নিকট তাহা থাকার কারণ সন্তোষকর রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। বাদিনীর সপত্নীর ৫০০০ টাকার যৌতুকের কথা সম্ভবপর নহে, এবং তাহা সপ্রমাণও হয় নাই। জজ যিনি সাক্ষিদিগকে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বাদিনীর সাক্ষিগণকে বিশ্বাস করিয়াছেন, এবং বিশ্বাস করার হেতুও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে আমরা কিজন্য অবিশ্বাস করিব তাহার কোন কারণ প্রদর্শিত হয় নাই।

অতএব আমিও ভ্রাতা লকের রায়ে সম্মত।

(গ)

---

২৩ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২৭১ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

বাবু হরগোপাল দাস ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

রামগোপাল সাহী প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর টি এলেন ও বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল ও বাবু গোপাললাল মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে সম্পত্তির বাটওয়ারা হয়, তাহার শরীকগণকে প্রত্যেকের অংশমতে বাটওয়ারার খরচ দেওয়ার জন্য কালেক্টর ১৮৩৮ সালের ১১ আইন মতে যে নোটিস দেন তাহা এমন দাবী নহে যে, তাঁহার রিপোর্ট পশ্চাতে কমিশনর কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইলেও, তদ্দ্বারাই বাকীদারেরা দায়ী হইবে।

বাটওয়ারার আমীনের বেতন পক্ষগণের নিকট সরকারী বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হওয়ার পূর্ব্বে, তাহা বোর্ড এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর হওয়া আবশ্যক, এবং যে সময়ে ও যে অংশ মতে আদায় হইবে, তাহা বোর্ড কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে।

বাকী প্রাপ্য না থাকিলে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা মতে কার্য্য করা যাইতে পারে না, এবং বাকী না থাকিলে যে নীলাম হয়, তাহা এককালে বৃথা।

বিচারপতি বেলি।—এই মোকদ্দমায় বাবু হরগোপাল দাস ও হংসরাজ সাহু প্রতিবাদী আপেলাণ্ট; ও রামগোপাল সাহী প্রভৃতি বাদী, এবং কালেক্টর এক জন প্রতিবাদী, রেস্পণ্ডেণ্ট।

গবর্ণমেণ্টের তৌজীলিখিত চরাউয়া নামক এক তালুক-ভুক্ত ধুন্দী পরশুরাম, কোসরা চারো, চক মাহমুদ, মালকধুয়া এবং জগদীশপুর মৌজার নানা অংশের দখল পাওয়ার জন্য ও তাহাতে স্বত্ব সাব্যস্ত করার নিমিত্ত, এবং বাটোয়ারা আমীনের বেতন আদায় করার জন্য কালেক্টর ১৮৬৮ সালের ৮ ই মে তারিখে যে নীলাম করেন, তাহা অন্যথা করার জন্য, বাদিগণ নালিশ করে। বাদিগণ বলে যে, উল্লিখিত ধুন্দী পরশুরাম মৌজার কিয়দংশের কতিপয় শরীক বাদিগণের অজানিত রূপে বাটোয়ারার দরখাস্ত করত আমীনের ফীস দাখিল করে। বাদিগণ স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা বাকী ফীস দেয় নাই, এবং ঐ বাকী আদায়ের জন্যই নীলাম হয়। কথিত হইয়াছে যে, ১৮৬৮ সালের ১০ ই আগষ্ট তারিখে, অর্থাৎ যে নীলাম অন্যথা করার জন্য বাদিগণ এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, কমিশনর যে তারিখে সেই নীলাম মঞ্জুর করেন সেই তারিখে নালিশের হেতু উত্থিত হয়।

আরজীর প্রথম কথা এই যে, ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের লিখিত কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করা হয় নাই, সুতরাং নীলাম আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যেহেতু বাটোয়ারা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমীনের ফীস বাকী হইয়াছে বলা যাইতে পারে না, এবং এই বাটোয়ারা সমাপ্ত হয় নাই, অতএব এই নীলাম বাতিল ও অকর্ম্মণ্য, কারণ, বিধিমত বাকী না পড়িলে বিধিমত নীলাম হইতে পারে না।

তৃতীয় কথা এই যে, যখন নীলাম হইয়াছিল তখন ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের বিধানান্তর্গত বাকী পাওয়ানা ছিল না, কারণ, বাকী টাকা নীলামের পূর্ব্বে দিতে চাওয়া হইয়াছিল এবং

কালেক্টর তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি পশ্চাতে ঐ নীলাম হইয়াছে।

বাদিগণের চতুর্থ কথা এই যে, যেহেতু গোবিন্দসহায় প্রভৃতি যাহারা কেবল এক মৌজার কিয়দংশের শরীক এবং যাহাদের নাম কালেক্টরের বহীতে স্বতন্ত্র রূপে রেজিষ্টরী-কৃত ছিল, কেবল তাহারাই বাটোয়ারার প্রার্থী ছিল, অতএব অন্যান্য শরীকগণের নিকট বাটোয়ারার ফীস তলব করা অথবা তাহা তাহাদের বাকী বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না।

পঞ্চম কথা এই যে, প্রত্যেক শরীকের হিস্যা নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করা এবং তদনুসারে আমীনের ফীস দাবী করা উচিত ছিল, এবং যে ব্যক্তি টাকা না দেয় কেবল সেই ব্যক্তিই বাকীদার বলিয়া গণিত হইবে। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রণালীমতে কার্য্য করা হয় নাই, অতএব পৃথক্ নিয়মানুসারে যে নোটিস জারী হইয়াছে, এবং সেই নিয়মানুসারে যে বাকীর হিসাব করা হইয়াছে এবং যে এস্তাহারে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তৎসমুদায়, নীলাম সমেত আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে।

নীলাম-ক্রেতা হরগোপাল দাস এবং হংসরাজ সাহু জওয়াবে বলে যে, ১ম, আইন ও বোর্ড অব্ রিবেনিউর বিধিমতেই নীলাম হয়; ২ য়, কালেক্টর নিজের সেরেস্তার যে সকল কাগজপত্র দৃষ্টে কার্য্য করিতে বাধ্য, তদনুসারেই ঐ নীলামের কার্য্য এবং নোটিস সমস্ত জারী হয়; ৩ য়, ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন এবং ১৮৩৮ সালের ১১ আইন সম্বন্ধে ঐ নীলাম অবৈধ বলিয়া যে সকল তর্ক হইয়াছে তাহা কমিশনরের সমক্ষে উত্থাপিত হয় নাই, সুতরাং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৩ ধারা মতে তাহা জাবেতা নালিশে প্রবল হইতে দেওয়া যাইতে পারে না; ৪ র্থ, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের বিধান এই যে, বাটোয়ারা আমীনের ফীস একবার নির্দ্ধারিত হইয়া প্রদত্ত না হইলেই বাকী রাজস্বের নীলামের ন্যায়, বাকীদারের তৌজীভুক্ত সম্পত্তির নীলাম দ্বারা আদায় হইবে, এবং ১৮৩৮ সালের ১১ আইনে এমন লেখা নাই যে, বাটোয়ারা সমাপ্ত না হইলে বাকীর জন্য নীলাম হইবে না; পঞ্চম, টাকা দেওয়ার জন্য যে শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত হয় সেই তারিখের পরে নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত টাকা গ্রহণ করা না করা কালেক্টরের ইচ্ছাধীন, এবং টাকা দেওয়ার নির্দ্ধারিত শেষ দিবসের (এই স্থলে ১৮৬৭ সালের ২৮ এ মার্চ) সূর্য্যাস্তের পরে তিনি টাকা লইতে আইনমতে বাধ্য নহেন; ৬ষ্ঠ, কালেক্টরের তৌজীতে মৌজা ধুন্দীপরশুরাম স্বতন্ত্র মহাল নহে, তাহা তৌজীর ২১০১ নং মহালভুক্ত; অতএব গোবিন্দ ঐ মৌজার এক ভাগের শরীক বিধায় সমুদায় ২১০১ নং মহালেরও শরীক ছিল; এমত অবস্থায়, গোবিন্দ অথবা অন্য কোন রেজিষ্টরী-ভুক্ত মালিক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে ত্রুটি করিলে, মহালের নীলাম হইতে পারে, এবং বাটোয়ারার ফীসের বাকী গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকীর ন্যায় আদায় হইতে পারে; এবং ৭ম, নোটিস আইন-সঙ্গত হইয়াছে এবং ফীসের দাবী এবং নীলাম হওয়ার সম্ভাবনার কথা বাদী সম্পূর্ণ রূপে অবগত ছিল, কারণ, সে নীলামের পূর্ব্বে টাকা দিতে চাহিয়াছিল।

প্রতিবাদী-কালেক্টরের পক্ষে গবর্ণমেণ্টের উকীলের জওয়াব এই যে, গবর্ণমেণ্ট এই মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে ইচ্ছা করেন না।

অধঃস্থ জজ বাবু ভূপতি রায় অতি যত্নের সহিত তর্ক সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিচার্য্য বিষয় এই, যথা:—

"১ ম, বাটোয়ারা আমীনের খরচ নির্দ্ধা-
"রণ করার জন্য, এবং ১৮৩৮ সালের ১১ আইন
"মতে ঐ খরচ মঞ্জুর হওয়ার পূর্ব্বে, যাহারা
"বাটোয়ারার প্রার্থনা করে তাহারা ভিন্ন
"এজমালী সম্পত্তির অন্য মালিককে সেই খরচ

"দিবার অনুমতি দিতে, এবং বাটোয়ারা "সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে বাকী রাজস্বের "ন্যায় তাহা আদায় করিতে কালেক্টরের "ক্ষমতা।"

"২য়, বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের নিকট এন্তেমেজাজ না করিয়া সম্ভাবিত খরচ মঞ্জুর করিতে "কমিশনরের ক্ষমতা।"

এই সকল বিষয়ে অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করেন যে, "ঐ আইনের ভূমিকায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের ১৫ "ধারা রদ করত, তৎকালের অনিষ্টের প্রতি-"কার করাই ব্যবস্থাপকগণের উদ্দেশ্য ছিল। "ঐ ধারার মর্ম্ম এই যে, মহালের জমার উপরে "আমীনেরা নির্দ্দিষ্ট শতকরা হিসাবে খরচা "পাইবে। কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ঐ "শতকরার এক তৃতীয়াংশ আমীনকে অগ্রিম "প্রদান করিতে হইবে, আর এক তৃতীয়াংশ "বাটোয়ারা অর্দ্ধ সমাপ্ত হইলে এবং বাকী "অংশ বাটোয়ারা সমুদায় সমাপ্ত হইলে দিতে "হইবে। ঐ ধারা রদ করিয়া ১৮৩৮ সালের "১১ আইনের বিধান এই যে, বোর্ড অব্ রিবেনিউ "বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে, বাটো-"য়ারা নির্ব্বাহের জন্য নিয়োজিত আমীনের "খরচা নিরূপণ করিতে, এবং বোর্ড যে যে "সময়ে ও যে যে পরিমাণে উচিত বোধ করেন "সেই সেই সময়ে ও পরিমাণে, বাকী রাজস্বের "ন্যায়, ঐ খরচা পক্ষগণের নিকট হইতে আদায় "করাইতে পারিবেন।"

অধঃস্থ জজ অনন্তর বলেন যে, "ঐ দাবী "বাকীর দাবী হইয়াছিল কি না, তাহাই এই-"ক্ষণে বিচার্য্য। আমি প্রথমেই দেখাইয়াছি "যে, তৎকালে ইহা দাবীর যোগ্য ছিল না, "কারণ, ১৮৩৮ সালের ১১ আইন মতে "বোর্ড কর্তৃক সম্ভাবিত ব্যয় স্থিরীকৃত অথবা "নির্দ্ধারিত হইয়াছিল না। অতএব দেখা যাই-"তেছে, যে, এমন কোন বাকী ছিল না "যাহার নিমিত্ত কালেক্টর ঐ ধারা মতে বৈধ "নোটিস জারী করিতে পারিতেন। তর্কিত হই-"য়াছে যে, কালেক্টর সম্ভাবিত ব্যয় নির্ণয় করত "তাহা আদায়ের জন্য এক দিন স্থির করিয়া-"ছিলেন, এবং সেই দিবস টাকা প্রদত্ত না "হওয়াতেই তাহা বাকী হইয়াছিল। এই তর্ক "আমার বিবেচনায়, অকর্ম্মণ্য, কারণ, খরচ "বোর্ড কর্তৃক স্থির না হইলে মালিকদিগের "নিকট তাহা তলব করিতে কালেক্টরের কোন "ক্ষমতা ছিল না। সওয়ালজওয়াবে কথিত "হইয়াছে যে, কোন কোন বিষয়ে বোর্ডের ক্ষমতা "কমিশনরের আছে, অতএব সম্পত্তির বাটোয়া-"রার খরচ মঞ্জুর করিতে পাটনার কমিশনরের "ক্ষমতা ছিল। অতএব লিখিত আইনের বিধান "মতে বোর্ড যে সকল কার্য্য করিতে বাধ্য, "তাহা যে কমিশনরের প্রতি অর্পণ করিতে "বোর্ডের কোন ক্ষমতা আছে, উকীল এমন "কোন আইন দর্শাইতে পারেন নাই।"

"কমিশনর কালেক্টরের কার্য্য সমস্তের "তত্ত্বাবধারক, এবং কমিশনরের হস্ত দিয়াই "বোর্ডে পত্র প্রেরণ করা এবং বোর্ডের পত্র "পাওয়া যায়। যদি ইহাও অনুমান করিয়া লওয়া "যায় যে, সুবিধার জন্য এবং কার্য্য শীঘ্র "নির্ব্বাহ করার জন্য বোর্ড তাঁহাদের ক্ষমতা "কমিশনরের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলেন (যাহা "আমি বোধ করি কখন হয় নাই), এবং যদি "ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, বোর্ডে "এন্তেমেজাজ না করিয়া অথবা বাঙ্গালার গবর্ণ-"মেণ্টের অনুমতি না লইয়া বাটোয়ারার খরচ "স্থির করিতে কমিশনরের ক্ষমতা আছে, "তাহা হইলেও কমিশনর কর্তৃক ঐ খরচ "নির্দ্ধারিত না হইলে কালেক্টর, মালিকগণের "উপর তাহা দেওয়ার হুকুম দিতে পারেন না "সম্ভাবিত খরচ এবং আমলা ১৮৬৮ সালের "৩০এ জানুয়ারি তারিখে কমিশনর মঞ্জুর করেন "এবং ঐ মঞ্জুরী অনুসারে মালিকগণের আপ

"আপন অংশের খরচা দেওয়ার জন্য কালেক্-
"টর কোন দিন স্থির করেন নাই। অতএব
"কালেক্টর কি বলিয়া তাহা বাকী বিবেচনা
"করত ৫ ধারা মতে টাকা দেওয়ার শেষ দিবস
"স্থির করিয়া নোটিস জারী করিয়াছিলেন,
"তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

"আমার ইহাও বলা আবশ্যক যে, কালেক্-
"টরের মতে এই বাকী, ১৮১৪ সালের ১৯
"কানুনের ৪ ধারার ৩ য় প্রকরণ মতে রাজস্ব
"বাকীর ন্যায় আদায় হইতে পারে। এই ধারার
"বিধান এই যে, বাটোয়ারা সম্পূর্ণ হওয়ার
"পরে সমুদায় মহালের জমা সম্বন্ধে প্রত্যেক
"শরীকের যে অংশ হইবে, সেই অংশের
"পরিমাণে শরীকগণ আপন আপন খরচা প্রদান
"করিবে। অতএব আইনের বাক্য দৃষ্টে আমি
"বলি যে, বাটোয়ারা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত
"কালেক্টর এই দাবী বাকীর দাবী বলিয়া
"বিবেচনা করিতে পারেন না।"

অধঃস্থ জজ পরিশেষে বলেন যে, "এই
"মোকদ্দমার সমুদায় অবস্থা দৃষ্টে আমার স্পষ্ট
"মত এই যে, বাটোয়ারার খরচ নির্দ্ধারণ
"করিতে কালেক্টরের কোন ক্ষমতা ছিল না,
"এবং বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া
"বোর্ড কর্তৃক খরচা নির্দ্ধারিত হওয়ার পূর্ব্বে
"কালেক্টর মালিকদিগকে খরচা দিতে হুকুম
"করিতে পারেন না, এবং যে দাবী আদায়
"করার জন্য কালেক্টর ঐ সম্পত্তি নীলাম করিয়া-
"ছিলেন তাহা বাটোয়ারা সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে
"বাকী গণ্য হইতে পারে না; অতএব কালেক্
"টর বাদীর সম্পত্তি অন্যায়রূপে এবং ক্ষমতা-
"ভাবে নীলাম করিয়াছেন।"

"প্রতিবাদীর পক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে,
"বাদী ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ২৬ ধারা
"মতে কমিশনরের নিকট আপীল করাতে,
"ঐ নীলামের ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে নূতন
"আপত্তি উত্থাপন করণে ঐ আইনের ৩৩ ধারা
"মতে বারিত হইয়াছে। কিন্তু আমি এই তর্ক
"গ্রাহ্য করিতে পারি না, কারণ, যে নীলাম
"আরম্ভেই অপকৃষ্ট, তাহা অন্তে উৎকৃষ্ট হইতে
"পারে না। যদি উপরি উক্ত হেতুবাদে কালেক-
"টরের ঐ নীলাম করার কোন ক্ষমতা না থাকিয়া
"থাকে, তবে কাজেই তাহা বৃথা হইবে; এবং
"বাদী কমিশনরের নিকট আপীল করিয়াছে
"বলিয়াই ঐ নীলাম উৎকৃষ্ট হইতে পারে না,
"অথবা বাদী কমিশনরের নিকট যে সমস্ত আপত্তি
"করিয়াছিল, নীলামের বিরুদ্ধে তদ্ভিন্ন অন্য
"আপত্তি উপস্থিত করিতেও সে বারিত হইতে
"পারে না।"

"২ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ১ ম
"পৃষ্ঠায় প্রচারিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির *
"উল্লেখ করা আবশ্যক; তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হই-
"য়াছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কমিশনরের নিকট
"আপীল না করিয়া থাকিলেও, নীলাম বেআইনী
"হওয়ার হেতুতে তাহা অন্যথা করার জন্য
"নালিশ দেওয়ানী আদালত গ্রহণ করিতে
"পারেন।"

"অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, ১৮৫৯ সালের
"১১ আইনের বিধান বাদীর মোকদ্দমায় খাটে
"না। আমি দেখিতেছি যে, এই মোকদ্দমার
"নিষ্পত্তির জন্য তৃতীয় ইসু আর প্রয়োজনীয়
"নহে।"

অধঃস্থ জজ বাদীর নালিশের ডিক্রী দেওয়ায়
প্রতিবাদী নীলাম-ক্রেতাগণ নিম্নলিখিত হেতুবাদে
আপীল করিয়াছে:—

১ ম। নিম্ন আদালত অন্যায়রূপে নির্দ্দেশ
করিয়াছেন যে, বাটোয়ারা আমীনের ফীস
নির্দ্ধারণ করিতে কালেক্টরের ক্ষমতা নাই।

২ য়। ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের দ্বারা
গবর্ণমেণ্টের এবং বোর্ডের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত
হয়, তাহা রিবেনিউ কমিশনরের উপরে

* বাঙ্গালা সাঃ রিপোর্ট, তৃতীয়ভাগ, পূর্ণাধি-
বেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি, ৬৪ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

অর্পিত হইয়াছে; অতএব নিম্ন আদালত এই মোকদ্দমায় অন্যায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নীলাম করিতে কালেক্টরের অধিকার ছিল না।

৩য়। নিম্ন আদালত যে নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই মোকদ্দমায় খাটে না, কারণ, পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পন্ন ঐ মোকদ্দমায় দেওয়ানী আদালত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, বাদী বাটোয়ারার খরচের জন্য দায়ী নহে, অতএব তাহাতে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায়, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদীর অংশের বাটোয়ারার খরচ বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় করার যোগ্য ছিল, অতএব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৩ ধারা দৃষ্টে বাদীর আপত্তি গ্রহণ করা উচিত ছিল না, কারণ, রিবেনিউ কমিশনরের নিকট এই সকল আপত্তি উপস্থিত হয় নাই।

৪র্থ। আমাদের সমক্ষে স্বীকৃত হইয়াছে যে, নীলামের পূর্ব্বে টাকা লইয়া সাধা হইয়াছিল, এবং বাকী থাকিয়া থাকিলে, কালেক্টরের বাক্যমতে ২৪১ টাকা বাকী ছিল; এবং যে এস্তাহারে লেখা ছিল যে, ২৮ এ মার্চ্চ তারিখে বাকী প্রদান করিতে হইবে তাহার তারিখ ৬ ই মার্চ্চ।

এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, বাটোয়ারা সম্বন্ধে বোর্ডের ১৮৫৪ সালের ৩০ এ আগষ্ট তারিখের সরক্যুলর অর্ডার এবং বোর্ডের সেক্রেটরী মেং চ্যাপম্যানের পুস্তকের ৮ দফার ৫০ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, ৩০ দিন মেয়াদে নোটিস হইবে, কিন্তু এই স্থলে মেয়াদ কেবল ২২ দিবস ছিল। কিন্তু আইনের বিধান এই যে, ১৫ দিবসের ন্যূন নহে এবং ৩০ দিবসের অধিক নহে, এমত সময় দিতে হইবে। মাল সম্পর্কীয় কার্য্য সম্বন্ধে মালের কর্ম্মচারিগণের জন্য বোর্ডের সরক্যুলর অর্ডার পথপ্রদর্শক হইতে পারে, কিন্তু আদালত অথবা মালের কর্ম্মচারিগণ যখন বিচার কার্য্যে উপবিষ্ট হন তখন তাঁহাদের জন্য ঐ সমস্ত সরক্যুলর, আইন নহে।

নীলামের পূর্ব্বে টাকা দেওয়া সম্বন্ধে আমার মত এই যে, তাহা লইতে অস্বীকার করার হেতুতে কমিশনর ও কালেক্টরের যে কিছু দোষ বা বিবেচনার ত্রুটি থাকুক, সেই অস্বীকার আইন-বিরুদ্ধ নহে।

আমাদের বিচার্য্য প্রধান প্রশ্ন আইন-ঘটিত, এবং তাহা এই যে, কালেক্টর ১৮৩৮ সালের ১১ আইনানুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন কি না যে, বাটোয়ারা আমীনের ফীসের বাবৎ অপ্রদত্ত ২৪১ টাকার দাবী সরকারী রাজস্ব বাকীর তুল্য বিবেচনা করিয়া ১৮৫৯ সালের ১১ আইন ও ১৮৩৮ সালের ১১ আইনমতে সমুদায় সম্পত্তি তিনি ন্যায্যরূপে নীলাম করিতে পারেন।

যদি এই প্রথম ও প্রধান প্রশ্নের উত্তরে আমরা 'না' বলি, তবে আপীলের অন্যান্য হেতুর বিচার করার আবশ্যক থাকিবে না।

আমি এমন বিবেচনা করি না যে, ১৮৩৮ সালের ১১ আইনমতে প্রত্যেক স্থলেই বোর্ডের বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণরের অনুমতি লইতে হইবে; আমার বিবেচনায়, এক সাধারণ অনুমতি হইলেই আইনের বিধান প্রতিপালিত হয়।

অনন্তর, যদি গবর্ণমেণ্ট বোর্ড অব্ রিবেনিউর উপরে এক সাধারণ হুকুম দেন, তাহা হইলে আমীনের বেতন সম্বন্ধে কত টাকা লইতে হইবে ও কাহার নিকট এবং কোন্ কোন্ সময়ে তাহা আদায় হইবে, তদ্বিষয়ে বোর্ডও এক সাধারণ হুকুম প্রচার করিতে পারেন।

জোন্সের সরক্যুলর অর্ডরের ২য় বালমের ১০ পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে যে, বাটোয়ারার ষ্টাবলিশমেণ্ট মঞ্জুর করিয়া রিবেনিউ বোর্ডের প্রতি আদেশ স্বরূপে ঐ বোর্ডের বরাবর বাঙ্গালার ডেপুটি গবর্ণরের ১৮৪০ সালের ১৫ ই, জুলাই তারিখের ২৪ নং এক পত্র আছে। আমি বিবেচনা করি যে, ষ্টাব্লিশমেণ্ট শব্দের মধ্যেই ফীসের পরিমাণ এবং তাহা কোন্ সময়ে এবং কত অংশে আদায় হইবে, তৎসমুদায়

ভুক্ত, কারণ, ঐ ষ্টাব্লিশমেণ্ট কার্য্যকারক হওয়ার জন্য ঐ সকল কথাও আবশ্যক।

কালেক্টর এই ষ্টাব্লিশমেণ্ট স্থাপনার্থে যে ফর্দ্দ দিবেন তাহাতে প্রত্যেক স্থলেই বোর্ডের মঞ্জুরীর আবশ্যক এবং তাহার পরে কমিশনর সেই ষ্টাব্লিশমেণ্ট স্থির করিবেন। ঐ ফর্দ্দে ফীসের টাকা এবং কখন্ তাহা দেয় হইবে, এবং কোন্ ব্যক্তির নিকট হইতে এবং কি কি অংশমতে তাহা আদায় হইবে, তাহা লেখা থাকিবে। কমিশনর ইহা করিলে পরে যদি বোর্ড তাহা মঞ্জুর করেন, তবে ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের বিধানমতে কালেক্টরের ফর্দ্দ অনুযায়ী কমিশনরের নির্দ্ধারিত এবং বোর্ডের মঞ্জুরী-কৃত ফর্দ্দের লিখিত আমীনের ফীস যদি দাবী করা মাত্রে প্রদত্ত না হয়, তবে তাহাকে বাকী বলিতে হইবে, এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের ন্যায় নীলামের দ্বারা আদায় হইবে।

আমি আরও বিবেচনা করি যে, অধঃস্থ জজ ভ্রমাত্মক রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাটোয়ারা সমাপ্ত না হইলে ঐ অপ্রদত্ত টাকা বাকী স্বরূপ গণ্য হইবে না। ইহা সত্য বটে যে, ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণের বিধান তাহাই ছিল; কিন্তু ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের দ্বারা তাহা রদ হইয়াছে। এই পশ্চাতের আইনে দেখা যাইতেছে যে, বাটোয়ারা আমীনের বেতন যে যে সময়ে এবং যে অংশমতে আদায়ের জন্য বোর্ড নির্দ্ধারণ করিবেন, বোর্ড গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তাহা সেই প্রকারে আদায় করিবেন। কিন্তু এই স্থলে যে, বোর্ডের মঞ্জুরী পাওয়া হইয়াছিল, অথবা কমিসনর ষ্টাব্লিশমেণ্ট নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, এমত প্রদর্শিত হয় নাই। কালেক্টরের ফর্দ্দে বিনা দস্তখতী এক ইয়াদদস্ত আছে যে, ঐ ফর্দ্দ কমিশনর তাঁহার ১৮৬৮ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখের পত্রের দ্বারা মঞ্জুর করিয়াছেন, কিন্তু কমিশনরের ঐ পত্র আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই, এবং কমিশনর যে, এই প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার কোন আইন-সঙ্গত প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই বা হওয়ার চেষ্টাও করা হয় নাই।

আমার বিবেচনায়, এই কথাই [নীলামের প্রতি সাংঘাতিক আপত্তি, কারণ, সকলেই স্বীকার করেন যে, অন্ততঃ কমিশনরের মঞ্জুরীর আবশ্যক ছিল।

মেং চ্যাপমানের পুস্তকের ৫ ম ধারায় ৪৯ পৃষ্ঠার পার্শ্বে লিখিত টীকায় যে লেখা আছে যে, "জাবেতামত মঞ্জুরীর অধীনে কমিশনর মঞ্জুর "করিতে পারেন," তাহা আমাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু ১৮৩৮ সালের ১১ আইনে তাহা বলে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিধি ব্যবস্থাপক সমাজের আইনে আছে, বোর্ড অব্ রিবেনিউর হুকুমমতে কার্য্যপ্রণালীর যে বিস্তারিত নিয়ম সকল প্রস্তুত হইয়াছে তাহা পটুতার সহিত প্রস্তুত হইয়া থাকিলেও, আইন নহে।

অনন্তর আমি নির্দ্দেশ করিতেছি যে, কমিশনরের মঞ্জুরী হইলেও তাহা আইনমতে যথেষ্ট হইত না, কারণ, আমি বিবেচনা করি যে, ১৮৩৮ সালের ১১ আইনমতে বোর্ডের মঞ্জুরীর নিতান্তই আবশ্যক ছিল। ১৮২৯ সালের ১ম কানুনের দ্বারা বোর্ডের অনেক ক্ষমতা কমিশনরের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার পরে ১৮৩৮ সালের ১১ আইনে বিশেষ বিধি হইয়াছে যে, বাটোয়ারার ষ্টাব্লিশমেণ্ট এবং কত ফীস কোন্ সময়ে কি পরিমাণে আদায় হইবে তৎসমুদায় সম্বন্ধে বোর্ডের মঞ্জুরী আবশ্যক। কিন্তু এই স্থলে বোর্ড যে, বাটোয়ারার ষ্টাবিশমেণ্ট, অর্থাৎ আমীনের ফীস, তাহার কত টাকা, ও কোন্ সময়ে কাহার নিকট এবং কি অংশমতে আদায় হইবে তদ্বিষয় মঞ্জুর করিয়া কমিশনর অথবা কালেক্টরের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, এমত প্রদর্শিত হয় নাই। অতএব আমি নির্দ্দেশ করিতেছি যে, গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বাকীর ন্যায় ফীসের বাকী

আদায় করার জন্য যে নীলাম হইয়াছে তাহা ১৮৩৮ সালের ১১ আইনমতে অবৈধ; অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারামতে কোন বাকী ছিল না, সুতরাং বৈধ নীলাম হয় নাই।

বাদীর কতিপয় বিষয়ে কমিশনরের নিকট দরখাস্ত না করা সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩৩ ধারার কি ফল হইবে, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যক নাই। উভয় পক্ষের সওয়াল-জওয়াবে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

অতএব আমি অধঃস্থ জজের রায় স্থির রাখিয়া কালেক্টরের নীলাম অন্যথা করিলাম। প্রতিবাদীরা সকল খরচা দিবে।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমার ভাব অতি কঠিন সত্ত্বেও অন্যান্য অনেক মোকদ্দমার ন্যায় এই মোকদ্দমায়ও এক কুপ্রথা অনুসারে সমুদায় কাগজপত্র আমাদের সমক্ষে প্রদর্শিত হয় নাই, এবং উকীলেরা যদি সৌজন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে ঐ সকল কাগজের অনুবাদ না দিতেন, তবে হয়ত আমি এই মোকদ্দমায় কোন রায়ই ব্যক্ত করিতে পারিতাম না।

আমি দেখিতেছি যে, মহাল চরাওয়ার ৮ মৌজার মধ্যে মৌজা ধুন্দী পরশুরাম নামক এক মৌজার এক তৃতীয়াংশের মালিক গোবিন্দসহায় প্রভৃতি ১৮৬৭ সালের ১২ ই জুন তারিখে ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনমতে বাটোয়ারার দরখাস্ত করে। সেই তারিখে সকল শরীককে, তাহাদের আপত্তি থাকিলে তৎসমুদায় এক মাসের মধ্যে উপস্থিত করার জন্য কালেক্টর এক নোটিস দেন। সেই মহালের ফুলওয়ারা নামক আর এক মৌজার ॥০ আনার শরীক মহম্মত গঞ্জাজয় ঐ প্রকার এক দরখাস্ত করে। ঐ মহালের চরাওয়া নামক আর এক মৌজার ৴৪ গণ্ডার মালিক পঞ্চমীসহায়ও ঐ প্রকার এক দরখাস্ত করে এবং ঐ শেষোক্ত মৌজার ১৭॥– গণ্ডার মালিক ফতেনারায়ণ সহায় ঐ প্রকার দরখাস্ত করে। বাদিগণ যাহারা ঐ সকল মৌজার কতক অংশের শরীক, তাহাদের উপরে প্রথম দরখাস্তের নোটিস জারী হয়, কিন্তু তাহারা তৎসম্বন্ধে কিছুই করে নাই এবং আমি যত দূর দেখিতেছি, তাহারা বাটোয়ারার সহায়তা অথবা প্রতিবন্ধকতা কিছুই করে নাই।

এই সকল দরখাস্তের উপরেই বাটোয়ারার কার্য্য হয় এবং ১৮৬৭ সালের ১৯ এ আগষ্ট তারিখে কালেক্টর ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের ৪ ধারা মতে এক ফর্দ্দ ( ষ্টেটমেণ্ট ) প্রস্তুত করেন। যে সকল সম্পত্তির বাটোয়ারা হইবে, তাহা এই ফর্দ্দে লিখিত হইয়াছে এবং মালিকের নামের ঘরে উপরিউক্ত প্রার্থিগণ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ প্রার্থী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামগোপাল সহায় প্রভৃতি এক দল প্রতিবাদী এবং দেবন রায় প্রভৃতি দ্বিতীয় দল প্রতিবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে আমীনের নাম এবং তাহার আমলাগণের পরিমাণ লেখা আছে। তাহার পরে কমিশন অর্থাৎ শতকরা ফীসের কথা লেখা আছে, এবং তাহাতে আদেশ আছে যে, এস্তাহার জারী হইলেই ঐ কমিশন প্রদত্ত হইবে; এবং তাহার পরে যে ঘর আছে তাহাই এই মোকদ্দমায় অত্যন্ত আবশ্যকীয়, এবং তাহা যে যে হিস্যানুযায়ী খরচ বিভক্ত হইবে তাহারই ঘর।

সেই দিবস মালিকদিগের উপরে এই নোটিস জারী হয় যে, ঐ ফর্দ্দ অনুসারে তাহারা খরচার আপন আপন অংশ দেয়।

কথিত হইয়াছে যে, যে অংশমতে খরচ দিতে হইবে তাহা কমিশনর কর্তৃক ১৮৬৮ সালের ২০ এ জানুয়ারি তারিখে মঞ্জুর হয়। এই মোকদ্দমায় বর্ণিত নীলামের পূর্ব্বে তাহা আর অন্য কাহার দ্বারা মঞ্জুর হয় নাই।

এক ফর্দ্দ যাহাতে বাদিগণ ২৫১/২ টাকা ও ২॥/৩ টাকার বাকীদার বলিয়া লিখিত ছিল, সেই ফর্দ্দ দৃষ্টে কালেক্টর ১৮৬৮ সালের ৬ ই মার্চ তারিখে এই হুকুম দেন যে, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের

৫ ধারার ৪ প্রকরণ মতে ঐ বাকীদারদিগের উপরে ১৮৬৮ সালের ২৮ এ মার্চ শনিবার দিবসে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিতে এস্তাহার জারী হয়; এই রাজস্ব শব্দে বোধ হয়, এই বাটোয়ার খরচ বুঝাইয়াছিল; এবং তদনুসারে ঐ এস্তাহার জারী হয়।

এই তারিখ অতীত হইয়া গেলে পরে বাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া, খরচা বাবতে যে টাকা দেয় ছিল, তাহা সমুদায় দিতে চাহে। সেই সময়ে বাস্তবিক কোন খরচা হয় নাই, এবং কলেক্টর হুকুম দেন যে ঐ টাকা আমানত থাকে এবং বলেন যে, তিনি নীলামের পূর্ব্ব দিবসে উচিত হুকুম দিবেন। ৮ ই এপ্রিল অর্থাৎ নীলামের নির্দ্ধারিত দিবসে কালেক্টর নির্দ্দেশ করেন যে, "হুণ্ডী আমানত করিতে ত্রুটি "করার কোন বৈধ হেতু ছিল না। নোটিস "প্রথমে ১৮৬৭ সালের জুলাই মাসে নির্গত হয়, "এবং প্রার্থীরা তীর্থভ্রমণে গিয়াছিল বলিয়া "যে জওয়াব দিয়াছে তাহা অকর্ম্মণ্য, কারণ, "তাহারা স্বীকার করে যে, কেবল দেড় মাস "হইল তাহারা তীর্থ ভ্রমণে গিয়াছিল। যাহারা "বাটোয়ারার প্রতি আপত্তি করে, তাহাদিগকে "অনর্থক বিলম্ব করিয়া বাটোয়ারা বন্ধ করিতে "দেওয়া উচিত নহে। অতএব দরখাস্ত নাম-"ঞ্জুর।" এপ্রযুক্ত নীলাম হয় এবং সমুদায় মৌজায় বাদিগণের স্বত্ব লাটবন্দী হইয়া ১৬১০০ টাকায় বিক্রীত হয়।

বাদী তাহার পরে কমিশনরের নিকট আপীল করে। কমিশনর বোধ হয় ঐ বিষয়ে কালেক্টরের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং তিনি বলেন যে, কালেক্টরের লিখিত অবস্থা দৃষ্টে তিনি কালেক্টরের হুকুমের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। কমিশনর বলেন যে, "মিছিল "সাবধানে দেখা গেল, কিন্তু কাগজপত্রে কোন "অনিয়ম দৃষ্ট হইল না। এই ঘটনা আপাততঃ "অন্যায় বোধ হইতে পারে, কিন্তু কেবল কষ্ট "দেওয়ার জন্য এবং বাটোয়ারা সমাপ্তির ব্যাঘাত "জন্মাইবার নিমিত্ত মালিকদের মধ্যে উদ্দোয়া "না দেওয়ার প্রথা আছে। মালিকদিগের "এই রূপ কার্য্যের দ্বারা বহু বৎসর পর্য্যন্ত "বাটোয়ারার কার্য্য মুলতবী থাকে। আপীল "ডিস্‌মিস্ হইল।"

অতএব বাদিগণ ক্রেতার নিকট বিক্রীত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করে; এবং অধঃস্থ জজ, আমার মতে অতি সন্তোষজনক হেতুবাদেই মালের হাকিমদের কার্য্য এককালে অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং উচিত কর্ম্মচারীর দ্বারা খরচার বিভাগ হয় নাই, সুতরাং এমন কোন বাকী ছিল না যাহার জন্য সম্পত্তি নীলাম হইতে পারে।

পক্ষগণের মধ্যে যে গুরুতর স্বত্ব লইয়া বিরোধ উপস্থিত, তাহা ব্যতীতও এই মোকদ্দমায় যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে তাহা অতি সাবধানে পর্য্যালোচনা করা উচিত, কারণ, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, বাটোয়ারার মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী এবং মালের হাকিমদিগের ক্ষমতার বিষয়ে ঐ সকল কর্ম্মচারী যে মত অবলম্বন করেন, তাহা. অধঃস্থ জজের ও আমার এবং আমি বিবেচনা করি, বিচারপতি বেলিরও মতের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

১৭৯৩ সালের ১ ম কানুন যাহাতে রাজস্ব সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিতে হইবে তাহা ব্যক্ত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, জমিদারী সমস্ত যাহার তৎকালে কেবল মোটের উপরে রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা বিভক্ত হইলে ভিন্ন ভিন্ন মালিকগণের মধ্যে রাজস্বও অংশমত বণ্টন করা আবশ্যক। সেই কানুনের মর্ম্ম এই নহে যে, শরীকগণের মধ্যে জমিদারী বণ্টনের কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীরা হস্তক্ষেপ করিবেন, কিন্তু তাহার মর্ম্ম এই যে, জমিদারীর বিভাগ হইলে বিভক্ত ভাগ সমুহের উপরে রাজস্ব উচিত

রূপে বণ্টন করিয়া দেওয়ার জন্য মালের কর্ম্ম-চারিগণকে সংবাদ দিতে হইবে। কিন্তু সেই তারিখে যে বিশেষ কানুন অর্থাৎ ২৫ কানুন হয় তাহার ৪ ধারার ১ প্রকরণে বিধিবদ্ধ হয় যে, কালেক্টর কেবল রাজস্বের বণ্টন করিবেন এমত নহে, তিনি জমিদারীর বাটোয়ারাও করিবেন। ৪ ধারার ১ প্রকরণের বিধান এই যে, বাটোয়ারার জন্য যদি সমুদায় মালিক দরখাস্ত না করে, তবে যে সকল ব্যক্তি বাটোয়ারার দরখাস্ত করিবে, কেবল তাহারাই তাহাদের অংশ মতে বাটোয়ারার খরচ দিবে। ১৮০৩ সালের ২৭ কানুনের ৩২ ধারার ১ প্রকরণেরও বাস্তবিক ঐ বিধি। এই দুই বিধি ১৮১০ সালের ৫ম কানুনের দ্বারা রদ হয়, এবং তাহার ৩ ধারার ২ প্রকরণের বিধান এই যে, বাটোয়ারার সকল মোকদ্দমায়ই বাটোয়ারার খরচ সকল মালিক-গণের মধ্যে তাহাদের জমার অংশমতে বিভক্ত হইবে, এবং যদি তাহারা ঐ অংশমত খরচা না দেয়, তবে বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য যে প্রণালীর বিধি আছে, খরচার বাকী-দারের নিকট হইতে সেই প্রণালীমতে ঐ খরচা আদায় হইবে।

এই সমস্ত কানুন ১৮১৪ সালের ১৯ কানু-নের দ্বারা রদ হয়, কিন্তু ১৮১০ সালের ৫ম কানুনের ৩ ধারার ২ প্রকরণ ঐ নূতন কানুনের ৪ ধরার ৩ প্রকরণে পুনরায় বিধিবদ্ধ হয়। এই কানুনের ১৫ ধারায় বাটোয়ারার খরচার ও আমীনের বেতনের এক ফর্দ্দ লিখিত আছে।

কালেক্টর কি বোর্ড এই সকল খরচা নির্দ্ধা-রণ এবং বিভাগ করিবেন, তাহা এই সকল বিধানে স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না। কিন্তু কালেক্টরের সমুদায় কার্য্য বোর্ডে রিপোর্ট করিতে হইবে, এবং কেবল " মঞ্জুরী-কৃত " খরচই বণ্টন হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এই কানুন মতে খরচা সমস্ত বোর্ড কর্তৃক মঞ্জুর হইয়া থাকে।

এই কানুনের ১৫ ধারা ১৮৩৮ সালের ১১ আইনের দ্বারা রদ হয়, কিন্তু ৪ ধারার ৩ প্রকরণ রদ হয় নাই। এই আইনের ২ ধারার বিধান এই যে, বাঙ্গালার গবর্ণরের ( এইক্ষণে লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের ) মঞ্জুরী লইয়া বোর্ড, বাটোয়ারার কানুনমতে কোন জমিদারীর বাটো-য়ারা করার জন্য যে আমীন অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিয়োজিত হয়, তাহার বেতন স্থির করিবেন এবং বোর্ড যে সময় এবং যে অংশ উচিত বিবেচনা করেন, সেই সময়ে এবং সেই অংশমতে বাকী রাজস্ব আদায়ের প্রণালীমতে তাহা আদায় করিবেন।

আইনের এই বিধানমতে বোর্ড অব্ রিবে-নিউ এবং বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হওয়া সুকঠিন। ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত কালেক্-টরদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে বলা ভিন্ন আর যে কিছু করা হইয়া-ছিল, এমত আমার দৃষ্ট হয় না। ১৮৫০ সালে কমিশনরকে যে এক পত্র লেখা হয় ( ১৮৫০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারিখের ৭৬ নং পত্র ) তাহাতে ব্যক্ত আছে যে, ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের ৪ ধারার ৩ প্রকরণমতে প্রার্থী-শরীক-গণের নিকট সমুদায় খরচা লওয়ার যে প্রথা আছে, তাহা অন্যায়, অতএব তাহাতে হুকুম হয় যে, বাটোয়ারার দরখাস্তের তারিখে সকল শরীকগণকেই বাটোয়ারার খরচ দিতে আদেশ করিতে হইবে। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ইহার দ্বারা বিলম্ব হইবে, কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, সুবিচারের জন্য বিলম্ব অবশ্যই সহ্য করিতে হয়।

বোর্ড অব্ রিবেনিউর ১৮৫২ ও ১৮৫৩ সালের হুকুমের নকল এই আদালতে নাই, কিন্তু যে হুকুমের কথা এইক্ষণে বলা হইল এবং অন্যান্য পূর্ব্ব এবং পশ্চাতের হুকুম ১৮৫৪ সালের ৩০এ আগষ্ট তারিখের হুকু-

মের দ্বারা রদ হয়। ইহাতে কালেক্টরের প্রতি আদেশ আছে যে, তিনি কমিশনরের নিকট প্রাথমিক রিপোর্ট স্বরূপ এক ফর্দ্দ (ষ্টেট-মেণ্ট) পাঠাইবেন এবং কমিশনর বাটোয়ারার ষ্টাব্লিশমেণ্ট মঞ্জুর করিতে এবং ঐ ষ্টাব্লিশ-মেণ্টের কি বেতন দিতে হইবে তাহা স্থির করিতে সক্ষম হইবেন, এবং তিনি পরিশেষে বোর্ডের মঞ্জুরীর জন্য ঐ ষ্টাব্লিশমেণ্টের ত্রৈমাসিক ফর্দ্দ পাঠাইবেন। কালেক্টরের প্রতি হুকুম আছে যে, কত খরচ হওয়ার সম্ভব তাহা তিনি স্থির করিবেন; এবং খরচের পরিমাণ এবং তাহা যে সময়ে আদায় হইবে তাহা স্থির হইলে, মালিকগণের উপরে এক নোটিস জারী করিতে হইবে যে, বাটোয়ারার জন্য দরখাস্ত হইয়াছে, এবং তাহারা অংশমতে তাহার খরচের দায়ী; এবং তাহাদিগকে ইহাও জানাইতে হইবে যে, তাহারা খরচা না দিলে ঐ সম্পত্তিতে তাহাদের স্বত্বের নীলাম হইবে। খরচের অংশের জন্য ঐ ফর্দ্দে কোন ঘর নাই, কিন্তু বোধ হয়, কালেক্টরের রিপোর্টেই তাহা লেখা থাকার মনস্থ ছিল।

তাহার পরে, বোর্ড অব্ রিবেনিউর সেক্রেটরী বোর্ডের অনুমতিমতে বোর্ডের বিধি সমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রচার করেন, এবং তাহাতে ১৮৫৪ সালের ৩০ এ আগষ্টের পত্র আছে কিন্তু তাহা অনেক রূপান্তরিত হইয়াছে। যে আদর্শে কমিশনরের নিকট কালেক্টরের রিপোর্ট করিতে হইবে, তাহাতে আমীনের বেতন যে অংশ মতে আদায় করিতে হইবে, তাহার এক ঘর আছে, এবং তাহাতে লেখা আছে যে, "খরচা এবং অংশ সম্বন্ধে বোর্ডের যে মঞ্জুরী হইবে তাহা কেবল "জাবেতা" মাত্র।

বোর্ডের এই সকল হুকুম বাঙ্গালার লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর কত দূর মঞ্জুর করিয়াছিলেন, তাহা দৃষ্ট হয় না।

কমিশনর এবং কালেক্টরের ও বোর্ডের নিজের কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বোর্ডের কি রায়, তাহাও এই সকল হুকুম দৃষ্টে আমার বুঝা কঠিন।

মাল আদালতের জাবেতা সম্বন্ধে আমাদের সমক্ষে কোন প্রমাণ প্রয়োগ হয় নাই, কিন্তু কালেক্টর এই মোকদ্দমায় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, আমি বিবেচনা করি, তাহাই সেই জাবেতা, এবং তাহা এই, যথা, তিনি মালিকগণকে তাহাদের অংশানুযায়ী খরচা দেওয়ার জন্য যে নোটিস দিয়াছিলেন তাহাই, পরে কমিশনর কর্তৃক মঞ্জুর হওয়ার সর্ত্তে, তিনি এমন দাবী বিবেচনা করেন যে, তাহা দিতে ত্রুটি করিলে মালিকেরা দায়ী হইবে। আমি বিবেচনা করি যে, বোর্ডের মনস্থ ছিল যে, তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরা এই প্রণালী মতেই কার্য্য করিবেন।

কিন্তু আমার মত এই যে, এই প্রণালী আইন-সঙ্গত নহে। আমি পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালেক্টর বাটোয়ারার খরচা নির্ণয় এবং বণ্টনের যে কার্য্য করেন তাহা ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের ৪ ধারা মতে কেবল তাঁহার উচ্চতর কর্ম্মচারিগণকে অবগত করার জন্য হয়। যাহা হউক, ১৮৩৮ সালের ১১ আইন প্রচলিত হওয়ার পরে ঐ কার্য্যের ঐ ভাবই হইয়াছে, এবং বোর্ডের ১৮৫৪ সালের বিধিতেও তাহাই পরিগণিত হইয়াছে। অতএব কালেক্টরের কার্য্য দ্বারা এমন দাবীর উৎপত্তি হইতে পারে না, যদ্দ্বারা শরীকগণের নিকট বাকী পাওয়ানা হইতে পারে, এবং যে সকল হুকুম প্রচার করা উচিত বিবেচনা হইয়াছে, (যদিও আমি এমন কথা বলি না যে, ইহা অপেক্ষা অন্য কোন সরল উপায় অবলম্বিত হইতে পারিত না,) তদ্দৃষ্টে আমার মতে, আমীনের বেতন বোর্ড অব্ রিবেনিউ এবং বাঙ্গালার লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের দ্বারা, ও যে সময়ে এবং যে অংশমতে তাহা আদায় করিতে হইবে তাহা বোর্ডের দ্বারা, মঞ্জুর না হইলে কিছুই পাওয়ানা হইতে পারে না। আমার

বোধ হয় যে, লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর তাঁহার ১৮৪০ সালের ১৫ ই জুলাই তারিখের সরকুলর হুকুমের দ্বারা প্রকাশ্যরূপে এই সকল খরচ অনুমোদনের ভার তাঁহার নিজ হস্তে রাখিয়াছেন, এবং বোর্ড অব্ রিবেনিউকে বাটোয়ারার ষ্টাব্লিশমেণ্ট মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, কিন্তু তাহাও ষাণ্মাসিক ষ্টেট্‌মেণ্ট পাঠাইয়া গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মঞ্জুর করিয়া লইতে হইবে। আমার বোধ হয়, এ কথা বলিবার কাহারও ক্ষমতা নাই যে, লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণরের অথবা বোর্ডের মঞ্জুরী কেবল জাবেতা মাত্র, অর্থাৎ, তাঁহাদের মঞ্জুরী হউক বা না হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। ইহা সত্য বটে যে, বোর্ডের যে ক্ষমতা ছিল, তাহা ১৮২৯ সালের ১ ম কানুনের দ্বারা কমিশনরদিগের প্রতি অর্পিত হয়, কিন্তু বোর্ডের তৎকালে যে ক্ষমতা ছিল, কেবল তাহাই আইনের দ্বারা অন্য বিধান না হওয়া পর্য্যন্ত অর্পিত হইয়াছিল। অতএব আমার বিবেচনায়, বাদীর উপরে যে দাবী হইয়াছিল, নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত তাহার এমন কোন মঞ্জুরী হয় নাই, যদ্দ্বারা দাবীর পরিমাণ অথবা টাকা দেওয়ার তারিখ চূড়ান্ত রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। অতএব কোন বাকী ছিল না।

কিন্তু আমি আরও বিবেচনা করি যে, যদিও কমিশনরের মঞ্জুরী দ্বারা, বাদীর নিকট কত টাকা পাওয়ানা এবং তাহা কোন্ তারিখে দিতে হইবে, তাহা চূড়ান্ত রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল বিবেচনা করা যায়, তথাপি এই চূড়ান্ত নির্দ্ধারণের পরে দায়ীর নিকট দ্বিতীয় বার দাবী না করা হইলে, বাকী পড়িয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের এই দাবী বাকী রাজস্বের দাবীর ন্যায় নহে, কারণ, তাহাতে পক্ষগণ পূর্ব্বেই জানে যে, ঠিক কত টাকা, এবং কোন্ তারিখে দিতে হইবে; কিন্তু এই দাবী হিসাব এবং গণনার উপর নির্ভর করে, এবং যে পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট কত টাকা পাওয়ানা এবং তাহা কোন্ তারিখে দিতে হইবে, তাহা চূড়ান্ত রূপে নির্দ্ধারিত হইয়া তদনুসারে দাবী না করা হয়, সে পর্য্যন্ত আমার বিবেচনায়, টাকা দিতে ত্রুটি হইয়াছে বলা যাইতে পারে না। তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৬৮ সালের ৬ ই মার্চ তারিখের এস্তেহারই যথেষ্ট দাবী। কিন্তু আমি তাহা বিবেচনা করি না। কমিশনরের নির্দ্দেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেও, এস্তেহারে এমন কোন সংবাদ ছিল না যে, কমিশনরের চূড়ান্ত নির্দ্দেশ হইয়াছে। অধিকন্তু, আমি দেখিতেছি যে, বিচারপতি বেলির রায় এই (এবং তাহাতে আমি সম্মত) যে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারা মতে কার্য্য করার পূর্ব্বে বাকী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই এস্তাহার যখন জারী হয়, তখন কোন বাকী ছিল না।

এই সকল হেতু ছাড়াও, তর্কিত হইয়াছে যে, কালেক্টরের রিপোর্ট কমিশনরের দ্বারা মঞ্জুর হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। অধঃস্থ জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহা মঞ্জুর হইয়াছিল; এবং কালেক্টরের রিপোর্টের উপরে ঐ মর্ম্মে এক ইয়াদদস্ত আছে। আমি অধঃস্থ জজের এই বিষয়ের নির্দ্দেশের প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না।

ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৯ ধারামতে যখন টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল, তখন কালেক্টর ও কমিশনর যে সকল হেতুবাদে তাহা লইতে অস্বীকার করেন, তাহা যথেষ্ট নহে, এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা পরিচালন না করা উচিত হয় নাই। মোকদ্দমার এই ভাগের বৃত্তান্ত সমস্ত যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমার অতি চমৎকার-জনক বোধ হইতেছে, এবং তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে আমার অল্প সন্দেহ বোধ হয় নাই। কিন্তু তাহা কালেক্টর অস্বীকার করেন নাই, এবং কালেক্টরের দ্বারা গবর্ণমেণ্ট

এই মোকদ্দমার এক পক্ষ। অতএব আমি এই মোকদ্দমার জন্য তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

আমরা অবগত হইয়াছি যে, নীলামের দীর্ঘ কাল পূর্ব্বে বাটোয়ারার খরচের অর্দ্ধেকেরও অধিক কালেক্টরের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এবং বাটোয়ারা অনেক দূর পর্য্যন্ত সম্পাদন করার জন্য হস্তে যথেষ্ট টাকা থাকাতেও তাহা কিছু মাত্র করা হয় নাই। টাকা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া নোটিস দেওয়ার পূর্ব্বে আমানতী টাকার অধিক টাকা খরচ হওয়ার আশঙ্কা থাকিলেও কালেক্টরের যখন ইচ্ছা তখনই ঐ সম্পত্তি নীলাম করিয়া তাহা আদায় করিয়া লওয়ার ক্ষমতা ছিল, এবং দেখা যাইতেছে যে, ঐ সম্পত্তির মুল্য দবী-কৃত টাকার ৬০ গুণ ছিল। কি কারণে এক দিবসের জন্যও এই বাটোয়ারার কার্য্যে বিলম্ব হইয়াছিল, তাহা দৃষ্ট হয় না, এবং কালেক্টর অথবা কমিশনরও কোন কারণ প্রদর্শন করেন নাই। দেখা যাইতেছে যে, বাদিগণ তাহাদের অংশের টাকা দেওয়ার হুকুম প্রতিপালন না করায় অবজ্ঞা করিয়াছিল, এমত বিবেচিত হইয়াছে, এবং তাহারা তাহার পরে যে টাকা দেয় তাহা, অন্যকে ভয় প্রদর্শনের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপে লইতে অস্বীকার করত তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। এই সকল কার্য্য সম্বন্ধে আমি এই প্রকার বিবেচনা করিতে নিতান্ত অনিচ্ছু, কিন্তু আমাদের সমক্ষে যে সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ঐ সকল নিষ্পত্তির বাক্যগুলি দৃষ্টি করিতে গেলে, আর কোন প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে না।

ইহা অবশ্যই সপষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মালের কর্ম্মচারিগণের হস্তে যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা রাজস্ব দেওয়ার ত্রুটি হইলে গবর্ণমেণ্টের ক্ষতি নিবারণ করা ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় নাই, এবং তাহাও যে পর্য্যন্ত পরিচালন করা আবশ্যক, তাহাই করা উচিত, এবং উপস্থিত ঘটনার ন্যায় যে সকল ঘটনায়, গবর্ণমেণ্টের কিছু পাওয়ানা না থাকে এবং গবর্ণমেণ্টের কোন রূপ স্বার্থ না থাকে, তাহাতে ঐ ক্ষমতা আরো সাবধানে পরিচালন করা আবশ্যক। এবং ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ১৮ ধারার দ্বারা কালেক্টর এবং কমিশনরের প্রতি রেহাই দেওয়ার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা, বাকীদারেরা রেহাই পাওয়ার যে দরখাস্ত করে তাহা যদিও ঐ সকল হাকিম শুনিতে ও নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য, এবং যদিও ঐ হাকিমেরা যে প্রণালীতে সেই দরখাস্ত পর্য্যালোচনা করা উচিত বিবেচনা করেন তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না, তথাপি আমার মত এই যে, ঐ প্রকার দরখাস্তের নিষ্পত্তি করায় যে ভ্রমের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা নীলাম অন্যথা হইতে পারে না।

পরিশেষে, তর্কিত হইয়াছে যে, আইনে যে প্রকার খরচ বণ্টন করার বিধি আছে তাহা কমিশনরের দ্বারাও হয় নাই। আমিও বিবেচনা করি, তাহা হয় নাই। কমিশনরের নিকট যে ফর্দ প্রেরিত হয় এবং যাহাই বণ্টন বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহাতে "মালিকের নামের" ঘরে লেখা আছে যে, "গোবিন্দ সহায়, কালীচরণ সহায়, "দয়াল ও অদ্বৈতনারায়ণ সিংহ প্রথম দরখাস্ত-"কারী; মসম্মত গঙ্গাপত কুঁওর দ্বিতীয় দরখাস্ত-"কারী; রামচরণ সহায় তৃতীয় দরখাস্তকারী, "রামগোলাম সহায় প্রভৃতি প্রতিবাদী; বন্ধু "প্রভৃতি দরখাস্তকারী; দেবন রায় প্রতিবাদী;" "হুণ্ডীর অংশের" ঘরে লেখা আছে যে, "প্রথম "অংশ ৪৮১০ টাকা; দ্বিতীয় অংশ ৩৩॥৵৯, "তৃতীয় অংশ ১৮৵৮, চতুর্থ অংশ ৪৭১।৵১০; "প্রথম অংশ ৪।৶৩, দ্বিতীয় অংশ ২৪৮৵৯ "টাকা।" ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, "রামগোলাম সহায় প্রভৃতি প্রতিবাদী" বলিয়া যাহারা বর্ণিত হইয়াছে তাহাদের ৪৭১।৵১০

টাকা দিতে হইবে। কিন্তু যে সকল নোটিস জারী হইয়াছে তাহাতে যে টাকার দাবী হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত টাকার বিভিন্নতা আছে, অর্থাৎ তাহাতে ৩৭১৮৵১১ টাকা, ১৫॥৵৫ টাকা, ১৪৴৪ টাকা, ৫৩৮৵ টাকা এবং ৩৩॥৵৮ টাকা লেখা আছে। নোটিসে রামগোলাম সহায়ের নাম দুই বার লেখা আছে। অন্যান্য কয়েক ব্যক্তি যাহাদের নাম লেখা আছে তাহাদের সহিত উহার প্রতি ৩৭১৮৵১১ এবং ১৪৴৪ টাকা দেওয়ার আদেশ আছে। কালেক্টরের রিপোর্টে খরচের যে প্রকার বণ্টন আছে তাহার সহিত আমি উক্ত টাকা ঐক্য করিতে পারি না। আর দুইটি ফর্দ যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা ঐ টাকা ঐক্য হইতে পারে তাহা আমাদের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা নথীতে দৃষ্ট হয় না। তাহাতে কিছু ঐক্য হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হয় না। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হইলেও দেখা যায় যে, কমিশনরের নিকট যে ফর্দ্দ প্রেরিত হইয়াছিল, হয় তাহা অসম্পূর্ণ, নচেৎ তাহা পশ্চাতে সংশোধিত হইয়াছে। অতএব বাস্তবিক যে টাকার দাবী করা হইয়াছিল তাহা যে কমিশনরের দ্বারাও মঞ্জুর হইয়াছিল, ইহা প্রতিবাদিগণ প্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

অতএব আমি, বিবেচনা করি যে, এই নীলাম একেকালে বৃথা হইয়াছে, কারণ, এমন কোন বাকী ছিল না যাহার জন্য ঐ জমিদারী নীলাম হইতে পারে। আমি বিবেচনা করি যে, কমিশনরের মঞ্জুরী দ্বারাই এমন দাবী হইতে পারে না যাহা দিতে ত্রুটি করিলে, গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের ন্যায় পরিগণিত হইতে পারে, এবং কমিশনরের মঞ্জুরী যথেষ্ট হইলেও, আমি বিবেচনা করি যে, যখন ৬ ই মার্চ তারিখের নীলামের এস্তাহার জারী হয়, তখন কোন বাকী ছিল না, এবং সেই এস্তাহারের আজ্ঞা প্রতিপালন না করাতেও বাকী জন্মে নাই। অপিচ, সেই এস্তাহারে যে টাকা বাকী থাকার কথা লেখা ছিল, তাহা কমিশনরেরও মঞ্জুরীকৃত দাবী নহে।

তর্কিত হইয়াছে যে, নীলামের পরে বাদিগণ কমিশনরের নিকট যে আপীল করে, তাহাতে তাহারা এই সকল আপত্তি উপস্থিত করে নাই, অতএব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩১ ধারামতে এই আদালত সেই সকল আপত্তি শুনিতে পারেন না। কিন্তু উপরি-লিখিত হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি যে, কোন বাকী ছিল না এবং এমত তর্ক করা হয় নাই যে, এই রায় অনুসারে ২ য় বালম বেঙ্গল রিপোর্টের পূর্ণাধিবেশনের যে নিষ্পত্তিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, কোন বাকী না থাকায় নীলাম করিতে মালের কর্ম্মচারিগণের অধিকার ছিল না, তাহার সহিত এই মোকদ্দমার কোন প্রভেদ আছে।

এই সকল হেতুবাদে আমার বিবেচনায়, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

(গ)

---

২৫ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৫৬ নং মোকদ্দমা।

২৪-পরগণার অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

প্রসন্নকুমার পালচৌধুরী ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

মদনমোহন পালচৌধুরী প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে সকল অবস্থায় খাজানার বাকী হয়, তাহাতে যদি মাল আদালতের বিচারাধিকার না থাকে, তবে সেই বাকী খাজানার নালিশ দেওয়ানী আদালতে চলিতে পারে, এবং তাহাতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের লিখিত তমাদী খাটে না।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিবেচনায়, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলগণকে কষ্ট দেওয়ার আবশ্যক নাই, কারণ, আপেলাণ্ট নিম্ন আদালতের রায়ের প্রতি হস্তক্ষেপ করার জন্য কোন উৎকৃষ্ট অথবা যথেষ্ট হেতু দর্শাইতে পারে নাই।

এই আপীলে তিনটি আইন-ঘটিত প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে; প্রথম প্রশ্ন এই যে, দেওয়ানী আদালতের এই মোকদ্দমায় বিচারাধিকার নাই, কারণ, প্রতিবাদীর নিকট বাকী খাজানা আদায় করাই এই নালিশের উদ্দেশ্য বিধায়, তর্কিত হইয়াছে যে, তাহাতে কেবল মাল আদালতের বিচারাধিকার আছে। দেখা যাইতেছে যে, কেবল এই উদ্দেশ্যে মাল আদালতে এক নালিশ উপস্থিত হয়, কিন্তু এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশন কর্তৃক চূড়ান্ত রূপে নিষ্পন্ন হয় যে, তাহাতে কালেক্টরের বিচারাধিকার নাই, কারণ, বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বাস্তবিক চুক্তি না থাকায় ন্যায়ানুসারে প্রতিবাদিগণ দায়ী হইবে, কিন্তু তদ্বিষয় কালেক্টরের বিচার করার ক্ষমতা নাই। অতএব উপস্থিত মোকদ্দমা কেবল বাকী খাজানা পওয়ার জন্য উপস্থিত হয় নাই, যে সকল কথার উপরে মাল আদালতের বিচারাধিকার নাই, এবং যাহা স্থির হইলে প্রতিবাদীর দায় সাব্যস্ত করিয়া বাকী আদায় হইতে পারে, তাহাই নির্দ্দেশ করার জন্য নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায়, (উইক্লি রিপোর্টরের ৮ম বালমের ৪২৮ পৃষ্ঠার পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিতে এই রূপ স্পষ্ট রায় থাকায়) দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার ছিল।

দ্বিতীয় হেতু এই যে, এই দাবীতে তমাদী ঘটিয়াছে, কারণ, ১২৭০ এবং ১২৭১ সালের বাকী খাজানার জন্য এই নালিশ হওয়ায়, এবং তাহা ১২৭৫ সালের ৭ই মাঘ তারিখে উপস্থিত হওয়াতে, খাজানা বাকী হওয়ার তিন বৎসর পরে তাহা উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩২ ধারামতে তাহার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। আমার বোধ হয় যে, কেবল ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতেই ঐ আইনের লিখিত তমাদী খাটে। কিন্তু এই নালিশের বিচার ১৮৫৯ সালের ১০ আইনান্তর্গত নহে, দেওয়ানী আদালতের সাধারণ বিচারাধিকারান্তর্গত।

কিন্তু বাদীর সম্বন্ধে তিন বৎসরের তমাদী খাটিলেও আমার বিবেচনায়, এখনও তাহার যথেষ্ট সময় আছে, কারণ, মাল আদালতে সরল ভাবে মোকদ্দমা করিতে তাহার যে সময় ক্ষেপ হইয়াছে তাহা যে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৪ ধারামতে বাদ পাইতে পারে। ইহাই তৃতীয় হেতু, এবং আমার বিবেচনায়, ইহার নিষ্পত্তিও রেস্পণ্ডেণ্টের অনুকূল হইবে।

অবশিষ্ট প্রশ্ন বৃত্তান্ত-ঘটিত। * *

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

---

২৬এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

গুজারীলাল, দরখাস্তকারী।

বাবু আশুতোষ ধর দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পাওয়ার পরে তাহাকে দেওয়ানী আদালতের হুকুম অনুসারে গ্রেপ্তার করাতে মাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ না করায়, প্রধানতম বিচারালয় তাহাতে সনন্দের ১৫ ধারা-প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন।

**বিচারপতি বেলি।**—আমার মতে এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইবে। সত্য বটে, কোন আদালতের মধ্যে গ্রেপ্তার করিতে না পারিবার নিয়ম ন্যূনাধিক প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু এ স্থলে আমাদের নিকট সনন্দের ১৫ ধারান্তর্গত অতিরিক্ত ক্ষমতা অনুসারে এই হুকুমের প্রার্থনা হইয়াছে যে, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পাওয়ার পরে তাহার উপর দেওয়ানী আদালতের এক পেয়াদা পরওয়ানা জারী করাতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ না করায় অন্যায় পূর্ব্বক বিচারাধিকার অস্বীকার করিয়াছেন, এবং জজও সেই ভ্রম করিয়াছেন।

আমার বিবেচনায়, এ বিষয়ে সনন্দে ১৫ ধারামতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, কারণ, প্রথমতঃ, কোন্ অবস্থায় দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা জারী সম্বন্ধে ঐ আদালতের পেয়াদার উপর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিজের ক্ষমতা থাকে, কোন্ অবস্থায় থাকে না, তাহা প্রত্যন্ত অনিশ্চিত। দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তিকে বে-আইন গ্রেপ্তার করা হয় বা যাহার প্রতি অন্য কোন আইন-বিরুদ্ধ পরওয়ানা জারী করা হয়, তাহার প্রতিকারের অন্য উপায় আছে।

অতএব সনন্দের ১৫ ধারা সম্বন্ধে আমি এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিলাম।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমিও এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইলাম। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল কি না, তৎসম্বন্ধে আমি কোন মত প্রকাশ করিতে চাহি না। দরখাস্তকারী আমাদের নিকট যে সকল বৃত্তান্ত দর্শায় তাহাতে আমি এমন কিছু দেখি না, যাহাতে সনন্দেরপ্রদত্ত ১৫ ধারার ক্ষমতা অনুসারে এই আদালতের হস্তক্ষেপ করিবার আবশ্যক হয়। অতি সপষ্ট দেখা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী গ্রেপ্তার হইবার সময় ফৌজদারী অভিযোগ হইতে খালাস পাওয়ায় তৎসম্বন্ধে তাহার কোন হানি হয় নাই। দরখাস্তকারী যদি তাহাকে গ্রেপ্তার করা আইন-বিরুদ্ধ বিবেচনা করে, তবে তাহার যে উপায় অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ হয় তাহা সে করিতে পারে; কিন্তু আমি এমত কিছু দেখি না, যাহাতে এ মোকদ্দমার সদ্বিচারার্থে সনন্দের ১৫ ধারামতে আমাদের হস্তক্ষেপ করার আবশ্যক হয়।

( ব )

---

২ই মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং জে, বি, ফিয়ার।

১৮৬৯ সালের ২০৭ নং মোকদ্দমা।

মূলমিনের রেকর্ডরের ১৮৬৯ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

হাওয়া বী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

ইব্রাহিম সালীভয় ডুপলী (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

এল, পি, ডি ব্রাউটন বারিষ্টর, আপেলাণ্টের কৌন্সেল।

এস বর্টানেস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—কোন ব্যক্তির মৃত স্ত্রীর সম্পত্তির সরবরাহ ও বিভাগের নিমিত্ত মুলমিনের রেকর্ডরের আদালতে দশ হাজার টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রথমে নালিশ হয়, কিন্তু দাবীর কিয়দংশ মিথ্যা বলিয়া ডিস্‌মিস্ হওয়ায়, অবশিষ্ট অংশের দাবী দশ হাজার টাকার ন্যূন হয়, এবং এতৎসম্বন্ধে বাদী ডিক্রী পায়।

১৮৬৩ সালের ২১ আইনের ২৭ এবং ৩৯ ধারার ন্যায্য অর্থে, ঐ ডিক্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল চলিবে।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে বর্টানেস সাহেব দুইটি প্রাথমিক আপত্তি করেন:—

১ম।—এই ডিক্রী মোকদ্দমার মুল বিষয়ের নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তৎসম্পর্কীয় অন্য বিষয়ে হওয়ায়, ইহার বিরুদ্ধে আপীল চলে না।

২য়।—রেকর্ডরের আদালত যে আইন দ্বারা সংস্থাপিত হয়, তাহার ২৯ ধারা মতে এ আদালতে আপীল হইবে না; কিন্তু পক্ষগণ জাবেতা নালিশ উপস্থিত করিতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বোধ হয়, এই আপীল শ্রবণের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহা কোন কার্য্যের নহে। যে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে, তাহা আমার বিবেচনায়, মোকদ্দমার মুল বিষয়ের নিষ্পত্তির পূর্ব্বে তৎসম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের নিষ্পত্তি নহে; তাহা পক্ষগণের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

আমার ইহাও বোধ হয় যে, তাহা ১৮৬৩ সালের ২১ আইনের ২৯ ধারাবর্ণিত কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি নহে। তাহা বাস্তবিক মৃত আসা বীর সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিবার নিমিত্ত জাবেতা নালিশ। অতএব আমার বিবেচনায়, তাহা জাবেতা নালিশের নিষ্পত্তি এবং তাহার বিরুদ্ধে আপীল চলিবে।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমারও ঐ মত।

অতঃপর দোষগুণ সম্বন্ধে আপীলের তর্কবিতর্ক হইয়া এই রায় প্রদত্ত হয়, যথা—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমা ইব্রাহিম সালীভয় ডুপলী তাহার নিজের এবং তাহার নাবালগ সন্তানগণের পক্ষে, তাহার মৃত স্ত্রী আসা বীর সম্পত্তির সরবরাহ এবং বণ্টনের দাবীতে, উক্ত স্ত্রীর মাতা হাওয়া বী প্রতিবাদিনীর দখলে ঐ সম্পত্তি থাকায়, তাহার বিরুদ্ধে উপস্থিত করে। নালিশের আরজীমতে ঐ সম্পত্তি কতক ভূসম্পত্তি, যাহা অন্য এক স্থলে এক বাটী ও বাগানের অংশ বলিয়া ব্যক্ত আছে, এবং কতকগুলি বাজারের অংশ (মোট ৫৮ টা) এবং অনেক গহনা, কাপড় এবং অন্যান্য দ্রব্য।

প্রতিবাদিনী তাহার নিকট উক্ত গহনা, কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্য (যাহাই উক্ত দাবীর অধিকাংশ) থাকিবার কথা অস্বীকার করে; এবং সে ভূসম্পত্তি ও বাজারের অংশ সম্বন্ধে বলে যে, আসা বী আপন জীবদ্দশায় তাহাকে অর্থাৎ প্রতিবাদিনীকে তাহা এক দলীল লিখিতপড়িত করিয়াও মুলমিনের রেজিষ্ট্রারের আফিসে তাহা রেজিষ্টরী করিয়া হস্তান্তর করিয়া দেয়।

রেকর্ডরের আদালতে উভয় পক্ষই প্রমাণ দেয়, এবং উক্ত আদালত স্থির করেন যে, বাদী যে গহনা ও কাপড় ইত্যাদি প্রতিবাদিনীর হস্তে থাকিবার কথা বলে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, অতএব তিনি মোকদ্দমার উক্ত অংশ ডিস্মিস্ করেন। বাদী উক্ত নিষ্পত্তির ঐ অংশের বিরুদ্ধে আপীল করে না। প্রতিবাদিনী ঐ সম্পত্তির যে অবশিষ্ট অংশ এই লিখিত দলীল দ্বারা তাহাকে হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা বলে, তৎসম্বন্ধে, রেকর্ডর এই সিদ্ধান্ত করেন যে, আসা বী উক্ত দলীল লিখিয়া দেয় নাই, সুতরাং প্রতিবাদিনী ঐ অবশিষ্ট সম্পত্তি পাইতে পারে না; এবং তিনি বাদীর অনুকূলে এই রায় দেন যে, ঐ সম্পত্তি বিক্রয় হইবে, এবং বাদিগণ তাহার কতক নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইবে।

নিষ্পত্তির এই অংশ সম্বন্ধে প্রতিবাদিনী আপীল করে।

বাদী যে প্রাথমিক আপত্তি করে, যাহা পূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়াছে তাহা, ও ডিক্রীর সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থিত হইয়াছে, যথা মোকদ্দমা ১৮৬৩ সালের ২১ আইনের ২৭ ধারার অন্তর্গত নহে, অর্থাৎ মোকদ্দমার দাবী ৩০০০ টাকার অধিক এবং ১০০০০ টাকার ন্যূন নহে, তাহাই আমাদিগকে অগ্রে বিবেচনা করিতে হইয়াছে। মোকদ্দমা প্রথমে যেরূপ উপস্থিত হয়, তাহাতে ১০০০০ টাকার অধিক মুল্যের অর্থাৎ ১৩০০০ টাকার সম্পত্তির কথা ছিল; কিন্তু পরে উক্ত সম্পত্তির কতক অংশ অর্থাৎ ৬০০০ টাকা মুল্যের

সম্পত্তি নিম্ন আদালতের মতে বর্ত্তমান না থাকিবার বিষয় প্রদর্শিত হওয়ায় এবং তৎসম্বন্ধে মোকদ্দমা একেবারে ডিস্‌মিস্‌ হওয়ায় মোকদ্দমার যে পরিমাণ দাবী বা মূল্য অবশিষ্ট রহিয়াছে, এবং যাহার সম্বন্ধে আপীল হইয়াছে, তাহা ১০০০০ টাকার ন্যুন; এবং উক্ত আইনের ২৭ এবং ৩৯ ধারার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে আমার বোধ হয় যে, আমাদের নিকট এক্ষণে যে আপীল ১০০০০ টাকার ন্যুন মূল্যের সম্পত্তি সম্বন্ধে উপস্থিত, তাহা এই আদালতের বিচারাধীন।

এক্ষণে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বাদী যে সম্পত্তির ডিক্রী পাইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্ন আদালতের রায় শুদ্ধ কি না। আমার বোধ হয়, বিজ্ঞবর রেকর্ডর আসা বীর দলীল লিখিতপড়িত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহা প্রমাণের বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে প্রতিবাদিনীর নিজের সাক্ষ্য আছে, এবং মহম্মদ সালে যে মৃত আসা বীর মোক্তার ছিল ও সৈয়দ আলী যে উক্ত দলীলের সাক্ষী ছিল, ইহারা স্পষ্ট শপথ করিয়া বলে যে, আসা বী উক্ত দলীল লিখিয়া দেয়, এবং মহম্মদ সালেকে তাহা রেজিষ্টরী করিবার ক্ষমতা দেয়। এই প্রমাণের বিরুদ্ধে কেবল বাদীর নিজের সাক্ষ্য ব্যতীত আর কোন প্রমাণ নাই। নিম্ন আদালত বাদীর নিজের সাক্ষ্য মোকদ্দমার গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্টাভিধানে মিথ্যা ব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে যে তিন সাক্ষীর নাম উক্ত হইল, তাহাদের সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ঐ প্রমাণ বিশ্বাস করা অসম্ভব; এবং এ মোকদ্দমায় আর একটি ঘটনা আছে, যাহার গুরুত্ব খণ্ডন করা সহজ নহে, যথা, উপস্থিত দলীল যাহার উপর প্রতিবাদিনী নির্ভর করে, এবং যাহা মৃত আসা বীর প্রদত্ত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা যে সময়ে লিখিতপড়িত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সেই সময়েই রীতিমতে এবং প্রকাশ্য রূপে দলীলের রেজিষ্ট্রারের নিকট রেজিষ্টরী হয়। দলীলের রেজিষ্টরী দ্বারাই তাহা লিখিতপড়িত হওয়া সপ্রমাণ হয় না বটে; কিন্তু তাহা যে সেই সময়ে প্রকাশ্য রূপে রেজিষ্টরী করা হয়, তাহাতে এরূপ বিশ্বাসের অনেক পোষকতা করে যে, যে ব্যক্তি কর্তৃক এবং যে সময়ে তাহা লিখিত পড়িত হইবার বিষয় বলা হয়, তাহা দ্বারা এবং সেই সময়েই তাহা লিখিতপড়িত হইয়াছিল।

আর একটি কথা আছে, এবং তাহাও নিতান্ত অনাবশ্যকীয় নহে। তাহা এই যে, যে ব্যক্তি এই দলীল রেজিষ্টরী ও প্রচার করেন, তিনি এমত এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহার এই বিষয়ে কোন স্বার্থ থাকিবার সন্দেহ হইতে পারে না; সে ব্যক্তি এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী, এবং রেজিষ্টরী আফিসের জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং তাঁহার এ মোকদ্দমার কোন এক পক্ষের সহিত কোন সম্বন্ধ বা যোগ থাকিবার বিষয় দেখান হয় নাই। এবং আমার বোধ হয় যে, এই দলীল যে, রেজিষ্টরী আফিসের ক্লার্ক অর্থাৎ সাক্ষী জনসন নকল করে, তাহাতেই প্রতিবাদিনীর পক্ষের প্রমাণ আরো গুরুতর হইতেছে।

উক্ত দলীল লিখিতপড়িত সম্বন্ধে এই হওয়ায়, আমাদিগকে এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, শরাতে এমন কিছু আছে কি না যদ্দ্বারা, উক্ত দলীল অসিদ্ধ হয়। আমি দেখিতেছি যে, শরাতে এমন কিছু নাই, যদ্দৃষ্টে আমাদের ঐ দলীল অন্যথা করা উচিত হইতে পারে। বলা হইয়াছে যে, দান-গৃহীতার উক্ত দলীলের উপকার লাভার্থে দখল থাকা আবশ্যক; কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহার দখল ছিল। বাজারের অংশ সম্বন্ধে এক রূপ প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে, যথা, প্রতিবাদিনীকে তাহার কন্যা ঐ সকল অংশ দান করার সময় হইতে সে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত তাহার উপকার এবং লাভ পাইয়া আসিতেছে। অপর, ঐ বাটী সম্বন্ধে প্রকাশ যে, প্রতিবাদিনী

তাহাতে বাস করিয়াছে, এবং করিতেছে, এবং বাদী তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া অবধি প্রতিবাদিনী তাহাতে একাকী দখীলকার আছে। আমার মতে, কন্যা মাতাকে দান করিয়া তথায় বাস করে, এবং তাহার স্বামীও তথায় বাস করে বলিয়াই, দান-গৃহীতার দখল বাতিল বা পরিবর্ত্তিত হয় না, বা উক্ত দানও নিষ্ফল হয় না।

আরও বলা হইয়াছে যে, নিশ্চিত করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, এবং যে সম্পত্তি দেওয়া হয় তাহা বিভক্ত বা নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল। আমার বিবেচনায়, উক্ত প্রশ্ন এ স্থলে উত্থিত হয় না। আসা বী তাহার সম্পত্তির এক অংশ মাত্র দেয় নাই যে, তাহা অবশিষ্ট হইতে বিভক্ত হইতে পারিত, কিন্তু সে তাহার মাতাকে তাহার উক্ত সম্পত্তির সমুদায় লাভালাভ হস্তান্তর করিয়া দিয়াছে।

এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের এই স্থির করা উচিত যে, ঐ দলীল লিখিতপড়িত হইয়াছে, এবং তাহা সিদ্ধ ও ফলদায়ক, এবং কাজে কাজে উক্ত দলীলের লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে বাদীর নালিশ অকর্ম্মণ্য হইবে। অতএব ইহাতেই মোকদ্দমার শেষ হইতেছে, কারণ, উক্ত দলীল একবার সংস্থাপিত হইলে, সরবরাহ করিবার আর কিছু বাকী থাকে না। অতএব আমি বিবেচনা করি, নিম্ন আদালতের যে রায়ে বাদীকে উক্ত দলীল দ্বারা হস্তান্তরিত সম্পত্তির অংশের ডিক্রী দেওয়া হইয়াছে, তাহা খরচা সমেত অন্যথা হওয়া উচিত।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমি সম্মত হইলাম।

( ব )

২৬ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৭০ সালের ৬৭ নং মোকদ্দমা।

গয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৭০ সালের ২ রা ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

সৈয়দ ফজলে হোসেন প্রভৃতি ( আপত্তিকারক ) আপেলাণ্ট।

তছদ্দক আলী খাঁ ( দরখাস্তকারী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, ই, টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে উকীল নাই।

চুম্বক ]—যে স্থলে ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ১৯ ধারা-প্রদত্ত ক্ষমতামতে, ১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুযায়ী সার্টিফিকেট পাওয়ার দরখাস্ত জেলার জজের সেরেস্তা হইতে অধঃস্থ জজের নিকট অর্পিত হয়, তাহাতে অধঃস্থ জজের হুকুমের বিরুদ্ধে জেলার জজের আদালতে আপীল হইবে, এবং হাইকোর্টে খাস আপীল হইতে পারে।

ডেপুটি রেজিষ্ট্রারের লিপি।—১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুযায়ী এক সার্টিফিকেটের দরখাস্তে গয়ার অধঃস্থ জজ যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে এই আপীল উপস্থিত।

এ প্রকারের দরখাস্ত অগ্রে জেলার জজের নিকট দাখিল হয়, এবং প্রার্থনা হইলে আদালত তাহা ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ১৯ ধারার লিখিত ক্ষমতা অনুসারে, নিষ্পত্তির জন্য সচরাচর জেলার অধঃস্থ জজের নিকট অর্পণ করিয়া থাকেন।

এই মোকদ্দমাও বোধ হয় সেই মতে জজের সেরেস্তা হইতে অধঃস্থ জজের নিকট অর্পিত হয়; এবং উল্লিখিত ধারার এবং আইনের মর্ম্ম

অনুসারে অধঃস্থ জজের হুকুমের বিরুদ্ধে জেলার জজের আদালতে আপীল হইবে, এবং এই আদালতে কেবল খাস আপীল হইতে পারে।

এই আপীল গ্রাহ্য করা না করার হুকুমের জন্য আদালতে উপস্থিত করা গেল।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায়, ডেপুটি রেজিষ্ট্রার যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ।

এই দরখাস্ত আপেলাণ্টকে ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে। (ব)

---

২৬ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৪২৬ এবং ২৪৬৯ নং মোকদ্দমা।

গয়ার প্রতিনিধি জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ২০ এ আগষ্টের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২১ এ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

পীত কুঙর এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

ছত্রধারী সিংহ (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং বুধসেন সিংহ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর, ই, টুইডেল এবং সি, গ্রেগরি রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন দেবত্রের মতওল্লী দান-পত্রের সর্ত মতে ঐ পদে আপন উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়া লোকান্তরিত হইলে, যে ব্যক্তি সেই সম্পত্তি দেবসেবায় দান করিয়া থাকে, তাহার দায়াধিকারিগণেই ঐ দেবত্রের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্শিবে।

বিচারপতি বেলি।—এই দুই মোকদ্দমায়, হরপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি সম্পত্তির মূল মালিক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বাদী ছত্রধারী সিংহ উক্ত হরপ্রসাদের ভগিনী দেবযানীর দেবর, এবং এই হেতুবাদে তাহার দায়াধিকারী স্বরূপে নালিশ করে যে, দেবযানী বিরোধীয় সম্পত্তি তাহার ভ্রাতা হরপ্রসাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়।

প্রতিবাদিনী খাস আপেলাণ্ট জয়বংশী কুঙর ও পীত কুঙর উক্ত হরপ্রসাদের বিধবা স্ত্রী।

দেখা যায় যে, হরপ্রসাদ ১৮৬৭ সালের ১৪ ই মার্চ তারিখে দুই খানা দলীল অর্থাৎ এক খানা বক্সিস্-নামা এবং আর এক খানা ওখ্ফনামা লিখিতপড়িত করিয়া কতক সম্পত্তি দেবযানীকে দেয়। উক্ত বক্সিস্নামা সম্বন্ধে উভয় নিম্ন আদালতই বাদীর দাবীর ডিক্রী দেন, এবং প্রতিবাদিনী জয়বংশী কুঙর অর্থাৎ ২৪২৬ নং মোকদ্দমার খাস আপেলাণ্ট নিম্ন আপীল-আদালতের এই নিষ্পত্তির প্রতি কোন আপত্তি করে না; কিন্তু পীত কুঙর অর্থাৎ ২৪৬৯ নং মোকদ্দমার খাস আপেলাণ্ট আপন উকীল বাবু বুধসেন সিংহের দ্বারা আপত্তি করে যে, উক্ত বক্সিস্নামার সর্ত দ্বারাই ঐ সম্পত্তি প্রতিবাদিনীকে হরপ্রসাদের স্ত্রীও বিধিমত দায়াধিকারিণী বলিয়া দেওয়া হয়। উকীল আমাদিগকে উক্ত দলীল পড়িয়া শুনিতে বলেন, আমরা তাহাই করি; কিন্তু উক্ত দলীলের শব্দে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উকীলের ঐ আপত্তি একেবারেই অমূলক। উক্ত দলীলের শব্দে প্রকাশ যে, উক্ত সম্পত্তি একেবারে দেবযানীকে দেওয়া হয়। এমত অবস্থায়, উকীল কি প্রকারে এই তর্ক করিতে পারেন যে, উক্ত সম্পত্তি সম্পূর্ণ রূপে দেওয়া হয় নাই, এবং তাহা দেবযানীর দায়াধিকারিগণে না অর্শিয়া হরপ্রসাদের দায়াধিকারিগণে পুনরায় অর্শিবে, তাহা আমরা বুঝি না। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, বক্সিস্নামায় যে সম্পত্তির কথা লেখা আছে, তৎসম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি স্থির থাকিবে।

আমরা এক্ষণে সেই তারিখের ওখ্ফনামা সম্বন্ধে বিচার করিব। উক্ত দলীল দ্বারা যে

সকল সম্পত্তি ঠাকুরের সেবায় এবং ঠাকুর বাড়ীর নিমিত্ত দেওয়া হয়, দেবযানীকে তাহার "মতওল্লী" করা হয়। উক্ত দলীলের এক সর্ত্ত এই যে, প্রত্যেক "মতওল্লীর" আপন উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে, কিন্তু তাহা নিয়োগ না করা হইলে কি করিতে হইবে, তাহার কোন বিধান করা হয় নাই। এ স্থলে দেবযানী কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত না করিয়াই লোকান্তরিত হয়, এবং বাদী দেবযানীর উত্তরাধিকারী স্বরূপে আপন স্বত্ব পরিচালনের দাবীতে নালিশ করে।

কি গতিকে দেবযানী ঐ সম্পত্তি পায়, তাহা দেখিয়া এ স্থলে বাদীর স্বত্বের পরীক্ষা করিতে হইবে। দেবযানী দায়াধিকার, ক্রয় বা শরীকী সূত্রে উক্ত সম্পত্তি পায় নাই; হরপ্রসাদ দেবত্র স্বরূপে যে ভূমি দেয়, দেবযানী উক্ত দলীলের সর্ত্ত অনুসারে এবং দানের ভাব দৃষ্টে তাহারই মতওল্লী মাত্র ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মতওল্লীর পদে কোন উত্তরাধিকারী মনোনীত করার সর্ত্ত দেবযানী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই; কিন্তু উক্ত সম্পত্তি বরাবরই মতওল্লীর তত্ত্বাবধারণে দেবত্র স্বরূপে ছিল; অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবত্র প্রদান করে, মতওল্লীর পদ সেই ব্যক্তির দায়াধিকারিগণেই বর্ত্তিবে।

এতদর্থে আমরা স্থির করিলাম যে, উক্ত ওখ্‌ফনামা লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের রায় অন্যথা হইয়া বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্‌ হইবে (ব)

২৭ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২২৫৭ নং মোকদ্দমা।

ছোট নাগপুরের প্রতিনিধি জুডিশিয়াল কমিশনর হাজারীবাগের ডেপুটি কমিশনরের ১৮৬৯ সালের ১১ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৩ রা জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

লালা বিষ্ণুপ্রসাদ প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

হাজারীবাগের কালেক্টর এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং মহেশচন্দ্র চৌধুরী আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ছোট নাগপুর প্রদেশে কোন মহালের মালিক স্বরূপে কোন ব্যক্তির নাম রেজিষ্টরী করিতে কালেকটরকে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

বিচারপতি লক।—রাজা শিবলাল সিংহের নিকট বাদী যে, পাথাইল মৌজা ক্রয় করিয়াছে, ইহার প্রমাণ লইয়া ঐ মৌজার মালিক স্বরূপে বাদীর নাম রেজিষ্টরী করণার্থে হাজারীবাগের কালেকটরকে বাধ্য করিতে, এবং বাদীর নাম রেজিষ্টরী করণার্থে কালেক্টর যে হুকুম দেন তাহা অন্যথা করিয়া ছোট নাগপুরের কমিশনর ১৮৬৭ সালের ২৭ এ অক্টোবরে যে আদেশ করেন, তাহা রহিত করিতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

উভয় নিম্ন আদালতই বাদীর মোকদ্দমা এই হেতুবাদে ডিসমিস্‌ করেন যে, ছোট নাগপুর প্রদেশে এমত কোন আইন প্রচলিত নাই, যদ্দৃষ্টে কালেক্টরকে বাদীর নাম রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য করা যায়।

আমরা ১৮৩৩ সালের ১৩ কানুনের ৩ ধারার বিধান দৃষ্টে বিবেচনা করি যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত যে সকল কানুন জারী হইয়াছিল, তাহার কার্য্য স্থগিত হয়, এবং ঐ সকল প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট যে কোন বিশেষ আইন বা কানুন প্রবর্ত্তন করা

উপযুক্ত বোধ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত তাহা বরাবর স্থগিত রহিয়াছে। এমত অবস্থায়, বাদী যে প্রতিকারের প্রার্থনা করে, তাহার জন্য সে কোন্ আইন অনুসারে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে তাহা জানা যাইতেছে না। ১৮৩৩ সালের ১৩ কানুনের ৫ ধারামতে, ছোট নাগপুর প্রদেশের কমিশনর এবং কর্ম্মচারিগণকে, যে সকল কানুনের কার্য্য ১৮৩৩ সালের ১৩ কানুনের ৩ ধারা দ্বারা স্থগিত হয়, তদনুসারে না চলিয়া গবর্ণর জেনরেল যে নিয়ম স্থাপন করেন, তদনুসারে চলিতে হয়; এবং সেই অবধি ছোট নাগপুর প্রদেশ ঐ সকল নিয়ম অনুসারেই শাসিত হইতেছে। বাদী ঐ সকল নিয়ম উপস্থিত করে নাই, এবং দেখাইতে পারে নাই যে, ঐ সকল নিয়ম দ্বারা সে এই মোকদ্দমা উক্ত প্রদেশের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে পারে; অতএব আমি বিবেচনা করি, নিম্ন আদালত দ্বয়ের রায়ই শুদ্ধ এবং এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমারও ঐ মত। কিন্তু আমার বিজ্ঞবর সহযোগীর রায়ে সম্মত হওয়ায়, এ স্থলে জমিদার কর্ত্তৃক বাদীকে যে হস্তান্তর করিবার কথা বলা হইয়াছে তদনুসারে বাদীর যে স্বত্ব হয়, তৎসম্বন্ধে আমি কোন মত দিলাম না, এমত বুঝিতে হইবে। আমি একথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, যে জমিদারের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে, সেই জমিদার ১৭৯৩ সালের ১ কানুনের ৯ ধারা মতে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় ছোট নাগপুর প্রদেশেও বিক্রয় দ্বারা তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না। আইন ঐ রূপ কি না, তদ্বিষয়ে আমি কিছু বলিলাম না। কিন্তু আমি ইহাতে সম্মত আছি যে, উপস্থিত বাদী যে প্রণালীতে তাহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে এবং চালাইয়াছে, তাহাতে আমরা তাহাকে কিছুতেই ডিক্রী দিতে পারি না। এমত সকল নিয়ম থাকিতে পারে যদনুসারে ছোট নাগপুরের কালেক্টরেরা এমত সকল ব্যক্তির নাম রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য হন, যাহারা হস্তান্তর দ্বারা স্থায়ী বন্দোবস্তী মহালের স্বত্ব পাইয়াছে। এমত কোন নিয়ম না থাকিতেও পারে; এবং স্বীকৃত হইয়াছে যে, এমত কোন কানুন নাই যদনুসারে কালেক্টর ঐ রূপ কোন হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য হন। অতএব বিচারপতি লক যে রূপ দর্শাইয়াছেন তদনুসারে, যে পর্য্যন্ত বাদী না দেখাইতে পারে যে, এমত কোন নিয়ম বা প্রথা আছে যাহা দ্বারা কালেক্টর উক্ত কথিত হস্তান্তর রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য, সে পর্য্যন্ত নিম্ন আদালত বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ না করিয়া পারেন না। (ব)

---

২৭এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২০৪ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজের ১৮৬৯ সালের ২৮এ জুনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

দমরী সাহু এবং অপর এক ব্যক্তি (বাদী) আপেলাণ্ট।

জগধারী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

মেং সি, গ্রেগরী এবং মুন্সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বুধ সেন সিংহ রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন নিম্নস্থ আদালত কোন মোকদ্দমার প্রমাণ গ্রহণ করিলে পর, জজ সেই মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা মতে আপন ফাইলে উঠাইয়া লইতে পারেন না।

বিচারপতি বেলি।—এই মোকদ্দমা শ্রবণ কালে রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল আপত্তি করেন যে, জজের এই মোকদ্দমা আপন রেজিষ্টরীভুক্ত

করিয়া প্রথম মোকদ্দমার ন্যায় নিষ্পত্তি করিতে আইন অনুসারে কোন ক্ষমতা ছিল না।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা, যাহাতে কোন অধঃস্থ আদালতের মোকদ্দমা জেলার আদালতের আপনার নিকট উঠাইয়া লইয়া প্রথম মোকদ্দমা স্বরূপে নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, "প্রতি নিম্ন "শ্রেণীর যে আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার "হইতে পারে, সেই আদালতে ঐ মোকদ্দমা "উপস্থিত করিতে হইবে, কিন্তু কোন জেলার "আদালতের অধীন যে কোন আদালতে মোক- "দ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই আদালত হইতে "ঐ মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার উপযুক্ত কারণ "জানিলে ঐ জেলার আদালত সেই মোকদ্দমা "খারিজ করিয়া আপনি তাহার বিচার করিতে "পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন অন্য যে "আদালত মোকদ্দমার মূল্য বুঝিয়া তাহার "বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদা- "লতে, তাহা অর্পণ করিতে পারিবেন। সেই "প্রকারেও সদর আদালতের অধীন যে কোন "আদালতে কোন মোকদ্দমা কি আপীলী "মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তাহা হইতে "সেই সদর আদালত তাহা উঠাইয়া দিয়া "আপনার অধীন অন্য যে আদালত ঐ মোক- "দ্দমা কি আপীলের মূল্য বুঝিয়া তাহার "বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন, সেই আদা- "লতে তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা করিতে "পারিবেন।" আমি এই ধারার উভয় অংশই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, কারণ, আপেলাণ্টের উকীল আমাদিগের নিকট যে তর্ক করেন, তৎ-সম্বন্ধীয় বিষয় উক্ত উভয় অংশেই আছে।

কাগজের বহীর ১২ ফাইল, ১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ যে, জজ এই মোকদ্দমার বিচারের অভিপ্রায়ে নূতন ইসু ধার্য্য করেন, কারণ, তিনি বলেন, "১৮৫৯ সালের ৬ ই মে তারিখের হুকুম মতে "নূতন করিয়া।" উক্ত হুকুমের ফল সম্বন্ধে জজ তাঁহার বর্ত্তমান রায়ে যে বর্ণনা করেন তাহাতে তিনি বলেন;—"আমার বোধ হয় যে, যে "সকল বিষয়ে বর্ণনা-পত্র বা ইসু দ্বারা মুন্সে- "ফের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই, তৎসম্বন্ধে "বাদিগণের উত্থাপিত মোকদ্দমার যুক্তির উপ- "রেই মুন্সেফের নিষ্পত্তি অধিকাংশ নির্ভর "করে; এবং রাজারামের হস্তক্ষেপের উপর "বিশেষ নির্ভর করা হইয়াছে। অতএব "আমি সমগ্র মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন করিয়া" (অর্থাৎ নূতন ইসু ধার্য্য করিয়া, নূতন প্রমাণ লইয়া এবং মোকদ্দমার নূতন বিচারের হুকুম দিয়া) "বাদিগণকে নূতন প্রমাণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিলাম।"

যদি মুন্সেফের নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বিবেচিত হইত এবং বর্ত্তমান মোকদ্দমা জজের নিকট নূতন মোকদ্দমার ন্যায় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া স্পষ্ট বর্ণিত হইত, তবে হয়ত এই প্রশ্ন হইতে পারিত যে, মুন্সেফের নিষ্পত্তি এবং তাঁহার সমুদায় কার্য্য অন্যথা হইয়াছে বিবেচনায়, জজের এ মোকদ্দমা জাবেতা মোকদ্দমার ন্যায় বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল কি না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, জজ তাঁহার নিজের কাগজ-পত্রে অর্থাৎ ১২ নং নথীতে যাহাতে ইসু ধার্য্য হইয়াছে, তাহাতে বাদিগণকে আপেলাণ্ট এবং প্রতিবাদিগণকে রেস্পণ্ডেণ্ট বলিয়াছেন। যাহা হউক, ইহা লিখিবার ভুল হইতে পারে, এবং ইহা গুরুতর বিবেচনা করা আমাদের উচিত নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, জজ বাস্তবিক নূতন ইসু ধার্য্য করিয়া নূতন প্রমাণ দৃষ্টে মোকদ্দমার বিচার করেন এবং উক্ত কাগজের বহীর ১২ পৃষ্ঠার ৪ দফায় হরি নামক এক ব্যক্তির ১ লা জুলাই তারিখের দরখাস্ত তাঁহার নিকট তৎকালের উপস্থিত মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপে উল্লেখ করেন। এই দরখাস্ত বাস্তবিক পূর্ব্বের মোকদ্দমার নথীর অন্তর্গত। অতএব জজ যদি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি

করণার্থে পূর্ব্ব মোকদ্দমার নথী হইতে প্রমাণ লইয়া থাকেন, তবে একথা বলা যাইতে পারে না যে, তিনি পূর্ব্ব মোকদ্দমার সমুদায় কার্য্য অন্যথা হওয়া বিবেচনা করিয়াছেন, বরং তিনি নূতন ইসু সম্বন্ধে যে নূতন প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা তিনি পূর্ব্ব মোকদ্দমার কোন কোন প্রমাণের সহিত একত্রে লইয়া দুই নথী একত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব তিনি কেবল নূতন প্রমাণ দৃষ্টে মোকদ্দমার বিচার করেন নাই, সুতরাং পূর্ব্ব মোকদ্দমা অন্যথা হইয়া নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে এরূপ কথা উচিত মতে বলা যাইতে পারে না। এতদর্থে, জজ এইরূপে যে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন, তাহা "উপস্থিত হওয়া" মোকদ্দমা বলা যাইতে পারে না (দ্রষ্টব্য, ৬ ধারা); বরং নূতন ও পুরাতন প্রমাণ দৃষ্টে পূর্ব্ব মোকদ্দমার ছানী বিচার বলা যাইতে পারে।

এক আদালতের অন্য আদালত হইতে কোন মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সদরল্যাণ্ডের রিপোর্টের অতিরিক্ত সংখ্যার ১৪ পৃষ্ঠায় রাণী আল্‌মদ কুওর বনাম উইলিয়ম টেলরের মোকদ্দমা আছে। যদিও আমাদের নিকট উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে উক্ত মোকদ্দমায় স্পষ্ট নিষ্পত্তি নাই, তথাপি তাহাতে বিচারপতিগণ অতি দৃঢ়রূপে এই মত প্রকাশ করেন যে, বাস্তবিক প্রমাণ গ্রহণের পর ঐ রূপে উঠাইয়া লওয়া যাইতে পারে না। তাঁহারা বলে—"নিম্ন "আদালত বাস্তবিক প্রমাণ গ্রহণ করিলে পরে, "কোন ঘটনায়ই ঐ রূপ হুকুম দেওয়া যাইতে "পারে কি না, তাহাতে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ "আছে।" উপস্থিত মোকদ্দমায় নিম্ন আদালতে যে, কেবল প্রমাণ গৃহীত হইয়াছিল এমত নহে, নিষ্পত্তিও হইয়াছিল; এবং ঐ নিষ্পত্তির পরে, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত মোকদ্দমা নূতন ইসু সম্বন্ধে নূতন বিচারার্থে জজের ফাইলে উঠাইয়া লওয়া হয়।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার দ্বিতীয় অংশ সম্বন্ধে আপেলাণ্টগণের উকীল এরূপ অনেক তর্ক করেন যে, কোন মোকদ্দমা তলব করিয়া পূর্ব্ব প্রমাণ দৃষ্টে নূতন মোকদ্দমা স্বরূপ বিচার করিতে, সদর আদালতের যেরূপ ক্ষমতা ছিল এবং সনন্দের ১৫ ধারা এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ৩৫ ধারা মতে প্রধানতম বিচারালয়ের যেরূপ ক্ষমতা আছে, জেলার জজেরও তদ্রূপ ক্ষমতা আছে। ইহা উক্ত নামকৃত আদালতদ্বয়ের বিশেষ ক্ষমতা, এবং তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার বিধানের অতিরিক্ত জেলার আদালতের প্রতি প্রদত্ত হয় নাই।

প্রদর্শিত নজীরে বিচারপতি লক এবং বিচারপতি নর্ম্যান যে মত প্রকাশ করেন যে, কোন অধঃস্থ আদালত প্রমাণ গ্রহণ করিলে পর জজ সেই মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া লইতে পারেন না, তদনুসারে আমি এ মোকদ্দমা জাবেতা আপীলের ন্যায় শুনিতে অস্বীকার করিলাম; অতএব এই আপীল ডিস্‌মিস্ করা গেল, কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে খরচা দেওয়া গেল না।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঠিক ঐ মত, এবং আমিও একই হেতুবাদেই আমার মত দিলাম। আমার বোধ হয়, এ আদালতের যাঁহার কেবল ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের ক্ষমতা আছে এমত নহে, সনন্দের দ্বারা যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও আছে, তাঁহার যে ক্ষমতাই থাকুক, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার এমত অভিপ্রায় নহে যে, যে প্রমাণ দৃষ্টে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে, তাহা লওয়া হইলে পর, এবং যে বিচারক ঐ প্রমাণ গ্রহণ করেন, তিনি তৎসম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, জেলার জজ উক্ত মোকদ্দমা আপন ফাইলে উঠাইয়া লইতে পারিবেন। অধঃস্থ জজ এ মোকদ্দমায় তাহাই করিয়াছেন। মুন্সেফের আদালতে যে প্রমাণ দাখিল হয় তাহা, অধঃস্থ জজ তাঁহার আদালতে গৃহীত নূতন প্রমাণের সহিত যোগ করেন, এবং তিনি নূতন ইস

ধার্য্য করিয়া, সংমিলিত প্রমাণ দৃষ্টে যে মোকদ্দমার বিচার করেন, তাহা তিনি নূতন মোকদ্দমার বিচার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। ইহা আমার নিকট আইন-বিরুদ্ধ বোধ হইতেছে। জজ প্রথম বিচারাধিকারের আদালত স্বরূপে যাহা করিয়াছেন, আপীল-আদালত স্বরূপে তাহা করিতে পারিতেন কি না, এবং এই আদালতে জাবেতা আপীল কি খাস আপীল হইত, তাহা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে। এ মোকদ্দমার বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদিগকে কেবল এইমাত্র বলিতে হইবে যে, এই জাবেতা আপীল চলিবে না। (ব)

---

২৭এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

দারজিলিঙ্গের ছোট আদালতের জজের ১৮৭০ সালের ২৭এ মার্চের এস্তমেজাজ।

১৪৭ নং মোকদ্দমা।

যুবরাজ চৌকীদার, বাদী।

মিস হোয়েলেন প্রভৃতি, প্রতিবাদী।

১২৩ নং মোকদ্দমা।

রামপিয়ার, বাদী।

মেং হোয়েলেন প্রতিবাদী।

চুম্বক।—যে মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন তাহা বিচারার্থে মুন্সেফের আদালতে বিধিমতে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না।

যে স্থলে কোন নাবালগ এবং তাহার পিতা মোকদ্দমার প্রতিবাদী, তাহাতে উক্ত পিতা স্বয়ং মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অনবগত থাকিলেও উক্ত নাবালগের পক্ষে মোকদ্দমার জওয়াব দেওয়ার উপযুক্ত পাত্র, তাহার মাতা উপযুক্ত পাত্র নহে।

এস্তমেজাজ।—উল্লিখিত মোকদ্দমাদ্বয় আমার আদালতে উপস্থিত হয়। ১৪৭ নং মোকদ্দমায় প্রথম প্রতিবাদিনীর মাতা এবং সেই মোকদ্দমার দ্বিতীয় প্রতিবাদীর স্ত্রী (যে ১২৩ নং মোকদ্দমারও প্রতিবাদী) উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার জওয়াব দিতে চাহে, এবং বলে যে, তাহার কন্যা নাবালগ, সুতরাং মোকদ্দমায় জওয়াব দিতে অসমর্থ, এবং তাহার স্বামী নিজে বিরোধীয় বিষয় অবগত নহে। আমি মিসেস হোয়েলেনকে মোকদ্দমার পক্ষ করিতে আদেশ করি। মিসেস হোয়েলেন আমার চাকর থাকাতে আমি এই ইচ্ছা করি যে, এই মোকদ্দমা বিচারার্থে দারজিলিঙ্গের মুন্সেফ মেং ডবলিউ, সি, মুলরের নিকট অর্পণ করা হয়।

আমার মতে এই দুই মোকদ্দমা মুন্সেফের ফাইলে উঠাইয়া দেওয়া উচিত, এবং আমার ঐ রূপ বিবেচনা করিবার কারণ এই যে, প্রধানতম বিচারালয় কিয়ৎকাল গত হইল এই মত প্রকাশ করেন যে, যে এক ফৌজদারী মোকদ্দমার মধ্যে আমার দুই জন চাকর ছিল তাহাতে আমার মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতায় প্রাথমিক তদন্ত করা অন্যায় হইয়াছে।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এ মোকদ্দমায় দারজিলিঙ্গের ছোট আদালতের জজ বলেন যে, তাঁহার আদালতে মিস হোয়েলেন এবং মেং হোয়েলেন নামে দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়; এই দুই জনের মধ্যে কন্যা ও পিতা সম্বন্ধ; এবং আর এক মোকদ্দমা কেবল মেং হোয়েলেনের বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। আরও বলা হইয়াছে যে, এক জন প্রতিবাদীর মাতা এবং অপরের স্ত্রী মিসেস হোয়েলেন ছোট আদালতের জজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কন্যা নাবালগ বিধায় তাহার পক্ষে জওয়াব দিতে চাহে, এবং সে বলে যে, তাহার স্বামী স্বয়ং ঐ সকল বৃত্তান্ত জানে না। এ প্রযুক্ত তাহাকে প্রতিবাদিনী করা হয়।

বলা হইয়াছে যে, মিসেস হোয়েলেন ঐ

জজের চাকরী করে; অতএব তাঁহার মতে ঐ মোকদ্দমা তাঁহার বিচার করা উচিত নহে, এবং তিনি এই আদালতে প্রার্থনা করেন যে, উক্ত মোকদ্দমা দারজিলিঙ্গের মুন্সেফ-আদালতে অর্পিত হয়।

এই মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচার্য্য বিধায় বিচারার্থে মুন্সেফ-আদালতে বিধিমতে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না; এবং তাহা উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইলে অন্য এক ছোট আদালতে উঠাইয়া দেওয়া যাইত। কিন্তু আমার বোধ হয় তাহার কোন আবশ্যক নাই। মিস হোয়েলেনের পিতা যে তাহার সহিত এক মোকদ্দমার প্রতিবাদী, সেই তাহার পক্ষে মোকদ্দমার জওয়াব দিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহার মাতা উপযুক্ত পাত্র নহে। সে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত অবগত ছিল না বলিয়াই মোকদ্দমায় আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অক্ষম হইবে, এমত নহে; সে কেবল তাহাতে সাক্ষ্য দিতে পারিবে না। অতএব মিসেস হোয়েলেনকে মোকদ্দমার পক্ষ করায় ভ্রম হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমায় তাহার সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারিত। অতএব মিসেস হোয়েলেনকে অন্যায় রূপে প্রতিবাদিনী করা হইয়াছে বলিয়া নথী হইতে তাহার নাম খারিজ করা জজের উচিত। তাহা হইলে, জজ স্বয়ং মোকদ্দমার বিচার কি জন্য করিবেন না, আমি তাহার কোন কারণ দেখি না।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

---

২৮এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৭০ সালের ৭৫ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ পরগণার জজের ১৮৭০ সালের ২৯এ ফেব্রুয়ারির হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

রাজবল্লভ সাহা (দায়ী) আপেলাণ্ট।

গোঁসাইদাস সাহা (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ ধর রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ডিক্রীর তারিখের এক বৎসরের অধিককাল পরে ঐ ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইলে, যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হয় তাহার প্রতি রীতিমত নোটিস জারী হওয়ার সন্তোষকর প্রমাণ না পাইলে আদালত ডিক্রীজারী করিতে পারেন না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমার বিবেচনায় জারীর কার্য্য অসঙ্গত, এবং নোটিস জারী হওয়ার প্রমাণ না থাকায় ঐ কার্য্য অন্যথা হইবে। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১৬ ধারার স্পষ্ট আদেশ এই যে, ডিক্রীর তারিখ হইতে এক বৎসরের অধিক কাল অন্তে জারীর প্রার্থনা হইলে, যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত হয়, তাহার প্রতি নোটিস জারী করিতে হইবে; এবং ২২১ ধারার বিধান এই যে, আবশ্যকীয় সকল প্রাথমিক কার্য্য হইলে আদালত ডিক্রীজারীর উপযুক্ত পরওয়ানা জারী করিবেন। যে স্থলে নোটিস জারীর বিধান আছে, তাহাতে রীতিমত নোটিস জারী হওয়ার বিষয়ে আদালত নিঃসন্দিগ্ধ হইতে স্পষ্ট বাধ্য, এবং ঐ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ না হইলে তিনি ডিক্রীজারী করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অতএব আমার বিবেচনায়, জজের হুকুম খরচা সমেত রহিত হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

---

২৮এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

মুন্সী আমীর আলী খাঁ বাহাদুর, প্রার্থী।

কাছিম আলী খাঁ, প্রতিপক্ষ।

মেং, জি, সি পল বারিষ্টর, ও মুন্সী মহম্মদ উইছফ প্রার্থীর উকীল।

মেং জে ডবলিউ বি, মণি প্রতিপক্ষের বারিষ্টর।

চুম্বক।—হাইকোর্টে আপীলের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত নিম্ন আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার জন্য হাইকোর্টে প্রার্থনা হইলে, যথেষ্ট জামিন দিলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার হুকুম হয়, এবং তদনুসারে জামিন দাখিল হয়। পরে, হাইকোর্টের এক খণ্ডাধিবেশনের সমক্ষে ঐ আপীল উপস্থিত হইয়া দুই বিচারপতির মতভেদ হওয়ায় সনন্দানুসারে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায়ই প্রবল হইয়া আপীলের ডিক্রী ও নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা হয়। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ আপীলের রেস্পণ্ডেণ্ট পূর্ণাধিবেশনে আপীল করে। কিন্তু খণ্ডাধিবেশনের রায় প্রদত্ত হওয়ার পরে জামিনদার তাহার জামিন রহিত করার জন্য জেলার জজের নিকট দরখাস্ত করিতে জজ এই বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন যে, পূর্ণাধিবেশনে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জামিনদার তাহার খৎ ফেরৎ পাইতে পারে না। তাহাতে সে ঐ খৎ ফেরৎ পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে মোশন করায় স্থির হইল যে :—

যে বিচারপতিদ্বয় আপীল শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের সমক্ষেই এই মোশন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে, কারণ, ইহা রায়ের বহির্ভূত বিষয়, অতএব যে কোন জেলা সম্বন্ধেই হউক, হাইকোর্টের যে খণ্ডাধিবেশনের ইচ্ছা তাঁহারাই এই প্রকার মোশন গ্রহণ করিতে পারেন।

কোন এক জেলার বিচার-ঘটিত কোন এক বিষয়ের দরখাস্ত সেই জেলার মোকদ্দমার বিচারাধিকার-বিশিষ্ট খণ্ডাধিবেশনের সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার যে প্রথা আছে, তদ্দ্বারা, রাজকীয় সনন্দ মতে অন্য খণ্ডাধিবেশনের যে ক্ষমতা আছে, তাহা বিলুপ্ত হইতে পারে না, এবং সর্ব্বস্থলেই ঠিক সেই প্রথানুসারেই কার্য্য হইতে পারে না।

যে স্থলে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারার বিধানানুযায়ী জামিন তলব করিতে হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে, সে স্থলে যে কোন সময়ে হউক, সেই জামিনী-খত রূপান্তর বা অন্যথা করিতে অথবা জামিনদারকে ফেরৎ দেওয়ার আদেশ করিতেও হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে; এবং হাইকোর্টের হুকুমানুসারে নিম্ন আদালতের জজ ঐ জামিনী লওয়া অথবা তাহার যথেষ্টতার তদন্ত করা সম্বন্ধে যে কার্য্য করেন, তাহা তিনি বিচারক স্বরূপে করেন না, অধীন কর্ম্মচারী স্বরূপে করেন বিবেচনা করিতে হইবে।

যে খণ্ডাধিবেশন ঐ আপীল শুনেন, সেই খণ্ডাধিবেশন-কর্তৃক যে স্থলে জজের ডিক্রী অন্যথা হয়, সে স্থলে জজের এমন কোন ডিক্রী আর থাকে না যাহা জারী হইতে পারে; অতএব জামিনী খত ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিয়া জজ যে হুকুম দেন, সেই হুকুম দিতে তাঁহার অধিকার নাই; সুতরাং তাহা বৃথা ও অবৈধ। আপীলে ঐ ডিক্রী অন্যথা হওয়া মাত্রেই জামিনদারের দায় বিলুপ্ত হয়, অতএব তাহার জামিনী খতের কার্য্যও সমাধা হইয়া যায়।

বিচারপতি লক।—এই খণ্ডাধিবেশনের সমক্ষে মুন্সী আমীর আলী এই প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করেন যে, ঐ দরখাস্তের লিখিত জামিনী খত অন্যথা করার অথবা তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়ার হুকুম হয়, অথবা আদালতের বিবেচনায় তাঁহাকে অন্য যে প্রতিকার প্রদান করা উচিত বোধ হয়, তাহা দেওয়ার আদেশ হয়।

কি জন্য মুন্সী আমীর আলী তাঁহার জামিনী খৎ ফেরৎ পাইবেন না এবং কি জন্য তিনি রমজান বেগের জামিনীর দায় হইতে মুক্তি পাইবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য প্রতিপক্ষের উপরে নোটিস জারী হয়।

মোকদ্দমা অদ্য শ্রবণার্থে উপস্থিত হয়। ইহার বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্ত এই, যথা:—কাছিম আলী নামক এক ব্যক্তি ২৪-পরগণার জজ-আদালতে প্রমিসরি নোটের উপরে রমজান বেগের নিকট ১১৯৪৫০ টাকা পাওয়ার দাবীতে নালিশ করিয়া ডিক্রী পায়। প্রতিবাদী রমজান বেগ হাইকোর্টে আপীল করে, কিন্তু ডিক্রীদার

ডিক্রীজারীর জন্যও প্রতিবাদীকে গেপ্তারীর ওয়ারেন্টের জন্য দরখাস্ত করাতে প্রতিবাদী হাইকোর্টে প্রার্থনা করে যে, আপীলের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী স্থগিত থাকে; তাহাতে হাইকোর্ট ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারার বিধান মতে ১৮৬৯ সালের ১৫ ই এপ্রিল তারিখে হুকুম দেন যে, যদি দায়ী এমন উৎকৃষ্ট ও পর্য্যাপ্ত জামিন দেয় যাহা অক্লেশে আদায় হইতে পারে, তাহা হইলে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিবে। তদনুসারে মুন্সী আমীর আলী ২৪-পরগণার জজের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ১৮৬৯ সালের ৩ রা ও ৭ ই মে তারিখে জামিনী খত দস্তখত করেন, যাহার দ্বারা তিনি একরার করেন যে, রমজান বেগের আপীল ডিস্‌মিস্ হইলে রমজান বেগ যদি ডিক্রী পরিশোধ না করে, তবে তিনি তাহা পরিশোধ করিবেন। এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশন কর্ত্তৃক রমজান বেগের আপীল বিচারিত হয় এবং যে বিচারপতিদ্বয় তাহার বিচার করেন, তাঁহাদের মতভেদ হওয়াতে ১৮৬৫ সালের রাজকীয় সনন্দের ৩৬ ধারামতে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায় প্রবল হইয়া নিম্ন আদালতের রায় ও ডিক্রী অন্যথা হয়। জ্যেষ্ঠ বিচারপতি লকের এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারামতে পূর্ণাধিবেশনে আপীল হইয়াছে। যখন খণ্ডাধিবেশনের রায় ব্যক্ত হয়, তখন মুন্সী আমীর আলী তাঁহার জামিনী খৎ ফেরৎ পাওয়ার জন্য ২৪-পরগণার জজের নিকট দরখাস্ত করেন। জজ ১৮৭০ সালের ২ রা এপ্রিল তারিখে এই বলিয়া তাঁহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন যে, "এই বিষয়ে যে "পর্য্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হয়, সেপর্য্যন্ত "জামিনদারের দায় স্থির থাকিবে। প্রতি-"পক্ষের উকীল দেখাইয়াছেন যে, খণ্ডাধিবে-"শনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পূর্ণাধিবেশনে আপীল "হইয়াছে। যদি সেই আপীল শ্রুত হয় এবং "তাহাতে রায় প্রদত্ত হয়, তবে সেই রায়ই এই "বিষয়ে হাইকোর্টের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবে; "অতএব আমি বিবেচনা করি যে, জামিনী "স্থির থাকিবে।" মুন্সী আমীর আলী ২৪-পরগণার জজের নিকটে তাঁহার জামিনী খত ফেরৎ পাইতে অসমর্থ হইয়া ১৮৭০ সালের ৭ ই এপ্রিল তারিখে এই দরখাস্ত হাইকোর্টে দাখিল করিয়াছেন।

প্রতিপক্ষের কৌন্সেল মেং মণি এই দরখাস্ত শ্রবণের প্রতি এই আপত্তি করেন যে, প্রথমতঃ, যে স্থলে প্রার্থী স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি বিক্টোরিয়ার ২৪ এবং ২৫ আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারার বিধানমতে অথবা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ৩৫ ধারার বিধানমতেও প্রতিকার প্রার্থনা করেন না, সে স্থলে আদালত কোন আইনমতে কার্য্য করিবেন অথবা কি ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা দৃষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যদি এই দরখাস্ত শুনা যাইতে পারে এবং তাহার উপরে এই আদালত হুকুম দিতে পারেন, তথাপি যে খণ্ডাধিবেশনের (বিচারপতি লক ও সর চার্লস হব্‌হৌস) সমক্ষে তাহা উপস্থিত হইয়াছে তদ্দ্বারা কোন হুকুম হইতে পারে না, কারণ, এই আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে বন্দোবস্ত হইয়াছে, তদনুসারে এই খণ্ডাধিবেশন এই দরখাস্ত গ্রহণ করিতে অক্ষম, এবং ইহা, যে বিচারপতিদ্বয় (লক ও দ্বারকানাথ মিত্র) আপীল শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট অথবা ২৪-পরগণা যে খণ্ডাধিবেশনের জেলায় আছে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা উচিত ছিল, অথবা যে পূর্ণাধিবেশনের সমক্ষে আপীল উপস্থিত আছে এবং কেবল যাঁহাদেরই এই দরখাস্ত সম্বন্ধে উচিত হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা আছে, সেই পূর্ণাধিবেশনের সমক্ষে উপস্থিত করা উচিত ছিল; জামিনী-খতের আইনসঙ্গত অর্থ কি, তাহার নির্দ্দেশ প্রাপ্ত হওয়াই প্রার্থীর প্রকৃত উদ্দেশ্য; অতএব সেই খতের ফল নির্ণয় করা এই খণ্ডাধিবেশনের ক্ষমতা-বহির্ভূত;

এবং আদালতের সমক্ষে সেই খত উপস্থিত না থাকাতেও, এবং ঐ খত দেওয়ার কালে পক্ষগণের কি মনস্থ ছিল, তন্নির্ণয়ার্থে কোন প্রমাণ না লইয়াই ঐ খতের ফল নির্দ্ধারণের জন্য আদালতে প্রার্থনা করা হইয়াছে। ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, যেহেতু ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৪ ধারা ও ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৪ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তি মতে, দায়ীর জামিনদার ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার মর্ম্মানুসারে মোকদ্দমার পক্ষ; অতএব জজের হুকুমের বিরুদ্ধে প্রার্থীর আপীল করাই উচিত ছিল, কারণ, সেই হুকুম পক্ষগণের মধ্যে ডিক্রী জারীতে প্রদত্ত হয়; অতএব তাঁহাকে দরখাস্ত দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইতে দেওয়া উচিত নহে এবং দেওয়া যাইতেও পারে না।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে, যেহেতু ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারামতে আদালতের জামিন তলব করার হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা আছে, অতএব যে কোন সময়ে হউক, ঐ হুকুম রূপান্তর অথবা অন্যথা করিতেও আদালতের ক্ষমতা আছে।

দ্বিতীয় আপত্তি অকর্ম্মণ্য। ইহা সত্য বটে যে, পক্ষগণের সুবিধার জন্য এই আদালতের অন্যতর খণ্ডাধিবেশন প্রত্যহ মোশন শ্রবণ করেন, কিন্তু তাহা বলিয়াই উহা অলঙ্ঘনীয় নিয়ম নহে। উপস্থিত স্থলে প্রার্থী সেই খণ্ডাধিবেশনেই দরখাস্ত করে যাঁহারা সেই দিবস মোশন শুনিবার জন্য নিয়োজিত ছিলেন, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেই খণ্ডাধিবেশন সেই দিবস মোশন শুনিতে অসমর্থ ছিলেন; অতএব প্রার্থী এই খণ্ডাধিবেশনে ( বিচারপতি লক ও সর চার্লস হব্‌হৌস ) আইসেন এবং খণ্ডাধিবেশন ঐ দরখাস্ত লইয়া তাহার উপরে হুকুম দেন, এবং এই হুকুম বিপক্ষের উকীলের সমক্ষেই প্রদত্ত হয়, কিন্তু তিনি তৎপ্রতি কোন আপত্তি করেন নাই। মোশন শ্রবণ করা সম্বন্ধে খণ্ডাধিবেশনের কত দূর ক্ষমতা আছে তদ্বিষয়ে বিজ্ঞবর কৌন্সেলের ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে। তিনি বিবেচনা করেন যে, যে জেলা যে খণ্ডাধিবেশনের অধীন, সেই খণ্ডাধিবেশনই কেবল সেই জেলা-সম্বন্ধীয় মোশন শুনিতে পারেন; কিন্তু তাহা নহে। যে খণ্ডাধিবেশন মোশন শ্রবণ করেন তিনি হাইকোর্টের অধীন সকল জেলারই মোশন লইতে পারেন, এবং সাধারণের ও উকীলদের সুবিধার জন্য এই আদালত যে যে বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা না করিয়াই হুকুম দিতে পারেন; অতএব এই খণ্ডাধিবেশন যিনি ঐ মোশন শুনিয়াছিলেন এবং নোটিস জারী করিয়াছিলেন, মোশনের অন্তর্গত প্রশ্ন সরাসরী রূপে নিষ্পন্ন হওয়ার যোগ্য হইলে, তাঁহার তাহা নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা ছিল। যে কোন খণ্ডাধিবেশনের সমক্ষে হউক, এই মোশন উপস্থিত করা যাইতে পারিত, এবং সেই খণ্ডাধিবেশনই তাহার নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। যে বিচারপতিগণ আপীল শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট ইহা উপস্থিত করার কোন আবশ্যক ছিল না, কারণ, ইহা তাঁহাদের রায়-বহির্ভূত কথা, এবং ইহা তাঁহাদের সমক্ষে দাখিল হইতে পারিত না, কারণ, ঐ খণ্ডাধিবেশন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই দিবস মোশন শ্রবণ করা যে খণ্ডাধিবেশনের কার্য্য ছিল তাঁহাদের সমক্ষে এই মোশন দাখিল হইতে পারে নাই, কারণ, কোন কারণ বশতঃ তাঁহারা সেই দিবস মোশন লইতে অসমর্থ ছিলেন; এমত অবস্থায়, যে কোন খণ্ডাধিবেশনের মোশন শুনিবার অবকাশ এবং ইচ্ছা থাকে, তাঁহাদের সমক্ষেই প্রার্থীরা তাহা দাখিল করিতে পারে। ২৪-পরগণা যে খণ্ডাধিবেশনের অধীন, তাহাতে মোশন করাও অনাবশ্যক, কারণ, পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে, যে খণ্ডাধিবেশন মোশন শুনিবার জন্য নিয়োজিত হন তাঁহারা, আদালতের জাবেতার জন্য যে বিভাগের বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা বিবেচনা না করিয়া সকল জেলার মোশনই শুনিতে পারেন।

পূর্ণাধিবেশনেও দরখাস্ত করার কোন সাধ্য ছিল না, কারণ, ঐ আপীল শুনিবার জন্য কোন পূর্ণাধিবেশন এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

মোশন শ্রবণের বিরুদ্ধে শেষ তর্ক এই যে, জজ জামিনীখত ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিয়া যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে প্রার্থীর আপীল করা কর্ত্তব্য ছিল, কারণ, ডিক্রীজারীতে পক্ষগণের মধ্যে এই হুকুম প্রদত্ত হয়, এবং প্রার্থী জামিনদার সূত্রে ঐ মোকদ্দমার পক্ষ হইয়াছিলেন। ইহা সত্য বটে যে, জজ যে রুবকারী করিয়াছেন তাহা ডিক্রীজারীর রুবকারীর ন্যায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক জজের এই বিষয়ে কোন কার্য্য করার ক্ষমতা ছিল না, এবং তাঁহার কোন রায় ব্যক্ত করাও উচিত ছিল না। কিন্তু যদি খত ফেরৎ দেওয়ার বিষয়ে তাঁহার মনে সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে প্রার্থীকে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিতে বলিয়া দেওয়া উচিত ছিল, কারণ, হাইকোর্টের হুকুম মতেই জামিন লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু জজের হুকুম কোনমতেই ডিক্রীজারীর হুকুমের ন্যায় বিবেচনা করা যাইতে পারে না, কারণ, তৎকালে জারী করার জন্য কোন ডিক্রী ছিল না। হাইকোর্টের হুকুম প্রতিপালনে জজ জামিন তদন্তের যে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমলার কার্য্যের স্বরূপ, এবং তিনি অন্য কোন প্রকারে কার্য্য করিতেও পারিতেন না, কারণ, যখন তিনি খৎ ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমক্ষে কোন মোকদ্দমা অথবা জারী করার জন্য ডিক্রী উপস্থিত ছিল না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রার্থী আপীল সূত্রে হাইকোর্টে আসিতে পারিতেন না, কারণ, জজের হুকুম ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় প্রদত্ত হয় নাই; অতএব কেবল হাইকোর্টে দরখাস্ত করাই প্রার্থীর একমাত্র উপায় ছিল, এবং তাহাই তিনি অবলম্বন করিয়াছেন।

মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে, খতের সর্ত্তে যদি এমত দেখা যায় যে, জামিনদারের যাহা করা কর্ত্তব্য ছিল তাহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দায় শেষ হইয়াছে, তবে এই আদালত প্রমাণ তলব না করিয়াও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারেন। প্রার্থী মূল খত দাখিল করিতে পারেন নাই, কারণ, তাহা আদালতের হস্তে আছে; কিন্তু তিনি সেই দলীলের এক জাবেতা নকল দাখিল করিয়াছেন এবং তাহার বিশুদ্ধতার প্রতি কোন আপত্তি হয় নাই।

খতে লেখা আছে যে, রমজান বেগ হাইকোর্টে ১৮৬৯ সালের ৭৭ নং আপীল দাখিল করিয়াছে, কিন্তু ডিক্রীদার তাহার ২২০০০ টাকার ডিক্রীজারী করিতে উদ্যত হইয়াছে, অতএব জামিনদার মুন্সী আমীর আলী ৩৬৬০০ টাকা মূল্যের কতিপয় সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া নিম্নলিখিত সর্ত্তে আপেলাণ্টের জামিন হইয়াছেন, যথা "যদি দায়ী হাইকোর্টের আপীলে কৃতকার্য্য "না হয়, অর্থাৎ যদি রমজান বেগের উক্ত "আপীল ডিস্‌মিস্ হয় এবং রমজান বেগ যদি "উক্ত ডিক্রী পরিশোধ করিতে না পারে, তবে "উক্ত জামিনদার নিজে ঐ টাকা দিবেন, নচেৎ "তাঁহার সম্পত্তির নীলামের দ্বারা তাহা আদায় "হইবে।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হাইকোর্টে রমজান বেগের ১৮৬৯ সালের অপীল ডিস্‌মিস্ হইলেই জামিনদারের দায় প্রবল হইত। যদি আপীল ডিস্‌মিস্ হইত, তবে কাছিম আলীর ডিক্রীর টাকার জন্য মুন্সী আমীর আলী দায়ী হইতেন; কিন্তু আপীল ডিস্‌মিস্ হয় নাই। আপীলের ডিক্রী হইয়াছে, অতএব ঐ দায় উপস্থিত হয় নাই; এবং এইক্ষণে রমজান বেগের বিরুদ্ধে কোন ডিক্রী নাই, সুতরাং জামিনদার তাঁহার দায় হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি ১৮৬৯ সালের ৭৭ নং আপীলের নিষ্পত্তির ফলের অপেক্ষায় আপনাকে দায়ী করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অনিষ্ঠে তিনি কিছু

করেন নাই। পক্ষগণের মনে এমন কোন কথা ছিল না যে, যে বিচারপতিগণ আপীলের বিচার করিবেন তাঁহাদের মতভেদ হইবে, এবং আবার পূর্ণাধিবেশনে আপীলের আবশ্যক হইবে; অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, আপেলাণ্ট রমজান বেগের অনুকূলে আপীল নিষ্পন্ন হওয়াতেই তাহার জমিনদারের দায় শেষ হইয়া গিয়াছে। এমত অবস্থায়, প্রার্থী মুন্সী আমীর আলী দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন বিবেচনা করিতে হইবে। আমরা জজের হুকুম অন্যথা করিয়া আদেশ করিতেছি যে, জামিনী খত রদ করিয়া প্রার্থী মুন্সী আমীর আলীকে ফেরৎ দেওয়া হয়। প্রার্থী এই মোশনের খরচা পাইবেন।

বিচারপতি হবহৌস।—আমি বিবেচনা করি যে, খরচা সমেত এই হুকুম মঞ্জুর হইবে। যে সকল বৃত্তান্তের উপরে আমাদের বিচার করিতে হইবে, তাহা এই, যথা—

কোন ব্যক্তি রমজান বেগ নামক এক ব্যক্তির নামে ২০০০০ হাজারের কিঞ্চিৎ অধিক টাকার জন্য নালিশ করে, এবং ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চ তারিখে ২৪-পরগণার জজ-আদালতে ডিক্রী পায়। সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আদালতে আপীল হয় এবং এই আদালতে সেই আপীল মুলতবী থাকার কালে দায়ীর গ্রেপ্তারীর প্রার্থনায় ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করে। ঐ আপেলাণ্ট রমজান খাঁ এই আদালতের বিচারপতি লক ও দ্বারকানাথ মিত্রের এক খণ্ডাধিবেশনে প্রার্থনা করে যে, জামিন লইয়া ডিক্রীজারী ক্ষান্ত রাখার হুকুম হয়। ১৮৬৯ সালের ১৫ ই এপ্রিল তারিখে খণ্ডাধিবেশনের উক্ত বিচারপতিগণ হুকুম দেন যে, আপীল-আদালতে আপেলাণ্টের বিরুদ্ধ হুকুম হইলে প্রথম আদালতের ডিক্রী অনায়াসে পরিশোধিত হইবার উপযুক্ত জামিন আপেলাণ্ট দিলে ডিক্রীজারী ক্ষান্ত থাকিবে।

তদনুসারে মুন্সী আমীর আলী খাঁ অর্থাৎ আমাদের সম্মুখস্থিত প্রার্থী, ২৪-পরগণার জজের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চের ডিক্রীর টাকার জন্য জামিন হন, এবং জজের বরাবর ঐ মর্ম্মে এক জামিনী-খত লিখিয়া দেন; সেই খতের জাবেতা নকল আমাদের সমক্ষে উপস্থিত আছে। তাহাতে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকে এবং ঐ আপীল অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ৭৭ নং আপীল উক্ত খণ্ডাধিবেশনের বিচারপতিদ্বয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু বিচারপতি লক নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা করার অভিপ্রায় করেন, এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র তাহা স্থির রাখিতে চাহেন। কিন্তু ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ খণ্ডাধিবেশনের জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায়ই প্রবল হইয়া ২৪-পরগণার জজের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা হয় এবং এখনও তাহা অন্যথা হইয়াই রহিয়াছে। তদনন্তর প্রার্থী ২৪-পরগণার জজের নিকট তাঁহার জামিনী খত ফেরৎ পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন। কিন্তু জজ এই হেতুবাদে তাহা ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন যে, তাঁহার ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে হাইকোর্টের চূড়ান্ত হুকুম না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জামিনী-খত স্থির থাকিবে। জজের মনের কথা এই যে, নিম্ন আদালতের বাদী জ্যেষ্ঠ বিচারপতি লকের নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হইয়া সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আদালতের পূর্ণাধিবেশনে আপীল করিয়াছে; এ প্রযুক্ত জজের রায় এই যে, যে পর্য্যন্ত ঐ পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত এই জামিনী খত সিদ্ধ থাকিবে।

প্রার্থী এইক্ষণে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলেন যে, বিরোধীয় জামিনী-খত ফেরৎ পাওয়ার জন্য জজের নিকট দরখাস্ত করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছিল; বাস্তবিক সেই খত ফেরৎ দেওয়া না দেওয়া হাইকোর্টের ক্ষমতাধীন, অতএব তিনি সেই দলীল ফেরৎ পাওয়ার জন্য ও

তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করার জন্য আমাদের নিকট দরখাস্ত করিয়াছেন। তদনুসারে কি জন্য ঐ খত প্রার্থীকে ফেরৎ দেওয়া যাইবে না, এবং তাহা বাতিল বলিয়া ব্যক্ত করা যাইবে না, অর্থাৎ কি জন্য প্রার্থীকে ঐ খতের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারিবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য বাদীর উপরে নোটিস জারী করিতে আমরা হুকুম দেই।

মেং মণি প্রতিপক্ষের কৌন্সেল স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তিনি এই দরখাস্তের বিরুদ্ধে নিম্ন-লিখিত আপত্তি করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলেন যে, খত সম্বন্ধে যে বিজ্ঞবর বিচারপতি লক ও দ্বারকানাথ মিত্র প্রথম হুকুম দিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটই ঐ দরখাস্ত করা উচিত ছিল; নচেৎ কার্য্যের বন্দোবস্তমতে ২৪-পরগণার মোকদ্দমা সমস্ত যে খণ্ডাধিবেশনের অধীন, অন্ততঃ সেই খণ্ডাধিবেশনে অথবা বিচারপতি লকের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে যে পূর্ণাধিবেশনে আপীল হইয়াছে সেই পূর্ণাধিবেশনে দরখাস্ত করা উচিত ছিল। তদনন্তর, তিনি তর্ক করেন যে, এই দরখাস্ত মোশন স্বরূপে লইতে আমাদের অধিকার নাই, কারণ, ২৪-পরগণার জজ যাঁহার হুকুম দেওয়ার অধিকার ছিল তিনি বিরোধীয় জামিনী-খত ফেরৎ দিতে অস্বীকার করেন; অতএব এই প্রকার হুকুমের বিরুদ্ধে কোন আপীল নাই, কিম্বা আপীল থাকিলে প্রার্থীর আপীল করাই উচিত ছিল; তিনি কোন মতেই এই রূপ দরখাস্তের দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইতে পারেন না। এবং পরিশেষে ঐ কৌন্সেল দোষগুণ সম্বন্ধে তর্ক করেন যে, খত তদন্ত করিয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, বিচারপতি লকের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত তাহা স্থির থাকিতে পারে, অথবা অন্ততঃ ন্যায়ানুসারে তাঁহার মওক্কেলের প্রতি সুবিচার করিতে গেলে উক্ত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত খত ফেরৎ দেওয়া উচিত হইবে না।

প্রথম প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর আছে; এবং তাহা এই যে, যে খণ্ডাধিবেশন ঐ হুকুম দিয়াছিলেন তাহার বিচারপতিরা এইক্ষণে একত্রে উপবিষ্ট নহেন, অতএব অতি উৎকৃষ্ট কারণ প্রদর্শিত না হইলে, এই আদালতের কার্য্যের ক্ষতি করিয়া এই দরখাস্ত শুনিবার জন্য তাঁহাদের পুনরায় একত্রে অধিবেশন হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত সমস্তে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আছে। এই মোকদ্দমার প্রার্থী বাস্তবিক সেই খণ্ডাধিবেশনেই দরখাস্ত করিয়াছিলেন, যাঁহার জেলা ২৪-পরগণার মোকদ্দমা সমস্ত বিচার করায় অধিকার আছে। কিন্তু ঐ খণ্ডাধিবেশন সেই দিবস মোশন শুনিবার জন্য উপবিষ্ট ছিলেন না; এ প্রযুক্ত প্রার্থী এই খণ্ডাধিবেশনে দরখাস্ত করেন, কারণ, যে বিচারপতিরা সেই হুকুম দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিচারপতি লক ছিলেন, সুতরাং এই প্রার্থনা শ্রবণের জন্য গ্রহণ করা হয়। যদিও ইহা কার্য্য-প্রণালীর একটি নিয়ম বটে যে, কোন এক জেলার মোকদ্দমা-ঘটিত বিষয় সেই জেলা যে খণ্ডাধিবেশনের অধীন, তাহাতেই উপস্থিত করিতে হইবে, তথাপি রাজকীয় সনন্দের দ্বারা এই আদালতের খণ্ডাধিবেশনের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঐ নিয়ম দ্বারা খণ্ডিত হয় নাই, এবং ঐ নিয়ম এমন নহে, যাহা সর্ব্বদা সম্পূর্ণ রূপে অনুসরণ করা যাইতে পারে, বা করা গিয়া থাকে। অতএব বিচারপতি লক এবং বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের, অথবা ২৪-পরগণা যে খণ্ডাধিবেশনের অধীন সেই খণ্ডাধিবেশনেরই কি জন্য এই দরখাস্ত শুনিতে হইবে, প্রতিপক্ষের কৌন্সেল তাহার কোন হেতু প্রদর্শন না করিলে আমরা এই দরখাস্ত ঐ বিচারপতিদ্বয়ের অথবা ঐ খণ্ডাধিবেশনের নিকট ন্যায্য রূপে পাঠাইতে পারি না।

তৃতীয় আপত্তির উত্তর এই যে, আমার স্পষ্ট বোধ হয় যে, যদিও এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশনে আপীল হইয়াছে, এবং আপীলের রেজিষ্টরী বহীতে তাহা রেজিষ্টরী হইয়াছে, তথাপি সেই পূর্ণাধিবেশন এখনও নির্দ্দিষ্ট অথবা নামকৃত হয় নাই, এবং তাহা যে কত কালের মধ্যে হইবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না; অতএব যে পর্য্যন্ত আমরা নিশ্চিত জানিতে না পারি যে, আমাদের অপেক্ষা পূর্ণাধিবেশন এই বিষয়ের সুবিচার করিতে পারিবেন, অথবা এই বিষয়ে আমাদের বিচারাধিকার নাই, পূর্ণাধিবেশনের তাহা আছে, সে পর্য্যন্ত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির প্রতীক্ষায় আমরা এই দরখাস্ত স্থগিত রাখিতে পারি না। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যাইতেছে যে, এই আদালতের দুই বিচারাধিপতির অন্য খণ্ডাধিবেশন কি পূর্ণাধিবেশন যেমন এই বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন, আমরাও তদ্রূপ বিচার করিতে পারিব। মেং মণির চতুর্থ আপত্তির প্রথম ভাগ এই যে, এই বিষয়ের বিচার করিতে হাইকোর্টের অধিকার আছে কি না, এবং তাহা থাকিলে, প্রার্থীকে এই জামিনী খত ফেরৎ দেওয়া আমাদের উচিত কি না।

বিচারাধিকার সম্বন্ধে বিজ্ঞবর কৌন্সেলের তর্কের সারাংশ এই যে, তিনি বলেন, এই দলীল ২৪-পরগণার জজ-আদালতে দাখিল হয়, এবং তাহা এখনও সেই আদালতের নথীতেই আছে; এবং এই দলীল যথেষ্ট কি না, তদ্বিষয়ে ২৪-পরগণার দেওয়ানী জজই প্রথমে বিচার করেন, এবং যে ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা ন্যায্য রূপেই তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উপরিউক্ত আপীলে পূর্ণাধিবেশনের চূড়ান্ত রায় প্রদত্ত না হইলে, তিনি জামিনী খত ফেরৎ দিতে পারেন না। কিন্তু ইহার উত্তর অতি সরল, এবং তাহা এই যে, রাজকীয় সনন্দের বিধান এই যে, নিম্ন কোন আদালতের জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ আপীলে কি নিষ্পত্তি হইবে, তদ্বিষয়ে যদি কোন খণ্ডাধিবেশনের বিচারপতিদ্বয়ের মতভেদ হয়, তবে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায় প্রবল হইয়া সেই রায়ই এই আদালতের ডিক্রী গণ্য হইবে। ইহার স্পষ্ট ফল এই যে, যে খণ্ডাধিবেশন মূল আপীলের বিচার করিয়াছিলেন, সে স্থলে সেই খণ্ডাধিবেশনের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি লক ২৪-পরগণার জজের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা করার রায় প্রদান করেন, সে স্থলে ২৪-পরগণার জজের সেই নিষ্পত্তি এবং তদনুযায়ী যে ডিক্রী হয়, তাহা বাতিল ও বিফল হইয়া গিয়াছে, এবং ২৪-পরগণার জজের কোন ডিক্রী আর বর্ত্তমান নাই। অতএব ২৪-পরগণার জজের ঐ ডিক্রী বর্ত্তমান না থাকায় সেই ডিক্রী জারীর কোন কার্য্য হইতে পারে না; সুতরাং ২৪-পরগণার জজ যখন জামিনী খত ফেরৎ দেওয়ার জন্য প্রার্থীর দরখাস্ত লইয়া, তাহা ডিক্রীজারীর কার্য্য অনুমানে ঐ খত ফেরৎ দিতে অস্বীকার করত হুকুম দিয়াছেন, তখন তিনি আমার বিবেচনায়, আইনে তাঁহাকে যে ক্ষমতা দেয় নাই তাহাই পরিচালন করিয়াছেন; অতএব তাঁহার রায় বাতিল ও বৃথা, এবং আমাদের বিবেচনায়, তাহা বাধ্যকর নহে। পক্ষান্তরে, আমি বিবেচনা করি যে, এই দরখাস্ত লইতে এবং তাহার দোষগুণের উপরে বাধ্যকর নিষ্পত্তি প্রদান করিতে এই আদালতের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

যে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ ১৮৬৯ সালের ১৫ ই এপ্রিলের হুকুম প্রদান করেন, তাঁহারা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিয়াছেন। যখন এই আদালতে আপীল উপস্থিত ছিল, তখন আপেলাণ্ট ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার জন্য এই আদালতে দরখাস্ত করে, এবং ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিয়া, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রথম আদালতের ডিক্রী প্রদত্ত হয়, তাহাকে আপীল-আদালতের ডিক্রী প্রতিপালন করার জন্য জামিন দাখিল করার হুকুম দিতে

আপীল-আদালত স্বরূপে কেবল এই আদালতেরই ক্ষমতা ছিল। ইহা সত্য বটে যে, উপস্থিত প্রার্থীর শরীর এবং সম্পত্তির দ্বারা আপেলাণ্ট যে জামিন দাখিল করে, তাহা যথেষ্ট কি না, তাহা নিম্ন আদালতের জজ তদন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু আমার বিবেচনায়, ঐ জজ এই বিষয়ে আম্‌লার কার্য্য করিয়াছিলেন, বিচারকের কার্য্য করেন নাই।

বিজ্ঞবর কৌন্সেল তৎপরে তর্ক করেন যে, যে খণ্ডাধিবেশন ১৮৬৯ সালের এপ্রিলের হুকুম প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার তাহা প্রদান করার ক্ষমতা থাকিলেও এমন হইতে পারে না যে, উপস্থিত প্রার্থী যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাও এই অথবা অন্য কোন খণ্ডাধিবেশনের মঞ্জুর করার ক্ষমতা আছে।

তাহার উত্তর এই যে, যে স্থলে কোন কার্য্য কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য হইলেও তাহা করিতে আদালতের হুকুম প্রদান করার ক্ষমতা থাকে, সে স্থলে ইহা অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সেই হুকুমের অন্তর্গত এবং তৎসংক্রান্ত ও তদানুষঙ্গিক অন্য যে কোন হুকুম পশ্চাতে দেওয়ার আবশ্যক হয়, তাহা দিতেও ঐ আদালতের সমতুল্য অধিকার আছে। মনে কর; প্রার্থী এই জামিনী খত না দিয়া, প্রথম আদালতের ডিক্রী পরিশোধার্থে যে টাকার আবশ্যক, তাহার জামিন স্বরূপে এই আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হস্তে নগদ টাকা অথবা কোম্পানির কাগজ আমানৎ করিয়া দিতেন; এবং এই মোকদ্দমায় যে প্রকার ঘটনা হইয়াছে, মনে কর, সেই প্রকারেই ডিক্রী বাতিল ও অন্যথা হইত, তবে কি ঐ ডিক্রী অন্যথা ও বাতিল হইলে আমরা সেই টাকা অথবা কোম্পানির কাগজ ফেরৎ দিবার হুকুম দিতে পারিতাম না? ইহার উত্তর এই যে, আমরা তাহা দিতে পারিতাম, এবং প্রতিপক্ষের কৌন্সেলও এতদ্বিরুদ্ধ তর্ক করিতে পারেন নাই। অতএব আমাদের নিজের আদালতের রেজিষ্ট্রারের হস্তে যাহা জামিন স্বরূপ আমানত থাকে তাহা যদি আমরা ফেরৎ দিবার হুকুম করিতে পারি, তবে আমাদের অধীন আদালত যিনি তুল্যরূপে আমাদের হুকুমের অধীন এবং যিনি বিচারক স্বরূপে আপন বিচারাধিকারান্তর্গত কার্য্য করেন নাই, আমাদের হুকুমানুসারে আমলার কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই আদালতে যাহা জামিন স্বরূপ দাখিল হইয়াছে তাহা আমরা কি জন্য ফেরৎ দিবার হুকুম প্রদান করিতে পারিব না?

কিন্তু মে মণি তর্ক করেন যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির অধ্যায় এবং বচন না দেখাইতে পারিলে আমাদের বিচারাধিকার হইতে পারে না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৩৮ ধারামতেই আমাদের ঐ বিচারাধিকার আছে, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদি কোন বিশেষ প্রয়োজনের এবং বিশেষ সময়ের নিমিত্ত জামিন লওয়ার হুকুম দিতে আমাদের ক্ষমতা থাকে, তবে সেই ক্ষমতা হইতে যে ক্ষমতার উৎপত্তি হয় তাহাও আমাদের আছে, অর্থাৎ, যখন ঐ জামিন আর সেই প্রয়োজনের জন্য আবশ্যক নাই এবং তাহা যে সময়ের জন্য আবশ্যক হইয়াছিল তাহা অতীত হইয়া গিয়াছে, এবং যে ব্যক্তি তাহা দিয়াছিল তাহার তাহাতে স্বত্ত্ব আছে এবং তাহা কোন না কোন ব্যক্তির দ্বারা ফেরৎ হইবে, তখন তাহা ফেরৎ দিতে আমাদেরও ক্ষমতা আছে। কোন কোন ডিক্রীজারী সম্বন্ধে এই আদালতের যে বহুতর নজীর হইয়াছে তাহা আমাদের ঐ মতের প্রতিপোষক। মনে কর, প্রথম আদালত ৫০০ টাকার ডিক্রী দিয়াছেন, এবং সেই ডিক্রী রবিরুদ্ধে আপীল চলিবার কালে প্রথম আদালতের ডিক্রীদার সেই আদালতে ডিক্রীজারী করিয়া তাহার ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে; তাহার পরে যদি এই আদালতের দ্বারা সেই ডিক্রী অন্যথা

হয়, তবে, এই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, প্রথম আদালত ঐ ডিক্রীজারীতে যে হুকুম দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা অন্যথা করায়, যে ডিক্রীদারের ডিক্রী আপীল-আদালত কর্ত্তৃক অন্যথা হইয়াছে, সে বিচারাদিষ্ট দায়ীর নিকট যে টাকা লইয়াছিল, তাহা দায়ীকে ফেরৎ দিবার অধিকার আছে। কিন্তু অধঃস্থ আদালতের দ্বারা এইরূপ ক্ষমতা পরিচালনের জন্য দেওয়ানী কার্য্য-বিধিতে কোন অনুজ্ঞা-সূচক ধারা অথবা বচন নাই; তথাপি এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশন এবং নানা খণ্ডাধিবেশন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, অধঃস্থ আদালত সমস্ত ভ্রমবশতঃ যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা অন্যথা করিতে পারেন। অতএব এই আদালত উপস্থিত বিষয়ে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা অন্যথা করার আবশ্যক হইলে এই আদালতও তাহা অন্যথা করিতে পারেন।

অনন্তর, দোষগুণ সম্বন্ধে মেং মণি তর্ক করেন যে, হাইকোর্টের আপীলের বিষয়ে জামিনদারের কি দায় হইবে তাহা জামিনী-খতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে বটে, কিন্তু প্রথম আদালতের ডিক্রী অন্যথা হইলে তাঁহার কি দায় হইবে তাহা ঐ খতে লেখা নাই; অতএব বিজ্ঞবর কৌন্সেল তর্ক করেন যে, তদ্বিষয়ে আমরা প্রমাণ লইতে বাধ্য, অর্থাৎ প্রথম আদালতের ডিক্রী অন্যথা হইলেই জামিনদারের দায় শেষ হইয়া যাইবে, কি উক্ত পূর্ণাধিবেশনের দ্বারা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ দায় স্থির থাকিবে, তাহা আমরা দেখিতে বাধ্য।

কিন্তু প্রার্থীর পক্ষে মেং পল এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঐ আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের উত্তর। তিনি ন্যায্য রূপেই বলিয়াছেন যে, ঠিক কি বিষয়ের জন্য জামিনদার খত লিখিয়া দিয়াছেলেন, কেবল তাহাই আমাদের নির্দ্দেশ করিতে হইবে, এবং সেই বিষয় জামিনী খতে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত আছে, অতএব খতের বহির্ভুত প্রমাণ লইয়া খতে যে বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ নাই তাহার জন্য আমরা জামিনদারকে দায়ী করিতে পারি না। আমার বোধ হয় যে, তাহাই আইন-সিদ্ধ কথা। কেবল এক বিষয়ের জন্যই জামিনী-খত লিখিয়া দেওয়া হয়। তাহা এই সর্ত্তে প্রদত্ত হয় যে, যদি ১৮৬৯ সালের ৭৭ নং আপীল আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে নিষ্পন্ন হয়; তবে জামিনদার প্রথম আদালতের ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চ্চের ডিক্রীর দেনার জন্য দায়ী হইবে। কেবল এই কথার জন্যই জামিন দাখিল হয়; অতএব যে স্থলে মোকদ্দমার এই ফল হইয়াছে যে, প্রথম আদালতের ডিক্রী অন্যথা হইয়াছে এবং সেই ডিক্রী বাতিল ও অন্যথা হওয়ায় আর ডিক্রী বর্ত্তমান নাই, সে স্থলে সেই ডিক্রীর ফল রক্ষা করার জন্য যে জামিনী-খত প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু আরও তর্কিত হইয়াছে যে, এই জামিনী-খত এইক্ষণে ফেরৎ দেওয়ার কোন আবশ্যক নাই, এবং বাদীর প্রতি সুবিচার করিতে হইলে আমাদের তাহা আদালতের হস্তেই রাখা কর্ত্তব্য, কারণ, বিচারপতি লকের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদী ভবিষ্যতে যদি পূর্ণাধিবেশনের ডিক্রী পায়, তবে প্রার্থী সেই ডিক্রীর দেনার জন্য দায়ী হইবে কি না, তাহা সেই ডিক্রীজারীতে উপস্থিত হইয়া মীমাংসিত হইতে পারিবে।

কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, ঠিক এই কথার সিদ্ধান্ত করিতেই আমাদের ক্ষমতা আছে এবং তাহারই আমরা এইক্ষণে বিচার করিতেছি, এবং আমাদের বিচারাধিকার থাকিলে আমরা কি জন্য তাহার মীমাংসা করিব না, তাহার কোন হেতু প্রদর্শিত হয় নাই।

এমত অবস্থায়, আমি বিবেচনা করি যে, এই রুল মঞ্জুর হইবে; এবং আমরা আদেশ করিতেছি যে, প্রার্থীকে তাঁহার জামিনী-খত ফেরৎ দেওয়ার জন্য ২৪-পরগণার দেওয়ানী

জজের উপরে এক পরওয়ানা জারী হয়, এবং ইহা ব্যক্ত হয় যে, এই খত বাতিল হইল এবং প্রার্থী অর্থাৎ জামিনী-খত-দাতা তাহার জামিনীর দায় হইতে মুক্ত হইলেন। প্রতিপক্ষ এই মোশনের খরচা দিবে। (ব)

২৮ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৮৫১ নং মোকদ্দমা।

বাঁকুড়ার মুনসেফের ১৮৬৯ সালের ২১ এ জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ ১৮৬৯ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

নীলমাধব কর্ম্মকার (বাদী) আপেলাণ্ট।

শিবুপাল (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনানুসারে এক অধীন-জমার নীলাম-ক্রেতা তাহার পূর্ব্বাধিকারীর সৃষ্ট এক মোকররী জমা অন্যথা করিয়া তদন্তর্গত ভূমির খাস দখল পাওয়ার জন্য ঐ জমার দখীলকারের বিরুদ্ধে নালিশ করে। ঐ দখীলকার-প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, সে ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ঐ ভূমির চাষ করিয়া দখলের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়াছে। এ স্থলে, প্রতিবাদী উচ্ছেদের দায় হইতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার দ্বারা রক্ষিত; এবং বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারামতে ঐ মোকররী পাট্টা অন্যথা হইতে পারিলেও তাহাতেই যে প্রতিবাদী অবশ্য দখল হইতে উচ্ছেদিত হইবে, এমত হইতে পারে না।

বিচারপতি হবহৌস।—এই মোকদ্দমার বাদী অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্ট বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনানুযায়ী এক নীলামে এক অধীন-জমা ক্রয় করে। বাদীর ক্রয়ের পূর্ব্বে ঐ অধীন-জমা যে ব্যক্তির ছিল, সে প্রতিবাদীকে এক মোকররী পাট্টা দিয়া ঐ জমার উপরে এক দায় সৃজন করিয়াছিল। বাদী ক্রয় করার পরে প্রতিবাদী হইতে ঐ মোকররী পাট্টার অন্তর্গত ভূমির খাস দখল পাওয়ার জন্য নালিশ করে। আপীল-আদালতের জজ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নির্দেশ করিয়াছেন যে, যে প্রকারেই হউক, প্রতিবাদী ১২ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ ঐ ভূমির চাষ করিয়া আসিতেছে, অতএব বাদী এই নালিশের দ্বারা খাস দখল পাইতে অর্থাৎ প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করিতে পারে না।

আমরা প্রথমে মনে করিয়াছিলাম যে, জজের এই নিষ্পত্তি ভ্রমাত্মক হইয়াছে। কিন্তু আইন বিশেষ রূপে দেখিয়া এবং প্রতিপক্ষের তর্ক শুনিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে যে, জজের রায়ই বিশুদ্ধ। খাস আপেলাণ্টের তর্ক এই যে, বিরোধীয় মোকররী পাট্টার দ্বারা জমার উপরে এক দায় সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সে বলে যে, যেহেতু প্রতিবাদী ঐ দায়ের দখীলকার, অতএব যদি বাদীর ঐ দায় অন্যথা করার ক্ষমতা থাকে, তবে প্রতিবাদীকেও বাদী উচ্ছেদ করিতে পারে। এবং সে তর্ক করে যে, প্রতিবাদী কেবল বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারার প্রথম বজ্জিত বিধি অবলম্বন করিলে এবং সে যে এক জন খোদখাস্ত রাইয়ৎ অথবা ঐ বজ্জিত বিধির অন্তর্গত বাসেন্দা এবং পুরুষানুক্রমে কৃষী, ইহা দেখাইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে।

কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, প্রতিবাদীর সহিত উক্ত বজ্জিত বিধির কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা সত্য বটে যে, জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,

প্রতিবাদী খোদখাস্ত রাইয়ত নহে, এবং জজ ইহা নির্দ্দেশ করেন নাই যে, প্রতিবাদী বাসিন্দা এবং পুরুষানুক্রমাগত কৃষী ; কিন্তু তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজা ; এবং সেই কথার দ্বারাই আমরা বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় ঐ প্রজা যথেষ্ট রূপে রক্ষিত। ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারায় লেখা আছে যে, যদি দায় "সৃজন করার স্বত্বের" স্পষ্ট বিধি না থাকে এবং যে প্রজার নামে নালিশ উপস্থিত হয় সে যদি ইহা না দেখাইতে পারে যে, সে আমার উপরিউক্ত বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত প্রজা, তবে, "এই আইনমতে "নীলাম-কৃত অধীনজমার ক্রেতা সেই অধীন-"জমার অধিকারীর অথবা তাহার প্রতিনিধির "অথবা যে ব্যক্তি তাহার স্বত্ব পাইয়াছে তাহার "সৃজিত সকল দায় হইতে মুক্ত অধিকার পাইবে।" এই জমার পূর্ব্বাধিকারীর কৃত দায় মুক্ত করার জন্য যদি বাদী নালিশ করিত, তবে এই নালিশ উৎকৃষ্ট বলিয়া আমরা নির্দ্দেশ করিতে ও তাহাকে প্রতিকার প্রদান করিতে পারিতাম, কারণ, এই দায় পূর্ব্বাধিকারি-কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে এবং তাহা সৃজন করার কোন বিশেষ একারের অন্তর্গত স্বত্বের দ্বারা তাহা রক্ষিত নহে। কিন্তু প্রতিবাদী এই মোকদ্দমায় ঐ দায়ের উপরে নির্ভর করিলেও কেবল তাহারই উপরে নির্ভর করে না। সে বলে যে, সে উচ্ছেদিত হইতে পারে না, কারণ, তাহার দখলের স্বত্ব আছে, এবং সে সেই স্বত্ব ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে পাইয়াছে। বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের ১৬ ধারায় যে দায়ের কথা লেখা আছে তাহা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় নহে, সম্পত্তি সম্বন্ধীয় দায়। এই মোকদ্দমার পাট্টা হয়ত বাতিল করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেই এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, যে ব্যক্তি তাহার দখীলকার সে অবশ্যই অবশ্য উচ্ছেদিত হইবে। আইনে এমন কথা বলে না ; বরং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের যে বিধির উপরে প্রতিবাদী নির্ভর করে, তাহা প্রতিবাদীর ন্যায় যে ব্যক্তির দখলের স্বত্ব আছে তাঁহাকে রক্ষা করে।

১১ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৫৩ পৃষ্ঠায় এক খণ্ডাধিবেশনের নিষ্পত্তি আমাদের এই রায়ের প্রতিপোষক।

খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইল।

( গ )

---

২৯ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট এবং বিচারপতি এফ বি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৭৭৫ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১৬ ই আগস্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সেতাবচাঁদ নাহার ( বাদী ) আপেলান্ট।

মাছম আলী চৌধুরী ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেন্ট।

বাবু কালীকৃষ্ণ সেন আপেলান্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেন্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—যে স্থলে কালেক্টর দেখেন যে, তিনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, এজেন্ট (অর্থাৎ মোক্তার বা গোমাস্তা) তাহার উচিত উত্তর দিতে পারে না, সে স্থলে তিনি মুল ব্যক্তির হাজির হওয়ার হুকুম দিলে যদি সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ত্রুটি করে, তবে মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫৮ ধারার অন্তর্গত হইবে, এবং এই প্রকার মোকদ্দমায় কালেক্টরের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না।

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—আমরা বিবেচনা করি যে, জজ বিশুদ্ধ রূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমার আপীল নাই। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬৪ ধারার বিধান

এই যে, কালেক্টরের যদি এই মত হয় যে, এজেণ্ট কোন আবশ্যকীয় কথার উত্তর দিতে পারিবে না এবং সে যাহার এজেণ্ট তাহার নিজের উত্তর করা আবশ্যক, তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে হাজীর হওয়ার হুকুম দিতে পারেন, এবং যদি সে হাজীর না হয়, তবে হাজীর হইতে ত্রুটি করিলে যে প্রকার হুকুম দেওয়া আবশ্যক, তিনি তদ্রূপ হুকুম দিতে পারেন। গয়র হাজীরীর মোকদ্দমার ন্যায়, ৫৮ ধারামতে ঐ হুকুম হইতে পারে, কারণ, বিধান এই যে, কালেক্টর যদি দেখেন যে, তিনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, কোন এক পক্ষের এজেণ্ট তাহার উত্তর দিতে পারে না এবং সেই পক্ষের স্বয়ং তাহার উত্তর দেওয়া উচিত, এবং তিনি যদি নির্দেশ করেন যে, এজেণ্টের হাজীর যথেষ্ট হাজীর নহে, সেই মূল পক্ষের স্বয়ং হাজীর হওয়া অবশ্যক, তবে সেই পক্ষ হাজীর না হইলে মোকদ্দমা ৫৮ ধারার অন্তর্গত হয়।

যদিও শ্রেণীমতে ৬৪ ধারা ৫৮ ধারার পরে স্থাপিত হইয়াছে, তথাপি ব্যবস্থাপক সমাজের মনে যে এমন ভাব ছিল যে, ৬৪ ধারার অন্তর্গত নিষ্পত্তি ৫৮ ধারার অন্তর্গত নিষ্পত্তির ন্যায় হইবে না, তাহা কিছুতেই দৃষ্ট হয় না।

স্পষ্ট বিধান আছে যে, গয়র হাজিরীর দরুন্ যে হুকুম হয় তাহার বিরুদ্ধে আপীল নাই। কালেক্টরের হুকুম সেই বিধানান্তর্গত। ইহা বাদীর পক্ষে কষ্টদায়ক হয় বটে। কালেক্টর যদি অন্য কোন হুকুম প্রদান করিতেন, তবে তাঁহার ইহা অপেক্ষা ভাল বিবেচনার কার্য্য হইত, কিন্তু ঐ ধারা দৃষ্টে আমরা অন্য কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি না। আইন অনুসারে আমাদের নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আপীল ডিস্মিস্ হইবে, কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে কেহ উপস্থিত না হওয়ায় খরচা দেওয়া যাইবে না। (গ)

২৯ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি ই জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৭০ সালের ১৩১ নং মোকদ্দমা।

২৪-পরগণার দ্বিতীয় অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৮ এ এপ্রিলের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ৬ ই সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কালিদাস মিত্র (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

দেবনারায়ণ দেব (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীমোহন দাস ও মোহিনীমোহন রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আনন্দগোপাল পালিত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দখলের ডিক্রী পাইলেই যে সকল স্থলেই ওয়াশীলাৎ পাওয়ার স্বত্ব জন্মে, এমত নহে।

ওয়াশীলাতের যে মোকদ্দমায় বাদীর ত্রুটিতে আমীনের তদন্ত সম্পূর্ণ না হয়, তাহাতে এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, স্থানীয় তদন্ত এক কালেই হয় নাই, এবং প্রতিবাদী তাহার প্রমাণ দাখিল করিবার সুযোগ পায় নাই।

কনিষ্ঠ বিচারপতি গ্লবর এই মতে অসম্মত।

বিচারপতি গ্লবর।—ওয়াশীলাতের জন্য এই নালিশ হয়। বাদী এবং প্রতিবাদী তালুক আবাদ কৃষ্ণরাম নামক এক সম্পত্তির শরীক ছিল। যখন প্রথমে তাহারা ঐ সম্পত্তির মালিক হয়, তখন তাহার অনেক ভাগ জঙ্গল ছিল, এবং তাহাদের মধ্যে এই বন্দোবস্ত হয় যে, যদি জরীপ করিয়া এমন দৃষ্ট হয় যে, তাহাদের মধ্যে কেহ তাহার নিজ অংশ অপেক্ষা অধিক জমি ভোগ করে, তবে সেই অতিরিক্ত ভূমি কত তাহা নির্ণীত হইলে, সে তাহা ছাড়িয়া দিবে।

এই মোকদ্দমায় বাদী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বলিয়া ৩৯৯ বিঘা ভূমির দাবীতে প্রতিবাদীর

নামে নালিশ করে যে, সে তাহার নিজ অংশের অতিরিক্ত ঐ ভূমি ভোগ করে, এবং বাদী তাহাতে ডিক্রী পায়। নথীতে সেই ডিক্রী নাই, এবং বাদী অথবা প্রতিবাদী তাহা দাখিল করা উচিত বোধ করে নাই; কিন্তু সকলেই স্বীকার করিয়াছে যে, প্রতিবাদী ঐ সকল জঙ্গল আবাদ করিতে যে খরচ করিয়াছিল, ঐ ডিক্রীতে তাহাকে তাহার খেসারত প্রদত্ত হয়। নালিশের পূর্ব্ব ছয় বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিবাদী যে ওয়াশীলাৎ পাইয়াছে, তাহা তাহার নিকট হইতে পাওয়ার জন্য বাদী তাহার বিরুদ্ধে এইক্ষণে নালিশ করিয়াছে।

প্রতিবাদীর জওয়াব এই যে, মোকদ্দমার অবস্থামতে সে ওয়াশীলাতের জন্য দায়ী হইতে পারে না। সে কত দূর পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করিয়া এই সকল ভূমি আবাদ করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত, এবং বাদী জঙ্গলের পরিবর্ত্তে আবাদী ভূমি লাভ করিয়াছে, অতএব সে ওয়াশীলাতের দাবী করিতে পারে না।

প্রথম আদালত এই হেতু নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন যে, যে স্থলে দখলের মুল ডিক্রী দাখিল হয় নাই, সেস্থলে ওয়াশীলাতের দাবী চলিতে পারে কি না, তাহা বলা দুঃসাধ্য; এবং ওয়াশীলাতের পরিমাণ সম্বন্ধে নথীতে যথেষ্ট প্রমাণ নাই, কারণ, বাদী আমীনের ফীস দাখিল না করাতে আমীনের স্থানীয় তদন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই।

আপীলে জজ নির্দ্দেশ করেন যে, বাদী ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান্, এবং আমীন যে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যদিও বাদীর সমুদায় দাবী সংস্থাপন করে না, তথাপি তদ্দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, ভূমির কতক ভাগের ওয়াশীলাৎ রাইয়ৎদিগের নিকট আদায় হইয়াছে, অতএব তিনি সেই পরিমাণে বাদীকে ডিক্রী দেন।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, বাদী যে ওয়াশীলাতের স্বত্ববান্, ইহার কোন প্রমাণ সে দর্শায় নাই, এবং সে স্বত্ববান্ হইলেও তাহার কত টাকা প্রাপ্য, তাহা সে সপ্রমাণ করে নাই।

আমার বোধ যে, প্রথম হেতু সম্বন্ধে জজের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ। প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে বাদী নিঃসন্দেহ এই হেতুতে ডিক্রী পাইয়াছিল যে, প্রতিবাদী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই ভূমিতে অন্যায় দখীলকার ছিল। প্রতিবাদী এই ভূমি সরলভাবে কি কপটভাবে দখল করিয়া থাকুক, অর্থাৎ তাহাতে তাহার উৎকৃষ্ট স্বত্ব আছে বিবেচনা করিয়া, কিম্বা আপনাকে অনধিকার-প্রবেশক জানিয়াই দখল করিয়া থাকুক, তাহাতে আমার বিবেচনায়, কিছু আইসে যায় না। যে ঘটনায়ই হউক, সে যে কয় বৎসর পর্য্যন্ত দখল করিয়াছিল, (যে দখল উপযুক্ত আদালত অন্যায় দখল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন,) সেই কয় বৎসর সে ঐ খাজানা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, যে খাজানা তাহার নিজের প্রাপ্য নহে, বাদীর প্রাপ্য ছিল।

আমাদের সমক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, মুল ডিক্রীতে খেসারতের হুকুম থাকাতেই দেখা যাইতেছে যে, যে আদালত তখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন, বাদীকে ওয়াশীলাৎ দিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না, কারণ, তাহা হইলে ঐ খেসারতের হুকুমের দ্বারা তাঁহার নিজের হুকুম অকর্ম্মণ্য হইত, অর্থাৎ তাহা হইলে, যাহা এক হস্তে দেওয়া হইয়াছিল তাহা আর এক হস্ত দ্বারা লওয়া হইত।

কিন্তু আমি এই তর্কের বল দেখি না। বাদীর নালিশে ওয়াশীলাতের দাবী ছিল না। তাহা কেবল দখল পাওয়ার জন্য উপস্থিত হয়; অতএব আদালত ওয়াশীলাতের কোন কথা বলিলে তাঁহার ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্য্য করিতেন, এবং আদালতের খেসারতের হুকুম দেওয়াতেই বোধ হইতেছে যে, তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাদী ইহার পরে ওয়াশীলাতের দাবী করিবে, অতএব প্রতিবাদী ঐ ভূমি আবাদ করাতে তাহার যে ব্যয়

হইয়াছিল, তাহা এই মনস্থে তাহাকে অগ্রে দেওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন যে, যদি পশ্চাতে তাহার ওয়াশীলাৎ দিতে হয়, তবে তাহার কোন হানি না হইতে পারে। যাহা হউক, যদি সেই ডিক্রীতে বাদীর ওয়াশীলাৎ পাওয়ার স্বত্বের বিরুদ্ধ কোন প্রসঙ্গ থাকে, তবে প্রতিবাদীরই সেই ডিক্রী দাখিল করা, এবং যে সাধারণ নিয়ম আছে যে, যাহা এক ব্যক্তির সম্পত্তি নহে তাহা যদি সে দখল করে, তবে যত কাল সে তাহা ঐ রূপ অন্যায় দখল করিবে, তত কালের ওয়াশীলাতের জন্য সে দায়ী হইবে, এই নিয়ম কি জন্য প্রতিবাদীর সম্বন্ধে খাটিবে না, তাহা প্রদর্শন করা, উচিত ছিল।

ইহার সন্দেহ নাই যে, ওয়াশীলাতের পরিমাণ সম্বন্ধে বাদীর ত্রুটি হেতুই আমীনের রিপোর্ট এবং স্থানীয় তদন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই, এবং বাদীর আপন ত্রুটির সেই পরিমাণ ফলভোগ করা উচিত। কিন্তু ঐ ভূমির কতক ভাগ সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, যে সকল সাক্ষী ঐ স্থানে বাস করে, আমীন অন্ততঃ তাহাদের জবানবন্দী লইয়াছিলেন, এবং তাহারা নিজে প্রতিবাদীকে যে হারে খাজানা দেওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছে, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতিবাদী এইক্ষণে বলে যে, আমীনের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকায় আমীন যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছিলেন, তাহাদের সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে প্রতিবাদী সুযোগ পায় নাই; কিন্তু নথীতে দেখা যাইতেছে যে, সে অবশ্যই সেই সুযোগ পাইয়াছিল, কারণ, সাক্ষী যে টাকা দিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করে, তাহা যে প্রতিবাদী আদায় করে নাই, তাহা দেখাইবার জন্য প্রতিবাদী জমাওয়াশীল-বাকীর কাগজ দাখিল করিয়াছিল; কিন্তু সে ঐ জমাওয়াশীল-বাকীর কাগজ সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করে নাই, এবং নিজের পক্ষেও কোন সাক্ষীর জবানবন্দী করাইতে চেষ্টা করে নাই। অতএব এইক্ষণে সে এত বিলম্বে আর বলিতে পারে না যে, সে সুযোগ পাইলে, যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে তাহাদের সাক্ষ্য খণ্ডন করিতে পারিত। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন সে জমাওয়াশীল-বাকীর কাগজ দাখিল করিয়াছিল তখনই তাহার বিস্তর সুযোগ ছিল। দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১৮০ ধারার বিধান এই যে, আমীনের রিপোর্ট এবং যে প্রমাণের উপরে আমীন তাঁহার রিপোর্ট করেন, তদুভয়ই মোকদ্দমার প্রমাণ, এবং আইনের কোন স্থানে এমন বিধান নাই যে, উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় যে অবস্থায় আমীনের রিপোর্ট সম্পূর্ণ হইতে পারে না, তাহাতে, যে পর্য্যন্ত প্রমাণ লওয়া হইয়া থাকে তাহা জজের বিবেচনায়, বিশ্বাস-যোগ্য হইলে, বিরোধীয় সম্পত্তির কতক ভাগ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পরিবে না। এই মোকদ্দমায় জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বিরোধীয় সম্পত্তির কতক ভাগ সম্বন্ধে কি হারে খাজানা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ১৫ জন সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, অতএব আমার বিবেচনায়, ইহা একটি বৃত্তান্ত-ঘটিত নির্দ্দেশ যাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে খাস আপীলে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই। অতএব আমি বিবেচনা করি, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করা উচিত।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই খাস আপীল যে দুই হেতুর উপরে উপস্থিত হইয়াছে তদুভয় সম্বন্ধেই আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতির সহিত আমার মতের প্রভেদ হইতেছে। আমি বিবেচনা করি যে, বাদীরই ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, সে ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান, এবং প্রতিবাদী কি অবস্থায় ঐ ভূমির দখল পাইয়াছিল বাদী তাহার কোন প্রমাণ দিতে না পারিলে সে স্বত্ববান কি না, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সে এই বিষয়ের বাচনিক প্রমাণ দিতে পারিত, অথবা এই মূল মোকদ্দমায় যে ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা দাখিল করিতে পারিত। সে

ঐ দুই কার্য্যের এক কার্য্যও করে নাই ; অতএব সে ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান কি না, তাহা আমি জানিতে পারি না ; এবং নিম্ন আদালতের সমক্ষে এমন কোন প্রমাণ ছিল না যদ্দ্বারা তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন যে, বাদী ওয়াশীলাৎ পাইতে পারে। বাদীর ওয়াশীলাৎ পাওয়ার স্বত্ব প্রতিবাদী অস্বীকার করিয়াছে, অতএব বাদীরই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, সে তাহাতে স্বত্ববান। আমি এমত বিবেচনা করি না যে, প্রত্যেক বাদীই দখলের ডিক্রী পাইলেই ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান হইবে। আমাদের আদালত সমক্ষে এমন অনেক মোকদ্দমা হইয়াছে যাহাতে দখলের ডিক্রী সত্ত্বেও ওয়াশীলাতের ডিক্রী দেওয়া হয় নাই ; বিশেষ, এই মোকদ্দমায় যে স্থলে প্রতিবাদীকে প্রথমে খেসারত না দিয়া বাদী দখলের ডিক্রী পায় নাই, সে স্থলে বাদী যে, ওয়াশীলাৎ পাইতে স্বত্ববান হইবে, ইহা অত্যন্ত সন্দেহের কথা। পূর্ব্ব মোকদ্দমায় ওয়াশীলাতের নালিশ হইয়াছিল কি না, তাহা আমি জানি না, আমি বোধ করি, তাহা হয় নাই। কিন্তু যে আদালত দখলের হুকুম দিয়াছিলেন তিনি যে স্থলে, ভূমির আবাদ ও উন্নতি করিতে প্রতিবাদীর যে ব্যয় হইয়াছিল তাহা প্রতিবাদীকে দিতে বাদীর প্রতি আদেশ করিয়াছেন, সে স্থলে আমি বিবেচনা করি, তিনি ওয়াশীলাতের প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেন না।

আমি আরও বিবেচনা করি যে, যে স্থলে বাদী আদালতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা ওয়াশীলাৎ সপ্রমাণ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়াছে এবং স্থানীয় তদন্তের উপরে নির্ভর করত সেই তদন্তও সম্পূর্ণ করিতে ত্রুটি করিয়াছে, সে স্থলে, ঐ তদন্তের প্রারম্ভে আমীন যে কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়াছিলেন তাহাদের সাক্ষ্য দৃষ্টেই, সে ডিক্রী পাইতে পারে না। তদন্ত সমাপ্ত হইলে, আদালত আমীনের রিপোর্টের এবং আমীনের গৃহীত জবানবন্দীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারেন। তদ্দ্রুয়ই মোকদ্দমার প্রমাণ। কিন্তু বাদীর ত্রুটি হেতু যদি তদন্ত সম্পূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে বাস্তবিক স্থানীয় তদন্ত এককালেই হয় নাই। প্রতিবাদী আমীনের সমক্ষে তাহার প্রমাণ দাখিল করিতে সুযোগ পায় নাই। যে কর্ম্মচারীর সমক্ষে বাদীর কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, ঐ সকল সাক্ষী বিশ্বাসযোগ্য কি না, তদ্বিষয়ে তিনি কোন রায় লিপিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। আমি বিবেচনা করি যে, আমীনের অসম্পূর্ণ তদারকের এই ভাগ মোকদ্দমার প্রমাণ বলিয়া নিম্ন আপীল-আদালতের বিবেচনা করা উচিত ছিল না।

আমি বিবেচনা করি যে, উভয় বিষয়েই জজের আইন-ঘটিত ভ্রম হইয়াছে, অতএব তিনি বাদীকে যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা আমি অন্যথা করিয়া সমুদায় খরচা সমেত নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করিলাম।

(গ).

---

২৯ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট এবং বিচারপতি এফ, বি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৭৬৩ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের মুনসেফের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ৩ রা আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বংশী সাহু ও আর এক ব্যক্তি ( বাদী )

আপেলাণ্ট ।

কালীপ্রসাদ ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমানাথ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল ।

চুম্বক।—বাদীর ভূমিতে জল পতিত হইয়া এক জলাশয়ে জমা হয় এবং তথা হইতে প্রতিবাদীর ভূমিতে গমন করে। এমত স্থলে, প্রতি-

বাদীর ঐ জল ব্যবহার করার কোন স্বত্ব নাই, এবং প্রতিবাদীর ভূমিতে জল যাইতে না পারে, এমত ভাবে বাদীর নিজের ভূমিতে বাঁধ প্রস্তুত করিতে বাদীর স্বত্ত্ব আছে।

**প্রধান বিচারপতি কাউচ।**—বাদী এই মোকদ্দমায় এই স্বত্ত্বের দাবী করে যে, প্রতিবাদীর বাধের দক্ষিণে সে তাহার নিজের ভূমির উপরে এমন এক বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে পারে যদ্দ্বারা, যে জল বাদীর ভূমিতে পতিত হইয়া সেই স্থানে এক জলাশয়ে জমা হয়, তাহা প্রতিবাদীর ভূমিতে যাইতে পারিবে না।

প্রতিবাদী তর্ক করে যে, বাদী তাহা করিতে স্বত্ত্ববান নহে।

নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি এই হেতুবাদে হইয়াছে যে, ঐ জলাশয় হইতে প্রতিবাদীর ভূমিতে জল যাইতে দিতে প্রতিবাদীর পূর্ব্বাপর স্বত্ত্ব আছে। তাহা না হইলে, ঐ নিষ্পত্তি স্থির রাখা যাইতে পারে না। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, বাদীর ভূমিতে যে জল পতিত হয় তাহা ব্যবহার করার জন্য যেমন ইচ্ছা তেমন করিয়া বাঁধ প্রস্তুত করিতে বাদীর স্বত্ত্ব আছে। এক জলাশয়ে ঐ জল জমা হয় বলিয়াই উক্ত স্বত্ত্বের ব্যতিক্রম হইতে পারে না এবং প্রতিবাদী যে স্বত্ত্ব সাব্যস্ত করিতে চাহে, তাহাও সে তদ্দ্বারা পাইতে পারে না। প্রতিবাদীর পূর্ব্ব ব্যবহারজনিত স্বত্ব আছে, এমত বলার কোন প্রমাণ নাই, এবং যে জল বাদীর ভূমিতে পতিত হয়, তাহা প্রতিবাদী কোন্ যুক্তি অনুসারে ব্যবহার করিতে স্বত্ত্ববান্ হইতে পারে, তাহা আমার দৃষ্ট হয় না। বাদী তাহার সম্পত্তি ভোগ করিবার নিমিত্ত তথায় জল থাকিতে দিয়াছে বলিয়াই সে তাহা বরাবর করিতে বাধ্য নহে, এবং তদ্দ্বারা প্রতিবাদীর তাহা ব্যবহার করার স্বত্ব জন্মে নাই। এ প্রদেশস্থ এবং ইংলণ্ডের নজীর সমস্তও ঐ মতের বিরুদ্ধ। নিম্ন আপীল-আদালত কি হেতুতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই জলে প্রতিবাদীর স্বত্ত্ব আছে, এবং বাদীর বাঁধ নির্ম্মাণের কোন স্বত্ব নাই, তাহা আমাদের দৃষ্ট হয় না; এবং আমরা দেখিতেছি যে, সেই হেতুবাদেই তিনি নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

বাদী তাহার আপন ভূমিতে বাঁধ প্রস্তুত করিলে সেই ভূমি দিয়া প্রতিবাদীর ভূমিতে জল যাওয়া নিবারিত হইলেও বাদী তাহার আপন ভূমিতে বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে স্বত্ত্ববান্। তাহার যে স্বত্ত্ব এইক্ষণে ব্যক্ত হইল, সে যেন তাহা অতিক্রম না করে, কারণ, তাহা করিলে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত হইতে পারিবে।

সমুদায় খরচা সমেত আমরা উভয় নিম্ন আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিলাম, এবং ব্যক্ত করিলাম যে, বাদী উপরিউক্ত মতে স্বত্ত্ববান্। (গ)

---

২৯ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৬১৫ নং মোকদ্দমা।

সোনামুখীর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ ১৮৬৯ সালের ১৬ ই আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মধুসূদন চক্রবর্ত্তী (বাদী) আপেলাণ্ট।

রাইমণি দাসী ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদিগণের মধ্যে দুই জন) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দুর্গাদাস দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বংশীধর সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের (বি) চিহ্নিত তফসীলের ১১ ধারার ৩ প্রকরণের (বি) টীপ্পনীতে, কোন সম্পত্তির বাজার-দর অথবা বার্ষিক নীট উপস্বত্বের বিষয়ে স্থানীয় তদন্ত করার জন্য আদালতের উপর যে অনুজ্ঞা আছে, তাহাতে এমন কিছু লেখা নাই যে, আদালত

কেবল আমীনের রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করিবেন ; কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থাপক সমাজের এই অভিপ্রায় দেখা যায় যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির লিখিত অন্যান্য বিষয়ে আদালত যে প্রকার আমীনের রিপোর্টের সহায়তা লাভ করেন, ইহাতেও সেই প্রকার লাভ করিতে পারেন।

বিরোধীয় সম্পত্তির বাজার-দর অথবা বার্ষিক নীট উপস্বত্ব সম্বন্ধে আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না বলিয়া যে আইন হইয়াছে, তদ্দ্বারা, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩১ ও ৩৯ ধারায় যে বিধি আছে যে, অনুপযুক্ত মুল্য ধরা হেতু প্রথম আদালতের আরজী অগ্রাহ্য করার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে, তাহা রদ হইয়াছে, অনুমান করিতে হইবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমরা বিবেচনা করি যে, এই বিষয়ে জজের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে। বাদী তাহার মোকদ্দমার এক নির্দ্দিষ্ট মুল্য ধরিয়া নালিশ উপস্থিত করে। মুল্যের প্রতি প্রতিবাদী আপত্তি করাতে, প্রথম আদালতের জজ বাদীকে ১৮৬৭ সালের ২৬ আইনের (বি) চিহ্নিত তফসীলের ১১ দফার ৩ প্রকরণের (বি) টীপ্পনীর লিখিত তদন্তের জন্য ফীস দাখিল করিতে আদেশ করেন। বাদী ফীস দাখিল করিতে অস্বীকার করত তাহার লিখিত মুল্য সপ্রমাণার্থে তাহার কয়েক জন সাক্ষীর উপরেই নির্ভর করে। আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য মতেও বাদী তাহার মোকদ্দমার মুল্য ন্যূন ধরিয়াছে, অতএব তিনি আরজী অগ্রাহ্য করেন।

বাদী জজের নিকট আপীল করে, এবং জজ নির্দ্দেশ করেন যে, নিম্ন আদালতের হুকুমই চূড়ান্ত, অতএব তিনি আপীল নামঞ্জুর করেন।

আমরা বিবেচনা করি যে, জজের রায় বিশুদ্ধ হইয়াছে। আইনে লেখা আছে যে, "নালিশের অন্তর্গত কোন সম্পত্তির বাজার-দর "অথবা বার্ষিক নীট লভ্য নির্ণয়ার্থে আদালত "আপনা হইতে অথবা মোকদ্দমার কোন পক্ষের "দরখাস্ত মতে, কোন ব্যক্তির প্রতি এই আদেশে "এক কমিশন দিতে পারেন যে, সে স্থানীয় বা "অন্য আবশ্যকীয় তদন্ত করিয়া আদালতে তাহার "রিপোর্ট দেয় ; এবং ঐ বাজার-দর বা বার্ষিক "নীট লভ্য সম্বন্ধে আদালত যে মীমাংসা "করেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে।"

আমরা বিবেচনা করি যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এই প্রকার তদন্ত সম্বন্ধে আদালতকে এমন সীমাবদ্ধ করেন নাই যে, তাঁহার কেবল আমীনের রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে ; কিন্তু ব্যবস্থাপক সমাজের এই অভিপ্রায় ছিল যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির লিখিত অন্যান্য মোকদ্দমায় আদালত সমস্ত আমীনের তদন্তের সহায়তা যে প্রকার লাভ করেন, ইচ্ছা করিলে, ইহাতেও তদ্রূপ লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সমাজ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, "বাজার-দর "অথবা বার্ষিক লভ্য সম্বন্ধে ঐ আদালতের "নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে।" এই বাক্য এবং তাহার অর্থ সম্বন্ধে কোন বিরোধ হইতে পারে না।

কিন্তু খাস আপেলাণ্টের উকীল বলেন যে, এই বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। কিন্তু ইহা একটি বৃত্তান্ত-ঘটিত ভ্রম ; কারণ, আদালত যাহা করিয়াছেন এবং যাহার প্রতি খাস আপেলাণ্ট আপত্তি করে তাহা এই যে, আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহার মোকদ্দমার কম মুল্য ধরা হইয়াছে, এবং সেই কম মুল্য কেবল বাজার-দর অথবা বার্ষিক উপস্বত্ব সম্বন্ধে হইতে পারে, কারণ, ঐ দুয়ের মধ্যে একটার পরিমাণ মতেই মোকদ্দমার মুল্য ধরা হয়।

উকীল ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩১ ও ৩৯ ধারার উল্লেখ করিয়াছেন ; তাহার বিধান এই যে, অনুচিত মুল্য ধরা হেতু যদি আদালত কোন আরজী অগ্রাহ্য করেন, তবে সেই হুকু-

যের বিরুদ্ধে ঔদুচ্চ আদালতে আপীল চলিবে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ঐ ধারায় ঐ রূপই বিধান আছে। কিন্তু যে আইন তাহার পশ্চাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তাহার বিধান উহার ঠিক বিপরীত; অতএব পশ্চাতের আইনের বিধানের দ্বারা পূর্ব্বের আইনের ঐ ধারা অন্যথা হইয়াছে, ইহাই অনুমান করিতে হইবে।

আমরা বিবেচনা করি, জজের রায়ই বিশুদ্ধ, অতএব আমরা এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম।

আমার ইহাও বলা আবশ্যক যে, উইক্লি রিপোর্টরের অতিরিক্ত সংখ্যার ১ ম পৃষ্ঠায় প্রচারিত পাঁচ জন জজের এক পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি এই প্রকার এক মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট হয় যে, দেওয়ানী আমীনের তদন্ত সম্বন্ধে বাদী আদালতের হুকুম প্রতিপালন না করিলে তাহা তাহার ত্রুটি বলিতে হইবে এবং তাহার নালিশ ডিস্মিস্ হওয়া উচিত, এবং উচিত রূপেই তাহা ডিস্মিস্ হইয়াছিল এবং বাদীর ঐ নালিশ ডিস্মিস্ করিয়া আদালত যে হুকুম দেন, তাহার বিরুদ্ধে আপীল বা খাস আপীল নাই; সে কেবল পুনর্ব্বিচারের দ্বারা প্রতিকার পাইতে পারে। (গ)

---

২ রা মে, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৭০ সালের ২৫১ নং মোকদ্দমা।

বারাসতের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ২৪-পরগণার প্রথম অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ নবেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কালিদাস চক্রবর্ত্তী (বাদী) আপেলাণ্ট।

ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে পর্য্যন্ত আদালতের সন্তোষজনক রূপে এমত সপ্রমাণ না হয় যে, কথিত সাক্ষীর সাক্ষ্য অতি আবশ্যক এবং সে সমন এড়াইতে চেষ্টা করিতেছে, সে পর্য্যন্ত আদালত দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১৫৯ ধারায় লিখিত এস্তাহার ও ক্রোকের হুকুম জারী করিতে পারেন না; এবং এই সকল বৃত্তান্ত সপ্রমাণ হইলেও ঐ এস্তাহার ও ক্রোকের হুকুম জারী করা, এবং জারী করার পরে মোকদ্দমা মুলতবী রাখা, আদালতের ইচ্ছাধীন।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই খাস আপীলের হেতু এই যে, যে কয়েক জন সাক্ষীর নাম বাদী দাখিল করে, তাহাদের হাজীর হইয়া সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাহাদের উপরে সমন জারী হয়, এবং তাহাতে তাহারা হাজীর না হওয়াতে বাদীর দরখাস্তমতে এস্তাহার জারী হওয়াতেও তাহারা হাজীর হয় না; অতএব বাদী তাহাদের সম্পত্তি ক্রোকের জন্য দরখাস্ত করে; কিন্তু ঐ ক্রোকের হুকুম দেওয়া হয় নাই।

দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১৫৯ ধারার বিধান এই যে, "প্রমাণ দিবার কি দলীল উপস্থিত "করিবার জন্যে হাজির হইবার সমন যাহার "নামে বাহির হয় তাহার উপর যদি ইহার পূর্ব্বের "লিখিত কোন প্রকারে জারী হইতে না পারে, "তবে আদালত জারী করণীয় আমলার রিটর্ণের "দ্বারা তাহা নিশ্চিত রূপে জানিলে, ও সেই সাক্ষীর "সাক্ষ্য কিম্বা সেই দলীল উপস্থিত করা প্রকৃ-"তর বিষয়, ও সমন জারী না হয় এই কারণে "ঐ সাক্ষী কি অন্য ব্যক্তি পলায় কি লুকাইয়া "থাকে এই এই কথার প্রমাণ হইলে, আদালত "তাহার ঘরের কি বাসস্থানের কোন প্রকাশ্য "স্থানে ইস্তাহার লটকাইয়া দেওয়াইবেন। সেই "ইস্তাহারনামাতে ঐ লোককে আজ্ঞা হইবে

"যে, ঐ ইস্তাহারনামার লিখিত সময়ে ও স্থানে "সাক্ষ্য দিবার কি দলীল উপস্থিত করিবার "জন্যে হাজির হয়। ও যদি ঐ ইস্তাহারনামার "লিখিত সময়ে ও স্থানে হাজির না হয়, তবে "যে পক্ষ ঐ সমন বাহির হইবার দরখাস্ত "করিয়াছিল সে প্রার্থনা করিলে, আদালত যত "টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ লোকের তত "টাকা পর্য্যন্তের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি "ক্রোক করিবার হুকুম করিতে পারিবেন।"

উল্লিখিত দুই কথা, অর্থাৎ ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক এবং তাহার উপরে সমন জারী হইতে না দেওয়ার জন্য সে আপনাকে গোপন করিয়া বেড়াইতেছে, ইহা সপ্রমাণ না হইলে আদালতের এই দুই হুকুমের এক হুকুমও দিবার ক্ষমতা নাই, এবং ঐ দুই কথা সপ্রমাণ হইলেও এস্তাহার ও ক্রোকের হুকুম জারী করা না করা, ও তাহা জারী হইবার পরে মোকদ্দমা স্থগিত রাখার হুকুম দেওয়া সম্পূর্ণ রূপেই আদালতের স্বেচ্ছাধীন। এ স্থলে এমত প্রদর্শিত হয় নাই যে, ঐ ধারার বিধানমতে যে যে বিষয়ের প্রমাণ আবশ্যক, তাহা দেওয়া হইয়াছিল। অতএব আদালতের ঐ ত্রুটি খাস আপীলের হেতু হইতে পারে না। এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

২ রা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

সৈয়দ ওয়াজেদ হোসেন এবং অপর এক ব্যক্তি দরখাস্তকারী।

মৌলবী আবদুল কাদের প্রভৃতি, প্রতিপক্ষ।

মেং সি, গ্রেগরি এবং বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং মুন্সী মহম্মদ ইউসুফ দরখাস্তকারীর উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং কালীমোহন দাস প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬৪ ধারাবর্ণিত উপায় সমস্ত অবলম্বিত হইলেই, ঐ ধারানুযায়ী দখল প্রদানের কার্য্য সম্পূর্ণ হয়; এবং তাহার পরে, ভূমির দাবীদার কোন প্রকার বাধা দিলে, তাহা ২৬৯ ধারা-বর্ণিত বাধা গণ্য হইতে পারে না, এবং তাহাতে আদালত ঐ ধারানুযায়ী সরাসরী রূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমায় মেং গ্রেগরি, ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়ামের পক্ষে সনন্দের ১৫ ধারামতে কতিপয় ব্যক্তির উপর এই কারণ দেখাইতে বলিবার এক হুকুম পান যে, গয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ৬ ই জানুয়ারির হুকুম বিচারাধিকারাভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া কি জন্য অন্যথা হইবে না।

দেখা যাইতেছে যে, জোরনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৮৬১ সালের ২৭ এ আগষ্ট তারিখে এক ডিক্রী হয়; এবং উক্ত ডিক্রী অনুসারে কতক সম্পত্তি ক্রোক হয়।

১৮৬৯ সালের ১১ ই জুন তারিখে সৈয়দ ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়াম এই হেতুবাদে উক্ত সম্পত্তির ৷৷০ আনা অংশ খালাসের দাবীতে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৪৬ ধারা মতে দরখাস্ত করে যে, তাহারা উক্ত অংশ ১৮৬৮ সালের ১৫ ই মে তারিখের বিক্রয়-কবালা দ্বারা ক্রয় করে।

অধঃস্থ জজ কোন তদন্ত না করিয়া উক্ত দরখাস্তের বর্ণনা দৃষ্টেই তাহা ডিস্‌মিস্ করেন। তিনি বলেন যে, দরখাস্তকারিগণ দরখাস্তেই স্বীকার করিয়াছে যে, দায়ীর উক্ত সম্পত্তিতে কিছু স্বত্ব ছিল, অতএব তিনি বিবেচনা করেন যে, উক্ত স্বত্ব যাহাই হউক না কেন, তাহারই নীলাম হইবে। ইহা ঐ দরখাস্তের বিচার করিবার সঙ্গত প্রণালী নহে; কিন্তু উক্ত প্রশ্ন এক্ষণে আমাদের নিকট উপস্থিত নাই।

উক্ত সম্পত্তিতে দায়ীর যে স্বত্ব ও লাভ ছিল, তাহা ১৮৬৯ সালের ২০ এ জুলাই তারিখে নীলাম হয়, এবং নীলাম মঞ্জুর হইলে ক্রেতাকে বয়নামা দেওয়া হয়; এবং এই সম্পত্তি প্রজাগণের দখলে থাকায়, ১৮৬৯ সালের ১৮ ই সেপ্টেম্বর তারিখে ২৬৪ ধারার বিধানমতে, অর্থাৎ বয়নামার এক নকল উক্ত ভূমির কোন প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কাইয়া দিয়া এবং প্রতিবাদীর স্বত্ব ও লাভ ঐ ক্রেতাকে হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইল বলিয়া ভূমির দখীলকারগণের নিকট রীতিমত প্রচার করিয়া দখল দেওয়া হয়।

নীলাম-ক্রেতা ১৮৬৯ সালের ৬ ই নবেম্বর তারিখে অধঃস্থ জজের নিকট এই বলিয়া এক দরখাস্ত করে যে, তাহাকে উল্লিখিতরূপে উক্ত ষোল আনা সম্পত্তিতে দখল দেওয়া হয়; কিন্তু সে ১৫ ই অক্‌টোবর তারিখে কর আদায় করিতে যাওয়ায় ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়াম (যাহারা এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছে) তাহাকে বাধা দেয়। এ দরখাস্তে অধঃস্থ জজ এই হুকুম দেন যে, এই মোকদ্দমা রেজিষ্টরী এবং নম্বরভুক্ত করিয়া ও নীলাম ক্রেতাকে বাদী করিয়া ২২৯ ধারার বিধানমতে জাবেতা মোকদ্দমার ন্যায় বিচারার্থে প্রস্তুত করা হয়; কিন্তু পরে ১৮৭০ সালের ৬ ই জানুয়ারি তারিখে আর এক হুকুম দেওয়া হয়, তাহাতে অধঃস্থ জজ এই বৃত্তান্ত স্থির করেন যে, নীলাম-ক্রেতাকে দখল দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু এই বলেন যে, যে হুকুম দ্বারা ২২৯ ধারামতে তদন্তের আদেশ করা হয়, তাহা বাস্তবিক ২৬৮ এবং ২৬৯ ধারামতে করা উচিত ছিল, অতএব অধঃস্থ জজ ঐ দুই ধারামতে স্থির করেন যে, উক্ত দরখাস্ত যথাসময়েই হইয়াছে, এবং আদেশ করেন যে, তিনি যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন, তদনুসারে নীলাম-ক্রেতাকেই দখীলকার রাখিতে হইবে; বিপক্ষ (অর্থাৎ ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়াম) তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, কিন্তু জাবেতা নালিশ দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা পাইতে পারিবে।

আমাদের নিকট এই মূল প্রশ্নের তর্ক হয় যে, অধঃস্থ জজের এই শেষ হুকুম বিচারাধিকার-বহির্ভূত কি না, এবং আমার বোধ হয় যে, আমাদের নিকট যে সকল হেতু উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা এই এক বিষয়ে পরিণত হইতেছে যে, নীলাম-ক্রেতা ২৬৪ ধারার বিধান মতে দখল পাইয়াছে স্থির হইলে, অধঃস্থ জজ আর ২৬৯ ধারা মতে, কোন হুকুম দিতে পারেন না, কারণ, ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়াম তর্ক করে যে, কেবল ২৬৪ ধারানুযায়ী কার্য্যের প্রতি বাধা হইলেই ঐ হুকুম দেওয়া যাইতে পারে।

আমার বিবেচনায়, এই দুই ধারা ঐক্য করিয়া এবং এ বিষয়ে আইনের অভিপ্রায় দেখিয়া এই তর্ক বিশুদ্ধই বোধ হয়। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ মোকদ্দমায় নীলাম-ক্রেতাকে ভূমিতে প্রকৃত দখল না দিয়া, ২৬৪ ধারামতে এস্তাহার ও প্রজাগণকে নোটিস দিয়া দখল দেওয়ান হইয়াছে। ২৬৯ ধারায় ব্যক্ত আছে যে, "আসামী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি "দ্বারা, দখল প্রদানে বাধা বা নিবারণ হইয়াছে "দৃষ্ট হইলে" তদন্ত হইতে পারে এবং আদালত যে হুকুম উচিত বিবেচনা করেন তাহা দিতে পারেন। এই ধারার "দখল প্রদান" শব্দের অর্থের উপরেই উপস্থিত প্রশ্ন নির্ভর করে। আমি বিবেচনা করি তাহার এই অর্থ করিতে হইবে যে, ২৬৪ ধারার বিধানোক্ত উপায় অবলম্বিত হইলেই দখল প্রদান সমাধা হয়, এবং উক্ত ভূমির দাবীদার পরে যে কোন কার্য্য করে তাহা ২৬৯ ধারামতে, দখল প্রদানের প্রতি কোন বাধা বা প্রতিবন্ধক হইবে না; তাহা সম্পূর্ণ নূতন বাধা হইবে, যাহাতে যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্য করে তাহার বিরুদ্ধে নীলাম-ক্রেতার নালিশের কারণ জন্মে; কিন্তু তন্নিবন্ধন ২৬৯ ধারামতে সরাসরি রূপে হস্তক্ষেপ করিবে

আদালতের কোন অধিকার জন্মে না। আমি বিবেচনা করি যে, আদালতকে কেবল জারীর কার্য্য সমাধা করিবার ক্ষমতা দেওয়াই ২৬৯ ধারার অভিপ্রায়, এবং আমার বিবেচনায়, ২৬৪ ধারার বিধানমতে দখল দেওয়া হইলেই ঐ কার্য্য শেষ হয়। আমার বোধ হয়, যে বাদী স্থাবর সম্পত্তি পাইবার ডিক্রী পায়, তাহাকে দখল দেওয়ার কার্য্য তুলনা করিলে ইহা আরো স্পষ্ট হয়। যে ব্যক্তি নালিশ উপস্থিত করিয়া দখলের ডিক্রী পায়, তাহার স্থল অপেক্ষা নীলাম-ক্রেতার স্থলে আদালতের অধিক ক্ষমতা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ২২৬, ২২৭ এবং ২২৯ ধারা যাহা এই দুই ধারার সদৃশ, তদনুসারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে স্থলে ডিক্রী জারীর প্রতি বাধা হয়, তাহাতেই কেবল আদালত হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। উক্ত বাক্যই ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং ডিক্রীজারী হইবার সময়ে যে বাধা দেওয়া হয় তাহাতেই ঐ দুই ধারা প্রয়োগ হয়। অতএব আমার বিবেচনায়, ১৫ ই অক্টোবর তারিখে যে বাধা দেওয়া হয় তাহা এমত বাধা নহে, যাহাতে আদালতের ২৬৯ ধারার বিধান মতে সরাসরী রূপে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে।

আর এই এক প্রশ্ন আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, এ মোকদ্দমায় সনন্দের ১৫ ধারামতে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আছে কি না। ৯ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৩৮৭ পৃষ্ঠায় এই আদালতের যে নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, এ আদালতের কেবল এই হেতুবাদে হস্তক্ষেপ করা উচিত যে, নিম্ন আদালতের যে বিচারাধিকার ছিল না তাহা তিনি পরিচালন করিয়াছেন বা তাঁহার যে বিচারাধিকার ছিল তাহা তিনি পরিচালন করেন নাই, আমি তাহারই অনুবর্ত্তী হইলাম, এবং আমি বিবেচনা করি যে, এ সকল বিষয়ে নিম্ন আদালতের বিচারাধিকারের ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা আমাদের উচিত; কিন্তু বিচারপতি সেলি তর্কের সময় যেরূপ দেখাইয়াছেন তদনুসারে আমার বোধ হয় যে, এই ধারার শব্দগুলি অতি ব্যাপক, এবং তাহাতে আদালতকে তত্ত্বাবধারণের সাধারণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবং এমন কিছু নির্দ্ধারণ করা হয় নাই যে, কোথায় আদালতের সেই ক্ষমতা পরিচালন করা উচিত এবং কোথায় উচিত নহে। আমার বোধ হয়, এ মোকদ্দমায় আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত। আমি উপরে যে সকল কারণ দর্শাইলাম, তাহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধঃস্থ জজের বিচারাধিকার ছিল না এবং তিনি এমত এক হুকুম দিয়াছেন যাহা কেবল বিচারাধিকার-বহির্ভূত, এমত নহে, তাহাতে পক্ষগণের স্বত্বের প্রতিও বিশেষ দোষ স্পর্শিয়াছে; কারণ, উক্ত হুকুমের ফল এই যে, পরে যে কোন কার্য্য হইবে তাহাতেই নীলাম-ক্রেতা, প্রতিবাদীর অনুকূল সমুদায় অনুমানসহ প্রতিবাদী হইবে, এবং ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়াম যাহারা নিশ্চয়ই দখীলকার ছিল এবং আপনাদের স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার কোন সুযোগ পায় নাই, এবং যাহারা কখন কোন বিধিমত উপায় দ্বারা বেদখল হয় নাই, তাহারা বাদি-শ্রেণীভুক্ত হইবে।

আমার বিবেচনায়, আমাদের এ মোকদ্দমায় সনন্দের ১৫ ধারামতে হস্তক্ষেপ করা উচিত; অতএব আমরা অধঃস্থ জজের ১৮৭০ সালের ৬ ই জানুয়ারি তারিখের হুকুম বিচারাধিকার-বহির্ভূত বলিয়া রহিত করিলাম। ওয়াজেদ হোসেন এবং মসম্মত মেরায়াম যাহারা এই হুকুম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের খরচা ও মোহর পাইবে।

বিচারপতি বেলি।—আমারও ঐ মত।

(ব)

৩ রা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ২৬৯৯ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজ তত্রত্য অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ১৩ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৩ ই আগষ্ট তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সৈয়দ আলী ( প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি ) আপেলাণ্ট।

গোপাল দাস ( বাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জে, ডবলিউ, বি, মণি বারিষ্টর এবং সি গ্রেগরি ও মুন্সী মহম্মদ ইউছুফ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জে, টি, উড্রফ বারিষ্টর এবং বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং মহেশচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—নিম্ন আদালত কোন প্রথা সম্বন্ধে প্রমাণ দৃষ্টে যে মীমাংসা করেন, তাহা বৃত্তান্তঘটিত নিষ্পত্তি বিধায় তৎপ্রতি হাইকোর্ট খাস আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

কোন হুণ্ডী অমান্য হওয়ার পরে তদন্তর্গত টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করা হইলে, তাহা ঐ হুণ্ডী অমান্য হইবার সংবাদ পাওয়ার দাবী ত্যাগের তুল্য না হইলেও, এই বিষয়ের উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট প্রমাণ গণ্য হয় যে, ঐ অঙ্গীকারক ঐ হুণ্ডী অমান্য হওয়ার সংবাদ পাইয়াছে।

'ল অব্ মর্চেণ্টছ্' অর্থাৎ 'সওদাগর সম্বন্ধীয় আইন বা ব্যবহার' এ দেশের মফঃসলস্থ হুণ্ডিয়ানের কারবারে প্রয়োগ হয় না।

বিচারপতি কেম্প।—বিচারপতি কেম্প এবং গ্লবর ১৮৬৯ সালের ১০ ই জুন তারিখে এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন। উক্ত পুনঃপ্রেরণের হুকুমেই মোকদ্দমার বিস্তারিত বর্ণনা করা গিয়াছে, এবং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। জজকে এই স্থির করিতে বলা হয় যে, নোটিস দেওয়া হইয়া থাকিলে তাহা উচিত সময়ের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে কি না, এবং তাহা না দেওয়া হইয়া থাকিলে, তিনি আবশ্যক হইলে এই বিচার করিতে পারেন যে, তাহা যথোচিত সময়ে না দেওয়াতে হুণ্ডীর পৃষ্ঠে স্বাক্ষরকারীর অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টের ক্ষতি বা ক্ষতির বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছে কি না। পাটনা নগরের বণিকদিগের মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত থাকে তদনুসারে তাঁহাকে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে আদেশ করা হয়। আর এই এক বিষয় তাঁহাকে দেখিতে বলা হয় যে, হুণ্ডী যে সাকরাইয়া দেয় তাহার নিকট হইতে বাদী ৫০০ টাকা লওয়াতেই পৃষ্ঠে স্বাক্ষরকারীকে সমুদায় দায়িত্ব হইতে মুক্ত করা হইয়াছে কি না। পক্ষগণকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে অতিরিক্ত প্রমাণ দিতে দেওয়া হয়।

এ আদালত যে তিন ইসু সম্বন্ধে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান, জজ এন্‌লী সাহেব তাহা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, তিনি প্রথা সম্বন্ধে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপেলাণ্ট তিন জন হুণ্ডীর দালালের এবং এক জন বণিকের যে গোমাস্তা হুণ্ডীর কাজ করে তাহার সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছিল, এবং বাদী রেস্পণ্ডেণ্ট পাটনার হুণ্ডীর কারবারের প্রধান পাঁচ ঘরের গোমাস্তার এবং নারায়ন দাস নামক যে এক ব্যক্তি নিজেই হুণ্ডীর কারবার করে তাহার সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছিল। জজ স্থির করেন যে, প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টের প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হয় নাই যে, হুণ্ডী ওয়াদার তারিখেই উপস্থিত করিতে হইবে এবং টাকা আদায় না হইলে, হুণ্ডীর পৃষ্ঠে-স্বাক্ষরকারীর নিকট টাকার দাবী করিবার জন্য তখনই তাহাকে টাকা আদায় না হইবার সংবাদ দিতে হইবে। জজ এই বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণের সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হন। বাদীর অর্থাৎ আমাদের সমীপস্থ রেস্পণ্ডেণ্টের প্রমাণ এই যে, খোকা অর্থাৎ আদায়ী হুণ্ডী দেখাইতে না পারিলে হুণ্ডীর

পৃষ্ঠে-স্বাক্ষরকারী কিছুতেই দায়মুক্ত হইতে পারে না। জজ বলেন যে, খাস আপেলাণ্ট এই দেখাইয়া রেস্পণ্ডেণ্টের সাক্ষিগণের বাক্য অবিশ্বাস করাইতে চেষ্টা পায় যে, তাহারা সাক্ষ্য দিবার সমন পাইয়া এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করণার্থে এক সভা করে। জজ বিবেচনা করেন যে, যদিও স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাহারা পরামর্শ করিয়াছে, তথাপি পাটনার প্রধান প্রধান কুঠীর কার্য্যকর্ত্তাদিগের সাক্ষ্য অযথার্থ বলিয়া অগ্রাহ্য করা উচিত নহে, কারণ, উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহাদের কোন স্পষ্ট সম্বন্ধ না থাকিলেও, যে বিষয়ে তাহাদের সকলেরই স্বার্থ আছে তাহাই বিবেচনা করার জন্য তাহারা সমবেত হইয়াছিল। জজ বলেন যে, উক্ত সাক্ষ্য "একই আদর্শে গঠিত" অর্থাৎ একই প্রকারের নহে, এবং তাঁহার এমত বিশ্বাসের কোন কারণ নাই যে, সাক্ষিগণ নিজে যাহা জানিত তাহা তাহারা বলে নাই বা তাহারা সত্য ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়াছে। ফল এই হয় যে, জজ স্থির করেন যে, বণিকদিগের হুণ্ডী সম্বন্ধে প্রথা এই যে, ওয়াদার তারিখ হইতে ২৫ দিনের অনধিককালের মধ্যে ঐ হুণ্ডী সাক্ষরকারীর নিকট ফেরৎ পাঠাইতে হয়। এক জন সাক্ষী উক্ত সময় ২ মাস কি ২॥ মাস হইবার কথা বলে। কিন্তু জজ বিবেচনা করেন যে, সমুদায় প্রমাণ দৃষ্টে তিনি এই অনুমান করিতে পারেন যে, ২৫ দিনই উচিত মিয়াদ। তিনি আরো স্থির করেন যে, সওদাগরদের হুণ্ডী সম্বন্ধে পাটনার প্রথা অনুসারে এস্থলে হুণ্ডী-স্বাক্ষরকারীকে হুণ্ডীর টাকা না পাওয়ার সংবাদ দিতে অন্যায় বিলম্ব হয় নাই, এবং তিনি আরো স্থির করেন যে, উক্ত হুণ্ডীর টাকার মধ্যে যে ৫০০ টাকা আদায় হয়, তাহাতেই হুণ্ডী-স্বাক্ষরকারী অতিরিক্ত দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয় না। অতএব তিনি খাস আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করেন।

এই খাস আপীলে, খাস আপেলাণ্টের পক্ষ মণি সাহেব এবং খাস রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষ উড্রফ সাহেব সমর্থন করেন। মণি সাহেবের প্রথম আপত্তি এই যে, যে স্থানে টাকা আদায় হয়, প্রথা তথাকার আইনেরই অধীন হইবে, অতএব কলিকাতা টাকা আদায়ের স্থান বলিয়া, এ মোকদ্দমায় পাটনার সওদাগরদিগের সাক্ষ্য না লইয়া কলিকাতার সওদাগরদিগের সাক্ষ্য দৃষ্টে ঐ প্রথা স্থির করিতে হইবে। তদনন্তর তিনি "সওদাগরদিগের আইনের" কথা বলেন, যাহা তাঁহার বাক্যমতে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রয়োগ হয়। এ আপত্তি খাস আপীলের হেতুতে উত্থাপিত হয় নাই। বিজ্ঞবর কৌন্সেল এই প্রথম তাহা উপস্থিত করিয়াছেন, অতএব এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রথমতঃ, তাহা খাস আপীলের হেতুতে উত্থাপিত হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ "সওদাগরদিগের আইন" মফঃসলের এ প্রকার কারবারে প্রয়োগ হয় না; ভারতবর্ষে তাহা খাটে কি না, তাহাতেই আমার সন্দেহ আছে; এবং তৃতীয়তঃ, এ আপত্তি খাস আপেলাণ্টের মুখ হইতে বাহির হওয়া অসঙ্গত, কারণ, সে স্বয়ংই পাটনার প্রচলিত প্রথা সপ্রমাণার্থে পাটনার লোকের দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়ায়। অতএব এক্ষণে তাহাকে ফিরিয়া এ কথা বলিতে দেওয়া যাইতে পারে না যে, উক্ত প্রথা কলিকাতার সাক্ষীর দ্বারা সপ্রমাণ করা উচিত ছিল।

মণি সাহেব তদনন্তর তর্ক করেন যে, হুণ্ডী স্বাক্ষরকারীর টাকা দিতে অঙ্গীকার করিবার প্রমাণের উপর নির্ভর করা উচিত নহে; এক জন সাক্ষী খাস আপেলাণ্টগণের কর্ম্মচ্যুত চাকর, এবং অপর ব্যক্তির বাক্যের উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞবর কৌন্সেল এ কথার কোন বিশেষ কারণ দর্শান নাই। বিজ্ঞবর কৌন্সেল ইহাও বিবেচনা করেন যে, জজ মহাজনদিগের প্রথা স্থির না করিয়া ব্যাপারীদিগের প্রথা নির্ণয় করিয়াছেন, এবং মহাজনদিগের মধ্যে কি প্রথা ছিল, তৎসম্বন্ধে জজ কোন

তদন্ত করেন নাই। তিনি আরও তর্ক করেন যে, এমন কোন প্রমাণ নাই যে, খাস আপেলাণ্টকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ হুণ্ডী স্বাক্ষর করিয়া দেয় তাহাকে উচিত সময়ের মধ্যে সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল; হুণ্ডী স্বাক্ষরকারী যদি উচিত সময়ের মধ্যে হুণ্ডীর টাকা আদায় না হইবার সংবাদ পাইত, তবে সে সেই টাকা দিবার উপায় করিতে পারিত, এবং নিজের যাহাতে কোন ক্ষতি না হয় তাহা করিতে পারিত। আমি বিবেচনা করি, জজ পুনঃপ্রেরণের হুকুম প্রকৃতার্থে প্রতিপালন করিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, হুণ্ডী স্বাক্ষরকারীকে যথোচিত সময়েই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এবং ইহা তিনি পাটনার মহাজনদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রথার প্রমাণ দৃষ্টে স্থির করেন। প্রমাণ দৃষ্টে প্রথা সম্বন্ধীয় প্রশ্নের যে মীমাংসা করা হয়, তাহা বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা বিধায় আমরা তাহাতে খাস আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। (দ্রষ্টব্য ১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১৫৩ পৃষ্ঠা)।

পরন্তু, এ মোকদ্দমায় আর একটি বিষয় আছে যাহাতে আমার বিবেচনায়, সুস্পষ্ট প্রকাশ যে, খাস আপেলাণ্ট এই সকল হুণ্ডী অগ্রাহ্য হইবার সংবাদ পাইয়াছিল এবং টাকা দিবারও অঙ্গীকার করিয়াছিল। এমত কথিত হইতে পারে যে, তাহার টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারের দ্বারাই যে, সংবাদ পাওয়ার দাবী ত্যাগ করা হয় এমত নহে; কিন্তু টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার যদি প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হয়, তবে তাহাই খাস আপেলাণ্টের সংবাদ পাওয়ার অত্যুৎকৃষ্ট প্রমাণ, এবং সে যে টাকা দিতে অঙ্গীকার করে, তাহাতেই তাহার এই জ্ঞান থাকার বিষয় প্রকাশ পায় যে, তাহাকে এই হুণ্ডীর টাকা দিতে বলিতে বাদীর স্বত্ব আছে। প্রতিবাদী যে এই সকল হুণ্ডীর টাকা দিতে অঙ্গীকার করে, তাহা প্রথম আদালতই স্থির করেন। প্রতিবাদী এই বিষয় সম্বন্ধে খাস আপীল করে না, এবং প্রতিবাদী যে টাকা দিতে অঙ্গীকার করে তাহা সপ্রমাণার্থে বাদী দুই জন সাক্ষী দিয়াছে। এ সাক্ষিগণ অবশ্যই প্রতিবাদীর অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টের বিপক্ষ সাক্ষী, সুতরাং এই সাক্ষিগণ যাহাদিগকে বাদীর উকীল ডাকেন, তাহারা মূল জবানবন্দীতেই যখন এই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রতিবাদী টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিল, তখন বাদীর উকীলের এই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদিগকে জেরা না করা উচিতই হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদীর নিজেরই জবানবন্দী লওয়া হয়, অতএব বাদী টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষী দেয়, প্রতিবাদীর উকীল তাহাদের বাক্যের প্রতি বিশ্বাস দূর করিতে ইচ্ছা করিলে এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার প্রতিবাদীকে জেরা করা কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু প্রতিবাদী এই অঙ্গীকার করে কি না, তৎসম্বন্ধে তাহাকে কোন প্রশ্ন করা হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই বিষয় সম্বন্ধে বাদীর দুই সাক্ষীর সাক্ষ্য কোন রূপেই খণ্ডিত হয় নাই। অতএব প্রথম আদালত যখন এই বৃত্তান্ত স্থির করেন যে, প্রতিবাদী এই সকল হুণ্ডীর টাকা পরিশোধ করিতে স্বীকার করিয়াছে, এবং যখন অখণ্ডিত প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, সে এই অঙ্গীকার করিয়াছে, তখন আমি ইহাই স্থির করিলাম যে, এই অঙ্গীকার হেতু সংবাদ পাওয়ার দাবী পরিত্যক্ত না হইলেও, তাহা উৎকৃষ্ট, এবং প্রতিবাদীর সংবাদ পাওয়ার এবং টাকা দিতে অঙ্গীকার করার যথেষ্ট প্রমাণ।

যে ৫০০ টাকা আংশিক রূপে প্রদত্ত হয়, তৎসম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, ইহা ওয়াদার তারিখের পর দেওয়া হয় নাই; তাহা ওয়াদার তারিখ ৬ ই সেপ্‌টেম্বরে দেওয়া হয়। আমার মতে জজ পুনঃপ্রেরণের হুকুম সম্পূর্ণ প্রতিপালন করিয়াছেন। অতএব আমি এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে চাহি।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিবেচনায়ও এই খাস আপীল ডিস্মিস্ হওয়া উচিত। খাস আপেলাণ্টের কৌন্সেল তাঁহার এই তর্কের সন্তোষকর প্রমাণ দেন নাই যে, নথীতে এমত কোন প্রমাণ নাই যদ্দৃষ্টে নিম্ন আপীল আদালত ঐ প্রথা স্থির করিতে পারিতেন, যাহা উক্ত আদালতে সপ্রমাণ হইয়াছে স্থির করেন। নথীতে যথেষ্ট প্রমাণ আছে যদ্দৃষ্টে আদালত উক্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন, এবং আদালত সেই সিদ্ধান্ত করিতে, উক্ত প্রথা এই মোকদ্দমার বৃত্তান্তে প্রয়োগ করা, এবং কাজে কাজে বাদীকে ডিক্রী দেওয়া তাঁহার উচিতই হইয়াছে। প্রতিবাদী যে স্বীকার করে যে, তাহাকে উক্ত হুণ্ডী অমান্য হওয়ার সংবাদ দিলে সে তাহার টাকা দিবে, তৎসম্বন্ধে আমি বিচারপতি কেম্পের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইলাম। সে যে টাকা দিতে স্বীকার করে তাহাই তাহার তখন এই জ্ঞান থাকিবার অতি বলবৎ প্রমাণ হইতেছে যে, সে উক্ত হুণ্ডীর টাকা দিতে বাধ্য; এবং ন্যায়ানুসারে বিবেচনা করিলে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ হয় না যে, প্রতিবাদী বাদীকে যে হুণ্ডী দেয় এবং যাহা বাদীর কোন দোষে অগ্রাহ্য হয় নাই, যে কুঠীর উপর তাহা দেওয়া হয় তাহা দেউলিয়া হওয়াতেই অগ্রাহ্য হয়, বাদীকে প্রতিবাদী তাহার মূল্য দিতে বাধ্য। আমিও এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম।

( ব )

---

৩ রা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ৯৯ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ২২ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মহাবীরপ্রসাদ সিংহ প্রভৃতি ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

ত্রিহুতের কালেক্টর ও অন্যান্য ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জি সি পল বারিষ্টর ও সি গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জে টি উড্রুফ বারিষ্টর ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মহেশচন্দ্র চৌধুরী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারায় যে "মহাল" শব্দ আছে তাহাতে কেবল সম্পূর্ণ মহাল বা জমিদারীই বুঝাইবে, এমত নহে; ঐ ধারার প্রথম ভাগে যে সকল হিস্যার উল্লেখ আছে তাহাও বুঝাইবে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারামতে সরবরাহকার নিয়োজিত হইলেই যে, সম্পত্তির ক্রোক রহিত হয়, এমত নহে।

দেওয়ানী আদালতের হাকিমের হুকুমমতে যে জমিদারী ক্রোক হয়, তাহা ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার ৩ প্রকরণমতে রক্ষিত হওয়ার জন্য, কোন মালের কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহার সরবরাহ হওয়া আবশ্যকীয় নহে। যে সকল জমিদারী ক্রোক হয়, তাহা কালেক্টরের সরবরাহের অধীন হউক বা না হউক, তাহাই ঐ ধারা-বর্ণিত বিশেষ নোটিসের উপকার লাভ করিতে পারিবে।

নীলামের মূল্যের উদ্বৃত্ত যে টাকা কালেক্টরের হস্তে আমানত থাকে, তাহার কোন অংশ কোন ডিক্রীদার লইলে এবং বিচারাদিষ্ট দায়ী তৎপ্রতি আপত্তি না করিলেও ঐ রূপ টাকা লওয়া ৩৩ ধারার মর্ম্মান্তর্গত টাকা গ্রহণের তুল্য হইতে পারে না।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমা শ্রবণার্থে গত ২৬ এ জানুয়ারি তারিখে প্রথম উপস্থিত হয়; কিন্তু কয়েকখানা দলীল দাখিলের জন্য সকলের সম্মতিতে তাহা মুলতবী থাকে। ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে এক সমগ্র জমিদারীর রাজস্বের এক অংশ সম্বন্ধে ঐ জমিদারীর যে

এক হিস্যা পৃথকরূপে দায়ী করা হইয়াছিল, ঐ রাজস্ব বাকীর জন্য ১৮৬৭ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সেই হিস্যার যে নীলাম হয় তাহা অন্যথা করার নিমিত্ত এই নালিশ উপস্থিত হয়। বাদিগণ ঐ হিস্যার কিয়দংশের মালিক। ঐ রাজস্ব প্রদানের শেষ সময় ১৮৬৭ সালের ১২ ই জানুয়ারির সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ছিল। আমরা অবগত হইয়াছি যে, ঐ সময়ের মধ্যে ৭২।৶ টাকা বাদে সমুদায় রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং ২১ এ জানুয়ারি তারিখে ঐ বাকী দাখিল করিয়া লওয়ার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করা হয়।

সেই দরখাস্ত অনুসারে, ঐ সম্পত্তির কোন অংশ সরবরাহকারের কর্ত্তৃত্বের অধীন ছিল কি না তাহা জানিবার জন্য দেওয়ানী আদালতে তত্ত্ব করা হয়। ঐ দরখাস্ত-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথার বিস্তারিত বর্ণনা করার আবশ্যক নাই; ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অবশেষ কালেক্টর ঐ টাকা লইতে অস্বীকার করেন। তাহার পরে ঐ সম্পত্তির নীলাম হয়, এবং প্রতিবাদিগণ তাহা ১৪০০০০ টাকায় ক্রয় করে। এপ্রযুক্ত ঐ নীলাম অন্যথা করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়; এবং বাদিগণ যে সকল হেতুর উপরে নির্ভর করে, তাহার কেবল প্রথম ও চতুর্থ হেতুর উল্লেখ করা আবশ্যক। প্রথম হেতু এই যে, যে দেওয়ানী আদালত ঐ সম্পত্তি ক্রোক করেন, তাঁহার হুকুমমতে উহা এক সরবরাহকারের অধীন ছিল, অতএব ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারার বিধান প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু তাহা করা হয় নাই। চতুর্থ হেতু এই যে, যদিও কালেক্টর ১৮৬৭ সালের ২১ এ জানুয়ারি তারিখে প্রথম এক হুকুম দেন যে, প্রার্থীর আসল দরখাস্ত দেওয়ানী আদালতে প্রেরিত হয়, এবং সম্পত্তি সরবরাহকারের কর্ত্তৃত্বের অধীনে থাকিলে সরবরাহকারের প্রতি হুকুম হয় যে, সে সম্পত্তি রক্ষা করে, এবং যদিও সরবরাহকার গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্ব আনিয়া প্রার্থনা করে যে, তাহা রাজস্বের বাবতে আমানতের ঘরে জমা করা হয়, তথাপি কালেক্টর নীলাম করেন, এবং রাজস্ব দেওয়ার শেষ তারিখের পরে টাকা লওয়ার কোন ক্ষমতা নাই, অনুমান করিয়া কালেক্টর যে নীলাম করিয়াছেন, তাহা ঐ আইনের ১৮ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ। ১৮৬৮ সালের ৯ ই নবেম্বর তারিখে ইসু নির্দ্ধারিত হইয়া ২৬ এ নবেম্বরে মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির দিন স্থির হয়। দুই পক্ষের কোন পক্ষেই সাক্ষী তলব হয় নাই, এবং ১৮৬৮ সালের ২২ এ ডিসেম্বর আদালত এই নির্দ্দেশ করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন যে, বাদিগণ উপরিউক্ত যে দুই হেতুর উপরে নির্ভর করে, তাহা কর্ম্মণ্য নহে।

এইক্ষণে আমাদের সমক্ষে মোকদ্দমার জাবেতা আপীল হইয়াছে, এবং নিম্ন-আদালতে যে দুই হেতু উত্থাপিত হয়, তাহাই আমাদের সমক্ষে উত্থাপিত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত হেতুদ্বয়ের দ্বিতীয় হেতু যে ১৮ ধারার উপর সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার বিধান এই যে, "মহালের কি মহালের অংশের নীলাম "আরম্ভ হওনের পূর্ব্বে কোন সময়ে কালেক্টর "সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতে অন্য কার্য্যকারক "সাহেব ঐ মহাল কি অংশ নীলাম হইতে মুক্ত "করিতে পারিবেন। সেই প্রকারে, মহালের "কি মহালের অংশের নীলাম আরম্ভ হওনের "পূর্ব্বে কোন সময়ে রাজস্বের কমিশনর সাহেব "কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমতের অন্য "কার্য্যকারক সাহেবকে প্রত্যেক গতিকে বিশেষ "আজ্ঞা দিয়া ঐ মহাল কি তাহার কোন অংশ "নীলাম হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। ও "মুক্ত হইবার সেই হুকুম হইলে পর যদি নীলাম "হয় তবে তাহা বেআইনী হইবে।" এই হেতুর উপরে আপেলাণ্টেরা এমত তর্ক করে নাই, এবং করিতেও পারে না যে, ঐ টাকা লওয়া না লওয়ার বিষয়ে কালেক্টরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন ক্ষমতা

ছিল না, কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, এই ধারার বিধান মতে কালেক্টর যে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে বাধ্য ছিলেন, তাহা তিনি করেন নাই। যদি কালেক্টরের কার্য্য সম্বন্ধে আমাদের ঐ রায়ই হইত, তবে আমরা নির্দ্দেশ করিতাম যে, নীলাম স্থির রাখা যাইতে পারে না। আমরা ১৮ ধারার এই অর্থ করি যে, দোষগুণ সম্বন্ধে ঐ দরখাস্তের বিচার করিতেই কালেক্টর বাধ্য ছিলেন। •

বিপক্ষ তর্ক করে যে, ১৮ ধারামতে নীলাম হইতে ঐ সম্পত্তি মুক্ত করার জন্য প্রার্থনা হয় নাই। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না যে, ঐ দরখাস্ত দৃষ্টব্যে টাকা দাখিলের জন্য হইলেও, বাস্তবিক নীলাম হইতে সম্পত্তি রক্ষা করণার্থে কালেক্টরকে টাকা লইতে প্রার্থনা করাই উহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যদিও কালেক্টরের বাঙ্গালা রুবকারীর ভাষার অবিকল অর্থে বোধ হয় যে, তিনি বলিয়াছেন যে, প্রার্থীর প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে তাঁহার ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতা নাই, তথাপি স্থূলে, সমুদায় বৃত্তান্ত দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, উহাই তাঁহার প্রকৃত মনস্থ নহে; তাঁহার প্রকৃত ভাব এই ছিল যে, অবস্থা দৃষ্টে, ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করা অনুচিত বোধ হওয়াতেই তিনি তাহা মঞ্জুর করিতে পারেন নাই। কালেক্টরের রায় তাঁহার নিজ ভাষাতে লিখিত না হওয়াতেই কথিত শব্দ সকল ব্যবহৃত হওয়ার কতক কারণ দেখা যায়। ১৮ ধারামতে কালেক্টরের যে ক্ষমতা আছে তাহা যে, রিবেনিউ কালেক্টরের পদস্থ কোন ব্যক্তি অস্বীকার করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। এই হেতুবাদে আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

তাহার পরে, ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারান্তর্গত বিষয় আসিতেছে। নিম্ন আদালতের ন্যায় আমাদের সমক্ষেও তর্কিত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমা ঐ ধারার বিধানান্তর্গত, এবং তল্লিখিত বিশেষ এস্তাহার জারী করা কর্ত্তব্য ছিল। ৫ ধারায় লেখা আছে যে, তল্লিখিত বিশেষ নোটিস জারী না হইয়া "নিম্নে বর্ণিত কোন "দাবী, অথবা বাকী খাজানা আদায়ের জন্য "কোন জমিদারীর অংশ বা স্বত্বের "নীলাম হইবে না।" এবং যে তৃতীয় প্রকারের বাকী সম্বন্ধে এই ধারা খাটে বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহা "আদালতের কোন কার্য্য "কারকের হুকুমমতে যে মহাল ক্রোক হইয়াছে "তাহার, কিম্বা তদ্রূপ হুকুমমতে কালেক্টরের সরবরাহ করা মহালের বাকী খাজানা।" রেস্পণ্ডেণ্টের আপত্তির বিচার করিয়াই এই বিষয়ের মীমাংসা করা সুবিধা-জনক হইবে। এমন তর্কিত হয় নাই যে, এই ধারা খাটিলে তাহার বিধানানুযায়ী সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় ঐ ধারা খাটে না। প্রথমতঃ, তর্কিত হইয়াছে যে, এই স্থলে যাহা ক্রোক হয় তাহা এক মহাল নহে, মহালের এক অংশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, ঐ মহাল বা তাহার কোন অংশ কিছুই ক্রোকের অধীন ছিল না, কারণ, যখন তাহা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারামতে নিয়োজিত সরবরাহকারের অধীনে অর্পিত হয় তখনই তাহার ক্রোক বিলুপ্ত হয়। শেষ তর্ক (যাহার উপরে অত্যন্ত নির্ভর করা হইয়াছে) এই যে, কোন মহাল উক্ত তৃতীয় প্রকারের অন্তর্গত হওয়ার জন্য কেবল আদালতের কার্য্য-কারকের হুকুমের দ্বারা ক্রোক হইলেই হইবে, এমত নহে, মালের কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা তাহার সরবরাহ হওয়াও আবশ্যক।

আমি বিবেচনা করি যে, ব্যবস্থাপকগণের এই বিধান করার যে উদ্দেশ্য ছিল তাহার পর্য্যালোচনা করিলেই এই সকল আপত্তির অনেক মীমাংসা করা যাইতে পারিবে। তর্কবিতর্কের সময় বিচারপতি বেলি যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছেন তদনুসারে, কালেক্টরের তৌজীভুক্ত কোন

সমগ্র মহাল, অথবা রীতিমত বাটোয়ারার দ্বারা মহালের যে অংশ পৃথক্ নম্বরে তৌজীভুক্ত হইয়াছে অথবা তাহার যে অংশ সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে পৃথক্ হিসাব খোলা হইয়াছে, কেবল তৎসম্বন্ধেই মালের হাকিম কার্য্য করিতে পারেন, এবং যদি কোন অংশের খাজানা বাকী পড়ে তবে সমুদায় সম্পত্তির উপরই বিঘ্ন ঘটে। অতএব যখন এমন ঘটনা হয় যে, সম্পত্তি রক্ষা করিতে যে ব্যক্তির স্বার্থ আছে, তাহার কোন ত্রুটি ব্যতীতও রাজস্ব দিতে বিলম্ব হয়, তখন তাহা বিশেষ রূপে রক্ষা করাই ব্যবস্থাপক সমাজের এই ধারার বিধান করার উদ্দেশ্য ছিল, এবং ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে সকল স্থলে মহালের কোন অংশ ক্রোক থাকে, তাহাতেই ঐ কাঠিন্য উপস্থিত হয়। যদি কোন সম্পত্তি ঋণের জন্য ক্রোক হয়, তবে রাজস্ব দেওয়ার নিমিত্ত সকল স্থলে দায়ীর বাস্তবিক স্বার্থ থাকে না, যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহার অথবা দায়ীর শরীকেরই স্বার্থ থাকে। মহাল যখন দেওয়ানী আদালতের নিয়োজিত সরবরাহকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে অর্পিত হয়, তখন তাহার মালিকের রাজস্ব প্রদানে স্বার্থ থাকিলেও তাহা তাহার দেওয়ার উপায় থাকে না, কারণ, সম্পত্তির সমুদায় আয় ও লভ্য তাহার হস্ত হইতে বাহির করিয়া লইয়া অন্য এক ব্যক্তির হস্তে অর্পিত হইয়াছে; এবং দেওয়ানী আদালতের নিয়োজিত এবং সম্পূর্ণ রূপে ঐ আদালতের অধীন সরবরাহকারের হস্তে সম্পত্তি থাকিলে যে প্রকার মালিকের উপায় থাকে না, কালেক্টর অথবা মালের অন্য কর্ম্মচারীর হস্তে তাহা থাকিলেও মালিকের সেই প্রকার অনুপায় হয়। পরন্তু, দেখা যাইতেছে যে, আইনের শব্দগুলি আইনের ঐ উদ্দেশ্যের সহিত ঐক্য। ৫ ধারায় যে "মহাল" শব্দ ব্যবহৃত আছে তাহা দৃষ্টব্যে সম্পূর্ণ মহাল বুঝায় বটে,- কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, এই প্রকার সঙ্কুচিত অর্থ করিলে ব্যবস্থাপক-সমাজের প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না, কারণ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে সকল হিস্যার কথা ঐ ধারার প্রথম ভাগে লেখা আছে, তৎসম্বন্ধেও ঐ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব "মহাল" শব্দের দৃষ্টব্য অর্থ হইতে কিছু ব্যাপক অর্থ করিতে হইবে।

ঐ মহালের ক্রোক জারী ছিল না বলিয়া যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের বোধ হইতেছে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারামতে সরবরাহকার নিয়োজিত হইয়াছে বলিয়াই ক্রোক বিলুপ্ত হয় না, কারণ, উত্তমর্ণদিগের স্বত্ব বহাল রাখিয়া সম্পত্তি রক্ষা করাই ২৪৩ ধারামতে সরবরাহকার নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য, সুতরাং যদি সরবরাহকার নিযুক্ত করাতেই সেই স্বত্ব বিনষ্ট হয়, তবে উত্তমর্ণদিগের অত্যন্ত অনিষ্ট হইবে।

অপর, ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, রেস্‌পণ্ডেণ্টেরা যে ব্যাখ্যা করে যে, মহাল দেওয়ানী আদালতের দ্বারা ক্রোক হইয়া মালের কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনেও অর্পিত হইবে, ইহা আইনের শব্দের বিরুদ্ধ। এই আইনের সহিত নীলামের পুরাতন আইন সমস্ত তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন বিশেষ সহায়তা হয় না, কারণ, পুরাতন আইনমতে, যখন দেওয়ানী আদালতের দ্বারা ক্রোক হইত তখন কাজে কাজে সেই হুকুম কালেক্টরের দ্বারা প্রতিপালিত হইত, অতএব কোন মহাল দেওয়ানী আদালতের দ্বারা ক্রোক হইলেই, তাহা এককালে কালেক্টরের কর্ত্তৃত্বাধীনে অর্পিত হইত। ক্রোকের তাহাই সচরাচর চলিত নিয়ম ছিল। কিন্তু ক্রোকের এক নূতন প্রণালী ও কালেক্টর ভিন্ন অন্যের দ্বারা সম্পত্তির সরবরাহ করার প্রণালী প্রথমে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের দ্বারা প্রচলিত হয়, এবং যদি কেবল কালেক্টরের সরবরাহের অধীন সম্পত্তি সক-

লেই ৫ ধারার ৩ প্রকরণের ফল সীমাবদ্ধ করা অভিপ্রেত হইত, তবে ঐ প্রকরণের শব্দ গুলি কি প্রকার হইত, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তাহা হইলে "কোন দেওয়ানী হাকিমের হুকু- "মের দ্বারা ক্রোকী এবং কালেক্টরের সর- "বরাহের অধীন সম্পত্তি" বলিয়া লিখিত হইত। ঐ প্রকার বাক্য ব্যবহৃত না হইয়া লেখা হইয়াছে যে, ক্রোক-কৃত সম্পত্তি কালেক্টরের কর্তৃত্বাধীন হউক বা না হউক, তৎসমুদায় সম্বন্ধেই ঐ বিশেষ নোটিসের উপকার প্রদত্ত হইবে। দুই ঘটনাতেই সরবরাহকারেরা সম্পত্তির রিসিবর; দুই ঘটনাতেই রাজস্ব দেওয়া কঠিন হইতে পারে; অতএব রেস্পণ্ডেণ্ট আইনের যে প্রকার অর্থ করিতে চাহে, আইনের শব্দগুলি অতিক্রম করিয়া কি জন্য আমাদের সেই প্রকার অর্থ করিতে হইবে, তাহার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না।

মেং উড্রফ ঐ আইনের ১৭ ধারার বাক্যের উপর নির্ভর করেন, কিন্তু এই সকল বাক্য বরং প্রতিপক্ষের তর্কের পোষকতা করে, এবং তজ্জন্য ১৭ ধারার দ্বারা যে উপকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহা ৫ ধারা-প্রদত্ত উপকার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এবং অন্ততঃ তাহাতে কেবল নীলামের দায় স্থগিত থাকে। কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের কর্তৃত্বাধীন সম্পত্তি, নাবালগের সম্পত্তি, ও আদালতের হাকিমের হুকুম ভিন্ন অন্য প্রকারে যে সকল সম্পত্তি মালের কর্মচারীর হস্তে ক্রোক থাকে, ও আদালতের হাকিমের হুকুমমতে যে সকল সম্পত্তি মালের কর্মচারীর হস্তে ক্রোক থাকে, কেবল এই সকল সম্পত্তি সম্বন্ধেই ১৭ ধারা খাটে। এই স্থলে যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে বিবিধ প্রকারে সম্পত্তির ক্রোক ও সরবরাহ হইতে পারে, তাহা দেখানই কেবল ব্যবস্থাপক সমাজের অভিপ্রেত ছিল, এবং যখন ব্যবস্থাপকগণ কোন বিশেষ উপকার প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন, তখন তজ্জন্য তদুপযোগী বাক্যও ব্যবহার করিয়াছেন।

তর্কিত হইয়াছে যে, ক্রোক হইয়াছে কি না, তাহা কালেক্টরের অবগত হওয়া কঠিন হইবে। যদি ঐ সংবাদ পাওয়া কঠিন হয়, তবে সম্পত্তি ক্রোক হইলে কালেক্টরকে সংবাদ দিতে দেওয়ানী আদালতকে লওয়ান যাইতে পারে, কিন্তু ঐ কাঠিন্য অনুমান করিয়া লইয়া আমরা ব্যবস্থাপকগণের স্পষ্ট বাক্যের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমায় কার্য্য করিতে পারি না।

রেস্পণ্ডেণ্টেরা তদনন্তর ৩৩ ধারার বিধানের উপরে নির্ভর করে এবং অতি বিশুদ্ধরূপেই তর্ক করে যে, কেবল নীলামের অনিয়ম সপ্রমাণ করিলেই ঐ ধারার বিধান যথেষ্ট প্রতিপালিত হয় না; নীলামের পরে ক্রয়-মূল্যের কোন অংশ বাদিগণ লইলে, তাহা যথেষ্ট প্রতিপালিত হয় না; এবং তর্কিত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় তাহাই ঘটিয়াছে, কারণ, বাদিগণের বিরুদ্ধ এক জন ডিক্রীদার, কালেক্টরের হস্তে নীলামের যে উদ্বৃত্ত টাকা ছিল তন্মধ্যে কতক টাকা তাহার ডিক্রী পরিশোধার্থে বাদিগণের বিনা আপত্তিতে বাহির করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, এই প্রকার টাকা লওয়া ৩৩ ধারার মর্ম্মান্তর্গত টাকা লওয়া নহে। বাদিগণ নিজে ক্রয়-মূল্যের কোন অংশ লয় নাই, অতএব অন্য কোন ব্যক্তিকে টাকা দেওয়া হইলে তাহাতে তাহাদের কিছু আইসে যায় না। যদি তাহারা নিজের জন্য কোন টাকা লইত অথবা তাহাদের নিজের প্রার্থনামতে অন্য কোন প্রয়োজনের জন্য টাকা দেওয়া হইত, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা হইত; কিন্তু এ স্থলে তাহা হওয়ার কথা প্রদর্শিত হয় নাই।

অপিচ, বিশুদ্ধরূপেই তর্কিত হইয়াছে যে, ৩৩ ধারামতে, নীলাম অন্যথা করিতে হইলে বাদিগণের ইহা সপ্রমাণ করা আবশ্যক যে, কথিত অনিয়ম হেতু তাহাদের বাস্তবিক ক্ষতি হইয়াছে, এবং রেস্পণ্ডেণ্টগণ অতি প্রবলরূপে তর্ক করি-

য়াছে যে, এই মোকদ্দমায় ঐ বৃত্তান্ত সপ্রমাণ হয় নাই, এবং তাহা বাদিগণের অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতেই তাহাদের মোকদ্দমার পক্ষে সাং-ঘাতিক হইয়াছে। নিম্ন আদালতে কি প্রকারে মোকদ্দমা চলিয়াছিল তাহা নথীতে সহজে দৃষ্ট হয় না, এবং কেহ আমাদিগকে তাহার কোন সংবাদও দিতে পারেন না। এই বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন তদন্ত অথবা নির্দ্দেশ হয় নাই; এবং যদি আমাদের এমত প্রতীতি না হয় যে, বাদিগণ তাহাদের আরজীতে স্পষ্টাক্ষরে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা লিখিয়া পশ্চাতে তাহারা সেই কথা পরি-ত্যাগ করিয়াছে, তবে আমরা বিবেচনা করি যে, তাহারা এইক্ষণে সেই ইসু উত্থাপন ও বিচার করাইতে নিবারিত হইতে পারে না। ইহা সত্য বটে যে, এই ইসু যথোচিত রূপে উত্থাপিত হয় নাই; কিন্তু এই কথা যাহা অত্যন্ত আবশ্যকীয় এবং যাহা সপ্রমাণ না করিলে বাদিগণ ডিক্রী পাইতে পারে না, তাহা যদি পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তবে নিম্ন আদালত নীলামের বৈধতা ও অবৈধতা সম্বন্ধীয় আইন-ঘটিত কঠিন প্রশ্ন কি প্রকারে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এই বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালত কেবল এক কথার উপরে অর্থাৎ নীলামের অনিয়ম হইয়া-ছিল কি না, তাহারই উপরে মোকদ্দমার বিচার করেন, এবং কোন অনিয়ম হয় নাই স্থির করত বাদীর কোন বাস্তবিক ক্ষতি হইয়াছে কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া বাদীর নালিশ ডিস্মিস্ করেন। যদি আদালত অনিয়ম হই-য়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তবে সেই অনি-য়মের গতিকে বাদিগণের কোন বাস্তবিক ক্ষতি হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের নিঃসন্দেহ বিচার করিতেন।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদা-লতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, এবং এই মোক-দ্দমায় ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারামতে নোটিস জারী না হওয়ায় যে অনিয়ম দৃষ্ট হইতেছে তদ্দ্বারা বাদিগণের বাস্তবিক কোন ক্ষতি হইয়াছে কি না, তাহার তদন্তের জন্য মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫৪ ধারামতে পুনঃপ্রেরিত হইবে। দুই পক্ষই এই ইসু সম্বন্ধে নূতন প্রমাণ দিতে পারিবে, এবং নিম্ন আদালত তাহার বিচার করিয়া এই হুকুম পাওয়ার পরে দুই মাসের মধ্যে তাঁহার নিষ্পত্তি ও প্রমাণ এই আদা-লতে প্রেরণ করিবেন। এই আপীলের খরচা নিষ্পত্তির ফলের অনুগামী হইবে। (গ)

---

৩ রা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই জ্যাক্সন।

১৮৭০ সালের ২৬ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের সদর আমীনের ১৮৬৭ সালের ১০ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল, যাহা ১৮৬৯ সালের ২০১৬ নং খাস আপীলে ১৮৭০ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারির হুকুম-মতে এই আদালতে উঠাইয়া লওয়া হয়।

সেখ আবেদ হোসেন (বাদী) আপেলাণ্ট।

লালা রায়শরণ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু ও কৃষ্ণসখা মুখো-পাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক জন মুসলমান মোক্তার এই বলিয়া নালিশ করে যে, এক হিন্দুপরিবারস্থ ব্যক্তিরা, তাহাদের পিতা যে কতিপয় সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করণার্থে তাহাদের হস্তে যথেষ্ট টাকা না থাকাতে, তাহার (বাদীর) সহিত বন্দোবস্ত করে যে, সে তাহার আপন টাকা দিয়া ঐ মোক-দ্দমা চালাইবে, এবং জয়ী হইলে ঐ সম্পত্তির এক ভাগ পাইবে।

এই কার্য্যে মোকদ্দমা ক্রয়বিক্রয়ের কুপ্রথার সংস্রব থাকায় হিন্দুপরিবারের বিষয় সম্বন্ধে এক

নিঃসম্পর্কীয় মুসলমান মোক্তারকে এই প্রকার হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া উচিত নহে।

বিচারপতি কেম্প।—এই মোকদ্দমার বাদী জেলা মজঃফরপুরের এক জন মোক্তার; তাহার নালিশ এই যে, প্রতিবাদিগণের পিতা যে সকল হস্তান্তর করিয়াছিল, তাহা তাহাদের অন্যথা করার আবশ্যক হওয়াতে এবং তাহাদের যথেষ্ট সঙ্গতি না থাকাতে তাহার নিকট তাহারা প্রার্থনা করে, এবং এই বন্দোবস্ত করে যে, বাদী তাহাদের পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবে, এবং মোকদ্দমার সমুদায় খরচ দিবে, এবং জয়ী হইলে বাদী কতিপয় সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পাইবে। প্রথম বন্দোবস্ত এই হয়। কথিত হইয়াছে যে, এই বন্দোবস্ত লিপিবদ্ধ হয়, এবং ইহার এক পাণ্ডুলিপি এবং এক খানা সাদা ষ্টাম্প কাগজ প্রতিবাদী দ্বয়ের স্বাক্ষর সম্বলিত গুদরসহায় নামক এক তৃতীয় ব্যক্তির হস্তে এই সর্ত্তে অর্পিত হয় যে, যদি প্রতিবাদিগণের পিতা কর্ত্তৃক হস্তান্তর অন্যথা করার নালিশ হাইকোর্টে জিত হয়, তবে ঐ পাণ্ডুলিপি ঐ সাদা ষ্টাম্প কাগজে নকল হইয়া বাদীকে দেওয়া হইবে। আমার এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদীর কথা অনুসারে এই প্রথম বন্দোবস্ত রূপান্তরিত হইয়া পক্ষগণের এই বন্দোবস্ত হয় যে, বাদী প্রতিবাদিগণের নালিশে যে ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে বাদীকে তাহারা কতিপয় সম্পত্তির এক অংশের মোকররী পাট্টা দিবে, যাহার মধ্যে এক সম্পত্তি প্রতিবাদিগণের ভদ্রাসনবাটী যে মৌজায় স্থিত, সেই মৌজা। দেখা যাইতেছে যে, বাদীর পূর্ব্ব এক নালিশে প্রতিবাদিগণ ন্যূন মূল্য ধরা হইয়াছিল বলিয়া জওয়াব দিয়াছিল। বাদী সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়া তাহার সেই নালিশ উঠাইয়া লয়, এবং সে বিরোধীয় সম্পত্তির এক বৎসরের উপস্বত্ব ধরিয়া ৮০০ টাকা মূল্যে এই রূপে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

এই প্রকার মোকদ্দমায় যে স্থলে বাদী এক আদালতের মোক্তার, এবং তাহার ও প্রতিবাদিগণের মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণ করার দাবী করে এবং ঐ বন্দোবস্ত মোকদ্দমা ক্রয়বিক্রয় সংসৃষ্ট বোধ হয়, সে স্থলে এই দাবী নিশ্চিত, সঙ্গত ও সর্ব্বথা ন্যায্য হওয়া আবশ্যক। উপস্থিত মোকদ্দমায় আদালতের এক জন মোক্তার আমাদের এই বিশ্বাস জন্মাইতে চাহে যে, প্রতিবাদিগণের যে মোকদ্দমা খাস আপীলে জিত হইয়াছে, এবং যে খাস আপীলে কেবল ১২ টাকা কয়েক আনা খরচা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই মোকদ্দমা চালাইতে সে ২০০০ টাকা ব্যয় করিয়াছে। এই ২০০০ টাকা ব্যয়ের কোন হিসাব আমরা দেখিতে পাই না। বাদীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, এবং ২০০০ টাকার মধ্যে সে কেবল ১১০ টাকার অর্থাৎ প্রথম ষ্টাম্পের মূল্য ৫০ ও উকীলের ফীস ৬০ কি ৬৫ টাকার হিসাব দিতে পারিয়াছে। মোক্তার নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, প্রতিবাদিগণ এক সাদা ষ্টাম্প কাগজে দস্তখত করিয়া দেয় যাহাতে পশ্চাতে প্রতিবাদিগণের এক সম্পত্তি যাহার বার্ষিক উপস্বত্ব ৮০০ টাকা তাহার এক ইস্তমরারী মোকররী পাট্টা লেখা হয়; অতএব বাদীর ২০০০ টাকা ব্যয় করার কথা সত্য হইলেও দেখা যাইতেছে যে, যে সম্পত্তির অন্ততঃ দশ বৎসরের উপস্বত্ব ধরিয়া মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেও ৮০০০ টাকা মূল্য হয়, তাহাই সে তাহার ব্যয়কৃত টাকা ও পরিশ্রমের পরিবর্ত্তে পাইয়াছে।

এই মোকদ্দমার প্রমাণ যাহা বিস্তারিত রূপে আমাদের সমক্ষে পঠিত হইয়াছে, তাহা আমরা অতি সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। এবং দুই পক্ষের প্রমাণ উৎকৃষ্ট রূপে পর্য্যালোচনা করার জন্য আমরা বাদীর খাস আপীল জাবেতা আপীল স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু আমার বিবেচনায়, ফল এই যে, যে পাণ্ডুলিপি বাদীর উকীল সাক্ষী শ্যামনারায়ণ সিংহ বলেন

যে, সে নিজে লিখিয়াছিল, তাহা যে প্রতিবাদিগণের সমক্ষে অথবা তাহাদের সম্মতি লইয়া লেখা হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। ইহা হইতে পারে এবং প্রমাণের দ্বারাও দৃষ্ট হইতেছে এবং প্রতিবাদিগণের উকীলও অস্বীকার করেন না যে, বাদী এই মোকদ্দমা চালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পরিমাণে টাকা ব্যয় ও সময়ক্ষেপ করিয়াছে। যদি সেই বাবতে তাহার কোন দাবী থাকে, তবে সে যে টাকা দিয়াছে তাহা এবং তাহার পারিশ্রমিক পাওয়ার জন্য তাহার নালিশ করা উচিত ছিল। সে যে প্রণালীতে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে তাহা সঙ্গত এবং যথার্থ দাবী নহে; তাহা এমন কঠিন ও অসঙ্গত দাবী যে, কোন একটির আদালতই এক মুহূর্তের জন্যও তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।

দুই নিম্ন আদালতই বিবেচনা করিয়াছেন যে, বাদীর এই নালিশ চলিতে পারে না। জজের মতে ইহাতে মোকদ্দমা ক্রয়-বিক্রয়ের সংস্রব আছে, এবং তিনি রিবেনিউ জুডিশিয়াল এবং পুলিস-জর্ণেলের ৫ ম বালমের ২৬০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত এক মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি পীককের এক নিষ্পত্তির উল্লেখ করিয়াছেন; ঐ বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি বলেন যে, "তিনি এমন কথা বলেন না যে, চাম্পার্টির আইন অর্থাৎ মোকদ্দমার ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধীয় আইন মফঃসলে প্রচলিত আছে, তথাপি "তিনি বিবেচনা করেন যে, গৃহবিবাদে যদি "নিঃসম্পর্কীয় কোন ব্যক্তিকে প্রকৃত দায়াধি- "কারীর সহিত এই প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া "হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া যায় যে, ঐ দায়াধি- "কারীর দাবী সংস্থাপন করিতে পারিলে সে "সম্পত্তির এক ভাগ পাইতে স্বত্ত্ববান হইবে, "তাহা হইলে আদালতের আপন ইচ্ছাধীন "ক্ষমতা অতি অন্যায় রূপে পরিচালন করা "হইবে।" এই মোকদ্দমায় এক জন লভ্যপ্রয়াসী মুসলমান মোক্তার এক হিন্দু-পরিবারের সাংসারিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রতিবাদিগণের পিতা যে সকল হস্তান্তর করিয়াছিল তাহা অন্যথা করার নালিশ চালাইবার জন্য এই সর্ত্তে টাকা দেয় যে, দায়াধিকারিগণ জয়ী হইলে ক্রেতাগণ হইতে ঐ রূপে পুনঃপ্রাপ্ত সম্পত্তির এক ভাগে সে স্বত্ত্ববান হইবে; অতএব এই প্রকার নালিশ গ্রহণ করিলে আমাদের নিতান্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য্য হইবে।

শতকরা ৬ টাকার হিসাবে সুদ সমেত সকল আদালতের খরচা সহ বাদীর নালিশ ও এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইল।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমি কেবল এই বলিতে চাহি যে, আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতি যে নিষ্পত্তি ও তাহার যে সকল হেতু বর্ণন করিলেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। যখন মোকদ্দমা এই আদালতে খাস আপীলে ছিল, তখন আমার বোধ হইয়াছিল যে, প্রমাণের বিরুদ্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি হইয়াছিল এবং যেহেতু অনেক সাক্ষীর জবানবন্দীর দ্বারা প্রমাণ প্রদত্ত হয়, এবং সেই জবানবন্দীতে কিঞ্চিৎ গোল ছিল, অতএব মোকদ্দমার জাবেতা আপীল এই আদালতে উঠাইয়া লওয়া হয়। এক্ষণে মোকদ্দমা সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়া ও সমুদায় প্রমাণ দেখিয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, ঐ প্রমাণের উপর বাদীর ডিক্রী পাওয়া উচিত নহে, এবং প্রতিবাদীরা আপন বর্ণনা-পত্রে যে বলিয়াছে যে, তাহারা কখন এই চুক্তি করে নাই, তাহাই সত্য। বিরোধীয় কোন ভূমির মৌরসী পাট্টা দেওয়ার কথা হইয়াছিল বটে, কিন্তু মৌরসীর খাজানা সম্বন্ধে যে কোন কথার নির্দ্ধারণ হইয়াছিল এমত প্রদর্শিত হয় নাই, এবং মোকররী প্রদানে মোকররীদার কত খাজানার দায়ী হইবে, তাহা একটি মূল কথা। বাদী নিজে ঐ মোকররী পাট্টা লিখিয়া প্রস্তুত করে, এবং সে নিজে যত টাকা খাজানা

দিতে ইচ্ছা করিয়াছিল তাহাই সে ঐ পাট্টায় লিখিয়া দেয়, এবং প্রতিবাদিগণ যে সাদা ষ্টাম্প কাগজ দস্তখত করিয়া দিয়াছিল তাহাতেই ঐ পাট্টা তাহার পরে প্রতিবাদিগণের সম্মতি না লইয়া এবং প্রতিবাদিগণের অসাক্ষাতে এবং তাহাদের নিকট কোন আদেশ না পাইয়া লেখা হয়, এবং আমার বোধ হয় যে, সাক্ষিগণও তাহাদের নাম প্রতিবাদিগণের অসাক্ষাতে স্বাক্ষর করিয়াছিল।

যে প্রণালীতে এই সকল কার্য্য হইয়াছে তদ্দ্বারা তাহার প্রতি অনেক সন্দেহ উপস্থিত হয়, এবং সেই কার্য্যের ফল এই যে, অতি সামান্য টাকার জন্য এক বহু মুল্যের সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি লইয়া যে মোকদ্দমা হয় তাহার গতিকে প্রতিবাদিগণের হস্ত হইতে বাদী যে তাহাদের মোক্তার স্বরূপে ঐ মোকদ্দমা চালাইতেছিল, তাহার নিকট হস্তান্তরিত হইত। বাদী যত টাকার কথা কহে তত টাকা যে, ঐ মোকদ্দমায় খরচ হইয়াছিল, অথবা তাহাই যে, বাদীর পরিশ্রমের উচিত মূল্য, এমত কিছুতেই প্রদর্শিত নাই।

প্রতিবাদিগণ যে কখন এই চুক্তি করিয়াছিল এমত আমার হৃদ্বোধ হয় না, অতএব আমিও এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ করিলাম।

(গ)

৩ রা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২২৭ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২ রা জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মসম্মত মামুলা খানম্ প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

খাজা মহম্মদ ইছা খাঁ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি, এলেন ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র চৌধুরী ও বুধসেন সিংহ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, ই, টুইডেল ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলমাধব সেন, দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু, মোহিনীমোহন রায় ও মুন্‌সী মহম্মদ ইউছুফ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে দলীলের নকল নথীতে আছে তাহা লিখিতপড়িত হওয়ার কথা বৈধ রূপে সপ্রমাণ করিতে হইলে, সাক্ষীর কেবল এই জবানবন্দী দিলেই হইবে না যে, সে ঐ প্রকার এক দলীল লিখিয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহাকে ঐ নকল পাঠ করিয়া শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, ইহারই মূল দলীল সে স্বাক্ষর করিয়াছিল কি না।

যে মোকদ্দমায় এক জন প্রতিবাদী ভিন্ন আর সমুদায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সকল বাদীরই এক নালিশের হেতু থাকে, এবং কেবল এক জন বাদীর সেই এক জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অন্যান্য বাদীর নালিশের হেতু ভিন্ন অন্য নালিশের হেতু থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই মোকদ্দমা একত্র করিয়া এক নালিশ হইতে পারে না।

মোকদ্দমার আনুষঙ্গিক বিষয়ে হুকুম ঃ—

বিচারপতি লক।—তিন খানা দলীল নথীতে আছে বলিয়া আপেলাণ্টের উকীল প্রার্থনা করিয়াছেন যে, তাহা প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হয়। প্রথম দলীল ইছা খাঁ এবং মকিমী বেগমের নামীয় ১৮৬৮ সালের ২৫ এ জানুয়ারির এক দরখাস্ত, যাহা ডিক্রীদার ইমামবন্দী এবং বিচারাদিষ্টদায়ী মহম্মদ তকীর দায়াধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মধ্যে এক ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় দাখিল হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

২ য় দলীল ১৮৬৮ সালের ২৮ এ আগষ্ট

তারিখের এক ঠিকা পাট্টা, যাহা মোহন্ত ভগীরথ নন্দ নামক এক ব্যক্তির বরাবর ইছা খাঁ এবং মকিমী বেগমের দ্বারা প্রদত্ত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, এবং যাহাতে মৌজা আছিয়াপুর উক্ত ভগীরথ নন্দকে পাট্টা দেওয়া হয়।

তৃতীয় দলীল ১২৭৩ সালের ২৬ এ চৈত্রের এক ঠিকা পাট্টা, যাহা আবদুল হোসেন ও আর এক ব্যক্তির বরাবর ইছা খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কথিত হইয়াছে যে, প্রতিবাদী ইছা খাঁ এবং মকিমী বেগম যে, আপনাদিগকে মোকররীদার বলিয়া বর্ণনা এবং বিবেচনা করিয়াছিল, এবং আয়েসা বেগমের নিকট স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহারা মোকররীদারের ন্যায় ঐ সকল দলীলের লিখিত সম্পত্তি সম্বন্ধে কার্য্য করিয়াছিল, তাহা দেখানই ঐ সকল দলীল দাখিল করার উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতেছি যে, এই সকল দলীল বৈধ রূপে সপ্রমাণ হয় নাই। দেখা যাইতেছে যে, ইছা খাঁকে সাক্ষী স্বরূপ বাদী তলব করে, এবং তাহার জবানবন্দী লয়; অন্যান্য প্রশ্নের মধ্যে তাহাকে জিজ্ঞাসিত হয় যে, ইমামবন্দীর মোকদ্দমায় সে এক দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিল কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলে যে, এক ডিক্রীজারীর মোকদ্দমায় সে ১৮৬৮ সালের ২৫ এ জানুয়ারি তারিখে এক দরখাস্ত দাখিল করে, এবং তাহার নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই সেই দরখাস্তের উদ্দেশ্য ছিল। এই কথা পর্য্যন্তই তাহার জবানবন্দী শেষ হয়। কিন্তু বাদীর উকীলের আরও প্রশ্ন করা কর্তব্য ছিল, এবং যদিও মূল দরখাস্ত আদালতে ছিল না, তথাপি তিনি ঐ দলীলের নকল পাঠ করত তাহাকে শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন যে, ঐ মর্ম্মেই সে ১৮৬৮ সালের ২৫ এ জানুয়ারি তারিখে দরখাস্ত করিয়াছিল কি না। যে স্থলে ইছা খাঁ ঐ রূপ কোন কথা স্বীকার করে নাই, সে স্থলে নথীতে যে দরখাস্তের নকল আছে, তাহা উক্ত ইছা খাঁর বিরুদ্ধ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

অন্য দুই দলীল সম্বন্ধেও ঐ রূপ। ঐ দলীল দ্বয়ের নকল দাখিল হইয়াছে; এবং ইছা খাঁকে কেবল এই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, সে ঐ সকল দলীলের লিখিত সম্পত্তির ঠিকা পাট্টা দিয়াছে কি না; এবং তদুত্তরে সে বলে যে, সে দিয়াছে। কিন্তু বাদীর উকীল আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। তিনি ইছা খাঁর হস্তে ঐ দলীল দেন নাই, বা দলীলের মর্ম্মও তাহাকে পাঠ করিয়া শুনান নাই, অথবা এমন কথাও জিজ্ঞাসা করেন নাই যে, আদালতে তখন যে নকল ছিল, তাহা সেই পাট্টার নকল কি না। এমত অবস্থায়, আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, যে সকল পাট্টার নকল এখন দাখিল হইয়াছে, তাহা ইছা খাঁর প্রদত্ত পাট্টারই নকল। অতএব আমরা এই সকল নকল প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না।

আমরা বিবেচনা করি যে, ৯ ম বালম মুয়রের ৩৬২ পৃষ্ঠার; ১০ ম বালম মূয়রের ৩৮১ পৃষ্ঠার; ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৫০ ও ২৭০ পৃষ্ঠার যে সকল মোকদ্দমার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা খাটে না। তাহাদের সহিত উপস্থিত মোকদ্দমার কোন সম্বন্ধ নাই। এমত অবস্থায়, এই সকল দলীল এই মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিতে আমরা অস্বীকার করিলাম।

ঐ দলীল সকল নথীতে আছে, এবং তাহারা যত দূর যোগ্য তত দূর প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবাদী ইছা কখন তাহাদিগকে গ্রহণ করণে সম্মত হয় নাই। নথীতে যে, ঐ সকল দলীল আছে, তাহা বোধ হয় সে কখন জানে না; এবং সে তল্লিখিত বিবরণ সমস্ত স্বীকার করে কি না, তাহা জানিবার জন্য তাহা তাহার হস্তে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা দেওয়া হয় নাই।

খাজা মহম্মদ গওহর আলীর বিরুদ্ধ নালিশের

হেতুর সহিত এই মোকদ্দমার প্রকৃত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশের হেতুর প্রভেদ আছে বলিয়া যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিবেচনায়, বিশুদ্ধ। দেখা যায় যে, বাদীর পিতা গোলাম মহিউদ্দীনের বিরুদ্ধ এক ডিক্রীজারীতে মৌজা বর্দ্দোকর নীলাম হয় এবং ঐ মৌজায় তাহার স্বত্ব ও লাভ গওহর আলী খাঁ ১৮৬৭ সালের ২৩ এ জুলাই তারিখে ক্রয় করে। এই মোকদ্দমার বাদিগণ যাঁহারা গোলাম মহিউদ্দীনের দায়াধিকারী, তাহারা এই মৌজার প্রতি কোন দাবী করে নাই; কিন্তু তোতারাম নামক এক ব্যক্তি যে বলে যে, সে ১৮৬৭ সালের ৪ ঠা মে তরিখে মহিউদ্দীনের নিকট ঐ মৌজার অর্দ্ধাংশ ক্রয় করে, সে এই বলিয়া তাহার ঐ অংশ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করে যে, নীলাম-ক্রেতা তাহাকে বেদখল করিয়াছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই মোকদ্দমায় দুই দল বাদী একত্রিত হইয়াছে; এক দল বাদীর এই সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ নাই, সুতরাং তাহারা কোন প্রতিকারের প্রার্থনা করে না; দ্বিতীয় দল বাদী নিজের জন্য সম্পত্তির দাবী করিয়া পুনঃদখল পাওয়ার নালিশ করিয়াছে। অতএব এই ডিক্রীতে আমাদের এক দল বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্, কিন্তু অন্য দল বাদীর দাবী ডিক্রী করিতে হইবে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই সম্পত্তি সম্বন্ধে তোতারামের নালিশের হেতু, অপর সম্পত্তি সম্বন্ধে অন্য বাদিগণের সহিত একত্রে তাহার যে নালিশের হেতু আছে, তাহা হইতে বিভিন্ন। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমার দোষগুণের উপরে আদালতের কোন রায় ব্যক্ত না হইয়া গওহরআলীর দখলে এক্ষণে যে সম্পত্তি আছে তৎসম্বন্ধীয় নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে, এবং সে তাহার এই আদালতের ও নিম্ন আদালতের খরচা পাইবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমারও ঐ মত। আমি বিবেচনা করি যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারার বাক্যে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদী গওহর আলীর বিরুদ্ধে বাদী তোতারামের মোকদ্দমা, অন্য সকল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ঐ বাদী এবং তাহার সহ-বাদিগণের মোকদ্দমার সহিত একত্রে শুনা যাইতে পারে না। আইনের বিধান এই যে, "একই পক্ষের দ্বারা একই পক্ষের বিরুদ্ধে" হইলেই নালিশের হেতু সকল একত্র করা যাইতে পারে। এই মোকদ্দমায় দেখা যাইতেছে যে, গওহর আলী ভিন্ন অন্যান্য প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে বাদী তোতারাম এবং তাহার সহ-বাদিগণের এক নালিশের হেতু ছিল; এই মোকদ্দমা এক দল প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এক দল বাদীর নালিশ। কিন্তু প্রতিবাদিগণের মধ্যে কেবল গওহর আলীর বিরুদ্ধে বাদিগণের মধ্যে কেবল তোতারামের নালিশ উক্ত মোকদ্দমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই নালিশ ঠিক এরূপ নালিশ, যাহাতে ৯ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫২৫ পৃষ্ঠার এক মোকদ্দমায় এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারে না।

অনন্তর, কথিত হইয়াছে যে, ইহা কেবল কার্য্যপ্রণালীর ভ্রম ভিন্ন আর কিছু নহে, এবং যেহেতু ইহাতে মোকদ্দমার দোষগুণের অথবা বিচারাধিকারের ব্যতিক্রম হয় না এবং যেহেতু এই আপত্তি পূর্ব্বে উত্থিত হয় নাই, অতএব আমরা এইক্ষণে তাহা শুনিতে পারি না। কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল যে প্রকার দেখাইয়া দিয়াছেন তদনুসারে আমি বিবেচনা করি, আদালতের বিচারাধিকারের ব্যতিক্রম হয়। নালিশের যে ভাগ বাদী তোতারাম কর্তৃক প্রতিবাদী গওহর আলীর বিরুদ্ধে উপস্থিত হয় তাহার মূল্য কেবল ১৫০০ টাকা। অতএব অধঃস্থ জজ-আদালতের এই নালিশ গ্রহণের অধিকার থাকিলেও আমরা এইক্ষণকার ন্যায় তাহার জাবেতা আপীল শুনিতে পারি না। তাহা হইলে ফল

এই হইত যে, জেলার জজের নিকট আপীল হইয়া হয়ত কোন আইন-ঘটিত বিষয়ে আমাদের সমক্ষে খাস আপীল হইত, এবং প্রিবি কৌন্সিলের অথবা আমাদের অনুমতি না হইলে আর কোন আপীল হইতে পারিত না। কিন্তু যদি আমাদের এমত বিবেচনা করিতে হয় যে, গওহর আলীর বিরুদ্ধ এই পৃথক্ মোকদ্দমা সকল প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে সকল বাদীর মোকদ্দমার তুল্য (কিন্তু তাহা নহে এবং হইতেও পারে না,) তাহা হইলে এই আদালতে জাবেতা আপীল হয় এবং তাহার পরে প্রিবি কৌন্সিলে আপীল চলে।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, ইহা কেবল জাবেতার ভ্রম নহে; ইহাতে আদালতের বিচারাধিকারেরও ব্যতিক্রম হয়; অতএব ইহাই সাংঘাতিক বিবেচনা করিয়া আমরা ব্যক্ত করিলাম যে, প্রতিবাদী গওহর আলীর বিরুদ্ধে বাদীর নালিশ হারাহারী মত খরচা সমেত দোষ গুণের উপরে কোন রায় প্রদত্ত না হইয়া ডিস্মিস্ হইবে। (গ)

---

৩ রা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

বেণীমাধব রায়, প্রার্থী।

বাবু আনন্দচন্দ্র ঘোষাল প্রার্থীর উকীল।

চুম্বক।—অনাবশ্যক এবং অনুচিত বিলম্বের হেতুবাদে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারান্তর্গত এক দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়া ক্রোককৃত সম্পত্তির নীলাম হয়; কিন্তু দখল লওয়ার চেষ্টা করাতে প্রার্থী এই বলিয়া ক্রেতাকে বাধা দেয় যে, প্রার্থী নিজে দখীলকার আছে। নিম্ন আদালত ২৬৯ ধারা মতে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, যেহেতু প্রার্থীর দাবী ২৪৬ ধারা মতে অগ্রাহ্য হইয়াছে, অতএব তাহার দখীলকার থাকার কোন স্বত্ব নাই। এ স্থলে নিম্ন আদালতের ঐ হুকুম ন্যায্য ও সঙ্গত।

বিচারপতি নর্ম্যান।—প্রার্থী বেণীমাধব রায় বলে যে, একটি পুষ্করিণীর ৵৵ অংশ যাহা সে ১২৭৩ সালের ২৯ এ চৈত্র তারিখে প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ক্রয় করে তাহা, বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বামাসুন্দরীর এক ডিক্রীজারীতে বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তি বলিয়া ক্রোক হয়; এবং প্রার্থী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারামতে ঐ পুষ্করিণীর প্রতি দাবী উপস্থিত করে।

প্রার্থীর দরখাস্ত শুনিয়া, প্রার্থী অনাবশ্যক এবং অনুচিত বিলম্বে মোজাহেম দেওয়ার হেতুবাদে আদালত ২৪৭ ধারামতে ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করত প্রার্থীকে জাবেতা নালিশ করিতে আদেশ করেন। সেই হুকুম অথবা যে সকল বৃত্তান্তের উপরে আদালত ঐ হুকুম প্রদান করেন, তাহা আমাদের সমক্ষে নাই; কিন্তু আমরা অনুমান করি যে, ২৪৭ ধারামতে উচিত রূপেই ঐ হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। নীলাম হওয়ায় ডিক্রীদার পুষ্করিণী ক্রয় করে। সে দখল লওয়ার চেষ্টা করাতে প্রার্থী এই বলিয়া বাধা দেয় যে, সে পুষ্করিণীর দখীলকার আছে। আদালত ২৬৯ ধারামতে তদন্ত করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, বাদীর দাবী উত্থিত হইয়া ২৪৭ ধারামতে অগ্রাহ্য হওয়াতে ২৬৯ ধারানুযায়ী তদন্তে তাহাকে দখীলকার বলিয়া বিবেচনা করার জন্য প্রার্থনা করিতে তাহার কোন স্বত্ব নাই।

প্রার্থী এইক্ষণে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া তর্ক করে যে, জজ ঐ প্রশ্নের উচিত বিচার করেন নাই; তাঁহার ২৬৯ ধারামতে দখলের বিচার করা উচিত ছিল।

২৬৯ ধারার বিধান এই যে, জজ কেবল তদন্ত করিবেন, এবং মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার যে হুকুম দেওয়া উচিত ও ন্যায্য বোধ হয়, তাহাই তিনি প্রদান করিবেন। যদি ইহা সত্য হয় যে, সুবিচারের ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য ঐ দাবী উপস্থিত করিতে অনাবশ্যক এবং অনুচিত বিলম্ব

করা হইয়াছিল, এবং যদি প্রার্থীর ঐ বিলম্ব এবং প্রতারণা-মূলক কার্য্যের গতিকে ২৪৭ ধারানুযায়ী তদন্ত অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, তবে আমরা বিবেচনা করি যে, ২৪৭ ধারানুযায়ী হুকুমে প্রার্থীকে জাবেতা নালিশ করিতে যে প্রথম আদেশ করা হয়, তাহাই বিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং জজের সেই হুকুমের প্রতি আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না।

জজের প্রদত্ত হুকুম আমাদের বিবেচনায়, অতি ন্যায্য ও উচিত বোধ হইতেছে। দরখাস্তে আমরা কোন হুকুম দিলাম না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (গ)

৩ রা মে, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

হীরালাল শীল প্রভৃতি, প্রার্থী।

জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের স্পেসেল এসাইনী এ ক্যারাপিএট, প্রতিপক্ষ।

মেং আর টি এলেন, প্রার্থীর উকীল।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র মিত্র প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—হাইকোর্ট আপেলাণ্টের নিকট খরচার জন্য জামিন তলব করা উচিত বিবেচনা করিলে, অপীল শ্রবণের পূর্ব্বে যে কোন সময়ে হউক, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৪২ ধারামতে তাহা তলব করিতে পারেন। ১০৩ ধারামতে বাদীর পরিবর্ত্তে যে এসাইনী সংস্থাপিত হয়, সে যদি আদালতের হুকুম মতে উচিত সময়ের মধ্যে খরচার জামিন দিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে, তবে ঐ অস্বীকার অথবা ত্রুটির পরে প্রতিবাদী ৮ দিবসের মধ্যে বাদী নির্ধনী হইয়াছে বলিয়া মোকদ্দমা স্থগিত হওয়ার প্রার্থনা করিতে পারে।

বিচারপতি কেম্প।—বাবু হীরালাল শীল ও অন্যান্য এই আদালতে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে, ঐই মোকদ্দমার প্রথম বিচার এবং আপীলের খরচার জন্য উচিত সময়ের মধ্যে জামিন দাখিল করিতে আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১০৩ ও ৩৪২ ধারামতে বাদী-আপেলাণ্টের প্রতি হুকুম প্রদান করেন, এবং আপেলাণ্ট জামিন দিতে না পারিলে আপীল অগ্রাহ্য হয়। খরচার জন্য আপেলাণ্ট কি জন্য আদালতের ইচ্ছামত জামিন দিবে না, ১০ দিবসের মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১০৩ ও ৩৪২ ধারামতে আদালত গত মাসের ১৪ ই তারিখে এক হুকুম জারী করেন।

দেখা যাইতেছে যে, উপস্থিত বাদী আপেলাণ্ট, জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্পত্তির এসাইনীব কতিপয় সম্পত্তি যাহা বাবু হীরালাল শীল প্রভৃতির দখলে আছে, তাহা জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি সাব্যস্ত করার জন্য বাদী নালিশ উপস্থিত করেন। জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় তাহার বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে যত টাকার ডিক্রী পাইয়াছিল তাহাই তিনি মোকদ্দমার মূল্য অবধারণ করিয়াছেন, সম্পত্তির মূল্য ধরিয়া তাহা অবধারণ করেন নাই। আমরা অবগত হইয়াছি যে, ঐ কথাই এসাইনীর পক্ষে এই আদালতের আপীলের এক হেতু। মোকদ্দমার এই অবস্থায় কোন রায় ব্যক্ত না করিয়াও, আমরা বিবেচনা করি যে, খরচা সম্বন্ধে ঐ তর্ক বর্ম্মণ্য কি না, তাহাতে সন্দেহ করার দৃষ্টব্য হেতু আছে।

৩৪২ ধারামতে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে যে, আদালত উচিত বিবেচনা করিলে খরচার জন্য আপেলাণ্টের নিকট জামিন তলব করিতে পারেন, এবং রেস্পণ্ডেণ্টকে হাজীর হইয়া জওয়াব দেওয়ার জন্য তলব করার পূর্ব্বে আদালত যদি এই ইচ্ছাধীন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন, তবে আদালত উচিত বিবেচনা করিলে আপীল শুনিবার পূর্ব্বে যখন ইচ্ছা তখনই ঐ

প্রকার জামিন তলব করিতে পারেন। বাদী নির্ধনী হইলে ১০৬ ধারামতে বাদীর পরিবর্ত্তে এসাইনী সংস্থাপিত হয়, এবং এই মোকদ্দমার ন্যায় যখন এসাইনী উত্তমর্ণদিগের উপকারার্থে মোকদ্দমা চালায়, তখন আদালতের হুকুমানুসারে উচিত সময়ের মধ্যে এসাইনী খরচার জন্য জামিন দিতে অস্বীকার না করিলে মোকদ্দমা চলিবে, কিন্তু যদি এসাইনী হুকুমের লিখিত সময়ের মধ্যে ঐ প্রকার জামিন দিতে অস্বীকার বা ত্রুটি করে, তবে প্রতিবাদী ঐ অস্বীকার অথবা ত্রুটির পরে ৮ দিবসের মধ্যে বাদী নির্ধনী হইয়াছে বলিয়া মোকদ্দমা রহিত করার প্রার্থনা করিতে পারে।

কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, শ্রীনাথ মল্লিকের বিরুদ্ধে ঐ নির্ধনী যে ডিক্রী পায় তাহা ৩৫০০০ টাকার ডিক্রী; অতএব বাবু হীরালাল শীল প্রভৃতি আপীলে জয়ী হইলে শ্রীনাথ মল্লিকের বিরুদ্ধ ডিক্রীতে নির্ধনীর যে স্বত্ব ও লাভ আছে তাহা বিক্রয় করিয়া অনায়াসে খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। প্রথমতঃ, দেখা যাইতেছে যে, শ্রীনাথ মল্লিকের নিকট হইতে যদি এসাইনী এই টাকা আদায় করিতে পারে, তবে তাহা জয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের উত্তমর্ণদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, অতএব খরচার জন্য বাবু হীরালাল শীল প্রভৃতি তাহা সমুদায় পাইবেন না। এই সকল খরচার জন্য ঐ টাকার কোন্ অংশ পাওয়া যাইবে তাহা আদালতের এইক্ষণে বলা দুঃসাধ্য। আমরা বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় এসাইনী এই আপীল চালাইবার অনুমতি পাওয়ার পূর্ব্বে তাহার প্রথম আদালতের ও এই আপীলের খরচার জন্য জামিন দিতে হইবে।

অতএব আমরা আদেশ করিতেছি যে, ৩৪২ ধারামতে এসাইনী দুই আদালতের খরচার বাবৎ আদালতে ৩০ দিবসের মধ্যে ২০০০ টাকার জামিন দাখিল করে।

এই হুকুম মতে আদালতের সন্তোষজনক জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত আপীল শুনা যাইবে না। (গ)

---

৪ ঠা মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি ই, জ্যাক্‌সন এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৭০ সালের ১৩৩ নং মোকদ্দমা।

ত্রিপুরার মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৩ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ৩০ এ সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ফতেমা খাতুন ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

নাবালগ সৈয়দ বশারত আলীর পক্ষে ত্রিপুরার কালেক্টর (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেৎ সি গ্রেগরি ও বাবু কাশীকান্ত সেন, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনমতে, বাকী খাজানার ডিক্রীজারীতে যদি কোন জমার নীলাম হয়, তবে তদ্দ্বারা নিজ জমাই বিক্রীত হয়, যে প্রজার নাম জমিদারের সেরেস্তায় রেজিষ্টরী-কৃত থাকে, কেবল তাহার স্বত্ব ও অধিকার বিক্রীত হয়, এমত নহে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—বাকী খাজানার এক ডিক্রীজারীতে এক সিকমী জমার যে নীলাম হয়, তাহা অন্যথা করিয়া ঐ জমাতে বাদীর স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়।

দেখা যাইতেছে যে, বাদী ১৮৬৬ সালের ২৮ এ সেপ্টেম্বর তারিখে বিরোধীয় জমায় হরকুমার নামক এক ব্যক্তির স্বত্ব, অধিকার, ও লাভ ক্রয় করে।

গৌরমণি নামে এক ব্যক্তি জমিদারের সেরে-

ন্যায় প্রজা বলিয়া রেজিষ্টরী-কৃত থাকায় তাহার বিরুদ্ধে জমিদার প্রতিবাদী ঐ জমার বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিয়া ১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ডিক্রী পায়। এই ডিক্রীজারীতে বিরোধীয় জমা ১৮৬৭ সালের ২৯ এ এপ্রিল তারিখে প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টের নিকট বিক্রীত হয়; অতএব বাদী তর্ক করে যে, যেহেতু বিরোধীয় জমা হরকুমারের সম্পত্তি, গৌরমণির নহে, অতএব সে যে নির্ণায়ক ডিক্রীর জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, তাহা সে পাইতে স্বত্ববান্।

প্রথম আদালত এই হেতু তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন যে, সে ডিক্রীজারীতে যে হরকুমারের স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করিয়াছে, বিরোধীয় জমা যে তাহারই সম্পত্তি, এমত সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।

আপীলে ঐ নিষ্পত্তি অধঃস্থ জজ যে হেতুবাদে অন্যথা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার রায়েই বর্ণিত

আমি বিবেচনা করি, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, কারণ, তিনি যে সমস্ত হেতুর উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাহা স্থির রাখা যাইতে পারে না। তিনি বলেন যে, "ইহা অস্বীকৃত নহে "যে, ঐ সিকমী তালুক পূর্ব্বে হরকুমারের পিতা "মৃত ব্রজচন্দ্রের সম্পত্তি ছিল; অতএব হিন্দু "ব্যবহারশাস্ত্রমতে পিতার মৃত্যুর পরে হর- "কুমারই সেই সম্পত্তি পায়, হরকুমারের মাতা "গৌরমণি পায় নাই, এবং ঐ সিকমী তালুক "হস্তান্তর-যোগ্য জমা বিধায় হরকুমারের বিরুদ্ধ "ডিক্রীজারীতে তাহা ১৮৬৬ সালের ২৮ এ সেপ্- "টেম্বর তারিখে বিক্রীত হয়।"

বিরোধীয় সম্পত্তি হরকুমারের পিতার সম্পত্তি ছিল বলিয়া, প্রতিবাদিগণ যে কখন স্বীকার করিয়াছে এমত কোন কথা নথীতে নাই, এবং এ প্রকার স্বীকারের অভাবে বাদীর কর্ত্তব্য ছিল যে, সে তাহার আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করে। অতএব অধঃস্থ জজ ভ্রমাত্মক রূপে অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, উহা হরকুমারের পিতার সম্পত্তি ছিল, অতএব তিনি উহা হরকুমারের সম্পত্তি বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কাজেই অকর্ম্মণ্য হইবে।

কিন্তু তাহা ছাড়াও দেখা যাইতেছে যে, অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি স্থির রাখা যাইতে পারে না। তিনি বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জমিদার-প্রতিবাদী যে বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিয়াছিল তাহা তাহার যথার্থই প্রাপ্য ছিল, এবং তিনি আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, জমিদারের সেরেস্তায় গৌরমণির নামই প্রজা বলিয়া রেজিষ্টরী-কৃত ছিল। এমত অবস্থায় যদি হরকুমার তাহার মাতা গৌরমণিকে আপন নাম জমিদারের সেরেস্তায় প্রজা বলিয়া রেজিষ্টরী করিতে দিয়া থাকে, তবে গৌরমণি রেজিষ্টরী-কৃত প্রজা হওয়ায় জমিদার ন্যায্য রূপেই বাকী খাজানার জন্য তাহার নামে নালিশ করিয়াছিল। এবং যেহেতু বাকী খাজানা যথার্থই প্রাপ্য ছিল, এবং নালিশও সরলান্তঃকরণে উপস্থিত হইয়াছিল, অতএব ডিক্রীজারীতে যে নীলাম হইয়াছে তাহা বাদীর বিরুদ্ধে প্রবল। প্রতিবাদী ঐ জমায় গৌরমণির স্বত্ব, অধিকার ও লাভ ক্রয় করে নাই, কিন্তু সে বাঙ্গালার কৌন্‌সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনের অন্তর্গত নীলামে ঐ জমাই ক্রয় করিয়াছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অধঃস্থ জজের রায় এই হেতুতেও ভ্রমাত্মক হইয়াছে।

আমি অধঃস্থ জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করত সকল খরচা সমেত প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখিব।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমারও ঐ মত

* * *

(গ)

৬ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৭০৫ নং মোকদ্দমা।

কোতলপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১৫ ই জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া পশ্চিম বর্দ্ধমানের জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গঙ্গানারায়ণ মৈত্রেয় ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

গদাধর চৌধুরী ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ভবানীচরণ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রামবিহারী ঘোষ ও পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—শারীরিক হানির দ্বারা যদি বাস্তবিক টাকার ক্ষতি হয়, তবে তাহার খেসারতের দাবীতে মানের হানির খেসারতভুক্ত থাকিলেও, ৫০০ টাকার ন্যূন হইলে, সমুদায় দাবীর নালিশই ছোট আদালতে চলিবে।

বিচারপতি হবহৌস।—খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল যে প্রাথমিক আপত্তি করিয়াছেন তদনুসারে আমাদের বিচার্য্য প্রশ্ন কেবল এই যে, এই নালিশ যে প্রকার উপস্থিত হইয়াছে তাহাতে ইহা ছোট আদালতের বিচার্য্য কি না, কারণ, তাহা হইলে দাবী ৫০০ টাকার ন্যূন বিধায় এই আদালতে খাস আপীল চলিতে পারে না।

নিম্নলিখিত অবস্থামতে, শারীরিক হানি হইয়াছে বলিয়া বাদী খেসারতের নালিশ করে। সে বলে যে, প্রতিবাদী তাহার নামে মিথ্যা করিয়া ডাকাইতীর অভিযোগ করে, এবং সেই মিথ্যা অভিযোগের হেতু সে কয়েক মাস পর্য্যন্ত ফৌজদারী কারাগারে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু সে তাহার পরে হাইকোর্টে খালাস হওয়ায় এইক্ষণে এই প্রকার খেসারতের দাবী করে, যথা—সে বলে যে, তাহার মানের হানির পরিমাণ ৭৫ টাকা, এবং তাহার শারীরিক হানির দ্বারা তাহার বাস্তবিক ১২০ টাকার ক্ষতি হইয়াছে; কারণ, সে বলে যে, সে এত মাস যাবৎ কারাবদ্ধ ছিল, এবং ঐ কয়েক মাসে তাহার পরিশ্রমের মূল্য তত টাকা হইত, এবং যেহেতু সে তাহার ঐ পরিশ্রমের ফল হারাইয়াছে, অতএব সে তজ্জন্য এই খেসারতের দাবী করে।

অতএব কারাগারে আবদ্ধ থাকাতেই তাহার শারীরিক হানি হইয়াছে; যদি সে কারাবদ্ধ না হইত, তাহা হইলে সে ১২০ টাকা উপার্জ্জন করিত, এবং সে কারাবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়াই সে ঐ টাকা হারাইয়াছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহার ঐ শারীরিক হানি হওয়াতেই সে ঐ টাকা হারাইয়াছে। ১৮৬৫ সালের ১১ আইনের ৬ ধারায় ব্যক্ত আছে যে, ৫০০ টাকার ন্যূন মুল্যের খেসারতের দাবী ছোট আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে, কিন্তু শারীরিক হানির দ্বারা টাকার ক্ষতি না হইলে সেই শারীরিক হানির জন্য কোন খেসারত পাওয়ার নালিশ ছোট আদালতে উপস্থিত হইবে না। ঐ বর্জ্জিত কথার বিপরীত কথা এই যে, যদি শারীরিক হানির দ্বারা টাকার ক্ষতি হইয়া থাকে, তবে খেসারতের দাবী সম্পূর্ণ ( আইনে তাহার ভাগের কথা বলে না ) ছোট আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে। অতএব আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই নালিশ এই প্রকারে হইয়াছিল যে, তাহা ছোট আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত, অতএব খেসারতের মুল্য ৫০০ টাকার ন্যূন বিধায় খাস আপীল চলিতে পারে না। খরচা সমেত এই আপীল ডিস্মিস্ হইল।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

( গ )

৬ ই মে, ১৮৭০।

## প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট এবং বিচারপতি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৮৬৪ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৬ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সেখ গোলাম আহোয়া ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

জয়মঙ্গল সিংহ ও আর এক ব্যক্তি ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মুন্সী মহম্মদ ইউছফ, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ক্ষেত্রনাথ বসু, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—সোফার স্বত্ব সাব্যস্ত করার মোকদ্দমায় বাদী বলে যে, প্রতিবাদিগণের অর্থাৎ বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে যে বিক্রয়-কবালা লিখিত পড়িত হইয়াছে, তাহাতে যে মুল্য লেখা আছে, তাহা প্রকৃত মুল্য নহে।

এই কথা সপ্রমাণ করার জন্য বাদীরই কিছু প্রমাণ দর্শান উচিত।

বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যে মুল্য অবধারিত হয়, তাহা বাদী দিলেই সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ হইবে, কিন্তু ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে এক বন্দোবস্ত হয় যে, ক্রেতা ঐ সম্পত্তির বন্ধক উদ্ধার করার জন্য ক্রয়-মুল্যের কতক টাকা তাহার নিজ হস্তে রাখিতে পারিবে, বাদী সেই বন্দোবস্তের উপকার লাভ করিতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—দেখা যাইতেছে যে, সোফার স্বত্বের দাবী করিয়া বাদী এক নালিশ উপস্থিত করে। সে বলে যে, ৩৪৫।/ টাকা ঐ সম্পত্তির প্রকৃত মুল্য, প্রতিবাদিগণের অর্থাৎ বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে কবালায় যে মুল্য লেখা আছে, তাহা প্রকৃত নহে। আমরা বিবেচনা করি যে, যদি সে এই কথা বলিয়া থাকে, তবে তাহার পোষকতায় তাহার কিছু প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল। সে এই কথার প্রমাণ না দিলে, তাহার অনুকূল নিষ্পত্তি পাইতে পারে না। ঐ কথা তাহার নালিশের একভাগ, অর্থাৎ তাহা এই যে, সে যাহা বলে তাহাই ঐ সম্পত্তির প্রকৃত মুল্য, এবং প্রতিবাদীরা যে মুল্যের কথা বলে, তাহা অসঙ্গত। প্রমাণ-ভার সম্বন্ধে যাবতীয় আইনের যুক্তি অনুসারেই ঐ কথার পোষকতায় কিছু প্রমাণ দেওয়া বাদীরই উচিত ছিল। তর্কবিতর্কে মোকদ্দমার যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে এবং বিক্রয়-কবালায় সম্পত্তির মুল্য অশুদ্ধরূপে লেখার সম্ভাবনা দৃষ্টে আমরা এমন কথা বলি না যে, বাদী অল্প প্রমাণ দিলে তাহা যথেষ্ট হইবে না এবং তদ্দ্বারা তাহা খণ্ডন করার জন্য প্রতিপক্ষের উপর প্রমাণ-ভার নিক্ষিপ্ত হইবে না; কিন্তু ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, বাদী কিছু না কিছু প্রমাণ দিতে বাধ্য ছিল। সে এইক্ষণে বলে যে, ৩৪৫।/০ টাকা মূল্য সম্বন্ধীয় ইসু আমি আমার অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার দাবী করি, কারণ, প্রতিবাদিগণ তাহার বিরুদ্ধ কোন কথা সপ্রমাণ করে নাই, অর্থাৎ তাহা 'নহে' বলিয়া, সপ্রমাণ করে নাই। আমাদের বিবেচনায়, এই তর্ক অকর্ম্মণ্য, অতএব আপীলের এই হেতু নিষ্ফল হইল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, তাহা উচিত সময়ে উত্থাপিত হয় নাই বলিয়া যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই তাহার প্রকৃত উত্তর হইয়াছে। বিক্রেতা ও ক্রেতার মধ্যে যে মুল্য অবধারিত হইয়াছে, এবং যাহা বন্ধক-মুক্ত সম্পত্তির মুল্য, তাহা দিলেই বাদী সম্পত্তি প্রাপ্ত হইতে স্বত্ববান্ হইবে। পরন্তু, দেখা যাইতেছে যে, পক্ষগণের মধ্যে এক বন্দোবস্তের দ্বারা তাহাই হইয়াছে, যাহা এই প্রকার ঘটনা সমস্তে সচরাচর হইয়া থাকে। বিক্রেতা নিজে সমুদায় মুল্য লইয়া নিজে বন্ধকী ঋণ পরিশোধ না করিয়া, ক্রয়-মুল্যের মধ্যে বন্ধক পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট টাকা ক্রেতার হস্তেই রাখিয়া দেয় যে, ক্রেতা নিজেই তাহা

পরিশোধ করিবে। ঐ পক্ষগণ ঐ প্রকার বন্দোবস্ত করিতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য এমন হইতে পারে না যে, বাদী যাহার কেবল সোফার স্বত্ব আছে, সে ব্যক্তিও ঐ বন্দোবস্তে স্বত্ববান্ হইবে। এবং এ স্থলে এমত হইতে পারে যে, বন্ধকী ঋণ পূর্ব্বেই পরিশোধিত হইয়া গিয়াছে, এবং সেই ঋণ পরিশোধ করার জন্য ক্রয়-মূল্য হইতে টাকা কর্ত্তন করিয়া রাখার বাদীর কোন হেতু নাই। যদি এতৎপূর্ব্বে যথাকালে এই প্রশ্ন উত্থিত হইত, তবে তদ্বিষয়ে এক উচিত ইসু নির্দ্ধারিত হইতে পারিত, এবং তাহা হইলে বাদী এইক্ষণে যে বন্দোবস্তের দাবী করে, তাহা করা আবশ্যক কি না, তাহা প্রদর্শিত হইতে পারিত। যদি এমত প্রদর্শিত হইত যে, তখনও বন্ধক বর্তমান ছিল, তবে তাহা পরিশোধ করার জন্য প্রতিবাদীর কিছু বন্দোবস্ত করার আবশ্যক হইত, এবং হয়ত সে ইহাতে সম্মত হইত; কিন্তু এইক্ষণে মোকদ্দমার যে অবস্থা, তাহাতে খাস আপীলের পোষকতার কোন হেতু নাই, অতএব তাহা খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল। (গ)

---

৬ ই মে, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ৯০ নং মোকদ্দমা।

হুগলীর অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২০ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

শম্ভুচন্দ্র হালদার, আপেলাণ্ট।

রামলাল ঘোষ, রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু প্রসন্নকুমার রায়, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও অভয়চরণ বসু, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—একতরফা ডিক্রীজারীর জন্য যে কোন পরওয়ানা নির্গত হউক, বিচারাদিষ্টদায়ীকে তাহার বিশেষ নোটিস দেওয়া আবশ্যকীয় নহে; সে দেঃ কার্য্য-বিধির ১১৯ ধারা-বর্ণিত প্রতিকার পাইতে ইচ্ছা করিলে, ঐ ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হওয়ার পরে ৩০ দিবসের মধ্যে আদালতে প্রার্থনা করিতে বাধ্য।

বিচারপতি গ্লবর।—এই মোকদ্দমায় রেস্পণ্ডেণ্ট আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী পায়। বিচারাদিষ্ট দায়ীর কোন নীলামের উদ্বর্ত্ত যে টাকা কালেক্টরের হস্তে ছিল তাহা ঐ ডিক্রী জারীতে ১৮৬৯ সালের ৯ ই জুলাই তারিখে ক্রোক হয়। তাহার পরের ২০ এ আগষ্ট তারিখে অর্থাৎ ক্রোকের ৩০ দিবস পরে, বিচারাদিষ্ট দায়ী তাহার উপরে সমন জারী হয় নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধ ডিক্রী অন্যথা করার জন্য দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১১৯ ধারামতে আদালতে দরখাস্ত করে, এবং ইহাও ব্যক্ত করার জন্য প্রার্থনা করে যে, যেহেতু সম্পত্তি ক্রোকের দ্বারা ডিক্রীজারীর নোটিস তাহার উপরে উচিতমত জারী হয় নাই, অতএব ক্রোক অবৈধ।

অধঃস্থ জজ ঐ দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ করেন। আমাদের সমক্ষে আপীলে কেবল এই আপত্তি হইয়াছে যে, ১১৯ ধারার ন্যায্য অর্থ করিলে, তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীর যে কোন পরওয়ানা হউক, তাহার বিশেষ নোটিস তাহাকে দেওয়া উচিত ছিল।

এ স্থলে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আইনের লিখিত ৩০ দিবসের মধ্যে আপেলাণ্ট উপস্থিত হয় নাই; এবং এই বিষয়ে ঐ ধারার বাক্য অতি সপষ্ট। তাহা এই যে, যদি কেহ একতরফা ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে চাহে, তবে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর কোন পরওয়ানা জারী হওয়ার পরে এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে। এবং ইহা আমার বিবেচনায়, অতি ন্যায্য বোধ হয়, কারণ, কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হইলেই এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ঐ ডিক্রী প্রদান করার পূর্ব্বে আদালত

দেওয়ানী কার্য্য-বিধির লিখিত নিয়মানুসারে যথেষ্ট রূপে জানিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তির উপরে উচিত রূপে সমন জারী হইয়াছিল এবং সমন পাইয়াও সে হাজীর হইতে এবং মোকদ্দমার জওয়াব দিতে ইচ্ছা করে নাই।

দ্বিতীয় আপত্তি, অর্থাৎ ডিক্রী জারীর জন্য যে পরওয়ানা জারী হয় তাহা এরূপ হইবে যে, বিচারাদিষ্ট দায়ী অবশ্যই তাহা জানিবে, এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ডিক্রী জারীর যে নানা প্রকারের পরওয়ানা জারী হয় তাহার মধ্যে ১১৯ ধারায় যে, কোন প্রভেদ করা হইয়াছে, এমত দৃষ্ট হয় না:—তাহা এমন পরওয়ানা হউক যদ্দ্বারা বিচারাদিষ্ট দায়ীকে অবশ্যই অবগত করা হয় যে, তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইল, অথবা এমন পরওয়ানাই হউক যাহা বিচারাদিষ্ট দায়ী না জানিতে পারে, আইনে "কোন পরওয়ানা" শব্দদ্বয় মাত্র লেখা আছে। এই মোকদ্দমায় ২৩৭ ধারা খাটে, এবং সেই ধারার মর্ম্মমতে, এই মোকদ্দমার ক্রোককৃত সম্পত্তি সম্বন্ধে আইনে যে এক মাত্র পরওয়ানার উল্লেখ আছে তাহা, যখন ক্রোকের নোটিস কলেক্টরের উপরে জারী হয়, তখনই জারী হইয়াছিল।

অতএব আমার বোধ হয় যে, যেহেতু কালেক্টরের হস্তে নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা ক্রোক হওয়ার পরে উচিত সময়ের মধ্যে বিচারাদিষ্ট দায়ী আদালতে উপস্থিত হয় নাই, অতএব তাহার এক্ষণে কোন উপায় নাই, এবং অধঃস্থ জজ বিশুদ্ধরূপই তাহার দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে; উকীলের ফীস ২ মোহর দেওয়া গেল।

**বিচারপতি হব্‌হোস।**—বিচারপতি প্রবর যে রায় ব্যক্ত করিলেন তদতিরিক্ত আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাহি। আমি দেখিতেছি যে, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আপত্তি হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় বিচারাদিষ্ট দায়ীর উপরে যে পরওয়ানা জারী হইয়াছে তদ্দ্বারা, তাহার বিরুদ্ধে যে ডিক্রী ছিল, তাহার কোন সংবাদ তাহাকে দেওয়া হয় নাই, এবং যদি তাহাই হয়, তবে আপেলাণ্টের উকীল তর্ক করেন যে, যেহেতু আদালতের পরওয়ানা দ্বারা ঐ প্রকার সংবাদ দেওয়াই ১১৯ ধারার অভিপ্রায়, এবং যেহেতু ঐ প্রকার সংবাদ দেওয়া হয় নাই, অতএব কথিত পরওয়ানার পরে ৩০ দিবসের মধ্যে দায়ী আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল না।

যদি এই তর্ক কর্ম্মণ্য হয়, তবে তাহা আরও বিস্তার করা যাইতে পারে, অর্থাৎ প্রতিবাদী কেবল পরওয়ানার পরে ৩০ দিবসের মধ্যে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য হইবে না, এমত নহে; সে ৯০ অথবা ১০০ দিবস, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই উপস্থিত হইতে বাধ্য হইবে না, কারণ, কথিত পরওয়ানার দ্বারা সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, আইনে যে, কেবল স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, ঐ প্রকার পরওয়ানা জারীর পরে ৩০ দিবসের মধ্যে দায়ীর হাজীর হইতে হইবে, এমত নহে, তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং এক ন্যায্য অনুমানের উপরেই লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ, এই অনুমান করিয়া তাহা লেখা হইয়াছে যে, দায়ীর বিরুদ্ধে যে ডিক্রী হইয়াছে তাহা দায়ী ঐ পরওয়ানার দ্বারা অবশ্যই অবগত হইয়া থাকিবে। ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে যে, এই আইনের ১১১ ধারায় দায়ীর রক্ষার জন্য যে বিধি আছে, ব্যবস্থাপক সমাজ ১১৯ ধারায় তদতিরিক্ত বিধান করিয়াছেন। ১১১ ধারার মর্ম্ম এই যে, যে পর্য্যন্ত আদালতের এমত প্রতীতি না জন্মে যে, প্রতিবাদীর উপরে সমন জারী হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হইতে পারিবে না। তদনন্তর, ১১৯ ধারায় লেখা আছে যে, একতরফা ডিক্রী হইলে বিচারাদিষ্ট দায়ীর রক্ষার আরও উপায় আছে, যদি সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে তাহার জন্য প্রার্থনা করে, এবং আপন দাবী সপ্রমাণ করিতে পারে। এবং আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে সকল পরওয়ানার ৩০ দিবসের মধ্যে একতরফা ডিক্রীর দায়ীর হাজীর হইতে হয়, তাহা দুষ্টব্যেই এমন পরওয়ানা যে, আমাদের অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে তদ্দ্বারা, দায়ীর বিরুদ্ধে কি কার্য্য হইতেছিল তাহার সংবাদ দায়ী পাইয়াছে, ঐ সকল পরওয়ানা তাহার শরীরের নচেৎ সম্পত্তির বিরুদ্ধ পরওয়ানা। যদি শরীর ক্রোক হয়, তবে নিঃসন্দেহই সে সংবাদ পায়; সেই রূপ, ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, লোকে সাধারণতঃ যে প্রকার, আপনার বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই প্রকার যে ব্যক্তি তাহার আপন সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহার সম্পত্তি ক্রোক হইলে সে অবশ্যই জানিতে পারে যে, তাহার বিরুদ্ধে কি কার্য্য হইতেছে। উপস্থিত মোকদ্দমায় ঐ যুক্তি প্রয়োগার্থে আমাদের ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, যে স্থলে বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি কালেক্টরের হস্তে ছিল সে স্থলে তৎপ্রতি অবশ্যই তাহার দৃষ্টি ছিল; অতএব যখন দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৩৭ ধারার লিখিত পরওয়ানা দ্বারা (কেবল ঐ পরওয়ানা দ্বারাই তাহা ক্রোক হইতে পারে) সেই সম্পত্তি ক্রোক হয়, তখন আমাদের ইহা অবশ্যই অনুমান করিতে হইবে যে, বিচারাদিষ্ট দায়ী তাহার সংবাদ পাইয়াছিল এবং আদালতে হাজীর হইতে এবং একতরফা ডিক্রীর বিরুদ্ধে জওয়াব দিতে তাহার ৩০ দিবস দীর্ঘ সময়ই ছিল। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, আপেলাণ্টের উকীলের তর্ক মতেও এই পরওয়ানা জারীর পরে ৩০ দিবসের মধ্যে আপেলাণ্ট হাজীর হইতে বাধ্য ছিল।

(গ)

৬ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

আসরফুন্নেছা বেগম, প্রার্থী।

সৈয়দ এনাএত হোসেন, প্রতিপক্ষ।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও বুধসেন সিংহ, প্রার্থীর উকীল।

মেং সি, গ্রেগরি ও মুন্সী মহম্মদ ইউছফ, প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—দুই হাম্‌কালেবের মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালত কর্ত্তৃক বাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পন্ন হওয়াতে, বাদী কেবল এক মোকদ্দমায় হাইকোর্টে আপীল করে, দ্বিতীয় মোকদ্দমার ৫০০ টাকার ন্যূন মূল্য বিধায় তাহার আপীল করিতে পারে না। হাইকোর্ট জজের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন, এবং জজ তাহাতে ঐ দ্বিতীয় মোকদ্দমায় তাঁহার যে ভ্রম হইয়াছিল তাহা সংশোধনার্থে ৯০ দিবসের পরে, কোন হেতু লিপিবদ্ধ না করিয়া পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করেন,—

এ স্থলে, জজ আইনের সমুদায় বিধান প্রতিপালন না করিয়া পুনর্ব্বিচারের হুকুম দিয়া থাকিলেও তাহা তাঁহার বিচারাধিকার-বহির্ভূত কার্য্য হয় নাই, এবং এই মোকদ্দমার বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে হাইকোর্ট সনন্দের ১৫ ধারানুযায়ী অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালন করা উচিত বোধ করেন না।

বিচারপতি বেলি।—আমার মত এই যে, খরচা সমেত এই রুল অগ্রাহ্য হইবে।

এই দরখাস্ত যাহা সনন্দের ১৫ ধারামতে দাখিল হইয়াছে, তাহার হেতু এই যে, যেহেতু বিলম্বের উৎকৃষ্ট কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হওয়ার কোন হেতু নিম্ন আদালত লিপিবদ্ধ না করিয়া ৯০ দিবসের পরে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব উহা তাঁহার বিচারাধিকার-বহির্ভূত কার্য্য হইয়াছে। উইক্লি রিপোর্টরের ১১ শ বালমের ২২ পৃষ্ঠার ১৮৬৮ সালের ১৮ নং জাবেতা আপীলের নিষ্পত্তি এই বলিয়া প্রদর্শিত

হইয়াছে যে, তাঁহাতে এই প্রকার কার্য্য বিচারাধিকার-বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। প্রথমতঃ, বক্তব্য এই যে, উহা জাবেতা আপীলের মোকদ্দমা ছিল; এ স্থলে সনন্দের ১৫ ধারানুযায়ী প্রার্থনা হইয়াছে। ১৫ ধারার অন্তর্গত দরখাস্ত সকলের বিচারে যে, অবশ্যই জাবেতা আপীলের নিষ্পত্তির অনুবর্ত্তী হইতে হইবে, কিম্বা এক খণ্ডাধিবেশনের এক জন বিচারপতির রায়ের সহিত আর এক খণ্ডাধিবেশনের রায় অনৈক্য হইলেই যে, মোকদ্দমা অবশ্যই পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে হইবে, এই যুক্তি আমি স্বীকার করিতে পারি না।

কথিত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় জজ বিচারাধিকার-বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন, কারণ, ৯০ দিবসের পরে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার যে সকল বিধান আছে, তাহা যে পর্য্যন্ত তিনি প্রতিপালন না করেন অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত তিনি ইহা লিপিবদ্ধ না করেন যে তাঁহার প্রতীতি হইয়াছে যে, বিলম্বের উৎকৃষ্ট হেতু আছে, সে পর্য্যন্ত তিনি পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত লইতে এবং মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না, অতএব তাঁহার বিচারাধিকার জন্মিয়াছিল না। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় নিম্ন আদালত আইনের সমুদায় বিধান পালন না করিলেও তাঁহার বিচারাধিকার ছিল। আইনের সকল বিধান পালন না করিলেই যে, জজের কার্য্য প্রত্যেক স্থলেই বিচারাধিকার-বহির্ভূত গণ্য হইবে, এমত নহে; এবং এই মোকদ্দমায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পক্ষগণের মধ্যে যে পাল্টা মোকদ্দমা সেই সময়ে চলিতেছিল, এবং সওয়াল-জওয়াবে যে সকল হেতু বর্ণিত হইয়াছে, অর্থাৎ এক মোকদ্দমায় হাইকোর্টের নিষ্পত্তি দ্বারা দ্বিতীয় মোকদ্দমার পক্ষগণের স্বত্বের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারে, নিম্ন আদালত এই সমস্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টি করিতে সক্ষম, এবং অনুমান করিতে হইবে যে, তিনি তদ্দৃষ্টেই পুনর্ব্বিচার গ্রহণের যথেষ্ট হেতু আছে বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এই আদালতের এক রূপ অনেক নজীরের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, যে সকল মোকদ্দমায় বিচারাধিকার থাকিলে জজ তাহা পরিচালন করিতে অস্বীকার করেন, অথবা বিচারাধিকার না থাকিলে তাহা পরিচালন করেন, কেবল সেই সকল মোকদ্দমায়ই সনন্দের ১৫ ধারার অন্তর্গত নালিশ উপস্থিত হইতে পারে। ঐ ধারামতে আমাদের তদতিরিক্ত ক্ষমতা নাই আমি এমত না বলিয়া, এই মাত্র বলিব যে, উপরোক্ত নজীর সমস্তের অনুসরণ করিয়া এবং এই মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় যে, জজ বিলম্বের যথেষ্ট হেতু থাকার বিষয়ে প্রতীত হওয়ার কোন হেতু লিপিবদ্ধ না করিয়া ৯০ দিবসের পরে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করাতে ঠিক কার্য্যবিধি অনুযায়ী কার্য্য না করিয়া থাকিলেও, তাহা তাঁহার বিচারাধিকার-বহির্ভূত কার্য্য হয় নাই। এবং ইহা এমন অন্য কোন ঘটনাও নহে যাহাতে আমরা সনন্দের ১৫ ধারা-প্রদত্ত অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারি।

আমি খরচা সমেত এই রুল অগ্রাহ্য করিলাম।

বিচারপতি মার্কবি।—আমিও বিবেচনা করি, এই রুল অগ্রাহ্য হইবে। এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সকল অসাধারণ। দুই হায়্কালেবের মোকদ্দমা হয়, যাহার এক মোকদ্দমা এনাএত হোসেন নামক এক ব্যক্তি, নজুমন্নেছার বিরুদ্ধ এক ডিক্রীজারীর নীলামে কোন মোসাহেরার স্বত্ব ক্রয় করিয়া তাহার বাকীর জন্য উপস্থিত করে; এবং দ্বিতীয় মোকদ্দমা যে ব্যক্তি ঐ মোসাহেরা পাওয়ার স্বত্ববান সে ঐ নীলাম অন্যথা করার জন্য উপস্থিত করে। জজ আপীলে ঐ দুই মোকদ্দমার যে প্রকার নিষ্পত্তি করেন তাহা এনাএত হোসেনের স্বত্বের বিরুদ্ধ। তাহাতে এনাএত হোসেন কেবল এক মোকদ্দমায় এই আদালতে আপীল করে; দ্বিতীয় মোকদ্দমার মূল্য ৫০০ টাকার ন্যূন বিধায় তাহার আপীল হইতে পারে নাই। যে মোকদ্দমায় আপীল হইয়াছিল তাহাতে এই আদালত জজের নিষ্পত্তি

অন্যথা করাতে দ্বিতীয় মোকদ্দমার রায়ে যে ভ্রম দৃষ্ট হইয়াছিল তাহা পুনর্ব্বিচারের দ্বারা সংশোধন করিবার জন্য জজ ৯০ দিবস অতীত হওয়া সত্ত্বেও এনাএত হোসেনকে সুযোগ প্রদান করেন। ১২ শ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১৫৪ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় বিচারপতি গ্লবর ও কেম্প যাহা করিয়াছিলেন, ঐ কার্য্য ঠিক তদনুরূপ কার্য্য। অধঃস্থ জজ পুনর্ব্বিচার গ্রহণের যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা আপীলে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত থাকিলে তাহা আমরা বিশুদ্ধ বলিতাম কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয়ের প্রতি যথেষ্ট সম্মান সহকারে বোধ হয়, আমি বলিতাম যে, জজের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ হয় নাই, কিন্তু তজ্জন্য আমরা সনন্দের ১৫ ধারা মতে আমাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিয়া উপস্থিত মোকদ্দমায় জজ যে হুকুম দিয়াছেন, তাহা অন্যথা করিতে পারি না। জজ কি পর্য্যন্ত অনিয়ম করিলে তাঁহার বিচারাধিকার বিলুপ্ত হয়, তাহা ঠিক বলা সুকঠিন, এবং তাঁহার বিচারাধিকারের কত দূর সীমা, তাহাও এই মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত করা অনাবশ্যক। বিচারপতি বেলি যেরূপ বলিয়াছেন তদ্রূপ, ঐ ১৫ ধারানুযায়ী ক্ষমতা পরিচালন সম্পূর্ণ রূপে আমাদের বিবেচনাধীন, এবং যে স্থলে দেখা যাইতেছে যে, হাইকোর্ট যাহা আইন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারেই জজ ঐ দুই মোকদ্দমার ঐক্য রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে স্থলে তৎপ্রতি আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

১১ শ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২২ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় বিচারপতি হব্‌হৌস যে এমত নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে যে, যে কোন ভাবেই হউক এমত বলা যাইতে পারে যে, এই হুকুম বিচারাধিকারাভাবে প্রদত্ত হইয়াছে; তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না।

৬ ই মে, ১৮৭০।

## প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ নাইট এবং বিচারপতি এফ, বি, কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৮০৬ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩ রা মার্চের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ১৮ ই জুন তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মল্লিক করীম বক্‌স (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

হরিহর মন্দর ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি, গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ব্যবহারের স্বত্ব সংস্থাপনার্থে এক নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ভোগ সপ্রমাণ করা আবশ্যকীয় নহে। যদি এই নির্দ্দিষ্ট হইয়া ঐ স্বত্ব সাব্যস্ত হয় যে, তাহা দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া আসিয়াছে, তবে ঐ নির্দ্দেশের প্রতি আইনঘটিত কোন দোষ বর্ত্তিতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—এই মোকদ্দমায় আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দীর্ঘ কাল যাবৎ ভোগ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং বাদী তাহার জল ব্যবহার করার স্বত্ব সংস্থাপন করিয়াছে। "দীর্ঘকাল যাবৎ" শব্দগুলির দ্বারা এত দীর্ঘকাল আমাদের বুঝিতে হইবে যাহাতে ঐ স্বত্ব থাকার বিষয়ে আদালতের প্রতীতি জন্মিয়াছে। এই প্রকার স্বত্ব থাকার কথা সাব্যস্ত করার জন্য এক নির্দ্দিষ্ট কালের ভোগ আবশ্যকীয় নহে। আদালতের এই দেখিতে হইবে যে, এত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে কি না, যদ্দ্বারা স্বত্ব জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হইতে পারে। আমি যত দূর অবগত আছি তাহাতে ভারতবর্ষের এই ভাগ সম্বন্ধে নজীর সমস্তে ইহার অতিরিক্ত কোন

বিধান নাই। কোন নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত ব্যবহারের প্রমাণ থাকিলে জজ সেই স্বত্ব আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য কি না, সেই প্রশ্নের সহিত জজ ব্যবহারের স্বত্ব থাকার কথা নির্দ্দেশ করিলে সেই নির্দ্দেশ ন্যায্য হইয়াছে কি না, এই প্রশ্নের অনেক প্রভেদ আছে। ব্যবহারের স্বত্ব সংস্থাপন করার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভোগ সপ্রমাণ করা আবশ্যক, আইনের এমন কোন বিধি নাই, অতএব এই মোকদ্দমায় যে স্থলে নিম্ন আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, অতি দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে, সে স্থলে ঐ নির্দ্দেশের প্রতি কোন আইন-ঘটিত দোষ বর্ত্তে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বাদী তাহার আরজীতে বলে যে, জল ব্যবহার করিতে তাহার যে স্বত্ব আছে, এক বাঁধ প্রস্তুত হওয়াতে তাহা তাহার ভোগ করার ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। নিম্ন আদালতদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পক্ষগণের যে স্বত্ব ছিল তাহা এই যে, প্রতিবাদী জল ব্যবহার করিবে, এবং তাহার পরে বাদীর তাহা ব্যবহার করার স্বত্ব থাকিবে। মুন্সেফের ডিক্রীর ঐ ভাবই নিম্ন আপীল-আদালত গ্রহণ করিয়াছেন। কোন কোন সময়ে এই ডিক্রী প্রতিপালন করা কঠিন হইতে পারে, এবং প্রতিবাদী যে স্বত্বে স্বত্ববান তদতিরিক্ত স্বত্ব সে পরিচালন করিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে সময়ে সময়ে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা এইরূপ ঘটনার এবং পক্ষগণের স্বত্বের আনুষঙ্গিক। প্রতিবাদী যে পরিমাণে জল ব্যবহার করিতে স্বত্ববান, সে যদি কখন তদতিরিক্ত জল ব্যবহার করত বাদীর স্বত্বের হানি করে, তবে সেই কথা আর এক মোকদ্দমায় বিচারিত হইবে। আমি ভরসা করি যে, এইক্ষণে স্বত্ব ব্যক্ত হওয়াতে পক্ষগণ এমন রূপে তাহা পরিচালন করিবে যে, তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে আর মোকদ্দমা না হয়।

এইক্ষণে আর এই প্রশ্ন বিচার্য্য আছে যে, অধঃস্থ জজ মুন্সেফের রায়ের যে অর্থ করিয়াছেন, মুন্সেফের রায় সেই অর্থে স্থির রাখা উচিত কি না। অধঃস্থ জজ বলেন যে, "আমি আপীল-" "ডিস্‌মিস্ করিলাম, এবং আমি মুন্সেফের নিষ্প-" "ত্তির যে অর্থ করিলাম সেই অর্থে আমি তাহা" "স্থির রাখিলাম।" তিনি যে প্রকার মুন্সেফের ডিক্রীর অর্থ করিয়াছেন বলেন, সেইরূপে মুন্সেফের ডিক্রী সংশোধন করিলে ভাল হইত, কারণ, তাহা হইলে পক্ষগণের স্বত্ব আরও নিশ্চিত ও নির্দ্দিষ্ট রূপে ব্যক্ত হইত। কিন্তু তিনি প্রথম আদালতের ডিক্রীর যে অর্থ করিয়াছেন তদনুসারে তাঁহার ডিক্রী সংশোধন করার জন্য পক্ষগণ তাঁহার নিকট দরখাস্ত করিতে পারে। এই বিষয়ে খাস আপীলের কোন আবশ্যক ছিল না, অতএব এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে। (গ)

---

৮ ই মে, ১৮৭০।

### বিচারপতি জে পি নর্ম্যান এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৬৮ নং মোকদ্দমা।

গৌলমীনের রেকর্ডরের ১৮৬৯ সালের ১১ ই আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

ঙ্গা থাইয়া (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

মী খাঁ মোন্ (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং ডব্লিউ এ মণ্টিও, আপেলাণ্টের বারিষ্টর।

মেং এস্ বর্টানেস, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহ এবং বণ্টনের জন্য তাহার কোন দায়াদ নালিশ করিয়া মৃত ব্যক্তির সমুদায় অস্থাবর সম্পত্তির নিকাশ চাহিতে পারে, এবং যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি অন্যায় রূপে আত্মসাৎ করে তাহার হস্তে ঐ দায়াদ সেই সম্পত্তি ধৃত করিতে পারে। আর এক জন দায়াদ ১৮৬০ সালের ২৭ আইনানুযায়ী সার্টিফিকেট পাইয়াছে বলিয়াই, ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না।

যে ব্যক্তির অজ্ঞাতে কোন দাবীর অথবা

বিরোধীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ তদন্ত ও নিষ্পত্তি হইতে পারে না, অথবা যাহাকে মোকদ্দমায় যোগ করিলে বিরোধীয় বিষয়ের তদন্ত ও নিষ্পত্তির ফলের দ্বারা তাহার স্বত্বের ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভব, এমন সকল ব্যক্তিকেই আদালত দেঃ কাঃ বিধির ৭৩ ধারা মতে বাদী অথবা প্রতিবাদীর শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন।

বিচারপতি নর্ম্যান।—ঙ্গা থায়ের সম্পত্তির সরবরাহ ও বণ্টনের জন্য, মী খু উ নাম্নী তাহার এক বিধবা স্ত্রী যে ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট পায় তাহার বিরুদ্ধে বাদিনী অর্থাৎ ঙ্গা থায়ের আর এক বিধবা স্ত্রী এই নালিশ উপস্থিত করে।

রেকর্ডর নির্দ্দেশ করেন যে, ঙ্গা থায়ের মৃত্যুর পরে প্রতিবাদিনী মী খু উর হস্তে ঙ্গা থায়ের যে সম্পত্তি আইসে তাহা৩১৬ খানা সাগুন কাষ্ঠ, এবং বাদিনী ঙ্গা থায়ের এক বিধবা স্ত্রী সূত্রে তাহার অর্দ্ধাংশে স্বত্ববতী, এবং দাখিলী হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, ঐ সম্পত্তির অধিক ভাগ মী খু উর এজেণ্ট স্বরূপ ঙ্গা থাইয়ার হস্তে আসিয়া বিলি হইয়া গিয়াছে।

ঙ্গা থাইয়াকে সহ-প্রতিবাদী করার জন্য রেকর্ডর হুকুম দেন।

ঙ্গা থাইয়া হাজীর হইয়া তাহার উকীলের দ্বারা তর্ক করে যে, সে মী খু উর এজেণ্ট, অতএব তাহার নিকট ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট নিকাশ দিতে সে দায়ী নহে।

রেকর্ডর এই আপত্তি অগ্রাহ্য করেন। মোকদ্দমা চলে, এবং রেকর্ডর সিদ্ধান্ত করেন যে, ঙ্গা মাহজীন অথবা মুং শোং নাইর দ্বারা মেং হ্যানের নিকট ঐ কাষ্ঠ বিক্রয় হইয়া যে ১০১২৮ টাকা বাস্তবিক আদায় হয়, তাহার নিকাশের জন্য ঙ্গা থাইয়া দায়ী। এই টাকা হইতে ঙ্গা থাইয়ার ইষ্টেটের বাবতে ৪০৩১।/০ ন্যায্য রূপে ব্যয় হইয়াছে, এবং ঐ বাবতে ২৪৪৩ টাকা মী খু উকে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া তাহা রেকর্ডর বাদ দেন, এবং বাকী ৩৬৫১৷৷/ টাকা আদালতে দাখিল করার জন্য ঙ্গা থাইয়ার প্রতি হুকুম প্রদান করেন।

এই ডিক্রী যত দূর ঙ্গা থাইয়ার সম্বন্ধে খাটে তত দূর সে তদ্বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে।

মণ্টিও সাহেবের প্রথম আপত্তি এই যে, ঙ্গা থাইয়াকে প্রতিবাদীর শ্রেণী-ভুক্ত করা রেকর্ডরের অনুচিত হইয়াছে, কারণ, সে, যে মী খু উ ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের অন্তর্গত সার্টিফিকেট পাইয়াছে, তাহার এজেণ্ট বিধায় কেবল তাহারই নিকটে নিকাশের দায়ী, এবং সে বাস্তবিক নিকাশ দিয়াছে।

কিন্তু ঙ্গা থাইয়া কেবল এজেণ্ট নহে। এজেণ্ট বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ করা হয় নাই। বাদিনী তাহাকে এজেণ্ট স্বরূপ দায়ী করিতে চাহে না। যে কাষ্ঠের গুঁড়ী সমস্ত মৃত ব্যক্তির প্রায় সমুদায় সম্পত্তি ছিল, তাহা ঙ্গা থাইয়ার হস্তগত হয়। যদি রেকর্ডরের নির্দ্দেশ বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে ঙ্গা থাইয়ার মনিব অর্থাৎ সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত মী খু উ তাহার প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহার সে অপব্যবহার করিয়াছে, এবং মুং শোং নাইয়ের নামে এক মিথ্যা বিক্রয় করিয়া মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির কাষ্ঠ সকল শঠতা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছে।

মেং মণ্টিও তাহার পরে তর্ক করেন যে, কোন সম্পত্তির সরবরাহের জন্য কোন অছি বা সরবরাহকারের বিরুদ্ধ নালিশে, যে সকল ব্যক্তি নিজে অথবা অছিদিগের অনুমতিক্রমে অনুচিত রূপে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি হস্তগত করে, তাহাদের সহিত স্বত্বাভিষিক্ত ব্যক্তির যোগ-সাজস করা অথবা স্বত্বাভিষিক্ত ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া প্রদর্শিত না হইলে, তাহাদিগকে সহ-প্রতিবাদী করা যাইতে পারে না। তিনি বলেন যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহের জন্য উত্তমর্ণ অথবা মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে দানপ্রাপকগণ যে নালিশ করে, তাহাতে একজেকিউটরের এজেণ্টকে

একজিকিউটরের সহিত সে যে সকল কার্য্য করে, তাহার নিকাশের জন্য দায়ী করিলে অত্যন্ত অন্যায় হইবে, এবং উপস্থিত মোকদ্দমায় কোন দোষারোপ হয় নাই, এবং এমত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই যে, মী খু উ সরলান্তঃকরণে ঙ্গা থাইয়ার সহিত কার্য্য করে নাই।

প্রথমতঃ, আমাদের বক্তব্য এই যে, সহ-দায়াদগণের মধ্যে যে এক জন ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেট ও প্রাপ্য আদায় করার ক্ষমতা পায়, তাহার অবস্থার সহিত ইংলণ্ডীয় আইনের অন্তর্গত একজেকিউটর অথবা সরবরাহকারের অবস্থার প্রভেদ আছে। একজেকিউটর উইলকর্ত্তার এবং তাহার সম্পত্তির সম্পূর্ণ প্রতিনিধি।

অস্থাবর সম্পত্তিতে একজেকিউটরের আইনানুগত স্বত্ব আছে। কিন্তু যে ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, সে মৃত ব্যক্তির দায়াধিকারী সূত্রে পূর্ব্বেই যে সম্পত্তি পায় তাহা ভিন্ন ইষ্টেটের অন্য কোন সম্পত্তিতে অথবা উপস্বত্বে স্বত্ববান হয় না। সে ব্যক্তি সার্টিফিকেটের দ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় করিয়া রসীদ দেওয়ার ক্ষমতা ভিন্ন আর কোন প্রকারে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না।

যে ব্যক্তি সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়, সে এমন অবস্থান্বিত হয় না যে, তদ্ধেতু মৃত ব্যক্তির উত্তমর্ণ অথবা দায়াধিকারীর প্রথমে তাহার নিকটেই আসিতে হইবে, অথবা সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তে ভিন্ন অন্য যে কোন ব্যক্তির হস্তে ঐ উত্তমর্ণ অথবা দায়াধিকারী মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি পায় তাহার নিকট তাহারা তাহা ধৃত করিতে পারিবে না।

*　　*　　*

আমরা বিবেচনা করি যে, উপস্থিত মোকদ্দমা মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহ এবং বণ্টনের জন্য উপস্থিত হওয়ায় এই প্রকার মোকদ্দমায় বাদিনী সমুদায় অস্থাবর সম্পত্তির নিকাশ পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আমরা বিবেচনা করি যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যে কেহ অন্যায় রূপে আত্মসাৎ করে, তাহার হস্তেই মৃত ব্যক্তির কোন দায়াধিকারী তাহা ধৃত করিতে পারে, এবং সেই স্বত্ব সার্টিফিকেটের দ্বারা বিলুপ্ত হয় না, কারণ, ৪ ধারামতে ঐ সার্টিফিকেট কেবল মৃত ব্যক্তির ঋণীদিগের বিরুদ্ধে এবং যে সকল ঋণী সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তির হস্তে ঋণ পরিশোধ করে, তাহাদের অনুকূলেই চূড়ান্ত। সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যে কার্য্য করে তদ্দ্বারা ঐ স্বত্ব বিনষ্ট হইতে পারে না। অতএব এই প্রকার মোকদ্দমা যাহা ১৮৬০ সালের ২৭ আইনানুযায়ী সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে যে ব্যক্তি সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তির সম্মতিক্রমে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি অন্যায় রূপে হস্তগত এবং আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাকে বাদিনী সহ-প্রতিবাদী করিতে পারে।

অতঃপর মেং মণ্টিও যে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহা এই যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৩ ধারায় আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই, যদ্দ্বারা তিনি নথীতে এক নূতন নিকাশ-দাতাকে সহ-প্রতিবাদী করিতে পারেন।

আমি বিবেচনা করি যে, "বিরোধীয় বিষয়ে "যে সকল ব্যক্তি স্বত্ববান্ হইতে পারে, অথবা "যাহারা তাহার কোন ভাগের অথবা স্বত্বের "দাবী করে, অথবা নিষ্পত্তির ফলের দ্বারা "যাহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে" এই শব্দগুলির ব্যাপক অর্থ করিতে হইবে। আমি তাহার এই রূপ অর্থ করি যে, যে কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে বিরোধীয় বিষয়ের অথবা বাদীর দাবীর সম্পূর্ণ তদন্ত ও মীমাংসা হইতে পারে না, আদালত এমন সকল ব্যক্তিকেই বাদী অথবা প্রতিবাদীর শ্রেণী-ভুক্ত করিতে পারেন। আমি বিবেচনা করি যে, "নিষ্পত্তির ফলের দ্বারা যাহাদের ক্ষতিবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে," এই বাক্যের এই প্রকার অর্থ করা যাইতে

পারে যে, যদি তাহাদিগকে মোকদ্দমার পক্ষ করা যায়, তবে মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়ের তদন্তের ও নিষ্পত্তির ফলের দ্বারা তাহাদের ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইহাতেই দেখা যায় যে, উইক্‌লি রিপোর্টরের ৮ ম বালমের ২০২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত জয়গোবিন্দ দাস বনাম গৌরীপ্রসাদ সাহার মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ন্যায় নিষ্পত্তি সমস্ত প্রয়োগ হয় না, কারণ, সেই মোকদ্দমায় যে ব্যক্তিকে সহ-প্রতিবাদী করা হইয়াছিল, সে বাদী এবং মুল প্রতিবাদী উভয় ব্যক্তিরই বিরুদ্ধে দাবী করিয়াছিল, সুতরাং বাদী ও মুল প্রতিবাদীর মধ্যে যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা হইত, তদ্দ্বারা তাহার স্বার্থের ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে পারিত না।

এক অর্থে, এমত কথিত হইতে পারে যে, যে ব্যক্তি কোন মোকদ্দমার পক্ষ নহে, সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দ্বারা তাহার কোন হানি হইতে পারে না।

উপস্থিত মোকদ্দমায় জমা থায়ের সম্পত্তির নিকাশ ও বণ্টনের জন্য নালিশ হয়। প্রতিবাদী বলে যে, সম্পত্তির কতক কাষ্ঠের সে যথোচিত হিসাব দিয়াছে। বাদিনী কহে যে, প্রতিবাদী তাহা আত্মসাৎ করিয়াছে, অতএব সে তাহার মুল্যের হিসাব দিতে বাধ্য। আমি বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদী কাষ্ঠ হস্তগত করাতে এবং সে তাহার হিসাব দিয়াছে, এই কথা বলাতেই মোকদ্দমায় তাহার এমন স্বার্থ জন্মিয়াছে যে, রেকর্ডর ৭৩ ধারামতে ন্যায্যরূপেই তাহাকে প্রতিবাদী করিতে পারেন।

কিন্তু যদি তাহা না হয়, এবং আমি ৭৩ ধারার যে অর্থ করিলাম সেই অর্থ যদি বিশুদ্ধ না হয়, তথাপি প্রতিবাদীকে এক অন্যায় হুকুমের দ্বারা মোকদ্দমার পক্ষ করা হইয়াছে। তাহাকে সমন করা হইয়াছে, এবং সে তাহার জওয়াব দিয়াছে, এবং সম্পূর্ণ বিচারের পরে তাহার প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হইয়াছে।

মোকদ্দমায় যে সময়ে তাহাকে প্রতিবাদী করা হয়, সেই সময়ে তাহাকে প্রতিবাদী করাতে ভ্রম হইয়া থাকিলেও, ৩৫০ ধারা দৃষ্টে আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেই অনিয়মহেতু আমাদের ঐ ডিক্রী অন্যথা করা উচিত।

দোষগুণ সম্বন্ধে মোকদ্দমা অতি সরল। প্রতিবাদী জমা থাইয়া যে শঠতাচরণ করিয়াছে, বাদিনী তাহা বিস্তারিতরূপে জানিতে না পারাতেই সম্পূর্ণ প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারে নাই। * * *

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমি সম্মত হইলাম। (গ)

৯ ই মে, ১৮৭০।

**প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট এবং বিচারপতি এফ, বি, কেম্প।**

১৮৬৯ সালের ২৮৩৪ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ২১ এ আগস্টের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কেবল সাহু (বাদী) আপেলাণ্ট।

রামনারায়ণ সিংহ ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু নীলমাধব সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—যদি এমন সর্তে এক পাট্টা দেওয়া হয় যে, পাট্টা-দাতা পাট্টা-গৃহীতার নিকট যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাহা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত পাট্টা-গৃহীতা ভূমিতে দখীলকার থাকিবে, তবে পাট্টা-দাতা বন্ধক-দাতার অবস্থাস্থিত হয়, এবং যত টাকার প্রতিভূ দেওয়া হয়, পাট্টা-গৃহীতা তাহার পরিমাণে বন্ধক-গৃহীতা হয়; কিন্তু পাট্টা-গৃহীতা সেই সম্পত্তি সাধারণ বন্ধকী-সম্পত্তির ন্যায় বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না।

**প্রধান বিচারপতি কাউচ।**—এই মোকদ্দমার পাট্টা দ্বারা বাদীকে ক্ষমতা দেওয়া হয় যে, যে পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য টাকা পরিশোধিত

না হয়, সে পর্য্যন্ত সে ভূমিতে দখীলকার থাকিবে, কিন্তু সে তাহা এই নালিশের দ্বারা চাহে না। সে এই চাহে যে, সাধারণ বন্ধকের ন্যায় এই সম্পত্তি ঐ বন্ধকের দায়ে বিক্রীত হইবে। যদিও ইহা সত্য বটে যে, এই সকল পাট্টা আদালতের দ্বারা উপস্বত্ত্ব-ভোগী বন্ধকের ন্যায় বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে, এবং পক্ষগণের মধ্যে কতক দূর বন্ধক-দাতা ও বন্ধক-গৃহীতার স্বত্ত্ব আছে; তথাপি এই প্রকার মোকদ্দমায় পাট্টা-গৃহীতা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইতে স্বত্ত্ববান্ হইতে পারে না। তাহা হইলে, পাট্টা-গৃহীতা যে প্রতিভূ লওয়ার সর্ত্ত করে, তাহা হইতে তাহাকে অধিক দেওয়া হইবে। এই প্রকার মোকদ্দমায় আদালত সমস্ত এই পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পক্ষগণকে কেবল পাট্টা-দাতা এবং পাট্টা-গৃহীতা বিবেচনা করা যাইবে না, তাহাদিগকে বন্ধক-দাতা ও বন্ধক-গৃহীতা বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ, টাকা পরিশোধ করার প্রতিভূ স্বরূপ পাট্টা প্রদত্ত হয়। ইহার দ্বারা পাট্টা-দাতা বন্ধক-দাতার স্বত্ত্ব প্রাপ্ত হয় ও বন্ধক-দাতার অবস্থান্বিত হয়, এবং প্রতিভূর পরিমাণ পর্য্যন্ত পাট্টা-গৃহীতা বন্ধক-গৃহীতার স্বত্ত্বে স্বত্ত্ববান্ ও দায়ে দায়ী হয়। কিন্তু এইক্ষণে বাদী যাহা চাহে, তাহা তদতিরিক্ত। আমরা বিবেচনা করি, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তিই বিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং বাদী এই মোকদ্দমায় যে ডিক্রী চাহে, তাহা সে পাইতে পারে না।

আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

(গ)

---

৯ ই মে, ১৮৭০।

## প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ নাইট এবং বিচারপতি এফ, বি, কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৮৮৮ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ২৪ এ সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

দুলাল বিবী (এক জন প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

নাদা সাহা (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীনাথ দাস আপেলাণ্টের উকীল।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর ও বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন জারী থাকার কালে যদি কোন বিক্রয়-কবালা লিখিতপড়িত হইয়া রেজিষ্টরীকৃত না হয়, এবং যাহার বরাবর তাহা লেখা হয় তাহাকে তল্লিখিত স্বত্ত্ব প্রদানার্থে তাহা যদি বৈধ দলীল হয়, তবে তাহা ১৮৬৪ সালের অথবা ১৮৬৬ সালের রেজিষ্টরী আইন প্রচলিত হওয়ার পরে ১ বৎসরের মধ্যে রেজিষ্টরী করান হয় নাই বলিয়াই অবৈধ বা অসিদ্ধ হইতে পারে না; অথবা ঐ দুই আইন মতে পশ্চাতে অন্য কোন কবালা লিখিত ও রেজিষ্টরীকৃত হইয়াছে বলিয়া এই রেজিষ্টরীকৃত কবালা-গৃহীতার স্বত্ব অগ্রগণ্য হইতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—এই মোকদ্দমার প্রথম প্রশ্ন ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৪৯ ও ১০০ ধারার অর্থের উপরে নির্ভর করে। ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন প্রচলিত থাকার কালে বাদীর বিক্রয়-কবালা হইয়াছিল, এবং ঐ আইনানুসারে তাহা রেজিষ্টরী করার আবশ্যক ছিল না। আইনমতে রেজিষ্টরী না হওয়ার ফল এই যে, তাহার পশ্চাতের কোন কবালা রেজিষ্টরী হইলে তাহা অগ্রগণ্য হইবে; কিন্তু তৎকালে এমন কোন আইন ছিল না যদনুসারে বাদীর বিক্রয়-কবালা বৈধ করণার্থে তাহা রেজিষ্টরী করা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। ১৮৬৬ সালের ২০ আইন জারী হওয়ার পরে প্রতিবাদীর কবালা লিখিতপড়িত হয়। এই আইনের ৪৯ ধারায়

লেখা আছে যে, ১৭ ধারায় যে সকল দলীল রেজিষ্টরী করার বিধান আছে তাহা এই আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী না হইলে, কোন আদালতে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে না, অথবা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধিতে বর্ণিত কোন সরকারী কর্ম্মচারী তদ্দৃষ্টে কার্য্য করিবেন না, অথবা তদ্দ্বারা তল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্বের কোন ব্যতিক্রম হইবে না। বাদীর বিক্রয়-কবালা যদি ১৭ ধারার অন্তর্গত না হয়, তবে ৪৯ ধারার বিধানে তাহার ক্ষতি করিতে পারে না, কিন্তু তাহা ১৭ ধারার মধ্যে আইসে না, কারণ, যে সকল সম্পত্তি কোন জেলার মধ্যস্থিত, এবং যে তারিখে ১৮৬৪ অথবা ১৮৬৬ সালের আইন প্রচলিত হয় তাহার পরে যে সকল দলীল লিখিতপড়িত হয়, কেবল সেই সম্পত্তি এবং সেই দলীল সম্বন্ধেই ঐ ধারা খাটে।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই আইনের ১০০ ধারায় কোন বিধান না থাকিলে তাহার অন্য কোন স্থানে এমন বিধান নাই যে, বাদীর কবালা রেজিষ্টরী না হওয়াতেই তাহা অবৈধ হইবে, অথবা তদ্দ্বারা তল্লিখিত সম্পত্তির স্বত্ব প্রদত্ত হইবে না। এই আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল দলীল লিখিতপড়িত হইয়াছিল তাহা রেজিষ্টরী করাইবার জন্য ঐ আইনের ১০০ ধারায় লোককে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে বলে যে, ঐ প্রকারের দলীল যাহা এই আইন প্রচলিত হওয়ার তারিখের পূর্ব্বে লিখিতপড়িত হইয়াছে তাহা ঐ তারিখের পরে ১২ মাসের মধ্যে রেজিষ্টরীর জন্য উচিত রূপে দাখিল হইলে, রেজিষ্টরী করণার্থে গৃহীত হইবে, কিন্তু এমন কোন বিধান নাই যে, তাহা রেজিষ্টরী না হইলে কোন রূপ অবৈধ হইবে, অথবা পক্ষগণ ঐ সকল দলীল দ্বারা যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা কোন প্রকারে ন্যূন হইয়া যাইবে, অথবা তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারিবে। এই সকল ধারায় আমি এমন নির্দ্দেশ করার কোন কারণ দেখি না যে, যে দলীল ১৮৬৪ সালের আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে লিখিতপড়িত হইয়াছে এবং যাহা যে ব্যক্তির বরাবর লিখিত হইয়াছে তাহাকে তল্লিখিত স্বত্ব প্রদান করার জন্য বৈধ দলীল হইয়াছিল, তাহা সেই ব্যক্তি ১২ মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী করায় নাই বলিয়াই অসিদ্ধ হইবে, অথবা আর এক ব্যক্তি আর এক খানা কবালা লিখাইয়া লইয়া তাহা রেজিষ্টরী করিয়াছে বলিয়াই, যে ব্যক্তির দলীল ঐ প্রকার রেজিষ্টরী হয় নাই তাহার অগ্রগণ্য হইবে। আমি ঐ সকল আইনের সমুদায় ধারা দৃষ্টি করিয়া এই মত স্থির করিয়াছি, এবং আমি দেখিতেছি যে, এই আদালতের অনেক নিষ্পত্তির সহিতও তাহা ঐক্য। এই সকল নজীর (যাহা আমার স্পষ্ট বিরুদ্ধ মত না হইলে আমি অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি) দৃষ্টে এবং ঐ সকল ধারা সম্বন্ধে আমার নিজের রায় অনুসারে আমি বিবেচনা করি যে, খাস আপেলাণ্টের আপত্তি এককালে অকর্ম্মণ্য এবং এই বিষয়ে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি যে ভ্রমাত্মক হইয়াছে, এমন নির্দ্দেশের কোন হেতু নাই।

আর একটি আপত্তি অর্থাৎ বাদীর বিক্রয়-কবালার লিখিত ভূমি প্রতিবাদিগণের দখলী ভূমির সহিত অনন্য কি না তাহার তদন্ত করা উচিত ছিল, এতৎসম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমার ভাব এবং তাহা যে প্রকারে চলিয়াছে তদ্দৃষ্টে ঐ বিষয় খাস আপীলে উত্থিত হয় না। আমি স্পষ্ট দেখিতেছি যে, পক্ষগণের মধ্যে মূল প্রশ্ন এই হয় যে, দুই বিক্রয়-কবালার মধ্যে কোন্‌টি অগ্রগণ্য হইবে। ভূমির দখল পাওয়ার জন্য নালিশ উপস্থিত হয় এবং ডিক্রী কেবল ভূমির দখলের জন্যই হয়, এবং ঐ ভূমি পক্ষগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির সম্পত্তি তাহাই বাস্তবিক বিচার্য্য প্রশ্ন। এই কথা লইয়াই তাহারা প্রথম হইতে বিরোধ করিয়াছে

এবং এই কথার উপরেই নিম্ন আপীল-আদালতে স্পষ্ট নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

আমি দেখিতেছি যে, বাস্তবিক বেদখল হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন ন্যায্য ও উচিত রূপে উত্থিত হয় নাই এবং তাহা এমন ভাবের কথাও নহে যে, তাহার বিচারের জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান আমাদের উচিত হইতে পারে।

একবার স্বত্ব সাব্যস্ত হওয়ায়, ভূমির দখলের ডিক্রী, মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে, এবং রেজিষ্টরী আইনমতে বিক্রয়-কবালাদ্বয়ের ফল সম্বন্ধে উচিত রূপেই প্রদত্ত হইয়াছে। আমি এমত নির্দ্দেশ করিবার কোন কারণ দেখি না যে, নিম্ন আদালতের ঐ নিষ্পত্তির প্রতি এই আদালতের খাস আপীলে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

(গ)

১০ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডব্‌লিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২৯৪৯ নং মোকদ্দমা।

তাজপুরের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ মার্চের নিষ্পত্তি রূপান্তর করত ত্রিহুতের জজ ১৮৬৯ সালের ২৪ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সেখ আহমেদুল্লা ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদিগণের মধ্যে দুই জন) আপেলাণ্ট।

সাহ আসরফ্ হোসেন প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, ই, টুইডেল ও সি গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও কালীমোহন দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—এক এজমালী ও অবিভক্ত সম্পত্তির ঘরাও বিভাগ হইয়া এক শরীক তাহার অংশের ৪ বিঘা ভূমির মোকররী পাট্টা দেয়। পরে, পক্ষগণের দরখাস্তমতে কালেক্টর যে বাটোয়ারা করেন, তাহাতে ঐ মোকররী ভূমির মধ্যে দুই বিঘা ভূমি অন্য এক জন শরীকের হিস্যায় পড়ে, কিন্তু সেই শরীক এই বলিয়া মোকররীদারের ঐ দুই বিঘায় মোকররী স্বত্ব অস্বীকার করে যে, যেহেতু ঘরাও বিভাগের দ্বারা সমুদায় চারি বিঘা মোকররীপাট্টা-দাতার হিস্যায় ছিল, অতএব জমার লোকসান তাহারই উপর পড়িবে, এবং কালেক্টরের বাটোয়ারার দ্বারা মোকররী অর্থাৎ নূতন জমা সমেত অন্য শরীককে ঐ দুই বিঘা প্রদত্ত হইতে পারে না।

এ স্থলে কালেক্টরের ঐ বাটোয়ারার দ্বারা মোকররীদারের মোকররী স্বত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না; অতএব সকল শরীকেরই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

**বিচারপতি বেলি।**—আমার মতে এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে। মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই:—বাদী এই বলিয়া ৩ বিঘা মোকররী ভূমির দখলের জন্য এবং এক বিঘা ভূমিতে তাহার মোকররী স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য নালিশ করে যে, এজমালী সম্পত্তির ॥০ আনার মালিক বিবী বন্নুজান তাহাকে ঐ চারি বিঘার মোকররী পাট্টা দিয়াছিল। দেখা যাইতেছে যে, যদিও এই সম্পত্তি কালেক্টরের তৌজীতে এজমালী এবং অবিভক্ত ছিল, তথাপি শরীকগণের মধ্যে ইহার ঘরাও বিভাগ হইয়াছিল, এবং তদ্দ্বারা, ঐ মোকররী পাট্টা-দাতার হিস্যায় ঐ সমুদায় চারি বিঘা পড়িয়াছিল। এই চারি বিঘার কোন অংশই সেই সময়ে খাস আপেলাণ্টের দখলে ছিল না। তাহার পরে পক্ষগণ ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে নিয়মিত বাটোয়ারার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে।

ঐ কানুন মতে কালেক্টরের বাটোয়ারা দ্বারা ঐ মোকররী ভূমির দুই বিঘা খাস আপেলাণ্টের হিস্যাতে অর্পিত হয়, এবং অপর দুই বিঘা অন্য শরীকগণকে দেওয়া হয়। বাদী কহে যে, ঐ দুই বিঘা সম্বন্ধে সে খাস আপেলাণ্টদিগকে তাহার

মোকররী স্বত্ব স্বীকার করাইতে পারে নাই, অতএব সে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

প্রথম আদালত তাহাকে এক রূপান্তরিত ডিক্রী দিয়াছিলেন, কিন্তু নিম্ন আপীল-আদালত বাদীকে তাহার সম্পূর্ণ দাবীর ডিক্রী প্রদান করেন।

প্রতিবাদিগণ খাস আপীল করিয়া তর্ক করে যে, ঘরাও বিভাগ মতে মোকররী-দাতার হিস্যায় ঐ সমুদায় চারি বিঘা ভূমিই ছিল, এবং সেই সময় অবধি যে খাজানার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা উচিত রূপে সর্ব্বস্থলে মোকররীদাতারই হয়, কারণ, সম্পত্তি ঘরাও বিভাগ হওয়ার পরে ঐ পাট্টা পাট্টা-দাতার হিস্যা হইতে দেওয়া হয়, এবং পাট্টা-দাতা কেবল তাহার নিজের অংশ সম্বন্ধে নিজে ঐ জমার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল; অতএব ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে কালেক্টর যে বাটোয়ারা করেন, তদ্দ্বারা জমার মূল পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না, এবং মোকররী অর্থাৎ ন্যূন জমায় দুই বিঘা ভূমি অন্য শরীককে প্রদত্ত হইতে পারে না।

আমার বিবেচনায়, এই তর্ক বৈধ নহে। সমুদায় সম্পত্তিই এজমালী এবং অবিভক্ত ছিল এবং তদবস্থায় কালেক্টরের নিকট সমুদায় রাজস্বের দায়ী ছিল, এবং ঘরাও বিভাগ হইলেও, আইন মতে সম্পত্তি যেরূপ যৌত ছিল, তদ্বিরুদ্ধে, সেই বিভাগের দ্বারা তাহা বিভক্ত হইয়া দুই সম্পত্তি হইতে পারে না; তাহা এক সম্পত্তিই থাকিবে। পরন্তু, কালেক্টরের বাটোয়ারার দ্বারা এই সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত করার পরে যদি রাজস্ব বাকীর জন্য সেই দুই বিভক্ত সম্পত্তির এক ভাগ বা উভয় ভাগই নীলাম করিতে হয়, তবে নীলামের সময়ে তিনি এমন হুকুম দিতে পারেন না যে, যেহেতু প্রথম ঘরাও বিভাগানুযায়ী ॥০ আনার শরীকের দ্বারা মোকররী প্রদত্ত হইয়াছিল, অতএব ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে বাটোয়ারার অন্তর্গত সম্পত্তির অপর হিস্যা যাহাতে কালেক্টর-কৃত অংশমতে ঐ দুই বিঘা পড়িয়াছে তাহার ক্রেতাকে সেই দুই বিঘার সম্পূর্ণ খাজানা মোকররী-দাতার দিতে হইবে।

অপিচ, কালেক্টর যখন ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে বাটোয়ারা করেন, তখন তাঁহার কেবল সমুদায় সম্পত্তির অংশ মত ভূমির উপরে অংশমত জমা নির্দ্ধারণ করিয়া সেই সম্পত্তি দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইয়াছিল। তিনি ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এমন নিষ্পত্তি করিতে পারেন না যে, যেহেতু এক শরীক মোকররী পাট্টা প্রদান করিয়া জমার হ্রাস করিয়াছে, অতএব তাহার হিস্যায় সেই ন্যূন জমার দায়গ্রস্ত ভূমি পড়িবে। মোকররীর বৈধতা অথবা অবৈধতার বিষয়ে নিষ্পত্তি করিতে কালেক্টরের ক্ষমতা নাই। যে মহাল দুই ভাগে বিভাগ করিতে হইবে, তিনি কেবল সেই মহাল ভুক্ত বলিয়া ঐ জমার ভূমি বিবেচনা করিয়া লইতে পারেন এবং সেই সমুদায় মহাল বিভাগ করত অংশমত জমা নির্দ্ধারণ করিয়া দুই ভাগ করিতে পারেন।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ই বিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমিও বিবেচনা করি, এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে। আমিও সম্পূর্ণ রূপে সম্মত হইয়া বলিতেছি যে, রাজস্ব নির্দ্ধারণের জন্য কালেক্টর যখন সেই রাজস্ব বিভাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তিনি উচিত বিবেচনা করিলে, ঘরাও বিভাগ অগ্রাহ্য করিতে পারেন; কিন্তু মেং গ্রেগরি তর্ক করেন যে, ঘরাও বিভাগ রাজস্ব আদায়ের জন্য কেবল অগ্রাহ্য হইতে পারে, এমত নহে; কালেক্টরের বাটোয়ারার পরে তাহা এককালে বাতিল ও অকর্ম্মণ্য হয়, এবং কেবল সম্পত্তির হিস্যা সম্বন্ধেই তাহা বাতিল হয় এমন নহে, সম্পত্তির প্রত্যেক অংশের মালিক তৃতীয় ব্যক্তির যে সকল

স্বত্ত্ব সৃজন করে তৎসম্বন্ধেও অকর্ম্মণ্য হয়। তিনি এই প্রস্তাবের পোষক কোন প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, এবং আমার বিবেচনায়, ইহা অতি অন্যায় প্রস্তাব। ইহা অস্বীকৃত হয় নাই যে, কালেক্টরের বাটোয়ারার পূর্ব্বে শরীকগণের মধ্যে ঘরাও বাটোয়ারা হইয়াছিল, এবং আমি দেখিতে পাই না যে, যে স্বত্ত্ব প্রথমে উৎকৃষ্ট ছিল তাহা, যে কার্য্যে সেই স্বত্ত্বের দখীলকার কোন পক্ষ ছিল না, সেই কার্য্যের দ্বারা কি প্রকারে বাতিল হইতে পারে। আমার বোধ হয় তাহাই এই মোকদ্দমায় খাস আপেলাণ্টের তর্ক।

খরচা সমেত এই খাস আপীল ডিস্মিস্ করিতে আমি সম্মত হইলাম। (গ)

১১ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি ই জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২৭৮৯ নং মোকদ্দমা।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজ বামনাড়ার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

মোল্লা নবী নওয়াজ (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু যাদবচন্দ্র শীল, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কমলাকান্ত সেন, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মালিক সময়ে সময়ে আবশ্যক মতে আপন ব্যবহারার্থে তাহার ভূমির খাস দখল করিয়া অন্যের ব্যবহারে বাধা দিলে, শেষোক্ত ব্যবহার যত কাল পর্য্যন্তই হউক না কেন, তাহাতে ব্যবহার-জনিত স্বত্ত্ব উৎপন্ন হয় না। এমত অবস্থায়, ঐ অন্য ব্যক্তির ব্যবহার সম্মতি-সম্ভূত গণ্য হইবে, স্বত্ত্ব-সম্ভূত নহে।

বিচারপতি মার্কবি।—রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলের নিকট জওয়াব তলব করা আমি আবশ্যকীয় বোধ করি না। এ মোকদ্দমার অভিপ্রায় এই যে, যে ভূমির উপর দিয়া প্রতিবাদী সাধারণ রাস্তার দাবী করে, এবং যাহা সে বাদীর কথিত মতে বাদীর স্বত্ত্বের হানি করিয়া ব্যবহার করিয়াছে, সেই ব্যবহার-স্বত্ত্ব রহিত করিয়া ঐ ভূমিতে বাদীর মালিকী-স্বত্ত্বের দাবী সংস্থাপন করা হয়।

আমাদের সমক্ষে এক মাত্র প্রশ্ন এই যে, আইনমতে নিম্ন আপীল-আদালতের ইহা স্থির করা অন্যায় হইয়াছে কি না যে, রাস্তার স্বত্ত্ব ছিল না।

প্রথম আদালত স্থির করেন যে, উক্ত ভূমির উপর ৭৫ বৎসর যাবৎ কোন না কোন প্রকারের রাস্তার স্বত্ত্ব ছিল, সুতরাং তিনি বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন। দ্বিতীয় আদালতের রায় আমরা যে রূপ বুঝিয়াছি, তাহাতে ৭৫ বৎসর ব্যবহারের নির্দ্দেশ খণ্ডন করা হয় নাই, কিন্তু ঐ আদালত এমত অনুমান করিতে চাহেন না যে, তাহাতে রাস্তার কোন স্বত্ত্ব অর্জ্জিত হইয়াছে। এ বাক্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট নহে, কিন্তু আমরা মূল রায়ের সহিত অনুবাদ মিলাইয়া বিবেচনা করিতেছি যে, তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, উক্ত ব্যবহার কেবল ঘটনাধীন এবং সম্মতি-সম্ভূত; তাহা এ রূপ নহে যে, তাহাতে স্বত্ত্ব প্রদত্ত হয়। অতএব আমাদিগকে কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যে, নিম্ন আপীল-আদালত এই ভাব গ্রহণ করিতে পারেন কি না। স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তিনি তাহা পারেন। মালিক সময়ে সময়ে আবশ্যকমতে আপন ব্যবহারার্থে তাহার জমি খাস দখল করিয়া অন্যের ব্যবহারে বাধা দিলে উক্ত ব্যবহার যত কালেরই হউক, তাহাতে কোন স্বত্ত্ব উৎপন্ন হয় না। এমত অবস্থায় ব্যবহারের ভাব পরিবর্ত্তিত হয়, এবং এ রূপ ব্যবহার কেবল সম্মতি-সম্ভূত, স্বত্ত্ব-সম্ভূত নহে। ব্যবহারের প্রকৃত ভাব অবস্থা দৃষ্টে সংগৃহীত হইবে।

নিম্ন আপীল-আদালত এ মোকদ্দমায় যে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাহা এ প্রকারের ব্যবহার নহে যাহাতে স্বত্ব উৎপন্ন হয়, আমি তাহাতে কোন ভ্রম দেখিতে পাই না।

আমার বিবেচনায়, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ হইবে।

**বিচারপতি জ্যাক্‌সন।**—আমারও ঐ মত।

(ব)

---

১২ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৯৬৭ নং মোকদ্দমা।

পূর্ণিয়ার অধঃস্থ জজ আড়ারিয়ার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২৭ এ মে তারিখের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১৭ ই সেপ্‌টেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

তীর্থানন্দ ঠাকুর (বাদী) আপেলাণ্ট।

পরেশমন ঝা এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু তারকনাথ সেন, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—কোন অধীনজমায় বিচারাদিষ্ট দায়ীর যে স্বত্ব ও লাভ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালত-কর্তৃক টাকার ডিক্রীজারীতে নীলাম হইলে, তাহাতে প্রতারণার কোন সংস্রব না থাকিলে সেই নীলাম তাহার যোগ্যতা অনুসারে বলবৎ গণ্য; এবং ঐ জমার পূর্ব্ব দখীলকারের দেয় বাকী খাজানার জন্য ঐ দখীলকারের বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে ঐ সম্পত্তি আর পুনরায় নীলাম হইতে পারে না।

আইনানুসারে অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭১২ ধারামতে কেবল ভূমির ফসল তাহার করের নিমিত্ত আবদ্ধ থাকে, ঐ ভূমি ভূমিস্থিত আবদ্ধ থাকা গণ্য হইতে পারে না।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—ইহা এক অদ্ভুত প্রকারের মোকদ্দমা, এবং যে সকল বৃত্তান্ত দৃষ্টে আমরা উপস্থিত আইন-ঘটিত প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিলাম, তাহা সাবধানে বর্ণনা করা আবশ্যক।

এই মোকদ্দমার বাদী, প্রতিবাদিগণের মধ্যে রঙ্গলাল নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাল আদালতে ১২৭১ এবং ১২৭৪ সালের বাকী করের ডিক্রী পায়। এই ডিক্রীর তারিখ ১৮৬৭ সালের ১০ ই সেপ্‌টেম্বর। রঙ্গলালের সহ-প্রতিবাদী পরেশমন ঝা উক্ত রঙ্গলালের বিরুদ্ধে মুনসেফ আদালতে ১৮৬৭ সালের ২৮ এ মে তারিখে এক টাকার ডিক্রী পায়। প্রতিবাদী পরেশমন এই টাকার ডিক্রীজারী করিয়া উপস্থিত বিরোধীয় তালুকে রঙ্গলালের স্বত্ব এবং লাভ নীলাম করায় ১৮৬৭ সালের ২৯ এ নবেম্বর তারিখে উক্ত পরেশমন ঝা নিজেই ঐ তালুকের উক্ত স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করে। তাহার পরে (কোন্‌ তারিখে, তাহা বলা হয় নাই) রঙ্গলালের ঐ তালুক বিক্রয় দ্বারা বাদীর ১৮৬৭ সালের ১০ ই সেপ্‌টেম্বরের বাকী করের ডিক্রীজারীর জন্য বাদী মাল আদালতে প্রার্থনা করে। যে বাকী করের ডিক্রী হয়, তাহা রঙ্গলাল প্রতিবাদীর যে ভূমি পরেশমন প্রতিবাদীর নিকট বিক্রয় হয় তাহারই বাকী কর হইবার বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে।

বাদী যখন উল্লিখিত রূপে তাহার ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে, তখন ডেপুটি কালেক্টর ১৮৬৮ সালের ২৫ এ এপ্রিল তারিখে এই হেতুবাদে উক্ত ডিক্রীজারী করিতে দিতে অস্বীকার করেন যে, উক্ত জমিতে রঙ্গলালের যে স্বত্ব ও লাভ ছিল, তাহা দেওয়ানী আদালত-কর্তৃক পূর্ব্বেই নীলাম হইয়া পরেশমন প্রতিবাদীর নিকট বিক্রীত হইয়াছে।

এমত অবস্থায়, বাদী দেওয়ানী আদালতের ১৮৬৭ সালের ২৯ এ নবেম্বরের নীলাম অন্যথার এবং ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২৫ এ

এপ্রিলের হুকুম রদের দাবীতে এবং ঐ জমি বাদীর আপন ডিক্রীজারীতে নীলাম করার জন্য নালিশ করে।

নিম্ন আপীল-আদালত এই হেতুবাদে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন যে, প্রতিবাদীর নিকট ১৮৬৭ সালের ২৯ এ নবেম্বরে যে বিক্রয় হয় তাহা সঙ্গত, অতএব পুনরায় রঙ্গলাল দায়ীর স্বত্ব এবং লাভ বিক্রীত হইতে পারে না।

খাস আপীলে তর্ক হইয়াছে যে, জজের আইন-ঘটিত ভ্রম হইয়াছে; এবং খাস আপেলাণ্টের উকীলের তর্ক এই:—তিনি বলেন যে, প্রতিবাদী রঙ্গলাল যে স্থলে উক্ত অধীন জমার প্রজা ছিল, এবং বাদীকে যে বাকী করের ডিক্রী দেওয়া হয়, তাহা যে স্থলে এই বিশেষ জমার প্রজার দেয় বাকী কর, সে স্থলে উক্ত জমাই ঐ বাকী করের নিমিত্ত দায়ী, এবং পরেশমন প্রতিবাদী যে ঐ জমা ক্রয় করে, সে তাহা সমুদায় দাবী-দাওয়া সম্বলিতই ক্রয় করে।

প্রথমতঃ, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই নালিশের প্রথম দুই প্রার্থনা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এমত তর্ক করা হয় নাই যে, পরেশমনের অনুকূলে মুনসেফ আদালতের ডিক্রী পরেশমনের উক্ত আদালতের নীলাম ক্রয়, এবং ডেপুটি কালেক্‌টরের ১৮৬৮ সালের ২৫ এ এপ্রিল তারিখের হুকুম কোন রূপে প্রতারণা মূলক। অতএব একেবারেই স্থির করিতে হইবে যে, ২৯ এ নবেম্বরের নীলাম দ্বারা ক্রেতাকে যাহাই দেওয়া হইয়া থাকুক, তাহা যত দূর যোগ্য, তত দূর বলবৎ গণ্য হইবে; এবং ডেপুটি কালেক্‌টর যে হুকুম দ্বারা ঐ ভূমি পুনরায় নীলাম করিতে অস্বীকার করেন, তাহাও বিচারাধিকারেই প্রদত্ত হয়, অতএব দেওয়ানী আদালতে আমরা তাহা অন্যথা করিতে পারি না। কিন্তু বাদীর দুই প্রধান প্রার্থনাই গ্রাহ্য হইতে পারে না বলিয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে, কেবল এই ক্ষুদ্র হেতুর উপর আমি আমার রায় স্থাপন করিতে চাই না। আমি বরং এই মোকদ্দমার এই ভাব গ্রহণ করিব যে, বাদীর প্রার্থনা এই যে, পরেশমন ১৮৬৭ সালের ২৯ এ নবেম্বর তারিখে যে স্বত্ব ক্রয় করে তাহা ঐ প্রকারের স্বত্ব যে, সে তাহা ক্রয় করাতেও, যে বাকী করের ডিক্রী হয় ও যাহা ঐ ভূমির পূর্ব্বের প্রজার নিকট প্রাপ্য ছিল, তাহার নিমিত্ত ঐ জমা দায়ী, এবং কাজে কাজে তাহা ঐ বাকী করের নিমিত্ত নীলাম হইতে পারে।

এই সমুদায় আপত্তি এই কল্পনার উপর নির্ভর করে যে, প্রত্যেক অধীন জমাই তাহার দেয় করের নিমিত্ত তাহার মালিকের নিকট আবদ্ধ থাকে। যদিও এক বিধি অর্থাৎ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১২ ধারা আছে, যাহাতে বলে যে, কোন ভূমির দেয় করের নিমিত্ত তাহার ফসল আবদ্ধ থাকা গণ্য হয়, কিন্তু এমত কোন আইন আমাদিগকে দেখান হয় নাই যাহাতে ব্যক্ত আছে যে, মুল ভূমিই তাহার করের নিমিত্ত আবদ্ধ থাকে। অতএব প্রথমতঃ আমার বোধ হইতেছে যে, ভূমির করের নিমিত্ত তাহার ফসল আবদ্ধ থাকিবার আইন থাকাই, সেই করের জন্য উক্ত ভূমি আবদ্ধ থাকিবার কোন আইন না থাকার প্রবল প্রমাণ; একবাক্য দ্বারা তদ্বিপরীত বাক্য বর্জ্জিত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদিগকে খাস আপেলাণ্টের মতের পোষক বলিয়া এই আদালতের কতিপয় খণ্ডাধিবেশনের নিষ্পত্তি দর্শান হইয়াছে। এই সকল নিষ্পত্তি ২ য় বালম উইকলি রিপোর্টরের ১১১ পৃষ্ঠা; ৫ ম বালমের ২০৫ পৃষ্ঠা; ৮ ম বালমের ৩৮৪ পৃষ্ঠা; ২ য় বালম ওয়াইমানের রিপোর্টের ৩১২ পৃষ্ঠা; এবং ৩ য় বালমের ১৯ পৃষ্ঠা হইতে দর্শান হইয়াছে।

ওয়াইমানের রিপোর্টে প্রচারিত মোকদ্দমা দেখিবা মাত্রই স্পষ্ট বোধ হয় যে, যে সকল বিচারপতি ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার করেন, উপস্থিত বিষয় কোন প্রকারেই তাঁহাদের মনে উত্থাপিত হয় নাই, এবং খাস আপেলাণ্টের উকীলই

নিষ্কপটে স্বীকার করেন যে, তাহাই যথার্থ; এবং এই সকল মোকদ্দমা দৃষ্টে তিনি এই মাত্র উদ্ভাবনা করেন যে, তাহাতে এমত কোন কোন বাক্য আছে যাহা তাঁহার মতের পোষকতা করে।

পরন্তু, আমি বিবেচনা করি যে, ৫ ম এবং ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমা সমস্ত অতি সাবধানে দেখিলে বোধ হইবে যে, ঐ সকল মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ বাস্তবিক এ মোকদ্দমার উপস্থিত বিষয়ের বিচার করেন নাই। ৩৮৪ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ স্থির করেন যে, উক্ত মোকদ্দমা প্রতারণা হওয়া না হওয়ার প্রসঙ্গের উপরেই নির্ভর করে; এবং নিম্ন আদালতের জজ কোন প্রমাণ ব্যতীতই প্রতারণা হওয়ার বিষয় স্থির করাতে তাঁহার নিষ্পত্তি ভ্রান্তিমূলক সাব্যস্ত হয়। সেইরূপ, ৫ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের মোকদ্দমায়ও প্রতারণা হওয়া না হওয়ার বিষয়ই বিচারপতিগণের নিকট উপস্থিত ছিল; এবং যদিও ঐ স্থলে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ খাস আপেলাণ্টের মতের অনুকূল মত প্রকাশ করেন, তথাপি তাঁহারা উক্ত মতের ফল স্বরূপেই রায় দেন নাই; বরং প্রতারণা হইয়াছিল কি না, তাহারই বিচারার্থে তাঁহারা মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান।

২ য় বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমাই খাস আপেলাণ্টের মতের অধিক পোষকতা করে; এবং ঐ মোকদ্দমার বিচারপতিগণ বোধ হয় নিঃসন্দেহই বলেন যে, যে মহাল নীলাম হয়, তাহারই কর প্রাপ্য থাকায়, যে ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে, সে তাহার পুনরায় নীলামের দ্বারা বাধ্য। কিন্তু তাঁহারা আবার সেই সঙ্গেই বলেন যে, তাহার বাধ্য হইবার কারণ এই যে, সে ঐ মহালের দেয় কর দেয় নাই। অতএব উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ করিতে হইলে আমাদিগকে ঐ ডিক্রীর তারিখ দেখান উচিত ছিল। যদি দেওয়ানী আদালতের ক্রেতা ঐ ভূমির মালিক হইবার পর ঐ ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে সে তাহার করের নিমিত্ত দায়ী হইতে পারে, এবং সে তাহা না দিলে ঐ ভূমি উচিত মতেই নীলাম হইতে পারে। কিন্তু কোন্ সময়ে ঐ ডিক্রী হইয়াছিল, তাহা বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ তাঁহাদের রায়ে বলেন না, অতএব ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত স্থলে খাটে কি না, আমরা নিশ্চিত জানি না।

পক্ষান্তরে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদিগকে এমত কোন প্রথা বা আইন দেখান হয় নাই, যাহাতে প্রকাশ যে, কোন অধীন-জমা তাহার দেয় করের নিমিত্ত দায়ী; এবং যে এক আইন আছে, তাহাতে এক বিষয় ব্যক্ত থাকাতেই অপর বিষয়ের আইন না থাকা প্রকাশ পায়। এবং ৩ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টে এমত সকল মোকদ্দমা আছে, যাহা স্পষ্ট এ স্থলে খাটে, এবং তাহাতে স্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে যে, উপস্থিত মোকদ্দমার সহিত ঠিক এক রূপ অবস্থায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীতে নীলাম হইলে, সেই সম্পত্তির পূর্ব্বের দখীলকারের বিরুদ্ধে যে বাকী করের ডিক্রী থাকে, সেই ডিক্রী জারীতে ঐ সম্পত্তির আবার নীলাম হইবে না।

অতএব আমার বিবেচনায়, জজের এ কথা বলা উচিতই হইয়াছে যে, বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হইবে; এবং আমি এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম।

বিচারপতি লক।—আমি আমার সহযোগীর রায়ে সম্মত হইলাম। ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৩৮৪ পৃষ্ঠা-প্রচারিত রায় সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ঐ রায় প্রদান করেন, এবং তাহাতে আমি সম্মতি দেই, এবং তাহা উপস্থিত খাস আপেলাণ্টের মোকদ্দমার পোষকতায় দর্শান হইয়াছে; এবং বলা হইয়াছে যে, ৩ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের ৪৯ পৃষ্ঠা-প্রচারিত রায়ে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যে মত প্রকাশ করেন, তাহা উক্ত মোকদ্দমায় তিনি যে রায় দেন, তাহার

বিপরীত। ৮ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এবং সেই মোকদ্দমার খাস আপেলাণ্টের উত্থাপিত হেতু দৃষ্টে আমার বোধ হইতেছে যে, আমার সহযোগী বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ৩য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্ট-প্রচারিত মোকদ্দমায় তদ্বিরুদ্ধ কোন কথা বলেন নাই; কারণ, প্রথমোক্ত মোকদ্দমায় আমাদের নিকট এই বলা হয় যে, নিম্ন আপীল-আদালতের এমত স্থির করা অন্যায় হইয়াছে যে, জমিদারের কার্য্যে প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্র ছিল, এবং আমাদিগের সেই বিষয়েরই নিষ্পত্তি করিতে হইয়াছিল, এবং তাহাতে আমরা স্থির করি যে, নিম্ন আপীল-আদালত অসংলগ্ন ভাবে যে প্রতারণার কথা বলেন, তাহাতেই অধঃস্থ জজের খাস আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে প্রতারণার সিদ্ধান্ত ন্যায্য হয় না।

আমার বিজ্ঞবর সহযোগী এ মোকদ্দমায় যে হুকুমের প্রস্তাব করিলেন যে, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। (ব)

১৭ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি. লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ৯৬ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের প্রতিনিধি অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ নবেম্বরের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মোহন্ত রামরক্ষা দাস (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

দুর্গাদাস মিশ্র ও আর এক ব্যক্তি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—তমঃসুকী ঋণের জন্য ডিক্রীতে যদি এমন সর্ত্ত থাকে যে, ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা পরিশোধিত না হইলে তমঃসুকে আবদ্ধ সম্পত্তির নীলাম হইতে পারে, তবে ঐ সর্ত্তের এই অর্থ করিতে হইবে যে, ঐ আবদ্ধ সম্পত্তি ডিক্রীকৃত ঋণের জন্য দায়ী।

ডিক্রীদার কেবল ডিক্রী জারী করিয়াই ঐ সম্পত্তি ধৃত করিতে পারে, এবং তাহা হইলে সে অন্য ডিক্রীদারের অবস্থাপিত এবং দেওয়ানী কার্য্য-বিধির বিধান সমস্তের দ্বারা বাধ্য হইবে, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ী ২৪৩ ধারার উপকার লাভ করিতে পারিবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই যে, রেস্পণ্ডেণ্ট-বিচারাদিষ্ট দায়ীদিগের বিরুদ্ধে আপেলাণ্ট ডিক্রীদারের ৫৩৮৩ টাকা কয়েক আনার এক ডিক্রী আছে। এই ডিক্রীর তারিখ ১৮৬৯ সালের ২৯ এ এপ্রিল, এবং তাহাতে ঐ টাকা ডিক্রীদারের প্রাপ্য বলিয়া লেখা আছে; এবং ডিক্রীর এক দফায় লেখা আছে যে, ঐ টাকা পরিশোধিত না হইলে, যে খতের উপরে ঐ টাকা প্রাপ্য বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, সেই খতে আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রীত হইতে পারে। ডিক্রীদার তাহার ডিক্রী জারীর জন্য দরখাস্ত করে। কিন্তু বিচারাদিষ্ট দায়িগণ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৩ ধারা মতে সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণার্থে এক জন কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করার জন্য ১৮৬৯ সালের ২৮ এ আগষ্ট তারিখে জজের নিকট দরখাস্ত করে। বিরোধীয় সম্পত্তির ঠিক উপস্বত্ব কত টাকা, তাহা আমীনের দ্বারা তদন্ত করাইবার খরচা দাখিল করার জন্য জজ বিচারাদিষ্ট দায়ীদিগকে আদেশ করেন। তদনুসারে বিচারাদিষ্ট-দায়িগণ টাকা দাখিল করে, ও আমীন তদন্ত করিয়া জজের নিকট রিপোর্ট দেয়। কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রতি ডিক্রীদার ১৮৬৯ সালের ২৩ এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে আপত্তি করে। সে বলে যে, আমীন যে আয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বিচারাদিষ্ট দায়িগণের স্বীকৃত আয় অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু বাস্তবিক ঐ আয় বার্ষিক ১২০০

টাকার ন্যূন, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ীদিগের হস্তে এইক্ষণে তাহাদের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয়ের টাকা আছে, যদ্দ্বারা তাহারা ঐ ডিক্রী পরিশোধ করিতে পারে ; অতএব ডিক্রীদার এই সকল হেতুবাদে উক্ত ধারানুযায়ী কার্য্যাধ্যক্ষ নিয়োগের প্রতি আপত্তি করে।

ডিক্রীদারের ঐ দরখাস্তের সহিত কোন শপথপূর্ব্বক এজাহার অথবা ঐ এজাহারের তুল্য কোন জবানবন্দী দাখিল হয় নাই। কথিত রূপে বিচারাদিষ্ট দায়ীদিগের হস্তে টাকা থাকার অথবা সম্পত্তির উপস্বত্ব সম্বন্ধে আমীনের নির্দ্দেশ অশুদ্ধ হওয়ার কোন প্রমাণ দেওয়া বা দিতে চাওয়া হয় নাই। অতএব আমাদের ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে, যে স্থলে জজ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সম্পত্তির উপস্বত্বের দ্বারা উচিত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ৬ বৎসরের মধ্যে ডিক্রীদারের ডিক্রী যথেষ্ট রূপে পরিশোধিত হইতে পারে, সে স্থলে তাঁহার নির্দ্দেশ বিশুদ্ধই হইয়াছে। এবং তাহা যে বিশুদ্ধ নহে, এমত কোন আপত্তি হয় নাই। কিন্তু ডিক্রীর শব্দ, বিশেষ, উপরিউক্ত দফা সম্বন্ধে তর্কিত হইয়াছে যে, এই ডিক্রীতে জজ ২৪৩ ধারার বিধান অন্যায় রূপে খাটাইয়াছেন, এবং যে স্থলে ডিক্রীর আদেশ এই যে, ডিক্রীর লিখিত টাকা পরিশোধিত না হইলে আবদ্ধ সম্পত্তি বিক্রীত হইবে, সে স্থলে আমাদের ইহাই নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, ঐ সম্পত্তি অবশ্য বিক্রীত হইবে, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ীদিগের প্রতি ২৪৩ ধারায় যে যে অনুগ্রহ এবং প্রতিকার প্রদান করার বিধান আছে, তাহা তাহারা পাইতে পারে না।

ইহা একটি নূতন তর্ক, এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রতিপক্ষের কোন উকীল অথবা কৌন্সেল নাই যে, এই কথার বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত করার জন্য তাঁহারা আমাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু মেং গ্রেগরি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয়ে আদালতের বন্ধু স্বরূপ কার্য্য করিয়াছেন। সমুদায় দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, তাঁহার মতই বিশুদ্ধ। আমরা বিবেচনা করি যে, ডিক্রীর ঐ দফায় যে কোন আদেশই থাকুক, সেই দফার অর্থ এই যে, বিচারাদিষ্ট দায়ী যে সম্পত্তি আবদ্ধ রাখে তাহা ডিক্রীদারের অনুকূল টাকার ডিক্রীর জন্য দায়ী, এবং সম্পত্তি বাস্তবিক বিক্রয় করা উচিত বলিয়া ব্যক্ত করিতে আদালতের ক্ষমতা ছিল না, এবং তাহা তাঁহার মনস্থও ছিল না ; কারণ, ডিক্রী প্রদত্ত হওয়া মাত্রেই ডিক্রীর লিখিত টাকা আদালতে আমানত হইতে পারিত, এবং তাহা হইলে ডিক্রীর ঐ শেষ দফার আদেশ অকর্ম্মণ্য হইত। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তি ঋণের জন্য দায়ী ব্যক্ত করা ভিন্ন আদালতের অন্য কিছু মনস্থ ছিল না। পরন্তু, দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীজারী ভিন্ন ডিক্রীদার অন্য কোন উপায়ের দ্বারা সম্পত্তি ধৃত করিতে পারিত না, এবং যখন সে ঐ ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি ধৃত করে, তখন বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তির বিরুদ্ধে অন্য কোন ডিক্রীদার ডিক্রীজারী করার চেষ্টা করিলে যেরূপ অবস্থাপিত হইত, তাহারও ঠিক সেই অবস্থা ছিল, এবং তাহাতে সে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৩২ ধারা হইতে ২৪৩ ধারা পর্য্যন্ত বিধানের দ্বারা বাধ্য। যাহা হউক, মেং গ্রেগরি যেরূপ তর্ক করিয়াছেন যে, ইহা কেবল টাকার ডিক্রী এবং তাহাতে কেবল এই মাত্র ব্যক্ত যে, টাকা পরিশোধ করিতে হইবে, কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া ব্যক্ত নাই, তাহাই সত্য।

অতএব কেবল ইহাই রহিল যে, অন্য ডিক্রীদার যে প্রকারে ডিক্রীজারী করিতে পারে এই ডিক্রীদারও কেবল সেই প্রকারে ডিক্রীজারী করিয়া আপন প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতে স্বত্ববান ; অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় বিচারাদিষ্ট দায়িগণ ঐ আইনের ২৪৩ ধারার উপকার লাভ করিতে পারে।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতের জজের হুকুম স্থির থাকিবে এবং এই আপীল ডিস্মিস্ হইবে। (গ)

---

১৭ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ৯৯ নং মোকদ্দমা।

পাটনার জজের ১৮৭০ সালের ১৯ এ ফেব্রুয়ারির হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মহম্মদী বেগম্, আপেলাণ্ট।

মসম্মত ওম্‌দতুন্নেছা, রেস্পণ্ডেণ্ট।

মুন্সী মহম্মদ ইউছফ, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি গ্রেগরি ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—নাবালগের অভিভাবক নিযুক্ত করিতে হইলে, আদালত পক্ষগণের নিজ ব্যবহার শাস্ত্রের (যথা, মুসলমান হইলে, শরার) প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে ঐ অভিভাবক মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু পক্ষগণের শাস্ত্রমতে যে ব্যক্তি অভিভাবক হইতে পারে সে যদি উপযুক্ত পাত্র হয়, তবে আদালত তাহাকেই নিযুক্ত করিতে পারেন।

১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে অভিভাবকতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ হইলে, ঐ অভিযোগ যথার্থ কি না এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত সার্টিফিকেট রাখিবার যোগ্য কি না, তাহা আদালতের তদন্ত করা কর্ত্তব্য, এবং ঐ তদন্ত দ্বারা এই সকল বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া তাহার সার্টিফিকেট রহিত করত অন্যকে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত নহে।

বিচারপতি লক।—এই মোকদ্দমার আপেলাণ্ট মহম্মদী বেগম্ তাহার নাবালগ সন্তান অর্থাৎ এক পুত্র এবং কন্যার অভিভাবিকা স্বরূপে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের বিধান মতে এক সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের জন্যেও সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন কি না, তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। ১৮৭০ সালের ২৪ এ জানুয়ারি তারিখে মহম্মদী বেগমের মাতা এবং ঐ সন্তানদ্বয়ের মাতামহী ওম্‌দতুন্নেছা এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করে যে, যেহেতু মহম্মদী বেগম হাসেন রেজা নামক এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচার করিতেছে এবং পরিবারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে, অতএব তাহার হস্তে সন্তানদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকিলে তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার অথবা তাহাদিগকে বধ করার এবং সম্পত্তি বিনষ্ট করার আশঙ্কা আছে, এবং কতক সম্পত্তি নষ্টও হইয়াছে, অতএব জজের উচিত যে, মহম্মদী বেগম ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে যে সার্টিফিকেট পাইয়াছে তাহা তিনি উঠাইয়া লন।

১৮৭০ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারি তারিখে মহম্মদী বেগম জওয়াব দেয় যে, সে ব্যভিচারিণী হয় নাই, কিন্তু সে ইমামিয়ার ব্যবহারমতে মত্তিয়া প্রণালীতে হাসেন রেজাকে আইন-সঙ্গত রূপে বিবাহ করিয়াছে, ও তাহার মাতার নিষ্ঠুরতার গতিকে সে তাহার মাতার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে, কারণ, তাহার মাতা তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার স্বামী মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় পুলিশের উপরে তদন্তের হুকুম হওয়াতেই সে সেই কয়েদ হইতে খালাস পাইয়াছে এবং সে তাহার সম্পত্তি তাহার মাতার হস্তেই রাখিয়া আসিয়াছে এবং সে তাহা ফেরৎ চাহিয়া না পাওয়ায় মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, ইতিমধ্যে তাহার মাতা তাহার বিরুদ্ধে ১৮৭০ সালের ২৪ এ জানুয়ারি তারিখে এই দরখাস্ত করে।

জজ যে সকল হেতুবাদে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন তাহার তিনি সংক্ষেপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মহম্মদী বেগম হাসেন রেজাকে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে কি

তাহাকে বিবাহ করিয়াছে তাহার মীমাংসার আবশ্যক নাই; যদি বাহির হইয়া গিয়া থাকে তবে সে অভিভাবিকার অযোগ্য, এবং যদি বিবাহ করিয়া থাকে, তবে আইনমতে অযোগ্য হইবে; অতএব হাসেন রেজার সহিত মহম্মদী বেগমের বিবাহ বৈধ কি অবৈধ, জজ সেই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অস্বীকার করেন। কারণ, তিনি বিবেচনা করেন যে, মহম্মদী বেগম বিবাহিতা স্ত্রী অথবা উপপত্নী হউক, সেই উভয় ঘটনায়ই অভিভাবিকা হইতে পারে না। অতএব জজ ঐ সার্টিফিকেট উঠাইয়া লইয়া ওমদতুন্নেছাকে নূতন সার্টিফিকেট দিবার হুকুম দেন।

নিম্ন আদালতের রায়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জজ শরা অনুসারেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

আপেলাণ্ট এক্ষণে বলে যে, সে শীয়া। সে নিম্ন আদালতে আপনাকে কি বলিয়াছিল তাহা দৃষ্ট হয় না। যদি সে শীয়া হয়, তবে বেলির গ্রন্থের ২৩২ পৃষ্ঠায় ইমামিয়ার ব্যবহার সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, মাতা নিজে তাঁহার সন্তানের অভিভাবিকা হইতে পারেন না, অথবা উইলের দ্বারা অন্য অভিভাবিকাও নিযুক্ত করিতে পারেন না; কিন্তু সুন্নী ব্যবহার মতে মাতা আপন সন্তানের অভিভাবিকা হইতে পারেন, অর্থাৎ বালক হইলে ঐ বালকের ৭ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এবং বালিকা হইলে ঐ বালিকার যৌবনাবস্থা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অভিভাবিকা হইতে পারেন, কিন্তু মাতা যদি পুনরায় বিবাহ করেন তবে তিনি আইন-সঙ্গত রূপে অভিভাবিকা থাকিতে পারেন না।

সুন্নী-সম্প্রদায়ের উক্ত ব্যবহার ম্যাকনাটনের গ্রন্থে বর্ণিত আছে, এবং দেখা যাইতেছে যে, জজ ঐ ব্যবহার মতেই কার্য্য করিয়াছেন। অভিভাবক নিযুক্ত করিতে হইলে, পক্ষগণ যে ব্যবহার শাস্ত্রাধীন, সেই শাস্ত্রে যে প্রকার ব্যক্তিকে অভিভাবক নিযুক্ত করার আদেশ আছে তৎপ্রতি করাই উচিত বটে, কিন্তু পক্ষগণের ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও আদালত ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে অভিভাবক মনোনীত করিতে পারেন। ঐ আইনে এমন কোন বিধান নাই যদ্দ্বারা পক্ষগণের শাস্ত্রে যে ব্যক্তিকে অভিভাবকের পদে নিযুক্ত করার আদেশ আছে সে ব্যক্তি উপযুক্ত পাত্র হইলে তাহাকে আদালত নিযুক্ত করিতে পারিবেন না; কিন্তু সেই ব্যক্তি অনুপযুক্ত হইলে ঐ আইন অনুসারে তিনি তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

মহম্মদী বেগম সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬৭ সালে সকল পক্ষগণের সমক্ষে সে উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল, এবং তদনুসারেই সে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত হয়; কিন্তু এইক্ষণে তাহার কোন কার্য্যের এবং চরিত্রের গতিকে প্রার্থী তাহাকে অনুপযুক্ত বলেন এবং ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ২১ ধারামতে জজের যে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে তাহা পরিচালন করত তিনি মহম্মদী বেগমের সার্টিফিকেট উঠাইয়া লইয়াছেন।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে আমাদের বিবেচনায়, শরার কথা এককালে পরিত্যাগ করিতে হইবে। ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের বিধান এই যে, যদি উইলের দ্বারা কোন অভিভাবক নিয়োজিত না হইয়া থাকে, তবে নাবালগের যে কোন বান্ধব অভিভাবক হইতে সম্মত এবং যোগ্য হয় আদালত তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারেন, এবং সে ব্যক্তির কেবল নিকট সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার যোগ্যতার প্রতি আদালতের দৃষ্টি করিতে হয়। যে স্থলে মহম্মদী বেগম একবার যোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে স্থলে ইহা কি প্রমাণ হইয়াছে যে, সে তাহা হারাইবার কোন কার্য্য করিয়াছে? সে ব্যভিচারিণী হইয়াছে এবং সম্পত্তির অপচয় করিতেছে এবং পরিবারের গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া, তাহার বিরুদ্ধে কএকটি অভিযোগ

উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল কথা সপ্রমাণ করা উচিত ছিল, এবং জজের ইহা স্থির করা উচিত ছিল যে, ঐ সকল কথা সপ্রমাণ না হইলে, এবং সে বিবাহ করিয়া থাকিলে এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় তিনি তাহার হস্তে সার্টিফিকেট রাখিতে পারেন কি না। যদি জজ এমন নির্দ্দেশ করেন যে, মহম্মদী বেগম সার্টিফিকেট রাখিবার যোগ্য নহে, তবে প্রার্থীকে সার্টিফিকেট প্রদান করার পূর্ব্বে, প্রার্থীর বিরুদ্ধে মহম্মদী বেগম যে সমস্ত পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে তাহা জজের তদন্ত করিতে হইবে, এবং প্রার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়ার পূর্ব্বে সেই সকল আপত্তির মীমাংসা করিতে হইবে।

মহম্মদী বেগমের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ হইয়াছে তাহা, ও প্রার্থী সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য কি না, তন্নির্ণয়ার্থে প্রার্থীর চরিত্র সম্বন্ধে প্রমাণ লওয়ার জন্য মোকদ্দমা জজের নিকট পুনঃপ্রেরিত হইবে।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমি কেবল অতিরিক্ত কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। * * *

সম্পত্তি সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, কালেক্টর সম্মত হইলে সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে অর্পণ করিতে পক্ষগণ রাজী আছে। কিন্তু যদি তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার পূর্ব্বেই মহম্মদী বেগমের হস্তে অর্পিত হইয়া থাকে, তবে জজ উচিত বিবেচনা করিলে তাহার হস্তে পুনরায় তাহা অর্পণ করিতে পারেন, অথবা অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকেও দিতে পারেন।

ওমদওন্নেছাকে সার্টিফিকেট প্রদান করার যে হুকুম হইয়াছে তাহা আমাদের অবশ্যই অন্যথা করিতে হইবে।

খরচা মোকদ্দমার শেষ নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গ)

১৭ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন।

ঢাকার জজ কর্ত্তৃক তত্রত্য জজ-আদালতের ওকালতী হইতে বহিষ্কৃত গণেশচন্দ্র গাঙ্গলীর মোকদ্দমা।

চুম্বক।—যদি কোন অধঃস্থ আদালতের উকীলের প্রতি এমত দোষারোপ হয় যাহা সপ্রমাণ হইলে দণ্ডবিধির অন্তর্গত অপরাধের তুল্য হইতে পারে, তবে তাহা শুদ্ধ ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অন্যায়াচরণ জ্ঞান না করিয়া ঐ উকীলকে ফৌজদারীতে বিচারার্থে অর্পণ করত, তথায় অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ১৪ ধারামতে তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইবে।

রায়।—গণেশচন্দ্র গাঙ্গলীর মোকদ্দমা আমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম; এবং জজের সিদ্ধান্ত সকল বিশুদ্ধ হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে আমি আমার নিজের মত স্থির করিয়া থাকিলেও আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা এরূপ নহে যাহাতে ' উকীলগণের আইন ' অর্থাৎ ১৮৬৫ সালের ২০ আইনমতে আমার হুকুম দেওয়া উচিত হইতে পারে।

ঐ আইনের ১৪ ধারার বিধান এই যে, এই আইনমতে, আদালতের রেজিষ্টরীভুক্ত কোন উকীল বা মোক্তার যদি, কোন ফৌজদারী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে হাইকোর্ট সেই উকীল বা মোক্তারকে স্থগিত অথবা পদচ্যুত করিতে পারেন, এবং তদন্তে যদি দেখা যায় যে, কোন উকীল বা মোক্তার আপন ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে শঠতা বা অতি গর্হিতাচরণ করিয়াছে, তবে সেই কারণে অথবা অন্য কোন ন্যায্য কারণে হাইকোর্ট সেই উকীল অথবা মোক্তারকে সম্পেণ্ড অথবা পদচ্যুত করিতে পারেন। অনন্তর, ১৬ ধারার বিধান এই যে, হাইকোর্টের অধীন কোন উকীল অথবা মোক্তার কোন অধঃস্থ আদালতে পূর্ব্বোক্ত ধারার লিখিত কোন দোষ অর্থাৎ শঠতা, বা ব্যবসায়-সংক্রান্ত কর্ত্তব্য

সম্পাদনে গর্হিতাচরণ করিলে বা অন্য কোন ন্যায্য কারণ হইলে, সেই অধঃস্থ আদালতের জজ তদন্ত ও রিপোর্ট করিবেন।

আমার বোধ হয় যে, ব্যবস্থাপক সমাজের এমত মনস্থ ছিল না যে, যখন কোন অধঃস্থ আদালতের কোন উকীলের চরিত্রের বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ হয় যাহা সপ্রমাণ হইলে 'অপরাধের' তুল্য হইতে পারে, তখন তাহা অপরাধ স্বরূপে তদন্ত না হইয়া, শুদ্ধ অন্যায়াচরণ জ্ঞানে উক্ত উকীলকে কেবল পদচ্যুত করার এক হেতু বলিয়া গণ্য হইবে। আমি বিবেচনা করি যে, যখন কোন উকীলের আচরণের প্রতি এই প্রকার দোষারোপ হয়, তখন তাহা, অন্যান্য মোকদ্দমার ন্যায়, ফৌজদারী অভিযোগের হেতু গণ্য হইবে, এবং তাহাতে যদি সেই উকীল অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে আদালত ঐ আইনের ১৪ ধারামতে তাহাকে ওকালতী হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।

উপস্থিত মোকদ্দমায় গণেশচন্দ্র গাঙ্গলীর প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহই দণ্ডবিধির অন্তর্গত অপরাধ গণ্য হইতে পারে। তাহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ হয় যে, সে এক কৃত্রিম ওকালৎনামা কৃত্রিম জানিয়া ব্যবহার করিয়াছে এবং সেই কৃত্রিম ওকালৎনামা দর্শাইয়া ঢাকার জজের নিকট হইতে অন্য এক ব্যক্তির এক খানা দলীল শঠতাপূর্ব্বক বাহির করিয়া লইয়াছে। ইহাতে দণ্ড-বিধির অন্তর্গত দুই অপরাধ হইতে পারে। আমার বিবেচনায়, ইহা উকীলের শুদ্ধ ব্যবসায় সংক্রান্ত দোষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত নহে; যদি এই সকল অভিযোগের উৎকৃষ্ট হেতু থাকে, তবে তাহাকে বিচারার্থে ফৌজদারীতে অর্পণ করা উচিত, এবং তাহাতে সে নির্দ্দোষী অথবা অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। যদি সে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তবে আদালত ১৪ ধারামতে তাহার নাম রেজিষ্টরী হইতে খারিজ করিবার হুকুম দিবেন। কিন্তু সে ফৌজদারী আদালতে মুক্তি পাইলে, এই আদালতের হস্ত বদ্ধ হইবে কি না, তদ্বিষয়ে এইক্ষণে কোন নিশ্চিত রায় ব্যক্ত না করিয়া, আমি ইহাই বলা উচিত বোধ করিলাম যে, সম্প্রতি সর্ব্বাগ্রে ফৌজদারী বিচার হওয়া উচিত।

অতএব গণেশচন্দ্র গাঙ্গলীর বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করণার্থে যাহা কিছু আবশ্যক তাহা করার জন্য এই কাগজপত্র ঢাকার জজের নিকট ফেরৎ যাইবে, এবং সেই অভিযোগের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত গণেশচন্দ্র গাঙ্গলী সস্পেণ্ড থাকিবে। (গ)

---

১৮ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৭৩৮ নং মোকদ্দমা

ছাপ্‌ড়ার মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ২৯ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া সারণের অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ললিত পাঁড়ে (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

শ্রীধর দেবনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মুন্সী মহম্মদ ইউছফ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু তারকনাথ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন পৈতৃক সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির আজীবন স্বত্ব থাকে, তাহার যদি টাকা কর্জ্জ করার প্রয়োজন হয়, তবে সেই প্রয়োজনের জন্য যত টাকা আবশ্যক কেবল তাহাই তাহার কর্জ্জ করা উচিত, তাহার অধিক কোন দায় ঐ সম্পত্তির উপর সৃজন করিতে তাহার স্বত্ব নাই, এবং কর্জ্জদাতারও কর্জ্জ দেওয়ার পূর্ব্বে নির্ণয় করা উচিত যে, আইন-সঙ্গত রূপে যথার্থ কত টাকা কর্জ্জ করার প্রয়োজন।

বিচারপতি লক।—তুলসীনারায়ণের কন্যা

শিবরাজকুমারী পৈতৃক সম্পত্তির দখীলকার থাকার কালে যে জরীপেসগী বন্ধক দেন তাহা অন্যথা করিয়া বিরোধীয় সম্পত্তির।০ আনা অংশের দখল পাওয়ার জন্য তুলসী-নারায়ণের আইন-সঙ্গত দায়াধিকারী সূত্রে বাদী এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। ঐ বন্ধকের তারিখ ১৮৬১ সালের ১৯ এ অক্টোবর, এবং শিবরাজ কুমারী ১২৭২ অর্থাৎ ১৮৬৫ সালে লোকান্তর গমন করেন। ৯৫০০ টাকা কর্জ্জ করা হয়, এবং নিম্ন আদালতদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কেবল ৬৯২১।/০ টাকা কর্জ্জ করার আইন-সঙ্গত প্রয়োজন ছিল, কিন্তু অবশিষ্ট ২৫৭৮॥/০ টাকা কর্জ্জ করার আবশ্যক ছিল না, অতএব নিম্ন আদালতদ্বয় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ৬৯২১।/০ টাকা পর্য্যন্ত কর্জ্জ বৈধ; সুতরাং প্রতিবাদীকে তাহার ঐ টাকা দিলে বাদী দখল পাইতে স্বত্ববান হইবে।

প্রতিবাদী বন্ধক-গৃহীতা খাস আপীল করিয়াছে। পক্ষগণ মৃত তুলসীনারায়ণের আইন-সঙ্গত দায়াধিকারী কি না, তৎসম্বন্ধে আপীলের প্রথম হেতু উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু যে স্থলে এই আপত্তি নিম্ন আপীল-আদালতে উত্থিত হয় নাই এবং ইহা বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্ন, সে স্থলে তাহা এইক্ষণে উত্থাপন করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, যেহেতু আইন-সঙ্গত প্রয়োজন থাকার কথা নিম্ন আদালতদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব ঐ সম্পূর্ণ দলীলই স্থির রাখা উচিত ছিল।

তৃতীয় আপত্তি এই যে, যেহেতু বন্ধক-গৃহীতা আইন-সঙ্গত প্রয়োজন থাকার কথা অবগত হওয়ার জন্য তদন্ত ও উচিত যত্ন করিয়াছে, অতএব যে প্রকারে সেই টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার জন্য তাহার ক্ষতি হইতে পারে না।

খাস আপেলাণ্টের উকীল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ইহা কেবল এক দায় সৃজন করার কার্য্যই হউক, অথবা এক ব্যক্তির মালিকী স্বত্ব অন্য ব্যক্তিকে সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করার কার্য্যই হউক, আইন দুই স্থলেই তুল্য। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, এই দুই ঘটনার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। আপেলাণ্টের উকীল আমাদের নিকট যে সমস্ত নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন তৎসমুদায়ই বিক্রয় সংক্রান্ত, সুতরাং উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহা খাটে না। যদি বন্ধক দেওয়ার আবশ্যক হয়, তবে যে ব্যক্তি টাকা কর্জ্জ করে তাহার যদি কেবল সীমাবদ্ধ স্বত্ব থাকে, তবে তাহার যত টাকার আবশ্যক কেবল তত টাকাই কর্জ্জ করা উচিত। অনিবার্য্য প্রয়োজন সাধনার্থে যত টাকার আবশ্যক, সম্পত্তির উপরে তাহার অধিক টাকার দায় সৃজন করিতে তাহার কোন ক্ষমতা নাই; এবং কত টাকার আবশ্যক তাহা, কর্জ্জ দেওয়ার পূর্ব্বে কর্জ্জদাতা নির্ণয় করিতে বাধ্য। এই কথা বলিলে কর্জ্জদাতার উৎকৃষ্ট জওয়াব হইতে পারে না যে, ৫০০ টাকার আবশ্যক ছিল; অতএব আমি ২০০০ টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত টাকার আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিয়া কর্জ্জ-দাতা যদি তত টাকাই কর্জ্জ দেয়, কেবল তাহা হইলেই সে রক্ষিত হইতে পারে।

তৃতীয় হেতু সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করি যে, তাহার তদন্ত করা নিঃসন্দেহ উচিত ছিল। কিন্তু খাস আপেলাণ্ট তদ্বিষয়ে ইসু উত্থাপন করে নাই এবং আমাদের বিবেচনায়, এত বিলম্বে আমাদের সমক্ষে এই আপত্তি উপস্থিত করিয়া তাহার জন্য মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারার্থে ফেরৎ পাঠাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা যাইতে পারে না।

অতএব এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।　　(গ)

১৯ এ মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৯৯৯ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৮ ই জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২২ এ সেপ্‌টেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সেখ কেফায়েৎ হোসেন ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

সেখ সমসের আলী ( প্রতিবাদী ) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু রূপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক** —১৮৫৯ সালের আইনের ৭৭ ধারা মতে মাল আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি হইবার পরেও দেওয়ানী আদালত, খাজানা পাওয়ার আইন-সঙ্গত স্বত্ব আছে কি না, তাহার বিচার করিতে পারেন, এবং তাহাতে দেওয়ানী আদালত ইহাও বিচার করিতে পারেন যে, মাল আদালতের নিষ্পত্তির দ্বারা যদি কোন পক্ষ কোন খাজানা হারাইয়া থাকে, তবে সে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে কি না।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্তে কিঞ্চিৎ গোল আছে, অতএব প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়ে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বৃত্তান্তের সপষ্ট বর্ণনা করা আবশ্যক। প্রথমে পক্ষগণের মধ্যে মাল আদালতে এক মোকদ্দমা হয়, এবং তাহা ১৮৬৩ সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত হয়। কেবল উল্লেখ করা ভিন্ন ঐ মোকদ্দমার আর কোন বর্ণনার আবশ্যক নাই, কারণ, বিচার্য্য বিষয় তাহার উপরে কিছুতেই নির্ভর করে না। কিন্তু কালেক্‌টরীতে ১৮৬৭ ও ১৮৬৮ সালে যে মোকদ্দমা হয়, তাহার বিশেষ বর্ণনা করিতে হইবে। ঐ মোকদ্দমায় বর্ত্তমান বাদী বিরোধীয় সম্পত্তির মালিক স্বরূপে বর্ত্তমান প্রতিবাদী সমসেরের নামে ঐ সম্পত্তির ১২৭২ ও ১২৭৩ সালের খাজানা ৪৩৸৵ টাকার জন্য নালিশ করে। উপস্থিত মোকদ্দমার ভাদুই নামক আর এক জন প্রতিবাদী সেই মোকদ্দমায় মোজাহেম দেয়, এবং সেই মোকদ্দমার পূর্ব্বে ভাদুই বাস্তবিক খাজানা পাইত কি না, তদ্বিষয়ে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারা মতে তাহার ও বর্ত্তমান বাদীর মধ্যে এক ইসু উত্থাপিত হয়। সেই মোকদ্দমা ভাদুইয়ের অনুকূলে প্রথম আদালতে ১৮৬৭ সালের ২১ এ সেপ্‌টেম্বরে ও দ্বিতীয় আদালতে ১৮৬৮ সালের ২২ এ জুলাই তারিখে নিষ্পন্ন হয়। সেই মোকদ্দমায় ভাদুই স্বীকার করে যে, বর্ত্তমান বাদী বিরোধীয় ভূমির মালিক ছিল; কিন্তু সে বলে যে, বাদী ১২৭০ সালের ৭ ই বৈশাখ তারিখের এক দলীলের দ্বারা ঐ ভূমি তাহাকে হস্তান্তর করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই মোকদ্দমা ১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে শেষ হয়। তাহার পরে সেই বৎসরের সেপ্‌টেম্বর মাসে বাদী বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে, এবং তাহার আরজী যাহা সপষ্ট রূপে লিখিত হয় নাই, তাহাতে সে উক্ত ১০ আইনের মোকদ্দমার লিখিত ৪৩৸৵ টাকা খাজানা আদায় করিবার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে এবং ভাদুইয়ের বরাবর ১২৭০ সালের ৭ ই বৈশাখের উল্লিখিত দলীল অন্যথা করিতে চেষ্টা করে।

জজ বিবেচনা করেন যে, ভাদুইয়ের বরাবর ১২৬৭ সালের ২ রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে যে কবালা প্রদত্ত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা অন্যথা করার জন্য বাদীর নালিশ করা উচিত ছিল, এবং যে স্থলে তাহা অন্যথা করার জন্য নালিশ হয় নাই, সে স্থলে জজের রায়ে বাদীর নালিশ চলিতে পারে না, সুতরাং তিনি তাহা ডিস্‌মিস্ করেন।

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, জজের রায় ভ্রমাত্মক হইয়াছে, এবং খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল মেং টুইডেলও তাহা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু

তথাপি তিনি তর্ক করেন যে, বাদীর নালিশ চলিবে না, কারণ, যে সকল খাজানা সম্বন্ধে মাল আদালতে মোকদ্দমা হইয়া বাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হয়, তাহাই আদায় করার স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে, এই তর্ক কর্ম্মণ্য নহে। মাল আদালতে বাদীর এবং প্রতিবাদী ভাদুইয়ের মধ্যে কেবল এই বিচার্য্য ছিল, (এবং তাহাই বিচারিত হয়) যে নালিশ উপস্থিত হওয়ার কালে ও তৎপূর্ব্বে উক্ত ভাদুই বাস্তবিক খাজানা পাইত কি না, এবং সেই কথা যে পক্ষের অনুকূলেই নিষ্পন্ন হউক, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারায় স্পষ্ট বিধান আছে যে, যে ব্যক্তির উক্ত ভূমির খাজানায় অথবা জমায় স্বত্ব থাকে, তাহার তাহা দেওয়ানী আদালতে উচিত সময়ের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করিয়া সাব্যস্ত করণে কালেক্টরের সেই নিষ্পত্তির দ্বারা কোন বাধা হইবে না। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, মাল আদালত যে কোন নিষ্পত্তি করেন, তাহার বিরুদ্ধে বিরোধীয় জমার খাজানায় আইন-সঙ্গত স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য, এই আইনের ঐ ধারার স্পষ্ট বিধান মতেই অন্য আদালতে নালিশ চলিতে পারে, এবং আমাদের বোধ হয় যে, যখন খাজানার আইন-সঙ্গত স্বত্বের বিষয় শেষোক্ত আদালতের মীমাংসা করিতে হয়, তখন তিনি ইহারও বিচার করিতে পারেন যে, মাল আদালতের নিষ্পত্তি দ্বারা যদি কোন পক্ষ কোন বস্তু (যেমন এই স্থলে খাজানা) হারায়, তবে তাহাকে তাহা ফেরৎ দেওয়া যাইতে পারে কি না। এই ধারাতে এমন কোন বিধান নাই যে, এই কথার উপরে মাল আদালত যে নিষ্পত্তি করেন, তাহা এমন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি যে, কোন ব্যক্তি মাল আদালতে তৃতীয় ব্যক্তির সহিত বিবাদে যাহা কিছু হারায় তাহা সে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া পাইতে পারিবে না। মাল আদালতের নিষ্পত্তি এমন চূড়ান্ত বলিয়া যদি আমরা নির্দ্দেশ করি, তবে নিতান্ত অন্যায় হইবে।

অনন্তর, তর্কিত হইয়াছে যে, উপস্থিত বাদী আদালতে আসিতে পারে না, কারণ, সে নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, সে এই সম্পত্তি এক তৃতীয় ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়াছে, এবং সে এইক্ষণে তাহার মালিক নহে। তাহা হউক বা না হউক, তাহা আমাদের নির্দ্দেশ করার আবশ্যক নাই। এই মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ফেরৎ যাইবে, এবং সেই আদালত মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে বিচার করার সময় পক্ষগণের মধ্যে অন্যান্য যে কথার বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহার সহিত এই কথারও মীমাংসা করিবেন। দোষগুণ সম্বন্ধে পক্ষগণের মধ্যে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার বিচারের জন্য এই মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে। আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিলাম। খরচা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

(গ)

---

১৯ এ মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ২৭৪৮ নং মোকদ্দমা।

ভাগুদার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করত ছোট নাগপুরের জুডিশিয়াল কমিশনর ১৮৬৯ সালের ৬ ই আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গৌরমণি মুরাইন (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

শঙ্করী পাহাড়িনী ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ ও রাজেন্দ্র মিশ্র, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায়, রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ডিক্রীর উপলক্ষে তাহার অতিরিক্ত যে ভূমি অন্যায়রূপে দখল করা হয় তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার নালিশের তমাদীর মিয়াদ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১২ প্রকরণান্তর্গত।

বিচারপতি বেলি।—আমরা বিবেচনা করি, এই খাস আপীল মঞ্জুর এবং তমাদী সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে।

বর্ণিত চৌহদ্দী মধ্যস্থিত কতিপয় ভূমির জন্য বাদিনীর পুত্র প্রতিবাদিনীর স্বামীর নামে নালিশ করে। প্রথম আদালতে মোকদ্দমার ডিক্রী হয়, কিন্তু আপীলে ১৮৬৩ সালের ১৪ ই মার্চ তারিখে নিম্ন আপীল-আদালত কর্তৃক তাহা ডিস্‌মিস্ হয়। ইতিমধ্যে আরজীর লিখিত চৌহদ্দী মধ্যস্থিত ভূমির জন্য ডিক্রীজারী হয়। প্রতিবাদিনী নিম্ন আপীল-আদালতে বাদিনীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করাইয়া, বাদী ডিক্রীজারীতে যে ভূমি দখল করিয়া লইয়াছিল, তাহা ফেরৎ পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করে।

আদালত তদনুসারে ফেরৎ দিবার অনুমতি করেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, আদালতের নাজীরের বরাবর যে পরওয়ানা হয়, তাহার তফসিলে বাদীর আরজীর লিখিত চৌহদ্দী মধ্যস্থিত ভূমির অতিরিক্ত অন্য ভূমিও ভুক্ত হয়।

পরওয়ানার লিখিত আদেশানুসারে নাজীর বাদিনীর ডিক্রীতে বর্ণিত ভূমি অপেক্ষা অধিক ভূমিতে প্রতিবাদিনীকে দখল দেয়।

ডিক্রীতে বর্ণিত চৌহদ্দীর মধ্যে যে ভূমি লেখা নাই তাহার জন্য বাদিনী গৌরমণি এইক্ষণে নালিশ করিয়াছে এবং সে বলে যে, নিম্ন আপীল-আদালতের ডিক্রীজারীতে যখন প্রতিবাদিনী ভূমির দখল লইয়াছিল, তখন অর্থাৎ ১২৭০ সালের মাঘ মাসে তাহার নালিশের হেতু উপস্থিত হয়।

প্রথম আদালত বাদিনীকে ডিক্রী দেন।

সেই নিষ্পত্তি নিম্ন আপীল-আদালত এই বলিয়া অন্যথা করেন যে, প্রথমতঃ, বাদিনীর নালিশে এক বৎসরে তমাদী হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ যেহেতু বাদিনীর দাবী-কৃত ভূমি প্রতিবাদিনীকে আদালতের হুকুমের দ্বারা প্রদত্ত হয়, অতএব সেই হুকুমই চূড়ান্ত হইয়াছে।

বাদিনী খাস আপীল করিয়া বলে যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১২ প্রকরণমতে সে তমাদীর ১২ বৎসর মিয়াদ পাইতে স্বত্ববান, এবং ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৫ প্রকরণান্তর্গত এক বৎসরের তমাদীর বিধান এই মোকদ্দমায় খাটে না।

ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষের দ্বারাও অস্বীকৃত নহে যে, ঐ সরাসরী হুকুম অন্যথা করার জন্য আরজীতে কোন প্রার্থনা নাই; অতএব ঐ প্রশ্ন এই মোকদ্দমায় উত্থিত হইতে পারে না। ডিক্রী উপলক্ষ করিয়া প্রতিবাদিনী অন্যায় রূপে যে ভূমি লইয়াছে তাহাই পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য আরজীর মুল প্রার্থনা। এই নালিশ আমার বিবেচনায়, ভূমির জন্য নালিশ, অতএব ইহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১২ প্রকরণান্তর্গত। আমার বোধ হয় যে, নিম্ন আপীল-আদালতের এমত বলাও ভ্রম হইয়াছে যে, যেহেতু আদালতের হুকুমের দ্বারা প্রতিবাদিনীকে দখল দেওয়ান হইয়াছে, অতএব সেই হুকুম অসঙ্গত হইলেও চূড়ান্ত। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

রেস্পণ্ডেণ্ট সে পাল্টা আপীল করিয়াছে তাহাতে এই এক তর্ক উত্থিত হইয়াছে যে, বাদিনীর পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়াতে আদালতে বাদিনীর কোন স্থান নাই। প্রথম আদালতে এই আপত্তি উত্থিত হয় নাই; তাহা হইলে বাদিনী তাহার নালিশ করার স্বত্ব দেখাইবার জন্য নানাপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিতে পারিত; এবং যদিও নিম্ন আপীল-আদালতে আপীলের হেতুর মধ্যে এই কথার প্রসঙ্গ আছে, তথাপি তাহা তথায় তর্কিত হয় নাই

এই আপত্তি সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ে কোন প্রসঙ্গ নাই, অতএব বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহাই অনুমান করিতে হইবে যে, ঐ কথা তর্কে উত্থাপিত হয় নাই। যে স্থলে উত্থিত ইসু সমস্তে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদিনী এই কথার তর্ক করে নাই, সুতরাং প্রথম আদালতে তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রয়োগ হয় নাই, সে স্থলে আমরা খাস আপীলে এই আপত্তি প্রথম উত্থাপন করিতে দিতে পারি না।

পাল্টা আপীলে আর যে এক প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ ভূমি সমস্ত ডিক্রীর অন্তর্গত কি না, তাহা আমার বিবেচনায়, মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারকালেই বিচারিত হইতে পারিবে।

অতএব দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারিত হওয়ার জন্য মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইল।

বিচারপতি মার্কবি।—আমিও বিবেচনা করি, এই খাস আপীল পুনঃপ্রেরণ করিতে হইবে। ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৫ প্রকরণে "সরাসরী নিষ্পত্তি অথবা হুকুম" শব্দগুলিতে কি বুঝায়, এই কঠিন প্রশ্ন আমরা এই মোকদ্দমায় একেবারেই এড়াইতে পারি। তাহার যে অর্থই হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি তাহা অন্যথা করিতে চাহে তাহারই বিরুদ্ধে তাহা অবশ্য প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু এই মোকদ্দমায় বাদিনীর বিরুদ্ধে তাহা হয় নাই, তাহার পুত্রের বিরুদ্ধে হয়, অতএব উপস্থিত মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৫ প্রকরণ খাটে না। (গ)

---

২৫ এ মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৯৩০ নং মোকদ্দমা।

সালিখার মুনসেফের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মার্চের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া হুগলীর অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা অক্টোবরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

হাবড়ার মিউনিসিপালিটীর সভাপতি মেং হেনরি প্রাইস (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

খেলচন্দ্র ঘোষ (বাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, টি, এলেন, রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মিউনিসিপাল কমিশনরেরা পাথর স্তূপ করিয়া যে ভূমি হইতে বাদীর প্রজাকে উচ্ছেদ করত বাদীকে বঞ্চিত করেন, সেই ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ উপস্থিত হওয়ায় নির্দ্দিষ্ট হইল যে, ঐ সম্পত্তির ।৶ আনা শরীক মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বিরুদ্ধে পূর্ব্বে ঐ রূপ যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং যাহাতে বর্তমান বাদীকে দাঁড়ামত প্রতিবাদী করা হইয়াছিল তদ্দ্বারা, এই বাদী ঐ ভূমি সম্বন্ধে এইক্ষণে যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি বাধ্য হইতে পারেন না।

৩ মাসের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করার জন্য বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারার বিধান কেবল ঐ আইনমতে এবং তাহার উদ্দেশ্য সাধনার্থে মিউনিসিপাল কমিশনরেরা যে সকল কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধেই খাটে। ১২ বৎসরের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া তাহার দখল পাওয়ার জন্য নালিশ করিতে সকল লোকের জন্য যে সাধারণ আইন আছে তাহার লোপ করা ঐ আইনের অভিপ্রায় নহে।

বিচারপতি লক।—হাবড়ার মিউনিসিপাল কমিশনরেরা বাদীর কতক ভূমির উপরে প্রস্তর স্তূপ করিয়া সেই ভূমি হইতে তাহাকে বঞ্চিত করাতে তাহার দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বাদী নালিশ করেন, এবং তিনি বলেন যে, ১৮৬৮ সালের ১৫ ই জুন তারিখে যখন তাঁহার

রাইয়ৎ মধুসূদন দাঁ মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের দ্বারা উচ্ছেদিত হইয়া ভূমি ছাড়িয়া দেয় তখনই তাঁহার নালিশের হেতু জন্মে।

মুনসেফ এই মোকদ্দমায় যে ৬ ইসু নির্দ্ধারণ করেন, এ স্থলে তাহার কেবল ৪ ইসুর উল্লেখ করার আবশ্যক হইবে, অর্থাৎ, মধুসূদন ভূমি পরিত্যাগ করার সময় হইতে নালিশের হেতু উত্থিত হইয়াছে কি না? তিন মাসের তমাদীর বিধান দ্বারা এই নালিশ বারিত কি না? তমাদীর সাধারণ আইনের দ্বারা নালিশ বারিত কি না? এবং পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধা এই মোকদ্দমায় খাটে কি না?

দেখা যাইতেছে যে, মুনসেফ নির্দ্দেশ করেন যে, পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধা এই মোকদ্দমায় খাটে, এবং বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারামতে নালিশে তমাদী ঘটিয়াছে।

আপীলে অধঃস্থ জজ উক্ত দুই বিষয়েই মুনসেফের সহিত ভিন্ন মত করিয়া অবশিষ্ট ইসুর উপরে অর্থাৎ সাধারণ তমাদীর আইন খাটে কি না, এবং বিরোধীয় সম্পত্তি বাদীর চরভুক্ত ছিল কি না এবং তাহার প্রকৃত পরিমাণ কত, এই সকল ইসুর বিচারার্থে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন।

অধঃস্থ জজের এই পুনঃপ্রেরণের হুকুমের বিরুদ্ধে খাস আপীল হইয়া আমাদের সমক্ষে দুই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, প্রথম তর্ক এই যে, পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধার নিয়ম এই মোকদ্দমায় খাটে, কারণ, এই সম্পত্তির ॥৵০ আনার শরীক পূর্ণচন্দ্র রায় হাবড়ার মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের বিরুদ্ধে এই প্রকার এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং তাহাতে বর্ত্তমান বাদী খেলচন্দ্র ঘোষকে দাঁড়ামত প্রতিবাদী করা হইয়াছিল। সেই মোকদ্দমা ৯ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫৩৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়, কারণ, সেই মোকদ্দমায় নির্দ্দিষ্ট হয় যে, মিউনিসিপাল কমিশনরগণ এই সম্পত্তিতে ১২ বৎসরের অধিক কাল দখীলকার ছিলেন। বর্ত্তমান বাদীকে সেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী করা হইয়া থাকিলেও এমত বলা যাইতে পারে না যে, সেই মোকদ্দমায় পূর্ণচন্দ্রের এবং মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের মধ্যে যে নিষ্পত্তি হয় তাহা, বর্ত্তমান বাদীর এই ভূমিতে যে কোন স্বত্ব আছে তৎসম্বন্ধে তাহার সহিত মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের মোকদ্দমায়ও বাধ্যকর হইবে। অতএব আমার বোধ হয় যে, এই বিষয়ে নিম্ন আপীল-আদালতের রায় বিশুদ্ধ হইয়াছে।

তমাদী সম্বন্ধে দ্বিতীয় আপত্তি উপস্থিত হইয়া তর্কিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারা মতে নালিশের হেতুর তারিখ হইতে ৩ মাসের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করা উচিত ছিল, এবং তাহা না হওয়ায় নালিশ তমাদীর দ্বারা বারিত হইয়াছে। এবং উপরিউক্ত নজীরে বিচারপতিগণ যে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, এই প্রকার মোকদ্দমায় বাঙ্গালা কৌন্সিলের ৩ আইনের ৮৭ ধারার বিধান খাটে, তাহা প্রদর্শন করার জন্য সেই নজীরের পুনরায় উল্লেখ হইয়াছে। বিচারপতি বেলির রায়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পক্ষগণের কি স্বত্ব ছিল, তাহাই তিনি প্রথমে নির্দ্দেশ করেন, এবং মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের ব্যবহার জনিত-স্বত্ব হইয়াছে দেখিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাদীর নালিশে তমাদী ঘটিয়াছে, অতএব তিনি বলেন যে, বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারার বিধান খাটে। পক্ষান্তরে, ঐ মোকদ্দমায় ৮৭ ধারা খাটে কি না, তদ্বিষয়ে বিচারপতি ফিয়ার সন্দেহ করেন, কিন্তু মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করার জন্য তিনি তাঁহার সহ-বিচারপতির মতে সম্মত হন। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সেই নিষ্পত্তি হইতে খাস আপেলাণ্ট অতি অল্প সহায়তা পাইতে পারেন।

আসল কথা এই যে, বাঙ্গালার কৌন্‌সিলের ৩ আইনের ৮৭ ধারা খাটে কি না, তাহা দেখার জন্য মোকদ্দমার ভাবের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যক। বাদীর স্বত্বের প্রমাণের উপরে দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তাহাতে নালিশের হেতুর তারিখ হইতে ১২ বৎসরের যে সাধারণ তমাদীর বিধান আছে, তাহাই খাটিবে।

কিন্তু খাস আপেলাণ্টের পক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, যে সকল স্থলে কোন মিউনিসিপালিটী সংলিপ্ত থাকে, তাহাতে সাধারণ তমাদীর আইন বর্জ্জিত হইয়া, মিউনিসিপালিটীর বিরুদ্ধে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা হউক, তাহাই বাঙ্গালার কৌন্‌সিলের ৩ আইনের ৮৭ ধারা মতে ৩ মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায়, ঐ আইন এই প্রকার মোকদ্দমা সমস্তে খাটে না, এবং ঐ আইনের এই ধারা যাহার বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে, তাহা কেবল সেই সকল মোকদ্দমায়ই খাটে যাহা, ঐ আইনমতে এবং ঐ আইনের উদ্দেশ্য সাধনার্থে মিউনিসিপাল কমিশনরগণ যে কার্য্য করেন তদ্বিরুদ্ধে উপস্থিত হয়। মনে করে, এই কমিশনরেরা যদি ঐ আইনের বিধান মতে প্রস্তর সমস্ত স্তূপ করিতেন, তবে তাহা স্থানান্তর করার জন্য অথবা তাহা স্তূপ করাহেতু খেসারতের জন্য নালিশ ৩ মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইত। এই আইন মতে কমিশনরেরা অন্য যে কোন কার্য্য করেন, তাহার জন্যও নালিশ উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়ার জন্য সাধারণ তমাদীর আইন মতে লোকের ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করার যে স্বত্ব আছে তাহা উঠাইয়া লওয়া কখনই ঐ আইনের অভিপ্রায় নহে। এই আইন প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের এবং হাবড়া মোকামের সুশৃঙ্খল এবং সুশাসনের জন্য ১৮৫৭ সালের ২১ আইন প্রচলিত ছিল এবং ৮৭ ধারার ন্যায় সেই আইনে কোন বিধান ছিল না। এবং আমরা বিবেচনা করি যে, খেসারতের যে নালিশ এই আইনমতে উপস্থিত হইতে পারে, কেবল তাহা উপস্থিত করার সময় নিরূপণ করাই এই ধারার উদ্দেশ্য। অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধেও নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট ইস্যু সমস্তের বিচারার্থে মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে পুনঃ প্রেরণ করার হুকুমও বিশুদ্ধ হইয়াছে।

অতএব আমরা এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। (গ)

---

২৬ এ মে, ১৮৭০।

## প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ নাইট এবং বিচারপতি এফ বি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৯৫৪ নং মোকদ্দমা।

ছোট নাগপুরের সহকারী কমিশনরের ১৮৬৯ সালের ৩ রা মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য জুডিসিয়ল কমিশনর ১৮৬৯ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মেৎ সি জে ডুমেইন (বাদী) আপেলাণ্ট।

উত্তম সিংহ (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

মেৎ আর ই টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বর্দ্ধিত হারে খাজানার নালিশে যদি প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার বিধান অবলম্বন করত ২০ বৎসর পর্য্যন্ত খাজানার পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া জওয়াব দেয়, তবে সে যে দাখিলা সমস্ত উপস্থিত করে তাহার অকৃত্রিমতার বিষয়ে তাহারই কিছু প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক।

নোটিস জারী সপ্রমাণ না হওয়ার আপত্তি যদি প্রথম আদালতে উত্থিত না হয়, তবে তাহা খাস আপীলে, অথবা তৎপরে মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইলে সেই আদালতেও উত্থিত হইতে পারে না।

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—এই মোকদ্দমার প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার বিধান অবলম্বন করিতে চেষ্টা করায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এক হারে খাজানা দেওয়ার কথা প্রদর্শন করিতে বাধ্য। প্রমাণ-ভার তাহার উপরেই ছিল, এবং যে সকল দাখিলায় দৃষ্টব্যে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত হারে খাজানা দেওয়া হইয়াছে দেখা যায়, কেবল তাহা দাখিল করাই তাহার জন্য যথেষ্ট কার্য্য নহে। ঐ সকল দাখিলার অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ করার জন্য তাহার কিছু প্রমান প্রয়োগ করা আবশ্যক ছিল। সে যে সকল দাখিলা দর্শাইয়াছে তাহা প্রথম আদালতে কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আপীল-আদালতের জজ বিবেচনা করেন যে, প্রতিবাদী ঐ সকল দাখিলার অকৃত্রিমতা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য নহে; দাখিলা সমস্ত প্রদর্শিত হওয়ার পরে বাদীই তাহা অপ্রমাণ করিতে বাধ্য ছিল। তাহাই তাঁহার রায়ের নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদের অর্থ। ঐ পরিচ্ছেদ এই যে, "যে স্থলে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত "খাজানার পরিবর্ত্তন না হওয়া সম্বন্ধে প্রতিবাদীর "প্রমাণ সমস্ত বাদী খণ্ডন করার কোন চেষ্টা "করে নাই, সে স্থলে বস্তুতঃ বাদী তাহা স্বীকার "করিয়াছে। অতএব যে স্থলে প্রতিবাদী জওয়াব "দিয়াছে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে "খাজানার পরিবর্ত্তন হয় নাই এবং সপ্রমাণ করিয়াছে যে, গত ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহা পরিবর্ত্তিত "হয় নাই, অতএব খাজানার পরিবর্ত্তন সপ্রমাণ "করার ভার বাদীর উপরেই বর্ত্তে।"

প্রতিবাদী যে সকল দাখিলা সুদ্ধ দাখিল করে তাহা প্রথম আদালত কৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব বাদী ঐ সকল দাখিলা খণ্ডন করিতে অসমর্থ হওয়াতেই জজ যে বিবেচনা করিয়াছেন যে, বাদী ২০ বৎসর পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত হারে খাজানা দেওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছে, ইহা তাঁহার ভ্রম। ইহাতে তাঁহার বিচার-প্রণালীর গুরুতর ভ্রম হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই হইয়াছে যে, যে দাখিলা সমস্ত সপ্রমাণ হয় নাই এবং যাহার বিরুদ্ধে এক আদালত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা অকৃত্রিম বলিয়া অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি যে, এই ভ্রম তাঁহার সমুদায় রায় ব্যাপিয়াছে। উদ্ধৃত নজীরে বিচারপতি ফিয়ার যে রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমরা সম্মত। জজ যদি পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া থাকেন যে, দাখিলা সমস্ত স্বীকৃত হইয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, তবে বাচনিক প্রমাণ পর্য্যালোচনার কালে সেই বিশ্বাসমতেই যে তাঁহার রায় ব্যক্ত হয় নাই, এমত বলা দুঃসাধ্য। কিন্তু যে জজ ঐ সকল দলীলের অকৃত্রিমতার প্রতি সন্দেহ করেন তিনি ঐ বাচনিক প্রমাণ অন্য ভাবে গ্রহণ করিবেন। অতএব যদিও জজ বলেন যে, তিনি প্রতিবাদীর সাক্ষিগণের এবং বাদীর এক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দৃষ্টে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তথাপি আমরা তাহা এমন বৃত্তান্ত-ঘটিত নির্দ্দেশ বলিয়া স্থির রাখিতে পারি না, যাহার প্রতি এই আদালত খাস আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। আমাদের বোধ হয় যে, দাখিলা এবং তৎসংক্রান্ত প্রমাণ-ভার সম্বন্ধে তাঁহার যে ভ্রম হইয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার সমুদায় নিষ্পত্তিতেই দোষ স্পর্শিয়াছে।

অতএব পুনর্ব্বিচারের জন্য মোকদ্দমা প্রেরিত হইবে। খরচা নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

নোটিস জারী হওয়ার কথা সপ্রমাণ হয় নাই বলিয়া ১২ শ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৭ পৃষ্ঠার এক পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি দৃষ্টে প্রতিবাদী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এত বিলম্বে আর তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং পুনঃপ্রেরণের পরেও নিম্ন আপীল-আদালতে আর তাহা উত্থাপিত হইতে পারে না। এই আপত্তি প্রথম আদালতেই উত্থাপন করা উচিত ছিল। নোটিস জারী হইয়াছে কি না, তাহা বৃত্তান্ত-ঘটিত কথা, এবং যদি তাহা উচিত সময়ে উত্থিত হইত

তবে নোটিসজারী হওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে বাদী সুযোগ পাইত। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারায় লেখা আছে যে, যে ব্যক্তি খাজানা পাইবে তাহার দরখাস্ত মতে নোটিস জারী হইবে, এবং যদিও নালিশ উপস্থিত করার কেবল তিন দিবস পূর্ব্বে বাদীর স্বত্ব জন্মিয়াছিল, তথাপি এমত হইতে পারে যে, জমিদার অর্থাৎ যে ব্যক্তি খাজানা পাইবে, সে ঐ সময়ের মধ্যে নোটিস জারী করিয়া থাকিবে, এবং উচিত সময়ের মধ্যে এ আপত্তি উত্থিত হইলে বোধ হয় তাহা সপ্রমাণ হইতে পারিত।

(গ)

---

২৬ এ মে, ১৮৭০।

বিচারপতি জি লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ১১৩ নং মোকদ্দমা।

মালদহের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া দিনাজপুরের প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ৫ ই আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

লোচন মণ্ডল (বাদী) আপেলাণ্ট।

উজীর প্রামাণিক ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দুর্গাদাস দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দেঃ কার্য্য-বিধির ১৪৮ ধারানুযায়ী নিষ্পন্ন মোকদ্দমায়, উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হইলে, পক্ষগণের মধ্যে সুবিচারার্থে ঐ মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে আপীল-আদালত ঐ ধারার দ্বারা বারিত নহেন।

বিচারপতি লক।—প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক বাদী বলপূর্ব্বক বেদখল হইয়াছে বলিয়া ৯ বিঘা ভূমির দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদিগণ বাদীকে বেদখল করার কথা অস্বীকার করে, এবং বলে যে, বাদী তাহাদের নিকট ঐ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে।

নিম্ন আপীল-আদালত, প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, দখলের কথা সপ্রমাণ হয় নাই এবং প্রতিবাদিগণ যে ক্রয়ের কথা বলে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

খাস আপীলের হেতু এই যে—

১ ম।—জজের ১৮৬৮ সালের পুনঃপ্রেরণের হুকুম আইন-বিরুদ্ধ।

২ য়।—বিক্রয়-কবালার বিরুদ্ধে প্রথম আদালতের রায়ে যে সকল আপত্তি বর্ণিত আছে তাহা খণ্ডন না করিয়াই জজ ঐ কবালা অকৃত্রিম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩ য়। যখন পূর্ব্বে এই মোকদ্দমা জজের সমক্ষে উপস্থিত ছিল, তখন প্রতিবাদী কেবল বর্ণনা-পত্র দাখিল করার জন্য পুনঃপ্রেরণের হুকুমের প্রার্থনা করে, এবং মোকদ্দমা তজ্জন্যই পুনঃপ্রেরিত হয়; অতএব প্রতিবাদীকে প্রমাণ প্রয়োগ করিতে দেওয়া এবং দোষগুণের উপরে সমুদায় মোকদ্দমার বিচার করা নিম্ন আদালত দ্বয়ের অন্যায় হইয়াছে।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে খাস আপেলাণ্টের উকীল ১৮৫৯ সালের ৮০ আইনের ১৪৮ ধারার বিধানের উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও ইহা স্বীকার করা যায় যে, যে স্থলে প্রতিবাদীকে সুযোগ প্রদান করাতেও প্রতিবাদী আদালতের হুকুম পালন করে নাই, সে স্থলে প্রথম আদালত ঐ ধারার বিধানমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য ছিলেন, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে, উৎকৃষ্ট এবং যথেষ্ট হেতু প্রদর্শিত হইলে, পক্ষগণের মধ্যে সুবিচারার্থে ঐ ধারামতে আপীল-আদালত যে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে পারিবেন না এমত হইতে পারে না। এ স্থলে জজ এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা উচিত রূপে পরিচালন করিয়াছেন কি না, তাহা আমরা

বলিতে পারি না, কারণ, নথীর সেই ভাগ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত নাই। কিন্তু আমরা ইহা বলিতে পারি যে, পুনঃপ্রেরণ দ্বারা বাদীর কোন ক্ষতি হয় নাই, কারণ, বাদী তাহার মোকদ্দমা সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হওয়াতে জজ তাহা ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।

বিক্রয়-কবালার বিষয়ে জজের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, তাহা বৃত্তান্ত-ঘটিত নির্দ্দেশ। যে সকল সাক্ষী বিক্রয় সপ্রমাণ করিয়াছে জজ তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছেন, অতএব এই আপত্তি অকর্ম্মণ্য।

তৃতীয় আপত্তির মীমাংসা প্রথম আপত্তির সঙ্গেই হইয়াছে। এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল। (গ)

---

৩০ এ মে, ১৮৭০।

## প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ নাইট এবং বিচারপতি এফ বি কেম্প।

১৮৭০ সালের ১০ নং মোকদ্দমা।

রাজসাহীর অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা অক্টোবরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রাণী শরৎসুন্দরী দেবী (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

কুমার পরেশনারায়ণ রায় (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গোপাললাল মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—প্রতিবাদী আপন জওয়াবে যে কথা বলে না এবং যাহা তাহার জওয়াবের সহিত অনৈক্য, আদালত সেই কথা তাহার জওয়াব বলিয়া অনুমান করিয়া লইতে পারেন না।

**প্রধান বিচারপতি কাউচ।**—১, ২ এবং ৪ নং ভূমিখণ্ড সম্বন্ধে, প্রতিবাদী তাহা ডিক্রীজারীতে দখল করার কথা অস্বীকার করেন, এবং বর্ণনা-পত্রে আরজীর যে ভাব ব্যক্ত আছে তাহাতেও ডিক্রীজারীতে দখল লওয়ার কথা প্রকাশ পায় না। এই তিন খণ্ড ভূমি সম্বন্ধে প্রতিবাদী যে জওয়াব দেয় নাই এবং যাহা তাহার বর্ণনার, অর্থাৎ নালিশ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার দ্বারা বারিত হওয়ার প্রসঙ্গের সহিত অনৈক্য, আদালত সেই জওয়াব অনুমান করিয়া লইতে পারেন না। এবং আমরা বিবেচনা করি যে, যখন পূর্ব্বে এই মোকদ্দমা এই আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যদি এই কথা আদালতের গোচর করা হইত, তবে পুনঃপ্রেরণের হুকুম অন্য ভাবের হইত অর্থাৎ ৩ নং ভূমি খণ্ড সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ হইত। তর্কিত হইয়াছে যে, বাদী পুনঃপ্রেরণের হুকুমের অতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারে না। পুনঃপ্রেরণের হুকুমের যে এই ভাব যে, ডিক্রীজারীতে ঐ তিন খণ্ড ভূমি দখল করা হয় নাই বলিয়া প্রতিবাদী নিজে বলাতেও, তাহা হইয়াছে বলিয়া নিম্ন আদালত যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা অন্যায় বলিয়া তদ্বিরুদ্ধে বাদী তর্ক করিতে পারিবে না, এমত আমাদের প্রতীতি হয় না।

৩ নং ভূমি-খণ্ড সম্বন্ধে মোকদ্দমার প্রভেদ আছে। মোকদ্দমা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারামতে বারিত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইলে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, ৩ নং ভূমি-খণ্ড ডিক্রীজারীতেই লওয়া হইয়াছিল। যদি তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে আদালত নালিশ বারিত বলিয়া ন্যায্য রূপে নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

আপীল-আদালতের জজের নির্দ্দেশের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীজারীতে তাহা লওয়া হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ, তিনি বলেন যে, অতি অসন্তোষকর এবং

অনিয়মিত রূপে দখল দেওয়া হইয়াছিল, এবং নিয়োজিত পেয়াদারা কোন্ ভূমি হস্তান্তর করিয়া দিয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। অতএব নিম্ন আদালত যে প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন "আমি তাহাই অবলম্বন করিতে বাধ্য হই- "লাম।" তাহার পরে তিনি বাদীর নিজের মূল আপত্তির উপরে নির্ভর করিয়াছেন। আমরা বিবেচনা করি যে, তিনি ন্যায্যরূপে তাহার উপরে নির্ভর করিতে পারেন না। বাদী যখন সদর আমীনের নিকট দরখাস্ত করেন, তখন তিনি তাঁহার নালিশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, এবং সেই আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি হওয়াতে তাঁহার সেই কথা চূড়ান্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে না, বিশেষতঃ, তাহা এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বর্ণনার সহিত অনৈক্য। অনন্তর জজ বলেন যে, সাক্ষিগণ দেখাইয়াছে যে, ডিক্রীর অন্তর্গত ভূমির ন্যায্য দখল লওয়ার এক সময়েই ৩ নং ভূমিখণ্ডের দখল লওয়া হয়; কিন্তু তদ্দ্বারা চূড়ান্ত রূপে এমন প্রদর্শিত হইতে পারে না যে, তাহা ডিক্রীজারীতেই লওয়া হইয়াছিল। ডিক্রী-কৃত ভূমির সহিত এক সময়ে এই ভূমি লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই যে তাহাও ডিক্রীজারীতে লওয়া হইয়াছে এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তাহা এক সময়ে লওয়া হইয়া থাকিবে এবং তাহা সম্ভবপরও বোধ হয়। কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, জজের নির্দ্দেশে তাঁহার আপন বাক্যের দ্বারাই ব্যক্ত যে, ঐ বিষয়ে এমন সন্দেহ ছিল যে, তদ্দ্বারা আদালত ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারান্তর্গত ঐ জওয়াব ন্যায্য রূপে গ্রহণ করিতে পারেন না, এবং ঐ চারি খণ্ড ভূমির কোন খণ্ড সম্বন্ধেই তাহা গ্রহণ করা উচিত নহে।

পুনর্ব্বিচারের জন্য এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবে। ইহা অত্যন্ত শোচনীয় যে, আমরা দ্বিতীয়বার এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে বাধ্য হইলাম, কিন্তু আমাদের উপায়ান্তর নাই। খরচা নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গ)

৩১ এ মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রার্থী।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, প্রতিপক্ষ।

বাবু রামচরণ মিত্র, প্রার্থীর উকীল।

বাবু অভয়চরণ বসু ও দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, প্রতিপক্ষের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রার্থী।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর, প্রতিপক্ষ।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, মহেশচন্দ্র চৌধুরী, কালীমোহন দাস এবং মহেন্দ্রলাল সোম, প্রার্থীর উকীল।

প্রতিপক্ষের উকীল নাই।

চুম্বক।—বেদখল হইবার এক মাসের অধিক কাল পরে কোন ব্যক্তি দেঃ কাঃ বিধির ২৬৯ ধারামতে নালিশ করিলে সেই ধারামতে সে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

কেবল ডিক্রীজারীর নীলাম-ক্রেতার উপকারার্থেই দেঃ কাঃ বিধির ২৬৮ ধারা বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং ক্রেতার দখল লওয়ার প্রতি বাধা দিতেছে বলিয়া যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ হয় সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ক্রেতা বলিয়া উপস্থিত হইতে পারে না।

বিচারপতি বেলি।—এই দুই রুল একত্রে শ্রবণের হুকুম হয়। যে পর্য্যায়ক্রমে তর্কিত হইয়াছে তদনুসারেই তাহাদের বিচার করা সুবিধাজনক হইবে।

হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরখাস্ত সম্বন্ধে আমার মত এই যে, রুল অগ্রাহ্য হইবে। হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থনা স্পষ্টই ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৬৯ ধারার অন্তর্গত। সেই ধারায় বলে যে, "আসামী ছাড়া মালিক কি "বন্ধক লওনিয়া কি পাট্টাদার বলিয়া কিম্বা "অন্য কোন দলীলক্রমে ঐ নীলাম করা

"সম্পত্তিতে স্বত্বের দাওয়াদার অন্য কোন ব্যক্তি "হইতে খরীদারের দখল পাইবার ঐ নিবারণ "কি বাধা হইয়াছে ইহা যদি দৃষ্ট হয়, কিম্বা খরী- "দারকে দখল দেওয়াইবাতে যদি সেই প্রকারের "দাওয়াদার কোন ব্যক্তিকে বেদখল করা যায়, "তবে সেই নিবারণ কি বাধা, কিম্বা বিষয় "বিশেষে সেই রূপ বেদখল হইবার তারিখ অবধি "এক মাসের মধ্যে ঐ খরিদার কিম্বা পূর্ব্বোক্ত "স্বত্বের দাওয়াদার নালিশ করিলে আদালত ঐ "নালিশের কথা তদন্ত করিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া "যে হুকুম উচিত হয় তাহাই করিবেন।"

স্বীকৃত হইয়াছে যে, হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বেদখলের তারিখের পরে এক মাসের মধ্যে উপস্থিত হয় নাই, অতএব যে ধারার উপরে সে নির্ভর করে সেই ধারা মতেই আদালতে তাহার স্থান নাই। এমত অবস্থায়, আমাদের কেবল খরচা সমেত এই রুল অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

দ্বিতীয় দরখাস্ত সম্বন্ধে বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমা এই যে, তিনি ডিক্রী-জারীর নীলামে সেই বিচারাদিষ্ট দায়ী ঈশ্বর-চন্দ্র পালের স্বত্ব ও লাভ ক্রয় করিয়া ১৮৬৪ সাল অবধি দখীলকার আছেন, যাহার বিরুদ্ধে রাজা বরদাকণ্ঠ রায় ডিক্রীদার তাঁহার তৎপ-রের তারিখের এক ডিক্রীজারীতে দখল পাও-য়ার চেষ্টা করেন। দরখাস্তে বাবু অনুকূল-চন্দ্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তিনি এখনও দখীলকার আছেন। তাঁহার উকীল আমাদের সমক্ষে বলেন যে, তিনি এক মাসের মধ্যে উপ-স্থিত হন নাই, কারণ, সেই সময়ের মধ্যে তাঁহার আসিবার আবশ্যক ছিল না, কারণ, তিনি ২৬৯ ধারামতে আদালতে উপস্থিত হন নাই। তিনি বলেন যে, তাঁহার দাবী ২৬৮ ধারার অন্ত-র্গত। ২৬৮ ধারায় এই রূপ লেখা আছে, যথা, "ডিক্রীজারীক্রমে যে কিছু স্থাবর সম্পত্তির নীলাম "হয় তাহার খরীদারের দখল পাইবার নিবা-"রণ কি বাধা হইলে কোন মোকদ্দমাতে যাহার "পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে সেই জন ডিক্রীমতে "যে সম্পত্তি পাইতে পারে তাহার দখল পাই-"বার নিবারণের কি বাধার সম্পর্কীয় ২২৬, "২২৭ ও ২২৮ ধারাতে যে বিধান হইয়াছে "সেই বিধান ঐ নিবারণের কি বাধার উপর "খাটিবে।"

আমি দেখিতেছি যে, এই ধারা কেবল ডিক্রীজারীর নীলাম-ক্রেতার রক্ষা এবং সহা-য়তার জন্য হইয়াছে, এবং কারণ দর্শাইবার জন্য যে ক্রেতার উপর এই রুল প্রদত্ত হইয়া-ছিল, তিনি রাজা বরদাকণ্ঠ রায়। ২৬৮ ধারা প্রার্থী অনুকূলের সম্বন্ধে অবিকল খাটে না। অনন্তর, তর্কিত হইয়াছে যে, ২৬৮ ধারা বিচারা-দিষ্ট দায়ীর সম্বন্ধে খাটে, এবং ঈশ্বরচন্দ্রের স্বত্ব ও লাভের ক্রেতা, বিচারাদিষ্ট দায়ীর স্থলাভিষিক্ত সূত্রে ঐ ধারার সহায়তা প্রার্থনা করিতে পারে; কিন্তু সেই ধারায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহা কেবল সেই মোকদ্দমায় খাটে, যাহাতে ডিক্রীজারীতে স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতা দখল প্রাপণে নিবারিত বা বাধা প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে কোন বাধা অথবা নিবারণ হয় নাই, অত-এব আমার বিবেচনায়, ২৬৮ ধারা এক কালেই খাটে না।

কিন্তু প্রার্থীর পক্ষে বাবু মহেন্দ্রলাল সোম তর্ক করেন যে, যেহেতু এই রুলের বিরুদ্ধে কেহ কারণ দর্শাইতে উপস্থিত নাই, এবং যেহেতু নিম্ন আদা-লতের হুকুম অন্যথা করার জন্য বাবু অনুকূল-চন্দ্র দরখাস্ত করিয়াছেন, অতএব আমাদের সেই হুকুম অন্যথা করা উচিত। কিন্তু প্রার্থীর প্রার্থনা কি ছিল, প্রশ্ন তাহা নহে। আমাদের কেবল ইহাই দেখিতে হইবে যে, এই রুল অগ্রাহ্য করা উচিত কি না। ঐ রুলের বাক্য এই ছিল যে, "রাজা বরদাকণ্ঠ রায় দেখাইবেন যে, ২৬৯ "ধারা মতে তাঁহাকে দখল দেওয়ার প্রতি বাবু "অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আপত্তি সমস্ত জজ "কি জন্য গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করিবেন না।" জজের

হুকুম কি জন্য সাধারণতঃ অন্যথা হইবে না, তাহা দর্শাইবার জন্য কোন রুল নির্গত হয় নাই। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, জজের হুকুম অন্যথা করণার্থে কোন হুকুম এইক্ষণে প্রচার হইতে পারে না; কিন্তু প্রার্থী অনুকূল অতঃপর উপযুক্ত সময়ে ২৬৯ ধারা অথবা অন্য কোন ধারা মতে যে কোন উপায় অবলম্বন করা উচিত ও পরামর্শ-সিদ্ধ বোধ করেন, তাহার ব্যাঘাত না জন্মাইয়া আমরা এই রুল নামঞ্জুর করিলাম। এই ক্ষণে তিনি ২৬৯ ধারা মতে উপস্থিত হন নাই, এবং তিনি যে ২৬৮ ধারা মতে আসিয়াছেন বলেন, তাহা খাটে না।

অতএব রুল নামঞ্জুর হইল।

বিচারপতি মার্কবি।—আমিও বিবেচনা করি, এই দুই রুলই নামঞ্জুর হইবে। প্রথম মোকদ্দমায় যাহাতে হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী, তাহাতে আমি তাহার তর্ক সমস্ত এতদ্দূর অনুসরণ করিতে পারি যে, সে দখীলকার ছিল, এবং ২৬৯ ধারার মর্ম্মানুসারে বেদখল হয়। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সে বেদখল হইয়া থাকিলেও এই দরখাস্তের এক মাসের অধিককাল পূর্ব্বে বেদখল হইয়াছিল, অতএব এই দরখাস্ত বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় তাহার প্রার্থনানুসারে আমরা জজকে দরখাস্তের বিচার করিতে আদেশ করিতে পারি না।

বাবু অনুকূলচন্দ্রের দরখাস্ত সম্বন্ধে আমি বিচারপতি বেলির সহিত একমতে বলিতেছি যে, ২৬৮ ধারা কেবল ক্রেতাদিগের উপকারার্থে হইয়াছে, এবং ক্রেতার দখলের প্রতি বাধা দিতেছে বলিয়া যাহার বিরুদ্ধে নালিশ হয়, সেই ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কেহ ক্রেতা বলিয়া উপস্থিত হইতে পারে না। আমার বোধ হয় যে, এ পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য হইয়াছে, তদ্দ্বারা বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই। যখন আদালতের কোন কর্ম্মচারী আইনের আদেশ স্বরূপ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার দখলের ব্যাঘাত জন্মাইবে, তখন তিনি ২৬৯ ধারা মতে আদালতে উপস্থিত হইতে সম্পূর্ণ সুযোগ পাইবেন; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আদালতে তাঁহার কোন স্থান নাই। (গ)

৩১ এ মে, ১৮৭০।

### বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৭০ সালের ১৮৩ নং মোকদ্দমা।

ত্রিপুরার মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২৮ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য অধঃস্থ জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ নবেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বক্‌স আলী ভুঞা (বাদী) আপেলাণ্ট।

শ্রীমতী নবতারা (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টার মূল্য সম্বন্ধে এক সর্ত্ত আছে বলিয়া, এবং পাট্টাদাতা কতক টাকা দিলে পাট্টার মিয়াদ ন্যূন হইতে পারে বলিয়াই তাহা পাট্টা নহে, এমন বলা যাইতে পারে না। এই প্রকার পাট্টা রেজিষ্টরী না হইলে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বিচারপতি ফিয়ার।—যে দলীল বাদীর দাবীর মূল, তাহা নিঃসন্দেহই এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা। ইহার মূল্য সম্বন্ধে এক সর্ত্ত আছে বলিয়া, অথবা পাট্টা-দাতা কতক টাকা দিলে, ইহা যে সম্পূর্ণ কালের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ন্যূন হইবে বলিয়াই যে, ইহা পাট্টা নহে, এমত বলা যাইতে পারে না; এবং যেহেতু ইহা এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা, অতএব ইহা রেজিষ্টরী না হইলে কোন আদালতে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে না। এই দলীল রেজিষ্টরী হয় নাই, অতএব যাহা বাদীর মোকদ্দমার এক মাত্র মূল, তাহাই সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।

নিম্ন আপীল-আদালতের রায় বিশুদ্ধ বোধ হইতেছে; অতএব আমরা বিনা খরচায় এই আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম, কারণ, রেস্পণ্ডেণ্ট উপস্থিত নাই। (গ)

---

৩১ এ মে, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ৪৮ নং মোকদ্দমা।

জেলা রাজসাহীর মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ৪ ঠা নবেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

জয়মণি দেবী ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

ইমাম বক্‌স তালুকদার (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন এজমালী সম্পত্তির দুই কিম্বা তদধিক মালিক, পৃথক্‌ পৃথক্‌ হিস্যায় আপন আপন অংশ দখল করার মানসে প্রত্যেকে এবং সকলে তাহার অংশ মত বিভাগ করিয়া লওয়ার জন্য একই রূপ দরখাস্ত করে, এবং অন্য কোন শরীক সেই বাটোয়ারার প্রতি কোন আপত্তি না করে, তবে কালেক্টর তাহা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর করিতে পারেন; এবং যখন আপত্তি করার সুযোগ ছিল, তখন যদি পক্ষগণ কোন আপত্তি না করিয়া থাকে, তবে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া ঐ সকল হিস্যা পুনঃমিলিত করা যাইতে পারে না।

কিন্তু যদি কালেক্টর কোন হিস্যা সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হওয়ার কথা অবগত হন, তবে তিনি সেই হিস্যার বাটোয়ারা করিতে পারেন কি না, তাহা সন্দেহের বিষয়। ঐ হিস্যার বাটোয়ারা করা হইলে তাহা অন্যথা করণার্থে যে কোন নালিশ উপস্থিত হউক, তাহাতে কালেক্টরকে এক পক্ষ করিতে হইবে।

বিচারপতি লক।—নিম্নলিখিত অবস্থা মতে এই মোকদ্দমার বাদী তালুক ধুলি আটার ॥০ আনা অংশে স্বত্ব সাব্যস্তের নালিশ উপস্থিত করে। রামকিশোর ও কৃষ্ণকিশোর যাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ধনিরামের নিকট পায়, তাহাদের নামে ঐ সম্পত্তি কালেক্টরীতে রেজিষ্টরী ছিল। কালেক্টরের তৌজীতে তাহা ১০৩৭ নম্বরভুক্ত এবং উহার অর্দ্ধাংশ রামকিশোরের এবং অপর অর্দ্ধাংশ কৃষ্ণকিশোরের সম্পত্তি। কৃষ্ণকিশোরের পৌত্র রামলোচন, বাদী এবং তাহার পুত্রকে চারিখানা দলীলের দ্বারা ঐ সম্পত্তির ॥০ আনা অংশ বিক্রয় করে, অর্থাৎ ১২৬৭ সালের ১৫ ই অগ্রহায়ণের দলীলের দ্বারা।০ আনা, ১২৬৭ সালের ৬ ই চৈত্রের দলীলের দ্বারা ৶৵ আনা ও ১২৬৯ সালের ২৬ এ চৈত্রের দলীল দ্বারা ⁄১৫ আনা এবং চতুর্থ কবালার দ্বারা ৫ গণ্ডা বিক্রয় করে, কিন্তু এই চতুর্থ কবালা পাওয়া যাইতেছে না। বাদী আরও কহে যে, বাকী ॥০ আনা অর্থাৎ কৃষ্ণকিশোরের হিস্যা ২ নং হইতে ১০ নং প্রতিবাদীর দখলে আছে, কারণ, ঐ প্রতিবাদীরা রামলোচনের নিকট তাহা ক্রয় করে।

দেখা যাইতেছে যে, ১২৭৩ সালের ৫ ই ফাল্গুণে এই সম্পত্তির।৴ আনা অংশের দাবীদার তিন জন শরীক হরচন্দ্র, ব্রহ্মময়ী এবং শ্রীমন্ত এজমালী সম্পত্তি হইতে তাহাদের অংশ পৃথক্‌ করার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে, এবং তাহাদের দরখাস্তে তাহারা বলে যে, তাহারা ।৶০ আনার দখীল্‌কার, এবং পরমানন্দ ও দুর্গাগতি প্রভৃতি ৶০ আনার দখীল্‌কার, এবং বাদী ইমাম বকস্‌ ॥০ আনার দখীল্‌কার। ১২৭৩ সালের ৩ রা চৈত্র তারিখে পরমানন্দ সেন প্রভৃতি ৶০ আনার শরীক সূত্রে ঐ অংশের বাটোয়ারার জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে। তাহারা

তাহাদের দরখাস্তে আরও বলে যে, হরচন্দ্র এবং তাহার শরীকগণের ।/০ আনা এবং বাদী ইমামবক্সের ॥০ আনা হিস্যা ছিল। এবং ১২৭৪ সালের ১ লা আষাঢ় তারিখে বাদী নিজে তাহার আপন ॥০ আনা অংশের বাটোয়ারার জন্য দরখাস্ত করে এবং সেই দরখাস্তে ব্যক্ত করে যে, হরচন্দ্রের হিস্যা ।/০ আনা ও পরমানন্দ প্রভৃতির হিস্যা ৵০ আনা।

১২৭৪ সালের ১৬ ই আষাঢ় তারিখে বাদীর দরখাস্তের বিরুদ্ধে জয়মণি এক আপত্তির দরখাস্ত করিয়া বলে যে, বাদী ॥০ আনা অংশের স্বত্ব-বান নহে, এবং জয়মণি নিজে কৃষ্ণকিশোরের বিধবা স্ত্রী তারিণীর নিকট ।৵০ আনা ক্রয় করিয়াছে। এই আপত্তির দরখাস্ত দাখিল হওয়াতে বাদীর দরখাস্ত কালেক্টর কর্তৃক ১৮৬৭ সালের ৯ ই জুলাই মোতাবেক ১২৭৪ সালের ২৬ এ আষাঢ় তারিখে অগ্রাহ্য হয়। এই হুকুম হওয়ার পূর্ব্ব দিবসে জয়মণি এক বাটোয়ারার দরখাস্ত করে এবং তাহার ।৵০ আনা অংশের বাটোয়ারার হুকুম হয়। ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনমতে আমীন নিযুক্ত হয় এবং ১৮৬৭ সালের ৯ ই ডিসেম্বর তারিখে কালেক্টর তাঁহার কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত অংশানুযায়ী চূড়ান্ত বাটোয়ারার ষ্টেটমেণ্ট প্রস্তুত করেন:—যথা, হরচন্দ্র প্রভৃতি ।/০ আনা, পরমানন্দ সেন প্রভৃতি ১৬ গণ্ডা, কালীকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ ১৮ গণ্ডা, জয়মণি ।৵০ আনা, দুর্গাগতি রায় ও শ্রীমন্ত রায় নিজের ও কালীকুমারের জন্য, এবং বাদী ইমামবক্স ৵৫॥ আনা। এই বাটোয়ারা ১৮৬৭ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর তারিখে রিবেনিউ কমিশনর কর্তৃক মঞ্জুর হয়।

বাদী এইরূপে সমুদায় মহালে তাহার ॥০ আনার স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য এবং কালেক্টর ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনমতে যে বাটোয়ারা করিয়াছেন তাহা অন্যথা করার নিমিত্ত নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। দুই নিম্ন আদালতই তাহাকে ॥০ আনার পরিবর্ত্তে ।৵১৫ গণ্ডার ডিক্রী দিয়াছেন, কারণ, বাদী বাকী ৫ গণ্ডা সম্বন্ধীয় চতুর্থ কবালা দাখিল করিতে পারে নাই।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, বাদীর দরখাস্ত নামঞ্জুর হওয়াতেও বাদী বাটোয়ারার কার্য্য সমস্তের কথা অবগত ছিল এবং তাহাতে উপস্থিত ছিল, এবং জজ ভ্রমাত্মকরূপে বলিয়াছেন যে, বাটোয়ারা যে হইতেছিল তাহা ৯ ই জুলাই তারিখের পরে বাদীর অবগত থাকার কোন প্রকার প্রমাণ নথীতে নাই। এই তর্কের পোষকতায় কালেক্টরের ১৮৬৭ সালের ৯ ই ডিসেম্বরের ষ্টেটমেণ্ট এবং এই মোকদ্দমার বাদীর শপথ পূর্ব্বক বর্ণনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

আর এক আপত্তি এই যে, নালিশ বর্ত্তমান ভাবে চলিতে পারে না,; মালের কর্ম্মচারিগণের দ্বারা বাটোয়ারা সমাধা ও মঞ্জুর হইয়া যাওয়ায় সেই বাটোয়ারা অন্যথা করার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ চলিতে পারে না; বাদী এবং জয়মণির মধ্যে বিরোধ থাকাতে বাদী ও জয়মণির হিস্যা সম্বন্ধে কালেক্টরের কার্য্য সমস্ত অনিয়মিত হইলেও ।/০ ও ৵০ আনার শরীক হরচন্দ্র এবং পরমানন্দের হিস্যা সম্বন্ধে বাটোয়ারা আইনসঙ্গতই হইয়াছে এবং বাদী তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ঐ সকল হিস্যার বাটোয়ারা সম্বন্ধে সে কোন আপত্তি করে নাই এবং নিজের দরখাস্তেই স্বীকার করিয়াছে যে, ঐ অংশ যে সকল শরীককে অর্পিত হইয়াছে তাহা তাহাদেরই সম্পত্তি; অতএব বাটোয়ারার কার্য্য সমস্ত বাতিল করিয়া সম্পত্তি পূর্ব্ব অবস্থায় পুনঃ স্থাপন করত ঐ পুনঃস্থাপিত ষোল আনার ॥০ আনা পাওয়ার জন্য বাদীকে নালিশ করিতে দেওয়া যাইতে পারে না।

আর এক আপত্তি এই যে, কালেক্টরকে এই মোকদ্দমায় পক্ষ করা উচিত ছিল, এবং আদালত যদি এমন নির্দ্দেশও করেন যে, নালিশ চলিতে পারে; তথাপি কালেক্টরের অনুপ-

স্থিতিতে কোন ফলদায়ক ডিক্রী প্রদত্ত হইতে পারে না।

দোষগুণ সম্বন্ধে জজের নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আরো আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা পর্য্যালোচনা করা আবশ্যকীয় বোধ হয় না, কারণ, আমরা বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমা বর্ত্তমান ভাবে চলিতে পারে না।

প্রথম আপত্তি সম্বন্ধে আমাদের বিবেচনায় জজের নির্দ্দেশ বিশুদ্ধ হইয়াছে, কারণ অদ্য আমাদের নিকট যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতে বাদীর সম্বন্ধে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কালেক্টর তাঁহার ১৮৬৭ সালের ৯ ই জুলাই তারিখের হুকুম দেওয়াতেই বাদী এমন বিবেচনা করিয়াছিল যে, তাহার হিস্যার বাটোয়ারা হইবে না, এবং জয়মণি যে হিস্যার দাবী করিয়াছিল তাহার বাটোয়ারা হইবে, এমনও বাদী বিবেচনা করে নাই। কালেক্টর যখন অবগত হইয়াছিলেন যে, জয়মণি এবং বাদীর মধ্যে ঐ হিস্যা লইয়া বিরোধ উপস্থিত ছিল, তখন ঐ দুই জনের এক জনের দাবী সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ হিস্যার বাটোয়ারা করিতে কালেক্টরের অধিকার ছিল কি না, তাহা নিতান্ত সন্দেহের কথা। ইহা সত্য বটে যে, বাটোয়ারার কালে বাদী উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহার হলফান এজাহারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহার বিশ্বাস এই ছিল যে, কেবল ।/০ ও ৵০ আনার বাটোয়ারা হইতেছিল, কারণ, সে বলে যে, আমি ॥০ আনার মালিক থাকার কথা লিপিবদ্ধ ছিল বিশ্বাস করিয়াই আমীনের চিটায় আমি দস্তখত করিয়াছিলাম। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহার হিস্যার বাটোয়ারার প্রত্যাশা অথবা প্রার্থনায় সে আমীনের নিকট উপস্থিত ছিল না, সম্পত্তির এক জন মালিক সূত্রে আইনমতে উচিত জরিপ হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য সে তাহার হিসাবপত্র লইয়া উপস্থিত ছিল। অতএব বাটোয়ারা হওয়ার কথা অবগত থাকিলেও সে ইহা জানিত না যে, তাহার নিজের হিস্যার বাটোয়ারা হইতেছিল।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তির ।/০ ও ৵০ আনার বাটোয়ারা আইনসঙ্গতই হইয়াছিল। এই সকল ব্যক্তির হিস্যা সম্বন্ধে বাদী বা জয়মণি কেহই কোন আপত্তি করে নাই, এবং কোন আপত্তি না হওয়ায় কালেক্টর ১৮১৪ সালের ১৯ কানুন মতে ন্যায্য রূপেই বাটোয়ারা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং এই সকল হিস্যা সম্বন্ধে যখন পক্ষগণের আপত্তি করার সুযোগ ছিল তখন যে স্থলে তাহারা কোন আপত্তি উপস্থিত করে নাই, সে স্থলে ঐ সকল হিস্যা মূল সম্পত্তি হইতে উচিত ও বৈধরূপেই পৃথক্ হইয়াছে এবং তাহা দেওয়ানী আদালতে নালিশের দ্বারা পুনরায় তাহার সহিত একত্রিত হইতে পারে না। এই কারণে আমার বিবেচনায় বর্ত্তমান নালিশ নিষ্ফল হইবে।

তৃতীয় আপত্তি সম্বন্ধেও নালিশ নিষ্ফল হইবে। যদি আদালত এমন নির্দ্দেশও করেন যে, বাদী তাহার বিভক্ত সম্পত্তি পুনরায় একত্রিত করিতে এবং ঐ প্রকার একত্রিত সম্পত্তির ১৬ আনার মধ্যে ॥০ আনার স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে স্বত্ববান, তথাপি ঐ নালিশে কালেক্টরকে পক্ষ না করিলে হুকুম অকর্ম্মণ্য হইবে, কারণ, ঐ হুকুম কালেক্টরের উপরে বাধ্যকর হইবে না।

এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করি এই নালিশ খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে, কিন্তু জয়মণির বিরুদ্ধে বাদীর যে কোন দাবা থাকে, এই হুকুমের দ্বারা তাহার কোন ক্ষতি হইবে না।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—বিচারপতি লক এই মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। আমি বিবেচনা করি যে, নিষ্পত্তির জন্য প্রতিবাদিনী জয়মণিকে মোকদ্দমার অন্যান্য প্রতিবাদী হইতে পৃথক্ করিতে হইবে; কারণ, ঐ প্রতিবাদিনী সম্বন্ধে মোকদ্দমার ভাব অন্য প্রতিবাদী সম্বন্ধীয় ভাব হইতে অনেক বিভিন্ন। বাদী বলে যে, সে প্রতিবাদিগণের সহিত এক এজমালী অবিভক্ত সম্পত্তির শরীক, এবং সে প্রার্থনা করে যে, ঐ সম্পত্তির ॥০ আনা অংশে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত হয়, এবং কালেক্টর ঐ সম্পত্তির যে বাটোয়ারা করিয়াছেন, তাহা অন্যথা হয়। প্রতিবাদী হরচন্দ্র প্রভৃতির ১২৭৩ সালের ৫ ই ফাল্গুনের, পরমানন্দ প্রভৃতির ১২৭৩ সালের ৩ রা চৈত্রের এবং বাদীর ১২৭৪ সালের ১ লা আষাঢ়ের দরখাস্তে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহারা সকলেই এক বিষয়ের জন্য কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করে। তাহারা যে সম্পত্তির শরীক তাহা একই প্রকারে বিভক্ত করার জন্য তাহারা সকলে দরখাস্ত করে; তাহারা সকলেই বলে যে, হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং তাহার শরীকেরা ॥০ আনা পাইবে। অতএব প্রথমতঃ, তাহারা ১৮১৪ সালের ১৯ কানুনের ৪ ধারার

২ প্রকরণের অন্তর্গত, অর্থাৎ তাহারা এজমালী সম্পত্তির মালিক স্বরূপে প্রত্যেকে আপন আপন হিস্যা বিভাগ করিয়া লইতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু তাহারা তাহা হইতেও অধিক ছিল, অর্থাৎ তাহারা ঐ ধারার ১ ম প্রকরণান্তর্গত ব্যক্তি, কারণ, তাহারা যে প্রকার তাহাদের হিস্যার বর্ণনা করিয়াছে, সেই অংশ মত তাহারা তাহাদের সম্পত্তি বিভাগ করার প্রার্থনা করিয়াছে। অতএব যখন ইহা অনুমান করা যায় যে, অন্য কোন শরীক ঐ বাটোয়ারার প্রতি আপত্তি করে নাই, তখন এই সকল ব্যক্তি সম্বন্ধে কালেক্টর তৎক্ষণাৎ তাহাদের দরখাস্ত অনুসারে তাহাদের হিস্যার বাটোয়ারা করিতে সক্ষম ছিলেন। পাঁচ ও তিন আনা হিস্যা সম্বন্ধে স্বীকৃত হইয়াছে যে, কোন শরীক আপত্তি করে নাই, এবং এখনও করে না; অতএব কালেক্টর এই দুই হিস্যার যে বাটোয়ারা করিয়াছেন, তাহাতে আইন মতে সকল শরীকের, বিশেষতঃ, বর্ত্তমান বাদীর সম্মতি ছিল, অতএব ঐ বাটোয়ারা তাহাদের প্রত্যেকের ও সকলের উপরেই বাধ্যকর। অতএব বাদী আপনাকে এজমালী ও অবিভক্ত সম্পত্তির ৷৷০ আনার শরীক ব্যক্ত করার ও বাটোয়ারার কার্য্য অন্যথা করার নালিশ করিতে পারে না। সে আপন দরখাস্তেই এই পাঁচ ও তিন আনার বাটোয়ারার প্রস্তাব করিয়াছিল।

কিন্তু প্রতিবাদিনী জয়মণি সম্বন্ধে মোকদ্দমার কিছু প্রভেদ আছে। সে এই সকল দরখাস্তের কোন পক্ষ ছিল না। সে বাস্তবিক বর্ত্তমান বাদীর বিরুদ্ধ স্বত্বের দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। সে বলে যে, বর্ত্তমান বাদী এমন বাটোয়ারার প্রার্থনা করিয়াছে, যাহাতে সে এই সম্পত্তির ৷৷০ আনার মালিক বলিয়া ব্যক্ত হইবে, কিন্তু আমি বাস্তবিক ।৵০ আনার মালিক, অতএব এই বাটোয়ারা হইতে পারে না। অতএব কালেক্টর বাদীর অনুকূলে ঐ ৷৷০ আনার বাটোয়ারা করিতে ন্যায্য রূপেই অস্বীকার করেন। কিন্তু বর্ত্তমান বাদীর নিজের দরখাস্ত যাহা ঐ সময়ে কালেক্টরের নিকট উপস্থিত ছিল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, জয়মণি যেমন বাদীর ঐ ছয় আনার বাটোয়ারার প্রতি আপত্তি করিয়াছিলেন, বাদীও সেই রূপ জয়মণির ছয় আনার বাটোয়ারার প্রতি আপত্তি করিতেছিল; এবং যদিও এই বিষয়ে আমি কোন স্পষ্ট রায় ব্যক্ত করিলাম না, তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, জয়মণির অনুকূলে বাটোয়ারা হওয়ার জন্য কালেক্টরের হুকুম হয়ত অন্যায় হইয়াছে, এবং তাহা দিতে তাঁহার কোন অধিকার ছিল না। কিন্তু সে যাহা হউক, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যদি বাটোয়ারা অন্যথা করিতে হয়, অথবা বাদীর সম্বন্ধে তাহা যত দূর ক্ষতি-জনক হইয়াছে, তত্দূর অন্যথা করার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তবে তাহা কালেক্টরকে পক্ষ করিয়া নালিশের দ্বারা করিতে হইবে, এবং আমি বিবেচনা করি যে, আমরা এক্ষণে এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিলে সকলেরই ক্ষতি হইবে, অতএব নথীর বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা তাহা করিতে পারি না। পরন্তু, বাদী এমন এক নালিশ উপস্থিত করিয়াছে যে তাহার নিজের বর্ণনা মতেই দেখা যাইতেছে যে, তাহা অপকৃষ্ট বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করে। অতএব আমার মতে এই নালিশ অবশ্য ডিস্‌মিস্ হইবে, এবং তাহা ডিস্‌মিস্ করাই সকল পক্ষের সুবিধা-জনক হইবে। কিন্তু ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইল যে, জয়মণি এবং বাদীর সম্বন্ধীয় বাটোয়ারার বিষয়ে বাদীর যে কিছু স্বত্ব আছে, তাহা এই আদালতের অথবা নিম্ন আদালতের কোন নিষ্পত্তি দ্বারা মীমাংসিত হইল না।

অতএব আমাদের নিষ্পত্তির ফল এই যে, জয়মণি ভিন্ন অন্য প্রতিবাদিগণ ও বাদীর মধ্যে ১৮৬৭ সালের ১৯ এ ডিসেম্বর তারিখে বাটোয়ারার যে কার্য্য হয়, তাহা চূড়ান্ত হইয়াছে, এবং তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না, এবং ঐ কার্য্যের যে ভাগ বাদী ও জয়মণির সহিত সম্বন্ধ রাখে, তদ্বিষয়ে আমরা কোন রায় প্রদান অথবা নিষ্পত্তি করিলাম না, আমরা কেবল ইহাই ব্যক্ত করিলাম যে, এই নালিশের অসম্পূর্ণ ভাব দৃষ্টে খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করা গেল।

( গ )

৩১ এ মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি ই জ্যাক্সন এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ১১০ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের জজের ১৮৭০ সালের ৭ ই মার্চের হুকুমের বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

চিন্তামণ সিংহ চৌধুরী (মোজাহেমদার) আপেলাণ্ট।

মসম্মত নওলক্ষকুমারী ( প্রার্থী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরি ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং রমেশচন্দ্র মিত্র, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন ও বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রমাধব ঘোষ ও লক্ষ্মীচরণ বসু, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন হিন্দু তাহার পরিবারের অন্য ব্যক্তির সহিত পৃথক্ থাকিলে, তাহার মৃত্যুর পরে তাহার প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাহার বিধবা স্ত্রী সার্টিফিকেট পাইতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—রণজিত সিংহ নামক এক ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী আপন স্বামীর প্রাপ্য আদায় করণার্থে ১৮৬০ সালের ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যে দরখাস্ত করে তাহার উপরে জেলা ভাগলপুরের জজ যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে। বিধবাকে সার্টিফিকেট দেওয়ার প্রতি মৃত ব্যক্তির অব্যবহিত পুরুষ দায়াধিকারী এবং খুড়তাত ভ্রাতা চিন্তামণ সিংহ চৌধুরী আপত্তি করে। কিন্তু জজ হুকুম দেন যে, বিধবাকে সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়। ঐ হুকুমের বিরুদ্ধে চিন্তামণ আপীল করিয়াছে।

তাহার উকীল বলেন যে, ঐ বিধবা সার্টিফিকেট পাইতে পারে না, কারণ, মৃত রণজিত সিংহ চিন্তামণ চৌধুরীর সহিত এক এজমালী হিন্দু পরিবারভুক্ত ছিল, অতএব তৎপ্রদেশে প্রচলিত মিতাক্ষরা মতে চিন্তামণই মৃত ব্যক্তির দায়াধিকারী, এবং বিধবা কেবল ভরণপোষণের স্বত্ববতী; সুতরাং চিন্তামণই সার্টিফিকেট পাইতে স্বত্ববান। আপেলাণ্টের উকীলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, মৃত ব্যক্তির এবং আপেলাণ্টের পরিবার এজমালী থাকার বিষয়ে তাঁহার মওক্কেল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছে কি না। তিনি বলেন যে, ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দ্বারা আদালতে যে কতিপয় দরখাস্ত দাখিল হয় তাহাই প্রমাণ স্বরূপ নথীতে আছে। কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে, এই সকল দরখাস্ত কাহার দ্বারা দাখিল হইয়াছে তাহার কোন প্রমাণ দর্শান হয় নাই। পরিবার যৌত থাকার পোষকতায় উকীল অন্য কোন প্রমাণ আমাদের নিকট পাঠ করেন নাই, কিন্তু অন্তে তিনি এই কথা বলিয়া তাঁহার মোকদ্দমার পোষকতা করিয়াছেন যে, পরিবার পৃথক্ থাকার বিষয়ে বিধবা কোন প্রমাণ দর্শায় নাই। কিন্তু নথীতে এমত প্রমাণ আছে যদ্দ্বারা দৃষ্টব্যে বোধ হয় যে, অন্ততঃ, পরিবারের সম্পত্তির কতক ভাগ সম্বন্ধে পরিবার পৃথক্ ছিল। স্পষ্ট এক তক্‌সিমনামা আছে যাহা আপেলাণ্ট অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ইহা ছাড়াও, দেখা যাইতেছে যে, পরিবার যৌত থাকার প্রসঙ্গের উপরে আপেলাণ্ট নিম্ন আদালতে তাহার দাবী স্থাপন করে নাই; সে এই হেতুবাদে দাবী করে যে, ঐ তক্‌সিমনামামতে সে গুঞ্জুর নামক এক সম্পত্তি সম্বন্ধে অব্যবহিত দায়াধিকারী, কারণ, পারিবারিক প্রথা অনুসারে এবং পরিবারস্থ পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমস্ত দলীল করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে ঐ সম্পত্তি মৃত মালিকের অব্যবহিত পুরুষ দায়াধিকারীর হস্তে গমন করিবে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, গুঞ্জুরের স্বত্বের প্রসঙ্গের সহিত এই সার্টিফিকেটের কোন সম্পর্ক নাই। চিন্তামণ, গুঞ্জুর পাইতে স্বত্ববান হউক বা না হউক, রণজিত যদি তাহার পরিবারের সহিত পৃথক্ থাকিয়া থাকে, তবে তাহার বিধবা স্ত্রী রণজিতের প্রাপ্য আদায় করিবার সার্টিফিকেট পাইতে স্বত্ববতী হইবে। নথীর প্রমাণে নিশ্চয় দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তির অধিকাংশ সম্বন্ধে রণজিত পৃথক্ ছিল, এবং তাহার পৃথক্ দখল সেরূপ জজের দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে, রণজিত সিংহের সহিত চিন্তামণ চৌধুরীর পিতা রামদয়ালের দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমা হয় তাহাতেও ঐ রূপ সংস্থাপিত হয়। এমত অবস্থায়, আমরা বিবেচনা করি যে, রণজিত সিংহের প্রাপ্য আদায় করার সার্টিফিকেটের জন্য তাহার বিধবা স্ত্রী যে দরখাস্ত করে, তাহা নিম্ন আদালতের জজ বিশুদ্ধ রূপেই মঞ্জুর করিয়াছেন। এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

( গ )

# প্রধানতম বিচারালয়ের

## আপীল বিভাগের

# মালসংক্রান্ত নিষ্পত্তি।

৬ ষ্ঠ ভাগ। ১৮৭০

৪ ঠা জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২০৬১ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২৮ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মে তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শ্যামাসুন্দরী দেবী ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) আপেলাণ্ট।

দিগম্বরী দেবী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণদয়াল রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—আপীল প্রথম বিচারাধিকার-বিশিষ্ট আদালতের 'নিষ্পত্তির' বিরুদ্ধে হয় না, তাঁহার 'ডিক্রীর' বিরুদ্ধে হয়।

যে স্থলে প্রতিবাদীর অনুকূলে সম্পূর্ণ ডিক্রী হয়, কিন্তু রায়েতে কোন কোন ইস্যু তাহার প্রতিকূলে নিষ্পন্ন হয়, সে স্থলে ঐ নিষ্পত্তির যে অংশটি ঐ প্রতিবাদীর প্রতিকূল তদ্বিরুদ্ধে তাহার আপীল করার অধিকার নাই।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—এই মোকদ্দমার বাদিগণ প্রতিবাদী-রাইয়তদের নিকট বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ৎ পাওয়ার জন্য নালিশ করে।

প্রথম আদালত সর্ব্বাগ্রে নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতিবাদিগণ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার বিধানমতে বর্দ্ধিত খাজানার দায় হইতে মুক্ত নহে। কিন্তু কবুলিয়ৎ সম্বন্ধে ঐ আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, বাদিগণ ঠিক তাহাদের দাবীকৃত হারে কবুলিয়ৎ পাওয়ার স্বত্ব সপ্রমাণ করিতে পারে নাই; অতএব তিনি তাহাদের নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদিগণ এই নিষ্পত্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু তাহার যে ভাগে ব্যক্ত হয় যে, প্রতিবাদিগণ ঐ আইনের ৪ ধারার মর্ম্মানুসারে রক্ষিত নহে, প্রতিবাদিগণ সেই ভাগের বিরুদ্ধে আপীল করে এবং জজ বাদিগণের নালিশ ডিস্‌মিস্ করার প্রথম আদালতের ডিক্রী স্থিরতর রাখিয়া সেই আদালতের নিষ্পত্তির ঐ ভাগ অন্যথা করেন যাহাতে ব্যক্ত ছিল যে, প্রতিবাদিগণ উক্ত ৪ ধারার বিধান মতে রক্ষিত নহে; এবং জজ ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার রায়ে প্রতিবাদিগণ প্রমাণানুসারে রক্ষিত।

বাদিগণ নানা হেতুবাদে জজের এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে খাস আপীল করিয়াছে; কিন্তু আমরা কেবল তাহার প্রথম হেতুর পর্য্যালোচনা ও মীমাংসা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। তাহা এই যে, যে স্থলে প্রথম আদালতে বাস্তবিক প্রতিবাদিগণের অনুকূলে ডিক্রী হইয়াছিল, সে স্থলে প্রতিবাদিগণ সেই আদালতের নিষ্পত্তির যে ভাগের প্রতি আপত্তি করে, সেই ভাগের বিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল উপস্থিত হইতে পারে কি না।

এ বিষয়ের অনুকূল বা প্রতিকূল এই আদালতের কোন নজীর আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই ; কিন্তু আইনের বাক্যের ও অভিপ্রায়ের যত দূর সঙ্গত অর্থ আমরা করিতে পারি, তাহা করিয়া আমরা বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় প্রতিবাদিগণ নিম্ন আপীল-আদালতে আপীল করিতে পারে না। আমরা দেখিতেছি যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২৩ ধারার বিধানে ব্যক্ত আছে যে, নিম্ন আদালতে যে আপীল হইবে তাহা প্রথম বিচারাধিকার-বিশিষ্ট আদালতের "ডিক্রীর বিরুদ্ধে" হইবে, এবং ঐ আইনের ৩৫০ ধারার বিধান এই যে, আপীল-আদালত যে রায় প্রদান করিবেন তাহা প্রথম আদালতের ডিক্রী স্থির রাখার অথবা অন্যথা কিম্বা রূপান্তর করার জন্য প্রদান করিবেন, এবং যদিও ইহা সত্য বটে যে, ঐ আইনের ৩৩৪ ধারায় লেখা আছে যে, আপীলের দরখাস্তে "নিষ্পত্তির" প্রতি আপত্তি লেখা থাকিবে, তথাপি আমাদের বোধ হয় যে, প্রথম আদালতের ডিক্রী কি প্রকারে আপেলাণ্টের ক্ষতিজনক হইয়াছে তাহা নিষ্পত্তির প্রতি আপত্তি দৃষ্টে আপীল-আদালত বুঝিতে পারিবেন বলিয়াই ঐ বিধান করা হইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে, আপেলাণ্টের ক্ষতি হইলে তাহা সংশোধন করাই আপীলের উদ্দেশ্য, এবং আপীলের জন্য, কোন্ দলীলের দ্বারা ক্ষতি হয় তাহা আইনে দেখাইয়া দিয়াছে, এবং সেই দলীলের নাম "ডিক্রী"। অতএব যদি প্রথম আদালতের ডিক্রী আপেলাণ্টের ক্ষতিজনক না হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহার অনুকূল হয়, তবে যে রায়ের দ্বারা ঐ ডিক্রী হয় তাহার কেবল কয়েকটি বাক্য ক্ষতিজনক বিবেচিত হইলেই সেই ডিক্রীর বিরুদ্ধে কি প্রকারে আপীল হইতে পারিবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

অতএব যে স্থলে এই নিষ্পত্তি আপেলাণ্টের অনুকূলেই হইয়াছিল, এবং যে স্থলে ঐ ডিক্রী কোন প্রকার অন্যথা করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল না, সে স্থলে আমরা বিবেচনা করি যে, আইন মতে তদ্বিরুদ্ধে নিম্ন আপীল-আদালতে আপীল হইতে পারে না।

আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন আপীল-আদালতের এই আপীল গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না, অতএব আমরা ঐ আদালতের রায় অন্যথা করিয়া প্রথম আদালতের ডিক্রী স্থির রাখিলাম। আমাদের বিবেচনায়, খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণ নিম্ন আদালতের ও এই আদালতের আপীলের খরচা দিবে। (গ)

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ১৪৫২ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ১৪ ই অক্টোবরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

পণ্ডিত শিবপ্রকাশ মিশ্র প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

ফকীর রায় (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু তারকনাথ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক ডিক্রী দ্বারা কোন জমিদারীর মালিকের পরিবর্ত্তন হওয়ার পরে, এক জন দখলী-স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা নূতন জমিদার-কর্ত্তৃক অবৈধ রূপে বেদখল হইয়াছে প্রসঙ্গে মাল-আদালতে নালিশ করে। এই নালিশ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে চলিতে পারে।

বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত অতি সরল। বাদী এক জন রাইয়ৎ; সে অনেক বৎসর যাবৎ, (বাস্তবিক ১৫ বৎসরের

ন্যূন নহে,) ১৬ বিঘা ভূমির দখলীকার আছে। দেখা যাইতেছে যে, ভবানন্দপুর নামক এক মৌজার জমিদার ঝুমক সিংহ প্রভৃতিকে সে পূর্ব্বে খাজানা দিয়া আসিয়াছে। এই ভূমির স্বত্ব সম্বন্ধে ১৮৬৮ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে শিশোয়ার জমিদার পণ্ডিত শিবপ্রকাশ মিশ্র প্রভৃতি এক ডিক্রীর অন্তর্গত অন্যান্য ভূমির সহিত বাদীর ভূমিও শিশোয়ার অন্তর্গত বলিয়া দখল পান। শিশোয়ার জমিদার পণ্ডিত শিবপ্রকাশ মিশ্র প্রভৃতি বাদীকে আইন-বিরুদ্ধ রূপে বেদখল করিয়া তাহার শস্য কাটিয়া তাহা লাঙ্গলের দ্বারা উঠাইয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া বাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

ভাগলপুরের জজ, ডেপুটি কালেক্টরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া এই ডিক্রী দেন যে, বাদী পুনঃ-দখল পাইতে পারে।

খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, প্রতিবাদী ও বাদীর মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজারূপ সম্বন্ধ নাই; অতএব মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে উপস্থিত না হইয়া দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল।

আমরা বিবেচনা করি, ঐ তর্কের কোন হেতু নাই, এবং নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি বিশুদ্ধই হইয়াছে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদীর দখলী-স্বত্ব ছিল। ঐ জমি মৌজা শিশোয়ার অন্তর্গত বলিয়া ডিক্রী হওয়ায় সেই ডিক্রীর বলে প্রতিবাদী শিবপ্রকাশ সিংহ দখল লওয়াতে মালিকের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহার দ্বারা বাদীর দখলী-স্বত্বের ব্যতিক্রম হয় নাই। ঐ ভূমি মৌজা শিশোয়ার অন্তর্গত বলিয়া যে সময়ে শিবপ্রকাশ সিংহকে তাহাতে দখল দেওয়া হয়, সেই সময় হইতেই সে, বাদী দখলী-স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজা বলিয়া বাদীর নিকট হইতে কর আদায় ও গ্রহণ করিতে স্বত্ববান্‌ হইয়াছে; অতএব তাহার বিরুদ্ধে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে নালিশ চলিতে পারে।

আমরা নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ করিলাম। (গ)

৬ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২২৪৭ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৮ ই জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

জহীরুদ্দীন মহম্মদ (প্রতিবাদিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

দেবীপ্রসাদ সিংহ (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস, ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং কৃষ্ণদয়াল রায় আপেলাণ্টের উকীল।

মেং সি, গ্রেগরি এবং বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন তহসীলদারের চিহ্নিত (স্বাক্ষরিত নহে,) মবলগবন্দী-যুক্ত চালান ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত "দাখিলা" নহে।

উক্ত ধারা অনুসারে নিম্ন আপীল-আদালত যে ক্ষতি-পূরণের হুকুম দেন, তাহা অতিরিক্ত হইলেও, আইনের বিধানমত হইলে খাস আপীলে তাহা আইন-ঘটিত ভ্রম বলিয়া তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না।

**বিচারপতি বেলি।**—আমাদের মতে এ মোকদ্দমায় নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি

স্থির থাকিবে; কিন্তু অবস্থা দৃষ্টে, খরচা দেওয়া যাইবে না।

৩০১ টাকার দাখিলা না দেওয়ায় তাহার ক্ষতি-পূরণের দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত হয়, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারার বিধান অনুসারে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে অর্থাৎ ৬০২ টাকার দাবী করা হয়।

বাদীর নালিশ এই যে, উক্ত টাকা করের বাবৎ দিয়া সে তাহার দাখিলা পায় নাই।

প্রতিবাদী উক্ত টাকা আদায়ের বিষয় স্বীকার করে, কিন্তু বলে যে, প্রথমতঃ, মবলগবন্দী ও তাহার নায়েবের চিহ্নযুক্ত চালান দ্বারা, এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন এক মহালে বাদীর শরীক আতাউল্লাকে সে যে এক প্রকৃত দাখিলা দেয় তাহা দ্বারাই বাদীকে দাখিলা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত আতাউল্লা এই বিশেষ মহালের শরীক না থাকিবার স্বীকার পাইয়াছে।

এই তর্ক অনুসারে ইসু এই হয় যে, "প্রতিবাদী দাখিলা দিয়াছিল কি না।"

এই ইসু সম্বন্ধে প্রথম আদালত স্থির করেন যে, বাদী ৩০১ টাকার দাখিলার ন্যায় এক দলীল পাইয়াছে, এবং উক্ত প্রদেশে স্বতন্ত্র দাখিলা দিবার বড় প্রথা নাই।

নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া উভয় আদালতের সম্পূর্ণ খরচা সমেত বাদীকে ৪৫১৷৷০ টাকার ডিক্রী দেন।

খাস আপীলের দরখাস্তে ছয়টি হেতু আছে; কিন্তু তাহার প্রথম ৩ টি নিম্ন আদালত দ্বয়ের কোন আদালতে উত্থাপিত না হওয়ায় আমরা তাহা উত্থাপন করিতে দিলাম না। আপীলের প্রধান হেতুই চতুর্থ হেতু; তাহা এই যে, নায়েবের চিহ্নিত মবলগবন্দীযুক্ত চালানের নকল বাদী আপন প্রদত্ত করের দাখিলা স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং বাদী যে দাখিলা চাহিয়াছিল, এবং তাহাতেও তাহা দেওয়া হয় নাই, এমত সে সপ্রমাণ করে নাই; সে বিষয়ের প্রমাণ-ভার তাহারই উপর ছিল; অতএব নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রাখিবার কোন প্রমাণ নাই।

এ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পক্ষগণ নিম্ন আদালতদ্বয়ে যে ইসু গ্রহণ করে, তাহা ইহা নহে যে, বাদী যে দাখিলা চাহিয়া পায় নাই, তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে কি না; কিন্তু উভয়পক্ষই তাহাদের নিজের নিজের বাক্য সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়; প্রতিবাদী কহে যে, সে দাখিলা দিয়াছে, এবং বাদী সপ্রমাণ করে যে, সে তাহা পায় নাই।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারায় এই লেখা আছে,—"কোন কোর্পা প্রজার কি "রাইয়তের পাট্টাতে যত খাজানা লেখা আছে, "কিম্বা এই আইনের বিধান মতে তাহার যত "দিতে হয়, তাহার অধিক কিছু টাকা যদি আবও-"য়াব বলিয়া কিম্বা অন্য কোন ছলে জোর "করিয়া লওয়া যায়, ও কোর্পা প্রজা কি রাইয়ৎ "কি চাষী খাজানা বলিয়া যে টাকা দিয়াছে, "তাহার কবজ যদি তাহাকে না দেওয়া যায়, "তবে যত টাকা সেই প্রকারে জোর করিয়া লওয়া "গেল, কিম্বা খাজানার যত টাকা দেওয়া গেল, "তাহার দ্বিগুণ পর্য্যন্ত টাকা সেই প্রজা প্রভৃতি "খাজানা যাহার নিকটে দিতে হয়, তাহার স্থানে "ফিরিয়া পাইতে পারিবে। যে সালের কি "যে সালের খাজানার রসীদ দেওয়া যায়, তাহা "বিশেষ করিয়া ঐ কবজে লিখিতে হইবে। "তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতে যদি স্বীকার না হয়, "তবে কবজ না দেওয়ার তুল্য জ্ঞান হইবে।"

এই ধারায় যে দাখিলার কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে আমাদের বিবেচনায় উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় তহসীলদারের চিহ্নযুক্ত (স্বাক্ষর যুক্ত নহে,) মবলগবন্দী-বিশিষ্ট চালান বুঝায় না। বিশেষ, নিম্ন আপীল-আদালত স্পষ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ঐ দাখিলা বাদী পায় নাই, এবং যে আতাউল্লাকে ঐ দাখিলা দেওয়া হয় বলিয়া কথিত

হইয়াছে, সে বাদীর এই বিশেষ মহালের শরীক নহে; অতএব আতাউল্লাকে যে কোন দাখিলা দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারা মতে বাদীকে বিধিমত দাখিলা দেওয়া হয় না। বাদীর আর এই প্রমাণ আছে যে, সে উক্ত চালানে সন্তুষ্ট না হইয়া উপযুক্ত বিধিমত দাখিলার জন্য এক পত্র লেখে, কিন্তু দাখিলা পায় না।

আমাদের মতে এই প্রমাণ এবং এই সকল বৃত্তান্ত দৃষ্টে, নিষ্পত্তিতে কোন আইন-ঘটিত ভ্রম নাই, অথবা উক্ত নিষ্পত্তির পোষকতায় যে কোন বিধিমত প্রমাণ নাই, তাহাও নহে।

ক্ষতি-পূরণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যে টাকার দাখিলা দেওয়া হয় নাই, আইন অনুসারে তাহার দ্বিগুণ টাকার ক্ষতি-পূরণ হইতে পারে, এবং এ মোকদ্দমায় নিম্ন আপীল-আদালত বাদীকে তাহার দেড়া দিয়াছেন; এবং যদিও এ টাকা আমাদের নিকট অতিরিক্ত বোধ হয়, তথাপি আমাদের এমত বলার সাধ্য নাই যে, এ টাকা দেওয়ায় আইন-ঘটিত ভ্রম হইয়াছে এবং এমত বিষয় সম্বন্ধে খাস আপীলে নিম্ন আপীল-আদালতের হুকুমে আমরা হস্তক্ষেপ করিতে পারি।

অতএব আমাদের মতে এই আপীল ডিস্মিস্ হইবে; কিন্তু এ মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায়, খরচা দেওয়া যাইবে না। (ব)

---

১৭ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৪২৫ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ-পরগণার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২৬ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ১৪ ই জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গঙ্গারাম শাস্ত্রা প্রভৃতি (মোক্তাহেমদার)
আপেলাণ্ট।

রামকমল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি (বাদী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু তারকনাথ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীচরণ দত্ত এবং উপেন্দ্রচন্দ্র বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে ব্যক্তি ১৮৬৫ সালের ৮ আইনানুযায়ী নীলামে কোন পত্তনী-তালুক ক্রয় করে, এবং যে তাহা দর-ইজারদার বলিয়া দাবী করে, তাহাদের মধ্যে এই বিষয়ের বিচার করিতে হইবে যে, দর-ইজারদার কর আদায় করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে দখীলকার ছিল কি না। যে তাহা থাকিলে, উক্ত দর-ইজারা রহিত করার প্রশ্নের নিষ্পত্তি কালেক্টরের দ্বারা হইতে পারে না।

বিচারপতি লক।—আমার বিবেচনায়, এ মোকদ্দমায় জজের এ কথা বলায় উচিত মতই আইনের বিধান সংস্থাপন করা হইয়াছে যে, "রেস্পণ্ডেণ্টগণ বলে যে, ক্রেতা প্রতারণা-মূলক "স্বত্ব গ্রহণ না করিলে, সে পর্য্যন্ত সে ঐ সকল "ব্যক্তির বিরুদ্ধে আপন স্বত্ব সংস্থাপন না "করে, যাহারা এই প্রকার মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব "উত্থাপন করে, সে পর্য্যন্ত ইহা তাহাকে "বেদখল রাখিবার তুল্য হয়; কিন্তু ইহা ক্রেতার "পক্ষে যত কষ্টদায়কই হউক না কেন, আমার "বিবেচনায়, যে স্থলে কর আদায়ের বিষয় "সংস্থাপিত হয়, এবং স্পষ্ট উৎকৃষ্ট প্রমাণ "দ্বারা দেখান হয় যে, কথিত মধ্যবর্ত্তী স্বত্ব "যথার্থই ছিল, সে স্থলে আপেলাণ্টের আপত্তি "উত্তম এবং বর্ত্তমান আইন অনুসারে প্রবল "হইবে।" জজ তদনন্তর বলেন,—"কিন্তু বস্তুতঃ, "নথীতে এমত কোন প্রমাণ নাই যদ্দ্বারা, ইজারা "থাকিবার বিষয় দেখান যায়। প্রজাগণ যে "সকল দাখিলা দাখিল করে, তাহা এবং দর-"ইজারা পাট্টা দ্বারা ঐ ইজারা থাকিবার বিষয়

" প্রকারান্তরে সপ্রমাণ হয়, কিন্তু পাট্টাদাতাগণ " ক্রমান্বয়ে যে সকল স্বত্ব হস্তান্তর করিয়া দেয়, " তাহার কোন প্রমাণ নাই।"

প্রথম আদালতের রায় দৃষ্টে আমরা দেখিতেছি যে, একটি মাত্র ইসু ধার্য্য হয়, যথা,— " বাদিগণ ১৮৬৫ সালের ৮ আইন অনুযায়ী " নীলামে পত্তনী-তালুক ক্রয় করিবার পূর্ব্বে " পত্তনীদার যে সকল দাবী দাওয়া সৃজন করে, " বাদিগণ তাহা অন্যথা করিয়া প্রতিবাদিগণের " নিকট কর পাইতে পারে কি না?" মোস্তাহেন্দার, আপেলাণ্ট যে কর আদায় দ্বারা দখীলকার ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে যে তাহাকে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, এমত দেখা যায় না; এবং আমরা বিবেচনা করি, এই প্রকারের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে উক্ত বিষয়েরই মীমাংসা করিতে হইবে, যথা, এই ব্যক্তি যে দর-ইজারদার স্বরূপে দাবী করে, সে কর আদায় দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে দখীলকার ছিল কি না। সে তাহা থাকিলে, উক্ত স্বত্ব রহিত হওয়ার বা রহিত হওয়ার যোগ্যতার প্রশ্নের মীমাংসা কালেক্টরের দ্বারা হইতে পারে না। আমরা উল্লিখিত বিষয়ের ইসু ধার্য্য করিতে এবং পক্ষগণকে দখল সপ্রমাণার্থে প্রমাণ দাখিল করিবার অবকাশ দিতে এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইলাম।

ফলানুসারে এই আপীলের খরচার আদেশ হইবে।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমি পুনঃপ্রেরণের হুকুমে সম্মত হইলাম। (ব)

১৭ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৩৫৫ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অতিরিক্ত জজ বাগহাটের ডেপুটি-কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২৭ এ জুনের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১ লা মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

বিপিনবিহারী বসু প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আশুতোষ ধর এবং বংশীধর সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—যে প্রতিবাদী বলে যে, সে সামিলাৎ তালুকদার অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনের ৫ ধারার বিধানান্তর্গত তালুকদার, তাহার কর বৃদ্ধির নালিশে আদালতের যে যে প্রণালী অবলম্বন বিচার করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইল।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—এই মোকদ্দমা কর বৃদ্ধির দাবাতে উপস্থিত।

বাদী এই নোটিস দেয় যে, প্রতিবাদী আপনাকে সামিলাৎ তালুকদার বলিলেও, বাস্তবিক তাহার জমা কায়েমী নহে, এবং নোটিসে যে হারের দাবী করা হয় তাহা ঐ পরগণার এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমির হার।

প্রতিবাদী বলে, সে সামিলাৎ তালুকদার, অর্থাৎ (তাহার বাক্যের মর্ম্মে বোধ হয়) ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনের ৫ ধারার মর্ম্মান্তর্গত তালুকদার।

নিম্ন আপীল-আদালত প্রতিবাদীর প্রদত্ত কোন কোন প্রমাণ, যথা ১৮৫৩ এবং ১১৫৪ সালের দুই কবুলিয়ৎ এবং ১১৯৭ সালের এক জরিপের চিঠার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এ মোকদ্দমার একমাত্র ইসু এই যে, " প্রতিবাদী উক্ত ভূমি প্রজা স্বরূপে, না তালুকদার স্বরূপে ভোগ করে।" এবং এই ইসু সম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালত এই নিষ্পত্তি করেন, যথা—

"এক্ষণে বাদী এই সকল কাগজ দ্বারা উক্ত "ভূমি তালুক বলিয়া স্বীকার করে, এবং ঐ "সকল দলীলের সহীমোহরের নকলেও তাহা "তালুক বলিয়া প্রকাশ; পরন্তু, বোর্ড কালেক্ "টরের চিঠীর উত্তরে ১৮১৬ সালের ৩ রা "সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠীতে তালুক বলিয়া "স্বতন্ত্র রূপে কর আদায় করিতে দেন; তাহা "কালেক্টরের ১৮১৭ সালের ৩ রা জানুয়ারির "রুবকারী দ্বারা আরো প্রতিপন্ন হইয়াছে। "জমার প্রকৃত পরিমাণ কি, অথবা ঐ সকল কাগজে "অন্যায় হস্তক্ষেপ হইয়াছে কি না, এ মোকদ্দমায় "তাহা দেখান বড় দরকারী নহে। উক্ত ভূমি পত্ত- "নীই হউক বা সামিলাৎই হউক, তাহা যে তালুক "এবং তন্নিবন্ধন ১৮৫৯ সালের ১০ আইন "অনুসারে তাহার কর বৃদ্ধি হইতে পারে না, "ইহা যথেষ্ট রূপেই সপ্রমাণ হইয়াছে। "অতএব আমি এই আপীল খরচা সমেত "ডিস্‌মিস্ করিলাম।" অতএব জজ এই নিষ্পত্তি করেন যে, উক্ত ভূমি এমত প্রকারের যে তৎসম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিধান মতে নালিশ চলিতে পারে না।

কিন্তু আপীলে আমাদের নিকট দর্শান হইয়াছে যে, অনেক প্রকারের তালুকদার আছে, যথা—১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫ ধারার বিধানানুযায়ী তালুকদার, উক্ত কানুনের ৫১ ধারার বিধানানুযায়ী অধীন তালুকদার, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৫ এবং ১৬ ধারা-বর্ণিত তালুকদার; অতএব খাস আপেলান্টের পক্ষে তর্ক হইয়াছে যে, প্রতিবাদীর তালুক কি প্রকারের তালুক, তৎসম্বন্ধে নিম্ন আপীল-আদালত স্পষ্ট কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই।

পক্ষান্তরে, খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল তর্ক করেন যে, স্থূলে জজ এই স্থির করেন যে, আমি যে কানুনের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহার মওক্কেল ঐ কানুনের ৫ ধারার মর্ম্মানুযায়ী তালুকদার। "প্রতিবাদী প্রজা কি তালুকদার" এই ইসু সম্বন্ধে জজ নিশ্চয়ই স্থির করিতে পারিতেন যে, এস্থলে প্রতিবাদী প্রদর্শিত প্রকারেরই তালুকদার, কিন্তু বাস্তবিক জজ এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু স্থির করেন নাই। তাঁহার রায় দৃষ্টে বোধ হয়, প্রতিবাদীর ভূমি পত্তনী কি সামিলাৎ তালুক, এ বিষয় তাঁহার নিকট আবশ্যকীয় বোধ হয় নাই; এবং যখন পত্তনী এবং সামিলাৎ তালুকের বিধিমত প্রভেদ জানিয়া জজকে আমরা এরূপ বলিতে দেখি যে, এ বিষয় আবশ্যকীয় নহে, তখন একথা বলা অসম্ভব যে, প্রতিবাদী কোন্ প্রকারের তালুকদার অথবা সে সে উল্লিখিত কানুনের ৫ ধারার বিধানান্তর্গত তালুকদার, এবিষয় জজের স্পষ্ট রূপে স্থির করিবার ইচ্ছা ছিল।

অতএব আমরা বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমা জজের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে হইবে এবং তিনি প্রমাণ দৃষ্টে প্রথমতঃ এই স্থির করিবেন যে, প্রতিবাদী ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫ ধারা-বর্ণিত তালুকদার কি না। জজ এ বিষয় সম্বন্ধে প্রতিবাদীর অনুকূলে স্থির করিলে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবেন। যদি তিনি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই দেখিতে হইবে যে, প্রতিবাদী ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫১ ধারার বিধানান্তর্গত অধীন তালুকদার কি না। জজ এই বিষয়ে প্রতিবাদীর অনুকূলে স্থির করিলে বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিবেন, কারণ, এ স্থলে ঐ ধারার মর্ম্মানুরূপ নোটিস প্রতিবাদীর উপর জারী করা হয় নাই। যদি জজ এই দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধেও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্থির করেন, তবে তাঁহাকে এই দেখিতে হইবে যে, প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৬ ধারার বিধান দ্বারা রক্ষিত কি না, এবং এবিষয়ে উভয় পক্ষকে আপন আপন প্রমাণ দাখিল করিতে দিতে হইবে। যদি জজ স্থির করেন যে, প্রতিবাদী ১৬ ধারার বিধানের অন্তর্গত, তবে তিনি বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিবেন। যদি তিনি এবিষয় সম্বন্ধেও প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্থির

করেন, তবে প্রতিবাদীর বাদীকে নোটিস অনুসারে কোন বর্দ্ধিত হারে কর দিতে হইলে উচিত এবং ন্যায্য হার কি হইবে তাহা তাঁহাকে মীমাংসা করিতে হইবে, এবং এ বিষয় সম্বন্ধেও জজের উভয় পক্ষকে প্রমাণ দাখিল করিতে দিতে হইবে। ফল দৃষ্টে এই আপীলের খরচার আদেশ হইবে।

সম্মতিক্রমে ১৩৫৬ নং আপীলও এই হুকুমের অনুগামী হইল, এবং তাহাও ঐ হুকুম অনুসারে ফেরৎ পাঠান গেল।

মহারাণীর প্রিবি কৌন্সিলের মান্যবর বিচারপতিগণ ১৮৬৯ সালের ১৩ ই ডিসেম্বর তারিখে বামাসুন্দরী দাসী বনাম রাধিকা চৌধুরিণী প্রভৃতির যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন, যাহা আমরা এই রায় দিবার পরে ১৭ ই জানুয়ারি তারিখের ইংলিসম্যান সম্বাদপত্রে প্রচারিত হইবার কথা বাচনিক বলি, তাহার প্রতি আমরা এই সুযোগে জজকে মনোনিবেশ করিতে বলিতেছি। (ব)

১৯ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং স্যর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২১৪১ নং মোকদ্দমা।

ময়মনসিংহের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ৩০ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গৌরচন্দ্র সেন ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

মাণিকরাম ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস এবং কাশীকান্ত সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক। কোন মোকদ্দমা এক ডেপুটি কালেক্টর কর্ত্তৃক ডিস্‌মিস্ হয়, কিন্তু তাঁহার বিধিমত রায় না দিয়াই মৃত্যু হয়; তাহাতে নিম্ন আপীল-আদালত তাহা পুনর্ব্বিচারার্থে মৃত কর্ম্মচারীর পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারীর নিকট অর্পণ করেন। তিনি তাহা কোন পক্ষের আপত্তি ব্যতীত নথীস্থ প্রমাণ দৃষ্টেই বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করেন।

স্থির হইল যে, পক্ষগণ প্রার্থনা না করিলে পুনরায় সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া বা অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করা ঐ দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টরের অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায় এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বাদী করবৃদ্ধির দাবীতে নালিশ করে।

প্রতিবাদী বলে যে, সে ৬৲ টাকা জমার এক পাট্টা অনুসারে ভোগ করে।

ডেপুটি কালেক্টর যাঁহার নিকট এই মোকদ্দমার প্রথম বিচার হয়, তিনি বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস করেন, কিন্তু উক্ত ডেপুটি কালেক্টরের রায় তাঁহার নিজের হস্তে লিখিত না হওয়ায় এবং তাহার পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, নিম্ন আপীল-আদালত উক্ত মোকদ্দমা ১৮৬৮ সালের ১৮ ই মে তারিখে বিচারার্থে অপর এক ডেপুটি কালেক্টরের নিকট অর্পণ করেন। অতএব কোন পক্ষের কোন আপত্তি না হওয়ায় উক্ত দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টরের নিকট উক্ত মোকদ্দমার বিচার হয়, এবং কোন পক্ষ আর কোন প্রমাণ না দেওয়ায় এবং দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টরও কোন প্রমাণ গ্রহণ না করায়, তখন নথীতে যে প্রমাণ ছিল তদ্দৃষ্টেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়।

দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টরের এই বিচারে তিনি প্রতিবাদীর পাট্টার লিখিত হারের ডিক্রী দেন, এবং প্রতিবাদীর দাখিলী পাট্টা যে উৎকৃষ্ট, তাহা স্থির করিবার কারণ তিনি অতি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করেন।

নিম্ন আপীল-আদালত প্রথমে আদালতের সহিত ঐক্য হন, এবং বিস্তারিত কিছু বর্ণনা না করিয়া প্রথম আদালতের নিষ্পত্তিই স্থিরতর রাখেন।

বাদী প্রথমতঃ, এই বলিয়া খাস আপীল করে যে, নিম্ন আপীল-আদালত তাঁহার বর্ত্তমান নিষ্পত্তিতে বাদীর অনুকূলে রায় দিবার কোন কারণ দর্শান নাই ; দ্বিতীয়তঃ, ১৮৬৮ সালের ১৮ ই মে তারিখের পুনঃপ্রেরণের হুকুম দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৫১ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ ; তৃতীয়তঃ, উক্ত পুনঃপ্রেরণের হুকুম আনুমানিক হেতুবাদে এবং নথীর কাগজাতের বিরুদ্ধে দেওয়া হয় ; এবং চতুর্থতঃ, যে ডেপুটি কালেক্টর এই মোকদ্দমার প্রথম বিচার করেন, এবং বিধিমত রায় না দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন তাঁহার সহিত, এক্ষণে যে ডেপুটি কালেক্টর মোকদ্দমার বিচার করেন, তাঁহার মতভেদ হওয়ায়, যে সকল সাক্ষী পূর্ব্বে সাক্ষ্য দেয় পুনরায় তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা উপস্থিত ডেপুটি কালেক্টরের কর্ত্তব্য ছিল।

প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নিম্ন আপীল-আদালত সপষ্ট রূপে প্রথম আদালতের রায়ে তাঁহার সম্মতি প্রকাশ করেন। নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ের ভাবে সপষ্ট বোধ হইতেছে যে, তিনি সম্পূর্ণ রূপে বিশেষতঃ, প্রতিবাদীর পাট্টা যে উত্তম এবং কর ৬৲ টাকা, তৎসম্বন্ধে প্রথম আদালতের হেতু সমস্তই অবলম্বন করেন, বস্তুতঃ, নিম্ন আপীল-আদালতের বাক্যে প্রকাশ যে, প্রথম আদালতের রায়ই তাঁহার নিজের রায়ের তুল্য, অতএব এই বিবেচনায়, যে সকল কারণ দেওয়া হইয়াছে তাহাই প্রচুর।

খাস আপীলের দ্বিতীয় হেতু সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে পর্য্যন্ত ফেরৎ পাঠাইবার হুকুম দ্বারা বাদীর মোকদ্দমার কোন হানি হওয়া না দেখান যায়, সে পর্য্যন্ত ঐ হেতুতে সপষ্টই খাস আপীল হইবে না, (দ্রষ্টব্য, ২য় বালম উইক্লি রিপোর্টর ১৮১ পৃষ্ঠা)। এ স্থলে পূর্ব্বের নথীই উত্তম বলিয়া থাকিতে দেওয়া হয়, কারণ, তাহাতে কোন পক্ষের কোন আপত্তি ছিল না, এবং বাদীর বিরুদ্ধে নূতন প্রমাণ গ্রহণ দ্বারাই হউক বা তাহার অনুকূলে যে কোন প্রমাণ ছিল, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াই হউক, তাহার প্রতি যে, কোন হানি করা হইয়াছে, এমত দেখা যায় না।

তৃতীয় হেতু সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রথম ডেপুটি কালেক্টরের রায় যখন তাঁহার নিজ হস্তে লিখিত না হওয়ায় এবং তাহার কোন হেতু লিখিত না হওয়ায় বিধিমত রায় বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং যখন তাঁহার মৃত্যুর গতিকে পরে আর তাঁহার বিধিমত রায় দিবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন নিম্ন আপীল-আদালতের বাস্তবিক ঐ কর্ম্মচারীর পদে যে ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হয়েন, তাঁহা দ্বারাই কেবল মোকদ্দমা সমাপ্ত করাইবার আবশ্যক হয়। অতএব নিম্ন আপীল-আদালত তাঁহার ১৮৬৮ সালের ১৮ ই মে তারিখের পুনঃপ্রেরণের হুকুমের যে সকল কারণ দেন, তাহাতে নথীর কাগজাতের বিরুদ্ধ বা আনুমানিক কিছু দেখা যায় না।

চতুর্থ হেতু সম্বন্ধে, আমাদিগকে কোথায়ও দেখান হয় নাই যে, সাক্ষিগণের পুনরায় জবানবন্দী লইবার অথবা অতিরিক্ত জবানবন্দী লইবার বা প্রথম ডেপুটি কালেক্টর যাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি যে সকল প্রমাণ লইয়া তাহার বিচার করেন, তদ্ভিন্ন অন্য প্রমাণ দৃষ্টে বিচার করিবার নিমিত্ত প্রথম আদালতে প্রার্থনা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে যে, সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দী করা প্রথম আদালতের কর্ত্তব্য, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, যে পক্ষের পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণ করাইবার ইচ্ছা, তাহারই আদালতকে তাহা করিতে প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য ; নচেৎ যখন পক্ষগণ নিজে নথীস্থ প্রমাণ দৃষ্টেই মোকদ্দমার বিচার হইতে দিতে প্রস্তুত ছিল, তখন অতিরিক্ত সাক্ষ্য লইলে তাহাদিগকে এবং সাক্ষি-

গণকে অতিরিক্ত ব্যয় এবং কষ্টে ফেলা হইত। যাহা হউক, ইহা ছাড়াও, সম্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উক্ত নথী যে ভাবে নিম্ন আপীল-আদালতে আইসে, তদ্দৃষ্টেই নিম্ন আপীল-আদালতের আপীলের বিচার করিতে হয়, এবং ফেরৎ পাঠাইবার পূর্ব্বে নথীর সেই অবস্থাই ছিল, এবং নিম্ন আপীল-আদালতের রায়েও প্রকাশ নাই, এবং খাস আপেলাণ্টের উকীলও আমাদিগকে দেখান নাই যে, কোন আপত্তি করা হইয়াছিল বা নিম্ন আপীল-আদালতে এই আপত্তি করা হইয়াছিল যে, সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণ করা আবশ্যক।

এতদর্থে আমরা এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

২২ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১১৬৬ নং মোকদ্দমা।

চব্বিশ-পরগণার জজ আলীপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৭ সালের ২৯ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৩০ এ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মহেশচন্দ্র দাস (বাদী) আপেলাণ্ট।

মাধবচন্দ্র সরদার (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু নবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—প্রথম আদালত কোন প্রতিবাদীর যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহা যখন এরূপ অসম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা হয় যে, নিম্ন আপীল-আদালত তদ্দৃষ্টে যথেষ্ট রায় দিতে পারেন না, তখন নিম্ন আপীল-আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৫৫ ধারার বিধান অনুসারে স্বয়ং প্রতিবাদীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি পুনর্ব্বিচারার্থে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে পারেন না। তিনি যদি ঐরূপে প্রতিবাদীর জবানবন্দী লয়েন, তবে এই নূতন প্রমাণ উচিত মতে গ্রহণ করা হইয়াছে কি না, তাহা প্রধানতম বিচারালয় আপীলে মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবার জন্য, তাহার কারণ জজের লিখিতে হইবে।

ব্যবস্থাপক সমাজ কি মনে করিয়া কোন্ আইন জারী করেন, তাহা দেওয়ানী আদালতের দেখিবার বিষয় নহে; বিধিমতে আইনের শব্দ গুলির যে অর্থ হয়, তদনুসারেই উক্ত আদালত চলিতে বাধ্য।

**বিচারপতি ফিয়ার।**—আমি অতিদুঃখের সহিত এই সিদ্ধান্ত করিতেছি যে, নিম্ন আপীল-আদালত আবার ভ্রমমূলক রায় দিয়াছেন। শেষ বারে যখন এই মোকদ্দমা আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন আমাদের এই মত হয় যে, প্রতিবাদী প্রথম বিচারের সময় যে সাক্ষ্য দেয় তাহার প্রতিপোষণার্থে পুনঃপ্রেরণের পরে যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তাহা এই মোকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে অন্যায় রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং তাহা নিম্ন আদালতের দেখা উচিত নহে।

জজের যে রায় এখন আমাদের নিকট উপস্থিত, তাহা তিনি যে সকল প্রমাণ দৃষ্টে দেন, তাহা হইতে উক্ত প্রমাণ তিনি কথায় পরিত্যাগ করিয়াছেন; এবং ইহা বলা উচিত যে, যদি তাঁহার এক্ষণকার বৃত্তান্ত-ঘটিত সিদ্ধান্ত, এবং প্রতিবাদী পূর্ব্বে যে সাক্ষ্য দেয় তৎসম্বন্ধে তাঁহার এক্ষণকার অভিপ্রায় গ্রহণ করা যায়, তবে পুনঃপ্রেরণে প্রতিবাদী যে অতিরিক্ত সাক্ষ্য দেয় যাহার বিষয় আমি এই মাত্র উল্লেখ করিলাম, তাহার একেবারেই কোন আবশ্যক ছিল না।

প্রতিবাদী যে পাট্টা এবং যে সকল দাখিলা দাখিল করে তাহা তাহার মোকদ্দমায় সপ্রমাণ হওয়া নিতান্তই আবশ্যক ছিল।

যখন এই মোকদ্দমা প্রথমে জজের নিকট

উপস্থিত হয়, তখন তাঁহার এই মত হয় যে, প্রতিবাদী স্বয়ং প্রথম আদালতে সাক্ষ্য দিয়াছে বটে, কিন্তু সে উক্ত পাট্টা এবং ঐ সকল দাখিলা সপ্রমাণ করে নাই; এবং আমরা জজের রায় হইতে যাহা বুঝিতেছি, তদনুসারে জজ প্রতিবাদীকে স্পষ্টই এই ভ্রম সংশোধন করিতে দিবার অভিপ্রায়ে এই হুকুম দিয়া মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান যে, প্রতিবাদীর আবার জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

আমি যে মত পূর্ব্বে বলিয়াছি তদনুসারে দ্বিতীয় জবানবন্দীর ফল ছাড়িয়া দিয়া, জজ বলেন:—"প্রতিবাদী যখন এই সকল দলীল দাখিল করে, তখন সে তাহা সপ্রমাণ করিতে "সাক্ষী দেওয়া অনাবশ্যক বোধ করে, এবং "সে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সত্যতা "সম্বন্ধে তাহাকে শপথ করিতে বলা হয় নাই। "কিন্তু পক্ষান্তরে, তাহার প্রতি জেরা সওয়াল "হয় নাই এবং তাহার বাক্য খণ্ডনের কোন "চেষ্টাও করা হয় নাই।" এবং তদনন্তর জজ "বলেন:—"এমত অবস্থায়, আমার বোধ "হইতেছে যে, আমার এমত বিবেচনা করা "উচিত যে, প্রতিবাদী সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া যে সকল "প্রমাণ দেয় তাহার মধ্যে সে যখন তাহার "পাট্টা এবং দাখিলা সকল দর্শায়, তখন সে "তাহাদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে শপথ করিয়া "তাহা সপ্রমাণ করিতে অবশ্য মনস্থ করিয়াছিল; "এবং যখন সে বলে যে, তাহার পিতা উক্ত জমা "১২৩৪ সালের অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে ভোগ "করিয়া আসিয়াছে, এবং ২০ বৎসরের অধিক "কাল এক হারের কর থাকিবার বিষয় সপ্র- "মাণার্থে দাখিলা সকল দাখিল করে, তখন "সে ৩ ধারা-প্রদত্ত স্বত্ব এবং ৪ ধারা-বর্ণিত "অনুমানের উপর নির্ভর করিতে মনস্থ করিয়া- "ছিল। এই অনুমান করিয়া লইয়া আমি দেখিতেছি যে, বাদী স্বীকৃত রূপেই উক্ত "বাক্যে কোন দ্বিধা জন্মাইতে, এবং তাহা "হইতে যে অনুমান হয় তাহা খণ্ডন "করিতে অসমর্থ। বাদী কিছুই জানে না, "কারণ, সে কেবল অল্প কাল হইল ঐ "ভূমি ক্রয় করিয়াছে, এবং ঐ ভূমির পূর্ব্বের "মালিক ১৮৫৯ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ "হইবার পূর্ব্বে যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত "করিয়া প্রতিবাদীর করবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা "করে, তাহাতে সে যে অকৃতকার্য্য হয়, কারণ, "আদালত স্থির করেন যে, প্রতিবাদী তাহা "নির্দ্ধারিত করে ভোগ করে, তাহার বিবরণ "নথীতে আছে।"

জজ তাঁহার অনুমানের ন্যায্যতা দর্শাইবার জন্য এ স্থলে যে তর্ক ব্যবহার করিতে বাধ্য, তাহাতেই আমি বোধ করি স্পষ্ট প্রকাশ যে, জজের মনে এমত বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, উপস্থিত স্থলে এই পাট্টা এবং এই সকল দাখিলা প্রতিবাদি-কর্তৃক প্রথমে সপ্রমাণ হয় নাই, এবং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জজ যখন প্রতিবাদীর পুনরায় জবানবন্দী গ্রহণের জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান তখন তাঁহার নিজের অবশ্যই এই মত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, যত দূর আমরা দেখিতেছি, তাহাতে এই সকল দলীল বিচারের পূর্ব্বে দাখিল হয়, এবং প্রতিবাদী তাহার সাক্ষ্য দিবার সময় কখনই নিশ্চিত রূপে তাহার উল্লেখ করে নাই।

আমি বোধ করি, ১৮৫৯ সালের ৮ আইন প্রচার করিবার সময়ে ব্যবস্থাপক-সমাজের মনে কি ছিল, তাহা যেমন জজ অনুসন্ধান করিয়াছেন তাহা করা আমাদের বা নিম্ন আদালতের কার্য্য নহে। উক্ত আইনের শব্দগুলির বিধিমত যে অর্থ হয়, তদ্দ্বারাই আমরা বাধ্য, এবং এই মোকদ্দমায় আদালতের কার্য্য যে উক্ত আইন দ্বারা শাসিত, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

জজ যে বোধ করেন যে, ব্যবস্থাপক-সমাজ এই আইন যে আদালতে প্রয়োগ হইবে

তাহার অযোগ্যতা রীতিমত অবগত থাকিলে জজ নিজে যে সকল বিধান অনুযায়ী কার্য্য করেন নাই তাহা জারী করিতে পারিতেন না, এরূপ বোধ তিনি উচিত মতে করিতে পারেন না; এবং ব্যবস্থাপক-সমাজ জজকে যাহা করিতে আদেশ বা নিষেধ করিয়াছেন তাহা অমান্য করিবার কারণ স্বরূপে, তিনি ডেপুটি কালেক্টরের কোন অযোগ্যতা থাকিলেও, সেই অযোগ্যতা কি প্রকারে দর্শাইতে পারেন, তাহা আমি বাস্তবিকই বুঝিতে পারি না। যদি জজের স্পষ্ট বোধ হইয়া থাকিত যে, ডেপুটি কালেক্টর পক্ষগণের সম্বন্ধে প্রতিবাদীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেন নাই, এবং তদ্দৃষ্টে যদি জজ পক্ষগণের মধ্যে সন্তোষকর রায় দিতে না পারিতেন, তবে তিনি দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৫৫ ধারার বিধান অনুসারে স্বয়ং প্রতিবাদীর সম্পূর্ণ জবানবন্দী লইতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করিলে তিনি এই জন্য এই জবানবন্দী লইবার কারণ লিখিতে বাধ্য হইতেন যে, উক্ত নূতন প্রমাণ উচিত মতে গ্রহণ করা হইয়াছে কি না, তাহা এই আদালত আপীলে দেখিতে পারেন। যাহা হউক, জজ এই উপায় অবলম্বন করেন নাই, এবং তাহা না করিয়া তিনি এমত অবস্থায় উক্ত মোকদ্দমা পুনঃশ্রবণ এবং পুনর্ব্বিচারার্থে ফেরৎ পাঠান, যাহাতে তাঁহার আইন অনুসারে তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। অতএব ঐ পুনঃপ্রেরণের পরে যাহা কিছু হইয়াছে তাহা বৃথা এবং আইন অনুসারে অকর্ম্মণ্য বলা ব্যতীত এই আদালতের আর কোন উপায় নাই।

প্রতিবাদী যে বহুকাল পর্য্যন্ত এক হারে কর দিয়া আসিয়াছে, এ মোকদ্দমায় তাহা অনুমান করিবার কারণ আছে বটে, কিন্তু উক্ত কাল [illegible] বৎসর বা সেই রূপ কোন কাল কি না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বাদীর দাবীর প্রতিবাদ করিতে প্রতিবাদী যে জওয়াব লইয়া আদালতে উপস্থিত হয়, তাহাকেই তাহা সংস্থাপন করিতে হইবে, এবং যে ভাবে সে জওয়াব দেয় তাহাতে আমি বোধ করি, সে এই বলিতে চাহে, যে, সে এত কাল পর্য্যন্ত একহারে কর দিয়া আসিয়াছে যদ্দ্বারা বাদীর দাবী বারিত হয়। আমার মতে, সে যদি ২০ বৎসর এক হারে কর দিবার বিষয় প্রতিপন্ন করিতে এবং তাহার বিধি মত উপকার পাইতে পারে, তবে সে তাহার বর্ণনায় ১০ আইনের তমাদী সম্বন্ধীয় ধারাগুলির উল্লেখ করে নাই বলিয়াই তাহাকে সেই উপকার পাইতে না দেওয়া উচিত নহে।

কিন্তু এক্ষণে আমাদের নিকট নিম্ন আদালতের যে রায় প্রেরিত হইয়াছে তদ্দৃষ্টে আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যদিও প্রতিবাদীকে তাহা সপ্রমাণ করিতে যথেষ্ট অবকাশ দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রথম বিচারের সময় সে তাহার নিজের অনুকূল স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়াছে, তথাপি সে তাহা সপ্রমাণ করিতে পারে নাই। জজ বাক্যে নিশ্চয়ই এখন বলেন যে, তাঁহার বিবেচনায়, উক্ত পাট্টা এবং দাখিলা সকল সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তিনি যে যুক্তি দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন তদ্দ্বারাই তাহা সপ্রমাণ না হওয়া বুঝায়। এই সকল দলীল স্পষ্টই ছাড়িয়া দিতে হইবে। নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ে বৃত্তান্তের যে সকল অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে আমরা বিবেচনা করি যে, জজের নিষ্পত্তি আইন অনুসারে ভ্রম-মূলক।

অতএব তাঁহার নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে, এবং পক্ষগণ কোন বর্দ্ধিত হার নির্দ্ধারিত করিয়া না লইলে, এ মোকদ্দমা এই ইসুর বিচারার্থে ফেরৎ যাইবে যে, কর বৃদ্ধির নোটিস-লিখিত হেতু দৃষ্টে এই ভূমির কি হার ন্যায্য এবং উচিত হইবে?

আপেলাণ্ট তাহার এই আপীলের খরচা পাইবে। মোকদ্দমার খরচার আদেশ ফল দৃষ্টে হইবে। (ব)

২৫ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে. বি. ফিয়ার এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৩৮১ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৭ সালের ৮ ই মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২৯ এ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মহম্মদ হাসিম এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ললিতচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু কালীমোহন দাস এবং কাশীকান্ত সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে প্রধানতম বিচারালয় ভ্রমে এমত এক ইসু ধার্য্য করিয়া মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ফেরৎ পাঠান যাহার উপর উক্ত মোকদ্দমা সেই সময়ে পক্ষগণের মধ্যে স্থাপন করা উচিত ছিল না, এবং পুনঃপ্রেরণের পর নিম্ন আপীল-আদালত যে এক বৃত্তান্তের নিষ্পত্তি করেন তাহাতে উক্ত মোকদ্দমা উচিতমতেই নিষ্পন্ন হয়; সে স্থলে নিম্ন আপীল-আদালতে যে ইসু পাঠান হয় উক্ত আদালত ঠিক তৎসম্বন্ধে উচিতমতে নথীস্থ প্রমাণ না দেখিয়া থাকিলেও বাদি-প্রতিবাদীর মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম হয় না।

যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য অস্বীকার না করিয়া তাহা খণ্ডনার্থে আর এক কথা বলে, সে স্থলে প্রতিবাদীর ঐ কথা তাহার নিজেরই সপ্রমাণ করিতে হইবে।

বিচারপতি ফিয়ার।—যে অবস্থায় এক্ষণে এই মোকদ্দমা উপস্থিত, তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ সন্তোষকর বোধ হয় না।

১৮৬৮ সালের জুলাই মাসে এই আদালত এই হুকুম দিয়া তাহা জজের নিকট ফেরৎ পাঠান যে, তিনি সম্পূর্ণরূপে এই ইসুর বিচার করিবেন যে, "উক্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রতিবাদীর "পরিশ্রম এবং ব্যয়ে বর্দ্ধিত হইয়াছে কি না "এবং হইয়া থাকিলে কি পরিমাণে হইয়াছে।" তাহার সহিত আরও এই এক হুকুম দেওয়া হয় যে, "যদি উক্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি যে পরিমাণেই "হউক, এই রূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তবে "নিম্ন আপীল-আদালত তদনুসারে কর নির্দ্ধা- "রণ করিবেন। ফল দৃষ্টে খরচার আদেশ "হইবে।"

পুনঃপ্রেরণের পরে জজ প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই ইসুর নিষ্পত্তি করেন, এবং প্রতিবাদী যে সকল প্রমাণ দেয় কেবল তদৃষ্টেই রায় দেন।

এক্ষণে আপত্তি হইয়াছে যে, ইহা করাতে তিনি অনুচিত পাত্রে প্রমাণ-ভার নিক্ষেপ করিয়াছেন; এবং আমি বোধ করি, যে ইসু পাঠান হয়, বাদীর মোকদ্দমা তল্লিখিত ঘটনা হওয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে প্রতিবাদীর নিকট হইতে প্রমাণ লইবার পূর্ব্বে, বাদীরই তদ্বিষয়ে কিছু প্রমাণ দেওয়ার আবশ্যক ছিল। যে স্থলে বাদী নোটিস দিবার পর এই বলিয়া করবৃদ্ধির দাবীতে নালিশ করে যে, উক্ত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রজার দ্বারা না হইয়া অন্য প্রকারে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে বাদীরই প্রমাণ দর্শান অত্যাবশ্যক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে নিষ্পত্তির কথা আমি বলিতেছি তাহা সদরলাণ্ডের ৯ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৯০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে।

আমি বিবেচনা করি, উপস্থিত মোকদ্দমায় আদালত যে ইসু পাঠান তাহা বাদীরই সপ্রমাণ করা উচিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে খাস আপীলের বিচারে এই ইসু ধার্য্য হয় এবং পুনঃপ্রেরণের হুকুম হয়, তাহাতে প্রতিবাদীর পক্ষে এই আদালতে কেহ উপস্থিত ছিল না, এবং আমার এক্ষণে এই বিবেচনা হইতেছে যে, মিথ্যা এক ইসু অর্থাৎ যে ইসু পক্ষগণের মধ্যে বাস্তবিক উত্থিত হয় নাই তাহাই ধার্য্য করিয়া মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান হইয়াছিল।

নালিশের আরজী দৃষ্টে বোধ হয় যে, বাদী এই বলিয়া নালিশ করে যে, প্রতিবাদী বাদীর কতক ভূমি দখল করিতেছে; সে তাহাকে উচ্ছেদ করিবার প্রার্থনায় মাল আদালতে নালিশ করিয়াছিল, কিন্তু প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারামতে তাহার দখলের স্বত্ব হইবার বিষয় সপ্রমাণ করায় বাদী ঐ মোকদ্দমা হারে। বাদী আরো বলে যে, প্রতিবাদী তাহার বসতবাটীর সহিত এই ভূমি ভোগ করে; "উক্ত ভূমি "অনেক গতিকে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে," বিশেষতঃ তাহা সহরের মধ্যে পড়িয়াছে; এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ জমির কর প্রতি কড়ায় দুই টাকা হিসাবে প্রদত্ত হয়; অতএব বাদী ঐ হারে প্রতিবাদীর নিকট কবুলিয়তের দাবী করে।

এই নালিশের আরজী দৃষ্টেই বলা যাইতে পারে যে, বাদীর দাবী এমত নহে যে, সে তাহা ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অনুসারে করিতে পারে; কারণ, বাদীর বর্ণনা দৃষ্টে প্রথমতঃ বোধ হয় যে, সে সহরের মধ্যে যাহার বাটী এমত এক প্রজার নিকট হইতে বৰ্দ্ধিত হারের করের কবুলিয়ৎ লইতে চাহে। কিন্তু আমার বিবেচনায়, কেবল নালিশের আরজী দেখিলে যে কষ্ট হইতে পারিত তাহা প্রতিবাদীর বর্ণনাপত্র দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছে। সে তাহাতে স্পষ্টই এই ভূমি "জীরাত" বলে, যাহাতে কৃষির যোগ্য বা লাগ্রক-আবাদী, অথবা অন্যার্থে, প্রফেসর উইলসনের গ্রন্থ অনুসারে, উৎপন্ন দ্রব্য সমেত আবাদী ভূমি বুঝায়, এবং তাহা বাগানের চাষ হইতে স্বতন্ত্র। নালিশের আরজী এবং প্রতিবাদীর বর্ণনা-পত্র একত্রে গ্রহণ করিয়া আমার নিঃসন্দেহ বোধ হইতেছে যে, প্রতিবাদী উক্ত ভূমি চাষের জন্য দখল করে এবং নিজেই চাষ করে বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে বাদী নালিশ করে, এবং এতৎসম্বন্ধে প্রতিবাদীও বাদীর বর্ণনা স্বীকার করিয়াছে। অতএব সংক্ষেপে বলিতে গেলে তর্ক দ্বারা এ মোকদ্দমা যে রূপ প্রকাশ, তদনুসারে বাদী প্রতিবাদীকে এই ভূমিখণ্ড হইতে উঠাইয়া দিতে চাহে, কিন্তু প্রতিবাদী দখলের স্বত্ব সংস্থাপন করায় বাদী অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

অতএব প্রতিবাদী মোকদ্দমার অবস্থা অনুসারে যে প্রকারের পাট্টা পাইতে পারে, বাদী তাহাকে সেই প্রকারের পাট্টা লইতে সাধিলে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫ এবং ৯ ধারার বিধান অনুসারে প্রতিবাদীর নিকট হইতে কবুলিয়ৎ পাইতে চেষ্টা করিতে পারে। ৫ ধারা এই রূপ আরম্ভ হইয়াছে, যথা "যে সকল রাইয়তের দখলের স্বত্ব আছে" ইত্যাদি। বাদীর বাক্য মতে প্রতিবাদী ঐ প্রকারেরই প্রজা, এবং প্রতিবাদীও তাহা অস্বীকার করে নাই। এ স্থলে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫ এবং ৯ ধারা দ্রষ্টব্য।

অতএব আমার বোধ হয়, পক্ষগণ এই প্রশ্নের বিচার জন্যই আদালতে আসিয়াছে, যথা—বাদী যে পাট্টা দিতে চাহে, অর্থাৎ সে যে কবুলিয়ৎ চাহে তাহার পাট্টা উপযুক্ত এবং ন্যায্য হারের পাট্টা কি না। ১০ আইনের ১৭ ধারায় এতৎসম্বন্ধে ব্যক্ত আছে যে, "কোন দখলের স্বত্বাধিকারী প্রজা পূর্ব্বে যে কর দিত তাহা" উক্ত ধারা-বর্ণিত হেতু ব্যতীত "বৃদ্ধি হইতে পারিবে না।" এবং প্রতিবাদী পূর্ব্বে যে কর দিত এ মোকদ্দমা স্পষ্টই তদতিরিক্ত হার অবধারণার্থে উপস্থিত হইয়াছে। বাদী যে হেতুবাদে উক্ত অতিরিক্ত হারের দাবী করে তাহা এই যে, সে যে হারের করের দাবী করে, চতুষ্পার্শ্বস্থ তুল্য শ্রেণীর এবং তুল্য ফসদায়ক ভূমির দখীলকারেরাও সেই হারে কর দিয়া থাকে।

আমি বোধ করি উভয় নিম্ন আদালতই এই ইসু বাদীর অনুকূলে নিষ্পন্ন করেন। বোধ হয় প্রতিবাদী এই হেতুবাদে ঐ হারের ঔচিত্য এবং ন্যায্যতার প্রতি বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করে যে, উক্ত ভূমির বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা (তাহাতেই আমি বোধ করি, যে ভূমির

সহিত তাহার তুলনা করা হইয়াছে তাহার সহিত তাহা ঐক্য হয়) প্রতিবাদীরই পরিশ্রম এবং ব্যয়ে হয়; এবং নিম্ন আদালতদ্বয়ের কোন আদালতই (নিম্ন আপীল-আদালত নিশ্চয়ই নহে) প্রতিবাদীর এই আপত্তির প্রতি মনোযোগ করেন নাই; এবং তাহা না করায়ই প্রতিবাদী এই আদালতে খাস আপীল করে।

এই আদালত তখন বিবেচনা করেন যে, প্রতিবাদীর এই ইসুর বিচার করাইবার অধিকার আছে। কিন্তু এই আদালত খাস আপেলাণ্টের উকীলের প্রদর্শন মতে চুক্তির এই শব্দগুলির এই অর্থ করেন যে, তাহাতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারার দ্বিতীয় হেতু প্রকাশ করিতে মনস্থ ছিল। প্রতিবাদী স্বয়ং বা উকীল দ্বারা উপস্থিত হয় না, এবং আদালতকে নথীস্থ বিষয় নিশ্চয় রূপে অবগত করান হয় না।

প্রথম আদালতে যে সকল প্রমাণ দেওয়া হয় তাহা আমরা অদ্য বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি, এবং আমরা এক্ষণে দেখিতেছি যে, আমি ১৭ ধারার যে দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ করিলাম তাহাতে যে ইসু আছে, তাহা সপ্রমাণ বা খণ্ডন করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই।

এক্ষণে আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রতিবাদী ভূমির উন্নত অবস্থার কথা বলাতে তাহা যে শস্য বা অন্য কোন উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে উন্নত, এ কথা বলে নাই, কিন্তু বরিষালের সহরের নিকট বলিয়া বাসের পক্ষে উন্নত অবস্থার কথা বলিয়াছে।

আমরা বিবেচনা করি, যে ইসু আমাদের পুনঃপ্রেরণের হুকুমে বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই ইসু দৃষ্টে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইবার আমাদের ভ্রম হইয়াছিল, কারণ, তখন উক্ত ইসুর পোষকতায় বা খণ্ডনার্থে নথীতে বাস্তবিক কোন প্রমাণ ছিল না। এমত অবস্থায় এ মোকদ্দমা এ ভাবে উচিত মতে ব্যবহার করা অসম্ভব বোধ হইতেছে যে, উক্ত বিষয় যেন ঐ পুনঃপ্রেরণের হুকুম দ্বারা পক্ষগণের মধ্যে চূড়ান্ত রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিম্ন আপীল-আদালতে যে ইসু পাঠান হয় যদিও তিনি নথীস্থ প্রমাণ দৃষ্টে উচিত রূপে তাহার বিচার করেন নাই, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে, ইহা তিনি করেন নাই বলিয়াই বাদি-প্রতিবাদীর মধ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নহে।

যাহা হউক, আমার বোধ হয় যে, পুনঃপ্রেরণের হুকুমে যে ইসু বিচারার্থে পাঠান হয়, যদিও সেই সময়ে পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমা তাহার উপর স্থাপন করা উচিত ছিল না, তথাপি উক্ত পুনঃপ্রেরণের পরে জজ যে বৃত্তান্ত-ঘটিত নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা মোকদ্দমার উচিত মত নিষ্পত্তি হইয়াছে।

যে ইসু আমরা পাঠাই তাহা বাদী উত্থাপন করে, বা বাদীর দাবীর ভাব দৃষ্টে পক্ষগণের মধ্যে আবশ্যক বলিয়া অনুমানিত হয়।

কিন্তু এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে, পক্ষগণের মধ্যে যে ইসুর নিষ্পত্তি তখন হয় নাই, তাহা প্রতিবাদীর নিজের উত্থিত ইসু। তুল্য অবস্থার তুল্য ভূমির প্রজাগণ যে পরিমাণে কর দেয় বাদী সেই পরিমাণে করের দাবী করায় তদুত্তরে প্রতিবাদী আপন বর্ণনাপত্রে বলে যে, তাহার নিকট সেরূপ কর লওয়া অন্যায় এবং অনুচিত, কারণ, তাহার নিজের পরিশ্রম এবং ব্যয়ে ভূমির ঐ অবস্থা হইয়াছে। বাদী আদালতে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করে এবং যাহা বাদী সপ্রমাণ করিয়াছে বলিয়া প্রতিবাদী অনুমান করিয়া লয় তাহা প্রতিবাদী অস্বীকার করে না, কিন্তু আর এক প্রসঙ্গের দ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে চাহে। অতএব আমার বিবেচনায় প্রতিবাদীই তাহার এই প্রসঙ্গ সপ্রমাণ করিতে বাধ্য।

পুনঃপ্রেরণের হুকুম দৃষ্টে নিম্ন আপীল-আদালতের কার্য্য অন্যায় হইলেও, তিনি পুনঃপ্রেরণের পরে ঠিক উপরোক্ত অভিপ্রায় করিয়া

প্রথমতঃ, এই দেখেন যে, প্রতিবাদী তাহার এই বাক্য সপ্রমাণ করিয়াছে কি না।

জজ প্রতিবাদীর প্রমাণ দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত বাক্য সপ্রমাণ হয় নাই, এবং আমার বিবেচনায়, আইন-ঘটিত কোন কারণে জজের উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতি আপত্তি হইতে পারে না।

সমুদায় দৃষ্টে আমার মত এই যে, এই মোকদ্দমা যাহা দীর্ঘকাল যাবৎ চলিতেছে, তাহার মীমাংসা যদিও অতি কদর্য্য রূপে হইয়া থাকে, তথাপি উচিত ইসু অর্থাৎ যে ইসু পক্ষগণ প্রথমে উত্থাপন করে, এবং যৎসম্বন্ধে তাহারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার অভিলাষ করে, তাহা পরিশেষে এমত বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় স্বরূপে বিচারিত এবং মীমাংসিত হইয়াছে যে, খাস আপীলে তৎপ্রতি আর হস্তক্ষেপ হইতে পারে না।

এই মর্ম্মে আমি বোধ করি না যে, আমাদের এই বলিয়া নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত যে, এই মোকদ্দমা ইতিপূর্ব্বে যখন আমাদের নিকট উপস্থিত ছিল তখন আমরা পুনঃপ্রেরণের যে হুকুম দেই, তিনি তদ্দৃষ্টে বিচার করেন নাই।

আমি যে সকল আপত্তির উল্লেখ করিলাম তদ্ভিন্ন আপীলের লিখিত হেতুর মধ্যে আরো অনেক আপত্তি এক্ষণে আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাহা অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও খাস আপেলাণ্টের প্রতিকূলে আমার কোন প্রবল মত নাই।

সে আপত্তি করে যে, কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত কবুলিয়ৎ চলিবে তাহা নালিশের আরজীতে বা উভয় নিম্ন আদালতের রায়েও নির্দ্দিষ্ট রূপে বর্ণিত হয় নাই। আমি এই বলিতে বাধ্য যে, যে কবুলিয়ৎ এই সকল বিষয়ে অনির্দ্দিষ্ট তাহা সংস্থাপন করা হয়, এমত কোন নিষ্পত্তি করিতে আমি অত্যন্ত অনিচ্ছুক।

এই আদালত কর্তৃক বিচার দ্বারা নিষ্পন্ন না হইলেও ব্যক্ত হইয়াছে যে, যদি পাট্টার কবুলিয়ৎ আরম্ভের সময় লেখা না হয়, বা আদালত তাহা প্রথম বিচারের কালে স্থির করিয়া না দেন, তবে উক্ত কবুলিয়ৎ চূড়ান্ত ডিক্রীর তারিখ হইতে প্রবল হইবে এবং সেই তারিখ হইতে তাহার মিয়াদ গণনা করিতে হইবে। উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমায়, উক্ত নিষ্পত্তিদ্বারা পক্ষগণের মধ্যে এমত এক চুক্তির ডিক্রী দেওয়া হইবে, যাহার সর্ত্ত সকল উচিত এবং ন্যায্য কি না, তাহা এমত প্রমাণের উপর নির্ভর করে যাহা যে তারিখে ঐ সকল সর্ত্ত কার্য্যে পরিণত হইবে তাহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে দেওয়া হয়; এবং আমি বিবেচনা করি, সহজেই দেখান যাইতে পারে যে, এই প্রকার ডিক্রী যখন দেওয়া হয়, তখনও তাহা পক্ষগণের মধ্যে সেইরূপ ন্যায্য এবং উচিত হইবে না, যেমত তদ্বিপরীতে হইবে না।

যাহা হউক, আপেলাণ্ট এই আপত্তি নিম্ন আদালতদ্বয়ের যে কোন আদালতে হউক, উচিত মতে উত্থাপন করিতে পারিত, এবং সেই আদালতেই তাহার তাহা উত্থাপন করিবার ক্ষমতা ছিল, কারণ, ঐ দুই আদালতে কবুলিয়তের ভ্রম বা দোষ সংশোধিত হইতে পারিত, অথবা অন্ততঃ, উক্ত আপত্তির গুরুত্ব প্রমাণ দৃষ্টে পরীক্ষা করা যাইতে পারিত। যাহা যাহা ঘটিয়াছে তদ্দৃষ্টে বিশেষতঃ, এই মোকদ্দমা যখন শেষবারে এই আদালতে উপস্থিত হয়, তখন যে আপেলাণ্ট ইচ্ছাপূর্ব্বক এক মিথ্যা ইসুর বিচার জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে আদালতকে রত করে, তদ্বিবেচনায় আমি এক্ষণে তাহার প্রতি কোন অনুগ্রহ দেখাইতে চাহি না।

এই আদালত বরাবর স্থির করিয়া আসিয়াছেন যে, যখন কোন ব্যক্তি নিম্ন আদালত সকলে যে সকল ইসু ধার্য্য হয়, তাহার উপরই ঐ সকল আদালতে তাহার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে দেয় এবং নালিশের প্রণালী সম্বন্ধে কোন আপত্তি না করে (যে আপত্তি সে ঐ সকল আদালতেই উচিতমতে করিতে পারে এবং তাহার

করাও উচিত, যে সকল আদালতে বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয়ের বিচার হয়) তখন এ আদালত খাস আপীলে তাহাকে উক্ত আপত্তি করিতে না দিলেও পারেন। নিম্ন আদালত যে কবুলিয়তের ডিক্রী দিয়াছেন তাহাতে যদিও তাহার মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাপি পক্ষগণ আপনাদের মধ্যে ঐ ডিক্রীই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে; কিন্তু প্রত্যেক পক্ষ উভয় এই আপীলের এবং পুনঃপ্রেরণের পূর্ব্বের বিচারের আপন আপন খরচা বহন করিবে। (ব)

---

২৫ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৪২০ নং মোকদ্দমা।

মুরসিদাবাদের প্রতিনিধি জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২৬ এ জুনের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ১ লা সেপ্‌টেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

টি লায়নস্ প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

সি, জি, ডি, বেট্‌স্ প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু অমরনাথ বসু এবং তুলসীদাস শীল, আপেলাণ্টের উকীল।

মেঃ, আর, টি, এলেন এবং বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক ব্যক্তি কোন ভূমি জমিদারের নিকট হইতে পাট্টাদার স্বরূপে ভোগ করে বলিয়া দাবী করে, এবং আর এক ব্যক্তি সেই জমিদারের নিকট হইতে তাহার মৌরসী স্বত্বে ভোগ করে বলিয়া দাবী করে; তাহাতে আদালত স্থির করেন যে, উক্ত দুই স্বত্ব এক সঙ্গে থাকিতে পারে, এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রকৃত দখল পাইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারীর ন্যায় জমিদারের প্রাপ্য কর দিতে পারে। ডিক্রীজারীতে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে, যে জমির উপর কোন এক কুঠির এমারতাদি আছে তাহা ভূমির সহিত যায় না বলিয়া স্থির হওয়ায়, তদ্ব্যতীত আর সমস্ত জমিতে দখল দেওয়া হয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ঐ এমারতের ভূমিতে দখল না পাইয়া তাহার করের দাবীতে নালিশ করে।

স্থির হইল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তি অনধিকার-প্রবেশক বলিয়া এবং সে যে কর দিতে সম্মত থাকিবার কথা বলে, তাহা দ্বারা ভূম্যধিকারী ও প্রজারূপ সম্বন্ধ সৃষ্ট না হওয়ায়, মাল আদালতে করের দাবীর নালিশ চলিবে না।

বিচারপতি লক্।—এই মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে আদালতের বোধ হইতেছে যে, মাল আদালতের ইহার বিচার করিবার অধিকার নাই, এবং মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইবার পূর্ব্বে প্রথম আদালত প্রথমে যে রায় দেন তাহাই শুদ্ধ। দেখা যায় যে, এই আদালত ১৮৬২ সালে যে নিষ্পত্তি করেন তদনুসারে উপস্থিত মোকদ্দমার বাদী লায়নস জমিদারের নিকট হইতে পাট্টা-গৃহীতা স্বরূপে কতিপয় ভূমি দাবী করে; উক্ত মোকদ্দমার প্রতিবাদী এণ্ড্রু সাহেবের স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে বেট্‌স ঐ সকল জমি উক্ত জমিদারের নিকট হইতে মৌরসী স্বত্বে ভোগ করে বলিয়া দাবী করে। এই আদালত স্থির করেন যে, উক্ত দুই পাট্টা এক সময়ে থাকিতে পারে, এবং এণ্ড্রুর স্বত্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া বাদী লায়নস্ ঐ সকল জমির প্রকৃত দখল পাইতে পারে, এবং এণ্ড্রু জমিদার এবং তাহার মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী বলিয়া জমিদারের কর এণ্ড্রুকে দিতে পারে।

লায়নস্ তাহার ডিক্রীজারী করত প্রতিবাদীর দখলের কোন কুঠীর এমারতাদির জমি বাদে আর সমস্ত জমিতে দখল পায়। কিন্তু এই আদা-

ষ্ট ৫ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪৯ পৃষ্ঠা-প্রচারিত রায়ে স্থির করেন যে, ভূমির সহিত এমারতাদি যায় নাই, এবং সেই জন্য লায়ন্‌সকে তাহার ডিক্রী অনুসারে তাহার দখল দেন না। বেট্‌স এক্ষণে এণ্ড্রুর স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে এই এমারতাদির ভূমি দখল করিতেছে, এবং সে বস্তুতঃ উক্ত ভূমিতে অনধিকার-প্রবেশক। লায়ন্‌স দখল না পাইয়া এই এমারতের ভূমির নিমিত্ত ৩২৮ টাকা হারে করের দাবীতে এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী বলে, সে ১৩৮ টাকা করে উক্ত ভূমি ভোগ করিতে স্বত্ববান্; এবং প্রথম আদালত পূর্ব্বে স্থির করেন যে, এ মোকদ্দমা দুইটি হেতুবাদে মাল আদালতে বিচারিত হইতে পারে না, প্রথমতঃ "যে সকল নিষ্পত্তি দাখিল হয় তাহার কোন স্থানেই করগ্রহণ করিবার স্বত্ব থাকিবার বিষয় দেখান হয় নাই, এবং তাহা দেখান হইয়া থাকিলেও তাহাদের মধ্যে যে ভূম্যধিকারী এবং প্রজারূপ সম্বন্ধ ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই।" উক্ত নিষ্পত্তি পরে জজ অন্যথা করেন, এবং আমরা বিবেচনা করি, তাহা করায় তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। লায়ন্‌স প্রতিবাদীকে উক্ত ভূমি হইতে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, এবং প্রতিবাদীও তাহাতে থাকিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে, সুতরাং সে অনধিকার-প্রবেশক স্বরূপ; অতএব প্রথম আদালত যে পূর্ব্বে মত প্রকাশ করেন যে, করের দাবীর নালিশ চলিতে পারে না, তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম; এবং প্রতিবাদী যে বলে যে, সে কর দিতে ইচ্ছুক, তাহাও ভূম্যধিকারী এবং প্রজারূপ যে সম্বন্ধ বাস্তবিক কখন ছিল না, তাহা সৃজনের পক্ষে যথেষ্ট জ্ঞান করা যাইতে পারে না।

এলেন সাহেব রেস্পণ্ডেণ্টের অনুকূলে বলেন যে, আপেলাণ্টের বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিবার আর সময় নাই; কিন্তু আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত প্রশ্ন আদালত উপস্থিত করেন, আপেলাণ্ট করে না; এবং তাহা যে সময়েই হউক, উত্থাপন করা যাইতে পারে; এবং এই প্রথম তাহা উপস্থিত হইতেছে না, কারণ, প্রথম আদালত মোকদ্দমার প্রথম নিষ্পত্তির সময়ে ঐ প্রশ্নের বিচার করেন, এবং মাল আদালতে ঐ মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে না বলিয়া তাহা ডিস্‌মিস্ করেন।

আমাদের বিবেচনায়, নিম্ন আদালতদ্বয়ের রায় অন্যথা করিয়া এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা উচিত, এবং পক্ষগণ এই সমুদায় মোকদ্দমার আপন আপন খরচা দিবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

২৬ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২২৬৪ নং মোকদ্দমা।

চট্টগ্রামের প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ১৫ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২১ এ জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বৃন্দাবন দে (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

বিসনা বিবী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং, আর, ই, টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু আনন্দগোপাল পালিত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য প্রকারের ভূমির করের প্রচলিত হার দর্শাইয়া বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ৎ পাওয়ার দাবীতে নালিশ হয়, সে স্থলে ঐ দাবী এরূপ সম্ভাবনা বা নিশ্চয়তার দ্বারায়, সাব্যস্ত হয় না যে, পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির

পুনরায় জমাবন্দী করিলে দাবী-কৃত হারই সাব্যস্ত হইবে।

যখন প্রথম আদালত কোন মোকদ্দমা কোন প্রাথমিক প্রশ্ন সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করেন, এবং এমত কোন বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রমাণ না লন যাহা নিম্ন আপীল-আদালতের নিকট পক্ষগণের স্বত্ব নিরূপণার্থে প্রয়োজনীয় বোধ হয়, এবং যখন প্রথম আদালতের ডিক্রী উক্ত প্রাথমিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আপীল-আদালত অন্যথা করেন, তদ্ব্যতীত আর কোন কারণেই নিম্ন আপীল-আদালতের কোন মোকদ্দমা প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠাইবার অধিকার নাই।

বিচারপতি ফিয়ার।—নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি স্পষ্টই অন্যায়।

বাদিনী প্রতিবাদীর নামে বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়তের দাবীতে নালিশ করে, এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সেই প্রকারের ভূমির যে হারে কর আদায় হয় তাহারই উপর সে তাহার কর বৃদ্ধির হেতু স্বরূপ নির্ভর করে। এতৎসম্বন্ধে জজ বলেন:— "বলা হইয়াছে যে, সেই স্থানের এমত কোন "সাক্ষী নাই যে, বাস্তবিক বাদিনীর দাবী-কৃত "হারে কর দেয়; কিন্তু ইহার যথেষ্ট প্রমাণ "আছে যে, পুনরায় জমাবন্দী করিলে হার বাদি- "নীর দাবী-কৃত হারের তুল্যই হইবে।" সেই জন্য তাঁহার এই মত হয় যে, বাদিনী তাহার কর বৃদ্ধির হেতু সংস্থাপন করিয়াছে।

আমি স্বীকার করিতেছি যে, জজের নিজের বাক্য মতেই তাঁহার নিকট এমত কোন প্রমাণ ছিল না যাহাতে এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হইতে পারে। নিকটবর্ত্তী প্রজাগণ যে হারে কর দেয় তাহার পুনরায় বন্দোবস্ত করিলে যে দাবী-কৃত হারের তুল্য হইবে, ইহার সম্ভাবনা বা নিশ্চয়তার দ্বারাও আমার বিবেচনায় এমত সপ্রমাণ হয় না যে, যে হারের দাবী হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই নিকটবর্ত্তী প্রজাগণ দিয়া থাকে।

নিম্ন আপীল-আদালতের যে রায় একণে আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে তাহাই যে কেবল আমার মতে, আইন-বিরুদ্ধ, এমত নহে; কিন্তু জজ ১৮৬৭ সালের মে মাসে যে পুনঃপ্রেরণের হুকুম দেন, তাহাও আমি বোধ করি, অন্যায় রূপে দেওয়া হইয়াছিল। উক্ত হুকুম এই:—"বাদিনী বর্দ্ধিত হারে করের কবুলিয়- "তের দাবীতে নালিশ করে, এবং চারি বৎ- "সর পূর্ব্বে অন্য এক ব্যক্তি এই প্রতিবাদীর "বিরুদ্ধে একণকার দাবী-কৃত হারের যে ডিক্রী "পায় বাদিনী সেই ডিক্রীর এবং পাঁচ জন "সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। আমার "মতে ইহা যথেষ্ট প্রমাণ নহে। বাদিনীর "স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, সে "প্রতিবাদীর যত ভূমি ভোগ করিবার কথা "বলে, প্রতিবাদী বাস্তবিকই তত ভূমি ভোগ "করে; কারণ, প্রতিবাদী তাহার ন্যূন বলে। "তাহাকে আরও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, "যে হারের দাবী হইয়াছে তাহা উচিত এবং "ন্যায্য। ইহা এমত এক ডিক্রী দ্বারা সপ্রমাণ "হইবে না যাহা অনেক দিন হইল প্রদত্ত "হইয়াছে। এই দেখাইতে হইবে যে, বাদিনী "যে হারের দাবী করে সেই হারই প্রতিবাদীর "দখলের ভূমির ন্যায় ভূমি সকলে প্রচলিত। "ইহা দেখান হয় নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায়, "বাদিনীকে জরিপ এবং স্থানীয় তদন্ত দ্বারা "তাহার দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য আর এক- "বার সুযোগ প্রদান করা উচিত; এবং এত- "দর্থে আমি মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতেছি যে, "তাহা তদন্ত করিয়া চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আবার "পাঠান হয়।"

যখন প্রথম আদালত কোন কোন প্রাথমিক প্রশ্ন সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করেন, এবং এমত কোন বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রমাণ লওয়া হয় না যাহা নিম্ন আদালতের নিকট পক্ষগণের স্বত্ব নিরূপণার্থে প্রয়োজনীয় বোধ হয়, এবং যখন প্রথম আদালতের ডিক্রী উক্ত প্রাথমিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আপীল-আদালত অন্যথা করেন, তদ্ব্যতীত আর কোন স্থলেই, নিম্ন

আপীল-আদালতে যে' মোকদ্দমা বিচারার্থে উপস্থিত হয় তাহা তাঁহার ফেরৎ পাঠাইবার অধিকার নাই। এমত স্থলে, নিম্ন আপীল-আদালত মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে ফেরৎ পাঠাইতে পারেন।

সত্য বটে, জজ এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইয়া নিজে এই বিবেচনা করেন যে, তিনি ৩৫৪ ধারার বিধান অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু ৩৫৪ ধারা অনুসারেও, যদি এরূপ অবস্থা থাকে যাহাতে তিনি উক্ত ধারার বিধান অনুসারে আপন বিবেচনামত কার্য্য করিতে পারেন, তথাপি তাঁহার এই মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান উচিত ছিল না; নিম্ন আদালতের বিচার জন্য এক বা অধিক ইসু ধার্য্য করিয়া দেওয়া উচিত ছিল, যাহাতে নিম্ন আদালত ঐ সকল ইসুর বিচার করিতে এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার নিষ্পত্তি প্রমাণের সহিত নিম্ন আপীল আদালতে ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। এই ধারা-বর্ণিত কার্য্য-প্রণালীর অনুসরণ করিবার বিশেষ কারণ এই যে, নিম্ন আপীল-আদালত মোকদ্দমার প্রথমেই পক্ষগণের মধ্যে এমত কোন ইসু বা ইসু সকল ধার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন, যাহা প্রথম আদালত উপস্থাপন বা বিচার করেন নাই, এবং যাহা আপীল-আদালত নথীর প্রমাণ দৃষ্টে নিজে মীমাংসা করিতে অসমর্থ হন।

জজ যদি ঐ মোকদ্দমায় নিজে এরূপ কোন ইসু ধার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি এই দেখিতেন যে, পক্ষগণের মধ্যে এমত কোন গুরুতর ইসু নাই যাহার বিচার প্রথম আদালত করেন নাই, এবং বাস্তবিকই এমত কোন ইসু নাই, যাহার উপর বাদিনী নির্ভর করিতে পারে এবং যাহা তিনি স্বয়ং তাঁহার ফেরৎ পাঠাইবার হুকুমের প্রথমেই নিষ্পত্তি করেন নাই, কারণ, তিনি তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, বাদিনী যে হেতুর উপর ———— নালিশ স্থাপন করে তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে নাই; এবং আমি বিবেচনা করি, তিনি নিজে ইহা জানিলে কখনই এরূপ বোধ করিতেন না যে, ৩৫৪ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান তাঁহার উচিত হইবে।

আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, উক্ত ফেরৎ পাঠাইবার হুকুম অন্যায় হইয়াছে, এবং এক্ষণেও তাহা অন্যথা করা যাইতে পারে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উক্ত ফেরৎ পাঠাইবার হুকুম হেতু যে সকল প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তদ্দ্বারাও নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ে বাদিনীর দাবী সপ্রমাণ হয় নাই।

এই আপীলের ডিক্রী দেওয়া গেল, এবং বাদিনীর মোকদ্দমা সমস্ত আদালতের খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল। (ব)

---

৩১ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২২৫১ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার প্রতিনিধি জজ মাণিকগঞ্জের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৮ ই জুন তারিখে যে, নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল (মোক্তাহেমদার) আপেলাণ্ট।

গৌরীপ্রসাদ রায় (বাদী) এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অভয়চরণ বসু এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং ললিতচন্দ্র সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন প্রজার দখলের স্বত্ব থাকে এবং সে ঐ স্বত্ব বহাল রাখিতে চাহে, তবে তাহার প্রকারান্তরে এই করার করা হয় যে,

তাহার জমিদার কবুলিয়ৎ চাহিলে সে উচিত এবং ন্যায্য হারে কবুলিয়ৎ দিবে ; কিন্তু দখলের স্বত্ত্ব না থাকিলে প্রজা কেবল জমিদারের অনুমতিমতে অর্থাৎ জমিদার ও তাহার মধ্যে যে সকল সর্ত্তের বন্দোবস্ত হয় কেবল তদনুসারেই ভূমিতে থাকিতে পারে।

দেওয়ানী আদালত ভূমির দখলের যে ডিক্রী দেন তাহা কেবল দেওয়ানী আদালতই জারী করিতে পারেন।

বিচারপতি ফিয়ার।—এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই বৃত্তান্ত স্থির হওয়া সত্ত্বেও নিম্ন আপীল-আদালত প্রজা-প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে কবুলিয়তের ডিক্রী দিয়াছেন যে, মোজাহেমদার পূর্ব্ব হইতে নালিশ উপস্থিতের কাল পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে কর পাইয়া আসিয়াছে। আমার বলা বাহুল্য যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারা অনুসারে, এরূপ বৃত্তান্ত স্থির হওয়ায় বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করা নিম্ন আপীল-আদালতের কর্ত্তব্য ছিল।

আমার আরও বোধ হইতেছে যে, বাদী স্বয়ং আদালতে যে প্রসঙ্গ উপস্থিত করে তাহাতেই তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্ করা উচিত ছিল।

কবুলিয়ৎ চুক্তির কার্য্য মাত্র। প্রজার দখলের স্বত্ব থাকিলে এবং সেই স্বত্ত্ব সে স্থির রাখিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে, এমত করার বুঝায় যে, তাহার ভূম্যধিকারী চাহিলে সে উচিত এবং ন্যায্য হারে কবুলিয়ৎ দিবে। কিন্তু দখলের স্বত্ব না থাকিলে প্রজা কেবল ভূম্যধিকারীর অনুমতিমতে অর্থাৎ তাহার সহিত ভূম্যধিকারীর যে সকল সর্ত্ত হয়, তদনুসারে ঐ জমিতে থাকিতে পারে, সুতরাং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৮ ধারায় সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যে সকল প্রজার দখলের স্বত্ত্ব নাই, তাহারা তাহাদের এবং যাহাদিগকে কর দিতে হইবে তাহাদের মধ্যে যে হারের বন্দোবস্ত হয়, কেবল সেই হারেই পাট্টা পাইতে পারে।

এ মোকদ্দমায় বাদী এই বলিয়া আপন মোকদ্দমা আরম্ভ করে যে, প্রতিবাদীর দখলের স্বত্ত্ব নাই। সে যে কখন তাহার নিকট কর পাইয়াছে এমত বলে না, এবং প্রতিবাদীর সহিত তাহার এমত কোন ঘটনা হইবার কথা সে বলে না, যাহা হইতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রতিবাদী স্পষ্ট বা আনুমানিক করার দ্বারা যে কোন সর্ত্তে হউক, পাট্টা লইতে সম্মত হইয়াছে, এবং আমি বোধ করি না যে, এ মোকদ্দমায় এমত কোন প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে যে, উক্ত ব্যক্তিগণ এমত কোন করার সম্বন্ধে কথোপকথন করিয়াছে।

আমার অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এমত কোন হেতু নাই যাহাতে কালেক্টর বিধিমতে প্রতিবাদীকে কবুলিয়ৎ দিতে আদেশ করিতে পারেন, এবং বাদীর নিজের প্রসঙ্গ অনুসারেই নালিশের আরজী ডিস্‌মিস্ করা উচিত ছিল।

কি প্রকারে নিম্ন আপীল-আদালতের এই মত জন্মে যে, ১০ আইনের স্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও তিনি বাদীকে ডিক্রী দিতে বাধ্য, তাহা আমার বুঝা ভার ; কারণ, যদি বাদী এই ভূমি দখলের জন্য দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী পাইয়া থাকে, তবে উক্ত দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী করিতে তাহার দেওয়ানী আদালতেই দরখাস্ত করা উচিত ছিল।

নিম্ন আপীল-আদালত বোধ হয় এই আদালতের ঐ সকল নিষ্পত্তি বুঝিতে ভ্রম করিয়াছেন, যাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, কালেক্টরকে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী প্রবল করিতে হইবে। দেওয়ানী আদালতের যে সকল ডিক্রী দ্বারা জমিদার কর পাইবে না স্থির হয় তাহা কালেক্টরের নিকট দাখিল করা সত্ত্বেও, যে স্থলে কালেক্টর কেবল দখলের এবং কর আদায়ের প্রমাণ দৃষ্টে জমিদারের অনুকূলে ডিক্রী দিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ সকল নিষ্পত্তি হইয়াছে।

আমাদের বিবেচনায়, এই আপীলের ডিক্রী হইবে; এবং নিম্ন আপীল-আদালতের রায় অন্যথা হইয়া বাদীর মোকদ্দমা সমস্ত আদালতের খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে। (ঘ)

---

বিচারপতি এল এস জ্যাক্‌সন এবং এফ এ গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ৩৩৬ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের ডেপুটি কাক্টেরের ১৮৬৯ সালের ১৪ ই মার্চের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

সনাতন দাস প্রভৃতি (বাদী) আপেলাণ্ট।

কালীপ্রসাদ দাস প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর টি এলেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু গিরিজাশঙ্কর মজুমদার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংক্রান্ত এক মোকদ্দমায় যখন প্রারম্ভিক শুনানী হইয়া ইসু নির্দ্ধারিত হয় তখন বাদী উপস্থিত ছিল, কিন্তু বিচারের দিবসে তাহার নিজের হাজির হওয়ার হুকুম ছিল না; এমত স্থলে বাদী তাহার উকীল অথবা রিবেনিউ এজেণ্টের দ্বারা হাজির হইলেই (১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ২০ ধারা দৃষ্টে) বাদীর হাজির হওয়া বুঝায়।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল স্পষ্ট রূপেই আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ডেপুটি কালেক্টরের হুকুমের পোষকতা করিতে পারেন না, কারণ, তাহা স্পষ্টই ভ্রমাত্মক। এই মোকদ্দমার যখন প্রাথমিক শুনানী হয় তখন বাদী উপস্থিত ছিল এবং ইসু সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়া পরে বিচারের দিন উপস্থিত হয়। বাদীর সাক্ষিগণ এবং বাদীর পক্ষে মোক্তার ও উকীল আদালতে উপস্থিত হয়। ডেপুটি কালেক্টর বলেন যে, ইহার কোন ব্যক্তিই বাদীর উপযুক্ত প্রতিনিধি নহেন, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৫ ধারা মতে বাদী স্বয়ং অথবা এমন এক এজেণ্ট দ্বারা হাজির হইতে বাধ্য যে নিজে বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত আছে, অথবা ঐ এজেণ্টের সঙ্গে এমত ব্যক্তির আসা উচিত যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত আছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ে বাদীর নিজে অথবা ঐ প্রকার এজেণ্ট দ্বারা হাজির হওয়ার আবশ্যক ছিল না। কেবল প্রমাণ শুনিয়া মোকদ্দমার বিচার করা মাত্র বাকী ছিল। বাদীকে স্বয়ং হাজির হইতে আদেশ করা হয় নাই, এবং ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের (উকীল ও মোক্তারের আইন) ২০ ধারা মতে "যে "সকল উকীল এই আইন মতে গৃহীত এবং "রেজিষ্টরী-কৃত হয়, তাহারা হাইকোর্টের বিচা- "রাধিকার মধ্যে যে কোন মাল কাছারীতে "হউক, সওয়ালজওয়াব ও কার্য্য করিতে "পারিবে।" অতএব উকীল এবং মোক্তার যিনি আমি বোধ করি, রিবেনিউ এজেণ্ট ছিলেন, তিনি হাজির হওয়াতে বাদীরই হাজির হওয়া হইয়াছিল, এবং ডেপুটি কালেকটরের সমক্ষে ঐ উকীল এবং মোক্তারকে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিতে দেওয়া উচিত ছিল। অতএব আইন মতে কার্য্য করিয়া বাদীর মোকদ্দমা শ্রবণ করিবার জন্য ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি হুকুমনামা জারী হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম। (গ)

---

১০ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ৯৮২ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অতিরিক্ত জজ খুলনিয়ার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২৫ ই জানুয়ারির

নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ২৪ এ জুন তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রাজা বরদাকণ্ঠ রায় বাহাদুর (বাদী)
আপেলাণ্ট।

রাধাচরণ রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী)
রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং ডবলিউ, এ, মণ্টি ও বারিষ্টর
আপেলাণ্টের কৌন্সেল।

বাবু শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে ভূমির কোন কর আদায় হয় নাই তাহাতে কর সংস্থাপনের মোকদ্দমা কর বৃদ্ধির মোকদ্দমা নহে।

কোন জমিদার তাহার ও রাইয়তের মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারীর কর বৃদ্ধি করিতে চাহিলে এ রূপ নির্দ্দিষ্ট নোটিস দিতে বাধ্য যাহাতে কর বৃদ্ধির হেতু স্পষ্ট রূপে বর্ণিত থাকে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—দেখা যাইতেছে যে, বাদী এ মোকদ্দমায় প্রতিবাদিগণের কর বৃদ্ধি করিবার ডিক্রী পাইতে পারে না।

আমি বরাবর দেখিয়া আসিতেছি যে, এ দেশে কর বৃদ্ধি করার এবং কর কমাইবার মোকদ্দমা অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার; এবং আমি যত দূর এ বিষয় বুঝি তাহাতে যখন মোকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে পরস্পর এ রূপ সম্বন্ধ থাকে যে, তাহাদের একের ভূমি অপরে ভোগ করিয়া তাহার উপস্বত্ব তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার স্বত্ব থাকে, এবং ঐ সকল উপস্বত্বের কি পরিমাণে ভাগ হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার যখন আদালত সকল, হয় আইন দ্বারা নচেৎ দেশাচারের দ্বারা তাহাদের উপর নিক্ষেপ করেন, তখনই কেবল কর বৃদ্ধির বা হ্রাসের প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব আমি বিবেচনা করি এ প্রকারের প্রত্যেক স্থলে ভূম্যধিকারী এবং প্রজা রূপ সম্বন্ধ থাকা এবং পক্ষগণের মধ্যে এমত চুক্তি থাকা আবশ্যক যে, এক পক্ষ ভূমির উপস্বত্বের কিয়দংশ প্রদান এবং অপর পক্ষ গ্রহণ করিবে।

আমার বিবেচনায়, উপস্থিত মোকদ্দমা বাস্তবিক করবৃদ্ধির মোকদ্দমা নহে। যে ভূমি এক্ষণে প্রতিবাদিগণ কোন কর না দিয়া ভোগ করিতেছে, সেই ভূমির উপর কোন এক হারে কর ধার্য্যের নিমিত্ত এ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে।

এই আদালত ১৮৬৪ সালে এই পক্ষগণের মধ্যে যে নিষ্পত্তি করেন তাহার শেষ অংশে যে বাক্য আছে তাহা আপেলাণ্টের বিজ্ঞবর কৌন্‌সেল এ মোকদ্দমায় আমাদিগকে বিশেষ আগ্রহের সহিত দেখাইয়াছেন। তাহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে; "যে সকল ভূমি ১৮৫৬ সালের "বন্দোবস্ত ব্যতীত প্রতিবাদিগণের ভোগ করি- "বার কথা বাদী বলে, তাহা যদি বাদী স্পষ্ট "চিহ্নিত করিতে পারে, তবে সে রীতিমত নোটিস "জারী করত কর বৃদ্ধির দাবীতে নূতন মোক- "দ্দমা উপস্থিত করিতে পারে।" আমার বিবেচনায় এমত তর্ক করা যাইতে পারে না যে, ঐ সকল শব্দ দ্বারাই উপস্থিত মোকদ্দমা চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, অথবা যে আদালতে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই আদালত ঐ সকল শব্দ দ্বারা এই স্থির করিতে বাধ্য যে, এ মোকদ্দমা অবশ্যই চলিবে। আমি বোধ করি ঐ বাক্যে এই মাত্র বুঝায় যে, আদালত বাদীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া চূড়ান্ত রূপে এই নিরূপণ করিতে মনস্থ করেন নাই যে, প্রতিবাদীর কর বৃদ্ধি হইতে পারিবে না, কিন্তু বাদী যে সকল ভূমির কর বৃদ্ধির দাবী করে তাহা সে স্পষ্ট রূপে চিহ্নিত করিতে না পারায় আদালত তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিতে বাধ্য হন, অতএব যদি সে ভবিষ্যতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ঐ সকল ভূমির স্পষ্ট নিশান দিতে পারে, তবে উক্ত নিষ্পত্তি হেতু তাহার

কর বৃদ্ধি করিবার স্বত্ত্ব সংস্থাপনের বাধা হইবে না। আমি বোধ করি উক্ত রায়ের এই মাত্রই অভিপ্রায় ছিল; অতএব প্রথমোক্ত হেতুতে এই মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু তদ্ব্যতীত, প্রদত্ত নোটিসের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আর একটি হেতু দেখা যাইতেছে। যে মোকদ্দমা ১২ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫০৬ পৃষ্ঠা হইতে দর্শান হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে এই বলা যাইতে পারে যে, যে জমিদার এমত কোন ব্যক্তির কর বৃদ্ধি করিতে চাহে, যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারী, সেই জমিদার এমত এক নির্দ্দিষ্ট নোটিস দিতে বাধ্য, যাহাতে কর বৃদ্ধির হেতু স্পষ্ট রূপে বর্ণিত থাকে। ধনপত সিংহের মোকদ্দমায় প্রিবি কৌন্সিলের রায়ে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা দ্বারাও উক্ত মত সংস্থাপিত হইতেছে, এবং তাহা উপরোক্ত মোকদ্দমার রায়ে বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি উল্লেখ করিয়াছেন। যে ভূমি লইয়া এ মোকদ্দমা উপস্থিত, তাহা যখন যৎসামান্য এক জোত না হইয়া এক বৃহৎ জমিদারী, তখন বাদী প্রতিবাদিগণের উপর যে নোটিস জারী করিয়াছে তাহা বাদীর নিকট কি প্রকারে যথেষ্ট বোধ হইয়াছিল, তাহা বুঝা কঠিন।

যাহা হউক, বাদী এই ভাবিয়া থাকিবে যে, সে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারা মতে কার্য্য করিতেছে। সে স্পষ্ট বলে যে, উক্ত ধারা মতে নোটিস দেওয়া হইয়াছে, এবং যদিও উক্ত ধারা অনুসারেই নোটিস দেওয়া হইল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কর-বৃদ্ধির নির্দ্দিষ্ট কোন হেতু লিখিত নাই। তাহাতে কেবল এই মাত্র লেখা আছে যে, প্রতিবাদিগণ বাস্তবিক কোন কর না দিয়া উক্ত ভূমি ভোগ করে, এবং উক্ত ভূমির কর পরগণার হারে প্রতি বিঘায় ৷৷০ আনা হওয়া উচিত। কোন্ শ্রেণীর প্রজার এবং কোন্ প্রকারের ভূমির সেই হারে কর হইতে পারে, তাহা তাহাতে বর্ণিত হয় নাই; অতএব আমি বিবেচনা করি যে, উক্ত নোটিস অসম্পূর্ণ হওয়ায় এই হেতুতেও বাদীর মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হওয়া উচিত। এবং বাদী এই আদালতের পূর্ব্বের রায়ের শব্দগুলি না বুঝিতে পারায় তাহার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে আমরা দুঃখিত হইলেও তদ্বিবেচনায় আমাদের তাহাকে ডিক্রী দেওয়া উচিত নহে।

আমি বিবেচনা করি, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি এই আপীল ডিস্মিস্ করণে সম্মত হইলাম। (ব)

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১৮০০ নং মোকদ্দমা।

দিনাজপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৫ ই মার্চের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১০ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মালদী নশ্য এবং আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

বল্লভীকান্ত ধর ও আর এক ব্যক্তি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অম্বিকাচরণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে জমা বৎসর বৎসর উল্লেখে প্রদত্ত হয়, তাহা পক্ষগণ যে পর্য্যন্ত সম্মত থাকে, সেই পর্য্যন্ত চলিত থাকে, এবং যদিও তাহা দুই পক্ষের এক পক্ষের ইচ্ছামতে কোন বৎসরের শেষে সমাপ্ত হইতে পারে, তথাপি তাহা প্রত্যেক বৎসরের শেষে যে অবশ্যই সমাপ্ত হওয়া গণ্য হইবে, এমত নহে।

বিচারপতি গ্লবর।—বাদী এই মোকদ্দমায় বাঙ্গলা ১২৭৫ সাল হইতে ৫ বৎসরের কবুলিয়তের জন্য এই বলিয়া ৩ জন রাইয়তের নামে নালিশ করে যে, তাহারা তাহার চুকানী অর্থাৎ ইচ্ছাধীন রাইয়ত। প্রতিবাদীর মধ্যে দুই ব্যক্তি অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টদ্বয় হাজির হইয়া তর্ক করে যে, তাহারা বিরোধীয় ভূমির দখীলকার ছিল, অতএব তাহারা বাদীকে কবুলিয়ৎ দিতে বাধ্য নহে। তৃতীয় প্রতিবাদী উপস্থিত হয় নাই। যে দুই প্রতিবাদী হাজীর হয়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রথম আদালত এই নির্দেশ করিয়া বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন যে, আর এক মোকদ্দমা যাহা বাদীর শরীকেরা ঐ তিন জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাতে ঐ প্রতিবাদিগণ যে জওয়াব দেয়, তাহাতে তাহারা ১২৭৪ সাল হইতে ঐ ভূমি পরিত্যাগ করে, অতএব এই বাদীকে কবুলিয়ৎ দেওয়ার জন্য এই প্রতিবাদিদ্বয়কে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

আপীলে জজ এই নিষ্পত্তি সংশোধন করিয়া তিন জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধেই বাদীকে ডিক্রী দেন, কারণ, তিনি বিবেচনা করেন যে, ঐ পূর্ব্ব মোকদ্দমায় ১ ও ২ নং প্রতিবাদী যে জওয়াব দেয় তাহাতে তাহারা ঐ জমা পরিত্যাগ করে নাই; এবং যেহেতু তাহারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৯ ধারামতে তাহাদের জমিদারকে নোটিস দেয় নাই, অতএব তাহারা এখনও খাজানার জন্য দায়ী, সুতরাং তাহারা বাদীকে কবুলিয়ৎ দিতে বাধ্য। কিন্তু জজ নির্দেশ করিয়াছেন যে, পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে কোন পক্ষ হউক, ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক বৎসরের শেষে জমা সমাপ্ত করিতে পারে, অতএব তিনি ৫ বৎসরের জন্য কবুলিয়তের জন্য ডিক্রী দিয়া এই এক সর্ত্ত যোগ করেন যে, রাইয়তেরা যে কোন বৎসরের শেষে হউক, জমা সমাপ্ত করিতে পারিবে।

আমাদের সমক্ষে খাস আপীলে যে মুল আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা এই যে, প্রতিবাদিগণের জোত বার্ষিক বিধায় প্রত্যেক বৎসরের শেষে স্বতঃই সমাপ্ত হয়, এবং এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, রাইয়তেরা প্রতিবৎসরের শেষেই তাহাদের জোত পরিত্যাগ করে, এবং নূতন বন্দোবস্ত না করিলে, তাহারা তাহাদের জমিদারের নিকট খাজানার জন্য দায়ী হয় না।

এই তর্ক অতি অকর্ম্মণ্য। প্রথমতঃ, আমরা দেখিতেছি যে, এতৎ সম্বন্ধে জজ বৃত্তান্ত-ঘটিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই জমা যদিও পক্ষগণের ইচ্ছামতে প্রত্যেক বৎসরের শেষে সমাপ্ত হইতে পারে, তথাপি তাহা যে অবশ্যই প্রত্যেক বৎসরের শেষে সমাপ্ত হইবে, এমত নহে। বিশেষতঃ, আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে জমা বৎসর বৎসর চলিবার কথা থাকে, তাহা যে পর্য্যন্ত পক্ষগণ সম্মত থাকে, সে পর্য্যন্ত চলিত জমা বিবেচনা করিতে হইবে, এবং ঐ জমা কোন এক নির্দ্দিষ্ট বৎসরের শেষে সমাপ্ত হওয়ার জন্য পক্ষগণের মধ্যে বন্দোবস্ত না হইলে তাহা ঐ প্রকার সমাপ্ত হয় না। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৯ ধারা এই প্রকার জমা সম্বন্ধে খাটে, এবং এই প্রতিবাদিগণের ন্যায় যে রাইয়তেরা জমা ভোগ করে, তাহারা ঐ ধারার বিধান মতে যে ব্যক্তি খাজানা পাইতে স্বত্ত্ববান্ তাহার নিকট তাহাদের জমা পরিত্যাগের ইচ্ছার লিখিত নোটিস না দিলে তাহারা জমা পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথবা খাজানা দেওয়ার দায় হইতেও মুক্ত হইতে পারে না।

খাস আপেলাণ্টের উকীলের দ্বারা আরও তর্কিত হইয়াছে যে, নথীতে প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও জজ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতিবাদিগণ ১২৭৫ সালে দখীলকার ছিল, এবং প্রতিবাদিগণ ১২৭৪ সালে দখীলকার ছিল বলিয়া, তাহা তাহাদের ১২৭৫ সালে দখীলকার থাকার প্রমাণ হইতে পারে না। ইহার উত্তর অতি সরল। যদি প্রতিবাদিগণ রাইয়ত সূত্রে ১২৭৪ সালে

দখীলকার থাকিয়া থাকে, এবং যদি তাহারা আইনের বিধান মতে ভূমি পরিত্যাগ না করিয়া থাকে, তবে তাহারা বাস্তবিক দখীলকার থাকুক বা না থাকুক, তাহাদিগকে ১২৭৫ সালে দখীলকার থাকা বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে, অতএব যে পর্য্যন্ত ঐ ভূমি অন্য ব্যক্তিকে না দেওয়া হয়, সে পর্য্যন্ত তাহারা বাদীর নিকট খাজানার দায়ী।

খাস আপীলের দরখাস্তের লিখিত ১ ম, ৫ ম, ৬ ষ্ঠ, ও ৭ ম, হেতুর কিঞ্চিৎ উল্লেখ হইয়াছে। ইহাঁর মধ্যে ৫ ম, ৬ ষ্ঠ, ও ৭ ম, হেতুর উত্তরে কেবল ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৯ ধারার উল্লেখ করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, সে পর্য্যন্ত রাইয়তেরা ভূমি ত্যাগ না করে, সে পর্য্যন্ত তাহারা খাজানার জন্য দায়ী থাকে। প্রথম আপত্তি পারিভাষিক এবং তাহা নিম্ন আদালতে মোকদ্দমার কোন অবস্থায় উত্থিত হয় নাই; অতএব আমরা খাস আপীলে তাহা উত্থাপন করিতে দিতে পারি না।

এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

**বিচারপতি হবহৌস।**—আমি এই কথা বলিতে চাহি যে আমি নিশ্চয় জানি না যে, এই মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৯ ধারার বিধান খাটে কি না, তাহা আমাদের বিবেচনা করা আবশ্যক, এবং আমার ইহাও মত নহে যে, প্রত্যেক ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে যে বন্দোবস্ত হয় তাহাতেই প্রজা ঐ আইনের ১৯ ধারা মতে নোটিস দিতে বাধ্য হইবে। আমি বিবেচনা করি যে, জজ যে সমস্ত বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে এই যে, প্রথমতঃ, পক্ষগণের মধ্যে যে কোন পক্ষ হউক ইচ্ছা মতে এই জমা যে কোন বৎসর হউক, তাহার শেষে সমাপ্ত করিতে পারে; এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি বলেন যে, "বাস্তবিক ইস্তাফা করা হয় নাই।" অতএব প্রতিবাদিগণ সম্বন্ধে আমার বিবেচনায় তিনি এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে বন্দোবস্তের উপরে বাদী নালিশ করিয়াছে তাহা রাইয়ত প্রতিবাদিগণের ইচ্ছা মতে বৎসরের শেষে সমাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবাদিগণ তাহা বাস্তবিক সমাপ্ত অর্থাৎ পরিত্যাগ করে নাই। যদি তাহা সমাপ্ত না হইয়া থাকে, তবে তাহা এখনও চলিতেছে বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব উপস্থিত বিচার্য্য প্রশ্নে ১৯ ধারা খাটুক বা না খাটুক, আমার ইহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, জজ যে বৃত্তান্ত-ঘটিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত। অতএব আমি এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস করিতে সম্মত হইলাম। (গ)

---

১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ এ গ্লবর এবং
সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ৫৫৫ নং মোকদ্দমা।

বগুড়ার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ৩০ এ জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া রাজসাহীর জজ ১৮৬৮ সালের ২৯ এ ডিসেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

বগুড়ার কালেক্টর (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

দ্বারকানাথ বিশ্বাস ও আর এক ব্যক্তি
(বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ললিতচন্দ্র সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—রিবেনিউ কালেক্টর ১৮২৭ সালের ৫ ম কানুনের ৩ ধারা মতে কোন জমিদারীর এড্‌মিনিষ্ট্রেটর অর্থাৎ সরবরাহকার নিয়োজিত হইলেই তাঁহাকে কোন প্রকারে জমিদারের প্রজা বলা যাইতে পারে না।

**বিচারপতি হবহৌস।**—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্ত অতি সরল। কোন জমার প্যারী-

মোহন নামক এক মালিক উইল না করিয়া মরে। ১৭৯৯ সালের ৫ ম কানুন ও ১৮২৭ সালের ৫ ম কানুন মতে তাহার সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের অধীনে আইসে। ১৭৯৯ সালের ৫ম কানুনের ৫ ধারা ও ১৮২৭ সালের ৫ ম কানুনের ৩ ধারা মতে ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করার জন্য ঐ জেলার কালেক্টর নিয়োজিত হন; অতএব উক্ত কানুনে যে প্রকার অনুজ্ঞা আছে তদনুসারে কালেক্টরের ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের ভার লইতে হয়। তিনি ১৮৬৪ সালের আগষ্ট মোতাবেক বাঙ্গালা ১২৭১ সালের ভাদ্র মাস হইতে ১৮৬৮ সালের মে মোতাবেক ১২৭৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত সেই সম্পত্তি লইয়া তাহার তত্ত্বাবধারণ করেন। সেই সময়ে তিনি ঐ সম্পত্তির উপস্বত্ব আদায় করিয়া তাহা তাঁহার দখলে রাখেন। নিম্ন আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ উপস্বত্বের ৪৫ টাকা দ্বারা তিনি ঐ সম্পত্তির দেয় রাজস্ব দিয়াছিলেন এবং বাকী টাকা তিনি নিম্নলিখিত অবস্থামতে আদালতে দাখিল করেন।

প্যারীমোহনের সম্পত্তির বিরুদ্ধে এক ব্যক্তি ডিক্রী পায়। সেই ডিক্রীজারীতে কালেক্টরের হস্তে যে সম্পত্তি ছিল, তাহা সে ক্রোক করে। যে আদালতের ঐ ডিক্রীজারী করার অধিকার ছিল সেই আদালতের হুকুম মতে কালেক্টর ঐ ডিক্রী পরিশোধার্থে উক্ত ৪৫ টাকা বাদে সম্পত্তির সমুদায় আয় আদালতে দাখিল করেন।

এমত অবস্থায়, বাদী এইক্ষণে আদালতে উপস্থিত হইয়া বলে যে, প্যারীমোহনের যে জমা ছিল তাহার সে উচ্চ ভূম্যধিকারী এবং ১২৬৮ সাল হইতে ১২৭১ সাল পর্য্যন্ত ঐ জমার খাজানা তাহার প্রাপ্য আছে; অতএব সে দাবী করে যে, কালেক্টর প্যারীমোহনের স্থলাভিষিক্ত বিধায় কালেক্টরই তাহার প্রজা এবং উক্ত খাজানার জন্য দায়ী।

"এই মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে উপস্থিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১০ আইনমতে এই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারিলে, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল যেরূপ স্বীকার করিয়াছেন সেই রূপ কেবল ১২৭১ সালের এবং সেই সময় হইতে তাহার পরের খাজানার জন্য উপস্থিত হইতে পারে। অনন্তর, আমাদের বিবেচনায়, কালেক্টরকে কোন অর্থেই বাদীর প্রজা বলা যাইতে পারে না; অতএব এই নালিশ গ্রহণ করিতে মাল-আদালত সমস্তের, সুতরাং নিম্ন আপীল-আদালতের অধিকার ছিল না। ১৭৯৯ সালের ৫ ম কানুনের ৫ ধারা অনুসারে, যে ব্যক্তি উইল না করিয়া মরে তাহার সম্পত্তির উচিত তত্ত্বাবধারণের জন্য তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে আদালতের প্রতি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, এবং তত্ত্বাবধারক তাহার তত্ত্বাবধারণের কালের জমাখরচের সম্পূর্ণ ও ন্যায্য হিসাব দিতে বাধ্য। এই ধারার বিধানমতে পূর্ব্বে আদালত সমস্ত যাহাকে ইচ্ছা তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু আদালতের ঐ ক্ষমতা ১৮২৭ সালের ৫ ম কানুনের ৩ ধারার দ্বারা সংশোধিত হইয়া ব্যক্ত হয় যে, রিবেনিউর কালেক্টর ঐ তত্ত্বাবধারকের পদে নিয়োজিত হইবেন। অতএব যখন এই স্থলে রিবেনিউর কালেক্টর প্যারীমোহনের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে নিয়োজিত হন, তখন ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তিনি ঐ সূত্রে কেবল আয় ব্যয়ের হিসাব দিতে দায়ী, আর কোন বিষয়ের জন্য দায়ী নহেন। আইনের বাক্যগুলির কেবল তাহাই মর্ম্ম, অন্য মর্ম্ম বিবেচনা করা অন্যায়

অধঃস্থ জজ বিবেচনা করেন যে, কালেক্টর কতক দায়ী, কারণ, "জমিদারের খাজানা যে পাওনা "ছিল (প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহার বলা উচিত ছিল "যে, খাজানার যে দাবী করা হইয়াছিল) তাহা "অবগত থাকিয়া জমিদারের খাজানার দাবী

"পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট টাকা হস্তে না "রাখিয়া কালেক্টরের সকল টাকা দেওয়ানী "আদালতে পাঠান উচিত ছিল না।" জজ বলেন যে, কালেক্টর প্রধান সদর আমীনকে যে উত্তর প্রেরণ করেন তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে, তিনি গবর্ণমেন্টের খাজানার জন্য আপন হস্তে ৪৫ টাকা রাখিয়াছিলেন; অতএব জজ বিবেচনা করেন যে, জমিদারের খাজানার দাবী পরিশোধ করার জন্যও কালেক্টরের টাকা রাখা উচিত ছিল।

ইহার উত্তর এই যে, কালেক্টর যিনি কেবল তত্ত্বাবধারক ভিন্ন আর কিছু ছিলেন না, যে স্থলে তিনি ঐ সম্পত্তি হইতে যে টাকা আদায় করিয়াছিলেন তাহা আদালতে দাখিল করিতে তাঁহার প্রতি হুকুম হইয়াছিল, সে স্থলে তাঁহার হস্তে কিছু না রাখিয়া সমুদায় টাকাই আদালতে প্রদান করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। অতএব কালেক্টরের যে টাকা নিজের হস্তে রাখা কর্ত্তব্য ছিল না, সেই টাকা তিনি রাখিয়াছিলেন বলিয়া তাহা হইতে কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহা তাঁহার উচিত হউক বা না হউক, আমাদের বিবেচনায়, এই বিষয়ে কালেক্টরকে বাদী জমিদারের প্রজা বলা যাইতে পারে না। অতএব কালেক্টরের বিরুদ্ধে বাদীর প্রতিকারের অন্য কোন উপায় থাকুক বা না থাকুক, বাদী এই মোকদ্দমায় প্রতিকার পাওয়ার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তদ্দ্বারা সে প্রতিকার পাইতে পারে না।

আমরা নিম্ন আপীল-আদালতের রায় অন্যথা করত প্রথম আদালতের বাদীর নালিশ ডিস্মিস করার রায় স্থির রাখিলাম। (গ)

২১ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

### বিচারপতি জি, লক, এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৬৭৩ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২২ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১২ ই এপ্রিল তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শিবব্রত সিংহ (বাদী) আপেলাণ্ট।

লালজী চৌধুরী (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু তারকনাথ পালিত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে এবং এক নাবালগের অভিভাবক স্বরূপে, কবুলিয়তের দাবীতে নালিশ হইলে, সে ঐ নাবালগের অভিভাবকতা অস্বীকার করে; কিন্তু তাহার নিজের অংশ আছে এবং সে নাবালগের অভিভাবকও আছে স্থির করিয়া প্রথম আদালত তাহার ও নাবালগের উভয়েরই বিরুদ্ধে বাদীকে ডিক্রী দেন। ঐ নাবালগের খুড়ী পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করে, এবং তাহা অগ্রাহ্য হওয়ায় আপীল করে।

এ স্থলে ঐ খুড়ীর ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে সার্টিফিকেট না থাকিলেও, ঐ আইনের ৩ ধারামতে তাহাকে নাবালগের অভিভাবিকা স্বরূপে আপীল করিতে দিতে জজের ক্ষমতা আছে। কিন্তু বাদী এবং ঐ অভিভাবিকার মধ্যে দোষগুণ দৃষ্টে মোকদ্দমার পুনরায় বিচারার্থে তাহা প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠান জজের কর্ত্তব্য।

বিচারপতি লক।—এ মোকদ্দমায় বাদী শিবব্রত সিংহ, লালজী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার নিজের স্বত্বে এবং রামসহায় নামক এক নাবালগের অভিভাবক স্বরূপে, কবুলিয়তের দাবীতে নালিশ করে। লালজী প্রতিবাদী উক্ত নাবালগের অভিভাবক থাকিবার বিষয় অস্বীকার করে। কিন্তু ডেপুটি কালেক্টর প্রমাণ দৃষ্টে স্থির করেন যে, লালজীর উক্ত ভূমিতে অংশ ছিল, এবং সে ঐ নাবালগের অভিভাবক ছিল; অতএব তিনি লালজীর এবং রামসহায়ের বিরুদ্ধে বাদীকে কবুলিয়তের ডিক্রী দেন।

উক্ত ডিক্রী দিবার পরে ঐ নাবালগের খুড়ী মসম্মত লালকুমারী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫৮ ধারা অনুসারে কালেক্টরের নিকট এই হেতুবাদে উক্ত মোকদ্দমা পুনঃশ্রবণের জন্য দরখাস্ত করে যে, ঐ নাবালগের বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পক্ষে কেহ উপস্থিত হয় নাই, ডেপুটি কালেক্টর ঐ দরখাস্ত এই বলিয়া অগ্রাহ্য করেন যে, তিনি ১৮৬৮ সালের ১৯ সেপ্টেম্বরে যে ডিক্রী দেন তাহা কেবল লালজীর বিরুদ্ধে দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার রায়ের শব্দ হইতে স্পষ্ট প্রকাশ যে, লালজী এবং ঐ নাবালগ রামসহায় উভয়ের বিরুদ্ধেই ঐ ডিক্রী দেওয়া হয়।

লালকুমারী পরে জজের নিকট আপীল করে; এবং জজ স্থির করেন যে, উক্ত ডিক্রী স্পষ্টই ঐ নাবালগের বিরুদ্ধে হইয়াছে; কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, যখন লালজী বলে যে, সে ঐ নাবালগের অভিভাবক ছিল না, তখন দোষগুণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠান অনাবশ্যক; এবং তাহার ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনানুসারে সার্টিফিকেট থাকিলেই কেবল ডেপুটি কালেক্টর তাহাকে অভিভাবক স্বরূপে দায়ী করিতে পারিতেন; এবং অভিভাবকতার বিষয় যখন মোকদ্দমার বিষয়ের মধ্যে গণ্য নহে, তখন এই স্থির করিতে হইবে যে, উক্ত নাবালগের সম্পত্তি ঐ ডিক্রী হইতে মুক্ত। সেই সঙ্গে আমাদিগের নিকট বলা হইয়াছে যে, বাদী এক পাল্টা আপীল করিয়া এই প্রার্থনা করে যে, উক্ত মোকদ্দমা তাহার মধ্যে এবং লালকুমারীর অভিভাবকতার অধীন ঐ নাবালগের মধ্যে দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে ফেরৎ পাঠান হয়।

নিম্নলিখিত হেতুবাদে খাস আপীল হইয়াছে :—

প্রথমতঃ, লালকুমারী যখন মোকদ্দমায় কোন পক্ষ নহে, এবং ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে অভিভাবকতার সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত হয় নাই, তখন তাহাকে প্রথম আদালতের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিতে দেওয়া জজের অন্যায় হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি আদালতের মতে লালকুমারীকে উক্ত নাবালগের অভিভাবিকা স্বরূপে কার্য্য করিতে দেওয়া যাইতে পারে, তবে মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে ফেরৎ পাঠান উচিত ছিল।

আমরা বিবেচনা করি, লালকুমারী ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট না পাওয়া সত্ত্বেও তাহাকে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ৩ ধারার বিধানানুসারে উক্ত নাবালগের প্রতিনিধি হইতে দিতে এবং কালেক্টরের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল করিতে দিতে জজের ক্ষমতা ছিল।

আমরা আরও বিবেচনা করি যে, বাদী যখন তাহার মোকদ্দমা লালজীর বিরুদ্ধে তাহার নিজের স্বত্বে এবং ঐ নাবালগের অভিভাবক স্বরূপে উপস্থিত করিয়াছে, তখন জজের এই মোকদ্দমা বাদীর এবং ঐ নাবালগের প্রতিনিধি স্বরূপে লালকুমারীর মধ্যে দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে ফেরৎ পাঠান উচিত ছিল। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন ঐ মোকদ্দমা প্রথম আদালতে বিচারিত হয় তখন লালজী ঐ নাবালগের স্পষ্ট অভিভাবক থাকা সত্ত্বেও সে অভিভাবক স্বরূপে কার্য্য করিতে অস্বীকার করে; অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রথম আদালতে উক্ত নাবালগের পক্ষে কেহ উচিতমতে উপস্থিত হয় নাই, এবং নাবালগের পক্ষে কেহ উপস্থিত ছিল কি না তাহা না দেখিয়া আদালতের তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু লালজী উক্ত নাবালগের অভিভাবকতা অস্বীকার করে বলিয়াই যে ঐ নাবালগের বিরুদ্ধে বাদীর দাবীর বিচার হইবে না, ইহার কোন কারণ নাই। সে উভয় লালজী এবং ঐ নাবালগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা উপস্থিত করে, এবং এক্ষণে ঐ নাবা-

লগের প্রতিনিধি স্বরূপে লালকুমারী সম্বন্ধে তাহার মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে। অতএব এই মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে বিচারার্থে প্রথম আদালতে ফেরৎ যাইবে।

মোকদ্দমার ফল দৃষ্টে এই আপীলের খরচার আদেশ হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

---

২৩ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে পি নর্ম্যান ও বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৭০ সালের ১ নং মোকদ্দমা।

১৮৬৮ সালের ১২০৮ নং খাস আপীলের মোকদ্দমায় হাইকোর্টের বিচারপতি এল এস জ্যাক্‌সন ও দ্বারকানাথ মিত্র ১৮৬৯ সালের ২৫ এ নবেম্বর তারিখে পরস্পর মতভেদে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারা মতে আপীল।

হরক সিংহ ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

তুলসীরাম সহায় (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং সি গ্রেগরি আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কর বৃদ্ধির মোকদ্দমায় প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, তাহার খাজানা ২০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু সে এমন কথা কহে না অথবা প্রমাণও দেয় না যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে তাহার খাজানা অপরিবর্ত্তিত না হওয়াতে তাহার অপরিবর্ত্তনীয় খাজানায় জমা ভোগ করার স্বত্ব আছে। এমত স্থলে দুই বিচারপতি নির্দ্দেশ করিলেন যে, প্রতিবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে এক অপরিবর্ত্তিত হারে খাজানা দিয়া ভোগ করিয়াছে কি না, এই ইসুর বিচার না করা ডেপুটি কালেক্টরের পক্ষে ন্যায্যই হইয়াছে।

কোন ব্যক্তির যে স্বত্ব থাকে, তাহা যদি সে নিজে স্পষ্টাক্ষরে উত্থাপন না করে ও তাহার বিচারের প্রার্থনা না করে, তবে আদালত স্বয়ং সেই স্বত্ব সম্বন্ধে ইসু উত্থাপন করিতে ও তাহার বিচার করিতে বাধ্য নহেন।

১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে বিচার্য্য ইসু সমস্ত ঐ আইনের ৬৫ ধারানুযায়ী, প্রধানতঃ, পক্ষগণের জবানবন্দী দৃষ্টে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এই অধিবেশনের কেবল এক জন বিচারপতির (বিচারপতি বেলি) মত এই যে, রাইয়ত প্রতিবাদীর আপন জওয়াবে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ এবং ৪ ধারার শব্দ স্পষ্ট বাক্যে অবিকল ব্যক্ত করা অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে; যদি সে বস্তুতঃ এই জওয়াব দেয় যে, সে স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে এক হারে ভোগ করিয়াছে, এবং সে যদি ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এক অপরিবর্ত্তিত হারে ভোগ করার প্রমাণ দেয়, তবে তাহাতেই এই অনুমানের উদয় হইবে যে, সে স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে এক হারে ভোগ করিয়া আসিয়াছে।

উপরিউক্ত দুই বিচারপতির মতই প্রবল।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—প্রতিবাদিগণ যাহারা উপস্থিত খাস আপেলাণ্ট, তাহাদের জমার ১২৭৪ সালের বাকী খাজানার জন্য বাদী প্রথম আদালতে নালিশ করে।

প্রতিবাদিগণ বর্ণনা-পত্র দাখিল করে এবং তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে শপথ পূর্ব্বক জবানবন্দী দেয়। প্রথম আদালত বাদীকে কতক খাজানার ডিক্রী দিয়া, আমাদের সমক্ষে এইক্ষণে যে ইসু সম্বন্ধে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিচার করিতে নিম্নলিখিত হেতুবাদে অস্বীকার করেন। ঐ আদালত বলেন, "যেহেতু প্রতিবাদিগণ এই বলিয়া অপরিবর্ত্তিত "হারে জমা ভোগ করার স্বত্ব উত্থাপন করে "নাই যে, সেই হার স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল "হইতে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু তাহারা কেবল "বলিয়াছে যে, ২০ বৎসরের অধিক কালাবধি

"খাজানা অপরিবর্ত্তিত আছে, অতএব এই বিষয় "সম্বন্ধে কোন ইসু নির্দ্ধারিত হয় নাই। দেখা "যাইতেছে যে, তাহাদের দাক্ষী সোব্রাত আলী "বলে যে, ভূমি প্রথমে প্রতিবাদীর পিতা কর্ত্তৃক "আবাদ হয়।" আদালত উপরি উক্ত শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়া, ভূমি স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত খাজানায় ভোগীকৃত হইয়াছে কি না, তাহার বিচার করিতে অস্বীকার করেন।

মোকদ্দমা তদনন্তর নিম্ন আপীল-আদালত হইতে খাস আপীলে এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশনের সমক্ষে উপস্থিত হয়, এবং প্রথম আদালত যে প্রকার ইসু গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করেন সেই প্রকার ইসু উত্থিত হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে ঐ খণ্ডাধিবেশনের জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায়ের সহিত কনিষ্ঠ বিচারপতির রায় অনৈক্য হওয়াতে সেই জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায়ই প্রবল হয়, এবং তাহার বিরুদ্ধে রাজকীয় সনন্দের ১৫ ধারামতে আমাদের সমক্ষে এইক্ষণে আপীল হইয়াছে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের বিবেচনায়, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত হারের প্রশ্ন সওয়াল-জওয়াবে উত্থিত হইয়াছে, এবং প্রথম আদালত সেই প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য ছিলেন, অতএব ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতি বিবেচনা করেন যে, ঐ ইসুর বিচারের জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করা উচিত। বিচারপতি জ্যাক্সন পক্ষান্তরে বিবেচনা করেন যে, ঐ ইসু উচিত রূপে উত্থিত হয় নাই, এবং তাঁহার রায়ের সারাংশ এই যে, "ইহার কোন সন্দেহ "নাই যে, উচিত ইসু নির্দ্ধারণ করা আদালতের "কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং যদি এমত দেখা যায় যে, "এই মোকদ্দমায় স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে "অপরিবর্ত্তিত হারে ভোগ করার প্রশ্ন উচিত "রূপে উত্থিত হয়, তবে সেই ইসু নির্দ্ধারণ "ও বিচার করার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ "করাই আমাদের কর্ত্তব্য হইবে; কিন্তু প্রতি- "বাদীর স্বত্বের ভাবে এবং তাহাদের জবান- "বন্দীতে এমন কিছু দেখা যায় না যে, ঐ "জমা স্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ "হইয়াছে, এবং তাহা ঐ সময় হইতে বর্ত্তমান "কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত হারে চলিয়া আসি- "য়াছে।" এই শব্দগুলির দ্বারা বোধ হইতেছে যে, ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতি বিবেচনা করিয়াছেন যে, ঐ প্রশ্ন উচিত রূপে উত্থিত হয় নাই, কারণ, প্রতিবাদিগণের স্বত্বের ভাব ও তাহাদের জবানবন্দী হইতে তাহা অনুভূত হইতে পারে না, এবং তিনি তদনন্তর বলেন যে, প্রতিবাদী অন্য যে এক প্রমাণ দিয়াছে তাহা হইতেও তাহা অনুভূত হইতে পারে না। আপেলাণ্টের পক্ষে মেং গ্রেগরি যে সকল শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া কহেন যে, তদ্দ্বারা ঐ ইসু উত্থিত হইয়াছে, তাহা প্রতিবাদিগণের বর্ণনা-পত্রে এই রূপ লেখা আছে। প্রতিবাদিগণ তাহাতে বলে যে, জমার করবৃদ্ধি হইতে পারে না, কারণ, "ইহা একটি প্রজাস্তা মোকররী জমা, পূর্ব্ব কাল "হইতে ২০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত "খাজানার হ্রাস-বৃদ্ধি না হইয়া চলিয়া আসি- "তেছে; ইহা পৈতৃক জোত এবং পুরাতন "প্রথানুসারে এক হারে রহিয়াছে, এবং এই "জমা প্রজাস্তা মোকররী জমা বিধায় ইহার "খাজানা বৃদ্ধি হইতে পারে না, এবং খাজানা "বৃদ্ধির প্রার্থনা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের "৪ ধারার বিরুদ্ধ।"

এই বর্ণনা আমার বিবেচনায়, কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত শব্দে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রতিবাদিগণ ইহাতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার উল্লেখ করিয়াছে; যে সকল জমা স্থায়ী বন্দোবস্তের কালে বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে ঐ ধারা খাটে; এবং যদি কেবল ঐ বর্ণনাই থাকিত এবং কেবল তাহাই এই মোকদ্দমায় আমাদের পর্য্যালোচনা করিতে হইত, তাহা হইলে মেং গ্রেগরি যে বিবিধ নজীরের উল্লেখ

করিয়াছেন তদৃষ্টে আমি বলিতে পারিতাম যে, প্রতিবাদিগণের আপন জওয়াবে এই বলিবার মনস্থ ছিল যে, তাহারা ৪ ধারা-বর্ণিত জমা ভোগ করে। কিন্তু প্রতিবাদিগণ যখন প্রথমে তাহাদের বর্ণনা-পত্র দাখিল করে, তখন তাহাদের যাহাই বলার মনস্থ থাকুক, তাহাদের পশ্চাতের কার্য্যের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের কখন স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে এক অপরিবর্ত্তিত খাজানায় জমা ভোগ করার কথা বলিবার মনস্থ থাকিলেও, তাহা তাহারা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি দেখিতেছি যে, তাহাদের বর্ণনা-পত্র ৪ ঠা নবেম্বর তারিখে দাখিল হয়। ৫ ই নবেম্বর তারিখে প্রতিবাদীর জবানবন্দী লওয়া হয়, এবং প্রথমে সে কেবল এই কথা বলে যে, বাদী যে জল সেচনের প্রণালী করিয়াছে তাহাতে ভূমির উন্নতি হয় নাই এবং তাহার সাক্ষাতে ভূমি জরিপ হয় নাই, এবং তাহার প্রতি জেরা সওয়াল না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহার জমা স্থায়ী বন্দোবস্তের কালে বর্ত্তমান থাকার কথার কোন উল্লেখও সে করে নাই, এবং তখন সে যে কথা বলে তাহা তাহার পূর্ব্ব দিবস সে আপন বর্ণনা-পত্রে যাহা ব্যক্ত করিয়াছিল তদপেক্ষা অনেক অসম্পূর্ণ। তাহার কথাগুলি এই যে, “আমার “পিতার সময় হইতে এই জোত পৈতৃক খিলমার। “১২৬৩ সালে জোতের জমি আমার দখলে ছিল “এবং আমার নিকট খাজানার দাখিলা আছে, “এবং যে অবধি আমার ভূমি খিলমার জোত “হইয়াছে, সে অবধি এক হার চলিয়া আসি-“য়াছে।” পূর্ব্ব দিবস কাগজে যে বর্ণনা লেখা হইয়াছে, তাহার সহিত এই কথার অনেক প্রভেদ আছে।

অনন্তর, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীলের বাক্যমতে আমারও বোধ হইতেছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬৫ ধারার বিধান এই যে, প্রধানতঃ পক্ষগণের জবানবন্দী হইতেই ১০ আইন মতে বিচার্য্য ইসু সমস্ত নির্ণীত হইবে। আমার বোধ হয় না যে, উকীলের তর্কমতে, বর্ণনা-পত্র এককালেই পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে না, কারণ, ৫৯ ধারামতে ঐ বর্ণনা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য, এবং ইহা কখন মনে করা যাইতে পারে না যে, যে স্থলে ব্যবস্থাপক সমাজ ঐ প্রকার বর্ণনা-পত্র সমস্ত নথীভুক্ত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাদের এই মনস্থ ছিল যে, তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইবে না। যাহা হউক, ৬৫ ধারার বিধান সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, ইসু প্রস্তুত করার জন্য মাল আদালতের পক্ষগণের জবানবন্দীর প্রতিই বিশেষ রূপে দৃষ্টি করার বিধান স্থাপন করা মনস্থ ছিল। পক্ষগণের অর্থাৎ এস্থলে প্রতিবাদিগণের জবানবন্দী লওয়ার পরে ১৮৫৭ সালের ৫ ই নবেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমার যে ইসু নির্ণীত হয় তাহা এই যে, বাদী যে আহর উঠাইয়াছে তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে কি না, এবং হইয়া থাকিলে, তাহা কি পরিমাণে হইয়াছে? পক্ষগণের জবানবন্দী লওয়ার পরে এবং তাহাদের সাক্ষাতে মাল আদালত এই ইসু ধার্য্য করেন এবং এই ইসু সম্বন্ধেই উভয় পক্ষের প্রমাণ প্রয়োগ হয়; এবং আমি প্রতিবাদীর জবানবন্দীতে যে অনিশ্চিত বর্ণনার উল্লেখ করিয়াছি তদ্ভিন্ন, উল্লিখিত ইসু ব্যতীত অন্য কোন ইসুর বিচার সম্বন্ধীয় কোন কথা প্রদর্শিত নাই। নথীতেও এই ইসুর প্রতি প্রতিবাদীর কোন আপত্তি নাই, অথবা আদালত যে ইসুর বিচার করিয়াছেন তদ্ভিন্ন অন্য কোন ইসুর বিচার করার জন্য সে প্রার্থনাও করে নাই।

মোকদ্দমার নথী ২৭ এ নবেম্বর তারিখে সমাপ্ত হয়, এবং ২৮ এ নবেম্বর তারিখে আদালত আপন রায় প্রদান করেন। সেই দিবস আদালতকে প্রথম জানান হয় যে, জমা স্থায়ী বন্দোবস্তের কালে সংস্থাপিত ছিল কি না, এই ইসুর বিচার করা কর্ত্তব্য ছিল। প্রতিবাদী তাহার মোক্তারের দ্বারা এই কথার দরখাস্ত

করে, কিন্তু সেই দরখাস্তে সত্যতা লিখিত হয় নাই, এবং তাহার সারাংশ এই যে, "যদিও "আমার প্রজাস্বত্ব জোত স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল "হইতে সংস্থাপিত আছে, এবং ২৯ বৎসরের "দলীল দাখিল হইয়াছে, তথাপি বর্ণনা-পত্রে "'২০ বৎসরের অধিক কাল' লেখা হওয়াতে "এবং 'স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে' শব্দ- "গুলি না লেখাতে প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধে কোন ইসু "নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্রকৃত কথা এই যে, "যে স্থলে বৎসরের নির্ণয় লেখা হয় নাই, এবং যে স্থলে আমি ২০ বৎসরের অধিক কালের "কথা লিখিয়াছি, সে স্থলে তাহা ১০০ বৎসরের "সমতুল্য, এবং স্থায়ী বন্দোবস্ত ১২০২ সালে "হইয়াছে।" অতএব প্রার্থী প্রার্থনা করে যে, জজ স্থানীয় তদন্ত করেন অথবা করার হুকুম দেন; অতএব আমাদের অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই জমা যে স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে সংস্থাপিত আছে তদ্বিষয়ে স্থানীয় তদন্ত করার জন্য প্রার্থনা হয়। এই দরখাস্তের উপরে জজ বলেন যে, মোকদ্দমা শেষ হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি তাঁহার রায় ব্যক্ত করিতে উদ্যত, অতএব তিনি ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন; এবং তাহার পরে, আমি পূর্ব্বে যে ইসু উদ্ধৃত করিয়াছি জজ তদ্বিষয়ে তাঁহার রায় প্রদান করেন।

নথীর লিখিত প্রমাণ দৃষ্টে যদিও বলা যাইতে পারে যে, প্রতিবাদীর প্রথম বর্ণনা-পত্রে এমন কথা ছিল যদ্দ্বারা ঐ ইসু ধার্য্য হইতে পারিত, তথাপি তাহার নিজের ও তাহার সাক্ষিগণের জবানবন্দী পর্য্যালোচনা করিয়া এবং প্রথম আদালতে যে প্রণালীতে মোকদ্দমা চালান হইয়াছে তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, যে পর্য্যন্ত সে আসল ইসুর বিচারে পরাজিত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত সে স্থায়ী বন্দোবস্তের কালে তাহার জমা বর্ত্তমান থাকার ইসু উত্থাপন করে নাই; এবং তাহা আমার ইহা দেখিয়াও বোধ হইতেছে যে, যখন প্রতিবাদিগণ নিম্ন আপীল-আদালতে আপীল করে, তখন তাহারা এমন কথা বলে নাই যে, যে ইসু নির্দ্ধারণ ও নিষ্পত্তি করার আবশ্যক ছিল তাহা নির্দ্ধারিত ও বিচারিত হয় নাই; এবং সেই নূতন ইসুর উপরে তাহারা পুনর্ব্বিচারের দাবী করে নাই, কিন্তু তাহারা কেবল এই কথা বলে যে, যে বিষয় লইয়া তাহারা আমাদের নিকট আসিয়াছে তাহা নথীস্থ প্রমাণেই সংস্থাপিত হইয়াছে।

আমি যাহা বলিলাম তাহার ফল এই যে, যে বিচারপতির রায় এই মোকদ্দমায় প্রবল হইয়াছে তাঁহার সহিত সম্মত হইয়া আমি বলিতেছি যে, ঐ ইসু যথোচিত রূপে উত্থাপিত হয় নাই, এবং যদিও আমি তাঁহার রায়ের সমুদায় হেতুবাদে সম্মত নহি, এবং যদিও খাস আপেলাণ্টের পক্ষে মেং গ্রেগরি তর্ক করেন যে, এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই রূপে আমাদের বিচার করা উচিত নহে, তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, প্রথম আদালত যে কোন কারণে হউক, যে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই ইসু উত্থাপিত হয় নাই এবং তাহা তিনি নিষ্পত্তি করিতে পারেন না, এই কথা প্রমাণ দৃষ্টে বিশুদ্ধ কি ভ্রমাত্মক তদ্বিষয়েই বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয়ের মতভেদ হয়, এবং এ বিষয়ে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির মতই আমার মতে শুদ্ধ, অতএব আমি তাঁহার রায় স্থির রাখিয়া খরচা সমেত এই আপীল ডিস্মিস্ করিলাম।

বিচারপতি বেলি।—ইহা অত্যন্ত শোচনীয় যে, এই মোকদ্দমায় আমার বিজ্ঞবর সহবিচারপতিগণের সহিত আমার রায় অনৈক্য হইতেছে। আমার বিবেচনায় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের রায়ই বিশুদ্ধ ও তাহা স্থির রাখা উচিত। এত শেষ বেলায় আমি সওয়াল-জওয়াবের সমুদায় কথা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিব না, কিন্তু আমি যে দুইটি প্রধান কথা

অত্যাবশ্যকীয় বিবেচনা করি, তাহারই উল্লেখ করিব।

বাদী এই হেতুবাদে প্রতিবাদিগণের কর বৃদ্ধি করার জন্য নালিশ করে যে, সে যে আহর স্থাপন করিয়াছে তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হওয়ার কথা প্রতিবাদিগণ অস্বীকার করে; এবং বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে তাহারা যে বর্ণনা-পত্র দাখিল করে তাহা বিশুদ্ধ রূপে উল্লেখ করার জন্য আমি আদালতের কাগজের বহী হইতে তাহা পাঠ করিতেছি। প্রতিবাদী বলে যে, "এই হার বহুকালের "পুরুষানুক্রমাগত হার স্বরূপে ২০ বৎসরের "অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে অপরিবর্ত্তিত ভাবে "চলিয়া আসিয়াছে।" প্রতিবাদী তাহার পরে সেই বর্ণনা-পত্রে বলে যে, "এই জমা বহুকালের "পুরুষানুক্রমাগত জমা বিধায়, পূর্ব্ব মালিকের "কর বৃদ্ধি করেন নাই অতএব নোটিসের "বুনিয়াদে করবৃদ্ধি করার জন্য বাদীর নালিশ "১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারা ও অনেক "নজীর মতে অগ্রাহ্য।"

এই বর্ণনা-পত্র দাখিল হওয়ার পরে এক জন প্রতিবাদীর জবানবন্দী লওয়া হয়। মুল জবানবন্দী কেবল ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি সম্বন্ধে হয়। স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে জমা সংস্থাপিত থাকা সুত্রে প্রতিবাদীর জমা খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষিত বলিয়া সে দাবী করে কি না, তদ্বিষয়ে আদালত প্রতিবাদীকে কোন প্রশ্ন করেন নাই, কিন্তু বাদীর উকীলের প্রশ্নের উত্তরে ঐ প্রতিবাদী যে জওয়াব দেয় তাহা বিচারপতি হবৃহৌস বর্ণনা করিয়াছেন। সে তাহাতে ৪ ধারার উল্লেখ করে নাই, এবং সে যে ঐ জমা স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অথবা ২০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছে তাহাও বলে নাই। সে কেবল এই কথা বলে যে, ঐ জমা তাহার পিতার সময় হইতে থিলমার পৈতৃক মৌরুসী জমা।

প্রতিবাদিগণের এই কথাতে ডেপুটি কলেক্টর মনে করেন যে, প্রতিবাদিগণ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারা মতে করবৃদ্ধির দায় হইতে মুক্ত থাকার স্বত্ব উত্থাপন করে নাই, অতএব এই বিষয়ে কোন ইসু নির্দ্ধারণ করার আবশ্যক নাই। আমার এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, প্রতিবাদিগণ ১৮৬৭ সালের ২৭ এ নবেম্বর তারিখে যে এক দরখাস্ত করে তাহাতে তাহারা সপষ্টাক্ষরে বলে যে, "বরাবর" এবং "২০ বৎসরের অধিক" শব্দ গুলি ব্যবহার করাতেই দেখা যায় যে, তাহারা ৪ ধারার অনুমানের উপকার লাভ করিতে মনস্থ করিয়াছিল, এবং "২০ বৎসরের অধিক" এই শব্দ গুলি ১০০ বৎসরের উল্লেখ করার সমতুল্য, এবং স্থায়ী বন্দোবস্ত ৭৫ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ ১২০২ সালে হইয়াছে। ইহা সত্য বটে যে, প্রমাণ প্রদত্ত হওয়ার পরে এবং যখন ডেপুটি কালেক্টর তাঁহার রায় ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন ঐ দরখাস্ত দাখিল হয়; কিন্তু তথাপি তদ্দ্বারা সপষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদীর দাবীর বিরুদ্ধে ৩ ও ৪ ধারার বিধানমতে কর বৃদ্ধির দায় হইতে মুক্ত হওয়ার দাবী করা বরাবর প্রতিবাদিগণের মনস্থ ছিল। ১০ আইনের বিধানমতে ঐ ধারাগুলির ঠিক বাক্য উচ্চারণ করিয়া তর্ক করা অথবা জওয়াব দেওয়া নিতান্তই আবশ্যকীয় নহে, এবং রাইয়তের ৪ ধারার উপকার লাভ করিতে হইলে সপষ্টাক্ষরে স্থায়ী বন্দোবস্তের উল্লেখ করিতে হইবে কি না, তদ্বিষয়ে কতক কাল পর্য্যন্ত সন্দেহ ছিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে বহু নজীরের দ্বারা এইক্ষণে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যদি রাইয়ত বাস্তবিক এমন তর্ক করে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে সে এক হারে ভূমি ভোগ করিতেছে, তবে তাহার ঐ ধারার ঠিক বাক্যগুলি ব্যবহার না করিলেও হইবে, এবং যদি

সে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত এক অপরিবর্ত্তিত হারে ভোগ করা সপ্রমাণ করে, তবে তদ্দ্বারাই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, সে স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে একহারে ভোগ করিতেছে, এবং তাহা হইলেই প্রতিপক্ষের ইহা দেখাইয়া সেই অনুমান খণ্ডন করিতে হইবে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে কোন সময়ে ঐ খাজানার পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

ঐ আইনের ৫৯ ধারার মর্ম্ম এই যে, পক্ষগণের জবানবন্দী, আরজী ও বর্ণনাপত্র হইতে মোকদ্দমার মূল বৃত্তান্ত সমস্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ জমা এমন ভাবের কি না, যদ্দ্বারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ ও ৪ ধারামতে বাদীর করবৃদ্ধির নালিশ বারিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আদালত প্রতিবাদীকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। প্রতিবাদিগণের উক্ত বর্ণনা-পত্রে এবং তাহাদের ২৭ এ নবেম্বরের দরখাস্তে আমার বিবেচনায় স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাহারা আদালতকে জানাইয়াছিল যে, তাহাদের জমা বহুকালাবধি সংস্থাপিত আছে, এবং ৩ ও ৪ ধারার বিধানমতে তাহাদের জমার করবৃদ্ধি হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে ইসু প্রস্তুত করিতে তাহারা আদালতকে প্রার্থনা করিয়াছিল। কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, ডেপুটি কালেক্টরের এই বিষয়ে ইসু উত্থাপন করিতে অস্বীকার করিবার বিষয়ে নিম্ন আপীল-আদালতে আপীল হয় নাই। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, যদিও তাহা স্পষ্ট রূপে উত্থাপিত না হইয়া থাকুক, তথাপি যখন প্রতিবাদিগণ বলিয়াছিল যে, প্রথম আদালত অন্যায় রূপে তাহাদিগকে ৪ ধারার অন্তর্গত উপকার লাভ করিতে দেন নাই, তখন তদ্দ্বারাই ঐ কথা উত্থাপিত হইয়াছিল।

অপিচ, এই আদালতে খাস আপীলের ৩ য় হেতুতে আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি যে, প্রতিবাদিগণ এই আপত্তি করে যে, ঐ ইসু স্পষ্টাক্ষরে উত্থাপিত ও বিচারিত হওয়া উচিত ছিল। ডেপুটি কালেক্টরের রায়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তিনি এই কারণে ঐ ইসু উত্থাপন ও বিচার করেন নাই যে, প্রতিবাদিগণ স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে ভোগ করার কথা না বলিয়া কেবল ২০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ভোগ করার কথা বলিয়াছে ; এবং তাঁহার মতে, কেবল স্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিলেই প্রতিবাদিগণ ৪ ধারার উপকার লাভ করিতে পারিত। ডেপুটি কালেক্টর বলেন যে, "যেহেতু স্থায়ী বন্দোবস্তের "তারিখ হইতে খাজানা পরিবর্ত্তিত না হওয়ার "হেতুবাদে প্রতিবাদিগণ অপরিবর্ত্তিত খাজানায় "ভোগ করার স্বত্বের দাবী করে নাই, তাহারা "কেবল এই কথা বলিয়াছে যে, ২০ বৎসরের "অধিক কাল পর্য্যন্ত তাহাদের খাজানার পরি- "বর্ত্তন হয় নাই ; অতএব এই বিষয়ে কোন ইসু "নির্দ্ধারণ করা হয় নাই।" আমি পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, এই কথা এই আদালতের সমুদায় নজীরের বিরুদ্ধ, কারণ, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের নাম উচ্চারণ করা নিতান্তই আবশ্যকীয় নহে।

এই সমস্ত কারণে আমি বিবেচনা করি যে, প্রতিবাদিগণ তাহাদের বর্ণনা-পত্রে ও তাহাদের ২৭ এ নবেম্বরের দরখাস্তে এবং তাহাদের জওয়াবের সমুদায় মর্ম্মে, তাহাদের জমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৪ ধারার দ্বারা রক্ষিত কি না, তদ্বিষয়ে ইসু ধার্য্য করার জন্য আদালতকে যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করিয়াছিল।

অতএব আমি বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত সম্মত হইয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে, ডেপুটি কালেক্টরের ঐ বিষয়ে ইসু উত্থাপন ও বিচার না করা অন্যায় হইয়াছে।

অতএব আমি জ্যেষ্ঠ বিচারপতি লুইস্ জ্যাক্সনের রায় অন্যথা করিয়া উক্ত ইসুর বিচার করার জন্য মোকদ্দমা প্রথম আদালতে পুনঃপ্রেরণ করিতে চাই।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—আমাদের বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, কর-বৃদ্ধির দায় হইতে প্রতিবাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩ ধারা মতে রক্ষিত কি না, তদ্বিষয়ে ইসু নির্দ্ধারণ না করা ডেপুটি কালেক্টরের অন্যায় হইয়াছে কি না। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র এই ভাবেই ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, এবং আমার বিবেচনায়, তাহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ রূপেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমায় রাইয়ত যে স্বত্ব উত্থাপন করে, তাহা ঐ আইনের ৩ ধারার অন্তর্গত। স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত হারে যে সকল রাইয়ত জমা ভোগ করে, ঐ ধারায় ঐ সকল রাইয়তদিগকে সেই হারে পাট্টা পাইতে অর্থাৎ সেই হারে জমা ভোগ করিবার স্বত্ব দিয়াছে। অতএব এই প্রকার মোকদ্দমায় বিচার্য্য বিষয় এই যে, "রাইয়ত "এমন খাজানায় ভোগ করিয়াছে কি না, যাহা "স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে পরিবর্ত্তিত হয় "নাই।" যে ব্যক্তি বলে যে, তাহার ঐ স্বত্ব আছে, তাহার উপরেই ঐ কথা সপ্রমাণ করার ভার বর্ত্তে। আমার বিবেচনায়, যদি কোন পক্ষ তাহার কোন এক স্বত্ব থাকার কথা না বলে, এবং সেই স্বত্বের বিচারের দাবী না করে, তবে সেই স্বত্ব বর্ত্তমান আছে কি না, তদ্বিষয়ে ইসু উত্থাপন অথবা বিচার করিতে আদালত বাধ্য নহেন।

তর্কবিতর্কের কালে মেং গ্রেগরি অনেক নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল নজীরের ফল পর্য্যালোচনা করার জন্য এই দেখা আবশ্যক যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত মোকদ্দমা সমস্তে, পক্ষগণ শপথ করিয়া যে জবানবন্দী দেয়, তাহা হইতে ইসু উত্থাপিত হয়। স্থায়ী বন্দোবস্তের কালে কি অবস্থা ছিল, তাহা কেহ নিজে দেখিয়াছে বলিয়া কহিতে পারে না। অতএব যে ব্যক্তি বলে যে, সে স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত হারে জমা ভোগ করিয়া আসিয়াছে, সে যদি এমন বৃত্তান্তের বর্ণনা করে, যদ্দ্বারা দেখা যায় যে, সে যত দূর অবগত আছে, তাহাতে সে বিশ্বাস করে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অথবা তত্তুল্য প্রাচীন কাল হইতে খাজানা অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা হইলে সেই কথাই যথেষ্ট হইবে। ঐ কথা যত দূর নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে তত দূর নিশ্চিত রূপে বলা হয়। যেমন, যে স্থলে কোন ব্যক্তি ৪০ কিম্বা ৪৫ বৎসরের দাখিলা দাখিল করত বলে যে, সে এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা বহুকাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত হারে ভোগ করিয়া আসিয়াছে, এবং যে স্থলে এমন অনুমান না হয় যে, তাহারা স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে ভোগ করিবার কথা বলিতে মনস্থ করে নাই, সে স্থলে আদালত সমস্ত এই বিবেচনা করিয়া লইয়াছেন যে, তাহা তাহার ও তাহার পূর্ব্ব পুরুষদের স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত খাজানায় ভোগ করার তুল্য কথা। রাইয়তের যত দূর নিশ্চয় করিয়া বলার ক্ষমতা আছে, ঐ কথা সে বোধ হয় তত দূর নিশ্চয় করিয়াই বলিয়াছিল। আমার বোধ হয় যে, যে সমস্ত নজীরের উল্লেখ হইয়াছে তৎসমুদায়েরই ঐ রূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই স্থলে দাবী কি, তাহা দেখা আবশ্যক। প্রতিবাদীর জমার খাজানা এই হেতুবাদে বৃদ্ধি করার জন্য দাবী হইয়াছে যে, বাদী ঐ ভূমিতে জল সেচন করার যে উপায় করিয়া দিয়াছে তদ্দ্বারা ভূমির উর্ব্বরতাশক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু সেই দাবীর কি প্রকার জওয়াব দেওয়া হইয়াছে? ভূমির উর্ব্বরতাশক্তি যে বৃদ্ধি হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিয়া জওয়াব দেওয়া হইয়াছে। প্রতিবাদী আর এক জওয়াব দিয়াছে। তাহার জবানবন্দীর পূর্ব্বে সে যে বর্ণনা-পত্র দাখিল করে তাহাতে সে বলে যে, "পূর্ব্ব কাল হইতে ওজাস্তা মৌরসী

"সূত্রে ২০ বৎসরের অধিক কাল হইতে খাজা- "নার হ্রাসবৃদ্ধি না হইয়া এই ভূমি ভোগ "হইয়াছে।" ইহাই লিখিত বর্ণনা। তাহার ও তাহার পিতার যত দূর স্মরণ আছে, এমন কথা সে বলে না, কিন্তু বলে যে, "বহুকাল হইতে ২০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ;" এবং বাদীর উপরে প্রমাণ-ভার নিক্ষেপ করার জন্য সে তাহা বলিয়াছে। ঐ বর্ণনা-পত্র ৪ ঠা নবেম্বর তারিখে দাখিল হয়।

তাহার পর দিবস ৫৯ ধারা মতে তাহার জবানবন্দী লওয়া হয়, এবং ৬৫ ধারামতে ইসু নির্দ্ধারিত হয়। তাহাতে প্রতিবাদী এমন কথা বলে না যে, তাহার পূর্ব্বাধিকারিগণ স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে অপরিবর্ত্তিত হারে ভোগ করিয়াছে। বাদী অথবা তাহার উকীল ঐ প্রকার কোন কথা বলে নাই, এবং বাদীর উকীল জেরা-সওয়াল না করা পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে কোন কথা বলা হয় নাই। ঐ জেরা-সওয়ালের জওয়াবে সে বলে "যে আমার পিতার সময় হইতে "ইহা পৈতৃক খিলমার জোত। ১২৬২ সাল "হইতে ভূমি আমার দখলে আছে, এবং "আমি খাজানার দাখিলা রাখি। আমার "জোত খিলমার হওনাবধি তাহা এক হারে "ভোগ করা হইয়াছে।" ঐ ভূমি সমস্ত কখন্ খিলমার হয়? তাহার পিতার আমলে যে সময়ে জোত খিলমার হয়, সে কোন্ সময়, তাহা প্রতিবাদী নিজে অবশ্যই জানিত, তথাপি এমন কোন কথা বলা হয় নাই যদ্দ্বারা এমত অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, ঐ ভূমি আবাদ হইয়াছিল, এবং তাহার পিতা তাহা স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে খিলমার স্বরূপে ভোগ করিয়াছিল। তৎপরে, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির বৃদ্ধি হইয়াছে কি না, কেবল এই ইসুর উপরেই প্রতিবাদীর বিনা আপত্তিতে মোকদ্দমা বিচারিত হয়।

প্রতিবাদী দেখাইতে চেষ্টা করে যে, তাহার ভূমির উর্ব্বরতাশক্তির পূর্ব্ব অপেক্ষা এইক্ষণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? তাহার আপন সাক্ষী সোবরাত তাহার মূল জবানবন্দীতে বলিয়াছে যে, প্রতিবাদীর পিতার আমলে যখন চাস নূতন আরম্ভ হয়, তখন প্রত্যেক বিঘায় ৫।৭ মণ ফসল হইত, কিন্তু এইক্ষণে তাহার ন্যূন হয়। প্রতিবাদীর পিতার আমলে ঐ ভূমি যে প্রথমে আবাদ হয় তাহা যে আধুনিক, এবং যখন ইসু সমস্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল তখন যে পক্ষগণ তাহা অবগত ছিল, এবং কেহ যে এমন কথা বলে নাই যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে ঐ আবাদ হইয়াছিল, এ সকল বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই।

যদি কেহ নিজে কোন স্বত্ব উত্থাপন না করে, তবে আদালত স্বয়ং আগ্রহ করিয়া তাহার জন্য সেই স্বত্ব উত্থাপন করিবেন না, এই যে নিয়ম আছে, ইহা আমার বিবেচনায় দৃঢ় রূপে প্রতিপালন করা উচিত।

আইনের একটি প্রসিদ্ধ বিধি এই যে, কেহ প্রমাণ জওয়াব দিতে পারে না, এবং ৪ ধারায় কেবল প্রমাণের কথাই লেখা আছে। তাহাতে কেবল ব্যক্ত আছে যে, যখন এই আইনের অন্তর্গত কোন মোকদ্দমায় এমত সপ্রমাণ হইবে যে, রাইয়ত যে খাজানায় ভূমি ভোগ করে তাহা নালিশের পূর্ব্ব ২০ বৎসর পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয় নাই, তখন বিরুদ্ধ কথা সপ্রমাণ না হইলে অথবা খাজানা স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে কোন সময়ে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার কথা প্রদর্শিত না হইলে, এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতেই ঐ হারে ভোগ করা হইয়াছে।

কেহ এমন কথা বলিতে পারে না যে, "আমার এমত কিছু প্রমাণ আছে", (যে প্রমাণ খণ্ডন করা যাইতে পারে) "যে, স্থায়ী "বন্দোবস্তের সময় হইতে ভূমি অপরিবর্ত্তিত "হারে ভোগ করা হইয়াছে।"

মনে কর, এক তমঃসুকের উপরে নালিশ হয়, তাহাতে প্রতিবাদী তমঃসুকের টাকা পরিশোধ করিয়াছে এমন কথা না বলিয়া যদি বলে যে, "আমি এই কাগজ (অর্থাৎ রসীদ) দাখিল করিতেছি" "ইহাতে বাদীর নাম স্বাক্ষরিত আছে।" এই বাক্য দ্বারা এমত বলা হইল না যে, সে টাকা পরিশোধ করিয়াছে। ইহা নালিশের জওয়াব হইতে পারে না। প্রতিবাদী নিজে যে কথা বলিতে সাহস করে না আদালতকে সেই কথা অনুমান করিয়া লইতে বলা হয়। আমি বিবেচনা করি, ডেপুটি কালেক্টর বিশুদ্ধ রূপেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতিবাদিগণ স্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে খাজানার পরিবর্তন হয় নাই বলিয়া ঐ জমা অপরিবর্তনীয় খাজানায় ভোগ করার স্বত্ব উত্থাপন করে নাই, তাহারা কেবল বলিয়াছে যে, ২০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত তাহাদের খাজানা পরিবর্ত্তিত হয় নাই, অতএব প্রতিবাদিগণ যে স্বত্ব উত্থাপন করে নাই ডেপুটি কালেক্টরের তাহার সত্যাসত্যের বিচার না করা উচিতই হইয়াছে।

এমত অবস্থায়, আমি বিবেচনা করি যে, জ্যেষ্ঠ বিচারপতি লুইস জ্যাক্সনের নিষ্পত্তিই বিশুদ্ধ, এবং তাহা খরচা সমেত স্থির রাখিতে হইবে। (গ)

---

২৩ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে; বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

আনন্দমোহন শর্ম্মা তালুকদার, প্রার্থী।

গিরিজাকান্ত লাহিড়ী (ডিক্রীদার এবং আর এক ব্যক্তি (ক্রেতা) প্রতিপক্ষ।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রার্থীর উকীল।

বাবু ললিতচন্দ্র সেন, প্রতিপক্ষের উকীল।

**চুম্বক।**—বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক-সমাজের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ২০ ধারা, নালিশ (ডিক্রীজারীর কার্য্য নহে) এবং যে নালিশের বিচার বাকী আছে, তৎসম্বন্ধে খাটে। যে নালিশ এক জন ডেপুটি কালেক্টরের নিকট বিচারিত হইতেছে, তাহা অন্যত্রে বিচারিত হওয়ার জন্য উঠাইয়া লইতে ঐ ধারায় কালেক্টরের প্রতি ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই।

অনুচিত নীলামের বিরুদ্ধে প্রতিকার পাওয়ার জন্য পক্ষগণ যে প্রণালীতে কার্য্য করে, তাহাতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারা খাটে না, এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৬ ধারার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

**বিচারপতি ফিয়ার।**—মেং ডনয়ের কৈফিয়তে প্রকাশ যে, একটি মোকদ্দমা যাহা প্রথমে তাঁহার আদালতে উপস্থিত হয়, তাহা তিনি বিচারের জন্য মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট অর্পণ করেন।

মৌলবী তাহা বিচার করিয়া বাদীর অনুকুলে ডিক্রী দেন, এবং শেষে ডিক্রীজারী করেন, এবং তাহাতে বিচারাদিষ্ট দায়ীর কতিপয় সম্পত্তি নীলাম হয়।

ডিক্রীজারীর নীলামের পরে এক তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ উপস্থিত প্রার্থী কতিপয় হেতুবাদে ঐ নীলাম অন্যথা করার জন্য মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট প্রার্থনা করে। মৌলবী ডেপুটি কালেক্টর সেই দরখাস্ত গ্রহণ করত কয়েক দিবস পর্য্যন্ত তদন্তে উভয় পক্ষের বাক্য শ্রবণ করেন, এবং তাহার পরে, ডিক্রীদার হাইকোর্টের কতিপয় নজীর দাখিল করার জন্য সময় পাওয়ার দরখাস্ত করাতে সেই দরখাস্ত অনুসারে ডেপুটি কালেক্টর মোকদ্দমা স্থগিত রাখেন। কিন্তু এই রূপ মুলতবী থাকার কালে ডিক্রীদার ঐ সকল নজীর সংগ্রহ করার চেষ্টা না করিয়া, মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের আদালত হইতে ঐ দরখাস্ত উঠাইয়া মেং ডনয়ের নিজের আদালতে লইয়া বিচার করিতে মেং ডনয়ের নিকটে প্রার্থনা করে। মেং ডনয় ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করত প্রার্থীর মোকদ্দমা আপন

আদালতে উঠাইয়া লইয়া নিজে তাহার নিষ্পত্তি করেন।

যদিও অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, মেৎ ডনয়ের ইহা করার ক্ষমতা ছিল, তথাপি তিনি যে সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করিয়া মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি নিতান্ত অন্যায় ও অনুচিত রূপে তাঁহার সেই ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছেন। যে সকল হেতুবাদে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার প্রার্থনা হইয়াছিল তাহা অতি সামান্য। মেৎ ডনয়ও সেই সকল হেতুবাদেই ঐ প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, এবং মৌলবী ডেপুটি কালেক্টর যে, ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে সম্যক্ রূপে যোগ্য ছিলেন না, এমন কোন প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয় নাই।

কিন্তু আমরা বিবেচনা করি যে, মৌলবীর আদালত হইতে মেৎ ডনয়ের আপন আদালতে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার কৈফিয়তে তিনি বলেন যে, বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ২০ ধারা মতে তিনি কার্য্য করিয়াছেন। ঐ ধারায় লেখা আছে যে, "এই আইন মতের কিম্বা ১৮৫৯ সালের "১০ আইনমতের মোকদ্দমার হেতু যে জেলার "মধ্যে হয়, সেই জেলার রাজস্ব সম্পর্কীয় কাছা- "রীতে, অথবা যদি জেলার কোন মহকুমা "ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি অর্পিত হইয়া থাকে "তবে যে মহকুমার মধ্যে ঐ মোকদ্দমার হেতু "হয় সেই মহকুমার রাজস্ব সম্পর্কীয় কাছা- "রীতে, ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, "অথবা মহকুমার ভারপ্রাপ্ত না হইয়া যে "ডেপুটি কালেক্টর উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা " গ্রাহ্য করিতে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা " প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার এলাকার অন্তর্গত স্থানের "মধ্যে যদি ঐ মোকদ্দমার হেতু হয়, তবে "সেই ডেপুটি কালেক্টরের কাছারীতে ঐ মোক- "দ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু কালেক্- "টর সাহেব কোন ডেপুটি কালেক্টরের নিকট "হইতে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি "তাহার বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা অন্য "ডেপুটি কালেক্টরের প্রতি অর্পণ করিতে পারি- "বেন।"

মেৎ ডনয় বলেন যে, মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের সম্বন্ধে তিনি কালেক্টর ছিলেন, অতএব ঐ ধারার বিধান মতে তিনি মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া নিজে তাহার বিচার করিতে পারেন।

কিন্তু উল্লিখিত শব্দগুলি এক মোকদ্দমা, এবং যে মোকদ্দমার তখনও বিচার হয় নাই, তৎসম্বন্ধে খাটে। ঐ শব্দ গুলি দৃষ্টে, মোকদ্দমা অন্যত্রে বিচারিত হওয়ার জন্য কালেক্টর ডেপুটি কালেক্টরের নিকট হইতে উঠাইয়া লইতে পারেন। আমাদের বোধ হয় যে, মৌলবী ডেপুটি কালেক্টর এই যে মোকদ্দমার তদন্ত করিতেছিলেন, তাহা স্বতন্ত্র মোকদ্দমা বলা গেলেও, যখন মেৎ ডনয় তাহা উঠাইয়া লইয়াছিলেন তখন তাহা এমন অবস্থায় ছিল না যদ্দ্বারা তাহা উক্ত ধারার মর্ম্মান্তর্গত হইতে পারে।

পূর্ব্বেই ইহার বিচার হইয়াছিল, ইহা বিচারার্থে পড়িয়া ছিল না। দুই পক্ষের কথাই মৌলবী শুনিয়াছিলেন, এবং বস্তুতঃ, বিচার প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, অতএব মৌলবীর কার্য্য সমস্ত প্রথমে অন্যথা না হইলে, আমাদের বিবেচনায়, অন্য বিচারক ন্যায্য রূপে তাহার নূতন করিয়া বিচার করিতে পারেন না। অপিচ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডেপুটি কালেক্টর যে তদন্ত করিতেছিলেন তাহা মোকদ্দমা ছিল না। যে মোকদ্দমার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ বিচার ও নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছিল তৎসংক্রান্ত ডিক্রী জারীর জন্য ইহা একটি কার্য্যমাত্র; এবং মার্সেলের রিপোর্টের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মীপত দুগড় বঃ মহারাজ জগদীন্দ্র বনওয়ারীলালের মোকদ্দমায় হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইন যাহা বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬২ সালের ৬

আইনের অনুরূপ, তদ্দ্বারা জজের প্রতি ডিক্রী জারীর মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই; কারণ, ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়ার পরেই অবশ্য ডিক্রী জারীর আরম্ভ হয়।

মেং ডনয় নিজেই বলেন যে, তিনি প্রথমে এই মোকদ্দমা মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট অর্পণ করেন, এবং ঐ মৌলবী তাহা শুনিয়া বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করেন; অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, এমন কোন কথা বাকী ছিল না যাহার জন্য মেং ডনয় বাঙ্গালার কৌন্সিলের উক্ত আইনের ২০ ধারা মতে নিজে বিচার করণার্থে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইতে পারিতেন; অতএব মৌলবীর নিকট হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়ার জন্য মেং ডনয় যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা ক্ষমতা-বহির্ভূত বিধায় অন্যথা হইবে।

কিন্তু আমরা ইহাও বিবেচনা করি যে, মূল মোকদ্দমার ডিক্রীজারীতে প্রার্থী তৃতীয় ব্যক্তি মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট মোজাহেমের যে দরখাস্ত দেয়, ঐ কর্ম্মচারী তাহা গ্রহণ করাতে বিচারাধিকার-বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন। বিক্রীত সম্পত্তিতে প্রার্থীর কোন স্বত্ব থাকিলে, নালিশ উত্থাপন করার পূর্ব্বে সেই স্বত্ব ছিল। সে সম্যক্ রূপে তৃতীয় ব্যক্তি, এবং দেওয়ানী আদালতে সে তাহার ঐ স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে। যদি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৬ ধারা খাটে, তবে সে ব্যক্তি তাহার উপকার লাভ করিতে পারে না। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, কলেক্টরের প্রদত্ত ডিক্রী জারীর নীলাম সম্বন্ধে ঐ ৮ আইনের ২৫৬ ধারা খাটে না।

আমাদের সমক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, ঐ ধারা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১১০ ধারার বিধান দ্বারা ঐ প্রকার মোকদ্দমায় প্রযুক্ত হইয়াছে। এই ধারার মূল বাক্যগুলি এই যে, "নীলামের যোগ্য পেটাও তালুক হইলে, "সেই তালুকের বাকী খাজানা ভিন্ন অন্য দাওয়ার "নিমিত্ত ঐ পেটাও তালুকের নীলামের উপর "তৎকালের চলিত আইনের যে বিধান খাটে, "সেই বিধানমতে ঐ তালুকের নীলাম হইবে।"

আমার বোধ হয় যে, নীলামের প্রণালী সম্বন্ধে ঐ বাক্যগুলি খাটে, কিন্তু অনুচিত নীলামের বিরুদ্ধে লোকে যে প্রণালীতে প্রতিকার পায় তৎসম্বন্ধে খাটে না। অতএব ২৫৬ ধারা যদ্দ্বারা নীলামের পরে কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সেই নীলাম অন্যথার প্রার্থনা করিতে পারে, তাহা ঐ ১১০ ধারায় উল্লেখ করা হয় নাই।

অতএব এই মত বিশুদ্ধ হইলে, প্রার্থীর দরখাস্ত লইতে মৌলবী ডেপুটি কালেক্টরের ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু তিনি তাহার উপরে কোন হুকুম দেন নাই, অতএব অন্যথা করার কোন কথা নাই।

আমাদের কেবল মেং ডনয়ের হুকুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে, এবং তাহা বিচারাধিকার-বহির্ভূত বলিয়া আমাদের অন্যথা করিতে হইবে।

মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন খরচা বহন করিবে। (গ)

---

১৪ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০

বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং
দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৫৩৪ নং মোকদ্দমা।

খুলনিয়ার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি সংশোধন করিয়া যশোহরের অতিরিক্ত জজ ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জুনে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

প্রাণহরি দাস (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

পার্ব্বতীচরণ মজুমদার (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জে এস রচফোর্ট আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু বংশীধর সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দখলের স্বত্ববিশিষ্ট কোন রাই-

য়তের বিরুদ্ধে করবৃদ্ধির মোকদ্দমায়, যে নোটিস জারী হইয়াছে তাহা যদি আইন-সঙ্গত না হইয়া থাকে, তবে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বিরোধীয় ভূমির পরিমাণ ও পার্শ্ববর্তী স্থানে প্রচলিত হার নির্ণয়ার্থে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে কার্য্যবিধির বিধানমতে জজের কোন ক্ষমতা নাই।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমাদের মতে, খাস আপেলাণ্টের উপরে করবৃদ্ধির যে নোটিস জারী হইয়াছে তাহা আইনসঙ্গত নহে।

আমাদের অবশ্য এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, প্রতিবাদী দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত, নচেৎ তাহার বিরুদ্ধে করবৃদ্ধির ঐ প্রকার নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না। এমত অবস্থায়, রাইয়তের দখলী ভূমির কর কেবল ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারা মতে বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু যেহেতু খাস আপলাণ্টের উপরে যে নোটিস জারী হইয়াছিল তাহাতে ঐ ধারার লিখিত কোন হেতু বর্ণিত হয় নাই, অতএব বাদীর নালিশ অবশ্যই ডিস্‌মিস্ হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন আদালতের বিজ্ঞবর জজ, বিরোধীয় ভূমির পরিমাণ ও পার্শ্ববর্তী স্থানের খাজানার হার নির্ণয়ার্থে আমীন নিয়োগ করার আদেশ সম্বলিত মোকদ্দমা প্রথম আদালতে পুনঃপ্রেরণ করেন।

প্রথমতঃ, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জজ যে প্রকারে এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিয়াছেন তাহা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির বিধানমতে তাঁহার করিবার ক্ষমতা ছিল না; এবং দ্বিতীয়তঃ, বাদী আপন নোটিসে যে দাবী উত্থাপন করিয়াছে তাহা ভিন্ন তাহাকে অন্য প্রকার দাবী সপ্রমাণ করিতে দিতে জজের ক্ষমতা ছিল না।

অতএব আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্ন উভয় আদালতের নিষ্পত্তিই অন্যথা এবং বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে, কিন্তু মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন খরচা বহন করিবে।　　　(গ)

২৫ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৪৯ নং মোকদ্দমা।

ময়মনসিংহের কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

রামলাল মিশ্র (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

চন্দ্রাবলী দেবী চৌধুরিণী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ললিতচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ব্যক্তি কোন পাট্টাদাতার মালিকী স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পাট্টাদারকে বেদখল করিলে, পাট্টাদার যদি পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকে, তবে সে ঐ পাট্টাদারকে প্রজা উল্লেখে কালেক্টরের নিকট তাহার বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিতে পারে না।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমার বিবেচনায়, বাদিনী আপন স্বত্ব বুঝিবার ভ্রমে এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

বাদিনী এইক্ষণে যে সম্পত্তির মালিক তাহা ১২৬৯ সালে রামকিশোরের দখলে ছিল এবং রামকিশোর তখন প্রতিবাদীকে তিন বৎসরের জন্য তাহার পাট্টা দেয়। প্রতিবাদী ঐ পাট্টামতে দখল লইয়া ১২৭২ সালের ৬ই আশ্বিন পর্য্যন্ত দখীলকার ছিল। ইতিমধ্যে ভুবনময়ী দেবী, রামকিশোরের বিরুদ্ধে ঐ সম্পত্তির দাবী করিয়া রামকিশোরের সহিত মোকদ্দমা করিতেছিল এবং পরিশেষে সে প্রিবি কৌন্সিলে বোধ হয় ১২৭২ সালের কোন সময়ে স্বীয় অনুকুলে ডিক্রী পায়, এবং (ঐ ডিক্রীজারীতে কি না, তাহা স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না) সে ঐ ভূমির দখল লয় এবং প্রতিবাদী ১২৭২ সালের ৬ই আশ্বিন তারিখে আপন দখল ছাড়িয়া দেয়।

ভুবনময়ী ১২৭৪ সালে লোকান্তর গমন করে এবং তাঁহার মালিকী স্বত্বে বাদিনী স্বত্ববতী হইয়া, রামকিশোরের নিকট প্রতিবাদী যে পাট্টা পাইয়াছিল তাহার সর্ত্ত অনুযায়ী ১২৭২ সালের ৫ ই আশ্বিন পর্য্যন্ত ৫ মাসের খাজানা পাওয়ার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

যে স্থলে বাদিনী কালেক্টরের নিকট নালিশ উপস্থিত করিয়াছে, সে স্থলে সে কেবল ইহা দেখাইলেই কৃতকার্য্য হইতে পারে যে, রামকিশোরের নিকট প্রতিবাদী যে পাট্টা পাইয়াছিল তাহার সর্ত্তমতে প্রতিবাদী উক্ত কয়েক মাস পর্য্যন্ত ভুবনময়ীর প্রজা ছিল, অর্থাৎ বাদিনীর ইহা দেখাইতে হইবে যে, রামকিশোরের পাট্টামতে প্রতিবাদী ১২৭২ সালের ১ লা বৈশাখের পূর্ব্বে যখন দখীলকার ছিল তখন কোন না কোন সময়ে প্রতিবাদী ঐ পাট্টার সর্ত্ত অনুযায়ী ভুবনময়ীকে ভূম্যধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু বাদিনী যে আরজী উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে তাহার নালিশের হেতুতে এই কথার কোন প্রসঙ্গ নাই। তাহাতে এইমাত্র লেখা আছে যে, রামকিশোরের বিরুদ্ধে ভুবনময়ী এক স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রী পায় এবং ১২৭৪ সালে ভুবনময়ীর মৃত্যু হওয়াতে তাহার স্বত্বে বাদিনী স্বত্ববতী হইয়াছে; অতএব প্রতিবাদীর নিকট ঐ পাঁচ মাসের অর্থাৎ প্রতিবাদীর দখলের শেষ পাঁচ মাসের খাজানা বাদিনীর প্রাপ্য।

আমরা এমন কথা বলিতে পারি না, যে ভুবনময়ীকে ভূম্যধিকারিণী স্বীকার করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বাদিনী কি জন্য ত্রুটি করিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ আছে। আমাদের স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ঐ খাজানার নালিশ করিতে স্বত্ববতী হওয়ার নিমিত্ত যে, ভুবনময়ীকে ভূম্যধিকারিণী স্বীকার করার কথা আবশ্যক তাহা বাদিনীর মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও উদয় হয় নাই। এবং আমরা ইহাও বিবেচনা করি যে, মোকদ্দমার মধ্যে এমন কোন ঘটনা হয় নাই যদ্দ্বারা এক মুহূর্ত্তের জন্য অনুমান করা যাইতে পারে যে, প্রতিবাদী বিবেচনা করিয়াছিল যে, ১২৭২ সালের প্রথম ৫ মাস পর্য্যন্ত ভুবনময়ীর সহিত তাহার ভূম্যধিকারিণী ও প্রজারূপ সম্পর্ক ছিল কি না, সেই কথার উপরে আরজীর দাবী নির্ভর করে। সে যে জওয়াব দিয়াছে তাহার স্থূল মর্ম্ম দুই কথার উপরে নির্ভর করে। প্রথম কথা এই যে, "আমি কখন আপনার প্রজা ছিলাম না," এবং দ্বিতীয় কথা এই যে, "আপনি যে ভুবনময়ীর স্বত্বে স্বত্ববতী হইয়াছেন তাহাও আমি কখন জানি না।"

ভুবনময়ীর জীবদ্দশায় যে খাজানা বাকী হয় তাহা ভুবনময়ীর স্থলাভিষিক্ত সূত্রে বাদিনীর দাবী করার স্বত্ব, ঐ পাট্টামতে প্রতিবাদী, বাদিনীর নিজের প্রজা হইয়াছিল কি না, সেই কথার উপরে নির্ভর করিতে পারে না, এবং ভুবনময়ীর যে টাকা পাওনা ছিল তাহা বাদিনীর দাবী করার স্বত্ব আছে, এই কথা প্রতিবাদী যে অবগত ছিল তাহাও বাদিনীর বলার আবশ্যক ছিল না। অতএব আমার বোধ হয় যে, যখন এই সকল ইসু প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন মোকদ্দমার আসল বুনিয়াদ কি, অর্থাৎ যে স্থলে এই নালিশ কালেক্টরের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, সে স্থলে কোন্ বুনিয়াদে বাদিনী জয়ী হইতে পারিবে, তাহা পক্ষগণের মনে উদয় হয় নাই, অতএব যে ইসুর উপরে এই মোকদ্দমা বিচারিত হওয়া উচিত, তাহা এই গতিকে নিম্ন আদালতে বিচারিত হয় নাই। অতএব যদি আমরা বিবেচনা করিতাম যে, বাদিনীর আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণ করার সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে আমরা তাহা পুনর্ব্বিচারের জন্য ফেরৎ পাঠাইতাম। কিন্তু আরজী ও বাদিনীর মোক্তারের বর্ণনা দৃষ্টে আমাদের নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, যে সময়ের খাজানার দাবী হইয়াছে সেই সময়ে প্রতিবাদী, ভুবনময়ীর প্রজা ছিল না।

বর্ত্তমান নালিশ এই অনুমানে উপস্থিত হই-

য়াছে যে, ১২৭২ সাল শেষ হওয়ার দিবসের পূর্ব্বে ঐ সালের প্রথম পাঁচ মাসের খাজানা প্রাপ্য হয় নাই। বাদিনীর মোক্তার নবীনচন্দ্র গুহ সপষ্টাক্ষরে বলিয়াছে যে, প্রতিবাদী ১২৭২ সালের আশ্বিন মাসে তাহার ইজারা হইতে বেদখল হয়, এবং ভুবনময়ী তখন দখল লয়। ভুবনময়ী প্রিবি কৌন্সিলের ডিক্রী পাওয়ার অব্যবহিত পরেই ঐই ঘটনা হয়; বৎসরের মধ্য স্থলে অর্থাৎ বাদিনীর আপন হিসাবে, খাজানা প্রাপ্য হওয়ার ৭ মাস পূর্ব্বে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করা যে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল তদ্বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, ঐ সময় পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর দখল ভুবনময়ীর বিরুদ্ধ দখল ছিল, কোন প্রকারেই প্রজা-সূত্রে দখল ছিল না। রামকিশোরকে ভূম্যধিকারী বলিতে অস্বীকার এবং ভুবনময়ীকে স্বীকার না করিয়া সে কোন প্রকারেই ভুবনময়ীর প্রজা হইতে পারে নাই। যদি এই প্রকার কোন ঘটনা হইত, তবে বাদিনীর পরামর্শদাতারা অবশ্যই তাহা আরজীতে লিখিয়া দিত। তাহারা কখন এই হেতুর উপরে তাহার নালিশের স্বত্ব স্থাপন করে নাই, এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, ঐ প্রকার কোন ঘটনা না হওয়াতেই তাহা তাহারা করে নাই। এবং যদি তাহাই হয়, তবে সাক্ষিগণ যাহারা এত দূর বলিয়াছে যে, যখন ১২৭৪ সালে প্রতিবাদীর নিকট ঐ বাকী খাজানার দাবী করা হইয়াছিল তখন সে টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করিয়া টালমটাল করিয়াছিল, তাহাদের সাক্ষ্যে কেবল এই প্রকার দাবী সাব্যস্ত হইয়াছে যাহা কেবল দেওয়ানী আদালতের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারে। প্রতিবাদী দুই বৎসর পূর্ব্বে যে দখল পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহা দ্বারা সেই দখলের কালে ভুবনময়ীকে ভূম্যধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করা বলা যাইতে পারে না, এবং প্রতিবাদী ভুবনময়ীর প্রজা ছিল, এমতও বলা যাইতে পারে না।"

আমরা যাহা বলিলাম তদ্দ্বারাই পর্য্যাপ্ত রূপে দৃষ্ট হইবে যে, আমাদের রায়ে বাদিনীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের ইহাও ব্যক্ত করা আবশ্যক যে, বাদিনীর নিজের সাক্ষীরা যে অবস্থা ব্যক্ত করিয়াছে তাহাতে ঐ পাট্টামতে ১২৭২ সালের প্রথম পাঁচ মাসের দখল সম্বন্ধে প্রতিবাদীকে বাদিনী খাজানার দায়ী করিতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সন্দেহ আছে। বাদিনী নিজেই দেখাইয়াছে যে, ঐ চুক্তি বৎসরের মধ্যস্থলে হঠাৎ ভঙ্গ করা হয়, এবং খাজানার কিস্তী বলিয়া যদি ঐ টাকার দাবী করা যাইতে পারে, (কিন্তু তাহা যে খাজানা বলিয়া দাবী করা যাইতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের অনেক সন্দেহ আছে) তথাপি বাদিনী তাহা দাবী করার জন্য বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য ছিল কি না, তাহা আমরা সন্দেহ করি। যদি সে বাধ্য না থাকে, তবে এই নালিশ বারিত হইয়াছে।

নিম্ন আদালতের ডিক্রী অন্যথা ও বাদিনীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে।

আমাদের বিবেচনায়, প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন খরচা বহন করিবে। (গ)

---

২৫ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১১৬৯ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১৪ ই জুনে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

নছরুদ্দীন হোসেন চৌধুরী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

লাল মহম্মদ প্রামাণিক। (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, ই, টুইডেল ও বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—পাট্টা পাওয়ার নালিশে ডেপুটি কালেক্টর বাদীর কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী লইতে ত্রুটি করায় নিম্ন আপীল-আদালত তাহাদের জবানবন্দী লওয়ার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন। তাহা লওয়া হয়, এবং ডেপুটি কালেক্টর মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিয়া পুনরায় নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন। আপীলে ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা হয়।

হাইকোর্ট কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল যে, জজের মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিয়া ঐ অতিরিক্ত জবানবন্দী-সহ মোকদ্দমা তাঁহার নিকট ফেরৎ পাঠাইবার আদেশ না করাতে ভ্রম হইয়া থাকিবে, কিন্তু যে স্থলে ঐ ভ্রমের দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের অথবা বিচারাধিকারের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, সে স্থলে খাস আপীলে তাঁহার নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করা ন্যায্য হইতে পারে না।

বিচারপতি গ্লবর।—৫৩ বিঘা ভূমির বার্ষিক ৩০ টাকা হারে পাট্টা পাওয়ার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। ভূম্যধিকারী প্রতিবাদী, বাদীর দাবী-কৃত হার অস্বীকার করে। সে আরও বলে যে, বাদীর দখলী ভূমি ৫৩ বিঘা নহে, তাহার কিঞ্চিৎ ন্যূন, এবং খাজানার ন্যায্য হার ৬০ টাকা, ৩০ টাকা নহে।

মোকদ্দমা যখন প্রথমে ডেপুটি কালেক্টরের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তিনি দুই কথার বিচার করেন; প্রথমতঃ, কত ভূমি এবং কি ভাবের ভূমি। দ্বিতীয়তঃ, ঐ ভূমিতে ন্যায্য কত খাজানা আদায় হইতে পারে। তিনি এক কোর্ট-আমীনের দ্বারা স্থানীয় তদন্ত করেন, এবং দেখেন যে, বাদীর দখলে ৪৯ বিঘা ভূমি আছে, ৫৩ বিঘা নহে, এবং ন্যায্য খাজানা ৩০ টাকা নহে, ৬২ টাকা; অতএব তিনি পাট্টার জন্য বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদীর যে সকল সাক্ষী ডেপুটি কালেক্টরের নিকট উপস্থিত হওয়াতেও তিনি তাহাদের জবানবন্দী লন নাই, সেই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়ার জন্য জজ আপীলে মোকদ্দমা ডেপুটি কালেক্টরের নিকট পুনঃপ্রেরণ করেন। পুনঃপ্রেরণের পরে ডেপুটি কালেক্টর ঐ সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়া মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করত পূর্ব্বের হেতুবাদেই পুনরায় নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

আপীলে এই হুকুম অন্যথা হয়; কারণ, জজ বাদীর সাক্ষিগণকে বিশ্বাস করেন এবং নির্দ্দেশ করেন যে, বাদী আপন দাবীকৃত হারে পাট্টা পাইতে স্বত্ববান।

এইক্ষণে তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩৫১, ৩৫২ ও ৩৫৩ ধারা মতে জজের পুনঃপ্রেরণের হুকুম অন্যায় হইয়াছিল, কারণ, নিম্ন আদালত বৃত্তান্তের প্রমাণ ছাড়িয়া দিয়া কোন প্রাথমিক আপত্তির উপরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন নাই, এবং কেবল তাহা হইলেই জজ আইন-সঙ্গত রূপে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে পারিতেন।

এই সমস্ত ধারা পাঠ করিয়া আমাদের বোধ হয় যে, জজ ন্যায্য রূপেই ঐ হুকুম দিয়াছেন, কারণ, যে স্থলে কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী দ্বারা কোন এক বৃত্তান্ত স্থির করিতে হয়, এবং সেই কথা স্থিরীকৃত না হইয়া থাকে এবং ঐ সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লিপিবদ্ধ না হইয়া থাকে, সে স্থলে আমি বিবেচনা করি যে, ঐ কথার আইন-সঙ্গত নিষ্পত্তি হয় নাই, অতএব জজ ৩৫৪ ধারা মতে সেই কথার নিষ্পত্তি করার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে সক্ষম ছিলেন। জজের এই পর্য্যন্ত ভ্রম হইয়া থাকিবে যে, মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করার কালে তিনি নিম্ন আদালতকে আদেশ করেন নাই যে, নিম্ন আদালত জবানবন্দী লইয়া এবং নিজে কোন রায় ব্যক্ত না করিয়া মোকদ্দমা জজের নিকট

ফেরৎ পাঠাইবেন। কিন্তু যদি তর্কস্থলে তাহাই স্বীকার করা যায়, তথাপি জজের হুকুমে যে, কোন পক্ষের ক্ষতি হইয়াছে, এমত দৃষ্ট হয় না। সমুদায় প্রমাণ দুই আদালতের সমক্ষেই উপস্থিত ছিল এবং জজের কার্য্য অনিয়মিত বলিয়া স্বীকার করিলেও তদ্দ্বারা মোকদ্দমার দোষ-গুণের অথবা বিচারাধিকারের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই; অতএব দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৫০ ধারা ইহাতে খাটে না।

খাস আপীলের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ন্যায্য ও সঙ্গত হারের প্রশ্ন বিচার করিতে জজ যে প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়াছেন তাহা ঐ বৃত্তান্তের আইন-সঙ্গত প্রমাণ নহে। কিন্তু এই বিষয়ের বিচার করার আবশ্যক নাই, কারণ, খাস আপেলাণ্টের উকীল বাবু রমেশ-চন্দ্র মিত্র নথী দৃষ্টি করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, নালিশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে বহু বৎসর পর্য্যন্ত আপেলাণ্ট যে নিরিখে খাজানা দিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য সে যে সকল দাখিলা দাখিল করিয়াছে তাহা প্রতিবাদীর নিজের যে গোমাস্তাকে বাদীর পক্ষে সাক্ষী মান্য করা হইয়া-ছিল তাহার দ্বারা স্বাক্ষরিত ও সপ্রমাণ হইয়াছে। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদী যে খাজানার হারের কথা বলে এই সাক্ষীও তাহাই জবানবন্দী দিয়াছে। আরও দেখা যাইতেছে যে, নথীতে অন্য প্রকারের অনেক প্রমাণ আছে যাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মোকদ্দমার কোন অবস্থায় কোন আপত্তি করে নাই, এবং বাদী নিজে তাহার জমার পরিমাণ ও ভাব এবং সর্ব্বদা যে হারে খাজানা দিয়া আসিয়াছে তৎসম্বন্ধে শপথ করিয়া জবানবন্দী দিয়াছে। অতএব আমার বোধ হয় যে, বাদী ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫ ধারা মতে যে সকল প্রমাণ দিতে বাধ্য ছিল, তাহা সে দিয়াছে এবং নিষ্পত্তি করার জন্য তাহা জজের নিকট আইন-সঙ্গত রূপে যথেষ্টই ছিল।

অতএব জজ যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা প্রমাণের উপরে বৃত্তান্ত-ঘটিত নির্দ্দেশ এবং তৎপ্রতি আমরা খাস আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না। অতএব এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইল।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—বিচারপতি গ্লবরের সহিত আমি এক মতে বলিতেছি যে, এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

কিন্তু খাস আপেলাণ্টের উকীল কর্ত্তৃক যে প্রথম আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমার ইচ্ছা এই যে, ইহা যেন অনুমান করা হয় না যে, এই মোকদ্দমায় জজ যে পুনঃপ্রেরণের হুকুম দিয়াছিলেন তাহাও আমি আইন-সঙ্গত বিবেচনা করিতে সম্মত হইয়াছি। আমি এই বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট মত ব্যক্ত করিতে চাহি না, অতএব সেই কারণেই আমি সাবধান হইতে ইচ্ছা করি যে, ইহা যেন অনুমান করা হয় না যে, আমি ঐ হুকুম বৈধ বিবেচনা করি। যাহা হউক, আমি তর্কস্থলে অনুমান করিয়া লইব যে, ঐ হুকুম অবৈধই হইয়াছিল। তথাপি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন জজ দেখিয়াছিলেন যে, কতিপয় সাক্ষী যাহাদিগকে বাদী সমন করিয়াছিল, নিম্ন আদালতের ত্রুটিতে তাহা-দিগের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, তখন তাঁহাদের জবানবন্দী লওয়া আপীল-আদালতেরই উচিত ছিল। দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৫৫ ও ৩৫৬ ধারার বিধান মতেই তিনি ঐ জবানবন্দী লইতে পারিতেন, অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রমাণ লওয়ার জন্য তাঁহার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া হয়ত নিজে সেই প্রমাণ লইতে পারিতেন, অথবা সেই প্রমাণ লইয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে নিম্ন আদালতের প্রতি আদেশ করিতে পারিতেন। তিনি তাঁহার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং সেই হেতু অতি উৎকৃষ্টই ছিল, এবং নিম্ন আদালতকে সেই প্রমাণ লইতে আদেশ করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালত ঐ প্রমাণ লইয়া তাঁহার প্রথম

নিষ্পত্তিই স্থির রাখেন। তাহার বিরুদ্ধে জজের নিকট আপীল হয়, এবং আপীলে নথী সম্বলিত সেই প্রমাণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, এবং তিনি তাহার উপরে আপন রায় ব্যক্ত করেন। অতএব তাঁহার প্রদত্ত পুনর্ব্বিচারের হুকুমের প্রণালীতে ভ্রম হইয়া থাকিলেও সেই ভ্রমের দ্বারা দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৩৫০ ধারামতে মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অথবা আদালতের বিচারাধিকারের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এমত অবস্থায়, ইহা এমন ভ্রম নহে যদ্দ্বারা জজের নিষ্পত্তি ভ্রমাত্মক বলিয়া আমরা খাস আপীলে তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিতে পারি।

বিচারপতি প্লবর যথার্থই বলিয়াছেন যে, বৃত্তান্ত সম্বন্ধে খাস আপেলাণ্টের উকীল বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র মোকদ্দমা বাস্তবিক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি দেখিতেছেন যে, বাদী পূর্ব্বে যে হারে খাজানা দেওয়ার কথা বলিয়াছে, তাঁহার মওক্কেলের নিজের গোমাস্তাও সেই রূপই শপথ করিয়া জবানবন্দী দিয়াছে, এবং যে স্থলে জজ সেই প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, সে স্থলে ঐ উকীল অতি ন্যায্য রূপেই লিখিয়াছেন যে, বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তিনি জজের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আর তর্ক করিতে পারেন না। (গ)

---

২ রা মার্চ ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২০১ নং মোকদ্দমা।

সিরাজগঞ্জের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২ রা জুলাই তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

আনন্দময়ী দাসী চৌধুরিণী (বাদী) আপেলাণ্ট।

আনন্দসুন্দর মজুমদার (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মণিলাল সান্যাল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক একতরফা ডিক্রীর পরে, কোন পরওয়ানা জারীর ১৫ দিবসের পূর্ব্বে প্রতিবাদী হাজির হইয়া শপথ পূর্ব্বক ব্যক্ত করে যে, যে নালিশে ঐ একতরফা ডিক্রী হইয়াছে তাহাতে তাহার প্রতি সমন জারী হয় নাই, এবং যে চুক্তির উপরে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় তাহা বাদী নিজেই ভঙ্গ করিয়াছে।

এ স্থলে, প্রতিবাদী পূর্ব্বে হাজির না হওয়ার যথেষ্ট হেতুই প্রদর্শন করিয়াছে, এবং সে দ্রষ্টব্য প্রমাণ দিয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় সুবিচারের ত্রুটি হইয়াছে।

আর; যেহেতু এই প্রমাণ উভয় পক্ষের মোক্তারের সমক্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল, অতএব ঐ মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের রেজিষ্টরীভুক্ত করার জন্য আদালত যে হুকুম দিয়াছেন তাহাই বৈধ হুকুম হইয়াছে।

বিচারপতি লক।—১২৭৫ সালের আষাঢ় হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত প্রতিবাদীর নিকট সুদ সমেত ৬২৭৩৸৶৯ টাকা খাজানা প্রাপ্য আছে বলিয়া তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এবং প্রতিবাদী যে ১২৭৩ সালের ১৯ এ ভাদ্রের এক ইজারা পাট্টার অন্তর্গত বিরোধীয় ভূমি ভোগ করে তাহাকে তাহা হইতে উচ্ছেদ করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, প্রথমে বাদী দাবীকৃত টাকার জন্য ১৮৬৯ সালের ২০ এ মার্চ তারিখে একতরফা ডিক্রী পায়। ঐ ডিক্রীর পুনর্ব্বিচারের জন্য ১৮৬৯ সালের ৫ ই এপ্রিল তারিখে দরখাস্ত হয়, এবং ডেপুটি কালেক্টর, প্রতিবাদীর পক্ষে শ্রীনাথ কর নামক ব্যক্তির জবানবন্দী লইয়া পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করত বৃত্তান্তের উপরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

প্রতিবাদী কবুলিয়ৎ দস্তখত করার ও সন সন খাজানা দেওয়ার কথা স্বীকার করে, কিন্তু সে

বলে যে, এইক্ষণে যে খাজানার দাবী হইয়াছে তাহার জন্য সে দায়ী নহে, কারণ, ১২৭৫ সালের শ্রাবণ মাসে সে কতক ভূমি হইতে উচ্ছেদিত হইয়াছে এবং ১২৭৪ সালের প্রথম হইতে সে তরফ মোহিনী হইতে উচ্ছেদিত হইয়াছে।

ডেপুটি কালেক্টর এক আমীনের দ্বারা স্থানীয় তদন্ত করাইয়া নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতিবাদী ১২৭৫ সালের সমুদায় বৎসর দখীলকার ছিল না, অতএব তিনি বিবেচনা করেন যে, সে ১২৭৫ সালের আরম্ভ হইতে কেবল আষাঢ়ের কিস্তী পর্য্যন্ত খাজানার দায়ী; এবং তিনি বাদীকে ৮৫৮ টাকার ডিক্রী দেন এবং প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করার জন্য বাদী যে প্রার্থনা করে তাহা অগ্রাহ্য করেন।

এই হুকুমের বিরুদ্ধে বাদী আপীল করিয়াছে, এবং আমাদের বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, প্রতিবাদী যে বলে যে, সে এই সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদিত হইয়াছিল এবং বাদিগণ ১২৭৫ সালের ১৬ই শ্রাবণ হইতে তিনিটি তরফে এবং ১২৭৪ সালের প্রথম হইতে তরফ মোহিনীতে দখীলকার ছিল, তাহা সত্য কি না? বাদিগণ দখীলকার ছিল কি না, তাহা প্রতিবাদীরই সপ্রমাণ করিতে হইবে, এবং সে তাহা সপ্রমাণ করিয়াছে কি না, তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে।

কিন্তু সেই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে, ডেপুটি কালেক্টরের পুনর্ব্বিচারের হুকুম সম্বন্ধে আপেলাণ্টের উকীল এই প্রথমে যে আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমাদের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তর্কিত হইয়াছে যে, তাঁহার কার্য্য সমস্ত আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা আদালতের বিচারাধিকারের ব্যতিক্রম হইয়াছে, অতএব যদিও আপেলাণ্ট এই আপত্তি নিম্ন আদালতে উপস্থিত করে নাই এবং এই আদালতের আপীলের দরখাস্তেও তাহা লেখে নাই তথাপি তাহাকে এইক্ষণে ঐ আপত্তি উপস্থিত করিতে দেওয়া উচিত।

তর্কিত হইয়াছে যে, নিম্ন আদালত আইনমত কার্য্য করেন নাই, এবং মোকদ্দমার প্রথম বিচারের কালে প্রতিবাদীর হাজীর না হওয়ার উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট কারণ প্রদর্শিত হয় নাই, এবং পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার কোন হুকুম হয় নাই, কিন্তু ডেপুটি কালেক্টর মোকদ্দমা শ্রবণের জন্য ১৮৬৯ সালের ৮ই মে তারিখ ধার্য্য করিয়া মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের রেজিস্টরী ভুক্ত করিতে এবং উভয় পক্ষের মোক্তারদিগকে আপন আপন দলীল ও প্রমাণ লইয়া ঐ তারিখে হাজীর হইতে, ১৯ এ এপ্রিল তারিখে হুকুম দেন, এবং তাহার পরে কতিপয় ইসু ধার্য্য করেন এবং তদনন্তর মোকদ্দমা শ্রবণের জন্য ১০ই মে দিন স্থির করিয়া পরিশেষে ১৮৬৯ সালের ২৯ এ জুলাই তারিখে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন।

আমার বিবেচনায়, এই আপত্তি অনেক বিলম্বে উপস্থিত হইয়াছে। মোকদ্দমা শ্রবণের সময়েই তাহার এই আপত্তি উপস্থিত করা উচিত ছিল, আপীলের দরখাস্তেও সে ঐ আপত্তি উপস্থিত করিতে পারিত; কিন্তু এই আপত্তি আমার বিবেচনায়, কর্ম্মণ্য বোধ হয় না; কারণ, যদিও পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার কোন প্রকাশ্য হুকুম আমাদের দৃষ্ট হয় না, তথাপি আমরা দেখিতেছি যে, ঐ পুনর্ব্বিচার গৃহীত হয় এবং পক্ষগণের সমক্ষে মোকদ্দমা বিচারিত হয়। এবং যদিও নথীতে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার কোন জাবেতামত হুকুম দৃষ্ট হয় না, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে, তাহা গ্রহণ করার উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট হেতু থাকার বিষয়ে নিম্ন আদালতের প্রতীতি জন্মিয়াছিল।

আমরা এইক্ষণে বৃত্তান্তের বিচার করিব। * * *

বিচারপতি হব্‌হৌস।—বিচারপতি লক এই মোকদ্দমায় যে রায় ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি সম্মত। কিন্তু আপেলাণ্টের উকীল যে প্রাথমিক আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন তদ্বিষয়ে

আমি বিচারপতি লক অপেক্ষায় অধিক দূর যাই। আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালত ১৮৬৯ সালের ১৯ এপ্রিল তারিখে যে হুকুম দেন তাহা পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার ন্যায্য হুকুম হইয়াছিল। আমি দেখিতেছি যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করাইবার জন্য প্রতিবাদীর কর্ত্তব্য এই যে, ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হওয়ার ১৫ দিবস মধ্যে অথবা তাহার পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বে অনুপস্থিত থাকার উৎকৃষ্ট ও যথেষ্ট হেতু দর্শায় এবং সুবিচারের যে, ব্যাঘাত হইয়াছে, তাহা কালেক্টরের তৃপ্তিজনক রূপে সপ্রমাণ করে; এবং তাহা করিলেই কালেক্টর মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু তিনি অগ্রে প্রতিপক্ষের উপরে সমন জারী না করিয়া ডিক্রী অন্যথা অথবা রূপান্তর করিতে পারেন না। কিন্তু এই মোকদ্দমার স্বীকৃত বৃত্তান্ত সমস্তে দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদীর উপরে কোন পরওয়ানা জারী হওয়ার পরে ১৫ দিবসের পূর্ব্বেই প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়াছিল। এবং উপস্থিত হইয়া সে শপথ পূর্ব্বক ব্যক্ত করে যে, যে মোকদ্দমায় একতরফা ডিক্রী হয় তাহাতে তাহার উপরে সমন জারী হয় নাই। এই কথা যদি বিশ্বাস্য হইয়া থাকে, তবে তাহাই তাহার পূর্ব্ব অনুপস্থিতির উৎকৃষ্ট ও, যথেষ্ট কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অপিচ, সে শপথ করিয়া বলে যে, সে ঐ মহালের খাজানা দেওয়ার জন্য বাদীর সহিত চুক্তি করিয়া থাকিলেও বাদী নিজেই সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, অর্থাৎ বাদী তাহাকে মহাল হইতে বেদখল করাতে চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। অতএব যদি নিম্ন আদালত এই বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তবে আদালতের সমক্ষে এমন দ্রষ্টব্য প্রমাণ উপস্থিত ছিল যদ্দ্বারা তিনি বিবেচনা করিতে পারেন যে, পূর্ব্ব ডিক্রীর দ্বারা সুবিচারের ত্রুটি হইয়াছে।

অনন্তর, আদালতের হুকুমে দৃষ্ট হইতেছে যে, এই প্রমাণ উভয় পক্ষের মোক্তারের সমক্ষে প্রদত্ত হয়, কারণ, আদালত বলেন যে, "অদ্য "(অর্থাৎ প্রতিবাদীর জবানবন্দীর দিবসে) "এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষের মোক্তারের সমক্ষে "উপস্থিত হইয়া হুকুম হইল;" এবং তাহার পরে যাহা লেখা আছে তাহা বোধ হয় পুনর্ব্বিচার গ্রহণ করার হুকুম বলিয়াই মনস্থ ছিল; অর্থাৎ হুকুম হয় যে, এই মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের রেজিষ্টরী-ভুক্ত হয়, এবং তাহার পরে হুকুমে লেখা আছে যে, উভয় পক্ষের প্রমাণ লইয়া মোকদ্দমা শ্রবণের জন্য ৮ ই মে দিন স্থির হয়। অতএব আমার বোধ হয় যে, বিচারপতি লকের বাক্যমতে যে স্থলে আপেলাণ্ট নিম্ন আদালতে অথবা তাহার আপীলের হেতুতে এই আপত্তি উপস্থিত করে নাই, সে স্থলে আমরা তাহাকে এই আপত্তি উপস্থিত করিতে দিলেও আমাদের ইহা বলিতে হইবে যে, তাহা অবৈধ আপত্তি। * *

(গ)

৪ টা মার্চ, ১৮৭০।

### প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২২০১ নং মোকদ্দমা।

ভাগলপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২৯ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ১২ ই জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

উইলিয়ম চার্লস্ ডফ্ (বাদী) আপেলাণ্ট।

সওদাগর সাহু জোতদার (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রূপনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর ই টুইডেল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক -১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩

ধারানুযায়ী নোটিসে প্রতিবাদীকে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া বর্ণনা না করিয়া সেই নোটিস জারীর পরে করবৃদ্ধির মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী যদি ১৭ ধারান্তর্গত হেতু ভিন্ন অন্য হেতুবাদে করবৃদ্ধির দায় হইতে মুক্ত হইতে চাহে, তবে শেষোক্ত ধারান্তর্গত ইস্যু উত্থাপনার্থে তাহাকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে, অথবা অন্ততঃ বলিতে হইবে যে, তাহার দখলের স্বত্ব আছে।

যদি এই প্রকার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর দখলের স্বত্ব না থাকে, এবং যদি জজ বিবেচনা করেন যে, দাবী-কৃত খাজানার হারই সঙ্গত, তবে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট অনেক পুরাতন রাইয়ত তাহার ন্যূন হারে খাজানা দিলেও তিনি ঐ দাবী-কৃত হারের ডিক্রী দিতে পারেন।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমায় প্রকৃত ইস্যু কি তদ্বিষয়ে উভয় নিম্ন আদালতই ভ্রম করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিয়াছেন। প্রতিবাদীর খাজানা প্রতি বিঘা ১৷০ টাকা হইতে ২৶০ টাকায় বৃদ্ধি করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৭ ধারানুযায়ী নোটিস জারী না হইয়া ১৩ ধারানুযায়ী হইয়াছে। অতএব প্রতিবাদীকে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত উল্লেখে এই নোটিস জারী হয় নাই। নোটিস এই যে, প্রতিবাদীর হার পার্শ্ববর্ত্তী রাইয়তের প্রদত্ত হার অপেক্ষা ন্যূন। অপিচ, জজের নিকট আপীলে বাদী-আপেলাণ্ট তর্ক করিয়াছে যে, প্রতিবাদীর ভূমির ন্যায় পার্শ্ববর্ত্তী সমভাবের ভূমির কর ২৶০ টাকা হিসাবে প্রদত্ত হয়; অতএব ঐ হারের ডিক্রী দেওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, মূল নোটিসে অথবা জজের নিকট আপীলে, বাদী ১৭ ধারান্তর্গত কর-বৃদ্ধির প্রথম হেতুর, অর্থাৎ প্রতিবাদীর তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সমশ্রেণীর রাইয়তের সমভাবের ভূমির প্রচলিত হার অপেক্ষা ন্যূন হারে খাজানা দেওয়ার কোন প্রসঙ্গ করে নাই।

ডেপুটি কালেক্টর এবং জজ উভয়েই প্রতিবাদীকে দখলের-স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ৎ বিবেচনা করিয়া ইস্যুর মধ্যে এই প্রশ্ন প্রবিষ্ট করিয়াছেন যে, দাবী-কৃত হার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে প্রতিবাদীর সমশ্রেণীর প্রজারা যে হারে খাজানা দেয়, তাহার সমান কি না; এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের রাইয়তেরা ২৶০ হারে খাজানা দেয় কি না, এই প্রশ্নের বিচারে জজ বলেন যে, যে সকল রাইয়ত বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে তাহারা যে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ৎ তাহা কিছুতেই প্রদর্শিত নাই, এবং তিনি বলেন যে, যদি তাহাদের সেই স্বত্ব না থাকে, তবে তাহারা ১৭ ধারামতে রক্ষিত নহে।

নথীতে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা প্রতিবাদীকে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ৎ বলা যাইতে পারে। ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদীর যেন দখলের স্বত্ব নাই এমত ভাবে বাদী তাহাকে নোটিসে এবং আদালতে প্রদর্শিত প্রমাণে ব্যবহার করিয়াছে; এবং প্রতিবাদীর যদি এই বলিবার মানস থাকে যে, তাহার দখলের স্বত্ব ছিল, সুতরাং সে ১৭ ধারান্তর্গত ভিন্ন অন্য হেতুবাদে করবৃদ্ধির দায় হইতে মুক্ত ছিল, তবে তাহা তাহারই সপ্রমাণ করা অথবা অন্ততঃ ব্যক্ত করা উচিত ছিল। ডেপুটি কালেক্টর এবং জজ উভয়েই এই কথা ছাড়িয়া গিয়াছেন, এবং তাহার ফল এই যে, পার্শ্ববর্ত্তী রাইয়তেরা সমশ্রেণীর ভূমির জন্য কি হারে খাজানা দেয় অর্থাৎ প্রতিবাদীকে দখলের-স্বত্ব-বিশিষ্ট প্রজা বিবেচনা না করিলে তাহার নিকট বাদী কত খাজানা পাইতে পারে, তাহা তাঁহারা বিচার করেন নাই।

এই মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের জন্য জজের নিকট ফেরৎ যাইবে। কিন্তু মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে যে প্রকার বিচারিত হইয়াছে তদৃষ্টে আমাদের বোধ হয় যে, যদি প্রতিবাদী এইক্ষণে দেখাইতে পারে যে, তাহার দখলের স্বত্ব

আছে, তবে তাহাকে পুনর্ব্বিচার কালে জজের সমক্ষে ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে দেওয়া উচিত। যদি প্রতিবাদী কোন প্রকারে রক্ষিত না হয় এবং যদি তাহার দখলের স্বত্ত্বক্ষা থাকে এবং কর বৃদ্ধি করার বাদীর স্বত্ত্ব ১৭ ধারায় সীমাবদ্ধ না হয়, তবে প্রতিবাদীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির ৫ জন রাইয়ৎ বিঘা প্রতি ২৵ হারে খাজানা দেওয়ার যে প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা জজ বিশ্বাস করিলে ন্যায্য রূপেই বিবেচনা করিতে পারেন যে, ঐ হারে স্বত্ত্ব-হীন রাইয়তের খাজানা আদায় হইতে পারে। যদি প্রতিবাদীর এই বলা মনস্থ থাকে, যে এই সকল রাইয়ৎ যে হারে খাজানা দেয় তাহা অসাধারণ, এবং ভূমির সঙ্গত খাজানা নহে, তবে সে ইচ্ছা করিলে তাহা বলিতে পারিবে। কিন্তু তাহার জন্য এমন হইতে পারে না যে, দখলের স্বত্ত্ব-বিশিষ্ট বহুতর প্রাচীন প্রজা ন্যূন হারে খাজানা দিতেছে বলিয়া ভূমির ন্যায্য খাজানার হার ২৸৹ হইলেও প্রতিবাদীর নিকট বাদী ঐ হারে খাজানা পাইতে পারিবে না।'

এই আপীলের এবং পূর্ব্ব বিচারের খরচা মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি এই মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিতে সম্মত হইলাম। (গ)

---

৫ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২৪৯১ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৭ সালের ২৮ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ২৫ এ জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

জাগর্দ্দী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

রাধাকিশোর তালুকদার (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অখিলচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—খাজানার দাবীর মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী যদি তাহার ও বাদীর সহিত পরস্পর প্রজা ও ভূম্যধিকারী রূপ সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করে, এবং বলে যে, মোজাহেমদারকে সে খাজানা দিয়াছে, তবে মোজাহেম অগ্রাহ্য হইলেই যথেষ্ট হইবে না, আদালতের দেখিতে হইবে যে প্রতিবাদী বাদীর রাইয়ৎ কি না।

বিচারপতি বেলি।—বাদীর সহিত প্রতিবাদীর ভূম্যধিকারী ও প্রজারূপ সম্পর্ক থাকার কথা বাদী সপ্রমাণ করিয়াছে কি না, তাহার বিচারার্থে এই মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হয়। নিম্ন আপীল-আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যেহেতু মোজাহেমদারের মোজাহেম অন্যথা হইয়াছে, অতএব বাদী প্রতিবাদীর ভূম্যধিকারী। কিন্তু ইহা যথেষ্ট নহে। প্রতিবাদী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে যে, বাদী যে বলে যে, সে বাদীর প্রজা, তাহা সে নহে। অতএব বাদীরই আপন বাক্য সপ্রমাণ করা কর্ত্তব্য ছিল। ইহা সত্য বটে যে, প্রতিবাদী কহিয়াছে যে, যে মোজাহেমদারের মোজাহেম অন্যথা হইয়াছে তাহাকে সে খাজানা দিয়াছে, কিন্তু তাহা সাধারণ ইসু সম্বন্ধে প্রতিবাদীর অস্বীকৃত বাক্যের কেবল এক অংশ এবং শেষ অর্দ্ধ। সে যে, বাদীর প্রজা নহে, এই অস্বীকৃত বাক্য এখনও রহিয়াছে। এমত অবস্থায়, মোজাহেমদারের কথা ছাড়িয়া দিয়া, প্রতিবাদী বাদীর রাইয়ত ছিল কি না, তাহার তদন্ত না করা নিম্ন আপীল-আদালতের অন্যায় হইয়াছে। মোজাহেমদারের দাবী অগ্রাহ্য হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হইতে পারে।

অতএব উপরোক্ত কথা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারের জন্য মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইল। খরচা শেষ নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গ)

৯ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২৫২৫ নং মোকদ্দমা।

হুগলির প্রতিনিধি জজ হাবড়ার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৫ ই মে তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ৩০ এ জুনে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শিবরাম ঘোষ (বাদী) আপেলাণ্ট।

প্রাণ পাঁড়ে এবং অপর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু দেবেন্দ্রনারায়ণ বসু আপেলাণ্টের উকীল

বাবু রাজেন্দ্রনাথ মিশ্র রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়তের দাবীর মোকদ্দমায়, আরজীতে ভূমির যে পরিমাণ লিখিত থাকে, তৎসমুদায়ের প্রতি বাদীর স্বত্ব সপ্রমাণ না হইলে, নালিশ ডিস্মিস হইবে: কারণ, করের দাবীকৃত হার সম্যক্ রূপে প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত না হইলে যেরূপ ১০ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাধিবেশনের নজীর (বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট, ৩ য় ভাগ পূর্ণাধিবেশনের মালসংক্রান্ত নিষ্পত্তির ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) খাটে, আরজীর লিখিত মতে ভূমির পরিমাণ প্রমাণে সম্যক্ রূপে সাব্যস্ত না হইলেও সেই নজীর তদ্রূপ খাটে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—এ মোকদ্দমা বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়তের দাবীতে উপস্থিত হয়। নিম্ন আপীল-আদালত দুই হেতুবাদে মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন, যথা—প্রথমতঃ, বাদী ভূমির এক অংশের কবুলিয়তের দাবীতে নালিশ করিতে পারে না; এবং দ্বিতীয়তঃ, এই মোকদ্দমার বিরোধীয় ভূমির এক অংশ প্রতিবাদীর জমার অন্তর্গত বলিয়া বাদী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই।

খাস আপীলে আমাদের নিকট দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে; যথা—প্রথমতঃ, যে প্রথম হেতু দৃষ্টে জজ নিষ্পত্তি করেন, তাহা যখন প্রতিবাদী প্রথম আদালতে বা আপীল-আদালতে উত্থাপন করে নাই, তখন বাদী যে, এক অংশের কবুলিয়ৎ পাইতে পারে, তাহা তাহাকে সপ্রমাণ করিতে দেওয়ার জন্য এই মোকদ্দমা প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠান জজের উচিত ছিল। এবং দ্বিতীয়তঃ, যে সকল ভূমি জজ প্রতিবাদীর লাখেরাজ ভূমি বলিয়া স্থির করেন, তদ্ব্যতীত এই মোকদ্দমার বিরোধের অন্তর্গত আরো ভূমি ছিল, যাহার সম্বন্ধে বাদী কবুলিয়ৎ পাইবে কি না, তাহা জজের নির্দ্ধারণ করা উচিত ছিল।

প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমাদের কোন মত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই। এই বলিলেই যথেষ্ট যে, বাদী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই যে, যে পরিমাণের ভূমি বাদীর নালিশের আরজীতে বর্ণিত হইয়াছে, সে প্রতিবাদীর নিকট হইতে তৎসমুদায়ের কবুলিয়ৎ পাইতে পারে; অতএব এই মোকদ্দমা ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির অন্তর্গত হইতেছে। প্রমাণে জমির পরিমাণ সম্বন্ধেই প্রভেদ হউক, বা যে হারে কবুলিয়তের প্রার্থনা হয়, তৎসম্বন্ধেই হউক, ফল তুল্যই হয়, এবং যে পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির উল্লেখ করা গেল, তাহার বিধি উভয় স্থলেই তুল্য রূপে প্রয়োগ হয়।

এই খাস আপীল, খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইল।

বিচারপতি লক।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

---

১৬ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৮৬৫ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ১২ ই অক্টোবরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ৩৮ ই মে তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

তিলকধারী রায় ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদীর মধ্যে দুই জন) আপেলাণ্ট।

মুরলীধর রায় (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীকৃষ্ণ সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ওম্মেদওয়ার আদালতের কর্ম্মচারী না হওয়ায় ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৩ ধারামতে, সে কোন স্থানীয় তদন্তের জন্য প্রেরিত হইতে পারে না, এবং তাহার রিপোর্টও সঙ্গত রূপে প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায়, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

খাস আপীলের প্রথম হেতু এই যে, নিম্ন আপীল-আদালত আমীনের রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য করিতে অন্যায় রূপে অস্বীকার করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয় হেতু এই যে, যে ফারখৎ এবং দাখিলা সমস্ত সপ্রমাণ হয় নাই বলিয়া প্রথম আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা নিম্ন অপীল-আদালত অন্যায় রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রথম হেতু সম্বন্ধে আমরা দেখিতেছি যে, যে ব্যক্তি আমীন বলিয়া কথিত হইয়াছে, সে এক ওম্মেদওয়ার অর্থাৎ কর্ম্মাকাঙ্খী। স্থানীয় তদন্তের জন্য ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৩ ধারায় আদালতের কোন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করার আদেশ আছে। সেই কর্ম্মচারী আদালতে শপথ করিয়া কর্ম্ম লইয়াছে, অতএব তাহার রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে, কিন্তু এ স্থলে যে ওম্মেদওয়ার তদন্তের জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, সে আদালতের কর্ম্মচারী নহে, এবং ঐ রূপ কর্ম্মচারীর ন্যায় সে তাহার কার্য্যে হলফের দ্বারা বাধ্য নহে। অতএব কোন প্রকারেই এই রূপ আমীনের রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন আপীল-আদালত কেবল ঐ ফারখৎ ও দাখিলার উপরে নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করেন নাই। তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদী যে সকল চিঠার উপরে নির্ভর করে তাহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদীর দখল সাক্ষীর দ্বারাও ঐ দাখিলা ও ফারখতের দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। পাটওয়ারীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে প্রথম আদালতে যে আপত্তি উত্থিত হয় তাহা নিম্ন আপীল-আদালত কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রূপে খণ্ডিত হইয়াছে।

খাস আপেলাণ্টের উকীল আমাদের সমক্ষে উল্লিখিত যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নিম্ন আপীল-আদালতের রায়ে আইনঘটিত কোন ভ্রম আমাদের দৃষ্ট হয় না, অতএব আমরা এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ করিলাম। (গ)

১৬ ই মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৫৯০ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২৩ এ সেপ্টেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

স্বরূপচন্দ্র চৌধুরী (বাদী) আপেলাণ্ট।

নিমচাঁদ চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীমোহন দাস আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এক হাওয়ালা উল্লেখে তাহার খাজানার নালিশে, প্রতিবাদিগণ জওয়াব দেয় এবং আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, বিরোধীয় ভূমি সমস্ত দুই হাওয়ালা ভুক্ত, এক হাওয়ালা নহে।

এমতস্থলে ঐ হেতুবাদে নালিশ ডিস্‌মিস্ করা উচিত নহে; সাধারণ যুক্তি অনুসারে এবং প্রতিবাদীরই সুবিধার জন্য আদালত পক্ষগণের মধ্যে অন্যান্য ইসুর তদন্ত করিয়া সুবিচার করিতে পারেন।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—অনন্তরাম ও রাজারাম নামে একটি হাওয়ালা উল্লেখে তাহার খাজানা পাওয়ার জন্য প্রতিবাদিগণের নামে বাদী নালিশ করে। প্রতিবাদিগণ বলে যে, ঐ নামে দুই হাওয়ালা আছে, এক হাওয়ালা নহে; এবং যে ডেপুটি কালেক্টর মোকদ্দমার বিচার করেন, তিনি কেবল এই ইসু নির্দ্ধারণ করেন যে, বাদী যাহাকে অনন্তরাম ও রাজারাম বলে তাহা দুই কি এক হাওয়ালা; এবং যদি তাহা এক হাওয়ালা হয়, তবে বাদী প্রতিবাদিগণের নিকট এই নালিশে খাজানা আদায় করিতে পারে কি না?

ডেপুটি নির্দ্দেশ করেন (জজও সেই নির্দ্দেশ স্থির রাখিয়াছেন) যে, ঐ ভূমি প্রথমে দুই হাওয়ালা ছিল, এবং জমিদার তাহা একত্র করিয়া এক হাওয়ালা করার ইচ্ছা করিয়া থাকিলেও তাহাতে প্রতিবাদিগণ সম্মত হয় নাই। তাহার পরে তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন যে, বাকী খাজানার জন্য বাদী দুই পৃথক্ নালিশ উপস্থিত করিতে বাধ্য ছিল এবং আরজীতে দোষ হইয়াছে, সুতরাং নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে।

দেখা যাইতেছে যে, এবিষয়ে আরো প্রশ্ন আছে, যথা—বাদী যে প্রকার বলে, বিরোধীয় জমাতে প্রতিবাদিগণের সেই প্রকার স্বার্থ আছে কি না। কিন্তু নিম্ন আদালতদ্বয় সেই প্রশ্নের নিষ্পত্তি করেন নাই। তাঁহারা যে এক প্রশ্নের বিচার করিয়াছেন তাহা কেবল জাবেতা সম্বন্ধীয়, অর্থাৎ বাদী দুই জমা একত্র করিয়া নালিশ করাতে তাহা ডিস্‌মিস্ করা উচিত কি না। আমার বোধ হয়, এমত অবস্থায় বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করার আবশ্যক ছিল না, কারণ এক বা অধিক ব্যক্তি এক জমিদারীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের জমা রাখিলে তাহার যদি খাজানার বাকী পড়ে, তবে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন নালিশ উপস্থিত না করিয়া এক নালিশ উপস্থিত করা বরং প্রতিবাদীরই সুবিধা-জনক।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, "একি পক্ষের নামে বিপক্ষের "নালিশ করিবার নানা কারণ থাকিলে, ও "সেই সেই কারণ একি আদালতে বিচার "হইতে পারিলে সেই সকল কারণ একি "মোকদ্দমায় ধরা যাইতে পারিবেক। কিন্তু "ইহাতে প্রয়োজন যে, ঐ মোকদ্দমাতে যত "টাকা কি সম্পত্তির যত মূল্য লইয়া সম্পূর্ণ "দাওয়া হয়, সেই মূল্যের দাওয়া ঐ আদালতের "বিচার করিবার ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।" ইহা সত্য বটে যে, ঐ মর্ম্মের কোন স্পষ্ট বিধান ১৮৫৯ সালের ১০ আইনে নাই; কিন্তু সাধারণ যুক্তি অনুসারে এবং আমার উল্লিখিত হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি, আদালত এই নালিশ ডিস্‌মিস্ না করিয়া মোকদ্দমার অন্যান্য ইসুর তদন্ত করত পক্ষগণের মধ্যে সুবিচার করিতে পারিতেন। অতএব আমার মতে নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা হইবে এবং মোকদ্দমা দোষগুণ দৃষ্টে বিচারার্থে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

২১ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র

১৮৬৯ সালের ১৮৭৬ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের অতিরিক্ত জজ তত্রত্য প্রতিনিধি ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ১০ ই নবেম্বরের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১লা মে তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রামেশ্বর সিংহ এবং অপর এক ব্যক্তি
(প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

অযোধ্যাপ্রসাদ সিংহ এবং অপর এক ব্যক্তি
(বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু আনন্দগোপাল পালিত আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী আইন প্রয়োগ দ্বারা চূড়ান্ত হইবার পরে খাস আপীলে তাহার সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি হইতে পারে না।

বিপক্ষের হিসাবের খাতা অধিক হইলেও প্রতিপোষক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, নিরপেক্ষ প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল স্বীকার করেন যে, এ মোকদ্দমায় নিম্ন আপীল আদালতের রায় স্থির থাকিতে পারে না। জজকে কেবল এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হয় যে, প্রতিবাদিগণ বাদীর প্রজা কি না; এবং যদিও জজ বলেন যে, তিনি এই বৃত্তান্ত স্থির করেন যে, প্রতিবাদিগণ বাদীর প্রজা, তথাপি তিনি এই সিদ্ধান্তের পোষকতায় যে সকল কারণ দর্শান তাহা একেবারে অসম্পূর্ণ এবং আইন সম্বন্ধে ভ্রান্তি-মূলক। প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে, প্রধান সদর আমীনের প্রতিবাদিগণের অর্থাৎ উপস্থিত খাস আপেলাণ্টগণের অনুকূলে ডিক্রী দিবার অধিকার ছিল না। এ কথা বলা তাঁহার নিশ্চয়ই অন্যায় হইয়াছে। উক্ত ডিক্রী এক্ষণে আইনের কার্য্য দ্বারা চূড়ান্ত হইয়াছে, এবং খাস রেস্পণ্ডেণ্টগণ এক্ষণে তাহার সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, জজ বলেন যে, প্রতিবাদিগণ উক্ত ডিক্রী অনুসারে ঐ মৌজার অন্তর্গত ভূমির অংশ পাইবে, কোন নির্দ্দিষ্ট ভূমি পাইবে না। তাহা হউক বা না হউক, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদিগণ বাদীর প্রজা কি না, এই প্রশ্নের সহিত উক্ত কথার কোন সম্বন্ধ নাই। তৃতীয়তঃ, জজ বলেন যে, প্রতিবাদিগণ তাহাদের ২৬ গণ্ডা অংশের পরিবর্তে ১৮॥ বিঘা ভূমি পাইবে, অতএব তাহারা অতিরিক্ত ভূমিতে বাদীর প্রজা স্বরূপে ব্যবহৃত হইবে। এই তর্ক স্পষ্টই ভ্রান্তিমূলক; কারণ, ঐ তর্কের জন্য যদি স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, প্রতিবাদিগণের যত ভূমি প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা অধিক তাহাদের দখলে ছিল, তথাপি উক্ত বৃত্তান্তের সহিত প্রতিবাদিগণ যে এই সকল অতিরিক্ত ভূমি বাদীর প্রজা স্বরূপে ভোগ করে, এই বৃত্তান্তের বিস্তর প্রভেদ আছে। ঐ বিষয়ে জজের যে এক মাত্র বাক্য খাটে তাহা তাঁহার রায়ের শেষ ভাগে আছে। তিনি বলেন যে, তিনি বাদীর পাট্টাদাতাগণের তহসীলের খাতা তলব দেন, এবং ঐ সকল খাতায় প্রকাশ যে, প্রতিবাদিগণ বাদিগণের পাট্টাদাতাদিগের প্রজা। কিন্তু এস্থলেও আবার জজের আইন-ঘটিত ভ্রম হইয়াছে। দেওয়ানী কার্য্য-বিধিমতে, ঐ সকল খাতা আপীলে প্রথম তলব দেওয়ার কোন কারণ দর্শান হয় নাই। এ সকল খাতার অকৃত্রিমতা সপ্রমাণের কোন বিধিমত প্রমাণ থাকিবার নিদর্শন নাই; এবং যদি অনুমান

করিয়া লওয়া যায় যে, তাহা রীতিমত সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা হইলেও ইহা অতি স্পষ্ট যে, এই মোকদ্দমায় জজকে যে বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাহা নিরপেক্ষ প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। এরূপ কাগজ অধিক হইলেও প্রতিপোষক প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু এমত কোন খাতার লিখিত বিষয় দ্বারা কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা যায় পর নাই অন্যায়, যাহা তাহার বিরুদ্ধে তাহার বিপক্ষ লিখিয়াছে এবং যাহার উপর তাহার কোন অধিকার ছিল না।

এমত অবস্থায়, আমরা এই মোকদ্দমা দোষগুণ সম্বন্ধে নূতন বিচারার্থে নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য হইলাম। যদি ঐ খাতাগুলি বিধিমত প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ না হইয়া থাকে, তবে জজ তাহা একেবারেই দেখিবেন না।

ফল দৃষ্টে খরচার আদেশ হইবে। (ব)

২৪ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ বি কেম্প এবং ই জ্যাক্‌সন।

১৮৬৯ সালের ২৪২৪ নং মোকদ্দমা।

মানভূমের অতিরিক্ত সহকারী কমিসনরের ১৮৬৯ সালের ৩১ মার্চের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া ছোট নাগপুরের জুডিসিয়ল কমিসনর ১৮৬৯ সালের ২১ এ আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মথুরানাথ সরকার (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

নীলমণি দেব (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবানীচরণ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—নোটিস জারী না হওয়ার হেতুতে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়, তবে ঐ ভূমি মাল কি লাখেরাজ তৎসম্বন্ধে ঐ মোকদ্দমার রায়ে যে কোন নির্দেশ থাকুক, তাহা কথার কথা মাত্র।

যদি এই প্রকার মোকদ্দমায়, নোটিসে এমন কথা লেখা না থাকে যে, রাইয়ত তাহার সমশ্রেণীর প্রজা অপেক্ষা ন্যূন হারে খাজানা দেয়, তবে উক্ত রূপ রাইয়তদিগের দ্বারা যে খাজানা প্রদত্ত হয় নথীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলে ঐ অনিয়মে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু ঐ প্রকার প্রমাণ না থাকিলে নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—কর বৃদ্ধি করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয়। নিম্ন আদালতে এই হেতুবাদে কতক ভূমির করবৃদ্ধির প্রতি আপত্তি হয় যে, ঐ কতক ভূমি লাখেরাজ, এবং দাবীকৃত হার সঙ্গত ও ন্যায্য নহে। প্রথম আদালত ও আপীলে জুডিসিয়ল কমিসনর কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত হইয়াছে এবং প্রথম আদালত যত ভূমির বর্দ্ধিত খাজানার ডিক্রী দেন, জুডিসিয়ল কমিশনর তদপেক্ষা অধিক ভূমির ডিক্রী দিয়াছেন। খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, যে হেতুবাদে নিম্ন আপীল-আদালত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অধিক ভূমির কর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা আইনসম্বন্ধে ভ্রমাত্মক।

নিম্ন আপীল-আদালত বলিয়াছেন যে, এই পক্ষগণের মধ্যে পূর্ব্ব এক মোকদ্দমায়, এই গ্রামে প্রতিবাদীর যে সমস্ত ভূমি আছে তাহার কিঞ্চিৎ বাদে সমুদায় মাল বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছিল এবং এক্ষণে প্রতিবাদী যে প্রকার বলে, সেই প্রকার লাখেরাজ বলিয়া ব্যক্ত হয় নাই। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, নোটিস জারী না হওয়ার হেতুতে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছিল; অতএব ভূমি মাল কি লাখেরাজ তৎসম্বন্ধীয় নিষ্পত্তি কেবল কথা মাত্র; এবং যখন উচ্চ আদালতে মোকদ্দমার আপীল হয়, তখন ইহা স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, ঐ

নিষ্পত্তির দ্বারা কাহারও কোন স্বত্বের ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, নিম্ন আপীল-আদালতের ঐ নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য করা উচিত ছিল না। ঐ রায় বাস্তবিক কোন নিষ্পত্তি নহে, এবং ভূমি মাল কি লাখেরাজ, তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন এখনও বিচারের জন্য খোলা আছে।

কিন্তু খাজানা বৃদ্ধি করিতে বাদীর স্বত্বের প্রতি আরো আপত্তি উত্থিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, করবৃদ্ধির নোটিসে ইহা স্পষ্টরূপে লেখা হয় নাই যে, প্রজা যে হারে খাজানা দেয়, তাহা, পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ঐ প্রকার ভূমির জন্য সমশ্রেণীর প্রজারা যে হারে খাজানা দেয়, তদপেক্ষা ন্যূন। অপিচ, বাদী যে প্রমাণ দিয়াছে তাহাতে, সমশ্রেণীর প্রজারা কি হারে খাজানা দেয় তাহার কোন উল্লেখ নাই।

আমীনের তদন্ত হইয়াছিল; কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ঐ প্রকার ভূমির জন্য যে খাজানা প্রদত্ত হয়, ঐ তদন্তে কেবল তাহারই উল্লেখ হইয়াছিল; সমশ্রেণীর প্রজারা সেই হারে খাজানা দেয় কি না, তাহা ঐ তদন্তে প্রকাশ নাই; ঐ গ্রামে যে হারে খাজানা আদায় হয় তাহাই সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার প্রমাণের উপরে খাজানা বৃদ্ধির যে হুকুম হয় তাহার প্রতি আপত্তি হইয়াছে। নোটিসের অনিয়ম সম্বন্ধে নিম্ন আদালতে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই, এবং আইনমতে যে সমস্ত কথা সপ্রমাণ করা আবশ্যক তাহার জন্য যদি প্রমাণ যথেষ্ট থাকিত, তবে কেবল নোটিসের অনিয়মের হেতুতে নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করা উচিত হইত কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিত। নোটিস অসাবধানে লেখা হইয়াছে বটে; কিন্তু যদি উভয় পক্ষই বুঝিয়া থাকে যে, তাহারা কি বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এবং যদি মোকদ্দমার তদন্ত করিয়া আদালতের তৃপ্তি জন্মিত যে, ঐ অনিয়মের দ্বারা তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, তবে নোটিসের অনিয়ম হেতু আদালত নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু এ স্থলে ঐ নিষ্পত্তি স্থির রাখা দুঃসাধ্য। প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, দাবীকৃত হার সমশ্রেণীর প্রজার হার বলিয়া সপ্রমাণ হয় নাই, এবং প্রতিবাদী কোন্ শ্রেণীর প্রজা তাহা বিবেচনা না করিয়াই হার নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

খাস আপীলে আর এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে, অপরিবর্ত্তনীয় হারে ভোগ করিতে প্রতিবাদীর যে স্বত্ব আছে এবং যে স্বত্ব সে আপীল-আদালতে দাবী করিয়াছিল এবং যাহা আপীল-আদালত উক্ত নিষ্পত্তির বলে অগ্রাহ্য করেন, তাহা আপীল-আদালত বিচার করেন নাই। কিন্তু যেস্থলে ঐ নিষ্পত্তি এই বিষয়ের চূড়ান্ত রায় নহে, সেস্থলে কি বর্দ্ধিত হার হওয়া উচিত, তাহা নির্ণয় করার পূর্ব্বে নিম্ন আপীল-আদালতের প্রতিবাদীর অপরিবর্ত্তনীয় হারের কথার নিষ্পত্তি করার আবশ্যক হইবে। কিন্তু যেহেতু এই মোকদ্দমা ১৮৬৮ সালে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমরা ইহা পুনঃপ্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলাম না। বাদী যে হারে বর্দ্ধিত খাজানার দাবী করে, তাহা সে সপ্রমাণ করিতে কৃতকার্য্য হয় নাই; অতএব খরচা সমেত তাহার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবে; যদি সে উচিত বিবেচনা করে, তবে ভবিষ্যতে বর্দ্ধিত হারে খাজানা পাওয়ার জন্য ইহার পরে নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে।

খাস আপীল খরচা সমেত ডিক্রী হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—আমি কয়েকটি কথা বলিতে চাহি। এই আদালতের অনেক নিষ্পত্তি আছে বটে যে, ১৭ ধারা মতে যে সকল হেতুবাদে রাইয়তের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তাহা যদি ১৩ ধারার লিখিত নোটিসে বর্ণিত না থাকে, তবে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে। এই মোকদ্দমায় ১৭ ধারার প্রথম হেতু-

বাদে কর বৃদ্ধির দাবী করা হইয়াছে। নোটিসের মর্ম্ম এই যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের প্রজারা গড়ে যে হারে খাজানা দেয়, তদপেক্ষা প্রতিবাদী ন্যূন হারে খাজানা দেয়; কিন্তু ইহাতে এমন কথা লেখা নাই যে, প্রতিবাদীর "সমশ্রেণীর" প্রজারা "সমভাবের" ভূমির জন্য যে খাজানা দেয়, তদপেক্ষা সে ন্যূন খাজানা দেয়। এই আপত্তি নিম্ন আদালতে উপস্থিত হয় নাই এবং দুই পক্ষই সমুদায় মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, এবং ঐ প্রকার ভূমির জন্য প্রতিবাদীর সমশ্রেণীর প্রজারা কি হারে খাজানা দেয়, নথীতে যদি তদ্বিষয়ের প্রমাণ থাকিত, তবে আমি নোটিসের অনিয়মের প্রতি দৃষ্টি করিতাম না; কিন্তু ঐ প্রকারের কোন প্রমাণ না থাকাতে আমার বিবেচনায়, নালিশ ডিস্‌মিস্ হইবে, কারণ, বাদী সপ্রমাণ করিতে পারে নাই যে, প্রতিবাদীর সমশ্রেণীর প্রজারা ঐ প্রকার ভূমির জন্য যে হারে খাজানা দেয় তদপেক্ষা প্রতিবাদী ন্যূন হারে খাজানা দিতেছে। (গ)

২৪ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২১৯৭ নং মোকদ্দমা।

গয়ার সহকারী কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২৫ এ জানুয়ারির নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১২ ই জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শ্রীচাঁদ ( প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি )
আপেলাণ্ট।

বুদ্ধু সিংহ ( বাদী ) ও আর এক ব্যক্তি
( অপর প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু নীলমাধব সেন ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন ও মুন্সী মহম্মদ ইউছফ
রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে ব্যক্তির পাট্টামতে প্রতিবাদী ভূমি ভোগ করে, সে তাহার পরে বাদীকে যে এক পাট্টা দেয় তদ্দ্বারা প্রতিবাদীর নিকট প্রতিবাদীর পাট্টার সর্ত্তানুযায়ী খাজানা আদায় করিতে বাদী স্বত্ব প্রাপ্ত হয়।

এমত স্থলে, ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার করার কথা অনাবশ্যক, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে মাল আদালতে নালিশ হইতে পারে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি আমাদের হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। সেই আদালত সপষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, প্রতিবাদী বাদীকে পূর্ব্ব বৎসর সমূহের খাজানা দিয়া ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, পত্তনী পাট্টার সর্ত্তে সপষ্ট দেখা যাইতেছে, এবং প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক অস্বীকৃত হয় নাই যে, বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা রূপ সম্পর্ক আছে। বাদীর পাট্টাদাতার নিকট প্রতিবাদী ১৮৫০ সালে এক পাট্টা পায়। বাদী তাহার পাট্টা ১৮৬০ সালে পায় এবং প্রতিবাদীর ১৮৫০ সালের পাট্টার সর্ত্ত অনুযায়ী বাদীর পাট্টায় প্রতিবাদীর নিকট খাজানা আদায় করার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়। এই প্রকার মোকদ্দমায় ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার করার আবশ্যক নাই, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে কালেক্টরের আদালতই এই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত করার জন্য উপযুক্ত আদালত।

অতএব আমরা এই মোকদ্দমা বাদী-রেস্পণ্ডেণ্টকে খরচা দিয়া ডিস্‌মিস্ করিলাম। অপর রেস্পণ্ডেণ্ট আপন খরচা আপনি বহন করিবে।

(গ)

৪ টা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি. লক, এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ১১৩৯ নং মোকদ্দমা।

মালদহের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৩১ এ মে তারিখের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে দিনাজপুরের প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

শ্যামাসুন্দরী দেবী ( প্রতিবাদিনী ) আপেলাণ্ট।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় ( বাদী ) রেস্পাণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও পূর্ণচন্দ্র সোম আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন দত্ত রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক। অবিভক্ত তালুকের এক শরীক তাহার প্রাপ্য খাজানার হিস্যা সাধারণতঃ আদায় করিতে পারে; কিন্তু তজ্জন্য সে, কোন বিশিষ্ট জোতের খাজানা আদায় করার একরার না থাকিলে, ঐ জোতদারের নিকট তাহা আদায় করিতে পারে না।

বিচারপতি হবহৌস।—আমাদের বিবেচনায়, নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে হইবে। নিম্নলিখিত অবস্থামতে বাদী প্রতিবাদিনীর নিকট বাকী খাজানা আদায়ের জন্য নালিশ করে। সে বলে যে, বিরোধীয় ভূমি যে তালুক ভুক্ত, সে তাহার ৵৩৷৷ গণ্ডার মালিক এবং প্রতিবাদিনী সেই সম্পত্তির ।১১৷৷ গণ্ডার মালিক এবং আর দুই ব্যক্তি যাহাদিগকে মোকদ্দমায় পক্ষ করা হয় নাই, তাহারা ১৬ আনার বাকী কয় আনার মালিক ছিল। সে তদনন্তর বলে যে, প্রতিবাদিনী সাধারণ তালুকের মধ্যে এক জোত রাখে, অতএব বাদী ঐ জোতের খাজানা হইতে তাহার আপন অংশ পাওয়ার জন্য নালিশ করে।

প্রতিবাদিনীর জওয়াব এই যে, সে বাদীকে কখন কোন খাজানা দেয় নাই এবং কোন একরারের দ্বারাও সে খাজানা দিতে বাধ্য নহে, এবং বাদী বিরোধীয় ভূমিতে কখন দখীলকার ছিল না, এবং ঐ তালুকে প্রতিবাদিনীর নিজের যে হিস্যা আছে তাহারই মধ্যে ঐ জোত স্থিত।

স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ তালুক অবিভক্ত; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, প্রত্যেক শরীক আপন হিস্যার খাজানা পৃথক্ রূপে আদায় করিয়া আসিয়াছে। প্রতিবাদিনীর বিরুদ্ধে জজ এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, "প্রতিবাদিনী "যে বলে যে, বিরোধীয় জোত তাহার নিজ "হিস্যার অন্তর্গত, তাহা, নিম্ন আদালতে সে ঐ "সম্পত্তি অবিভক্ত বলিয়া স্বীকার করাতেই "খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব এক বিঘারও "তাহার স্বতন্ত্র মালিকী স্বত্ব নাই। ঐ তর্ক "অন্যথা হওয়ায়, আমার বোধ হইতেছে যে, "পক্ষগণের মধ্যে ভূম্যধিকারী ও প্রজা রূপ "সম্বন্ধ নাই বলিয়া যে তর্ক হইয়াছে তাহাও "অকর্ম্মণ্য, কারণ, প্রতিবাদিনী স্বীকার করিয়াছে "যে, সে ঐ তালুকের মধ্যে ঐ জোত রাখে এবং "বাদী যে, ঐ তালুকের এক শরীক তাহাও সে "স্বীকার করিয়াছে। অতএব বাদী ঐ জোতের "খাজানার অংশ পাইতে স্বত্ববান হইবে।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, জজের রায় এই হেতুর উপরে হইয়াছে, যথা:—তালুক অবিভক্ত, প্রতিবাদিনী ঐ তালুকের মধ্যে এক জোত রাখে এবং বাদী ঐ তালুকের এক শরীক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব প্রতিবাদিনী ঐ তালুকে যে জোত রাখে তাহার খাজানার মধ্যে বাদীর যে হিস্যা হয় তাহা প্রতিবাদিনী তাহাকে দিতে বাধ্য।

এই নির্দ্দেশ দেখিয়াই আমাদের বোধ হইতেছে যে, ইহা আইন সম্বন্ধে ভ্রমাত্মক। ইহা হইতে পারে যে সাধারণ তালুকের খাজানার যে হিস্যা বাদীর হয় তাহা সে লইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য এমত বলা যাইতে পারে না যে,

বাদী এই জোত হইতে প্রতিবাদিনীর নিকট আদায় করিতে পারিবে ; এবং আদায় করার জন্য প্রকাশ্য বা আনুমানিক একরার না থাকিলে সে আদায়ও করিতে পারিবে না। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, কোন প্রকাশ্য একরার নাই, এবং নথীতে কোন আনুমানিক একরারেরও প্রমাণ নাই। কথিত হইয়াছে যে, আনুমানিক চুক্তির প্রমাণ আছে, এবং যে প্রমাণ আমাদের নিকট প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার ভাব এই। কথিত হইয়াছে যে, এক মোকদ্দমায় প্রতিবাদিনী কতিপয় জমা-ওয়াশীল বাকীর কাগজ দাখিল করিয়াছে, এবং কথিত হইয়াছে যে, ঐ সকল জমা-ওয়াশীল বাকীর কাগজে ঐ জোত থাকার, এবং শরীকদিগকে ঐ জোতের যে খাজানা দেওয়া হয় তাহার কিছু প্রসঙ্গ আছে। এই সকল জমা-ওয়াশীল বাকীর কাগজের নকল বাদি-কর্ত্তৃক দাখিল হইয়াছে। ইহাই ঐ প্রমাণের এক ভাগ। ঐ প্রমাণের আর এক ভাগ এই যে, মেং কমিন নামক আর এক জন শরীক শপথ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছে যে, ঐ তালুকের এক জোতের জন্য প্রতিবাদিনী তাহাকে তাহার অংশের খাজানা দিয়াছে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, বিরোধীয় জোতের খাজানা দেওয়ার জন্য প্রতিবাদিনীর চুক্তি সাব্যস্ত করার নিমিত্ত এই প্রমাণ অতি উৎকৃষ্ট হইতে পারিত ; কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, ইহাতে এক অত্যাবশ্যকীয় কথার অভাব আছে, এবং সেই অভাব এই যে, জমা-ওয়াশীল-বাকী ও মেং কমিসনের বাক্য ও তাহার কাগজে যে জোতের উল্লেখ আছে তাহাই যে বিরোধীয় জোত, এমত ঐ প্রমাণ দ্বারা চিহ্নিত হয় নাই। বাদী ঐ জোত বিরোধীয় জোত বলিয়া সেনাক্ত করে নাই। ঐ জোত সেনাক্ত হইলে নথীতে কোন না কোন প্রমাণ থাকিত। কিন্তু তাহা হইলেও, প্রতিবাদিনী বাদীকে সাধারণ তালুকের এক শরীক বলিয়া এই জোতের খাজানা দিতে যে আনুমানিক চুক্তি করিয়াছিল, ইহা সাব্যস্ত করণার্থে ঐ প্রমাণ অতি দূর প্রমাণ হইত। কিন্তু প্রকৃতার্থে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রমাণ যাহা নিজেই অতি দুর্ব্বল, তাহাতে এই আবশ্যকীয় বিষয়ের অভাব আছে ; এমত অবস্থায় আমরা এই বলিতে বাধ্য যে, প্রতিবাদিনী যে, বিরোধীয় ভূমির জন্য বাদীকে খাজানা দিবার কোন একরার করিয়াছিল, এমত কোন প্রমাণ নথীতে নাই।

বাদী সকল আদালতের খরচা দিবে।

—— ( গ )

৪ ঠা এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৯ সালের ২২০৮ নং মোকদ্দমা।

দক্ষিণসাবাজপুরের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ২৬ এ জুনের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া বাকরগঞ্জের প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১০ ই আগষ্টে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ক্ষেদারুন্নেছা বিবী ও অন্যান্য ( বাদী ) আপেলাণ্ট।

বুধী বিবী ও অন্যান্য ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীমোহন দাস ও কাশীকান্ত সেন, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—নোটিস জারীর পরে বর্দ্ধিত খাজানার দাবীর মোকদ্দমা, আপীলে ডিস্‌মিস্ হইলে, ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদী যে হার স্বীকার করিয়াছিল সেই হারে বাদী সেই বৎসরের খাজানার জন্য নালিশ করাতে—

স্থির হইল যে, পূর্ব্ব মোকদ্দমার ও বর্ত্তমান মোকদ্দমার নালিশের হেতু এক নহে ; অতএব পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধার বিধানের দ্বারা এই নালিশ বারিত নহে।

বিচারপতি নর্ক।—২৫৮৷৷৯ টাকা জমায় ১২৭১ সালের খাজানার দাবীতে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত হয়। প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক তর্কিত হইয়াছে যে, এই নালিশ বারিত হইয়াছে; কারণ, ১২৭১ সালের খাজানার দাবীর নিষ্পত্তি পূর্ব্ব মোকদ্দমাই হইয়া গিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারামতে নোটিস জারী করিয়া বর্দ্ধিত হারে ১২৭১ সালের খাজানা পাওয়ার জন্য বর্ত্তমান বাদী ১৮৬৫ সালে এক নালিশ উপস্থিত করে। ডেপুটি কালেক্টর বর্দ্ধিত হারে বাকী খাজানার বাবতে মোট ৩৮৩৬২ টাকার ডিক্রীদেন।

জজের নিকট আপীল হওয়াতে জজ বাদীর নালিশ এককালেই ডিস্মিস্ করেন। হাইকোর্টে খাস আপীল হয় এবং হাইকোর্ট ১৬ বিঘা সম্বন্ধীয় নিষ্পত্তি বাদে জজের অবশিষ্ট নিষ্পত্তিই স্থির রাখেন, এবং ঐ ১৬ বিঘা সম্বন্ধে আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, জজের নিষ্পত্তি অন্যথা হইয়া বাদী পূর্ব্ব হারের ডিক্রী পাইবে। ঐ নালিশে বাদী যে বর্দ্ধিত হার দাবী করে, সেই হারে ১২৭১ সালের খাজানা পাইতে অকৃতকার্য্য হইয়া, প্রতিবাদী সই মোকদ্দমায় যে হারের জমা স্বীকার করিয়াছিল, সেই হারে সেই সনের খাজানা পাওয়ার জন্য বাদী এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। নিম্ন আদালতদ্বয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, এই বিষয় পূর্ব্বেই মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে, অতএব বাদী বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করিতে পারে না। এই মোকদ্দমা পূর্ব্ব নিষ্পত্তি হেতু বারিত কি না, তাহাই এই খাস আপীলে বিচার্য্য।

নথীতে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রতিবাদী ৩৯৮ বিঘার এক জোত রাখে, যাহা হইতে গয়র-আবাদী ৪২ বিঘা বাদ দিয়া প্রতি বিঘা ৷৷৶৭ হারে ২৫৮৷৷১৫ জমা নির্দ্ধারিত ছিল। তাহার পরে, বাদী পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে প্রকার বলিয়াছে সেই প্রকার ঐ গয়র-আবাদী ৪২ বিঘার মধ্যে ২৩ বিঘা আবাদ হয়, এবং যেহেতু প্রতিবাদী যে খাজানা দিতেছিল তাহা ঐ ভাবের ভূমির প্রদত্ত খাজানা হইতে ন্যূন, অতএব বাদী ঐ নূতন আবাদী ২৩ বিঘা ভূমি সমেত সমুদায় জোতের পুনরায় জমাবন্দী করিয়া ১২৭১ সালের জন্য ৪৩৬৮৶১১ টাকা খাজানার দাবী করে। সেই মোকদ্দমায় প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, সে ২৫৮৷৷১৫ জমায় ঐ জোত ভোগ করে, কিন্তু নানা হেতুবাদে বর্দ্ধিত হারে বাদীর খাজানা পাওয়ার দাবীর প্রতি আপত্তি করে। অতএব সেই মোকদ্দমায় জজের যে প্রশ্ন বিচার্য্য ছিল তাহা এই যে, দাবী-কৃত বর্দ্ধিত হারে বাদী খাজানা পাইতে পারে কি না; এবং তিনি তাঁহার রায়ে যে কারণ দর্শাইয়াছেন তদনুযায়ী তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, বাদী তাহা পাইতে পারে না; অতএব তিনি বাদীর সমুদায় দাবী ডিস্মিস্ করেন।

সেই মোকদ্দমায় জজকে দেখাইয়া দেওয়া হইলে তিনি নিঃসন্দেহই প্রতিবাদীর স্বীকৃত হারে বাদীকে ডিক্রী দিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা দেন নাই। এবং যখন মোকদ্দমা খাস আপীলে উপস্থিত হয় তখনও আদালতকে এই কথা দেখাইয়া দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আমার বোধ হইতেছে যে, যদিও পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান মোকদ্দমার পক্ষগণ ও নালিশের হেতু এক, অর্থাৎ পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যেরূপ ১২৭১ সালের খাজানা দিতে অস্বীকার করাই নালিশের হেতু হইয়াছিল, এই মোকদ্দমায়ও সেই রূপ হইয়াছে, তথাপি আমার মতে দাবীর বিষয় বিভিন্ন।

উপস্থিত মোকদ্দমায় পুরাতন চুক্তি অনুযায়ী খাজানা পাওয়ার জন্য বাদী নালিশ করিয়াছে। পূর্ব্ব মোকদ্দমায়, সে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারানুসারে নোটিস জারী করিয়া আইনমতে যে আনুমানিক নূতন চুক্তি

করে, সেই চুক্তি অনুযায়ী খাজানা আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই মোকদ্দমা ডিস্মিস্ হইলেও, প্রতিবাদী আপন বর্ণনা-পত্রে স্বীকার করিয়াছিল যে, বাদী তাহার নিকট ২৫৮ টাকা কয়েক আনা পাইবে। অতএব বাদী তাহার সেই মোকদ্দমায় দাবী-কৃত বর্দ্ধিত হারে খাজানা আদায় করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া থাকিলেও, প্রতিবাদী তাহার নিকট ১২৭১ সালের যে পাওয়ানা, স্বীকার করে তাহা যে, বাদী পাইতে পারিবে না, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। তাহা হইলে বাদী ১২৭১ সালের যে খাজানা পাইবে বলিয়া প্রতিবাদী নিজে স্বীকার করিয়াছে, তাহা হইতে বাদী বঞ্চিত হয়।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, নিম্ন আদালতদ্বয়ের ডিক্রী অন্যথা হইয়া এই আপীল খরচা সমেত ডিক্রী হইবে।

উকীলগণের পরস্পরের বন্দোবস্তমতে আরও হুকুম হইল যে, ১২৭১ সালের শেষ হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত বাকী খাজানার উপরে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ চলিবে।

বিচারপতি হবৃহৌস।—আমারও ঐ মত। কিন্তু এই মোকদ্দমায় যে বিধি খাটে, তদ্বিষয়ে বিচারপতি লক অপেক্ষা আমার মত কিঞ্চিৎ অধিক ব্যাপক।

দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২ ধারার বিধান আমার বিবেচনায় এই যে, পূর্ব্ব নিষ্পত্তি হেতু পশ্চাতের মোকদ্দমার বাধা এমত স্থলেই হইতে পারে যে স্থলে পূর্ব্ব ও পশ্চাতের নালিশের হেতু ও পক্ষগণ এক, এবং আদালত উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন, এবং পশ্চাতের মোকদ্দমায় যে ইসু হয়, তাহা সেই আদালত পূর্ব্বেই স্পষ্ট মীমাংসা করিয়াছেন।

এই মোকদ্দমায় ইহা একেবারেই স্বীকার করা যাইতে পারে যে, পক্ষগণ এক এবং যে আদালত প্রথম মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন তিনি উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন; কিন্তু অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ে আমার বোধ হয় যে, পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধার বিধি যে, এই মোকদ্দমায় খাটিতে পারে, এমত সপ্রমাণ হয় নাই।

নালিশের হেতু আমার বিবেচনায়, এক নহে, এবং বিরোধীয় বিষয়ও এক নহে, এবং এইক্ষণকার বিচার্য্য প্রশ্নও পূর্ব্বের মোকদ্দমায় বিচারিত হয় নাই।

উপস্থিত নালিশের হেতু কি? প্রতিবাদী বাদীকে এত টাকা দিতে ত্রুটি করিয়াছে কেবল তাহা নহে, কিন্তু ঐ প্রকার ত্রুটি করাতে তাহার ও বাদীর মধ্যে যে চুক্তি ছিল তাহা সে ভঙ্গ করিয়াছে। সে যে ভূমি ভোগ করে তাহার ১২৭১ সালের খাজানা স্বরূপ বাদীকে কতক টাকা দিতে সে চুক্তি করিয়াছিল। অতএব কেবল টাকা না দেওয়া নালিশের হেতু নহে, চুক্তিভঙ্গ প্রকৃত হেতু, এবং টাকা না দেওয়ায় কেবল কোন্ সময়ে চুক্তিভঙ্গ হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছে। অতএব প্রতিবাদী যে চুক্তির দ্বারা বাদীকে ১২৭১ সালের জন্য এত খাজানা দিতে স্বীকার করিয়াছিল, তাহা প্রতিবাদি-কর্তৃক ভঙ্গ হওয়াই উপস্থিত নালিশের হেতু।

তবে পূর্ব্ব নালিশের কি হেতু ছিল? ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে চুক্তিভঙ্গের উপরে বাদী এইক্ষণে নালিশ করিতেছে তাহা ভঙ্গ করা সেই নালিশের হেতু ছিল না। কিন্তু তাহা স্বতন্ত্র পরিমাণের ভূমি ও স্বতন্ত্র পরিমাণের খাজানা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের চুক্তি-ভঙ্গ ছিল। সেই চুক্তি স্পষ্ট ছিল না এবং তাহা এমন চুক্তিও ছিল না যদ্দ্বারা পক্ষগণ বাক্য অথবা লেখার দ্বারা আপনাদিগকে বাধ্য করিবার করার করিয়াছিল; কিন্তু যদি তাহাকে চুক্তি বলা যায়, তবে আইনের লিখিত কতিপয় অবস্থামতে বাদীর ও প্রতিবাদীর পরস্পর সম্বন্ধ হইতে তাহার উদ্ভব হয়, এবং ঐ সকল অবস্থা

সপ্রমাণ হইলে সেই চুক্তি দ্বারা দুই পক্ষই বাধ্য হয়। ইহাকে চুক্তি বলা গেলে তাহা এমত চুক্তি যাহা পক্ষগণের মধ্যে, ভূম্যধিকারী ও প্রজা রূপ সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ যে সম্পর্ক ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ও ১৭ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে। বাদী যদি পূর্ব্ব মোকদ্দমায় সপ্রমাণ করিতে পারিত যে, উল্লিখিত বিধান সমস্ত তাহার ও প্রতিবাদীর সম্পর্ক সম্বন্ধে খাটে, তবে প্রতিবাদীর পক্ষে এমন এক আনুমানিক চুক্তি সাব্যস্ত হইত যদ্দ্বারা সে বাদীকে বাদীর পূর্ব্ব নালিশের দাবী-কৃত খাজানা দিতে বাধ্য হইত। কিন্তু বাদী এইক্ষণে যে স্বীকৃত এবং প্রকাশ্য চুক্তির উপরে নালিশ করিয়াছে, তাহা ঐ আনুমানিক চুক্তি হইতে স্বতন্ত্র। পূর্ব্ব মোকদ্দমায় যে চুক্তি-ভঙ্গ সম্বন্ধে বিরোধ ছিল তাহাই সেই নালিশের হেতু ছিল। উপস্থিত মোকদ্দমার নালিশের হেতু অন্য এক চুক্তি-ভঙ্গ, সেই চুক্তি-ভঙ্গ নহে। এবং আমি যে সমস্ত হেতু প্রদর্শন করিলাম তদনুযায়ী বিরোধীয় বিষয়ও এক নহে।

প্রতিবাদীর স্বীকৃত চুক্তিমতে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভূমির বাকী খাজানাই এই মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয়; পূর্ব্ব মোকদ্দমায় ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণের ভূমির এবং উপস্থিত মোকদ্দমার ভূমি হইতে কিছু বিভিন্ন ভূমির বর্দ্ধিত-হারের বাকী খাজানাই বিরোধীয় বিষয় ছিল।

উপস্থিত বিচার্য্য বিষয়েরও কোন মীমাংসা তখন হয় নাই। তখন আদালতের সমক্ষে কেবল এই প্রশ্ন উপস্থিত ছিল যে, বাদী এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের ভূমির উপরে এক নির্দ্দিষ্ট বর্দ্ধিত হারে খাজানা পাইতে পারিবে কি না? কেবল সেই প্রশ্নের উপরেই ইসু হইয়া নিষ্পত্তি হয়। উপস্থিত মোকদ্দমায় তদপেক্ষা অল্প পরিমাণের ভূমির উপরে স্বতন্ত্র চুক্তির বলে তদপেক্ষায় অল্প পরিমাণের খাজানা পাওয়ার প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালত পূর্ব্ব মোকদ্দমায় কোন ইসু উত্থাপন অথবা মীমাংসা করেন নাই।

কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, যে খাজানা লইয়া এইক্ষণে বিরোধ হইতেছে, পূর্ব্ব মোকদ্দমায়ও তাহা লইয়া বিরোধ হইয়াছিল, কারণ, মুল খাজানা বর্দ্ধিত খাজানা ভুক্ত বিবেচনা করিতে হইবে। এক ভাবে তাহা অবশ্যই হইতে পারে, কারণ, যখন কোন ব্যক্তি এক বৎসর ১০০ টাকার খাজানা দাবী করে, এবং তাহার পর বৎসর ১৫০ টাকার দাবী করে, তখন প্রথম বৎসরের ১০০ টাকা পর বৎসরের ১৫০ টাকাভুক্ত বলিয়া অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, এক চুক্তির অর্থাৎ প্রথম বৎসরের চুক্তির অন্তর্গত বাকী খাজানার পরিমাণ দ্বিতীয় বৎসরের দ্বিতীয় চুক্তির অন্তর্গত বাকী খাজানার পরিমাণভুক্ত; কারণ, মনে কর, এক ব্যক্তি ১৮৬০ সালে এক জনকে ১০০ টাকার তমঃসুক দেয়, এবং তাহার পর ১৮৬১ সালে ঐ তমঃসুক-গৃহীতার নিকট আর ৫০ টাকা কর্জ্জ করিয়া তাহার পূর্ব্ব তমঃসুক বাতিল করত ১৫০ টাকার জন্য নুতন এক তমঃসুক দেয়। যখন ঐ তমঃসুক-গৃহীতা আদালতে আসিয়া পশ্চাতের ১৫০ টাকার তমঃসুকের উপরে নালিশ করে তখন প্রথম ১০০ টাকার তমঃসুকের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে না। এই মোকদ্দমার ন্যায়, যদি প্রথম তমঃসুক স্বীকৃত হয়, তবে বিচার্য্য প্রশ্ন কেবল এই হইবে যে, ১৫০ টাকার পশ্চাতের তমঃসুক প্রদত্ত হইয়াছে কি না? অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এক বৎসরের স্বীকৃত এক চুক্তির অন্তর্গত খাজানার জন্য এক নালিশ করিয়া আর এক বৎসরের প্রদত্ত অন্য এক চুক্তির অন্তর্গত বর্দ্ধিত হারে খাজানার জন্য আর এক নালিশ করা, উল্লিখিত ঘটনার সদৃশ।

কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, এ স্থলে নিম্ন আদালত

যে প্রথম মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন আপীলে যদি তাহার প্রতিকার পাওয়া যাইত, তবে দ্বিতীয় মোকদ্দমা চলিত না, এবং এই তর্কের পোষকতায় ২ য় বালম উইকলি রিপোর্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ১৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশনের এক নিষ্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে। উপস্থিত মোকদ্দমার পূর্ব্ব মোকদ্দমার ন্যায় সেই মোকদ্দমায় বর্দ্ধিত হারে খাজানার জন্য নালিশ হয় এবং নিম্ন আদালতের জজ কোন না কোন কারণে (যাহা ব্যক্ত নাই) স্বীকৃত বাকী খাজানার জন্য বাদীকে ডিক্রী দিতে অস্বীকার করেন, এবং এই আদালতের ঐ খণ্ডাধিবেশন ঐ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য ঐ জজের নিকট মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এমন অনেক ঘটনা আছে যাহাতে বর্দ্ধিত হারে খাজানার নালিশেও জজ মোকদ্দমার ইসুর উপরে স্বীকৃত কোন বাকী খাজানা সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য হইতে পারেন, এবং ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫৫ ধারার মর্ম্মও এই বোধ হয় যে, ঐ প্রকার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা যে, সকল স্থলেই হইবে, এমন নহে। এবং ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ যে সকল বৃত্তান্তের উপরে ঐ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন তাহা আমরা না দেখিলে আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, ঐ নিষ্পত্তি এই মোকদ্দমায় আমাদের উপরে বাধ্যকর হইবে। পক্ষান্তরে, আইনে লেখা আছে যে, যাহা পূর্ব্বে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের দ্বারা মীমাংসিত হয় নাই তাহা পশ্চাতের মোকদ্দমার বাধা স্বরূপ গণ্য হইবে না। অতএব কোন প্রশ্ন মীমাংসিত হইতে পারিত বলিয়াই যদি এমত নির্দ্দেশ করা হয় যে তাহা মীমাংসিত হইয়াছে (পূর্ব্ব নিষ্পত্তিজনিত বাধা স্থির করার জন্য ঐ প্রকার নির্দ্দেশ আবশ্যক) তাহা হইলে নিতান্ত অলীক সিদ্ধান্ত হইবে।

আমি সম্মত হইয়া বলিতেছি যে, নিম্ন আদালতদ্বয়ের ডিক্রী অন্যথা করিতে হইবে, এবং বাদী তাহার দাবী-কৃত টাকা সমুদায় খরচা সমেত পাইবে। উকীলগণের পরস্পর বন্দোবস্ত অনুসারে আরও হুকুম হইল যে, ১২৭১ সালের শেষ হইতে আদায়ের তারিখ পর্য্যন্ত বাকী খাজানার উপরে বার্ষিক শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ চলিবে। (গ)

৫ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং এফ বি কেম্প।

১৮৬৯ সালের ২৬৪৫ নং মোকদ্দমা।

আড়ার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ২০ এ মার্চের নিষ্পত্তি রূপান্তর করত সাহাবাদের জজ ১৮৬৯ সালের ১৪ এ আগষ্টে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

জে, জি, ব্যাকম্যান (বাদী) আপেলাণ্ট।

লালবিহারী পাঁড়ে (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র এবং অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—সাক্ষিগণ যদি সমনে হাজীর না হয়, তবে তাহাদিগকে হাজীর করার অন্য উপায় অবলম্বনার্থে আদালতে প্রার্থনা করা পক্ষগণেরই কর্ত্তব্য, আদালত আপনা হইতে তাহা করিবেন না। যদি এমত প্রদর্শিত হয় যে, সাক্ষিগণ পলায়ন করিতেছে অথবা লুক্কায়িত ভাবে রহিয়াছে, তবে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১৬৮ ধারামতে আদালত ক্রোকের পরওয়ানা জারী করিতে পারেন।

বিচারপতি বেলি।—আমাদের বিবেচনায়, এই আপীল খরচা সমেত ডিসমিস্ হইবে।

খাস আপেলাণ্টের উকীল যে সমস্ত তর্ক করিয়াছেন তাহা এই যে, ২১৬ টাকার বাবতে জওয়াহেরলাল মুচ্ছুদী কর্তৃক যে জমাখরচের

কাগজ স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং যাহা আইনমতে কেবল প্রতিপোষক প্রমাণ, কেবল তাহার উপরেই জজ নির্ভর করিয়াছেন, এবং ঐ ২১৬ টাকার মধ্যে ১১৬ টাকা সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

আমরা দেখিতেছি যে, মেং ব্লুএট যাঁহার জবানবন্দী কমিশনরের দ্বারা লওয়া হয় তিনি কহিয়াছেন যে, ২১৬ টাকা দেওয়া হইয়াছিল, এবং ঝুলী রায়ও জবানবন্দী দিয়াছে যে, ২১৬ টাকার মধ্যে ১০০ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। জমাখরচের কাগজে দেখা যাইতেছে যে, ১২৭৫ সালের জন্য ১৬ টাকা লেখা আছে এবং ঐ সকল কাগজ উক্ত মুচ্ছুদ্দী দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়াছে; অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যথেষ্ট আইনসঙ্গত প্রমাণ আছে।

ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, জজ কেবল ঐ জমাখরচের কাগজ এবং ঝুলী রায়ের সাক্ষ্যের উপরে নির্ভর করিয়াছেন, মেং ব্লুএটের জবানবন্দীর উপরে নির্ভর করেন নাই; কিন্তু আমাদের সমক্ষে আপীলের সমগ্র নথী আছে এবং আমরা যদি মেং ব্লুএটের জবানবন্দী অগ্রাহ্য করি, তবে অবশ্য অন্যায় করা হইবে; কিন্তু আমরা কেবল মেং ব্লুএটের সাক্ষ্য পর্য্যালোচনা করার জন্য যদি মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরণ করি, তবে এই আদেশে তাহা প্রেরণ করিতে হইবে যে, মেং ব্লুএটের সাক্ষ্য মোকদ্দমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিবেচনা করিতে হইবে, কিন্তু তাহা হইলে কেবল নামমাত্র পুনঃপ্রেরণ করা হইবে।

দাবীর যে অংশ অগ্রাহ্য হইয়াছে তৎসম্বন্ধে খাস রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, এই বলিয়া ৩৪৮ ধারামতে এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, নিম্ন আপীল-আদালতের কার্য্যপ্রণালীতে এক ভ্রম হইয়াছে, কারণ, যে সকল সাক্ষী সমনে হাজীর হয় নাই তাহাদের নামে এস্তাহার জারী করার জন্য তাঁহার মওক্কেল ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এক দরখাস্ত করিয়াছিল, কিন্তু সেই দরখাস্ত কেবল নথী সামিল করার হুকুম হয়।

কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর হইতে তৎপরের ২০ এ মার্চ পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রথম আদালতের নিষ্পত্তির তারিখ পর্য্যন্ত সাক্ষিগণের সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য অথবা তাহাদের হাজীরীর নিমিত্ত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৮ ধারানুযায়ী হুকুমের জন্য বা অন্য উপায় অবলম্বন করণার্থে খাস রেস্পণ্ডেণ্ট আদালতে কোন প্রার্থনা করে নাই। আমাদের এই স্থলে বলা আবশ্যক যে, পক্ষগণেরই আদালতে দরখাস্ত করা উচিত, পক্ষগণের সাক্ষীরা হাজীর হইল কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি করা আদালতের কার্য্য নহে। কিন্তু তাহা ছাড়াও, ১১৮ ধারার বিধান এই যে, যদি এমত প্রদর্শিত হয় যে, সাক্ষী পলায়ন করিতেছে অথবা এমন গুপ্তভাবে আছে যে, তাহাকে গ্রেপ্তার অথবা আদালতে হাজীর করা যাইতে পারে না, তবে আদালত ক্রোকের পরওয়ানা দিতে পারেন। কিন্তু এই মোকদ্দমায় সাক্ষিগণ যে পলায়ন করিতেছিল বা গুপ্তভাবে ছিল, এতদ্বিষয়ে খাস রেস্পণ্ডেণ্ট প্রথম আদালতে কোন প্রমাণ দর্শায় নাই।

সমুদায় দৃষ্টে ৩৪৮ ধারান্তর্গত আপত্তি আমরা গ্রাহ্য করিতে পারি না; অতএব আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিলাম।

এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস হইল। (গ)

---

১৩ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৮৭৮ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অতিরিক্ত জজ তত্রত্য ডেপুটি কালে-

কটরের ১৮৬৭ সালের ৩০ এ আগষ্টের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৮ সালের ২২ এ ডিসেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কাদম্বিনী দাসী প্রভৃতি ( বাদিনী ) আপেলাণ্ট।

কাশীনাথ বিশ্বাস এবং অপর এক ব্যক্তি ( প্রতিবাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রেস্পাণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন ভূমির করের দাবীর নালিশে, প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, যে কালের করের দাবী করা হয়, জমিদার-বাদী অপর এক ব্যক্তিকে পাট্টা দেওয়াতে ঐ ব্যক্তি দ্বারা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রজাগণ বেদখল ছিল; এ স্থলে ঐ প্রজাগণ বেদখলের পরে ওয়াশীলাৎ সমেত দখলের ডিক্রী পাইয়া থাকিলেও, ঐ বেদখলী কালের করের দাবীতে জমিদার তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই মোকদ্দমা হরিচরণ বসু প্রভৃতি জমিদারগণ, প্রজা কাশীনাথ ও শুভদ্রার বিরুদ্ধে করের দাবীতে উপস্থিত করে। প্রকাশ যে, প্রতিবাদিনী শুভদ্রা এ মোকদ্দমায় জওয়াব দেয় না, অপর প্রতিবাদী জওয়াব দিয়া তর্ক করে যে, যে কালের করের দাবী হয়, জমিদার অর্থাৎ উপস্থিত বাদিনীগণ অপর এক ব্যক্তিকে পাট্টা দেওয়াতে সেই ব্যক্তি দ্বারা প্রজাগণ উচ্ছেদিত হইয়া সেই কাল পর্য্যন্ত উক্ত ভূমিতে বেদখল ছিল।

ডেপুটি কালেক্টর বিবেচনা করেন যে, বাদিনীগণ যে করের দাবীতে নালিশ করে, তাহা তাহারা পাইবে; কিন্তু জেলার জজ এই নিষ্পত্তি অন্যথা করেন; এবং বাদিনীগণ এই সকল হেতুবাদে আমাদের নিকট খাস আপীল করে, যথা— তাহারা অস্বীকার করিতে পারে না, বলিয়া স্বীকার করে যে, প্রতিবাদিগণ বাদিনীগণের সহায়তায় তৃতীয় পক্ষ দ্বারা এই ভূমি হইতে বেদখল হয়, কিন্তু তাহারা আপত্তি করে যে, প্রথমতঃ, ঠিক বলিতে গেলে বাদিনীগণ স্বয়ং বেদখল করে নাই; এবং দ্বিতীয়তঃ, ১ বালম, বেঙ্গল রিপোর্টের ১৩৮ পৃষ্ঠার লিখিত নজীর অনুসারে এরূপ বেদখল দ্বারা বাদিনীর কর পাইবার বাধা হয় না।

আমার বোধ হয়, এ মোকদ্দমা উক্ত নিষ্পত্তির অন্তর্গত হয় না। যখন তৃতীয় পক্ষ কর্ত্তৃক বেদখল হয়, তখন জমিদারের উক্ত কার্য্যে কোন সম্বন্ধ না থাকায়, কর দেওয়ার দায়িত্বের লোপ হয় না; কিন্তু এ স্থলের ন্যায় জমিদার যখন কেবল বেদখল করিতে সহায়তা করে এমত নহে, বাস্তবিক এমত পাট্টা দেয় যদুপলক্ষে প্রজাগণ বেদখল হয়, সে স্থলে প্রতিবাদিগণ যত কাল বেদখল থাকে, জমিদার তাহাদের নিকট হইতে সেই কালের করের দাবীতে নালিশ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, তর্ক করা হয় যে, প্রতিবাদিগণ ভূমি হইতে বেদখল হইয়া থাকিলেও তাহারা তৎপরে বেদখলের কালের ওয়াশীলাৎ সমেত দখলের ডিক্রী পাইয়াছে, সুতরাং বাদিনীর কর পাইবার স্বত্ব পুনর্জীবিত হইয়াছে, কারণ, প্রতিবাদিগণ তাহাদের পূর্ব্বাবস্থায় পুনঃস্থাপিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, যে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে তাহার ভূমি ভোগ করিতে থাকে, এবং যে উচ্ছেদিত হইয়া পরে দখলের ও ওয়াশীলাতের ডিক্রী পায়, ইহাদের অবস্থা এক রূপ নহে।

আর এক হেতু এই যে, এক জন প্রতিবাদী মূল মোকদ্দমায় উপস্থিত না হওয়ায় এক্ষণে আপীলে অপর প্রতিবাদীর সহিত আসিয়া মিলিতে পারে না; এবং কেবল এক প্রতিবাদীর আপীলে নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের রায় অন্যথা করিতে পারেন না। আমি এই স্থির করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক যে, ৩৩৭ ধারায় যে নিয়ম আছে, সেই রূপ নিয়ম দ্বারা আপীল-আদালত কেবল এক জন প্রতিবাদীর আপীলমতে এমত এক ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন, যাহার সহিত সেই প্রতি-

বাদীর এবং অন্যান্য প্রতিবাদীর সম্বন্ধ আছে, এবং যাহা স্পষ্টই ভ্রান্তি-মূলক এবং অন্যায় দেখা যায়। যাহা হউক, এ স্থলে ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, এই আপত্তি নিম্ন আপীল-আদালতে উত্থাপিত হয় নাই; এবং আমি বিবেচনা করি না যে, আমাদিগকে কেবল জাবেতার সম্ভাবিত ভ্রমের হেতুবাদেই এমন এক নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে হইবে, যাহা আমাদের মতে স্পষ্ট ন্যায্য এবং উচিত হইয়াছে।

অতএব আমার বিবেচনায়, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হওয়া উচিত।

**বিচারপতি গ্লবর।**—আমারও ঐ মত।

(ব)

১৩ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

১৮৬৯ সালের ২৭৫২ নং মোকদ্দমা।

যশোহরের অতিরিক্ত জজ ঝিনাইদহের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৮ সালের ৩১ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া ১৮৬৯ সালের ৭ ই জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রাধাচরণ রায় প্রভৃতি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

মোরান্ এবং কোম্পানি (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বংশীধর সেন, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু ভবানীচরণ দত্ত, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

**চুম্বক।**—প্রতিবাদী যে বর্ণনা-পত্র দাখিল করে, তাহাতে সত্যতা লেখাইয়া লওয়া উচিত; কিন্তু যদি সত্যতার লিপি ব্যতীতই তাহা নথীতে গৃহণ করা হয়, তবে তল্লিখিত বিষয় দেখিতে হইবে, এবং তদনুসারে ইসু ধার্য্য করিতে হইবে।

যে স্থলে কোন ব্যক্তি অনধিকার-প্রবেশক থাকিবার হেতুবাদে কোন করের দাবীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়, সে স্থলে সে মাল আদালতে দখলের দাবীর নালিশ উপস্থিত করিতে পারে না।

**বিচারপতি জ্যাক্‌সন।**—আমি দেখিতেছি যে, এ মোকদ্দমা ডেপুটি কালেক্টরের এবং জজের আদালতে, উভয় স্থলেই অতি কদর্য্য রূপে বিচারিত হইয়াছে।

বাদী মহম্মদসাই পরগণার ।৶০ আনার মালিক স্বরূপে ১২৫৴ বিঘা জমাই জমির দখলের দাবীতে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করে। প্রকাশ যে, এই পরগণার ।৶০ আনা এবং ॥৶০ আনা অংশ যশোহরের কালেক্টরীর তৌজীতে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর ভুক্ত আছে, কিন্তু প্রতিবাদী ভিন্ন ভিন্ন ক্রয় দ্বারা উভয় অংশই লইয়া তাহার মালিক হয়। অতএব সে মোট ষোল আনার মালিক, এবং আরজীতে লেখা আছে যে, ঐ সকল ভূমির অবশিষ্ট ॥৶০ আনা অংশ সম্বন্ধে সেই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আর এক নালিশ উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হইতেছে।

প্রতিবাদী বর্ণনা-পত্র দাখিল করিয়া তাহাতে বলে যে, সে এই বাদীর বিরুদ্ধে পূর্ব্বে ঐ সকল ভূমির করের দাবীতে যে এক নালিশ করে তাহাতে বাদী এই হেতুবাদে উক্ত নালিশ অন্যথা করায় যে, তাহারা এই সকল জমি সম্বন্ধে এই জমিদারের প্রজা নহে। সংক্ষেপে, তাহারা এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, তাহারা ঐ সকল জমি তাহাদের সাবেক জমার অন্তর্গত বলিয়া ভোগ করে, নচেৎ তাহারা তাহা অনধিকার-প্রবেশক স্বরূপে ভোগ করে; এবং যে আদালত উক্ত মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি এই আপত্তি প্রমাণ্য স্থির করিয়া উক্ত নালিশ এই হেতুবাদে অগ্রাহ্য করেন যে, তাহার অনধিকার-প্রবেশক।

এই বর্ণনা-পত্র যাহা প্রতিবাদীর আম-মোক্তার দাখিল করে, তাহাতে রীতিমত সত্যতা লিখিত নাই; এবং ইহা লইয়া অতিরিক্ত জজ কিছু বাদানুবাদ করেন। অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, রীতিমত সত্যতা লেখাইয়া লওয়া ডেপুটি

কালেক্টরের উচিত ছিল, এবং উক্ত বর্ণনা-পত্রে সত্যতা লেখা না হইলে তিনি তাহা লইতে অস্বীকার করিতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া উক্ত বর্ণনা-পত্র এই সাধারণ হুকুম দিয় দাখিল করিতে দেন যে, তাহা "নথীর সহিত দরপেশ হয়।" অতএব উক্ত বর্ণনা-পত্র নথীতে থাকায় তাহাতে যাহা ছিল তাহা দেখিয়া তদনুসারে ইসু ধার্য্য করা কর্ত্তব্য ছিল।

এই সকল বাক্য হইতে আসল ইসু এই হইতেছে যে, যে ভূমি সম্বন্ধে পূর্ব্বের মোকদ্দমা বাদিগণের অনধিকার-প্রবেশক স্বরূপে ভোগ করিবার হেতুবাদে ডিস্‌মিস্‌ হয়, সেই ভূমি সম্বন্ধে বর্ত্তমান মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে কি না; কারণ, তাহা হইলে, আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, বাদিগণ দেওয়ানী আদালতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১৫ ধারা মতে ডিক্রী পাইতে পারিলেও, মাল আদালতে প্রতিকার পাইতে পারে না।

প্রতিবাদী-খাস-আপেলাণ্টগণ এমত কোন স্বীকার দেখাইতে পারে না, যদ্দৃষ্টে আমরা এই স্থির করিতে পারি যে, ঐ ভূমি সেই পূর্ব্ব মোকদ্দমার অন্তর্গত ভূমিই ছিল; এবং যদিও এবিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতে পারে, তথাপি আমরা বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ঐ রূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি না।

অতএব আমি বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমা এই জন্য নিম্ন আপীল-আদালতে ফেরৎ যাইবে যে, উক্ত বিষয় সম্বন্ধে ইসু ধার্য্য করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করা হয়। বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে আদালত প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে এবং বাদিগণের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিলেও, তাঁহার বর্ত্তমান নিষ্পত্তিতে যে শেষ তিন আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যাহার নিষ্পত্তি অতি অসম্পূর্ণ, তাহা তাঁহাকে পুনঃগ্রহণ করিয়া উপযুক্ত প্রণালীতে মীমাংসা করিতে হইবে।

আর একটি প্রশ্ন আছে, যৎসম্বন্ধে আমি এক্ষণে কোন মত দেওয়া আবশ্যকীয় বোধ করি না। তাহা এই যে, যে প্রতিবাদী এই জমিদারীর উভয় ।৴০ আনা এবং ॥৴০ আনা অংশের মালিক, বাদীর তাহার বিরুদ্ধে নালিশের কারণ থাকাতেও কেবল ।৴০ আনা অংশের বাবতে তাহার বিরুদ্ধে এই নালিশ উপস্থিত করায় এবং এই মোকদ্দমায় তাহার সমুদায় নালিশের কারণ অর্থাৎ ।৴০ আনা ও ॥৴০ আনা অংশের মালিক যে প্রতিবাদী তাহার দ্বারা সম্পূর্ণ বেদখল হওয়ার কথা একত্রে উত্থাপন না করায়, সে পরে ॥৴০ আনা অংশ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নালিশ করিতে পারিবে কি না। একথা ॥৴০ আনা অংশ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় বিবেচিত হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

---

২২ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৯৭৫ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের সহকারী কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২৭ এ জুন তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সেখ মহম্মদ এনুস্ (বাদী) আপেলাণ্ট।

লালা জোমারাদ লাল (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন, আর ই টুইডেল ও বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও চন্দ্রমাধব ঘোষ, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ের জন্য বাদীর হস্তে ১৮৬০ সালের ২৭ আইনা-

ন্তর্গত এক সার্টিফিকেট থাকায় তাহার বলে সে বাকী খাজানার জন্য নালিশ করে, কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারা মতে এক ব্যক্তি মোজাহেম দেয়। এ স্থলে, যে ব্যক্তি বাস্তবিক ও সরল ভাবে খাজানা পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দখল রাখিতে স্বত্ববান।

১৮৬০ সালের ২৭ আইনের এমত মর্ম্ম নহে যে, তদনুসারে পক্ষগণের দায়াধিকারের বা স্বত্বের বিচার হইবে; কেবল যে সকল ঋণী মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য পরিশোধ করে তাহাদিগকে রক্ষা করাই ঐ আইনের উদ্দেশ্য।

বিচারপতি বেলি।—আমরা বিবেচনা করি, এই খাস আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

প্রতিবাদীকে ঠিকাদার বলিয়া বাদী তাহার নামে ১২৭৪ সালের ফাল্গুণ মাসের কতক দিনের ও চৈত্র মাসের খাজানার জন্য নালিশ করে।

বাদীর ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী কেন্দন বিবী মোজাহেম দেয়।

প্রথমে আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, কেন্দন বিবী বাস্তবিক খাজানা পায় বটে, কিন্তু সে তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে পায় না, অর্থাৎ প্রথম আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, যে স্থলে বাদী তাহার মৃত ভ্রাতা গোপীনাথের সম্পত্তির প্রাপ্য আদায় করার জন্য ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট পাইয়াছে, সে স্থলে মোজাহেমদার কেন্দন বিবীকে প্রতিবাদীর খাজানা দেওয়া অথবা কেন্দন বিবীর সেই খাজানা লওয়া প্রকৃত খাজানা পাওয়া বলা যাইতে পারে না। অতএব প্রথম আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, মোজাহেমদার যে খাজানা পাইয়াছে তাহাই চূড়ান্ত।

আপীলে নিম্ন আপীল-আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, বাদী কেবল ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট পাইয়াছে বলিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা পাওয়া না পাওয়ার কথার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না। নিম্ন আপীল-আদালত আরও নির্দ্দেশ করেন যে, মোজাহেমদার প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা পাইয়াছে এবং তাহা বাদীও স্বীকার করিয়াছে, অতএব প্রতিবাদী ও মোজাহেমদারের মধ্যে যোগসাজস অনুমান করার কোন হেতু নাই।

অতএব নিম্ন আপীল-আদালত বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

বাদী এইক্ষণে খাস আপীল করিয়া প্রথমতঃ, তর্ক করে যে, নিম্ন আপীল-আদালতের এমত নির্দ্দেশ করা ভ্রমাত্মক হইয়াছে যে, প্রথম আদালত স্থির করিয়াছেন যে, মোজাহেমদার প্রকৃত রূপে খাজানা পাইয়াছে, অথবা বাদী তাহা স্বীকার করিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোজাহেমদার ভূমির খাজানা পাইয়াছে; কিন্তু যেহেতু বাদী ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে সার্টিফিকেট পাইয়াছে, অতএব প্রথম আদালত সেই কারণে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহাকে যে খাজানা দেওয়া হইয়াছে এবং সে যে খাজানা পাইয়াছে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা ভোগ করা নহে, অতএব মোজাহেমদার ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারার উপকার লাভ করিতে পারে না। এবং জজের রায়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মোজাহেমদার যে বাস্তবিক খাজানা পাইত, তাহা বাদী তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিয়াছে।

দ্বিতীয় আপত্তি পূর্ব্ব আপত্তির সহিত কিঞ্চিৎ অনৈক্য, কারণ, ইহাতে তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারার বিধান এই মোকদ্দমায় খাটে না, এবং বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, বাদী, গোপীনাথের সহিত সম্পত্তি সম্বন্ধে এজমালী এবং গোপীনাথের অংশের দায়াধিকারী বিধায় ঐ ইজারার খাজানায় স্বত্ববান কি না। কিন্তু আমি বোধ করি যে, এই প্রকারে পক্ষগণ নিম্ন আদালতে তাহাদের মোকদ্দমা উত্থাপন করে নাই। প্রথম আদালত যে প্রথম

ইসু করেন তাহা এই যে, নালিশ উপস্থিত হওয়ার কালে এবং তাহার পূর্ব্বে মোস্তাহেমদার সরলভাবে ঐ ভূমির খাজানা আদায় এবং ভোগ করিয়াছে কি না; এবং বাদী তাহার প্রাপ্ত ২৭ আইনের অন্তর্গত সার্টিফিকেটের উপরে নির্ভর করত সেই খাজানা অপ্রকৃত রূপে পাওয়ার কথা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে।

পরে তর্কিত হইয়াছে যে, যে যেহেতু গোপীনাথের মৃত্যুর অল্প কাল পরেই এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সেই সময়ের খাজানা আদায় হইতে পারে নাই, সুতরাং মোস্তাহেমদারও প্রকৃতরূপে কোন খাজানা ভোগ করিতে পারে নাই। কিন্তু নিম্ন আদালত বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোস্তাহেমদার খাজানা পাইয়াছে; এবং পক্ষান্তরে, ঐ সময় অতি অল্প হইলেও তাহার মধ্যে যে মোস্তাহেমদার কোন খাজানা পায় নাই, এমত প্রদর্শিত হয় নাই।

চতুর্থ হেতু এই যে, ঠিকাদার যে, ২৭ আইনান্তর্গত কার্য্যের কথা অবগত ছিল এবং সে যে, মোস্তাহেমদারের জন্য মোকদ্দমা চালাইতেছিল তাহার প্রমাণ আছে; অতএব এমত বলা যাইতে পারে না যে, ঐ খাজানা লওয়া ও দেওয়া প্রকৃত হইয়াছিল।

প্রথমতঃ, তাহাই যে সত্য কথা, এমত আমাদের নিকট প্রদর্শিত হয় নাই; কিন্তু তাহা হইলেও আমরা বিবেচনা করি যে, এই আপত্তি উৎকৃষ্ট নহে। আমরা পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি যে, সমুদায় তর্কের সার মর্ম্ম এই যে, যেহেতু বাদী ২৭ আইন মতে সার্টিফিকেট পাইয়াছে, অতএব সে ভিন্ন অন্য কেহ খাজানা পাইলে তাহা সরল ভাবে লওয়া গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের বিধান এই যে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রাপ্য আদায় করার জন্য মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট দিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির দায়াধিকারিত্ব স্বত্বের বিচার করার জন্য তাহাতে কোন বিধান নাই। মৃত ব্যক্তির ঋণিগণ তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করাই ঐ আইনের মূল উদ্দেশ্য।

দুই নিম্ন আদালতই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, মোস্তাহেমদার বাস্তবিক খাজানা পাইয়াছে, এবং নিম্ন আপীল-আদালত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ খাজানা প্রকৃত প্রস্তাবে অর্থাৎ সরল ভাবেই লওয়া হইয়াছে, এবং তাহার বিরুদ্ধে কিছু প্রদর্শিত হয় নাই।

এমত অবস্থায়, আমি এই সকল নির্দ্দেশের প্রতি হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ দেখি না; অতএব আমি খরচা সমেত এই আপীল ডিস্‌মিস করিলাম।

বিচারপতি মার্কবি।—আমারও ঐ মত। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই প্রকার মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা পায়, সেই ব্যক্তিই দখল রাখিতে স্বত্ববান্। এই স্বত্ব ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারায় প্রদত্ত হইয়াছে। জজ সার্টিফিকেটের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা বিশুদ্ধ হউক বা না হউক, তাহা কার্য্য-কারক নহে, কারণ, সার্টিফিকেটের দ্বারা যে স্বত্বই প্রদত্ত হউক, যে ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা পাইয়া থাকে, সে ভিন্ন ৭৭ ধারামতে আর কেহ জয়ী হইতে পারে না। স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় মোস্তাহেমদার প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা পাইত, এবং সে যে প্রকৃত প্রস্তাবে খাজানা পাইত না, তাহা কিছুতেই প্রদর্শিত নাই।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে আমি সম্মত হইলাম। (গ)

---

২২ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং ই, জ্যাক্সন।

১৮৬৯ সালের ১২৮ নং মোকদ্দমা।

পাবনার ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ১২ ই মার্চের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

মহারাণী ব্রজসুন্দরী দেবী (বাদিনী) আপেলাণ্ট।

মেৎ গর্ডন, ষ্টুয়ার্ট কোম্পানির পক্ষে মেৎ কলিন্‌স্ (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী আপেলাণ্টের উকীল।

মেৎ জে, এস, রচফোর্ট এবং বাবু মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন একরার-নামায় এমন লেখা থাকে যে, এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক পক্ষের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে; তাহাতে যদি সেই পক্ষ সেই সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদন করিতে ত্রুটি করে, এবং সেই ত্রুটি সত্ত্বেও যদি প্রতিপক্ষ সেই চুক্তির উপকার লাভ করিতে থাকে, তবে ঐ প্রতিপক্ষকে সেই চুক্তি সম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য অবশ্য সম্পাদন করিতে হইবে; এবং সকল স্থলে ঐ চুক্তি অনুযায়ী ঠিক কার্য্য করা দুঃসাধ্য হইলেও, যত দূর সাধ্য ঐ চুক্তির সর্ত্ত সকল প্রতিপালন করিতে হইবে।

বিচারপতি নর্ম্যান।—প্রতিবাদীরা বাদিনীর নিকট অন্যান্য সম্পত্তির সহিত চর তারাপুরের ।৷৵০ আনা অংশ অগ্রিম ৫৫০০ টাকা প্রদান করত ১২৭৩ সাল হইতে ১২৭৮ পর্য্যন্ত ৬ বৎসরের ইজারা লইয়া কবুলিয়ৎ দেয়। পাট্টা এই, যথা, "তোমরা ১৫০১ টাকায় ১২৬৬ সাল "হইতে ১২৭২ সাল পর্য্যন্ত ৭ বৎসরের ইজারা "লইয়া দখীলকার আছ। সেই ইজারার মিয়াদ "গত হওয়াতে পূর্ব্ব জমার উপরে ২৫২ টাকা "অর্থাৎ বার্ষিক ১৭৫১ টাকা জমা ও অগ্রিম "২৫০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া পুনরায় ইজারা "লওয়ার প্রার্থনা করিয়াছ। অতএব আমি "তোমাদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া বার্ষিক "১৭৫১ টাকা জমায় ১২৭৩ সাল হইতে ১২৭৮ "সাল পর্য্যন্ত ইজারা দিলাম, এবং তোমাদের "নিকট অগ্রিম ২৫০০ টাকা পাইলাম। তোমরাও "এই সকল সর্ত্তে সম্মত হইয়া এক কবুলিয়ৎ "দস্তখত করত আমাকে দিয়াছ। নীচের লিখিত "কিস্তিবন্দী অনুযায়ী তোমাদের বৎসর বৎসর "খাজানা দিতে হইবে।" (টীকা-কিস্তিবন্দীতে ১৭৫১ টাকার কিস্তি লেখা আছে।) "তোমরা "যদি কিস্তী-খেলাফ কর, তবে আইন অনুসারে "তোমাদের সুদ ও খেসারত দিতে হইবে। মহা- "লের জোতদারের মধ্য হইতে তোমরা ৫ টী "জোত ক্রয় করিয়া ১২৭২ সালের ২৩ এ ফাল্গুণ "তারিখে এক একরার লিখিয়া দিয়াছ যে, "জোতের ভূমি সমস্ত পরগণার চলিত নলে "ও নিরিখে জরীপ জমাবন্দী হইবে। মহাশয়ের "নিয়োজিত আমীনের সহিত ঐক্য হইয়া পাট্টার "তারিখ হইতে ১২৭৩ সালের ৩০ এ ফাল্গুণ "তারিখ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরগণার "চলিত রসীর দ্বারা উক্ত জোতের ভূমি সমস্ত ও "ঐ মহালের সর্ব্বপ্রকার ভূমির জরীপ হইবে। "এবং পতিত ও আবাদের গরলাএক ভূমি বাদে "বাকী ভূমি পরগণার নিরিখে জমাবন্দী হইয়া, "তোমাদের হিস্যার উক্ত ১৫০১ টাকার উপরে "যে বর্দ্ধিত জমা স্থির হইবে, তাহার অর্দ্ধাংশ "তহসীলের খরচা বাদে তোমরা ইজারার মিয়াদ "পর্য্যন্ত পাইবে। বাকী অর্দ্ধেক তোমরা কবু- "লিয়ৎ দিয়া ইজারার মিয়াদ পর্য্যন্ত আমার "সরকারে দিবে। এবং যদি ঐ জরীপ জমা- "বন্দীতে স্থিরীকৃত ১৭৫১ টাকা জমার ন্যূন "হয়, তবে তোমরা ঐ কমির মিনাহী পাইবে। "জরীপ জমাবন্দীর খরচ তোমরা এবং আমি "সমান অংশে দিব। যদি ঐ ৩০ এ ফাল্গুণের "মধ্যে মহালের সকল রকমের ও উক্ত জোতের "ভূমি জরীপের পরে নোটিস জারী হইলে, "উপরিউক্ত প্রকারে কোন বেশী হয়, এবং "তোমরা ঐ বেশীর জন্য নূতন ডৌল ও কবুলিয়ৎ "না লিখিয়া দেও, তবে উক্ত সময়ের পরে আমি "কালেক্টরকে অবগত করিয়া ১ মাসের মধ্যে "উক্ত বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ৎ দেওয়ার জন্য

"তোমাদের উপরে নোটিস জারী করিব। যদি "তাহার পরেও ঐ নোটিসের লিখিত সময়ের মধ্যে "তোমরা কবুলিয়ৎ দাখিল না কর, তবে এই "পাট্টার সর্ত্ত সমস্ত বাতিল হইবে, এবং তোমা- "দের প্রদত্ত অগ্রিম টাকা সুদ সমেত তোমাদিগকে "ফেরৎ দেওয়া যাইবে, এবং যদি তোমরা "তাহা লইতে অস্বীকার কর, তবে আমি তাহা "দেওয়ানী আদালতে জানাইব, এবং ১৫ দিবসের "মধ্যে ঐ টাকা লওয়ার জন্য তোমাদের নামে "নোটিস জারী করিয়া আমি এই মহাল খাস "দখলে আনিয়া স্বয়ং খাজানা আদায় করিব।"

বাদিনী তদনন্তর বলেন যে, ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ৯ ধারা মতে জরীপ হইয়া ৭৪৪০/২॥ বিঘা ভূমির উপরে ৫৭৩৩/৬ টাকা জমা ধার্য্য হয়, এবং নির্দ্ধারিত ১৫০১ টাকা এবং প্রতিবাদিগণের অর্দ্ধেক হিস্যা বাদে প্রতিবাদিগণের নিকট বার্ষিক ২১১৬৯ টাকা খাজানা প্রাপ্য হয়, এবং তদনুযায়ী কবুলিয়ৎ দেওয়ার জন্য প্রতিবাদিগণের উপরে বারম্বার নোটিস জারী হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তাহা দিতে অস্বীকার করিয়াছে। বাদিনী ঐ হারে তাঁহার ৭৯৩৫॥/৯ টাকা খাজানা পাওয়ানা আছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

প্রতিবাদিগণ তাঁহাদের বর্ণনা-পত্রে বলিয়াছেন যে, কবুলিয়তের এক সর্ত্ত এই যে, জরীপ ১২৭৩ সালের ৩০ এ ফাল্গুণের মধ্যে সমাপ্ত করিতে হইবে, অতএব ঐ ৩০ এ ফাল্গুণের পরে বাদিনীর জরীপ করার কোন স্বত্ব ছিল না।

ডেপুটি কালেক্টর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বাদিনী ১২৭৩ সালের মাঘ মাসের শেষে জরীপ আরম্ভ করেন, এবং কোন্ হাতের মাপে জরীপ হইবে, তদ্বিষয়ে বাদিনী ও প্রতিবাদীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় কালেক্টর প্রতিবাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করত ঐ বিরোধ ভঞ্জন করেন। ৩০ এ ফাল্গুণের পরে জরীপ সমাপ্ত হয়।

এই সকল বৃত্তান্তের উপরে ডেপুটি কালেক্টর বলেন যে, বাদিনী কর্ত্তৃকই ঐ চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হয় এবং বাদিনী "সরলা" নহেন; এবং পরগণার মাপের যে নল প্রচলিত, নহে, তাহা দিয়া বাদিনীর জরীপ আরম্ভ করার চুক্তি ছিল না, এবং বাদিনীর জরীপ জমাবন্দী করার কোন ক্ষমতা ছিল না; এবং যেহেতু বাদিনীই ঐ বিরোধের হেতু হইয়াছিলেন, অতএব ৩০ এ ফাল্গুণের পরে তিনি যে জরীপ জমাবন্দী করেন, তাহা অসিদ্ধ, কারণ, তাহা চুক্তির বিরুদ্ধ, এবং এই অনিয়মিত জরীপ জমাবন্দীর দ্বারা প্রতিবাদিগণ বাধ্য নহেন। তিনি তদনন্তর বলেন যে, "চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গের দ্বারা চুক্তির বিষয় রহিত হইয়াছে;" অতএব তিনি নালিশ ডিস্‌মিস করেন।

এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ "অসরলা" বাদিনী এই আদালতে আপীল করিয়াছেন। একরার পাঠ করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, জরীপের পরে এক নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে যে খাজানা স্থির হইবে, সেই খাজানায় ৭ বৎসরের জন্য প্রতিবাদিগণ কতিপয় সম্পত্তির ইজারা লইয়াছেন। পক্ষগণ অনুমান করিয়া লইয়াছেন যে, জরীপ ৩০ এ ফাল্গুণ পর্য্যন্ত হইবে, এবং তাঁহারা একরার করিয়াছেন যে, ঐ সময়ের মধ্যেই জরীপ সমাপ্ত হইবে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাদিনী জরীপ সমাপ্ত করিতে অকৃতকার্য্য হওয়াতে, প্রতিবাদিগণ ঐ ইজারা ছাড়িয়া দিবার অথবা চুক্তি একেকালে অন্যথা করার দাবী করেন নাই; বরং তাঁহারা ভূমিতে দখীলকার থাকিয়া পাট্টার লিখিত মিয়াদ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ভূমি দখল করার স্বত্ব স্থির থাকা জ্ঞানে কার্য্য করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দৈবাৎ জরীপ সমাপ্ত না হইলে, পক্ষগণের যে ইহাই মনস্থ ছিল যে, প্রতিবাদিগণ নির্দ্দিষ্ট জমা না দিয়া ৭ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমি ভোগ করিবে, ইহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত না থাকিলে, আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না।

ইহা সত্য বটে যে, এই স্থলে জরীপ সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এক খাজানা দেওয়ার কথা

একরারে লেখা আছে, কিন্তু প্রতিবাদিগণের তর্ক যদি উৎকৃষ্ট হয়, তাহা ঐ একরার না থাকিলেও সমতুল্য রূপে উৎকৃষ্ট হইত। এবং ডেপুটি কালেক্টরের রায় বিশুদ্ধ হইলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরীপ সামাধা না হওয়াতে, প্রতিবাদিগণ পাট্টার লিখিত সমুদায় মিয়াদ পর্য্যন্ত কর না দিয়া ভূমি ভোগ করিবার দাবী করিতে পারেন। জরীপ সমাধার বিলম্ব হওয়াতে যে, প্রতিবাদিগণের কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইয়াছে, এমত বলা সুকঠিন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জরীপ সমাধা না হইলে কি হইবে, তাহা একরারে লেখা নাই।

যদি কোন একরারে এমন সর্ত্ত থাকে যে, এক পক্ষের দ্বারা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কার্য্য সম্পাদিত হইবে, এবং সেই পক্ষ যদি সেই সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদন করিতে ত্রুটি করে, তবে এমন অনেক স্থল আছে যাহাতে প্রতিপক্ষ ঐ চুক্তির দায় হইতে নিজে মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যদি সে ঐ চুক্তির ফল লাভ করাই পছন্দ করে, তবে ঐ চুক্তিতে তাহার নিজের কর্ত্তব্য অংশ তাহার নিঃসন্দেহই সম্পাদন করিতে হইবে। এমন সকল স্থলে মুল চুক্তির সকল সর্ত্ত অবিকল সম্পাদন করা দুঃসাধ্য হইলেও যথাসাধ্য তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে।

পক্ষগণের প্রকৃত মনস্থ অনুসারে এই চুক্তি প্রবল করিতে হইলে, আমি বিবেচনা করি যে, জরীপ করিবার সময় সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে তাহা কেবল একরার মাত্র, সর্ত্ত নহে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এক কার্য্য প্রথমে যে প্রকারে সম্পাদিত হওয়ার কথা ছিল তাহা অবিকল সেই প্রকারে সম্পাদিত হয় নাই বলিয়াই, প্রতিবাদিগণ এমন কথা বলিতে পারেন না যে, চুক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে।

দোষগুণের উপরে বিচারিত হওয়ার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবে। প্রতিবাদিগণ এই আপীলের খরচা দিবেন। নিম্ন আদালতে পূর্ব্ব বিচারের খরচা মোকদ্দমার নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে। (গি)

---

২৮ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

১৮৭০ সালের ১১১ নং মোকদ্দমা।

মুরশিদাবাদের জজ তত্রত্য ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ১৬ ই জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৮ ই ডিসেম্বরে যে নিষ্পত্তি করেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

গুরুপ্রসাদ রায় (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায়, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মহেন্দ্রলাল শীল, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বিচারাদিষ্ট দায়ীর আপন অধীন প্রজার নিকট প্রাপ্য কর পাওয়ার স্বত্ব, ঐ দায়ীর বিরুদ্ধে জমিদারের ১৮৫৯ সালের ১০ আইনান্তর্গত বাকী করের ডিক্রীজারীতে কালেক্টর নীলাম করিতে পারেন।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের কার্য্য সাধনার্থে কর, "সম্পত্তি" এবং "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দের মর্ম্মান্তর্গত।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এ খাস আপীলে এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, অধীন প্রজার নিকট দায়ীর যে কর প্রাপ্য থাকে, তাহা পাওয়ার স্বত্ব, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে বাকী করের ডিক্রীজারীতে কালেক্টরের নীলাম করিবার ক্ষমতা আছে কি না।

উপস্থিত মোকদ্দমায় জমিদার তাহার পাট্টাগৃহীতা বিবী রবিনসনের বিরুদ্ধে ডিক্রী পায়, এবং ঐ বিবীর অধীন প্রজা গুরুপ্রসাদ রায়ের নিকট ঐ বিবীর কর পাওয়ার যে স্বত্ব ছিল তাহা ঐ ডিক্রীজারীতে নীলাম করায়।

উভয় নিম্ন আদালত স্থির করেন যে, যখন ঐ নীলাম হয়, তখন গুরুপ্রসাদ রায়ের নিকট বিবী রবিন্‌সনের কর প্রাপ্য ছিল; অতএব এক মাত্র প্রশ্ন এই যে, ১০ আইনান্তর্গত ডিক্রীজারীতে কালেক্টর যে নীলাম করেন সেই নীলামক্রেতার করের দাবীতে নালিশ করিবার স্বত্ব জন্মে কি না।

জজ স্থির করেন যে, তাহা জন্মে না; কিন্তু আমার বোধ হয় যে, জজের ইহাতে ভ্রম হইয়াছে, এবং বিধিমতেই নীলাম হইয়াছে এবং তাহা সিদ্ধ।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৮৬ ধারার স্থলে বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের ১৭ ধারা সংস্থাপিত হয়, এবং উক্ত ধারায় বিধিবদ্ধ হয় যে "ডিক্রীজারীর পরওয়ানা "বিচারাদিষ্ট দায়ীর শরীর বা সম্পত্তির উপর "জারী হইতে পারিবে, কিন্তু তাহার শরীর ও "সম্পত্তি এ উভয়ের উপর এককালে জারী "হইবে না।" এবং ১০ আইনের ৮৭ ধারায় বিধিবদ্ধ হয় যে, "ডিক্রীজারীতে যে কিছু "অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আবশ্যক "হয়, ডিক্রীদার যদি পারে তবে সেই সম্পত্তির "এক ফর্দ্দ লিখিয়া দাখিল করিবে।" তৎপরে "ঐ ধারায় লেখা আছে যে, "পরওয়ানা জারী "করিবার ভার যে কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পিত হয় "তাহাকে ডিক্রীদার বা তাহার এজেণ্ট ক্রোক "হইবার সম্পত্তি দেখাইয়া দিবে।"

অতএব প্রশ্ন এই যে, প্রাপ্য কর ঋণ স্বরূপ হওয়ায়, "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দদ্বয়ের মধ্যে গণ্য কি না।

আমি দেখিতে পাই যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইন যাহা ১০ আইনের কিছু কাল পূর্ব্বেই জারী হয়, তদনুসারে, যে ব্যক্তি ডিক্রীর টাকার নিমিত্ত দায়ী তাহার নিকট বিচারাদিষ্ট দায়ীর যে টাকা প্রাপ্য তাহা, যে যে প্রকারের সম্পত্তি ক্রোক এবং নীলাম হইতে পারে তাহার মধ্যে গণ্য, এবং তাহা স্পষ্টই অস্থাবর সম্পত্তি রূপে শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। ইহা অতি অসম্ভব যে, ব্যবস্থাপক সমাজ এক সময়ে যে ১৮৫৯ সালের ৮ আইন এবং ১০ আইন জারী করেন তাহার এক আইনে অস্থাবর সম্পত্তি শব্দে ঋণাদি ধরিবেন এবং অপর আইনে তাহা ধরিবেন না। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনাপেক্ষা ৮ আইনে ক্রোক এবং নীলামের বিধান বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ৮ আইনের বহুতর ধারায় উক্ত বিষয় সম্বন্ধে যে বিস্তারিত বিধান আছে তাহা ১০ আইনের দুই এক ধারার মধ্যেই সংকলিত হইয়াছে।

স্বীকৃত হইয়াছে যে, ভূম্যধিকারী আপন কর পাইবার স্বত্ব তৃতীয় এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারে, এবং উক্ত ব্যক্তি ঐ বিক্রয় অনুসারে ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে এই করের দাবীতে নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিয়া লইতে পারে। তাহা হইলে আমাদের এই সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হইতে অধিক কষ্ট হয় না যে, যাহা ভূম্যধিকারী স্বয়ং ঘরাও বিক্রয় করিতে পারে, তাহা কালেক্টরও অস্থাবর সম্পত্তি স্বরূপে নীলাম করিতে পারেন।

আমাদের নিকট ১০ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২২৪—২২৮ পৃষ্ঠায় প্রচারিত নিষ্পত্তির * বিশেষ উল্লেখ হইয়াছে; এবং তর্ক করা হইয়াছে যে, আদালত এই সংস্থাপন করেন যে, কোন মোকদ্দমায় দায়ীর যে স্বত্ব থাকে, তাহা কালেক্টর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনান্তর্গত ডিক্রী জারীতে নীলাম করিতে পারেন না।

আমি দেখিতেছি যে, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল অদ্য আমাদের নিকট যত দূর তর্ক করেন আদালতের ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে কিছুতেই তত দূর বলা হয় নাই। উক্ত মোকদ্দমায় বলা হইয়াছে যে, "প্রার্থীরা তাহাদের মৃত খুল্লপিতামহ "রুক্মীনাথ ভট্টাচার্য্যের দায়াধিকারী হইয়া

* বাঃ সাঃ রিঃ, তৃতীয় ভাগ, দেওয়ানী নিষ্পত্তি, ২০৫—২১০ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"কতিপয় স্থাবর সম্পত্তির দখল পাওয়ার জন্য "২, ৩, এবং ৪ নং প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে এই "জেলার সদর আমীনের আদালতে ১৮৬৬ "সালের ১৪০ নং মোকদ্দমা উপস্থিত করে। "উক্ত মোকদ্দমা চলিবার সময়ে ২, ৩ এবং ৪ "নং প্রতিবাদী বাকী খাজানার জন্য প্রার্থি- "গণ ও তাহাদের অন্যান্য শরীকগণের নামে "ঐ জেলার কালেক্টরীতে ১৮৬৬ সালের ৬৮৯ "নম্বরের এক মিথ্যা নালিশ উপস্থিত করিয়া "প্রার্থিগণের অজ্ঞাতসারে ১৮৬৬ সালের ২৪ এ "ফেব্রুয়ারি তারিখে একতরফা ডিক্রী পায় ও "সেই ডিক্রীজারীতে তাহারা প্রার্থিগণের উক্ত "১৪০ নং মোকদ্দমার স্বত্ব গোপনে ও আইন- "বিরুদ্ধ রূপে ক্রোক ও নীলাম করিয়া তাহাদের "ভাগিনেয় ১ নং প্রতিবাদীর নামে বেনামী "করিয়া অতি অল্প মূল্যে অর্থাৎ ৬০ টাকায় "তাহা ১৮৬৬ সালের ২ রা এপ্রিল তারিখে "ক্রয় করে। ইহাতে ভবিষ্যতে অনেক বিরোধ "উপস্থিত হইতে পারে; অতএব প্রার্থিগণ উক্ত "প্রবঞ্চকতা-মূলক ও অন্যায় নীলাম অন্যথা করিয়া "তাহাদের স্বত্ব স্থির রাখার জন্য এই নালিশ "উপস্থিত করিতেছে।"

অতএব ঐ মোকদ্দমা মাল আদালতের উক্ত নীলামের ফল হইতে নিষ্কৃতি পাইবার দাবীতে দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয়; অতএব বিজ্ঞবর বিচারপতি বলেন:—"আমাদের সমক্ষে "মোট বিচার্য্য বিষয় এই যে, বাদীর ১৪০ নং "মোকদ্দমার স্বত্বের নীলাম ঐ প্রকার স্বত্ব "নীলাম করার ক্ষমতা-বিশিষ্ট আদালতের দ্বারা "হইয়াছে কি না।" তদনন্তর, কোন্ কোন্ বৃত্তান্ত অত্যাবশ্যকীয় এবং ডেপুটি কালেক্টর কি করেন তাহা দর্শাইয়া, আদালত বলেন:—"অতএব "মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির "স্বত্ব ও লাভ" "সম্পত্তি সম্বন্ধীয় হউক বা না হউক, তাহা ডেপুটি "কালেক্টর নীলাম করিতে পারেন কি না, এ "বিষয়ের এক্ষণে বিচার করিতে হইবে। তজ্জন্য "১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিধানমতে কালে- "ক্টরের প্রতি যে নীলাম করার ক্ষমতা প্রদত্ত "হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।" এই "বিষয়ে প্রথম ৮৬ ধারায় বিধি আছে, এবং "দ্রষ্টব্য কারণের জন্য তাহাতে অতি সাধারণ "বাক্যগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিচারাদিষ্ট "'দায়ীর শরীর অথবা সম্পত্তির উপর ডিক্রী- "'জারী হইতে পারে।' কি প্রকার সম্পত্তির "বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হইবে, তাহা এ স্থানে বিশেষ " করিয়া লেখা নাই, কারণ, আইনে যে প্রকার "সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করার অনুমতি "প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক প্রকার "সম্পত্তি সম্বন্ধে কি রূপে ডিক্রীজারী করিতে "হইবে, তাহা পশ্চাতে বিশেষ রূপে লিখিত "হইয়াছে। এ স্থলে কেবল সাধারণ "সম্পত্তি" "শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার অব্যবহিত "পশ্চাতের ধারা সমস্তে দায়ীর অস্থাবর সম্প- "ত্তির উপর কি রূপে ডিক্রীজারী হইবে, তাহা "লেখা আছে এবং তফসীলের লিখিত প্রণা- "লীতে ডিক্রীজারী হইবে, এই কথা ৮৬ ধারার "শেষ ভাগে লেখা আছে। সেই প্রণালী ইংরেজী 'ভাষায় লেখা আছে। ঐ প্রণালী যদিও সংক্ষেপ "তথাপি তাহা আমি পাঠ করিব না; কিন্তু "আমি দেখাইতে ইচ্ছা করি যে, অস্থাবর "সম্পত্তি ধৃত করিয়া আদালতের হুকুম প্রতি- "পালন করিতে নাজীরের প্রতি আদেশ আছে। "অতএব আমার বিবেচনায় আইনে ঐ প্রকার "অস্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিতে "অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা হস্ত দ্বারা ধৃত "হইতে পারে।" এবং পরিশেষে আদালত বলেন:—"অতএব সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া "দেখা গেল যে, ডেপুটি কালেক্টর ১৮৫৯ "সালের ১০ আইনের মর্ম্মানুসারে টাকার "ডিক্রীজারীতে কেবল এমত অস্থাবর সম্পত্তি "নীলাম করিতে পারেন যাহা হস্ত দ্বারা ধৃত "হইতে পারে, এবং আমি যে প্রকার অস্থাবর

"সম্পত্তির কথা কহিলাম, সেই প্রকার অস্থা-
"বর সম্পত্তি অথবা দায়ীর শরীরের উপর
"ডিক্রীজারী করিতে না পারিলে, ডেপুটি কালেক্
"টর যে কোন প্রকারের হউক, স্থাবর সম্পত্তির
"উপর ডিক্রীজারী করিতে পারেন।" বিচার-
পতি ফিয়ার যিনি আদালতের রায় প্রদান
করেন, তিনি পরে বলেন, "বিচারাসনে বসিয়া
"আমি এ কথা বলিতে চাহি না যে, যে শব্দ
"প্রয়োগ দ্বারা মোকদ্দমাকে বিক্রয় বা হস্তান্তরের
"মূল বিষয়ে অতি আবশ্যকীয় করিয়া তোলে,
"তদনুসারে যে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত
"হয়, তাহা বিক্রীত অথবা হস্তান্তরিত হইতে
"পারে না। যেমন, এ স্থলে কালেক্টর এ প্রকার
"শব্দগুলি ব্যবহার করিতে পারিতেন, যে, 'যে
"'সম্পত্তি লইয়া ১৪০ নং মোকদ্দমা উপস্থিত
"'হইয়াছে, তাহাতে বিচারাদিষ্ট দায়ীর স্বত্ব
"'ও লাভ।' তিনি এমন কথা ব্যবহার করিতে
"পারিতেন, যদ্দ্বারা বাদিগণ বাস্তবিক যে স্থাবর
"সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য নালিশ করিয়া-
"ছিল তাহা সঙ্গত রূপে বুঝা যাইতে পারিত।
"যদি তিনি তাহা করিতেন এবং স্থাবর সম্পত্তি
"নীলাম করার যে প্রণালী আছে, তাহা অব-
"লম্বন করিতেন, তাহা হইলে (অবশ্য ইহা
"স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, 'স্থাবর সম্পত্তি
"নীলাম করার জন্য যে ঘটনার আবশ্যক, তাহা
"হইয়াছিল) তিনি নিঃসন্দেহই স্থাবর সম্পত্তি
"এবং তাহার সহিত মোকদ্দমার স্বত্বও নীলাম
"করিতে পারিতেন।"

রেস্পণ্ডেণ্টগণের উকীল বাবু মহেন্দ্রলাল শীল আমাদের নিকট ওয়ারেণের ব্লাক্‌ষ্টোনের গ্রন্থ হইতে এক বাক্য পাঠ করেন; তাহাতে কর স্থায়ী সম্পত্তি রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমার বোধ হয়, এই ব্যাখ্যান দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা হয় না। এই বলিলেই যথেষ্ট যে, আমার বিবেচনায়, কর ১৮৫৯ সালের ৮ এবং ১০ আইনের অভিপ্রায় সাধনার্থে "সম্পত্তি" এবং "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দের অন্তর্গত। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, কালেক্টর এই সকল কর নীলাম করিতে পারেন; সুতরাং উক্ত নীলামের ক্রেতা কর পাইবার বিধিমত স্বত্ব পাইয়াছে, এবং সে মোকদ্দমা চালাইতে পারে, অতএব কর প্রাপ্য থাকায় সে ডিক্রী পাইতে পারে। অতএব আমার বিবেচনায়, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি খরচা সমেত রহিত হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

৪ ঠা মে, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

১৮৭০ সালের ৩৭০ নং মোকদ্দমা।

মুরশিদাবাদের ডেপুটি কালেক্টরের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ নবেম্বরের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৭০ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারিতে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

উদয়নারায়ণ সরকার (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক! ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় যদি প্রতিবাদী বাদীর এজেণ্ট থাকা অস্বীকার করে, তবে পক্ষগণের মধ্যে মওক্কেল ও এজেণ্টের সম্পর্ক আছে কি না, তাহা কালেক্টর বিচার করিতে বাধ্য। ঐ সম্পর্ক থাকিলেই কালেক্টরের বিচারাধিকার থাকে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বোধ হয় যে, নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি যে আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট নহে।

তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৩৩ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমায় যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর এজেণ্ট থাকা অস্বীকার করে এবং বলে যে, সে নিজে ঐ ভূমির মালিক, সে স্থলে যদি মোকদ্দমার অবস্থায় দেখা যায় যে, তাহাই প্রতিবাদীর প্রকৃত জওয়াব, তবে মাল আদালতের মোকদ্দমা হইতে হস্ত উঠাইয়া লইয়া পক্ষগণকে দেওয়ানী নালিশ করিতে বলা উচিত। কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, এই তর্ক কর্ম্মণ্য নহে।

আমার বোধ হয় যে, কালেক্টরের বিচারাধিকার আছে কি না, তাহা নির্ণয় করার জন্য পক্ষগণের মধ্যে মওকেকল এবং এজেণ্টের সম্পর্ক আছে কি না, তিনি তাহার তদন্ত ও বিচার করিতে বাধ্য, ও সক্ষম। যদি ঐ সম্পর্ক থাকে, তবে, তাঁহার ঐ মোকদ্দমার বিচার করার অধিকার আছে, এবং যদি তিনি দেখেন যে, প্রতিবাদী নিকাশ দেয় নাই, তবে তাঁহার ডিক্রী দেওয়া উচিত। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, খরচা সমেত এই খাস আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(গ)

---

৮ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১৫৪০ নং মোকদ্দমা।

গয়ার অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ৮ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রিলে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

লালা শ্যামসুন্দর (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

সুর্য্যলাল প্রভৃতি (বাদী) এবং অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর টি এলেন ও বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ বসু ও বুধসেন সিংহ, আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও কালীমোহন দাস, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বিচারপতি নর্ম্যানের মতে, ডেপুটি কালেক্টর ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২২ ধারা দৃষ্টে এমত নির্দ্দেশ করিয়া এক মোকররী পাট্টা অন্যথা করত খাজানার যে ডিক্রী প্রদান করেন যে, ঐ পাট্টা দ্বারা স্থায়ী এবং হস্তান্তর-যোগ্য স্বত্ব সৃষ্ট হয় নাই, সেই ডিক্রী ভ্রমাত্মক হইলেও তাহা বাতিল এবং বিচারাধিকার-বহির্ভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী জারী না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ জমা রহিত হয় না।

বিচারপতি নর্ম্যান।—এক বন্ধক মুক্ত করার জন্য এবং মৌজা সাঁধ মাজগাওয়ান তুক্ত কয়েক ভূমিখণ্ড যাহা পূর্ব্বে এক মোকররী পাট্টামতে দখলীকৃত ছিল তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বাদী হিম্মত বাহাদুর প্রভৃতি এই নালিশ বন্ধক-গৃহীতা সেবালাল এবং জমিদার শ্যামসুন্দরের বিরুদ্ধে উপস্থিত করে, এবং কহে যে, উক্ত জমিদার উক্ত বন্ধক-গৃহীতার সহিত যোগসাজস করিয়াছে।

নিম্ন আপীল-আদালত বন্ধক-গৃহীতা সেবালালের বিরুদ্ধে ডিক্রী দিয়াছেন, এবং সে তাহার বিরুদ্ধে আপীল করে নাই।

শ্যামসুন্দরের জওয়াব এই যে, সে বাদীর পূর্ব্বপুরুষ পোক্ষণলালের এবং বন্ধকগৃহীতা সেবালালের বিরুদ্ধে খাজানার এবং মোকররী জমা অন্যথা করার এক ডিক্রী পাইয়াছে এবং সেই ডিক্রী জারীতে সে ১৮৬২ সালে দখল পাইয়া তদবধি দখীলকার আছে।

অধঃস্থ জজ নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন।

আপীলে জজ মেং লোইস প্রথম আদালতের ডিক্রী অন্যথা করত শ্যামসুন্দরের বিরুদ্ধে বাদীকে দখলের এক ডিক্রী দিয়াছেন। তিনি তাঁহার রায় এই বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন যে, "বাদীর

বিরুদ্ধে সপষ্ট প্রতারণা এবং ষড়যন্ত্র হওয়াতেও যে, প্রধান সদর আমীন বাদীর দাবী ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন, এতদ্দৃষ্টে আদালত চমৎকৃত হইয়াছেন, অতএব তাহা অন্যথা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, "বাদীকে দুই প্রতিবাদীর অথবা তাহার মধ্যে এক জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত করিতে এই আদালত অনুমতি দিলেন।" এই নিষ্পত্তি অসন্তোষকর। জজের সিদ্ধান্ত অতি অসঙ্গত হইয়াছে, এবং প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষিত নহে।

বন্ধক-গৃহীতার বিরুদ্ধে বন্ধক-দাতার বন্ধক উদ্ধার এবং বন্ধকী সম্পত্তির দখল পাওয়ার নালিশের সহিত, জমিদার অথবা উচ্চতর কোন মালিকের বিরুদ্ধে মোকররী-পাট্টাদার ঐ পাট্টার অন্তর্গত ভূমির দখল পাওয়ার জন্য যে নালিশ উপস্থিত করে, তাহার প্রভেদ আছে। সপষ্টই দেখা যায় যে, বন্ধক-গৃহীতার সহিত যোগ-সাজস করার অভিযোগ জমিদারের বিরুদ্ধে উপস্থিত না হইলে, বন্ধক-গৃহীতার বিরুদ্ধে বন্ধক উদ্ধারের নালিশে জমিদারের কোন সংস্রব নাই, এবং তাহাকে তাহাতে প্রতিবাদীও করা যাইতে পারে না।

বন্ধক-দাতাকে বঞ্চনা করার জন্য প্রতিবাদী শ্যামসুন্দর সেবালালের সহিত যোগসাজস করিয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে এক ইসু করা উচিত ছিল। এবং তজ্জন্য এই তদন্তের আবশ্যক হইবে যে, নালিশ উপস্থিত হওয়ার কালে ও তৎপূর্ব্বে সেবালাল তাহার বন্ধক-গৃহীত সম্পত্তিতে দখীলকার ছিল কি না।

এই সকল ইসু প্রথম আদালতে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল এবং তথায় উত্থাপিত হইয়া যদি এমত নির্দ্দিষ্ট হইত যে, শ্যামসুন্দর বাস্তবিক এবং সরলভাবে তাহার নিজের জন্য সম্পত্তিতে দখীলকার ছিল, সেবালালের জন্য বেনামী দখীলকার ছিল না, তবে বর্ত্তমান নালিশ ডিস্‌মিস্ করা উচিত হইত। আমি যে ডিক্রীর উল্লেখ করিব, শ্যামসুন্দরের তদন্তর্গত স্বত্বের প্রতি আপত্তি করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হয় নাই, এই নালিশে সেই ডিক্রী এককালে অস্বীকার করা হইয়াছে।

কালেক্টরের ১৮৬২ সালের ডিক্রী, বাদীর পূর্ব্বপুরুষ পোক্ষণলালের জমা অন্যথা করার জন্য আপেলাণ্ট শ্যামসুন্দরের অনুকূল ডিক্রী। ইহা সপষ্টই ভ্রমাত্মক ডিক্রী, কারণ, ইহাতে ব্যক্ত আছে যে, পোক্ষণলালের মোকররী জমা, ভূমিতে স্থায়ি-স্বত্ব-বিশিষ্ট জমা নহে, সুতরাং তাহা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২২ ধারামতে রহিত হইতে পারে।

কিন্তু বৃত্তান্ত এবং আইন সম্বন্ধে কালেক্টরের ভ্রম হওয়ার হেতুবাদে জজ ঐ ডিক্রী অকর্ম্মণ্য এবং হুকুম বিচারাধিকার-বহির্ভূত বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমাত্মক।

প্রতিবাদী যেরূপ বলে তদ্রূপ, বিরোধীয় ডিক্রী সরল ভাবে এবং পোক্ষণলালের উপরে সমন জারী হওয়ার পরে হইয়াছিল, কি তাহা সেবালালের ও শ্যামসুন্দরের মধ্যে প্রতারণা এবং যোগসাজসের দ্বারা হয়, এই ইসুর বিচার করিতে হইবে।

ইহা এমত প্রকারের মোকদ্দমা নহে যাহাতে বন্ধক-গৃহীতা দখীলকার থাকিয়া সম্পত্তির সমুদায় উপস্বত্ব নিজে গ্রহণ করে, এবং বন্ধক চলিত থাকার কালে জমিদারের খাজানা পরিশোধ করিয়া বন্ধক-দাতার আপন রক্ষার জন্য তাহার হস্তে কিছুই আয় থাকে না।

সেবালাল বন্ধক-গৃহীতা-সূত্রে বন্ধকী সম্পত্তিতে দখীলকার থাকিলেও সে যে টাকা দিয়াছিল তাহা অতি অল্প অর্থাৎ ৪৭১ টাকা মাত্র, এবং তাহার ঠিকা জমার বাবতে পোক্ষণলালকে বার্ষিক ৪৭১ টাকা খাজানা দেয় ছিল। দেখা যাইতেছে যে, ঠিকা পাট্টায় এমন কিছু সর্ত্ত ছিল না যদ্দ্বারা সেবালাল জমিদারকে খাজানা দিতে বাধ্য ছিল, এবং পক্ষগণ এমন অবস্থাস্থিত ছিল না যে, পোক্ষণলাল তাহার আপন খাজানা দিতে ইচ্ছা করিলে তাহা সে দিতে পারিত না।

স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদীর মোকররী পাট্টায় এমন কোন সর্ত্ত ছিল না যে, খাজানা না দিলে তাহা অন্যথা অথবা বাতিল হইবে, সুতরাং ইহা বৈধ রূপে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২২ অথবা ৭৮ ধারামতে রহিত হইতে পারে না; ঐ আইনের ১০৫ ধারামতে কেবল তাহার নীলাম হইতে পারে।

ডেপুটি কালেক্টর নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, ঐ মোকররী পাট্টার দ্বারা স্থায়ী অথবা হস্তান্তর-যোগ্য স্বত্ব সৃষ্ট হয় নাই, অতএব ঐ নিষ্পত্তি ভ্রমাত্মক হওয়া সত্ত্বেও পাট্টা অন্যথা করার জন্য যদি তাহার উপরে নির্ভর করা হয়, তবে তাহার ভাব এবং ফলের প্রতি আমাদের দৃষ্টি করিতে হইবে। ঐ নিষ্পত্তিতে ব্যক্ত আছে যে, মোকররী পাট্টা দ্বারা ভূমির স্থায়ী এবং হস্তান্তর-যোগ্য স্বত্ব সৃষ্ট হয় না, অতএব তাহাতে ব্যক্ত আছে যে, ২২ ধারার বিধানমতে তাহা রহিত হইতে পারে। ২২ ধারার বিধান এই যে, এই প্রকার কোন জমা (অর্থাৎ যাহাতে জমা-গৃহীতার স্থায়ী ও হস্তান্তর-যোগ্য স্বত্ব নাই) ঐ আইনের অন্তর্গত ডিক্রীজারী দ্বারা ভিন্ন রহিত হইবে না। স্বীকৃত হইয়াছে যে, ঐ ডিক্রী কখন জারী হয় নাই এবং ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, তাহা এক্ষণে জারী করা যাইতে পারে না। অতএব ঐ ডিক্রী দ্বারা যে, ঐ জমা রহিত হইয়াছে এমত আমরা নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহি।

কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিধান ছাড়িয়া দিলেও, এমত হইতে পারে যে, বন্ধক-দাতা পোক্ষণলাল এবং বন্ধক-গৃহীতা সেবালাল জানিয়াছিল যে, জমিদারের অনেক খাজানা পাওয়ানা ছিল যাহার জন্য ঐ জমা বিক্রীত হইতে পারিত, এবং জমার নীলাম হওয়ার পরে পোক্ষণলালের অন্য সম্পত্তি ও নীলাম হইতে পারিত, এবং তজ্জন্যই তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক জমিদারের নিকট জমা পরিত্যাগ এবং ইস্তাফা করিয়াছে।

অতএব ৫ ম আর একটি ইসুর বিচার করিতে হইবে, অর্থাৎ কালেক্টরের ডিক্রী প্রদানের পরে পোক্ষণলাল, অথবা পোক্ষণলালের সম্মতি লইয়া সেবালাল ইচ্ছাপূর্ব্বক জমিদারের নিকট ঐ জমা পরিত্যাগ ও ইস্তাফা করিয়াছিল কি না।

এই মোকদ্দমা জজের নিকট ফেরৎ যাইবে; তিনি উপরিউক্ত ইসু সমস্তের উপরে প্রমাণ লইয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার রায় লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তিনি যে সকল প্রমাণ লইবেন তাহাও তৎসম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বলিত এই আদালতে নথী পুনঃপ্রেরণ করিবেন।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমার বিজ্ঞবর সহযোগী যে হুকুম দিলেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম; কিন্তু তিনি তাঁহার রায়ে যে সকল কথার উল্লেখ করিলেন, তদ্বিষয়ে এক্ষণে আমি কোন রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না। মোকদ্দমার শেষ শ্রবণ পর্য্যন্ত আমি ঐ সকল বিষয়ে আমার মত ব্যক্ত করা স্থগিত রাখিলাম। (গ)

# প্রধানতম বিচারালয়ের

## আপীল বিভাগের

# পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তি

( দেওয়ানী )

৬ ই সেপ্‌টেম্বর, ১৮৬৯।

**প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট ও বিচারপতি এইচ, বি, বেলি; এফ, বি, কেম্প; এ জি, ম্যাক্‌ফার্সন ও এফ, এ, গ্লবর।**

হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ, প্রার্থী।

কৈলাসচন্দ্র বসু, প্রতিপক্ষ।

বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ ও বৈকুণ্ঠনাথ পাল প্রার্থীর উকীল।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—যদি রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর জন্য যথোচিত দরখাস্ত হইয়া থাকে, তবে ঐ তারিখ হইতে ৩ বৎসর গত হওনার পরেও ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা মতে ডিক্রীজারী হইতে পারে। বিচারপতি বেলি ও কেম্প এই মতে অসম্মত।

বিচারপতি বেলি ও হবহৌসের নিম্নলিখিত রায় মতে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

বিচারপতি হব্‌হৌস।—এই মোকদ্দমার আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত এই যে, প্রার্থী হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ কালেক্টরের নিকট কৈলাসচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাকী খাজানার জন্য নালিশ করে।

নালিশ ডিসমিস্ হয়, এবং ১৮৬৪ সালের ৭ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে এক চূড়ান্ত হুকুম প্রদত্ত হয়, যদ্দ্বারা কৈলাসচন্দ্রকে এই মোকদ্দমার খরচা দিতে হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষের প্রতি আদেশ হয়।

১৮৬৭ সালের ১৪ ই আগস্ট তারিখে কৈলাসচন্দ্র তাহার খরচার ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে; কিন্তু তাহা চালাইবার কোন প্রকৃত কার্য্য না হইয়া ঐ দরখাস্ত ৩১ এ আগস্ট তারিখে খারিজ হয়, এবং ঐ তারিখ আমাদের আর পুনরায় উল্লেখ করার আবশ্যক নাই।

১৮৬৭ সালের ৪ ঠা সেপ্‌টেম্বরে কৈলাসচন্দ্র তাহার ডিক্রীজারী করার জন্য আর এক দরখাস্ত করে। নিয়মানুসারে নোটিস জারী হয়, এবং ১৮৬৭ সালের ৯ ই সেপ্‌টেম্বরে বিচারাদিষ্ট দায়ী উপস্থিত হইয়া এই হেতুবাদে ডিক্রীজারীর প্রতি আপত্তি করে যে, ঐ ডিক্রীজারী তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ আপত্তি অগ্রাহ্য হয়, এবং ১৮৬৭ সালের ২২ এ অক্‌টোবর তারিখে বিচারাদিষ্ট-দায়ীর সম্পত্তি ডিক্রীজারীতে ক্রোক হয়।

এই তারিখ হইতে ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত ২৪-পরগণার সদর আমীন-আদালতের ভিন্ন ভিন্ন তারিখের হুকুমের দ্বারা মাল আদালতের ডিক্রীজারীর কার্য্য স্থগিত থাকে; কিন্তু উল্লিখিত তারিখে অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারি তারিখে ঐ সকল হুকুম উঠাইয়া লওয়া হয়, এবং ১৮৬৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারি,

তারিখে কালেক্টর ডিক্রীজারীর হুকুম দেন।

১৮৬৯ সালের ১৯ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে বিচারাদিস্ট-দায়ী হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, এবং কালেক্টরের ১৮৬৭ সালের ২২ এ অক্টোবরের ক্রোকের হুকুম ও সেই ক্রোক অনুযায়ী কার্য্য করার জন্য তাঁহার ১৮৬৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখের দ্বিতীয় হুকুম কি জন্য এই হেতুবাদে রহিত হইবে না যে, ১৮৬৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বরের ডিক্রীর তিন বৎসর পরে সেই ডিক্রী জারী করিতে কালেক্টরের ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারার বিধান মতে হুকুম দেওয়ার অধিকার ছিল না; তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য কৈলাসচন্দ্রের উপর এক হুকুম প্রাপ্ত হয়।

৯২ ধারার শব্দ গুলি এই যে, "এই আইন "মতে যে ডিক্রী হয়, তাহার তারিখ অবধি তিন "বৎসর গত হইলে পর, সেই ডিক্রীজারীর "কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির হইবে না। "কিন্তু যদি পাঁচ শত টাকার অধিকের ডিক্রী "হয়, তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী "করিবার মিয়াদের যে সাধারণ বিধি চলন "আছে, তদনুসারে ঐ ডিক্রীজারী করিবার মিয়া- "দের বিধি হইবে।"

প্রার্থী হৃদয়কৃষ্ণ ঘোষের পক্ষে আমাদের সমক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, ঐ আইনের ৯২ ধারার বাক্য-গুলি চূড়ান্ত; এবং যেহেতু রায়ের তারিখ ১৮৬৪ সালের ৭ ই সেপটেম্বর, অতএব ১৮৬৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর হইতে তিন বৎসর পরে সেই রায়ের উপরে ডিক্রীজারীর কার্য্য হইতে পারে না।

ডিক্রীদার কৈলাসচন্দ্র বসুর পক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, ঐ আইনের ৯২ ধারার বিধানের ন্যায্য অর্থ করা উচিত, এবং উইক্লি রিপোর্টরের ৬ ষ্ঠ বালমের ৮৪ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় ঐ প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, এবং সেই ব্যাখ্যা মতে, যে স্থলে সে অর্থাৎ ডিক্রীদার ১৮৬৭ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বরে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং যে স্থলে তাহার নিজের দোষে ডিক্রীজারী খারিজ করা অথবা স্থগিত রাখা হয় নাই, কেবল আদালতের কার্য্যের দ্বারাই তাহা হয়, সে স্থলে তাহার দরখাস্ত উচিত সময়েই দাখিল হইয়াছে, কারণ, রায়ের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে তাহার ডিক্রীজারীর দরখাস্ত হইয়াছিল। ডিক্রীদার কৈলাসচন্দ্র বসুর উকীল যে নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করেন, তাহা ঠিক এই মোকদ্দমায় খাটে, এবং সম্পূর্ণ রূপে তাহার অনুকূল। সেই নিষ্পত্তি আমাদের মান্য করা উচিত, এবং সেই নিষ্পত্তিতে আইনের যে প্রকার অর্থ করা হইয়াছে, তাহা যদি আমরা করিতে পারিতাম, তবে তল্লিখিত হেতুবাদে ও সুবিচারের অনুরোধে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাহার অনুগামী হইতাম। কিন্তু আইনের বাক্য গুলি যদি এমন পরিষ্কার থাকে যে, তাহার অর্থ সম্বন্ধে সাধারণতঃ কোন আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না, তাহা হইলে ঐ বাক্য-গুলির ঠিক যে শব্দার্থ হইতে পারে, তদ্ভিন্ন আমরা উহার অন্য কোন অর্থ করিতে পারি না।

আইনে সপষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, এই প্রকার মোকদ্দমায় যখন ১৮৫৯ সালের ১০ আই-নের বিধান মতে ৫০০ শতের ন্যূন টাকার জন্য ডিক্রী প্রদত্ত হয়, তখন "ডিক্রীর তারিখ হইতে "তিন বৎসর গত হওয়ার পরে সেই ডিক্রী "জারীর কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির "হইবে না।"

ক্রোক ডিক্রীজারীর কার্য্য; এবং যদি এমত নির্দ্দেশ করিতে হয় যে, কালেক্টরের এই মোক-দ্দমায় ডিক্রীজারী করার অধিকার আছে, তবে আমাদের ইহাও বলিতে হইবে, এই ডিক্রীর তিন বৎসর পরেও তিনি ডিক্রীজারীর স্বরূপ ক্রোকের হুকুম প্রচার করিতে পারেন। কিন্তু আইনে লেখা আছে যে, রায়ের তিন বৎসর পরে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবে না।

এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে ঐ বিধান কষ্টদায়ক দৃষ্ট হয় না, কারণ, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীদার যদি এই ডিক্রীজারী করিতে না পারে, তবে তাহার নিজের দোষেই পারিবে না। ডিক্রীর তারিখ ১৮৬৭ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর, এবং রায়ের পরে তিন বৎসর অতীত হওয়ার কেবল ৩ দিবস পূর্ব্বে ভিন্ন সে কোন কার্য্য করে নাই। কিন্তু ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, আইনের ঠিক বাক্যের দ্বারা কোন কোন অর্থীর ক্ষতি হইতে পারে, এবং আমাদের নিকট যে নিষ্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তল্লিখিত ঘটনা সমস্তে যে কষ্ট হয় তাহা আমরা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করি; এবং আমরা বিবেচনা করি যে, অন্যান্য মোকদ্দমায় তদপেক্ষা অধিক কষ্টও হইতে পারে। তথাপি যদি আমাদের বিবেচনায়, আইনের বাক্যগুলি নিশ্চিত হয়, তবে আমাদের ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, সেই বাক্যের দ্বারা যে সকল ঘটনায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভব তৎপ্রতি দৃষ্টি করা আমাদের উচিত নহে; আইনের ঐ বাক্যের দ্বারা আমাদের বাধ্য হওয়া ও তাহার অনুসরণ করা উচিত।

আইন সম্বন্ধে যদি আমাদের এই অভিপ্রায় বিশুদ্ধ হয়, তবে ১৮৬৭ সালের ২৭ এ আগষ্ট তারিখের ক্রোকের হুকুম বিচারাধিকার না থাকা সত্ত্বেও বাহির হইয়াছিল; এবং যদি আমাদের মত বিশুদ্ধ হয়, তবে সেই হুকুম প্রতিপালনের জন্য আর কোন কার্য্যও সঙ্গত রূপে করা যাইতে পারে না। কিন্তু যে স্থলে বিরুদ্ধ মতের এক নিষ্পত্তি আছে, সে স্থলে পূর্ণাধিবেশনের মতের জন্য আমরা এই মোকদ্দমা অর্পণ করিতে বাধ্য, সুতরাং আমরা তাহাই করিলাম।

অতএব যে স্থলে আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত সমস্ত এই যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের বিধান মতে আদালতের এই রায় ১৮৬৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রদত্ত হয় ও ১৮৬৭ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হয়; ও ডিক্রীজারীর প্রতি বিচারাদিষ্ট দায়ী এই হেতুবাদে আপত্তি করে যে, ১৮৬৭ সালের ৯ ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহাতে তমাদী হইয়াছে, কিন্তু তথাপি মাল আদালত ১৮৬৭ সালের ২২ এ অক্টোবর তারিখে ক্রোকের এবং ১৮৬৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নীলামের জন্য দ্বিতীয় হুকুম দেন; অতএব প্রশ্ন এই যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারা দৃষ্টে ১৮৬৭ সালের ২২ এ অক্টোবর তারিখে ক্রোকের হুকুম ও ১৮৬৯ সালের ৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সেই ক্রোকের উপরে অতিরিক্ত কার্য্য করার হুকুম দিতে মাল আদালতের ক্ষমতা ছিল কি না?

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—৬ ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ৮৪০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হীরালাল শীল বঃ পরাণ মাতিয়ার মোকদ্দমায় আমি যে রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাহা পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ আমি দেখি না। ৯২ ধারার বাক্যগুলির সঙ্গত ব্যাখ্যা করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে দুই পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে, (৬ ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ২৮ পৃষ্ঠার এবং ৭ ম বাঃ উইক্‌লি রিপোর্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ৫১৫ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তি) তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক* সমাজের আইনের বাক্যগুলির ঠিক শব্দার্থ করা সকল সময়ে সুবিধাজনক হয় না। কৈলাসচন্দ্রের পক্ষে যে উকীল এই মোকদ্দমায় তর্ক করিয়াছেন তিনি যে বলিয়াছেন যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার শব্দার্থ মতে চলিলে মফঃসল আদালতের কোন রায়ের উপরেই ডিক্রী জারী হওয়া দুঃসাধ্য, এ কথা সত্য। সকল কার্য্যেরই প্রথমারম্ভের আবশ্যক; কিন্তু যদি ঐ ধারার বাক্যগুলির ঠিক

শব্দার্থ করা যায়, তবে ডিক্রীজারীর জন্য প্রথম দরখাস্তের অগ্রে এক দরখাস্ত হয় নাই, বলিয়া সেই দরখাস্ত ডিস্‌মিস্‌ করিতে হইবে। ঐ ধারার ঠিক বাক্য মতে, ডিক্রী প্রবল করার জন্য কোন ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারে না, যদি ঐ ডিক্রীজারীর দরখাস্তের পূর্ব্বে তিন্‌ বৎসরের মধ্যে ঐ রায়, ডিক্রী অথবা হুকুম বলবৎ রাখার জন্য কোন কার্য্য না হইয়া থাকে।

কথিত হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের মর্ম্ম ও উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার ২১ ধারার কেবল শব্দার্থ করিলে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে।

এ মোকদ্দমায় ১৮৬৪ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডিক্রী প্রদত্ত হয়, এবং ১৮৬৭ সালের ২২ এ অক্টোবরের পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হয় নাই। সেই তারিখ হইতে ১৮৬৯ সালের ১১ ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত থাকে। যদি প্রতিপক্ষের তর্ক বিশুদ্ধ হয়, ও যদি ১৮৬৪ সালের ৮ ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডিক্রী জারীর জন্য দরখাস্ত হইয়া থাকে, এবং কোন না কোন কারণে যাহার জন্য প্রার্থী দায়ী নহে, যদি ১৮৬৭ সালের ২৪ এ অক্টোবর তারিখ পর্য্যন্ত কার্য্য সমস্ত স্থগিত থাকিয়া থাকে, তবে বাদী তাহার ডিক্রী জারী করিতে স্বত্ববান্‌ হইতে পারে না।

যেরূপ অর্থ করিবার জন্য তর্ক হইয়াছে তাহাই যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে আমি এমন ঘটনা সমস্ত অনুমান করিয়া লইতে পারি যাহাতে ডিক্রীদারের, কোন ত্রুটি ব্যতীত, সে ডিক্রী পাওয়ার পর দিবসে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিলেও ডিক্রীর ফল হারাইতে পারে। যেমন, ডিক্রী জারীর প্রার্থনা করার পর দিবসে যদি প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়, তবে এই প্রকার ঘটনায় ৯১ ধারা মতে বিচারাদিষ্ট দায়ীর দায়াদ অথবা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিকে তাহার উপস্থিত করার আবশ্যক হইবে, এবং সেই ধারার বিধানানুযায়ী ঐ দায়াদ অথবা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি হাজির হইয়া জওয়াব দেওয়ার জন্য নোটিস জারী না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হইতে পারে না।

সেই প্রকার, যদি কোন ব্যক্তি ডিক্রী পাইয়া মরে এবং তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি আসিয়া ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করে, তবে জজ তাহার ডিক্রীজারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করার পূর্ব্বে তাহার ঋণ আদায় করার ক্ষমতার সার্টিফিকেট দেখিতে চাহিতে পারেন। এমন ঘটনায়, প্রার্থীর আবশ্যকীয় সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য আদালতে যাওয়ার আবশ্যক হইতে পারে। সে ঐ সার্টিফিকেট পাওয়ার অনুমতি পাইতে পারে, এবং সেই হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে। এই সকল কার্য্যে তিন বৎসর অতীত হইয়া যাইতে পারে; এবং যদি জজ এই হেতুবাদে ডিক্রীজারীর হুকুম দিতে না পারেন যে, রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ডিক্রীদার ডিক্রীর পর দিবসে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা সত্ত্বেও তাহার ডিক্রীর ফল হইতে বঞ্চিত হইতে পারে।

আমি এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সমস্তের প্রতি দৃষ্টি করিতেছি না; কিন্তু কেবল এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে নহে, অন্যান্য মোকদ্দমা সম্বন্ধেও এই ধারার কি প্রকার অর্থ করা উচিত তাহার প্রতিই আমি দৃষ্টি করিতেছি। "বাহির" শব্দের দ্বারা ব্যবস্থাপক সমাজের কি ইহাই ব্যক্ত করা মনস্থ ছিল যে, যে কোন অবস্থায়ই ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হওয়ার বাধা হউক, যদি ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাস্তবিক বাহির না হয়, তবে আদালত হইতে ৯২ ধারার অন্তর্গত ডিক্রী সমস্তের ন্যায় ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবে না? ব্যবস্থাপকগণের বাক্যের ঠিক শব্দার্থ সর্ব্ব স্থলে করা যাইতে পারে না। যেমন আইনে বিধিবদ্ধ আছে যে, যদি কোন জেলর অর্থাৎ জেল-দারোগা

কোন কয়েদীকে পলায়ন করিতে দেয়, তবে সে দণ্ডনীয় হইবে। জেলে অগ্নি লাগিল, এবং জেলর কয়েদীদিগকে পুড়িয়া মরিতে না দিয়া তাহাদের সকলকে পলায়ন করিতে দিল। এমত স্থলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জেলর এই কার্য্যের জন্য দণ্ডনীয় হইতে পারে না। যদি "বাহির" শব্দের ঠিক অর্থ করা যায়, তবে এমন অনেক ঘটনা হইতে পারে যাহাতে অত্যন্ত অন্যায় হইবে।

ডোমাটের সিবিল ল সম্বন্ধীয় গ্রন্থে কথিত হইয়াছে যে, "দুই প্রকার স্থলে আইনের "ব্যাখ্যার আবশ্যক হয়। প্রথমতঃ, যে স্থলে "কোন আইনে কোন অনিশ্চিত বা দ্বিধাজনক "বাক্য অথবা শব্দবিন্যাসের দোষ থাকে, সে "স্থলে প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ার্থে উহার ব্যাখ্যা করা "আবশ্যক; এবং আইনে কি বলে তাহা জানি- "বার জন্য এই প্রকার ব্যাখ্যা কেবল আইনের "শব্দ সম্বন্ধে করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে স্থলে "আইনের শব্দগুলি পরিষ্কার আছে, কিন্তু "আইনের মন্তব্য না বুঝিয়া অসাবধানে সেই "বাক্যের লিখিত সমস্ত বিষয়ে আইন খাটাইতে "গেলে আমাদের ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত হয়। কারণ, "এই প্রকার স্থলে দৃষ্টব্য অর্থের দ্বারা স্পষ্ট অবি- "চার হয় দেখিয়া আমাদের কোন না কোন প্রকার "অর্থ করিয়া আইনের শব্দ না দেখিয়া তাহার "মন্তব্য কি, তাহাই আমরা দেখিতে, এবং তাহার "ব্যাখ্যার দ্বারা আইন কত দূর পর্য্যন্ত খাটান "যাইতে পারে, এবং সেই মন্তব্য কত দূর পর্য্যন্ত "সীমাবদ্ধ করা যাইতে পারে তাহা আমরা বিচার "করিতে বাধ্য হই।"

ঐ গ্রন্থকর্ত্তা পরে এক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যথা, "আইনের ইহা হইতে আর স্পষ্ট ও নিশ্চয় "বিধি নাই যে, যে ব্যক্তি কাহার নিকট কোন "দ্রব্য গচ্ছিত রাখে সে যখন তাহা তাহার নিকট "চাহিবে তখনই তাহা সে ফেরৎ দিতে বাধ্য; "কিন্তু গচ্ছিত টাকার মালিক যখন তাহার টাকা "চাহিতে যায়, তখন যদি সে জ্ঞানশূন্য হইয়া "থাকে, তাহা হইলে, ইহা সকলেরই স্বীকার "করিতে হইবে যে, যে ব্যক্তির নিকট টাকা "গচ্ছিত আছে সে তখন তাহা ফেরৎ দিলে নিতান্ত "অন্যায় কর্ম্ম হইবে। কারণ, কে ইহা না "জানে, যে উন্মত্তের হস্তে যে দ্রব্য দিলে নষ্ট "হওয়ার অথবা অন্যায় রূপে ব্যবহৃত হওয়ার "সম্ভাবনা আছে তাহা তাহাকে দিতে আর একটি "নিষেধক বিধি আছে, এবং কে ইহা না জানে "যে, উন্মত্তকে সেই দ্রব্য ফেরৎ দিলে তাহার "অনিষ্ট করা হইবে।"

আমি যে ধারার উল্লেখ করিলাম কেবল তাহাই এই আইনের অথবা কোন আইনের এক মাত্র ধারা নহে যাহাতে ঠিক শব্দার্থ করিলে অবিচার হয়।

যদি কোন আইনে এমন বিধি থাকে যে, জেলর একটি কয়েদীকে আদালতে উপস্থিত করার হুকুম প্রতিপালন না করিলে দণ্ডার্হ হইবে, তাহা হইলে কেহ এমন নির্দ্দেশ করিতে পারেন না যে, কএদীর শরীর আদালতে উপস্থিত করার জন্য হুকুম হইয়াছে বলিয়াই কএদীর মৃত্যু হইলেও অথবা কএদী যদি এমন পীড়িত থাকে যে, তাহাকে স্থানান্তর করিতে গেলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে তাহা হইলেও জেলরের ঐ হুকুম প্রতিপালন করিতে হইবে। কএদীকে আদালতে উপস্থিত জন্য যে আইনে জেলরের প্রতি অনুজ্ঞা আছে তাহার সঙ্গত অর্থ করিতে হইবে।

আমার বিবেচনায় "ইসু" অর্থাৎ "বাহির" করা শব্দের ঠিক শব্দার্থ করা উচিত নহে। আমার বিবেচনায়, সফলরূপে নালিশ করা বা দরখাস্ত করাই উহার অর্থ, অর্থাৎ ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হওয়ার জন্য কোন দরখাস্ত সফল হইবে না, যদি সেই দরখাস্ত অথবা নালিশ একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হয়। ঐ ধারার অবশিষ্টাংশ দৃষ্টে আমি বিবেচনা করি যে, ব্যবস্থাপক সমাজের ইহাই মনস্থ ছিল। তাহাতে বলে যে, "এই আইনমতে যে ডিক্রী হয় তাহার

" তারিখ অবধি ৩ বৎসর গত হইলে পরে, সেই " ডিক্রীজারীর কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির' " হইবে না ; কিন্তু যদি পাঁচ শত টাকার অধিকের " ডিক্রী হয় তবে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারী " করিবার মিয়াদের যে সাধারণ বিধি চলিত আছে ঐ " ডিক্রীজারী হওয়ার ' মিয়াদও তদনুবর্ত্তী হইবে। "

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, " বাহির " ও " হওয়া " এই দুই শব্দ একই বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। ' হওয়া ' শব্দে বাস্তবিক বাহির হওয়া বুঝায় না, কিন্তু প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়া বুঝায়। আমার বোধ হয়, এই দুই শব্দই প্রার্থীর প্রার্থনা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে ; মোকদ্দমায় যে সকল বিলম্বের ঘটনা হইতে পারে তাহার পরে যে সময়ে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা আদালত হইতে প্রকৃতরূপে বাহির হয় সেই সময় সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয় নাই।

আইনের শব্দগুলির ন্যায় অর্থ করিলে আমি বিবেচনা করি যে, " বাহির " শব্দের এই অর্থ নহে যে, রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসর অতীত হওয়ার পূর্ব্বে যে কোন অবস্থায়ই হউক, আদালত হইতে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা প্রকৃতরূপে বাহির হওনাবশ্যক।

খরচা সমেত এই হুকুম রহিত হইবে।

**বিচারপতি বেলি।**—পূর্ণাধিবেশনের বিচারার্থে খণ্ডাধিবেশন কর্তৃক যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে তাহা এই যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারার বিধানমতে, স্বীকৃতরূপেই তিন বৎসর গত হওয়ার পরে কালেক্টর ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির করিয়া বিচারাধিকার-বহির্ভূত কার্য্য করিয়াছেন কি না ? মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করার হুকুমে লিখিত হইয়াছে যে, এই মোকদ্দমায় বিশেষ হানির কারণ নাই, কারণ, ডিক্রীদার নিজের দোষেই উচিত সময়ের মধ্যে তাহার ডিক্রীজারী করে নাই।

এই মোকদ্দমায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৬৪ সালের ৭ ই অক্টোবর তারিখে রায় প্রদত্ত হয়। ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মাল আদালত ১৮৬৭ সালের ২২ এ অক্টোবর তারিখে অর্থাৎ রায়ের তারিখের ৩ বৎসর পরে ক্রোকের পরওয়ানা বাহির করেন। এই বিষয়ের বিধি ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারায় আছে। কিন্তু এই মোকদ্দমার দাবী যে ৫০০ টাকার ন্যূন এমত কোন তর্ক নাই।

অর্পণকারক বিচারপতিগণের রায়ের বিরুদ্ধে ৬ ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৮৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মার্কবির এক রায় আছে যাহাতে তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন যে, ৯২ ধারার বাক্যগুলির ন্যায্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে, এবং ঐ বিচারপতিদ্বয়ের রায়ের অনুকূল উইক্লি রিপোর্টরের ৪ র্থ বালমের ৯৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত বিচারপতি লক ও গ্লবরের ও ৩ য় বালমের ১৩১ পৃষ্ঠার ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তিতে বিচারপতি কেম্প ও সিটনকারের নিষ্পত্তি আছে।

ব্যাখ্যার কোন আইন-সঙ্গত যুক্তি অনুসারে এই মোকদ্দমা কালেক্টরের বিচারাধিকারের মধ্যে আনা যাইতে পারিলে আমরা তাহাই করিতাম, যদি দেওয়ানী আদালতের কোন ডিক্রীর উচ্চতর বলের দ্বারা ডিক্রীদারের হস্ত একেবারে বদ্ধ থাকিত। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ২৪ পরগণার সদর আমীন ঐ ৩ বৎসরের অধিকাংশ কাল পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রী ক্রোক রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু পক্ষান্তরে, ইহাও দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীদার যখন ঐ ৩ বৎসর অতীত হওয়ার ৩ দিবস মধ্যে ডিক্রীজারী করিয়াছিল তখনও সে তাহা আইনবিরুদ্ধ রূপে করিয়াছিল, অর্থাৎ সে আইনমতে প্রথমে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক না করিয়া স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের জন্য দরখাস্ত করিয়াছিল। ৩ বৎসর স্বীকৃত রূপে অতীত হইবার পরে সে ১৮৬৭ সালের ২৫ এ অক্টোবর তারিখের এক দরখাস্তে ঐ কথা স্বীকার করে ; অতএব ডিক্রীদার উচিত সময়ের মধ্যে দরখাস্ত করিয়াছিল কি না, বাস্তবিক সেই প্রশ্ন সম্বন্ধে,

আদালতে তিন বৎসরের মধ্যে কোন আইন-সঙ্গত দরখাস্ত না হওয়ার কথা একটি আবশ্যকীয় বৃত্তান্ত। কিন্তু আমি কেবল ব্যাখ্যা করার নিয়মের বিচার করিব।

লিখিত আইন সম্বন্ধে ডোয়ারিশের গ্রন্থে ব্যাখ্যার যে সকল বিধি আছে তাহাতে লেখা আছে যে, "ন্যায় এবং বহুতর নজীরের দ্বারা "ব্যাখ্যার এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত আছে যে, যদি "কিছু দ্বারা এমত প্রদর্শিত না হয় যে, কোন উইল "অথবা লিখিত আইনের শব্দের অবিকল ও "উচিত অর্থ করার মনস্থ ছিল না, তাহা হইলে "ঐ সকল শব্দের অবিকল ও উচিত অর্থ করিতে "হইবে। আইনের প্রসিদ্ধ শব্দগুলির সাধারণ "অর্থ করার যদি কোন স্পষ্ট মনস্থ দৃষ্ট না হয়, "তবে ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে, ঐ "শব্দগুলি পারিভাষিক অবিকল অর্থে ব্যবহৃত "হইয়াছে।"

অনন্তর, তাহার পরের পৃষ্ঠায় লর্ড ডেনম্যানের এক রায়ে কথিত হইয়াছে যে, "আমরা "এই প্রকার রূপান্তর করিতে পারি না, "এবং আমি বিবেচনা করি, লিখিত আইনের "ব্যাখ্যায় তাহার ব্যতিক্রমজনক বাক্য উপস্থিত "করিলে আইনের প্রতি দোষ হয়। যে সকল "প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার এক প্রস্তাবও "আইনের স্পষ্ট বাক্যে নাই এবং আমরা তাহা "আমাদের ইচ্ছানুযায়ী অর্থের দ্বারা রূপান্তর "করিতে পারি না।" ঐ প্রকার এবরেট ও মিল্সের মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি টিণ্ডাল কহিয়াছেন যে, "ব্যবস্থাপকগণের ঠিক বাক্যগুলি "দৃষ্টে কার্য্য করা এবং তাহার কিছু হ্রাসবৃদ্ধি "না করাই সকল আদালতের কর্ত্তব্য। তাহাতে "যে সর্ত্ত অথবা অর্থ নাই তাহা আমাদের অনু- "মান করা উচিত নহে।"

ব্যাখ্যার এই সকল বিধি অনুসারে ৯২ ধারার বাক্য আমার বিবেচনায় দ্বিধাজনক বোধ হয় না। "এই আইন মতে যে ডিক্রী হয়, তাহার তারিখ "হইতে তিন বৎসর গত হইলে পর, সেই ডিক্রী- "জারীর কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির "হইবে না, ইত্যাদি।" ৯২ ধারাক্ত বাক্যগুলির দ্বারা যে অভিপ্রায় ও মনস্থ ব্যক্ত হইয়াছে তদপেক্ষা আর কিছু স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হইতে পারে না। অতএব আমি এই মোকদ্দমায় বিবেচনা করি যে, যে স্থলে ঐ ধারার বিধি এমন স্পষ্ট বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে, সে স্থলে ব্যাখ্যার উল্লিখিত নিয়মের বিরুদ্ধে ঐ বাক্যগুলি অতিক্রম করত তাহার অন্য অর্থ করার নূতন প্রস্তাব আমাদের গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহা সত্য বটে যে, এই মোকদ্দমায় প্রার্থী যদি ৩ বৎসর অতীত হইয়া যাওয়ার ৩ দিবস পূর্ব্বে আইন-সঙ্গত ও উচিত রূপে দরখাস্ত করিত, অর্থাৎ স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার পূর্ব্বে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য প্রার্থনা করিত, তথাপি সদর আমীন আদালতের যে উচ্চতর বলের উপরে তাহার কোন ক্ষমতা ছিল না, তদ্দ্বারা সে প্রতিকার হইতে বারিত হইত। কিন্তু ইহাও সত্য বটে যে, যে স্থলে ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য এমন পরিষ্কার বাক্য সকল ব্যবহার করেন, সে স্থলে আমার বিবেচনায় ঠিক তদনুযায়ী আমাদের কার্য্য করা উচিত। আইনে যদি কোন ত্রুটি থাকে, তবে তাহা সংশোধন করত আবশ্যকীয় ঘটনার প্রতিকারের উপায় করা ব্যবস্থাপক সমাজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, আমাদের নহে। এই প্রকারে কাঠিন্য দূরীভূত হইবে অথচ ব্যাখ্যার নিয়ম স্থির থাকিবে।

প্রতিপক্ষ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ও ২১ ধারার উপরে যে নির্ভর করে, তৎসম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, ঐ ধারাদ্বয়ের বাক্যের সহিত ৯২ ধারার পরিষ্কার বাক্যের অনেক প্রভেদ আছে।

এই বিষয়ে আমি যথোচিত মনোনিবেশ করিয়া এবং পক্ষগণের মধ্যে সুবিচার করার সম্পূর্ণ ইচ্ছা সহকারে দেখিতেছি যে, এই

মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করার হুকুমে আমি ও বিচারপতি হব্‌হৌস যে রায় ব্যক্ত করিয়াছি তাহাই আইনের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশুদ্ধ। অতএব আমার এখনও মত এই যে, এই স্থলে কালেকটরের বিচারাধিকার ছিল না।

বিচারপতি কেম্প।—১৮৫৯ সালের ১০ আইনের অন্তর্গত এক খরচার ডিক্রীজারীর জন্য এই দরখাস্ত হয়। ডিক্রীর দাবী ৫০০ টাকার ন্যূন হওয়ায় দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীর জন্য যে সাধারণ নিয়মকাল আছে তাহা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারার শেষ ভাগের বিধান মতে এই মোকদ্দমায় খাটে না। এই মোকদ্দমায় ডিক্রীদার ডিক্রীর তারিখের পরে তিন বৎসরের মধ্যে কোন উপযুক্ত দরখাস্ত করে নাই। যে মোকদ্দমায় ডিক্রীজারীর জন্য উচিত দরখাস্ত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধেই ৬ ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৮৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মার্কবির রায় প্রদত্ত হয়। উপস্থিত মোকদ্দমায় ডিক্রী টাকা দেওয়ার জন্য প্রদত্ত হওয়ায়, এবং সেই টাকা ১০৯ ধারা মতে যে অধীন-জমা বিক্রীত হইতে পারে তাহার বাকী খাজানার টাকা না হওয়ায়, বিচারাদিষ্ট দায়ীর শরীরের ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রথমে ডিক্রীজারী না করিয়া তাহার স্থাবর সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করা যাইতে পারে না। অতএব যদিও এই মোকদ্দমার অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের বিচার করার আবশ্যক নাই, তথাপি আমার বিবেচনায়, এই ডিক্রীদার আদালতের নিকট কোন অনুগ্রহ পাইতে পারে না।

যে বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয় এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিয়াছেন, আইন-ঘটিত প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি তাঁহাদের মতে সম্মত। আমি পূর্ব্বে যে রায় ব্যক্ত করিয়াছি, কিন্তু যাহা ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয়ের সমক্ষে উপস্থিত হয় নাই, তাহা ঐ মতের সহিত ঐক্য। আমার ঐ নিষ্পত্তি উইক্‌লি রিপোর্টরের ৩ য় বালমের ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। আমি বিবেচনা করি যে, কোন আইন পরিষ্কার ও নিশ্চিত বাক্যে লিখিত হইলে ব্যবস্থাপকগণের সেই বাক্য গুলির ঠিক অর্থ অনুযায়ী আদালত তাহার অর্থ করিতে বাধ্য। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারায় লেখা আছে যে, "এই আইন মতে যে ডিক্রী হয়, তাহার "তারিখ হইতে তিন বৎসর গত হইলে পর সেই "ডিক্রীজারীর কোন প্রকারের পরওয়ানা বাহির হইবে না।" ৫০০ টাকার ন্যূন ডিক্রী সম্বন্ধে উহা খাটে। এই মোকদ্দমায়, রায়ের তারিখ হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর পরওয়ানার জন্য কোন দরখাস্ত করা হয় নাই, এবং যে স্থলে রায়ের তারিখের ৩ বৎসর পরে কালেক্‌টর ডিক্রীজারীর জন্য হুকুম প্রদান করিয়াছেন, সে স্থলে আমার বিবেচনায়, এই হুকুম অবৈধ হইয়াছে, এবং তাঁহার এই হুকুম দেওয়ার কোন অধিকার ছিল না।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।—অর্পিত প্রশ্নে বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি যে উত্তর দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতেই আমি সম্মত; কিন্তু এই বিষয়ে যে আমার অনেক সন্দেহ ছিল না, এ কথা আমার বলা দুঃসাধ্য।

১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারায় স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, "এই আইনমতে যে "ডিক্রী হয় তাহার তারিখ হইতে ৩ বৎসর গত "হইবার পরে সেই ডিক্রীজারীর কোন পরওয়ানা "বাহির হইবে না।" এই বাক্য গুলির ঠিক অর্থ করিলে দেখা যায় যে, তিন বৎসর অতীত হইয়া গেলে কোন প্রকার পরওয়ানা বাহির হইতে পারে না। ঐ বাক্যের ঠিক অর্থ করিয়া এই ধারা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি ডিক্রী পাইয়া যদি তৎক্ষণাৎ সে তাহা জারী করার উপায় অবলম্বন করে, এবং যত্নের সহিত কার্য্য করে, কিন্তু তাহার নিজের কোন ত্রুটি বিনা, রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে

ডিক্রীজারী করিতে অসমর্থ হয়, তবে ৩ বৎসর অতীত হওয়া মাত্রই তাহার সমুদায় কার্য্য এবং ডিক্রীজারী করার স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে। ঐ ধারার বাক্যের ঐ রূপ অর্থ করিলে অত্যন্ত অনিষ্ট হয়, এবং আমি বিবেচনা করি যে, ৬ ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ৮৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হীরালাল শীল বঃ পরাণ মাতিয়ার মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মার্কবি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাই সঙ্গত; এবং ঐ বাক্যের এই অর্থ করিতে হইবে যে, রায়ের তারিখ হইতে তিন বৎসরের মধ্যে উচিত দরখাস্ত না করিলে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবে না।

বিচারপতি গ্লবর।—কেবল ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৯২ ধারার বিধি সম্বন্ধে এই অর্পিত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে হইবে অনুমান করিয়া আমার ইহা বলায় বাধা নাই যে, ৬ ষ্ঠ বালম উইক্লি রিপোর্টরের ১০ আইন সংক্রান্ত নিষ্পত্তির ৮৪ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হীরালাল শীল আপেলাণ্টের মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি মার্কবি যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্মত। আমি ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয়ের সহিত এক মতে বিবেচনা করি যে, ঐ আইনের ৯২ ধারার অর্থ এই যে, রায়ের তারিখের পরে তিন বৎসরের মধ্যে "উচিত দরখাস্ত" না করা হইলে ডিক্রীজারীর পরওয়ানা বাহির হইবে না। এই স্থলে ৩ বৎসরের মধ্যেই ১৮৬৭ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে এক দরখাস্ত হয়, এবং যেহেতু উচিত "দরখাস্ত" হইয়াছিল কি না, এই প্রশ্ন আমাদের সমক্ষে উত্থিত হয় নাই, অতএব এই অর্পণ সম্বন্ধে আমার অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ঐ দরখাস্ত উচিত দরখাস্তই হইয়াছিল; এবং তাহাই হইলে, মুল রায় প্রদত্ত হওয়ার তারিখ হইতে ৩ বৎসর গত হওয়ার পরে ডিক্রীজারীর জন্য কালেক্টরের হুকুম বাহির হওয়া সত্ত্বেও, আমার বিবেচনায় তাহা করিতে কালেক্টরের ক্ষমতা ছিল। আইন মতে ডিক্রীদার কেবল তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করিতে বাধ্য ছিল, এবং তাহাই সে করিতে পারিত। অন্যান্য সকল কার্য্য আদালতের হস্তে ছিল, এবং আদালত যদি তাঁহার নিজের প্রয়োজন বশতঃ ক্রোক করিতে বিলম্ব করিয়া থাকেন, তজ্জন্য ডিক্রীদার দায়ী হইতে পারে না।

(গ)

১০ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট ও বিচারপতি এফ. বি. কেম্প; এ. জি. ম্যাক্ফার্সন; দ্বারকানাথ মিত্র ও সর চার্লস. হব্‌হৌস বারণেট।

১৮৬৮ সালের ৩২৩৭ নং মোকদ্দমা।

খুলনিয়ার মুনসেফের ১৮৬৭ সালের ৩০ এ ডিসেম্বরের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া যশোহরের প্রতিনিধি জজ ১৮৬৮ সালের ২ রা সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

অম্বিকা দেবী ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদিগণের মধ্যে দুই জন) আপেলাণ্ট।

প্রাণহরি দাস (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু বংশীধর সেন আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, জে, এস, রচ্‌ফার্ট ও বাবু করুণাদাস বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন অধীন-প্রজা আপন স্বত্ব রক্ষার্থে তদুচ্চতর জমা-ভোগীর দেয় বাকী খাজানা আমানত করিয়া দিয়া ঐ জমা নীলাম হইতে রক্ষা করিলে, ১৮১৯ সালের ৮ম কানুনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণ মতে, ঐ রূপ রক্ষিত জমার তৎক্ষণাৎ দখল পাওয়ার জন্য কালেক্টরের নিকট তাহার অবশ্যই দরখাস্ত করিতে হইবে, এমত নহে; কিন্তু সে ঐ রূপ কোন দরখাস্ত না করিয়াও সচরাচর প্রণালীতে নালিশ করত

তাহার আমানতী টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে।

## বিচারপতি প্লবর ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত রায়মতে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—এই খাস আপীলে দুই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, যথা—

১ ম, বাদী দাবী-কৃত টাকা খাস আপেলাণ্টের নিকট পাইতে পারে না, কারণ, খাস আপেলাণ্ট যে ছিস্যা ক্রয় করে তাহার সহিত বাদীর দর-পত্তনীর কোন সংস্রব নাই।

২ য়, যদিও তর্কচ্ছলে অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, বাদী ঐ টাকা খাস আপেলাণ্টের নিকট পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহা হইলে যে জমা নীলাম হইতে রক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তৎক্ষণাৎ দখল পাওয়ার জন্য ১৮১৯ সালের ৮ ম কানুনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণ মতে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত করাই এক মাত্র উপায় ছিল।

প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট মত এই যে, তাহা বৈধ নহে। স্বীকৃত হইয়াছে যে, খাস আপেলাণ্ট ও তাহার শরীকগণের মধ্যে বিধিমত কোন বাটোয়ারা হয় নাই এবং জমিদারের প্রাপ্য খাজানার জন্য সমুদায় জমা বিক্রীত হইতে পারে। এমত অবস্থায়, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বাদীর টাকা দেওয়াতে খাস আপেলাণ্টের শরীকগণের যেরূপ উপকার হইয়াছিল খাস আপেলাণ্টেরও তদ্রূপ উপকার হইয়াছিল, এবং ১৮১৯ সালের ৮ ম কানুনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জমার নীলাম নিবারণার্থে অধীন প্রজা যে টাকা দেয় সেই টাকার জন্য ঐ জমার মালিকগণ দায়ী। আমরা এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিলাম।

দ্বিতীয় আপত্তিও অকর্ম্মণ্য। ১৮১৯ সালের ৮ ম কানুনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণ যাহা এই প্রকার মোকদ্দমা সম্বন্ধে বাঙ্গাল কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনমতে খাটে, তদনুসারে কালেক্টরের নিকট তৎক্ষণাৎ দখলের জন্য দরখাস্ত করাই একমাত্র উপায় নহে। ১৮১৯ সালের ৮ ম কানুনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণের স্পষ্ট বিধান এই যে, যে আমানতের দ্বারা জমার নীলাম নিবারিত হয়, সেই আমানত ঐ জমার মালিকের ঋণ স্বরূপ বিবেচনা করিতে হইবে, এবং যে তালুকের নীলাম এইরূপে নিবারিত হয়, তাহা বন্ধকের উপরে কর্জ্জ দেওয়ার ন্যায় আমানতকারীর হস্তে প্রতিভূ স্বরূপে থাকিবে, এবং তাহার উপস্বত্ব হইতে তাহার আমানতী টাকা উঠাইয়া লইবার জন্য সে প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণাৎ বাকীদারের জমার দখল পাইতে পারিবে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই দফার এই শেষ ভাগের দ্বারা আমানতকারীর প্রতিকার কেবল ব্যাপক করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া সে সাধারণ নালিশের দ্বারা ঐ টাকা আদায় করণে বঞ্চিত হইতে পারে না। আমানতী টাকা নীলাম হইতে রক্ষিত জমার বন্ধকের উপরে কর্জ্জ দেওয়া টাকা বিবেচনা করিতে হইবে, এবং যে ব্যক্তি ঐ টাকা আমানত করে তাহার দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিয়া অথবা কালেক্টরের দ্বারা তৎক্ষণাৎ দখল লইয়া তাহা আদায় করিয়া লওয়ার স্বত্ব আছে। তৎক্ষণাৎ দখল দেওয়ার যে বিধান আছে, তদ্দ্বারা দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিকার নিবারিত হয় নাই, অতএব ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১ ধারামতে আমরা এই নালিশ গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু যেহেতু সদরল্যাণ্ডের উইক্লি রিপোর্টরের ১০ ম বালমের ২০৫ পৃষ্ঠায় প্রচারিত এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশনের নিষ্পত্তির সহিত আমাদের মতের প্রভেদ হইতেছে; অতএব চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আমরা এই প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিলাম।

অর্পিত প্রশ্ন এই যে, যদি কোন অধীন প্রজা জমিদারকে তাহার উক্ত জমার খাজানা প্রদান

করত সেই জমার নীলাম বারণ করে, তবে সে নীলাম হইতে রক্ষিত জমার তৎক্ষণাৎ দখল পাওয়ার জন্য কালেকটরের নিকট দরখাস্ত করিতে বাধ্য, না সে ঐ প্রকার কোন দরখাস্ত না করিয়া তাহার প্রদত্ত টাকা আদায় করার জন্য সচরাচর রূপেও নালিশ করিতে পারে ?

পূর্ণাধিবেশনের রায় ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—আমার মতে এই নালিশ চলিবে। ১৮১৯ সালের ৮ ম কানুনের ১৩ ধারার ৪ প্রকরণে বলে যে, জমার নীলাম রক্ষা করার জন্য যে টাকা প্রদত্ত হয় তাহা জমার অধিকারীকে ঋণ প্রদান স্বরূপ জ্ঞান করিতে হইবে, এবং যে তালুক ঐ প্রকারে রক্ষিত হয় তাহা আমানতকারীর নিকট প্রতিভূ স্বরূপ থাকিবে, এবং বন্ধকের উপরে টাকা দেওয়ার ন্যায় ঐ সম্পত্তির উপরে তাহার স্বত্ব থাকিবে। যদি ইহাকে ঋণের ন্যায় বিবেচনা করিতে হয়, তবে কর্জ্জা টাকা আদায় করিয়া লওয়ার জন্য আইনে যে সমস্ত উপায় আছে, তাহা, ব্যবস্থাপক সমাজের অন্য প্রকার মনস্থ প্রদর্শিত না হইলে, ইহাতেও খাটিবে। আমি একদা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, "প্রতিভূ" শব্দের পূর্ব্বে "ঐ" শব্দ থাকাতে, নীলাম হইতে রক্ষিত তালুকই এক মাত্র প্রতিভূ গণ্য হইবে। কিন্তু ইহা যে ব্যবস্থাপক সমাজের মনস্থ ছিল এমত হইতে পারে না, কারণ, অধীন-জমার মালিক, যে উচ্চ জমা প্রতিভূ স্বরূপ পায় তাহার মুল্য অপেক্ষা, অধীন-জমা রক্ষা করার জন্য সে অধিক টাকা দিয়া থাকিতে পারে। অতএব যে অধীন-জমার মালিক তাহার অধীন-জমা রক্ষা করার জন্য টাকা দিতে বাধ্য হয়, তাহার যথেষ্ট প্রতিভূ পাওয়ার জন্য, সে যে জমা রক্ষা করে তাহাই কেবল প্রতিভূ স্বরূপ পাইবে এমন নহে, কিন্তু আবশ্যক হইলে, তাহার প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া লওয়ার জন্য তাহার নালিশ করারও স্বত্ব আছে।

দেখা যাইতেছে যে, এই মোকদ্দমায় দাবীকৃত টাকা, ৫০০, শতের ন্যূন, এবং কেবল টাকা পাওয়ার জন্যই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এই মোকদ্দমায় আপীল নাই। অতএব আপীলের প্রচলিত খরচা সমেত এই আপীল ডিস্মিস্ হইল।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন, দ্বারকানাথ মিত্র ও হব্‌হৌস, প্রধান বিচারপতির মতে সম্মত।

বিচারপতি কেম্প।—যেহেতু, উইক্‌লি রিপোর্টরের ১০ ম বালমের ২০৫ পৃষ্ঠার মোকদ্দমা যে সকল বিচারপতিগণ নিষ্পন্ন করেন, তন্মধ্যে আমি এক জন ছিলাম, অতএব আমি বলিতে চাহি যে, প্রধান বিচারপতি এইক্ষণে যে রায় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। তৎকালে আমার এই মত ছিল যে, দরপত্তনীদার অথবা ছেপত্তনীদার টাকা আমানত করিয়া যে তালুকের নীলাম রক্ষা করে, কেবল সেই তালুকই আমানতকারীর হস্তে প্রতিভূ স্বরূপ থাকে, এবং ঐ টাকা আদায় করার জন্য নালিশ চলিতে পারে না। আমার মত নিঃসন্দেহই ভ্রমাত্মক হইয়াছিল, এবং আমার বিজ্ঞবর সহবিচারপতিগণ এইক্ষণে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইলাম।

(গ)

১০ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট ও বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান ; এফ, বি, কেম্প, ; এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন ও দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৮ সালের ২০৬ নং মোকদ্দমা।

২৪-পরগণার জজের ১৮৬৮ সালের ৯ ই আগষ্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

শ্রীরামমাণিক ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

তিনকড়ি রায় ( বাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী ও কালীমোহন্ দাস
আপেলাণ্টের উকীল ;

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চন্দ্রমাধব
ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন উত্তমর্ণ ডিক্রী হওয়ার পূর্ব্বে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৮৪ ধারার বিধান মতে, তাঁহার ঋণীর সম্পত্তি ক্রোক করে, তবে সেই সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করার পূর্ব্বে তাহার ঐ ডিক্রী পাওয়ার পরে রীতিমত দরখাস্ত করিয়া পুনরায় সেই সম্পত্তি ক্রোক করিতে হইবে। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭০ ধারায় যে ক্রোকের কথা লেখা আছে, তাহা ডিক্রী হওয়ার পরে যে সকল ক্রোক হয়, কেবল তৎসম্বন্ধেই খাটে, রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, তৎসম্বন্ধে খাটে না।

বিচারপতি লক, ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—যে সকল বৃত্তান্ত হইতে এই মোকদ্দমা উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে এই, যথা—

এক বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে বাদী ও প্রতিবাদিগণ প্রতিযোগী ডিক্রীদার। বাদী যে মোকদ্দমায় ডিক্রী পায়, তাহা ১৮৬৬ সালের ২৬ এ জুলাই তারিখে উপস্থিত হয়, এবং যাহাতে প্রতিবাদিগণ তাহাদের ডিক্রী পায়, তাহা ঐ মাসের ২৯ তারিখে অর্থাৎ ৩ দিবস পরে উপস্থিত হয়। দুই মোকদ্দমারই একত্রে শুনানী হইয়া এক আদালতের দ্বারা একই তারিখে অর্থাৎ ঐ সালের ৫ ই অক্টোবরে ডিক্রী হয়। কিন্তু ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক সম্বন্ধে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির যে ৮৪ ধারা বিধিবদ্ধ আছে, বাদী সেই ধারার বিধান মতে দায়ীর কতিপয় সম্পত্তি ক্রোক করাইয়াছিল। এই সকল সম্পত্তি পশ্চাতে, বাদী ও প্রতিবাদিগণ কর্ত্তৃক তাহাদের আপন আপন ডিক্রী জারীতে ক্রোক হয়, কিন্তু দুই ক্রোকই একই সময়ে করা হয়। পরে ঐ সম্পত্তি আইনের লিখিত নিয়মানুসারে নীলাম হয়, এবং বাদী এই হেতুবাদে তাহার ডিক্রী প্রথমে পরিশোধ করিয়া লওয়ার জন্য আদালতে দরখাস্ত করে যে, উল্লিখিত ধারামতে সে যে ক্রোক করিয়াছিল, তাহা প্রতিবাদিগণের ডিক্রীজারীর ক্রোকের পূর্ব্বে হইয়াছিল। এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়, এবং ঐ নীলামের টাকা বাদী ও প্রতিবাদিগণের মধ্যে হারাহারী মতে ভাগ করিয়া লওয়ার হুকুম হয়। এপ্রযুক্ত বাদী, প্রথম ক্রোককারী ডিক্রীদার প্রসঙ্গে প্রথমে তাহার ডিক্রী পরিশোধ করিয়া লওয়ার স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে।

২৪-পরগণার জজ যিনি প্রথমে এই মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি বোর্কের রিপোর্টের ১৩৯ ও ১৪৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত এই আদালতের দুই নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করিয়া বাদীকে ডিক্রী দেন। আমার মত এই যে, জজের সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক, এবং আমি দুঃখিত হইলাম যে, বিজ্ঞবর জজ তাঁহার রায়ের পোষকতায় যে নিষ্পত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা আমার মতের সহিত অনৈক্য। আমি বিবেচনা করি যে, প্রতিযোগী ডিক্রীদারের মধ্যে প্রথম ক্রোক সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তাহার সহিত ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয় তাহার কোন সংস্রব নাই। এই বিষয়ের বিধি দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৭০ ধারায় আছে, এবং আমি বিবেচনা করি যে, তাহাতে যে ক্রোকের কথা লেখা আছে তদ্দ্বারা ডিক্রীজারীর ক্রোক বুঝায়, ৮৪ ধারার বিধান মতে ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয় তাহা বুঝায় না।

২৭০ ধারায় এই রূপ লেখা আছে, যথা,
"যখন ডিক্রীজারীক্রমে কোন সম্পত্তির নীলাম
"হয়, তখন যে লোকের প্রার্থনা মতে ঐ সম্পত্তি
"ক্রোক করা যায় সেই লোকের ঐ নীলামের
"উৎপন্ন টাকা হইতে আপনার প্রাপ্য টাকা

"প্রথমে পাইবার স্বত্ব থাকিবে, ও তাহার "পূর্ব্বে কোন ডিক্রীজারীক্রমে অন্য লোকের "দ্বারা সেই সম্পত্তি পরে ক্রোক হইলেও ঐ "পূর্ব্বোক্ত লোক প্রথমে টাকা পাইবে।"

৪র্থ অধ্যায় যাহা ডিক্রীজারী সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, ঐ ধারা তাহারই এক অঙ্গ, এবং ঐ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে যে সকল ক্রোকের কথা লেখা আছে তাহা ঐ ডিক্রীজারী করার কার্য্য। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সমাজ যে স্থলে এই ধারা সংস্থাপন করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টই প্রবল রূপে এমত নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, ঐ ধারা ডিক্রীজারীর ক্রোক সম্বন্ধে হয় নাই। সে যাহা হউক, ঐ ধারার শেষ বাক্য অর্থাৎ "পূর্ব্বের কোন "ডিক্রীজারীক্রমে অন্য লোকের দ্বারা সেই "সম্পত্তি পরে ক্রোক হইলেও" এই বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ দুই ক্রোকই ডিক্রীর পরে ডিক্রীজারীর ক্রোক। নচেৎ যদি আমরা নির্দ্দেশ করি যে, ঐ ধারা ডিক্রীর পূর্ব্ব ও পরের ক্রোক সম্বন্ধে খাটে, তাহা হইলে তাহা এই রূপ লিখিত হইত, যথা, "ডিক্রীজারীতে "সম্পত্তি নীলাম হইলে, যে ব্যক্তির দরখাস্ত "মতে ঐ ক্রোক হইয়া থাকে, 'ঐ ক্রোক ডিক্রীর "পূর্ব্বে বা পরে হউক' সেই ব্যক্তি, পূর্ব্বের "কোন ডিক্রীজারীক্রমে অন্য লোকের দ্বারা "সেই সম্পত্তি পরে ক্রোক হইলেও, উক্ত নীলা- "মের মুল্য হইতে অগ্রে আপন প্রাপ্য টাকা পাইবে।" ঐ ধারার শব্দগুলি উপরোক্ত রূপে রূপান্তর করিলে এক ফল এই হইবে যে, যে ব্যক্তি ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিবে, তাহার অনুকূলে ডিক্রী না হইলেও সে ঐ ক্রোকের গতিকে অগ্রে তাহার দাবী পরিশোধ করিয়া লইতে স্বত্ববান্ হইবে। এমত বলা যাইতে পারে যে, ইহা এমন অমূলক কথা যে, তাহা কেহই গ্রাহ্য করিবে না; কিন্তু তাহা হইলেও অন্য এক ফল অবশ্যই ঘটিবে, অর্থাৎ, যে ডিক্রীদার ৮৪ ধারার বিধানমতে ক্রোক করে তাহার ডিক্রী পশ্চাতে প্রদত্ত হইলে এবং অন্য ডিক্রীদার তদপেক্ষা পূর্ব্বের তারিখে ডিক্রী পাইয়া সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করার কালে প্রথমোক্ত ডিক্রীদারের ডিক্রী প্রদত্ত না হইয়া থাকিলেও, সে অগ্রগণ্য হওয়ার দাবী করিতে পারিবে।

যেমন, যদি কোন সম্পত্তি শ্যামের দরখাস্ত অনুসারে ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক হয়, এবং সেই ক্রোক যদি তারিখ সম্বন্ধে অগ্রে হয় এবং যদি রাম নামক আর এক জন ডিক্রীদারের দরখাস্ত অনুসারে ঐ সম্পত্তি নীলাম হওয়ার সময় শ্যামের ডিক্রী প্রদত্ত না হইয়া থাকে, তবে শ্যাম যে সময়েই ডিক্রী পাউক, ঐ নীলামের টাকা হইতে অগ্রে আপন টাকা পাওয়ার দাবী করিতে পারিবে, এবং রাম যদি ইতিমধ্যে সেই টাকা পাইয়া থাকে তবে সে তাহা শ্যামকে ফেরৎ দিতে বাধ্য হইবে। রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল এত দূর পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত নহেন, এবং জজ যে সকল নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে আমার বোধ হয়, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, নীলামকৃত সম্পত্তি ৮৪ ধারার বিধান মতে প্রথমে ক্রোক হওয়ার হেতুবাদে ডিক্রী অগ্রে পরিশোধ করিয়া লইতে হইলে, নীলামের সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় ক্রোকের সময়ে ডিক্রী বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। কিন্তু যদি আমরা এমন নির্দ্দেশ করি যে, ২৭০ ধারার লিখিত ক্রোক যদ্দ্বারা ঐ ডিক্রীদার কোন প্রকার দাবী করিতে পারে, তাহার অর্থে দুই প্রকার ক্রোক অর্থাৎ ডিক্রীর পূর্ব্ব ক্রোক ও পরের ক্রোক উভয়ই বুঝায়, তবে কি জন্য ঐ প্রকার দুই দিকই রক্ষা করিয়া নিষ্পত্তি করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। ঐ ধারাতে এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা এমন রূপান্তর করা যায়; এবং যদি আমরা এক বার "ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক হউক, বা," ইত্যাদি, শব্দগুলি ব্যবহার করি, তাহা হইলে আমরা

আমাদের নিজের এই বাক্যের ফলের অনুসরণ করিতে বাধ্য হইব।

কথিত হইয়াছে যে, ডিক্রী প্রদত্ত হইলেই ডিক্রীর পূর্ব্বের ক্রোক সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু আমি আইনে এমন কিছু দেখি না যদ্দ্বারা এই অনুমান বৈধ হইতে পারে। এই প্রকার ক্রোকের আইন-সঙ্গত যে কিছু ফল হউক, তাহা যত দূর সম্পূর্ণ হইতে পারে তাহা সেই ক্রোক হওয়ার কালেই সম্পূর্ণ হয়, এবং ক্রোকের যে সম্পূর্ণতা ক্রোক হওয়ার কালে না থাকে তাহা যে পশ্চাতে হইতে পারে, কার্য্য-বিধিতে এমন কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। তর্কিত হইয়াছে যে, যে সম্পত্তি ডিক্রীর পূর্ব্বে একবার ক্রোক হয় তাহা আর ডিক্রীর পরে পুনরায় ক্রোক করার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমি এই তর্কের বিশুদ্ধতা স্বীকার করিতে পারি না। ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার পরে নূতন ক্রোক না হইলে, তাহা একটি গুরুতর অনিয়ম বিবেচিত হইয়া ডিক্রীজারীর নীলাম অন্যথা হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমি কোন মত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, প্রত্যেক ডিক্রীদার তাহার প্রতিযোগী যে সকল ডিক্রীদার তাহার মোকদ্দমায় পক্ষ ছিল না, তাহাদের স্বত্ব বারণ রাখিতে ইচ্ছা করিলে, যে সম্পত্তি হইতে তাহার ডিক্রী পরিশোধ করিয়া লইতে চাহে তাহা সে ক্রোক করিতে বাধ্য হইবে, এবং যে ব্যক্তি ৮৪ ধারা মতে পূর্ব্বে সম্পত্তি ক্রোক করে তাহার অনুকূলে আইনে যে, কোন বিশেষ বিধি আছে এমত আমি অবগত নহি।

২০১ ধারায় বলে যে, "ডিক্রী যদি টাকার নিমিত্তে হয়, তবে তাহা দায়ীর সম্পত্তি 'ক্রোক' ও নীলাম দ্বারা জারী 'হইবে'" ইত্যাদি। ২০৭ ধারায় বলে যে, "যে লোকের পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে, সে যদি তাহা জারী করাইতে চাহে, তবে আদালতে তাহার দরখাস্ত করিতে 'হইবে'" ইত্যাদি। ২১২ ধারায় বলে যে, "ডিক্রীজারীর জন্য যে দরখাস্ত হয় তাহা লিখিয়া দিতে হইবে, এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, যে প্রণালীতে আদালতের সহায়তা চাওয়া হয়, তাহা লিখিতে 'হইবে'।" ২৩২ ধারায় বলে যে, "'ডিক্রী যদি টাকার নিমিত্তে হয়' ও যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হয়, তাহার সম্পত্তি হইতে যদি 'সেই টাকা আদায় করিতে হয়,' তবে আদালত এই প্রকারে সেই সম্পত্তি ক্রোক 'করাইবেন'।" এই সকল ধারাতে "করিতে হইবে" বলিয়া যে বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারাই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন দায়ীর সম্পত্তি হইতে ডিক্রী আদায় করিয়া লওয়ার চেষ্টা হয়, তখন প্রত্যেক স্থলেই ক্রোক অবশ্য করিতে হইবে, এবং যে ডিক্রীদার ৮৪ ধারার বিধান মতে পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করে, তাহার জন্য যে কোন বর্জ্জিত বিধি আছে, এমত আমার দৃষ্ট হয় না।

এমত কথিত হইতে পারে যে, টাকার ডিক্রীজারীতে যে প্রকারে ক্রোক করার বিধান আছে, ৮৫ ধারার বিধানেও ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করার জন্য সেই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করার অনুমতি আছে, এবং ক্রোক দুই বার করিতে হইলে, অনর্থক এক প্রণালীই দুই বার অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই দুই প্রকার ক্রোক করা হয়, তাহার সম্পূর্ণ প্রভেদ আছে, এবং দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সমাজ নিজেই তাহাদের প্রত্যেকের ফল সম্বন্ধে গুরুতর প্রভেদ সংস্থাপন করিয়াছেন। ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, তাহা ডিক্রীজারী করার জন্য ক্রোক নহে, কিন্তু ডিক্রী পশ্চাতে প্রাপ্ত হইয়া জারী করিতে গেলে দায়ী কোন বিলম্ব করিতে অথবা বাধা দিতে না পারে এই জন্যই পূর্ব্বে ক্রোক করা হয়। ডিক্রীর পরে যে ক্রোক হয় তাহা ডিক্রী তৎক্ষণাৎ জারী করার জন্য হয় এবং তাহাতে ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারী করার জন্য দরখাস্ত করিয়াছে অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহা

স্মরণ রাখা উচিত যে, যে পর্য্যন্ত মোকদ্দমা চলিতে থাকে সেই পর্য্যন্তই ৮৪ ধারার অন্তর্গত ক্রোকের প্রার্থনা গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে উত্তমর্ণের দরখাস্ত ক্রমে সেই ক্রোক হয়, সে যে পর্য্যন্ত ডিক্রী না পায় এবং তাহা জারী করার জন্য আইনে যে প্রাথমিক কার্য্যের বিধান আছে তাহা সে পর্য্যন্ত সে অবলম্বন না করে, সে পর্য্যন্ত সে ঐ ক্রোককৃত সম্পত্তির বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিতে পারে না। মনে কর, যদি এক ব্যক্তি ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার ঋণীর সম্পত্তি ক্রোক করাইয়া তাহার পরে ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রী জারীর জন্য আইনে যে তমাদীর কালের বিধান আছে সেই কাল অতীত হওয়ার শেষ দিবস পর্য্যন্ত নিদ্রা যায় অর্থাৎ কোন কার্য্য না করে, তবে সেই শেষ দিবসে সে জাগ্রত হইয়া দাবী করিলে, ইতিমধ্যে অন্যান্য যে সকল ডিক্রীদার উচিত সময়ের মধ্যে ও যত্নের সহিত সম্পত্তি নীলাম করায় তাহাদের অপেক্ষা কি তাহার দাবী প্রবল করা উচিত ও সঙ্গত হইবে? কিন্তু যদি ২৭০ ধারানুযায়ী কার্য্য সম্বন্ধে আমরা এমন নির্দ্দেশ করি যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয় তাহার ফল ডিক্রীর পরের ক্রোকের ফলের তুল্যই হইবে, তাহা হইলে উক্ত দাবীও প্রবল করিতে হইবে।

কথিত হইয়াছে যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয় তাহা ডিক্রী প্রদত্ত হওয়া মাত্রেই ডিক্রীর পরের ক্রোকের তুল্য হয়। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আইন-সঙ্গত রূপে এই রূপ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু যদি তাহাই হয়, তবে প্রথমে যে তারিখে ক্রোক হয়, অথবা যে তারিখে ডিক্রী উচ্চারিত হয়, ইহার কোন্ তারিখ আমরা ক্রোকের তারিখ বলিয়া জ্ঞান করিব? স্বীকৃত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তির দরখাস্তক্রমে ৮৪ ধারানুযায়ী ক্রোক হয়, তাহার ডিক্রী যদি অন্য এক জন ডিক্রীদার কর্ত্তৃক সেই সম্পত্তি ক্রোক হওয়ার পরে প্রদত্ত হয়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তিরই দাবী অগ্রগণ্য হইবে; কিন্তু আইনে এমন কোন্ প্রভেদ-সূচক বিধান দৃষ্ট হয় না, এবং ইহার জন্য যেরূপ ব্যাখ্যার আবশ্যক তাহাও কাজেই অশুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে। ৮৯ ধারার বিধানের দ্বারাই এই বিষয়ের সকল সন্দেহ দূর হয়। সেই ধারার স্পষ্ট বিধান এই যে, "নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বে যে ক্রোক করা যায়, "তাহাতে মোকদ্দমার কোন পক্ষের মধ্যে যাহারা "না হয়, এমত লোকদের স্বত্বের হানি হইবে "না। ও আসামীর বিপক্ষে যে কোন লোক "পূর্ব্বে ডিক্রী পাইয়া থাকে, তাহার সেই ডিক্রী "জারীক্রমে ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির নীলাম "হইবার দরখাস্ত করিতে বাধা হইবে না।"

এই সকল বাক্যের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় ক্রোক হয়, তাহাতে যে সকল প্রতিযোগী উত্তমর্ণ পক্ষ না থাকে, তাহাদের স্বত্বের কোন ক্ষতি ঐ ক্রোকের দ্বারা হয় না, এবং তাহাদের নিজের ডিক্রীজারীতে যে সম্পত্তি ক্রোক থাকে, তাহার নীলামের দরখাস্ত করণেও তাহারা নিবারিত হইতে পারে না। ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, এবং ডিক্রীর পরে যে ক্রোক হয়, তাহার স্পষ্ট প্রভেদ আছে, এবং যদি আমরা এমন নির্দ্দেশ করি যে, ২৭০ ধারার বিধানানুযায়ী কার্য্যের জন্য দুই প্রকার ক্রোকেরই সমতুল্য ফল হইবে, তাহা হইলে আমার বিবেচনায়, এই ধারার বিরুদ্ধ আচরণ করা হইবে। এমত বলা যাইতে পারে যে, যে ব্যক্তি ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিয়া ঋণীর সম্পত্তি আবদ্ধ করে, সে তাহার অধিকতর যত্নের জন্য আদালতের নিকট কিছু অনুগ্রহ পাইতে স্বত্ববান্ হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক কেবল কতিপয় বিশেষ অবস্থায়ই হইতে পারে, এবং এক জন উত্তমর্ণ তাহার যত্নের দ্বারা যে প্রকার সেই সকল অবস্থা অবগত হইতে পারে, হঠাৎ দৈবঘটনায়ও সে তদ্রূপ তাহা অবগত হইতে পারে। কিন্তু সে যাহা হউক, আমাদের কেবল

ডিক্রীজারী করার যত্নের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে, এবং যে ডিক্রীদার তাহার ডিক্রীজারীর জন্য সকল আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছে, সে কেবল ৮৪ ধারামতে ক্রোকের জন্য দরখাস্ত করে নাই বলিয়াই তাহার ত্রুটি হইয়াছে, বলা যাইতে পারে না। আইনের বর্ত্তমান অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপক সমাজ নিজেই ডিক্রীর পূর্ব্বের ও পরের ক্রোকের প্রভেদ করিয়াছেন, এবং আদালত নিজে এক ব্যাখ্যা করিয়া সেই প্রভেদের লোপ করিতে পারেন না।

প্রথম ক্রোককারী উত্তমর্ণ প্রতারণা করিয়া ডিক্রী পাইলে তাহার এক প্রতিকারের উপায় ২৭২ ধারায় আছে, এবং ঐ ধারার বাক্যগুলির দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তল্লিখিত ক্রোক ডিক্রীর পরের ক্রোক, তাহার পূর্ব্বের ক্রোক নহে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীর পূর্ব্ব ক্রোক সম্বন্ধে যদি ২৭০ ধারার বিধান অবলম্বন করা যায়, তবে যখন প্রতারণা-মূলক ডিক্রীদারের দ্বারা ঐ প্রকার ক্রোক হয়, তখন সেই ক্রোক খণ্ডন করার জন্য আইনের আর কোন বিধান থাকে না, কারণ, ২৭২ ধারার বিধান তাহাতে খাটিবে না। যেহেতু বিজ্ঞবর জজ যে সকল নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমার মতভেদ হইতেছে, অতএব আমি এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিব।

রেস্পণ্ডেণ্ট যে আর এক তর্ক উত্থাপন করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা উচিত। কথিত হইয়াছে যে, আপেলাণ্টদিগের ডিক্রীজারীর ক্রোক সম্বন্ধীয় কাগজাতে কতকগুলি কাটকুট আছে। কিন্তু লেখার সময়ে যে বাস্তবিক সরলান্তঃকরণে ঐ সকল কাটকুট হয় নাই এমত আমার প্রতীতি হইতেছে না, এবং আপেলাণ্টগণ যে শঠতা-পূর্ব্বক তাহা করিয়াছে, ইহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই। বরং যদি সরলান্তঃকরণে ঐ সকল কাটকুট না হওয়া অনুমান করার কারণ থাকে, তবে রেস্পণ্ডেণ্টের নিজের বিরুদ্ধেই সন্দেহ হয়। এই কথা একেবারেই অমূলক বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করিলাম।

পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত প্রশ্ন এই যে,

১ ম। যে উত্তমর্ণ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮৪ ধারা মতে তাহার ঋণীর সম্পত্তি ক্রোক করে, সে সেই সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিবার কালে নূতন করিয়া ক্রোক করিতে বাধ্য কি না?

২ য়। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৭০ ধারানুযায়ী কার্য্যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, তাহারও ডিক্রীর পরে যে ক্রোক হয় তাহার, ফল সমতুল্য কি না; এবং যদি তাহাই হয়, তবে কোন্ তারিখ হইতে, অর্থাৎ যে তারিখে প্রথম ঐ ক্রোক হয়, সেই তারিখ কি যে তারিখে ক্রোকের পরে ডিক্রী হয়, সেই তারিখ হইতে ঐ ফল গণনা করিতে হইবে?

বিচারপতি লক।—এই দুই প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে আমি সম্মত হইলাম।

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

বিচারপতি নর্ম্যান।—এই মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদী একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৮৬৬ সালের ৫ ই অক্টোবর তারিখে পৃথক্ পৃথক্ ডিক্রী পায়। বাদী ডিক্রীর পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৭ এ আগষ্ট তারিখে, ঋণীর এমত পরিমাণের সম্পত্তি ক্রোক করে, যদ্দ্বারা তাহার ডিক্রী পরিশোধিত হইতে পারিত। ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৮৪ ধারা মতে, এই সম্পত্তি দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে ক্রোক হয়।

ডিক্রী হওয়ার অব্যবহিত পরে দুই ডিক্রীদারই একই তারিখে ডিক্রীজারীর জন্য দরখাস্ত করে। ডিক্রীজারীর পরওয়ানা আদালতের হুকুমানুযায়ী একই কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পিত হয়, এবং এক সময়েই ঐ ডিক্রীজারী হয়। প্রশ্ন এই যে, বাদী প্রথম ক্রোককারী উত্তমর্ণ বিধায় ২৭০ ধারা মতে অগ্রগণ্য হইতে পারে কি না।

প্রশ্ন এই যে, "সে কি ঐ ব্যক্তি যাহার দরখাস্ত "অনুসারে সম্পত্তি প্রথমে ক্রোক হয়," কারণ,

যদি তাহা হয়, তবে ২৭০ ধারার বিধানমতে সে অগ্রগণ্য হইবে। ৪র্থ অধ্যায়ের যে সকল ধারা ডিক্রীর পরের ক্রোকের সহিত সম্বন্ধ রাখে, তাহার মধ্যে ঐ ধারা নহে। "ক্রোককৃত" শব্দে যে কেবল ডিক্রীর পরে ক্রোক হওয়া বুঝাইবে, আমার এমন কিছু দৃষ্ট হয় না; ঐ বাক্য সম্পূর্ণ ব্যাপক। রায়ের পূর্ব্বে ক্রোক হইয়াছে বলিয়া তাহা ক্রোক নহে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। ইহা সত্য বটে যে, ৮৯ ধারার বিধান এই যে, যে সকল ব্যক্তি মোকদ্দমার পক্ষ নহে, রায়ের পূর্ব্ব ক্রোকের দ্বারা তাহাদের স্বত্বের ক্ষতি হইবে না। কিন্তু ৮৪ ধারানুযায়ী ক্রোক দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্ত, অর্থাৎ কেবল রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে নহে কিন্তু তাহা প্রদত্ত হওয়ার পরেও জারী থাকিবে। ৮৯ ধারায় ইহাও লেখা আছে যে, প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যে ব্যক্তির হস্তে ডিক্রী থাকে রায়ের পূর্ব্ব ক্রোকের দ্বারা, সে তাহার ডিক্রী-জারীতে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য দরখাস্ত করিতে নিবারিত হইবে না। কেবল প্রথম ক্রোককারী উত্তমর্ণই ডিক্রীজারীতে সম্পত্তি ক্রোক করিতে স্বত্ববান হইবে, এমন নহে, যে কোন ডিক্রীদার রায়ের পরে ক্রোক করে সে ব্যক্তিও তাহা করিতে স্বত্ববান্ হইবে।

আমার বোধ হয় যে, যদি দুই উত্তমর্ণের মধ্যে এক জন তাহার প্রতিকার পাওয়ার উপায় যত্নের সহিত অবলম্বন করত দেখে যে, তাহার ঋণী পলায়ন করিতেছে, এবং ঋণী যে সম্পত্তি গোপন করিতেছে তাহা সে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে এবং তাহার দাবী যথেষ্টরূপে পরিশোধিত হয় এমত পরিমাণে সেই সম্পত্তির সম্পূর্ণ অথবা কিয়দংশ ক্রোক করায়, এবং কেবল ক্রোক করার ব্যয় বহন করে এমন নহে, ২৪৬ ধারামতে যে সকল ব্যক্তি ক্রোকের বিরুদ্ধে মোজাহেম দেয় তাহাদের সহিত মোকদ্দমা করার ব্যয়ও বহন করে, তবে এরূপ যত্নশীল উত্তমর্ণদিগের প্রতি আদালতের অনুগ্রহ প্রকাশ করার যে নিয়ম আছে, তদনুসারে এমন ব্যক্তি, অন্যান্য যে ব্যক্তি ঐ প্রকার যত্নের সহিত কার্য্য করে নাই এবং ব্যয় স্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই, তাহাদের অপেক্ষা অবশ্য অগ্রগণ্য হইবে। যদিও আমার মতের শুদ্ধতার প্রতি আমার অনেক সন্দেহ আছে, কারণ, আমি যে যে হেতু সমূহের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম তাহার কোন কোন হেতু যে কর্ম্মণ্য নহে এ বিষয় আমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তথাপি বোর্কের রিপোর্টের ১৩৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত রাজচন্দ্র রায় বনাম ঈশ্বরচন্দ্র রায়ের মোকদ্দমায় আমি যে রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, ৮৯ ও ২৭০ ধারা একত্রে পাঠ করিতে হইবে, এবং ৮৯ ধারার দ্বারা, ক্রোককারক উত্তমর্ণ রায় প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার প্রতিযোগী উত্তমর্ণ অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর স্বত্ব পাইতে পারে না; সেই রায় আমি এইক্ষণেও স্থির রাখিব। সে যে পর্য্যন্ত ডিক্রী না পায় সে পর্য্যন্ত সে ৮৪ ধারার অন্তর্গত কোন স্বত্ব পাইলেও, অন্য ডিক্রীদার ঐ সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিতে পারে। কিন্তু তাহার ডিক্রী পাওয়ার পূর্ব্বে যে সকল ডিক্রীদার ক্রোক করিয়া অগ্রগণ্য হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ভিন্ন ডিক্রী পাওয়ার পরে ৮৯ ধারার বিধানের দ্বারা তাহার স্বত্বের কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

আমার বোধ হয় যে, ২৭০ ধারার বাক্যগুলির এই প্রকার অর্থ করা যাইতে পারে, এবং যদি তাহাই হয় তবে তদনুযায়ী আমাদের কার্য্য করা উচিত। যে সকল তর্কের দ্বারা সচরাচর প্রথম ক্রোককারী উত্তমর্ণকে অন্যান্য উত্তমর্ণ অপেক্ষা অগ্রগণ্য করা যায়, তাহা যে উত্তমর্ণ পলায়নপর ঋণীর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আবদ্ধ করে তাহার সম্বন্ধে আরো প্রবলরূপে খাটে, এবং সে যে তাহার নিজের জন্যই ঐ ক্রোক করে এমত নহে, কারণ, তাহার ডিক্রী পাওয়ার পূর্ব্বে যদি অন্য ডিক্রীদার ক্রোক করে, তবে সেই ব্যক্তি তাহার অগ্রগণ্য হইবে।

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—আমার বোধ হয় যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৮১ ধারা হইতে যে সকল ধারায় রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোকের বিধান আছে, সেই সকল ধারানুযায়ী ক্রোক ২৭০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত ক্রোক নহে, এবং যে ব্যক্তি রায়ের পূর্ব্বে ক্রোক করে সে যদি তাহার ডিক্রী আদায় করিয়া লইবার জন্য সেই সম্পত্তি অবলম্বন করিতে চাহে, তবে ৪ র্থ অধ্যায়ের বিধানানুসারে তাহার ডিক্রীজারীতে সেই সম্পত্তির বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে হইবে। এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করার কালে বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যে রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তদতিরিক্ত আমার অধিক বলিবার নাই, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় তাহা সেই ব্যক্তি ডিক্রী পাইবামাত্রেই সেই ডিক্রীর অন্তর্গত ক্রোক হয় না। যে ব্যক্তির সম্পত্তি রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে ক্রোক হয়, সে ডিক্রী প্রতিপালন করার জন্য জামিন দিলে ক্রোক রহিত করাইতে পারে। মনে কর, কোন বাদী ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করত পশ্চাতে ডিক্রী পাইয়া চুপ করিয়া থাকে, এবং তাহার ডিক্রীর অন্তর্গত কোন কার্য্য করে না; এবং মনে কর, ডিক্রীর তারিখ হইতে ২ বৎসর এবং ৩৬০ দিবস অতীত হইবার পরে প্রতিবাদী আসিয়া ডিক্রী প্রতিপালন করার জন্য ৮৭ ধারামতে জামিন দেয়; তাহা হইলে আমি বোধ করি সে ক্রোক রহিত করাইতে পারে এবং প্রতিবাদীর দরখাস্ত অনুসারে ক্রোক উঠাইয়া লওয়া বাদীর ডিক্রীজারীর কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

মনে কর, বাদী, ক্রোক উঠাইয়া লওয়ার অর্দ্ধ বৎসর পরে তাহার ডিক্রী যাহা সে ক্রোক উঠাইয়া লওয়ার ২ বৎসর ৩৬০ দিবস পূর্ব্বে প্রাপ্ত হয়, সেই ডিক্রীজারী করার জন্য দরখাস্ত করে; তাহা হইলে তমাদীর আইনের দ্বারা সে বারিত হইবে, কারণ, তাহার ডিক্রী পাওয়ার ৩ বৎসরের মধ্যে সে ডিক্রীজারী করার কোন উপায় অবলম্বন করে নাই, এবং সে এমন কথা বলিতে পারে না যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে সে যে সম্পত্তি ক্রোক করে তাহা ঐ ২ বৎসর ও ৩৬০ দিবস পর্য্যন্ত তাহার ডিক্রীজারীতে ক্রোকী সম্পত্তি ছিল।

পরন্তু, যদি ২৭০ ধারার লিখিত "ক্রোক" শব্দে ডিক্রীর পূর্ব্বের ক্রোক বুঝায়, তাহা হইলে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৮৯ ধারা এককালে অকর্ম্মণ্য হইবে। মনে কর, শ্যাম ১ লা জানুয়ারি তারিখে এক ডিক্রী পায় এবং তাহার ডিক্রীজারীতে সেই তারিখেই সম্পত্তি ক্রোক করে। ৮৯ ধারানুযায়ী তাহা তাহার করিবার স্বত্ব আছে, এবং ডিক্রীজারীতে তাহার এই ক্রোক, অন্যান্য উত্তমর্ণ ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক করিয়াছে তাহা অপেক্ষা প্রবল হইবে।

আমার বোধ হয় যে, ২৭০ ধারার লিখিত "ক্রোককৃত" শব্দ ৪ র্থ অধ্যায়ের মর্ম্মান্তর্গত ডিক্রীজারীর ক্রোক বুঝায়, এবং ২৪২ ধারার লিখিত "পূর্ব্ব ধারার অন্তর্গত সকল ক্রোক" এই শব্দগুলি ডিক্রীজারীর বিষয়ে ৪ র্থ অধ্যায়ের পূর্ব্ব ধারা সকলকে বুঝায়, ৮১ ধারার ও তাহার পরের প্রকরণগুলির লিখিত পূর্ব্ব ক্রোক বুঝায় না, কারণ, তাহার ও ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় ধারাগুলির মধ্যে মোকদ্দমার বিচার ও অন্যান্য কথা সম্বন্ধীয় অনেক বিষয়ের বিধান আছে যাহার সহিত ডিক্রীজারীর কোন সম্পর্ক নাই।

আমার মত এই যে, যে স্থলে উপস্থিত মোকদ্দমায় দুই পক্ষই একই সময়ে ডিক্রী পাইয়াছে এবং একই সময়ে সম্পত্তি ক্রোক করিয়াছে, সে স্থলে তাহাদের মধ্যে ডিক্রীজারীর নীলামের টাকা বিভক্ত হইবে, এবং যে পক্ষ ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিয়াছিল সে ঐ রূপ ক্রোক করিয়াছিল বলিয়াই অগ্রগণ্য হইতে পারে না। যদি আমরা এমন নির্দ্দেশ করি যে, সে ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করিয়াছিল বলিয়াই অগ্রগণ্য হইবে, তাহা হইলে আমাদের বস্তুতঃ এই নির্দ্দেশ করা হইবে যে, তঙ্কক ঋণী আদালতের বিচারাধিকার

হইতে তাহার সম্পত্তি অন্তরিত করিতে চেষ্টা করিলে উত্তমর্ণ অগ্রগণ্য হইবে, কিন্তু ঋণী সৎ হইলে এবং আইন এড়াইবার চেষ্টা না করিলে সে অগ্রগণ্য হইত না।

ডিক্রীজারীতে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে তাহাই বিশুদ্ধ; অতএব জাবেতা নালিশে তাহা অন্যথা করিয়া যে ডিক্রী হয় তাহা ভ্রমাত্মক এবং তাহা অন্যথা করিতে হইবে। অতএব নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তি সকল খরচা সমেত অন্যথা হইল।

আমার ইহাও বলা উচিত যে, এই নিষ্পত্তি নূতন ইণ্ডিয়ান জুরিষ্টের ১ ম বালমের ২৭৩ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তি ও বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের ২ য় বালমের ১৪৯ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তির সহিত ঐক্য, এবং বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের রিপোর্টরের সেই বালমের ১৫৯ পৃষ্ঠার এক নিষ্পত্তি যাহাতে সেই আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, ডিক্রীজারীর পূর্ব্বে নাজীর যে সম্পত্তি ক্রোক করিয়া আপন হস্তগত করে তাহা সে ডিক্রীজারীর ক্রোকে পুনরায় ধৃত করিতে বাধ্য নহে, তাহাও এই নিষ্পত্তির সহিত অনৈক্য নহে।

বিচারপতি কেম্প।—প্রধান বিচারপতির রায়ে আমি সম্মত।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।—আমার মত এই যে, যে বিচারাদিষ্ট উত্তমর্ণ ডিক্রীর পূর্ব্বে তাহার ঋণীর সম্পত্তি দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৮৪ ধারা মতে ক্রোক করে, তাহার সেই সম্পত্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিবার পূর্ব্বে অবশ্য পুনরায় ক্রোক করিতে হইবে।

নালিশ চলিবার কালে প্রতিবাদী তাহার সম্পত্তি স্থানান্তর করত বাদীর ক্ষতি না করিতে পারে, কেবল ইহাই ৮১,৮৩ ও ৮৪ ধারার উদ্দেশ্য। বাদীর অনুকূলে যাহা কিছু ডিক্রী হইবে, তাহা সর্ব্বস্থলেই আদায় করার উপায় এই সকল ধারার দ্বারা রক্ষিত হয় না, কেবল প্রতিবাদী সম্পত্তি হস্তান্তর বা স্থানান্তর করিতে না পারে, এই পর্য্যন্তই বাদীর স্বত্ব তদ্দ্বারা রক্ষিত হয়।

৮৩ ও ৮৪ ধারা মতে, প্রতিবাদী যদি আদালতের হুকুমের লিখিত টাকার উপযুক্ত জামিন এই সর্ত্তে দেয় যে, সে আবশ্যক হইলেই কথিত সম্পত্তি বা তাহার মূল্য বা তাহার যে অংশ ডিক্রী পরিশোধার্থে যথেষ্ট হয়, তাহা উপস্থিত করিবে, এবং আদালতের হস্তে অর্পণ করিবে, তাহা হইলে, ক্রোক জারী হইবে না। যদি জামিন প্রদত্ত না হয়, তবে সেই সম্পত্তি অথবা তাহার যে ভাগের দ্বারা ডিক্রী পরিশোধিত হইতে পারে, তাহা ক্রোক করা যাইতে পারে। "মোকদ্দমায় তাহার বিরুদ্ধে যে কোন ডিক্রী "প্রদত্ত হইবে, তাহা পরিশোধ করার জন্য "জামিন" এই যে, ব্যাপক শব্দগুলি ৮৩ ধারায় ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা কি ভাবের জামিন লইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে ৮৩ ধারায় যে এই বিধান আছে যে, "আবশ্যক মতে ঐ সম্পত্তি উপস্থিত করিতেও "আদালতের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে" ইত্যাদি, তদ্দ্বারা, ব্যাখ্যাত ও সীমাবদ্ধ হইয়াছে। ঐ ধারা সকল ঐ প্রকার পঠিত হইলে, স্পষ্ট দেখা যায় যে, সম্পত্তি অন্যায় রূপে হস্তান্তরিত না হয়, এবং সেই গতিকে বাদীর কোন ক্ষতি না হয়, কেবল ইহাই উদ্দেশ্য। ইহাই যে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা, তাহা ৮৯ ধারার দ্বারাই প্রকাশ, কারণ, তাহাতে ব্যক্ত আছে যে, যে সকল ব্যক্তি মোকদ্দমার পক্ষ নহে, ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোকের দ্বারা তাহাদের স্বত্বের ক্ষতি হইবে না, কিন্তু যে ব্যক্তি ডিক্রীর পূর্ব্বে ক্রোক করে, সে পরে ডিক্রী পাইলেই যদি ঐ ক্রোকের দ্বারা তাহার অনুকূলে সম্পত্তি রক্ষিত হয়, তবে ঐ বিধান ইহার সহিত অসংলগ্ন হইবে।

অধিকন্তু দেখা যাইতেছে যে, কেবল দ্বিতীয় হুকুম পর্য্যন্তই ক্রোক থাকিবে। যে প্রতিবাদী আদালতের এলাকা ছাড়িয়া অন্য স্থানে যাইতে উদ্যত হয়, তাহাকে রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করার বিধান যে ৭৮ ধারায় আছে, তাহাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, "মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না

হওয়া পর্য্যন্ত, অথবা প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি হইলে, ডিক্রীজারী না হওয়া পর্য্যন্ত” তাহাকে ক্রোক রাখা যাইতে পারে। পশ্চাতে প্রাপ্ত ডিক্রীজারীর জন্য ডিক্রীর পূর্ব্বের ক্রোক যথেষ্ট হওয়াই যদি অভিপ্রেত হইত, তবে ঐ বাক্যগুলি অথবা তদনুরূপ বাক্য ৮১, ও ৮৩ ও ৮৪ ধারায় ব্যবহৃত হইত।

এই সকল ধারার বাক্যের ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিয়া, “সম্পত্তি ক্রোকের দ্বারা টাকার ডিক্রী-জারী সম্বন্ধে” দেওয়ানী কার্য্য-বিধির যে ভাগ বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, ২৩২ ধারায় ব্যক্ত আছে যে, যদি প্রতিবাদীর সম্পত্তি হইতে ডিক্রীর টাকা আদায় করিয়া লইতে হয়, তবে “‘নিম্নলিখিত রূপে’ আদালত “সেই সম্পত্তি ক্রোক করাইবেন।” “নিম্নলিখিত রূপ” কি তাহা পশ্চাতের ধারা গুলিতে বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু রায় প্রদত্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, তাহা যে ডিক্রীর পরে তাহা জারীর ক্রোক স্বরূপে পরিগণিত হইবে, ইহা উহার কোন ধারাতেই উল্লিখিত নাই। ২৪৬ ধারায় রায়ের পূর্ব্বে ক্রোকের কথা লেখা আছে, কিন্তু ৮৬ ধারার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীজারীর নীলামের প্রতি যে আপত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে ঐ বর্ণনা হয় নাই, কেবল যে তৃতীয় ব্যক্তিগণ মোক্তাহেম দিয়া বলে যে, ঐ সম্পত্তি তাহাদের সম্পত্তি এবং বিচারের পূর্ব্বে ক্রোক হওয়া উচিত ছিল না, তাহাদের দাবী সম্বন্ধেই হইয়াছে।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের বিধান সমস্ত সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়া আমার এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, তাহা ডিক্রীর পরে যদিও এমন বলবৎ থাকে যে, তদ্দারা ঐ সম্পত্তি আদালতের হস্তে থাকে, তথাপি যে ব্যক্তি তাহা ক্রোক করে, সে যদি ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে তাহার ডিক্রীজারী করিতে ইচ্ছা করে, তবে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অন্য ডিক্রী-দার ঐ সম্পত্তি ক্রোক করিতে ইচ্ছা করিলে যে প্রকার কার্য্য করিতে বাধ্য, সেই ব্যক্তিও সেই প্রকার তাহা নূতন করিয়া ক্রোক করিতে বাধ্য।

২৭০ ধারা যাহা ডিক্রীজারীর বিধান-সূচক ধারা সমস্তের মধ্যে আছে, তাহাতে “যে ব্যক্তির “দরখাস্ত অনুসারে ঐ সম্পত্তি ক্রোক হয়” বলিয়া যে বাক্য আছে, তাহা কেবল ডিক্রীর পরে যে ক্রোক হয়, তৎসম্বন্ধেই খাটে, ডিক্রীর পূর্ব্বে যে ক্রোক হয়, তৎসম্বন্ধে খাটে না।

আমাদের রায়ের জন্য যে সকল প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে, বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি তাহার যে উত্তর দেওয়ার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেই আমি সম্মত।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমিও প্রধান বিচারপতির মতে সম্মত। (গ)

১০ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

### প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট ও বিচারপতি এফ, বি, কেম্প; এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন; দ্বারকানাথ মিত্র ও সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনরের ১৮৬৮ সালের ৩১ এ অক্টোবরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

১৮৬৯ সালের ২৪ নং মোকদ্দমা।

প্রতাপচন্দ্র বরুয়া (বাদী) আপেলাণ্ট।

রাণী স্বর্ণময়ী (প্রতিবাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং আর, টি, এলেন ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দাস, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভবানীচরণ দত্ত রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

১৮৬৯ সালের ২৭ নং মোকদ্দমা।

রাণী স্বর্ণময়ী (প্রতিবাদিনী) আপেলাণ্ট।

প্রতাপচন্দ্র বরুয়া (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনাথ দাস, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতী-চরণ ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর, টি, এলেন ও বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এবং তারিণীকান্ত ভট্টা-চার্য্য রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ওয়াশীলাৎ সমেত ভূমির দখল পাওয়ার নালিশ প্রথম আদালত ডিস্মিস্ করিলে, বাদী কেবল ভূমির দখল সম্বন্ধে আপীল করিয়া দখলের ডিক্রী পায়, কিন্তু সেই ডিক্রীতে ওয়াশী-লাতের কোন হুকুম বা প্রসঙ্গ থাকে না। বাদী এই ডিক্রীজারী করত দখল লইয়া, বেদখল হওয়ার তারিখ হইতে আপীল-আদালতের ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ পাওয়ার দাবীতে নূতন নালিশ উপস্থিত করে। এমত স্থলে, ওয়াশীলাতের জন্য এই নূতন নালিশ দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২ বা ৭ কিম্বা ১৯৬ ধারা মতে, অথবা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা মতে বারিত গণ্য হইতে পারে না।

বিচারপতি নর্ম্যান ও ই জ্যাক্সনের নিম্ন-লিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণা-ধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

বিচারপতি নর্ম্যান।—১৮৫২ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বরে বেদখল হওনাবধি ১৮৬৪ সালের ২৫ এ ডিসেম্বর তারিখে ডিক্রীজারীতে দখল পাওয়ার সময় পর্য্যন্ত সাহেব আল্গা ও জয়না-রায়ণ মারা নামক চরের প্রতি বিঘা বার্ষিক সিক্কা।৴০ আনার হিসাবে ১২ বৎসর ৩ মাস ১১ দিবসের ওয়াশীলাৎ পাওয়ার জন্য বাদী নালিশ করে। যে মোকদ্দমায় সে চরের পুনঃদখল পায়, তাহা ১৮৫৫ সালের এপ্রিল মাসে উপস্থিত হয়। উহা ওয়াশীলাৎ সমেত দখল পাওয়ার নালিশ ছিল। রঙ্গপুরের জজের ১৮৫৯ সালের ১৫ ই জুনের ডিক্রী দ্বারা বাদীর নালিশ একেবারে ডিস্মিস্ হয়।

সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদী আপীল করে, এবং হাইকোর্ট কর্ত্তৃক ১৮৬৩ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রঙ্গপুরের জজের ডিক্রী অন্যথা হয়।

বাদীর আপীলের দরখাস্ত অনুসারে প্রধান-তম বিচারালয়ের যে ডিক্রী হয় তাহাতে ওয়াশী-লাৎ ব্যতীত বাদীকে কেবল দখল দেওয়া হয়, এবং তাহাতে ওয়াশীলাতের কোন প্রসঙ্গই নাই। বাদী ডিক্রীজারীতে ১৮৬৪ সালের ২০ এ ডিসেম্বর তারিখে চরের দখল পায়, এবং ওয়াশীলাতের জন্য ১৮৬৫ সালের ২৮ এ আগষ্ট তারিখে বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত করে। নিম্ন আদালত বাদীকে ১৮৫২ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ তাহার বেদখলের তারিখ হইতে ১৮৫৫ সালের এপ্রিল অর্থাৎ তাহার পূর্ব্ব নালি-শের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দেন।

বাদীর অনুকূলে প্রধানতম বিচারালয় যে ভূমির ডিক্রী দেন, তাহার মূল মোকদ্দমার তারিখ হইতে ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে প্রধানতম বিচা-রালয়ের ডিক্রীতে কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া ডেপুটি কমিসনর বিবেচনা করেন যে, বাদীর ঐ ওয়াশীলাৎ পাওয়ার দাবেতা নালিশ বারিত হইয়াছে, এবং তিনি বলেন যে, প্রথম মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করাই বাদীর প্রতিকারের উপায় ছিল।

দুই পক্ষই ডেপুটি কমিসনরের এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল করিয়াছে।

প্রতিবাদিনী-সম্বন্ধে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৫২ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৫৫ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের দাবী তমা-দীর দ্বারা বারিত হইয়াছে; অতএব বাদীকে যে টাকা দেওয়ার হুকুম হইয়াছে তাহা অন্যথা হইবে।

কিন্তু বাদী আপেলাণ্ট তর্ক করে যে, তমাদি-

শের পূর্ব্ব ৬ বৎসরের অথবা তমাদীর আইনের বিধান মতে যে কালের জন্য সে ওয়াশীলাৎ পাইতে পারে, তাহা সে পাইতে স্বত্ববান্।

৬ ষ্ঠ বাঃ উঃ রিঃ ৬৮ পৃঃ ও ১০ ম বাঃ উঃ রিঃ ৪৮৬ পৃষ্ঠায় বিচারপতি ম্যাকফার্সনের দুই নিষ্পত্তি আছে, কিন্তু তাহার বিশুদ্ধতার প্রতি আমার সন্দেহ আছে, এবং আমি বিবেচনা করি যে, পূর্ণাধিবেশনে এই প্রশ্ন অর্পণ করিতে হইবে যে, যদি কোন বাদী ওয়াশীলাৎ সমেত দখলের দাবী করে, এবং প্রথম আদালতে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হওয়ার পরে কেবল দখলের বিষয়ে আপীল করিয়া কেবল দখলের ডিক্রী পায় এবং তাহাতে ওয়াশীলাতের কোন প্রসঙ্গ না থাকে, এবং তাহার পরে ঐ ডিক্রীকৃত ভূমির দখল পায়, তাহা হইলে সে নূতন নালিশের দ্বারা সেই ওয়াশীলাৎ পাইতে পারে কি না, যাহা তাহার প্রথম মোকদ্দমায়ই প্রদত্ত হইতে পারিত, কিন্তু প্রদত্ত হয় নাই।

আমার বোধ হয় যে, যে আদালতের সমক্ষে এই দুই মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তিনি ৭ ধারার বিধান পর্য্যালোচনা করেন নাই। তাঁহার নিষ্পত্তি হাইকোর্টের রিপোর্টরের ২ য় বালমের ২৩৫ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তির সহিত অনৈক্য, এবং ১০ ম বাঃ উঃ রিঃ প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তির ১ ম ও ৩ য় পৃষ্ঠায় রঘুনাথ পেয়ারা উদয় তাবর বনাম কাটামা নাচিয়ারের মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি হইয়াছে বোধ হয় তাহার সহিতও অনৈক্য।

আমার নিজের মত এই যে, প্রথম মোকদ্দমায় যে ওয়াশীলাৎ পাওয়া যাইতে পারিত, তাহা বাদী পাওয়ার ইচ্ছা করিলে তাহার দাবী পরিচালন করা উচিত ছিল, কিন্তু যে স্থলে সে তাহা করে নাই, সে স্থলে তৎসম্বন্ধে সে নূতন নালিশ উপস্থিত করিতে পারে না। এই বিষয়ে পূর্ণাধিবেশনের রায়ের অপেক্ষায় প্রধানতম বিচারালয়ের ১৮৬৩ সালের ১৮ ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ডিক্রী হইতে ১৮৬৪ সালের ২৫ এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কত ওয়াশীলাৎ হইয়াছে তাহার তদন্ত করার জন্য মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

ডিক্রীর বর্তমান অবস্থায় তাহা অসম্পূর্ণ, কারণ, এই মোকদ্দমায় যাহা বিচার্য্য ইসু, এবং যাহা কেবল ডিক্রীজারীতে বিচারিত হইবে না, তাহাই বিচারিত হয় নাই।

যে পর্য্যন্ত পূর্ণাধিবেশনের দ্বারা এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত মোকদ্দমার নথী এই আদালতেই থাকিবে।

পক্ষগণ স্বীকার করিয়াছে যে, ২৭ নং আপীলও এই নিষ্পত্তির অনুগামী হইবে।

**বিচারপতি জ্যাক্সন।**—বিচারপতি নর্ম্যানের মতে সম্মত হইয়া আমি বলিতেছি যে, কমিসনর ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের যে ডিক্রী দিয়াছেন তাহা অন্যথা হইবে, এবং সেই ওয়াশীলাতের দাবী তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে বলিয়া ডিস্মিস্ হইবে।

এই আদালতে বাদীর আপীল সম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, এই হেতুবাদে বাদীর ১৮৫৫ সাল হইতে ১৮৫৯ সালের ওয়াশীলাতের দাবী ডিস্মিস্ করিতে হইবে যে, বাদী ইহার পূর্ব্বেই ঐ ওয়াশীলাতের জন্য নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল, এবং সেই মোকদ্দমা উপযুক্ত আদালতের দ্বারা বিচারিত ও নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং সেই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইয়াছে। সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বাদী আপীল করিতে পারিত, কিন্তু তাহা সে করে নাই। সে সেই নালিশের হেতুর উপরে নূতন নালিশ উপস্থিত করিতে পারে না।

কিন্তু ১৮৫৯ সালের পরের ওয়াশীলাতের জন্য বাদীর দাবী অগ্রাহ্য করার কোন হেতু আমি দেখি না। এই ওয়াশীলাতের জন্য কোন মোকদ্দমা হয় নাই এবং যদি ইহা নির্দ্দেশ করা

যাইতে পারে যে, প্রথম মোকদ্দমার আরজীতে ঐ ওয়াশীলাৎ ভুক্ত ছিল, তাহা হইলেও তদ্বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি হয় নাই। যে তারিখে নিষ্পত্তি হয় সেই তারিখ পর্য্যন্ত যে ওয়াশীলাৎ পাওনা হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে কেবল তৎসম্বন্ধেই নিষ্পত্তি হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে।

আমার বিবেচনায়, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭, ৮ ও ৯ ধারায় এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা উপস্থিত মোকদ্দমা বারিত হইতে পারে। আমার বিবেচনায়, বাদী নালিশ করিতে কোন ত্রুটি বা আপন স্বত্ব পরিত্যাগ করে নাই। বস্তুতঃ, সে ওয়াশীলাতের জন্য নালিশ করিয়াছিল। ইহা সত্য বটে যে, বাদী আপীল করিতে ত্রুটি করিয়াছিল। কিন্তু আইন অনুসারে, সে আপীল করিতে বাধ্য ছিল না এবং যে পর্য্যন্ত বাদীর বিরুদ্ধে প্রথম আদালতের ডিক্রী হয় এবং তাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় নাই, কেবল সেই পর্য্যন্তই বাদী অতিরিক্ত নালিশ করিতে বারিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অধিক বারিত হয় নাই। এই বিষয়ে অধিক তর্কবিতর্ক হয় নাই, এবং যে স্থলে এই প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হইয়াছে, সে স্থলে এক্ষণে তাহার নিষ্পত্তি করার আবশ্যক নাই।

১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালের ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে বিচারপতি নর্ম্যাণের সহিত এক মতে আমি বলিতেছি যে, বাদী ডিক্রী পাইতে স্বত্ববান্।

## পূর্ণাধিবেশনের রায় ঃ—

**প্রধান বিচারপতি পীকক্।**—বাদী ১৮৫৫ সালে ভূমির পুনঃদখল পাওয়ার জন্য নালিশ করে এবং সেই নালিশে সে বেদখলের তারিখ হইতে ওয়াশীলাতেরও প্রার্থনা করে। আমি বিবেচনা করি যে, বাদী যে তারিখ হইতে বেদখল হয় সেই তারিখ হইতে ডিক্রীর সময় পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের দাবী করা হয়। জেলার আদালত ১৮৫৯ সালে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন এবং নির্দ্দেশ করেন যে, বাদী দখল পাইতে পারে না। ঐ আদালত ওয়াশীলাতের কোন উল্লেখ করেন নাই, এবং স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সেই মোকদ্দমায় বাদীর স্বত্বের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করাতে আদালত তাহাকে ওয়াশীলাৎ দিতেও পারিতেন না। বাদী হাইকোর্টে আপীল করে এবং সেই আদালত জেলার আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া এই ডিক্রী দেন যে, বাদী দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু হাইকোর্ট ওয়াশীলাতের কোন হুকুম দেন নাই। প্রশ্ন এই যে, ১৮৫৯ সালে জেলার আদালত যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন সেই সময় হইতে বাদী তাহার ডিক্রীর অন্তর্গত দখল পাওয়ার সময় পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ পাওয়ার জন্য নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারে কি না।

তর্কিত হইয়াছে যে, এই সকল ওয়াশীলাতের জন্য বাদী স্বতন্ত্র নালিশ উপস্থিত করিতে স্বত্ববান নহে। বাদীর দাবী ৭ ধারার বিধানমতে বারিত হইয়াছে কি ১১৬ ধারার বিধানমতে বারিত হইয়াছে, ইহার মীমাংসা করার জন্য আমাদের নিকট প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে কি না, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে বাদীর স্বত্বের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আদালতের নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া এই নালিশ ঐ আইনের ২ ধারার দ্বারা বারিত কি না, সেই প্রশ্ন যে, আমাদের নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত হয় নাই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

বিচারপতি নর্ম্যান যে বলেন যে, ৭ ধারার বিধান যথোচিতরূপে পর্য্যালোচিত হয় নাই, তৎসম্বন্ধে আমি বিবেচনা করি যে, বাদী ১৮৫৫ সালে যে নালিশ উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতে, সে যে সময়ে ডিক্রী পাইত সেই সময় হইতে সেই ডিক্রীর অন্তর্গত দখল পাওয়ার সময় পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের দাবী করিতে বাধ্য ছিল না।

৭ ধারায় বলে যে, নালিশের হেতু হইতে যে কোন দাবী উত্থাপিত হয় তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যেক মোকদ্দমারই উপস্থিত করিতে হইবে। বাদী যে সময়ে ডিক্রী পাইত এবং যে সময়ে সে সেই ডিক্রীর অন্তর্গত দখল পাইত, এই মধ্যবর্ত্তী

সময়ের ওয়াশীলাতের দাবী তাহার আরজী দাখিল করার কালে বর্ত্তমান ছিল না, অতএব সে তাহার আরজীতে ঐ ওয়াশীলাতের দাবী উপস্থিত করিতে পারিত না। তাহা ছাড়াও, আমি বিবেচনা করি যে, সে দখলের জন্য নালিশে তাহার ওয়াশীলাতের দাবী উপস্থিত করিতে বাধ্য ছিল না।

এই বিষয়ে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১০ ধারার বিধান অতি পরিষ্কার। ১৮৫৯ সালের ডিক্রীর তারিখ হইতে, যে সময়ে সে দখল পায় সেই সময় পর্য্যন্তের ওয়াশীলাতের দাবী তাহার ১৮৫৫ সালের নালিশের মধ্যে উপস্থিত করে নাই বলিয়া সে বারিত নহে। ১৮৫৫ সালে সে যে নালিশ করে তাহাতে সে ১৮৫৯ সাল হইতে ১৮৬৩ সালের ওয়াশীলাতের দাবী উপস্থিত করিতে পারিত না।

তর্কিত হইয়াছে (কিন্তু সেই বিষয় যে আমাদের নিকট অর্পিত হইয়াছে এমত আমার দৃষ্ট হয় না) যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার গতিকে এই মোকদ্দমা চলিবে না, কারণ, তাহার বিধান এই যে, যে ওয়াশীলাতের পরিমাণ ডিক্রীজারীর কালে মীমাংসিত হইবে বলিয়া ডিক্রীতে লেখা "থাকে তৎসম্বন্ধে, কিম্বা মোকদ্দমা উপস্থিত "হইবার তারিখ হইতে ডিক্রীজারী না হইবার "তারিখ পর্য্যন্ত বিরোধীয় বিষয়ের উপর যে কিছু "ওয়াশীলাৎ বা সুদ দেয় হইতে পারে তৎসম্বন্ধে, "যাবতীয় তর্ক ডিক্রীজারীকারক আদালতের হুকু- "মের দ্বারা মীমাংসিত হইবে, পৃথক্ নালিশের "দ্বারা হইবে না।"

"ওয়াশীলাতের পরিমাণ সম্বন্ধীয় যাবতীয় "তর্ক" এই শব্দগুলি সম্বন্ধে এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশন কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে ওয়াশীলাতের স্বত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝায় না, কিন্তু কোন ডিক্রীতে যে ওয়াশীলাৎ দেওয়ার আজ্ঞা থাকে তাহার পরিমাণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝায়। যদি আদালত এমন নির্দ্দেশ করিতেন যে, বাদী ওয়াশীলাৎ পাইবে, এবং এমন হুকুম দিতেন যে, ওয়াশীলাতের পরিমাণ ডিক্রীজারীতে নির্ণীত হইবে, তাহা হইলে এই ধারা খাটিত; কিন্তু যে স্থলে যে আদালত পক্ষগণের স্বত্বের বিচার করিয়াছেন তিনি ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে কোন হুকুম দেন নাই, সে স্থলে ঐ ধারার মর্ম্মানুসারে সেই ডিক্রীর দ্বারা এমন ওয়াশীলাৎ প্রদত্ত হয় নাই যে, তদ্দ্বারা ডিক্রীজারীতে আদালত তাহার পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারেন।

আমি এই আদালতের যে পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির উল্লেখ করিলাম তাহা সদরলাণ্ডের উইক্‌লি রিপোর্টরের ৬ ষ্ঠ বালমের মোৎফরকা নিষ্পত্তির ১০৯ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নিষ্পত্তির রিপোর্টের ১ ম বালমের ১৫৩ পৃষ্ঠায় যে নিষ্পত্তি প্রচারিত হইয়াছে তাহার সহিত উক্ত নিষ্পত্তি অনৈক্য বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহার পরের এক মোকদ্দমায়, যাহা ৩ য় বালম মান্দ্রাজ হাইকোর্টের রিপোর্টের ২৮৭ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, সেই আদালত ব্যক্ত করেন যে, তাঁহারা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার যে ব্যাখ্যা করেন তদপেক্ষা বঙ্গ দেশের প্রধানতম বিচারালয় ঐ ধারার অধিক সঙ্কুচিত অর্থ করিয়াছেন; কিন্তু ঐ শেষোক্ত বিচারালয়ের নিষ্পত্তি তাঁহাদের বিবেচনায় বিশুদ্ধ হইয়াছিল কি না, তাহা তাঁহারা ব্যক্ত করেন নাই, কারণ, তাঁহাদের সমক্ষে যে মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল তাহার নিষ্পত্তি করার জন্য বঙ্গদেশীয় প্রধানতম বিচারালয়ের মতের সহিত তাঁহারা ঐক্য ছিলেন কি না, তাহা বলার আবশ্যক ছিল না। বোম্বাইয়ের হাইকোর্টের ৪ র্থ বালম রিপোর্টের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির ১৮১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত রাধাভয় বঃ রাধাভয়ের মোকদ্দমায় বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয় বঙ্গদেশীয় প্রধানতম বিচারালয়ের ন্যায়ই ১১ ধারার অর্থ করিয়াছেন। আমি যে নিষ্পত্তির উল্লেখ করিলাম এবং যে নিষ্পত্তি এই প্রধানতম বিচারালয় ৬ ষ্ঠ বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে

প্রচারিত মোকদ্দমায় প্রদান করেন তাহা যে, কোন বিষয়ে ভ্রমাত্মক, এমত আমার বিবেচনা হয় না।

আগ্রার প্রধানতম বিচারালয় এই বিষয়ে অন্য মত ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, যখন ভূমির দখলের জন্য ডিক্রী হয় তখন কাজে কাজেই ডিক্রীর তারিখ হইতে বাদীর দখল পাওয়া পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ অবশ্য প্রদান করিতে হইবে। আমার বিবেচনায় ১ ম বালম আগ্রা হাইকোর্টের নিষ্পন্ন মোকদ্দমার রিপোর্টের ১৪১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমায় ঐ আদালত ঐ রূপ নিষ্পত্তিই করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, ইহা বলা দুঃসাধ্য যে, বাদী ভূমির দখল পাওয়ার স্বত্ববান্ বলিয়া ডিক্রী প্রদত্ত হইলেই বাদী সেই ডিক্রীর পরের কালের ওয়াশীলাৎ পাইবে। আমার সপষ্ট বোধ হইতেছে যে, দখল পাওয়ার তারিখ হইতে ওয়াশীলাৎ যে পর্য্যন্ত ডিক্রী জারীতে নির্ণীত না হয়, সে পর্য্যন্ত দখল দেওয়া সম্বন্ধে ডিক্রীজারী স্থগিত থাকিবে না। যদি বাদী দখলের ডিক্রী পাইয়া, ডিক্রীর তারিখ হইতে সে কত ওয়াশীলাৎ পাইতে পারে, তাহা আদালতের নির্ণয় না করা পর্য্যন্ত, দখল না, পাইতে পারে, তবে স্থানীয় তদন্তের হুকুম হইতে পারে, এবং ওয়াশীলাতের পরিমাণ নির্ণয় করিতে অনেক সময় ক্ষয় হইতে পারে, এবং সেই সমুদায় কাল পর্য্যন্ত বাদী বেদখল থাকিবে এবং প্রতিবাদী ক্রমশঃ ওয়াশীলাতের দায়ী হইবে। অতএব ডিক্রীর পরের তারিখের ওয়াশীলাতের পরিমাণ নির্ণয় করার পূর্ব্বে আদালত যদি ন্যায্য রূপে দখলের ডিক্রীজারীতে বাদীকে দখল দিতে পারেন, তাহা হইলেই যে, বাদী দখলের ডিক্রীর তারিখের পরের ওয়াশীলাতের জন্য প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অবশ্য ডিক্রীজারী করিতে পারিবে, এমন হইতে পারে না। আমার বোধ হয় যে, কোন আসল টাকার ডিক্রীমতে সুদ অবশ্যই দিতে হইবে, এই কথা বলার যেমন কোন হেতু নাই, তদ্রূপ দখলের, ডিক্রীর তারিখের পরের ওয়াশীলাৎও অবশ্যই দিতে হইবে এমত বলারও কোন হেতু নাই। ডিক্রীজারীতে ওয়াশীলাৎ পাওয়ার স্বত্বের বিচার হইতে পারে না। যদি ডিক্রীতে ওয়াশীলাৎ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলেই ডিক্রী জারীতে আদালত কেবল ওয়াশীলাতের পরিমাণের বিচার করিতে পারেন।

তর্কিত হইয়াছে যে, ১৯৬ ধারামতে যে আদালত ভূমির দখলের হুকুম দেন, তিনি ডিক্রীর তারিখ হইতে দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের হুকুম দিতে বাধ্য। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, যদি নালিশের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ পাওয়ার প্রার্থনা না থাকে, তবে আদালত তাহা দিতে বাধ্য নহেন; কিন্তু তথাপি তর্কিত হইয়াছে যে, আদালত নালিশের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য না হইলেও, ডিক্রীর তারিখ হইতে দখলের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ তাঁহার অবশ্য দিতে হইবে, যদিও ইহা দেখা যাইতেছে যে, ওয়াশীলাতের স্বত্ব সম্বন্ধে এবং বেদখলের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের সঙ্খ্যা সম্বন্ধে হয়ত আদালতের অন্য এক মোকদ্দমায় তদন্ত করিতে হইবে। দখলের মোকদ্দমায় আমি সর্ব্বদা দেখিয়াছি যে, ওয়াশীলাতের দাবী করিলে যে ষ্টাম্প দিতে হয় তাহা দেওনার আশঙ্কায় বাদী তাহার ভূমির স্বত্বের নিষ্পত্তি হওয়া পর্য্যন্ত, ওয়াশীলাতের দাবী উপস্থাপন করিতে ক্ষান্ত থাকে। অতএব যদি আদালতের এমন দৃষ্ট হয় যে, বেদখলের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের জন্য স্বতন্ত্র নালিশের আবশ্যক হইবে, তাহা হইলেও কি আদালত আপন হইতে ডিক্রীর তারিখ অবধি দখলের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য হইবেন? এমত হইতে পারে যে, ওয়াশীলাতের জন্য অন্য এক আদালতে এক নালিশ তৎকালে চলিতেছে। তাহা হইলে যে স্থলে

আদালত ইহা জানেন যে, বেদখলের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের নালিশ অন্য এক আদালতে চলিতেছে, সে স্থলেও কি তিনি ১৯৬ ধারা মতে ডিক্রীর তারিখ হইতে দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের ডিক্রী দিতে বাধ্য? বেদখলের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ পাওয়ার জন্য যদি স্বতন্ত্র নালিশ মুন্সেফের আদালতে উপস্থিত থাকে, এবং তাহাতে সেই আদালতের স্থানীয় তদন্তের হুকুম দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে যে আদালতে দখলের নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তিনি কি ডিক্রীর তারিখ হইতে দখলের তারিখ পর্য্যন্ত এমন ওয়াশীলাতের ডিক্রী দিতে বাধ্য, যাহা তাঁহার নিজের ডিক্রীজারীতে ডিক্রীজারীকারক আদালতের দ্বারা নির্ণীত হইবে, এবং যাহাতে হয়ত আর একটি অন্য আমীনের দ্বারা স্থানীয় তদন্ত করার আবশ্যক হইবে? আমার বোধ হয় যে, এই প্রকার কার্য্য অত্যন্ত অসুবিধা ও বিরক্তি-জনক হইবে। আমি বিবেচনা করি যে, আদালত ডিক্রীর তারিখ হইতে দখলের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য নহেন।

১৯৬ ধারার বাক্যগুলি বাধ্যকর নহে। তাহা এই যে, "নালিশের তারিখ হইতে দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ আদায়ের হুকুম আদালত ডিক্রীতে দিতে 'পারেন'।" এমত তর্কিত হয় নাই যে, আদালত নালিশের তারিখ হইতে ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য; কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, আদালত ডিক্রীর তারিখ হইতে বাদীর দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য।

অতএব প্রশ্ন এই যে, প্রধানতম বিচারালয় যখন ১৮৬৩ সালে জেলার আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করত বাদীকে এই বলিয়া ডিক্রী দেন যে, সে দখল পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন প্রধানতম বিচারালয় ১৮৫৫ সালে নালিশ উপস্থিত হওয়ার তারিখ হইতে ১৮৫৯ সালে জেলার আদালতের ডিক্রীর তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য না থাকিলেও, কি নিম্ন আদালতের ১৮৫৯ সালের ডিক্রীর তারিখ হইতে যে তারিখে সেই বাদী সেই ডিক্রী মতে দখল পাইবে, সেই তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য ছিলেন? তর্ক এই যে, যদিও প্রধানতম বিচারালয় ১৮৫৫ সালে নালিশ উপস্থিত হওয়ার সময় হইতে ১৮৫৯ সালে নিম্ন আদালত কর্ত্তৃক বাদীর দখলের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হওয়া পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য ছিলেন না, তথাপি ১৮৫৯ সালের ডিক্রীর তারিখ হইতে আপীল-আদালতের ডিক্রী মতে দখল পাওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য ছিলেন। আমি বিবেচনা করি যে, ঐ প্রকার ডিক্রী দিতে আপীল-আদালত বাধ্য ছিলেন না, এবং তিনি ঐ প্রকার ডিক্রী দেন নাই বলিয়া এমন নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না যে, বাদী ঐ সকল ওয়াশীলাতের জন্য স্বতন্ত্র নালিশ চালাইতে স্বত্ববান্ নহে।

অতএব আমার মতে, নালিশের অব্যবহিত পূর্ব্ব ৬ বৎসরের ওয়াশীলাতের জন্য বাদী নালিশ করিতে ১৯৬, ধারার দ্বারা বারিত নহে, এবং তাহার নালিশ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২, ৭ বা ১৯৬ ধারার দ্বারা, অথবা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার দ্বারাও বারিত নহে। বাদী যে সময় দখীলকার ছিল তাহা বাদে, নালিশের অব্যবহিত পূর্ব্ব ৬ বৎসরের ওয়াশীলাৎ সে এই নালিশের দ্বারা পাইতে পারে।

আমাদের এই মতসহ মোকদ্দমাদ্বয় খণ্ডাধিবেশনে পুনঃপ্রেরিত হইবে। বাদী এই অর্পণের খরচা পাইবে।

**বিচারপতি কেম্প।**—আমি প্রধান বিচারপতির মতে সম্মত হইলাম।

**বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।**—আমিও বিবেচনা করি যে, এই নালিশ ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের

৭ অথবা ১১৬ ধারার দ্বারা কিম্বা ১৮৭১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার দ্বারা বারিত নহে; এবং আমার মতে বাদী ওয়াশীলাৎ পাওয়ার ইচ্ছা করিলে, সে দখলের জন্য যে নালিশ করে তাহাতেই তাহার তৎসম্বন্ধে হুকুম পাওয়ার প্রার্থনা করা আবশ্যকীয় নহে।

খণ্ডাধিবেশনের দুই নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বিচারপতি নর্ম্যান আমাদের নিষ্পত্তির জন্য যে প্রশ্ন অর্পণ করিয়াছেন, তাহার এক ভাগ আমরা পর্য্যালোচনাই করি নাই।

যে দুই নিষ্পত্তির গতিকে ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতি মোকদ্দমা এই পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিয়াছেন, তাহা কেবল ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২ ধারার উপর নির্ভর করে।

আমাদের সমক্ষে ২ ধারা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন যত দূর উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি বলিতে প্রস্তুত আছি যে, উইক্লি রিপোর্টরের ১০ম বালমের ৪৮৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত মোকদ্দমায় (যাহার বৃত্তান্ত এই মোকদ্দমার বৃত্তান্তের অনুরূপ) আমি যে নিষ্পত্তি করিয়াছিলাম তাহা এখনও আমার বিবেচনায়, বিশুদ্ধ। আমি তাহাতে বাস্তবিক এই নিষ্পত্তি করিয়াছিলাম যে, দখলের মোকদ্দমায় ওয়াশীলাতের প্রশ্ন উত্থাপিত এবং নিষ্পন্ন হয় নাই; অতএব ওয়াশীলাতের জন্য পশ্চাতে যে নালিশ হয় তাহা ২ ধারার দ্বারা বারিত নহে। যদি কোন বিষয়ের ইসু পূর্ব্বে বাস্তবিক উপস্থিত ও নিষ্পন্ন না হইয়া থাকে, তবে তৎসম্বন্ধীয় নালিশ ২ ধারার দ্বারা বারিত হইতে পারে না।

**বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।**—আমি সম্মত হইলাম।—

**বিচারপতি হব্‌হোস।**—উপস্থিত প্রশ্নের যে উত্তর দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। আমি বিবেচনা করি যে, সেই প্রশ্ন বাস্তবিক এই যে, উপস্থিত মোকদ্দমায় বাদী কেবল ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালের ওয়াশীলাৎ পাইবে কি ১৮৫৯, ১৮৬০, ১৮৬১, ১৮৬২, ১৮৬৩ এবং ১৮৬৪ সালেরও ওয়াশীলাৎ পাইবে?

কথিত হইয়াছে যে, প্রথমতঃ, বাদী ১৮৬৩ সালের ওয়াশীলাৎ পাইতে পারে না, কারণ, সে ১৮৫৫ সালে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহাতে সে ঐ ওয়াশীলাতের দাবী উত্থাপন করে নাই, অর্থাৎ, কথিত হইয়াছে যে, তাহার ১৮৫৫ সালের নালিশের হেতু হইতে যে সকল দাবী উত্থাপিত হইতে পারে, তাহা সে সম্পূর্ণ রূপে সেই সময়ে উপস্থিত করে নাই বলিয়া, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ৭ ধারার বিধানের দ্বারা বারিত। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, তাহার নালিশের হেতু হইতে তখন যে সকল দাবীর উদ্ভব হয়, তৎ সমুদায়ই সে উক্ত মোকদ্দমায় উপস্থিত করিয়াছিল। সেই দাবী প্রথমতঃ ভূমির দখলের জন্য, ও দ্বিতীয়তঃ সেই ভূমির ওয়াশীলাতের জন্য; এবং তাহার বেদখলের তারিখ হইতে তাহার নালিশের তারিখ পর্য্যন্ত ওয়াশীলাতের জন্য সে নালিশ করে, এবং আমার বিবেচনায়, তৎকালে তাহাই তাহার সমুদায় দাবী ছিল। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, ৭ ধারার বিধান উপস্থিত দাবীর বাধা-জনক নহে।

অনন্তর, কথিত হইয়াছে যে, কার্য্য-বিধির ১১৬ ধারা খাটে, এবং তদ্দ্বারা এই দাবী বারিত; এবং এই কথা এই হেতুবাদে উত্থাপিত হইয়াছে যে, আদালত যে ডিক্রী দিয়াছেন, তাহাতে তিনি নালিশের তারিখ হইতে দখলের তারিখ পর্য্যন্ত বিরোধীয় ভূমির ওয়াশীলাৎ দিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু ঐ ধারার বাক্য আদালতের উপরে বাধ্যকর নহে। ঐ ধারায় এমত বলে না যে, আদালতের অবশ্যই ওয়াশীলাতের হুকুম দিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে বলে যে, আদালত তাহা দিতে 'পারেন'। ঐ শব্দগুলি স্পষ্টই সম্মতি-সূচক, অনুজ্ঞা-সূচক নহে; এবং এই শব্দগুলি যাহা সচরাচর অর্থে কেবল সম্মতি-সূচক, তাহা কি জন্য অনুজ্ঞা-সূচক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে,

তাহার কোন হেতু অথবা নজীর প্রদর্শিত না হইলে আমরা তাহা সচরাচর ভাবে অর্থাৎ সম্মতি-সূচক বলিয়াই গ্রহণ করিব। এই কারণে আমি বিবেচনা করি যে, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ১১৯ ধারার বিধান মতে উপস্থিত নালিশ বারিত নহে।

১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা খাটাইলেও আমার বিবেচনায়, নালিশ বারিত নহে। ঐ ধারার উপরে তর্কিত হইয়াছে যে, যেহেতু যে ওয়াশীলাতের দাবী লইয়া এক্ষণে বিরোধ উপস্থিত, তাহা মোকদ্দমার বিরোধীয় বিষয় সম্বন্ধে নালিশ উত্থাপন করার তারিখ হইতে ডিক্রীজারীর সময় পর্য্যন্ত ওয়াশীলাৎ, অতএব ঐ ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন কেবল যে আদালত ডিক্রীজারী করিবেন, (অর্থাৎ এই মোকদ্দমায় যে আদালত ১৮৬৩ সালে ডিক্রী প্রদান করেন,) সেই আদালত কর্ত্তৃক বিচারিত হইতে পারে, এবং আইনের বাক্য মতে, জাবেতা নালিশে অন্য আদালত কর্ত্তৃক বিচারিত হইতে পারে না। কিন্তু বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি যে পূর্ণাধিবেশনের রায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেই ঐ প্রশ্নের মীমাংসা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে। সেই রায়ে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, যখন ডিক্রীতে তৎকালের দেয় ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ না থাকে, তখন যে আদালত ডিক্রীজারী করেন, সেই আদালত, কত ওয়াশীলাৎ দিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারেন না, এবং তাহা দিবার হুকুম দিতেও পারেন না। অতএব এই সকল হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার দ্বারাও এই নালিশ বারিত নহে। (গ)

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

**প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট ও বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান; এফ, বি, কেম্প; এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন ও দ্বারকানাথ মিত্র।**

১৮৬৮ সালের ৫১২ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার মুন্সেফের ১৮৬৭ সালের ২৫ এ ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য অতিরিক্ত অধঃস্থ জজ ১৮৬৭ সালের ১৩ ই ডিসেম্বরে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

ফর্ম্মাণ খাঁ (বাদী) আপেলাণ্ট।

ভরতচন্দ্র সাহা চৌধুরী প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জে, ডবলিউ, বি, মণি বারিষ্টর ও বাবু পূর্ণচন্দ্র সোম আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

১৮১৮ সালের ২৫৪৩ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার অধঃস্থ জজের ১৮৬৬ সালের ৩১ এ আগষ্টের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া ঢাকার জজ ১৮৬৮ সালের ১৩ ই আগষ্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

সেখ কুদ্‌রতুল্লা (বাদী) আপেলাণ্ট।

মোহিনীমোহন সাহা প্রভৃতি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জি, এ, টুইডেল আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

১৮৬৮ সালের ২৮২১ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের অধঃস্থ জজের ১৮৬৮ সালের ১৩ ই জানুয়ারির নিষ্পত্তি অন্যথা করত তত্রত্য প্রতিনিধি জজ ১৮৬৮ সালের ৪ ঠা সেপ্টেম্বরে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

রামকুমার রায় (বাদী) আপেলাণ্ট।

জান মহম্মদ (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ও ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, সি, গ্রেগরী ও বাবু বৈকুণ্ঠনাথ পাল রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক ।—যে স্থানে হিন্দুদের মধ্যে সোফার স্বত্ব পরিচালনের প্রথা না থাকে, সে স্থানে কোন হিন্দু কোন ভূমি ক্রয় করিলে, বিক্রেতা ও সফী উভয়ে মুসলমান হইলেও, ঐ সফী নৈকট্য অথবা শরীকী-সূত্রে শরা অনুযায়ী সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে পারে না। বিচারপতি নর্ম্যান ও ম্যাক্‌ফার্সন এই মতে সম্মত নহেন।

এই মোকদ্দমাত্রয়ের প্রথম মোকদ্দমা বিচারপতি গ্লবরের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয় :—

পূর্ণাধিবেশনে যে প্রশ্ন অর্পিত হইল তাহা এই যে, "যে স্থলে হিন্দুদিগের মধ্যে সোফা "সম্বন্ধে স্থানীয় প্রথা না থাকে, সে স্থলে "কি কোন মুসলমান সফী, এক জন মুসলমান "বিক্রেতা এক জন হিন্দুর নিকট বিক্রয় করি- "য়াছে বলিয়া, সেই বিক্রেতার বিরুদ্ধে আপন "সোফার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারে ?"

গত ডিসেম্বর মাসে আমার ও বিচারপতি লুইস্ জ্যাক্‌সনের সম্মুখে এক খাস আপীলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এবং খাস আপেলা-ণ্টের পক্ষে তর্কিত হয় যে, উইকলি রিপোর্টরের অতিরিক্ত সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় ফকীর কোরাল বঃ সেখ ইমাম বক্‌সের মোকদ্দমায় পূর্ণাধিবেশ-নের ১৮৬৩ সালের ২৮ এ সেপ্‌টেম্বরের নিষ্পত্তি এই মোকদ্দমায় খাটে না, এবং দুই মোক-দ্দমায় অর্থাৎ মনোহর আলী বঃ সৈয়দ আজহ-রুদ্দীন (৫ ম বাঃ উইকলি রিপোর্টরের ২৭০ পৃষ্ঠা) ও সেরাজআলি চৌধুরী বঃ রমজান বিবীর (৮ ম বাঃ উইকলি রিপোর্টরের ২০৪ পৃষ্ঠা) মোকদ্দমায় এই প্রশ্নের যে নিষ্পত্তি হয় তাহা আইন-সঙ্গত নহে ; ও স্থানীয় প্রথা থাকুক বা না থাকুক, মুসলমানেরা যে স্থানেই বাস করে সেখানেই তাহাদের সোফার স্বত্ব থাকে, এবং কোন মুসলমান সফীর দাবীর ব্যাঘাত জন্মাই-বার উদ্দেশ্যে কোন মুসলমান বিক্রেতা এক জন হিন্দুকে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছে বলিয়াই ঐ মুসলমান সফী আপন স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে পারে না।

বিচারপতি লুইস্ জ্যাক্‌সনের মতে খাস আপেলাণ্টের তর্ক বিশুদ্ধ, কিন্তু যেহেতু যাব-তীয় মুসলমানের পক্ষেই ঐ প্রশ্ন অতি আবশ্য-কীয়, অতএব এই বিষয়ে একটি চূড়ান্ত বিধির জন্য ইহা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করা উচিত। মনস্থ ছিল যে, বিচারপতি জ্যাক্‌সন যাঁহার রায় খাস আপেলাণ্টের অনুকূল ছিল তিনিই এই অর্পণের হুকুম লিখিবেন।

আমি কনিষ্ঠ বিচারপতি বিধায় অর্পণের প্রতি অবশ্যই কোন আপত্তি করিতে পারি না, এবং করিতে বাস্তবিক ইচ্ছাও করি না। ইহা যে অত্যন্ত আবশ্যকীয় প্রশ্ন তাহা আমি স্বীকার করি, এবং যদিও উপরোক্ত দুই নিষ্পত্তিতে আমি এক জন বিচারপতি ছিলাম, এবং তাহা আমি এইক্ষণে ভ্রমাত্মক বলিতে প্রস্তুত নহি, তথাপি আমি ইচ্ছা করি যে, এই বিষয় চূড়ান্ত রূপে স্থিরীকৃত হয়।

যেহেতু বিচারপতি জ্যাক্‌সন এইক্ষণে বিদায় লইয়া স্থানান্তরে আছেন এবং তাঁহার পুনরা-গমন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত রাখা যাইতে পারে না, কারণ, ইহা দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত মুল-তবী রহিয়াছে, অতএব উক্ত রায় সম্বলিত আমি ইহা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিলাম।

দ্বিতীয় মোকদ্দমা বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন ও মার্কবির নিম্নলিখিত রায় অনুসারে পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয় :—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই মোকদ্দমায় যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে তাহা যে স্থলে অন্য এক মোকদ্দমায় উত্থিত হওয়াতে তাহা পূর্ণা-ধিবেশনের নিষ্পত্তির জন্য অর্পিত হইয়াছে সে স্থলে এই মোকদ্দমাও সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পূর্ণাধিবেশনে যাইবে। প্রশ্ন এই যে, যে স্থলে কোন্ ব্যক্তির দ্বারা কোন সম্পত্তি এক জন মুসলমানের নিকট বিক্রীত হইলে, সেই

সম্পত্তি সম্বন্ধে নৈকট্য অথবা শরিকী-সূত্রে অন্য মুসলমান আপন সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে স্বত্ববান্ হয়, সে স্থলে সেই সম্পত্তি মুসলমান ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রীত হইলে প্রথমোক্ত মুসলমান কি সেই স্বত্ব পরিচালন করিতে বারিত হইবে?

শেষ মোকদ্দমা বিচারপতি নর্ম্যান ও ই জ্যাকসনের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ——

বিচারপতি নর্ম্যান।—আমার বিবেচনায় এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হওয়া উচিত।

এই মোকদ্দমায়, বিক্রেতা সৈয়দ মহম্মদ রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কৈকুরি নামক জমিদারীর /৭॥ আনার মালিক ছিল। সে সেই সম্পত্তি অনন্তমোহন নামক এক ব্যক্তিকে বিক্রয় করে; তাহাতে তাহার শরীক জান মহম্মদ যে ঐ সম্পত্তির বাকী চারি আনা কয়েক গণ্ডার দখীলকার ছিল, সে সোফার স্বত্বের দাবী করে।

রঙ্গপুর জেলায় হকসোফার এমত প্রথা প্রচলিত আছে কি না যে, উপস্থিত মোকদ্দমা তদন্তর্গত হইতে পারে, তাহার বিচারার্থে জজ প্রথম আদালতে মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন।

আমি বিবেচনা করি, যে বাদী সোফার স্বত্বের দাবী করে, সে এবং বিক্রেতা উভয়ই যখন মুসলমান হয়, তখন শরা অনুযায়ী হকসোফার নিয়ম খাটে কি না, এই প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশন কর্তৃক বিচারিত হওয়া উচিত। ইহার বিরুদ্ধ নিষ্পত্তি আছে। আমরা অবগত হইলাম যে, এই প্রশ্ন আর এক খণ্ডাধিবেশন দ্বারাও অর্পিত হইয়াছে।

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—এই মোকদ্দমা সকলে যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে তাহা এই যে, যে জেলার হিন্দুগণ মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করে নাই, তথায় এক জন মুসলমান বিক্রেতার নিকট হিন্দু ক্রয় করিলে তাহার বিরুদ্ধে এক জন মুসলমান নৈকট্য অথবা শরিকী সূত্রে সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে পারে কি না। আমার মতে "না" বলিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।

এই প্রশ্নের বিশুদ্ধ মীমাংসা করার জন্য, যে বিধি সেই মীমাংসার মুল হওয়া উচিত তাহা প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। মহম্মদীয় ব্যবশাস্ত্রই যে এদেশের ব্যবহারশাস্ত্র নহে; এ কথায় বোধ হয় কোন আপত্তি নাই, অতএব এই মোকদ্দমার বিরোধীয় সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তি বলিয়াই এমত নির্দেশ করার হেতু হইতে পারে না যে, ঐ সম্পত্তি যে স্থানে স্থিত, মহম্মদীয় ব্যবহার শাস্ত্রই সেই স্থানের ব্যবহারশাস্ত্র স্বরূপে এই বিষয় শাসন করিবে। অতএব যদি এই প্রকার মোকদ্দমায় আমরা মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিতে বাধ্য হই, তবে এই জন্য হইব যে, কোন স্পষ্ট লিখিত আইনের দ্বারা আমরা ঐ প্রকার ব্যবহার অবলম্বন করিতে বাধ্য, অথবা ঐ ব্যবহার যে যুক্তির উপর সংস্থাপিত, তাহা এমত সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সংজ্ঞান-সম্মত যে, বিরুদ্ধ কোন স্পষ্ট আইন না থাকিলে, এই দেশের আদালত সমস্ত স্বভাবতঃই তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য।

যাহা হউক, আমার বিবেচনায়, ১৮৩২ সালের ৭ ম কানুনের ৯ ধারা এই বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত। সেই ধারা এই যে, "এতদ্দ্বারা নির্দেশ "করা যাইতেছে যে, কোন মোকদ্দমায় আইন "প্রয়োগ করিবার কালে যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত "প্রস্তাবে ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বী থাকিবে, কেবল "তাহাদের সম্বন্ধেই উপরোক্ত নিয়ম সমস্ত প্রয়োগ "করা অভিপ্রেত, এবং প্রযুজ্য বিবেচিত হইবে, "এবং এই প্রকার ব্যক্তিগণের স্বত্ব রক্ষার "মনস্থেই ঐ সমস্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, অন্যা-"ন্যের স্বত্ব রহিত করিবার নিমিত্ত নহে। "অতএব যখন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার "পক্ষগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হয়, অর্থাৎ যখন এক

"পক্ষ হিন্দু ও অপর পক্ষ মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী "হয়, অথবা যে স্থলে মোকদ্দমার পক্ষগণের "মধ্যে এক বা অধিক ব্যক্তি হিন্দুও না হয় "বা মুসলমানও না হয়, এমত স্থলে ঐ সকল "ধর্ম্মানুগত ব্যবহার প্রয়োগ না হইলে এরূপ "ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ যে সম্পত্তিতে স্বত্ববান "হইতে পারিত, তাহা হইতে তাহাকে বা তাহা- "দিগকে বঞ্চিত করণার্থে ঐ সকল ব্যবহার প্রয়োগ "করা যাইবে না। এরূপ সকল মোকদ্দমায় "সুবিচার ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানানুমত যুক্তি "অনুসারে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।"

স্বীকৃত হইয়াছে যে, উপস্থিত মোকদ্দমা দেওয়ানী মোকদ্দমা, এবং ইহার পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী। এমত অবস্থায়, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই প্রকার মোকদ্দমার নিষ্পত্তি উক্ত ধারার দ্বারা শাসিত, এবং এই ভাবের মোকদ্দমায় আমাদের কেবল সুবিচার ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, এমত নহে, যে সকল মোকদ্দমায় দেখা যায় যে, হিন্দু অথবা মহম্মদীয় ব্যবহার অবলম্বন করিলে কোন পক্ষ এমন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, যাহাতে ঐ ব্যবহার অবলম্বন না করিলে সে স্বত্ববান হইত, তাহাতে ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিতে ঐ ধারায় আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ নিষেধ আছে।

অতএব এই বিধিই আমাদের নিষ্পত্তির মূল হওয়া উচিত বিধায় আমাদের প্রথমে এই দেখিতে হইবে যে, এই মোকদ্দমায় মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার পরিচালন করিতে দিলে হিন্দু-ক্রেতা এমন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে কি না, যাহা সে ঐ ব্যবহার পরিচালন না করিলে পাইতে স্বত্ববান হইত। এবং তাহার পরে আমাদের দেখিতে হইবে যে, ঐ ব্যবহার এমন সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানানুমত যুক্তি-সঙ্গত কি না, যে পক্ষগণ কে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী, তাহা বিবেচনা না করিয়াও আমরা ঐ ব্যবহারের অনুগামী হইতে বাধ্য।

যদি এই দুই প্রস্তাবের প্রথম প্রস্তাবের উত্তর "হাঁ" হয়, তবে দ্বিতীয় প্রস্তাব আর পর্য্যালোচনার আবশ্যক হইবে না; কারণ, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার উচিত ও ন্যায্য হইলেও, যে ব্যক্তি লোকতঃ অথবা আইনানুসারে তাহা প্রতিপালন করিতে বাধ্য নহে, তাহার প্রাপ্ত স্বত্ব যদি ঐ ব্যবহারের দ্বারা রহিত হইতে দেওয়া হয়, তবে কেবল সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তির বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে, এমত নহে, ব্যবস্থাপকগণের স্পষ্ট বিধিও আমাদের উল্লঙ্ঘন করা হইবে। কিন্তু পক্ষান্তরে, যদি প্রথম প্রশ্নের উত্তর "না" হয়, তবে আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবের মীমাংসা করিতে হইবে, কারণ, মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার আমাদের বিবেচনায়, সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত না হইলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে ব্যক্তি (আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি) ঐ ব্যবহারানুযায়ী কার্য্য করিতে লোকতঃ অথবা আইন মতে বাধ্য নহে, তাহার বিরুদ্ধে ঐ ব্যবহার প্রবল করিতে আমাদের কোন স্বত্ব নাই। এই দুই প্রশ্নই অবিচ্ছেদ রূপে পরস্পর সংলিপ্ত আছে, এবং মহম্মদীয় ব্যবহারের অন্তর্গত সোফার স্বত্বের ভাবের উপরেই তাহাদের মীমাংসা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি সেই স্বত্ব-বিক্রেতার স্বত্বের কোন পূর্ব্ব দোষের উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ, যদি এমন হয় যে, বিক্রেতা প্রথমে তাহার শরীক অথবা পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিদিগকে সম্পত্তি ক্রয় করার সুযোগ প্রদান না করিয়া অপর ব্যক্তিকে তাহা বিক্রয় করিতে আইনানুসারে অসমর্থ থাকে, তবে ঐ শরীক ও পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি, সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হিন্দু-ক্রেতাকে অবশ্যই বলিতে পারে, কারণ, যদিও সে হিন্দু বিধায় মহম্মদীয় ব্যবহারের অধীন নহে, তথাপি সে, সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি অনুসারে তাহার বিক্রেতার স্বত্বের তদন্ত করিতে বাধ্য ছিল, এবং যে সম্পত্তি বিক্রয়

করিতে তাহার বিক্রেতার কোন স্বত্ব ছিল না, তাহা আমরা সেই যুক্তি অনুসারেই, তাহাকে রাখিতে দিতে পারি না। কিন্তু পক্ষান্তরে, যদি এমত দেখান যাইতে পারে যে, বিক্রেতার স্বত্বে ঐ প্রকার কোন দোষ ছিল না, অর্থাৎ শরা অনুসারেও সে তাহা অপরকে বিক্রয় করিতে অসমর্থ ছিল না, তবে এই সিদ্ধান্তই করিতে হইবে যে, যখন ক্রেতার স্বত্ব সৃজিত হয়, তখন সেই স্বত্বে কোন দোষ ছিল না; এবং যে ব্যবহার তাহার উপরে বাধ্যকর নহে, তাহা অবলম্বন করিয়া, যদি আমরা যে সম্পত্তি পূর্ব্বেই তাহার সম্পত্তি হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করি, তবে আমাদের ১৮৩২ সালের ৭ কানুনের ৯ ধারার বিধানের বিরুদ্ধ কার্য্য করা হইবে।

সোফা সম্বন্ধে শরার ব্যবস্থা যত দূর আমি দেখিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সোফার স্বত্ব, বিক্রেতার নিকট হইতে নহে, কিন্তু ক্রেতা অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঐ স্বত্ব সম্বন্ধীয় সম্পত্তির সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত মালিক বলিয়া বর্ণিত হয় তাহার নিকট পুনঃক্রয় করার স্বত্ব মাত্র। আমি যত দূর অবগত আছি তাহাতে শরাতে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যদ্দ্বারা কেহ তাহার সম্পত্তি অপর কাহাকে বিক্রয় করার পূর্ব্বে আপন শরীক অথবা পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে বিক্রয় করার জন্য সাধিতে বাধ্য হইবে, এবং এমনও কিছু দেখা যায় না যদ্দ্বারা সোফার স্বত্ব এমত বাধ্যকর বিধির উপর নির্ভর করে যে, তাহা প্রতিপালিত না হইলে এক জন অপর ক্রেতা তাহার ক্রয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ ও বৈধ স্বত্ব পাইবে না; বরং দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদীয় আইনবেত্তারা নিজেই স্পষ্ট রূপে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বত্ব এবং ইহা বিক্রয়ের দ্বারা সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত স্বত্ব ক্রেতাতে বর্ত্তিবার পরে প্রথমে উত্থিত হয় এবং তাহা ক্রেতার কিম্বা বিক্রেতার স্বত্বের কোন দোষের গতিকে উত্থিত হয় না; কেবল সফীর নিকটবর্ত্তী সম্পত্তি অথবা যে সম্পত্তিতে তাহার শরীকী আছে তাহা অপর ব্যক্তি ক্রয় করিলে সফীর যে অসুবিধা হইবে তাহার জন্যই উত্থিত হয়। হেদায়ার নিম্নলিখিত বাক্যগুলি দ্বারা উক্ত মত সপ্রমাণ হইতেছে।

"ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, অপর ব্যক্তি "অপেক্ষায় শরীকের অধিক খাতির করা উচিত, "কারণ, বহুকাল বাস করিয়া শরীকের যে স্থানের "প্রতি মায়া হয় তাহা তাহার আপন অনিচ্ছায় "ত্যাগ করিতে হইলে তাহার যে অসুবিধা হয় "তাহা ঐ অপর ব্যক্তির অসুবিধা হইতে অধিক; "কারণ, যদিও সে যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে "তাহা তাহার অনিচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে "হয়, তথাপি তাহার অধিক অসুবিধা হয় না, "কারণ, সে যথোচিত মূল্য না পাইয়া বেদখল "হয় না।" ৩ য় বালম উইক্লি রিপোর্টর, ৫৬৩ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"সোফার স্বত্ব বিক্রয়ের পরে জন্মে।" ঐ বালম ৫৬৮ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"সাক্ষিগণের সাক্ষাতে নিয়মিতরূপে দাবী "না করা পর্য্যন্ত সোফার স্বত্ব জন্মে না, এবং "বিক্রয়ের কথা অবগত হওয়ার পরেই শীঘ্র "ঐ দাবী করা আবশ্যক, কারণ, সোফার স্বত্ব "অতি দুর্ব্বল, এবং তদ্দ্বারা কেবল সম্ভাবনীয় অসু- "বিধা নিবারণার্থে অন্যকে তাহার সম্পত্তি হইতে "বেদখল করা হয়।" ঐ বালম, ঐ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"সাক্ষিগণের সাক্ষাতে নিয়মিতরূপে দাবী "করা হইলেও, যে পর্য্যন্ত ক্রেতা বাটী ছাড়িয়া "না দেয় অথবা যে পর্য্যন্ত কাজী ফতোয়া না "দেন, সে পর্য্যন্ত সফী ঐ বাটীর মালিক হয় না, "কারণ, ক্রেতার সম্পত্তি সম্পূর্ণ হওয়াতে তাহার "নিজের সম্মতি অথবা কাজীর ফতোয়া ভিন্ন "তাহা সফীতে হস্তান্তরিত হইতে পারে না।" ঐ বালম, ঐ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"কিন্তু ক্রেতাকে যদি দখল দেওয়া হইয়া "থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতার বিরুদ্ধে প্রমাণ

"লইলেও যথেষ্ট হইবে না, কারণ, সে ব্যক্তি "প্রতিপক্ষ নহে এবং তাহার দখল অথবা স্বত্ব "রহিত হওয়াতে সে এক অপর ব্যক্তি মাত্র।" ঐ বালম ৫৭২ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"যে স্থলে বিক্রেতা সম্পত্তির দখীলকার থাকে, সে স্থলে দুই জনেরই উপস্থিত থাকা আব- "শ্যক, কারণ, ক্রেতা মালিক এবং বিক্রেতা "দখীলকার, এবং যেহেতু কাজীর ফতোয়া দুই "জনের বিরুদ্ধেই হইবে, অতএব দুই জনেরই "উপস্থিত থাকা আবশ্যক।" ঐ বালম ৫৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই সকল ব্যবস্থাদ্বারাই চূড়ান্ত রূপ সপ্রমাণ হইতেছে যে, ক্রেতা যে সম্পত্তির সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত অধিকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে তাহার নিকট হইতে পুনঃক্রয় করার স্বত্ব ভিন্ন সোফার স্বত্ব আর কিছু নহে; এবং এই স্বত্ববিক্রেতার স্বত্বের কোন পূর্ব্ব দোষ হইতে উত্থিত হয় না, সম্পত্তির স্বত্ব সম্পূর্ণ রূপে ক্রেতার হস্তে বর্ত্তিলে উত্থিত হয়, এবং ইহা অত্যন্ত দুর্ব্বল স্বত্ব, এবং ক্রেতা বিক্রেতাকে যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে তাহা সে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সম্পত্তি ফেরৎ দিতে বাধ্য না হইলে সফীর যে অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কা আছে কেবল তাহার উপরেই ঐ স্বত্ব নির্ভর করে। অতএব শরা অনুসারে ঐ স্বত্বের ভাব এই প্রকার বিধায়, এবং মহম্মদীয় আইন-বেত্তারা নিজেই যখন এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, ক্রেতা ক্রয়ের দ্বারা যে সম্পত্তির উপরে সম্পূর্ণ স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা ছাড়িয়া দিলে তাহারই অধিক অসুবিধা হইবে, কি সফীর পুনঃক্রয়ের দাবী গ্রাহ্য না হইলে সফীরই অধিক অসুবিধা হইবে, তখন কি আমাদের ১৮৩২ সালের ৭ কানুনের ৯ ধারা দৃষ্ট হয় না, যাহার স্পষ্ট বিধান এই যে, যে দেওয়ানী মোকদ্দমার পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাতে শরার বিধান অবলম্বন না করিলে যদি কোন ব্যক্তি কোন সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ হইতে পারে, তবে সেই বিধান অবলম্বন করত তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না; এবং ইহাও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা এই মোকদ্দমায় সোফা সম্বন্ধে শরার বিধান অবলম্বন করি, তাহা হইলে তাহার নিশ্চিত ফল এই হইবে যে, শরা অনুসারেও যে হিন্দু ক্রেতা কোন সম্পত্তির সম্পূর্ণ আইন-সঙ্গত মালিক হইয়াছে, সে তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমন কথা বলিতে চাই না যে, যে সকল দেওয়ানী মোকদ্দমার পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহার কোন মোকদ্দমাতেই আমরা হিন্দু শাস্ত্রের বা শরার বিধান অবলম্বন করিতে পারি না। বরং ঐ বিধান সমস্ত অনেক সময়ে এরূপ মোকদ্দমায় অবলম্বিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা কেবল সেই সকল মোকদ্দমাতেই উচিতরূপে অবলম্বিত হইয়াছে যাহাতে ১৮৩২ সালের ৭ কানুনের ৯ ধারার প্রথম বাক্যের স্পষ্ট বিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য হইয়াছে। সেই বিধান এই যে, "ঐ প্রকার ব্যক্তিগণের, অর্থাৎ 'যাহারা "প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল "ধর্ম্মাবলম্বী' তাহা- "দের স্বত্ব রক্ষার মনস্থেই ঐ সকল বিধান প্রয়ো- "গের নিয়ম সমস্ত' প্রবর্ত্তিত হয়; অন্যান্যের "স্বত্ব রহিত করিবার নিমিত্ত নহে।"

কথিত হইয়াছে যে, যদি কোন মুসলমান কোন সম্পত্তি শরা অনুযায়ী দায়ক্রমের বিধান মতে তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া কোন হিন্দুকে বিক্রয় করে, এবং যদি সেই সম্পত্তির প্রকৃত দায়াধিকারী এই বলিয়া ক্রেতার বিরুদ্ধে নালিশ করে যে, ঐ সম্পত্তিতে বিক্রেতার কোন স্বত্ব ছিল না, তাহা হইলে পক্ষগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও কেবল শরা অনুযায়ী দায়ক্রমের বিধান দৃষ্টে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। কিন্তু এই মোকদ্দমা উপস্থিত মোকদ্দমা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা সত্য বটে যে, প্রথমোক্ত মোকদ্দায় আমাদের কেবল শরা অনুযায়ী দায়ক্রমের বিধানমতে চলিতে হইবে; কিন্তু শরা

হিন্দু ক্রেতার উপরে বাধ্যকর বলিয়া আমরা তাহা করি না, কেবল সুবিচারের জন্য ঐ বিধান মতে পক্ষগণের পরস্পরের স্বত্বের মীমাংসা করা উচিত বলিয়াই আমরা তাহা করি। বাদী ঐ বিধানের উপকার প্রাপ্ত হয়, কারণ, আমরা তাহার স্বত্ব রক্ষা করিতে বাধ্য, এবং প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আমরা সেই বিধান অবলম্বন করাতে প্রতিবাদী কোন আপত্তি করিতে পারে না, কারণ, তাহা অবলম্বন না করিলে সে যে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত না, আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাকে সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করি না; আমরা কেবল এই কথা ব্যক্ত করি যে, সে তাহার ক্রয়ের দ্বারা কোন স্বত্ব পায় নাই, কারণ, তাহার বিক্রেতার বিক্রয় করার কোন স্বত্ব ছিল না, এবং ব্যবস্থাপকগণ এই প্রকার মোকদ্দমা সমস্তে আমাদের চলিবার জন্য সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তির যে বিধি দিয়াছেন তাহার সহিত ঐ কথা সম্পূর্ণ সংলগ্ন। এই প্রকার মোকদ্দমায় ক্রেতার যদি কোন স্বত্ব থাকে তবে তাহা সম্পূর্ণ রূপেই শরার বিধানের উপরে নির্ভর করে, এবং কেবল সেই বিধান দর্শাইয়া সে তাহার স্বত্ব সংস্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কারণ, অন্য কোন বিধি নাই যাহার উপরে সে নির্ভর করিতে পারে।

যাহা হউক, উপস্থিত মোকদ্দমার অবস্থা স্বতন্ত্র। ইহা সত্য বটে যে, যে ব্যক্তির নিকটে রেস্পণ্ডেণ্ট ক্রয় করিয়াছিল সে শরার দ্বারা বাধ্য ছিল, কারণ, সেই শরাই তাহার ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির ব্যবহার-শাস্ত্র; কিন্তু শরার দ্বারা রেস্পণ্ডেণ্টের আপন ক্রয়-জনিত সম্পূর্ণ স্বত্ব পাইবার বাধা হয় নাই। অতএব তাহার ঐ প্রকার স্বত্ব পাওয়ার পরে আমরা তাহার বিরুদ্ধে শরার বিধান সমস্ত অবলম্বন করিলে, আমরা তাহা অবলম্বন না করিলে সে যে সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ হইত আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাকে সেই সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিব; কিন্তু উল্লিখিত ধারার বিধানে তাহা করিতে আমাদের প্রতি দৃঢ় রূপে নিষেধ আছে।

শরা অনুযায়ী সোফার স্বত্বের স্পষ্ট ভাব দেখাইবার জন্য মিতাক্ষরার অধীন অবিভক্ত হিন্দুপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের স্বত্বের সহিত তুলনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। মিতাক্ষরার বিধান মতে, যদি কোন যৌত হিন্দুপরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কোন সম্পত্তি দান, বিক্রয় অথবা অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে চাহে, তবে সেই হস্তান্তর নিষেধ করিতে ঐ পরিবারের প্রত্যেকের স্বত্ব আছে এবং সেই ব্যক্তির সম্মতি ব্যতীত বিক্রয় হইলে তাহা এককালে অকর্ম্মণ্য ও বাতিল হয়। পক্ষান্তরে, শরা অনুসারে কেবল বিক্রয়ের পরে সোফার স্বত্ব জন্মে, এবং তাহার কোন স্থানেই সোফার নিষেধ করিবার ক্ষমতার বিধি নাই। প্রথমোক্ত স্থলে, অবিভক্ত হিন্দুপরিবারের কোন ব্যক্তি তাহার শরীকগণের সম্মতি না লইয়া ক্রেতাকে বৈধ স্বত্ব প্রদান করিতে পারে না, এবং ক্রেতা যদি ঐ প্রকার সম্মতি ব্যতীতই ক্রয় করে, তবে সে তাহা তাহার আপন ঝুঁকিতেই লয়। মনে কর, ঐ ক্রেতা এক জন মুসলমান, এবং তাহার হিন্দুবিক্রেতার শরীকেরা তাহার বিরুদ্ধে ঐ ক্রয় অন্যথা করার জন্য নালিশ উপস্থিত করে, এমত স্থলে সুবিচার ও ন্যায়পরতার যুক্তি অনুসারে পক্ষগণের পরস্পরের স্বত্বের মীমাংসার জন্য হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মই অবলম্বন করিয়া আমরা কেবল পক্ষগণের সুবিধা অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি করি না, কিন্তু ঐ নিয়ম অবলম্বন না করিলে মুসলমান ক্রেতা যে সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ হইত তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত না করিয়া, আমরা কেবল হিন্দু শরীকগণের স্বত্ব রক্ষা করি, কারণ, ঐ মুসলমান ক্রেতার এমন কোন স্বত্ব নাই যাহা হইতে সে বঞ্চিত হইতে পারে, কারণ, তাহার বিক্রেতার বিক্রয় করার কোন স্বত্ব ছিল না, অতএব সেই ক্রয়ের দ্বারা সে

কোন সম্পত্তি পায় নাই। পক্ষান্তরে, শরায় বিক্রেতার প্রতি বিক্রয় করার কোন নিষেধ না থাকিয়া বরং সোফার স্বত্ব পরাভূত করার জন্য নানা চাতুরী ও ছলনার বিধান আছে। আমি এই রায়ের প্রারম্ভে যে দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহা ইহার পরে বিচার করার কালে আমি ঐ সকল চাতুরী ও ছলনার উল্লেখ করিব, কিন্তু আমি এই স্থানে কেবল এই কথা-ইবার মনস্থে উহার প্রসঙ্গ করিলাম যে, যদি পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে ও শরীককে সম্পত্তি লইতে প্রথমে না সাধিয়া অপর ব্যক্তির নিকট তাহা বিক্রয় করিতে বিক্রেতার প্রতি দৃঢ় নিষেধ করা মহম্মদীয় আইনবেত্তাদিগের কিছু মাত্রও ইচ্ছা থাকিত, তবে তাঁহারা কখন চাতুরী ও ছলনার দ্বারা সেই স্বত্ব পরাভূত করিবার বিধান করিতেন না এবং প্রতারণার প্রশ্রয় দিতেন না। শরা যে মহম্মদীয় ধর্ম্মের উপরে নির্ভর করিয়াই সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা বিবেচনা করিলেই উক্ত তর্ক অখণ্ডনীয় বোধ হইবে; এবং ইহা কখন বিশ্বাস করা যাইতে পারে না যে, ঐ আইন-বেত্তাগণ যাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রের নিয়ম সমস্ত অতি কঠিন রূপে প্রতিপালন করার জন্য প্রসিদ্ধ, তাঁহারা প্রায় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুজ্ঞার ন্যায়, বিক্রেতার উপরে ঐ বাধ্যকর অনুজ্ঞা প্রচার করিয়া, তাহাকে তঞ্চকতামূলক কার্য্য, যাহা তাঁহারা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ভিন্ন জ্ঞান করিতে পারিতেন না, সেই কার্য্য দ্বারা তাহা এড়াইবার অনুমতি দিবেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ সোফা সম্বন্ধে শরার বিধান এমন সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত কি না, যে এই মোকদ্দমার পক্ষগণ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হওয়াতে যে যে বিবেচনার আবশ্যক তাহা না করিয়াও আমরা সেই বিধানানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য, এতৎসম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রথম প্রশ্নের উত্তর "হাঁ" বলিয়া দেওয়া গেলে এই দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন হইবে না, এবং যেহেতু আমি ভরসা করি, আমি দেখাইয়াছি যে, প্রথম প্রশ্নের আর কোন উত্তর দেওয়া যাইতে পারে না, অতএব আমি দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় অতি অল্প কথায়ই শেষ করিব। এই আদালতের এক পূর্ণাধিবেশন কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, জেলায় হিন্দুগণ মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করে নাই, সে স্থানে মুসলমান বিক্রেতার নিকট মুসলমান ক্রেতার বিরুদ্ধে কোন হিন্দু সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে পারে না। আমি এমন কথা বলি না যে, উপস্থিত মোকদ্দমায় আমাদের নিকট যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে তাহা ঐ নিষ্পত্তির দ্বারা কোন প্রকারে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং আমি ইহাও বলি না যে, প্রত্যেক যথার্থ প্রতিজ্ঞার বিপরীত প্রতিজ্ঞা অবশ্যই যথার্থ হইবে; কিন্তু আমি এই বলি যে, উহা অন্ততঃ এবিষয়ের একটি চূড়ান্ত প্রমাণ যে, শরার সোফা সম্বন্ধীয় ব্যবস্থায় এমত কিছু নাই যদ্দ্বারা আমরা তাহা কেবল সুবিচার ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তির বলে অবলম্বন করিতে পারি। যদি আদালত এমন দেখিতেন যে, মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার সুবিচার ন্যায়-পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত, তাহা হইলে ঐ নিষ্পত্তি যে মোকদ্দমায় হয় সেই মোকদ্দমা যে জেলায় উপস্থিত হইয়াছিল, তথাকার হিন্দুগণ মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছিল কি না, তাহার বিচার করার কোন আবশ্যক হইত না; কারণ, তাহা হইলে আদালত সেই ব্যবহারেরই অনুগামী হইতে বাধ্য হইতেন; কিন্তু মহম্মদীয় ব্যবহার বলিয়া তাহার অনুসরণে বাধ্য হইতেন, এমত নহে, তদ্বিরুদ্ধে কোন আইনের স্পষ্ট বিধান না থাকাতে সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি অনুযায়ী চলিবার যে বিধি আছে সেই বিধির সহিত ঐ ব্যবহার সম্পূর্ণ সংলগ্ন বলিয়াই তাহা অনুসরণে বাধ্য হইতেন। কিন্তু এই বিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক

নাই। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সফীর কেবল অসুবিধা হওয়ার আশঙ্কায়ই শরাতে সোফার স্বত্বের বিধান করা হইয়াছে, কিন্তু যদি একটী আদালত দেখেন যে, যে ব্যক্তি আপন দেশের আইনের দ্বারা পূর্ব্বেই কোন সম্পূর্ণ ও বৈধ স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; সে তাহা হইতে শরার ব্যবহারের দ্বারা বঞ্চিত হয়, তবে উক্ত অসুবিধার বিবেচনা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়। সোফার স্বত্ব পরাভূত করার জন্য শরাতেই যে সকল চাতুর্য্য ও ছলনার অনুমতি আছে তদ্দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে, ঐ স্বত্ব এমন দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ যে, যে ব্যক্তি ঐ বিধান প্রতিপালন করিতে আইন অনুসারে অথবা লোকতঃ বাধ্য নহে, তাহার বিরুদ্ধে কোন একটী আদালতের তাহা পরিচালন করা উচিত নহে। এমত কথিত হইতে পারে যে, এই স্বত্ব দুর্ব্বল ও অসম্পূর্ণ বলিয়া যদি আদালত তাহা অগ্রাহ্য করেন, তবে দুই পক্ষই মুসলমান, অথবা যে হিন্দুরা শরার অন্তর্গত সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, ঐ প্রকার হিন্দু হইলেও, ঐ স্বত্ব কোন মোকদ্দমায়ই প্রবল করা উচিত নহে। কিন্তু এই আপত্তির উত্তর অতি সহজ। প্রথমতঃ, ক্রমাগত বহুতর নিষ্পত্তির দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মুসলমানগণের মধ্যে, এবং যে সকল হিন্দু মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে এই স্বত্ব পরিচালিত হইবে। এই বিষয়ের আইন ক্রমাগত একরূপ বহুসংখ্যক নিষ্পত্তির দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং এত দীর্ঘ কাল পরে আর আমরা তাহার বিশুদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতে পারি না। পরন্তু, ঐ স্বত্ব অসম্পূর্ণ হইলেও যে সকল ব্যক্তি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ঐ ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে তাহা পরিচালিত হইলে তদ্বিরুদ্ধে তাহারা আপত্তি করিতে পারে না। এবং পক্ষগণ ক্রেতার সহিত এক ধর্ম্মাবলম্বী হইলে অথবা এক ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকিলে, ক্রেতা যাহা এক স্থলে হারাইবে, তাহা সে সেই স্বত্বের বলে অন্যান্য স্থলে পাইতে পারিবে।

কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় এই হেতুরও অভাব দৃষ্ট হইতেছে, কারণ, যদি আমরা এই মোকদ্দমা হিন্দু ক্রেতার বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়া, তাহার স্বদেশের আইন অনুযায়ী যে সম্পত্তি তাহার সম্পত্তি হইয়াছে, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করি, তাহা হইলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা পূর্ব্বেই নিষ্পত্তি করিয়াছি যে, তাহার শরীকের নিকট কোন মুসলমান তাহার আবাস-বাটীর কোন অংশ ক্রয় করিলেও সে তাহার বিরুদ্ধে সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে পারিবে না। যে পর্য্যন্ত এই দেশ মুসলমানদের শাসনের অধীন ছিল, সে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম, বর্ণ ও জাতি বিবেচনা না করিয়া সকল ব্যক্তির সম্বন্ধেই সোফার স্বত্ব সমতুল্য রূপে পরিচালিত হইত, কারণ, তখন শরাই এই দেশের আইন ছিল এবং তাহাতে ঐ প্রকার কোন প্রভেদের বিধি নাই। কিন্তু যেহেতু এইক্ষণে শরা আর এই দেশের সর্ব্বপ্রচলিত আইন নহে, অতএব আমার বোধ হয় যে, যদি হিন্দুর বিরুদ্ধে আমরা শরা অনুযায়ী সোফার স্বত্ব পরিচালন করি, কিন্তু অন্যান্য মোকদ্দমায় যাহাতে সে সফী হইতে পারে, তাহাতে তাহাকে সেই ব্যবহারের উপকার লাভ করিতে না দেই, তাহা হইলে নিতান্ত অনুচিত ও অন্যায় কার্য্য হয়। যদি সুবিচারের জন্য ইহাই করা উচিত হয়, তবে তাহা সর্ব্বপ্রকারেই করা হউক। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, এই প্রকার মোকদ্দমায় শরা অনুযায়ী সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিতে ব্যবস্থাপকগণ আমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন।

তর্কিত হইয়াছে যে, যদি দুই ব্যক্তি একত্রে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করে এবং তাহাদের আপনাদের মধ্যে এই একরার করে যে, তাহাদের মধ্যে একজন দ্বিতীয় জনকে প্রথমে তাহার অংশ ক্রয় করিতে না সাধিয়া তাহা অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করিতে পারিবে না, এবং যদি কোন অপর ব্যক্তি

ঐ একরারের কথা না জানিয়া ঐ অংশ ক্রয় করে, তবে সে একুটী আদালতের সমক্ষে ঐ একরারের দ্বারা অবশ্য বাধ্য হইবে; কিন্তু এই ঘটনার সহিত উপস্থিত মোকদ্দমার বাস্তবিক কোন সাদৃশ্য নাই, কারণ, প্রথমতঃ উপস্থিত স্থলে বিক্রেতার সহিত সফীর এরূপ কোন বন্দোবস্ত নাই। ইহা সত্য বটে যে, তাহারা দুই জনই মুসলমান, এবং তজ্জন্য তাহারা শরার দ্বারা বাধ্য, কিন্তু তাহারা পরস্পরের বিনা সংস্রবে তাহাদের প্রত্যেকের স্বত্ব পাইয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা হইলে যদি এক জন, অন্যের স্বত্বের ক্ষতি না করিয়া নিজের সম্পত্তি ব্যবহার করে, তবে তাহাদের কেহ কাহার বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতার অভিযোগ করিতে স্বত্ববান্ হইতে পারে না। মনে কর, এই মোকদ্দমার বিক্রেতা বিক্রয়ের পূর্ব্বে অথবা বিক্রয়ের কালে তাহার ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে, তাহা হইলেও কি এমত বলা যাইতে পারে যে, সে মহম্মদীয় সোফার ব্যবহারের দ্বারা বাধ্য, এবং ঐ ব্যবহারের দ্বারা স্থায়ীরূপে তাহার ও তাহার শরীকগণের মধ্যে এমন একরারের সৃষ্টি হইয়াছে যদ্দ্বারা কখনই সে তাহাদের সম্মতি ও অনুমতি না লইয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না? কিন্তু শরাতে বিক্রেতার উপরে যে, ঐ প্রকার বাধ্যকর কোন অনুজ্ঞা নাই ইহা দেখিলেই ঐ তর্ক চূড়ান্তরূপে খণ্ডিত হয়, বরং তাহাতে এই অনুজ্ঞা আছে যে, প্রতিবাসী অথবা শরীক সোফার যে দাবী করে তাহা, যে ছল ও চাতুরী ঐ অনুজ্ঞা থাকিলে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, বিক্রেতা তাহা অবলম্বন করত ঐ দাবী এড়াইতে পারিবে। মনে কর, দুই ব্যক্তি উপরি উক্ত তর্কে বর্ণিত একরারের ন্যায় পরস্পরের মধ্যে এক চুক্তি করে, এবং মনে কর, সেই চুক্তিতে এমন লেখা থাকে যে, মহম্মদীয় সোফার ব্যবহারে যে প্রকার ছল ও চাতুরী করার অনুমতি আছে সেই প্রকার ছল ও চাতুরীর দ্বারা সমস্ত এড়ান যাইতে পারে। তাহা হইলে কি সকল একুটী আদালতই ঐ চুক্তি এককালে অকর্ম্মণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন না? এবং কেহ কি এমত তর্ক করিতে পারে যে, যে ক্রেতা মূল্য দিয়া ক্রয় করে সে কেবল ঐ চুক্তির সর্ত্তের কথা অবগত হইয়া ক্রয় করিয়াছে বলিয়াই তাহার ক্রয়ের স্বত্ব হারাইবে? আমার বিবেচনায়, এই দুই প্রশ্নের কেবল এক উত্তরই আছে।

পরিশেষ, আমার বক্তব্য এই যে, যে সকল নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে তৎসমুদায়ই আমার রায়ের অনুকূল। তর্কবিতর্কে যে মোকদ্দমার প্রথম উল্লেখ হইয়াছে এবং যাহা ১ ম বালম সিলেক্‌ট রিপোর্টের ৩৫০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহার এমন অপরিষ্কাররূপে রিপোর্ট হইয়াছে যে, তাহার উপরে দুই পক্ষের কোন পক্ষেই নির্ভর করা যাইতে পারে না। দেখা যাইতেছে যে, কেবল শরার বিধির উপরে প্রথম যে জাবেতা নালিশ উপস্থিত হয়, তাহা প্রবিন্সিয়েল কোর্টের দ্বারা ডিস্‌মিস্ হয়, এবং আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, দ্বিতীয় মোকদ্দমায়, স্থানীয় হিন্দুরা মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে কি না, তাহার তদন্ত করার হুকুম হয়। মুদ্রিত রিপোর্টে এই ব্যবহার প্রচলিত থাকা সম্বন্ধে আর কিছু দৃষ্ট হয় না, অতএব অবশেষে শরার বিধি যে খাটান হইয়াছিল তাহা প্রচলিত থাকার হেতুতে কি অন্য কোন হেতুতে খাটান হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫ ম বালমের ২৭০ পৃষ্ঠায়, ৬ষ্ঠ বালমের ২৫০ পৃষ্ঠায়, ও ৮ ম বালমের ২৪০ ও ৪৩৬ পৃষ্ঠায় যে সকল নিষ্পত্তি প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আমার রায়ের অনুকূল। সওয়ালজওয়াবে যে অন্যান্য নিষ্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটে না, কারণ, যে জেলার হিন্দুরা মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে সেই জেলায়ই ঐ সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয়।

**বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।**—আমার মত

এই যে, যে ব্যক্তি সোফার স্বত্বের দাবী করে সে যদি মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী হয় এবং বিক্রেতাও যদি সেই ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তবে সেই জেলার হিন্দুদের শরা অনুযায়ী সোফার ব্যবহার অবলম্বন করার কথা সপ্রমাণ না হইলেও, ক্রেতা হিন্দু বলিয়া ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে না।

অর্পিত প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি একাল পর্য্যন্ত কোন আদালত কর্ত্তৃক হয় নাই।

ইহা সত্য বটে যে, ইদানীন্তন যে দুই মোকদ্দমা হইয়াছে তাহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, এমত অবস্থায় সোফার স্বত্ব নাই। এই সকল মোকদ্দমা এই, যথা, বিচারপতি ট্রেবর ও গ্লবরের বিচারিত দেওয়ান মনওর আলী বঃ সৈয়দ আজহরুদ্দীন মহম্মদ (৫ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৭০ পৃষ্ঠা) ও বিচারপতি কেম্প ও গ্লবরের বিচারিত সেরাজ আলী চৌধুরী বঃ রমজান বিবীর মোকদ্দমা (৮ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২০৪ পৃষ্ঠা)। আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতিগণের নিজের রায়ের বর্ণনা স্বরূপে এই সকল নিষ্পত্তি অত্যন্ত সম্মানের যোগ্য বটে, কিন্তু যে স্থলে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ ঐ রূপ সিদ্ধান্ত করার এক হেতু (তাহাও প্রকৃতার্থে অমূলক বিশ্বাস-জনিত) ভিন্ন অন্য কোন হেতু প্রদর্শন করেন নাই, সে স্থলে নজীর স্বরূপে ঐ সকল নিষ্পত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল।

মনওর আলীর মোকদ্দমা কেবল এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পন্ন হয় যে, এই প্রধানতম বিচারালয় কর্ত্তৃক ফকীর রাউত বঃ ইমামবক্‌সের মোকদ্দমার (উইক্‌লি রিপোর্টরের অতিরিক্ত সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বেই, নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, যদি ইহা সপ্রমাণ না হয় যে, ঐ জেলার হিন্দুদিগের মধ্যে সোফার ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে, তবে যে স্থলে বিক্রেতা মুসলমান ও ক্রেতা হিন্দু, সে স্থলে অপর মুসলমানের সোফার স্বত্ব নাই। সেরাজ আলী চৌধুরীর মোকদ্দমায়, প্রধান সদর আমীন এমন কোন স্থানীয় প্রথা দেখেন নাই, যদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতে পারে যে, ঐ জেলার হিন্দুরা মহম্মদীয় সোফার ব্যবহারের দ্বারা বাধ্য, এই কথা প্রধানতম বিচারালয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে, "ঐ প্রথা "সপ্রমাণ না হইলে দীর্ঘ কালের বহুসংখ্যক "নজীরের দ্বারা যে যুক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে যে, "পূর্ব্ব পরম্পরাগত ব্যবহার ও স্থানীয় প্রথা "স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ না হইলে হিন্দু প্রতিবাদী "সোফার স্বত্ব সম্বন্ধীয় শরার বিধানের দ্বারা "বাধ্য নহে, আমরা তাহার ব্যতিক্রম করিতে "পারি না।"

আমি বিবেচনা করি, মেং মণি চূড়ান্ত রূপে দেখাইয়াছেন যে, এই বিষয় সম্বন্ধে ক্রমাগত বহুসংখ্যক নিষ্পত্তি নাই, এবং ফকীর রাউতের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে তাহা স্পর্শ করাও হয় নাই। সেই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে উপস্থিত হয়, এবং তাহার অর্পিত প্রশ্ন এই যে, "যখন সেফার "স্বত্ব হিন্দুদিগের মধ্যে দাবীকৃত ও স্বীকৃত হয়," তখন সেই স্বত্ব শরা অনুসারে পরিচালিত হইবে কি না। প্রধানতম বিচারালয় নির্দ্দেশ করেন যে, যে সকল জেলায় সেফার স্বত্ব অথবা ব্যবহার প্রচলিত থাকার কথা আদালতের গোচর নাই, তখন সেই ব্যবহার সপ্রমাণ করিতে হইবে, এবং যে স্থানে ঐ ব্যবহার প্রচলিত থাকে সেই স্থানে, বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলে, ইহাই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, তাহা শরার বিধানের সহিত সমতুল্য রূপে প্রচলিত আছে। মুসলমানের নিকট হিন্দু ক্রয় করিলে ঐ হিন্দুর বিরুদ্ধে অন্য মুসলমানের সোফার স্বত্বের প্রশ্নের প্রসঙ্গই হয় নাই, এবং তাহার সহিত ঐ পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তিরও কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যে মোকদ্দমায় হিন্দু কর্ত্তৃক ঐ স্বত্ব দাবীকৃত ও স্বীকৃত হয়, সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সহিত, উপস্থিত মোকদ্দমার (যাহাতে কেবল এক মুসলমান ঐ স্বত্বের দাবী করে, এবং অপর এক মুসলমান বিক্রয় করে, এবং হিন্দু ক্রয় করিয়া সেই স্বত্ব অস্বীকার করে) তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

ইহা সত্য হইতে পারে যে, হিন্দুর যে সোফার স্বত্ব আছে, ইহা সে প্রচলিত প্রথা দ্বারা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে, ঐ স্বত্বের দাবী করিতে পারে না, এবং ইহাও সত্য হইতে পারে যে, যখন কোন হিন্দু কোন মুসলমানের নিকট ক্রয় করে, তখন তাহার বিরুদ্ধে অন্য এক জন মুসলমানের সোফার স্বত্ব থাকিতে পারে। এই দুই প্রশ্ন পৃথক্ পৃথক্ যুক্তির উপরে নির্ভর করে।

এক জন খ্রীষ্টিয়ান ক্রেতার বিরুদ্ধে যে দুই মোকদ্দমার বিষয় আমি পরে উল্লেখ করিব তাহা ভিন্ন, অন্যান্য মোকদ্দমায় যাহাতে এই নির্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে, উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমায় হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ প্রথা প্রচলিত থাকার কথা সপ্রমাণ করিতে হইবে, তাহাতে ফকীর রাউতের মোকদ্দমায় পূর্ণাধিবেশনের দ্বারা যে নিষ্পত্তি হয় তদতিরিক্ত কোন কথার নিষ্পত্তি হয় নাই।

ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বঃ মহম্মদ নাজীরুদ্দীনের মোকদ্দমায় (১ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৩৪ পৃষ্ঠা ও ৫ম বালমের ২৩৭ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য) মূল কাগজের বহীতে আমি দেখিতেছি যে, বাদী যে সোফার স্বত্বের দাবী করে, সে মুসলমান ছিল, কিন্তু বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ই হিন্দু ছিল। জোমিলা খাতুন বঃ পাগলরামের মোকদ্দমার (১ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২১১ পৃষ্ঠা) এবং মাধবচন্দ্রনাথ বিশ্বাস বঃ তারিণী বেওয়ার মোকদ্দমার (৫ম বাঃ উইক্লি রিপোর্টরের ২৭৯ পৃষ্ঠা) অবস্থাও ঐ রূপ, কারণ, তাহার রায়ের প্রারম্ভে লেখা আছে যে, মোকদ্দমার পক্ষগণ হিন্দু। এই সমস্ত মোকদ্দমায় ফকীর রাউতের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিধি খাটে, এবং ইহা উচিত রূপেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল যে, ব্যবহার প্রচলিত থাকার বিষয় সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক।

মুন্সী হবীবল্ হোসেন বঃ লালা দেবকীনন্দনের মোকদ্দমায় (১৮৬৪ সালের উইক্লি রিপোর্টরের ৭৪ পৃষ্ঠা) বৃত্তান্ত সমস্ত এমন স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয় নাই, যদ্দ্বারা দেখা যাইতে পারে যে, তাহা এই বিষয়ে খাটে কি না, কারণ, বিক্রেতা হিন্দু কি মুসলমান ছিল ইহা ব্যক্ত নাই। আমি এই মোকদ্দমার কাগজাতের অনুসন্ধান করাইয়াছিলাম, কিন্তু আমি দেখিলাম যে, মহাফেজখানায় কেবল খাস আপীলের হেতু আছে, এবং তদৃষ্টে কিছু জানা যায় না। ঐ মোকদ্দমা উহার বর্তমান অবস্থায় কোন দিকেই নজীর স্বরূপ গণ্য হইতে পারে না।

আর দুই নিষ্পত্তি আছে যাহাতে কথিত হইয়াছে যে, এই প্রশ্ন বিশেষ রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যদিও আমি স্বীকার করি যে, ঐ দুই মোকদ্দমা ইহার অনেক অনুরূপ, কিন্তু তথাপি তাহাতে এক্ষণকার প্রশ্ন প্রকৃত রূপে নিষ্পন্ন হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে আমি সন্দেহ করি। বাবু মহেশীলাল বঃ খ্রীষ্টিয়ানের মোকদ্দমায় (৬ষ্ঠ বাঃ উইক্লি রিপোর্টরের ২৫০ পৃঃ) এবং সেই মোকদ্দমায় তাহার পরে যে আপীল হয় (৮ম বাঃ উইক্লি রিপোর্টরের ৪৪১ পৃঃ) তাহাতে বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত ও বেলি এবং ফিয়ার নির্দেশ করেন যে, (ঐ মোকদ্দমায় যে ব্যক্তি সোফার স্বত্বের দাবী করে সে ও বিক্রেতা হিন্দু এবং ক্রেতা খ্রীষ্টিয়ান ছিল) যদি এমত সপ্রমাণ না হয় যে, সেই জেলার হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ানেরা সোফার স্বত্ব অবলম্বন করিয়াছে, তবে খ্রীষ্টিয়ানের বিরুদ্ধে তাহা পরিচালন করা যাইতে পারে না। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এই নিষ্পত্তি উপস্থিত প্রশ্নের অত্যন্ত কাছাকাছি আইসে। কিন্তু যেহেতু সাধারণ হিন্দু-ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে সোফার স্বত্ব নাই, কেবল স্থানীয় প্রথার গতিকে হিন্দুদিগের মধ্যে তাহা কখন কখন প্রচলিত হয়, অতএব আমার বোধ হয় যে, বিক্রেতা মুসলমান এবং সফীও মুসলমান,

কেবল এই হেতু ভিন্ন অন্যান্য হেতু পর্য্যালোচনা করিয়া উক্ত বিচারপতিগণ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন।

একটি বহুকালের মোকদ্দমা অর্থাৎ গোলাম-নবী চৌধুরী বনাম গৌরকিশোর রায়ের মোকদ্দমা আছে (১ ম বালম সিলেক্ট রিপোর্টের ২ য় সংস্করণের ৪৬৭ পৃষ্ঠা) এবং তাহা মেং মণি, স্বীয় অনুকূল বলিয়া আগ্রহ-সহকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা ঠিক তাঁহার অনুকূল নজীর বলা যাইতে পারে না, কিন্তু তাহাতে যে নিষ্পত্তি হইয়া থাকুক, তাহা তাঁহার প্রতিকূল নহে। উপস্থিত মোকদ্দমার সহিত ঐ মোকদ্দমার পক্ষগণের সমান অবস্থা ছিল, অর্থাৎ সফী ও বিক্রেতা উভয়েই মুসলমান এবং ক্রেতা হিন্দু ছিল। ক্রেতা হিন্দু হইলে মহম্মদীয় সোফার ব্যবহারের দ্বারা তাহার অবস্থার কোন ব্যতিক্রম হয় কি না, এই প্রশ্ন স্পষ্ট বাক্যে উত্থাপিত হয় নাই, কিন্তু বৃত্তান্ত সমস্তের উপরে কাজীরা ও আদালত ব্যক্ত করেন যে, সফীর সোফার স্বত্ব আছে, এবং সে তদনুসারে ডিক্রী পান। ঐ মোকদ্দমায় দেখা যাইতেছে যে, যদিও অনেক তর্ক বিতর্ক এবং কয়েক মোকদ্দমা হইয়াছিল, তথাপি এমত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই যে, ক্রেতা হিন্দু বিধায় সে মুক্ত ছিল।

সমুদায় পর্য্যালোচনা করিয়া আমি বিবেচনা করি যে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বস্তুতঃ কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই।

আদালতের কোন বিশেষ নিষ্পত্তির প্রতি দৃষ্টি না করিলে আমার বোধ হয় যে, বিক্রেতা মুসলমান এবং ক্রেতা হিন্দু হইলেও এবং সেই জেলার হিন্দুদিগের মধ্যে শরার বিধান প্রচলিত ও অবলম্বিত হওয়া প্রদর্শিত না হইলেও মুসলমানের সোফার স্বত্ব থাকিতে পারে, এবং শরিকী-সূত্রেই সোফার দাবী হউক, বা নৈকট্য সূত্রেই হউক, আমার বিবেচনায়, মুসলমানের ঐ স্বত্ব থাকিবে।

এ বিষয় কেবল শরা সম্বন্ধীয় কথা বলিয়া বিবেচনা করিলে, উক্ত রায়ই যে বিশুদ্ধ, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ, শরার অন্তর্গত সোফা সম্বন্ধীয় বিধান সমস্ত কেবল মুসলমানদিগের সম্বন্ধে খাটিত, এমত নহে, কিন্তু যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধেই খাটিত। কিন্তু আমাদের আদালতে তাহা ভিন্ন কথা, কারণ, যদিও সোফার স্বত্ব মুসলমানদিগের সম্পত্তির আনুষঙ্গিক স্বত্ব বলিয়া বরাবর পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি তাহা শরার এক বিধান বলিয়া তত পরিচালন করা যায় নাই, যত সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সংজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত ব্যবহার বলিয়া পরিচালন করা গিয়াছে।

ঐ স্বত্ব যাহা সম্পত্তি মুসলমান মালিকের হস্তে থাকার কালে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু ঐ সম্পত্তি বিক্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে পারে না, সেই স্বত্ব যাহার নিকট ঐ সম্পত্তি বিক্রীত হয় তাহার নিকট হইতে ক্রয় করার স্বত্ব; এবং যে ব্যক্তি সোফার স্বত্ব পরিচালন করিয়া ঐ সম্পত্তি লয়, সে প্রথম ক্রেতার নিকট হইতে লয়, মূল-বিক্রেতার নিকট হইতে লয় না। যে ব্যক্তির সোফার স্বত্ব আছে সে ক্রেতার নিকট সম্পত্তি লইতে পারিবে এই দায় সম্বলিত তাহা মূল বিক্রেতার দ্বারা বিক্রীত হয়, অন্য প্রকারে তাহা বিক্রীত হইতে পারে না।

আমি সম্যক্ রূপে স্বীকার করি যে, বিক্রেতার স্বত্ব শেষ হইয়া যে পর্য্যন্ত বিক্রয় সম্পূর্ণ না হয়, সে পর্য্যন্ত সোফার স্বত্ব পরিচালিত হইতে পারে না। ইহাই যে সত্য এবং সফী মূল বিক্রেতার নিকট হইতে লয় না, ক্রেতার নিকট হইতে লয়, তাহা হেদায়ায় এবং বেলির মহম্মদীয় ব্যবহার-সংগ্রহের ৪৭১ ও তৎপরের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। মেং, বেলি অল্প দিবস হইল যে, নূতন গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, শীয়া সম্প্রদায়ের ব্যবহারও তদ্রূপ। ঐ গ্রন্থের ১৭২—১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে স্থলে সোফার স্বত্বের ভাব এই, এবং যে স্থলে আদালত সমস্ত মুসলমানদিগের মধ্যে এই স্বত্ব সম্বন্ধে শরার বিধান প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মুসলমানেরা এই স্বত্বের অধীনে সম্পত্তি ভোগ করে, সে স্থলে কি জন্য কেবল মুসলমান ক্রেতা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমাতেই তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে? যে ব্যক্তি সোফার স্বত্বের দাবী করে যদিও সে কেবল প্রথম ক্রেতার নিকট ক্রয় করার দাবী করিতে পারে, তথাপি মুসলমান বিক্রেতার হস্তস্থিত সম্পত্তির মালিকত্ব সফীর দাবীর অধীন বলিয়াই তাহার সেই স্বত্ব আছে, এবং বিক্রেতা সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, শরার লিখিত যে সকল বিধি তঞ্চকতা বলিয়া কথিত হইয়াছে সেই তঞ্চকতা ভিন্ন বিক্রেতা সফীর ঐ স্বত্ব খণ্ডন করিতে পারে না। আমার বোধ হয়, যে মুসলমান আপন সম্পত্তি বিক্রয় করিলে ঐ স্বত্বের অধীনে বিক্রয় করিতে হইবে জানিয়া তাহা ভোগ করে তাহার নিকট যে ব্যক্তি ক্রয় করে তাহার সম্বন্ধে অবশ্যই এই বিবেচনা করিতে হইবে যে, সে ঐ আইন-সঙ্গত আনুষঙ্গিক দায়ের বিষয় জানিয়াই তাহা ক্রয় করিয়াছে। অতএব ক্রেতা মুসলমান নহে বলিয়াই যদি ঐ স্বত্ব পরিচালন করিতে না দেওয়া যায়, তবে কি তাহা সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তির বিরুদ্ধ হয় না? যদি ক্রেতা মুসলমান হয়, তবে ঐ স্বত্ব পরিচালিত হইবে। তবে ক্রেতা কেবল হিন্দু বলিয়া তাহা কি জন্য পরিচালিত হইবে না? উক্ত উভয় ঘটনাতেই ভূমি এই সর্ত্তে বিক্রেতার হস্তে ছিল যে, যদি বিক্রেতা অন্য এক ব্যক্তির নিকট তাহা বিক্রয় করে, তবে তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ভূমি ক্রয় করার জন্য দাবী করিতে পারিবে। যে স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, ক্রেতা এই দায়ের বিষয় অবগত ছিল, সে স্থলে ক্রেতা কেবল হিন্দু বলিয়াই কি প্রকারে সেই স্বত্ব বিনষ্ট হইবে? বিক্রেতার হস্তে বিনা সর্ত্তে সম্পত্তি ছিল না, সোফার স্বত্বের অধীন ছিল, এবং যে ক্রেতা ঐ স্বত্ব অবগত হইয়া ক্রয় করে সে, বিক্রেতার নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব পাইতে পারে না। যদি সোফার স্বত্ব মুসলমানদের মধ্যে পরিচালন করা সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত হয়, তবে মুসলমানেরা যে ঐ স্বত্বের অধীনে সম্পত্তি ভোগ করে, তাহা অবগত থাকিয়া যাহারা মুসলমানদিগের নিকটে ঐ সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহাদের বিরুদ্ধেও ঐ স্বত্ব পরিচালন করা সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত।

যদি শরা অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানই সোফার স্বত্বের অধীনে সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকে, এবং যে সকল মোকদ্দমায় কেবল মুসলমানেরা লিপ্ত আছে, কেবল তাহাতে যদি আমাদের আদালত সমস্ত ঐ বিধি গ্রাহ্য ও পরিচালন করিয়া থাকেন, তবে যে মোকদ্দমায় বিক্রেতা ও সফী মুসলমান হয়, তাহাতে ক্রেতা হিন্দু হইলে সেই যুক্তি অনুসারে আদালত সমস্ত উক্ত স্বত্ব কি জন্য পরিচালন করিবেন না? যে ক্রেতা ঐ দায়ের বিষয় জানিয়া ক্রয় করে, সে আমাদের অনুগ্রহ লাভের দাবী করিতে পারে না, এবং যদি আমরা নির্দ্দেশ করি যে, মুসলমানকে বিক্রয় না করিয়া হিন্দুকে বিক্রয় করা হইয়াছে বলিয়াই ঐ দায় বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে মুসলমানদিগকে সকল স্থলেই ঐ দায় এড়াইবার উপায় করিয়া দেওয়া হইবে। যদি হক-সোফার আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, যদি মুসলমানের নিকট বিক্রয় হইলে ঐ আইন খাটান যায়, তবে হিন্দুর নিকট বিক্রয় হইলেও তাহা খাটান উচিত, কারণ, মুসলমানের নিকট বিক্রয় করিলে সম্পত্তির মুসলমান শরীকের যে অসুবিধা হয়, হিন্দুকে বিক্রয় করিলে তাহার তদপেক্ষা অধিক অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা। সোফার স্বত্ব এড়াই-

বার জন্য শরাতে অনেক ধর্ম-বিরুদ্ধ উপায়ের বিধান আছে বটে, কিন্তু তথাপি যে স্থলে অনেক জেলার, বোধ হয় বঙ্গদেশের প্রায় অর্দ্ধেক জেলার হিন্দুরা সোফার ব্যবহার অবলম্বন করিয়াছে, সে স্থলে অবশ্যই এই প্রদেশের লোকেরা ইহা অনেক উপকার-জনক ব্যবহার বলিয়া বিবেচনা করে।

সফী যে প্রথম ক্রেতার নিকট হইতে লয়, একেবারে মূল বিক্রেতার নিকট হইতে লয় না, এই কথা আমার বিবেচনায় আবশ্যকীয় নহে; কারণ, অন্যান্য বিষয়ে এই স্বত্বের ঠিক ভাব যে প্রকারই হউক, দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তি তৃতীয় পক্ষের নিকট বিক্রী হওয়া মাত্রেই সোফার স্বত্ব অধিকারীর ঐ সম্পত্তি ক্রয় ও দখল করার স্বত্বের অধীনে মুসলমান মালিক ঐ সম্পত্তি ভোগ করে। যেহেতু যখন সকল পক্ষ মুসলমান হয়, তখন কেবল শরার বিধি বলিয়া ঐ স্বত্ব প্রবল করা হয় না. কিন্তু বিচার, ন্যায়-পরতা ও সংজ্ঞানের যুক্তি-সঙ্গত বলিয়াই প্রবল করা হয়; অতএব আমার বিবেচনায় ক্রেতা হিন্দু হইলেও তাহা প্রবল করা উচিত।

ক্রেতা হিন্দু হউক বা না হউক, তাহার ক্রীত সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইলে কোন প্রাপ্ত স্বত্বের লোপ হয় না, কারণ, ক্রেতা এমন কোন স্বত্ব পায় নাই, যাহা সোফার স্বত্বের অধীন ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে ও আমাদের আদালত সমস্ত অন্য কোন ভাবে ঐ স্বত্ব বিশুদ্ধ রূপে প্রবল করিতে পারেন না।

যে মোকদ্দমায় শরীকীর উপরে ঐ স্বত্ব নির্ভর করে, এবং যাহাতে নৈকট্যের উপরে তাহা নির্ভর করে, এই দুই ঘটনা সম্বন্ধেই আমাদের নিকট প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে।

দুই ঘটনাতেই আমার উত্তর এক; কারণ, শরীকীর উপরে নির্ভর করিলে, ঐ স্বত্বে যে যুক্তি খাটে, নৈকট্য সম্বন্ধেও ঐ স্বত্বে সেই যুক্তি খাটে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, শেষোক্ত স্বত্ব দুর্ব্বলতর স্বত্ব, এবং অতি সাবধানে তাহা পরিচালিত হইতে দেওয়া উচিত। কিন্তু তথাপি শরা অনুসারে তাহা কোন কোন ঘটনায় সংস্থাপিত আছে, এবং যখন তাহা বর্ত্তমান আছে, তখন শরীকীর উপরে যে স্বত্ব নির্ভর করে, তাহা যে ক্রেতার বিরুদ্ধে প্রবল হইতে পারে, নৈকট্য-জনিত দুর্ব্বলতর স্বত্বও তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হওয়া উচিত।

বিচারপতি কেম্প।—এই পূর্ণাধিবেশনে যে প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে, তাহা এই যে, যে স্থানে হিন্দুদিগের মধ্যে সোফার ব্যবহার প্রচলিত না থাকে, তথায় শরীক অথবা প্রতিবাসী-সূত্রে কোন মুসলমান সোফার স্বত্বের দাবী করিলে, হিন্দু ক্রেতার স্বত্ব রহিত করিতে পারে কি না? আমার বিবেচনায়, পারে না। এই বিষয়ে এ কাল পর্য্যন্ত যাবতীয় নিষ্পত্তি আমার এই রায়ের অনুকূল। বিচারপতি ট্রেবর, বেলি, মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ফিয়ার ও গ্লবর এবং আমি এই রায় অবলম্বন করিয়া আসিয়াছি, এবং এই বিচারপতিগণের সহিত আমি, এইক্ষণে আমার বিজ্ঞবর সহযোগী বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যাঁহার সুদীর্ঘ ও উৎকৃষ্ট রায় এই মাত্র প্রদত্ত হইল, তাঁহার নামও উচ্চারণ করিতে পারি। এই সকল নিষ্পত্তি আমার বিবেচনায়, নিঃসন্দেহই আমার রায়ের অনুকূল, অর্থাৎ যে স্থানে হিন্দুদিগের মধ্যে সোফার স্বত্ব পরিচালনের প্রথা না থাকে, সে স্থানে হিন্দু ক্রেতার বিরুদ্ধে মুসলমান সফীর স্বত্ব নাই। যে তিন মোকদ্দমা আমাদের নিকট অর্পিত হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইটিতে শরীকী-সূত্রে এবং তৃতীয় মোকদ্দমায় নৈকট্য-সূত্রে দাবী উপস্থিত হইয়াছে।

এক জন মুসলমান মৌলবী ইহার এক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন। তাঁহার নিষ্পত্তি মুসলমান সফীর প্রতিকূলে হয়। কিন্তু যে তিন মোকদ্দমা আমাদের নিকট অর্পিত হইয়াছে, তাহার দোষ-গুণের সহিত আমাদের কোন সংস্রব নাই। আমা-

দের রায়ের জন্য যে আইন-ঘটিত প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে, আমাদের কেবল তাহারই উত্তর করিতে হইবে।

আমি বিবেচনা করি যে, শরা অনুসারে অধিক হইলেও সোফার স্বত্ব যে কত দুর্ব্বল, তাহা বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র চূড়ান্ত রূপেই দেখাইয়াছেন। এই সোফার স্বত্ব যাহার উৎপত্তি শরা হইতেই হয় তাহা, এই দেশ মুসলমানদিগের শাসনের অধীন থাকার কালেও কেবল মুসলমানদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল এমত নহে, অন্যান্য দেশ যে সকল এইক্ষণে মহম্মদীয় রাজশাসনের অধীন আছে, তাহাতেও যে কেবল মুসলমানদিগের মধ্যেই সোফার স্বত্ব প্রচলিত আছে, এমত নহে; খ্রীষ্টীয়ান ও হিন্দু যাহাদিগকে মুসলমানেরা কাফের বিবেচনা করে, তাহাদিগের মধ্যেও ঐ স্বত্ব পরিচালনের অনুমতি আছে। বেলির গ্রন্থের ৪৭৩ পৃঃ ও ৩ য় বালম হেদায়ার ৫৯৫ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য

সোফার স্বত্ব প্রথমতঃ, বিক্রীত ভূমির শরীককে, দ্বিতীয়তঃ, ভূমির আনুষঙ্গিক স্বত্বের অর্থাৎ জল ও পথের স্বত্বের শরীককে, ও তৃতীয়তঃ, প্রতিবাসীকে প্রদত্ত হইয়াছে। যে বস্তুতে এজমালী দখল থাকে এবং যাহা বিভক্ত হয় নাই তৎসম্বন্ধেই সোফার স্বত্ব খাটে। বিভাগ হইলে যে অসুবিধা হয় তাহা নিবারণার্থে শরার এই স্বত্ব শরীককে প্রদত্ত হইয়াছে, কারণ, যদি শরীক সোফা সম্বন্ধীয় অংশ না পায়, তাহা হইলে নূতন ক্রেতা যে হিন্দু অথবা খ্রীষ্টিয়ান হইতে পারে, সে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইতে জেদ করিতে পারে এবং তদ্দ্বারা মুসলমান শরীকের অসুবিধা জন্মিতে পারে

কিন্তু এই সোফার স্বত্ব বিক্রয়ের পরে ভিন্ন জন্মে না অথবা সম্পূর্ণ হয় না, কারণ, যে পর্য্যন্ত মালিক তাহার ভূমি অথবা গৃহ স্বয়ং রাখার ইচ্ছা পরিত্যাগ না করে, সে পর্য্যন্ত ঐ স্বত্বের উৎপত্তি বা সত্ত্বা হইতে পারে না, এবং সেই ইচ্ছা পরিত্যাগ করা কেবল ভূমি অথবা গৃহ বিক্রয়ের দ্বারা প্রদর্শিত হইতে পারে। ৩য় বালম হেদায়ার ৫১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিক্রেতা শরার অনুসারেই, যে ছলের দ্বারা ঐ স্বত্বের দায় এড়াইতে পারে তাহা আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র উল্লেখ করিয়াছেন, এই সকল ছল বড় বড় মুসলমান আইনবেত্তারা যে গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন, ইহা সপষ্টই দেখা যাইতেছে। হনিফা যাঁহাকে সকলে প্রধান মহম্মদীয় ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করে তাঁহার প্রধান ছাত্র আবু ইউছফ যাঁহার বিদ্যার বলে সুবিখ্যাত হারুনল রসীদ তাহাকে কাজিওল্ কোজ্জাতের পদে নিযুক্ত করেন, সেই আবু ইউছফ নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, এই প্রকার ছল সমস্ত ঘৃণিত নহে, এবং তাঁহার তর্ক এই যে, যেহেতু ঐ সকল ছলের দ্বারা সোফার স্বত্ব সংস্থাপন নিবারিত হয়, অতএব সোফীর যে অসুবিধা হয় তাহা বিবেচনা করা উচিত নহে।

শরার অন্তর্গত যে সমস্ত ছলের দ্বারা বিক্রেতা সোফার স্বত্ব নষ্ট করিতে পারে, আমি তাহার দুই একটির উল্লেখ করিতেছি। দুই জন মুসলমান প্রতিবাসীর দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। মনে কর, এক জন মুসলমান আপন বাটী এক জন হিন্দুকে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে সফীর গৃহের বরাবর এক গজ পরিমাণ ভূমি রাখিলেই সে তাহার সোফার স্বত্ব বিনষ্ট করিতে পারে। আর একটি উদাহরণ দেখ। যদি টীমু নামক এক জন মুসলমান শিবু নামক এক হিন্দুকে, দুই লক্ষ টাকায় এক গৃহ বিক্রয় করে, এবং তাহার পরে ঐ টাকার পরিবর্ত্তে টীমু এক জামা অথবা গাওন লয়, তাহা হইলে ঐ গৃহ ২০০ টাকা মূল্যের যোগ্য না হইলেও, সফীকে হয় দুই লক্ষ টাকা দিয়া ঐ গৃহ লইতে হইবে, নচেৎ আপন সোফার স্বত্ব হারাইতে হইবে।

এই সমস্ত ছলের বর্ণনার কালে ইহাও বলা

উচিত যে, এক জন মুসলমান আইন-বেত্তা এই সমস্ত স্থল অতি ঘৃণিত বিবেচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই আইন-বেত্তার নাম মহম্মদ, তিনি প্যাগম্বর মহম্মদ নহেন, আইন-বেত্তা মহম্মদ। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং হ্যারিংটনের সারসংগ্রহে দৃষ্ট হইবে যে, আবু ইউছফের মত, মহম্মদের মত অপেক্ষায় প্রবল, এবং কেবল আবু ইউছফের অথবা কেবল মহম্মদের মত অপেক্ষায় হনিফার মত অধিক প্রবল; কিন্তু যে স্থানে আবু ইউছফ এবং মহম্মদের এক মত হানিফার মতের সহিত অনৈক্য, তথায় তাহাদের মতই প্রবল হইবে।

আর এক জন বিখ্যাত মহম্মদীয় আইন-বেত্তা আছেন, যাঁহার গ্রন্থ ফরাসিস গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে মেং পেরোঁ কর্ত্তৃক ফরাসিস ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের নাম "মুসলমানদিগের দেওয়ানী আইন।" ঐ গ্রন্থের ৪ র্থ বালমের ৪২৩ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ আছে, এবং তাহা আমি ফরাসিস ভাষা হইতে অনুবাদ করিলাম, যথা, "সঙ্গী অথবা শরী-"কের সম্পত্তির সংলগ্ন সম্পত্তির নূতন "মালিকের বিরুদ্ধে, সেই সম্পত্তি অন্য কোন "সম্পত্তির পরিবর্ত্তে অথবা বিক্রয়ের দ্বারা "হস্তান্তরিত হওয়ার পরে ভিন্ন, সোফার স্বত্ব "উত্থাপিত অথবা পরিচালিত হইতে পারে না।"

পরন্তু, হেদায়ায় দৃষ্টি করিলে এই স্বত্ব যে কত দুর্ব্বল, তাহা দেখা যায়। কাজী দখলের ডিক্রী দেওয়ার পূর্ব্বে যদি সফীর মৃত্যু হয়, তবে তাহার সোফার স্বত্বের এক কালে নির্ব্বাণ হয়। যদি ডিক্রীর পরে তাহার মৃত্যু হয়, তবে ক্রয়-মুল্য না দেওয়া হেতু সে দখল না পাইয়া থাকিলেও (কারণ, সে ক্রয়-মুল্য না দিলে দখল পাইতে পারে না) ঐ স্বত্ব তাহার ওয়ারিশগণে বর্ত্তে। আমার বিবেচনায়, ইহাতেই প্রকাশ যে, এই স্বত্ব ভূমি সম্বন্ধীয় স্বত্ব নহে, কেবল ব্যক্তি বিশেষের নিজের স্বত্ব।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই দায় অতি দুর্ব্বল। শরা অনুসারেও বোধ হয় যে, যে সমস্ত স্থল মহম্মদীয় বিখ্যাত আইন-বেত্তা আবু ইউছফ গ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়া ঐ স্বত্ব এড়ান যাইতে পারে। অতএব আমরা সুবিচার, ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি মতে এমত নিষ্পত্তি করিতে পারি না যে, যে জেলায় হিন্দুদিগের মধ্যে সোফার স্বত্বের ব্যবহার প্রচলিত নাই, তথায় এক জন হিন্দু ক্রেতা যে শরার দ্বারা বাধ্য নহে, সে যে সম্পত্তি ক্রয় করে তাহা, এক জন মুসলমান শরীকী অথবা নৈকট্য সুত্রে সোফার স্বত্বের দাবী করিয়াছে বলিয়া তাহাকে সে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যে রায় প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপ সম্মত।

**বিচারপতি নর্ম্যান।**—এই মোকদ্দমায় প্রশ্ন এই যে, যদি কোন মুসলমান শরীক এক জন হিন্দুর নিকট আপন অংশ বিক্রয় করে, তবে সেই জেলার হিন্দুগণ সোফার সত্বের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকুক বা না থাকুক, অন্য মুসলমান শরীক ঐ বিক্রীত অংশ সম্বন্ধে সোফার স্বত্বের দাবী করিতে পারে কি না?

ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করণার্থে শরা অনুসারে শরীকের যে সোফার স্বত্ব আছে তাহার ভাব পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। এই স্বত্ব অতি সঙ্কুচিত। সংক্ষেপ ব্যাখ্যা মতে, ইহা ক্রেতা যে মুল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে তাহাকে তাহা প্রদান করিয়া সম্পত্তি দখল করার স্বত্ব। ক্রয় সম্পূর্ণ ও বিক্রীত সম্পত্তিতে বিক্রেতার স্বত্ব বিলুপ্ত হইলেই ঐ স্বত্বের উৎপত্তি হয়। সফী তাহার শরীককে বিক্রয় ও পরিবর্ত্তন ভিন্ন অন্য প্রকারে তাহার সম্পত্তি যাহার নিকট ইচ্ছা হস্তান্তর করিতে নিবারণ করিতে পারে না। ম্যাকনাটনের নজীর সংগ্রহের ৯ ম মোকদ্দমার ১২৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত সদর দেওয়ানী আদালতের কাজীদিগের ফতোয়াতে দেখা যাইতেছে যে, ক্রেতা যে মুল্যে

সম্পত্তি ক্রয় করে, বিক্রয়ের পূর্ব্বে সফী সেই মূল্য
দিতে অস্বীকার করিলেও সেই স্বত্ব বহাল
থাকিবে।

হেদায়ার ২৮ অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদে
প্রতিবাসীর সোফার স্বত্ব সম্বন্ধে সাফী এবং
হানিফের মতাবলম্বীদের প্রত্যেকের তর্ক বর্ণিত
আছে। সাফীর মত এই যে, প্রতিবাসীর সোফার
স্বত্ব নাই। তিনি বলেন, " যে সম্পত্তি এজমা-
" লীতে দখলী-কৃত হয় এবং যাহা বিভক্ত হয়
" নাই তাহার সম্বন্ধে সোফার স্বত্ব খাটে;
" অতএব যখন সম্পত্তি বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক
" অংশের চতুঃসীমা স্থিরীকৃত হইয়া প্রত্যেকের
" রাস্তা নির্দ্দিষ্ট হয়, তখন আর সোফার স্বত্ব
" থাকে না। বিশেষতঃ, সোফার স্বত্বের তুলনা
" করা যায় না, কারণ, ইহার দ্বারা এক ব্যক্তির
" স্বেচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার সম্পত্তি লইতে হয়,
" অতএব শরাতে যাহাদের প্রতি সেই স্বত্ব প্রদত্ত
" হইয়াছে কেবল তাহাদিগের মধ্যেই ঐ স্বত্ব
" সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। ইহা বিশেষ রূপে
" শরীককে প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রতিবাসীকে
" তাহা বিবেচনা করা যায় না, কারণ, বিভাগের
" দ্বারা যে অসুবিধা হয়, তাহা নিবারণ করাই
" শরীককে দেওয়ার উদ্দেশ্য, কারণ, যে সম্পত্তি
" লইয়া সোফার দাবী হয় তাহা যদি শরীক
" না পায়, তবে নূতন ক্রেতা বিভাগ করিয়া
" লইতে পারে এবং তদ্দ্বারা ঐ শরীকের নির-
" র্থক কষ্ট জন্মিতে পারে," ইত্যাদি।

হানিফার মতাবলম্বিগণ বলে যে, " শরীককে
এই স্বত্ব প্রদান করার কারণ এই যে, তাহা
নিয়ত ও অবিভক্ত রূপে অপর ব্যক্তির (অর্থাৎ
" ক্রেতার) সহিত সংলগ্ন থাকে যাহা ঐ অপর
" ব্যক্তির স্বভাবের বিভিন্নতার দ্বারা শরীকের
" ক্ষতিজনক হইতে পারে। ইহার কোন সন্দেহ
" নাই যে, যে অপর ব্যক্তি ক্রয় করে তাহার
" অপেক্ষা শরীক অধিক অনুগ্রহ-ভাজন, কারণ,
" অপর ব্যক্তির যে অসুবিধা হয় তদপেক্ষা
" শরীকের অধিক দীর্ঘ কাল বাস করিয়া যে
" স্থানের প্রতি মায়া জন্মিয়াছে তাহা পরি-
" ত্যাগ করিতে হইলে অধিক কষ্ট হয়, কারণ,
" যে সম্পত্তিতে সে ক্রয়ের দ্বারা স্বত্ব প্রাপ্ত হই-
" য়াছে তাহা হইতে তাহাকে তাহার ইচ্ছার
" বিরুদ্ধে উচ্ছেদিত করিলেও তাহার অসুবিধা
" অধিক নহে, কারণ, তাহাকে মূল্য না দিয়া বেদ-
" খল করা হয় না; এবং যেহেতু এই সমস্ত হেতু
" প্রতিবাসী সম্বন্ধেও সমতুল্য রূপে খাটে, অত-
" এব শরীকের ন্যায় প্রতিবাসীও সোফার স্বত্বে
" স্বত্ববান। কিন্তু সাফী যে যে হেতুবাদে শরী-
" কের স্বত্ব সংস্থাপন করেন এবং শরীক ও
" প্রতিবাসীর মধ্যে যে প্রভেদ করেন তাহা গ্রাহ্য
" করা যাইতে পারে না, কারণ, সম্পত্তির বিভা-
" গের দ্বারা যে অসুবিধা হয় তাহাতে আই-
" নের অনুমতি আছে, এবং তাহা এমন নহে
" যে, তাহার জন্য এক ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে
" ন্যায্য রূপে তাহার সম্পত্তি হইতে তাহাকে
" বঞ্চিত করা যাইতে পারে। সোফার স্বত্ববান
" ব্যক্তিদিগকে আমরা যেরূপ শ্রেণী-বদ্ধ করি-
" লাম তাহা প্যাগম্বরের আজ্ঞানুযায়ী; তিনি
" কহেন যে, যে ব্যক্তি মূল সম্পত্তির শরীক
" হয়, সে তাহার আনুষঙ্গিক স্বত্বের শরীক
" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং আনুষঙ্গিক স্বত্বের শরীক
" প্রতিবাসীর অগ্রগণ্য; পরন্তু সম্পত্তির শরীকীর
" দ্বারা যে সংমিলন হয় তাহা সর্ব্বোপরি প্রবল,
" এবং আনুষঙ্গিক স্বত্বের শরীকী তৎপরে
" গণ্য, (কারণ, ইহাতে ঐ ব্যক্তি সম্পত্তির
" আনুষঙ্গিক উপস্বত্ব ভোগ করে যাহা প্রতি-
" বাসী ভোগ করিতে পারে না) এবং সকল
" বিষয়েই হেতুর অথবা মূল যুক্তির প্রবলতার
" উপরে স্বত্বের শ্রেষ্ঠত্ব [illegible] বিভা-
" গের দ্বারা যে কষ্ট এবং [illegible]
" হয় তাহা অন্য ব্যক্তির [illegible]
" লেও এক অতিরিক্ত তর্ক বলিয়া স্বীকার
" করা যাইতে পারে।" মূল সম্পত্তির বা তাহার

আনুষঙ্গিক স্বত্বের শরীক বা প্রতিবাসী যে ব্যক্তির প্রতি আপত্তি করে তাহাদ্বারা নিকট ক্রয় করিতে তাহাদের যে স্বত্ব আছে তাহাই সোফার স্বত্ব

ফরেন্ ও কলোনিয়েল আইনের গ্রন্থের ৪ র্থ বালমের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় যেৎ বর্জ যে সকল যুক্তি লিখিয়া গিয়াছেন, এবং সেই পুস্তকের ২ য় বালমের ৩৪৪ ও ৩৪৫ পৃষ্ঠায় ঐ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তাদিগের যে রায় সংগৃীত হইয়াছে তাহা এবং ষ্টোরীর কন্‌ফ্লিক্‌ট অব্ লর ৪২৭ ধারার টীকা অনুসারে আমি বিবেচনা করি যে, সোফার আইন মূল সম্পত্তি সম্বন্ধীয়, এবং তাহাতেই আবদ্ধ বিবেচনা করিতে হইবে। যে সম্পত্তি সম্বন্ধে সোফার দাবী হয় তাহাতেই সোফার দায় স্বভাবতঃ আবদ্ধ। এই কথা ইহার দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ক্রেতার হস্তে সম্পত্তি গেলেও সফী তাহা লইবার চেষ্টা করিতে পারে, এবং বিক্রেতার নিকট হইতে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইলেও সফী আপন স্বত্বের দাবী করিতে ও তাহা প্রবল করিতে পারে। মুসলমান মালিকের আপন সম্পত্তি হস্তান্তর করার যে ক্ষমতা আছে তাহার উপরে এই স্বত্ব একটি দায়।

অতএব আমরা যদি ১৮৩২ সালের ৭ কানুনের ১৫০ ধারার প্রতি দৃষ্টি করি, তবে বোধ হয় এমত বলা যাইতে পারে না যে, এক জন হিন্দু যে ঐরূপ মুসলমান বিক্রেতার নিকট ক্রয় করে যাহার বিরুদ্ধে ঐ বিক্রেতার এক জন শরীক সোফার স্বত্বের দাবী করে, সেই দাবী গ্রাহ্য হইলে, ঐ ক্রেতা মুসলমানদের শাস্ত্রের দ্বারা কোন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে। সে কেবল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে, কারণ, সে কোন সর্ত্ত অথবা আনুষঙ্গিক স্বত্ব-বিশিষ্ট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, এবং হয়ত ঐ আনুষঙ্গিক স্বত্ব না থাকিলে সম্পত্তির যে মূল্য হইত, তদপেক্ষায় ন্যূন মূল্যে সে তাহা ক্রয় করিয়াছে। সে একটি অসম্পূর্ণ স্বত্ব ক্রয় করে। সফীর স্বত্বের অধীনে যে ব্যক্তি সম্পত্তি ক্রয় করে, সফীর সেই উৎকৃষ্টতর স্বত্বের বিরুদ্ধে ঐ ক্রেতার স্বত্ব প্রবল হইতে দেওয়া যাইতে পারে না।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ১৮৪৯ সালের রিপোর্টের ১৩৭ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর বিক্রেতা ও ক্রেতা দুই জনই হিন্দু ছিল। সফীর দাবীর ন্যায্যতার বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিক্রয়ের দ্বারা কি হস্তান্তরিত হয় তাহা স্থির করিতে হইলে, বিক্রেতা যে আইনের অধীন, সেই আইন স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে স্থানীয় আইন হউক, অথবা তাহার প্রকৃত বাসস্থানের আইন যাহাতে স্থানীয় আইন খাটে না তাহাই হউক, তদ্দ্বারা তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে কতদূর ক্ষমতা আছে, তাহা আমাদের তদন্ত করা আবশ্যক।

ব্যাটেলের ল অব্ নেশনের ২ য় অধ্যায়ের ৮ ম পরিচ্ছেদের ৩ য় ধারায় লেখা আছে যে, "বিদেশী উইলকর্ত্তা তাহার স্বদেশের স্থাবর "বা অস্থাবর সম্পত্তি সেই দেশের আইন অনু- "যায়ী ভিন্ন দান করিতে পারে না।" সে যে নগরে বাস করে তথাকার আইনের দ্বারা সে কত দূর বাধ্য তাহা ঐ গ্রন্থকর্ত্তা পশ্চাতে দেখাইয়াছেন। "যে ব্যক্তি বিদেশে উইল করিয়া পরলোক গমন করে, সে এই দেশের আইন অনুযায়ী তাহার বিধবা স্ত্রীকে তাহার অস্থাবর সম্পত্তির যে ভাগ দিতে বাধ্য হইত, তাহা হইতে সে ঐ বিধবাকে বঞ্চিত করিতে পারে না। জেনিবা নগরস্থ এক ব্যক্তি যে তাহার স্বদেশের আইন অনুসারে, তাহার ভ্রাতা প্রভৃতি তাহার অব্যবহিত দায়াদ হইলে তাহাদিগকে তাহার অস্থাবর সম্পত্তির কিয়দংশ দান করিতে বাধ্য, সে যে পর্য্যন্ত জেনিবা নগরের প্রজা থাকে, সে পর্য্যন্ত বিদেশে উইল করিলেও ঐ সকল ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিতে পারে না।"

আমি এমন কোন মোকদ্দমার কথা অবগত নহি, যাহাতে, বিক্রয়ের দ্বারা কি স্বত্ব হস্তান্তরিত হয়

তাহা নির্ণয়ার্থে, বিক্রেতা ও ক্রেতা যে সমস্ত আইনের দ্বারা বাধ্য, তাহাতে অনৈক্যতা থাকিলে, সম্পত্তির বিক্রেতা অথবা সেই সম্পত্তি যে সমস্ত আইনের দ্বারা বাধ্য তদ্ভিন্ন অন্য কোন আইনের প্রতি দৃষ্টি করা হয়। * *

যে সকল স্থলে সোফার স্বত্ব থাকে, তাহাতে ক্রেতা তাহার ক্রয়ের দ্বারা এমন স্বত্ব পায় যাহা একটি বিশেষ ঘটনার দ্বারা খণ্ডিত হইতে পারে, অর্থাৎ সেই স্বত্ব শরীক ও প্রতিবাসীর সোফার দাবী পরিচালনের দায়ের অধীন থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে ক্রেতা যে কেন হউক না, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। সম্পত্তি যে সকল দায়ের অধীন, এক জন হিন্দু কেবল হিন্দু বলিয়াই সেই সকল দায় এড়াইয়া সম্পত্তি কি প্রকারে লইতে পারে? যদি সে সোফার দায় রহিত করিয়া সম্পত্তি লইতে পারে, তবে সম্পত্তি তাহার মূল অধিকারীর হস্তে থাকার কালে আলোক অথবা পথের স্বত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে তাহার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির অধীন থাকিয়া থাকিলেও ঐ ক্রেতা সেই সমস্তও রহিত করিয়া লইতে পারে।

হ্যাগার্ডস কনসিষ্টরী রিপোর্টের ২ বাঃ ৬১ পৃষ্ঠায় ডাল্‌রিম্পল বঃ ডাল্‌রিম্পলের মোকদ্দমায় লর্ড ষ্টোএল কহিয়াছেন, "যাবতীয় সভ্য দেশের "আইনের এক প্রসিদ্ধ যুক্তি এই যে, যে কোন "দেশে কোন ব্যক্তি কোন চুক্তি করে, সে যে "সেই দেশের চুক্তির আইন জানিয়াই চুক্তি করে "এমত অনুমান করিতে হইবে। সে যদি তাহা "অবগত না হইয়া চুক্তি করে, তবে সেই অনবগতির দ্বারা যে ক্ষতি ও অসুবিধা হয় তাহা "কাজেই তাহার ভোগ করিতে হইবে।"

আমি বিবেচনা করি যে, সেই যুক্তি অনুসারে, ব্রিটিস ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে যেখানে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশী বাস করে এবং প্রত্যেকে আপন আপন আইনের দ্বারা শাসিত হয় তথায় যদি এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সহিত কারবার করে, তবে যে ব্যক্তির সহিত সে যুক্তি করে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করার কত দূর ক্ষমতা আছে তাহা সে অবগত হইতে বাধ্য। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যদি কোন হিন্দু কোন মুসলমান পরিবারস্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে নাবালগের সম্পত্তি ক্রয় করে, তবে তাহাকে কখন এমত তর্ক করিতে দেওয়া যাইতে পারে না যে, সে সরলান্তঃকরণে কার্য্য করিয়াছিল, অথবা সে ইহা জানিত না যে, হিন্দুপরিবারের মধ্যে কর্ত্তার যে ক্ষমতা, নাবালগের অভিভাবক স্বরূপে উক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারও সেই পরিমাণ ক্ষমতা ছিল।

যদি কোন মুসলমান মিতাক্ষরার অধীন যৌত হিন্দুপরিবারস্থ কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহা হইলে বোধ করি সে মিতাক্ষরার ব্যবহার অবগত ছিল না বলিয়া বিক্রেতার সন্তান অথবা শরীকের ক্ষতি করিয়া স্বত্ব পাইতে পারে না।

অতএব মুসলমানের নিকট হিন্দুক্রয় করিলে এমত বলিতে পারে না যে, সে সোফার স্বত্ব থাকার বিষয় না জানিয়া ক্রয় করিয়াছে।

মনে কর, একখণ্ড ভূমির বা চা বাগিচার অথবা এক রেশমের কুঠীর দুই জন শরীকের মধ্যে এমন চুক্তি হয় যে, তাহাদের এক জন অপর শরীকের সম্মতি না লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবে না, এবং যদি তাহাদের মধ্যে কেহ ঐ প্রকার সম্মতি না লইয়া অপর কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে, তবে যে মূল্যে বিক্রয় করার বন্দোবস্ত হয়, তাহা প্রদান করিয়া ক্রেতার নিকট ঐ দ্বিতীয় শরীকের তাহা পুনঃক্রয় করার স্বত্ব থাকিবে। ইহা অস্বীকৃত হয় নাই যে, যদি কোন ব্যক্তি এই বন্দোবস্তের কথা অবগত থাকিয়া প্রথমে এক শরীকের সম্মতি না লইয়া দ্বিতীয় শরীকের নিকট ক্রয় করে, তবে প্রথমোক্ত শরীক তাহাকে মূল্য লইয়া সাধিলে সে তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য হইবে। তবে, পরস্পরের চুক্তি দ্বারা ঐ দায় সৃষ্ট না হইয়া উভয় পক্ষের মান্য আইনের দ্বারা ঐ দায় সৃষ্ট হইয়াছে, বলিয়াই কি জন্য তাহার ফলের প্রভেদ হইবে।

ন্যায়-পরতার একটি স্পষ্ট যুক্তি এই যে, যদি কোন ভূমির শরীকের অনুকূল কোন চুক্তির বা আইনের দ্বারা সৃষ্ট দায় অথবা স্বত্বের অধীনে সেই ভূমির অপর শরীক আপন অংশ ভোগ করে, তবে ঐ দায় অথবা স্বত্বের কথা অবগত থাকিয়া কেহ সেই অপর শরীকের অংশ ক্রয় করিলে, ঐ বিক্রেতা উক্ত দায়ে যে পরিমাণ দায়ী ছিল, তাহার অংশক্রেতাও সেই পরিমাণে দায়ী হইবে। কোন ভূমির মালিকের সহিত ঐ ভূমির সংলগ্ন ভূমির ক্রেতার যদি এমন চুক্তি হয় যে, ঐ ক্রেতা কোন এক বিশেষ প্রকারে সেই ভূমির উপরে গৃহ-নির্ম্মাণ করিবে না, অথবা তাহা কোন বিশেষ প্রকারে ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে একুটীর আদালতের চক্ষে ঐ ভূমি ঐ সর্ত্তে দায়ী হইবে, এবং যদি কেহ ঐ চুক্তি অবগত হইয়া তাহা ক্রয় করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে সেই সর্ত্ত পরিচালন করা যাইতে পারিবে।

সিমনের ৯ ম বালমের ১৯৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হোয়াট্‌ম্যান্ বঃ গিব্‌সনের মোকদ্দমায়, কোন ভূমির মালিক কতকগুলি গৃহ-নির্ম্মাণার্থে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করত তাহার কতক খণ্ড বিক্রয় করে, এবং ক্রেতাদিগের সহিত এবং ক্রেতারাও প্রত্যেকে তাহার ও আপনাদের পরস্পরের সহিত এই চুক্তি করে যে, ঐ সকল খণ্ডের কোন ক্রেতা ঐ ভূমির উপরে হোটেলের ব্যবসায় করিতে পারিবে না। ক এই সকল সর্ত্তে উক্ত মালিকের নিকট এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া পশ্চাতে তাহা প্রতিবাদীকে বিক্রয় করে, এবং প্রতিবাদী ঐ সকল সর্ত্ত জানিয়াই তাহা ক্রয় করে। আদালত খ নামক আর এক জন মূল ক্রেতার প্রার্থনামতে প্রতিবাদীর উপরে এই নিষেধক হুকুম জারী করেন যে, সে যে ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়াছে, তথায় সে হোটেলের ব্যবসায় করিতে পারিবে না। সিমনের ১৫ বালমের ৩৩৭ পৃষ্ঠার মোম বঃ ষ্টিফেনের মোকদ্দমা যাহা আপীলে লর্ড চ্যান্সেলর স্থিরতর রাখেন, তাহাতেও ঐ রূপ নিষ্পত্তি হয়। এই সকল মোকদ্দমা দৃষ্টি করিলে, প্রকাশ পাইবে যে, তাহা এই প্রকারে উপস্থিত মোকদ্দমার অনুরূপ, যথা—উপস্থিত স্থলের ন্যায়, সেই স্থলেও দায় পরস্পরের ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে উল্লিখিত মোকদ্দমার ন্যায় চুক্তির দ্বারাই দায় সৃজিত হউক অথবা উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় আইনের দ্বারাই তাহা সৃজিত হউক, তাহাতে একুটী আদালতের চক্ষে কোন ব্যতিক্রম হয় না।

ফিলিপ্‌সের ২ য় বালমের ৭৭৪ পৃষ্ঠার টলক্ বঃ মোক্‌সের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি আরও অধিক দূর যায়। সেই মোকদ্দমায় এক খণ্ড ভূমির ক্রেতা ক চুক্তি করে যে, ঐ ভূমির উপরে সে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, এবং তাহাতে বাদীর ও তাহার প্রজাদের বায়ুসেবন ও আমোদ প্রমোদ করিবার স্বত্ব থাকিবে, এবং তাহা লোহার রেল দিয়া বেষ্টন করিয়া রাখিবে। প্রতিবাদী যে ঐ সকল সর্ত্তের কথা অবগত হইয়া কয়ের নিকট তাহা ক্রয় করে, তাহার প্রতি এই নিষেধক হুকুম জারী হয় যে, সে ঐ ভূমিতে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। লর্ড কটেন্‌হাম বলেন, "আমি বিবেচনা করি যে, "দায় সৃজন করার যোগ্য ব্যক্তির দ্বারাই এই "ভূমির উপর এক দায় সৃষ্ট হইয়াছে, এবং প্রতিবাদী এই দায় থাকার কথা সম্পূর্ণ রূপে "জানিয়াই তাহা ক্রয় করিয়াছে; অতএব ঐ দায় "তাহার বিরুদ্ধে প্রবল হইবে।" তিনি আর এক স্থানে কহিয়াছেন, "আদালত সর্ব্বদাই এই "যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন; তোমরা যখন "এই সম্পত্তি ভোগ কর, তখন তোমরা যে চুক্তি "করিয়াছ তদ্দ্বারা একুটীর আদালতের নিয়মানু- "যায়ী তোমরা বাধ্য, এবং তোমাদের ও তোমা- "দের বিক্রেতার পরস্পরের মধ্যে যে স্বত্ব আছে, "তদপেক্ষা তোমরা তোমাদের ক্রেতাকে উৎকৃষ্টতর "স্বত্ব প্রদান করিতে পারিবে না।" * *

যে সকল নজীর উপস্থিত মোকদ্দমায় অবিকল খাটে, তাহা আমি এইক্ষণে পর্য্যালোচনা করিব। ১ ম বালম সিলেক্ট রিপোর্টের ৩৫০ পৃষ্ঠায় গোলামনবী চৌধুরী বঃ গৌরকিশোর রায়ের এক মোকদ্দমা আছে; ঐ মোকদ্দমা ঢাকা হইতে আইসে এবং তাহাতে বিক্রেতা ও সফী মুসলমান এবং ক্রেতা হিন্দু ছিল। সফীর নালিশ জেলার আদালতে ডিস্‌মিস্ হয়, এবং ঐ ডিস্‌মিসের হুকুম প্রবিন্‌সিয়েল কোর্টে স্থিরতর থাকাতে, সদর দেওয়ানী আদালত যাহাতে তখন মেং, যে, এইচ, হ্যারিংটন এক জন বিচারপতি ছিলেন, তিনি, ঐ মোকদ্দমায় শরার কোন্ বিধান খাটে তাহা নির্ণয় করণার্থে কতিপয় প্রশ্ন সম্বলিত মোকদ্দমার নথী আদালতের কাজীর নিকট অর্পণ করেন, এবং পরে নির্দ্দেশ করেন যে, আপেলাণ্ট সোফার স্বত্বের দ্বারা বিরোধীয় ভূমি পুনঃক্রয় করিতে স্বত্ববান।

৫ ম বালম সিলেক্ট রিপোর্টের ৩১১ পৃষ্ঠার এক মোকদ্দমায় ঢাকার প্রবিন্‌সিয়েল কোর্টের এক নিষ্পত্তি দ্বারা শরীকী-সূত্রে সোফার স্বত্ব পরিচালিত হয়, তাহাতে বাদী ও বিক্রেতা মুসলমান ও প্রতিবাদী অর্থাৎ ক্রেতা হিন্দু ছিল।

এই সকল মোকদ্দমা যে, ন্যায়পরতার বিশুদ্ধ যুক্তি অনুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি অনুমান করি যে, পশ্চাতে আমি যে মোকদ্দমার উল্লেখ করিতেছি তাহার নিষ্পত্তি হওয়ার কাল পর্য্যন্ত ঐ যুক্তি আইন স্বরূপে গৃহীত এবং তদনুসারে কার্য্য করা হইয়াছিল।

৫ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৭০ পৃষ্ঠার দেওয়ান মনওর আলী বঃ সৈয়দ আজহরুদ্দীন মহম্মদের মোকদ্দমায় এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশন নিষ্পত্তি করেন যে, "ফকীর রাউত "বঃ সেখ ইমাম বক্‌সের মোকদ্দমায় প্রধানতম "বিচারালয় যে বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন, "তদনুসারে, জেলা ত্রিপুরায় মুসলমান ভিন্ন অন্য "কোন জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সোফার স্বত্ব "প্রচলিত থাকার কথা সপ্রমাণ না হইলে, প্রতি"বাদী, হিন্দু ক্রেতার বিরুদ্ধে এক জন মুসলমানের "সোফার স্বত্ব প্রবল হইতে পারে না।"

ইহাকে আদালতের রায় বলা যাইতে পারে না, কারণ, ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ এই প্রশ্নের বিচার করেন নাই, অথবা তাঁহাদের নিজের কোন মত ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহারা যে অনুমান করিয়াছেন যে, পূর্ণাধিবেশনের দ্বারা ঐ প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহাদের ভ্রম, কারণ, সদরল্যাণ্ডের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির রিপোর্টের ১৪১ পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে যে, তাহা হয় নাই।

বোধ হয়, ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২০৪ পৃষ্ঠায় সেরাজ আলী চৌধুরী বনাম রমজান বিবীর মোকদ্দমায় মেং মর্ণিং ও, আমার ভ্রাতা কেম্প ও গ্লবরকে ১ ম ও ৫ ম বালম সিলেক্ট রিপোর্টের মোকদ্দমা দেখান নাই। তাঁহারা বলেন যে, বহুসংখ্যক নজীরের দ্বারা যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব-পরম্পরাগত ব্যবহার ও স্থানীয় প্রথা স্পষ্ট রূপে সপ্রমাণ না হইলে সোফার স্বত্ব যাহা হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রানুগত নহে, সেই স্বত্ব সম্বন্ধে হিন্দু প্রতিবাদী শরার দ্বারা বাধ্য নহে, ইহা আদালত অবহেলন করিতে পারেন না। কিন্তু এই বিষয়ে অনেক নজীর আছে বলিয়া যে অনুমান করা হইয়াছে, তাহা আমার বিবেচনায়, ভ্রম। এইক্ষণে নজীর সমস্ত সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ৫ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের নিষ্পত্তিই বাস্তবিক প্রথম নিষ্পত্তি যাহাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, মুসলমান শরীকের নিকট হিন্দু-ক্রেতা সম্পত্তি ক্রয় করিলে তাহা সোফার স্বত্বের অধীন হইবে না।

৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৪৪৭ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় বাদী এবং বিক্রেতা দুই জনই সেই শ্রেণীস্থ হিন্দু ছিল, যাহারা সোফার ব্যবহার

অবলম্বন করিয়াছিল। প্রতিবাদী খৃষ্টিয়ান ছিল। মেং মণ্টিও কি ভাবে মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিম্বা আদালত কোন্ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, বিচার-পতি ফিয়ার এই মোকদ্দমা ভিন্ন প্রকারের মোকদ্দমা বিবেচনা করিয়াছিলেন, এবং এই ক্ষণে আমাদের সমক্ষে যে প্রশ্ন উত্থাপিত, তাহা তিনি মীমাংসা করেন নাই। ইহার উপরে আমি কেবল একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আমার বোধ হয় যে, এমত অনুমান করা দুঃসাধ্য যে, ১৮৩৭ সালের ৪ আক্টের দ্বারা শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর যাবতীয় প্রজাদিগকে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্যের যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানে ভূমি ভোগ করার ক্ষমতা প্রদান করাতে ইহাই মনোগত ছিল যে, তাহারা, এই দেশীয় কোন ব্যক্তি আপন সম ধর্ম্মাবলম্বী বিক্রেতার নিকট ক্রয় করিয়া যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব পাইবে। ঐ আইনের দ্বিতীয় ধারাতে ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট নিষেধ আছে। স্বত্ব দুর্ব্বল বলিয়াই কি জন্য তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। যদি ইহা দুর্ব্বল স্বত্ব হয়, তবে যে ব্যক্তি তাহা অবগত হইয়া ক্রয় করে, তাহার বিরুদ্ধে সুবিচার ও ন্যায়-পরতার যুক্তির উল্লেখে সেই স্বত্ব অগ্রাহ্য না করিয়া, বরং তাহা প্রবল করারই বিশেষ কারণ আছে, কারণ, ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এই স্বত্বের ভার বহন না করা যায় এমন নহে।

অতএব যুক্তি ও এই বিষয়ের পুরাতন নজীর যাহা গত ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এই দেশের আইন স্বরূপে স্থির রহিয়াছে, এবং যাহা ইদানীন্তনের মোকদ্দমায় বিচারিত অথবা স্পষ্টাক্ষরে অন্যথা হয় নাই, তদনুসারে আমার মত এই যে, যখন কোন শরীক অথবা প্রতিবাসী সম্পত্তি বিক্রয় করিলে তাহার মুসলমান শরীক বা প্রতিবাসীর সোফার সম্পত্তি হয়, তখন ক্রেতা হিন্দু বলিয়া সেই স্বত্বের ব্যতিক্রম হয় না।

আমার মত এই যে, প্রস্তাবিত প্রশ্ন সকলের উত্তরে 'হাঁ' বলিতে হইবে।

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—আমার মান্যবর সহ-বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র অতি প্রবল ও পরিষ্কার রূপে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্মত, এবং আমার মতে এই প্রশ্নের উত্তরে "না" বলিতে হইবে। আমার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই মোকদ্দমার তর্কবিতর্কের পূর্ব্বে আমি যখন আদালতে আসিয়াছিলাম, তখন এবং আদালত হইতে যাওয়ার পরেও আমার এই প্রশ্নের 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। আমি তৎকালে বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, বাদী যে স্বত্বের দাবী করে, তাহা বাদীর ক্রয় করার স্বত্বের অর্থাৎ সোফার স্বত্বের অধীন ভিন্ন বাদীর শরীক বিক্রয় করিতে পারে না, শরীকের স্বত্বের এই ত্রুটি থাকার উপরেই সোফার স্বত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এইক্ষণে আমার প্রতীতি হইয়াছে যে, বাদী যে স্বত্বের দাবী করে, তাহা তাহার শরীকের বিক্রয় করার স্বত্বের কোন দোষের উপরে নির্ভর করে না শরার এক বিধানের উপর নির্ভর করে, যদ্দ্বারা প্রতিবাদী অথবা আদালত বাধ্য নহেন। শরা ভারতবর্ষীয় আইন নহে। ভারতবর্ষীয় আইন সমস্তে যত দূর শরার বিধান পালন করার আদেশ আছে, তত দূর ঐ বিধান আইন স্বরূপে গণ্য। মুসলমানদের রাজত্বের কালে শরার যে সকল বিধি প্রচলিত ছিল, অথবা আওরংজেব আলমগীর বাদসাহের আজ্ঞাক্রমে ফতোয়া আলমগীর নামে শরার যে সার সঙ্কলিত হয়, তাহার সমস্ত বিধানের দ্বারা আমরা বাধ্য নহি। ১৭৯৩ সালের ৪ কানুনের যে ভাগ ১৮৩২ সালের ৭ম কানুনের দ্বারা রূপান্তরিত হইয়াছে, সেই

ভাগ ভিন্ন আমরা প্রথমোক্ত কানুনের দ্বারা বাধ্য। ঐ প্রথমোক্ত কানুনের ১৫ ধারায় লেখা আছে যে, "উত্তরাধিকার, দায়াধিকার, বিবাহ, "জাতি এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় আচার "ব্যবহার এবং আলয়াদি সম্পর্কীয় মোকদ্দমায় "মুসলমানদের সম্বন্ধে শরা, এবং হিন্দুদের "সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্র, সাধারণ বিধি স্বরূপে বিচার- "পতিগণ আপন নিষ্পত্তিতে অনুসরণ করি- "বেন।" যদি মিতাক্ষরার অধীন কোন যৌত হিন্দুপরিবারস্থ দুই ভ্রাতার মধ্যে এক ভ্রাতা লোকান্তর গমন করে, তবে সম্পত্তি জীবিত ভ্রাতায় অর্শিবে, মৃত ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী ভরণ-পোষণের স্বত্ত্ববতী হইলেও আপন মৃত স্বামীর দায়াধিকারিণী-সূত্রে ঐ সম্পত্তিতে স্বত্ববতী হইতে পারিবে না। যদি ঐ বিধবা এক খ্রীষ্টিয়ানের নিকট আপন স্বামীর অংশ বিক্রয় করে, তাহা হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী তাহার মৃত স্বামীর অংশ হস্তান্তরিত হইবে না। মিতাক্ষরামতে বিধবা দায়াধিকারিণী-সূত্রে যে সম্পত্তি পাইতে পারে না, তাহা তাহার বিক্রয় করার কোন স্বত্ব নাই। যদি জীবিত ভ্রাতা (যে স্থলে অন্য দায়াধিকারী না থাকিলেও সম্পত্তি স্বোপার্জ্জিত হইলে সে তাহা বিক্রয় করিতে পারে,) এক জন মুসলমানের নিকট বিক্রয় করে, তবে সম্পত্তি ঐ মুসলমানের হস্তে যাইবে; এবং এই সম্পত্তি সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান যাহাদের দুই জনের এক জনও হিন্দু নহে, তাহাদের মধ্যে নালিশ উপস্থিত হইলে, সম্পত্তি কোন্ ব্যক্তিতে বর্ত্তিবে, তন্নির্ণয়ার্থে ঐ কানুনের বিধানানুসারে আমাদের মিতাক্ষরার ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। সেই প্রকার, যদি এক জন মুসলমান, এক মৃত মুসলমানের দায়াদ বলিয়া দাবী করত ঐ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কোন খ্রীষ্টিয়ানকে বিক্রয় করে, এবং আর এক ব্যক্তি ঐ প্রকার মৃত ব্যক্তির দায়াদ-সূত্রে দাবী করত এক হিন্দুর নিকট বিক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ ভঞ্জন করার জন্য আমাদের শরার প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, ঐ রূপ স্থলে বিক্রেতার বিক্রয় করার স্বত্ব শরার দ্বারা শাসিত হয়; কারণ, দায়াধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিক্রেতার স্বত্ব ঐ শরার দ্বারা শাসিত। কিন্তু দায়াধিকারিত্ব, বিবাহ অথবা জাতি সম্বন্ধীয় শরার বিধানের উপরে সোফার স্বত্ব নির্ভর করে না, এবং ইহা কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রথা অথবা ব্যবহারের উপরেও নির্ভর করে না; অতএব আমি বিবেচনা করি যে, নৈকট্যের উপরে শরা অনুযায়ী সোফার যে স্বত্ব নির্ভর করে তদ্দ্বারা যেমন মুসলমানের নিকট হিন্দু-ক্রেতা বাধ্য হইবে না, সেই প্রকার কোন হিন্দু মুসলমান শরীকের নিকট ক্রয় করিলেও সোফার স্বত্বের দ্বারা বাধ্য হইবে না।

যখন মেং বর্জ বলেন যে, সোফার স্বত্বের দ্বারা ভূমি সম্বন্ধীয় স্বত্ব প্রদত্ত হয়, তখন আমার বোধ হয়, তিনি মহম্মদীয় সোফার ব্যবহারের কথা বলেন নাই। আমার মান্যবর সহ-বিচারপতি নর্ম্যান এইক্ষণে যাহা আমাকে বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমি দেখিতেছি যে, তিনি কেবল মেং বর্জের কথা হইতে তাহা অনুমান করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টই দেখা যায় যে, নৈকট্য সম্বন্ধীয় সোফার স্বত্ব চুক্তির উপরে নির্ভর করে না, অথবা শরীকী-সূত্রে সোফার স্বত্বও চুক্তির উপরে নির্ভর করে না, কারণ, যদি কয়েক জন শরীক থাকে, এবং তন্মধ্যে যদি এক জন আপন অংশ বিক্রয় করে, তবে তাহার যে কোন শরীক হউক নালিশ করিতে পারে; কিন্তু বিক্রেতা তাহার সহিত চুক্তি করিয়াছিল বলিয়া সে ঐ নালিশ করে না। যেমন অন্য শরীকের সহিত বিক্রেতার চুক্তি ছিল না, সেই প্রকার তাহার সহিতও চুক্তি ছিল না। যদি চুক্তি থাকে, তবে তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে, এবং আনুমানিক চুক্তি থাকিলে তাহা সকল শরীকের সহিতই থাকিবে, যে ব্যক্তি প্রথমে নালিশ করে, কেবল তাহার সহিত থাকিতে পারে না।

যদি আমরা মুসলমান রাজত্বের অধীন বাস করিতাম, তবে আমার মান্যবর সহ-বিচারপতি কেম্প যেরূপ বলিয়াছেন, সেই রূপ, এক পক্ষ মুসলমান হইলেই কেবল তাহার উপরে সোফার স্বত্ব নির্ভর করিত না, কারণ, মুসলমান গবর্ণমেণ্টের অধীনে শরা দ্বারা মুসলমান শরীককে যে প্রকার স্বত্ব প্রদত্ত হইত, কাফের শরীককেও সেই প্রকার প্রদত্ত হইত। হিন্দু শরীকের বিরুদ্ধে হিন্দু শরীকের যে প্রকার ঐ স্বত্ব থাকিত, হিন্দু শরীকের বিরুদ্ধে মুসলমান শরীকেরও সেই প্রকার স্বত্ব থাকিত। মুসলমান না হইলেই যে, শরা অনুসারে কেহ সফী হইতে পারিবে না, এমত নহে, অতএব কাফেররাও আপনাদের মধ্যে অথবা মুসলমানের বিরুদ্ধে সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে পারিত। বেলির মহম্মদীয় ব্যবহার-গ্রন্থের ৪৭৩ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

ইহা নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, যে জেলায় হিন্দুদিগের মধ্যে সোফার ব্যবহার প্রচলিত নাই, তথায় মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর সোফার স্বত্ব নাই। অতএব যে জেলায় ঐ ব্যবহার নাই সেই জেলায় মুসলমান গবর্ণমেণ্ট কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুর অনুকূলে অথবা এক হিন্দুর বিরুদ্ধে অন্য হিন্দুর পক্ষে যে প্রকার শরা খাটাইতেন তাহা যদি আমরা না করি, তবে তদ্দ্বারাই দেখা যায় যে, মুসলমান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে যে শরার বিধান খাটাইতেন সেই প্রকার বিধান এই দেশের আদালতের আইন নহে। শরার গ্রন্থ সমস্তে সোফার স্বত্বের যে প্রকার বিধান আছে, বিক্রেতা ও সফী মুসলমান বলিয়া আমরা যদি সেই বিধান হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানের অনুকূলে পরিচালন করি, তবে মুসলমান গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার হিন্দুর অনুকূলে মুসলমানের বিরুদ্ধে তাহা পরিচালন করিতেন তাহা আমরা না করিলে আমাদের সমতুল্য বিচার করা হয় না।

আমি বোধ হয় দেখাইয়াছি যে, সোফার ব্যবহার মহম্মদীয় দায়ক্রম অথবা উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব সম্বন্ধীয় আইনের অঙ্গ নহে। আমার মান্যবর সহ-বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র অতি পরিষ্কার রূপে দেখাইয়াছেন যে, মুসলমান শরীকের বিক্রয়ের দ্বারা মুসলমানের হস্তে সম্পত্তি যে প্রকার বর্ত্তে, হিন্দুর হস্তেও সেই প্রকার বর্ত্তে। ক্রয়ের দ্বারা হিন্দু স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কোন্ আইনের দ্বারা সেই হিন্দু ঐ স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে? বিক্রেতার বিক্রয় করার স্বত্ব অসম্পূর্ণ ছিল না। তাহার স্বামিত্ব হস্তান্তরিত হইয়াছে। তবে কি শরা যাহাতে কেবল অসুবিধা নিবারণ করার জন্য সোফার স্বত্বের বিধান আছে, তাহা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীন হিন্দুর উপরে বাধ্যকর হইবে? শরার যে ভাগ এই দেশে প্রচলন করা হইয়াছে, এবং যাহা হিন্দুদিগের উপরে বাধ্যকর, তাহার মধ্যে ঐ স্বত্ব নাই। তবে কি মুসলমান শরীকের এমন কোন ন্যায়ানুগত স্বত্ব আছে, যদ্দ্বারা হিন্দু আপন ক্রয়ের দ্বারা যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা হইতে তাহাকে ঐ মুসলমান শরীক বঞ্চিত করিতে পারে?

১৮৩২ সালের ৭ ম কানুনের ৯ ধারায় ১৭৯৩ সালের ৪ কানুনের বিধির উল্লেখ করিয়া যে বিধান ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারপতি দ্বারকানাথের উপরোক্ত রায়েই উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদি কেহ কোন হিন্দুর দায়াধিকারী বলিয়া দাবী করে, এবং তাহার নিকট এক জন মুসলমান ক্রয় করে, তবে ঐ মুসলমানের স্বত্ব তাহার বিক্রেতার সত্ত্বের উপরে নির্ভর করে। তাহার বিক্রেতার যে স্বত্ব ছিল তাহাই সে ক্রয়ের দ্বারা প্রাপ্ত হয়; এবং হিন্দু শাস্ত্রানুগত দায়ক্রমে যদি বিক্রেতার কোন স্বত্ব না থাকে, তবে ক্রেতা অপর ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে যে প্রকার স্বত্ব পাইত, তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর স্বত্ব পাইতে পারে না। হিন্দু শাস্ত্রানুগত দায়ক্রমে ঐ বিক্রেতার কোন স্বত্ব না থাকাতে মুসলমান ক্রেতা আপন ক্রয়ের দ্বারা কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এই প্রকার নির্দ্দেশ করিলে, ঐ শাস্ত্র না খাটাইলে ক্রেতার যে স্বত্ব হইত তাহা হইতে আদালত তাহাকে বঞ্চিত করেন

না, কারণ, হিন্দু ব্যবহার শাস্ত্রের কথা এক কালে ছাড়িয়া দিলেও, ক্রেতা ঐ কল্পিত দায়াধিকারীর নিকট ক্রয় করিয়া কোন স্বত্ব প্রাপ্ত হইত না। হিন্দু শাস্ত্রানুগত দায়ক্রমের দ্বারা হিন্দু দায়াধিকারীতে সম্পত্তি বর্ত্তিয়াছে বলিয়াই ক্রেতা মুসলমান অথবা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী হউক, সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পূর্ব্বেই দেখান গিয়াছে যে, মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহা ঘটে না। হিন্দু, মুসলমানের নিকট ক্রয় করিয়া সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব প্রশ্ন এই যে, সে কি মহম্মদীয় সোফার ব্যবহারের দ্বারা সেই স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে? কানুনে লেখা আছে যে, "যে স্থলে পক্ষগণ ভিন্ন ভিন্ন "ধর্ম্মাবলম্বী হয়, সে স্থলে ঐ সকল ধর্ম্মানুগত "ব্যবহার প্রয়োগ না করিলে এরূপ ব্যক্তি বা "ব্যক্তিগণ যে সম্পত্তিতে স্বত্ববান হইতে পারিত, "তাহা হইতে তাহাকে বা তাহাদিগকে বঞ্চিত "করণার্থে ঐ সকল ব্যবহার প্রয়োগ করা "যাইবে না।

এই মোকদ্দমায়, মহম্মদীয় সোফার ব্যবহার প্রয়োগ না করিলে ঐ হিন্দু সম্পত্তিতে স্বত্ববান্ হয়। অতএব আমার বোধ হয় যে, হিন্দুর বিরুদ্ধে শরা অনুযায়ী সোফার স্বত্ব পরিচালন করিলে মুসলমানের জন্য হিন্দুকে এমন সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে, যাহা শরা প্রয়োগ না করিলে ঐ মুসলমান তাহার নিকট হইতে লইতে পারে না। অতএব হিন্দু, আইন-সঙ্গত রূপে যে সম্পত্তি পাইয়াছে, তাহাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করার জন্য কি সুবিচার, ন্যায়-পরতা ও সংজ্ঞানের অনুগত কোন বিধান আছে?

বিচারপতি কেম্প ও দ্বারকানাথ মিত্রই দেখাইয়াছেন যে, নিজ শরাতেই তাহার বিধান এড়াইবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ছলের ব্যবস্থা আছে। যদি মুসলমান বিক্রেতা ও হিন্দু ক্রেতার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে বিক্রয় হয়, এবং তাহারা আসিয়া যাহা সত্য নহে তাহা বলে, এবং বলে যে, তাহা প্রকৃত বিক্রয় নহে, কেবল কাল্পনিক ছল মাত্র, তাহা হইলে শরা অনুসারে তাহাদের বাক্য গ্রাহ্য করিতে হইবে, এবং তাহা সত্য নহে বলিয়া আপত্তি করা যাইতে পারিবে না, এবং সোফার স্বত্ব এড়াইবার জন্য বিক্রেতা ও ক্রেতা যে মিথ্যা বাক্য বলে সেই বাক্য দ্বারা তাহা বাধ্য হইবে। আমরা কি এমত বলিতে পারি যে, যদি তাহারা মিথ্যা কথা বলে তবে হিন্দু যে সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, তাহার সে দখীলকার থাকিবে, কিন্তু যদি তাহারা মিথ্যা কথা না বলে তাহা হইলে, ক্রেতার নিকট সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য হইবে।

অনন্তর যদি এই স্বত্ব মুসলমান বিক্রেতা ও হিন্দু ক্রেতার পরস্পরের চুক্তির উপর নির্ভর করে, এবং মুসলমান বিক্রেতা যদি তাহার শরীকগণের সহিত বাস্তবিক এমন চুক্তি করিয়া থাকে যে, সে সোফার স্বত্বের অধীন না রাখিয়া বিক্রয় করিবে না, তাহা হইলে এই ছলের দ্বারা আমরা তাহাকে তাহার চুক্তি খণ্ডন করিতে দিতে পারি না। কিন্তু যদি আমাদের শরা অনুসারেই বিচার করিতে হয়, এবং এই সমস্ত আদালতে যে আইন প্রচলিত আছে, তদনুসারে আমরা বিচার না করি, তাহা হইলে উহা চুক্তি এড়াইবার জন্য ছল কি না, তাহার বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। আমার বোধ হয় যে, এই প্রকার কার্য্য করিলে আমাদের সুবিচার, ন্যায়-পরতা ও সংজ্ঞানের যুক্তি অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে না।

মেং বেলি কর্ত্তৃক শরার সার-সংগ্রহ যাহা ফতোয়া আলমগিরী হইতে সঙ্কলিত, তাহাতে লেখা আছে যে, "যদি কোন ক্রয় ১০০ দেরহামের জন্য "হয়, তবে তাহা প্রকাশ্যে ১০০০ অথবা ততোধিক "দেরহামের জন্য করা যাইতে পারে, এবং তাহার "পরে ক্রেতা ঐ মূল্যের পরিবর্ত্তে ১০০ দেরহাম "মূল্যের এক খানা বস্ত্র বিক্রেতাকে দিতে পারে। "তাহাতে যদি সফী দাবী করিতে আইসে "তাহা হইলে তাহার ঐ প্রকাশ্য মূল্যে ক্রয়

" করিতে হইবে, কিন্তু তাহা অধিক মুল্য বিধায় " সে ক্রয় করিতে পারিবে না।"—৫০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ১০০ টাকা মুল্যের এক খণ্ড ভূমি সম্বন্ধে সোফার স্বত্ব এড়াইবার জন্য তাহা লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়া, পরে ১০০ টাকা লইলেই হইবে, এবং যে আদালত শরা অনুসারে বিচার করিবেন, তিনি এক লক্ষ টাকার কমে সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে দিবেন না, এবং এই আদালত যদি ঐ শরা অনুযায়ী কার্য্য করেন, তবে তাঁহারও উক্ত ছল বৈধ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে।

মেং বেলি তদনন্তর বলেন, " বিক্রেতা ও " ক্রেতা প্রকাশ করিতে পারে যে, বিক্রয় তলজীয়া " অর্থাৎ অবৈধ, অথবা বিক্রেতার ইচ্ছার অধীন; " তাহাদের এই কথা গ্রাহ্য করিয়া লইতে হইবে, " এবং তাহা হইলে সোফার দাবীর আর পন্থা " থাকিবে না।" অতএব যখন সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, তখন তাহারা ইহা বলিলেই পারে যে, তাহা মিথ্যা; এবং ঐ কার্য্য প্রকৃত বিক্রয়ের কার্য্যই হইয়াছিল এমত স্পষ্ট প্রমাণ থাকিলেও এই আদালতের নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, তাহা তলজীয়া অর্থাৎ অবৈধ। আমার যদি এই আদালতে বসিয়া ঐ প্রকার আইন অনুযায়ী বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। যে ব্যক্তি ১০০ টাকায় তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করে, তাহাকে যদি এমত বলিতে দেওয়া যায় যে, সে তাহা এক লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিয়াছে, এবং যদি আমি ঐ মিথ্যা বাক্যই গ্রাহ্য করিতে এবং বাস্তবিক অবস্থার তদন্ত না করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে আমার বোধ হয়, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের আদালত সমস্তে যে সকল আইন ব্যবহার করা ঐ গবর্ণমেণ্টের কখন মনস্থ নহে, তাহাই আমাদের ব্যবহার করা হইবে।"

অতএব আমার মত এই যে, হিন্দু ক্রেতা কতিপয় মুসলমান শরীকের মধ্যে এক শরীকের নিকট ক্রয় করিলেও উপরোক্ত হেতুবাদে মুসলমান শরীকের নিকট শরা অনুযায়ী সোফার স্বত্বে বাধ্য নহে। এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধেও আমার মত এই যে, নৈকট্য সম্বন্ধে শরা অনুযায়ী সোফার ব্যবহার, যাহা বিচারপতি কেম্প বে বলিয়াছেন যে, বিক্রীত ভূমি ও দাবী-কৃত ভূমির মধ্যে বিক্রেতা এক গজ পরিমাণ ভূমি রাখিলেই এড়াইতে পারে, তাহার দ্বারাও হিন্দু ক্রেতা বাধ্য নহে।

এই সমস্ত প্রশ্ন যে সকল খণ্ডাধিবেশনের দ্বারা অর্পিত হইয়াছে, তাঁহাদের নিকট উপরিউক্ত রায় সম্বলিত এই সকল মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরিত হইবে। এই পূর্ণাধিবেশনের বিচারের কোন খরচা প্রদত্ত হইবে না। (গ)

---

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক নাইট, এবং বিচারপতি জি লক; এইচ বি বেলি; এফ, বি কেম্প ও এ জি ম্যাক্‌ফার্সন।

যশোহরের ছোট আদালতের জজ কর্ত্তৃক এস্তমেজাজ।

ফকীরচাঁদ বসু, ডিক্রীদার।

মদনমোহন ঘোষ, দায়ী।

**চুম্বক**।—বিচারাদিষ্ট-দায়ী আপন বিরুদ্ধ ডিক্রীর অন্তর্গত কোন কিস্তীর টাকা আদালতের দ্বারা না দিয়া ঘরাও ভাবে ডিক্রীদারকে দিয়াছে ইহার সার্টিফিকেট দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২০৬ ধারার বিধান সত্ত্বেও, ডিক্রীদার পশ্চাতে আদালতে দাখিল করিতে এবং ঐ টাকা প্রদত্ত হওয়ার বিষয় সপ্রমাণ করিয়া, তৎপরের কিস্তীর টাকার ডিক্রীজারীর তমাদীর আপত্তি খণ্ডন করিতে পারে।

**ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজ**ঃ—এই মোকদ্দমায় কবুলমতে ১৮৬৪ সালের ২৮ এ জানুয়ারি তারিখে এই সর্ত্তে ১১৭ টাকার ডিক্রী হয় যে, ১২৭০ সালের চৈত্র মাস হইতে

১২৭৮ সালের চৈত্র মাসের মধ্যে কিস্তীবন্দী দ্বারা তাহা আদায় হইবে, এবং কিস্তী খেলাফ হইলে সমুদয় টাকা শতকরা ১২ টাকা হিসাবে সুদ সমেত আদায় হইবে, এবং ডিক্রীদার এইক্ষণে অর্থাৎ ১২৭২ সালের চৈত্র হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর জন্য প্রার্থনা করিয়া তমাদির বিরুদ্ধে তর্ক করে যে, সে ১২৭০ ও ১২৭১ সালের চৈত্রের কিস্তীর টাকা পাইয়াছে। অতএব প্রশ্ন এই যে, যেহেতু ঐ টাকা আদালতের বাহিরে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ডিক্রীদারের দ্বারা তৎসম্বন্ধে আদালতে কোন সার্টিফিকেট দাখিল হয় নাই, সে স্থলে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২১১ ধারামতে বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে কি জন্য ডিক্রীজারী হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য আমি তাহার উপরে নোটিস জারী করিতে পারি কি না ?

প্রধানতম বিচারালয় কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, আদালতের দ্বারা ভিন্ন অন্য গতিকে যে টাকা আদায় হয় এবং ডিক্রীর হিসাব ঠিক করার জন্য, যাহার সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল হয় নাই, তাহা ডিক্রীজারী সজীব রাখার কার্য্যের ন্যায় বিবেচনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু আদালতে হিসাব ঠিক করার চেষ্টা হইলেই তদ্দ্বারা ডিক্রী সজীব থাকে, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ী স্বীকার করিলে ডিক্রীদার নূতন সময় পায়, এবং ডিক্রীজারীর যে তমাদী হইত তাহা তদ্দ্বারা খণ্ডিত হয়। কিন্তু ডিক্রীজারীর অন্তর্গত পূর্ব্ব নীলামের টাকা লওয়া ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার মর্ম্মানুসারে ডিক্রী সজীব রাখার কার্য্য নহে। অতএব আর একটি প্রশ্ন এই যে, ঐ সকল কথিত টাকা দেওয়া, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারায় লিখিত "কোন কার্য্য" মধ্যে হইতে পারে কি না ?

১৮৬২। ৬৩ সালের হাইডের রিপোর্টের ৯৮ পৃষ্ঠায় সবাতুল্লা সরকার, বনাম টি, এ, টম্‌সনের মোকদ্দমায় বিচারপতি ওএল্‌স কহিয়াছেন যে, ৮ আইন একেবারেই বাদীর আইন, এবং ১১ বালম উঃ রি, ২৩২ পৃষ্ঠার ভুবনেশ্বরী দেবী বাদিনী বঃ দিননাথ সান্যাল প্রতিবাদীর মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি কহিয়াছেন * যে, "কোন ডিক্রীর "দেনার এক অংশ পরিশোধ করা হইলে, তাহা "যদিও আদালত দ্বারা বা আদালতকে জানাইয়া "না করা হউক, তথাপি তমাদী দোষ খণ্ডনার্থে "যে ঐ রূপ পরিশোধ সপ্রমাণ করা যাইতে "পারিবে না, এমত আমি নিশ্চয় বলিতে পারি "না। আমার বোধ হইতেছে যে, ২০৬ ধারায় "যে, "আদালত ডিক্রীর সমুদায় টাকার বা "তাহার কোন অংশের রফা স্বীকার করিবেন "না" শব্দগুলি আছে, তাহার অর্থ এই যে, "দায়ীর অনুকূলে যে রফা করা হয়, তাহা যদি "আদালতের দ্বারা না করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি "ডিক্রী পাইয়াছে, তাহার কর্ত্তৃক তদ্বিষয় আদা- "লতকে জানান না হয়, তবে ঐ রফা আদালত "স্বীকার করিবেন না, অর্থাৎ যে ব্যক্তি ডিক্রী "পাইয়াছে, সে যদি, আদালতের বাহিরে যে "কিস্তীর টাকা আদায় হইবার বিষয় বলা হয়, "আদালতে ঐ টাকা প্রাপ্তির নিদর্শন দাখিল না "করে, তবে সে ঐ আদায়ের দ্বারা বাধ্য হইবে "না। যদি তমাদীর আইনের বিষয় ব্যবস্থাপক "সমাজের মনে থাকিত এবং তমাদীর মিয়াদ "মধ্যে যে টাকা দেওয়া হয়, তাহা তমাদী নিবারণার্থে দর্শাইতে না দিবার অভিপ্রায় থাকিত, "তবে আমি বোধ করি, তাঁহারা উক্ত টাকা দেও- "য়ার বিষয়ে প্রতিবাদীর নিকট হইতে নিদর্শন "লওয়ার আবশ্যকতা সংস্থাপন করিতেন, কারণ, "প্রতিবাদীরই তাহাতে স্বার্থ থাকিত।"

"আমার এই মত হইবার আরো একটি কারণ "এই যে, কত কালের মধ্যে বাদীকে ঐ টাকা "প্রাপ্তির নিদর্শন দাখিল করিতে হইবে তাহার "নির্ণয় নাই। বাদী যদি কোন সময়ে আসিয়া এই "নিদর্শন দাখিল করে যে, সে টাকা পাইয়াছে,

* বাঙ্গালা সাঃ রিপোর্ট, ৪ র্থ ভাগ, দেঃ নিষ্পত্তি ২৯৪। ২৯৫ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

"তবেই সে তাহা দ্বারা বাধ্য হইবে; কিন্তু যদি "তমাদীর বিষয় ব্যবস্থাপকগণের মনে থাকিত, "তবে তাঁহারা এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত "নিদর্শন দাখিল করিবার নিয়ম করিতেন।

২০৬ ধারা সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতির উক্ত বাক্যগুলি পাঠ করিয়া আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। অতএব আদালতের বাহিরে ডিক্রীদারকে টাকা দিলে তাহা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার অন্তর্গত কার্য্য, এই কথা ভিন্ন, প্রধান বিচারপতির বাক্যের অতিরিক্ত আর কিছু বলা আমার বেয়াদবী হইবে। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে কি জন্য ডিক্রীজারী হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার উপরে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১২৬ ধারা মতে নোটিসজারী করা যাইতে পারে; এবং যদি তাহাতে সে আসিয়া কথিত টাকা দেওয়ার কথা অস্বীকার করে, তাহা হইলে দুই পক্ষই তাহাদের আপন আপন কথা সপ্রমাণ করিতে পারিবে। কিন্তু ঐ নোটিস জারীর জন্য আমি ইহাই অনুমান করিয়া লইব যে, কথিত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রধান বিচারপতি পীকক্ ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—পরস্পর অনৈক্য নজীর থাকায় এই প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হইবে।

ঐ অনৈক্য নজীর ৪ র্থ বাঃ উঃ রিঃ মোৎফরকা নিষ্পত্তির ২১ পৃঃ, এবং ১১ বাঃ উঃ রিঃ দেওয়ানী নিষ্পত্তির ২৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ছোট আদালতের জজ অন্যান্য যে সমস্ত নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন, উপস্থিত প্রশ্নের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক দৃষ্ট হয় না।

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—এই আদালতের মতের জন্য ছোট আদালতের জজ যে আইন-ঘটিত বিষয়ের এস্তমেজাজ করিয়াছেন তাহা হইতে এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হইতেছে। বাদী এই ডিক্রী পায় যে, ডিক্রীকৃত টাকা কিস্তীবন্দীর দ্বারা প্রদত্ত হইবে, এবং যদি কোন কিস্তী খেলাফ হয় তবে ঐ ডিক্রীর সমুদায় টাকা আদায় হইবে। সর্ব্ব প্রথম কিস্তীর তারিখ ডিক্রীজারীর প্রার্থনার ৩ বৎসর পূর্ব্বে ছিল, কিন্তু যে সকল কিস্তী বাদী ডিক্রীজারীতে আদায় করিতে চাহে, তাহা তিন বৎসরের মধ্যে পড়িয়াছে। বাদী ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১২৬ ধারা মতে বিচারাদিষ্ট দায়ীর উপরে এই মর্ম্মে নোটিসজারীর প্রার্থনা করে যে, ডিক্রী কি জন্য জারী হইবে না, তাহার কারণ ঐ দায়ী দর্শায়; এবং বাদী বলে যে, এই দরখাস্তের ৩ বৎসর পূর্ব্বে যে কিস্তী প্রাপ্য ছিল তাহা প্রতিবাদী দিয়াছে; অতএব প্রশ্ন এই যে, যে স্থলে ঐ সকল কিস্তীর টাকা আদালতের দ্বারা বাদীকে দেওয়া হয় নাই, সে স্থলে তাহাকে ঐ টাকা দেওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে দেওয়া যাইতে পারে কি না। যেহেতু কয়েকটি মোকদ্দমায় নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, পূর্ব্ব কিস্তী সমূহের টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং কাজে কাজে বাদী তমাদীর দ্বারা বারিত নহে, এই কথা বাদীর দেখাইবার ক্ষমতা নাই, অতএব প্রধানতম বিচারালয়ের মতের জন্য এই প্রশ্ন উপস্থাপিত হয় যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারা সত্ত্বেও বাদী আদালতে আসিয়া সপ্রমাণ করিতে পারে কি না যে, প্রতিবাদী প্রথম কিস্তী সমস্তের টাকা দিয়াছে, কাজে কাজে ডিক্রীদার-বাদী শেষের কিস্তীর জন্য ডিক্রীজারী করণে তমাদীর দ্বারা বারিত নহে।

১১ শ বা উইক্‌লি রিপোর্টরের ২৩২ পৃষ্ঠার ভুবনেশ্বরী দেবী বঃ দিননাথ সান্যালের মোকদ্দমায় আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অধিক আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি তাহাতে যাহা বলিয়াছি তাহা ছোট আদালতের জজের এস্তমেজাজেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঐ ধারামতে টাকা দেওয়ার সার্টিফিকেট বাদি-কর্তৃক দাখিল হইলেই হয়। আমার মত এই যে, বাদীর আদালতে আসিয়া শেষ কিস্তীর জন্য ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করার, ও প্রতিবাদী প্রথম কিস্তী সমস্তের টাকা দিয়াছে বলিয়া আদালতে তাহার সার্টিফিকেট দাখিল ও তাহা সপ্রমাণ করার ক্ষমতা আছে। ছোট আদালতের জজকে জানাইতে হইবে যে, প্রথম কিস্তী সমস্তের টাকা যে দেওয়া হইয়াছে বাদী এমত সার্টিফিকেট দাখিল করিলে তিনি নোটিসজারী করিবেন, এবং ঐ সকল কিস্তী যে যে সময়ে প্রাপ্য হইয়াছিল সেই সেই সময়ে যে তাহার টাকা প্রদত্ত হইয়াছে, বাদী তাহা ঐ জজের তৃপ্তিকর রূপে সপ্রমাণ করিতে পারিলে, প্রতিবাদী তখন আসিয়া দেখাইতে পারে যে, সে টাকা দেয় নাই, এবং তন্নিবন্ধন প্রথম কিস্তী খেলাফ হওয়ায় যখন ডিক্রীর সমুদায় টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিন বৎসরের মধ্যে বাদী ডিক্রী-জারী না করায় তাহার দাবীতে তমাদী ঘটিয়াছে।

(গ)

৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট, ও বিচারপতি এইচ, বি বেলি; এফ, বি কেম্প; এফ এ গ্লবর ও দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২০৪ নং মোকদ্দমা।

রাজসাহীর মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২০ এ ফেব্রুয়ারিতে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

কৃষ্ণকমল সিংহ (ডিক্রীদার) আপেলাণ্ট।

হরি সর্দ্দার ও আর এক ব্যক্তি (বিচারাদিষ্ট দায়ী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

মেং জি এ টুইডেল ও বাবু নরসিংহচন্দ্র মিত্র আপেলাণ্টের উকীল।

রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নাই।

চুম্বক।—কোন ডিক্রীদার কিস্তীবন্দীর দ্বারা আপন ডিক্রীর প্রাপ্য ক্রমে লইবার করার করিলে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্রীজারী না করিবার করারে আপনাকে আবদ্ধ করিলেই যে, তদ্দ্বারা তমাদীর নির্দ্দিষ্ট কালের ব্যতিক্রম হইবে, এমত নহে; ডিক্রী জারীকারক আদালত যে আকারে ডিক্রীটি দেখিতে পান, সেই আকারে তাঁহার তাহা জারী করিতে হইবে; পক্ষগণ সম্মতি দিলেই যে, তিনি মূল ডিক্রীতে কোন কথা সংযোগ বা তাহার কোন সর্ত্তের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, এমত নহে।

ডিক্রীদার কর্তৃক দায়ীর সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেওয়ার কার্য্য, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত ডিক্রী সজীব রাখার কার্য্য নহে।

প্রধান বিচারপতি পীকক্ ও বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত রায় মতে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—এই মোকদ্দমায়, চৌগাঁয়ের মুন্সেফ-আদালতের ডিক্রীর তারিখ ১৮৫৩ সালের ১৭ ই সেপ্টেম্বর। নাটোরের মুন্সেফ বলেন যে, তাহা জারীর জন্য বেলমারির মুনসেফ-আদালতে প্রেরিত হয়। তিনি বলেন যে, ডিক্রীজারীর যে দরখাস্ত ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর তারিখে বেলমারির মুনসেফের নিকট দাখিল হয়, তাহা আইন-বিরুদ্ধ রূপে গ্রাহ্য হইয়াছিল, কারণ, নাটোরের মুনসেফ যাঁহার ঐ ডিক্রীজারী কর্ত্তব্য ছিল, ডিক্রীদারের দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৮৫ ধারা মতে, ডিক্রীজারীর জন্য বেলমারীর মুনসেফের নিকট তাহার এক প্রতিলিপি প্রেরণ করার নিমিত্ত, তাঁহার অর্থাৎ নাটোরের মুনসেফের নিকটই প্রার্থনা করা উচিত ছিল। এই ডিক্রী কোন্ আদালতের ডিক্রী অর্থাৎ চৌগাঁয়ের মুনসেফের কি বেলমারীর মুন্সেফের

ডিক্রী, এবং আবশ্যক হইলে ২৮৫ ধারা মতে কোন্ আদালতের সার্টিফিকেট প্রেরণ কর কর্তব্য ছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।"

মোকদ্দমার কাগজাতে এই মাত্র দেখা যাইতেছে যে, আমরা এই ১৮৬৯ সালে ১৮৫৩ সালের এক ডিক্রী জারী করার স্বত্বের বিচার করিতেছি। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ডিক্রীজারীর জন্য শেষ দরখাস্ত ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর তারিখে বেলমারির মুন্সেফের আদালতে দাখিল হয়। ডিক্রীজারীতে কতিপয় সম্পত্তি ক্রোক হয়, এবং ১৮৬৫ সালের ২৬ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিক্রীদার ও বিচারাদিষ্ট দায়ী পরস্পরের মধ্যে এক বন্দোবস্ত করে, যদ্দ্বারা সম্পত্তি খালাস পায়, এবং ডিক্রী কিস্তীবন্দীর দ্বারা পরিশোধ হওয়ার করার হয়। প্রথম কিস্তী ১৮৬৫ সালের ৪ ঠা জুলাই তারিখে দেয় হয়। এই আপীল যে দরখাস্ত সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ১৮৬৮ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখে দাখিল হয়। আমার বিবেচনায়, যদিও ডিক্রীদার ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখের পূর্ব্বে ডিক্রীজারী করিতে ক্ষান্ত থাকার জন্য আপনাকে আপনি বাধ্য করিয়াছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা সে সেই তারিখ হইতে পুনরায় দরখাস্ত করিতে তিন বৎসর সময় পায় নাই; ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর হইতে ৩ বৎসরের মধ্যে তাহার দরখাস্ত করা উচিত ছিল। ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখে কিস্তী খেলাফ হইবার পরে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করার জন্য তাহার তখনও ২৸০ বৎসর বাকী ছিল। ডিক্রীদার ইচ্ছাপূর্ব্বক ডিক্রীজারী করিতে ক্ষান্ত থাকিলে যেরূপ তমাদী ঘটিবার বাধা হয় না, সেইরূপ সে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ডিক্রীজারী করিবে না, করারে আপনাকে আপনি বাধ্য করিয়াছিল বলিয়াই, তমাদীর গতি রোধ হইতে পারে না।

কিন্তু কয়েকটি মোকদ্দমায় নিষ্পত্তিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, আদালতের সম্মতি সহকারে কিস্তীবন্দী দাখিল হইলে তদ্দ্বারা ডিক্রী পরিশোধের কালের পরিবর্ত্তন হয়। এই সকল নিষ্পত্তি না থাকিলে আমি বিবেচনা করিতাম যে, ডিক্রীজারীকারক আদালত যে আকারে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েন কেবল তদনুসারেই তিনি তাহা জারী করিতে বাধ্য, এবং পক্ষগণ সম্মত হইয়াছে বলিয়া তিনি কোন রূপে মূল ডিক্রীতে অতিরিক্ত কোন কথা বসাইতে অথবা তাহা রূপান্তর করিতে পারেন না। আমার বর্ত্তমান সংস্কার এই; কিন্তু আমার ঐ সংস্কার যে ভ্রমাত্মক এবং উক্ত নিষ্পত্তি সমস্তই শুদ্ধ, এমত হেতু প্রদর্শিত হইলে আমি তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

অতএব এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হইবে। আমি যে সকল নিষ্পত্তির উল্লেখ করিলাম তাহা ১১ শ বাঃ উইক্‌লি রিপোর্টারের ৮৬ ও ৫৭০ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। আগ্রার হাইকোর্টেরও এক নিষ্পত্তি আছে যাহা উইক্‌লি রিপোর্টরের ৫৭০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ইহা নির্ণয় করিতে হইবে যে, জারীর জন্য ডিক্রী কি গতিকে বেলমারির মুন্সেফ-আদালতে ও নাটোরের মুন্‌সেফ-আদালতে গেল; অর্থাৎ ডিক্রীজারী করার জন্য কোন সার্টিফিকেট সম্বলিত গিয়াছিল, কি এবালিসী চৌগাঁয়ের মুন্‌সেফ-আদালতের পরিবর্ত্তে উক্ত দুই আদালত সংস্থাপিত হওয়াতেই তাহার এক আদালতে গিয়াছিল। এই মোকদ্দমার ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় সমুদায় কাগজ ও কিস্তীবন্দী পাঠাইবার জন্য জজকে আদেশ করিতে হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে সম্মত হইলাম। আমি ইতিপূর্ব্বেই উইক্‌লি রিপোর্টরের ১১ শ বালমের ৮৬ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় আমার রায় ব্যক্ত করিয়াছি, এবং আমি বলি যে, উপস্থিত স্থলে যে রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে তদ্রূপ বন্দোবস্ত সর্ব্বদাই ডিক্রীজারীর আদালত দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

তমাদীর প্রশ্ন সম্বন্ধে আমি বলি যে, ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে তমাদীর কাল গণনা করিতে, যে সময়ে প্রথম কিস্তী দেয় হয় নাই তাহা বিচারাদিষ্ট দায়ীকে গণনা করিতে দিলে, নিতান্ত অন্যায় হয়। তাহার উপকারের জন্যই ঐ বন্দোবস্ত হয়, এবং তাহাকে এই কথা বলিতে দেওয়া যাইতে পারে না যে, কিস্তীর টাকা বাস্তবিক প্রাপ্য হওয়ার পূর্ব্বেই ডিক্রীদারের ডিক্রীজারী করা কর্ত্তব্য ছিল।

পূর্ণাধিবেশনের রায়।—

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—যে মূল প্রশ্নের উপরে এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি নির্ভর করে তাহা এই যে, যদি কোন টাকার ডিক্রীর দুই পক্ষই পরস্পর বন্দোবস্ত করে যে, কিস্তীবন্দীর দ্বারা ডিক্রী ক্রমশঃ পরিশোধিত হইবে, তবে ডিক্রীজারীর আদালত সেই বন্দোবস্ত গ্রাহ্য করিতে পারেন কি না?

আমি এই বিষয় অতি সাবধানে ও অনন্যমনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম; কিন্তু ইহা অত্যন্ত শোচনীয় যে, আমার সিদ্ধান্ত আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতিগণের সিদ্ধান্তের সহিত অনৈক্য হইতেছে।

আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এমন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না যে, সাধারণতঃ, ডিক্রীজারীর আদালত ঠিক ডিক্রী অনুযায়ী তাহা জারী করিতে বাধ্য নহেন, এবং আমি এই প্রস্তাবের বিশুদ্ধতাও অস্বীকার করি না যে, যদি কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কোন এক নির্দ্দিষ্ট টাকার জন্য ডিক্রী প্রদান করেন, কিন্তু কত কালের মধ্যে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে, তাহার কোন উল্লেখ না করেন, তাহা হইলে যে তারিখে ডিক্রী প্রদত্ত হয় সেই তারিখেই ডিক্রীদারের ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকার জন্য তাহা জারী করার ক্ষমতা জন্মে।

কিন্তু সকল সাধারণ বিধিরই বর্জ্জনীয় ঘটনা আছে, এবং যদি এমন ঘটনা হয় যাহা ঐ বিধির অন্তর্গত না হয়, তবে সেই ঘটনা ন্যায্য রূপেই ঐ বিধির কার্য্য হইতে বর্জ্জিত হইবে।

কিস্তীবন্দীর দ্বারা টাকার ডিক্রীজারী করার প্রতি দুই আপত্তি হইতে পারে; প্রথম আপত্তি এই যে, ডিক্রীর সমুদায় টাকা তৎক্ষণাৎ আদায় করিতে ডিক্রীদারের যে স্বত্ব আছে, ঐ কিস্তীবন্দী দ্বারা তাহার ব্যাঘাত হয়; এবং দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, প্রত্যেক কিস্তী খেলাফ হওয়া মাত্র তাহার জন্য প্রত্যেক বার ডিক্রীজারী হইলে, বিচারাদিষ্ট দায়ীর নিরর্থক কষ্ট হয়। কিন্তু যদি দুই পক্ষই ঐ রূপ ডিক্রীজারী করিবার করার করে, তবে ঐ আপত্তিদ্বয়ের কোন আপত্তিই খাটে না, এবং বিধির হেতু অকর্ম্মণ্য হইলে, বিধি কাজেই খাটিতে পারে না।

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যদি প্রস্তাবিত বন্দোবস্তের দ্বারা ডিক্রীর ভাবের পরিবর্ত্তন হয় অথবা আইনে ডিক্রীজারীর যে প্রণালীর বিধি নাই, সেই বন্দোবস্তের দ্বারা তাহাই করা হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষের সম্মতি সত্ত্বেও ডিক্রীজারীকারক আদালতের সেই প্রণালীতে ডিক্রীজারী করার ক্ষমতা হইতে পারে না। কিন্তু টাকা সম্বন্ধে অথবা সেই টাকা যত কালের মধ্যে আদায় হইবে তৎসম্বন্ধে আইনে যে বিচারাধিকারের সীমা নিরূপিত আছে তাহা অতিক্রম না করিয়া কেবল টাকার পরিমাণের রূপান্তর করার চেষ্টা হইলে, উভয় পক্ষই সেই পরিমাণ পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী করার প্রার্থনা করিলে কি জন্যে ডিক্রীজারীর আদালত সেই প্রার্থনা মঞ্জুর করিবেন না, তাহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। মনে কর, ১০০০০ টাকার এক ডিক্রী হয়, কিন্তু পক্ষগণ আপনাদের মধ্যে বন্দোবস্ত করে যে, কেবল ৫০০০ টাকার জন্য ডিক্রীজারী হইবে; তাহা হইলে কি এমত তর্ক করা যাইতে পারে যে, ডিক্রীজারীর আদালত ঠিক ডিক্রী অনুসারে তাহা জারী করিতে বাধ্য বলিয়া ঐ বন্দোবস্ত গ্রাহ্য করিতে অসমর্থ হইবেন। আমি এমন কথা বলি না যে, এই

ঘটনা উপস্থিত মোকদ্দমার ঠিক অনুরূপ, কিন্তু আমার তাহার উল্লেখ করার কারণ এই যে, ডিক্রীজারীর আদালত তাহা ঠিক জারী করিতে বাধ্য, এই বিধি লোকে যেমন অটল বিবেচনা করে, তাহা সেরূপ নহে।

কার্য্যতঃ, এ দেশে ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর আদালতে একটি মোকদ্দমার দ্বারা আপন ডিক্রীর সমুদায় টাকা আদায় করিয়া লইতে পারে না। তাহার পথে অসংখ্য কণ্টক উপস্থিত হয়, এবং আর এক মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি যে বলিয়াছেন যে, এ দেশে যখন কোন অর্থী ডিক্রী পায় সেই কাল হইতেই তাহার কষ্টের আরম্ভ হয়, তাহাই সত্য। এই সমস্ত কষ্টের ফল এই যে, ডিক্রীদার বহু বৎসর পর্য্যন্ত বহুবার ডিক্রীজারী করিয়া তাহার টাকা আদায় করিয়া লইতে বাধ্য হয়; অতএব কার্য্যতঃ, এই বহু ডিক্রী জারীর ফল কি; ডিক্রী কিস্তীবন্দীর দ্বারা ক্রমশঃ পরিশোধিত হওয়ার সহিত উহা কি তুল্য কথা নহে? কিন্তু যদি ডিক্রীর এক ক্ষুদ্রাংশ অপরিশোধিত থাকা পর্য্যন্তও আদালত ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির করিতে বাধ্য হয়েন, তবে পক্ষগণ যে স্থলে পরামর্শ করিয়া কিস্তী-বন্দী দ্বারা ডিক্রী পরিশোধ করার বন্দোবস্ত করে, সে স্থলে আদালতের তাহা গ্রাহ্য করার পক্ষে কি আপত্তি হইতে পারে?

ডিক্রীদার আপত্তি করিলেও ডিক্রীজারীর আদালত যে, টাকার ডিক্রী সরবরাহকারের দ্বারা ক্রমে পরিশোধিত হওয়ার হুকুম দিতে পারেন, ইহা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ২৪৩ ধারায়ই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যায় যে, ডিক্রীর টাকা এই প্রকারে, অথবা কিস্তী-বন্দীর দ্বারা আদায় করার হুকুম হউক, কার্য্যতঃ, দুয়েরই সমান ফল; এবং যদি ডিক্রীদারের সম্মতি ব্যতীত ডিক্রীজারীর আদালত এক বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন, তবে ডিক্রীদার যে স্থলে স্পষ্টবাক্যে সম্মতি দেয় সে স্থলে তিনি দ্বিতীয় প্রকারের বন্দোবস্তও অবশ্যই মঞ্জুর করিতে পারেন। কেবল রিসিবর অর্থাৎ সরবরাহকার নিযুক্ত করাই এই দুই ঘটনার প্রভেদ; কিন্তু রিসিবর নিযুক্ত করার বিধান ডিক্রীদারের প্রাপ্য রক্ষার জন্যই হয়, এবং যে ব্যক্তির উপকারের জন্য হয় সেই ব্যক্তিই যদি তাহা আবশ্যক বিবেচনা না করে, তবে তাহা কাজেই অকর্ম্মণ্য হয়।

মনে কর, এক জন ডিক্রীদার যখন দেখে যে, আদালত ২৪৩ ধারামতে রিসিবর নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তখন যদি সে উপস্থিত হইয়া বলে যে, বিচারাদিষ্ট দায়ী ডিক্রী পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সম্পত্তির বার্ষিক উপস্বত্ব আদালতে আমানত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে দখীলকারে থাকিতে দিতে তাহার কোন আপত্তি নাই; এবং মনে কর, বিচারাদিষ্ট দায়ীও ঐ বন্দোবস্তে সম্পূর্ণ সম্মত হয়; তাহা হইলে কি আদালত ন্যায্যরূপে ঐ বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন না, এবং যদি তিনি মঞ্জুর করেন, তবে কি তাঁহার বিচারাধিকার নাই বলিয়া ঐ হুকুম অকর্ম্মণ্য ও বাতিল হইবে? আমার নিজের মত এই যে, এই দুই প্রশ্নের উত্তরই "না" হইবে; অতএব আমি বুঝিতে পারি না যে, কিস্তীবন্দী দ্বারা টাকার ডিক্রী ক্রমশঃ পরিশোধ করার বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিতে ডিক্রীজারীকারক আদালতের ক্ষমতা কেন থাকিবে না?

কথিত হইয়াছে যে, এই প্রকার বন্দোবস্ত মঞ্জুর করার জন্য দেওয়ানী কার্য্যবিধিতে আদালতের উপর কোন স্পষ্ট আদেশ নাই। কিন্তু এই আপত্তির উত্তর অতি সরল। ২৪৩ ধারার লিখিত ঘটনার ন্যায় যে সকল মোকদ্দমায় আদালত আপন ঝুঁকীর উপরে কার্য্য করিতে বাধ্য হন, কেবল সেই সকল মোকদ্দমা সম্বন্ধেই স্পষ্ট বিধানের আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন পক্ষগণ নিজেই কোন বিশেষ প্রণালীমতে কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত করে, তখন এই প্রকার বিধানের কোন আবশ্যক থাকে না। যেমন কবুলা জওয়াবের উপরে ডিক্রী দেও-

য়ার জন্য আদালতের প্রতি দেওয়ানী কার্য্য-বিধিতে কোন সাধারণ বিধান নাই, কিন্তু তজ্জন্য এমত তর্ক করা যাইতে পারে না যে, আদালতের ক্ষমতা না থাকা হেতু ঐ ডিক্রী অকর্ম্মণ্য ও বাতিল হইবে। কিন্তু আমি দেখাইতে পারি যে, ২০৬ ধারার বিধানে স্পষ্ট দেখা যায় যে, পক্ষগণের সম্মতিমতে আদালতের ডিক্রীর সমুদায় অথবা কিয়দংশের রফা হইতে পারে, এবং ঐ রফা বৈধ হওয়ার জন্য কেবল "তাহা আদালতের দ্বারা "হওনাবশ্যক, অথবা যে ব্যক্তির অনুকূলে ডিক্রী "প্রদত্ত হয় অথবা ডিক্রী যাহার নিকট হস্তান্তরিত "হয় তাহার দ্বারা তদ্বিষয়ের সার্টিফিকেট আদা- "লতে দাখিল হওনাবশ্যক।"

ডিক্রীজারীর আদালত টাকার ডিক্রী কিস্তী-বন্দীর দ্বারা ক্রমে পরিশোধ করার বন্দোবস্ত যে, মঞ্জুর করিতে পারেন, তাহা আমি বোধ হয় পর্য্যাপ্ত রূপেই দেখাইয়াছি; অতএব যে একমাত্র তমাদীর প্রশ্ন এই মোকদ্দমায় উত্থাপিত হইয়াছে, আমি এইক্ষণে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট মত এই যে, যে তারিখে প্রথম কিস্তীর টাকা দেয় হয় সেই তারিখ ভিন্ন অন্য তারিখ হইতে ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে তমাদীর কাল গণনা করা উচিত নহে। যে পর্য্যন্ত সেই ঘটনার উদ্ভব না হয়, সেই পর্য্যন্ত ডিক্রীদার আপন ডিক্রীজারী করিতে পারে না; এবং যেহেতু আইনে অসাধ্য-সাধনের অনুজ্ঞা নাই, অতএব ডিক্রীদারের যাহা করার সাধ্য ছিল না, তাহা সে করে নাই বলিয়া তাহাকে অপরাধী করা নিতান্ত অন্যায় ও সুবিচার-বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। মনে কর, মূল ডিক্রী এক কিস্তীবন্দী খতের উপরে প্রদত্ত হয়, এবং মনে কর, ডিক্রীর তারিখের তিন বৎসর পরে প্রথম কিস্তীর টাকা দেয় হয়, তাহা হইলে, কখন এমত তর্ক করা যাইতে পারে না যে, প্রথম কিস্তীর টাকা দিবার তারিখের পূর্ব্ব কোন তারিখ হইতে ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে তমাদীর কাল গণিত হইবে, কারণ, এমন তর্ক গ্রাহ্য করিলে নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, "ডিক্রীজারী করার উচিত সময়ের পূর্ব্বেই ডিক্রীতে তমাদী ঘটিয়াছে। তবে কেবল ডিক্রীজারীর আদালত ঐ প্রকার বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়াই কি জন্য আমরা ঐ প্রকার বন্দোবস্ত-ঘটিত মোকদ্দমায় ভিন্ন যুক্তি অবলম্বন করিব? যদি এই বন্দোবস্তের বুনিয়াদে ডিক্রীদার নূতন নালিশ উপস্থিত করে, তবে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে তারিখে প্রথম কিস্তী দেয় হয় সেই তারিখ ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে পূর্ব্ব কোন তারিখ হইতে তমাদীর কাল গণিত হইতে পারে না, কিন্তু যদি এই প্রণালীতে কার্য্য করার জন্য তাহাকে বাধ্য করায় কোন বিশেষ লাভ না থাকে, তবে যখন সে ডিক্রীজারীকারক আদালতের নিকট প্রতিকারের জন্য আইসে, তখন কি জন্য অন্য যুক্তি অবলম্বন করিতে হইবে?

কথিত হইয়াছে যে, যদি আদালতের দ্বারা এই প্রকার বন্দোবস্ত সকল গ্রাহ্য হয়, তবে লোকে অনায়াসে তমাদীর আইনের বিধান এড়াইতে পারে; কিন্তু এই আপত্তির কি বল, তাহা আমার দৃষ্ট হয় না। অনেক মোকদ্দমায় এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, তমাদীর আপত্তি বিচারাধিকার সম্বন্ধীয় আপত্তি নহে, এবং যাহাদের উপকার করা তাহার উদ্দেশ্য, তাহারাই যদি তাহাদের প্রতিপক্ষকে নূতন নালিশের হেতু প্রদান করিতে ইচ্ছা করে, তবে আদালত তমাদীর আইন প্রয়োগ করিতে না পারিলে তাঁহার কোন আক্ষেপের কারণ হইতে পারে না। উপস্থিত মোকদ্দমায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল বিচারাদিষ্ট দায়ীর উপকারের জন্যই আদালত কথিত বন্দোবস্ত মঞ্জুর করিয়াছিলেন, এবং কেবল অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে যে সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা সেই ব্যক্তি ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে তমাদীর কালের মধ্যে গণনা করিতে বলিতে পারে না। মনে কর, আদালত দায়ীর প্রার্থনামতে এবং ২৪৩ ধারার

আদালতের প্রতি ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করার যে ক্ষমতা আছে, তদনুসারে, দায়ীকে আপন সম্পত্তির দ্বারাও বিক্রয়ের দ্বারা টাকা সংগ্রহ করিতে দেওয়ার জন্য আদালত তিন বৎসর অথবা তাহার অধিক কালের জন্য ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার হুকুম দেন।' আদালত ন্যায্যরূপে ঐ হুকুম দিতে পারেন কি না, তাহা এইক্ষণে বিচার করার কোন আবশ্যক নাই, কারণ, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তাহা বিচারাধিকার নাই বলিয়া বাতিল ও অকর্ম্মণ্য হইবে না। কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে কোন আদালত কি দায়ীকে এমন কথা বলিয়া তমাদীর আপত্তি উপস্থিত করিতে দিতে পারেন যে, উক্ত সময়ের মধ্যেই ডিক্রীদারের ডিক্রীজারী করা উচিত ছিল? এবং যদি তাহাই না হয়, তবে উপস্থিত মোকদ্দমায় কি জন্য সেই আপত্তি উপস্থিত করিতে দেওয়া যাইবে তাহার আমি কোন হেতু দেখি না, কারণ, কথিত বন্দোবস্তের দ্বারা দায়ী আপনাকে আবদ্ধ করিয়া একরার করে যে, যে পর্য্যন্ত প্রথম কিস্তী দেয় হইবে না, সেই সময় সে ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে তমাদীর কাল গণনার মধ্যে ধরিবে না।

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—আমি বিবেচনা করি, মুন্সেফের ডিক্রী স্থির রাখিয়া নিম্ন আপীল-আদালত যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই বহাল রাখিতে হইবে। আমি এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করার কালে যাহা বলিয়াছি তদতিরিক্ত আমার অধিক বলিবার নাই; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, কোন আদালত যে ডিক্রী দেন তাহা ডিক্রীজারীকারক আদালত পরিবর্তন করিতে পারেন না, এবং পক্ষগণ সম্মত হইয়াও আইন বা আদালতের ডিক্রী পরিবর্তন করিতে পারে না। লোকে আদালতের ডিক্রীজারী করিবে না বলিয়া আপনাকে বাধ্য করিতে পারে, অথবা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতের ডিক্রীজারী না করিতেও আপনাকে বাধ্য করিতে পারে, কিন্তু আইনে যে কালের মধ্যে ডিক্রীজারী করার বিধান আছে তাহা সে উক্ত প্রকার বন্দোবস্তের দ্বারা বৃদ্ধি করিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্থাবর সম্পত্তি পুনঃদখল পাওয়ার জন্য অথবা টাকা পাওয়ার জন্য অথবা ভূমির উপরে অনধিকার-প্রবেশ অথবা মারপিট করার হেতু খেসারতের জন্য নালিশের হেতু থাকে, এবং সে যদি তাহাকে বলে যে, ২০ বৎসরের মধ্যে "আমি তোমার নামে নালিশ করিব না," তাহা হইলে নালিশ উপস্থিত করার জন্য আইনে যে নির্দ্দিষ্ট কালের বিধান আছে তাহার পরে সে নালিশ করিতে স্বত্ববান হইতে পারে না। যদি সে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে নালিশ করিবে না বলিয়া আপনাকে আপনি বাধ্য করে, কিন্তু তাহার নালিশ করার স্বত্ব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করে, তবে তমাদীর আইনে যে সময়ের মধ্যে নালিশ করার অনুজ্ঞা আছে, তাহার মধ্যে তাহার অবশ্যই নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে। ডিক্রী সম্বন্ধেও সেই প্রকার, যদি কোন ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে ডিক্রীজারী করিবে না বলিয়া আপনাকে আপনি বাধ্য করে, কিন্তু যদি তাহার ডিক্রীজারী করার ইচ্ছা থাকে, তবে যে সময়ের মধ্যে ডিক্রীজারী করার জন্য আইনে বিধান আছে, তাহা হইতে অধিক কালের জন্য ডিক্রী জারী স্থগিত রাখার নিমিত্ত তাহার আপনাকে আপনি বাধ্য করা উচিত হইবে না।

উপস্থিত মোকদ্দমায় যে ডিক্রীজারী করার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা ১৮৫১ সালের অর্থাৎ ১৭ বৎসরের ডিক্রী। ডিক্রীজারীর জন্য উপস্থিত দরখাস্তের পূর্ব্বে যে শেষ দরখাস্ত হয়, তাহা ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর তারিখে দাখিল হয়। সেই জারীতে কতিপয় সম্পত্তি ক্রোক হয়। ১৮৬৫ সালের ৬ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিক্রীদার দায়ীকে কিস্তীর দ্বারা টাকা পরিশোধ করার জন্য সময় দিয়া এক কিস্তীবন্দী করে, এবং তাহার প্রথম কিস্তী ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখে দেয় হয়। ডিক্রীজারীর বর্তমান দরখাস্ত ১৮৬৮

সালের ১৪ ই জুলাই তারিখে অর্থাৎ প্রথম কিস্তী দেয় হওয়ার তিন বৎসর পরে উপস্থিত হয়। তর্কিত হইয়াছে যে, এই কিস্তীবন্দী বাধ্যকর, কারণ, তাহা ডিক্রীজারীকারক আদালতে রেজিষ্টরী হয়, কিন্তু তমাদির আইন পরিবর্তন অথবা ১৮৬৮ সালের ১৪ ই জুলাই পর্য্যন্ত ডিক্রী জারীর মিয়াদ বিস্তার করিতে ডিক্রীজারীর আদালতের কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রথম কিস্তীর টাকা দেওয়ার জন্য যে তারিখ নির্দ্দিষ্ট হয়, ডিক্রীজারীর জন্য তাঁহার সেই তারিখ হইতে তিন বৎসরের সময় দেওয়ার কোন ক্ষমতা ছিল না। প্রতিবাদী এমন কোন বন্দোবস্ত করে নাই যে, বাদী তমাদীর কালের বৃদ্ধি পাইবে। কিস্তী খেলাফের পরে বাদীর ডিক্রীজারী করার যথেষ্ট সময় ছিল, কারণ, তাহার ডিক্রীজারীর শেষ দরখাস্ত ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর তারিখে হয়, এবং যখন ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখে কিস্তী খেলাফ হয়, তখন সে ১৮৬৭ সালের ৩০ এ ডিসেম্বরের পূর্ব্বে, অর্থাৎ কিস্তী খেলাফ হওয়ার পরে প্রায় ২॥০ বৎসরের মধ্যে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করিতে পারিত। প্রতিবাদীর একরারে, অথবা ডিক্রীজারীর আদালত কিস্তীবন্দী দাখিল করিয়া লওয়ার যে অনুমতি দিয়াছেন তাহাতে, এমন কিছু দৃষ্ট হয় না যদ্দ্বারা আইনের লিখিতমতে ডিক্রীজারী করার কাল বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর হইতে ৩ বৎসরের শেষে ঐ কালের শেষ হয়। কিন্তু যদি আদালত সম্মত হইয়া থাকেন এবং প্রতিবাদীও সম্মত হইয়া থাকে যে, বাদী যদি ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখের পূর্ব্বে ডিক্রীজারী না করে, তবে সে আইনের লিখিত সময় অপেক্ষা ডিক্রীজারীর জন্য অধিক সময় পাইবে, তাহা হইলে এই বন্দোবস্ত তাঁহাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত বন্দোবস্ত হইয়াছে। যদি এই তর্ক বিশুদ্ধ হয় যে, যখন কোন ডিক্রীদার তাহার ঋণীকে ঋণ পরিশোধ করার সময় দেয়, তখন সেই বর্দ্ধিত সময়ের পরে তিন বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে হউক, তাহার ডিক্রীজারী করার ক্ষমতা থাকিবে, তাহা হইলে এক জন ডিক্রীদার যাহার ডিক্রীজারী করার জন্য কেবল এক দিবস কাল বাকী আছে, সে তাহার দায়ীকে এক দিবসের সময় দিয়া সেই এক দিবসের পরে পুনরায় তিন বৎসর সময় পাইতে পারে, অতএব এক দিবসের পরিবর্ত্তে সে ডিক্রীজারীর জন্য তিন বৎসর পাইবে। ডিক্রীজারী করার সময় সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবস্থাপক সমাজের অবশ্যই কোন উদ্দেশ্য ছিল; অতএব করাও বন্দোবস্ত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য বিনষ্ট করা যাইতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার ডিক্রীজারী স্থগিত রাখিতে স্বীকার করে, তাহা হইলে সেই ১০ বৎসরের পরে তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে সে ঐ ডিক্রী জারী করার স্বত্ব পাইতে পারে না।

আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমার ডিক্রীদারের ১৮৬৪ সালের ৩০ এ ডিসেম্বর হইতে ডিক্রীজারীর জন্য ৩ বৎসর সময় ছিল। এবং যখন সে দেখিয়াছিল যে, কিস্তীবন্দীর সর্ত্ত অনুসারে প্রতিবাদী ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখে কিস্তী খেলাফ করিয়াছে তখন তাহার ১৮৬৫ সালের ১৪ ই জুলাই তারিখ হইতে ৩ বৎসর অতীত হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া ১৮৬৭ সালের ৩০ এ ডিসেম্বরের পূর্ব্বেই ডিক্রীজারী করা উচিত ছিল।

তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৬৫ সালের ৬ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ডিক্রীজারীর জন্য কতিপয় কার্য্য করা হইয়াছিল। কথিত হইয়াছে যে, সম্পত্তি ক্রোক হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ১৮৬৫ সালের ৬ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং সেই তারিখ হইতে ডিক্রীদারের তিন বৎসর কাল ছিল। কিন্তু আমার বিবেচনায়, বিচারাদিষ্ট-দায়ীর সম্পত্তির ক্রোক ছাড়িয়া দেওয়া, ডিক্রীজারী সজীব রাখার কার্য্য নহে, বরং তাহা ডিক্রীজারী বলবৎ না রাখারই কার্য্য।

কথিত হইয়াছে যে, তমাদীর আইনের বাক্যগুলি এই যে, ডিক্রী সজীব রাখার জন্য কিছু কার্য্য করা আবশ্যক। আমি দেখাইয়াছি যে, ক্রোক পরিত্যাগ করা ডিক্রীজারীর কার্য্য নহে, অতএব তাহা ডিক্রী বলবৎ রাখারও কার্য্য নহে। ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে যে, ডিক্রীজারীতে কোন সম্পত্তি ক্রোক করিয়া যদি তাহা পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাহা ডিক্রী বলবৎ রাখার কার্য্য হইতে বলিয়া গণ্য হইতে পারে? অতএব আমার মতে, জজ বিশুদ্ধ রূপেই মুনসেফের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়াছেন; সুতরাং নিম্ন আপীল-আদালতের নিষ্পত্তি স্থির রহিল, কিন্তু খরচা দেওয়া গেল না, কারণ, রেস্পণ্ডেণ্ট উপস্থিত নাই।

বিচারপতি বেলি, কেম্প এবং গ্লবর, প্রধান বিচারপতির মতেই সম্মত হইলেন। (গ)

---

১৩ ই সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯।

প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক্ নাইট ও বিচারপতি এইচ বি বেলি; এফ বি কেম্প; এফ এ গ্লবর ও দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৮ সালের ১৮৭৮ নং মোকদ্দমা।

রাঙ্গামাটির মুন্সেফের ১৮৬৭ সালের ১৮ ই এপ্রিলের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া চট্টগ্রামের অধঃস্থ জজ ১৮৬৮ সালের ১৬ ই এপ্রিলে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

মণিরাম দেব (প্রতিবাদীর মধ্যে এক ব্যক্তি) আপেলাণ্ট।

দেবীচরণ পোদ্দার (বাদী) ও অন্যান্য (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অখিলচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রাজেন্দ্রনাথ বসু রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন এক সাক্ষী এই মাত্র বলে যে, এক ব্যক্তি ভূমির দখীলকার আছে, তবে ঐ কথাই সেই ব্যক্তির দখীলকার থাকার আইনসঙ্গত প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। বিচারপতি দ্বারকানাথ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহেন।

প্রধান বিচারপতি পীকক্ ও বিচারপতি এল এস জ্যাক্সনের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—৯ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৭৯ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তি না থাকিলে আমি বিবেচনা করিতাম যে, যদি কোন সাক্ষী এই সাক্ষ্য দেয় যে, এক ব্যক্তি দখীলকার আছে, তবে তাহা আইন সম্বন্ধে তদ্বিষয়ের অযথেষ্ট প্রমাণ নহে। জাবেতা আপীলে এই প্রকার মোকদ্দমার বিচার করিতে গেলে, এক ব্যক্তি দখীলকার আছে, কেবল এই কথা ভিন্ন আদালত আরো কিছু চাহিতে পারেন, কিন্তু যে আদালত বৃত্তান্তের বিচার করেন তাঁহারই ঐ কথার মীমাংসা করিতে হইবে, তাহা খাস আপীলের হেতু হইতে পারে না। এই আইন-ঘটিত বিষয় সম্বন্ধে মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি সম্পূর্ণরূপে সম্মত। আমি বিবেচনা করি, উক্ত নিষ্পত্তিতে বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ সেই বিশেষ মোকদ্দমার দোষ গুণের বিচার করিয়াছিলেন এবং আইনের সাধারণ বিধি সংস্থাপন না করিয়া কেবল যে প্রণালীতে প্রমাণ লওয়া হইয়াছিল তদ্বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু ঐ নিষ্পত্তি যে প্রকার লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাহা আইন-ঘটিত বিধি স্বরূপ হইয়াছে, অতএব পূর্ণাধিবেশনের দ্বারা তাহার মীমাংসা হওনাবশ্যক।

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

প্রধান বিচারপতি পীকক্।—এই মোকদ্দমার বাদী ওয়াশীলাৎ সমেত কোন ভূমির তৃতীয়াংশের দখল পাওয়ার জন্য নালিশ করে। বাদীর পক্ষের এক জন সাক্ষী সাক্ষ্য দেয় যে, বাদী ঐ ভূমির তৃতীয়াংশে দখীলকার ছিল

এবং পশ্চাতে সে প্রতিবাদি-কর্ত্তৃক বেদখল হয়। জজ বলেন, "এই সাক্ষী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দেখা "যাইতেছে, অতএব তাহার একমাত্র সাক্ষ্যই "বিশ্বাস করা যাইতে পারে। অতএব আমার "স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, হস্তান্তর ও নালিশের "পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে বাদী আপন "হিস্যার দখীলকার ছিল।" প্রথম আদালতও ঐ রূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু প্রধানতম বিচারালয়ে খাস আপীলে তর্কিত হইয়াছে যে, আইন-সঙ্গত কোন প্রমাণ ছিল না এবং দখল শব্দের দ্বারা সাক্ষীর কি ব্যক্ত করা মনস্থ ছিল তাহা তাহার দেখান উচিত ছিল, বাদী দখীলকার ছিল, কেবল এই মাত্র বলা তাহার উচিত ছিল না।

মোকদ্দমা যখন আমার সমক্ষে উপস্থিত ছিল এবং যখন আমি তাহা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করি তখন আমি যাহা বলিয়াছি, তাহার অতিরিক্ত আমার অধিক বলিবার নাই। (পূর্ণাধিবেশনে অর্পণের উপরোক্ত রায় এস্থলে পাঠ্য)।

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যদি এক জন সাক্ষী আদালতে আসিয়া বলে যে, বাদী এক জমিদারীর তৃতীয়াংশে দখীলকার ছিল, তবে আমি তাহাকে জেরাসওয়াল করি ও সে কি প্রকারে তাহা অবগত হইয়াছে তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু এই মোকদ্দমায় জেরা সওয়াল হয় নাই, এবং জজ বলেন যে, প্রতিবাদীর উকীল তাহাকে জেরা-সওয়াল করা পরিত্যাগ করেন। আমার বোধ হয় এমন সঙ্গত প্রমাণ ছিল যাহার উপরে আদালত বাদীর দখলের অনুকূলে ন্যায্য রূপেই নিষ্পত্তি করিতে পারেন; অতএব এই বলিয়া অর্পিত প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে যে, যখন কোন সাক্ষী বলে যে, কোন ব্যক্তি দখীলকার আছে, সেই কথা ঐ ব্যক্তির দখল থাকার বিষয়ে আইন-সঙ্গত প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য।

আপেলাণ্টের উকীল স্বীকার করিয়াছেন যে, এই মোকদ্দমায় কেবল ঐ কথাই বিচার্য্য ছিল। অতএব আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে। বিচারপতি বেলি, কেম্প, ও গ্লবর এই রায়েই সম্মতি দিলেন।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—যেহেতু ৯ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরে প্রচারিত মোকদ্দমায় আমি এক জন বিচারপতি ছিলাম, অতএব আমি তৎকালে যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলাম তাহা কি কারণে করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে আমার কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। আমি বিবেচনা করি, ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যদি কোন সাক্ষী কেবল এই বলে যে, অমুক ব্যক্তি দখীলকার ছিল, কিন্তু কি প্রকারে ঐ সাক্ষী তাহা অবগত হইয়াছে তাহা যদি সে না বলে, তবে সেই কথা আইন-সঙ্গত প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইলেও তাহা অতি অসন্তোষকর ভাবের সাক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ রূপ সাক্ষ্য আইন-সঙ্গত প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য কি না? আমি স্বীকার করি যে, আমার এখনও এই বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ আছে। যদি "দখল" শব্দে বাস্তবিক ভোগ যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তাহা বুঝায়, তবে ঐ সাক্ষ্য নিঃসন্দেহই গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু যদি "দখল" শব্দ দ্বারা কেবল আনুমানিক দখল বুঝায়, এবং যাহা রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল নিজেও স্বীকার করিয়াছেন, তবে এই অনুমান করিতে হইবে যে, সাক্ষী তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ঐ কথা বলে নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত সে অবগত হইয়া থাকিবে, তাহার উপরে অনুমান করিয়া বলিয়াছে। কিন্তু যেহেতু আমার অন্যান্য বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতিগণ সকলেই ভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন; বিশেষতঃ, যে স্থলে আমার মতের পোষক কোন নজীর আমি প্রদর্শন করিতে পারি না, সে স্থলে তাঁহাদের সহিত আমার মতভেদ হওয়া উচিত নহে।

(গ)

২৪ এ জানুয়ারি, ১৮৭০ ।

## প্রধান বিচারপতি সর বার্ণেস পীকক, নাইট ও বিচারপতি এফ বি কেম্প ; এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন ; দ্বারকানাথ মিত্র ও সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট ।

১৮৬৯ সালের ১৪২৭ নং মোকদ্দমা।

ঢাকার মুন্সেফের ১৮৬৮ সালের ১০ ই জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি স্থিরতর রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ২৩ এ মার্চ তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গুরুগোবিন্দ সাহা প্রভৃতি ( প্রতিবাদী ) আপেলাণ্ট।

আনন্দলাল ঘোষ প্রভৃতি ( বাদী ) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত ও গিরিজাশঙ্কর মজুমদার আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীনাথ দাস ও ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—বঙ্গদেশে প্রচলিত হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য-দৌহিত্র দায়াধিকারী হইতে পারে।

### বিচারপতি বেলি ও হব্‌হৌসের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবশনে অর্পিত হয় :—

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমাদের বিচার্য্য বিষয় কেবল বংশাবলির একটি কথার উপর নির্ভর করে এবং ঐ বিষয় সম্বন্ধে স্বীকৃত বংশাবলি এই, যথা :—

বিষ্ণুরাম ঘোষ।

প্রাণবল্লভ — বজবল্লভ

প্রাণবল্লভ : রামশঙ্কর, রণজিত

রামশঙ্কর : পদ্মলোচন, শিবপ্রসাদ

পদ্মলোচন : কালীকান্ত জীবিত, কাশীকান্ত মৃত

শিবপ্রসাদ : গঙ্গাধর — বিধবা দয়াময়ী

রণজিত : উদয় — কাশীশ্বর — পঞ্চানন

বজবল্লভ : পার্ব্বতী — আরাধন — মৃত্যুঞ্জয় দত্তকপুত্র — তাহার পুত্রগণ, অর্থাৎ বাদিগণ

প্রশ্ন এই যে, বাদিগণ যাহারা দত্তকপুত্র মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র, তাহারা, পঞ্চানন বর্ত্তমানে, মৃত গঙ্গাধরের সম্পত্তি হইতে বিধবা দয়াময়ী প্রতিবাদী-খাস আপেলাণ্টের নিকট যে হস্তান্তর করিয়াছে তাহা অন্যথা করার জন্য নালিশ করিতে পারে কি না ?

সওয়ালজওয়াবে এই প্রশ্ন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

প্রথমতঃ।—বাদিগণ দত্তক পুত্রের সন্তান এবং পঞ্চমপুরুষ বিধায় দায়াধিকারী হইতে পারে কি না।

দ্বিতীয়তঃ।—বাদিগণ কোন না কোন সময়ে সম্পত্তি লইতে পারে, স্বীকার করিলেও, পঞ্চানন উৎকৃষ্টতর দায়াধিকারী কি না, কারণ, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, পঞ্চানন এমত এক জ্ঞাতি যে মৃত ধনী গঙ্গাধরকে দুই পিণ্ড দিতে পারে ; কিন্তু ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, বাদিগণ কেবল সকুল্য।

প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টের পক্ষে বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত ও বাদী খাস রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে বাবু রমেশচন্দ্র মিত্রের দ্বারা এই সকল বিষয় অতি উৎকৃষ্টরূপে তর্কিত হইয়াছে, এবং আমরা বোধ করি এই বিষয়ে যত প্রমাণ ও নজীর আছে তাহা আমাদের সমক্ষে সম্পূর্ণরূপে উত্থাপিত হইয়াছে।

খাস আপেলাণ্টের উকীলের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে যে, যদি উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় বিষয়ে দত্তক-পুত্র সর্ব্বপ্রকারে ঔরসজাত পুত্রের তুল্য অবস্থাস্থিত, হয়, তবে বাদিগণ এস্থলে দত্তক পুত্রের সন্তান বলিয়া আদালত হইতে বহিষ্কৃত হইবে না ; কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, এই উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে দত্তক-পুত্র ঐ রূপ সমতুল্য নহে, এবং যেহেতু ঔরসজাত পুত্রের সন্তানেরা সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত দায়াধিকারী, কিন্তু দত্তক পুত্রের সন্তানেরা চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত দায়াধিকারী, অতএব বাদিগণ পঞ্চম পুরুষ বিধায় দায়াধিকারী নহে।

দত্তকচন্দ্রিকার ৩ য় পরিচ্ছেদের অষ্টাদশ

হইতে ষষ্ঠবিংশ পর্য্যন্ত শ্লোকে যে বচন ও তাহার টীকা আছে, প্রায় সম্পূর্ণ রূপে তাহার ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করিয়াই এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে।

যে শ্লোকের উপরে বিশেষ নির্ভর করা হইয়াছে তাহা অষ্টাদশ শ্লোক এবং তাহার বাক্য গুলি, এই যথা,

"সপিণ্ডের সম্বন্ধ তাহার পরে বিবেচিত "হইয়াছে। ইহা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ; "জনক পিতার পরিবারে রক্তসম্বন্ধ হেতু; "এবং দত্তক-গৃহীতার পরিবারে পিণ্ডসম্বন্ধ "হেতু।"

মূলে যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, টীকাকার এই শ্লোকে বিবেচনার জন্য এক প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং তিনি যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রশ্নের কত দূর পর্য্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা খাটে এবং কত দূর তাহার মীমাংসা হইয়াছে তাহার বিচার এখনও বাকী রহিয়াছে।

১৯ শ্লোকে ঐ প্রতিজ্ঞার পোষক এক বচন আছে; এবং তাহার পরে ২০ হইতে ২৩ শ্লোকে ঐ বচনের ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে, এবং দৃষ্টব্যে অনৈক্য অন্যান্য বচনের সহিত একতা দেখান হইয়াছে। অনন্তর, ২৪ শ্লোকে ১৮ শ্লোকের অবিকল বাক্য ব্যবহার করিয়া অন্য এক টীকাকার কর্তৃক ব্যক্ত বলিয়া ঐ প্রতিজ্ঞা পুনরায় লিখিত হইয়াছে, এবং ২৫ ও ২৬ শ্লোকে ঐ বচনের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে।

এই তৃতীয় পরিচ্ছেদটি সমুদায়ে অতি উৎকৃষ্টরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ইহা ভিন্ন আর কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি না যে, টীকাকার এই প্রতিজ্ঞা স্থাপন করিয়াছেন যে, ঔরসজাত পুত্র সম্বন্ধে সপিণ্ডের সম্বন্ধ ৭ ম পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে, কিন্তু দত্তক-পুত্র সম্বন্ধে তাহা কেবল ৪ র্থ পুরুষ পর্য্যন্ত থাকে।

আমি দেখিতেছি যে, এই পরিচ্ছেদের পূর্ব্ব ভাগে তিনি দুই প্রকার দত্তক পুত্রের কথা এবং ঐ দুই প্রকারের পরস্পরের ও ঔরসজাত পুত্রের সহিত সম্বন্ধের কথা লিখিয়াছেন, এবং ১৮ শ্লোকে ঐ প্রতিজ্ঞার উল্লেখের অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দ্ব্যামুষ্যায়ণের সহিত শুদ্ধ দত্তক পুত্রের তুলনা করিয়াছেন।

পরে তিনি স্বভাবতঃই সপিণ্ড সম্বন্ধে এই দুই প্রকার পুত্রের কথা পর্য্যালোচনা করিয়াছেন এবং তাহার পরে যে প্রতিজ্ঞা আছে তাহাতে কাজেই এই দুই প্রকার পুত্রের কথাই আছে।

পরে তিনি মূল বচনের উল্লেখ করিয়া তাহা দ্ব্যামুষ্যায়ণ সম্বন্ধে কি প্রকারে খাটে তাহা (২০ শ্লোকে) দেখাইয়াছেন, এবং কেবল সেই দ্ব্যামুষ্যায়ণ ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ তাহার জনক পিতার তিন পুরুষ এবং দত্তকগৃহীতা পিতার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত কি প্রকারে সম্পত্তি লয় তাহা তিনি বুঝাইয়া গিয়াছেন, এবং (২৫ শ্লোক) শুদ্ধ দত্তক পুত্র কি প্রকারে ঊর্দ্ধতন তিন পুরুষ অর্থাৎ দত্তকগৃহীতা পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ পর্য্যন্ত সম্পত্তি লয় তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন।

তৎপরে এক উদাহরণের দ্বারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, দত্তকপুত্র ৩ পুরুষ পর্য্যন্ত লয়, অর্থাৎ পৌত্র, দত্তক পুত্রের ও দত্তকগৃহীতার ও দত্তক-গৃহীতার পিতার সহিত সহযোগের দ্বারা লয়।

পরিশেষে তিনি বলেন, দত্তক পুত্র হইতে জাত চতুর্থ পুরুষ বর্জ্জিত, কারণ, দত্তকপুত্রের সহিত ঔরস পুত্রের প্রভেদ থাকায় দত্তক পুত্র পিণ্ড-লোপের ভাগ হইতে বর্জ্জিত (২২ শ্লোক); "অতএব "মৎস্য পুরাণে যে বিধি লেখা আছে যে, ৭ ম "পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডের সম্বন্ধ থাকে, তাহা "ঐ বিশেষ বিধি অর্থাৎ সপিণ্ডের তিনি যে "বিশেষ বিধির প্রস্তাব করিয়াছেন তদ্দ্বারা

" বারিত, কারণ, সপিণ্ডের সম্বন্ধ যাহা প্রকৃত
" ঔরসজাত পুত্রের সহিত সাংদৃষ্টিকন্যায়ে অনুমিত
" হইতে পারে, " তাহা কেবল সংস্থাপিত হয়
" নাই এমন নহে, তাহা নিবিদ্ধ হইয়াছে
( ২৬ শ্লোক )।

অতএব আমি বিবেচনা করি, যে দত্তকচন্দ্রিকার উপরে দুই পক্ষই তাহাদের উকীলের দ্বারা নির্ভর করিয়াছে, তদনুযায়ী এই নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, চতুর্থ পুরুষের পরে দত্তকপুত্র সপিণ্ড নহে, এবং যদি সপিণ্ড না হয়, তবে সেই চতুর্থ পুরুষের পরে সে কোন জ্ঞাতিই নহে।

অতএব খাস আপেলাণ্টের উকীল তর্ক করেন যে, যদি এই মোকদ্দমার ন্যায় দত্তক পুত্র চতুর্থ পুরুষের পরে জ্ঞাতি না হয়, তবে সে দায়াধিকারীও হইতে পারে না, কারণ, হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে দায়াধিকারিত্ব স্বত্ব সম্বন্ধাধীন, অর্থাৎ বংশের ঊর্দ্ধতন অথবা অধস্তন পুরুষের সহিত সম্বন্ধ থাকার গতিকে প্রেতপিণ্ড ও পিণ্ডলোপ ও জলদান এবং অন্যান্য ক্রিয়া করার যোগ্যতা হইতেই ঐ স্বত্বের উদ্ভব হয়।

হিন্দুপরিবারের দায়ক্রম যে সাধারণ মূলের উপর নির্ভর করে এবং দত্তকের বিধি সমস্ত যে সকল হেতুর উপরে নির্ভর করে, তদ্দৃষ্টে আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সাধারণ নিয়ম এই যে, সম্বন্ধই দায়াধিকারিত্ব স্বত্বের মূল, এবং দত্তকের বিধিও ঐ নিয়মের অধীন, কারণ, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে যে, পিণ্ড ও জল দান এবং অন্য ক্রিয়াদির জন্যই দত্তক গ্রহণাবশ্যক (১ ম পরিচ্ছেদের ৩ য় শ্লোক); এবং এই সকল নিয়মের মূল ধরিয়া তর্ক করিলে আমার এই নির্দেশ করা উচিত হইবে যে, যখন সম্বন্ধের লোপ হয় তখন দায়াধিকারিত্ব স্বত্বেরও লোপ হয়; কিন্তু পক্ষান্তরে, আমি বিবেচনা করি যে, দত্তকচন্দ্রিকা এবং অন্যান্য গ্রন্থে দত্তকের বিধি যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে সেই নিয়মানুসারে যদি এমত দেখা যায় যে, দত্তক পুত্রেরা পার্ব্বণ ক্রিয়া সমস্ত করিতে না পারিলেও দায়াধিকারী হইতে পারে, এবং যদি এই নিয়ম সুবিচার ও ন্যায়ানুগত হয়, তাহা হইলে তাহা স্থির রাখা আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। অতএব যে সকল প্রমাণের উল্লেখ হইয়াছে, আমি তৎসমুদায় অতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিব, এবং দত্তক পুত্রের জ্ঞাতিত্ব শেষ হওয়ার পরে তাহার দায়াধিকারিত্ব স্বত্বের কোন নির্দ্দেশ বা প্রথা ঐ সকল প্রমাণে আছে কি না, তাহা আমি দেখিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ, আমি বিবেচনা করি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, দত্তকচন্দ্রিকার ৩ য় পরিচ্ছেদের বিধান সমস্ত কেবল শ্রাদ্ধাদি নির্ব্বাহ বিষয়েই দত্তক পুত্র সম্বন্ধে খাটে। প্রথম পরিচ্ছেদে লেখা আছে যে, " দত্তক পুত্রের
" কৃত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি পশ্চাতে স্থিরীকৃত হই-
" য়াছে। " যদিও " সপিণ্ডের সম্বন্ধ পরে বিবে-
" চিত হইয়াছে " এই কথাগুলি ব্যবহার করিয়া অষ্টাদশ শ্লোকে এক নূতন বিষয়ের প্রস্তাবনা হইয়াছে, তথাপি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ পরিচ্ছেদের পশ্চাতের শ্লোক সমস্তে ঐ সম্বন্ধ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্বন্ধে পর্য্যালোচিত হইয়াছে, অন্য কোন কথার সম্বন্ধে হয় নাই; ২১, ২২, ২৩, এবং ২৬ শ্লোকে ঐ সকল ক্রিয়ার স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে।

যে বিজ্ঞবর গ্রন্থকর্ত্তা দ্বারা দত্তকচন্দ্রিকা সঙ্কলিত হইয়াছে, তিনি আপন সুবিধার জন্য ঐ গ্রন্থ যে প্রকার অধ্যায় সমস্তে বিভাগ করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা দেখিতেছি যে, গ্রন্থকর্ত্তা নিজে এক দিকে শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্বন্ধে সপিণ্ডের কথার ও আর এক দিকে " দত্তক পুত্রের অপবিত্রতার " কথার বিচার করিয়াছেন এবং এই সকল কথার মীমাংসা শেষ না করিয়া, তিনি দত্তক পুত্রের দায়াধিকারিত্ব স্বত্বের বিচার আরম্ভ করেন নাই। টীকাকার যখন " দায়ক্রমে অধিকার " বিষয়ে এই বাক্য ব্যবহার করিয়া ৫ ম পরিচ্ছেদ আরম্ভ করিয়াছেন যে, " দত্তক পুত্রের
" দায়াধিকার পরে বিবেচিত হইয়াছে, " তখন

যে "তাঁহার মনে একটি নূতন বিষয় ছিল, তাহা "স্পষ্টই দেখা যায়।"

আমি বিবেচনা করি ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র ৫ ম পরিচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা এই প্রকার বিবেচনা করা যাইতে পারে। দত্তক-পুত্রের দায়াধিকার-সম্বন্ধে গ্রন্থকারগণের যে সকল পরস্পর অনৈক্য মত আছে তাহা তাহার কোন কোন বচনের ব্যাখ্যা স্বরূপ কোন কোন স্থানে দুই একটি বাক্য সম্বলিত ১ হইতে ১৮ শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

১৯ শ্লোকে টীকাকার ঐ অনৈক্য বচন সমস্তের মিলন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরে ২০ শ্লোকে তিনি মনুর মূল বচনের উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল।

২১ ও ২২ ধারায় তিনি পুনর্ব্বার কতিপয় অন্যান্য অনৈক্য বচনের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ২৩ ও ২৪ ধারায় তাঁহার নিজের সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, এবং তিনি প্রধান গ্রন্থকর্ত্তা বিধায় আমরা সেই সিদ্ধান্তের দ্বারা বাধ্য, যথা:—

মনুর বচন এই যে, "যাহার দত্তক-পুত্র "সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তাহার ধনাধিকারী সেই দত্তক- "পুত্রই হইবে।"

তাহার পরে টীকাকার দেখাইয়াছেন যে, "সর্ব্বগুণালঙ্কৃত" শব্দের দ্বারাই বিবিধ গ্রন্থকারগণের অনৈক্য বচনের মিল হয়, এবং তিনি এই বলিয়া ২৪ শ্লোক সমাপ্ত করিয়াছেন যে, "প্রকৃত "ঔরস-পুত্র যেরূপ ভ্রাতৃসম্বন্ধ ইত্যাদি দ্বারা "ভ্রাতৃ প্রভৃতির ধনে অধিকারী হয়, তদ্রূপ "ধনীর ঐ প্রকার পুত্র না থাকিলে, দত্তক- "পুত্র সম্পূর্ণ ধনেও অধিকারী হইতে "পারে।"

আমি বিবেচনা করি, কেবল উপস্থিত বিরোধ সম্বন্ধেই এই শেষ বচন চূড়ান্ত, এমত নহে, তাহা মহর্ষি মনুর বচনের ও দত্তক-গ্রহণের সমুদায় যুক্তির ও পণ্ডিতগণের মত, ও আমাদের আদালতের নিষ্পত্তি এবং সুবিচার ও ন্যায়পরতার যুক্তির অনুমোদিত।

মনুসংহিতার '৯ ম অধ্যায়ের' ১৫৮ হইতে ১৬০ শ্লোক পর্য্যন্ত আমি দেখিতেছি যে, মনু যে দ্বাদশ পুত্রের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬ জন জ্ঞাতি ও দায়াদ, এবং দত্তক-পুত্র ঐ জ্ঞাতি ও দায়াদের মধ্যে এক জন, এবং সেই পুত্র কেবল তাহার গৃহীতা পিতার দায়াদ, এমত নহে, জ্ঞাতিদিগেরও দায়াদ।

দত্তকচন্দ্রিকার ৩ য় পরিচ্ছেদের ৯ ম শ্লোকে আমি একটি বচন দেখিতেছি যাহাতে লেখা আছে যে, পশ্চাতে ঔরস-পুত্র না জন্মিলে দত্তক-পুত্র সর্ব্বপ্রকারে ঔরস-পুত্রের সমতুল্য; কিন্তু ইহার দ্বারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার বিষয়ে সপিণ্ডের সম্বন্ধের প্রতিও কিছু সন্দেহ উপস্থিত হয়।

অপিচ, সেই গ্রন্থের ২২৭ পৃষ্ঠার ২০ টীপ্পনীতে আমি দেখিতেছি যে, বিজ্ঞবর টীকাকার ঐ প্রমাণানুযায়ী এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ৩ য় পুরুষ পর্য্যন্ত দত্তক-পুত্রের যে অধিকারের কথা লেখা আছে তাহা জ্ঞাতির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে নহে, কেবল শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া ইত্যাদির সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে।

আবার, দত্তকগ্রহণের নিয়ম সম্বন্ধে আমি দেখিতেছি যে, দত্তকগ্রহণের পরে দত্তক-পুত্র সর্ব্বপ্রকারেই ঔরস পুত্রের অনুরূপ, এবং (উপস্থিত মোকদ্দমার ঘটনার ন্যায়) দায়াধিকার ও পরিবারের সম্পর্ক ও ক্রিয়াদি সম্বন্ধে জনকের পরিবারের সহিত স্বাভাবিক দত্তকের পিতৃ সম্পর্ক এক কালে বিলুপ্ত হয়। বাস্তবিক সে তাহার জনকের পরিবারচ্যুত হইয়া তাহার গৃহীতা পিতার পরিবারের সহিত এমন সংমিলিত হইয়া যায় যে, সে ঐ দত্তকগৃহীতা পিতার এক বংশোদ্ভূত ব্যক্তির ন্যায় হয় এবং ঐ বংশের কাহাকে বিবাহ করিতে পারে না।

আদালতের নিষ্পত্তি সকলও ঐরূপ। নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, দত্তক পুত্র তাহার পৈতৃক সম্পত্তি ও জ্ঞাতির সম্পত্তি উভয়েরই উত্তরাধিকারী হয়;

এবং তাহার কারণ এই যে, সে সর্ব্বপ্রকারেই তাহার প্রতিগৃহীতা পিতার পুত্র হয় ( সদরল্যাণ্ডের রিপোর্টের প্রীবি কৌন্সিলের ১৮৩৫ সালের ৬ ই ফেব্রুয়ারির নিষ্পত্তির ২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। ঔরস পুত্র না থাকায় দত্তক পুত্রই তাহার "প্রতিগৃহীতা "পিতার স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং তাহার পিতা যে "অংশ পাইত তাহাতে সে স্বত্ববান হইবে," ( উইক্লি রিপোর্টরের ৪২৩। ৪২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য )। "দত্তক-পুত্র ঔরস-পুত্রের সকল স্বত্বে স্বত্ববান "হইবে, এবং ঔরস-পুত্র যে প্রকার মাতার "স্ত্রীধন লয়, দত্তক পুত্রও সেই প্রকার তাহার "প্রতিগৃহীত্রী মাতার স্ত্রীধন লয়।" ৩য় বাঃ উইক্লি রিপোর্টরের ৪৯ ও ৫০ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

সুবিচার ও ন্যায়পরতা অনুসারেও সেই রূপ, কারণ, আমরা যে দত্তকপুত্রের কথার বিচার করিতেছি, দত্তক গৃহীত হইয়াছে বলিয়া যদি সে নিজে অথবা তাহার দায়াদগণ তাহার জনক পিতার সম্পত্তির কোন ভাগ লইতে বারিত হয়, ( দত্তক-চন্দ্রিকার ২ য় পরিচ্ছেদের ১৮ ও ১৯ শ্লোক ও ম্যাক্‌নাটনের ১ ম বালম, ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) তবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সুবিচারমতে, সে তাহার জনক পিতার যেরূপ দায়াদ ছিল, তাহার প্রতিগৃহীতা পিতারও সেই রূপ দায়াদ হইবে।

অতএব প্রমাণ সমস্ত অতি সাবধানে সমালোচনা করিয়া আমি দেখিতেছি যে, প্রথম ইসু খাস রেস্পণ্ডেন্টের অনুকূলে আমার নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

এইক্ষণে আমি দ্বিতীয় ইসুর বিচার করিব; এবং এই স্থানে আমি দেখিতেছি যে, এই আদালতের ছয় জন বিচারপতির ( তন্মধ্যে আমাদের মৃত সহ-বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এক জন ছিলেন ) মতের সহিত আমার মত অনৈক্য হইতেছে।

এই সমস্ত বিচারপতিগণের বিশেষতঃ, এই বিষয়ে বিচারপতি মৃত শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মতের বিরুদ্ধে আমি যে কত ইতস্ততঃ করিয়া আমার এই মত স্থির করিয়াছি তাহা আমার বলা বাহুল্য; কিন্তু যদি আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতি বেলিরও তদ্বিরুদ্ধ মত না হইত, তবে বোধ হয় আমি উক্ত বিচারপতিগণের মতই মান্য করিয়া আমার মত পরিত্যাগ করিতাম।

কিন্তু ইহা হিন্দু-পরিবার সম্বন্ধীয় এমন আবশ্যকীয় প্রশ্ন যে, আমার ও বিচারপতি বেলির মতে আমাদের রায় পূর্ণাধিবেশনের বিবেচনার জন্য অর্পণ করাই আমরা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম।

আমি প্রথমে আমাদের রায়ের বিরুদ্ধ এই প্রধানতম বিচারালয়ের যে সকল নিষ্পত্তি আছে তাহা এবং তৎপরে এই বিষয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের যে সমস্ত বচন আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিব।

প্রথম মুদ্রিত মোকদ্দমা মার্সেলের রিপোর্টের ৩১৮ পৃষ্ঠায় আছে, এবং যদিও তাহার প্রথমে স্পষ্টাক্ষরে লেখা নাই, তথাপি দেখা যাইতেছে যে, পিতৃব্য-দৌহিত্র কি প্রপৌত্র উৎকৃষ্টতর দায়াদ, তাহাই ঐ মোকদ্দমার প্রশ্ন ছিল।

বিজ্ঞবর বিচারপতি সীটনকার ও ক্যাম্বেল রাজসাহীর বিজ্ঞবর জজের ( এক্ষণকার বিচারপতি জ্যাক্‌সন ) নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, পিতৃব্য-দৌহিত্র অপেক্ষা প্রপৌত্রই উৎকৃষ্টতর দায়াদ।

যে হেতুবাদে ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ উক্ত নিষ্পত্তি করেন, তাহা সংক্ষেপে এই। তাঁহারা বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের স্বত্বে দায়াধিকার অতি বিরল; এবং পূর্ব্বতন রোমীয় আইনের ন্যায় হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী দায়াধিকার কেবল পুরুষে অর্শে, এবং স্ত্রীলোকের দ্বারা যে সকল পুরুষের সম্পর্ক জন্মে তাহারা অধিকাংশই দায়ক্রম হইতে বর্জ্জিত; এবং কন্যার অথবা দৌহিত্রের দায়াধিকার সঙ্গত নহে এবং বারাণসী প্রদেশের ব্যবহারে এইপ্রকার

দায়াধিকারের অনুমতি নাই, এবং বঙ্গদেশের শাস্ত্রবেত্তারাও এই বিষয়ে সকলে ঐক্য নহেন, অতএব দৌহিত্রের দায়াধিকারের বিরুদ্ধেই অনুমান করিতে হইবে, এবং এই অনুমান খণ্ডন করার জন্য কোন পর্য্যাপ্ত প্রমাণ অথবা সংস্থাপিত প্রথা প্রদর্শিত হয় নাই।

বস্তুতঃ, এই মোকদ্দমায় বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ নির্দ্দেশ করেন যে, পিতৃব্য-দৌহিত্র দায়াধিকার হইতে বর্জ্জিত, এবং তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের এই যুক্তির উপরে ঐ নিষ্পত্তি করেন যে, স্ত্রীর স্বত্বের বলে পুরুষের দায়াধিকার সাধারণ নিয়মানুগত নহে।

আমি যথাসাধ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে, যে যুক্তির উপরে নির্ভর করিয়া ঐ নিষ্পত্তি হইয়াছে, হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী দায়ক্রম তদনুগত নহে।

দায়ক্রমসংগ্রহে দায়ক্রমের প্রণালী দৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে, যে ৪২ জন দায়াদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৫ জন স্ত্রীলোক এবং তাহারা নিজে দায়াধিকারিণী বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং ১০ জন পুরুষ স্ত্রীলোকের সূত্রে দায়াধিকারী বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে।

আমি ভরসা করি, ইহার পরে আমি দেখাইতে পারিব যে, লিঙ্গভেদের উপরে অর্থাৎ দায়াদ স্ত্রী কি পুরুষ তাহার উপরে হিন্দুদায়ক্রমের নিয়ম নির্ভর না করিয়া বরং পিণ্ডের উপরে নির্ভর করে। যেমন, যে সকল কন্যা পুত্রবতী অথবা পুত্রসম্ভাবিতা, তাহাদের দায়াধিকার আছে, কারণ, তাহারা তাহাদের পুত্রের দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া মৃত ধনীর মঙ্গল সাধন করে (দায়ক্রমসংগ্রহের ১ ম অধ্যায় ৩ ধারার ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কিন্তু যে সকল কন্যা বন্ধ্যা অথবা পুত্রহীনা বিধবা, তাহারা দায়াধিকারিণী হইতে পারে না, কারণ, তাহারা পুত্রের দ্বারা পিণ্ড দান করত মৃত ধনীর উপকার করিতে পারে না। (৩ য় অধ্যায়ের ৫ ম শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

অতএব আমার বিবেচনায়, লিঙ্গ দায়াধিকারের পরীক্ষা নহে, পিণ্ডদান করার যোগ্যতাই তাহার যথার্থ পরীক্ষা। অতএব এই ব্যক্তি ভ্রাতৃদৌহিত্র বলিয়া দায়াদ কি না, একথা বিচার্য্য নহে, তাহার পিণ্ডদান করার যোগ্যতা-অযোগ্যতার উপরেই তাহার দায়াধিকারী হওয়া না হওয়ার মীমাংসা নির্ভর করে।

অতএব যে স্থলে আমি দেখিতেছি যে, উল্লিখিত রায় দায়ক্রম সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের মুল যুক্তি বুঝিবার ভ্রমে প্রদত্ত হইয়াছে, সে স্থলে আমি সেই রায়ের সহিত ঐক্য হইতে পারি না; এবং যেহেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ১৮৬৪ সালের ১৭ ই আগষ্ট তারিখের বিচারিত ১৮৬৪ সালের ৪৫৭ নং চিন্তামণি বসু প্রভৃতি খাস আপেলাণ্টের মোকদ্দমার এবং ১৮৬৮ সালের ১৭ ই ডিসেম্বর তারিখের ১৮৬৮ সালের ৯২৪ নং রাজদুলাল সরকারের মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে কেবল সদরল্যাণ্ডের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির রিপোর্টের অতিরিক্ত সংখ্যার ১৭৬ পৃষ্ঠার নিষ্পত্তির অনুসরণ করা হইয়াছে, অতএব আমি এইক্ষণে সেই নিষ্পত্তি পর্য্যালোচনা করিব।

সেই নিষ্পত্তি নিঃসন্দেহই এই মোকদ্দমায় অবিকল খাটে, এবং বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ (প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান ও বিচারপতি কেম্প ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত) স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন যে, ভ্রাতৃদৌহিত্র দায়াধিকার হইতে বর্জ্জিত।

সেই রায় সংক্ষেপ বর্ণনা করিলে, বোধ হয় এই সকল কথার উপরেই প্রদত্ত হয়, যথা, দায়ভাগে যে সকল দায়াদের নাম লেখা আছে তাহাতে পিতৃব্য-দৌহিত্র নাই এবং দায়ক্রম-সংগ্রহের যে বচনে পিতৃব্যদৌহিত্র আছে তাহা মুল গ্রন্থে ছিল না, পরে অন্য কেহ তাহা তথায় বসাইয়া দিয়াছে। অতএব এমত অবস্থায়, ভ্রাতৃদৌহিত্রকে বর্জ্জন করিলে হিন্দুপরিবারের সম্বন্ধে যে ফলই হউক, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই প্রকার গৌরাদি দৃষ্টে বিরুদ্ধ মত করিতে আমার কোন প্রকারে ইচ্ছা হয় নাই, কিন্তু মুল গ্রন্থ সমস্ত আমি যত পর্য্যালোচনা করিয়াছি এবং আমার বিবেচনায় হিন্দু দায়ক্রম যে মুলের উপরে নির্ভর করে তাহা আমি যত বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, ততই আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতিগণ যাহা হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রের মুল নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন তদ্দ্বারাই তাঁহাদের রায় খণ্ডন করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, আমার বোধ হয় যে, দায়ভাগে দায়াদের শ্রেণীতে পিতৃব্যদৌহিত্রের বিশেষ রূপে নাম লিখিত না থাকায় সে যে অবশ্যই দায়াধিকার হইতে বর্জ্জিত হইবে, এমত নহে, এবং আমি দেখিতেছি যে, মিতাক্ষরায় এই রূপ লেখা না থাকাতে সে বর্জ্জিত নহে—(বেঙ্গল রিপোর্টের ২য় বালমের ২য় খণ্ডের ৩৬ ও ৩৭ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য)

অতএব আমার বক্তব্য এই যে, দায়াধিকার হইতে বর্জ্জিত ব্যক্তিদিগের শ্রেণীর মধ্যে পিতৃব্যদৌহিত্রের নাম লেখা না থাকায়, সে বর্জ্জিত নহে (দায়ক্রম-সংগ্রহের ৩য় অধ্যায় এবং দায়ভাগের ৫ম অধ্যায়, দ্রষ্টব্য); এবং যদি সে বর্জ্জিত না হয়, তবে কি সে দায়াধিকারি-শ্রেণীভুক্ত নহে?

অধিকন্তু দেখা যাইতেছে যে, "দায়াধিকার হইতে বর্জ্জন সম্বন্ধে" দায়ভাগের ৫ম অধ্যায় একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, এবং সেই উদ্দেশ্য ঐ অধ্যায়ের প্রথম ও শেষ ভাগে বর্ণিত আছে, যথা—

"তাহার পরে, যে সকল ব্যক্তি দায়াধিকা-
"রীর অযোগ্য তাহাদের নাম লেখা আছে,"
"(কেন লেখা আছে?) কারণ, উহাদের নাম
"উল্লেখ করাতে যাহারা যোগ্য দায়াধিকারী
"তাহাদিগকে জানা যাইতে পারিবে।"—

(৫ম অধ্যায়ের ১ম শ্লোক, ১০১ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর, গ্রন্থকর্ত্তা অযোগ্য দায়াধিকারিগণকে ও কি হেতুতে তাহারা অযোগ্য তাহার বর্ণন করিয়াছেন, এবং পরিশেষে ২০ শ্লোকে, লিখিয়াছেন যে, "যাহারা দায়াধিকারের অযোগ্য তাহাদের এই রূপে বর্ণনা করা গেল।"

অতএব সমগ্র অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, কোন না কোন হেতুতে পিণ্ডদান করার অযোগ্যতা হইলেই তাহা দায়াধিকারীর অযোগ্যতার কারণ হয়; এবং পক্ষান্তরে, দেখা যাইতেছে যে, দায়াধিকার, উপকার প্রদান করার পারিতোষিক স্বরূপ (৬ষ্ঠ অধ্যায়); এবং যদি আমি এই অধ্যায় বিশুদ্ধ রূপে পাঠ করিয়া থাকি, তবে আমার বিবেচনায়, এই দুই প্রতিজ্ঞার উদ্ভব হয়:—

১ম প্রতিজ্ঞা এই যে, এই অধ্যায়ে যে সকল ব্যক্তি বর্জ্জিত বলিয়া লিখিত হয় নাই, তাহারা সকলেই দায়াধিকারের যোগ্য।

২য় প্রতিজ্ঞা এই যে, যে কেহ পিণ্ডদান করিতে পারে তাহারই দায়াধিকার আছে।

দায়াধিকার হইতে বর্জ্জন সম্বন্ধীয় এই অধ্যায় ও তাহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য দৃষ্টে ন্যায়সঙ্গত রূপে এমত বলা যাইতে পারে না যে, দায়-ক্রম সম্বন্ধে তাহার পরের অধ্যায়ে (১১ অধ্যায়) দায়ভাগের গ্রন্থকর্ত্তা সেই সকল ব্যক্তিকে বর্জ্জন করিতে মনস্থ করিয়াছেন যাহাদের নাম তিনি স্পষ্টাক্ষরে লেখেন নাই। আমি বিবেচনা করি যে, ঐ অধ্যায় সাবধানে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উহার ঐ রূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না।

প্রথমতঃ, ঐ পরিচ্ছেদে বচন আছে যাহাতে ঐ সংখ্যা স্পষ্টই সম্পূর্ণ নহে, যেমন ২১৬ পৃষ্ঠার ৩য় পরিচ্ছেদের ১৩ বচনে, যাহাতে গ্রন্থকর্ত্তা "মাতুল ও অন্যান্যের" কথা লিখিয়াছেন।

অনন্তর ২২৪ পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় যে সংখ্যা

ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও সম্পূর্ণ নহে, কারণ, সেই গ্রন্থকর্ত্তা দায়-ক্রমসংগ্রহে দায়ক্রমের যে নামাবলি দিয়াছেন তাহার সহিত এই সংখ্যা ঐক্য করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার গ্রন্থে এবং তাহা হইতে তিনি যে নামাবলি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহার অনেক দায়াধিকারীর নাম তিনি এই সংখ্যার মধ্যে ছাড়িয়া গিয়াছেন।

আরও দেখা যাইতেছে যে, এই পরিচ্ছেদে দায়ক্রমের যে মূল সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে অনেক ব্যক্তির নাম দায়াদ বলিয়া পরিগণিত হওয়া আবশ্যকীয় ব্যক্ত করিয়াও তাহাদের নাম ঐ প্রকার পরিগণিত হয় নাই, এবং আমি দেখিতেছি যে, বিজ্ঞবর ব্যবস্থাদর্পণপ্রণেতা বলেন যে, দায়ভাগে ঐ প্রকার ৩১০জন দায়াধিকারীর নাম ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অন্যান্য তত্তুল্য বরং উৎকৃষ্টতর টীকায় তাহারা পরিগণিত হইয়াছে। ১৮৬৭ সালের মুদ্রাঙ্কিত ব্যবস্থাদর্পণের ২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দায়ভাগের এই পরিচ্ছেদে দায়ক্রমের যে মহৎ যুক্তি আছে তাহা আমি পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়াছি এবং তাহা এই যে, দায়াধিকার মৃত ধনীকে পারলৌকিক উপকার প্রদান করার পারিতোষিক স্বরূপ, এবং সেই উপকারের পরিমাণের ন্যূনাধিক্যের উপরে দায়াধিকারের অগ্রগণ্যতা নির্ভর করে।

মনু বারম্বার বলিয়া গিয়াছেন যে, "তিন-"পুরুষের তর্পণ করিতে হয় এবং তিন পুরুষকে "পিণ্ড দিতে হয়" (২১৪ ও ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য,) এই কথা পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত দায়াধিকারিগণের প্রতি খাটে; এবং এ কথা আমাদের সমীপস্থ বিষয়ে প্রয়োগার্থে আমরা দেখিতেছি যে, ভ্রাতা দায়াধিকারী হয়, কারণ, সে তিন পিণ্ড দেয় (১১ পরিচ্ছেদের ৩য় শ্লোক, ১৯৯ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য); ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পৌত্র পিতৃব্য হইতে উৎকৃষ্টতর, কারণ, তাহারা অধিক নিকট পিণ্ড দেয় (৫ ও ৬ শ্লোক ১৯২ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য); ভ্রাতার প্রপৌত্র অধিক দূর সম্পর্কীয় বলিয়া অগ্রাহ্য, কারণ, সে পিণ্ড-দাতা নহে (৬১ পরিচ্ছেদের ৭ম শ্লোক, ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যদিও আমরা শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিত সংখ্যায় অন্যান্য বান্ধবের ন্যায় পিতৃব্য-দৌহিত্রের নাম দেখিতে পাই না, তথাপি আমরা দেখিতেছি যে, এই প্রশস্ত যুক্তি সংস্থাপিত হইয়াছে যে, "যে সকল বান্ধবের "পিণ্ড মৃত ধনী ভোগ করে, কেবল তাহাদের "অভাবেই মাতুল ও অন্যান্য ব্যক্তি দায়াধিকারী "হয়;" কারণ, তাহারা অল্প পিণ্ড দেয়, এবং তাহাদের পরে সকুল্যেরা দায়াধিকারী হয়, (২২৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অতএব আমার বিবেচনা এই যে, দায়ভাগের ১১ পরিচ্ছেদে দায়াধিকারিগণের সংখ্যার মধ্যে পিতৃব্য-দৌহিত্রের নাম প্রকাশ্যরূপে পরিগণিত না হওয়ার কারণেই তাহাকে দায়াধিকারী বলিয়া জ্ঞান করা যাইতে পারে না, এমত নহে; এবং আমি ইহাও বলিব যে, ৫ম পরিচ্ছেদে বর্জ্জিত ব্যক্তিগণের মধ্যে পিতৃব্য-দৌহিত্রের নাম না থাকায় এবং যে যুক্তির উপরে দায়াধিকার নির্ভর করে (সেই যুক্তি অনুযায়ী ঐ দৌহিত্র দুই পিণ্ড-দাতা বিধায় দায়াধিকারী হয়) তদনুসারে আমার বিবেচনায়, সে কি জন্য বর্জ্জিত হইবে তাহা সপ্রমাণ করার ভার প্রতিপক্ষের উপরেই অর্শে।

যে নজীরের কথা আমি উপরে বলিয়াছি তাহার সেই ভাগের বিচার আমি এক্ষণে করিব যাহাতে এই হেতুবাদে পিতৃব্য-দৌহিত্র দায়াধিকার হইতে বর্জ্জিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, দায়ক্রমসংগ্রহের যে বচনে ঐ দৌহিত্রকে দায়াধিকারীর মধ্যে যোগ করা হইয়াছে তাহা মূল গ্রন্থে আদৌ ছিল না, পরে অন্যের দ্বারা তাহা তথায় প্রবিষ্ট হইয়াছে।

যে শ্লোকে ঐ কথা প্রবিষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহা সমেত দায়ক্রমসংগ্রহের ১০ম পরিচ্ছেদের ১,২,৩, শ্লোক

আমি নিজে উদ্ধার করিলাম, এবং আমি বলি যে, প্রথমতঃ আমার বিবেচনায়, 'ইহা' পরে প্রবিষ্ট হওয়া বোধ হয় না; এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহা হইলেও এই কথা বিধিসম্বন্ধে চূড়ান্ত নহে।

১ ম শ্লোক।—"ভ্রাতৃপৌত্র অভাবে ধন পিতার দৌহিত্রে গমন করে, কারণ, সে তিন পিণ্ড দেয় অর্থাৎ মৃত ধনীর পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহকে, অর্থাৎ তাহার নিজের মাতামহ প্রমাতামহ এবং বৃদ্ধ মাতামহকে পিণ্ড দেয় (আচার্য্য চূড়ামণির মতে ধনস্বামীর সহোদরার পুত্রেরও এবং বৈমাত্রেয় ভগিনীর পুত্রের সমতুল্য দায়াধিকার আছে)।"

২ য় শ্লোক।—"ভগিনীর পুত্রের অভাবে ভ্রাতৃ দৌহিত্র দায়াধিকারী হয়, কারণ, সে দুই পিণ্ড দেয় যাহা মৃত ধনস্বামী ভোগ করে, অর্থাৎ মৃত ধনীর নিজের পিতার ও পিতামহের পিণ্ড দেয়।"

৩ য় শ্লোক।—"তাহার অভাবে পিতামহ দায়াধিকারী হন, কারণ, যেমন মৃত ধনস্বামীর দৌহিত্র পর্য্যন্ত দায়াধিকারী অভাবে, পিতা দায়াধিকারী হন, সেই রূপ সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতার দৌহিত্র পর্য্যন্ত দায়াধিকারীর অভাব হইলে, পিতামহ দায়াধিকারী হন, কারণ, তিনি এক পিণ্ড দেন (অর্থাৎ মৃত ধনস্বামীর প্রপিতামহকে অর্থাৎ তাঁহার আপন পিতাকে পিণ্ড দেন) এবং মৃত ধনী তাহার ভাগ পায়।"

আমি যে সকল শ্লোকের উল্লেখ করিলাম তাহার বাক্যে এবং সাধারণতঃ এই গ্রন্থের দায়ক্রম সম্বন্ধীয় শ্লোক সমস্তে দেখা যায় যে, প্রত্যেক শ্লোক দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ প্রথম ভাগে ব্যবস্থা আদিষ্ট হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ভাগে যে কারণে ঐ ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

যেমন, ১ ম শ্লোকে "ভ্রাতৃপৌত্র অভাবে "ধন পিতার দৌহিত্রে গমন করে।" ইহাই ব্যবস্থা এবং শ্লোকের প্রথম ভাগ;

"কারণ, সে তিন পিণ্ড দেয়, ইত্যাদি।" ইহাই যে কারণে ঐ ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার ব্যাখ্যা, এবং শ্লোকের দ্বিতীয় ভাগ।

ঐ প্রকার, ২ য় শ্লোকে প্রথমে ব্যক্ত হইয়াছে যে, পিতৃদৌহিত্র অভাবে ভ্রাতৃদৌহিত্র উত্তরাধিকারী হয়, কারণ, ইহা বুঝান হইয়াছে যে, সে দুই পিণ্ড দান করে।

৩ য় শ্লোকে ঐপ্রকার ব্যক্ত হইয়াছে যে, ভ্রাতৃদৌহিত্র অভাবে সাংদৃষ্টিক ন্যায়মতে পিতামহ ধনাধিকারী হন, কারণ, ইহা বুঝান হইয়াছে যে, তিনি এক পিণ্ড দান করেন।

* * *

আমার যথাসাধ্য বিবেচনায়, আমি ইহা প্রবিষ্ট করা শ্লোক বলিতে পারি না, কারণ, যদিও ইহা মূল গ্রন্থের কোন কোন প্রতিলিপিতে নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রতিলিপিতে আছে, এবং ইহা মূল সূত্রের সহিত অসংলগ্ন নহে, এবং ইহা উপযুক্ত স্থানেই লিখিত আছে এবং ইহা এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা ম্যাক্‌নাটনের দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছে, এবং আমার বিবেচনায়, যে যুক্তির উপরে হিন্দুদিগের দায়ক্রমের ব্যবহার সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা সেই যুক্তিসঙ্গত।

কিন্তু যদিও স্বীকার করা যায় যে, এই শ্লোক প্রবিষ্ট করা হইয়াছে, তথাপি হিন্দুদায়ক্রমের যে বিধির উপরে এই বচন নির্ভর করে, তাহা আমার বিবেচনায় ব্যক্ত ও গ্রাহ্য হইয়াছে, এবং তাহা ঐ প্রবিষ্ট করা বচনের সহিত সংলগ্ন।

'পিতামাতার জীবদ্দশায় দায়াধিকারীরা ধনে স্বত্ত্ববান হয় না, কারণ, তাহারা তখন মৃত ব্যক্তিদিগের উপকার করে না। দায়ক্রম-সংগ্রহের ১ ম অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদের ৪ র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কন্যা দায়াধিকারিণী হয়, কারণ, তাহার পুত্রের দ্বারা সে পিতাকে পিণ্ড দেয়। ঐ ৩ য় অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদের ৪ র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য

দৌহিত্র ধনাধিকারী হয়, কারণ, সে ঐ পিণ্ড

দেয়। ঐ ১ ম অধ্যায় ৪ র্থ পরিচ্ছেদের ১ ম শ্লোক দ্রুষ্টব্য।

মাতা দায়াধিকারিণী হন, কারণ, যাহারা ঐ প্রকার পিণ্ড দেয় তাহাদের তিনি জন্ম দেন। ঐ ১ ম অধ্যায়ের ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২ য় শ্লোক দ্রুষ্টব্য।

পিতামহের দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হয়, কারণ, সে দুই পিণ্ড দেয়; এবং সেই প্রকার পিতৃব্য-দৌহিত্র এবং পিতামহের দৌহিত্র। ১ ম অধ্যায়ের ১০ ম পরিচ্ছেদের ৮, ৯, ১৩ শ্লোক দ্রুষ্টব্য।

যে সকল দায়াদের প্রদত্ত পিণ্ডে মৃত ধনাধিকারী ভাগ পায় তাহাদের অভাব না হইলে সকুল্যেরা ধন লইতে পারে না। ঐ ১ ম অধ্যায়ের ১০ ম পরিচ্ছেদের ২১ শ্লোক দ্রুষ্টব্য।

এই পর্য্যন্ত দায়ক্রম-সংগ্রহে লেখা আছে, এবং দায়ভাগেও ঐ প্রকার আছে, কিন্তু দায়ভাগে আরো নিশ্চিত রূপে লেখা আছে।

সপিণ্ডেরা সাধারণতঃ প্রথমে লয়, এবং তাহাদের পরে ভিন্ন সকুল্যেরা লয় না।

পিণ্ড যত নিকট হয়, ততই তাহা উৎকৃষ্টতর। ১১ শ পরিচ্ছেদের ৫ ম ও ৬ ষ্ঠ শ্লোক ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টব্য।

ভ্রাতৃপ্রপৌত্র সপিণ্ড-সূত্রে ধনাধিকারী হয় না, কারণ, ৫ ম পুরুষ বিধায় সে পিণ্ডদাতা নহে। ১১ অধ্যায়ের ৭ ম শ্লোক ২১৪ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টব্য।

মনুর মতে "ইহাদিগকে পিণ্ডদান করিতে হইবে, এবং তাহারা প্রথমে ধন লয়; তাহার পরে সপিণ্ডদিগের ধনাধিকার, এবং ইহাদের অভাব না হইলে সকুল্য অথবা সমনোদকেরা ধনাধিকারী হয় না।" ১১ শ অধ্যায়ের ১০, ১৩, ১৫ শ্লোক, ২১৫, ২১৬ ও ২১৭ পৃষ্ঠা, দ্রুষ্টব্য।

২১৭ পৃষ্ঠার ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৭ শ্লোক অনুজ্ঞা-সূচক; তাহাতে মনুর প্রমাণে ব্যক্ত আছে যে, "পিতৃ অথবা মাতৃকুলের হউক যে পর্য্যন্ত এক পিণ্ড-দাতা থাকে, সে পর্য্যন্ত ৫ ম পুরুষ যাহার পিণ্ডদানের সম্বন্ধ নাই, সে ধনাধিকারী হইতে পারে না।"

জন্মের দ্বারা নিকট সম্পর্ক হয় না, "পিণ্ডদান দ্বারা উৎকৃষ্টতর উপকার প্রদানের উপরেই" তাহা নির্ভর করে (১৮ শ্লোক); অতএব ঐ বান্ধবই উৎকৃষ্টতর ধনাধিকারী (১৯ শ্লোক) এবং কেবল তাহার পরেই সকুল্য ধনাধিকারী হয় (২১ শ্লোক ২১৮ ও ২১৯ পৃষ্ঠা, দ্রুষ্টব্য)।

এই নিয়ম সকল বান্ধব সম্বন্ধে খাটে (১১ শ অধ্যায়ের ২৮ ও ৩১ শ্লোক ২২১ ও ২২২ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টব্য)।

উপরি উক্ত বচনেই লেখা আছে যে, "যে "সকল বান্ধবের দত্ত পিণ্ডে মৃত ধনী ভাগ "পায় তাহাদের অভাবে," যে সকল ব্যক্তি ন্যূন পিণ্ড দেয় তাহাদিগের হস্তে প্রথমে এবং পরিশেষে সকুল্যদিগের হস্তে ধন গমন করে। (২২৫ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টব্য)।

এই প্রকার কোলব্রুকের সারসংগ্রহের ৪ র্থ বালমের ১৫৯, ১৭৫, ১৮১, ১৯০, ২২৬, ২২৮ ও ২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টব্য।

যে শ্লোক প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে তাহা ছাড়িয়া দিলেও, আমি দেখিতেছি যে, পিতৃব্য-দৌহিত্র ধনাধিকারীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, অতএব আমি দ্বিতীয় ইসু প্রতিবাদী খাস আপেলাণ্টের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিয়া বাদীর নালিশ খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিব।

কিন্তু ইহা পূর্ণাধিবেশনের রায়ের অধীন থাকিবে। পূর্ণাধিবেশনে যে প্রশ্ন অর্পিত হইল তাহা এই যে, বঙ্গদেশীয় ব্যবহার শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য-দৌহিত্র ধনাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হয় কি না?

**বিচারপতি বেলি।**—উপরিউক্ত রায়ের লিখিত হেতুবাদে আমিও এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে সম্মত হইলাম।

পূর্ব্বাধিবেশনের রায় ঃ—

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র ।—আমাদের যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে, তাহা এই যে, বঙ্গদেশ-প্রচলিত ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে মৃত হিন্দু ধনীর অন্য কোন নিকটতর দায়াধিকারী না থাকিলে পিতৃব্যদৌহিত্র ধনাধিকারী হয় কি না।

বঙ্গদেশীয় ব্যবহারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ এবং প্রধান সংস্থাপক জীমূতবাহনের দায়ভাগ নামক গ্রন্থের যথার্থ ব্যাখ্যার উপরে এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ক্রম-সংগ্রহ, রঘুনন্দনের দায়তত্ত্ব ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বিবাদভঙ্গার্ণব প্রভৃতি বঙ্গদেশে প্রমাণস্বরূপ প্রচলিত গ্রন্থ সমস্ত প্রায় সম্পূর্ণরূপেই দায়ভাগ হইতে সংগৃহীত, এবং মূল গ্রন্থের যে কিছু প্রভেদ আছে তাহা কেবল ক্ষুদ্র বিষয় সম্বন্ধীয়, মূল যুক্তির কোন বিরোধ নাই।

আমাদের প্রমাণ সকলের এই অবস্থায়, সর্ব্বাগ্রে এই নির্ণয় করা উচিত যে, দায়ভাগই এমন কোন সাধারণ মত অথবা যুক্তির উপরে নির্ভর করত প্রণীত হইয়াছে কি না, যাহা অবলম্বন করিয়া আমরা উপস্থিত বিষয়ের যথেষ্ট মীমাংসা করিতে পারি। আমাদের বিবেচনায়, এমন একটি যুক্তি আছে এবং তাহা পারলৌকিক উপকার ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

দায়ক্রম সম্বন্ধে হিন্দুব্যবহার যে নিতান্তই মৃত ধনীর পারলৌকিক উপকারের উপরে নির্ভর করে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল হিন্দু ঋষিদিগের বচন ঐ ব্যবহারের মূল বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং যে সকল টীকাকারের মত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রমাণ স্বরূপে গৃহীত হয়, তাঁহারা সকলেই ঐ যুক্তি তাঁহাদের একমাত্র যুক্তি না হইলেও মূল যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। দায়ভাগ-প্রণেতাও তাহা ছাড়া নহেন, বরং তাঁহার স্পষ্টমত এই যে, দায়ক্রমের সমুদায় নিয়ম ঐ যুক্তির উপরেই নির্ভর করে, এবং কেবল ঐ একমাত্র যুক্তির দ্বারাই তৎসম্বন্ধীয় সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মিতাক্ষরা অর্থাৎ বারাণসী প্রদেশের প্রচলিত শাস্ত্র, দায়ভাগ প্রণীত হওয়ার কালে বঙ্গদেশে প্রবল ছিল, এবং ঐ প্রদেশের কতিপয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মতে মনুর লিখিত "সপিণ্ড" শব্দে কেবল রক্তসম্বন্ধ বুঝায়, পারলৌকিক উপকার প্রদান করার ক্ষমতা বুঝায় না। দায়ভাগ-প্রণেতা নূতন মত সংস্থাপন করিয়া উক্ত মত এককালে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মনু যে নিকট সম্পর্কের কথা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা কেবল পিণ্ডদানের উপরে নির্ভর করে। তিনি বলেন, "ইহা কখন "বলা যাইতে পারে না (কোলব্রুকের দায়ভাগের "সারসংগ্রহের ১১ শ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদের "১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) যে 'পুরুষ অথবা স্ত্রী হউক, "'নিকট সপিণ্ডে ধনাধিকার সর্ত্তে,' মনুর এই "বচন জন্মের অগ্রপশ্চাতের গতিকে নিকট সম্পর্ক "বুঝায়, পিণ্ডদান সম্বন্ধে বুঝায় না; কারণ, জন্মের "অগ্রপশ্চাতের কথা ঐ বচনে ইঙ্গিত হয় নাই। "কিন্তু মনু কহেন যে, জল ও পিণ্ড তিন পুরুষকে "দান করিতে হইবে, এবং চতুর্থ পুরুষ পিণ্ড "দান করিবে, কিন্তু অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পিণ্ড"দান করে না, এবং ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষও "পিণ্ড গ্রহণ করে না; অতএব তিনি এই প্রকারে "নিকট সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং "দেখাইয়াছেন যে, পিণ্ডদানের দ্বারা উপকার "প্রদানের উপরেই তাহা নির্ভর করে।" এই শ্লোকে মনুর যে বচনের উল্লেখ হইয়াছে তাহার উপরে আমাদের বক্তব্য এতৎপরে ব্যক্ত হইবে; কিন্তু আমরা এইক্ষণে এই স্মরণ রাখাইতে ইচ্ছা করি যে, দায়ভাগ-প্রণেতা ঐ বচনের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তদনুসারে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাগ্রে দায়াধিকারী হয়, যে ব্যক্তি মৃত ধনীকে সকলের অধিক পারলৌকিক উপকার প্রদান করিতে পারে। ঐ পরিচ্ছেদের ১৫ শ্লোকে তিনি

বলেন যে, "ধনের দ্বারা পিণ্ড-দাতা হয়।" তিনি পরেই বলেন যে, "ধন উপার্জ্জনের দুই উদ্দেশ্য "ব্যক্ত আছে, ইহলৌকিক সুখ এক উদ্দেশ্য, "এবং দান ইত্যাদির দ্বারা পারলৌকিক উপকার "দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। কিন্তু যেহেতু ধনীর মৃত্যু হইলে "সে ইহলোকের সুখভোগ করিতে পারে না, "অতএব তাহার পারলৌকিক উপকারের নিমিত্ত "তাহার ধনব্যয় হওয়া উচিত।" অপিচ, সেই পরিচ্ছেদের ২৯ শ্লোকে তিনি বলেন যে, "প্রদত্ত "উপকারের স্বত্ত্বেই ধনাধিকার জন্মে, এবং ঐ "উপকারের ন্যূনাধিক্যের উপরেই দায়ক্রম নির্ভর "করে।" ইহার পূর্ব্বশ্লোকেও এই যুক্তি অতি স্পষ্ট ও দৃঢ়রূপে ব্যক্ত হইয়াছে; তাহাতে লেখা আছে যে, "অতএব সেই দায়ক্রমের অনুগামী "হইতে হইবে যাহাতে মৃত ব্যক্তির ধন তাহারই "অধিক উপকার-জনক হয়।"

এমন গুরুতর বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর করণার্থে আমরা বিবেচনা করি যে, দায়ভাগে ঐ পারলৌকিক উপকারের যুক্তি যে প্রকারে সংস্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। ধনবিভাগ করাই ঐ গ্রন্থের দ্রুষ্টব্য উদ্দেশ্য; কিন্তু বাস্তবিক ঐ গ্রন্থ দুই শাখায় বিভাজ্য। সম-দায়াধিকারিগণের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে ধনবিভাগ করা এক শাখা; এবং দায়াধিকারীসূত্রে যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ধনের দাবী করে, তখন যে দায়ক্রম অবলম্বন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় শাখা। উপস্থিত বিষয়ে প্রথম শাখার কোন সম্বন্ধ নাই, অতএব আমরা কেবল দ্বিতীয় শাখারই উল্লেখ করিব।

দায়ভাগের এই অংশের সমুদায়ই যে, পারলৌকিক উপকার সম্বন্ধীয় মতের বিস্তারিত বর্ণনা, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে কোন বিষয় সম্বন্ধে বিচার আবশ্যক বিবেচনা হইয়াছে, তাহাই অন্তে ঐ মতের দ্বারা মীমাংসা করা হইয়াছে, এবং ঐ মতের দ্বারাই সকল বিরোধ ভঞ্জন হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রের অতি প্রধান প্রমাণ স্বরূপ মনুর ও অন্যান্য হিন্দু-ঋষির বচন সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু পারলৌকিক উপকারের মত অবলম্বন করিয়াই ঐ সকল বচনের ব্যাখ্যা, ও তাহাদের মধ্যে যে সকল বিরোধ আছে তাহা ভঞ্জন করা হইয়াছে।

যদি দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয়, তবে দায়ভাগের ১১ শ পরিচ্ছেদ যাহাতে, যে ব্যক্তি পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্র না রাখিয়া মরে, তাহার সম্বন্ধীয় দায়ক্রমের সম্পূর্ণ নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তাহা দৃষ্টি করিলেই হইবে। এই পরিচ্ছেদে দায়ক্রমের যে অতি প্রথম এবং প্রধান নিয়ম লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে সাধারণতঃ স্ত্রীলোক বর্জ্জিত হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মৃত ধনীর পারলৌকিক উপকারার্থে হিন্দু-শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়ার বিধি আছে তাহা স্ত্রীলোকেরা স্ত্রী বলিয়াই সম্পন্ন করিতে অসমর্থ। তজ্জন্য দায়ভাগ-প্রণেতা তাহাদিগকে দায়াধিকারীর শ্রেণী হইতে সাধারণতঃ বর্জ্জন করিয়াছেন। যে অল্প কয়েকটি স্ত্রীলোক দায়াধিকারিণী হওয়ার অনুমতি পাইয়াছেন, তাঁহারা কেবল বিশেষ বচনের বলে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধেও পারলৌকিক উপকার প্রদান তাঁহাদের দায়াধিকারিণী হওয়ার মূল কারণ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় বিধবা পত্নীও পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিতে পারেন না, কিন্তু তথাপি দায়ভাগ-প্রণেতার মতে "জায়া আপন ভর্ত্তার শরীরের অর্দ্ধাংশ, এবং তাঁহার পাপপুণ্যের ফলে ভর্ত্তা সমভাগী।" অতএব এই কারণে তিনি দায়াধিকারিণী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল অনৈক্য বচনের বিরোধ আছে তাহা ঐ কারণের দ্বারাই ভঞ্জন হইয়াছে দায়ভাগপ্রণেতা বলেন (কোলব্রুকের দায়ভাগের ১১ শ অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদের ৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) "যেহেতু এই ও অন্যান্য বচনে, "পত্নী পতিকে নরক হইতে উদ্ধার করেন, এবং

"যেহেতু দরিদ্রতা হেতু পত্নী ব্যভিচার "করিলে পতিকে নরকগামী করে, কারণ, "তাহারা উভয়েই উভয়ের পাপপুণ্যের ফলভোগী; "অতএব মৃত ধনীর উপকারার্থেই পত্নী ধনা- "ধিকারিণী হয়, সুতরাং পত্নীর ধনাধিকার "সঙ্গত। এক পক্ষে বিধবার, ও পক্ষান্তরে, "পুত্র পৌত্র এবং প্রপৌত্রের মধ্যে কাহার স্বত্ব "অগ্রগণ্য, এই কথার যে বিচার আছে তাহা প্রসিদ্ধ। যদি বিধবা পত্নী যথার্থই আপন ভর্ত্তার অর্দ্ধ শরীর হয়, তবে পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র কি প্রকারে তাহার অগ্রে ধনাধিকারী হয়? দায়ভাগ-প্রণেতা এই উত্তর দিয়াছেন যে, পারলৌকিক উপকার করার জন্য বিধবা পত্নীর ক্ষমতা পতির মৃত্যু হওয়ার সময়ে জন্মে, কিন্তু পুত্র ও পৌত্র ও প্রপৌত্রের ঐ উপকার প্রদান করার ক্ষমতা তাহাদের জন্ম হওয়া মাত্রেই জন্মে। ১১ শ অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদের ৪৩ শ্লোক, দ্রষ্টব্য।

তাহার পরে কন্যার প্রতি অনুমতি আছে, কারণ, সে পুত্র প্রসব করিয়া আপন পিতার অতি বৃহৎ পারলৌকিক উপকার করিতে পারে, কারণ, সেই পুত্র তাহাকে এবং তাহার পূর্ব্ব পুরুষকে নরক হইতে উদ্ধার করে; এপ্রযুক্ত যে সকল কন্যা বন্ধ্যা অথবা পুত্রহীনা বিধবা, তাহাদিগকে অতি সাবধানে দায়াধিকার হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে। অবিবাহিতা কন্যা প্রথমে ধনাধিকারিণী হয়, কারণ, ধনহীনতা হেতু যদি তাহার যৌবনাবস্থা প্রাপ্তির পরে বিবাহের বিলম্ব হয়, তবে তদ্দ্বারা তাহার পিতার এবং কাজে কাজে তাহার পূর্ব্ব পুরুষদিগেরও স্বর্গ লাভের ব্যাঘাত হয়। অতএব এই স্থলেও মৃত ধনীর পারলৌকিক উপকার বিবেচনায় মীমাংসা হইয়াছে। মাতা ও পিতামহী সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে, কারণ, প্রত্যেকের সম্বন্ধে পারলৌকিক উপকারই তর্কের মূল বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সুবিধার জন্য আমরা পুরুষ দায়াধিকারীদিগকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি।

(১ ম) সপিণ্ড।

(২ য়) সকুল্য।

(৩ য়) সমানোদক।

(৪ র্থ) আচার্য্য হইতে স্বগ্রামস্থ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তি। রাজার কথা ছাড়িয়া দেওয়া গেল, কারণ, তিনি জব্দ করিয়া লন, দায়াধিকারী স্বরূপে লন না।

এই স্থলেও দেখা যাইতেছে যে, আদ্যোপান্ত ঐ যুক্তিই পরিচালিত হইয়াছে। সকুল্যদিগের অগ্রে সপিণ্ডেরা ধন লয়, কারণ, বিভক্ত পিণ্ড অপেক্ষা অবিভক্ত পিণ্ড দ্বারা অধিক পারলৌকিক উপকার প্রদত্ত হয়, এবং সমানোদকের অগ্রে সকুল্যেরা আইসে; কারণ, জল অপেক্ষা বিভক্ত পিণ্ড অধিক উপকারজনক। ইহা সত্য বটে যে, শেষ শ্রেণীস্থ ব্যক্তিরা পিণ্ড অথবা জলদান করিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধেও পারলৌকিক উপকারের যুক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। যেমন তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাধম অর্থাৎ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এই হেতুতে ধনাধিকারী হয় যে, "ধনে ব্রাহ্মণের অধিকার হওয়াতে মৃত ধনীর ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়।" ১১ অধ্যায়ের ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ইহা একটি অসাধারণ দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু মৃত ধনীর পারলৌকিক উপকার সংস্থাপন করার জন্য দায়ভাগপ্রণেতা যে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই দেখাইবার জন্য আমি এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলাম। অনন্তর, দায়ভাগে এই সকল শ্রেণী যে প্রণালীতে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টি করিলেও দেখা যাইবে যে, ঐ যুক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাহা হইয়াছে। যেমন, যে সপিণ্ডেরা মৃত ধনীর কেবল মাতৃকুলের পিণ্ড দিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা তাহার পিতৃকুলে পিণ্ড দিতে পারে তাহাদিগকে উৎকৃষ্টতর

ধনাধিকারী বিবেচনা করা হইয়াছে, এবং এই প্রভেদের কারণ এই যে, পিতৃকুলের পিণ্ড মাতৃকুলের পিণ্ড অপেক্ষা অধিক উপকারজনক। সেই প্রকার, যাহারা অধিক সংখ্যক পিণ্ড দিতে পারে তাহারা, ঐ প্রকারের অল্প সংখ্যক পিণ্ড দেওয়ার যোগ্য ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এবং যাহারা সমতুল্য সংখ্যায় পিণ্ড দেয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা নিকটতর পিতৃলোকের পিণ্ড দেয় তাহারা শ্রেষ্ঠ। সকুল্য এবং সমানোদকের সম্বন্ধেও ঐ কথা তুল্য রূপে খাটে; কিন্তু তাহার বিস্তার বর্ণনার আবশ্যক নাই।

দায়ভাগের লিখিত দায়ক্রম পারলৌকিক উপকার প্রদানের উপরেই নির্ভর করে দেখিয়া এইক্ষণে উপস্থিত দাবীদার অর্থাৎ পিতৃব্যদৌহিত্র মৃতধনীর কোন পারলৌকিক উপকার প্রদান করিতে পারে কি না, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের মতে সে তাহা প্রদান করিতে পারে, এবং আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল এই কথার প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই;

হিন্দুর পিতৃব্য-দৌহিত্র যে তাহার এক জন সপিণ্ড, তদ্বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। সপিণ্ড সম্বন্ধে সমুদায় যুক্তি দায়ভাগের নিম্নলিখিত বচনে আছে।

"যেহেতু পিতা এবং কতিপয় অন্য পূর্ব্ব "পুরুষ শ্রাদ্ধে প্রদত্ত পিণ্ডের ভাগী হইয়া তিন "পিণ্ড ভোগ করেন, এবং যেহেতু পুত্র এবং "অন্য তিন জন সন্তান মৃত ব্যক্তির প্রেত পিণ্ড "দান করে, এবং যেহেতু যে ব্যক্তি জীবিত "থাকিতে তাহার যে পূর্ব্ব পুরুষকে পিণ্ডদান "করে, তাহার মৃত্যু হইলে সেই পূর্ব্ব পুরুষকে "পিণ্ড প্রদত্ত হইলে, সে সেই পিণ্ডের ভাগ প্রাপ্ত "হয়, অতএব যে সাত জন জীবিত থাকিতে "তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের শ্রাদ্ধ করিয়াছে এবং "মৃত্যুর পরে ঐ পূর্ব্ব পুরুষকে প্রদত্ত পিণ্ডের "ভাগ পাইয়াছে তাহার মধ্যম অর্থাৎ চতুর্থ ব্যক্তির "সন্তানেরা তাহাদের জীবদ্দশায় যে পিণ্ড দেয়, "তাহা তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া দেওয়া হয়, এবং "তাহাদের মৃত্যুর পরে দৌহিত্র এবং তৃতীয় পুরু- "ষের পরে অন্য সন্তান দ্বারা যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, "তাহার সে ভাগ পায়। অতএব যে সকল "পূর্ব্বপুরুষকে সে পিণ্ডদান করিয়াছে, এবং "যে সকল সন্তানেরা তাহাকে পিণ্ডদান করে "তাহারা শ্রাদ্ধে অবিভক্ত পিণ্ড ভোগ করে; "যে সকল ব্যক্তি এই প্রকার পিণ্ডের ভাগ পায় "তাহারাই সপিণ্ড। কোলব্রুকের দায়ভাগের "১১ অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদের ৩৮ শ্লোক "দ্রষ্টব্য।"

উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, যদি দুই হিন্দুর প্রত্যেকে তাহাদের জীবদ্দশায় এক জন পূর্ব্বপুরুষকে পিণ্ড দিতে বাধ্য হয়, তবে তন্মধ্যে এক জনের মৃত্যু হইলে জীবিত ব্যক্তি সেই পূর্ব্বপুরুষকে যে পিণ্ড দেয়, মৃত ব্যক্তি তাহার ভাগ পাইতে স্বত্ববান হইবে; অতএব যে ব্যক্তি সেই পিণ্ডদান করে এবং সে ব্যক্তিকে তাহা প্রদত্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাহার ভাগ পায় তাহারা সকলেই পরস্পরের সপিণ্ড। দায়ক্রমের জন্য সপিণ্ডের এই ব্যাখ্যা যে সর্ব্বথা সঙ্গত তাহা অব্যবহিত পরের শ্লোকেই চূড়ান্ত রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে বলে যে "সপিণ্ডের এই সম্পর্ক (যাহা চতুর্থ পুরুষের "অধিক যায় না' এবং সকুল্যের সম্পর্ক) দায়ক্রম "সম্বন্ধে' প্রতিপন্ন হইয়াছে।" কোলব্রুকের দায়ভাগের ১১ শ অধ্যায়ের ১ ম পরিচ্ছেদের ৩৯ শ্লোক, দ্রষ্টব্য।

উপস্থিত মোকদ্দমায় এই ব্যাখ্যা প্রয়োগার্থে, যে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের কথা আমরা এই রায়ের প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছি, সেই শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি প্রাথমিক বাক্য ব্যক্ত করা আবশ্যক। পিতৃ ও মাতৃকুলের প্রথম তিন পুরুষের প্রত্যেককে অর্থাৎ পিতৃকুলে পিতা পিতামহ, ও প্রপিতামহ ও মাতৃকুলে মাতামহ,

প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহকে পিণ্ডদান করাই পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের কার্য্য। এই কারণে এই ক্রিয়া দায়ভাগে ত্রৈপুরুষিক পিণ্ড দান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং এই ক্রিয়ায় প্রদত্ত পিণ্ড দ্বারাই ঐ গ্রন্থে লিখিত সপিণ্ডের সম্পর্ক উত্থিত হয়। প্রত্যেক হিন্দুই আপন ধর্ম্মশাস্ত্র মতে এই ক্রিয়া করিতে বাধ্য, কারণ, তাহার পিতৃলোকের গতির সহিত তাঁহার নিজের গতি সংলিপ্ত, এবং তাহা ঐ ক্রিয়ার উপরেই নির্ভর করে; অতএব ঐ ধর্ম্মে যে সমস্ত ক্রিয়াধ্ব বিধান আছে, তন্মধ্যে পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধই অতি প্রধান।

পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধের এবং তাহা সম্পাদন করার দায়ের ভাব এই হওয়ায়, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মৃত ধনীর পিতৃব্য-দৌহিত্র যে এইক্ষণে দায়ক্রমের স্বত্বে তাঁহার সম্পত্তি দাবী করিতেছে, সে যে প্রকার ঐ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে বাধ্য, সেই প্রকার ধনী নিজেও তাহা করিতে বাধ্য ছিলেন। পক্ষগণের অবস্থার দ্বরা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পিতৃব্য-দৌহিত্রের প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহই ধনীর পিতামহ ও প্রপিতামহ; অতএব দায়ভাগের ঠিক ব্যাখ্যানুযায়ী তাহারা যে পরস্পরের সপিণ্ড, ইহা ভিন্ন আর কোন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

মৃত ধনী আপন জীবদ্দশায় পিতামহ ও প্রপিতামহকে পিণ্ড দিতে বাধ্য ছিল, অতএব এইক্ষণে ঐ সকল ব্যক্তিকে তাহার পিতৃব্য-দৌহিত্র যে পিণ্ড দেয়, সে তাহার ভাগ পাইতে স্বত্ববান্।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত করার আর এক উপায় আছে। দেখা যাইতেছে যে, মৃত ধনী আপেলাণ্টের প্রমাতামহের পৌত্র ছিল, এবং ইহা স্বীকৃত আছে যে, প্রমাতামহের পৌত্র বঙ্গদেশ-প্রচলিত গ্রন্থ সমস্ত মতে সপিণ্ড সূত্রে দায়াধিকারী হইতে পারে। অতএব যদি মৃত ধনী আপেলাণ্টের সপিণ্ড হয়, তবে অবশ্য সপিণ্ড শব্দের ব্যাখ্যানুসারে আপেলাণ্টও মৃত ধনীর সপিণ্ড হইবে; কারণ, যদি সম্পূর্ণ পিণ্ডের দ্বারা রামের সহিত শ্যামের সম্পর্ক থাকে, তবে সেই শক্তিকেই শ্যামের সহিত রামেরও সম্পর্ক থাকিবে। কিন্তু এই দুই ঘটনার মধ্যে এক বিশেষ প্রভেদ আছে। মৃত ধনী যে পিণ্ড তাহার আপন পিতামহ ও প্রপিতামহকে দেয়, তাহা তাহার পিতৃব্য-দৌহিত্রের প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহে গমন করিত; কিন্তু পিতৃব্য-দৌহিত্র তাহার আপন প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহকে যে পিণ্ড দেয়, তাহা ধনীর পিতামহ ও প্রপিতামহে গমন করিবে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, দায়ভাগ অনুসারে পিতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষদিগকে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা মাতামহকুলের পিণ্ড অপেক্ষা অধিক পারলৌকিক উপকার-জনক, অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আপেলাণ্ট সম্বন্ধে মৃত ধনী যে প্রকার সপিণ্ড, তদপেক্ষা আপেলাণ্ট মৃত ধনীর অধিক নিকট সপিণ্ড।

পারলৌকিক উপকারের যে যুক্তির উপরে দায়ভাগোক্ত দায়ক্রম নির্ভর করে, পিতৃব্য-দৌহিত্র যে তদন্তর্গত তাহা আমি উপরেই দেখাইলাম; অতএব তাহার ধনাধিকারী হওয়ার স্বত্বের বিরুদ্ধে যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে, আমি এক্ষণে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

তর্কিত হইয়াছে যে, দায়ভাগের কোন স্থানেই ধনাধিকারী বলিয়া পিতৃব্য-দৌহিত্রের নাম লেখা নাই। আমাদের মত এই যে, এই আপত্তি অকর্ম্মণ্য। যিনি দায়ভাগ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন যে, প্রত্যেক দায়াদের নাম বিশেষ রূপে লেখা গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল না। ইহা সত্য বটে যে, কোন কোন স্থানে কয়েকটি দায়াধিকারীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু পারলৌকিক উপকারের যুক্তি দ্বারাই অধিকাংশ দায়াদ স্থির করার জন্য রাখা হইয়াছে। যথা, মৃত ধনীর মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পিণ্ড দেওয়ার স্বত্বের শক্তিকে যে সকল বহুসংখ্যক ব্যক্তি সপিণ্ড হইতে পারে,

তন্মধ্যে কেবল মাতুলের নাম উচ্চারিত হইয়াছে। অনন্তর, সকুল্যদের মধ্যে কেবল পৌত্রের প্রপৌত্রের নাম আছে, এবং সমানোদকের মধ্যে কাহারো নাম নাই। এই সকল বৃত্তান্ত দৃষ্টে এমত তর্ক করা দুঃসাধ্য যে, যে ব্যক্তি ধনাধিকারী হওয়ার জন্য দায়ভাগের লিখিত সমস্ত কার্য্য করিবার যোগ্য, ঐ গ্রন্থে তাহার নাম বিশেষ করিয়া লেখা নাই বলিয়াই সে ধনাধিকারী হইতে পারিবে না।

আরও তর্কিত হইয়াছে যে, দায়ভাগে সকুল্য পর্য্যন্ত দায়ক্রম এমন ঠিক ও সম্পূর্ণ রূপে লিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে পিতৃব্য-দৌহিত্রের নাম বসাইবার স্থান নাই, অতএব সে ব্যক্তি দায়ক্রমের মধ্যে কোন মতে আসিতে পারিলেও সপিণ্ডের শ্রেণীর মধ্যে আসিবে। আমাদের বিবেচনায়, এই আপত্তিও অকর্ম্মণ্য। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ক্রমসংগ্রহ নামক গ্রন্থ যাহার উদ্দেশ্য কেবল ধনাধিকারীদিগের নামাবলি প্রস্তুত করা ভিন্ন আর কিছু নহে, দায়ভাগ যদি ঐ গ্রন্থের ন্যায় হইত, তবে এই তর্কের কিছু বল থাকিত। কিন্তু যে স্থলে আমরা দেখিতেছি যে, দায়ভাগপ্রণেতার কেবল নিজের এক সাধারণ যুক্তি সংস্থাপন করাই উদ্দেশ্য ছিল, সেই যুক্তি প্রত্যেক স্থলে খাটাইয়া দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল না, সে স্থলে প্রথম আপত্তির আমরা যে উত্তর দিয়াছি, তাহাতেই দেখা যায় যে, এই প্রকার তর্কে কোন বল আছে, এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে না। যদি এই মোকদ্দমার দাবীদার মাতুলের দৌহিত্র অথবা সেই প্রকার অন্য কোন সম্পর্কীয় ব্যক্তি হইয়া কেবল মৃত ধনীর মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষদিগকে পিণ্ডদান করিতে পারিত, তাহা হইলে দায়ভাগের ঠিক মর্ম্মানুসারে এই প্রকার আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারিত না। তবে কিজন্য আমাদের এমত অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, পিতৃব্য-দৌহিত্রকে বর্জ্জিত করা ঐ গ্রন্থকর্তার মনস্থ ছিল, যে স্থলে আমরা নিঃসন্দেহই দেখিতেছি যে, সে তদপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীস্থ অর্থাৎ পিতৃকুলের পূর্ব্ব পুরুষকে পিণ্ডদান করিতে পারে? কি জন্য আমাদের এমত অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, সপিণ্ড শ্রেণীস্থ সকল দায়াদের নাম লিখিয়া শেষ করা হইয়াছে, কিন্তু অন্য এবং তদপেক্ষা অধম শ্রেণীস্থ দায়াদগণের নাম কেবল উদাহরণ স্বরূপে লিখিত হইয়াছে? যদি এই বিষয়ে এখনও কোন সন্দেহ থাকে, তবে কেবল দায়ভাগের ১১ শ অধ্যায়ের ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ১৯ শ্লোক দৃষ্টি করিলেই তাহা দূর হইবে। ঐ শ্লোক এই "অতএব মৃত ধনীর পিত অথবা মাতৃকুলে "ত্রৈপুরুষিক পিণ্ডদানের দ্বারা যে ব্যক্তি সম্পর্কীয় "হয় সে তাহার কুলোদ্ভব বিধায়, অন্য গোত্রজ, "যথা তাহার দৌহিত্র অথবা তাহার পিতার "দৌহিত্র, ইত্যাদি, অথবা তাহার মাতুলের ন্যায় "অন্য কুলোদ্ভব ইত্যাদি, হইলেও, দায়াদ হয়, "এবং এই বচন তিন পুরুষের তর্পণ, ইত্যাদি— "ঐ সকল জ্ঞাতির দায়াধিকার দেখাইবার জন্য "প্রতিপন্ন হইয়াছে; এবং তাহার পরের পরি- "চ্ছেদে, অতি নিকট সপিণ্ডে দায়াধিকার বর্ত্তে, "ইহাতে তাহাদের নৈকট্যের অগ্রপশ্চাৎ প্রভেদ "করিবার মনস্থ বুঝায়।"

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, পিতার দৌহিত্র যে প্রকার সপিণ্ড, পিতৃব্য-দৌহিত্রও তদ্রূপ সপিণ্ড, এবং যদি ইহা একবার স্বীকার করা যায় যে, "মাতুল" শব্দের পরে "ইত্যাদি" শব্দের এমন ব্যাপক অর্থ হইবে যে, তাহাতে মৃত ব্যক্তির মাতৃকুলে মাতুলের ন্যায় যে সকল ব্যক্তি পিণ্ডদান করিতে পারে তাহাদের প্রত্যেককে বুঝাইবে, তাহা হইলে "পিতার দৌহিত্র" শব্দদ্বয়ের পরে যে, "ইত্যাদি" শব্দ আছে, তাহার কি জন্য এমন ব্যাপক অর্থ হইবে না যে, তদ্দ্বারা পিতার দৌহিত্রের ন্যায় আর যে সকল ব্যক্তি পিণ্ডদান করিতে পারে তাহাদের সকলকে বুঝাইবে, তাহা আমার দৃষ্ট হয় না। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই শ্লোকে মনুর যে দুই বচনের

উপরে নির্ভর করা হইয়াছে, তদুভয়ই অতি ব্যাপক, কারণ, তাহার দুই বচনের কোন বচনেই এক জন দায়াদেরও নাম উচ্চারিত হয় নাই।" তবে কি জন্য আমাদের এমত অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, দায়ভাগ-প্রণেতা কেবল মাতৃকুলে যাহারা পিণ্ডদান করিতে পারে তাহাদের অনুকূলে তাঁহার ঐ বচন প্রয়োগ করিতে মনন করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা পিতৃকুলে পিণ্ড দিতে পারে তাহাদের পক্ষে তাহা প্রয়োগ করেন নাই? ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, মনুসংহিতা যাহা হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রের সকল বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ প্রমাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ, দায়ভাগপ্রণেতা নিজে তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উল্লঙ্ঘন করত যদি পূর্ব্বোক্ত মত সংস্থাপন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তবে তাহা তিনি অভ্রান্ত বাক্যে প্রকাশ করিতেন, এবং তিনি তাঁহার সমস্ত মতের যে মূল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে কার্য্য করার জন্য তিনি অবশ্যই উৎকৃষ্ট অথবা অপকৃষ্ট হেতু দেখাইয়া যাইতেন। পক্ষান্তরে, তিনি নিজে ১১ শ অধ্যায়ের ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদের ৩০ শ্লোকে কি বলিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। এই শ্লোক দায়ভাগের যে স্থানে আছে তদ্দৃষ্টে দেখা যায় যে, দায়ক্রম সম্বন্ধে তাঁহার সমুদায় তর্কের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা তাহাতে আছে, এবং তাহা এই, যথা:—

"সেই প্রকার, উল্লিখিত প্রণালীমতে মৃত
"ধনীর উপকারার্থে তাহার ধন ব্যবহার প্রত্যেক
"স্থলে বর্ণিত ক্রমানুসারে অনুমান করিয়া লইতে
"হইবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পারলৌকিক উপকারের যুক্তি অবলম্বন করিয়াই দায়ক্রম সম্বন্ধীয় সকল প্রশ্নের মীমাংসা করার বিশেষ অনুজ্ঞা এই স্থানে প্রদত্ত হইয়াছে, এবং তাহার অব্যবহিত পরের শ্লোকে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত আছে যে, মনুর এবং অন্যান্য যে ঋষিগণের বচন সমুদায় হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রের মূল, তাঁহারা ঐ মত সম্পূর্ণরূপে গ্রাহ্য করিয়াছেন। উল্লিখিত বচনে ব্যবহৃত "অনুমান" শব্দের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক। যদি দায়ভাগপ্রণেতা এমন বিবেচনা করিতেন যে, তিনি নিজেই দায়ক্রম সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় চূড়ান্তরূপে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ প্রকার অনুমান করিয়া লইবার কোন আবশ্যক থাকিত না; এবং তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে প্রত্যেক ঘটনায় কেবল তাঁহার আপন সংস্থাপিত বিধির অনুসরণ করিতেই আজ্ঞা করিয়া যাইতেন। কথিত হইয়াছে যে, "বর্ণিত ক্রমানুসারে" এই শব্দগুলি ঐ তর্কের পোষকতা করে; কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই স্থানে যে বর্ণনার উল্লেখ হইয়াছে তাহা উহার পূর্ব্ব বচনে যে লেখা আছে যে, "উপকারের "ন্যূনাধিক্যের দ্বারা দায়ক্রম-নির্ণীত হইবে" তাহাই বুঝায়।

অবশেষ, তর্কিত হইয়াছে যে, পারলৌকিক উপকারের যুক্তি অনুযায়ী দায়ক্রমে পিতৃব্য-দৌহিত্রের অবস্থার সহিত, দায়ভাগ-প্রণেতা ১১ শ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে যে সকল দায়াদের বর্ণনা করিয়াছেন তাহাদের অবস্থা অসংলগ্ন হয়। এই কথা প্রকৃত কি না, তাহা আমাদের অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই, কারণ, এই মোকদ্দমায় পিতৃব্য-দৌহিত্র দায়াদদিগের শ্রেণীর মধ্যে কোন্ স্থান পাইতে পারে তাহা আমাদের নির্দ্দেশ করিতে হইবে না; সে দায়াধিকারী হইতে পারে কি না, কেবল তাহাই আমাদের নির্ণয় করিতে হইবে। দায়ভাগপ্রণেতা যদি কোন দায়াদকে এমন স্থানে সংস্থাপন করিয়া থাকেন যাহা তাঁহার নিজের যুক্তি অনুসারেই সে পাইতে পারে না, তবে অধিক হইলেও সেই দায়াদের সম্বন্ধে কেবল এই বলা যাইতে পারে যে, তাহাকে ঐ স্থানই রাখিতে দিতে হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ যুক্তি অনুসারে সর্ব্বপ্রকারে দায়াধিকারী হওয়ার যোগ্য, ঐ কথা সত্য হইলেও, কেবল সেই হেতুতে তাহাকে বর্জ্জিত করা যাইতে পারে না। দায়ক্রমে পিতৃব্য-দৌহিত্রের ঠিক কোন্

স্থান তাহা নির্দ্দিষ্ট করার জন্য যদি ভবিষ্যতে আমাদের সমক্ষে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তবে তখন এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, যে যুক্তি দায়ভাগের মূল সেই যুক্তির বিরুদ্ধে দায়ভাগে কোন কথা লেখা থাকিলে তাহা গ্রাহ্য করা উচিত কি না। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, দায়ভাগ-প্রণেতা নিজেই মনুর যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদনুসারে সেই ব্যক্তিই অতি নিকট দায়াধিকারী যে মৃত ধনীকে অধিক পারলৌকিক উপকার প্রদান করিতে পারে। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা নিজে সেই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই যদি আমরা কোন মোকদ্দমায় ঐ রূপ কার্য্য করি, তবে সেই মোকদ্দমায় যাহা আবশ্যক তাহা অতিক্রম করিয়া কি জন্য আমাদের ঐ বিরুদ্ধ কার্য্যের আধিক্য করিতে হইবে, তাহা আমার দৃষ্ট হয় না। বৃহস্পতি কহিয়াছেন যে, "কেবল লিখিত শাস্ত্রের "ঠিক শব্দ অবলম্বন করিয়া মীমাংসা করা "উচিত নহে, কারণ, শাস্ত্রের যুক্তি অনুসারে "মীমাংসা না করিলে অবিচার হইতে পারে।" ব্যাখ্যার এই নিয়ম যে সুবিচার ও ন্যায়পরতা ও সৎজ্ঞানের যুক্তি সঙ্গত, তাহার কোন সন্দেহ নাই, এবং আমরা যে, তাহা এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য অনায়াসে অবলম্বন করিতে পারি, তাহা এতদ্দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে, দায়ক্রম সম্বন্ধীয় হিন্দু-শাস্ত্রের সকল বিষয়ে বৃহস্পতির বাক্য অতি প্রধান প্রমাণ বলিয়া দায়ভাগ-প্রণেতা নিজেই বারম্বার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অতএব উপরি-উক্ত হেতুবাদে আমাদের মতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য-দৌহিত্র দায়াধিকারী স্বরূপে গ্রাহ্য।

**প্রধান বিচারপতি পীকক্।**—আমি উপরি উক্ত রায়ে সম্মত, এবং আমি আরও বলিতে চাই যে, উহা দায়ক্রম-সংগ্রহের ১ ম অধ্যায়ের ১০ ম পরিচ্ছেদের ৯ দফার দ্বারাই সপ্রমাণ। তাহাতে লেখা আছে যে, "পিতামহের দৌহিত্র "অভাবে পিতৃব্য-দৌহিত্র ধনাধিকারী হয়, "কারণ, সে দুই পিণ্ড দেয় যাহার ভাগ মৃত "ধনী পায়, অর্থাৎ মৃত ধনীর পিতামহ এবং "প্রপিতামহকে (অর্থাৎ ঐ দৌহিত্রের নিজের "প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহকে), পিণ্ড দেয়।"

বিচারপতি কেম্প্ ও ম্যাক্‌ফার্সন এই মতে সম্মত।

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—অর্পণ করার কালে আমি যে রায় প্রদান করিয়াছি, তাহাই আমার রায়, এবং এই রায় আমার মতের ঠিক অনুরূপ বিধায় আমি ইহাতে সম্মত হইলাম।

(গ)

---

২৪ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

**প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান ও বিচারপতি জি, লক; এল, এস, জ্যাকসন; জে, বি, ফিয়ার ও এ, জি, ম্যাক্‌ফার্সন।**

রাজকুমার রায়, ডিক্রীদার।

কাদম্বিনী দেবী ও অন্যান্য, বিচারাদিষ্ট দায়ী।

রমানাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী দাবীদার।

মেং মেরিভিন বারিষ্টর, ডিক্রীদারের কৌন্সেল।

মেং কেনিডি বারিষ্টর, দাবীদারের কৌন্সেল।

**চুম্বক।**—রামের বিরুদ্ধে এক ডিক্রীজারীতে, কোন ভূমিতে তাহার অর্দ্ধাংশ ক্রোক হওয়ায় শ্যাম দেঃ কার্য্য-বিধির ২৪৬ ধারা মতে এই বলিয়া আপত্তির দরখাস্ত করে যে, রামের ৸৹ আনা অংশ আছে বটে, কিন্তু ঐ ভূমিতে তাহার নিজের চারি আনা অংশ আছে।

ইহা ২৪৬ ধারার মর্ম্মানুযায়ী, ডিক্রীজারীতে ক্রোককৃত ভূমি সম্বন্ধীয় দাবী; অতএব আদালত ঐ ধারা মতে ইহার তদন্ত করিতে, এবং শ্যাম আপন দাবী সপ্রমাণ করিতে পারিলে তাহার অংশ ক্রোক হইতে মুক্তি দিতে বাধ্য।

রামের বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে কোন ভূমিতে

তাহার স্বত্ব স্বামিত্ব এবং সম্পর্ক ক্রোক হয়। তাহাতে শ্যাম ২৪৬ ধারা মতে এই দরখাস্ত করে যে, ঐ সম্পত্তির বিশ ভাগের এক ভাগ রায়ের বটে, কিন্তু সে নিজে ঐ সম্পত্তির বিশ ভাগের দুই ভাগে স্বত্ববান্।

এমত স্থলে, শ্যাম ন্যায্যরূপেই আপন অংশের দাবী উপস্থিত করিতে পারে, এবং আদালত ২৪৬ ধারা মতে তদন্ত করিয়া, শ্যামের কথিত অংশ সপ্রমাণ হইলে তাহা ক্রোক হইতে খালাস দিতে বাধ্য।

## বিচারপতি ম্যাক্ফার্সনের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়:—

বিচারপতি ম্যাক্ফার্সন।—মৃত "পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর এক মাত্র কন্যা ও দায়াধিকারিণী" কাদম্বিনী দেবীর বিরুদ্ধে রাজকুমার রায়ের মোকদ্দমার ডিক্রীজারীতে প্রতিবাদীর প্রতি কোন স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার নিষেধক হুকুম প্রচারিত হইয়া সেই সম্পত্তি ক্রোক হয়। ঐ নিষেধক হুকুমে ক্রোককৃত সম্পত্তি এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে, যথা, "মাণিক বসুর গলিতে ৩০ নং "এক খণ্ড ভাড়াটিয়া ভূমিতে মৃত পার্ব্বতীচরণ "চক্রবর্ত্তীর যে অর্দ্ধেক হিস্যা ছিল, * * * "এবং মাণিক বসুর গলিতে ২৬ নং একটি "একতালা বাটীতে * * * এবং শুক- "বাজার যুক্ত এক খণ্ড ভূমির উপরে তিন কুঠরী "যুক্ত এক খানা খোলার ঘরে উক্ত মৃত পার্ব্বতী- "চরণ চক্রবর্ত্তীর যে কোন স্বত্ব, স্বামিত্ব ও "সম্পর্ক ছিল," ইত্যাদি।

তাহাতে প্রার্থিগণ উক্ত সম্পত্তি দাবী করিয়া এক দরখাস্ত দাখিল করত বলে যে, প্রথমোক্ত সম্পত্তিতে অর্থাৎ মাণিক বসুর গলির ৩০ নং ভূমিতে পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর কেবল ৶০ আনা অংশ এবং মাণিক বসুর গলির ২৬ নং বাটীতে কেবল ২০ অংশের এক অংশ এবং শুকবাজারের সম্পত্তিতে কেবল ।০ আনা অংশ ছিল, এবং প্রার্থীদিগের প্রথমোক্ত সম্পত্তিতে একযালী ।০ আনা ও দ্বিতীয়োক্ত সম্পত্তিতে ।০ আনা ও তৃতীয়োক্ত সম্পত্তিতে ॥০ আনা হিস্যা ছিল।

মাণিক বসুর গলির ৩০ নং সম্পত্তি সম্বন্ধে দরখাস্তে লেখা আছে যে, প্রার্থিগণ এবং তাহাদের ভ্রাতা পার্ব্বতীচরণ এবং উমাচরণ তাহার অর্দ্ধাংশ একত্রে ক্রয় করিয়া ভোগবান্ ছিল, অতএব প্রত্যেকে ঐ অর্দ্ধাংশের ।০ আনার অর্থাৎ সমুদায় সম্পত্তির ৶০ আনার মালিক ছিল।

মাণিক বসুর গলির ২৬ নং সম্পত্তি সম্বন্ধে দরখাস্তে লেখা আছে যে, ইহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ কাশীনাথ চক্রবর্ত্তীর সম্পত্তি ছিল, এবং তাহার নিকট হইতে তাহার চারি পুত্র অর্থাৎ প্রার্থিদ্বয় এবং পার্ব্বতী ও উমাচরণ দায়াধিকারী-সূত্রে ঐ পঞ্চমাংশ পাইয়া প্রত্যেকে ঐ পঞ্চমাংশের চারি ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ মোট সম্পত্তির বিশ ভাগের এক ভাগ পায়।

শুকবাজার সম্বন্ধে দরখাস্তে লেখা আছে যে, তাহা কাশীনাথ ক্রয় করে, এবং তাহার চারি পুত্র অর্থাৎ প্রার্থিদ্বয় ও পার্ব্বতীচরণ এবং উমাচরণ দায়াধিকারী-সূত্রে প্রত্যেকে সমান অংশ অর্থাৎ ।০ আনা অংশ পায়।

এই দাবী আমার সমক্ষে তদন্তের জন্য উপস্থিত হওয়াতে ডিক্রীদারের পক্ষ হইতে এই তর্ক উপস্থিত হইয়াছে যে, যেহেতু প্রার্থীরা ইহা স্বীকার করিয়াছে যে, ক্রোক-কৃত সম্পত্তিতে পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর বাস্তবিক স্বত্ব ছিল, অতএব ঐ দাবী অসঙ্গত; এবং তাঁহা এমন নহে যে, আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা মতে তাহার তদন্ত করিতে পারেন। এবং এই তর্কের পোষকতায় (৮ম বালম উঃ রিঃ ৩৭২ পৃঃ) মিশ্রি বেগম বনাম পদ্মু সিংহের মোকদ্দমায় এক খণ্ডাধিবেশনের (বিচারপতি সিটনকার ও দ্বারকানাথ মিত্র) নিষ্পত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রার্থীদিগের পক্ষে তর্কিত হইয়াছে যে, দাবী সঙ্গত, এবং যেহেতু কেনিডি (৪র্থ বালম উঃ রিঃ

৩৫ পৃঃ ) মনোহর খাঁ বনাম ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষের মোকদ্দমায় আর এক খণ্ডাধিবেশনের ( বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং ক্যাম্বেলের ) এক নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করিয়াছেন।

আমি নিজে বিবেচনা করি যে, যদিও ২৪৯ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, নীলামের এস্তাহারে এই কথা প্রচারিত হইবে যে, তল্লিখিত সম্পত্তিতে কেবল প্রতিবাদীর স্বত্ব, অধিকার ও স্বামিত্ব বিক্রীত হইবে ; এবং যদিও নীলামে সেই স্বত্ব, স্বামিত্ব ও অধিকার ভিন্ন আর কিছু ক্রীত অথবা হস্তান্তরিত হইতে পারে না, তথাপি এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে, ক্রোক ও নীলাম-কৃত সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর বস্তুতঃ কোন স্বত্ব থাকুক বা না থাকুক, ঐ ক্রোক কেবল সাধারণ ক্রোক হইবে, অথবা ঐ নীলামের দ্বারা প্রতিবাদীর স্বত্ব, স্বামিত্ব এবং অধিকারের কেবল সাধারণ নীলাম হইবে। ২১৩, ২৩৫ ও ২৩৯ ধারা একত্রে পাঠ করিয়া আমার বোধ হয় যে, কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির কোন নির্দ্দিষ্ট অংশই ক্রোক করিতে হইবে ; এবং* যদিও নীলামে বিক্রীত সম্পত্তিতে কেবল প্রতিবাদীর স্বত্ব, স্বামিত্ব এবং অধিকার বিক্রীত হইল, এই কথা ব্যক্ত করিয়া বিক্রয় করিতে হইবে, তথাপি নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি অথবা সম্পত্তির এক নির্দ্দিষ্ট অংশ বিক্রয় করিতে হইবে। আমি বিবেচনা করি, যে সকল মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্বত্ব প্রদর্শিত না হয়, এবং যাহাতে বাস্তবিক ঐ স্বত্ব থাকার কথা বিশ্বাস করার ন্যায্য হেতু না থাকে, সেই সকল ঘটনায় আদালতের ক্রোক অথবা নীলাম করা উচিত নহে।

প্রার্থীরা যে দাবী করিয়াছে, তাহা আমার বিবেচনায়, অপকৃষ্ট অথবা তাহা আদালতের তদন্তের অযোগ্য বোধ হয় না। কিন্তু যেহেতু আমার মত মিস্রি বেগমের মোকদ্দমায় * বিচারপতিগণের মতের বিরুদ্ধ এবং এই প্রশ্ন অত্যন্ত আবশ্যকীয়, অতএব আমি পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির জন্য এই মোকদ্দমা অর্পণ করিলাম।

অর্পিত প্রশ্ন এই যে:—

১ম। রামের বিরুদ্ধে এক ডিক্রীজারীতে কতিপয় ভূমিতে রামের অর্দ্ধাংশ ক্রোক হয়। শ্যাম ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারামতে এক দরখাস্ত দাখিল করে, এবং তাহাতে স্বীকার করে যে, ঐ সম্পত্তিতে রামের ৵০ আনা অংশ আছে, কিন্তু বলে যে, রামের কেবল ৵০ আনা অংশ আছে, এবং ।০ আনা তাহার নিজের সম্পত্তি। ইহা কি ডিক্রীজারীতে ক্রোক-কৃত ভূমি সম্বন্ধে ২৪৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত এমত দাবী যে তাহা ঐ ধারামতে আদালতের তদন্ত করা উচিত?

২য়। যদি তাহাই হয়, এবং শ্যাম যদি আপন দাবী সপ্রমাণ করে, তবে সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেওয়া সম্বন্ধে আদালতের কি হুকুম দেওয়া উচিত?

৩য়। রামের বিরুদ্ধে এক ডিক্রীজারীতে, কতিপয় ভূমিতে রামের স্বত্ব, স্বামিত্ব ও অধিকার ক্রোক হয়। শ্যাম ২৪৬ ধারা মতে এক দরখাস্ত করে, এবং তাহাতে স্বীকার করে যে, ঐ ভূমিতে রামের বিশ ভাগের এক ভাগ হিস্যা আছে, কিন্তু সে বলে যে, রামের ঐ বিশ ভাগের এক ভাগের অধিক লওয়ারি স্বত্ব নাই ; তাহার নিজের অর্থাৎ শ্যামের ঐ ভূমিতে ২০ ভাগের দুই ভাগ হিস্যা আছে। ইহা কি ২৪৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত দাবী যে তাহা ঐ ধারা মতে আদালতের তদন্ত করা উচিত?

৪র্থ। যদি তাহাই হয়, এবং শ্যাম যদি আপন দাবী সপ্রমাণ করে, তবে সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেওয়া সম্বন্ধে আদালতের কি হুকুম প্রচার করা উচিত?

পূর্ণাধিবেশনের রায় :—

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—৮ম বাঙ্গালা উইক্লি রিপোর্টরের ৩৭২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত

* বাঃ লাঃ রিপোর্ট ১ম ভাগ, দেঃ নিষ্পত্তি, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

এক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ৪র্থ বালম উইকলি রিপোর্টরের ৩৫ পৃষ্ঠার এক নিষ্পত্তির সহিত অনৈক্য বিধায় এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হইয়াছে। ৮ ম বালম উইকলি রিপোর্টরের নিষ্পত্তি এই যে :—

এক ব্যক্তি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা মতে এই বলিয়া এক দাবী উপস্থিত করে যে, একটি সম্পত্তি যাহা ক্রোক হইয়াছে তাহার ৬৵৫ তাহার নিজের সম্পত্তি। আদালত হুকুম দেন যে, দাবী-কৃত ৬৵৫ ক্রোক হইতে খালাস হয়, এবং তাহার পরে বাকী ৵১৫ গণ্ডার কোন উল্লেখ না করিয়া আদালত ঐ সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর স্বত্ব ও স্বামিত্ব নীলাম করেন। তাহার পরের একটি মোকদ্দমায়, যাহাতে ঐ নীলামের ফলের প্রশ্ন উত্থিত হয়, সেই মোকদ্দমায় আদালতের রায় প্রদান করিবার কালে বিচারপতি দ্বারকানাথ কহিয়াছেন যে, "সম্পত্তির এক অংশ "নীলাম হইতে বাদ দেওয়ার যে হুকুম হইয়াছে "তাহা স্পষ্টই অবৈধ।"

উপস্থিত অর্পণে বাস্তবিক এই প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে যে, ডিক্রীজারীতে ক্রোক-কৃত কোন ভূমি অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তির নীলামের বিরুদ্ধে যে দাবী করা হয় তাহা যদি ঐ সম্পত্তির কোন অবিভক্ত ভগ্নাংশের নীলামের বিরুদ্ধে দাবী হয়, তবে সেই দাবী ২৪৬ ধারা মতে বিচারিত হইতে পারে কি না?

২১৩ ধারায় আমরা দেখিতেছি যে, প্রতিবাদীর কোন ভূমি অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য দরখাস্ত হইলে তাহার সহিত "ঐ সম্পত্তির এক তালিকা কি ফর্দ দিতে হইবে, "তাহাতে ঐ সম্পত্তি নিশ্চিত রূপে চেনা যাইতে "পারে এমত উপযুক্ত বর্ণনা লেখা থাকিবেক "ও প্রতিবাদীর যে অংশ কি সম্পর্ক থাকে, "তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।"

"সম্পর্ক" শব্দ পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তি বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা প্রতিবাদীর নিজের সম্পত্তি।

যদি প্রতিবাদীর সম্পত্তি কোন ভূমি সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশ, যথা ॥০ আনা হয়, তবে প্রতিবাদীর সম্পত্তি বলিয়া তালিকায় ঐ অংশের বর্ণনা করিতে হইবে, যে ভূমির কেবল এক ভাগ প্রতিবাদীর সম্পত্তি, তাহার বর্ণনা করিতে হইবে না।

"সম্পর্ক" শব্দের পরে "তন্মধ্যে" শব্দ আছে; এবং "তন্মধ্যে" শব্দের দ্বারা কিছু গোলোযোগ উপস্থিত হয়, কারণ, ঐ শব্দ ব্যবহার করায় দেখা যাইতেছে যে, ঐ শব্দ লেখার কালে ঐ আইনের পাণ্ডু-লেখকের মনে, সম্পত্তি শব্দ পূর্ব্বে যে ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইতে অন্য ভাবে উপস্থিত ছিল। বোধ হয়, তৎকালে পাণ্ডু-লেখকের মনে সম্পত্তি শব্দে, প্রতিবাদীর সম্পত্তি যে সম্পত্তির এক অংশ মাত্র, তাহাই উপস্থিত ছিল।

২৩৫ ধারায় ক্রোক সম্বন্ধীয় বিধান আছে, এবং তাহার বিধান কেবল ভূমি ও বাটী সম্বন্ধে নহে, অন্য স্থাবর সম্পত্তি যাহাতে ভূমি অথবা বাটীর অবিভক্ত অংশ পর্য্যাপ্ত রূপে ভুক্ত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধেও ঐ বিধান খাটে।

২৩৯ ধারায় "যদি সম্পত্তি ভূমি সম্পত্তি "অথবা ভূমির কোন সম্পর্ক হয়," এই বাক্য আছে, এবং পরে তৎসম্বন্ধে এস্তাহার জারী বিষয়ে কি করিতে হইবে তাহার বিধান আছে।

ক্রোকী সম্পত্তি ভূমি অথবা ভূমির অংশ হইলে, তৎসম্বন্ধে ২৪৪ ধারার বিধান আছে। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, যখন আমরা ২৪৬ ধারায় আসিয়া "ভূমি অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি" এই শব্দগুলি দৃষ্টি করি, তখন ঐ সকল শব্দে কেবল জরীপ ও সীমাবন্দী দ্বারা বিভক্ত ভূমি অথবা বাটীই বুঝায়, এমন নহে; ঐ সকল ভূমির ও বাটীর অবিভক্ত অংশও বুঝায়।

২৪৬ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, যদি আদা-

লতের সন্তোষকররূপে" এমত দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করার চেষ্টা হয়, ঐ ভূমি অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি তাহার দখলে নাই, তবে আদালত ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাসের হুকুম দিবেন।

"স্থাবর সম্পত্তি" শব্দে যদি ভূমির অবিভক্ত অংশ বুঝায়, তাহা হইলে যখন এমত দৃষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রী জারীর প্রার্থনা হয় তাহার দখলে কোন অবিভক্ত অংশ নাই, তখন যে প্রকারে বিভক্ত ও স্বতন্ত্র সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দিতে হয়, সেই প্রকারে ঐ অবিভক্ত অংশও আদালতের খালাস দেওয়া উচিত।

আমাদের নিকট চারিটি প্রশ্ন অর্পিত হইয়াছে, প্রথম প্রশ্ন এই যে, "রামের বিরুদ্ধ এক ডিক্রী জারীতে কতিপয় ভূমিতে রামের অর্দ্ধাংশ ক্রোক হয়। শ্যাম ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৪৬ ধারা মতে এক দরখাস্ত দাখিল করে, এবং তাহাতে স্বীকার করে যে, ঐ সম্পত্তিতে রামের ✓ আনা অংশ আছে, কিন্তু বলে যে, রামের কেবল ৶০ আনা অংশ আছে এবং ।০ আনা তাহার নিজের সম্পত্তি ইহা কি ডিক্রীজারীতে ক্রোককৃত ভূমি সম্বন্ধে ২৪৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত এমত দাবী, যে, তাহা ঐ ধারামতে আদালতের তদন্ত করা উচিত?"

এই প্রশ্ন ক্রোকের হুকুম ও প্রার্থিগণের দরখাস্তের সহিত একত্রে পাঠ করিয়া দেখা যাইতেছে যে, ঐ ।০ আনা অংশ কথিত অর্দ্ধেকের অর্থাৎ রামের যে অর্দ্ধাংশ ক্রোক হয় তাহার ।০ আনা। পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর যে অর্দ্ধাংশ ছিল তাহাই ক্রোক হয়। দাবীদারেরা কহে যে, তাহারাও পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর সহিত এজমালীতে ঐ অর্দ্ধাংশ ক্রয় করে এবং তাহারা ঐ ক্রীত সম্পত্তির ।০ অংশের মালিক।

আমার বিবেচনায়, এই দাবী সম্পত্তি সম্বন্ধে উপস্থিত হয়, এবং যে ॥০ আনা অংশ ডিক্রী জারীতে ক্রোক হয় তাহারই নীলামের প্রতি ২৪৬ ধারামতে আপত্তি উপস্থিত হয়; অতএব ঐ ধারামতে আদালত তদ্বিষয়ের তদন্ত ও নিষ্পত্তি করিতে বাধ্য।

দ্বিতীয় প্রশ্ন যাহা প্রথম প্রশ্ন হইতেই উত্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার স্পষ্ট মত এই যে, পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তীর যে ॥০ আনা অংশ ছিল, তাহার ।০ আনা সম্বন্ধে যদি দাবীদার আপন দাবী সপ্রমাণ করিতে পারে, তবে আদালত ঐ অংশ ক্রোক হইতে খালাস দেওয়ার হুকুম দিতে বাধ্য।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে "রামের বিরুদ্ধ এক ডিক্রী জারীতে, কতিপয় ভূমিতে রামের স্বত্ব, স্বামিত্ব ও অধিকার ক্রোক হয়। শ্যাম ২৪৬ ধারামতে এক দরখাস্ত করে এবং তাহাতে স্বীকার করে যে, ঐ ভূমিতে রামের বিশভাগের এক ভাগ হিস্যা আছে, কিন্তু সে বলে যে, রামের ঐ বিশভাগের এক ভাগের অধিক লওয়ার স্বত্ব নাই; তাহার নিজের অর্থাৎ শ্যামের ঐ ভূমিতে ২০ ভাগের ২ ভাগ হিস্যা আছে। ইহা কি ২৪৬ ধারার মর্ম্মান্তর্গত দাবী যে, তাহা ঐ ধারামতে আদালতের তদন্ত করা উচিত?"

কতিপয় ভূমিতে রামের স্বত্ব, স্বামিত্ব এবং অধিকারের ক্রোকে কি বুঝায়, তাহার উপরেই ঐ প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। কিন্তু আমার বলা আবশ্যক যে, ২১৩ ধারায় কোন ব্যক্তির স্বত্ব, স্বামিত্ব ও অধিকার ক্রোক করার কোন কথা নাই। বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি, অর্থাৎ যে বস্তু তাহার সম্পত্তি, তাহাই ক্রোক হইবে; ঐ বস্তুতে তাহার যে সম্পত্তি আছে তাহা নহে। ডিক্রীদার যত দূর বিশ্বাস করে এবং যত দূর সে নির্ণয় করিতে পারে, তত দূর তাহার ক্রোককৃত সম্পত্তির মধ্যে বিচারাদিষ্ট দায়ীর যে অংশ অথবা স্বত্ব থাকে তাহা ডিক্রীদারের বর্ণনা করিতে হইবে। আমার বোধ হয়, স্বত্ব, স্বামিত্ব এবং অধিকারের ক্রোক ঐ ধারার মর্ম্মান্তর্গত ক্রোক নহে। ইহা একেবারে উৎকৃষ্ট ক্রোক কি না, তাহাই সন্দেহের কথা।

২ য় বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির ৯৭ পৃষ্ঠার আত্মাথাইয়া বনাম বরুণের মোকদ্দমায় * প্রধান বিচারপতি কহিয়াছেন যে, নিত্যকালী দেবী বনাম কৃপানাথ রায়ের মোকদ্দমায় মহালের সমুদায় অথবা তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ ক্রোক হয় নাই, তন্মধ্যে বিচারাদিষ্ট দায়ীর যে কিছু স্বত্ব ও সম্পর্ক ছিল তাহাই ক্রোক হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, "সাধারণ বাক্যে "বিচারাদিষ্ট দায়ীর স্বত্ব ও অধিকার ক্রোক "করিলে ক্রোকই হয় না; ক্রোক করিতে গেলে "কি ক্রোক হইল তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত করিতে "হয়।" তাহার পরে ২১৩ ধারার উল্লেখ করিয়া এবং ক্রোক ও নীলামের প্রভেদ দেখাইয়া প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন যে, "জেলায় "এমন এস্তাহার লটকাইলে হইবে না যে, ঐ "সমগ্র জেলার মধ্যে যে কোন সম্পত্তিতে দায়ীর "যে সকল স্বত্ব ও সম্পর্ক আছে তৎসমুদায়ই "ডিক্রীদার ক্রোক করে।"

এই ক্রোক অবৈধ বলিয়া স্বীকার করিয়া এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, অপর ব্যক্তির বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি ঐ প্রকার ক্রোকভুক্ত হয়, সেই ব্যক্তির তাহা সম্পূর্ণ সম্পত্তির ক্রোক বলিয়া ক্রোককারক ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে আপত্তি করার স্বত্ব আছে কি না? আমি বিবেচনা করি যে, তাহার সেই স্বত্ব আছে। আমার বিবেচনায়, এই ক্রোক প্রতিবাদীর সম্পত্তির ক্রোক বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। অন্য কোন বর্ণনার অভাবে ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে যে, প্রতিবাদী ঐ সমুদায় সম্পত্তির দখীলকার আছে, কারণ, সমুদায় সম্পত্তির ক্রোক ভিন্ন যে আর কিছু মনস্থ ছিল এমত প্রদর্শিত হয় নাই। নিত্যকালী দেবী বনাম কৃপানাথ রায়ের মোকদ্দমায় বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যে রায় ব্যক্ত করেন যে, ক্রোক অবৈধ রূপে হইয়াছে বলিয়া ২৪৬ ধারা মতে তদন্তের আবশ্যক নাই, তাহার সহিত প্রধান বিচারপতি যে আমার উল্লিখিত মোকদ্দমায় ঐক্য হইয়াছিলেন, এমত আমার বিবেচনা হয় না।

অতএব তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলিব যে, মোকদ্দমা যে প্রকার অর্পিত হইয়াছে তাহাতে শ্যাম আদালতে আসিয়া তাহার বিশ অংশের দুই অংশের দাবী করিতে পারে, এবং আদালত সেই দাবীর তদন্ত ও মীমাংসা করিতে বাধ্য।

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, অর্পিত মোকদ্দমায় দাবীদার যদি তাহার বিশ অংশের দুই অংশের দাবী সপ্রমাণ করিতে পারে তবে সে তাহা ক্রোক হইতে খালাস করিয়া লইতে স্বত্ববান। সে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইয়াছে তাহার দখলে ঐ ভূমি না থাকার হেতুতে তাহা নীলাম হওয়ার প্রতি আপত্তি করিতে পারে; এবং সে এই বলিয়া তক করিতে পারে যে, নীলাম হওয়া উচিত নহে, কারণ, ক্রোক অবৈধ এবং তদ্দ্বারা তাহার স্বত্বের হানি হইতে পারে।

এই অর্পণের খরচা দাবীদারের মোকদ্দমার খরচা হইবে। যদি দাবীদারগণ মোকদ্দমায় জয়ী হয়, তবে সে এই বিচারের খরচা পাইবে; যদি তাহারা পরাভূত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক পক্ষ এই বিচারের আপন আপন খরচা বহন করিবে।

**বিচারপতি ফিয়ার আপন রায় ব্যক্ত করিবার পরে প্রধান বিচারপতি বলিলেন যে,**

অর্পিত প্রথম প্রশ্নের উপরে আমার বিজ্ঞবর সহ-বিচারপতি ফিয়ারের রায় সম্বন্ধে আমি বলি যে, দাবী-কৃত ।০ আনার অতিরিক্ত রায়ের কথিত সমুদায় অর্দ্ধাংশ সম্বন্ধে ক্রোক খালাস হইবে কি না, তদ্বিষয়ে এইক্ষণে আমি কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করার প্রয়োজন দেখি না।

* বাং ল্যঃ রিঃ ৪র্থ ভাগ, পূর্ণাধিবেশন, ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বিচারপতি ... —প্রস্তাবিত উত্তরে আমি সম্মত হইলাম।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমি সম্মত হইলাম। ডিক্রীদার যে সম্পত্তি তাহার বিচারাদিষ্ট দায়ীর সম্পত্তি বিবেচনা করে, এবং যাহা সে ক্রোক করিতে ইচ্ছা করে, আমার বিবেচনায়, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২১১ ধারামতে সে তাহার বিশেষ বর্ণনা প্রদান করিতে বাধ্য। অর্থাৎ আমার মত এই যে, ঐ ক্রোক বৈধ হওয়ার জন্য, বিচারাদিষ্ট দায়ীর স্বত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়াও, সম্পত্তির এক বস্তুর স্পষ্ট বর্ণনা আবশ্যক। আমি বিবেচনা করি যে, কোন সম্পত্তিতে বিচারাদিষ্ট দায়ীর কেবল স্বত্ব ও সম্পর্ক ক্রোক করা এবং সে সম্পত্তি ক্রোক করিতে ইচ্ছা হয় তাহার পরিমাণাদি সম্বন্ধে আর অধিক বর্ণনা না করা ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের মর্ম্মান্তর্গত কার্য্য নহে। অবিভক্ত সম্পত্তির স্বত্ব যে ক্রোক করা যাইতে পারে, এ কথায় আমি সম্পূর্ণ সম্মত, এবং আমি বিবেচনা করি যে, এই প্রকার বিষয়ের ক্রোক সমস্তের বিরুদ্ধে সেই ব্যক্তি আপত্তি করিতে পারে, যাহার সেই বিষয়ে অংশ থাকে অথবা ঐ ধারার অবশিষ্ট ভাগের বিধানমতে, ক্রোক-কৃত বিষয় যে প্রকার বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রকারে তাহা নীলাম করার প্রতি আপত্তি করার উৎকৃষ্ট হেতু থাকে।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন যে প্রথম প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন সেই প্রকার ঘটনার ন্যায় ঘটনা সমস্তে প্রার্থীর শুদ্ধ দরখাস্ত দৃষ্টে ইহা বলা দুঃসাধ্য হইতে পারে যে, সম্পত্তির যে অংশে সে কোন প্রকারে স্বত্ববান হয়, ক্রোকের বর্ণিত অংশের নীলামের দ্বারা সেই অংশের প্রতি আক্রমণ হয়; কিন্তু তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, ঐ ক্রোক-কৃত স্বত্বের বলে এক জন ক্রেতাকে কেবল নামমাত্র তাহার শরীক বলিয়া প্রবিষ্ট করান হইলেও সে তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারে। যদি এই হেতুতেই ২৪৬ ধারামতে আপত্তি না করা যাইতে পারে, তাহা হইলে মেং মেরিভিন বিশুদ্ধ রূপেই তর্ক করিয়াছেন যে, এক জন অবিভক্ত শরীক ঐ ধারামতে কার্য্য করিতেই পারে না।

কিন্তু ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, যে সম্পত্তি ক্রোক করা হয়, তাহা বিচারাদিষ্ট দায়ীর দখলে কথিত প্রকারে ছিল কি না, সেই কথা সম্বন্ধে ২৪৬ ধারানুযায়ী আপত্তির দোষগুণের বিচার করিতে হইবে।

এমত অবস্থায়, প্রথম প্রশ্ন সম্বন্ধে আমার উত্তর এই যে, শ্যামের ২৪৬ ধারানুযায়ী আপত্তি করার স্বত্ব আছে, এবং সে যে সকল কথার উপরে নির্ভর করে তাহা যদি সে সপ্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে রামের যথার্থ হিস্যার অতিরিক্ত ভাগ ক্রোক হইতে খালাস হইবে, কারণ, আমার বোধ হয় যে, শ্যামের যদি আপত্তি করার কোন স্বত্ব থাকে, তবে সে তৎসমুদায়ের প্রতি আপত্তি করিতে পারে। বিচারাদিষ্ট দায়ীর সত্বের অতিরিক্ত স্বত্ব যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহাতে যদি এক জন অপর ব্যক্তিকে এক কাল্পনিক স্বত্বের বুনিয়াদে শরীক বলিয়া প্রবিষ্ট করান হয়, তবে শ্যামের বাস্তবিক ক্ষতি হইতে পারে।

৩ য় প্রশ্ন সম্বন্ধে, আমি বিবেচনা করি যে, যদি শ্যাম আপন দাবী সপ্রমাণ করে, তবে সে সমুদায় ক্রোক রহিত করাইতে পারে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—বিচারপতি ফিয়ার যাহা বলিলেন তদ্দৃষ্টে আমার এইক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, শ্যাম তাহার আপত্তি সপ্রমাণ করিলে সে আপনাকে যত দূর ঐ সম্পত্তির দখীলকার দেখাইতে পারে তত দূর পর্য্যন্ত সে ক্রোক খালাস করিয়া লইতে পারে। আমি এইক্ষণে ইহার অতিরিক্ত কোন রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না।

বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন।—দাবীদারগণ যে বিষয়ের প্রার্থনা করিয়াছে কেবল তাহাই তাহারা

পাইতে স্বত্ববান, অর্থাৎ সম্পত্তিতে তাহাদের যে অংশ আছে তাহা ক্রোক হইতে খালাস হইবে, এই কথা ভিন্ন এই সকল মোকদ্দমায় অন্য কোন হুকুম দেওয়া উচিত কি না, তাহার বিচার করা অনাবশ্যক। (গ)

১১ ই মে, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ নাইট ও বিচারপতি এফ, বি, কেম্প ; এল, এস, জ্যাক্সন এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ২১৯৮ নং মোকদ্দমা।

মালদহের মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ১ লা জুনের নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া দিনাজপুরের জজ ১৮৬৯ সালের ৩ রা আগস্ট তারিখে যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

গুণমণি দাসী (প্রতিবাদিনী) আপেলাণ্ট।

প্রাণকিশোরী দাসী (বাদিনী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু মোহিনীমোহন রায় ও রাসবিহারী ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

মেং, আর, ই, টুইডেল ও কালীকৃষ্ণ সেন রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন বিচারাদিষ্ট দায়ী আদালতের বাহিরে তাঁহার ডিক্রীদারকে ডিক্রী পরিশোধার্থে কোন টাকা দেয়, এবং ডিক্রীদার আদালতে তাহার সার্টিফিকেট না দিয়া ডিক্রীজারী করত তাহার ডিক্রীর টাকা পুনর্ব্বার আদায় করিয়া লয়, তবে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারা এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিধান সত্ত্বেও, বিচারাদিষ্ট দায়ী আদালতের বাহিরে প্রথমে যে টাকা দিয়াছিল তাহা সে ডিক্রীদারের নিকট পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য, দেওয়ানী আদালতে স্বাবেস্তা নালিশ করিতে পারে। এরূপ টাকা প্রদান সম্বন্ধীয় বিরোধের মীমাংসা করিতে ডিক্রীজারী-কারক আদালতের ক্ষমতা নাই।

বিচারপতি লক ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়।

বিচারপতি লক।—এক ডিক্রী পরিশোধার্থে প্রতিবাদিনীকে বাদিনী যে নগদ টাকা ও অলঙ্কার দেয়, তাহার মূল্য প্রতিবাদিনী হইতে পাওয়ার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে।

দেখা যায় যে, বাদিনীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনী গুণমণির এক ডিক্রী ছিল, এবং বাদিনী সেই ডিক্রী পরিশোধার্থে প্রতিবাদিনীকে নগদ ও অলঙ্কারে ৯১০৮৬ টাকা দেয় ; কিন্তু তথাপি প্রতিবাদিনী ঐ ডিক্রীজারী করে, এবং বাদিনীর টাকা দেওয়ার জওয়াব অগ্রাহ্য হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পক্ষগণের মধ্যে যে দেওয়ালওয়া হয়, ডিক্রীদার আদালতে তাহার সার্টিফিকেট দাখিল করে না, এবং টাকা পাইয়াও ডিক্রীজারী করে। প্রশ্ন এই যে, এই প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে কি না, এবং ডিক্রীজারী সম্বন্ধে পক্ষগণের মধ্যে এই প্রকারের বিরোধ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারামতে মীমাংসিত হওয়া উচিত কি না।

এ বিষয়ে এই আদালতের পরস্পর অনৈক্য নিষ্পত্তি আছে, অতএব ইহা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করা আবশ্যক। সদরল্যাণ্ডের রিপোর্টে প্রচারিত ছোট আদালতের এস্তমেজাজে, জমীর মণ্ডলের মোকদ্দমায় ১৮৬৪ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বিচারপতি বেলি ও ই, জ্যাক্সন কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হয় যে, এই প্রকার মোকদ্দমা চলিতে পারে না, এবং ডিক্রী পরিশোধার্থে টাকা দেওয়ার যাবতীয় প্রশ্ন ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারামতে, যে আদালত ডিক্রীজারী করেন তাঁহার দ্বারা মীমাংসিত হইবে। সেই বালমের ১২৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত সেই বিচারপতিদ্বয়ের নিষ্পন্ন আর এক মোকদ্দমা যাহাতে আলমগা বিবী বাদিনী ছিলেন তাহাতেও ঐ মত ব্যক্ত আছে। তাঁহাদের রায়ে তাঁহারা

বলেন যে, "এমত স্থলে ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে বিচারাদিষ্ট দায়ীর নালিশের হেতু হইতে পারে, যে স্থলে টাকা দেওয়ার কালে এমন চুক্তি হয় যে, ডিক্রীদার আদালতে তাহার সার্টিফিকেট দিবে; কিন্তু সে প্রবঞ্চকতা করিয়া তাহা দাখিল করে না। কিন্তু এই বিষয়ে আমরা কোন রায় ব্যক্ত করিলাম না, কারণ, তাহা এই মোকদ্দমায় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যদি এই প্রকার কোন স্পষ্ট চুক্তি না থাকে, এবং বিচারাদিষ্ট-দায়ী আইন উল্লঙ্ঘন করত আদালতকে অবগত না করিয়া ডিক্রী পরিশোধ করে, তবে অসৎ ডিক্রীদার দায়ীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করিলে তাহা দায়ীর নিজের দোষেই হইয়াছে বলিতে হইবে। যদি এই প্রকার মোকদ্দমা সমস্ত গৃহীত হয়, তবে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারা অকর্ম্মণ্য হইবে, এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারাও অকর্ম্মণ্য হইবে, কারণ, তাহাতে লেখা আছে যে, ডিক্রী পরিশোধার্থে টাকা দেওয়ার বিরোধ ডিক্রীজারীর আদালত দ্বারা মীমাংসিত হইবে, স্বতন্ত্র নালিশের দ্বারা হইবে না।"

২য় বাল্‌ম ওয়াইম্যানের রিপোর্টের ২১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত সুজন মণ্ডলের মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি জ্যাক্‌সনের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় যে, প্রতিবাদী আদালতে টাকা পাওয়ার কথার সার্টিফিকেট দেওয়ার চুক্তি-ভঙ্গ করাতে, অথবা প্রতারণা পূর্ব্বক ঐ সার্টিফিকেট দাখিল না করিয়া বাদীর বিরুদ্ধে অন্যায় রূপে ডিক্রীজারী করত তাহার সম্পত্তি ক্রোক করাতে, বাদী তাহার বিরুদ্ধে খেসারতের নালিশ করিতে স্বত্ববান। ৯ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ২১০ পৃষ্ঠায় ভগবান তাঁতির মোকদ্দমায় প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি বেলি নির্দ্দেশ করেন যে, এরূপ মোকদ্দমা চলিবে। মান্দ্রাজের হাইকোর্টের এক পূর্ণাধিবেশনের সমক্ষে (২য় বালম মান্দ্রাজ রিপোর্টের ১৮৮ পৃষ্ঠার আয়ানা চিলা পিলাইয়ের মোকদ্দমায়) এই প্রশ্নের বিচার হয়, এবং প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি ইনসের বিরুদ্ধমতে তিন জন বিচারপতি নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ নালিশ চলিতে পারে না। যেহেতু এই বিষয় সম্বন্ধীয় জাবেতা অনির্দ্দিষ্ট, এবং অনৈক্য নজীর আছে এবং ইহা একটি অতি আবশ্যকীয় কথা, অতএব আমরা ইহা পূর্ণাধিবেশনের রায়ের জন্য অর্পণ করিলাম।

যদি কোন ডিক্রীর সমুদায় অথবা কিয়দংশ পরিশোধার্থে টাকা দেওয়া হয়, অথবা বন্দোবস্ত করা হয়, এবং ডিক্রীদার ঐ টাকা প্রদান অথবা বন্দোবস্ত অমান্য করিয়া তাহার সমুদায় ডিক্রীজারী করে, তবে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারার সহিত ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা দৃষ্টে, দায়ী তাহার ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে খেসারতের নালিশ উপস্থিত করিতে পারিবে, কি ঐ টাকা দেওয়ার অথবা বন্দোবস্তের কথা পক্ষগণের মধ্যে ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় প্রশ্নের ন্যায় বিবেচিত হইয়া ডিক্রীজারীকারক আদালত কর্ত্তৃক বিচারিত হইবে, জাবেতা নালিশের দ্বারা হইবে না?

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমার মত এই যে, এই নালিশ দেওয়ানী আদালতে চলিতে পারে। টাকা দেওয়ার কথা আদালতে জানাইবার জন্য প্রতিবাদিনী স্পষ্ট বাক্যে সম্মত হইয়া থাকুক না থাকুক, সেই কথা আমার বিবেচনায়, এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য আবশ্যকীয় নহে। বাদিনীর বাক্য সত্য হইলে, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই মোকদ্দমায় যে টাকার দাবী হইয়াছে তাহা প্রতিবাদিনীর ডিক্রী পরিশোধার্থে বাদিনী দিয়াছিলেন এবং প্রতিবাদিনী সেই টাকা লওয়াতেই তাহার এই করার করা হইয়াছে যে, সে আর ঐ ডিক্রীজারী করিবে না। বাদিনী কহেন যে, প্রতিবাদিনী এই চুক্তি-ভঙ্গ করিয়াছে, এবং যদি এই কথা সত্য হয়, তবে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রতিবাদিনী গুরুতর প্রবঞ্চকতার অপরাধিনী হইয়াছে, কারণ, সেই একরারের বিরুদ্ধে তাহার ডিক্রীজারী করার কোন স্বত্ব ছিল না।

অতএব প্রশ্ন এই যে, বাদিনী উক্ত তঞ্চকতার হেতুতে খেসারত স্বরূপে অথবা অন্য প্রকারে ঐ টাকা ফেরৎ পাইতে পারেন কি না। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, বিরুদ্ধ আইন না থাকিলে এই আদালত একুটী ও বিশুদ্ধজ্ঞানের আদালত স্বরূপে ঐ প্রশ্নের 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন। বাদিনীর নিকট প্রতিবাদিনী ডিক্রী-জারী করিয়া যে টাকা আদায় করিয়া লইয়াছে তদতিরিক্ত তাহার এই টাকা রাখিতে কোন ন্যায্য স্বত্ব নাই; অতএব যে কোন প্রকারে হউক, বাদিনী তাহা ফেরৎ পাইতে পারে। সেই টাকায় প্রতি-বাদিনীর স্বত্ব জন্মিয়া থাকিবে, কিন্তু সে যে সর্ত্তে ঐ টাকা লইয়াছিল তাহা সে ভঙ্গ করিয়াছে; অতএব সে এই প্রকার ঠগাইয়া যে টাকা লইয়াছে, একুটীর আদালত যদি তাহাকে বাদিনীর সেই টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য করেন, তবে সে অথবা পৃথিবীর কোন লোকই কোন আপত্তি করিতে পারে না।

কিন্তু তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারার এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিধানের দ্বারা এই আদা-লতের হস্ত বদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এই দুই ধারার এক ধারায়ও এরূপ তর্কের কোন মুল আমার দৃষ্ট হয় না। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই দুই ধারা কেবল কার্য্য-বিধি নামক আইনের অঙ্গ, এবং ইহা কখনই সম্ভবপর নহে যে, প্রতারণা হইতে আদালতের প্রতিকার প্রদান করার যে ক্ষমতা আছে, ব্যবস্থাপক সমাজ ঐ স্থানে তাহার ব্যাঘাতজনক বিধান করার মনস্থ করিয়াছেন। কিন্তু সে যাহা হউক, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারায় অথবা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারায় এমন কোন বিধান নাই যে, টাকা-গ্রহীতা যে সর্ত্তে টাকা লয় তাহা প্রতিপালন না করিয়া যদি সে তঞ্চকতা করে, তথাপি উপস্থিত স্থলের ন্যায় টাকা প্রদান এককালে নিষ্ফল হইবে এবং তাহা তৎগৃহীতার নিকট পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারায় বলে যে, "ডিক্রীমতে যে সকল টাকা দিতে হয় তাহা "ঐ ডিক্রী যে আদালতের জারী করিতে হয় "সেই আদালতে দাখিল করিতে হইবে; কিন্তু "সেই আদালত কিম্বা ঐ ডিক্রী যে আদালত "প্রদান করিয়াছেন সেই আদালত যদি অন্য-"প্রকার হুকুম করেন তবে সেই হুকুম মতে "কার্য্য হইবে।" কিন্তু তাহাতে এমন কথা নাই যে, আদালতের বাহিরে যে টাকা দেওয়া হয় তাহা এককালে আইন-বিরুদ্ধ ও অনুচিত, কারণ, তাহাতে কেবল এই দণ্ডের বিধান আছে যে, "সমুদায় ডিক্রী কি তাহার কোন অংশের রফা হইলে, যদি আদালতের দ্বারা সেই রফা "না হয়, কিম্বা যাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়াছে "কি ডিক্রী যাহার নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে, "সে যদি ঐ রফা হইবার কথা আদালতে "জ্ঞাত না করে, তবে ঐ আদালত সেই রফা "স্বীকার করিবেন না।" এই অংশে ব্যবহৃত "ঐ আদালত" শব্দে স্পষ্টই এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের লিখিত আদালত অর্থাৎ ডিক্রীজারী-কারক আদালত বুঝায়। ব্যবস্থাপক সমাজ এই ধারা যে স্থানে বসাইয়াছেন তদ্দ্বারাই আমার অর্থের প্রবল পোষকতা হইতেছে। চতুর্থ অধ্যায় যাহাতে কেবল ডিক্রীজারীর বিষয়ই আছে, ইহা তাহারই এক অঙ্গ। অতএব ঐ ধারার অর্থ এই যে, "ডিক্রীজারীকারক আদালত অথবা যে আদালত ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন সেই আদালত অন্য প্রকার হুকুম না করিলে, ডিক্রীজারীকারক আদালতের দ্বারা ভিন্ন, আদালতের ডিক্রীর কোন টাকা পরিশোধ করা দায়ীর উচিত হইবে না; এবং যদি সে তাহা করে, এবং ডিক্রীদার ডিক্রীজারীকারক আদালতের নিকটে তাহা স্বীকার না করে, তবে ঐ আদালত সেই টাকা দেওয়ার কথা গ্রাহ্য করিবেন না।"

বাদিনী ২০৬ ধারার বিধান মতে ব্যবধানের

কার্য্য না করিয়া অদূরদর্শিতার কার্য্য করিয়াছে বটে, কিন্তু সে এই অসাবধানতাহেতু ঐ ধারার লিখিত দণ্ডও পাইয়াছে, কারণ, ডিক্রীজারী-কারক আদালত এই হেতুবাদে তাহাকে ঐ ডিক্রী পরিশোধ করিতে বাধ্য করিয়াছেন যে, সে যে টাকা দেওয়ার কথা উত্থাপন করিয়া জওয়াব দিয়াছে তাহা এমন কার্য্য নহে যাহা আদালত ডিক্রীর বিধিমত পরিশোধ বলিয়া গ্রাহ্য করিতে পারেন।

আইনে যে দণ্ডের বিধান নাই বাদিনীর সেই অতিরিক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে, এই তর্কের অনুকূলে সুবিচারের কোন্ যুক্তি প্রদর্শিত হইতে পারে? বাদিনীর অসাবধানতাহেতু প্রতিবাদিনীর প্রবঞ্চকতার দোষ খণ্ডিত হইতে পারে না, এবং বাদিনীর কথা সত্য বলিয়া অনুমান করিলে, প্রতিবাদিনী এমন অন্যায় করিয়া যে টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে তাহা তাহাকে রাখিতে দেওয়ার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহাকে ঐ টাকা দেওয়া হয়, এবং সেই উদ্দেশ্যেই সে তাহা গ্রহণ করে। তাহার উপরে যে বিশ্বাস ন্যস্ত হইয়াছিল সে তদ্বিরুদ্ধাচরণ করে, কারণ, আদালতে টাকা পাওয়ার কথা জ্ঞাত করার জন্য কোন স্পষ্ট সর্ত্ত থাকুক বা না থাকুক, তাহা আদালতকে জানান তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। আইনের বিধান এই যে, ডিক্রীদার টাকা পাওয়ার কথার সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল করিবে। দায়ীর সার্টিফিকেট কোন ফলদায়ক নহে, অতএব ঐ সার্টিফিকেট দিতে প্রতিবাদিনীই ন্যায্য রূপে বাধ্য ছিল। সে যে সার্টিফিকেট দেয় নাই, ইহা তাহার চালাকী বটে, কিন্তু বাদিনী দুই বার তাহার ডিক্রী পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়া আপন অসাবধানতার দণ্ড পাইয়াছে।

যে আদালতের এই মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে, সেই আদালত ডিক্রীজারী-কারক আদালত নহে, সুতরাং তাহা ২০৬ ধারার লিখিত আদালতও নহে। আদালতের ডিক্রীজারীর সুবিধা করাই ঐ ধারার উদ্দেশ্য; কিন্তু ন্যায়পরতা ও বিশুদ্ধজ্ঞানের যুক্তিমতে প্রতিবাদিনীর যে টাকা হস্তগত করিয়া রাখিবার স্বত্ব নাই, তাহা তাহাকে ফেরৎ দিতে বাধ্য করার জন্য এই আদালতের যে ক্ষমতা আছে তাহার সহিত এই ধারার কোন সম্বন্ধ নাই। এক সময়ে ঐ টাকাতে প্রতিবাদিনীর স্বত্ব থাকিয়া থাকিলেও তাহার প্রতারণার গতিকে সে তাহা হারাইয়াছে, অথবা ক্ষতিপূরণ স্বরূপে সে তত্তুল্য টাকা বাদিনীকে দিতে দায়ী হইয়াছে। যদি এমত নির্দ্দেশ করা হয় যে, ২০৬ ধারার বিধানানুযায়ী ঐ টাকা রাখিতে প্রতিবাদিনীর স্বত্ব জন্মিয়াছে, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, ব্যবস্থাপক-সমাজই প্রবঞ্চকতা করার অনুমতি দিয়াছেন, এবং যে স্থলে ঐ প্রকার অনুমানের যোগ্য কোন কথা নাই, সে স্থলে তাহা অনুমান করা ব্যাখ্যার যাবতীয় নিয়মের বিরুদ্ধ হইবে।

১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা সম্বন্ধে দেখা যাইতেছে যে, "তাহাতে এই লেখা আছে
"যে, ওয়াশীলাতের পরিমাণ, ইত্যাদির বিষয়ে,
"কিম্বা ডিক্রীর পরিশোধে কি ডিক্রীজারী প্রভৃতি
"ক্রমে যে টাকা দেওয়া গেল কথিত হয় তদ্বিষয়ে
"ও যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে সেই মোক-
"দ্দমার বাদি-প্রতিবাদীর মধ্যে ঐ ডিক্রীজারী
"সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে তাহা
"স্বতন্ত্র মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তি না হইয়া ঐ ডিক্রী-
"জারীকারক আদালতের হুকুমমতে নিষ্পত্তি
"হইবে।"

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এই ধারায় লিখিত সকল বিবাদেরই দুই স্পষ্ট লক্ষণ থাকিবে, অর্থাৎ প্রথম লক্ষণ এই যে, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে, সেই মোকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে ঐ বিবাদ উত্থিত হইবে; এবং দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, ঐ বিবাদ ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় বিষয়ে হইবে। যদিও "ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয়" শব্দদ্বয়, "ডিক্রী পরি-

"শোধে কি ডিক্রীজারীক্রমে যে টাকা দেওয়া "গেলে বলিয়া কথিত হয় তৎসম্বন্ধীয় বিবাদ" এই বাক্যের অব্যবহিত পরেই ব্যবহৃত হয় নাই, তথাপি ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধীয়, এবং ডিক্রী পরিশোধার্থে যে সকল টাকা দেওয়া হয় তৎসম্বন্ধীয় বিষয় কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপে উক্ত হইয়াছে। "এবং ঐ ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় 'অন্য' কোন বিষয়ে পক্ষগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে," এই বাক্যে যে "অন্য" শব্দটি আছে তাহাতে স্পষ্ট দেখায় যে, এই ধারাতে যে সকল বিবাদের উল্লেখ হইল তাহা সমভাবের হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার লক্ষণ তাহাদিগের মধ্যে অবশ্য থাকিবে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় আমাদের যে প্রশ্নের বিচার করিতে হইতেছে তাহাতে ঐ দুই লক্ষণের মধ্যে একটির অভাব আছে। ডিক্রীর পক্ষগণের মধ্যেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা সেই ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নহে। ডিক্রী পরিশোধিত হইয়াছে কি না, তাহা আমাদের এই মোকদ্দমায় বিচার করিতে হইবে না; কিন্তু প্রতিবাদিনী যে গুরুতর প্রতারণা করিয়াছে তজ্জন্য, বাদিনীর নিকট সে যে টাকা লইয়াছে তাহা সে ফেরৎ দিতে বাধ্য কি না, ইহাই আমাদের বিচার্য্য। প্রথমোক্ত প্রশ্ন ডিক্রীজারী সম্বন্ধীয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহা নহে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ডিক্রীজারীর আদালতে উত্থিত অথবা মীমাংসিত হইতে পারিত না, কারণ, ডিক্রী পরিশোধিত হইয়াছে কি না, কেবল তাহাই ঐ আদালতের বিচার্য্য ছিল; অতএব যে টাকা দেওয়ার সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল হয় নাই এবং যাহা ২০৬ ধারার বিধান মতে ডিক্রী পরিশোধ স্বরূপ আদালতের দ্বারা স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা ঐ আদালতের তদন্ত করার অধিকার ছিল না। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐ মোকদ্দমায় যে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে তাহা ডিক্রীজারীতে উত্থিত হইতে পারে না, এবং এমত তর্ক করা নিতান্ত অন্যায় যে, বাদিনীর এই নালিশ কোন আদালতেই বিচারিত হইতে পারে না।

যদি ঐ টাকা দেওয়া বৃথা এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে, তবে ঐ টাকার স্বত্ব প্রতিবাদিনীর হস্তে গমন করে নাই, সুতরাং প্রতিবাদিনী তাহা রাখিতে পারে না, কারণ, এই মোকদ্দমায়, ইচ্ছা করিয়া টাকা দেওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, যদি ঐ টাকার স্বত্ব প্রতিবাদিনীর হস্তে গিয়া থাকে, তবে প্রতিবাদিনী যে ব্যক্তিকে ঠকাইয়াছে তাহাকে সে ঐ টাকা ফেরৎ দিতে বাধ্য। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাদিনীর অসাবধানতা দ্বারা প্রতিবাদিনীর তঞ্চকতার দোষ খণ্ডিত হইতে পারে না, এবং উপরে যাহা ব্যক্ত হইল তদ্দ্বারাই যথেষ্টরূপে দেখা যাইতেছে যে, আমাদের সমক্ষে এইক্ষণে যে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিধানমতে ডিক্রীজারীকারক আদালত কর্ত্তৃক মীমাংসিত হইতে পারিত না।

আমার বিজ্ঞবর-সহ-বিচারপতি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মান্দ্রাজ হাইকোর্টের নিষ্পত্তিতে ম্যারিয়ট বনাম হ্যামাটনের মোকদ্দমার উপরে অনেক নির্ভর করা হইয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, তাহাতে কোন তঞ্চকতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত অথবা বিচারিত হয় নাই, এবং আমি আরও দেখিতেছি যে, ঐ নালিশের প্রতি এই বলিয়া আপত্তি হয় যে, আদালতের কার্য্য দ্বারা যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা ফেরৎ পাওয়ার জন্য ঐ নালিশ হইয়াছিল; কিন্তু এই মোকদ্দমায় বাদিনী তঞ্চকতার প্রসঙ্গে নালিশ করিয়াছে; ডিক্রীজারীর সেরেস্তায় যাহা হইয়াছে তাহা অন্যথা করার জন্য বাদিনী নালিশ করে নাই; প্রতিবাদিনী যাহা অন্যায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে তাহাই ফেরৎ দিতে তাহাকে বাধ্য করার নিমিত্ত এই নালিশ হইয়াছে। অপিচ, দেখা যাইতেছে

যে, ম্যারিয়ট বনাম হ্যাম্পটনের মোকদ্দমায় নালিশ উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে টাকা দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রতিবাদী আপন জওয়াবে ঐ টাকা দেওয়ার কথা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য ছিল। এই মোকদ্দমায় ডিক্রীর পরে টাকা দেওয়া হইয়াছে, এবং ঐ টাকা দেওয়ার প্রশ্ন ডিক্রীজারীর আদালতে উত্থিত হইলেও ঐ আদালত তাহার বিচার করিতে পারিতেন না, কারণ, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারা দ্বারা তাঁহার হস্ত বদ্ধ

এমত অবস্থায় টাকা আত্মসাৎ করা হইলে তাহা যে আইন-সঙ্গত উপার্জ্জন বলা যাইতে পারে, এমন কোন ন্যায়ানুগত যুক্তি আমি অবগত নহি; অতএব এই মোকদ্দমার সহিত ম্যারিয়ট বনাম হ্যাম্পটনের মোকদ্দমার স্পষ্ট প্রভেদ আছে।

কিন্তু যেহেতু এই বিষয়ে নজীরের অনৈক্যতা আছে, অতএব ইহা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিতে আমি আমার সহ-বিচারপতির সহিত সম্মত হইলাম।

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

প্রধান বিচারপতি কাউচ্।—বাদিনী আপন আরজীতে যে মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছে তাহা এই যে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদিনীর এক ডিক্রী ছিল, এবং বাদিনী সেই ডিক্রীর বাবতে নগদ ও অলঙ্কারে প্রতিবাদিনীকে ৯৩০৸১০ টাকা দিয়া ঐ ডিক্রীর অন্তর্গত দাবী রফা করে; এই টাকা প্রদানের ও রফার সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল না হওয়ায়, প্রতিবাদিনী পশ্চাতে ঐ ডিক্রীজারী করত বাদিনীকে ডিক্রীর টাকা দিতে বাধ্য করে; অতএব বাদিনী ঐ ডিক্রী রফা করার জন্য প্রথমে যে টাকা দিয়াছিল, তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য এই নালিশ করিয়াছে। প্রতিবাদিনী ডিক্রীজারী করিয়া যে টাকা লইয়াছে ও পূর্ব্বে বাদিনীর রফা সূত্রে যে টাকা পাইয়াছে, এ উভয় টাকাই প্রতিবাদিনীকে রাখিতে দিলে যারপর নাই অন্যায় হইবে। আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের এমত সিদ্ধান্ত করার হেতু আছে যে, প্রতিবাদিনীকে ঐ টাকা রাখিতে দেওয়া উচিত নহে, এবং প্রতিবাদিনী তাহা বাদিনীকে ফেরৎ দিতে বাধ্য।

২০৬ ধারা মতে, আদালতের বাহিরে যে রফা অথবা বন্দোবস্ত এবং টাকা দেওয়া হইয়াছিল, প্রতিবাদিনী-ডিক্রীদার আদালতে তাহার সার্টিফিকেট প্রদান না করিলে আদালত কর্ত্তৃক তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। বাদিনী যে টাকা দিয়াছে, তাহা আদালতে তাহার জানাইবার অথবা সার্টিফিকেট দাখিল করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না। আমার বোধ হয় যে, আদালতে ঐ কথার সার্টিফিকেট দাখিল করা প্রতিবাদিনীরই কর্ত্তব্য ছিল, এবং প্রতিবাদিনী যদি তাহা না করিয়া থাকে, এবং সার্টিফিকেট দাখিল না হওয়ার উপলক্ষে পশ্চাতে ডিক্রীজারী করত বাদিনীকে সমুদায় টাকা দিতে বাধ্য করিয়া থাকে, তবে বাদিনী পূর্ব্বে যে টাকা দিয়াছিল, যাহা প্রতিবাদিনী ডিক্রী পরিশোধার্থে লয় নাই এবং যাহা বাস্তবিক প্রতিবাদিনী আদালতে সার্টিফিকেট দাখিল না করায় ডিক্রী পরিশোধার্থে প্রয়োগ হইতেও পারিত না, প্রতিবাদিনীকে ঐ টাকার ট্রষ্টী অর্থাৎ জেম্মাদার জ্ঞান করিতে হইবে। অতএব আমার বিবেচনায়, বাদিনীর জেম্মাদার স্বরূপে প্রতিবাদিনীর হস্তে এই টাকা ছিল, এবং প্রতিবাদিনী ন্যায়ানুসারে তাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য। ডিক্রী পোরিশোধার্থে যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল তাহা সেই কার্য্যে প্রয়োগ না করিয়া প্রকাশ্য বা আনুমানিক চুক্তি-ভঙ্গ করার ক্ষতির হেতুতে অথবা প্রবঞ্চকতা পূর্ব্বক সার্টিফিকেট দাখিল না করার হেতুর উপরে এই দাবী সংস্থাপন করা অপেক্ষায় উল্লিখিত জেম্মার প্রসঙ্গের উপরে স্থাপন করাই আমি অধিক মনোনীত করি, কারণ, প্রথমে প্রবঞ্চকতার ভাব না থাকিয়া থাকিতে পারে, এবং প্রতিবাদিনী কেবল ঐ টাকা দেওয়ার এবং রফা

হওয়ার কথা আদালতকে জ্ঞাত করে নাই বলিয়াই তঞ্চকতার অনুমানের উদ্ভব হইতে পারে না। প্রতিবাদিনী আলস্য করিয়া, ঐ ত্রুটি করিয়া থাকিতে পারে, এবং যে ডিক্রী আদালতের বাহিরে বাস্তবিক রফা ও পরিশোধিত হইয়াছিল তাহা, সার্টিফিকেট দাখিল না হওয়ার উপলক্ষে পশ্চাতে জারী করিয়া লওয়া তঞ্চকতা হইতে পারে।

১৮৭১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারায় এমন কিছু নাই যদ্দৃষ্টে এই নালিশ উপস্থিত করা যাইতে পারে না। ঐ ধারায় বলে যে, ডিক্রীর পরিশোধে বা ডিক্রীজারী প্রভৃতি ক্রমে যে টাকা দেওয়া গেল বলিয়া কথিত হয়, তদ্বিষয়ে, এবং যে মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রদত্ত হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার পক্ষগণের মধ্যে ঐ ডিক্রীজারী সম্পর্কীয় অন্য কোন বিষয়ে বিবাদ হইলে, তাহা ডিক্রীজারীকারক আদালতের হুকুমের দ্বারা মীমাংসিত হইবে, স্বতন্ত্র নালিশের দ্বারা হইবে না; কিন্তু যে সকল টাকা আদালতের দ্বারা পরিশোধিত হয় নাই, অথবা যাহার সম্বন্ধে আদালতে সার্টিফিকেট দাখিল হয় নাই তাহা গ্রাহ্য করিতে আদালতের উপরে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারায় নিষেধ আছে; এবং ২০৬ ধারামতে আদালতের প্রতি যে সকল টাকা দেওয়ার কথা গ্রাহ্য করিতে নিষেধ আছে তৎসম্বন্ধীয় বিরোধ সমস্ত ডিক্রীজারীকারক আদালতকে শ্রবণ অথবা মীমাংসা করিতে বাধ্য না করাই ব্যবস্থাপক সমাজের মনস্থ ছিল। আমি বিবেচনা করি যে, কেবল এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াই এই দুই ধারা ঐক্য করা যাইতে পারে যে, আদালতের বাহিরে যে টাকা পরিশোধ করা হয় এবং যাহার সার্টিফিকেট আদালতে দাখিল হয় না এবং আদালত যাহা গ্রাহ্য করিতেও পারেন না, তৎসম্বন্ধে ১১ ধারা খাটে না। অতএব আমার মতে ১৮৭১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার বিধানাভাবেও ঐ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ঐ নালিশ চলিতে পারে। ইহা ন্যায়পরতার যুক্তি অনুসারে চলিতে পারে, এবং বাদীর তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া উচিত।

মান্দ্রাজ হাইকোর্টের মোকদ্দমা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, বিচারপতি হলওয়ে যাঁহার মত আমি অত্যন্ত সম্মান করি, তিনি বোধ হয় ঐ নালিশ রফা দ্বারা প্রদত্ত টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার নালিশ স্বরূপ বিবেচনা না করিয়া, ডিক্রীজারীতে যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার নালিশ স্বরূপে বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমার বিবেচনায়, উপস্থিত নালিশ সেই ভাবের নালিশ নহে। প্রথমে যে টাকা দেওয়া হয় এবং প্রতিবাদিনীকে বাদিনীর পক্ষে যে টাকার জেম্মাদার বিবেচনা করিতে হইবে এবং কাজে কাজে প্রতিবাদিনী যাহা ফেরৎ দিতে বাধ্য, তাহাই পুনঃপ্রাপ্ত হইবার জন্য এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হইবে।

আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস্ হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—আমি এই রায়ে সম্মত হইলাম।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমারও ঐ মত। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের উল্লিখিত মোকদ্দমা যে আকারে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা দৃষ্টি করিলেই ঐ আদালতের অধিকাংশ বিচারপতির রায় বুঝা যাইতে পারে।

আমাদের মতে, বাবু মোহিনীমোহন রায় যে রূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা যদি আমরা অবলম্বন করিতে বাধ্য হই, তবে আমাদের অতি গুরুতর তঞ্চকতা ও অবিচারের সহায়তা করা হইবে, কারণ, ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, এ দেশে, বিশেষতঃ, নির্ধনী অর্থি-প্রত্যর্থিগণের মধ্যে আদালতের বাহিরে ডিক্রী পরিশোধের বন্দোবস্ত করার সচরাচর প্রথা আছে, এবং অসংখ্য স্থলে টাকা দেওয়ার [illegible] আদালতে দাখিল না করাইয়া তাহারা ঐ প্রকার পরিশোধ করে। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, আদালতের বাহিরে যে

টাকা পরিশোধিত হয়, তাহা ব্যবস্থাপক সমাজ আদালত সমস্তকে গ্রাহ্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু আমি বিবেচনা করি, যে সকল বিচারাদিষ্টদায়ী ডিক্রীদারের উপরে বিশ্বাস করিয়া আদালতের বাহিরে ঐ প্রকার টাকা দেয়, ব্যবস্থাপক সমাজ তাহাদের জন্য ঐ চরম শাস্তির বিধান করিয়াছেন; কিন্তু ঐ রূপ পরিশোধিত টাকা সম্বন্ধে যে তাহারা অন্য প্রকার প্রতিকার হইতেও বঞ্চিত হইবে, এমত তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল না। ডিক্রীদারেরা যে সকল ব্যক্তিকে এই প্রকারে ঠকায়, তাহারা যে তাহাদের টাকা স্বতন্ত্র নালিশের দ্বারা পুনঃপ্রাপ্ত হইবে না, এমন কোন বিধান নাই। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা এবং ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২০৬ ধারা এক কার্য্যবিধিরই অঙ্গ বিধায় পরস্পর ঐক্য করিয়া পঠিত হওয়া উচিত; এবং ব্যবস্থাপক সমাজ আদালতের বাহিরে প্রদত্ত টাকার কথা আদালত সমস্তকে গ্রাহ্য করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়াতেই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা ডিক্রী জারীকারক আদালতের হস্তে তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্নের চূড়ান্ত বিচারের ভার রাখেন নাই; দেওয়ানী নালিশের দ্বারাই তাহা বিচারিত হওয়ার জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। অর্পণের হুকুমেই আমি আমার রায়ের হেতু সমস্ত ব্যক্ত করিয়াছি। (গ)

---

১১ ই মে, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট ও বিচারপতি এফ, বি, কেম্প ; এল, এস জ্যাক্সন এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ৪৬৮ নং মোকদ্দমা।

পশ্চিম বর্দ্ধমানের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ২৬ এ জুনের নিষ্পত্তি স্থির রাখিয়া তত্রত্য জজ ১৮৬৯ সালের ৩১ এ জুলাই তারিখে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে মোৎফরকা আপীল।

মহারাজাধিরাজ মাহতাবচাঁদ রায় বাহাদুর (বিচারাদিষ্ট দায়ী) আপেলাণ্ট।

বেচারাম হাজরা (ডিক্রীদার) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রমাধব ঘোষ আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু রাসবিহারী ঘোষ রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—ডিক্রী জারীতে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি হইয়া তাহার খরচা দেওয়ার হুকুম হইলে, ঐ খরচা পাওয়ার প্রার্থনা করিবার মিয়াদ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২২ ধারার মর্ম্মান্তর্গত নহে, ২০ ধারার অন্তর্গত।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন ও মার্কবির নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয় ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্সন।—৯ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪৫৮ পৃষ্ঠার ও ১১ শ বালমের ৯৮ ও ১১৭ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় এই আদালতের কয়েক খণ্ডাধিবেশনের রায়ের পরস্পর অনৈক্যতা থাকায় এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনের মতের নিমিত্ত অর্পণ করা আবশ্যক। প্রশ্ন এই যে, ডিক্রীজারীতে আদালতের দ্বারা মীমাংসিত এক বিরোধ সম্বন্ধে খরচা দেওয়ার যে হুকুম হয়, তাহা পরিচালনের প্রার্থনা ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২২ ধারা কিম্বা ২০ ধারার অন্তর্গত হইবে ?

পূর্ণাধিবেশনের রায় ঃ—

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—এই হুকুম ২২ ধারার মর্ম্মান্তর্গত, এবং প্রার্থী কেবল তাহা এক বৎসরের মধ্যে পরিচালন করিতে পারে, এমত নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে আমাদের যথেষ্ট রূপে স্থির করিতে হইবে যে, ইহা "সরাসরী" শব্দের মর্ম্মান্তর্গত। ঐ শব্দের কি অর্থে তাহা রক্ষা, অথবা সকল স্থলে খাটান যাইতে পারে ঐ শব্দের

এমত এক ব্যাখ্যা করা সুকঠিন। অনেক ঘটনায় মোকদ্দমার কার্য্য নিঃসন্দেহই সরাসরী হয়। ছয় মাসের মধ্যে বেদখলের নালিশ সরাসরী কার্য্য, অর্থাৎ সেই সরাসরী মোকদ্দমার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল চলে না, কিন্তু পশ্চাতে জাবেতা নালিশের দ্বারা তৎপ্রতি আপত্তি করা যাইতে পারে। সরাসরী কার্য্যের কি ভাব, তাহা উহার দ্বারাই প্রদর্শিত। সরাসরী মোকদ্দমা তাহাকেই বলে, যাহা আদালত শ্রবণ করিয়া বিরোধের মীমাংসা করেন, কিন্তু পক্ষগণের মধ্যে সেই মীমাংসা চূড়ান্ত হয় না, অর্থাৎ যে স্থলে তৎক্ষণাৎ কোন নিষ্পত্তি না করিলে কোন অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই স্থলে সেই অনিষ্ট নিবারণার্থে আদালত তৎকালের জন্য বিরোধীয় বিষয়ের যে নিষ্পত্তি করেন, তাহাই সরাসরী নিষ্পত্তি।

সরাসরী মোকদ্দমা তাহাকেও বলা যাইতে পারে, যাহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল নাই, এবং যে আদালত তাহা শ্রবণ ও নিষ্পত্তি করেন, তাঁহার নিষ্পত্তিই ঐ বিষয় সম্বন্ধে চূড়ান্ত হয়। আমার বিবেচনায়, উপস্থিত মোকদ্দমায় এমত বলা দুঃসাধ্য যে, বিরোধীয় হুকুম ২২ ধারার মর্ম্মান্তর্গত সরাসরী হুকুম। এক মোকদ্দমার ডিক্রীজারীতে আদালতের যে বিচারাধিকার ছিল, তাহা পরিচালনে সেই আদালত কর্তৃক এই হুকুম প্রদত্ত হয়, অর্থাৎ ঐ হুকুমের দ্বারা এই ব্যক্ত হয় যে, বিচারাদিষ্ট দায়ীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী হইতে পারে না, কারণ, তাহা তমাদীর আইনের দ্বারা বারিত হইয়াছে, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ী এই রূপ জয়ী হইয়া খরচার হুকুম পায়। আমাদের বিবেচনায়, ঐ খরচার হুকুম ২২ ধারার মর্ম্মান্তর্গত সরাসরী নিষ্পত্তি অথবা ফৈয়সলা বলা যাইতে পারে না। ইহা ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত হুকুম।

আমি বিবেচনা করি, উল্লিখিত নজীর সমস্ত বিশেষরূপে দেখিলে পরস্পর অনৈক্য বোধ হয় না। আমরা বিবেচনা করি যে, ৯ম ও ১১ শ বালম উইকলি রিপোর্টরের দুই নিষ্পত্তিই বিশুদ্ধ এবং আমাদের তাহার অনুসরণ করা উচিত।

আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে। (গ)

১৬ ই মে, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট ও বিচারপতি এফ বি কেম্প; এল এস জ্যাক্‌সন; জে বি ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৯ সালের ১২৩১ নং মোকদ্দমা।

বাকরগঞ্জের অধঃস্থ জজের ১৮৬৭ সালের ২৬ এ জুলাই তারিখের নিষ্পত্তি রূপান্তর করিয়া তত্রত্য প্রতিনিধি অতিরিক্ত জজ ১৮৬৯ সালের ৬ ই মার্চে যে হুকুম দেন, তদ্বিরুদ্ধে খাস আপীল।

অভয়চন্দ্র রায়চৌধুরী (প্রতিবাদী) আপেলাণ্ট।

প্যারীমোহন গুহ (বাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস ও গিরিজাশঙ্কর মজুমদার রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—এজমালী হিন্দুপরিবারস্থ যে ব্যক্তির উপরে ঐ পরিবারের এজমালী সম্পত্তির কর্তৃত্ব ভার থাকে, তাহার বিরুদ্ধে ঐ পরিবারস্থ অপর শরীকগণ নিকাশের দাবীতে নালিশ করিতে পারে, এবং যে কালের নিকাশের দাবী হয়, তখন ঐ অপর শরীকগণ নাবালগ থাকিয়া থাকিলেও ঐ রূপ নালিশ করিতে মঞ্জুরবান্।

বিচারপতি লক ও দ্বারকানাথ মিত্রের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—এই খাস আপীলে যে প্রথম তর্ক উত্থাপিত হইয়াছে, তাহা

এই যে, এজমালী হিন্দুপরিবারের কর্ত্তার বিরুদ্ধে ঐ পরিবারস্থ অন্য ব্যক্তিরা নিকাশের দাবীতে নালিশ করিতে পারে না। আমার মতে এই তর্ক অবৈধ। ইহা সত্য বটে যে, সচরাচর বখরাদারী কার্য্যের কর্ম্মাধ্যক্ষের অবস্থার সহিত এজমালী হিন্দুপরিবারের কর্ত্তার অবস্থার প্রভেদ আছে। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির যে কোন দায় নাই, এমত নহে। যৌত পরিবারের উপকারার্থে ঐ কর্ত্তা প্রকৃতপ্রস্তাবে যে টাকা ব্যয় করেন, তিনি তাঁহার শরীকের নিকট তাহার দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারেন, কিন্তু তিনি যে টাকার অপব্যবহার করেন, অথবা পরিবারের স্বার্থহীন অন্য বিষয়ে ব্যয় করেন, তাহার জন্য তাহাদের অংশের পরিমাণে তিনি নিঃসন্দেহই দায়ী। পরিবারের কোন এক শরীকের অন্য শরীক অপেক্ষা অধিক খরচার আবশ্যক থাকিলে অথবা অধিক পোষ্য থাকিলে তাহাদের ভরণপোষণার্থে যে টাকা ব্যয় করিতে হয়, তজ্জন্য সে তাহার শরীকগণের নিকট অবশ্যই দায়ী হইতে পারে না, কিন্তু তাহা শুদ্ধ এই কারণে হয় না যে, ঐ সকল ব্যয় সমুদায় পরিবারের ন্যায্য ব্যয় বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা, যৌত হিন্দুপরিবারের এক ব্যক্তির হয়ত অন্য অপেক্ষা অনেক গুলি কন্যার বিবাহ দিতে হয়। যে পর্য্যন্ত পরিবার যৌত থাকে, সে পর্য্যন্ত যোগ্যপাত্রে প্রত্যেক কন্যার বিবাহ দেওয়া সমুদায় পরিবারেরই কর্ত্তব্যকর্ম্ম, এবং এই সকল বিবাহের ব্যয়, সকলের আপন আপন স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না করিয়াই বহন করিতে হয়। কিন্তু বখরাদারী কার্য্যের নিয়ম স্বতন্ত্র, কারণ, তাহাতে প্রত্যেক বখরাদার তাহার আপন আইন-সঙ্গত হিস্যার অতিরিক্ত যাহা কিছু ব্যয় করে, তাহার প্রত্যেক পয়সার জন্য সে তাহার শরীকগণের নিকট দায়ী হয়। কিন্তু যদিও ইহার দ্বারা কেবল নিকাশ লওয়ার প্রণালী সম্বন্ধে ঐ দুই স্থলের প্রভেদ হইতে পারে, তথাপি এমন বলা যাইতে পারে না যে, যৌত হিন্দুপরিবারের শরীকেরা যদি তাহাদের কর্ত্তার নিকট তাঁহার কার্য্যের নিকাশ চাহে, তবে তিনি তাহা দিতে বাধ্য নহেন।

মনে কর, যৌত পরিবারের এক জন শরীক পৃথক্ হওয়ার মানসে তাহার কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তৃত্বের কালে পরিবারের আয়ের কত টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। যদি কর্ত্তা এমন কথা বলেন যে, কিছু সঞ্চয় হয় নাই এবং আয়ব্যয় যাহা সম্পূর্ণ তাঁহার অধীনে ছিল তাঁহার হিসাব দিতে অস্বীকার করেন, তবে যে ব্যক্তি পৃথক্ হইতে ইচ্ছা করে, সে কি প্রকারে জানিবে যে, বিভাগের জন্য বাস্তবিক কত টাকা আছে? এবং কোন্ আইন ও যুক্তি অনুসারে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সে কর্ত্তার কথাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে? যেপর্য্যন্ত যৌত পরিবারের মধ্যে শান্তি ও একতা থাকে, সে পর্য্যন্ত কর্ত্তার উপরে যে কত দূর বিশ্বাস থাকে তাহা যাঁহারা যৌত পরিবারের কথা কার্য্যতঃ অবগত আছেন, তাঁহারাই জানেন, এবং যদি খাস আপেলাণ্টের উকীলের তর্কই বিশুদ্ধ হয়, তবে আমি এই পর্য্যন্তও বলিতে পারি যে, যত শীঘ্র এরূপ পরিবারের এই প্রকার যৌত অবস্থা বিলুপ্ত হয়, ততই ভাল।

পরিবারের উপকারার্থে যে ব্যয় আবশ্যক, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যয়ের দায় হইতে যৌত হিন্দু পরিবারের কর্ত্তা যে, মুক্ত হইতে পারেন না, তাহা কোলব্রুকের সারসংগ্রহের ৪র্থ বালমের ৯১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত কাত্যায়নের নিম্নলিখিত বচনেই স্পষ্ট প্রকাশ:—

"এক ব্যক্তির ধর্ম্মানুষ্ঠানে যাহা প্রদত্ত হয়,
"এবং সে বন্ধুভাবে যে দান করে, অথবা
"নিজের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা প্রকাশ
"হইলে তাহার অংশভুক্ত হইবে, কারণ,
"পৈতৃক সম্পত্তির এক জন শরীক তাহার নিজের
"কার্য্যে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না।"

অনন্তর ঐ গ্রন্থের ৩য় বালমের ৯৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্তা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন লিখিয়াছেন এবং তিনি বলেন যে, রঘুনন্দনের দ্বারাও ইহা অনুমোদিত হইয়াছে, যথা—

"বিত্ত গোপন করার সন্দেহের কারণ প্রদ-
"র্শিত হইলেই পরীক্ষা করিতে হইবে। যেমন
"আয় অধিক ও ব্যয় অল্প, কিন্তু যে ব্যক্তি
"আয়-ব্যয়ের তত্ত্বাবধারণ করে, সে সন্তোষ-
"কর রূপে তাহার হিসাব দেয় না।"

যৌত হিন্দুপরিবারের শরীকগণের নিকট ঐ পরিবারের কর্তার যে নিকাশ দেওয়ার দায় আছে, তাহা শেষোক্ত বাক্যেই প্রদর্শিত। খাস আপেলাণ্টের উকীল দুই নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি ৯ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় এবং দ্বিতীয় নজীর ১ম বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের আদিম বিভাগের নিষ্পত্তির ১ম পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে। এই দুই নজীরের প্রথম নজীর সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, তাহা ঠিক উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটে না। যে বিজ্ঞবর বিচারপতিদ্বয়ের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাঁহারা যৌত হিন্দুপরিবারের অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্ত শরীক সম্বন্ধে কর্তার যে অবস্থা, তাহার উপরে অধিক নির্ভর করিয়াছেন। এবং যদিও আমি এমত নির্দ্দেশ করিতে পারি না যে, যৌত হিন্দুপরিবারের কর্তা কোন কমিটির সভাপতির সদৃশ, তথাপি আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, সেই মোকদ্দমায় কর্তার হস্তে যে পরিবারের সম্পত্তির সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধারণের ভার ছিল এমত সপ্রমাণ হয় নাই। দ্বিতীয় নজীর আপেলাণ্টের মোকদ্দমার পোষক বটে; কিন্তু যে বিজ্ঞবর বিচারপতি সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাঁহার প্রতি যথেষ্ট সম্মান সহকারে আমি ইহা বলিতে বাধ্য যে, আমি তাঁহার রায়ে সম্মত হইতে পারি না; অতএব আমি নিম্নলিখিত প্রশ্নদ্বয় এই আদালতের পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করিলাম, যথা:—

১ম। যৌত হিন্দুপরিবারের কর্তার বিরুদ্ধে ঐ পরিবারস্থ অন্য শরীকেরা নিকাশের দাবীতে নালিশ করিতে পারে কি না?

২য়। যে সকল ব্যক্তি নিকাশ চাহে তাহারা, যে কালের নিকাশের দাবী করা হয় সেই সময়ে নাবালগ থাকিয়া থাকিলেও ঐ প্রকার নালিশ চলিতে পারে কি না?

বিচারপতি লক।—আমি সম্মত হইলাম।

পূর্ণাধিবেশনের রায়:—

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—এই মোকদ্দমায় প্রথম প্রশ্ন এই যে, যৌত হিন্দুপরিবারস্থ যে শরীক ঐ পরিবারের কর্তৃত্ব করে, তাহার বিরুদ্ধে অন্য শরীকেরা নিকাশের দাবীতে নালিশ করিতে পারে কি না? যৌত হিন্দুপরিবারের সম্পত্তি ব্যয় করার জন্য ঐ পরিবারের কর্তার প্রতি আইনের দ্বারা অথবা পরিবারস্থ অন্যান্য শরীকের সম্মতির দ্বারা যে ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, সেই ক্ষমতানুযায়ী ব্যয়ের অধীনে পরিবারস্থ সকল শরীকই পরিবারের সম্পত্তিতে স্বত্ত্ববান। এই সকল ক্ষমতা পরিচালনের অধীনে এবং ঐ ক্ষমতা পরিচালনে পরিবারের সম্পত্তির যে কোন ভাগ ব্যয় হয় তাহার অধীনে, পরিবারের অন্যান্য শরীকের স্পষ্টই সেই সম্পত্তিতে স্বার্থ থাকে। আমার বিবেচনায়, ঐ কর্তাকে অন্যান্য শরীকের এজেন্ট বিবেচনা করিয়া তাহার উপরে তাঁহার নিকট নিকাশ চাহিবার স্বত্বের যুক্তি নির্ভর করে না। যৌত হিন্দুপরিবারের সম্পত্তির অংশে ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের যে স্বত্ত্ব আছে তাহার উপরেই ঐ যুক্তি নির্ভর করে, এবং যে স্থলে সম্পত্তির উপরে যৌত স্বার্থ থাকে এবং কেবল এক ব্যক্তি সমুদায় আয় লয়, সে স্থলে সেই ব্যক্তির যে সকল ব্যয় করার স্বত্ব থাকে, তাহা বাদ দিয়া, প্রত্যেক শরীককে তাহার আপন লভ্যের নিকাশ দিতে সেই ব্যক্তি বাধ্য। ইহাই আমার বিবেচনায়, বিশুদ্ধ যুক্তি, এবং এই যুক্তি অনুসারেই যৌত

প্রজা সম্বন্ধে (কেবল বখ্‌রাদার সম্বন্ধে নহে) ইংলণ্ডীয় একুটির আদালতসমস্ত কার্য্য করেন।

বিচারপতি মার্কবির নিষ্পত্তির প্রতি যথোচিত সম্মান সহকারে আমি বিবেচনা করি যে, তিনি ঐ স্বত্ব অতি সঙ্কুচিত হেতুর উপরে স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাহা যে হেতুর উপরে নির্ভর, তাহার ঠিক বিশুদ্ধভাব পরিগ্রহ করেন নাই। ইহাও দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার রায় যাহা এই প্রকার নিকাশের দাবীতে নালিশ করার স্বত্বের বিরুদ্ধ, তাহা তাঁহার সম্মুখস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ব্যক্ত করা আবশ্যকীয় ছিল না, অতএব তাহা মোকদ্দমার-বহির্ভূত রায়, কারণ, তিনি ঐ মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে নিকাশের দাবীর ডিক্রী দিয়াছেন। অতএব ঐ রায় সেই মোকদ্দমায় বিচার্য্য প্রশ্নের নিষ্পত্তি হইলে যেরূপ প্রবল হইত, তদ্রূপ এ স্থলে হইতে পারে না।

দ্বিতীয় নজীরের রায় সম্বন্ধে আমার বোধ হয় যে, তাহা নিকাশের জন্য নালিশ উপস্থিত করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধ নহে। ঐ মোকদ্দমার রায়ে বিচারপতি ফিয়ারের কি মনস্থ ছিল তাহা তিনিই উত্তম রূপে বলিতে পারেন; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, তিনি এমন বিধি স্থাপন করেন নাই যে, যৌত হিন্দু-পরিবারের কর্ত্তার বিরুদ্ধে নিকাশের জন্য নালিশ চলিতে পারে না। অতএব আমি বিবেচনা করি যে, একুটির আদালত সমস্ত এই প্রকার মোকদ্দমায় যে যুক্তি অনুসারে কার্য্য করেন এবং যে যুক্তির উপরেই নিকাশ লওয়ার স্বত্ব নির্ভর করে, তাহা দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, এই মোকদ্দমাও তদন্তর্গত। এবং যে স্থলে আমি দেখিতেছি যে, বহুকাল পর্য্যন্ত এই সকল নালিশ চলিতে দেওয়ার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, সে স্থলে আমি এমন নির্দ্দেশ করিতে পারি না যে, এই প্রকার নালিশ উপস্থিত হইতে পারে না, অথবা এমন সিদ্ধান্তও করিতে পারি না যে, তাহা হইলে হিন্দু-পরিবারের যৌত অবস্থা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ন্যায় ও বিশুদ্ধজ্ঞানের যুক্তি অনুসারে যৌত হিন্দু পরিবারের কর্ত্তার আপন কর্তৃত্বের কালের নিকাশ দিতে হইলে, অথবা তিনি নিকাশ দিতে অস্বীকার করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে নালিশ চলিলেই যে, যৌত হিন্দু-পরিবারের প্রথা কি রূপে বিলুপ্ত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। অতএব আমি প্রথম প্রশ্নের 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিব, এবং তাহা হইলে দ্বিতীয় প্রশ্নেরও ঐ প্রকার উত্তর হইবে। এতৎসম্বন্ধে বিচারপতি ফিয়ারের রায় অবিকল খাটে, অর্থাৎ, নাবালগের স্থলেও নিকাশের জন্য নালিশ চলিতে পারে। তিনি তাঁহার রায়ে স্পষ্টাক্ষরে এ রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন; এবং বিচারপতি মার্কবির তদ্বিরুদ্ধ মত কেবল বিচার-বহির্ভূত এক রায় মাত্র। তাহা সম্মান্য বটে, এবং সেই কারণেই এই মোকদ্দমা অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য ঐ রায় আবশ্যকীয় হইলে যত বলবৎ হইত, তাহা এইক্ষণে সে রূপ নহে।

এই সকল উত্তরের সহিত এই মোকদ্দমা আপীলের অন্যান্য প্রশ্নের বিচারার্থে অর্পণকারক খণ্ডাধিবেশনে পুনঃপ্রেরিত হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—আমি এই রায়ে সম্মত হইলাম।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমারও ঐ মত।

বিচারপতি ফিয়ার।—যেহেতু আমার যে রায় ৯ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৪৮৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হয় তাহা এই অর্পণের এক কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, অতএব আমি তাহা বুঝাইবার জন্য কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমি ইহা বলিতেছি যে, প্রধান বিচারপতি এই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিতে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। আমি অদ্য আদালতে আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার মনে কখনই এমত ভাব ছিল না যে, উল্লিখিত মোকদ্দমায় আমি যে রায় ব্যক্ত করি-

য়াছি তাহাতে যৌত হিন্দুপরিবারের কর্ত্তার বিরুদ্ধে নিকাশের দাবীতে নালিশ চলিবে না, ইহাই আমার মত বলিয়া বিবেচিত হইবে। সেই মোকদ্দমার প্রমাণে দেখা গিয়াছিল যে, যৌত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণে প্রতিবাদী যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল, বাদীও সেই রূপ করিয়াছিল; কেবল প্রতিবাদী ঐ পরিবারের কর্ত্তা ছিল বলিয়াই বাদী সেই নালিশ উপস্থিত করে। সেই মোকদ্দমায় আমার কেবল এই ব্যক্ত করাই মনস্থ ছিল যে, পরিবারস্থ কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে একান্নে থাকিলে পরিবারের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণের কার্য্যে সচরাচর যোগ দেয় বলিয়া অবশ্যই অনুমান হয়, বিরুদ্ধ প্রমাণ না থাকিলে, সেই ব্যক্তি, পরিবারস্থ অপর এক ব্যক্তি কেবল কর্ত্তা থাকিলেই যে, তাহাকে নিকাশ দিতে বাধ্য করিতে পারিবে, এমত হইতে পারে না। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই ইহার অধিক আর কিছু বলি নাই, কারণ, আমি ইংলণ্ডীয় ব্যবহারাজীব স্বরূপে তত্রত্য একুটির নিয়ম সমস্ত অনেক জ্ঞাত থাকায় আমার মত এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, সে হিন্দু যৌত পরিবারের কর্ত্তা হউক বা না হউক, যে জেম্মাদার স্বরূপে অথবা পরস্পর বিশ্বাসের গতিকে এমন সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ করে, যাহাতে অন্যের অধিকার বা স্বার্থ আছে, সে ব্যক্তি যে প্রকারে তাহার তত্ত্বাবধারণ করে, ও তাহা হইতে যে উপস্বত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য সে একুটির আদালতে ঐ অন্য ব্যক্তিকে নিকাশ দিতে বাধ্য। এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় একুটি আদালতের অবলম্বিত যুক্তি এই যে, পরস্পর বিশ্বাসে অথবা জেম্মাদার স্বরূপে যদি কোন ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তির অধ্যক্ষতা করে, তবে তাহাকে ঐ বিশ্বাসের অপব্যবহার করিতে দেওয়া যাইবে না, এবং সে মালিকের সম্মতি না লইয়া ঐ অধ্যক্ষতা দ্বারা নিজের লাভ করিতে পারিবে না; এবং যেহেতু লাভ করা হইয়াছে কি না, অথবা কি করা হইয়াছে তাহা তদবস্থায় কেবল সেই ব্যক্তিই অবগত থাকে, অতএব একুটির আদালত তাহা ব্যক্ত করিতে তাহাকে বাধ্য করিবেন, অর্থাৎ বাক্যান্তরে, তাহার অধ্যক্ষতার নিকাশ দিতে বাধ্য করিবেন। প্রকৃত মালিকের স্বত্ব রক্ষার জন্য হিসাব প্রকাশ করাইবার আবশ্যকতাই এই সকল মোকদ্দমার উপরে ইংলণ্ডীয় একুটি আদালতের বিচারাধিকারের মূল। ইহা অত্যন্ত শোচনীয় যে, আমি ঐ মোকদ্দমায় এমন অসম্পূর্ণ রূপে আমার রায় ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, তদ্দ্বারা বিশ্বাস হইয়াছিল যে, আমার মত এই যে, এরূপ নিকাশের দাবীতে মোকদ্দমা চলিবে না; কারণ, আমি বোধ করি, আমার রায় ঐ রূপ অসম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত না হইলে, পূর্ণাধিবেশনে এই মোকদ্দমা অর্পণের কোন আবশ্যক হইত না। বিচারপতি মার্কবির রায় নিষ্পত্তি নহে, তাহা কথার কথা মাত্র, এবং তাহা সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য আবশ্যকীয় ছিল না এবং ঐ বিজ্ঞবর বিচারপতি বাস্তবিক তাহাতে নিকাশ দেওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন।

আমার বোধ হয় যে, এই মোকদ্দমার প্রশ্ন সমস্তের যে উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ হওয়া উচিত নহে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—প্রস্তাবিত উত্তরে আমি সম্মত হইলাম; কিন্তু যেহেতু যে বিচারপতিদ্বয় এই এস্তমেজাজ করেন তন্মধ্যে আমি এক জন ছিলাম, অতএব যে অবস্থা দৃষ্টে এই এস্তমেজাজ করা আমার উচিত বোধ হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলা আবশ্যক।

৯ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের প্রচারিত বিচারপতি ফিয়ারের নিষ্পত্তি দৃষ্টে আমি এই এস্তমেজাজ করি নাই। আমি আমার রায়ে স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছি যে, সেই মোকদ্দমায় যে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নিকাশের দাবীতে নালিশ হয়, সেই ব্যক্তিই যে, ঐ যৌত পরিবারের সম্পত্তির একমাত্র অধ্যক্ষ ছিল এমন কোন প্রমাণ

ছিল না, অতএব বস্তুত তাহা এক কর্ত্তার বিরুদ্ধে নিকাশের দাবীতে নালিশ ছিল না, দুই যৌত কর্ত্তার মধ্যে এক জন আর এক জনের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়াছিল।

বিচারপতি মার্কবির নিষ্পত্তির গতিকেই আমি এই এস্তমেজাজ করিয়াছিলাম এবং আমার ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বিচারপতি ফিয়ারের উল্লিখিত নিষ্পত্তির যে ব্যাখ্যা বিচারপতি মার্কবি করিয়াছিলেন তদৃষ্টেই আমি এস্তমেজাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। বিচারপতি মার্কবি ঐ নিষ্পত্তিতে বলেন যে, বিচারপতি ফিয়ারের নিষ্পন্ন মোকদ্দমায়, এবং আর একটি মোকদ্দমা যাহা বিচারপতি মার্কবি ও প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিষ্পন্ন হয় তাহাতে, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, এক ব্যক্তির হস্তে যৌত হিন্দু-পরিবারের সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব ভার থাকিলেই যে, তাঁহার বিরুদ্ধে ঐ পরিবারস্থ অন্যান্য শরীক নিকাশের দাবীতে নালিশ করিতে পারিবে, এমত হইতে পারে না।

এই প্রস্তাব আমার নিকট ভ্রমাত্মক বোধ হইয়াছিল, এবং তজ্জন্যই আমি পূর্ণাধিবেশনে এই এস্তমেজাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

অর্পিত প্রশ্ন সম্বন্ধে বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি ফিয়ার যাহা বলিয়াছেন তদতিরিক্ত আমার কিছু বলিবার নাই। (গ)

---

১৬ই মার্চ, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট ও বিচারপতি এফ, বি, কেম্প; এল. এস, জ্যাক্সন; জে বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

১৮৬৮ সালের ১৮২, ১৮৪, ১৯৮ ও ২১৩ নং মোকদ্দমা।

রঙ্গপুরের জজের ১৮৬৮ সালের ১০ই জুনের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

রাধাপ্যারী চৌধুরিণী ও অন্যান্য (বাদী) আপেলাণ্ট।

নবীনচন্দ্র চৌধুরী (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু শ্রীনাথ দাস আপেলাণ্টের উকীল।

বাবু মোহিনীমোহন রায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৩০ ধারান্তর্গত মোকদ্দমায় আদালত কেবল দখলের বিচারেই সীমাবদ্ধ নহেন, যদি আদালতের প্রতীতি জন্মে যে, বাদীর দরখাস্তের সম্ভাবিত হেতু আছে, তবে তিনি বাদী এবং ডিক্রীদার-প্রতিবাদীর মধ্যে স্বত্বের বিচারেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন।

এরূপ মোকদ্দমায় স্বত্বের বিচার করিতে আদালতের ক্ষমতা থাকিলেও, অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে যে ব্যক্তি কোন ভূমি অথবা জলকর হইতে বেদখল হয়, তাহার ইহা ভিন্ন আর কিছু সপ্রমাণ করিতে হইবে না যে, সে প্রকৃতপ্রস্তাবে ও নিষ্কপটে দখীলকার ছিল, এবং ঐ ডিক্রীজারীতেই বেদখল হইয়াছে; এবং যদিও ডিক্রীদার, বাদীকে প্রমাণ দর্শাইতে বলিতে পারে, তথাপি বাদী আপন দখলের উপরে নির্ভর করিলে তাহাকে স্বত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে বাধ্য করিতে পারে না। ডিক্রীদার আপন স্বত্বের প্রমাণ দর্শাইতে পারে।

বিচারপতি নর্ম্যান ও ই, জ্যাক্সনের নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়ঃ—

বিচারপতি নর্ম্যান।—৩য় বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২১৪ পৃষ্ঠার ও ৫ম বালমের ২২৪ পৃষ্ঠার ও ৮ম বালমের ৮ ও ৪৭৭ পৃষ্ঠার মোকদ্দমা দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, নিম্নলিখিত প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশনের নিষ্পত্তির জন্য অর্পণ করিতে হইবে, যথাঃ—

যে ব্যক্তি ডিক্রীর কোন পক্ষ নহে, সে যদি তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে কোন ভূমি

অথবা জলকর হইতে বেদখল হয়, তবে তাহার কি ইহা ভিন্ন আর কিছু প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে ও নিষ্কপটে দখীলকার ছিল এবং সেই ডিক্রীজারীতেই বেদখল হইয়াছে।

ডিক্রীদার, বাদীকে বাদীর আপন স্বত্বের প্রমাণ দর্শাইতে বাধ্য করিতে পারে, কি ২৩০ ধারামতে দরখাস্ত মোকদ্দমা স্বরূপে নম্বর ও রেজিষ্টরীভুক্ত হইলে, কেবল বাদীর দখলের প্রমাণ খণ্ডনার্থে না হইয়া তাহার উত্তর স্বরূপে আপন স্বত্বের প্রমাণ দিতে পারে?

পূর্ণাধিবেশনের রায়ঃ—

প্রধান বিচারপতি কাউচ।—ব্যবস্থাপক সমাজ ২৩০ ধারায় যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা হইতেই আমরা তাঁহাদের অভিপ্রায় সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিব। আমি বিবেচনা করি যে, ঐ শব্দগুলির প্রতি দৃষ্টি করিলে ঐ ধারান্তর্গত দরখাস্তে স্বত্বের বিচার করা যাইতে পারে। এই ধারায় এমত ঘটনার জন্য বিধান আছে যাহাতে স্থাবর সম্পত্তি পাওয়ার নালিশে কোন ব্যক্তি ডিক্রী পায় এবং ঐ ডিক্রীজারী হওয়ার উপক্রম হয়। ঐ ধারায় বলে যে, প্রতিবাদী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি যদি ডিক্রীজারীতে কোন ভূমি অথবা অন্য স্থাবর সম্পত্তি হইতে বেদখল হয়, এবং সেই ব্যক্তি যদি ঐ ডিক্রীমতে তাহাকে ঐ সম্পত্তি হইতে বেদখল করিতে ডিক্রীদারের স্বত্বের প্রতি এই বলিয়া আপত্তি উপস্থিত করে যে, সে নিজের জন্য অথবা প্রতিবাদী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির জন্য প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ সম্পত্তির দখীলকার আছে, এবং ঐ সম্পত্তি ডিক্রীভুক্ত ছিল না, অথবা ডিক্রীভুক্ত থাকিলেও যে মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রদত্ত হয় তাহাতে সেই ব্যক্তি কোন পক্ষ ছিল না, তাহা হইলে সে বেদখলের তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে; এবং প্রার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আদালতের যদি এমত দৃষ্ট হয় যে, ঐ দরখাস্ত করার সম্ভাবিত হেতু আছে, তবে প্রার্থীকে বাদী করিয়া ও ডিক্রীদারকে প্রতিবাদী করিয়া তাহাদের মধ্যে মোকদ্দমার ন্যায় ঐ দরখাস্ত নম্বর ও রেজিষ্টরীভুক্ত করিতে হইবে। তাহার পরে কি করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে লেখা আছে যে, আদালত বিরোধীয় বিষয়ের তদন্ত করিবেন। তবে, বিরোধীয় বিষয় কি? আমার বোধ হয় যে, ঐ ডিক্রীমতে প্রার্থীকে সম্পত্তি হইতে ডিক্রীদারের বেদখল করার স্বত্বই বিরোধীয় বিষয়, এবং যে সকল হেতুবাদে প্রার্থী আদালতে উপস্থিত হইতে পারে তাহা ব্যক্ত করার জন্য পশ্চাতে যে সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা ঐ সকল শব্দের অর্থ সঙ্কুচিত হয় না, কিন্তু যে যে ঘটনায় প্রার্থী আদালতে আসিতে স্বত্ববান হয়, তাহা দেখাইবার জন্যই উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি প্রার্থী এমত না দেখাইতে পারে যে, সে নিজের জন্য অথবা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য বাস্তবিক দখীলকার ছিল, তবে তাহার আদালতে দরখাস্ত করার কোন স্বত্ব নাই। কিন্তু যদি সে তাহা দেখাইতে পারে এবং আদালতের প্রতীতি হয় যে, দরখাস্তের সম্ভাবিত হেতু আছে, তবে তিনি তাহা লইয়া সেই বিষয়ের তদন্তে প্রবৃত্ত হইতে পারেন; কিন্তু তথাপি আমার বিবেচনায়, প্রার্থীকে ডিক্রীদারের বেদখল করার স্বত্বই বিরোধীয় বিষয়। অতএব আমার বিবেচনায়, এ পর্য্যন্ত ঐ ধারাতে এমন কিছু নাই যে, কেবল দখলের প্রশ্নেই তদন্ত সীমাবদ্ধ হইবে; কিন্তু তাহার পরে লেখা আছে যে, ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে প্রার্থী ঐ সম্পত্তির জন্য নালিশ উপস্থিত করিলে আদালতের যে প্রকারে এবং যে ক্ষমতা পরিচালনে তদন্ত করিতে হইত, তদ্রূপ ঐ বিষয়ের বিচার করিতে হইবে।

যদি ঐ সম্পত্তির জন্য অন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে ডিক্রীদার কর্ত্তৃক নালিশ উপস্থিত না হইয়া প্রার্থী কর্ত্তৃক ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইত, তবে স্বত্বের বিচার করিতে হইত। কেবল দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ না

হইয়া সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য যে নালিশ উপস্থিত হয়, সেই নালিশে স্বত্বের বিচার করিতে হয়। এই সকল বাক্য দৃষ্টে আমার বোধ হয় যে, এরূপ স্থলে আমরা ব্যবস্থাপক সমাজের এই অভিপ্রায় অনুমান করিয়া লইতে পারি যে, যদি আদালতের প্রতীতি হয় যে, দরখাস্তের সম্ভাবিত হেতু আছে, তাহা হইলে পক্ষগণের স্বত্বের বিচার করিতে হইবে, এবং তাহা করার প্রণালী এই যে, প্রার্থী ইহা দেখাইতে পারে যে, সে সম্পত্তিতে বাস্তবিক স্বত্ববান, এবং তাহা পাওয়ার জন্য ডিক্রীদার যে ডিক্রী পাইয়াছে, তাহা অনুচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়, এবং তাহা প্রার্থীর উপর কোন মতেই বাধ্যকর নহে।

এই অর্থ ২৩১ ধারার শব্দগুলির দ্বারা প্রতিপোষিত হইতেছে, কারণ, তাহার বিধান এই যে, ঐ সকল পক্ষগণের বা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐ নালিশের হেতুতে কোন আদালতে ভবিষ্যতে কোন নালিশ উপস্থিত হইতে পারিবে না। ডিক্রীজারীতে বেদখল হওয়াই ২৩০ ধারামতে সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার নালিশের হেতু। এমত হইতে পারে যে, প্রার্থী দেখাইতে পারে যে, অন্য কোন সময়ে ঐ সম্পত্তির বেদখল হইয়াছিল, এবং হয়ত সেই গতিকে সে ২৩১ ধারার দ্বারা বাধ্য হওয়ার দায় এড়াইতে পারে, কিন্তু আমার বোধ হয় যে, যে স্থলে ব্যবস্থাপক সমাজ "ঐ নালিশের হেতুতে" শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, সে 'স্থলে' তাঁহারা কেবল এমত ঘটনার কথা মনে করিয়াছিলেন, যাহাতে প্রার্থী এই বলিয়া ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার স্বত্ব উত্থাপন করে যে, সম্পত্তি তাহার; এবং তাহা হইতে বেদখল হওয়াতে তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নালিশ করে ও এবং তাঁহারা ২৩০ ধারার অন্তর্গত দরখাস্ত প্রার্থীর মোকদ্দমার ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে, ঐ ধারার শব্দগুলি যথোচিত রূপে স্পষ্ট, কিন্তু আমার বিবেচনায়, ইহাই যে ব্যবস্থাপক সমাজের অভিপ্রায়, তাহা ঐ সকল শব্দ হইতে ন্যায্য রূপে সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

অতএব, আমাদের নিকট যে প্রশ্ন হইয়াছে ও যাহার বিশেষ উত্তর দিতে হইবে, তাহাতে আমাদের ঐ অর্থ প্রয়োগ করিতে হইবে।

প্রথম প্রশ্ন এই যে, যে ব্যক্তি মোকদ্দমার কোন পক্ষ ছিল না, সে যদি তৃতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধ ডিক্রী জারীতে কোন ভূমি অথবা জলকর হইতে বেদখল হয়, তবে তাহার কি ইহা ভিন্ন আর কিছু সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে দখীলকার ছিল, এবং সেই ডিক্রীজারীতেই সে বেদখল হইয়াছে। প্রার্থীর অর্থাৎ বাদীর স্বত্বের বিচার করিতে আদালতের ক্ষমতা আছে বলিয়াই যে, বাদী যথার্থ এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে দখীলকার থাকার অতিরিক্ত কোন কথা সপ্রমাণ করিতে বাধ্য হইবে, এমত নহে। যদি সে তাহাই সপ্রমাণ করে, তবে তাহা স্বত্বের এমন প্রমাণ হইবে, যাহার উপরে সে তাহার মোকদ্দমা স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু যদি সে তাহার স্বত্বের প্রমাণ দিতে ইচ্ছা না করে, তবে আমরা এমন কথা বলিতে পারি না যে, সে তাহা দিতে বাধ্য। দ্বিতীয় প্রশ্নের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ডিক্রীদার প্রার্থীকে তাহার স্বত্বের প্রমাণ দর্শাইতে বলিতে পারে কি না, এতৎসম্বন্ধে যদিও আমরা বলি যে, সে তাহা পারে, তথাপি সে স্বত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য জেদ করিতে পারে না, এবং বাদী উচিত বিবেচনা করিলে আপন দখলের উপরেই নির্ভর করিতে পারে। কিন্তু ঐ প্রশ্নের শেষ ভাগ, অর্থাৎ ডিক্রীদার তাহার নিজের স্বত্বের প্রমাণ দর্শাইতে পারে কি না, এতৎসম্বন্ধে আমরা বলি যে, সে তাহা পারে। যদি তাহার উৎকৃষ্ট স্বত্ব থাকে, তবে সে সেই স্বত্বের প্রমাণ দিতে পারে, এবং ঐ সম্পত্তি যে বাস্তবিক তাহারই সম্পত্তি তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারে। আমার বিবেচনায়, অর্পিত প্রশ্ন সকলের ঐ রূপ উত্তর দিতে হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—আমারও ঐ মত।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমারও ঐ মত। আমি বিবেচনা করি, দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২৩০ ও ২৩১ ধারা একত্রে পাঠ করা উচিত, এবং প্রথমোক্ত ধারায় ব্যবস্থাপক সমাজের কি মনস্থ ছিল তাহা শেষোক্ত ধারার বাক্যের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

যে সকল ঘটনায় ২৩০ ধারামতে আদালতে দরখাস্ত করা যাইতে পারে তাহা ঐ ধারার প্রথমে লেখা আছে; এবং তাহা এই যে, যে সম্পত্তি হইতে প্রার্থী বেদখল হইয়াছে, তাহাতে সে তাহার নিজের জন্য অথবা প্রতিবাদী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির জন্য বাস্তবিক দখীলকার ছিল এবং তাহা ডিক্রীভুক্ত ছিল না এবং ডিক্রীভুক্ত থাকিলেও, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রদত্ত

হয় তাহাতে সে কোন পক্ষ ছিল না ; এবং তাহার পত্রে লেখা আছে যে, "যদি প্রার্থীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আদালতের দৃষ্ট হয় যে, ঐ দরখাস্ত করার সম্ভাবিত হেতু আছে ;" অর্থাৎ আদালতের ঐ সকল ঘটনা যথেষ্ট রূপে জানিতে হইবে অর্থাৎ এই জানিতে হইবে যে, প্রার্থী উপরি-উক্ত রূপে বাস্তবিক দখীলকার ছিল এবং ঐ ভূমি ডিক্রীভুক্ত ছিল না এবং তাহা ডিক্রীভুক্ত থাকিলেও, যে মোকদ্দমায় ডিক্রী প্রদত্ত হয়, তাহাতে সে কোন পক্ষ ছিল না। এবং দরখাস্ত করার সম্ভাবিত হেতু থাকার কথায় আদালতের প্রতীতি হইলে, আদালত তাহা প্রার্থী বাদী ও ডিক্রীদার প্রতিবাদীর মধ্যে মোকদ্দমা স্বরূপ বিবেচনা করত, ডিক্রীদারের বিরুদ্ধে প্রার্থী ঐ সম্পত্তির জন্য নালিশ করিলে যেরূপ তদন্ত করিতে পারিতেন, সেই রূপে বিরোধীয় বিষয়ের তদন্ত করিতে সমর্থ হইবেন।

বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতির সহিত একমতে আমি বিবেচনা করি যে, দরখাস্ত করার হেতু থাকার বিষয়ে আদালত যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাই বিস্তারিত বিরোধীয় বিষয়, এবং সাধারণ দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায়, আদালতের ঐ বিষয়েরও তদন্ত এবং নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা আছে। ঐ নিষ্পত্তি ২৩১ ধারামতে "ডিক্রীর" ন্যায় অর্থাৎ "সম্পত্তির জন্য ডিক্রীর" ন্যায় প্রবল হইবে, এবং তাহার আপীল চলিবে ; এবং সম্পত্তির স্বত্ব সম্বন্ধে ঐ নিষ্পত্তি বিশুদ্ধ কি না, তন্নির্ণয়ার্থে ঐ আপীল হইবে ; তদনন্তর ঐ ধারা এই বলিয়া সমাপ্ত হইয়াছে যে, "সেই নালিশের "হেতু সম্বন্ধে সেই পক্ষগণের অথবা তাঁহাদের "স্বত্বে যাহারা দাবী করে তাহাদের মধ্যে কোন "নূতন নালিশ চলিবে না।"

২৪৬ ধারা যাহা প্রায় ঐ প্রকার এক বিষয় সম্বন্ধে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তল্লিখিত কার্য্যপ্রণালীর সহিত এই কার্য্যপ্রণালীর অনেক প্রভেদ আছে। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, ঐ ধারামতে প্রদত্ত হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল চলিবে না, "কিন্তু যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সেই হুকুম হয়, সে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য নালিশ করিতে পারিবে। অতএব যে স্থলে ব্যবস্থাপক সমাজ, সেই নালিশের হেতু সম্বন্ধে পক্ষগণকে অথবা যাহারা তাহাদের স্বত্বে দাবী করে তাহাদিগকে নূতন নালিশ করিতে নিবারণ করিয়াছেন, এবং যে নালিশ আমি বিবেচনা করি যে, সেই ডিক্রীজারীতে বেদখলের হেতুতেই উপস্থিত হইবে এবং যাহাতে বাদী আপন স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করিবে, সে স্থলে ঐ সকল কার্য্যে সে তাহার স্বত্ব সুপ্রমাণ করিতে যোগ্য না হইলে, তাঁহারা তাহাকে তাহার স্বত্ব সাব্যস্ত করার জন্য সমুদায় প্রমাণ প্রয়োগ করিতে না দিয়া, নূতন নালিশ উপস্থিত করিতে নিষেধ করিতেন না।

যে বিশেষ প্রণালীতে অর্পিত প্রশ্নের উত্তর করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আমি প্রধান বিচারপতির সহিত সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইলাম।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমি অসম্মত নহি।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি এই রায়ে সম্মত হইলাম। (গ)

১৪ ই জুন, ১৮৭০।

প্রধান বিচারপতি সর রিচার্ড কাউচ, নাইট ও বিচারপতি এফ, বি, কেম্প ; এল, এস, জ্যাক্সন ; ই, জ্যাক্সন ও ডবলিউ মার্কবি।

১৮৬৯ সালের ১৩৮ নং মোকদ্দমা।

ত্রিহুতের অধঃস্থ জজের ১৮৬৯ সালের ৩০ এ মার্চের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে জাবেতা আপীল।

রাজকুমার রামগোপাল নারায়ণ সিংহ (বাদী) আপেলাণ্ট।

রাম দত্ত চৌধুরী ও আর এক ব্যক্তি (প্রতিবাদী) রেস্পণ্ডেণ্ট।

বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

মেং আর টি এলেন ও বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রেস্পণ্ডেণ্টের উকীল।

চুম্বক।—দলীলে যদি এমত দেখা যায় যে, ভূমির উপরে দায় সৃজন করাই পক্ষগণের মনস্থ ছিল, তাহা হইলেই যথেষ্ট রূপে বন্ধক হয়। যদি দলীল হইতে সেই অভিপ্রায় সংগৃহীত হইতে পারে, তবে তাহাতে যে প্রকার বাক্যই ব্যবহৃত হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না।

বিচারপতি বেলি ও মার্কবির নিম্নলিখিত রায় অনুসারে এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয় ঃ—

বিচারপতি মার্কবি।—কোন ভূমির এক

অংশের দখল পাওয়ার জন্য, ও মুরলী ঝা প্রভৃতি দ্বারা প্রথম প্রতিবাদীর বরাবর ১৮৬৩ সালের ২০ এ অক্টোবর তারিখে যে এক ভর্ণা অর্থাৎ উপস্বত্বভোগী কট-কবালা প্রদত্ত হয় তাহা, ও প্রথম প্রতিবাদী দ্বিতীয় প্রতিবাদীর বরাবর যে এক কট্কীনা পাট্টা লিখিয়া দেয় তাহা, অন্যথা করার জন্য বাদী এই নালিশ করে।

১৮৬৫ সালের ৫ ই ডিসেম্বর তারিখে এক ডিক্রীজারীর নীলামে বাদী ক্রয় করে। যে ডিক্রীমতে নীলাম হয় তাহার তারিখ ১৮৬৪ সালের ১০ এ আগষ্ট। ১৮৬৩ সালের ২০ এ অক্টোবর তারিখের এক তমঃসুকের উপরে ঐ ডিক্রী হয় এবং সেই ডিক্রীতে ব্যক্ত হয় যে, ঐ ঋণ পরিশোধার্থে ঐ সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট রূপে দায়ী।

তমঃসুকের উপরে নালিশের পূর্ব্বে কিন্তু তমঃসুক লিখিয়া দিবার পরে, যে সকল ব্যক্তি বাদীর বরাবর তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছিল তাহারা বিরোধীয় সম্পত্তির এক কট-কবালা ১ নং প্রতিবাদীকে লিখিয়া দেয়, এক ১ নং প্রতিবাদী তাহার পরে ২ নং প্রতিবাদীকে এক পাট্টা দেয়। প্রতিবাদিগণ ১৮৬৩ সালের ২০ এ অক্টোবর তারিখের তমঃসুকের কথা না জানিয়া সরলভাবে কার্য্য করিয়াছিল, এবং ১ নং প্রতিবাদী তাহার জন্য যথেষ্ট মূল্য দিয়াছিল। ১৮৬৪ সালের ১০ এ আগষ্ট তারিখের ডিক্রী যে মোকদ্দমায় প্রদত্ত হয়, তাহাতে প্রতিবাদিগণ পক্ষ ছিল না।

এই মোকদ্দমার জন্য উকীলেরা ১৮৬৩ সালের ২০ এ অক্টোবরের তমঃসুকের যে অনুবাদ গ্রাহ্য করিয়াছেন তাহা এই, যথা—

"আমরা, মুরলী ঝা ও অন্যান্য অদ্যকার "তারিখে এক তমঃসুক লিখিয়া দিয়া মসম্মত "ভগবতী কুঙরের নিকটে ৩০০০ টাকা কর্জ্জ করি- "য়াছি এবং তাহা পাইয়াছি। এতদ্দ্বারা "আমরা একরার করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত "ঐ তমঃসুকের ঋণ পরিশোধিত না হয়, সে "পর্য্যন্ত আমরা মৌজা কনসোল, ভদ্রাওন এবং "চাপ্টার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী ব্রহ্মত্র "ও গয়ের বন্দোবস্তী ভূমি সমস্ত যাহা অদ্য "পর্য্যন্ত আমরা ভোগ করিয়া আসিতেছি তাহা "কোন সাফ বিক্রয়-কবালা, কট-কবালা, মোক- "ররী অথবা বন্ধকের দ্বারা অথবা জরীপেশগী "পাইয়া, ঠিকা পাট্টা দ্বারা অদ্যকার তারিখ "হইতে এবং অদ্যকার তারিখের পরে হস্তান্তর "করিব না; যদি এই সকল ভূমি সম্বন্ধে আমরা "ঐ প্রকার কোন কার্য্য করি, তবে সেই দলীল "অবৈধ ও অকর্ম্মণ্য হইবে; এবং যদি আমরা "ঐ প্রকার কোন দলীল লিখিয়া দেই, তবে "তাহা অবৈধ, এবং ঋণ পরিশোধ এড়াই- "বার জন্য বেনামী কার্য্য স্বরূপ বিবেচিত "হইবে।"

বিরোধীয় সম্পত্তি মৌজা কর্ষস্থিত বাড়ে- য়াপ্তী লাখেরাজ ভূমি, এবং তাহা তমঃসুকের পক্ষ অর্থাৎ মুরলী ঝা প্রভৃতির সহিত বন্দোবস্ত হয়।

অধঃস্থ জজ বাদীর নালিশ ডিস্মিস্ করেন। এই দলীল যে সম্পত্তি সম্বন্ধীয় তাহার যথেষ্ট বর্ণনা ইহাতে আছে কি না, তাহা তিনি সন্দেহ করেন; কিন্তু তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, তাহা হউক বা না হউক, ঐ দলীল বন্ধকী দলীল নহে, কেবল হস্তান্তর না করার একরার মাত্র। অতএব তিনি নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ তমঃসুক এবং তদনুযায়ী ডিক্রী ও নীলাম সত্ত্বেও, প্রথম প্রতিবাদীর বরাবর উপস্বত্ব-ভোগী কট উৎকৃষ্ট এবং বৈধ; এ প্রযুক্ত তিনি মোকদ্দমা ডিস্মিস্ করেন।

আপীলে আমাদের সমক্ষে প্রথমতঃ তর্কিত হইয়াছে যে, ১৮৬৩ সালের ২০ এ অক্টোবর তারিখের দলীল পক্ষগণের পশ্চাতের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পঠিত হইলে, বন্ধক বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত, অতএব বাদী পশ্চাতের সকল দায় মুক্তাবস্থায় ক্রয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, সম্পত্তির বর্ণনা যথেষ্ট নিশ্চিত আছে। এবং তৃতীয়তঃ, দলীল দৃষ্টি করিলেই বোধ হইবে যে, তদ্দ্বারা বন্ধক সৃষ্ট হইয়াছে।

রেস্পণ্ডেণ্ট নিম্ন আদালতের রায়ের পোষকতা করে, এবং আরও তর্ক করে যে, এই কার্য্য দ্বারা বন্ধক সৃষ্ট হইয়া থাকিলেও বাদী কেবল ডিক্রীজারীর নীলাম-ক্রেতা সূত্রে নীলামের তারিখে বিচারাদিষ্ট দায়ীর যে স্বত্ব ও লাভ ছিল তাহাই ক্রয় করায় তাহার বিরুদ্ধে, প্রতিবাদী না জানিয়া ও মূল্য দিয়া ক্রয় করাতে উৎকৃষ্টতর স্বত্ব পাইয়াছে।

এই শেষ আপত্তি সম্বন্ধে সে ৮ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ২৯১ পৃষ্ঠার এক নিষ্পত্তির উপরে নির্ভর করে। কিন্তু সেই নিষ্পত্তি এই আদালতের বহু নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ, এবং বিজ্ঞবর বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র যিনি সেই নিষ্পত্তিতে সাধারণতঃ সম্মত হইয়াছিলেন, তিনি

ইদানীং ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঐ বিষয় সম্বন্ধে তিনি ঐ নিষ্পত্তি ভ্রমাত্মক বিবেচনা করেন।

আমার ইহা নির্দেশ করার কোন বাধা নাই যে, যদি বিরোধীয় কার্য্য বন্ধক হয়, তবে বাদী কৃতকার্য্য হইবে।

পক্ষগণের কোন কার্য্যের এমত প্রমাণ নাই, যাহা হইতে আমরা তাহাদের মনস্থ অনুমান করিয়া লইতে পারি। যে এক মাত্র কার্য্যের উল্লেখ হইয়াছে তাহা প্রতিবাদিগণ যে বন্ধক-সূত্রে দাবী করে তাহার পরে হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে, আমি বিবেচনা করি যে, যদি বন্ধক হইয়া থাকে, তবে সম্পত্তি যথেষ্টই বর্ণিত হইয়াছিল। যে সকল বন্ধকে সম্পত্তি কোন্ স্থানে স্থিত অথবা তাহার ভাব কি, তাহার কোন বর্ণনা না লিখিয়া বন্ধক-দাতা তাহার সমুদায় সম্পত্তি বন্ধক দেয়, সেই সকল বন্ধক হইতে এই বন্ধকের প্রভেদ আছে।

এইক্ষণে এই মাত্র প্রশ্ন বাকী আছে যে, দলীল দৃষ্টেই তাহা বন্ধক বোধ হয় কি না। আমি বিবেচনা করি যে, তাহা হয় না। প্রসিদ্ধ এবং আবশ্যকীয় যে সকল প্রভেদ আছে তাহা রহিত না করিয়া আমরা ঐ রূপ নির্দেশ করিতে পারি না। সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৫৭ সালের রিপোর্টের ৮২৫ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় বিচারপতিগণ যে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। তাহাতে কথিত হইয়াছে যে, "সাধারণ নিয়ম স্বরূপে, "চন্দ্রকিশোর শর্ম্মার মোকদ্দমায় ১৮৫৫ সালের "৯ ই জুলাই তারিখে যে নিষ্পত্তি হইয়াছে "আমরা তাহারই অনুসরণ করিব; এবং তাহা "এই যে, বিক্রেতা বিক্রয়ের পূর্ব্বে যদি অপর "কোন ব্যক্তির সহিত এমন একরার করিয়া "থাকে যে, সে তাহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবে "না, তথাপি যে ক্রেতা সুরলভাবে ক্রয় করে "তাহার ক্রয় অকর্ম্মণ্য হয় না। যদি কোন "ব্যক্তি কোন বিশেষ সম্পত্তির উপর বৈধ "দাবী স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে, তবে ঐ প্রদেশে "নানাবিধ বন্ধকের যে প্রণালী প্রচলিত আছে "তাহার এক প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। "যদি সে তাহা না করে, তবে তাহা তাহার "নিজের দোষ, এবং তাহার ত্রুটির হেতু "নির্দ্দোষী ক্রেতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা উচিত "নহে।"

মেং গ্রেগরী যে দেখাইয়াদিয়াছেন যে, ঐ মোকদ্দমার সহিত উপস্থিত মোকদ্দমার প্রভেদ আছে, এবং এই মোকদ্দমার একরার এই যে, টাকা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত হস্তান্তর হইবে না, কিন্তু সেই মোকদ্দমায় একরার এই ছিল যে, প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত হস্তান্তর হইবে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু আমার নিকট এই প্রভেদ গুরুতর বোধ হয় না, এবং আমি যে রায়ের উল্লেখ করিয়াছি তাহা আমার বিবেচনায়, এই মোকদ্দমায় খাটে।

উল্লিখিত ১৮৫৫ সালের সদর আদালতের নিষ্পত্তি সর্ব্বথা উপস্থিত মোকদ্দমার অনুরূপ; এবং আমার বোধ হয়, বিচারপতি ম্যাক্‌ফার্সন তাঁহার বন্ধক সম্বন্ধীয় গ্রন্থে এই দুই মোকদ্দমা ছাড়িয়া গিয়াছেন।

কিন্তু ৭ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৩০৯ পৃষ্ঠায় এই আদালতের এক খণ্ডাধিবেশনের নিষ্পত্তিতে এতদ্বিরুদ্ধ রায় ব্যক্ত হইয়াছে। সেই মোকদ্দমায় এই প্রকার এক দলীলের উপরে নির্দিষ্ট হয় যে, ইহা এক সামান্য বন্ধক। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আদালতেরও কয়েকটি নিষ্পত্তি আছে যাহাতে ঐ প্রকার রায় ব্যক্ত হইয়াছে (ম্যাক্‌ফার্সনের মর্টগেজের ৫ ম সংস্করণের ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

যে তমঃসুকে এমন একরার থাকে যে, তল্লিখিত টাকা পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না, সেই তমঃসুক বন্ধকের তুল্য কি না, তাহা স্পষ্ট রূপে নির্দ্দেশ করা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত আবশ্যক; অতএব আমি নিম্নলিখিত প্রশ্ন পূর্ণাধিবেশনের রায়ের জন্য অর্পণ করিতে ইচ্ছা করি।

১৮৬১ সালের ২০ এ অক্টোবর তারিখের উল্লিখিত দলীল তল্লিখিত ভূমির বন্ধকী দলীল কি না?

যদি পূর্ণাধিবেশনের রায়ে তাহা বন্ধকী দলীল গণ্য হয়, তবে নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা হইবে, এবং বাদী দুই আদালতের খরচা সমেত দখলের ডিক্রী পাইবে, এবং ওয়াশীলাৎ নির্ণয়ের জন্য মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইবে। যদি পূর্ণাধিবেশনের বিচারে ঐ দলীল বন্ধকী দলীল গণ্য না হয়, তবে আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ হইবে।

বিচারপতি বেলি।—পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করার প্রস্তাবে আমি সম্মত হইলাম।

**পূর্ণাধিবেশনের রায় ঃ—**

**প্রধান বিচারপতি কাউচ।**—যদি এই মোকদ্দমায় কেবল এই প্রশ্ন হইত যে, টাকা দেওয়ার তমঃসুকে যদি কেবল এই সর্ত্ত থাকে যে, ঐ টাকা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করা যাইবে না, তবে তাহা বন্ধকী দলীল হয় কি না, তাহা হইলে এই প্রশ্নের "না" বলিয়া উত্তর দেওয়া যাইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমার ইতস্ততঃ হইত; কিন্তু আমাদের নিকট জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যে, ১৮৬৩ সালের ২০ এ অক্টোবর তারিখের দলীল তল্লিখিত ভূমির বন্ধকী দলীল গণ্য হইতে পারে কি না? বন্ধকের জন্য কোন বিশেষ আদর্শের আবশ্যক হয় না, এবং যদি ইহা দেখা যায় যে, সম্পত্তির উপরে দায় সৃজন করাই পক্ষগণের অভিপ্রেত ছিল, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে, এবং সেই অভিপ্রায় নির্ণয় করার জন্য "কার্য্য দ্বারা যে প্রকৃত মনস্থ "ব্যক্ত হয়, কেবল তাহাই বিবেচনা করিতে হইবে, "যে প্রকার বাক্য ব্যবহৃত হয়, অথবা ঠিক "বাক্যার্থ বিবেচনা করিতে হইবে না।" (৬ষ্ঠ বালম মুরের ভারতবর্ষীয় আপীলের ৪১০ পৃষ্ঠার হনুমানপ্রসাদ পাঁড়ে বনাম মসম্মত বাবুই মনরাজ কুমারীর মোকদ্দমা, দ্রষ্টব্য)।

তমঃসুকের যে অনুবাদ উকীলেরা গ্রাহ্য করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে, পক্ষগণের মনোগতভাব সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকিতে পারিত, কিন্তু তাহার শেষভাগে যে ব্যক্ত আছে যে, যে কোন হস্তান্তরের দলীল হউক, তাহা অকর্ম্মণ্য ও বাতিল ও এই ঋণ এড়াইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, ঐ তমঃসুকের দ্বারা সম্পত্তির উপরে দায় সৃজন করাই মনস্থ ছিল।

কিন্তু আদালতের অনুবাদক যে অনুবাদ* করিয়াছেন, তাহাতে ঐ মনস্থ আরও স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। তাহা এই যে, "উপরিউক্ত ভূমি সম্বন্ধে "যদি আমরা এই সকল কার্য্য করি, তবে তৎ- "সংক্রান্ত দলীল ঐ তমঃসুকের লিখিত টাকা "এড়াইবার (হজম করিবার) জন্য বেনামী দলী- "লের ন্যায় অবৈধ গণ্য হইবে।" এই সকল শব্দের দ্বারা আমার বিবেচনায়, এই প্রদর্শিত হইতেছে যে, উল্লিখিত ভূমি সমস্ত উক্ত ঋণের প্রতিভূ থাকাই পক্ষগণের মনস্থ ছিল। যদি তাহা হয়, তবে তদ্দ্বারাই ভূমির উপরে দায় সৃষ্ট হইয়াছে। উদ্ধৃত নিষ্পত্তিতে ভূতপূর্ব্ব সদর আদালত যে বলিয়াছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি বন্ধকের সচরাচর চলিত কোন প্রণালীতে বন্ধক গ্রহণ না করে, তবে তাহা ক্রেতার বিরুদ্ধে অবৈধ হইবে, আমি তদ্রূপ বলিতে প্রস্তুত নহি। যদি দলীল হইতে প্রকৃত অভিপ্রায় সংগৃহীত হইতে পারে, তবে যে কোন প্রণালীতেই তাহা লেখা হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। আমার বিবেচনায়, অর্পিত প্রশ্নের 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিতে হইবে।

**বিচারপতি কেম্প।**—আমারও ঐ মত। তমঃসুকের বাক্যগুলিতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সম্পত্তি আবদ্ধ রাখাই পক্ষগণের মনস্থ

---

* লিখিতং শ্রীমুরলী ঝা, হলধর ঝা, লালজী ঝা, এবং জাতাশঙ্কর ঝার মাতা ও অভিভাবিকা মসম্মত শচী ওঝাইনী, সাকিম মৌজা লক্ষ্মীপুর ওরফে নারোণী, পরগণা পরিহারপুর রোজো। পরন্তু, আমরা ১২৬৫ সালের ১০ ই বৈশাখ তারিখে রীতিমত এক তমঃসুক দিয়া মবলগ ৩০০০ টাকা লইয়া তাহা আমাদের মহাজন পরগণা বরওয়ারার মৌজা সিংহওয়ারা-নিবাসী মসম্মত শ্রীজারাণী দাইকে দিয়াছি। সেই তমঃসুকের লিখিত টাকা পরিশোধার্থে তাহাতে যে সকল সর্ত্ত বর্ণিত হইয়াছে, (তদনুসারে) আমরা ব্যক্ত করিতেছি যে, যে পর্য্যন্ত ঐ তমঃসুকের লিখিত টাকা পরিশোধিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই তারিখ হইতে, মৌজা কোসাইল, মৌজা ভাদিয়ান, মৌজা চাপ্‌টা, পরগণা বাসেন্দর, নানপুর এবং জাবদীর মধ্যস্থিত গবর্ণমেণ্টের বন্দোবস্তী ও বেবন্দোবস্তী যে সকল ব্রহ্মত্র ভূমি প্রথম হইতে অদ্য পর্য্যন্ত আমাদের ভোগ-দখলে আছে, তাহা আমরা অন্য কাহাকেও সাফ-কবালা, কট-কবালা কিম্বা মকররী পাট্টা বা বন্ধক অথবা আয়মা পাট্টার দ্বারা অগ্রিম টাকা লইয়া হস্তান্তর করিব না।

যদি উক্ত ভূমি সম্বন্ধে আমরা এই সকল কার্য্য করি, তবে তৎসংক্রান্ত দলীল উপরোক্ত তমঃসুকের টাকা পরিশোধ করার দায় এড়াইবার জন্য বেনামী দলীলের ন্যায় অবৈধ বিবেচিত হইবে। এতদর্থে আমরা এই কয়েক কথা একরারনামা স্বরূপ লিখিয়া দিলাম, যে তাহা আবশ্যক মতে ব্যবহার্য্য হইতে পারে, ইতি তারিখ ১০ ই বৈশাখ, ১২৬৫ সাল।

ছিল। যে বিচারপতিদ্বয় এই মোকদ্দমা পূর্ণাধিবেশনে অর্পণ করেন, তাঁহাদের জন্য সমুদায় তমঃসুক অনুবাদিত হইয়াছিল না; তমঃসুকের শেষ ভাগ যথোচিত রূপে তাঁহাদের বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয় নাই। এইক্ষণে সমুদায় তমঃসুক অনুবাদিত হওয়াতে পক্ষগণের অভিপ্রায় সপষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, এবং প্রধান বিচারপতি যে বলিয়াছেন যে, দলীলের শব্দগুলির দ্বারা যদি পক্ষগণের অভিপ্রায় সপষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়, তবে সম্পত্তির উপর দায় সৃজন করার জন্য বিশেষ কোন নির্দিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করার আবশ্যক রাখে না, তাহাই যথার্থ। আগ্রা হাইকোর্টের রিপোর্টের ২য় বালমের ১২৪ পৃষ্ঠায় প্রধান বিচারপতি সর ওয়াল্টর মর্গেন্ ও বিচারপতি রবর্টের ১৮৬৭ সালের ৩০এ জানুয়ারি তারিখের নিষ্পত্তিতেও ঐ প্রকার রায় ব্যক্ত আছে।

বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন।—প্রধান বিচারপতির রায়ে আমি সম্মত।

বিচারপতি ই জ্যাক্সন।—আমারও ঐ মত।

বিচারপতি মার্কবি।—এই মোকদ্দমা বিচারপতি বেলি এবং আমার কর্তৃক পূর্ণাধিবেশনে অর্পিত হয়, কারণ, আমরা বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, যে দলীলের আমাদের অর্থ করিতে হইবে, তাহা কেবল ঐ তারিখের এক তমঃসুকের টাকা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তর না করিবার একরার মাত্র, অতএব এই দলীল বন্ধকী দলীল গণ্য হইবে কি না, তাহা নির্ণয় করা আমাদের বিবেচনায় আবশ্যকীয় বোধ হইয়াছিল। উভয় পক্ষের উকীলের সম্মতি মতে আমরা যে অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়া রায় দিয়াছিলাম তৎপরিবর্ত্তে এই পূর্ণাধিবেশন আদালতের অনুবাদকের দ্বারা যে অনুবাদ করাইয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই এইক্ষণে রায় প্রদত্ত হইল।

আমার ভিন্ন এই পূর্ণাধিবেশনের আর সকল বিচারপতিরই রায় এই যে, উক্ত নূতন অনুবাদে এমন সকল বাক্য আছে, যাহা শুদ্ধ হস্তান্তর না করার একরার অপেক্ষায় অধিক ব্যাপক, অর্থাৎ, তাহাতে বন্ধক সৃজন করার মনস্থ ব্যক্ত আছে।

যদি তাহাই হয়, তবে আমি ও বিচারপতি বেলি যে সাধারণ প্রশ্নের উপরে আদালতের নিষ্পত্তি হওয়ার আশা করিয়াছিলাম, তাহা উত্থিত হয় না। কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, এই নূতন অনুবাদেও আমি এমন কোন লেখা দেখিতে পাই না, যদ্দ্বারা, কেবল হস্তান্তর না করার একরার ভিন্ন, বন্ধক সৃজন করার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, এবং আমার এখনও ইচ্ছা ছিল যে, আমরা যে সাধারণ প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছিলাম তাহার উপরেই আদালতের নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু যেহেতু তাহা হইবে না, অতএব আমার এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তমঃসুকের দেনা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইতে পারিবে না, কেবল এই একরার ভিন্ন উপস্থিত দলীলের যে, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

# প্রধানতম বিচারালয়ের

## আপীল বিভাগের

## রী নিষ্পত্তি।

ভাগ। ১৮৭০

৮ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং
এফ, বি, কেম্প।

মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র গোস্বামী এবং মহাভারত দোবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম কালী সরকার, হরি মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহন নগদী।

মেং ডবলিউ বর্ক বারিষ্টর, দরখাস্তকারিগণের কৌন্সেল।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬৮ ধারা মতে, মাজিষ্ট্রেট যখন কোন অপরাধ-জনক কার্য্য হইবার বিষয় অবগত হন, তখনই কেবল তিনি কোন অভিযোগ ব্যতীত ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারেন। স্বকপোলকল্পিত সন্দেহ বা কোন গয়রুজ্বা দরখাস্ত হইতে যে গোপনীয় সংবাদ পাওয়া যায়, তন্মূলক বিশ্বাস ঐ অবগতি নহে। গোপনীয় হউক বা নাই হউক, মাজিষ্ট্রেট যে সংবাদ দৃষ্টে কার্য্য করেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে বাধ্য।

মাজিষ্ট্রেট ৬৮ ধারা অনুসারে যে ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন, তাহা কএদ করিবার ওয়ারেণ্ট নহে, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে যত সময়ের আবশ্যক হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক দিন তাহাকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে না, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলেই উক্ত ওয়ারেণ্টের কার্য্য শেষ হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিতে হইলে অথবা অতিরিক্ত কাল আটক রাখিতে হইলে ২২২ বা ২২৪ ধারা মতে নুতন ওয়ারেণ্ট জারী করিতে হইবে।

কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত আবদ্ধ রাখা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেলে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে, মাজিষ্ট্রেটের এরূপ সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক যে, ঐ আসামীর কিছু অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে, অথবা এরূপ বিশ্বাসের ন্যায্য কারণ আছে যে, তাহার প্রতি যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত সে অপরাধী।

যখন উপযুক্ত তদন্তের পর এমত কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশ্বাস জন্মে যে, কোন এক সাক্ষী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইবে না, তখনই কেবল তিনি সেই সাক্ষীর উপর ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন। সমনের পরিবর্ত্তে একেবারে সমুদায়ই ওয়ারেণ্ট জারী করা উক্ত ধারা মতে হইতে পারে না। ১৮৮

ধারা মতে যে ওয়ারেণ্ট দেওয়া হয়, তাহা ৭৬ ধারান্তর্গত 'বি' চিহ্নিত পাঠ অনুযায়ী গ্রেপ্তারী পরওয়ানা, 'সি' চিহ্নিত পাঠ অনুযায়ী নহে।

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিন দিবার অনুমতি দিতে মাজিষ্ট্রেট এমত কোন সর্ত্ত স্থাপন করিতে পারেন না, যদ্দ্বারা তাহার ঐ জামিন দিবার ব্যাঘাত জন্মে।

যে বিধিতে সংস্থাপিত হইয়াছে যে, কোন সাক্ষী অপরাধীকে বাহির করিবার যে সন্ধান গবর্ণমেণ্টকে বলিয়া দেয়, তৎসম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে না, তাহা কেবল রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ বা মাল সংক্রান্ত আইন উল্লঙ্ঘনের অপরাধ সম্বন্ধেই প্রয়োগ হয়; যে স্থলে মাজিষ্ট্রেটকে কোন সংবাদ জানান হয়, এবং তিনি উদ্দিষ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতায় কার্য্য করেন, তাহাতে প্রয়োগ হয় না।

কোন পুলিস-কর্ম্মচারীর রিপোর্টে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়, তৎসম্বন্ধে যদিও উক্ত রিপোর্ট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১২৫ ধারা মতে কোন প্রমাণ নহে, তথাপি সেই কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সাক্ষ্য দয়, তাহা খণ্ডনার্থে বা বুঝাইবার জন্য ঐ রিপোর্ট প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত রিপোর্ট লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সেই পুলিস-কর্ম্মচারীকে জেরা ওয়াল করিতে পারে, এবং তাহাকে ঐ রিপোর্ট দাখিল করিতে বাধ্য করিতে পারে। যে স্থলে কোন আসামী বিচারার্থে সেশনে অর্পিত হয় এবং তাহার সাক্ষীর তালিকা দেয়, তাহাতে মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২২৮ ধারার অধীনে, সেই সকল সাক্ষীকে সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সমন করিতে পারেন। ২২৭ ধারা স্পষ্ট আজ্ঞা-সূচক, এবং কোন আসামী তাহার কোন জওয়াব সেশন আদালতে বলিবার জন্য রাখিয়া দিতে চাহিলে মাজিষ্ট্রেট তাহাতে বাধা দিতে পারেন না; ২০৭ ধারায়ই মাজিষ্ট্রেটকে কোন আসামীর পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করা না করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬৬ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং কোন মোকদ্দমা প্রথমে গ্রহণ করিয়া পশ্চাতে অন্য কোন বিচারকের নিকট পাঠাইতে পারেন না; কিন্তু যে স্থলে মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বাহির করা পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি সেই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন, এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে বা কোন পুলিস-কর্ম্মচারীকে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করিতে বলিতে পারেন, অথবা নিজেও ৬৬ ধারা অনুসারে অভিযোগ করিতে পারেন। তিনি এমত কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে বাধ্য নহেন যাহাতে তিনি নিজের উপর অভিযোক্তার কার্য্যের ভার লওয়া আবশ্যকীয় বোধ করেন।

বিচারপতি নর্ম্যান।—উপরের লিখিত মোকদ্দমা সমূহের পক্ষগণের কৌন্সেল বর্ক সাহেব এ আদালতে এই প্রার্থনায় দরখাস্ত করেন যে, বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেট গ্রাণ্ট সাহেব যে হুকুম দ্বারা পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশ গোস্বামী এবং মহাভারত ঘোষকে তাঁহার নিকট আসামী স্বরূপে জওয়াব দিতে আদেশ করেন, এবং অপর যে এক হুকুম দ্বারা তিনি কালী সরকার, হরি, মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহনের সেশন আদালতে বিচার হইবার আদেশ করেন, তাহা রহিত করা হউক, অথবা যদি এ আদালতের এই মত হয় যে, দরখাস্তকারিগণের মধ্যে কাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আছে, তবে উক্ত মোকদ্দমা বিচারার্থে বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট বা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পণ করা হউক।

এই আদালত মহেশ গোস্বামি-কর্তৃক সত্যতা লিখিত মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরখাস্ত পড়িয়া ২৬ এ অক্টোবর তারিখে হুকুম দেন যে, মাজিষ্ট্রেট অবিলম্বে সমস্ত প্রমাণ এবং তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত হুকুম সহ কাগজাত পাঠাইয়া দেন এবং দরখাস্তে তাঁহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তাঁহার যে জওয়াব থাকে তাহা এই আদালতে পাঠান; এবং মাজিষ্ট্রেটের ঐ জওয়াব দিতে সমর্থ হইবার জন্য উক্ত দরখাস্তের এবং তাহাতে যে হুকুম হয় তাহার নকল মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান হয়।

মাজিষ্ট্রেটের বর্ণনা-পত্র হইতে এই সকল মোকদ্দমার প্রথমাবস্থার নিম্নলিখিত মর্ম্ম গৃহীত হইল।

৮ ই আগস্ট তারিখে বিষ্ণুপুর পুলিসষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এই অভিযোগ হয় যে, অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায়গণের চাকরেরা নন্দ ডোম নামক এক ব্যক্তিকে মারপিট করিয়াছে, এবং সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া আছে। উক্ত কর্ম্মচারী তদন্ত করণানন্তর নন্দ ডোম কিঞ্চিৎ শোনিতাক্ত এক খানা বস্ত্রে আবৃত হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া আছে, কিন্তু শরীরে কোন আঘাতের দৃষ্টব্য চিহ্ন নাই দেখিয়া ডাক্তরকে দেখাইবার জন্য সেই মহকুমার সদর স্থানে অর্থাৎ মেদিনীপুরের অন্তর্গত গড়বেতায় পাঠাইতে বলেন। উক্ত ডোমকে এক খানা ডুলী করিয়া বিষ্ণুপুরে নেওয়া হয়, এবং সেই দিবস অপরাহ্নে (৯ ই) এক জন কনষ্টেবেলের জেম্মায় পাঠান হয়, যাহার প্রতি এই আদেশ ছিল যে, সে যত শীঘ্র হইতে পারে, ঐ ডোমকে গড়বেতার কর্তৃপক্ষগণের নিকট (আমি বোধ করি গ্রাণ্ট সাহেব এস্থলে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে মনে করেন) উপস্থিত করিবে।

উক্ত অভিযোগের মর্ম্ম এবং উক্ত ডোমকে যে, ডাক্তর দেখাইবার জন্য গড়বেতা মোকামে পাঠান হয়, তাহা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনের দৈনন্দিন খাতায় রীতিমত লেখা হয়।

যে কনষ্টেবেল ঐ ডোমকে গড়বেতায় লইয়া যায়, সে ১১ ই আগস্ট তারিখে বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগত হইয়া এই রিপোর্ট করে যে, কেবল সামান্য আঘাতের মোকদ্দমা বিধায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাহা পুলিসের অভিযোগে লইতে অস্বীকার করেন, এবং উক্ত ডোমকে এই বলিয়া দেন যে, সে ইচ্ছা করিলে রীতিমত নালিশ করিতে পারে। ডাক্তর দেখিয়া কি সব্যবস্থ করেন তাহার বিশ্বাসযোগ্য কোন সংবাদ না পাওয়ায় উক্ত কর্ম্মচারী সংবাদ পাওয়ার জন্য ১৫ ই আগস্ট তারিখে গড়বেতার কোর্ট-সবইনস্পেকটরকে লিখিয়া পাঠান। সব্‌ইনস্পেকটর তাহার এই উত্তর দেন যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা সামান্য আঘাতের বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, ইত্যাদি। দেখান হইয়াছে যে, এক ব্যক্তি ১১ ই তারিখে আপনাকে নন্দ ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া গড়বেতার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হয়, কিন্তু অভিযোগ করিতে চাহে না।

১৩ ই তারিখে গ্রাণ্ট সাহেব পুলিসের ডিষ্ট্রিক্‌ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট এই সংবাদ পান যে, অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায়গণের চাকরেরা এক জন ডোমকে এরূপ মারপিট করে যে, সে কয়েক দিন মৃতপ্রায় পড়িয়া থাকে, এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা তাহার সেই মুমূর্ষাবস্থায় কর্তৃপক্ষগণকে এই জন্য হস্তক্ষেপ করিবার প্রার্থনা করে যে, পাছে তাহার মৃত্যুর পর বন্দ্যোপাধ্যায়গণ তাহার মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়া ঐ অপরাধের সমস্ত প্রমাণ বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। গ্রাণ্ট সাহেব বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারীর উপর তদন্তের ভার দিয়া ডিষ্ট্রিক্‌ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টকে ঐ বিষয়ের তদন্ত করার জন্য আদেশ দেন। গ্রাণ্ট সাহেব যে দুই পুলিস কর্ম্মচারীর প্রতি তদন্তের ভার দিতে বলেন, তাহাদের রিপোর্ট ১৬ ই তারিখে তাঁহার নিকট পৌঁছে। এই দুই কর্ম্মচারী স্বতন্ত্র তদন্ত করিয়া স্বতন্ত্র রিপোর্ট করে। যে কর্ম্মচারীর উপর বিষ্ণুপুর-পুলিসের ভার ছিল তাহার এক চিঠী সহ, যে নন্দ ডোমকে মারপিট করিবার এবং গড়বেতায় পাঠাইবার কথা বলা হয়, তাহাকে এবং ঐ দুই রিপোর্ট ১৬ ই আগস্ট তারিখে গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত করা হয়। উক্ত দুই রিপোর্টেই এই কথা লিখিত ছিল যে, নন্দ ডোমকে মারপিট করা হয়, গড়বেতা মোকামে লইয়া যাওয়া হয়, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হয়, কিন্তু তিনি সেই মোকদ্দমা পুলিসের নিকট হইতে না লইয়া নন্দ ডোমকে স্বয়ং অভিযোগ করিতে বলেন, সে তাহা করিতে চাহে না। যে ব্যক্তি গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে নন্দ ডোম বলিয়া পরিচয় দেয় সে গ্রাণ্ট সাহেবের নিকটে অভি-

যোগ করিতে অসমর্থ হওয়াতে গ্রান্ট সাহেব তাহাকে ছাড়িয়া দেন।

যে পুলিস-কর্ম্মচারীকে নন্দ ডোমের সহিত বিষ্ণুপুর হইতে গড়বেতা মোকামে পাঠান হয়, তাহাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রাস্তায় গৌণ হওয়ার হেতুতে ১০ টাকা জরিমানা করেন, এই কথা সে বিষ্ণুপুর মোকামে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট করাতে গ্রান্ট সাহেব যে হুকুমদ্বারা উক্ত পুলিস-কর্ম্মচারীকে জরিমানা করা হয়, তাহা তলব দেন। গ্রান্ট সাহেবের তলবের উত্তরে প্রকাশ পায় যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উক্ত কনষ্টেবেলকে কোন জরিমানা করেন নাই, বা সে যে রাস্তায় গৌণ করে এ বিষয়ের কোন উল্লেখও করেন নাই।

গ্রান্ট সাহেব বলেন যে, বিষ্ণুপুর হইতে গড়বেতা ৮ ক্রোশ মাত্র ব্যবধান, রাস্তা সরকারী পাকা রাস্তা, মধ্যে কেবল একটা নদী আছে, তাহার উপর পুল না থাকিলেও তাহা চলিয়া পার হওয়া যায়। উক্ত পুলিস-কর্ম্মচারী ৯ই তারিখে দিবা দুই প্রহরের পূর্ব্বে বিষ্ণুপুর হইতে রওয়ানা হয়, এবং সেই দিবস সায়ংকালেই গড়বেতা পৌঁছিয়া তাহার রিপোর্ট করা উচিত ছিল, কিন্তু সে ১১ ই তারিখে প্রাতে ১০ ঘটিকার পূর্ব্বে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হয় না, এবং যে ব্যক্তি উক্ত পুলিস-কর্ম্মচারীর জেম্মায় ছিল, সে যখন বিষ্ণুপুর হইতে রওয়ানা হইবার সময় অচেতনাবস্থায় ছিল, এবং দাঁড়াইতে বা চলিতে অসমর্থ ছিল, তখন যে, সে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়াই নিজে সমুদায় কথা বলিতে সমর্থ হইয়াছে, এই সকল দেখিয়া গ্রান্ট সাহেবের এই বিশ্বাস হয় যে, কোন দুষ্টাভিসন্ধি সাধিত হইয়াছে। তিনি কি উপায় অবলম্বন করিবেন, তাহা যখন তিনি ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে, তিনি বলেন, "আমি "সংগোপনে" (অন্য এক স্থলে প্রকাশ যে, গয়বুল্লা দরখাস্ত দ্বারা) "যে সংবাদ পাইয়াছি, "তাহাতেই এ মোকদ্দমার ভাব অনেক স্পষ্ট "হইয়াছে। তাহা এই যে, যে বন্দ্যোপাধ্যায়গণের "চাকরেরা তাহাদের হুকুম মতে উক্ত ডোমকে "মারপিট করে (ঐ মারপিটই এই সমুদায় মোকদ্দমার মুল) "তাহারা ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে "গড়বেতা যাইবার সময় উক্ত কনষ্টেবেলের "নিকট হইতে লইয়া গোপনে স্থানান্তরিত করে, "এবং উক্ত কনষ্টেবেলকে বশ করিয়া ঐ পীড়িত "ব্যক্তির পরিবর্ত্তে অন্য এক ব্যক্তিকে দেয়। "সেই সঙ্গে আমি উক্ত পীড়িত ব্যক্তির সেই "আঘাতে মৃত্যু হইবারও সংবাদ পাইয়াছি।"

দরখাস্তের ২ য়, ৩ য়, ৪ র্থ, ৫ ম, ৬ ষ্ঠ, ৭ ম, এবং ৮ ম দফায় বলা হইয়াছে যে, ১৬ ই আগষ্ট তারিখে নন্দ ডোম উপস্থিত হইয়া অভিযোগ উঠাইয়া লয়, এবং গ্রান্ট সাহেব স্বয়ং স্থির করেন যে, দরখাস্তকারিগণের বিরুদ্ধে আর কিছু করিবার কোন হেতু নাই; ঐ ১৬ ই আগষ্ট হইতে গ্রান্ট সাহেব দরখাস্তকারিগণ কর্ত্তৃক এমত কোন অপরাধজনক কার্য্য হইবার বিষয় জ্ঞাত হন নাই যাহা তিনি সঙ্গতরূপে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬৮ ধারা অনুসারে বিচার করিতে পারেন; ২৪ এ আগষ্ট তারিখে অভিযোগের পক্ষের সাক্ষিগণকে ধৃত করিবার জন্য আইন-বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী করা হয়, তাহাদিগকে আইন-বিরুদ্ধ রূপে ধৃত করা হয়, এবং আটক রাখা হয়; সেই তারিখে দরখাস্তকারিগণকেও ধৃত করিবার জন্য আইন-বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী করা হয়; তাহাতে ১৮৬৯ সালের ২৪ এ আগষ্ট এবং ৬ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে আইন-বিরুদ্ধ রূপে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দরখাস্তকারীকে ধৃত করিয়া ১৪ দিন, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৯ দিন, কালী সরকার, হরি মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহনকে ৮ দিন জেলে কয়েদ রাখা হয়; উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী এবং ৬ ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে যে এক পক্ষ গত হয়, তাহার মধ্যে দরখাস্তকারিগণের বিরুদ্ধে যে কোন অভিযোগ হইয়া থাকুক বা হইতে পারে তাহা সত্য কি মিথ্যা

তাহার তদন্তের প্রার্থনায় গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট অনেক দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু যদিও মাজিষ্ট্রেট ও যে পুলিস-কর্ম্মচারিগণ উক্ত তদন্ত করেন তাঁহারা উক্ত সমুদায় কালে সেই সদর ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন, যে স্থানে দরখাস্তকারিগণ ঐ সাক্ষিদিগের সহিত হাজতে ছিল, তথাপি তাহাদের দরখাস্তের প্রতি মনোযোগ করা হয় নাই; দরখাস্তকারিগণর বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে জ্ঞানকৃত বধের বা গুরুতর পীড়া দিবার অভিযোগে ধৃত করা হয়, কিন্তু গ্রাণ্ট সাহেব তাহাদিগকে ওয়ারেণ্ট দেখিতে দেন নাই; কিন্তু তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উক্ত সমুদায় ওয়ারেণ্টই রীতি এবং আইন-বিরুদ্ধ।

গ্রাণ্ট সাহেবের জওয়াব এই:—"এ পর্য্যন্ত "আমার নিকট যে সকল পুলিস-রিপোর্ট হই-"য়াছে, তাহাতে যাহাদিগকে মারপিটের মুল "ঘটনায় অথবা পীড়িত ব্যক্তিকে স্থানান্তর করি-"বার কার্য্যে লিপ্ত থাকা প্রদর্শিত হইয়াছে, "তাহাদের সমুদায়কে ধৃত করিতে আমি ফৌজ-"দারী কার্য্য-বিধির ৯৮ ধারা অনুসারে ওয়া-"রেণ্ট জারী করি। উক্ত ব্যক্তির মারপিটেই মৃত্যু "হয়, এই বিশ্বাসে আমার ওয়ারেণ্ট সমস্তে "দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অথবা 'উক্ত' ধারার "যোগে ১০৯ ধারার উল্লেখ থাকে। মহেশ "বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব ডোম, "ধনকৃষ্ণ, ঐ কনষ্টেবেল, এবং যে ব্যক্তি আপ-"নাকে নন্দ ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার "নিকট উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহাকে আমি "কৃত্রিম নন্দ জ্ঞান করিয়াছি, কারণ, আমি "অনুমান করিয়াছিলাম যে, প্রকৃত নন্দ ঐ মার-"পিটের দ্বারাই মরিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে ও "মহেশ গোস্বামী এবং মহাভারত নগদী, এই "কয়েক ব্যক্তিকেই ঐ রূপে ধৃত করা হয়। "আর যে ছয় ব্যক্তির উক্ত ব্যক্তিকে প্রকৃত "নন্দ ডোম বলিয়া নিশান দিবার কথা পুলিস-"রিপোর্টে বর্ণিত হয়, তাহাদের বিরুদ্ধেও আমি "ঐ সময়ে গ্রেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট জারী করি; "এই কয়েক ব্যক্তির নাম পার্শ্বে * দেওয়া গেল;

* কানাই গোস্বামী
দীনু সেন
মাধব ডোম
কৈলাস ডোম
তারাচাঁদ ডোম
মাধব চক্রবর্ত্তী

"তাহাদিগকে প্রথমতঃ "সাক্ষী স্বরূপে আমার "নিকট কেবল নন্দের "নিশানা দিবার জন্য "ধৃত করা হয়, এবং "তাহাদের বিরুদ্ধে "ফৌজদারী কার্য্য-"বিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট জারী "হয়। আবার পার্শ্বলিখিত † ব্যক্তিগণের

† তারক রায়, হেড্ কনষ্টেবেল
শিবন পাত্র
জয়নারায়ণ মণ্ডল
বলাই সেখ

"নামে এই জানিয়া "ঐ ধারা অনুসারে "ওয়ারেণ্ট জারী করা "হয় যে, তাহারা উক্ত "পীড়িত ব্যক্তিকে ঐ "কনষ্টেবেলের নিকট হইতে লইয়া যাইবার "বিষয়ের সাক্ষ্য দিতে পারে; সেই সঙ্গে "আমি এক জন পুলিস-কর্ম্মচারীকে উক্ত "মোকদ্দমার নুতন তদন্ত করিয়া রিপোর্ট "করিবার হুকুম দেই।

"অভিযুক্ত মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৪ এ "তারিখে ধৃত করা হয়, পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮ এ "তারিখে এবং মহেশ গোস্বামী ২৭ এ তারিখে "আত্মসমর্পণ করে। মাধব ডোম, ধনকৃষ্ণ "এবং ঐ কৃত্রিম নন্দকে ২৮ এ তারিখে এবং "মহাভারত নগদীকে ২৯ এ তারিখে ধৃত করা "হয়।

"যাহাদিগের নাম পার্শ্বলিখিত (সাক্ষি-"গণের) প্রথম তালিকায় আছে, তাহাদিগকে "২৮ এ তারিখে উপস্থিত করা হয়। পার্শ্ব-"লিখিত দ্বিতীয় তালিকার সাক্ষিগণকে ২৯ এ "আগষ্ট তারিখে উপস্থিত করা হয়। মহেশ "বন্দ্যোপাধ্যায়, মাধব ডোম, কৃত্রিম নন্দ ডোম "এবং ধনকৃষ্ণকে ৩০২ ধারা অনুসারে অথবা "উক্ত ধারার সহিত ১০৯ ধারার যোগে, জেলে "পাঠান হয়। যে মহেশ গোস্বামী এবং মহা-

"ভারত নগদীকে প্রথমতঃ কেবল ৩২৫ ধারা "অনুসারে ধৃত করা হয় তাহারাও মহেশ "বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্ণ. বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ন্যায় লিপ্ত ছিল এমত রিপোর্ট দেখিয়া উল্লিখিত "অভিযোগে অর্থাৎ ৩০২ ধারা অনুসারে তাহা- "দিগকেও জেলে প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত "কোন ব্যক্তির নিকট হইতেই জামিন লওয়া "হয় না।

"পাশ্বস্থ প্রথম তালিকা-লিখিত ব্যক্তিগণকে "যে যে অবস্থায় পুলিসের নিকট অপর এক "ব্যক্তিকে নন্দ ডোম বলিয়া পরিচয় দিতে দেখা "যায় তাহা বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে যখন "হাজতে দেওয়া হয়, তখন তাহাদিগকে মিথ্যা "সংবাদ দিবার অভিযোগে, প্রত্যেকে ২০০ "শত টাকার জামিন না দিলে জেলে প্রেরণের "হুকুম দেওয়া হয়।

"আমি দুইটি নির্দ্দিষ্ট সন্ধান অনুসারে "অর্থাৎ ২৩ এ আগষ্ট তারিখে আমি গোপনে "যে সংবাদ পাই তাহা এবং দ্বিতীয়তঃ, আমার "১৩ ই আগষ্টের হুকুম মতে পুলিসের তদন্তের "রিপোর্ট অনুসারে এই পর্য্যন্ত করি।

"৩০ এ আগষ্ট তারিখে আমি আরো "সংবাদ পাই। আমি জেলরের এক পত্রে "অবগত হই যে, উল্লিখিত আসামীগণের মধ্যে "দুই ব্যক্তি মাধব ও নন্দ ডোম আমার নিকট "কোন বিষয় বলিবার জন্য আমার সহিত দেখা "করিতে চাহে। আমি ঐ দুই ব্যক্তিকে ডাকিয়া "পাঠাই এবং তাহাদের প্রত্যেকের বর্ণনা "লিখিয়া লই, এবং তাহা হইতে যে সংবাদ "পাওয়া যায় তদনুসারে আমি কালী সরকার, "হরি মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী, রামচাঁদ "চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহন নগদীর বিরুদ্ধে "দণ্ড-বিধির ১০৯ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট "জারী করি।

"সেই সঙ্গে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে কেত্তু ডোম, হর ডোম এবং "আনন্দমুখী নামক এক তামলীর নামে সাক্ষী "স্বরূপ ওয়ারেণ্ট জারী হয়।

উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কালী "সরকার, ফুলমোহন নগদী এবং হরি মুখো- "পাধ্যায়কে ১ লা সেপ্টেম্বর এবং রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও হর গোস্বামীকে পৃথক্ রূপে ৬ ই "সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার করা হয়।

"যে কর্ম্মচারীর প্রতি আমি ২৪ এ তারিখে "হুকুম দেই, তাহার রিপোর্টের তারিখ ২৯ এ "(রবিবার) এবং তাহার পর দিন (সোমবার) "আমি ঐ নূতন সংবাদ পাই, যাহাতে আমাকে "উক্ত তারিখে ওয়ারেণ্ট দিতে হয়, এবং তাহা "তাহার পর দিবস অর্থাৎ ১ লা সেপ্টেম্বরে "জারী হয়।

"যাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হয় "তাহাদের মধ্যে কেবল রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং "হর গোস্বামী ব্যতীত আর সকলেই সেই "তারিখে হাজতে ছিল।

"ইতিমধ্যে আসামীগণকে আমার হুকুম "অনুসারে প্রথম হইতেই এমত রূপে জেলে রাখা হয় যে, বন্দ্যোপাধ্যায়গণ ও তাহাদের "পক্ষের লোকেরা উক্ত ডোম প্রভৃতি অর্থাৎ "যাহাদিগকে প্রথমতঃ সাক্ষী স্বরূপে ধৃত করা "হয়, কিন্তু পরে বন্দ্যোপাধ্যায়গণও তাহাদের "চাকরদিগের সহায়তা ও পোষকতা করার অভি- "যোগে জেলে দেওয়া হয়, তাহাদের সহিত কোন "পরামর্শ না করিতে পারে।"

"আমার ইহা করিবার কারণ এই যে, আমি "এই শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে সাক্ষী স্বরূপে গ্রহণ "করিতে প্রায় কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম। ঐ "সকল ব্যক্তি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাহাদের "চাকরদের দ্বারা বাধ্য হইয়াই অপরাধ করি- "য়াছে বিবেচনায় আমার এই চেষ্টা ছিল যে, "তাহারা জেলের মধ্যে উক্ত ডোমদিগকে বশ "করিতে না পারে। ৬ ই সেপ্টেম্বর তারিখে "আমি উক্ত মোকদ্দমার বিধিমত বিচারে প্রবৃত্ত

"হই, এবং নন্দ ডোমের যে চারি জন আত্মীয়
"তাহাকে ডুলি করিয়া লইয়া যায়, সেই তারিখে
"আমি তাহাদের, এবং বিষ্ণুপুর ছাড়িয়া তাহারা
"যে ছত্রীতে থাকে তাহার রক্ষকের সাক্ষ্য
"গ্রহণ করি।"

কতকগুলি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবল যে কখন তাহাদের অভিযোক্তার সহিত দেখা হইতে না দিয়া এমত নহে, তাহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইয়াছিল তাহার বিষয়ও তাহাদিগকে জানিতে না দিয়া ৮ দিন হইতে ১৪ দিন পর্য্যন্ত জেলে রাখা হইয়াছিল, এ কথা মাজিষ্ট্রেটের নিজের বর্ণনা না থাকিলে, কদাচিৎ বিশ্বাসযোগ্য হইত। এরূপ কার্য্য সুবিচারের মূল সূত্র সমস্তের বিরুদ্ধ।

আমি এক্ষণে এই দেখাইতেছি যে, মাজিষ্ট্রেট যে যে উপায় অবলম্বন করেন তাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধির সংস্থাপিত নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত।

মাজিষ্ট্রেট ৬৮ ধারা অবলম্বনে কার্য্য করেন; তাহাতে এই বিধিবদ্ধ আছে যে, তাহাতে যে বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্যস্থলে জেলার মাজিষ্ট্রেট "যদি "কোন অপরাধের কথা অবগত হন তবে নালিশ "না হইলেও তিনি সেই অপরাধ বিচারার্থে "গ্রহণ করিতে পারেন। ও যাহাকে অপরাধী জানা "যায় কি যাহার প্রতি সন্দেহ থাকে, তাহার নামে "নালিশ হইলে যেমন করিতে পারিতেন তদ্রূপে "সমন জারী করিতে, অথবা যে স্থলে ওয়ারেণ্ট "জারী হইতে পারে সেই স্থলে গ্রেপ্তারী ওয়া- "রেণ্ট জারী করিতে পারিবেন।"

মাজিষ্ট্রেটের নিজের বর্ণনামতেই দেখা গিয়াছে যে, তিনি মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও অন্যান্যের নামে জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে ওয়ারেণ্ট জারী করিয়াছেন।

৬৮ ধারা মতে, মাজিষ্ট্রেট কেবল এমত কোন অপরাধের তদন্ত করিতে পারেন যাহার বিষয় তিনি অবগত হন। এমত তর্ক কখনই করা যাইতে পারে না যে, জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ করিবার বিষয় মাজিষ্ট্রেট অবগত হইয়াছিলেন। কোন গয়াবুল্লা দরখাস্ত দৃষ্টে যে গোপনীয় সংবাদ পাওয়া যায় তন্মূলক কোন স্বকপোলকল্পিত সন্দেহ বা বিশ্বাস ঐরূপ অবগতি নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে তাহা মাজিষ্ট্রেট যে প্রণালীতে গ্রহণ করিয়াছেন, আসামী-গণের প্রতি তাহা অপেক্ষা অন্যায় আর কিছুই হইতে পারে না। মাজিষ্ট্রেট স্পষ্ট বাক্যে বলেন যে, মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পূর্ণ বন্দ্যোপা-ধ্যায়কে যে ধৃত করা হয় তাহা গোপনীয় সংবাদ পাইয়াই করা হয়। উক্ত সংবাদই যদি অভি-যুক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা নালিশ হয়, তবে তাহা ৬৬ ধারা অনুসারে লিখিয়া লইয়া অভিযোক্তা এবং মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা স্বাক্ষ-রিত হইলেই কেবল তদ্দৃষ্টে কার্য্য করা যাইতে পারে। • • • •

তাহা স্পষ্টই ঐরূপ লেখা হয় নাই। আসামী-গণ তৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই। এখনও তাহারা জানে না, কে তাহাদের অভিযোক্তা, অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট উক্ত নথী এবং আপন জওয়াব এই আদালতে পাঠাইবার সময় তাহা কেবল তাঁহার গোপনীয় সংবাদ বলিয়া উল্লেখ করেন। সেই সংবাদ কি প্রকারে পাওয়া হয় তিনি তাহা আসামী-দিগকে বলা উচিত বোধ করেন নাই। উক্ত নথীর মধ্যে আমরা বাঙ্গালায় লিখিত যে এক খানা কাগজ পাইলাম তদ্দৃষ্টেই আমাদের বিশ্বাস হইতেছে যে, উক্ত গোপনীয় সংবাদ এক গয়াবুল্লা দরখাস্তে ছিল। • • •

কোন ব্যক্তির প্রতি কোন অপরাধের সন্দেহ হইলে ৬৮ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট যে ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন তাহা ৭৬ ধারা-বর্ণিত 'বি' চিহ্নিত পাঠের গ্রেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট। এই ওয়ারেণ্ট যে কর্ম্মচারীকে দেওয়া হয় সে কেবল তাহা দ্বারা উক্ত অভিযুক্ত বা সন্দেহকৃত ব্যক্তিকে ধৃত করিতে এবং মাজিষ্ট্রেটের সমীপে উপস্থিত করিতে পারে। তাহা জেলে দিবার ওয়ারেণ্ট নহে এবং মাজি

ষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে যত কাল আবশ্যক হয়, তাহা হইতে অধিক কাল কাহাকেও ঐ ওয়ারেণ্টমতে আটক রাখিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। যে কর্ম্মচারী উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী করে তাহার কর্ত্তব্য যে, উক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করিবার পর যত শীঘ্র হইতে পারে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করে; এবং উক্ত আসামীকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলেই উক্ত ওয়ারেণ্টের আজ্ঞা সম্পূর্ণ প্রতিপালিত এবং সমাধা হয়। উক্ত ওয়ারেণ্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিবার পর কেহই তাহাকে ন্যায্যরূপে আটক রাখিতে পারেন না। আসামীকে অধিক দিন আটক রাখিতে হইলে ২২৪ ধারান্তর্গত হুকুমের ন্যায় নূতন হুকুম বা ওয়ারেণ্টের দ্বারা রাখিতে হইবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিক কাল আটক রাখিবার ওয়ারেণ্ট কোন জেলরের বা অন্য যে ব্যক্তির আসামীদিগকে গ্রহণ করিবার এবং রাখিবার ক্ষমতা আছে তাহার নামে ২০২ ধারা অনুসারে কারাগারে অর্পণের ওয়ারেণ্ট হইবে। ৬৮ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের আসামীকে জেলে দিবার ওয়ারেণ্ট জারী করিবার ক্ষমতা নাই। এই ওয়ারেণ্ট যাহা 'সি' চিহ্নিত পাঠে হইবে, তাহাতে লিখিতে হইবে যে, আসামীর প্রতি কোন বিশেষ অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, এবং তাহাতে অর্পণকারী কর্ম্মচারীর ক্ষমতার উল্লেখ করিতে হইবে। উক্ত ওয়ারেণ্ট জারী করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটকে কোন অপরাধ থাকিবার বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, কারণ, নির্দ্দিষ্ট পাঠে ওয়ারেণ্ট লিখিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত বিষয় সপ্রমাণ হওনাবশ্যক। তাঁহাকে ১৯৪ ধারার বিধান মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে এবং ৪১ ও ১৯৩ ধারার বিধান মতে শপথ বা প্রতিজ্ঞা করাইয়া কোন সাক্ষীর বা সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণানন্তর তদ্দৃষ্টে ঐ বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কিছু কালের নিমিত্ত যথা, যে সকল সাক্ষী আসিতেছে জানা যায় তাহাদের আশা পর্য্যন্ত, বা এই রূপ অন্য কোন কারণে ক্ষণকাল আবদ্ধ রাখা ব্যতীত অন্য কোন কারণে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেলে দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট এই দেখিতে বাধ্য যে, প্রমাণে আসামীর কোন অপরাধ পাওয়া যায়, অথবা এই বিশ্বাসের উপযুক্ত কারণ আছে যে, তাহার প্রতি যে দোষারোপ হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত সে অপরাধী।

যদি মাজিষ্ট্রেট বিচার আরম্ভ করিবার পরে সাক্ষিগণের জবানবন্দী বা অতিরিক্ত জবানবন্দী গ্রহণ স্থগিত রাখা আবশ্যকীয় বোধ করেন, তবে তিনি ২২৪ ধারা অনুসারে লিখিত হুকুম দ্বারা তদন্ত স্থগিত রাখিতে, এবং ১৫ দিনের অনধিক যত দিন তাঁহার উচিত বোধ হয়, তত দিনের নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে পাঠাইতে পারেন। উপস্থিত মোকদ্দমায় তদন্ত স্থগিত রাখিবার কোন কথা হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট একেবারেই উপস্থিত করা হয় নাই, অথবা ৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত অর্থাৎ মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারীর পর চতুর্দ্দশ দিবস, পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রেপ্তারীর পরে নবম দিবস এবং আর আর সকলের গ্রেপ্তারীর পর অষ্টম দিবসের পূর্ব্বে তদন্তও আরম্ভ হয় নাই; এত কাল পর্য্যন্ত উল্লিখিত অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা অনুসারেই বিধি-বিরুদ্ধ রূপে জেলে আটক করিয়া রাখা হয়।

অভিযুক্ত মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে বিধি-বিরুদ্ধ রূপে আটক করিয়া রাখিবার কথা আমি বলিলাম। আমি এখন সাক্ষিগণের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্টের বিষয় পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এই রূপ ওয়ারেণ্ট দ্বারা ২৮ এ এবং ২৯ এ আগষ্ট তারিখে ১১ জন বা তদধিক ব্যক্তিকে ধৃত করা হয়। ঐ সকল ওয়ারেণ্টে এই লেখা হয়:— "কৈলাস তোমাকে

"সাক্ষী মানা হইয়াছে; অতএব অবিলম্বে উক্ত "কৈলাস ডোমকে ধৃত করিয়া আমার সমীপে "উপস্থিত করিতে তোমাকে হুকুম দেওয়া গেল।" দেখা যাইতেছে যে, তাহাতে গ্রেফতারীর কোন অভিপ্রায় বা হেতুর উল্লেখ করা হয় নাই। মাজিস্ট্রেট ভাবেন যে, তিনি ১৮৮ ধারামতে কার্য্য করিতেছিলেন। কিন্তু যখন মাজিস্ট্রেট এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ পান, অর্থাৎ উচিত মত তদন্ত করিয়া বিশ্বাস করেন যে, কোন সাক্ষীর প্রতি বল প্রকাশ না করিলে সে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হইবে না, তখনই কেবল তিনি ১৮৮ ধারা অনুসারে সমন না দিয়া অগ্রে ওয়ারেণ্ট দিতে পারেন। ঐ ধারার কখনই এ অভিপ্রায় নহে যে, মাজিস্ট্রেট কোন তদন্ত ব্যতীতই, যে কোন ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে পারিবে বলিয়া তাঁহার বোধ হয় তাহারই বিরুদ্ধে সমনের পরিবর্ত্তে এককালীন পরওয়ানা জারী করিতে পারিবেন, এবং তাহারা হাজির হইতে চাহে না, এই কথা বলিয়া ঐ রূপ অন্যায় ওয়ারেণ্টে দিবার দোষ এড়াইতে পারিবেন।

১৮৮ ধারা অনুযায়ী ওয়ারেণ্ট ৭৬ ধারা-বর্ণিত 'বি' চিহ্নিত পাঠে হইবে। কয়েক বৎসর হইল, কোন সাক্ষীকে অন্যায়রূপে ধৃত করিয়া লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ করাতে আমি দেখাইয়া দিয়াছিলাম যে, ১৮৮ ধারা অনুযায়ী ওয়ারেণ্ট সঙ্গত এবং 'বি' চিহ্নিত পাঠের অনুযায়ী হইবার জন্য যে বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে তাহা জারী করা হয় তাহা তাহাতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লিখিতে হইবে। (সদরলাণ্ডের ১ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ফৌজদারী সংক্রান্ত সরকুলর অর্ডর, ৭ পৃষ্ঠা দ্রুষ্টব্য)। 'বি' চিহ্নিত ওয়ারেণ্ট যাহাই কেবল মাজিস্ট্রেটের জারী করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাতে কেবল মাজিস্ট্রেটের নিকট সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার হুকুম থাকিবে, এবং তাঁহার কর্ত্তব্য এই হইবে যে, তাহার জবানবন্দী লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছাড়িয়া দেন।

যে সকল ব্যক্তিকে সাক্ষী স্বরূপে ধৃত করা হয় তাহার মধ্যে ছয় জনের অর্থাৎ কানাই গোস্বামী, দিন সেন, মাধব ডোম, কৈলাস ডোম, তারাচাঁদ ডোম, এবং মাধব চক্রবর্ত্তীকে হাজতে দিয়া মাজিস্ট্রেট বলেন যে, সমুদায় অবস্থা দৃষ্টে তাহারা যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এমত এক ব্যক্তিকে পুলিসের নিকট নন্দ ডোম বলিয়া পরিচয় দেয়, যে নন্দ ডোম নহে, তাহা প্রকাশ হওয়ায়, তাহাদিগকে মিথ্যা সংবাদ দিবার অপরাধে প্রত্যেকে ২০০ টাকার জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত জেলে রাখিবার হুকুম দেওয়া হয়।

যে বিধি সমস্তের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তদনুসারে জেলে পাঠান সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ বোধ হয়, কারণ, মাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াই তাহা করিয়াছেন। মাজিস্ট্রেটের নিকট পুলিসের রিপোর্ট এবং তিনি বরাবর যে গোপনীয় সংবাদ অর্থাৎ গয়রবুল্লা দরখাস্তের কথা বলিয়া আসিয়াছেন তাহা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩০ এ আগষ্ট তারিখে মাজিস্ট্রেট মাধব ডোম এবং নন্দ ডোমকে ডাকিয়া পাঠাইলে তাহারা তাঁহাকে কোন বিষয় জানায়। মাজিস্ট্রেট তাহাদের কথা লিখিয়া লয়েন। কিন্তু তাহারা তাহা শপথ করিয়া বলে না, বা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের কাহারও সাক্ষাতেও বলে না। গ্রাণ্ট সাহেব বলেন তিনি তাহাদের কথা বিচারক স্বরূপে লিখিয়া লন নাই, সরকারী কার্য্যনির্ব্বাহক স্বরূপে লইয়াছেন। সে যাহা হউক, তিনি উক্ত বর্ণনা দৃষ্টে মাজিস্ট্রেট স্বরূপে কার্য্য করিয়া তখনই কালী সরকার, হরি মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহন নগদীকে গ্রেফতারের ওয়ারেণ্ট জারী করেন এবং সেই সঙ্গে তিনি ক্ষেতু ডোম, হর ডোম এবং এক জন মুদী যাহার নাম তিনি জানেন না, এই তিন ব্যক্তিকে সাক্ষী স্বরূপে গ্রেফতারের জন্য ওয়ারেণ্ট জারী করেন। তিনি ঐ শেষোক্ত ব্যক্তিকে এক জন আমলী বলিয়া বর্ণনা করেন;

সে বাঁকুদহ মোকামের এক ছত্রীর অধ্যক্ষ। যে সকল ব্যক্তির প্রতি অপরাধের সন্দেহ হয় তাহাদের মধ্যে রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও হর গোস্বামী ব্যতীত আর সকল এবং ১৯ জন সাক্ষী গ্রেফ্তার হইয়া ১ লা সেপ্‌টেম্বর তারিখে হাজতে ছিল। উক্ত সাক্ষীদিগকে তাহাদের গ্রেফ্তারীর ভিন্ন ভিন্ন তারিখ হইতে আর না হউক, ৬ ই সেপ্‌টেম্বর পর্য্যন্ত এবং তাহাদের মধ্যে অধিকাংশকে তাহার অনেক পর পর্য্যন্ত বাস্তবিকই হাজতে রাখা হয়, কিন্তু কোন্ কানুনমতে রাখা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যথা, ক্ষেতু ডোমের জবানবন্দী ২৯ এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে লওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন, তিনি সাক্ষিগণের প্রতি কিছু দয়ার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন "আমি ঐই সকল সাক্ষীকে জেলে "কয়েদ করিতে পারিতাম; কিন্তু আমি তাহা "করি নাই। আমি তাহাদিগকে পুলিসের নজর- "বন্দীতে মাত্র পুলিসের ঘরে অপেক্ষাকৃত স্বাধী- "নতায় রাখি, তথায় ঐ রূপে রাখিবার উপযুক্ত "উৎকৃষ্ট স্থান আছে। কেবল তিন জন সাক্ষী যাহা- "দের ঐ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিষয় আমি এখ- "নও সম্পূর্ণ মীমাংসা করি নাই তাহাদিগকে, মাধব "ডোম, তাহার ভ্রাতা নন্দ, কিন্তু সেই প্রকৃত নন্দ "কি না, তৎপ্রতি আমার এখনও সন্দেহ আছে, "তারাচাঁদ ডোম এবং ১ নং কৈলাসকে জেলে "পাঠান হয়।"

আমি পূর্ব্বেই দর্শাইয়াছি যে, ১৮৮ ধারায় কোন সাক্ষীকে "সি" চিহ্নিত পাঠে জেলে অর্পণ করিবার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হয় নাই।

পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহাদের দরখাস্তের ৬ দফায় বলে যে, তাহারা ৬ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখের পূর্ব্বে হাজতে থাকিবার সময়ে জামিন লইয়া খালাস দিবার জন্য অনেক দরখাস্ত করে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে না, এবং ৬ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে তাহাদিগকে যে জামিন দিবার হুকুম দেওয়া হয়, তাহা এরূপে দেওয়া হয় যে, দরখাস্তকারিগণ তাহা হইতে কোন ফল প্রাপ্ত না হইতে পারে।

গ্রাণ্ট সাহেব বলেন—"দরখাস্তকারিগণের "মোক্তারেরা জামিন গ্রহণার্থে যে বাচনিক প্রার্থনা "করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু "এ বিষয় সম্বন্ধে কখন কোন লিখিত দরখাস্ত "দাখিল হয় নাই, এবং বাচনিক প্রার্থনা করা- "তেই কেবল জামিন লইতে অস্বীকার করা হয়, "কারণ, দরখাস্তকারিগণের প্রতি যে অপরাধের "অভিযোগ হয় তাহা যে আইন অনুসারে জামি- "নের যোগ্য নহে এরূপ বিশ্বাস করিবার ন্যায্য "হেতু ছিল। যথা, যখন মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায় "ও পূর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশ গোস্বামী ও "মহাভারত নগদীকে গ্রেফ্তার করা হয়, তখন "আমি যে সংবাদ পাইয়াছিলাম তাহাতে "আমার উচিত মতে এই বিশ্বাস হয় যে, "তাহারা নন্দ ডোমকে যে মারপিট করে "তাহাতেই তাহার মৃত্যু হয়; সুতরাং এরূপ "বিশ্বাসের উপযুক্ত হেতু ছিল যে, তাহারা জ্ঞান- "কৃত বধের বা, যে অপরাধ-জনক নরহত্যা "জ্ঞানকৃত বধ নহে তাহার অপরাধে অপরাধী "ছিল; উক্ত অপরাধে জামিন লওয়া হইতে "পারে না। আবার যখন কালী সরকার, "হরি মুখোপাধ্যায়, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং "ফুলমোহন নগদীকে গ্রেফতার করা হয়, তখনও "এরূপ বিশ্বাসের উপযুক্ত হেতু ছিল যে, তাহারা "নন্দকে গোপনে অন্যায় রূপে কয়েদ করিবার "অভিপ্রায়ে তাহাকে হরণ করিবার নিমিত্ত "অপরাধী, এবং এ অপরাধেরও জামিন হইতে "পারে না।"

আমি পূর্ব্বেই দর্শাইয়াছি যে, 'সি' পাঠের ওয়ারেণ্ট ব্যতীত আসামীগণকে কয়েদ করিয়া রাখিতে মাজিষ্ট্রেটের অধিকার ছিল না, এবং তাঁহার ঐ রূপ ওয়ারেণ্ট বিধিমতে জারী করিবার পূর্ব্বে আসামীগণকে আপন সমক্ষে উপস্থিত করাইয়া প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত ছিল।

মাজিষ্ট্রেট যদি রীতিমত প্রণালীতে চলিতেন তবে আসামীগণ জামিন দিবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সুযোগ পাইত, এবং মাজিষ্ট্রেট যদি ২২৪ ধারা অনুসারে তদন্ত স্থগিত রাখিবার আবশ্যক না দেখিতেন, তবে ৪১২ ধারার বিধান অনুসারে প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহার এবিষয়ের মীমাংসা করিতে হইত যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট জামিন গ্রহণ করা উচিত কি না।

দরখাস্তকারিগণ বলে, মাজিষ্ট্রেট ৬ ই সেপ্টেম্বর তারিখে এই হুকুম দেন যে, তাহাদের নিকট জামিন লওয়া হইবে। দরখাস্তকারিগণ আপত্তি করে যে, যে ১৬০০০ টাকার বা তাহাদের নিজের মুচলকা বাদে যে ৬৫০০০ টাকার জামিন চাওয়া হয় তাহা অত্যন্ত অধিক, এবং উক্ত হুকুমে এমত সকল সর্ত্ত ছিল যাহাতে তাহাদের জামিন দেওয়া অসম্ভব হইয়াছিল।

ঐ সকল সর্ত্ত এই :—"উক্ত জেলার অন্তর্গত "যে সকল জমিদারের নাম জমিদার বলিয়া "কালেক্টরীর তৌজিতে আছে, প্রত্যেক ব্যক্তির "তাহাদিগকে জামিন দিতে হইতে হইবে, এবং "এক জন জমিদারকে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের "মধ্যে একজনের অধিকের জামিন হইতে দেওয়া "হইবে না, অর্থাৎ যত জন অভিযুক্ত ব্যক্তি "আছে তাহার দ্বিগুণ জমিদার জামিন "আবশ্যক।" ইহাতে আসামীগণকে ১৬ জন জমিদারের জামিন দিতে হয়। জজের নিকট ৪৩৬ ধারা অনুসারে দরখাস্ত করায় তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের হাজির জামিনের পরিমাণ ৯৬০০০ টাকার স্থানে ৬০০০ টাকা করেন।

আমরা বলিতে পারি যে, জমিদার জামিন দেওয়ার এবং এক জন জমিদার একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন হইতে না পারিবার সর্ত্তে প্রতিবাদিগণকে যে জামিন দেওয়ার পক্ষে অনর্থক কষ্টে ফেলা হয়, তাহা আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য, মাজিষ্ট্রেটের তাহা করিবার অধিকার ছিল না।

৯ দফায় আপত্তি হইয়াছে যে, উক্ত ৬ ই তারিখে সাক্ষীর যে সকল জবানবন্দী লওয়া হয়, তাহা বিধিমতে লেখা হয় নাই, কারণ, তাহা ১৯৮ এবং ১৯৯ ধারার আদেশ মতে তাহাদের নিকট পঠিত বা তাহা তাহাদিগকে অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয় নাই।

প্রত্যেক জবানবন্দীর নিম্নে এই লেখা আছে :—"উপরোক্ত জবানবন্দী আমি স্বহস্তে "লিখিয়া লই নাই, কারণ, আমার হস্তের "শিরা ফুলিয়া অত্যন্ত বেদনা হওয়ায় আমি "তাহা করিতে স্বভাবতঃ অসমর্থ আছি, কিন্তু "আমার নিজের বাক্য ও অনুমতি মতে এবং "আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে তাহা লওয়া "হইয়াছে।"

মাজিষ্ট্রেট বলেন :—"১৯৮ এবং ১৯৯ ধারা "অনুসারে, জবানবন্দী আবশ্যক মতে সংশোধনার্থে সাক্ষীর নিকট পড়া এবং তাহাকে "বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাহা তাহার শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়ার যে সার্টিফিকেটের আবশ্যক ছিল তাহা দুর্ভাগ্যক্রমে লেখা হয় নাই। যে অস্বাভাবিক প্রণালীতে কার্য্য করা হয় তদ্ধেতু এবং "আমার শারীরিক অসুস্থতাহেতু এই ভ্রম "হয়। আমি এই অভিপ্রায়ে প্রথম সাক্ষীর "জবানবন্দী পড়ি নাই যে, অধিবেশনের শেষে "সমুদায় সাক্ষীকে পুনরায় ডাকিয়া সমস্ত জবান- "বন্দী পড়া হইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপের "নিবারণ হইবে; কিন্তু অধিবেশনের শেষে অনেক "গৌণ হইয়া যাওয়ায় আমার ওকথা আর স্মরণ "ছিল না, এবং কাজেই এ ত্রুটি হইয়াছে।"

আমাকে এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে বলা হয় নাই যে, প্রত্যেক সাক্ষীর নিকট জবানবন্দী যে পড়া হয় নাই, তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের এত ক্ষতি হইয়াছে কি না যে, ৪২৬ ধারার বিধান সত্ত্বেও, ঐ প্রকারে গৃহীত প্রমাণ দৃষ্টে যে অর্পণ করা হয় তাহা কাজে কাজেই অন্যথা হইবে। যাহা হউক, আমি বলিতে পারি

যে, ৮ ম বালম উইক্লি রিপোর্টরের ৬৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম ঈশ্বর রাউতের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি * সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করিবার পূর্ব্বে আমাকে এই মোকদ্দমা আরও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। উপস্থিত মোকদ্দমায় যে প্রমাণ সম্বন্ধে এই আপত্তি হইয়াছে, তাহা যদি অগ্রাহ্য বিবেচনা করা যায়, তথাপি রীতিমত গৃহীত আরো প্রমাণ আছে, যদনুসারে অর্পণ করা যাইতে পারে।

১০ দফায় আপত্তি হইয়াছে যে, যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের কৌন্সেল রওয়ানা হইয়াছেন, কিন্তু রাস্তায় গৌণ হইতে বলিয়া, তাঁহার পৌঁছা পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেটকে অপেক্ষা করিতে প্রার্থনা করে, তথাপি তিনি তাহাদিগকে না জানাইয়া উক্ত ৬ ই তারিখে বিচার করেন।

১১ দফায় মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অতি গুরুতর অভিযোগ আছে। দরখাস্তকারিগণ বলে, মাজিষ্ট্রেট, "নদীয়ার চাঁদ দত্ত নামক এক সাক্ষি-"দ্বারা মহেশ গোস্বামীর বিশেষ রূপে সেনাক্ত "করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, এবং ১৮৬৯ "সালের ৬ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে ঐ সাক্ষীর "জবানবন্দী লইবার কালে, উক্ত সাক্ষী তাহার "জবানবন্দীর যে স্থানে বলে, 'আমি নগদী-"দিগকে চিনি না, আমি ডোমদিগকে চিনি "না, আমি উক্ত গোমাস্তাকে চিনি' তাহা "লিখিয়া লইবার পরেই মাজিষ্ট্রেট আসন "হইতে উঠিয়া এবং এজলাস হইতে নামিয়া "আদালতের ঘরের যে পার্শ্বে দরখাস্তকারিগণ "ছিল, তথায় যাইয়া উক্ত সাক্ষীকে তাঁহার সঙ্গে "করিয়া আনিয়া সাক্ষীর আসনে উঠাইয়া দিয়া "তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আসামীগণকে "জান?' এবং সাক্ষী তদুত্তরে বলে 'না'। "মাজিষ্ট্রেট তদনন্তর উক্ত সাক্ষীর ঘাড় ধরিয়া "তাহাকে মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসামীকে "দেখাইয়া বলেন;—'ইনিই কি মহেশ বাবু?' "এবং তদুত্তরে আসামী বলে 'আমি জানি না।' "মাজিষ্ট্রেট তদনন্তর উক্ত সাক্ষীকে পূর্ণচন্দ্র "বন্দ্যোপাধ্যায় দরখাস্তকারীকে দর্শাইয়া "বলেন,—'এ কি পূর্ণ?' এবং তদুত্তরে উক্ত "সাক্ষী বলে 'আমি জানি না।' তদনন্তর "মাজিষ্ট্রেট মহেশ গোস্বামী দরখাস্তকারীর মুখে "আঘাত করিয়া ঐ সাক্ষীকে বলেন, এই কি "সে?' এবং তদুত্তরেও উক্ত সাক্ষী বলে, "আমি জানি না।' উক্ত সাক্ষী মহেশ গোস্বামী "দরখাস্তকারীর নিশানা দিবে, স্পষ্ট এই "প্রত্যাশায় মাজিষ্ট্রেট উক্ত আঘাত অতি বেগে "দেন।" দরখাস্তকারী বলে, সিবিল সর্জ্জন ডাক্তর রিচার্ডস্, কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌর মণ্ডল, নদীয়ারচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ঐ আঘাত করিতে দেখিয়াছে।

মাজিষ্ট্রেট যে আসামীকে ডকের মধ্যে আঘাত করেন, এ অভিযোগ তিনি সরোষে অস্বীকার করেন। আমরা উক্ত অভিযোগে মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিতেছি না। কিন্তু আমি বলিতে পারি যে, উপস্থিত মোকদ্দমার জন্য মাজিষ্ট্রেটের জওয়াব গ্রহণ করিতে আমার কোন বাধা নাই। তিনি বলেন, "এই অস্বাভাবিক অপবাদ "অপ্রমাণ করিতে আমি এ স্থলে আমার "প্রসিদ্ধ স্বভাব-চরিত্রের কথা বলিব না, কারণ, "আমার বেশ জানা আছে যে, যাঁহারা আমাকে "জানেন তাঁহারাই জানেন যে, দরখাস্তকারী "যে অপরাধের কথা বলে, আমি কখনই "তাহার নিমিত্ত অপরাধী হইতে পারি না; "কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখাইব যে, যে সকল "ঘটনা হইবার বিষয় আমি স্বীকার করিতেছি "তাহা দুরভিসন্ধি সহকারে সাজাইয়া এই অপ-"বাদ দেওয়া হইয়াছে; উক্ত ঘটনা এই:—যে "সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় তাহার বয়স্ "২০ বৎসরের ন্যূন ছিল, এবং সে স্পষ্টই "অতি ভীরু-স্বভাব, এবং আমি জানি যে,

* ১ ম ভাগ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ৭৭ পৃষ্ঠা দেখ।

" অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা
" পাইয়াছে। সে অতি ভীরুতা সহকারে জবান-
" বন্দী দেয়, এবং যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা
" হয় যে, তাহার দোকানে যে সকল ব্যক্তি আসি-
" য়াছিল তাহাদিগের কাহাকেও সে দেখাইয়া
দিতে পারে কি না, সে তখন ডকের মধ্যে যাহারা
" ছিল তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া
বলে যে, সে কেবল উক্ত গোমাস্তাকে চিনিতে
" পারিতেছে। তদনন্তর সে যাহাদিগকে চিনিত
তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া দিবার
" জন্য তাহাকে ডকের মধ্যে লওয়া হয়। ডকে
" লওয়া হইলে সে তাহার সম্মুখে ইতিকর্ত্তব্য-
" বিহীন হইয়া কম্পমান কলেবর দণ্ডায়মান
" থাকে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও
" মুখ পানে চাহিয়া দেখে না। এই দেখিয়া
" আমি তাহার নিকট নামিয়া গিয়া তাহাকে
" সাহস দিয়া ডকের চারি দিকে লইয়া ক্রমে
" ক্রমে প্রত্যেক আসামীকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা
" করি যে, যাহারা তাহার দোকানে যায় এ ব্যক্তি
" তাহার মধ্যে ছিল কি না। * *
" আমি এই করি যথা, আমি ডকের বাম দিক্
" হইতে দক্ষিণে যাই। মহেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
" প্রথম ব্যক্তি ছিল। উক্ত ডক প্রায় ৬ ফুট
" উচ্চ, আমি তাহার রেলের মধ্য দিয়া হাত
" দিয়া তাহাকে এই জন্য স্পর্শ করি (আমার
" বোধ হয় আমি তাহার স্কন্ধে হাত দিয়াছি-
" লাম) যে, সাক্ষী যাহার কথা বলে তাহার
" বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকে, এবং আমি
" তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এই ব্যক্তিই কি
" তোমার দোকানে গিয়াছিল। আমি পরে
" পূর্ব্বের সম্বন্ধেও তাহাই করি, এবং এই রূপে
" প্রত্যেককে দেখান হয়। কিন্তু আমি যখন
" হরি মুখোপাধ্যায়ের নিকট যাই, অন্যান্যের
" ন্যায় তাহাকেও সম্মুখে আনিবার সময়, মহেশ
" গোস্বামী যে, তাহার পার্শ্বে, হয়ত তাহার
" পশ্চাতে ছিল, সে নির্লজ্জ ভাবে গোলমাল
" করত অগ্রসর হইয়া হরি মুখোপাধ্যায়কে
" টানিয়া তফাৎ করিয়া লয়। আমি তখন
" ইহাতে প্রগল্ভতা ব্যতীত আর কোন অভি-
" সন্ধি থাকিবার কথা মনে করি নাই; কিন্তু
" আমি তাহাকে চাহিবার পূর্ব্বে সে অগ্রসর
" হইবে এমত আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি
" তাহাকে একপাশ করিয়া, বরং পশ্চাতে
" ঠেলিয়া দিয়া হরি মুখোপাধ্যায়কে সম্মুখে
" আনি; উক্ত সাক্ষী তাহাকে দেখিবামাত্রেই
" বলে যে, সে তাহার দোকানে গিয়াছিল, ইত্যাদি
" * * আমি মহেশ গোস্বামীর মুখে আঘাত করি
" নাই। আমি তাহাকে আঘাতই করি নাই,
" কিন্তু হরি মুখোপাধ্যায়কে সম্মুখে আনি-
" বার সময়ে সে অগ্রসর হইয়া পড়ায়,
" আমি তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া এবং আর
" আর আসামীকে সাক্ষীর নিকট যত জোরে
" আনা হয়, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ বেশী জোরে
" তাহাকে ঠেলিয়া পশ্চাতে দেই।"

মাজিষ্ট্রেট যে ঘটনার কথা বলেন তাহার শুদ্ধতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে ডাক্তর রিচার্ডসকে এবং অধিবেশনে আর যত লোক ছিল তাহাদিগকে সাক্ষী মানেন। মহেশ গোস্বামীর প্রতি এই অভিযোগ করা হেতু দোষারোপ করেন, এবং বলেন যে, তিনি কলিকাতায় গেলে তাঁহার অসাক্ষাতে ঐ কথা গড়ান হয়।

ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ৫ ই অক্টোবর তারিখে এই আদালতে প্রথম দরখাস্ত করিবার সময় এই আঘাতের সম্বন্ধে একটি কথাও বলা হয় নাই।

কিন্তু এ বিষয় সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের বর্ণনাই গ্রহণ করিয়া তিনি যে আপন পদ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া ডকে যে আসামিগণ দণ্ডায়মান ছিল তাহাদের গাত্রে হাত তুলিয়াছিলেন, এ বড় দুঃখের বিষয়। তাঁহার এই বিবেচনা-শূন্য কার্য্যে এক জন আসামীর সহিত এক প্রকার তাঁহার নিজের বিবাদ হওয়া দেখা যায়। যে আসামী তাঁহার হস্তে

অত্যাচার প্রাপ্ত হয় সে যে তাঁহার আচরণের প্রতিকূল ব্যাখ্যা করিবে, তাহাতে তাঁহার আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন অধিকার নাই। উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার নিজের বাক্যই গ্রহণ করিয়া আমরা বিবেচনা করি যে, ডকের উপর তিনি যে আসামীগণের গাত্রে হাত তুলিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত নিন্দার কথা।

১২ দফায় আপত্তি হইয়াছে যে, ২২৪ ধারার বিধানমতে পুনরায় মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত কোন দিন ধার্য্য না করিয়া ৫ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে শুনানী স্থগিত রাখা মাজিষ্ট্রেটের অন্যায় হইয়াছে।

দরখাস্তের ১৫ দফায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, মাজিষ্ট্রেট ২৩ এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে তদন্ত করিবার সময়ে স্বয়ং অভিযোক্তা হইবার কথা বলেন; যদিও প্রধানতম বিচারালয়ের এই হুকুম মাজিষ্ট্রেটকে দেখান হয় যে, কোন মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং আপনাকে অভিযোক্তা মনে করিবেন না, তথাপি মাজিষ্ট্রেট প্রধানতম বিচারালয়ের উক্ত হুকুমে বাধ্য নহেন বলিয়া তাহা অমান্য করেন। মাজিষ্ট্রেট ইহা স্বীকার করেন। তিনি বলেন—"আমি "বলিয়াছিলাম যে, আমিই অভিযোক্তা এবং "আমার তাহা না হওয়াই অসম্ভব। আমি ঐ "জেলার প্রধান কার্য্যনির্ব্বাহক হাকিম ছিলাম। "ঐ অভিযোগ ৬৮ ধারা অনুসারে এক বিশেষ "প্রকারে আমার নিজের দ্বারা উপস্থিত হয়।" মাজিষ্ট্রেট (বোধ হয় ৯ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৭০ পৃষ্ঠা হইতে) এমত এক নজীর দর্শান যাহাতে "প্রধানতম বিচারালয় আদেশ করেন "যে, ৬৮ ধারা অনুসারে যে সকল মোকদ্দমার "আরম্ভ হয় তাহাতে প্রথমারম্ভকারক মাজিষ্ট্রেট "ব্যতীত আর কোন মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিকার "নাই। গবর্ণমেণ্টের অর্থাৎ সরকারী অভি-"যোক্তা ছিল না, সুতরাং আমি অভিযোক্তা "ছিলাম না এমত বলা অসঙ্গত হইত। হাই-"কোর্টের যে নজীর আমাকে দেখান হয় তৎ-"সম্বন্ধে আমি প্রথমে দেখাইয়া দেই যে, তাহা "কথার কথা মাত্র; এবং দ্বিতীয়তঃ, আমি বলি "যে, শুদ্ধ কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধীয় বিষয়ে হাইকো-"র্টের নিষ্পত্তি করিবার অধিকার আছে কি না, "এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল।"

দরখাস্তকারিগণের আর এক অভিযোগ এই যে, মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমার উৎপত্তি সম্বন্ধে এবং তাহা যেরূপে তিনি অবগত হন তৎসম্বন্ধে কোন বিষয়ই তিনি প্রকাশ করিতে অসম্মত হন। মাজিষ্ট্রেট বলেন, "সত্য বটে, উক্ত মোকদ্দমার "উৎপত্তি এবং যে গতিকে তাহা আমি অবগত "হই, তৎসম্বন্ধে আমি কোন বিষয়ই প্রকাশ "করিতে অস্বীকার করি। ইহা সত্য। এরূপে "অস্বীকার করিতে আমার স্বত্ব ছিল। অপ-"রাধ বাহির করিতে গোপনে যে সকল সংবাদ "লওয়া হয় এবং যে প্রণালীতে কার্য্য করা হয়, "তাহা যদি প্রকাশ্য আদালতে প্রচার করা হয়, "তবে শীঘ্রই শাসন-কার্য্য অসম্ভব হইয়া পড়িবে। "অভিযোক্তা কোন ব্যক্তিবিশেষই হউক, বা "গবর্ণমেণ্টের পক্ষে পুলিসই হউক, তাহার যে "প্রণালীতে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা "ভাল বোধ হয়; সেই প্রণালীতেই সে তাহা "উপস্থিত করে; এবং যদি সেই প্রণালীতে উপ-"স্থিত করায় সদ্বিচার না হয়, তবে তাহা সেই "অভিযোক্তারই দোষ। যে বিষয় অভিযোক্তা "আদালতে উপস্থিত করা উপযুক্ত বোধ করে "না, তাহা তাহাকে করিতে আদেশ করা আদা-"লতের কার্য্য নহে; পরন্তু, যে বিষয় আইনমতে "স্পষ্টই বিচারালয়ে উপস্থিত করা যাইতে পারে "না, তাহা উপস্থিত করিতে আদালতের আদেশ "করা বা সম্মতি দেওয়া আরো অকর্ত্তব্য।"

মাজিষ্ট্রেটের এই সমুদায় তর্কই আমার বিবেচনায়, কতকগুলি ভ্রম হইতে উৎপাদিত হইয়াছে।

গ্রাণ্ট সাহেবের ইহা স্মরণ রাখিলে ভাল হইত, এবং আমি ভরসা করি, বিচারপতি ট্রেবর সমীরুদ্দী সেখের মোকদ্দমার (১ ম বালম উইক্‌লি রিপো-

টরের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ১২ পৃষ্ঠা) দোষগুণের বিচারে যে বলিয়াছিলেন যে, মাজিষ্ট্রেটেরা অভিযোক্তা নহেন; তাঁহাদিগকে প্রত্যেক মোকদ্দমার দুই দিকই বিচার করিয়া বিশেষরূপে প্রত্যেক মোকদ্দমার তদন্ত করা কর্ত্তব্য, তাহা গ্রাণ্ট সাহেব আর কখন অমান্য করিবেন না। মাজিষ্ট্রেটের অভিযোক্তা হওয়া অতি ভয়ানক কথা। এমত অবস্থার কোন বিচার সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারীর পক্ষে সম্পূর্ণ নিরুপেক্ষ হইয়া থাকা এবং অভিযুক্ত বা সন্দেহকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অগ্রেই কোন সংস্কার জন্মিবার সম্ভাবনা নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন। কোন অপরাধ বা আনুমানিক অপরাধের অনুসন্ধানে অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শনের আবশ্যক। সূত্র যতই দুর্ব্বল হউক না কেন, যাহাদিগকে অপরাধী অনুমান করা হয় তাহাদিগের গতির পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতেই হইবে। যে সকল অবস্থা দ্বারা অভিযুক্তব্যক্তিদিগের প্রতি অপরাধের অভিযোগ সাব্যস্ত হইতে পারে তাহা অতি সামান্য হইলেও তাহাই অতি গুরুতর গণ্য হইবে। অভিযুক্তব্যক্তিগণকে দণ্ডার্হ করা জয়ের কারণ হয়, হয়ত সে জয় স্বেচ্ছামূলক নহে, কিন্তু তাহা জয়। তাহাতে অকৃতকার্য্য হওয়া বা তাহাদিগকে অব্যাহতি পাইতে দেওয়া পরাজয়ের তুল্য। মাজিষ্ট্রেটের যে অবিচলিত নিরুপেক্ষ ভাবে তদন্ত করা কর্ত্তব্য, তাহা হইতে এই জয়পরাজয়ের ভাব কত ভিন্ন? গ্রাণ্ট সাহেব অপরাধ সাব্যস্তে ব্যগ্র অভিযোক্তার ভাবে এই মোকদ্দমা চালাইয়াছেন। তিনি ইহা আরম্ভ করিয়া অনুসন্ধানকারী পুলিসের ন্যায় তদন্ত করিয়াছেন। আমি অন্য এক স্থানে দেখাইব যে, গ্রাণ্ট সাহেবের এরূপ মনে করাতে ভ্রম হইয়াছে যে, তিনিই কেবল ঐ মোকদ্দমা চালাইতে পারেন।

উক্ত গয়বুল্লা দরখাস্তের লিখিত বিষয় বা গোপনীয় সংবাদ আর যাহাই হউক, তাহা যে গ্রাণ্ট সাহেব গোপন রাখিতে পারেন, তাঁহার এরূপ সংস্কার থাকা যার পর নাই চমৎকারজনক। সাক্ষিগণ অপরাধীকে বাহির করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে যে কোন সংবাদ দেয় তৎসম্বন্ধে তাহাদিগের জবানবন্দী লওয়া যাইতে পারে না, এ কথা সত্য হইতে পারে। কিন্তু এই নিয়ম স্পষ্টই রাজকার্য্যের সুবিধার্থে হইয়াছে, এবং তাহা অতি অল্প স্থলে প্রয়োগ হয়। আমি জানি না যে, তাহা কখন সাধারণ অভিযোগে, যাহাতে গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের বা মাল সংক্রান্ত আইন উল্লঙ্ঘনের অভিযোগের ন্যায় স্পষ্ট কোন সম্বন্ধ রাখেন না, তাহাতে প্রয়োগ হওয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এমত কোন স্থলে তাহা প্রয়োগ হয় না যখন উক্ত সংবাদ (এমত সংবাদ নহে যাহা গবর্ণমেণ্টের বা অভিযোক্তার বিবেচনামত ব্যবহারার্থে বা কার্য্য করণার্থে গোপনীয় ভাবে দেওয়া হয়, যাহা তাঁহারা হয়ত কখনই কোন বিচারালয় উপস্থিত না করিতে পারেন) মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হয়, এবং তিনি তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে কার্য্য করেন, যখন উক্ত সংবাদ দৃষ্টে এমত সকল হুকুম বা ওয়ারেণ্ট বাহির করা হয়, যদনুসারে যে ব্যক্তি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সে তাহার স্বাধীনতা হারায়, এবং যখন ঐ সকল প্রশ্ন এই হয় যে, আমার প্রতি কি অভিযোগ হইয়াছে? আমার অভিযোক্তা কে? সে আমার বিরুদ্ধে কি বলে? কেন আপনি আমাকে কয়েদ করিয়াছেন?

মাজিষ্ট্রেট লেখেন:—"হাইকোর্টের সন্তো-
"ষার্থে (যদিও আমি তাঁহাদিগকে জানাইতে
"বাধ্য নহি) আমি তাঁহাদিগকে জানাইতে পারি
"যে, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে যে এক দরখাস্ত করা
"হয়, যাহাতে অযোধ্যার বন্দ্যোপাধ্যায়েরা
"একাধিক নির্দ্দিষ্ট অপরাধের নিমিত্ত অভিযুক্ত
"হয়, যাহার মধ্যে এই অভিযোগের যথা,
"নন্দ ডোমকে আঘাত করার এবং পরে
"পুলিস হইতে তাহাকে ছিনিয়া লওয়ার বিষয়ও

"আছে, সেই দরখাস্তের সহিত আমার বর্ণনার "সম্বন্ধ আছে। ঐ দরখাস্ত কমিসনরের দ্বারা "আমার নিকট বিচারার্থে প্রেরিত হয়।"

যদি মাজিষ্ট্রেট এমত বিবেচনা করেন যে, তিনি গ্রেফ্তারীর ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া ও সেই গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে উক্ত ওয়ারেণ্ট অনুসারে অনেক কাল আটক রাখিয়া, যে সকল হেতুবাদে গ্রেফ্তার করিয়া আটক রাখা হয়, তাহা, যে হাইকোর্টের উপর সমস্ত নিম্ন আদালতের কার্য্য-প্রণালী দেখিবার ভার আছে, সেই কোর্টকে না জানাইলেও পারেন, তবে তাঁহার অত্যন্ত ভ্রম।

আমরা বিবেচনা করি যে, দরখাস্তকারিগণের প্রতি সদ্বিচারার্থে আমরা ঐ দরখাস্ত তলব দিতে এবং এই আদেশ করিতে বাধ্য যে, তাহা এই জন্য নথী সামিল হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদিগের জওয়াব দিবার নিমিত্ত বা অন্য কোন হেতুতে তাহা অনায়াসে দেখিতে পারে; অতএব মাজিষ্ট্রেট যে দরখাস্তের কথা বলিয়াছেন তাহা এবং আর যাহা দৃষ্টে গ্রেফ্তারীর ওয়ারেণ্ট সকল বা কোন গ্রেফ্তারীর ওয়ারেণ্ট বাহির হয়, এবং মাজিষ্ট্রেট জামিনের বাচনিক বা অন্য কোন প্রকারের দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া যদ্দৃষ্টে কার্য্য করেন তাহা আমরা মাজিষ্ট্রেটকে অবিলম্বে পাঠাইতে হুকুম দিলাম।

১৮ দফায় দরখাস্তকারিগণ আপত্তি করে যে, যে সকল ব্যক্তিকে সহ-অপরাধী বলিয়া গ্রেফ্তার করা হয় তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে না চাহিয়াই সাক্ষী স্বরূপে তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু সাক্ষিগণের এই রূপে জবানবন্দী লওয়ায় মাজিষ্ট্রেটের যে অন্যায় হইয়াছে, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমরা দেখি না।

২০ দফায় তাহারা বলে যে, পুলিস কনষ্টেবেল্ শ্রীরাম বাগ্চি ৯ই আগষ্ট তারিখে যে রিপোর্ট করে তদন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে তাহার প্রতি জেরা করিতে দিতে মাজিষ্ট্রেট অস্বীকার করেন।

মাজিষ্ট্রেট ১৫৫ ধারা দর্শান, এবং বলেন— "ইহা যার পর নাই স্পষ্ট যে, কোন পুলিস কর্ম্মচারীর রিপোর্ট তল্লেখকের বিরুদ্ধে ব্যতীত কোন প্রমাণ নহে।" পুলিস-কর্ম্মচারিগণের রিপোর্টে যে বর্ণনা থাকে, তৎসম্বন্ধে তাহা কোন প্রমাণ গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু পুলিস-কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে সাক্ষ্য দেয় তাহা খণ্ডনার্থে বা বুঝাইবার জন্য তাহা প্রবল প্রমাণ গণ্য হইতে পারে; অতএব অভিযুক্ত ব্যক্তির ঐ রিপোর্টের লিখিত বিষয় সম্বন্ধে উক্ত পুলিস-কর্ম্মচারীর প্রতি জেরা করিবার এবং পুলিস-কর্ম্মচারী আদালতে যে সাক্ষ্য দেয় তাহা খণ্ডন বা অবিশ্বাস্য করিবার নিমিত্ত তাহা দাখিল করা আবশ্যক বিবেচনা হইলে তাহা দাখিল করিতে বলিবার স্পষ্ট অধিকার আছে। আমাদের ইহা বলিবার বিশেষ কারণ এই যে, মাজিষ্ট্রেট বলেন যে, তিনি "এই রূপ অনেক স্থানে করিয়াছেন।"

২২ দফায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, ২ রা অক্টোবর তারিখে মাজিষ্ট্রেট কালী সরকার, হরি মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী, রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহন নগদীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা তাহাদের অনুকূলে সাক্ষী দিতে চাহে কি না; তাহারা তাহাকে উত্তর দেয় যে, তাহারা তাহা চাহে না। অতএব মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৩৩ এবং ২৩৯ ধারার বিধান অনুসারে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ১৪৩, ১৪৬, ১৮৬, ২০১, ৩৪১ এবং ৩৯৫ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ প্রণয়ন করেন; ঐ সকল অভিযোগ পঠিত হয়, এবং আসামীগণকে তাহার এক নকল দেওয়া হয়। যে নকল দেওয়া হয় তাহাতে এই সাধারণ হুকুম থাকে যে, আসামীগণ উল্লিখিত অভিযোগে সেশন আদালতে বিচারিত হইবে।

২০৭ ধারার বিধান মতে শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে তৎক্ষণাৎ ঐ সকল সাক্ষীর নাম দিতে বলা হয়, যাহাদের উপর তাহারা সেশন আদালতের বিচারে সাক্ষ্য দিতে সমনজারী করিতে চাহে। তাহারা সাক্ষীর ইসমনবিসী লিখিয়া দেয়।

গ্রাণ্ট সাহেব বলেন—“আমি তদনন্তর “অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের কৌনসেলকে জিজ্ঞাসা “করি যে, তিনি এই সকল সাক্ষীর উপর সমন “জারী করিয়া আমার নিকট জবানবন্দী দেওয়া- “ইতে চাহেন কি না। তিনি বলেন ‘না’; “তিনি কেবল এই চাহেন যে, তাহারা সেশন “আদালতে সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হয়।”

গ্রাণ্ট সাহেব পরে বলেন ঃ—“আমি তদনন্তর “উক্ত বিধির ২০৭ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরি- “চালন করিয়া এই সাক্ষিগণের প্রতি আমার “নিকট উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে সমন জারী করি। আমি তাহা এই জন্য করি যে, “মিথ্যা জওয়াব গঠিত না হইতে পারে। “এই হুকুম অভিসন্ধির সহিত ২০৭ ধারা “অনুসারে দেওয়া হয়, কিন্তু তাহা ১৮৬৯ সালের “৮ আইনের ৩৮০ (এ) ধারার বিধান মতে ২০১ “এবং ৩৬৭ ধারা অনুসারেও দেওয়া যাইত; “উক্ত উভয় ধারা অনুসারেই মাজিষ্ট্রেট বিচার “কার্য্যের মধ্যে কোন সময়ে মোকদ্দমার জন্য “আবশ্যকীয় বিবেচনা করিলে কোন সাক্ষীর “প্রতি সমন করিতে এবং তাহার সাক্ষ্য লইতে “পারেন।”

৪ ঠা অক্টোবর তারিখে দরখাস্তকারিগণ অর্থাৎ তাহাদের কৌনসেল এই মোকদ্দমা ৪৩৪ ধারা অনুসারে প্রধানতম বিচারালয়ে পাঠা- ইবার জন্য সেশন আদালতে দরখাস্ত করেন। গ্রাণ্ট সাহেব জজের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন যে, তিনি চূড়ান্ত হুকুম দেন নাই। জজ বলেন, “আদালতের মত এই যে, বিচারার্থে অর্পণ “করা হইলেই মাজিষ্ট্রেট এমন চূড়ান্ত হুকুম “দিয়াছেন বলিতে হইবে, যাহা ৪৩৪ ধারা “অনুসারে প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরণ করা “যাইতে পারে। কোন ব্যক্তি বিধি-বিরুদ্ধ “রূপে অর্পিত হইলে তাহাকে বিচারার্থে উপস্থিত “না করাই বাঞ্ছনীয়।” যাহা হউক, জজ এই হেতুবাদে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন যে, অর্পণের চূড়ান্ত হুকুম দেওয়া হয় নাই।

এক্ষণে, আমরা বলিতে চাহি যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সেশন আদালতে বিচারের হুকুম হইবার পরে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহাদিগকে সেশন আদালতের বিচারে সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন করিতে চাহে, যে তাহাদিগের ইসম- নবিসী দাখিল করিবার পরে, মাজিষ্ট্রেট ২২৮ ধারার বিধান অনুসারে, যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিচার হইবে সেই আদালতে অর্থাৎ সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সাক্ষি- দিগের প্রতি সমন করিতে বাধ্য। ২২৭ ধারার বাক্য অবশ্য-প্রতিপাল্য। উক্ত ধারায় এমন কিছু নাই যদ্দ্বারা, কোন আসামী সেশন আদা- লতের জন্য তাহার কোন জওয়াব রাখিয়া দিতে চাহিলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাতে বাধা দিতে পারেন। কোন প্রমাণ দ্বারা আসামীগণ তাহাদের জওয়াব সংস্থাপন করিতে পারে, হয়ত তাহাদের তাহা স্থির করিতে সময় পাইবার পূর্ব্বেই তাহাদের জওয়াব প্রকাশ করিতে তাহাদিগকে বাধ্য করিলে অনেক স্থলে স্পষ্টই অত্যন্ত ক্লেশের বিষয় হয়।

মাজিষ্ট্রেট ২০৭ ধারার উপর নির্ভর করেন। তাহা উপস্থিত মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় না। তাহার পার্শ্বলিখিত চুম্বকেই তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট ব্যক্ত, যথা, তাহা দ্বারা মাজি- ষ্ট্রেটকে আসামীর পক্ষের প্রমাণ অর্থাৎ অভি- যুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন সাক্ষী দেওয়া হয় নাই। ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৩৮০ (এ) ধারাদ্বারা যে ২০১ এবং ৩৬৭ ধারার বিধান বিস্তারিত হইয়াছে তাহাও প্রয়োগ

হয় না। মাজিষ্ট্রেট একথা বলেন না যে, তিনি আসামীর পক্ষের সাক্ষিগণের বা তাহাদের কাহার সাক্ষ্য ২৫১ ধারার লিখিত তদন্তের পক্ষে বা ৩৬৭ ধারা-বর্ণিতমতে মোকদ্দমার যথার্থ নিষ্পত্তির জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট সাহেব বলেন যে, তিনি "অভিযুক্ত "ব্যক্তিদিগের কৌন্সেলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আমার নিকটে তাহাদের "পক্ষের সাক্ষী দিতে চাহে কি না। তিনি এই "উত্তর দেন যে, তিনি সেশন আদালতের জন্য "জওয়াব রাখিয়া দিয়াছেন। আমি তখনই "২০৭ ধারা অনুসারে তাহাদের জবানবন্দী লই-"বার হুকুম দেই;" এবং আর এক স্থানে তিনি বলেন—"মিথ্যা জওয়াব প্রণয়ন না করা হয় এই জন্যই আমি ইহা করি।" মাজিষ্ট্রেট আবার আর এক স্থানে বলেন,—"আমি ২০৭ "ধারা অনুসারে এই সাক্ষিগণকে ৬ই অক্টো-"বর তারিখে উপস্থিত করাইবার জন্য হুকুম "দেই; তাহাতে আমার অভিপ্রায় এই ছিল যে, "তাহাদিগকে তখনই উপস্থিত না করাইলে "মিথ্যা প্রমাণ প্রণয়নের যে অবশ্যই সম্ভাবনা "ছিল, তাহা তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত "করাইলে নিবারিত হইবে।"

আসল কথা এই যে, মাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে অপরাধীই স্থির করিয়া বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, আসামী কিছুতেই সেশন আদালতে কোন জওয়াব দিতে না পারে; সেই জওয়াব মিথ্যা হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছিলেন। যে সকল সাক্ষীকে সমন অনুসারে তাঁহার নিকট উপস্থিত করান হয়, তাহাদের সম্বন্ধে তিনি যেরূপ ব্যবহার করেন তাহাতেই তাঁহার এই মনোগত ভাব প্রকাশ পায়।

৯ই অক্টোবর তারিখে আসামীদিগের মোক্তারেরা, আসামীদিগের কৌন্সেল অনুপস্থিত থাকার হেতু দর্শাইয়া সাক্ষিগণের জবানবন্দী করিতে অস্বীকার করে।

মাজিষ্ট্রেট তদনন্তর, ৩৬৭ ধারামতে তাঁহার যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা পরিচালনের উপলক্ষে বোধ হয় প্রথম দুই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, কেন তাহাদিগকে সাক্ষী স্বরূপে সমন করা হয় তাহা তাহারা জানে কি না। উক্ত প্রশ্ন লেখা হয় না, কিন্তু প্রথম সাক্ষী কোরিস্ সাহেবের উত্তর এই যে, "আমি জানি না, কেন "অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আমাকে তাহাদের পক্ষে "সাক্ষী মানে। অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ কোন "মারপিট ইত্যাদি করে কি না, তাহা আমি নিজে "জানি না।" মেৎ ওয়েদরল যে জবানবন্দী দেন তাহারও ঐ বলিয়াই আরম্ভ হয়। আর আর যে সকল সাক্ষীকে সমন করা হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের প্রতি কোন প্রশ্ন করেন না।

গ্রাণ্ট সাহেবের এই মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে গৌণ হওয়ার কারণ বুঝাইবার জন্য দুইটি ঘটনা দেখা যায়। তিনি বলেন যে, "৯ই "আগষ্ট হইতে আমার কর্ণ-মূল ফুলিয়া ফোড়া "হওয়ায় অত্যন্ত বেদনা প্রযুক্ত নিত্যনিয়মিত "কর্ম্ম ব্যতীত এবং তাহাও ঘরে বসিয়া করা "ব্যতীত আর কোন কার্য্য করা আমার পক্ষে "অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত পীড়া এত "প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, ৫ই সেপ্টেম্বর "রবিবারে আমাকে কলিকাতা যাইয়া অস্ত্র "করাইবার পরামর্শ দেওয়া হয়। অতএব "তাহার পর দিন (সোমবার) রাত্রে রওয়ানা "হইবার বন্দোবস্ত এই জন্য করি যে, সে "দিবস কাছারী করিয়া উক্ত মোকদ্দমার প্রধান "প্রধান সাক্ষিগণ যাহারা প্রায় এক সপ্তাহ "পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে জবানবন্দী "লইয়া ছাড়িয়া দিতে পারি। ২০এ আগষ্ট "হইতে ৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত কালের মধ্যে "আমি অতি অল্প কয়েক দিন আফিসে যাইতে

"এবং তাহাও অতি কষ্টে যাইতে পারিয়া-
"ছিলাম, এবং কেবল অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য
"সকল নির্ব্বাহ করিতে গিয়াছিলাম। ৬ ই
"সেপ্‌টেম্বর অর্থাৎ ঐ ব্রণ হওয়ার দ্বাদশ দিবসে
"পীড়ার অতি ভয়ানক অবস্থা হয়, এবং কেবল
"উক্ত মোকদ্দমা শুনা অতি আবশ্যক বলিয়াই
"আমি কাছারীতে যাই। * * * অভিযুক্ত
"ব্যক্তিগণ যে অপরাধ করে তাহাতে তাহা-
"দিগকে বিনা দণ্ডে যাইতে না দেওয়া হইলে,
"আমার বেদনার দরুন্‌ কার্য্য করণে অসমর্থতা
"সত্ত্বেও ৬ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে মোকদ্দমা
"গ্রহণ করা আবশ্যকীয় ছিল, * * * কারণ,
"পূর্ব্ব তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত, যদিও আমাকে বিশে-
"ষতঃ শেষের কয়েক দিন অধিকমাত্রায় অহিফে-
"নাক্ত দ্রব্য এবং ঐ প্রকারের নেশাকারক
"ঔষধ সেবন করিতে হইত, তথাপি ২৪ ঘণ্টার
"মধ্যে গড়ে তিন ঘণ্টার অধিক আমার নিদ্রা
"হইত না। ৬ই তারিখে আদালতে বসিয়া
"বিচার কার্য্য করিতে করিতে আমি প্রায় এক
"ডজন পুলটিস দিয়াছিলাম। আদালত হইতে
"আসিবার ন্যূনাধিক দুই ঘণ্টা পরে উক্ত ব্রণ
"ফাটিয়া পড়ে। পরদিবস কলিকাতা মোকামে
"ফেরার সাহেব অস্ত্র করেন, এবং আমি কলি-
"কাতায় ফেরার সাহেবের চিকিৎসাধীনে এক
"সপ্তাহ থাকি।"

পরে, মাজিষ্ট্রেট বোধ করেন যে, তিনি প্রথমে মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাহা আর কোন বিচারকের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন না। তিনি ৩৬ ধারার বিধান মতে অবশ্যই তাহা করিতে পারিতেন না। কিন্তু আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, কোন মাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট পর্য্যন্ত জারী করিলেও মোকদ্দমা সম্বন্ধে আর কোন কার্য্য না করিয়া এই আদেশ করিতে পারেন যে, অপচিত ব্যক্তি বা কোন পুলিস-কর্ম্মচারী অভি-যোগ চালাইবে, অথবা তিনি স্বয়ং ৬৬ ধারামতে অন্য যে কোন মাজিষ্ট্রেটের উক্ত অভিযোগ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে তাঁহার নিকট অভি-যোগ আনিতে পারেন। মনে কর, মাজিষ্ট্রেটের ৬৬ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট জারী করিবার পর তাহার কর্ণমূল না ফুলিয়া পক্ষাঘাত হইয়া একেবারে কর্ম্ম করার অসমর্থতা হইত, তবে একথা কি বলা যাইতে পারে যে, এই হেতুতে আসামী অব্যাহতি পাইবে যে, আর কোন মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিতে পারেন না? আবার মনে কর, কোন ব্যক্তিকে চৌর্য্য দ্রব্য গ্রহণ করার অপরাধে গ্রেপ্তার করিবার নিমিত্ত কোন মাজিষ্ট্রেট ৬৮ ধারা অনুসারে ওয়ারেণ্ট জারী করিবার পরে প্রকাশ পায় যে, উক্ত দ্রব্য মাজিষ্ট্রেটেরই নিজের দ্রব্য; অথবা মনে কর, উক্ত ওয়ারেণ্ট কোন ব্যক্তিকে লুঠ বা খুনের অপরাধে ধৃত করিতে বাহির হইবার পরে জানা যায় যে, যাহার দ্রব্য লুঠ বা যাহাকে খুন করা হয়, সে উক্ত মাজিষ্ট্রে-টের স্ত্রী বা পুত্র, তাহা হইলে এরূপ তর্ক করি-বার কোন হেতু নাই যে, যে মোকদ্দমার সহিত মাজিষ্ট্রেটের নিজের সম্বন্ধ আছে, তাহাতেও তাঁহাকে ৬৮ ধারা মতে অবশ্যই কার্য্য করিতে হইবে। এবং যাহাতে তিনি তাঁহার স্বয়ং অভিযোক্তা হওয়ার আবশ্যক দেখেন, তাহাতেও আমার বিবেচনায়, তিনি নিজে বিচার কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন। মাজিষ্ট্রেট মনে করিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার মতের পোষকতায় প্রধানতম বিচারালয়ের এক নজীর আছে।

মাজিষ্ট্রেট আসামীগণকে অপরাধী বলিয়াই দৃঢ় বিশ্বাসে, তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করি-বার অসঙ্গত আগ্রহে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং এই মোকদ্দমা তাঁহার সমক্ষে চলিবার কালে তিনি যে উৎকট শারীরিক পীড়ায় কষ্ট পাইতে ছিলেন, তদ্দ্বারাও সেই সময়ে তাঁহার জ্ঞানের বিচলতা হইয়া থাকিতে পারে।

মাজিষ্ট্রেট যে অবস্থায় ছিলেন, তাহাতে

তিনি নিশ্চয়ই প্রত্যেকের কিছু কিছু রীতিমত প্রমাণ গ্রহণ করিয়া নিজে আরোগ্যলাভ করা পর্য্যন্ত আসামীদিগকে ২২৪ ধারা অনুসারে ফেরৎ পাঠাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি পীড়িত না হইলে এবং ৬৮ ধারা অনুসারে কার্য্যারম্ভ করিবার পর তাঁহার ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে তাঁহার যে ভ্রম হইয়াছিল, তাহা না হইলে আমি তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে আরো কঠিন বাক্য প্রয়োগ আবশ্যকীয় বোধ করিতাম।

কালী সরকার, হরি মুখোপাধ্যায়, হর গোস্বামী রামচাঁদ চক্রবর্ত্তী এবং ফুলমোহন নগদীকে অর্পণ করিবার হুকুম রীতি এবং জাবেতা মতই দৃষ্ট হইতেছে। উক্ত হুকুম দিয়া মাজিষ্ট্রেটের তাহা আর রহিত করিবার ক্ষমতা ছিল না। আমি সমস্ত জবানবন্দী দেখিয়াছি, এবং যদিও আমি অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করিতেছি না, তথাপি আমি একথা বলিতে পারি না যে, নথীতে উক্ত অর্পণের উপযুক্ত প্রমাণ নাই। উক্ত অর্পণ সমাধা হইয়া থাকিলে এবং মোকদ্দমা সেশন আদালতে পাঠান হইয়া থাকিলে, তাহা রহিত করা আমার কঠিন বোধ হইত। কিন্তু যেহেতু মাজিষ্ট্রেট গোপনে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার যে সংস্কার হয় তিনি তাহার বশীভূত হইয়া রায় না দিলে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে 'অর্পণ' করিতে প্রবৃত্ত হইতেন কি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে; এবং যেহেতু এমত সকল প্রশ্ন ছিল যাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে মুল অভিযোগে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে সদ্বিচারার্থে তাহাদের সাক্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিত, বিশেষতঃ, গড়বেতার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারিত যে, যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল সে এই নন্দ ডোম কি না; এবং যেহেতু গ্রাণ্ট সাহেব অভিযোগ প্রণয়ন করণানন্তর (যে অভিযোগের নিম্ন ভাগে অর্পণের হুকুম আছে) সাক্ষিগণের উপস্থিত হইবার জন্য সমন ও ওয়ারেণ্ট জারী করিয়া তদন্ত শেষ হয় নাই এরূপ ভাবেই তাহা স্বয়ং ব্যবহার করিয়াছেন, অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এ আদালত উক্ত হুকুম প্রতিপালন করিবার পক্ষে কিছু করিতে বাধ্য নহেন। আমি বোধ করি না যে, উক্ত অর্পণের কার্য্য সমাধা করিতে, সাক্ষিগণের প্রতি সমন জারী করিতে এবং সেশন আদালতে নথী পাঠাইতে এই মোকদ্দমা আমি গ্রাণ্ট সাহেবের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে বাধ্য।

যে প্রণালীতে তদন্ত হইয়াছে এবং কোন কোন আসামীর সম্বন্ধে গ্রাণ্ট সাহেব যে বৈরভাব প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে আমি বোধ করি যে, তাঁহার নিকট এ মোকদ্দমা আর চলিলে ভাল হইবে না। আমি বিবেচনা করি, বর্দ্ধমানের বা আর কোন নিকটবর্ত্তী জেলার মাজিষ্ট্রেটকে এই মোকদ্দমার বিচারে নিযুক্ত করিতে বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট এজন্য কোন মাজিষ্ট্রেট মোতায়ন করা উচিত বিবেচনা করিলে, এই হুকুম হইবে যে, এই সকল মোকদ্দমা উক্ত কর্ম্মচারীর নিকট বিচারার্থে প্রেরিত হয়। এজন্য মাজিষ্ট্রেট মোতায়ন করা কঠিন হইলে, মোকদ্দমা বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হইবে। ইহার যাহাই করা হউক, মাজিষ্ট্রেটকে এ মোকদ্দমা অবশ্যই প্রথম হইতে নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। যদি কোন আসামীকে বিচারার্থে সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হয়, তবে মাজিষ্ট্রেটের তাহাকে পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমানের সেশন জজের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

বিচারপতি কেম্প।—এই দরখাস্তে যে চারি প্রার্থনা আছে তাহা দরখাস্তকারিগণের বিজ্ঞবর কৌন্সেল নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করেন:—

১ম। পূর্ণচন্দ্র, মহেশচন্দ্র গোস্বামী প্রভৃতি আসামীগণের বিচার বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে হইবার জন্য উক্ত মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন তাহা এই আদালত রহিত করা উচিত বোধ করিবেন।

২ য়।—উক্ত মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দ্বারা কালী সরকার প্রভৃতিকে সেশনে অর্পণের আদেশ করেন, তাহা এই আদালত রহিত করা উচিত বোধ করিবেন।

৩ য়।—যদি মোকদ্দমার বিচার হইবার যোগ্য প্রমাণ থাকে, তবে এই সম্পূর্ণ মোকদ্দমা অপর এক মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

৪ র্থ।—জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেবকে বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেটের পদ হইতে বদলী করিবার জন্য এই আদালত উক্ত সম্পূর্ণ মোকদ্দমা বাঙ্গালার মান্যবর লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিবেন।

বিচারপতি নর্ম্যান তাঁহার সুদীর্ঘ রায়ে যাহা যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাতে সাধারণতঃ সম্মত হইলাম। আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মোকদ্দমা প্রথম উপস্থিত হয়, তিনি তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে চলিবার কোন হেতু দেখেন নাই।

মাজিষ্ট্রেট স্বীকার করেন যে, তিনি গোপনীয় সংবাদ দৃষ্টে কার্য্য করিয়াছেন। কি রূপে তিনি ঐ সংবাদ পান তাহা তিনি অকপটে প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু বাঙ্গালা কাগজ-পত্র পড়িতে পড়িতে, গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্ম্মচারীর উপর যে এক পরওয়ানা দেন, তাহা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায় তাহাতে প্রকাশ পায় যে, গ্রাণ্ট সাহেব এক গয়রুল্লা দরখাস্ত-লিখিত সংবাদ দৃষ্টে কার্য্য করেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কি প্রকারের অভিযোগ হয় বা, মাজিষ্ট্রেট কি উপায়ে তাহাদের অপরাধের বিষয় জানিতে পান তাহা তাহাদিগকে অবগত করা উচিত সত্ত্বেও তাহা করা হয় নাই। এক গয়রুল্লা দরখাস্তে বর্ণিত অপরাধে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে) অনেক দিন পর্য্যন্ত কয়েদ রাখা হয়। তাহারা জামিন দিবার যে দরখাস্ত করে, তাহাতে এত পরিমাণে এবং এত অসম্ভব সত্ত্বে জামিন চাওয়া হয় যে, তাহাতে স্পষ্টই সদ্বিচার অস্বীকার করা হয়।

মাজিষ্ট্রেট যে সকল আইন-বিরুদ্ধ এবং রীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন তাহা বিচারপতি নর্ম্যানই দর্শাইয়াছেন। আমার মতে, সদ্বিচারার্থে এই আবশ্যক যে, মাজিষ্ট্রেট যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের তাঁহার নিকট বিচার হইবার হুকুম দেন তাহা রহিত হইবে; এবং বিচারপতি নর্ম্যান যে সকল কারণ দর্শাইয়াছেন তাহাতে অর্পণের হুকুমও অন্যথা হইবে।

সমগ্র মোকদ্দমাই নিরপেক্ষ ভাবে এবং উপযুক্ত রূপে বিচারিত হয় নাই। বিশ্বাস্য হইলে, অর্পণের যোগ্য প্রমাণ থাকিতে পারে; কিন্তু আমার স্পষ্টই হৃদ্বোধ হইয়াছে যে, এই প্রমাণ অপর এক কর্ম্মচারীকে আবার নূতন করিয়া লইতে হইবে; এবং এতদর্থে আমি এই মোকদ্দমা পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটের সমীপে যাইবার আদেশ করিতেছি। আমার মতে এই কর্ম্মচারীকে এই মোকদ্দমা লইয়া বিচার করিতে এবং আবশ্যক হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সেই জেলার সেশন জজের নিকট অর্পণ করিতে উপদেশ দেওয়া উচিত। আমি বুঝিয়াছি যে, বিজ্ঞবর কৌন্সেল তর্কের মধ্যে বলিয়াছেন যে, এই আদালত যদি এ মোকদ্দমা বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে উঠাইয়া লইবার আদেশ দেন, তবে তিনি বাঙ্গালার মান্যবর লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের নিকট ইহা পাঠাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ করিবেন না। ইহা না হইলে, বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেটের আদ্যোপান্ত কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারানুগত এবং অন্যায্য বিবেচনায় আমি তাহা গবর্ণর বাহাদুরের হুকুমার্থে পাঠান উচিত জ্ঞান করিতাম।

এতৎসম্বন্ধে আমি বিচারপতি নর্ম্যানের সহিত ঐক্য হইতেছি যে, এই মোকদ্দমার বিচার জন্য পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেটকে বা অন্য কোন ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মচারীকে পাঠাইবার হুকুমের

প্রার্থনায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টে লেখা হয়। এই মোকদ্দমার যে সকল সাক্ষী পশ্চিমাংশ বৰ্দ্ধমানে আছে, তাহাদিগকে পূৰ্ব্ব বৰ্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করিলে তাহাদের পক্ষে কষ্টকর হইবে। (ব)

১১ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

### শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম দরবারুদাস সরদার প্রভৃতি।

ডাকাইতির অভিযোগে কোচবিহারের মাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত এবং কমিশনর ও সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—এক আসামী যে অপরাধ স্বীকার করে তাহা অন্য আসামীর বিরুদ্ধে প্রতিপোষক প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির শরীর সম্বন্ধে প্রতিপোষক প্রমাণ না থাকিয়া অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে থাকিলে, সেই প্রমাণ কোন ফলদায়ক হয় না।

বিচারপতি মার্কবি।— এ মোকদ্দমায় নয় জন আসামী ডাকাইতির জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

যে প্রমাণ দৃষ্টে দরবারু আসামী অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহা কমিশনরের বর্ণনামতে ভূলী গোএন্দা ও তাহার সাক্ষী গোবৰ্দ্ধনের সাক্ষ্য, এবং তাহা মধু এবং রতি আসামীর অপরাধ স্বীকারের দ্বারা প্রতিপোষিত হয়। আরো বোধ হয় যে, কমিশনর এই বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করেন যে, গোএন্দাগণ আসামীর শরীর সম্বন্ধে না হউক, উক্ত ঘটনার বিবরণ সম্বন্ধে যাহা বলে তাহা আর আর সাক্ষিগণের বাক্যের দ্বারা প্রতিপোষিত হয়।

এ মোকদ্দমায় জজ বরাবর গোবৰ্দ্ধন এবং ভূলীকে এরূপে ব্যবহার করেন যে, তাহাদের সাক্ষ্য প্রতিপোষিত হওনাবশ্যক। ইহা আমার বিবেচনায়, তাঁহার উচিতই হইয়াছে। বাস্তবিকই আর আর বিশেষ কারণ আছে, যাহাতে এ মোকদ্দমায় ঐরূপ প্রতিপোষণ আবশ্যক।

কিন্তু কমিশনর যে বিবেচনা করেন যে, এমত বিশ্বাস্য প্রতিপোষক বাক্য আছে যাহার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে, ইহাতে আমরা সম্পূর্ণ অসম্মত। এজন্য আর আর আসামীগণের দোষ স্বীকারের প্রতি দৃষ্টি করা সম্পূর্ণ আইন-বিরুদ্ধ। এবং বারম্বার দেখান গিয়াছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির শরীর সম্বন্ধে প্রতিপোষক প্রমাণ না থাকিয়া অপরাধের বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে থাকা বৃথা—(দ্রষ্টব্য রস্কোকৃত ফৌজদারী প্রমাণ, ১২৩ পৃষ্ঠা)। এই আসামীর অপরাধসাব্যস্ত অন্যথা হইবে।

কমিশনর বলেন যে, দরবারুর বিরুদ্ধে যে প্রমাণ, ভোচকের বিরুদ্ধেও সেই প্রমাণ; অতএব এ অপরাধ-সাব্যস্তও অন্যথা হইবে।

শাকালুর মোকদ্দমা স্বতন্ত্র। চক্ষের উপর আঘাতের সম্বন্ধে যে প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই আসামীর শরীর সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। এই অপরাধ সাব্যস্ত স্থির থাকিবে।

দরবারুর বিরুদ্ধে যেরূপ অভিযোগ উপস্থিত, ধলা এবং কান্তি দাসের বিরুদ্ধেও অবিকল সেই রূপ, অতএব তাহারাও খালাস পাইবে।

মধু ও রতিরাম অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, এবং তাহাদের স্বীকার মতেই তাহাদের অপরাধ সংস্থাপিত হইতেছে। এই দুই অপরাধসাব্যস্ত স্থির থাকিবে।

দরবারু এবং আর যাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত আমরা অন্যথা করিলাম, তাহাদের অপেক্ষা, হেমাই ও সুখীর বিরুদ্ধের অভিযোগ অতি দুর্ব্বল। অতএব এই দুই অপরাধ-সাব্যস্তও রহিত হইবে। (ব)

১২ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং ই, জ্যাক্‌সন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম আসানুল্লা।

জাল দলীল শঠতা-পূর্ব্বক প্রকৃত দলীল স্বরূপে ব্যবহার করিবার অভিযোগে চট্টগ্রামের মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩৭২ ধারা মতে অভিযোক্তার প্রমাণাদি দেওয়া শেষ হইয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জওয়াব দিতে এবং প্রমাণাদি দাখিল করিতে বলিতে হইবে। অতএব আসামীর জওয়াব এবং প্রমাণাদি দাখিল করিবার পর অভিযোক্তার পক্ষের এক জন সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দী লইয়া আসামীকে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে জওয়াব এবং প্রমাণ দিতে অবকাশ না দিয়া যে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়, তাহা রহিত হইবে, এবং নূতন বিচার করিতে হইবে।

বিচারপতি নর্ম্যান।—আসামী এক খানা সোলেনামার নকল জাল করিবার অপরাধে বিচারিত, অপরাধী সাব্যস্ত এবং জরিমানা ও কঠিন পরিশ্রম সহ দুই বৎসরের কারাবাস-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সে আপীল করিয়াছে।

প্রমাণে প্রকাশ যে, মাজিষ্ট্রেটের আদালতের এক মোকদ্দমায় এক সোলেনামা দাখিল হয়; আসামী ১৮৬৩ সালের ১১ ই অক্টোবর তারিখে মাজিষ্ট্রেটের আদালত হইতে হেড ক্লার্কের দ্বারা রীতিমত সহীমোহর করাইয়া সোলেনামার এক নকল লয়; আসামী আলীফ খাঁর বিরুদ্ধে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ১৮৬৮ সালের ১৮ ই মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের প্রথম মুন্সেফের নিকট এই সোলেনামা দাখিল করে। উক্ত সোলেনামার বর্ত্তমান অবস্থায় দেখা যায় যে, তাহার নিম্ন ভাগে কয়েকটি দাগ বসান হইয়াছে। কিন্তু প্রথমতঃ আসামী যখন তাহা মফঃসলের আদালতে দাখিল করে, তখন তাহার অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দেওয়া হয় না। আসামী তাহার জওয়াব দিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে অভিযোক্তার পক্ষের যে সাক্ষ্য গৃহীত হয়, তাহাতে প্রমাণ সম্বন্ধে অর্থাৎ প্রথমতঃ, যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করে, তাহার সম্বন্ধে, এবং দ্বিতীয়তঃ, যে অভিপ্রায়ে তাহার পরিবর্ত্তন করা হয়, তৎসম্বন্ধে প্রমাণের একটি দোষ আছে।

আসামীকে জওয়াব দিতে বলা হয়। সে তাহা করে, এবং সাক্ষী উপস্থিত করে।

আসামীর পক্ষের সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়ার পর, সেশন জজ আবার মুন্সেফকে তলব দিয়া তাঁহার জবানবন্দী লয়েন। মুন্সেফ তাহাতে এই আসামী কর্ত্তৃকই আলীফ খাঁর বিরুদ্ধের নালিশের আরজী দাখিল হইবার কথা বলেন। তিনি এই সাক্ষ্য দেন যে, আসামী তাঁহার আদালতে উক্ত সোলেনামার পরিবর্ত্তিত নকল দাখিল করে; এবং তাহা যখন সে দাখিল করে, তখন তাহার নিম্ন ভাগে ঐ কয়েক দাগ ছিল। তিনি ইহাও সপ্রমাণ করেন যে, তিনি তাঁহার রায়ে উক্ত সোলেনামার নিম্ন ভাগে লিখিত দাগগুলি নালিশের আরজী-বর্ণিত দাগ সকলের সহিত ঐক্য হইবার কথা বলেন। যদি আসামী আপন জওয়াব দাখিল করিবার বা সাক্ষী উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই এই প্রমাণ দেওয়া হইত, তবে (আমার বিবেচনায়, উক্ত প্রমাণ আরো সম্পূর্ণ হইলে এবং পূর্ব্বের মোকদ্দমার নথী দাখিল করিয়া পক্ষগণের অবস্থা এবং আসামী যে অভিপ্রায়ে উক্ত কৃত্রিম সোলেনামা ব্যবহার করে, তাহা দেখান হইলে আরো সন্তোষকর হইত,) উক্ত প্রমাণ দ্বারাই যথেষ্ট প্রকাশ পাইত যে, আসামী তাঁহার দাবী সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে কোন সরকারী কর্ম্মচারী তাহার নিজের পদোপলক্ষে প্রস্তুত করিয়াছে বলিয়া শঠতা পূর্ব্বক এক কৃত্রিক দলীল ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু ৩৭২ ধারামতে অভিযোক্তার পক্ষের প্রমাণাদি প্রদান সমাধা হওয়ার পরে আসামীকে তাহার জওয়াব দিতে এবং প্রমাণ

দাখিল করিতে বলিতে হয়। উপস্থিত মোকদ্দমায় আসামীর জওয়াব দেওয়া শেষ হইলে মুন্সেফকে যখন আবার তলব দেওয়া হয়, তখন তিনি যে সাক্ষ্য দেন তৎসম্বন্ধে আসামীকে জওয়াব দিবার বা সাক্ষী আনাইবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই।

অতএব আমি বিবেচনা করি যে, এ মোকদ্দমার উচিত মতে বিচার হয় নাই, এবং উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত এবং দণ্ড-বিধান আইন-সঙ্গত নহে। আমার মতে ৪০৫ ধারা অনুসারে উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত রহিত করিয়া নূতন বিচারের হুকুম দেওয়া উচিত।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন —আমিও এই আসামীর বিচারের নথী চট্টগ্রামের জজের নিকট ফেরৎ পাঠাইতে এবং তাঁহাকে আসামীর নূতন বিচার করিতে আদেশ করিতে চাহি। আসামী কি অভিপ্রায়ে উক্ত পরিবর্ত্তিত দলীল ব্যবহার করে তৎসম্বন্ধে তিনি প্রমাণ গ্রহণ করিবেন। যে পর্য্যন্ত অভিসন্ধি সপ্রমাণ না হয়, সে পর্য্যন্ত উক্ত পরিবর্ত্তনে জাল করা সাব্যস্ত হয় না। জজের একথা বলা অন্যায় হইয়াছে যে, আসামী বিপরীত সপ্রমাণ না করিলে উক্ত পরিবর্ত্তন প্রতারণা-মূলক অভিপ্রায়েই করা হইয়াছে এমত অনুমান করিতে হইবে। এ মোকদ্দমার প্রমাণ স্বরূপে দেওয়ানী আদালতের কার্য্যের উপর নির্ভর করায় সেশন জজেরও ভ্রম হইয়াছে। এই বিষয়ের কিছু প্রমাণ থাকা আবশ্যক যে, উক্ত দালীলে যে বিষয় প্রবিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা যে মোকদ্দমায় উক্ত দলীল দাখিল হইয়াছিল সেই মোকদ্দমার সহিত সম্বন্ধ রাখে, এবং সেই বিষয় বঞ্চনা করিবার বা অন্যায় হানি করিবার অভিপ্রায়েই প্রবিষ্ট করা হয়। (বু)

---

১৮ ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি এল্ এস জ্যাক্‌সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম গোলোকচন্দ্র এবং তিলকচন্দ্র।

মেং আর ই টুইডেল এবং বাবু অখিলচন্দ্র সেন আপেলাণ্টের উকীল।

দলীলাদি জাল করিবার অভিপ্রায়ে কৃত্রিম মোহর রাখিবার অভিযোগে চট্টগ্রামের মাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন ব্যক্তি দলীল জাল করিবার মনস্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক গুলি মোহর রাখে, তাহাতে দণ্ডবিধির ৪৭৩ ধারা মতে, কেবল একটি জাল করিবার জন্য ঐ সকল মোহর রাখিবার বিষয় প্রকাশ না পাইলে, যত মোহর ঐ ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক এক সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র অপরাধ হয়, এবং ঐ ব্যক্তি বিধি মতে তাহার প্রত্যেক মোহর সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই মোকদ্দমার আসামীগণ সেশন আদালতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৪৭৩ ধারানুযায়ী অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। মোকদ্দমার অবস্থা সেশন জজের রায়ে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, অতি প্রত্যূষে মাজিস্ট্রেটের সাক্ষাতে এবং তাঁহার আদেশ অনুসারে আসামীর খানা-তল্লাস করিয়া স্থানে স্থানে ঐ জেলার জজ, মুন্‌সেফ, এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের আদালতের জাল মোহর কতক অবিকল প্রতিরূপ, কতক তাহা নহে, মোট ৯ টা, এবং অনেক কাগজ-পত্র পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে কতক আসামীগণের নিজের এবং কতক অপর ব্যক্তিগণের বিষয়াদি সম্বন্ধীয়, এবং কোন কোন কাগজের লেখা আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে তুলিয়া ফেলা হইয়াছে।

টুইডেল সাহেব আমাদের নিকট আসামীর অনুকূলে তর্ক করেন, এবং এই আপত্তি করেন যে, তাহারা যে এই সকল মোহর জাল করিবার অভিপ্রায়ে রাখিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আমার বোধ হয় যে, আসামীগণের নিকট এতগুলি জাল মোহর এবং উল্লিখিত প্রকারের কাগজ-পত্র থাকায় জজ অনা-

য়াসে এবং উচিত মতেই এই অনুমান করিয়াছেন যে, তাহারা জাল্ করিবার অভিপ্রায়েই তাহা রাখিয়াছিল।

আরও তর্ক হইয়াছে যে, ঐ সকল মোহর যে কৃত্রিম তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয় নাই। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এ তর্ক এক মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিবে না। ইহার প্রচুর প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে।

তদনন্তর, বলা হইয়াছে যে, আসামীগণের পক্ষে এই প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে যে, যে সকল স্থলে ঐ সকল মোহর পাওয়া গিয়াছে, তথায় কোন শত্রু তাহা রাখিয়াছিল, কিন্তু বাস্তবিক ঐ প্রকার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ দ্বারা কেবল এই দেখান হইয়াছে যে, এ রূপ হওয়া অসম্ভব নহে, এবং উদ্ভাবিত হইয়াছে যে, এক জন প্রতিবাসী যে আসামীগণের স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তি এবং যাহার সহিত তাহাদের বিবাদ ছিল, সে ঐ সকল মোহর তথায় রাখিয়াছিল; কিন্তু ইহারও কোন প্রমাণ নাই।

তদনন্তর বলা হইয়াছে যে, এক সময়ে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মোহর পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে জজের আসামীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা নাই।

আমার বোধ হয়, ৪৭৩ ধারার মর্ম্মানুসারে আসামীগণের একটি জাল করিবার উদ্দেশ্যে ঐ সকল মোহর রাখিবার বিষয় প্রকাশ না পাইলে উক্ত বাটীতে যত মোহর পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক এক সম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র অপরাধ করা হয়, এবং আসামীগণ বিধিমতেই প্রত্যেক মোহরের সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে। তাহা প্রকাশ পাইলে ৭১ ধারা অনুসারে ঐ সকল মোহর রাখাতে কেবল একটি অপরাধ হইতে পারে। এ স্থলে তাহা নহে। কেবল একটি জাল করার জন্য জজ, মুনুসেফ এবং আর আর কর্ম্মপক্ষগণের মোহরের আবশ্যক হওয়া অসম্ভব, এবং এরূপ আবশ্যকতার প্রসঙ্গ উদ্ভাবিতও হয় নাই।

দণ্ড কিছু কঠিন হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, আসামীগণ যে অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা জনসমাজ সম্বন্ধে অতি ভয়ানক অপরাধ। আসামীগণের সম্ভ্রম এবং তাহাদের প্রতি পূর্ব্বে যে লোকে সন্দেহ করে নাই, ইহা তাহাদিগকে আরো কঠিন দণ্ড দিবার কারণ বোধ হয়। আমার মতে এই অপরাধ সাব্যস্ত বা দণ্ডবিধান, ইহার কিছুতেই আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

বিচারপতি মার্কবি।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

১৮ই জানুয়ারি, ১৮৭০।

### বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং ডবলিউ মার্কবি।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম কমরুদ্দী সিকদার।

বাবু কালীমোহন দাস আপেলাণ্টের উকীল।

সাংঘাতিক অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক দাঙ্গা করিবার অভিযোগে ঢাকার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা সেশনে অর্পণ করিলে, ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩৫৯ ধারা অনুসারে সেশন জজ তাহার বিচার করিতে পারেন; এবং যে ব্যক্তি ঐ অর্পণের শুদ্ধতার প্রতি দোষারোপ করে, তাহারই দেখাইতে হইবে যে, উক্ত অর্পণের ক্ষমতা ছিল না।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—অপরাধ সাব্যস্তের প্রতি এই আপত্তি হইয়াছে যে, আসামীকে জেলার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট অর্পণ করেন, কিন্তু তাঁহার ঐ মোকদ্দমার তদন্ত করিবার এবং অর্পণ করিবার ক্ষমতা দেখা যায় না। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের যে, অর্পণ করিবার ক্ষমতা ছিল,

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মাজিষ্ট্রেটের আদালতের কার্য্য-প্রণালী দৃষ্টে স্পষ্টই এই সিদ্ধান্ত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, উক্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে প্রারম্ভিক তদন্ত করিতে এবং অর্পণ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু তাহা না হইলেও আমার মতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট যে অর্পণ করেন, তদনুসারে সেশন জজ অনায়াসেই ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩৫৯ ধারা অনুসারে মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন; এবং যে ব্যক্তি উক্ত কার্য্যের শুদ্ধতার প্রতি দোষারোপ করে, তাহাকেই দেখাইতে হইবে যে, উক্ত ক্ষমতা ছিল না। অতএব আমার বিবেচনায়, এই আইনঘটিত আপত্তি অকর্ম্মণ্য। (দ্রষ্টব্য, মহারাণী বনাম ননকোদস্ নাথর্ব্বিন্, ৪ র্থ বালম বোম্বাইয়ের প্রধানতম বিচারালয়ের রিপোর্টের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ৩৫৬ পৃষ্ঠা, প্রধান বিচারপতি কাউচের নিষ্পত্তি)।

তদনন্তর বলা হইয়াছে যে, জুরির মীমাংসা রীতিমত প্রদত্ত হয় নাই, কারণ, জজ মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনের সময় প্রমাণের বিশ্বাস্যতা সম্বন্ধে তাঁহার মত জুরির নিকট প্রশস্ত রূপে বর্ণন করেন। আমার বোধ হয়, উক্ত বিষয় সম্বন্ধে জুরির নিকট জজের মত প্রকাশ করিবার কোন বাধা নাই, এবং অনেক স্থলে তাঁহার তাহা করা অতি আবশ্যক, এবং বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বদাই করা হইয়া থাকে।

অতএব আমি বোধ করি, উক্ত কার্য্যের শুদ্ধতার প্রতি দোষারোপ করিবার কোন হেতু নাই, এবং আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে।

**বিচারপতি মার্কবি।**—আমারও ঐ মত।

(ব)

২৯ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

**শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম হোসেন সরদার।**

সাংঘাতিক আঘাতের অভিযোগে ঢাকার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

**চুম্বক।**—কোন সাক্ষীকে হয় শপথ করাইয়া নচেৎ সত্য প্রতিজ্ঞা করাইয়া জবানবন্দী লইতে হইবে; কিন্তু তাহাকে এক সঙ্গে উভয় শপথ ও সত্য প্রতিজ্ঞা করান যাইতে পারে না।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৯৯ ধারার বিধানানুযায়ী লিপি সর্ব্বদাই জবানবন্দীর সহিত সংযোজিত করিয়া দিতে হইবে।

**বিচারপতি গ্লবর।**—আমরা এ মোকদ্দমার প্রমাণাদি পড়িয়া দেখিলাম যে, তাহা অপরাধসাব্যস্তের জন্য যথেষ্ট। অতএব আসামীর আপীল অগ্রাহ্য করা গেল।

আমরা প্রতিনিধি সেশন জজকে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩ এবং ১৯৯ ধারার বিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছি। সাক্ষীর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দেখিয়া হয় তাহাকে শপথ করাইয়া নচেৎ সত্য প্রতিজ্ঞা করাইয়া জবানবন্দী লইতে হইবে, কিন্তু এক সঙ্গে তাহাকে শপথ এবং প্রতিজ্ঞা উভয়ই করান যাইতে পারে না।

১৯৯ ধারার বিধানানুযায়ী লিপি সকল সময়েই জবানবন্দীর সহিত সংযোজিত করিয়া দিতে হইবে, এবং আইন-নির্দ্দিষ্ট প্রণালী এবং আদর্শের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে।

(ব)

---

২৯ এ জানুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

**শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম রামচন্দ্র সরকার এবং বিনোদ সেখ।**

কোন ব্যক্তিকে অন্যায় রূপে কয়েদ রাখার এবং হরণকরার অভিযোগে রঙ্গপুরের মাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

বাবু শ্রীনাথ দাস আপেলাণ্টের উকীল।

চুম্বক।—পুলিস-কর্ম্মচারিগণকে সেশন আদালতে অভিযোগের পক্ষের কার্য্য চালাইতে দেওয়ার প্রথা অসঙ্গত।

সেশন আদালতে কোন সাক্ষীর মূল অর্থাৎ আদ্য জবানবন্দী লওয়ার কালে, মাজিস্ট্রেটের নিকট সে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তৎপ্রতি তাহাকে মনোযোগ করিতে বলা অনুচিত; ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৩ ধারা মতে, তাহার পূর্ব্ব লিপিবদ্ধ বর্ণনা সম্বন্ধে তাহাকে জেরা করা যাইতে পারে; এবং তাহার পূর্ব্ব বর্ণনার যে অংশের দ্বারা তাহার পশ্চাতের বর্ণনার অনৈক্যতা দেখাইতে হইবে, তাহা ঐ জেরা করার কালে তাহাকে দেখান যাইতে পারে।

বিচারপতি কেম্প।— * *
আমার রায় সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে যে প্রণালীতে সেশন আদালতে সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে চাহি। আমি শুনিলাম যে, এক্ষণে পুলিস-কর্ম্মচারী দ্বারা সেশন আদালতে অভিযোগ চালাইবার প্রথা হইয়াছে। আমার বিবেচনায়, এই কার্য্যপ্রণালী অতি দূষণীয়; কিন্তু সেশন আদালতে যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, তাহাদের স্মৃতি-শক্তি যেরূপে উত্তেজিত করা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি বিশেষ করিয়া বলিতে চাহি। তাহারা মাজিস্ট্রেটের নিকট যাহা বলে, তাহার ব্যতিক্রম কিছু বলিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে চুপ করাইয়া মাজিস্ট্রেটের নিকট যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমি বোধ করি এরূপ কার্য্য আসামীগণের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৩ ধারা মতে "কোন সাক্ষীর পূর্ব্বের লিপিবদ্ধ বর্ণনা তাহাকে না দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে তাহাকে জেরা করা যাইতে পারে; কিন্তু যদি উক্ত লিপিবদ্ধ বর্ণনা দ্বারা ঐ সাক্ষীর পশ্চাতের বর্ণনার অনৈক্যতা, দর্শাইবার মনস্থ হয়, তবে উক্ত অনৈক্য প্রমাণ দর্শাইবার পূর্ব্বে, তাহাকে উক্ত লিখিত বর্ণনার সেই অংশ দেখাইতে হইবে, যাহা তাহার উক্ত অনৈক্যতা দর্শাইবার জন্য ব্যবহার করিতে হইবে।" আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সাক্ষিগণকে তাহাদের মূল অর্থাৎ আদ্য জবানবন্দীতেই সংশোধন করা, এবং যখন কোন সাক্ষী মাজিস্ট্রেটের নিকট যাহা বলিয়াছিল তাহা হইতে ভিন্ন কিছু বলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্বের জবানবন্দীর উল্লেখ করিয়া তাহার স্মৃতি শক্তির উত্তেজনা করা আসামীগণের পক্ষে অত্যন্ত হানিকর। * * *

অনেক বিবেচনা করিয়া আমার এই মত হইল যে, নাগোরের লোকেরা এই অভিযোগ আসামীগণের এবং তাহাদের মুনিব বাবু বনওয়ারীলালের বিরুদ্ধে উপস্থিত করে। অতএব আমি উভয় আসামীকে অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়া তাহাদিগকে অবিলম্বে খালাস দিবার হুকুম দিলাম।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—বিচারপতি কেম্প যে বলেন যে, বিনোদ সেখ আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ বিশ্বাস-যোগ্য নহে, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম। * * *

আমি আর এইমাত্র বলিতে চাহি যে, বিচারপতি কেম্প যে বলিলেন যে, পুলিস কর্তৃক যে ফৌজদারী মোকদ্দমার তদন্ত হয় তাহাতে তাহাদিগকেই অভিযোগ চালাইতে দেওয়া উচিত নহে; তাহাতে আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম। এক্ষণে ইহা তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অতএব তাহারা তাহা যথা-সাধ্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য, এবং তাহারা যে, তাহা সাধুতা এবং উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ করে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি বোধ করি যে, তাহা তাহাদের উপযুক্ত কার্য্য নহে,

এবং তাহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া উচিত। এ মোকদ্দমায় এই দেখা যায় যে, যে কর্ম্মচারী অভিযোগ চালাইতে নিয়োজিত হয়, মোট মোকদ্দমা সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য অন্যান্য প্রমাণের প্রতিপোষক হইত। সে অভিযোগ চালাইতে নিযুক্ত হওয়াতেই আসামীর উকীল তাহার সাক্ষ্য লওয়ার প্রতি এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, সে আদ্যোপান্ত বিচারের সময় ও সমুদায় সাক্ষীর জবানবন্দী লইবার এবং তাহাদিগকে জেরা করিবার সময়ে উপস্থিত ছিল। **

(ব)

---

৭ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

ভাগলপুরের সেশন জজ কর্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

গন্দা বনাম প্যারীদাস গোস্বামী।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩১৬ ধারা-মতে কোন ব্যক্তির উপর স্ত্রী বা পুত্রের ভরণ-পোষণের হুকুম দিবার পূর্ব্বে উক্ত অভিযোগ তাহার বিরুদ্ধে বিধিমত সপ্রমাণ হওয়া উচিত; কারণ, উক্ত ধারায় যে "উপযুক্ত প্রমাণ" শব্দদ্বয় আছে তাহাতে শপথ পূর্ব্বক বিধিমত প্রমাণ বুঝায়।

এস্তমেজাজ।—প্রকাশ যে, ধানকজাতীয়া গন্দা নাম্নী এক বিধবা স্ত্রী গত ২০ এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে এই বলিয়া ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করে যে, প্যারীদাস গোস্বামী নামক এক ব্যক্তি তাহাকে রাখে এবং তাহার ঔরসে তাহার এক সন্তান জন্মে; উক্ত প্যারীদাস গোস্বামী তাহাকে বাহির করিয়া দিয়াছে, এবং তাহাকে অপমান করিয়াছে ও মাইরপিট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। অতএব সে উল্লিখিত প্যারীদাস গোস্বামীর নিকট হইতে তাহার সন্তানের ভরণপোষণ পাওয়ার প্রার্থনা করে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ব্রেট্ সাহেব প্যারীদাস গোস্বামীর জওয়াব তলব না করিয়াই, এই হুকুম দেন যে, সে উক্ত স্ত্রীলোককে তাহার সন্তানের খোরাকী বাবতে প্রতি মাসে দুই টাকা করিয়া দিবে। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের হুকুম এমত তদন্তের উপর হইয়াছে, যাহা "উপযুক্ত প্রমাণ" গণ্য হওয়া দূরে থাকুক, কোন প্রমাণই নহে; অতএব উক্ত হুকুম আমারমতে আইন-বিরুদ্ধ।

### প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি লক।—আমাদের বোধ হইতেছে যে, জজ যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাই শুদ্ধ। যদিও ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২১ অধ্যায়ে প্রমাণ লইবার বিধি নাই, তথাপি আমরা বিবেচনা করি যে, ৩১৬ ধারায় যে "উপযুক্ত প্রমাণ" শব্দগুলি আছে তাহাতে এই জন্য আইন-সঙ্গত প্রমাণ বুঝাইবে, যে কোন ব্যক্তি উক্ত ধারার বিধান দ্বারা বাধ্য হইবার পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আইনমতে সপ্রমাণ করিতে হইবে।

আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, উক্ত বিধির ৩৮৮ এবং ৩১৮ ধারায় যে "সন্তোষকর" শব্দ আছে, তাহাতে "বিধিমতে সন্তোষ" বুঝায় এবং সেইরূপে উক্ত বিধিতে যখন উপযুক্ত প্রমাণ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তখন আমরা বোধ করি তাহা "বিধিমত প্রমাণ" অর্থাৎ শপথ পূর্ব্বক প্রমাণ হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অন্যথা এবং হুকুম রহিত করা গেল।

(ব)

৭ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

ভাগলপুরের সেশন জজের ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪০৪ ধারা অনুসারে এস্তমেজাজ।

রাধাকিশোর বনাম গিরিধারী সাহী।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬২ ধারা মতে, কোন মাজিষ্ট্রেট, দাঙ্গা-হা বিবাদ হইবার সম্ভাবনা থাকিবার কোন প্রমাণ না পাইলে, যে ভূমি কোন এক ব্যক্তির হইবার কথা বলা হইয়াছে তাহাতে অপর এক ব্যক্তিকে ঘর তুলিতে নিষেধ করিবার সরাসরী হুকুম দিতে পারেন না।

এস্তমেজাজ।—প্রকাশ যে, গত ১৭ ই সেপ্‌টেম্বর তারিখে রাধাকিশোর নামক এক ব্যক্তি এই অভিযোগে ভাগলপুরের জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করে যে, গিরিধারী সাহী তাহার জমিতে এক দোকান ঘর উঠাইতেছে, এবং প্রার্থনা করে যে, উক্ত গিরিধারী সাহীকে ঐ দোকান ঘর তুলিতে নিবারণ করা হয়। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট গিরিধারী সাহীকে প্রাচীর নির্ম্মাণ তৎক্ষণাৎ স্থগিত করিবার এবং তাহার যে আপত্তি থাকে তাহা এক সপ্তাহের মধ্যে করিবার হুকুম দেন; সেই সঙ্গে, এই হুকুম প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা দেখিতে পুলিসকে আদেশ করা হয়।

২১ এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে গিরিধারী সাহী এক আপত্তির দরখাস্ত করে, তাহাতে এই হুকুম হয় যে, তাহা ঐ মোকদ্দমার নথী-সামিল পেশ হয়।

২৪ এ তারিখে উক্ত মোকদ্দমা উঠিয়া পুলিসের উপর এই তদন্তের হুকুম হয় যে, প্রতিপক্ষ গিরিধারী সাহী ঐ ভূমির উপর ঘর তুলিয়াছে কি না, যে ভূমিতে দরখাস্তকারীকে দখল দেওয়া হইয়াছে।

২৯ এ তারিখে পুলিস রিপোর্ট করে যে, প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীর দাবী-কৃত জমির উপর এক দোকান ঘর তুলিয়াছে, তাহাতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সেই মাসের ৩০ এ তারিখের এক হুকুম দ্বারা প্রতিপক্ষ গিরিধারী সাহীর উপর তাহার নির্ম্মিত প্রাচীর এক সপ্তাহের মধ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য সমন জারী করিতে এবং উক্ত হুকুম মান্য করা হয় কি না, পুলিসকে তাহা দেখিতে আদেশ করেন।

সেশন জজের হুকুম।—জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কোন্ আইন অনুসারে এ মোকদ্দমায় কেবল এক পুলিস-রিপোর্ট দৃষ্টে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দিবার এই সরাসরী হুকুম দেন, তাহা তিনি লিখিবেন। উক্ত হুকুমের কোন হেতু বর্ণিত হয় নাই, বস্তুতঃ নথীতে এমত কোন রায় নাই যাহাতে এই মোকদ্দমার বিবরণ জানা যায়। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট এই স্পষ্ট আইন-বিরুদ্ধ কার্য্যের কৈফিয়ৎ দিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ।—এই আদালত ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬২ ধারা অনুসারে কার্য্য করেন। পুলিস-রিপোর্ট দৃষ্টে ঐ হুকুম দেওয়া হয়। বরাবর অনধিকার-প্রবেশ হইতে থাকিলে দাঙ্গা বা বিবাদ হইবার স্পষ্ট সম্ভাবনা।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি হব্‌হৌস।—মাজিষ্ট্রেট বলেন যে, তিনি যে হুকুম দেন, তাহা উক্ত বিধির ৬২ ধারা অনুযায়ী; পুলিস রিপোর্ট দৃষ্টে তাহা দেওয়া হয়; এবং তিনি এই জন্য ৬২ ধারার বিধান প্রয়োগ করেন যে, তাঁহার বিবেচনায়, অবিচ্ছেদে অনধিকার-প্রবেশ হইতে থাকিলে দাঙ্গা বা বিবাদ হইবার স্পষ্ট সম্ভাবনা।

আমাদের মতে, এ দেশেও অবিচ্ছেদে অনধিকার-প্রবেশে যে দাঙ্গা বা বিবাদ অবশ্যই হইবে, এমত নহে; এবং তাহা হইলেও এ স্থলে যে পুলিসের রিপোর্টের উপর মাজিষ্ট্রেট নির্ভর করিবার কথা স্বীকার করেন, তাহা কোন প্রমাণ নহে, এবং বাস্তবিক তাহাতে এরূপ কোন অনধিকার-প্রবেশের কোন ইঙ্গিতও ছিল না।

মাজিষ্ট্রেট যে ধারার উপর নির্ভর করেন, এ মোকদ্দমায় তাহার বিধান প্রয়োগ করাতে তিনি অত্যন্ত বিবেচনার ত্রুটি দর্শাইয়াছেন; এবং তাঁহার তাহা করিবার বিধিমত অধিকার ছিল না।

উক্ত হুকুম রহিত করা গেল। (র)

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ, বি, বেলি।

বাকরগঞ্জের সেশন জজ কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪০ ধারা অনুসারে এস্তমেজাজ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম হরিদাস কুণ্ড প্রভৃতি।

চুম্বক।—কোন সব্ রেজিষ্ট্রারের নিকট যদি এই অভিযোগ হয় যে, তাঁহার নিকট যে দলীল রেজিষ্টরী করা হয়, তাহা জাল, তবে তিনি অভিযোক্তাকে ফৌঃ কার্য্যবিধির ৬৬ ধারা অনুসারে নালিশ করিতে বলিতে বাধ্য। একই ব্যক্তি সব্ রেজিষ্ট্রার ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি ঐ মোকদ্দমা আপনার নিকট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপে অর্পণ করিতে পারেন না; তাঁহাকে ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৯৫ ধারা অনুসারে অভিযোগ করিতে হইবে। এমত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ রীতিমত প্রমাণ করিতে হইবে, এবং তাহার সাক্ষাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান্।—১৮৬৯ সালের ২৮ এ জানুয়ারি তারিখে মাদারিপুরের সব্ রেজিষ্ট্রারের নিকট, কমলাকান্ত গুহের স্বাক্ষরিত বলিয়া এক খানা খত রেজিষ্টরী করার, ৪ মাস পরে অর্থাৎ ১৮ এ মে তারিখে কমলাকান্ত এই বলিয়া দরখাস্ত করে যে, উক্ত দলীল জাল; এবং তাহার তদন্তের প্রার্থনা করে।

এই দরখাস্ত পাইয়া সব্ রেজিষ্ট্রারের ফৌজদারী কার্য্য-বিধি ৬৬ ধারা অনুসারে অভিযোক্তাকে, হয় জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট, অথবা তিনি মাজিষ্ট্রেটের সোপর্দ্দ ব্যতীত ঐ প্রকারের অভিযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে তাঁহার নিজের নিকট নালিশ করিতে বলা উচিত ছিল।

তিনি সব্ রেজিষ্ট্রার স্বরূপে কমলাকান্তের অভিযোগের তদন্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং বাকরগঞ্জের রেজিষ্ট্রার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট স্বরূপে নিজের নিকট এক রুবকারী করিয়া বিধিমত তদন্তের জন্য কাগজ পত্র অর্পণ করেন।

এ কার্য্যও নিয়ম-বিরুদ্ধ। সব্ রেজিষ্ট্রার ১৮৬৬ সালের ২০ আইন অনুসারে যে অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করেন, তাহাতেই উক্ত আইনের ৯৫ ধারা মতে রেজিষ্ট্রারের অনুমতির আবশ্যক। সব্ রেজিষ্ট্রার অভিযোগ করেন নাই; তিনি মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপে মোকদ্দমা গ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি উমাতারা, আসামী রাধানাথ দে, কৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আর তিন ব্যক্তির নামে সমনজারী করেন।

আমরা বোধ করি, এই বলিয়া উক্ত কার্য্যের পোষকতা হইতে পারে যে, তাহা বেআইনী তদন্ত দ্বারা হইলেও, মাজিষ্ট্রেট অপরাধ হইবার বিষয় অবগত হইয়া ৬৮ ধারার লিখিত ক্ষমতা অনুসারে গ্রহণ করিয়াছেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ১০ ই ও ২৮ এ তারিখে এবং অক্টোবর মাসের ২৬ এ ও ৩০ এ তারিখে এবং ৯ ই নবেম্বর তারিখে সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়, এবং রাধানাথ দে ও কৃষ্ণচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আসামীদ্বয় ১০ ই নবেম্বর তারিখে বিচারার্থে অর্পিত হয়।

উক্ত অর্পণ আমাদের নিকট জায়েজা মতই বোধ হয়, এবং তাহা রহিত করিবার যথেষ্ট হেতু নাই।

কিন্তু ৯ ই নবেম্বর তারিখে হরিদাস কুণ্ডকে অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বরূপে জবানবন্দী করিয়া তাহার পর দিবস ১০ ই তারিখে তাহাকে বিচারার্থে অর্পণ করা হয়; ইহার বিরুদ্ধে পূর্ব্বে কোন অভিযোগ হয় নাই। যে সকল সাক্ষীর সাক্ষ্য দৃষ্টে তাহাকে বিচারার্থে অর্পণ করা হয়, তাহাদিগকে সপষ্টই তাহার সাক্ষাতে জবানবন্দী করা হয় নাই, বা সে তাহাদিগকে জেরা করিতেও পারে নাই।

সপষ্টই দেখা যাইতেছে যে, হরিদাস কুণ্ডকে

অর্পণ করিবার পোষকতায় কোন প্রমাণ নাই, অতএব তাহার অর্পণ রহিত হইবে।

আমরা কমলাকান্ত গুহকে এই জানাইতে বলি যে, তাহাকে হরিদাসের নামে মাজিষ্ট্রেটের নিকট রীতিমত অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে।

মাজিষ্ট্রেট যে পর্য্যন্ত হরিদাসকে অর্পণ না করেন, বা খালাস না দেন, সে পর্য্যন্ত অপর দুই আসামীর বিচার স্থগিত থাকিবে, এবং যদি সে অর্পিত হয়, তবে সেশন জজ এক সঙ্গেই তিন আসামীর বিচার করিবেন। (ব)

---

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম ঠাকুরচাঁদ শর্ম্মা।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫৪ ধারা মতে পুলিসের দৈনন্দিন খাতা আসামীর বিরুদ্ধে প্রতিপোষক প্রমাণ নহে।

বিচারপতি হবহৌস।—এ মোকদ্দমায় পুলিসের দৈনন্দিন খাতা আসামীগণের বিরুদ্ধে প্রতিপোষক প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করাতে জজের আইন-ঘটিত ভ্রম হইয়াছে।

১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ১৫৪ ধারায় স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, ঐ প্রকারের দৈনন্দিন খাতা যে ব্যক্তি লেখে তাহার বিরুদ্ধে ব্যতীত, তাহা "তল্লিখিত বৃত্তান্তের প্রমাণ গণ্য হইবে না।"

কিন্তু তাহা ছাড়াও নথীতে আসামীর অপরাধের চূড়ান্ত প্রমাণ আছে, এবং দণ্ড উপযুক্তই হইয়াছে।

আমরা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম। (ব)

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ বি কেম্প এবং ই জ্যাকসন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম বাবু মুণ্ডু প্রভৃতি

জাদু করার অপরাধ স্বীকার করার জন্য আঘাত করার অভিযোগে ছোট নাগপুরের মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত (ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৩৩০ ধারা)।

বাবু তারকনাথ দত্ত আপেলাণ্টের উকীল।

চুম্বক।—কোন মোকদ্দমা দণ্ড-বিধির ৩৩০ ধারার অন্তর্গত করিতে হইলে এই সপ্রমাণ করা আবশ্যক যে, অভিযোক্তার উপর যে আঘাত করা হয় তাহা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে করা হয়। অতএব উক্ত ধারা এমত কোন স্থলে প্রয়োগ হয় না যাহার জাদু করার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে।

বিচারপতি কেম্প।—এই তিন আসামী বাবু, কীলা এবং লালু ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৩৩০ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া বাবু আসামী কঠিন পরিশ্রমসহ সাত বৎসরের এবং কীলা ও লালু প্রত্যেকে চারি বৎসরের কারাবাস-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। দেখা যায় যে, এই তিন আসামী যাহারা পরস্পর ভ্রাতা ছিল, এবং এক বাটীতে বাস করিত, তাহারা তিনটি স্ত্রীলোককে ধরিয়া বাবুর বাটীতে লইয়া যায়, এবং তথায় তাহাদের মস্তকে গরম তৈল ঢালিয়া দিয়া কষ্ট দেয় এবং আর আর প্রকারে তাহাদের প্রতি অত্যাচার করে। পরে ইহাদের মধ্যে এক জন স্ত্রীলোক আপনি পাতকুয়ায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করে। কথিত হইয়াছে যে, উক্ত গ্রামে ওলাউঠা হইতেছিল, এবং এই কয়েক জন স্ত্রীলোক জাদু করিত বিবেচনায় আসামীগণ তাহাদের দ্বারা এই স্বীকার করাইবার জন্য তাহাদের প্রতি অত্যাচার করে, যে তাহারা ডাইন ছিল। আমাদের বিবেচনায়, আসামীগণ ৩৩০ ধারা অনুসারে বিধিমত

অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে না। উক্ত ধারায় দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধের বিষয় বলা হইয়াছে, এবং জাদু করা উক্ত বিধি অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ নহে।

আমরা বিবেচনা করি, আসামীগণ উক্ত তিন স্ত্রীলোকের গাত্রে গরম পদার্থ প্রয়োগ দ্বারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আঘাত করিবার অপরাধী, এবং তাহারা যে পশুবৎ ব্যবহার করে তদ্বিবেচনায় আমরা বাবু মুণ্ডকে কঠিন পরিশ্রমসহ তিন বৎসরের এবং কীল্লা ও লালু মুণ্ড আসামীদ্বয়কে কঠিন পরিশ্রম সহ দুই বৎসরের কারাবাস-দণ্ডাজ্ঞা দিলাম।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বিবেচনায় এই আসামীগণের অপরাধ-সাব্যস্ত বর্ত্তমান অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে না। তাহাদের বিরুদ্ধে যে যে অপরাধ সপ্রমাণ হইবার বিষয় দেখা যায় তাহা দণ্ড-বিধির ৩৩০ ধারায় আছে, অর্থাৎ, অভিযোক্তাকে ডাইন বলিয়া স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে তাহারা তাহাকে আঘাত করে। ইহা উক্ত ধারার অন্তর্গত নহে; তাহাতে কোন অপরাধ বা অসদাচরণ স্বীকার করাইবার জন্য আঘাত হওয়া আবশ্যক। জাদু করা অপরাধ বা অসদাচরণ নহে। উক্ত আঘাত গুরুতর আঘাতের ব্যাখ্যার অন্তর্গত হইলে আসামীগণ তাহার নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইবে, নচেৎ কোন গরম পদার্থ দ্বারা আঘাত করিবার নিমিত্ত ৩২৪ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত হইবে। প্রমাণ দ্বারা গুরুতর আঘাতের বিষয় সপ্রমাণ হয় না। অতি ভয়ানক অত্যাচারই হইয়াছে, কিন্তু যে প্রকৃত আঘাত করা হয় তাহা এরূপ নহে যাহাতে আহত ব্যক্তিদিগের হানি হইয়াছে; তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, এ মোকদ্দমায় প্রধান অপরাধীর প্রতি ৩২৪ ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ দণ্ড দেওয়া উচিত। আমি বাবুকে কঠিন পরিশ্রম সহ তিন বৎসরের এবং অপর দুই আসামী কীলা ও লালুকে দুই বৎসর করিয়া কারাবাস-দণ্ড দিতে চাহি। (ব)

---

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং ই, জ্যাক্সন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম সেপার্ড প্রভৃতি।

ডাকাইতী ইত্যাদির অভিযোগে চব্বিশ-পরগণার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

মেং জি, সি, পল, এবং সি, সি, ম্যাক্রে বারিষ্টর এবং বাবু রাজেন্দ্র মিশ্র আপেলাণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে সেশন জজ প্রত্যেক সাক্ষীর বর্ণনা অবিকল জুরির নিকট বর্ণন না করিয়া, অভিযোক্তা এবং আসামী উভয়ের পক্ষের প্রমাণের প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণন করেন, সে স্থলে তাঁহার ঐ রূপ অবস্থাবর্ণন ফৌজদারী কার্য্য-বিধি মতে অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না।

বিচারপতি ফিয়ার।—বিচারপতি জ্যাক্সন এবং আমি এ মোকদ্দমা অতি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিয়াছি, কিন্তু আমরা এই সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছি যে, জুরির হুকুম অন্যথা করিবার কোন বিধিমত হেতু নাই।

আমরা বিবেচনা করি, জজ যে মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করেন, তাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধির বিধানানুযায়ীই হইয়াছে। তাহাতে অভিযোক্তা এবং আসামীগণের জওয়াব, উভয় সম্বন্ধেই জুরির নিকট প্রমাণের প্রধান প্রধান লক্ষণ দর্শান হইয়াছে।

আমরা বিবেচনা করি, জজ উভয় পক্ষের প্রমাণই বর্ণন করিয়াছেন।

ইহা অবশ্যই যথার্থ রূপে বলা যাইতে পারে যে, জজ প্রমাণ সম্বন্ধে এমত কোন কোন বর্ণনা ও

সাক্ষিগণের সম্বন্ধে এমত কোন কোন কথার উল্লেখ করেন নাই, যাহা বোধ হয় জুরির নিকট গুরুতর বোধ হইতে পারিত। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি না যে, এরূপ ত্রুটি দ্বারা কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে ভ্রম হইয়াছে, বা বিচার দূষিত হইয়াছে। যদি আইনের এ অভিপ্রায় না হয় যে, মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিতে জজকে সমুদায় সাক্ষীর সাক্ষ্য কথায় কথায় বলিতে হইবে, তবে জুরির নিকট জজের মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনে সে যে কথার উল্লেখ করিবার ত্রুটির বিষয় আমি বলিলাম, সেই রূপ ত্রুটি অবশ্যই হইবে। আমি বিবেচনা করি, জজকে ফৌজদারী কার্য্য-বিধি মতে জুরির নিকট প্রত্যেক সাক্ষীর প্রত্যেক কথা বলিতে হয় না। জুরির নিকট প্রমাণের সারভাগ কি প্রকারে বর্ণন করা উচিত তৎসম্বন্ধে জজের সূক্ষ্ম বিবেচনা পরিচালন করিতে হইবে, এবং আমরা বিবেচনা করি, এ আদালত যদি এমত না দেখেন যে, জজ জুরির নিকট প্রমাণ এরূপে অর্পণ করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহাদের ভ্রম হইবার সম্ভব, তবে নিম্ন আদালতের বিচারের ফলে এ আদালতের হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না।

আমাদিগকে এই অনুমান করিতে হইবে যে, বিচারের সময়ে জুরির নিকট যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করা হয়, এবং যাহার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে আইনে তাঁহাদিগের বিবেচনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহার গুরুত্ব এবং বল তাঁহারা নিজেই বুঝিতে পারেন। এবং আমাদের এমত স্থির করা উচিত নহে যে, জুরি যাহা অবশ্যই শুনিয়াছেন অনুমান করিতে হইবে, তাহার প্রত্যেক অংশ জজ তাঁহাদিগকে মনে করিয়া না দেওয়ায় সমুদায় বিচারই কলুষিত হইবে।

...এ মোকদ্দমায় সেশন জজ জুরির নিকট মোকদ্দমার যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ উত্তম, এবং আসামীগণের কৌন্সেল জজের অবস্থা বর্ণনের প্রতি যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা সাক্ষিগণের বর্ণিত বৃত্তান্ত বর্ণনের প্রণালী সম্বন্ধীয় আপত্তি মাত্র। সত্য বটে, জজ স্বয়ং বৃত্তান্তের যে মর্ম্ম গ্রহণ করেন, তিনি জুরিকেও তাহা বুঝিতে দেন, এবং হয়ত প্রমাণের যে অংশ তাঁহার মতের মূলীভূত, তাহা অন্যান্য অংশ হইতে তিনি বিশেষ করিয়া জুরিকে দর্শাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, তাঁহার মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন আসামীগণের পক্ষে এরূপ ক্ষতি-জনক হইয়াছে, যাহাতে জুরির বিচারের নিরপেক্ষতায় দোষ স্পর্শে;—সংক্ষেপে বলা যাইতেছে যে, আমরা সেশন আদালতের হুকুম অন্যথা করিবার পক্ষে আইন-সঙ্গত কোন কারণ দেখি না, এবং মোকদ্দমার সমুদায় বৃত্তান্তের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা এ কথা বলিতে পারি না যে, জজ যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা আসামীগণ যে অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। আমাদের বিবেচনায়, এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে। (ব)

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

রজনীকান্ত ভূমিক, দরখাস্তকারী।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন ব্যক্তি ডাকাইতীর অপরাধে বিচারিত হইয়া ফৌঃ কার্য্য-বিধির ২৯৬ ধারামতে প্রসিদ্ধ কুব্যবসায়ী বলিয়া সাব্যস্ত হয়, সে স্থলে ঐ ধারানুযায়ী অপরাধ সাব্যস্ত করণার্থে ঐ ডাকাইতীর বিচারে গৃহীত প্রমাণ অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা উচিত নহে; ঐ ধারানুযায়ী অপরাধের স্বতন্ত্র প্রমাণ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

যে ব্যক্তি এমত বলে যে, সে আসামীর সহিত একত্রে আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছে, সে যদি আসামীর তুল্য অপরাধী না হয়, তবে তাহার

সাক্ষ্য অন্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষিত না হইলেও গ্রাহ্য হইতে পারে।

বিচারপতি কিয়ার।—আমার বিবেচনায়, আমাদের এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

মাজিষ্ট্রেট দরখাস্তকারীকে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৯৬ ধারা অনুসারে প্রসিদ্ধ কুব্যবসায়ী লোক স্থির করেন। সে প্রথমতঃ এই আপত্তি করে যে, যে প্রমাণ দৃষ্টে ঐ রূপ স্থির করা হয় তাহা এমত সময়ে লওয়া হইয়াছে যখন তাহার উপর ডাকাইতীর অভিযোগ ছিল, এবং তাহা ২৯৬ ধারা অনুযায়ী স্বতন্ত্র কার্য্যে গৃহীত প্রমাণ নহে।

যদি সে ঐ প্রমাণ গ্রহণের প্রতি আপীলে আপত্তি করিত এবং এই সপ্রমাণ করিত যে তদ্দ্বারা তাহার হানি হইয়াছে, (তাহা হইবার সম্ভব বটে) তাহা হইলে দরখাস্তের এই হেতু কিঞ্চিৎ বলবৎ হইত। কিন্তু দরখাস্তকারী তাহা করে নাই, এবং এখনও বোধ হয় না যে, সাক্ষিগণের প্রতি তাহাকে জেরা করিতে দিলে সে সওয়াল করত ২৯৬ ধারা অনুসারে এই বিশেষ অভিযোগ সম্বন্ধে উক্ত প্রমাণ খণ্ডন করিতে পারিত। অতএব যদিও আমি বিবেচনা করি যে, এতৎসম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের অবলম্বিত উপায় নিয়ম-বিরুদ্ধ, তথাপি ঐরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই যে, তাহাতে আসামীর কোন হানি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আসামী আপত্তি করে যে, অপরাধস্বীকারক সাক্ষীর সাক্ষ্যই ঐ প্রমাণের আবশ্যকীয় অঙ্গ, এবং এই সাক্ষ্য প্রতিপোষিত হয় নাই।

আমার বোধ হয় এই আপত্তিতে প্রমাণের যে নিয়মের উপর নির্ভর করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে ভ্রম হইয়াছে। কোন আসামীর প্রতি যে অপরাধের অভিযোগ হয়, যখন কোন সাক্ষী নিজে সেই অপরাধ-জনক কার্য্যে ভুক্ত থাকিবার বিষয় স্বীকার করে, তখন উক্ত বিষয় সম্বন্ধে তাহার সাক্ষ্য অতি সাবধানে লইতে হইবে, এবং তাহা অন্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিপোষিত না হইলে, তদ্দৃষ্টে কার্য্য করা সুবিধা-জনক নহে। ইহার স্পষ্ট কারণ এই যে, উক্ত সাক্ষী যে সাক্ষ্য দেয় তাহা দ্বারা তাহারই উপকার হয়। কিন্তু এ স্থলে যদিও উক্ত সাক্ষী এমত সকল বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্যের কথা বলে যাহা সে দরখাস্তকারীর সহিত একত্রে করিয়াছে, তথাপি এক্ষণে তাহার নিজের প্রতি দরখাস্তকারীর ন্যায় কুব্যবসায়ের অভিযোগ হয় না। উক্ত কার্য্যের সাক্ষ্য দেওয়ায় সে আপন দোষ এড়াইবার জন্য, বা সে যে দণ্ড পাইবার যোগ্য তাহা লঘু করণার্থে কোন কার্য্য করে নাই। আমি বোধ করি, তাহার সাক্ষ্যের পোষকতায় অন্য নিরপেক্ষ প্রমাণ না থাকিলেও আইনে এমত কোন নিয়ম নাই যাহা দ্বারা এ মোকদ্দমায় তাহা লইবার বাধা হয়।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। (ব)

১২ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম উমাময়ী দেবী।

বাবু লক্ষ্মীচরণ বসু এবং অম্বিকাচরণ বসু দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন দেওয়ানী আদালত ফৌঃ কার্য্য-বিধির ১৬৯ ও ১৭০ ধারামতে কোন অভিযোগ উপস্থিত করিবার অনুমতি দেন, সে স্থলে তিনি যে অপরাধ বা অপরাধ সমূহের অভিযোগের অনুমতি দেন, তাহা বিশেষ করিয়া স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

বিচারপতি কেম্প।—হুগলির সেশন জজ ৪৩৪ ধারা মতে এই এত্তেমেজাজ করেন। জজের মত এই যে, মুন্সেফ অভিযোক্তাকে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিবার যে অনুমতি দেন, তাহাই যথেষ্ট। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের মতে দেওয়ানী আদালতের অনুমতি যথেষ্ট ঠিক হয় নাই। মুন্সেফের অনুমতি যথেষ্ট ঠিক হইয়াছে, জজের এই মত হওয়ায় তিনি মোকদ্দমা এই আদালতে পাঠান। মুন্সেফের ১৮৬৯ সালের ২৭ এ মে তারিখের হুকুম দেখিয়া বোধ হয় যে, মুন্সেফের নিকট যে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৬৯ ও ১৭০ ধারার বিধান অনুসারে অভিযোক্তাকে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশ করিতে অনুমতি দেওয়া হয়। এই দুই ধারায় প্রকাশ্য বিচারের বিরুদ্ধে অপরাধের এবং এমত সকল দলীল সম্বন্ধীয় অপরাধের অভিযোগের কথা বলা হইয়াছে, যাহাতে উক্ত অপরাধ দেওয়ানী আদালতের নিকট বা বিরুদ্ধে করা হয়, অথবা যাহাতে ঐ সকল দলীল দেওয়ানী আদালতের কোন কার্য্যে প্রমাণ রূপে দাখিল করা হয়। আমরা বিবেচনা করি যে, যখন কোন দেওয়ানী আদালত এই দুই ধারা-লিখিত কোন অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ করিতে অনুমতি দেন, তখন যে আদালত ঐ অনুমতি দেন, তিনি যে বিশেষ অপরাধ বা অপরাধ সমূহের নিমিত্ত ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ করিতে অনুমতি দেন তাহা তাঁহার নির্দ্দিষ্ট রূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। মুন্সেফ তাহা না করায় আমরা একথা বলিতে পারি না যে, উক্ত মোকদ্দমা যে রূপে উপস্থিত হয় তাহাতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের তাহার বিচার না করায় অন্যায় হইয়াছে; কিন্তু দেওয়ানী আদালত ১৬৯ এবং ১৭০ ধারা মতে যে সময়ে হউক, অনুমতি দিতে পারেন; অতএব আমরা এই কাগজাত ফেরৎ পাঠাইলাম। মুন্সেফকে এই আদেশ করিতে হইবে যে, তাঁহার মতে তাঁহার আদালতে যে অপরাধ বা অপরাধ সমূহ করা হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে অনুমতি দেন।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি অনেক বার এই মত ব্যক্ত করিয়াছি যে, যে প্রণালীতে এই প্রকারের মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালত হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পাঠান হয়, তাহা কতক শিথিল। এই মোকদ্দমায় স্পষ্টই মাজিষ্ট্রেটের আদালতে নালিশ করিতে এবং অভিযোগ উপস্থিত করিতে অনুমতি দেওয়া হয়, কিন্তু জাল করার কি শপথ পূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধের অভিযোগ হইবে, তাহা বলা হয় নাই, অথবা কোন্ বিষয়ে জাল করা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহাও বলা হয় নাই। আমি বোধ করি এই অনুমতি নিঃসন্দেহরূপে আইন-সঙ্গত হওনার্থে যথা সম্ভব স্পষ্ট এবং পরিষ্কার রূপে ব্যক্ত হওয়া উচিত। এমত কোন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে যাহাতে যে কর্ম্মচারী তাহা পাঠান, তিনি আসল কথা স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করিতে পারেন না, কিন্তু যে বিষয় সম্বন্ধে তদন্ত করা উচিত তাহা তাঁহার যথাসাধ্য স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য। আমি আরো বিবেচনা করি, এ মোকদ্দমায় মুন্সেফকে যখন বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিতে বলা হইয়াছিল, তখন তাঁহার তাহা করা উচিত ছিল। (ব)

১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

### বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং এফ এ গ্লবর।

শঠতা পূর্ব্বক অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার অভিযোগে হুগলির মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত (ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৪১২ ধারা।)

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম সরফুদ্দীন এবং অপর এক ব্যক্তি।

বাবু কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায় আপেলাণ্টের উকীল।

চুম্বক।—যদি কোন দ্রব্য এক ব্যক্তির বলিয়া যথেষ্ট রূপে চিহ্নিত হয়, এবং তাহা মালিকের বিধিমত অনুমতি ব্যতীত অপর এক ব্যক্তির দখলে পাওয়া যায়, তবে যাহার দখলে সেই সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহাকেই তাহার দখলের কারণ দর্শাইতে হইবে; এবং সে যদি তাহা দর্শাইতে না পারে, তবে জুরি সঙ্গত রূপেই এই অনুমান করিতে পারেন যে, আসামী অপরাধ ভাবেই এমত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছে, যাহা তাহার নিজের নহে বলিয়া সে জানিত।

বিচারপতি বেলি।—এ আপীলের হেতু এই যে, অপহৃত সম্পত্তির নিসানা করিবার কোন প্রমাণ না থাকার হেতুবাদে জজের খালাস দিবার মত ব্যক্ত করা উচিতই হইয়াছিল, এবং উক্ত মত বর্ণন সত্ত্বেও আসামীকে অপরাধ ভাবে গ্রহণ করিবার অপরাধী সাব্যস্ত করায় জুরির অন্যায় হইয়াছে; এবং দ্বিতীয়তঃ, জজ আসামীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লয়েন নাই, এবং কাজে কাজে আইন-ঘটিত ভ্রম করিয়াছেন।

এ মোকদ্দমা জুরি দ্বারা বিচারিত হয়। একটা জাম-বাটী আসামীর গৃহে পাওয়া যায়, সে তাহা তাহার নিজের বলিয়া দাবী করে।

অভিযোক্তার সাক্ষিগণ তাহা অভিযোক্তার বলিয়া নিশানা দেয়; যে হেতুবাদে তাহা নিশানা করা হয়, তাহা জজ জুরির নিকট মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনে দুর্ব্বল বোধ করেন, এবং তাঁহার মনে তাহা বিশ্বাস-যোগ্য হয় না। কিন্তু যেহেতু আইন অনুসারে প্রমাণ যথেষ্ট কি না, এই বৃত্তান্ত-ঘটিত নিষ্পত্তি জুরিরই করিতে হয়, অতএব জজ প্রমাণ দৃষ্টে তৎসমুদায় অতি সাবধানে জুরির নিকট উপস্থিত করেন, কিন্তু তাঁহারা আসামীর বিরুদ্ধে অপরাধের হুকুম দেন। এমত কোন আইন আছে বলিয়া, আমরা জ্ঞাত নহি, যদনুসারে আমরা এই রূপ বৃত্তান্ত দৃষ্টে আপীল গ্রহণ করিতে পারি।

আমাদের নিকট বলা হইয়াছে যে, যদিও জুরি নিশানা করা সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তথাপি অপরাধভাবে গ্রহণের কোন প্রমাণ নাই। অপরাধভাব এমত বিষয় নহে, যৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া যাইবে। তাহা মনের বিশ্বাসের কথা, এবং কোন মনুষ্যের আচরণের মনোগত ভাব সম্বন্ধীয় বিষয়। তাহা বৃত্তান্ত হইতে অনুমিত হইবে; যথা, যদি কোন দ্রব্য এক ব্যক্তির হইবার বিষয়ে যথেষ্ট নিশানা দেওয়া হয়, এবং তাহা মালিকের বিধিমত অনুমতি, হুকুম বা আদেশ ব্যতীত অপর এক ব্যক্তির দখলে পাওয়া যায়, তবে যাহার দখলে সেই সম্পত্তি পাওয়া যায়, তাহাকেই তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে; এবং সে তাহা দর্শাইতে না পারিলে জুরি এই অনুভব করিতে পারেন যে, আসামী অপরাধভাবেই ঐ সম্পত্তি লইয়াছে, যাহা সে তাহার নিজের নহে বলিয়া জানিত।

দ্বিতীয় আপত্তি অর্থাৎ আসামীর পক্ষের সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, এতৎসম্বন্ধে এমত কোন প্রমাণ নাই যে, এই প্রকারের কোন দরখাস্ত করা হইয়াছিল, এবং তাহা গ্রহণ করা হয় নাই; বিশেষতঃ এই মোকদ্দমায়, যে স্থলে প্রত্যেক আসামীর, অর্থাৎ যে আপীল করিয়াছে, এবং যে আপীল করে নাই, তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উকীল ছিল, তাহাতে যদি ইহাও অনুমান করা যায় যে, আসামী বা জজ আসামীর সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়ার আবশ্যকতা না দেখিতে পারেন, তথাপি হুগলির তুল্য জেলায় যেখানে এক আসামীর পক্ষে দুই জন উকীল উপস্থিত হন, তাঁহাদের বিবেচনায় আসামীর সাক্ষিগণের প্রমাণ গ্রহণ করিলে আসামীর উপ-

কার হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে, তাঁহারা জজকে যে উক্ত প্রমাণ লইতে বলিতেন না, এমত বলা অসম্ভব।

জুরির নিষ্পত্তি বৃত্তান্ত দৃষ্টে হইয়াছে, এবং তাহা ভ্রমাত্মক হইতে পারে বলিয়া তৎপ্রতি আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই, এবং মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনে বা বিচার কার্য্যে কোন আইন-ঘটিত ভ্রম নাই।

অতএব এই আপীল অগ্রাহ্য করা গেল।

বিচারপতি গ্লবর।—আমিও এই আপীল অগ্রাহ্য করিতে সম্মত হইলাম। এমত কোন আইন-ঘটিত হেতু নাই, যদ্দৃষ্টে আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত হইতে পারে। (ব)

---

১৪ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং এফ, এ, গ্লবর।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম হারুরাজোয়ার এবং আর দুই ব্যক্তি।

ডাকাইতীর অভিযোগে গয়ার মাজিস্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত হইয়া তত্রত্য সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা মতে, ডাকাইতী করার অপরাধে ১৪ বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না।

বিচারপতি গ্লবর।—আমরা এই মোকদ্দমার প্রমাণ পাট করিয়া দেখিলাম যে, আসামীগণ ন্যায্য রূপেই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

কিন্তু হারু ও রূপচাঁদের প্রতি যে ১৪ বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা আইন-বিরুদ্ধ।

দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর করার অথবা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাস দণ্ড দেওয়ার বিধান আছে। অতএব হারু ও রূপচাঁদের প্রতি কারাবাসের চরম দণ্ডাজ্ঞা দিলেও ১০ বৎসরের অধিক কারাবাসের হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না; কিন্তু ইহাও আমরা অতিশয় কঠিন শাস্তি বিবেচনা করি। আমাদের বিবেচনায়, সাত বৎসরের নিমিত্ত কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবাসের দণ্ড হইলেই এই মোকদ্দমার সুবিচার হইবে। অতএব আমরা তদনুসারে সেশন জজের হুকুম সংশোধন করিলাম। (গ)

---

১৬ ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে; বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

নবীনচন্দ্র রায়ের অভিযোগমতে
শ্রীশ্রীমতী মহারাণী
বনাম
সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি।

বারিষ্টর জি সি পল, অভিযোক্তা নবীনচন্দ্র রায়ের পক্ষের এড্‌বোকেট।

বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষের উকীল।

বারিষ্টর মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির পক্ষের এড্‌বোকেট ও বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তৎপক্ষের উকীল।

মাজিষ্ট্রেট মনরো নিজ পক্ষে স্বয়ং উপস্থিত।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬৮ ধারা কেবল এমত সকল স্থলে খাটে, যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি রীতিমত অভিযোগ করিতে উপস্থিত না হয়; কিন্তু এ প্রকার স্থলেও কোন অপরাধ জনক কার্য্য হইবার বিষয় মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বা তাঁহার সমক্ষে বিধিমত প্রদত্ত প্রমাণ দৃষ্টে, অবগত না হইলে গ্রেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট, জারী করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। পুলিসের রিপোর্ট, অথবা যে বর্ণনা শপথ পূর্ব্বক না হয়, অথবা যাহা নিয়-

মিত রূপে প্রকৃত অভিযোগের তুল্য নহে, তদ্দৃষ্টে মাজিষ্ট্রেটের ঐ রূপ ওয়ারেণ্ট জারী করার অধিকার নাই।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৭ ধারা, এবং সংশোধিত বিধির ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় ধারামতে, মাজিষ্ট্রেট সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা ওয়ারেণ্ট জারী করাইতে পারেন বটে, কিন্তু যখন পুলিসের সহায়তা পাওয়া যায় না অথবা তৎক্ষণাৎ কার্য্য করার অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়, কেবল তখনই তিনি ঐ প্রকারে জারী করাইতে পারেন।

প্রমাণ গৃহীত ও লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বে কোন আসামীকে হাজতে দেওয়া নিতান্ত অবৈধ।

মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি এক স্থানে না করিয়া মাজিষ্ট্রেটের মফঃসল পরিভ্রমণ কালে আসামীগণকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে লইয়া যাওয়া অতি অসঙ্গত; এবং কোন আসামীর জামিন দিয়া খালাস হইবার পরে তাহাকে স্বেচ্ছামত চলিতে না দিয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিতে বলা মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে একেবারে ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্য্য।

**সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির পক্ষে তাহাদের উকীল বাবু গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যে দরখাস্ত করেন এবং যাহার উপরে হাইকোর্ট এই রূল্ অর্থাৎ হুকুম প্রদান করেন, তাহার সারভাগ নিম্নে লেখা গেল ঃ—**

জেলা নদিয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট মেং জে, মনরোর সমক্ষে উল্লিখিত যে মোকদ্দমা উপস্থিত আছে, তাহাতে প্রার্থীরা প্রতিবাদী।

১। প্রার্থীরা শুনিয়াছে যে, গত ২৮ এ আগষ্ট তারিখে গোপাল রায় নামক এক ব্যক্তি নদিয়ার জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করে যে, উক্ত মোকদ্দমার কতিপয় প্রতিবাদী এবং অন্যান্য ব্যক্তি, জেলা নদিয়ার কমলবতী গ্রামে বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের ৩১ এ শ্রাবণ তারিখে নবীন রায় নামক এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া বলপূর্ব্বক স্থানান্তর লইয়া যায়, অতএব সে প্রার্থনা করে যে, নবীন রায় যে তখনও নিরুদ্দেশ ছিল তাহার খালাসের জন্য উপায় অবলম্বন করা হয়।

২। উক্ত গোপাল রায় গত ২৮এ আগষ্ট তারিখে এই প্রার্থনায় আর এক দরখাস্ত করে যে, তাহার প্রথম দরখাস্তের লিখিত বৃত্তান্ত সমস্তের তদন্ত হয়; কিন্তু প্রার্থীদের জানিতরূপে গত ২ রা নবেম্বরের পূর্ব্বে উক্ত গোপাল রায়ের দরখাস্ত সম্বন্ধে নদিয়ার মাজিষ্ট্রেট অথবা জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট, গোপাল রায়ের না অন্য কোন ব্যক্তির জবানবন্দী লন নাই।

৩। গত ২৪ এ সেপ্টেম্বর তারিখে নদিয়ার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট মেং মনরো, প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায় যে এইক্ষণে উল্লিখিত মোকদ্দমায় এক জন প্রতিবাদী হইয়াছে, তাহার উপরে এই আদেশে এক ওয়ারেণ্ট জারী করেন যে, সুরেন্দ্রনাথ রায়, উপরিউক্ত আসামীগণের মধ্যে উপস্থিত প্রার্থী মহেশ হাড়ী, পাইকা হাড়ী, হরিশ ঘোষ এবং দ্বারিক ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়া উক্ত প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেটের হুজুরে প্রেরণ করে।

৪। উক্ত ওয়ারেণ্ট মতে প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রার্থী মহেশ হাড়ী, পাইকা হাড়ী, ও হরিশ ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়া মুড়াগাছা গ্রামে গত ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে মেং মনরোর নিকটে প্রেরণ করে।

৫। মেং মনরো তাহাতে আসামী পাইকা হাড়ী, মহেশ হাড়ী ও হরিশ ঘোষকে হাজতে পাঠাইবার হুকুম দেন; এবং আসামীগণকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়ার জন্য আসামীগণের পক্ষ হইতে যে বাচনিক প্রার্থনা হয় তাহা তিনি অগ্রাহ্য করেন।

৬। প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায় উক্ত ওয়ারেণ্ট মতে, গত ৭ ই অক্টোবর তারিখে, মেং মনরো যিনি তখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন, তাঁহার নিকট আসামী দ্বারিক ঘোষকে পাঠাইয়া দেয়।

৭। কৃষ্ণনগরে মেং মনরোর সমীপে আসামী দ্বারিক ঘোষের, এবং যে সকল আসামীর প্রতি মুড়াগাছায় হাজতের হুকুম হইয়াছিল তাহাদের খালাসের জন্য পুনরায় এক দরখাস্ত করা হয়; কিন্তু এই দরখাস্তও অগ্রাহ্য হয়।

৮। প্রার্থী মহেশ হাড়ী, পাইকা হাড়ী, হরি ঘোষ এবং দ্বারিক ঘোষকে গত ২ রা নবেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ প্রথম তিন জন আসামীকে ৩৪ দিন এবং চতুর্থ আসামীকে ৪৬ দিন পর্য্যন্ত কেবল সন্দেহ করিয়া এবং আসামীগণের সাক্ষাতে আসামীগণের বিরুদ্ধ কোন প্রমাণ লিপিবদ্ধ না করিয়া হাজতে রাখা হয়।

৯। আসামীগণকে কৃষ্ণনগরে মেং মনরোর হুজুরে হাজীর হওয়ার জন্য গত ২ রা নবেম্বর তারিখে হুকুম হয়, এবং সেই দিবস, মেং মনরো যে, নবীন রায় গোম হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহার কতক জবানবন্দী লন।

১০। সেই দিবসে অর্থাৎ ২ রা নবেম্বর তারিখে নবীন রায়ের কতক জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিয়াই সোনাডাঙ্গানিবাসী প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে আসামী করিয়া কয়েদ করা হয়। প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে জামিন লইয়া খালাস দেওয়ার জন্য সেই তারিখে দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু মেং মনরো এই হেতুবাদে তাহা অগ্রাহ্য করেন যে, দণ্ডবিধির ৩৬৫ ও ৩৬৮ ধারানুযায়ী যে সকল অপরাধের জন্য জামিন লওয়ার বিধি নাই, আসামীগণের বিরুদ্ধে প্রবল দৃষ্টব্য প্রমাণের দ্বারা সেই সকল অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে।

১১। ৩ রা নবেম্বর তারিখে প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে জামিন লইয়া খালাস দেওয়ার জন্য পুনরায় দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু মেং মনরো তৎপূর্ব্ব দিবসে যে হুকুম দেন তাহার তিনি পুনর্ব্বিচার করিতে অস্বীকার করেন।

১২। গত ৪ ঠা নবেম্বর তারিখে উক্ত নবীন রায়ের জবানবন্দী সমাপ্ত হয়, এবং সেই দিবস আর তিন চারি জন সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া মেং মনরো আন্দাজ এক সপ্তাহের জন্য মোকদ্দমা শ্রবণ স্থগিত রাখেন, এবং তিনি প্রার্থীকে অবগত করেন যে, মোকদ্দমার তদন্ত হইতেছে এবং কত দিন পর্য্যন্ত সেই তদন্ত চলিবে তাহা নিশ্চিত নাই।

১৩। ঐ মুলতবীর হুকুম প্রদানের পরে, লইয়া প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে খালাস দেওয়ার প্রার্থনায় পুনরায় এক দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু মেং মনরো তাহাও অগ্রাহ্য করেন।

১৪। ইতিমধ্যে অর্থাৎ ৪ ঠা নবেম্বর তারিখে, জামিন লইয়া প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে খালাস দেওয়ার জন্য নদিয়ার সেশন জজের নিকট দরখাস্ত করা হয়, কিন্তু তিনি মোকদ্দমার তৎকালের অবস্থায় প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেটের হুকুমে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করায়, প্রার্থী হাইকোর্টে দরখাস্ত করে এবং হাইকোর্ট তাহাকে জামিন লইয়া খালাসের হুকুম দেন।

১৫। প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায় শুনিয়াছে যে, গত ১০ ই নবেম্বর তারিখে বেলা অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় যখন মেং মনরো কাছারীতে ছিলেন তখন তাঁহার নিকট ঐ খালাসের হুকুম পৌছঁছে; কিন্তু তিনি সুরেন্দ্রনাথ রায়কে খালাস না দিয়া আপন গৃহে চলিয়া যান, সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ রায় তাহার পর দিবসের পূর্ব্বে খালাস পায় না। প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ ইহাও অবগত হইয়াছে যে, তাহার মোক্তার ঐ ১০ ই নবেম্বর তারিখে অপরাহ্ণে মেং মনরোকে হাইকোর্টের উক্ত হুকুমের কথা স্মরণ করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার বাটীতে যায়, কিন্তু মেং মনরো তাঁহার বাটীতে ঐ বিষয়ের কোন দরখাস্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

* * *

১৮। মেং মনরো কৃষ্ণনগরে গত ৯ ই নবেম্বর তারিখে পুনরায় এই মোকদ্দমা গ্রহণ করেন এবং অভিযোক্তার পক্ষের প্রায় ৭ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লন, এবং তন্মধ্যে এক জন সাক্ষী জেরাসওয়ালে বলে যে, সেই দিবস সে যে জবানবন্দী দিল তাহা সে পূর্ব্বে মেং মনরোকে গোপনে বলিয়াছে।

১৯। তাহার পরে ১৮ ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মোকদ্দমা মুলতবী থাকে, কিন্তু সেই তারিখে কোন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় না, এবং পুনরায় তাহা ২৫ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত মুলতবী থাকে এবং সেই তারিখেও মোকদ্দমা দরপেশ হয়

না, কিন্তু আসামীগণের প্রতি হুকুম তাহারা গত ৯ ই নবেম্বর তারিখে রাণাঘাটে হাজির হয়।

২০। ৯ ই ডিসেম্বর তারিখে প্রার্থীরা রাণাঘাটে উপস্থিত হয়, কিন্তু ১০ ই তারিখে তাহাদের প্রতি হুকুম হয় যে, মাজিষ্ট্রেট শীতকালের পরিভ্রমণে কৃষ্ণনগর হইতে ৪০ মাইল ব্যবধান কাঁচরাপাড়া নামক স্থানে গমন করিবেন, অতএব আসামীগণকে ২৩ এ ডিসেম্বর তারিখে তথায় হাজির হইতে হইবে।

২১। ২২ এ ডিসেম্বর তারিখে প্রার্থিগণ শুনে যে, মেং মনরো চাকদহে আছেন, অতএব তাহারা তথায় তাঁহার নিকট ২২ এ ও ২৩ এ তারিখে হাজির হয়, কিন্তু ২৪ এ তারিখে মোকদ্দমা দরপেশ্ হইয়া অভিযোক্তার পক্ষে প্রায় ৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়।

২২। তাহার পরে ৩ রা জানুয়ারি তারিখে কাঁচরাপাড়া মোকামে মোকদ্দমা দরপেশ হয় এবং তখন আর ৫ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়।

২৩। তাহার পর দিবস আর কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী হওয়া হয়; তদনন্তর আসামীগণের প্রতি হুকুম হয় যে, তাহারা মেং, মনরোর হুজুরে ১৫ ই জানুয়ারি তারিখে সারসা গ্রামে হাজির হয়। সারসা কৃষ্ণনগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল এবং চাকদহের রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে প্রায় ২৮ মাইল ব্যবধান।

২৪। ইতিমধ্যে এবং প্রধান সাক্ষী নবীনচন্দ্র রায়ের ও আর কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়ার পরে, প্রায় ১০ জন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়া আসামীর শ্রেণী-ভুক্ত হয়, কিন্তু যে সকল সাক্ষীর পূর্ব্বে জবানবন্দী লওয়া হইয়াছিল, তাহাদিগকে আর পুনরায় তলব করা হয় নাই।

২৫। নবীন রায়ের জবানবন্দীর পরে যে সকল আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়, মোকদ্দমার সেই কালে তাহাদিগকে আসামী করা অন্যায় হইয়াছে, বলিয়া দরখাস্ত করা সত্ত্বেও মাজিষ্ট্রেট মেং মনরো তাহাদিগকে জামিন লইয়া খালাস দিতে অস্বীকার করাতে, বর্ত্তমান প্রতিনিধি সেশন জজের নিকট তাহাদের পক্ষে দরখাস্ত হয়, এবং তিনি ২২ এ নবেম্বর তারিখে তাহাদের জামিন লইয়া খালাস দিবার হুকুম দেন।

২৬। জামিন লইয়া খালাস দেওয়ার পূর্ব্বে আসামী কৃষ্ণ চাড়াঁল, মাতুব্বর সেখ ও ওজুল্লাকে কএক দিন পর্য্যন্ত কোতওয়ালীর থানায় এবং অবশিষ্ট আসামীগণকে জেহেলখানায় রাখা হয়।

২৭। যদিও হাইকোর্ট প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়কে জামিন লইয়া খালাস দিতে হুকুম দেন, তথাপি মেং মনরো তাহাকে তাহার আপন বাটীতে যাইতে নিষেধ করেন, এবং হুকুম দেন যে সে প্রত্যহ কোর্ট-ইন্‌স্পেক্‌টরের নিকট হাজিরা দেয়।

২৮। ১৫ ই জানুয়ারি শনিবার বনগ্রাম মোকামে ঐ মোকদ্দমা পুনরায় দরপেশ হয় এবং অভিযোক্তার পক্ষের আর এক জন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়া অভিযোক্তার সওয়াল-জওয়াব সমাপ্ত হয়।

২৯। তদনন্তর মেং মনরো, আসামী কৈলাস সরকার, রাখাল রায়, ব্রজ ভট্টাচার্য্য, বাবু সেখ, হবু ঘোষ ও ওজুল্লা বেওয়াকে খালাস দিবার হুকুম দিয়া প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ড-বিধির ৩৪২ ও ১০৯ ধারামতে অভিযোগ প্রণয়ন করত তাহার জওয়াব লওয়ার হুকুম দেন, কারণ, তাঁহার কোন আসামীকে দাওরায় সোপর্দ্দ করিবার মনস্থ ছিল না।

৩০। ২৭ এ তারিখে বনগ্রাম মোকামে মোকদ্দমা শ্রবণের দিন স্থির হয়, এবং মেং মনরো তাহার পরে বলেন যে, তিনি ১৭ ই সোমবার অন্যান্য আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রণয়ন করিবেন।

৩১। ১৭ ই সোমবার মেং মনরো অন্য

৫ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রণয়ন করেন, (যাহার নকল প্রার্থীরা প্রাপ্ত হয় নাই) এবং এক জন আসামীকে খালাসের হুকুম দেন।

৩২। ১৮ ই তারিখ মঙ্গলবার মেং মন্‌রো, হরিশ ঘোষ নামক প্রার্থীর মানিত এক সাক্ষীকে তলব করিয়া তাহার জবানবন্দী লন; কিন্তু প্রার্থী হরিশ ঘোষ যে দরখাস্ত করে যে, অন্য কোন আসামীর অথবা তাহাদের উকীলের সাক্ষাতে উক্ত সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, তাহা মেং মন্‌রো গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন।

৩৩। প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায়ের মোকদ্দমা শ্রবণের দিন ২৭ এ তারিখে স্থির হয়, কিন্তু অন্যান্য আসামীগণকে ২৫ এ তারিখে তাহাদের সাক্ষী হাজির করিতে হুকুম হয়।

৩৪। প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট মেং মন্‌রো বরাবর আসামীগণকে বলিয়া আসিয়াছেন যে, তিনি তাহাদিগকে সেশনে অর্পণ করিবেন।

৩৫। প্রার্থিগণ প্রায় ৪০ জন সাক্ষী মানিয়াছে, এবং তাহাদিগকে অনেক দূর হইতে এবং তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে মুরসিদাবাদ অর্থাৎ নবীন রায় যেখানে কয়েদ ছিল বলিয়া কহে, তথা হইতে আনিতে হইবে।

৩৬। মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সঙ্গে এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গমনাগমন করিতে ও যে গ্রাম সমস্তে থাকিবার উপযুক্ত স্থান নাই, তথায় থাকিতে যে শারীরিক কষ্ট হয়, তদ্ব্যতীত প্রার্থীরা তাহাদের কৌন্সেলী ও মোক্তারগণকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনেক ব্যয় করিতেও বাধ্য হইয়াছে।

৩৭। মোকদ্দমা উপরিউক্ত প্রকারে বারম্বার মুলতবী থাকাতে প্রার্থিগণের অনেক কষ্ট হইয়াছে, এবং যেহেতু মেং মন্‌রো, কৃষ্ণনগরে মোকদ্দমার বিচার করিতে অস্বীকার করিয়াছেন, অতএব বনগ্রামে অথবা নদীয়া জেলার মফঃসলের অন্য কোন স্থানে প্রার্থিগণ তাহাদের সাক্ষী হাজির করিতে অনেক কষ্ট পাইবে।

৪০। মেং মন্‌রোর নিকটে সুরেন্দ্রনাথ রায়ের বিরুদ্ধে পুলিস কর্ত্তৃক এক নালিশ উপস্থিত ছিল, এবং নবীন রায়ের মোকদ্দমায় কথিত প্রকারে পুলিসের তদন্তে ব্যাঘাত ও সাক্ষী স্থানান্তর করিবার অভিযোগে আর একটি মোকদ্দমা ছিল। প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রথমে গত সেপ্‌টেম্বর মাসে ওয়ারেণ্টের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়।

৪১। মেং মন্‌রো প্রথমে গত সেপ্‌টেম্বর মাসে মোকদ্দমার তদন্ত আরম্ভ করেন, এবং অক্‌টোবর মাসের প্রারম্ভে শেষ সাক্ষীর জবানবন্দী লন; এবং মুলতবী রাখার কোন আবশ্যক না থাকাতেও মেং মন্‌রো গত সপ্তাহ পর্য্যন্ত মোকদ্দমা বিচার না করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রার্থী সুরেন্দ্রনাথ রায় অবগত হইয়াছে যে, ঐ মোকদ্দমা গত সপ্তাহে তাহার অনুকূলে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

* *

৪৩। প্রার্থিগণের বক্তব্য এই যে, যেহেতু মেং মন্‌রো প্রথম হইতেই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, প্রার্থিগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দৃষ্টব্য সপ্রমাণ হইয়াছে, এবং তিনি তাহা সেশনে অর্পণ করিবেন, অতএব তিনি নিজে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না; এবং যে স্থলে উপরিউক্ত বৃত্তান্ত সমস্তের দ্বারাই দেখা যাইতেছে যে, তিনি বরাবর অভিযোক্তার পক্ষপাত দেখাইয়া আসিয়াছেন, এবং গোপনে যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহার বশীভূত হইয়াছেন, সে স্থলে তিনি প্রার্থিগণের মোকদ্দমার বিচার করিবার উপযুক্ত পাত্র নহেন।

অতএব প্রার্থিগণের প্রার্থনা এই যে, প্রথমতঃ, উপরিউক্ত হেতু সমস্ত পর্য্যালোচনা করত বিচারপতিগণ, উক্ত মোকদ্দমার নথী তলব দিয়া, মেং মন্‌রো ১৫ ই ও ১৭ ই তারিখে যে হুকুম দেন যে, প্রার্থীরা তাঁহার সমক্ষে জওয়াব দাখিল

করিবে, সেই হুকুম অন্যথা করার করিবেন; এবং দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, যদি বিচারপতিগণের মনে প্রার্থিগণের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ থাকা অনুভূত হয়, তবে জেলা মুরসিদাবাদে যে স্থানে অভিযোক্তা ও আসামীগণ উভয়ের পক্ষের অনেক সাক্ষী বাস করে, সেই জেলার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা না কৃষ্ণনগরের জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অথবা অন্য কোন আদালতের দ্বারা মোকদ্দমা বিচারিত হওয়ার আজ্ঞা করিবেন।

উক্ত দরখাস্তের উপরে হাইকোর্ট (উপস্থিত, বিচারপতি ফিয়ার ও ই, জ্যাক্‌সন) যে হুকুম প্রচার করেন, তাহা নিম্নে লেখা গেল, যথা,—

হুকুম হইল যে, উপরিউক্ত মোকদ্দমার নথী অবিলম্বে এই বিচারালয়ে প্রেরিত হয়, এবং অভিযোক্তা নবীন রায়ের উপরে এই হুকুম জারী হওয়ার পরে ১৫ দিবসের মধ্যে সে কারণ দর্শায় যে, কি জন্য দরখাস্তের লিখিত হেতুবাদে মাজিষ্ট্রেটের ১৫ ই ও ১৭ ই তারিখের হুকুম অন্যথা হইবে না, এবং কি জন্য প্রার্থীদিগের প্রার্থনা অনুসারে মোকদ্দমা অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পিত হইবে না। ঐ সময় পর্য্যন্ত মাজিষ্ট্রেট এই মোকদ্দমায় আর কোন কার্য্য করণে ক্ষান্ত থাকিবেন।

এই দরখাস্তের ও তদুপরি যে হুকুম হইল, তাহার এক খণ্ড নকল মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই জানাইবার জন্য প্রেরিত হইবে যে, তিনি ইচ্ছা করিলে, এই হুকুম দরপেশ হওয়ার কালে তাঁহার বক্তব্য শুনা যাইতে পারিবে, এবং এই দরখাস্তের লিখিত বিষয়ে তিনি কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত বোধ করিলে তাহা তিনি প্রেরণ করিতে পারিবেন।

ঐ রুল নাইসাইয়ের তর্কবিতর্কের উপরে প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি ফিয়ার্।—এই মোকদ্দমা চলিবার প্রণালী সম্বন্ধে মেং মনরো নিজে যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ফৌজদারী কার্য্য-বিধিতে কার্য্য করার প্রণালীর যে বিধি আছে, তিনি এই মোকদ্দমায় তাহার অনেক অন্যথাচরণ করিয়াছেন, এবং তিনি মোকদ্দমার অনেক সময়ে বিবেচনার এমত অভাব-প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহা অতি শোচনীয়; কিন্তু সমুদায় দৃষ্টে আমি বিবেচনা করি যে, এই রুল রহিত হইবে, কারণ, এই দীর্ঘকাল চলিত মোকদ্দমার কোন সময়ে মেং মনরো যে, বিচারকের ন্যায় স্বকর্ত্তব্য সম্পাদন করার ইচ্ছা ভিন্ন আসামীদিগের প্রতি অন্য কোন অন্যায্য ভাবের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়াছেন, এমন অভিযোগ হইতে তাঁহাকে আমি সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি দিতেছি।

ইহা অতি শোচনীয় যে, মেং মনরো যে কার্য্য-প্রণালী আমাদের ফৌজদারী কার্য্য-বিধি অনুমত বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা নদীয়ার ন্যায়, রাজধানীর এমন সন্নিহিত জেলায় এখনও কথিত প্রকারে প্রচলিত আছে।

ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, আসামীগণকে কয়েদ রাখা আদ্যোপান্তই আইন-বিরুদ্ধ হইয়াছিল। মেং মনরো বলেন যে, তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে, গেরেপ্তারের জন্য তিনি যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬৮ ধারানুযায়ীই হইয়াছিল; কিন্তু আমার স্পষ্ট মত এই যে, যে স্থলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি রীতিমত অভিযোগ করিতে উপস্থিত না হয়, কেবল সেই সমস্ত স্থলেই ঐ ধারা খাটে। ব্যক্তিবিশেষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতে অনিচ্ছু বা অসমর্থ হইলে সুবিচারের ব্যাঘাত না হয়, এই জন্যই সরকারী কর্ম্মচারী সম্বন্ধে আইনে ঐ বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এবং এ রূপ স্থলেও অপরাধ হইবার

বিষয় অবগত হওয়ার উপরে মাজিষ্ট্রেটের গ্রেপ্তার করার অধিকার নির্ভর করে, এবং সেই অবগতি মাজিষ্ট্রেটের নিজের দ্বারা অথবা বিধিমত প্রদত্ত প্রমাণ দৃষ্টে হইবে।

কিন্তু এ স্থলে মেং মনরো আপন কৈফিয়তের আরম্ভেই কহিয়াছেন যে, নবীন রায়ের ভ্রাতা কেবল জইণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রথমে নালিশ করিয়াছিল, এমত নহে, মেং মনরো নিজে পশ্চাতে যে সকল কার্য্য করেন তাহা ঐ ব্যক্তি পুলিসে ও তাঁহার নিজের সমীপে যে সংবাদ দেয়, বস্তুতঃ তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই করা হইয়াছিল। অতএব ৬৮ ও ১৩৫ ধারায় যে সূত্র বর্ণিত আছে তাহার অন্যতর সূত্রের উপরে মোকদ্দমা স্পষ্টই চলিতে পারিত, এবং চালানও উচিত ছিল। মেং মনরোর নিজে গবর্ণমেণ্টের পক্ষের অভিযোক্তার ন্যায় কার্য্য করার কোন আবশ্যক ছিল না।

শারীরিক স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য ইংলণ্ডের আইন সমস্ত যে প্রকার সতর্ক, ভারতবর্ষের আইনও যে তদ্রূপ, এ বিষয়ে আমার মতে কোন সন্দেহ নাই, এবং নিশ্চিত আইনের যে সকল ঘটনা স্পষ্ট রূপে নির্দিষ্ট আছে তাহা ব্যতীত অন্য স্থলে ঐ স্বাধীনতা হইতে ন্যায্য রূপে বঞ্চিত করা যাইতে পারে না। মেং মনরো গ্রেপ্তারীর যে ওয়ারেণ্ট প্রচার করেন এবং যাহার দ্বারা প্রার্থীরা কয়েদ হয় তাহা ঐ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ভ্রাতা অনিয়মিত রূপে যে সংবাদ দেয় তাহা অবলম্বন করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল।

"নবীন তখনও নিরুদ্দেশ ছিল, এবং অভি-
"যুক্ত ব্যক্তিগণ সুরেন্দ্রনাথ রায়ের রাইয়ৎ বিধায়
"পুলিসের রিপোর্ট, এবং ঐ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির
"ভ্রাতা মুড়াগাছায় আমার নিকট উপস্থিত
"হইয়া যে সংবাদ দেয় তাহার উপরে নির্ভর
"করিয়া, সুরেন্দ্রনাথের উপরে আমি এই হুকুম
"সহ এক ওয়ারেণ্ট জারী করি যে, ঐ সকল
"ব্যক্তির উপরে ডাকাইতীর অভিযোগ হওয়াতে
"সুরেন্দ্রনাথ রায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া
"পাঠাইবে।"

ইহা মেং মনরোর নিজের বর্ণনা।

আমি বিবেচনা করি যে, পুলিসের রিপোর্ট অথবা নিরুদ্দেশ ব্যক্তির ভ্রাতার কথা যাহা বাস্তবিক নিয়মিত অভিযোগ অথবা শপথ পূর্ব্বক এজাহার নহে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া ওয়ারেণ্ট জারী করিতে আইন মতে মাজিষ্ট্রেটের অধিকার জন্মে না। পুলিস যে ব্যক্তিকে অপরাধী করিতে চাহে, মাজিষ্ট্রেট কেবল পুলিসের রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করিয়া তাহার গ্রেপ্তারীর জন্য ওয়ারেণ্ট জারী করিলে কত অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা আমার দেখাইয়া দেওয়া বাহুল্য। কোন কোন ঘটনায়, যথা, যখন মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে কোন অপরাধ করা হয়, তখন মাজিষ্ট্রেট নিঃসন্দেহই কোন নালিশ অথবা শপথপূর্ব্বক এজাহার না লইয়াও অপরাধীর গ্রেপ্তারীর হুকুম দিতে পারেন, কিন্তু তাহা তিনি ১১০ ধারার বিধান মতে পারেন, এবং বিধিতে এই ক্ষমতার স্বতন্ত্র বর্ণনা থাকাতেই দেখা যাইতেছে যে, মেং মনরো ৬৮ ধারার যে অর্থ করিয়াছেন তাহার সেই অর্থ হইতে পারে না। যে সকল ঘটনায় পুলিস ওয়ারেণ্ট ব্যতীত গ্রেপ্তার করিতে পারে, তাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধিতে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং আমার বোধ হয় যে, ওয়ারেণ্টের দ্বারা যে ব্যাপক ক্ষমতা পরিচালিত হয় তাহা মাজিষ্ট্রেটের নিজের সুবিচার-সম্মত বিবেচনামতে, অথবা যে অপর ব্যক্তি নালিশের অথবা শপথ-পূর্ব্বক এজাহারের দ্বারা এমন সকল বৃত্তান্ত দর্শায় যদ্দ্বারা আইনের কার্য্য করাইবার হেতু সে দায়ী হয়, সেই সকল বৃত্তান্তের উপরে পরিচালিত হইতে পারে।

পরন্তু, এই মোকদ্দমায় যে প্রকার ওয়ারেণ্ট জারী হইয়াছে তাহা অতি শোচনীয়। ইহা পুলিসের কর্ম্মচারীর বরাবর লিখিত না হইয়া

সুরেন্দ্রনাথ রায়ের নামে লেখা হইয়াছে যাঁহার মন্ত্রণায়ই কথিত গোম হয় বলিয়া পুলিস কর্তৃক কল্পিত হইয়াছিল। এবং এই বিষয়ে মাজিস্ট্রেট পুলিসের মত অবলম্বন না করিয়া থাকিলেও, যে সকল ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল তাহাদের সহিত সুরেন্দ্রনাথ রায়ের এমন স্পষ্ট সম্বন্ধ ছিল যে, সে অতি শীঘ্র এক সহকারী বলিয়া গ্রেপ্তার হয়। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৭৭ ধারায় এবং সংশোধিত বিধির তদনুরূপ ধারায় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা ওয়ারেণ্ট জারী করাইবার জন্য মাজিস্ট্রেটের প্রতি ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু যে যে অবস্থায় এই ক্ষমতা পরিচালিত হওয়া ব্যবস্থাপক সমাজের মনোগত ছিল তাহার আভাস ঐ আইনের মধ্যেই দেখা যায়, অর্থাৎ তাঁহাদের মনস্থ ছিল যে, সচরাচর পুলিসের কর্ম্মের এবং পদোপলক্ষে এই রূপ ওয়ারেণ্ট জারী করার ভার-প্রাপ্ত উপযুক্ত কর্ম্মচারীর সহায়তা যে স্থলে না পাওয়া যায়, এবং সর্ব্বোপরি যে স্থলে তৎক্ষণাৎ কার্য্য করার অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়, তখনই ঐ ক্ষমতা পরিচালিত হইবে।

প্রথম গ্রেপ্তার আইন-সঙ্গত রূপে হইয়া থাকুক, বা না থাকুক, ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, তৎপরে যে হাজতে দেওয়ার হুকুম হয়, ও বারম্বার তথায় ফেরৎ পাঠান হয় তাহা কোন প্রমাণ দৃষ্টে না হওয়াতে নিতান্ত অবৈধ হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা শোচনীয় যে, মেং মনরো, স্বীয় বিচারাসনে উপবিষ্ট থাকার কালে আসামীকে জামিন লইয়া খালাস দেওয়া সম্বন্ধে হাইকোর্টের হুকুম পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রকাশ করেন নাই, এবং মেং পল যে বলিয়াছেন যে, ঐ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি তখন আদালতে উপস্থিত ছিল না, তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও, মাজিস্ট্রেটের ঐ ত্রুটি আমি শোচনীয় জ্ঞান করি; কারণ, মাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্য ও আচরণ সম্বন্ধে লোকের মনে যদি কোন ভ্রম হয়, এই সকল স্থলে মাজিস্ট্রেটের ঐ প্রকার প্রচার করাই ঐ ভ্রম নিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

২ রা নবেম্বরের পরে মোকদ্দমার ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। সেই সময়ে মাজিস্ট্রেটের সমক্ষে এমন প্রমাণ প্রদর্শিত হয়, যদ্দৃষ্টে তিনি তাঁহার বিবেচনাধীন ক্ষমতা পরিচালন করত এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, মোকদ্দমার তদন্তের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আসামীগণকে নিরাপদে আবদ্ধ রাখার জন্য অথবা তাহাদের বিচারের অপেক্ষায় তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করা উচিত। এবং আমার বিবেচনায় এরূপ হওয়াতেই প্রার্থিগণের সর্ব্ব-প্রবল হেতু আমার নিকট নিস্ফল বোধ হইতেছে; কারণ, আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে, আমার বিবেচনায় ২ রা নবেম্বরের পূর্ব্বে যে গ্রেপ্তার ও কএদ হয়, তাহা অবৈধ হইয়াছিল, বলিয়া পশ্চাতের সকল কার্য্যই বৃথা হইয়াছে, এবং রহিত হওয়া উচিত। আমার বোধ হয় যে, বিচারের কালে গৃহীত এবং লিপিবদ্ধ প্রমাণ দৃষ্টে উপযুক্ত কর্ম্মচারি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হুকুমের দ্বারা প্রার্থিগণ এক্ষণে বিচারার্থে অর্পিত হইয়াছে; অতএব আমি এমন কথা বলিতে পারি না যে, তিনি যে সকল অপরাধে তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের বিচার হওয়া উচিত নহে।

তর্কবিতর্কে আমাদের সমক্ষে অন্যান্য অনেক বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আমি এমন কথা বলি না যে, তদ্দ্বারা অনেক সময় নিরর্থক নষ্ট হইয়াছে; কিন্তু আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের তাহা বিস্তারিত রূপে এক্ষণে পর্য্যালোচনা করার আবশ্যক নাই।

আমি দেখিতেছি যে, আসামীদিগকে প্রথম গ্রেপ্তার করণাবধি তাহাদিগকে অর্পণ করা পর্য্যন্ত অতি অযৌক্তিক দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়াছে, এবং আমি বিবেচনা করি যে, মেং মনরো

তাঁহার মফঃসল পরিভ্রমণ কালে সঙ্গে সঙ্গে পক্ষগণকে যে প্রকার স্থানে স্থানে টানিয়া লওয়াইছিলেন, তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারীর তাহা না করাই উৎকৃষ্টতর বিবেচনার কার্য্য হইত। কৃষ্ণনগর মোকামে মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে নিষ্পত্তি করার জন্য তিনি অনেক উপায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহার এই অনুমান যদি বিশুদ্ধ হয় (কিন্তু আমার বিবেচনায়, তাহা বিশুদ্ধ নহে) যে, তিনি ৬৮ ধারামতে কার্য্য করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাহা কোন অধীন মাজিস্ট্রেটের নিকট তদন্তের জন্য অর্পণ করিতে পারিতেন না, তথাপি প্রধান নগরে অথবা ঐ জেলার অন্য কোন সুবিধা-জনক স্থানে তাঁহার স্বয়ং ঐ মোকদ্দমা গ্রহণ ও সম্পূর্ণ রূপে নিষ্পত্তি করার কোন বাধা ছিল না। শীত কালে মাজিস্ট্রেটের মফঃসল পরিভ্রমণের গতি এমন প্রয়োজন-মূলক অটল নিয়মের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট নহে যে, মেং মনরো ন্যায্য রূপে কোন মতেই এক স্থানে বসিয়া এই মোকদ্দমার সকল প্রমাণ লইতে পারিতেন না।

আসামীদিগকে থানায় আটক রাখা, অধিক না বলিলেও, মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে, সদ্বিবেচনার কার্য্য হয় নাই বলা যাইতে পারে; এবং সুরেন্দ্রনাথ রায় জামিনে খালাস হইবার পরেও তাহাকে কৃষ্ণনগর মোকামে থাকিতে যে হুকুম দেওয়া হয়, তাহা একেবারেই ক্ষমতা-বহির্ভূত এবং তাহা দেওয়া উচিত ছিল না।

আমি ইহাও বলিতে পারি না যে, সাক্ষী হরিশনাথের জবানবন্দী যে প্রকারে ও যে অবস্থায় লওয়া হইয়াছিল, তদ্দ্বারা আসামীদিগের মনে মাজিস্ট্রেটের সরলতা ও অপক্ষপাতিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিতে পারে না।

এই মোকদ্দমার সমুদায় বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না যে, যদিও আসামীগণের সহিত মহারাণীর এই মোকদ্দমা মেং মনরোর বিচার করিবার অযোগ্যতার কোন হেতু এক্ষণে দৃষ্ট হয় না, তথাপি তিনি এই আদালতে যে কৈফিয়ৎ দাখিল করিয়াছেন, তাহা প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বে এমন অনেক হেতু ছিল, যদ্দ্বারা আসামীগণের মনে ন্যায্য রূপেই এমন আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাহারা ঐ মাজিস্ট্রেটের হস্তে পক্ষপাত-শূন্য সুবিচার প্রাপ্ত হইবে না।

অতএব যদিও আমি বলিয়াছি যে, এই হুকুম রহিত হইবে, তথাপি আমি বিবেচনা করি যে, এমত অবস্থায় তাহা খরচা ব্যতীত রহিত হইবে।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমারও ঐ মত (গ)

১৯ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

### শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম সোহরাই।

জ্ঞানকৃত বধের উদ্যোগ করার অভিযোগে পাটনার মাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

বাবু বুধসেন সিংহ আপেলান্টের উকীল।

চুম্বক।—বধ করার উদ্যোগের অপরাধ এমত গুরুতর ও হঠাৎ ক্রোধোৎপাদনের দ্বারা হইয়াছে কি না, যদ্দ্বারা তাহা জ্ঞানকৃত বধের তুল্য হয় না, ইহা বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় বিধায় এতৎসম্বন্ধে জুরি যে মীমাংসা করেন তৎপ্রতি দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ১ ম বর্জ্জিত কথা দৃষ্টে, হাইকোর্ট আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আসামীর প্রতি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার বিধান অনুসারে জ্ঞানকৃত বধের উদ্যোগ করিবার অপরাধের অভিযোগ হয়। তাহার জওয়াব এই যে, সে হঠাৎ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া, অর্থাৎ সে আপন স্ত্রীকে অপর এক ব্যক্তির সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত দেখিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া সেই স্ত্রীকে বধ

করিবার উদ্যোগ করে। মোকদ্দমা জুরি দ্বারা বিচারিত হয়, এবং জুরি আসামীকে ৩০৭ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত করেন।

আপীলে তর্ক হয় যে, যখন উক্ত কার্য্য উল্লিখিতমতে হঠাৎ অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হইয়া করা হয়, তখন উক্ত ক্রোধোৎপাদন হেতু আদালতের নিকট যত লঘু দণ্ড দেওয়া উচিত বোধ হয়, আসামী তাহাই পাইতে পারে। কিন্তু আমরা বলিতেছি যে, উক্ত বিধির ৩০০ ধারার ১ম বর্জ্জিত কথাতে যে ব্যাখ্যান আছে যে, "ক্রোধোৎপাদন এমত গুরুতর এবং আক- "স্মিক কি না, যাহাতে জ্ঞানকৃত বধের "তুল্য অপরাধ হয় না, তাহা বৃত্তান্ত-ঘটিত "বিষয়।"

আমরা আরো দেখিতেছি যে, জজ যখন জুরির নিকট মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করেন, তখন তিনি আসামীর এই জওয়াবই জুরিকে দর্শান। জুরি বৃত্তান্তের বিচারক স্বরূপে স্থির করেন যে, আসামী এক্ষণে যে ক্রোধোৎপাদনের উপর নির্ভর করে, সেরূপ ক্রোধোৎপাদিত হয় নাই। অতএব মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে ঐ নিষ্পত্তিতে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা হইলেও আমরা আপীল-আদালত স্বরূপে তাহা করিতে পারি না। এই আপীল ডিস্মিস্ হইল।

(ব)

---

১৯এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি জিলক এবং সর চার্ল্স হব্‌হৌস্ বারণেট।

### শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম গোলাম আর্ফিন্ প্রভৃতি।

জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে বাকরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

বাবু আশুতোষ ধর আপেলান্টের উকীল

চুম্বক।—যেস্থলে এক আইন-বিরুদ্ধ জনতা-ভুক্ত কতক ব্যক্তি রুকে ভুলাইয়া বাহির করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন সেই কার্য্যের উদ্যোগে ফকে বধ করে, সে স্থলে ঐ বাহির করিয়া লইবার কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত থাকে, তাহারা সকলেই দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারামতে, ফকে বধ করিবার অপরাধে অপরাধী।

বিচারপতি হব্‌হৌস।—এ মোকদ্দমায় যে পাঁচ আসামী আপীল করে, তাহাদের মধ্যে গোলাম আর্ফিনের অনুকূলে কিছুই বলা হয় নাই, এবং যে আঘাত দ্বারা মৃত ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহা এই আসামীর করিবার বিষয় স্বীকৃতমতে প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে। আর আর আসামীগণের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, মৃত ব্যক্তিকে বধ করা সকলের অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু জজের নির্দ্দেশ মতে রূপা বিবীকে বাহির করিয়া লওয়াই তাহাদের সাধারণ অভিপ্রায় ছিল, এবং তাহার কন্যা ফর্মান্ বিবী রূপা বিবীকে লইয়া যাইবার প্রতি বাধা দেওয়ায়, গোলাম আর্ফিন্ তাহার উপর আঘাত করে, এবং যখন তাহাকে বধ করা সকলের সাধারণ অভিপ্রায় ছিল না, তখন আর আর আসামীগণের প্রতি জজ যে দণ্ড দিয়াছেন, তাহা কমিতে পারে।

ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ১৪৯ ধারার শব্দ দৃষ্টে আমরা দেখিতে পাই যে, "যদি বে-আইনীমতের "জনতার কোন লোক সেই জনতার সাধারণ "অভিপ্রায় সফল হইবার জন্যে কোন অপরাধ "করে, কিম্বা ঐ জনতার লোকেরা ঐ অভিপ্রায় "সফল করিবার জন্যে যে অপরাধ হইবার "সম্ভাবনা জানে এমত কোন অপরাধ করে, "তবে সেই অপরাধ করিবার সময়ে যে সকল "ব্যক্তি ঐ জনতার লোক হইয়া থাকে, তাহা- "দের প্রত্যেক জন সেই অপরাধের দোষী "হইবে।"

এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সকল অস্বীকৃত হয়

নাই। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, আসামীগণ রূপা বিবীকে লইয়া যাইতে আইসে, তাহারা তখন আইন-বিরুদ্ধ জনতাভুক্ত ছিল, তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়া আইসে; এবং তাহাদের সকলের হাতে যে প্রকারের অস্ত্র ছিল, সেই প্রকারের অস্ত্র দ্বারা তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ফর্মান্ বিবীকে আঘাত করিয়া বধ করে, এবং এই জনতাভুক্ত ব্যক্তিগণ অবশ্য ইহাও জানিত যে, তাহারা রূপা বিবীকে লইয়া যাইবার যে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ঐরূপ ঘটনা হইতে পারে, এবং তাহাদের অভিপ্রায় সাধনের প্রতি যে বাধা দিতে চেষ্টা হয়, তাহা অতিক্রম করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিল, এবং উক্ত জনতার মধ্যে এক জন যে এক সাংঘাতিক অস্ত্র ব্যবহার করে, এবং যাহা দ্বারা ফর্মান্ বিবীর মৃত্যু সংঘটিত হয়, তাহারা সেই রূপ অস্ত্রই ব্যবহার করিতে প্রস্তুত ছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, জজের নিষ্পত্তিই শুদ্ধ, এবং আসামীগণের প্রতি যে দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উচিত হইয়াছে, এবং এই আপীল ডিস্‌মিস্ হইবে।　　　(ব)

---

২৬ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই জ্যাক্‌সন।

দ্বারকানাথ সেন এবং অপর এক ব্যক্তি আপেলাণ্ট।

কোন স্ত্রীলোকের প্রতি অপরাধ-জনক বল প্রকাশ করিবার অভিযোগে ঢাকার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

মেং ম্যাকেঞ্জি আপেলাণ্টের কৌন্সেল।

চুম্বক।—জুরির নিকট মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনে জজ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জুরিকে উপদেশ দিতে বাধ্য, এবং প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনি জুরিকে বলিতে পারেন।

বিচারপতি কেম্প।—আপেলাণ্টগণ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৩৫৪ ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, এবং কঠিন পরিশ্রম-সহ দুই বৎসর কারাবাস-দণ্ড প্রাপ্ত হয়। উক্ত ধারামতে ইহাই চরম দণ্ড। উক্ত মোকদ্দমা জুরি-কর্ত্তৃক বিচারিত হয়। জজ জুরির নিকট মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিতে যে একটি কথা বলেন তাহার প্রতি আসামীগণের পক্ষের বিজ্ঞবর কৌন্সেল আপত্তি করেন, উক্ত বাক্যটি এই:—"ঐ প্রকার "রাত্রি এ রূপ উদ্যোগের যোগ্য নহে; আমার "বোধ হয় সমুদায়ই উক্ত যুবতী স্ত্রীর এবং "তাহার পরিবারের অবমাননা করিবার নিমিত্ত "যেন এক দল মাতাল জুটিয়া তাহার উপর "প্রতিশোধ লয়।" বিজ্ঞবর কৌন্‌সেল তর্ক করেন যে, জজ তাঁহার মনোগত ভাব জুরির নিকট বলা উচিত বিবেচনা করিয়া থাকিলে তাঁহার সেই সঙ্গে তাঁহাদের নিকট বলা উচিত ছিল যে, তাঁহাদের উক্ত মোকদ্দমার বৃত্তান্তের বিচার করিতে হইবে, এবং মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে জজের মনে যে ভাবই হউক না কেন, তাঁহাদের তাহা না দেখিয়া, প্রমাণ দৃষ্টে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল। বিজ্ঞবর কৌন্‌সেল তর্ক করেন যে, ইহা মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন সম্বন্ধে এমত ভ্রম যে অপরাধ-সাব্যস্ত অন্যথা করিয়া আসামীগণকে খালাস দেওয়া উচিত, কারণ, প্রমাণ দৃষ্টে তাহা উচিত হয় নাই।

হরসুন্দরী নাম্নী বালিকার এবং তাহার পিতা মাতার সাক্ষ্য পাঠে এই মোকদ্দমা আমার নিকট নিঃসন্দেহই সত্য বোধ হইতেছে। আসামীর উকীল উক্ত বালিকার প্রতি, প্রসন্ন সেনের সহিত তাহার আসক্তি থাকা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন নাই। উক্ত বালিকার, তাহার পিতামাতার এবং অন্যান্য যে সকল সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হয়, তাহাদের সাক্ষ্য দ্বারা মোকদ্দমা সপ্রমাণ দেখা যায়, এবং মোকদ্দমাটি অতি গুরুতর। অনেক-

গুলি লোক রজনীযোগে অভিযোক্তার গৃহে প্রবে করে। তাহারা ঘর ভাঙ্গিয়া আন্দাজ ১৩ বৎসরের একটি বালিকাকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে, কারণ, প্রসন্ন সেন তাহাকে আপনার নিকট রাখিতে ইচ্ছা করে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, সেশন জজ উচিত মতে মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণন করিতে বাধ্য, তাঁহার বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়ে জুরিকে পরামর্শ দেওয়া উচিত, এবং বিজ্ঞবর প্রধান বিচারপতি টিণ্ডেলের বাক্যে বলা যাইতেছে যে, "প্রমাণ দৃষ্টে জজের মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা তাঁহার জুরিকে জানানতে" কোন আপত্তি নাই। এ আদালতের হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে এই প্রতীতি হওয়া উচিত যে, জজের মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনের কোন ভ্রম বা দোষ হেতু অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের হানি হইয়াছে। এ মোকদ্দমার প্রমাণ দৃষ্টে জজের মনে যে ভাবোদয় হয় তাহা তিনি তাঁহাদিগকে জানান উচিত বোধ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে ইহাও উদ্ভাবনা করিয়া দেন যে, ইহা এক মাতালের দলের কার্য্য হইতে পারে যাহারা "উক্ত যুবতী স্ত্রীর প্রতি প্রতিহিংসা লইবার মানসে তাহার এবং তাহার পরিবারের অবমাননা করে।" কিন্তু আমাদের বোধ হয় যে, জুরী জজের এ কথার বশীভূত হন নাই, এবং তাহাতে কিছুতেই আসামীগণের হানি হয় নাই। পক্ষান্তরে, জুরি যদি ঐ উদ্ভাবনামতে বিচার করিতেন, এবং জজ যে ভাব দর্শান তাহা যদি অনুমান করিতেন, তবে জজ যে চরম দণ্ড দিয়াছেন, তাহা হইত না, এবং তাহা লঘু হইবার সম্ভাবনা ছিল। অতএব যত দূর উদ্ভাবনা করা হইয়াছিল, তাহা আসামীগণের প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূলই দৃষ্ট হয়; কিন্তু আসল বৃত্তান্ত এই যে, জজ আইনের বিধান অনুরূপ অতিরিক্ত দণ্ড দেওয়ায় বোধ হয় এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, প্রমাণ দ্বারা উক্ত অপরাধ অতি গুরুতর এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া হইবার বিষয় সপ্রমাণ হইয়াছে, একদল মাতালে কেবল মাতলাম করিয়া তাহা করে নাই, কিন্তু আসামীগণ অভিযোক্তার পরিবারকে অপমান এবং অত্যাচার করিবার মানসেই তাহা করে। জজের মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনের দোষে বা ভ্রমে আসামীগণের প্রতি কোন হানি হয় নাই, আমার এই মত হওয়ায়, এবং প্রমাণের যে অংশ আমাদের নিকট পঠিত হইয়াছে তাহা দ্বারা, (যদিও আমাদিগকে বৃত্তান্ত দেখিতে হয় নাই) উক্ত দণ্ড উচিত হইয়াছে কি না, তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম বোধে উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত এবং দণ্ড বহাল রাখিতে এবং এই আপীল ডিস্মিস্ করিতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমি বিচারপতি কেম্পের মতে সম্মত হইলাম। আমি বোধ করি, জজ জুরির নিকট যে অবস্থা বর্ণন করেন তাহাতে আসামীগণের কোন হানি হয় নাই। আমি বিবেচনা করি যে, জজের মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনের আদ্যোপান্ত আসামীগণের অনুকূল; বিশেষতঃ, তাহার যে সকল শব্দের প্রতি আপত্তি করা হইয়াছে তাহা দ্বারা বোধ হয়, আসামীগণের অপরাধ লঘুই করা হইয়াছে। বিজ্ঞবর কৌন্সেল যে বলিয়াছেন তদনুসারে এমত কোন প্রমাণ নাই যে, আসামীগণ উক্ত অপরাধ করিবার সময় মাতাল হইয়াছিল, কিন্তু প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তাহারা ভাবিয়া চিন্তিয়াই উক্ত অপরাধ করিয়াছে।

অতএব আমি উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত বা দণ্ড বিধানে হস্তক্ষেপ করিলাম না। (ব)

২ রা মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি, লক, এবং সর চার্লস হব্হৌস বারণেট।

যশোহরের মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৩৪ ধারামতে এস্তমেজাজ।

শান্তমণ্ডল প্রভৃতি বনাম আবদুল বিশ্বাস প্রভৃতি।

চুম্বক।—অভিযোক্তা ও তাহার সাক্ষিগণ

উপস্থিত হয় নাই বলিয়া কোন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে হুকুমদ্বারা দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারান্তর্গত কোন মোকদ্দমার বিচার না করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন, সেই হুকুমে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে অসম্মত হইলেন।

## মোকদ্দমা এই ঃ—

অভিযোক্তাগণ তাহাদিগকে অন্যায় এবং বিধিবিরুদ্ধ কয়েদ করিবার হেতুবাদে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৪৩ এবং ৩৪২ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

ঐ মোকদ্দমা যশোহরের মাজিষ্ট্রেট গত ১৩ ই ডিসেম্বর তারিখে তত্রত্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মৌলবী আজারুল হকের নিকট অর্পণ করেন; তিনি ঐ তারিখে এই হুকুম দেন যে, উক্ত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে জামিন লওয়া হয়, এবং তিনি গত ২৩ এ ডিসেম্বর মোকদ্দমার বিচারের দিন স্থির করেন।

অভিযোক্তাগণ উক্ত গত ২৩ এ ডিসেম্বর তারিখে অনুপস্থিত থাকায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা নথী-খারিজ করিয়া প্রতিবাদিগণকে ছাড়িয়া দেন।

পরে অভিযোক্তাগণ মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই দরখাস্ত করে যে, তাহাদের সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া মোকদ্দমার নূতন বিচার করা হয়। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কৈফিয়ৎ তলব করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে মোকদ্দমা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন ঃ—

"উক্ত হুকুম আমার নিকট ভ্রান্তিমূলক বোধ "হয়, কারণ, মোকদ্দমা ১৪ অধ্যায় অনুসারে "বিচার্য্য বিধায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের তাহা ডিস্-"মিস্ না করিয়া অভিযোক্তাগণের জামিন জব্দ "করা উচিত ছিল।"

"আমি জানি একথা বলা হয় নাই যে, সাক্ষিগণ উপস্থিত ছিল কি না; তাহারা উপস্থিত থাকিলে তাহাদের সাক্ষ্য স্পষ্টই লওয়া উচিত ছিল।

"উপরোক্ত হেতুবাদে আমি বিবেচনা করি, "ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে এই মোকদ্দমা পুনঃ শ্রবণ "করিতে আদেশ করা উচিত।"

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মাজিষ্ট্রেটের নিকট কৈফিয়তে এই বলেন, যথা —

"প্রতিবাদিগণের উপর ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির "১৪৩ এবং ৩৪২ ধারানুযায়ী অপরাধের "অভিযোগ হয়। যদিও ৩৪২ ধারানুযায়ী অপ-"রাধে ছয় মাসের অনধিক কালের মিয়াদ "হইতে পারে, কিন্তু ১৪৩ ধারানুযায়ী অপরাধে "এক মাসের অনধিককালের মিয়াদ হইতে পারে; "এবং ইহার নিমিত্ত সাধারণতঃ সমনজারী হইতে "পারে, এবং যে দিবস অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের "উপস্থিত হইবার জন্য ধার্য্য হয়, সেই দিবসে "অভিযোক্তা উপস্থিত হয় না, এবং আমার স্মরণ "হইতেছে যে, সাক্ষিগণও উপস্থিত হয় না, সুতরাং "মোকদ্দমা নথী-খারিজ করা হয়। যাহা হউক, "মাজিষ্ট্রেট বা হাইকোর্ট মোকদ্দমা পুনঃ শ্রবণের "হুকুম দিলে আমি তাহা মান্য করিব।"

## প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি হব্‌হৌস।—উপস্থিত মোকদ্দমা এই বোধ হয়, যথা—

এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৩৪২ ধারার মর্ম্মানুযায়ী অপরাধের অভিযোগ হয়।

বিচারের নিমিত্ত যে দিন ধার্য্য হয়, সেই দিবস অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিল, কিন্তু অভিযোক্তা ও তাহার সাক্ষিগণ উপস্থিত ছিল না।

অতএব ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা নথীখারিজ করেন, এবং বোধ করি, আসামীগণকে খালাস দেন।

বলা হইয়াছে যে, তাঁহার বরং অভিযোক্তাগণের জামিন জব্দ করা উচিত ছিল, অর্থাৎ আমরা বোধ করি যে, তাঁহার এই প্রকারে বা অন্য কোন প্রকারে অভিযোক্তা ও তাহার সাক্ষিগণকে আদালতে উপস্থিত হইতে বাধ্য করা এবং তদনন্তর মোকদ্দমার বিচার সমাধা করা উচিত ছিল।

কিন্তু যে স্থলে কোন অভিযোক্তা এবং তাহার সাক্ষিগণ বিচারের নির্দ্ধারিত দিবসে উপস্থিত না-হয়, সে স্থলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খালাস দিবার যে হুকুম দেন, তাহা কার্য্য-বিধির আদেশমত না হইলেও এমত হুকুম নহে, যাহাতে আমরা আমাদের পুনর্দৃষ্টির অতিরিক্ত ক্ষমতা অনুসারে হস্তক্ষেপ করিতে পারি।

আমাদের বিবেচনায়, উক্ত হুকুম স্থির থাকিতে পারে।

বিচারপতি লক।—এই এস্তমেজাজ আমার নিকট অনাবশ্যক বোধ হয়। কোন বিচারই হয় নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কেবল এই জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় যে, অভিযোক্তা ও তাহার সাক্ষিগণ বিচারের নির্দ্ধারিত দিবসে উপস্থিত হয় নাই, এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন তাহা আইন-বিরুদ্ধ বোধ হয় না। তিনি অভিযোক্তা এবং তাহার সাক্ষিগণের জামিন জব্দ করিতে পারিতেন বটে। এই নথী ফেরৎ পাঠান যাইতে পারে। (ব)

---

৫ ই মার্চ, ১৮৭০।

প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ, বি, বেলি।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম শ্যামকিশোর হালদার।

ডাকাইতীর অভিযোগে বাকরগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—অভিযোগের পক্ষের যে সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা আসামীর নূতন কোন কথা খণ্ডন করা অভিপ্রেত না হয়, তাহার সাক্ষ্য আসামীর জওয়াব লওয়ার পরে গ্রহণ করা অনিয়মিত কার্য্য। কিন্তু যে স্থলে উক্ত সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিবে, তাহা আসামী জানিয়া শুনিয়া উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রসঙ্গে আপন জওয়াব দেয়, তাহাতে হাইকোর্ট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৯ ধারা দৃষ্টে, উক্ত অনিয়ম হেতু অপরাধ-সাব্যস্ত রহিত করিতে অস্বীকার করেন।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—আসামী ডাকাইতীর অভিযোগে বিচারিত এবং অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কঠিন পরিশ্রম-সহ পাঁচ বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। সে আপীল করে।

এই মোকদ্দমার বিচারে গুরুতর অনিয়ম হইয়াছে।

বাকরগঞ্জের নিকটবর্ত্তী নদীতে এক নৌকায় ডাকাইতী হয়। বিচারের সময় দুর্গাচরণ ব্রহ্মচারী জবানবন্দী দেয় যে, তাহার বোধ হয় যে, যে সকল ব্যক্তি ঐ নৌকায় আসে তাহার মধ্যে আসামী ছিল, কিন্তু তাহা সে নিশ্চিত বলিতে পারে না। উক্ত ডাকাইতীর রাত্রিতে তাহার নিকট হইতে যে এক টিনের বাক্স লওয়া হয়, সে তাহারও নিশানা দেয়। এই সপ্রমাণ হয় যে, এই বাক্স দশরথ নামক এক ব্যক্তির উপপত্নী নেতার নিকট পাওয়া যায়, সে দারোগার নিকট বলে যে, উক্ত আসামী তাহাকে তাহা দিয়াছিল।

পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর বিপিনবিহারী সরকার সাক্ষ্য দেয় যে, নেতা তাহাকে বলে যে, এক দিন সোমবার সায়ংকালে মোহন ডাকুন ও শ্যামকিশোর আসামী আসিয়া তাহার উপপতি দশরথকে লইয়া যায়, এবং তাহারা পর দিবস প্রাতে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া আইসে, (ঐ সকল দ্রব্যের বর্ণনা করা হয়)। সে আরো বলে যে, "নেতা আমাকে এই কোটরা বা বাক্স এই বলিয়া দেয় যে, সে তাহা তাহার সন্তানের খেলনা স্বরূপ শ্যামকিশোরের হাত হইতে যে প্রাতঃকালে তাহারা ফিরিয়া আইসে তখন পায়" শ্যামকিশোর তখন লুক্কায়িত ছিল।

নেতার উপর ৫ ই নবেম্বর তারিখে সমনজারী হয়, কিন্তু মোকদ্দমার বিচারের কালে সে উপ-

স্থিত হয় নাই, এবং বিপিনবিহারী সাক্ষীর সাক্ষ্য ২৩ এ নবেম্বর তারিখে গৃহীত হয়। জজের বিবেচনায় নেতার সাক্ষ্য আবশ্যক হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জওয়াব দিতে বলিবার পূর্ব্বে নেতাকে আদালতে উপস্থিত করাইবার জন্য বিচার স্থগিত রাখা তাঁহার উচিত ছিল। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৭২ ধারা, দ্রষ্টব্য। তাহা না করিয়া তিনি শ্যামকিশোরকে আপন জওয়াব দিতে বলেন, এবং ২৯ এ তারিখে তাহার সাক্ষী উপস্থিত করিতে দেন।

আসামী জওয়াব দিবার পর মোকদ্দমা ৩০ এ নবেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হয়; উক্ত তারিখে নেতা হাজির হওয়ায় অভিযোগের সাক্ষী স্বরূপে তাহার জবানবন্দী লওয়া হয়; এবং সে পুলিস ইনস্পেকটরের নিকট যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল, সেই সময়ে তাহাই বলে।

আসামীকে নেতার উপর জেরা করিতে দেওয়া হয়, কিন্তু সে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না।

আমাদিগের বোধ হয় যে, আসামী জওয়াব দিবার পরে, যে সাক্ষী আসামীর কোন নূতন কথা খণ্ডন করিবার সাক্ষী নহে, অভিযোগের পক্ষে তাহার জবানবন্দী গ্রহণ করিতে দেওয়ায় বিচার কার্য্য সম্বন্ধে অত্যন্ত অনিয়ম হইয়াছে, এবং সচরাচর অবস্থায় আমরা উক্ত বিচার অন্যথা করিতাম।

কিন্তু এই মোকদ্দমার বিশেষ অবস্থা দৃষ্টে, নেতা যে সাক্ষ্য দিবে, তাহা যখন আসামী সম্পূর্ণ রূপে জানিত:—যেহেতু সে এই জওয়াব দেয় যে, সে উক্ত কোটরার বিষয় কিছু জানিত না, তখন আমরা এ কথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে, নেতার জবানবন্দী লইবার পূর্ব্বে আসামীর জওয়াব লওয়ায় যে অনিয়ম হইয়াছে, তাহা এরূপ অনিয়ম যে, তাহাতে সদ্বিচার হয় নাই, বা হইতে পারে না; অতএব ৪৩৯ ধারার বিধান দৃষ্টে আমরা বিবেচনা করি যে, উক্ত রায় বা বিচার অন্যথা হওয়া উচিত নহে।

আমরা বিবেচনা করি, উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত প্রমাণ দৃষ্টে ন্যায্যই হইয়াছে। অতএব আমরা এই আপীল ডিস্মিস্ করিলাম। (ম)

১ লা এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

যশোহরের সেশন জজ কর্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম হীরালাল ঘোষ।

চুম্বক।—মোকদ্দমা ডিস্মিসের কোন কারণ না দর্শাইয়া এবং অভিযোক্তার সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী না লইয়া এবং তাহার যে সকল সাক্ষী উপস্থিত ছিল না, তাহাদিগকে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত সময় না দিয়া, তাহার অভিযোগ ডিস্মিস্ করা এবং দণ্ড-বিধির ২১১ ধারা মতে মিথ্যা অভিযোগের হেতুতে তাহার বিচার হইবার আদেশ করা, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য।

এস্তমেজাজ।—২৯ এ জুন তারিখে হীরালাল ঘোষ নামক এক ব্যক্তি অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশ এবং বল-পূর্ব্বক বাটী হইতে কাষ্ঠ লইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে খুলনিয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট দেবনাথ মিত্র প্রভৃতির নামে অভিযোগ করে।

তৎকালের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু কালীপ্রসন্ন সরকার পুলিসের প্রতি উক্ত বিষয়ের তদন্তের হুকুম দেন, এবং ১২ ই জুলাই তারিখে পুলিস রিপোর্ট করে যে, উক্ত অভিযোগ মিথ্যা।

সেই তারিখে হীরালাল ঘোষ তাহার সাক্ষী তলব করিবার জন্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু গৌরদাস বশাখের নিকট দরখাস্ত করে, এবং ১৯ এ জুলাই তারিখে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট পুলিসের রিপোর্ট লইয়া তাহা করেন।

কোন কোন সাক্ষী ২৭ এ জুলাই তারিখে

উপস্থিত হয়, কিন্তু সেই তারিখে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট ৭ ই আগস্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা শ্রবণ স্থগিত রাখেন।

সেই তারিখে অর্থাৎ ২৭ এ জুলাই হীরালাল তাহার আরো দুই জন সাক্ষীর প্রতি সমন করিবার প্রার্থনায় দরখাস্ত করে, এবং ৪ ঠা আগস্ট তারিখে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট তাহাদিগকে সমন করিতে হুকুম দেন।

৭ ই আগস্ট তারিখে এই সকল ব্যক্তি যাহাদের বাটী খুলনিয়া হইতে ছয় ঘণ্টার পথে স্থিত, তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ডেপুটি মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রহণ করেন, এবং হীরালালের দুই জন সাক্ষীর জবানবন্দী লইয়া তাহার নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করেন, এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ২১১ ধারা অনুসারে তাহার বিচার হইবার হুকুম দেন।

৭ ই আগস্ট তারিখে তিনি হীরালালের বিরুদ্ধ মোকদ্দমা গ্রহণ করেন, এবং হীরালাল পূর্ব্বে যে দুই সাক্ষীর প্রতি সমন করিবার প্রার্থনা করে, তাহাদের এবং আর আর সাক্ষিগণের জবানবন্দী লয়েন, এবং হীরালালকে ২৫ টাকা জরিমানা এবং তাহা না দিলে পাঁচ সপ্তাহের জন্য কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দেন।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪২৯ ধারা মতে মাজিস্ট্রেট কোন চূড়ান্ত হুকুম দিবার সময়ে তাহার কারণ দর্শাইতে বাধ্য; কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় ডেপুটি মাজিস্ট্রেট হীরালালের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিবার কোন কারণই দর্শান নাই; তাঁহার চূড়ান্ত হুকুম তাঁহার এক জন আমলা দ্বারা লিখিত হয়, এবং তাহা এই:—

"যে সকল সাক্ষী উপস্থিত ছিল তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণের পর হুকুম হইল যে, এই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয়।" এবং তদনন্তর উক্ত হুকুমে, হীরালাল মিথ্যা অভিযোগ করাতে তাহার বিচার হইবার আদেশ করা হয়।

নথীতে এমত কোন প্রমাণ নাই যে, হীরালালের কেবল দুই জন সাক্ষী উপস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে তিন জন ২৭ এ জুলাই তারিখে মোচলকা দেয়, অতএব এই অনুমান করিতে হইবে যে, ঐ তিন জনই উপস্থিত ছিল, এবং তৃতীয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করিবার কোন কারণ দর্শান হয় নাই।

ডেপুটি মাজিস্ট্রেট যে হীরালালের প্রতি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিবার নিমিত্ত অভিযোগ আনেন, তাহার পূর্ব্বে, সে তাহার অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষী মান্য করে, তাহাদের জবানবন্দী লওয়া উচিত ছিল, এবং হীরালালের প্রার্থনা মতে দুই জন সাক্ষীর প্রতি সমন করিবার পর, তাহাদের উপস্থিত হইবার জন্য উপযুক্ত সময় দেওয়া এবং কিছু কালের নিমিত্ত মোকদ্দমার চূড়ান্ত বিচার স্থগিত রাখা উচিত ছিল।

অতএব ডেপুটি মাজিস্ট্রেট যখন হীরালালের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিবার কোন কারণ না দর্শাইয়া আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, এবং তিনি যখন সমস্ত উপস্থিত সাক্ষীর জবানবন্দী লয়েন নাই, এবং আর দুই সাক্ষীর উপস্থিত হইবার জন্য উপযুক্ত সময় দেন নাই, এবং তাহাদের সাক্ষ্য না লইয়াই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিয়াছেন, তখন আমি এই অনুরোধ করি যে, তাঁহার এই কার্য্য সমস্ত রহিত করা হয়, এবং তাঁহাকে হীরালালের মোকদ্দমা আবার শুনিয়া উচিত হুকুম দিতে আদেশ করা হয়।

### প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমার মতে ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের ঐ চুরির অভিযোগ ডিস্‌মিস্‌ করিবার হুকুম অনিয়মিত, এবং তাঁহার কার্য্য রহিত হইবে, এবং তাঁহাকে মোকদ্দমার নূতন বিচার করিতে হইবে।

হীরালালের মোকদ্দমা আপীলে সেশন আদালতে উপস্থিত আছে, এবং উক্ত আদালত অপরাধ-সাব্যস্ত অন্যথা করিতে পারেন, কিন্তু এ আদালতও তাহা অন্যথা করিতে পারেন, এবং আমার বিবেচনায়, তাহা করা উচিত।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

( ব )

---

২ রা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক এবং সর চার্লস হবহৌস বারণেট।

বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

মধুসূদন ঘোষ ওরফে মাধবচন্দ্র ঘোষ

বনাম

জয়রাম হাজরা প্রভৃতি।

চুম্বক।—যখন কোন অভিযোক্তা তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধের অভিযোগ উপস্থিত করে, যাহার দুইটি অপরাধ ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫ অধ্যায় এবং একটি ১৪ অধ্যায় অনুসারে বিচার্য্য, তখন যদি মাজিষ্ট্রেটের এমত বোধ হয় যে, সে কেবল ত্যক্ত করিবার জন্য উক্ত ১৫ অধ্যায়ান্তর্গত অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে, তবে তিনি সেই অভিযোগ সম্বন্ধে উক্ত বিধির ২৭০ ধারা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণের হুকুম দিতে পারেন।

মোকদ্দমা।—মাজিষ্ট্রেট তাঁহার এস্তমেজাজে মোকদ্দমার এই বর্ণনা করেন।—"চুরী; অপকার এবং অপরাধজনক প্রবেশের অভিযোগ হয় (৩৭৯, ৪২৬ এবং ৪৪৭ ধারা)।" সহকারী মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৭০ ধারা মতে অভিযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতি পূরণের হুকুম দেন।

"২৭০ ধারা চুরির মোকদ্দমায় প্রয়োগ না হওয়ায়, যাহার বিচার ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫ অধ্যায়ের অন্তর্গত নহে, আমার মতে সহকারী মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রহিত করিতে হইবে। সহকারী মাজিষ্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে আমার নিকট আপীল হইয়াছে, কিন্তু আইন অনুসারে ২৭০ ধারানুযায়ী হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল নাই।"

"সহকারী মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ এতৎ সমভিব্যাহারে অর্পিত হইল।"

মাজিষ্ট্রেটের এস্তমেজাজে সহকারী মাজিষ্ট্রেটের এই কৈফিয়ৎ দেখা যায়, যথা—

"মহাশয়ের ১৮৭০ সালের ৯ ই মার্চ তারিখের হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নিকট মাধবচন্দ্র ঘোষ বনাম জয়রাম হাজরা এবং জয়জয়রাম হাজরার মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় পত্রের পাণ্ডুলিপি আমি পাইয়াছি। মহাশয় যে ঐ পত্রে বলেন যে, চুরি, অপকার এবং অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশের (৩৭৯,৪২৬ এবং ৪৪৭ ধারা) অভিযোগ হয়,—আমি তাহার শুদ্ধতার প্রতি আপত্তি করিতেছি। এক নালিশের দরখাস্তে তিনটি স্বতন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ হয়, এবং প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ সাব্যস্ত হইলে দুই প্রকারের কার্য্যপ্রণালীর আবশ্যক হইত; যথা, প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে ১৪ অধ্যায় অনুসারে রীতিমত চুরির অভিযোগ প্রণয়ন করিতে হইত; কিন্তু অপকার ও অনধিকার-প্রবেশ সম্বন্ধে কার্য্য-প্রণালী ১৫ অধ্যায় অনুযায়ী হইত, এবং চুরির অভিযোগের ন্যায় রীতিমত অভিযোগের আবশ্যক হইত না। যখন তিনটি স্বতন্ত্র অভিযোগ হয়, এবং দণ্ড একত্রে জড়াইয়া হইতে পারিত, তখন ডিস্‌মিসের হুকুম এক কার্য্য হইলেও তাহা এমত তিনটি অপরাধের অভিযোগ ডিস্‌মিসের হুকুম, যাহা এক দরখাস্তেই লিখিত হয় এবং কথিত হয় যে, তৎসমুদায় একই সময়ে হইয়াছিল।

"আমার আর এক নিবেদন এই যে, এ মোকদ্দমায় আমার নিষ্পত্তি দৃষ্টে স্পষ্ট প্রকাশ যে, চুরির অভিযোগের সহিত কোন সংস্রব ব্যতীতই ৪২৬ এবং ৪৪৭ ধারানুযায়ী অপকার এবং অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশের বিরক্তিকর অভিযোগের জন্য ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৭০ ধারা মতে খেসারত দেওয়া হয়।"

"প্রশ্ন এই যে, যে স্থলে কোন অভিযোক্তা

" এক নালিশে চুরির অভিযোগ ( যাহার বিচারের
" কার্য্য-প্রণালী ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫
" অধ্যায়ান্তর্গত ) অন্যান্য অভিযোগের ( যাহা
" স্বতন্ত্র রূপে উপস্থিত হইলে ১৪ অধ্যায়ের
" অন্তর্গত হইত ) সহিত একত্রে যোগ করে, তাহাতে
" মাজিস্ট্রেট ১৪ অধ্যায় অনুযায়ী কার্য্য-প্রণালীর
" অনুসরণ করিতে বাধ্য কি না। তিনি বাধ্য
" হইলে আমার বিবেচনায়, ২৭০ ধারা প্রয়োগ
" হয় না।"

এই এস্তমেজাজে হাইকোর্ট এই রায় দেন, যথা—

**বিচারপতি হব্‌হৌস।**—নথীতে উপস্থিত মোকদ্দমা এই:—১৮৬৯ সালের ৮ ই ডিসেম্বর তারিখে মাধবচন্দ্র ঘোষ দুই ব্যক্তির উপর তিনটি নির্দ্দিষ্ট অপরাধের অভিযোগ করে; প্রথম, ৩৭৯ ধারার বিধান মতে চুরির অভিযোগ; দ্বিতীয়, ৪২৬ ধারার বিধান মতে সামান্য অপকারের অভিযোগ; এবং তৃতীয়, ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৪৪৭ ধারার বিধান অনুসারে অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগ।

অভিযোক্তা ১৮৬৯ সালের ৮ ই ডিসেম্বর তারিখের আপন শপথপূর্ব্বক জবানবন্দীতে স্পষ্ট বলে—" আমি প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় " দণ্ডবিধির ৩৭৯, ৪২৬ এবং ৪৪৭ ধারা অনু-" সারে অভিযোগ করি;" এবং পরে ১৮৬৯ সালের ২৯ এ ডিসেম্বর তারিখে অভিযোক্তা এবং তাহার সাক্ষিগণ আবার শপথ পূর্ব্বক জবানবন্দী দেয়; এবং অভিযোক্তার জবানবন্দীতে সে এমত একটি কথা বলে, যাহাতে যে ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার পূর্ব্বের অভিযোগে দোষারোপ করা হয়, তাহাদের বিরুদ্ধে সামান্য অপকারের অভিযোগ ব্যতীত আর কোন অভিযোগ আসে না।

সহকারী মাজিস্ট্রেট অভিযোক্তা এবং তাহার সাক্ষিগণের বাক্য এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের জওয়াব শুনিয়া এই শব্দগুলিতে রায় দেন, যথা—

" এ মোকদ্দমার উপর আমার বিশ্বাস নাই।
" এক মাত্র প্রশ্ন এই যে, যে স্থানে উক্ত অপকার-
" জনক কার্য্য হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে,
" সেখানে প্রতিবাদিগণ ছিল কি না।"

" আমি বিশ্বাস করি তাহারা ছিল না, অত-
" এব আমি এই কয়েক অভিযোগ সম্বন্ধে
" জয়রাম হাজরা ও জয়জয়রাম হাজরার বিরুদ্ধে
" মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিলাম। এবং এ মোক-
" দ্দমা কিয়ৎ পরিমাণে ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারামতে
" উপস্থিত হওয়ায় প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা
" ও বিরক্তিকর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে
" বলিয়া ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৭০ ধারামতে
" তাহাদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অভি
" যোক্তার নিকট হইতে দশ দশ টাকা করিয়া
" লইবার হুকুম দিলাম।"

বর্দ্ধমানের মাজিস্ট্রেট সহকারী মাজিস্ট্রেটের কার্য্য অন্যথা করণার্থে তাহা আমাদের নিকট প্রেরণ করেন, কারণ, মাজিস্ট্রেট বলেন—" ২৭০ " ধারা চুরির মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয় না, যাহার " বিচার ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫ অধ্যা-" য়ের অন্তর্গত নহে;" এবং এই কারণে মাজিস্ট্রেটের মতে সহকারী মাজিস্ট্রেটের হুকুম রহিত হওয়া উচিত।

পক্ষান্তরে, সহকারী মাজিস্ট্রেট দেখান যে, তিনটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এবং নির্দ্দিষ্ট অপরাধের প্রসঙ্গে তিনটি অভিযোগ হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে দুইটি অপরাধ ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৫ অধ্যায়-মতে বিচার্য্য, অতএব উক্ত অধ্যায়ের ২৭০ ধারা অনুসারে বিরক্তিকর অভিযোগ আনিবার হেতুতে জরিমানা করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি জরিমানা করেন, কিন্তু তাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৪ অধ্যায় অনুসারে যে চুরির অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত করা হয় না, ১৫ অধ্যায় অনুসারে যে অপকার এবং অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশের অভিযোগ হয়, তন্নিমিত্তই করা হয়।

আমাদের বিবেচনায়, সহকারী মাজিস্ট্রেটের

উচিতই হইয়াছে। অভিযোক্তা যে সকল অভিযোগ করে, তাহা তিনটি স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের অভিযোগ। অভিযোক্তা যদি চুরির অভিযোগ চালাইত, তবে তাহার বিচার ১৪ অধ্যায়-লিখিত বিধান অনুসারে হইত। কিন্তু ৪২৬ এবং ৪২৭ ধারানুযায়ী অপরাধের অভিযোগ কেবল ১৫ অধ্যায় অনুসারেই বিচারিত হইতে পারে। তাহার বিচার ১৫ অধ্যায় অনুসারেই হয়, এবং ঐ রূপে বিচার করিবার পর সহকারী মাজিষ্ট্রেট দেখেন যে, অভিযোক্তা ঐ সকল অভিযোগ কেবল বিরক্ত করিবার জন্য উপস্থিত করে। সহকারী মাজিষ্ট্রেট উক্ত অভিযোক্তার প্রতি যে জরিমানা করেন, তাহা তাঁহার করিবার অধিকার ছিল। অতএব আমাদের বিবেচনায় সহকারী মাজিষ্ট্রেটের হুকুম স্থির থাকিবে। (ব)

---

৫ ই মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

বাকরগঞ্জের সেশন জজ কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪০৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম ওয়াহেদ আলী প্রভৃতি।

বাবু ভবানীচরণ দত্ত আসামীগণের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে সেশন আদালত কোন আসামীকে এই হেতুবাদে খালাস দেন যে, তাহার মোকদ্দমার কার্য্য সমস্ত আইন এবং রীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে তাহাকে সেই অপরাধের নিমিত্ত পরে বিচার এবং অপরাধী সাব্যস্ত করিতে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৫৫ ধারা মতে কোন বাধা হইবে না।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—সপষ্টই এ মোকদ্দমায় কিছু নাই। দরখাস্তকারিগণের উকীল ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৫৫ ধারার বিধানের উপর নির্ভর করেন। উক্ত ধারায় এই বিধি আছে যে, যে ব্যক্তি একবার বিচারিত হইয়া অপরাধী সাব্যস্ত হয়, বা মুক্তি পায়, তাহার সেই অপরাধের নিমিত্ত আবার বিচার হইবে না। এই ব্যক্তিগণ কোন অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হয় নাই, বা তাহা হইতে মুক্তি পায় নাই। তাহাদের বিচার হইয়াছে বটে, কিন্তু উক্ত কার্য্য সমস্ত সেশন আদালতে যাওয়ায় উক্ত আদালতের এই মত হয় যে, উক্ত কার্য্য আইন ও রীতিবিরুদ্ধ হইয়াছে, অতএব ঐ আদালত উক্ত কার্য্য সমস্ত রহিত করিয়া ঐ অপরাধসাব্যস্ত রহিত করেন। এমতে আসামীর ঐ অপরাধের নিমিত্ত বিচার এবং অপরাধ সাব্যস্ত হইবার কোন বাধা নাই।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত। (ব)

---

৮ ই মার্চ, ১৮৭০।

## প্রতিনিধি প্রধান বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং বিচারপতি এইচ, বি, বেলি।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম সাহাবৎ সেখ প্রভৃতি আপেলাণ্ট।

ডাকাইতীর অভিযোগে মুরশিদাবাদের মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—যে সকল বৃত্তান্ত এক অপরাধের অন্তর্গত, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে ভাগ করিয়া লইবার প্রথা অসঙ্গত।

কোন ব্যক্তি দণ্ড-বিধির ৩৯৫ ধারা মতে ডাকাইতীর নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, তাহার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের কোন প্রমাণ না থাকিলে, সে দণ্ড-বিধির ৪১১ ধারা অনুসারে শঠতা-পূর্ব্বক অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বা ৪১২ ধারা অনুসারে ডাকাইতী দ্বারা হস্তান্তরিত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে না।

যে প্রণালীতে আসামীগণের অপরাধ স্বীকার

অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণের অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা দর্শান হইল।

প্রধান বিচারপতি নর্ম্যান।—সাহাবৎ সেখ, হাকিম সেখ, ফুলবাস সেখ, মকিম সেখ, ব্যাকুল সেখ এবং পুঞ্জ সেখ, আসামীগণ ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৩৯৫ ধারা মতে ডাকাইতীর অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কঠিন পরিশ্রম-সহ পাঁচ বৎসরের কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সেশন আদালতের হুকুম অনুসারে কোন অপহৃত সম্পত্তি জানিয়া শুনিয়া শঠতা-পূর্ব্বক গ্রহণ করাতে দণ্ড-বিধির ৪১১ ধারা-নির্দ্দিষ্ট অপরাধের নিমিত্তেও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। তাহারা ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৪১২ ধারা অনুসারে, যে সম্পত্তি ডাকাইতী করিয়া পাঠান হইয়াছে, জানিয়া শুনিয়া তাহা গ্রহণ করিবার অপরাধেও অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

মুরসিদাবাদের সেশন জজ ১৮১৪ সালের ২৮এ আগষ্টের যে সরকুলরের উল্লেখ করেন তাহা তিনি উচিত রূপে বুঝেন নাই।

প্রমাণ দৃষ্টে বোধ হয় যে, এই আসামীগণ বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের বাটীতে ডাকাইতী করে, এবং তাহারা প্রথম অপরাধের অর্থাৎ ডাকাইতীর নিমিত্ত উচিত মতেই অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু যে সকল বৃত্তান্ত উক্ত অপরাধের অঙ্গ, এবং যাহা দ্বারা আসামীগণের ডাকাইতীর অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তাহা জজ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করিয়া একটি অপরাধ তিনটি স্বতন্ত্র অপরাধ স্বরূপে বিবেচনা করিয়াছেন।

তিনি জুরির নিকট মোকদ্দমা এমত ভাবে বর্ণনা করেন, যাহাতে সদ্বিচারের ব্যাঘাত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। তিনি অতি উচিত মতে জুরিকে ঐ সকল বিষয় দর্শাইয়াছেন যাহা আসামীগণের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ সপ্রমাণ হইয়াছে, স্থির করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদের হৃদ্বোধ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু তিনি প্রমাণ ক্রমান্বয়ে অসংলগ্ন বৃত্তান্ত স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং জুরিকে বৃত্তান্তের পরস্পর সম্বন্ধ, তাহার ফল, এবং যে সকল বৃত্তান্ত একত্রে প্রমাণ স্বরূপ হয় তাহাদের একতা দর্শান নাই।

জজ ঠিকই বলেন যে, ডাকাইতীর অভিযোগে প্রথমতঃ, প্রমাণ দ্বারা উক্ত অপরাধ করার বিষয় সংস্থাপন করিতে হইবে; এবং দ্বিতীয়তঃ, যে ব্যক্তিগণের প্রতি অভিযোগ হয়, তাহারা যে উক্ত অপরাধের কার্য্যে লিপ্ত ছিল, ইহা সংস্থাপন করিতে হইবে। ঐ অপরাধ কেবল এক মনুষ্যের সিঁধ কাটিয়া ঘরে যাইবার অপরাধ নহে, কিন্তু ঘরে সিঁধ কাটিয়া যাইয়া গৃহস্থের সম্পত্তি চুরি করিয়া লইয়া যাইবারও অপরাধ।

উপস্থিত মোকদ্দমায় আসামীগণ ডাকাইতী করার মধ্যে ছিল কি না, এতৎসম্বন্ধে জজ বলেন যে, আসামীগণের অপরাধ স্বীকার হইতেই উহার এক মাত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা অত্যন্ত ভ্রম। ঐ সকল অপরাধ স্বীকার প্রমাণের শৃঙ্খলের একটি গ্রন্থি মাত্র। উক্ত সম্পত্তি যাহা যাহারা ডাকাইতী করে তাহারাই অবশ্য লইয়াছে, তাহা ডাকাইতীর অব্যবহিত পরেই অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিকট বা তাহারা তাহা যে সকল স্থানে লুকাইয়া রাখে, সেই সকল স্থানে পাওয়াতে অতি প্রবল রূপে এই সপ্রমাণ হয় যে, উক্ত সম্পত্তি সকল যাহাদের হাতে ছিল বা যাহাদিগকে তাহা লুকাইয়া রাখিতে দেখা যায়, তাহারা হয় তাহা ডাকাইতীর সময়ে চুরি করিয়াছিল, নচেৎ যাহারা ডাকাইতী করে তাহাদের নিকট হইতে পাইয়াছিল। যদি কোন প্রমাণ না থাকে, এবং এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ না থাকে যে, আসামীগণ অপহৃত সম্পত্তির ব্যবসায়ী, এবং যদি যেরূপ ঘটিয়াছে, তদ্রূপ, আসামীগণকে এমত সকল ব্যক্তির সংসর্গে এবং সংস্পর্শে থাকিবার বিষয় দেখান হয়, যাহাদের নিকট ডাকাইতী হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উক্ত অপহৃত সম্পত্তির মধ্যে আর আর দ্রব্য পাওয়া

যায়, তবে ঐ প্রমাণ দ্বারা এই উদ্ভাবিত হয় না যে, তাহারা ডাকাইতদের নিকট হইতে শঠতা-পূর্ব্বক অপহৃত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া তাহার ব্যবসায়ী ছিল, কিন্তু এই উদ্ভাবিত হয় যে, তাহারা, যাহারা ডাকাইতী করে তাহাদের মধ্যেই ছিল, এবং উক্ত ডাকাইতীর দ্বারাই ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

জজ জুরিকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁহারা, আসামীগণ যাহা স্বীকার করে তাহা বিশ্বাস করেন কি না। কিন্তু তাঁহার ইহা দেখান উচিত সত্ত্বেও তিনি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই যে, ঐ সকল স্বীকৃত বাক্যের সত্যতা বা প্রকৃতত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিলে, অথবা যদি এই অনুমান হইয়া থাকে যে, যে অপরাধের নিমিত্ত তাহারা অপরাধী ছিল না, তাহা তাহাদিগকে যাতনা দিয়া অথবা ভয় বা পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া স্বীকার করাণ হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সন্দেহ এই বৃত্তান্ত দ্বারা দূর হইত যে, যে সকল ব্যক্তি স্বীকার করে তাহাদের নিকটেই ঐ সকল অপ-হৃত সম্পত্তি পাওয়া গিয়াছে, এবং যাহা তাহা-দের নিকট থাকার কারণ উক্ত স্বীকার দ্বারা জানা গিয়াছে, অন্য কোন গতিকে জানা যায় নাই।

বস্তুতঃ, কোন আসামী মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে স্বীকার করে তাহা জজের এমত এক সামান্য প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করা উচিত নহে যে, যে সাক্ষীর সত্যতার প্রতি সন্দেহ হয় তাহার সাক্ষ্য জুরি যে রূপে ব্যবহার করেন, এ প্রমাণও তাঁহারা সেই রূপে ব্যবহার করিতে পারেন। কোন আসামী মাজিষ্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকার করিলে জুরিকে এই বিষয় দেখিতে হইবে যে, অন্যায় ক্ষমতা প্রকাশ দ্বারা উক্ত অপরাধ স্বীকার করাইবার বিষয় অনুমান করিবার কোন কারণ আছে কি না; এবং ঐ রূপ কিছু অনুমান করিবার কোন কারণ না থাকিলে, জুরিকে তাহা বলিতে এবং এই পরামর্শ দিতে হইবে যে, তাঁহারা তদ্দৃষ্টে চলিতে পারেন।

ডাকাইতীর দ্রব্য গ্রহণ করিবার অভিযোগ সম্বন্ধে জজ ঐ সম্পত্তি নিশানা দিবার প্রমাণ জুরির প্রতি অর্পণ করেন। তিনি বলেন, এবং তাঁহার বলা উচিতই হইয়াছে যে, উক্ত সম্পত্তির নিশান দেওয়া কঠিন। অভিযোক্তা যে একটি কাঁশার পাত্রের নিশানা দেয় তাহার উপর নিঃ-সন্দেহরূপে নির্ভর করা যাইতে পারে কি না, এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে জুরির এই সন্দেহ অনায়াসেই হইতে পারে যে, বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদিগকে এই দেখাইয়া দিলে ঐ সকল সন্দেহ দূর হইত যে, যে পাত্র নিশানদিহী করা হয়, তাহা এমত এক ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায়, যে তাহা নিজের পাত্রের ন্যায় ব্যবহার করে নাই, চোরের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল এবং যাহা তাহার অধিকারে পাইলেই তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হয়।

জুরি আসামীদিগকে ডাকাইতীর দ্রব্য লই-বার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন, এমত তাঁহাদিগকে না বলিয়া জজের এই বলা উচিত ছিল যে, একটি মাত্র অপরাধ করা হই-য়াছে, এবং যদি মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে তাঁহাদের বিশ্বাস হয় যে, আসামীগণ ডাকাইতী করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে ডাকাইতীর অপরাধী সাব্যস্ত করাই কর্ত্তব্য। যদি পক্ষা-ন্তরে, তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে, কোন বিশেষ আসামী ডাকাইতীতে ছিল কি না, তৎপ্রতি সন্দেহ হইবার উপযুক্ত কারণ ছিল, তবে তাঁহা-দের যদি এই বিবেচনা হইত যে, উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট এই বোধ হয় যে, যে প্রকারে উক্ত দ্রব্য পাওয়া যায়, ঐ আসামী তাহা অবশ্যই জানিত, তবে তাঁহারা উক্ত আসামীকে ৪১১ ধারা অনুসারে ডাকাইতীর দ্রব্য গ্রহণ করিবার অপরাধী করিতে পারিতেন। কিন্তু যদি কোন প্রমাণ না থাকিত, অথবা জজের যদি এই বিষয়ে ন্যায্য সন্দেহ হইত যে, যে ব্যক্তির নিকট উক্ত অপহৃত সম্পত্তি পাওয়া যায়, সে তাহা এমত অবস্থায় লয় কি না, যাহাতে সে জানিতে পারিয়াছে

অথবা তাঁহারা অনায়াসে এই বোধ হইয়াছে যে, উক্ত সম্পত্তি ডাকাইতী দ্বারা পাওয়া হইয়াছে; যদি তাঁহাদের এই বিশ্বাস হইত যে, সে তাহা এমত অবস্থায় লয় যাহাতে উক্ত সম্পত্তি শঠতা পূর্ব্বক গ্রহণ করা ব্যতীত আর কোন অনুমান হয় না, তবে তাঁহারা ৪১১ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিতেন। একাধিক অপরাধ করিবার কোন প্রমাণ না থাকায় আসামীকে উভয় ৪১১ এবং ৪১২ ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত করাতে স্পষ্ট অন্যায় হইয়াছে।

ডাকাইতীর দ্রব্য গ্রহণ করার অভিযোগে এবং ৪১১ ধারা অনুসারে অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করা অন্যায় হইয়াছে; অতএব তাহা রহিত হইবে।

জুরি যে, আসামীদিগকে ডাকাইতীর অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

নেহাল সর্দ্দারের মোকদ্দমায়ও এই প্রকারের বাক্যই খাটে। ডাকাইতী করিয়া যে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়, তাহা গ্রহণ করা হেতু নেহাল সর্দ্দার ৪১২ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কঠিন পরিশ্রম-সহ পাঁচ বৎসরের কারাবাস-দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। সে জানিয়া শুনিয়া অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ৪১১ ধারা অনুসারে তাহাকে অপরাধী করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধীয় হুকুম অন্যথা হইবে। আসামীর একাধিক অপরাধ করিবার কোন প্রমাণ নাই।

এই সকল বাক্যাধীন আসামীগণের আপীল ডিস্‌মিস্ হইল; দণ্ড উপযুক্তই বোধ হইতেছে।

(ব)

২৪ এ মার্চ, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং জে, পি, নর্ম্যান

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম মাধবচন্দ্র মিশ্র।

বাবু রমানাথ বসু আসামীর উকীল।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে মেদিনীপুরের মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—ফৌজদারী আদালতের কোন্ হাকিমের দ্বারা তদন্ত হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া না বলিয়াও কোন মাল আদালত ফৌঃ কার্য্যবিধির ১৭১ ধারা মতে মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিতে পারেন; এবং ঐ মাল আদালতের হাকিম ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের অভিযোগ লিপি করিয়া যে বর্ণনা করেন, তাহাই যথেষ্ট অভিযোগ গণ্য হইবে।

বিচারপতি বেলি।—মাধবচন্দ্র মিশ্র আপেলাণ্ট মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ১৯৩ ধারা অনুসারে মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত হয়। উভয় জজ ও আসেসরগণ তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, এবং সে কঠিন পরিশ্রম-সহ পাঁচ বৎসরের কারাবাস দণ্ড প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে উক্ত অপরাধ সাব্যস্তের বিরুদ্ধে সে আপীল করিয়াছে।

আমাদিগকে এই সকল হেতু দর্শান হয়ঃ—

১। ডেপুটি কালেক্টর কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগে ফৌজদারী কর্তৃপক্ষগণের নিকট মোকদ্দমা বিচারার্থে পাঠান নাই।

২। মোকদ্দমা ডেপুটি কালেক্টর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান; এবং পুলিস-কর্ম্মচারীর কোন অভিযোগ বা রিপোর্ট না থাকায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের তাহা অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবার ক্ষমতা ছিল না।

৩। মোকদ্দমার অবস্থায় এমত কোন প্রমাণ নাই যে, ন্যায্য রূপে উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত হয়।

দেখা যায় যে, যাদবেন্দু সামন্ত নামক এক ব্যক্তি কোন প্রজার নামে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনমতে করের দাবীতে নালিশ করে। বাদী আসামীর পাট্টা-গৃহীতা স্বরূপে উপস্থিত হয়, এবং ক চিহ্নিত এক ইজারা পাট্টা এবং খ চিহ্নিত এক ছে-মকররী পাট্টা দাখিল করে, উভয়ই আসামী-কর্তৃক লিখিতপড়িত এবং রেজি-

ষ্টরী-কৃত হইবার বিষয় বলা হয়। আসামী শপথ করিয়া বলে যে, সে তাঁহা কখন লিখিত পড়িত বা রেজিষ্টরী করে নাই। ডেপুটি কালেক্টর এই অস্বীকার মিথ্যা জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমা তদন্তের নিমিত্ত ফৌজদারী আদালতে পাঠান, এবং এই অনুরোধ করিয়া আসামীকে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যে, তিনি হয় আসামীকে হাজতে পাঠাইবেন, নচেৎ অন্য কোন আবশ্যকীয় হুকুম দিবেন। এই মাত্র হুকুম দেওয়া হয় যে, আসামীকে ৫০০ টাকার জামিন লইয়া খালাস দেওয়া যায়। উক্ত মোকদ্দমা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবার কোন হুকুম দেখান হয় নাই, কিন্তু নথীতে প্রকাশ যে, জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাক্ষিগণের প্রতি সমন জারী করিবার পর অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহাদের জবানবন্দী গৃহীত এবং মোকদ্দমা বিচারিত হয়। উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের উপর মহকুমার ভার ছিল কি না, তাহা দেখান হয় নাই। স্বীকার করা হইয়াছে যে, তাঁহার উপর মহকুমার ভার থাকিয়া থাকিলে আপীলের দ্বিতীয় আপত্তি অকর্ম্মণ্য হইবে। পরন্তু, আপেলাণ্টের উকীল এ কথা অস্বীকার করেন না যে, উক্ত অধীন মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার এবং আসামীকে বিচারার্থে সেশনে অর্পণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল।

উক্ত মোকদ্দমা প্রথমে অর্পিত হইলে, ডেপুটি কালেক্টরের হুকুমেই তাহা ফৌজদারী আদালতে যায়, তখন যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় আসামীকে খালাস দেওয়া হয়। তাহাতে ১০ আইনের মোকদ্দমার বাদী যাদবেন্দু সমস্ত আপীল করে, এবং সেশন আদালত এই আপীলের বিচারে অধীন মাজিষ্ট্রেটকে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৫৫ এবং ২৫৯ ধারা অনুসারে সম্পূর্ণ তদন্ত করিবার আদেশ করেন। তাহাতে অধীন মাজিষ্ট্রেট বিচার করেন যে, আসামী প্রথমতঃ, উক্ত পাট্টা-দ্বয় লিখিত-পড়িত এবং দ্বিতীয়তঃ, তাহা রেজিষ্টরী করে কি না, এবং তৃতীয়তঃ, ক এবং খ চিহ্নিত পাট্টার কার্য্যের ফল এবং তদনুসারে তাহার দায়িত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে সালিশ মানিয়া তাহা স্বীকার করে কি না।

এই তিন প্রশ্ন সম্বন্ধেই অধীন মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, আসামী যে শপথ-পূর্ব্বক ঐ সকল দলীল লিখিত-পড়িত এবং রেজিষ্টরী করিয়া দিবার বিষয় অস্বীকার করে তাহা মিথ্যা, এবং আসামী আপোস মীমাংসা করিবার জন্য ঐ দুই দলীলের ফল এবং তাহার দায়িত্ব সম্বন্ধে সালিশ মান্য করিয়াছিল। অতএব আসামী ক এবং খ চিহ্নিত দলীল লিখিত পড়িত এবং রেজিষ্টরী করিবার বিষয় অস্বীকার করায় অধীন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে সেশনে অর্পণ করেন, এবং আসামী সেশন আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া উল্লিখিত রূপে আপীল করিয়াছে।

আমারমতে আপীলের প্রথম হেতু অকর্ম্মণ্য। এমত কোন আইন নাই যে; দেওয়ানী আদালত যে অভিযোগে কোন মোকদ্দমা বিচারার্থে ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করেন, তাহা এ স্থলের অপেক্ষা আরও নিশ্চিত হইবে। উইক্‌লি রিপোর্টরের অতিরিক্ত সংখ্যার ১৭১ পৃষ্ঠার মোকদ্দমায় (প্রধান বিচারপতি পীকক এবং বিচারপতি বেলি ও কেম্প) স্পষ্ট প্রকাশ যে, ফৌজদারী আদালতে যে মোকদ্দমা তদন্তের জন্য অর্পিত হয়, তাহার বৃত্তান্ত, এবং যে ব্যক্তিগণ অপরাধী হইতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে ঐ অর্পণের লিপি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় আপত্তি সম্বন্ধে, আমাদিগকে দেখান হয় নাই যে, উক্ত মোকদ্দমা যে তদন্তের জন্য পাঠান হয় তাহা জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃকই তদন্তের জন্য পাঠান হয়। ডেপুটি কালেক্টর স্পষ্ট বাক্যে উক্ত মোকদ্দমা ফৌজদারী আদালতে পাঠান, এবং আসামীকে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট অর্পণ করেন। পরন্তু, আমা-

দিগকে দেখান হয় নাই যে, জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেট উক্ত মোকদ্দমা অধীন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান। তদনন্তর, অভিযোগ হইবার বিষয় দেখা যায়। ডেপুটি কালেক্টর যে অভিযোগ লিখিয়া উক্ত মোকদ্দমা ফৌজদারী কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট পাঠান তৎসম্বন্ধে তাঁহার বাক্যই বাস্তবিক অভিযোগ। পরন্তু, বাদী যাদবেন্দু সামন্তের জবানবন্দী আছে। এমতে অন্য প্রকারেও আমি বিবেচনা করি, যথেষ্ট অভিযোগ হইয়াছে। সংশোধিত ফৌজদারী কার্য্য-বিধির অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৭৯ ধারা মতেও এই আপত্তি অকর্ম্মণ্য হয়। উক্ত ধারা এই যে, "যে অপরাধ কেবল সেশন আদাল-"তের বিচার্য্য, কিম্বা নিম্নোক্ত মাজিষ্ট্রেটের "বিবেচনায় ঐ আদালতের বিচারোপযুক্ত, জেলার "মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা "মতে কার্য্যকারী অন্য কর্ম্মকারকের কিম্বা "সেশন আদালতের বিচারার্থে ব্যক্তিদিগকে "সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন অধীন "মাজিষ্ট্রেটের নিকট কোন ব্যক্তির নামে সেই "অপরাধের অভিযোগ, কিম্বা সেই অপরাধ "করিয়াছে এমত অনুভবের অভিযোগ হইলে "ঐ মাজিষ্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা "দিতে পারিবেন।"

অধীন মাজিষ্ট্রেট যে, "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পরিচালন" করেন এবং লোকদিগকে "সেশন আদালতে বিচারার্থে অর্পণ করিতে পারেন" তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

অতএব অধীন মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল; এবং আমাদিগের নিকট যে দ্বিতীয় হেতু উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা করিবার পূর্ব্বে কোন্ স্থলে এই স্থলের ন্যায় স্পষ্ট ক্ষমতা আছে তাহাই প্রকৃতার্থে দেখিতে হইবে।

তদনন্তর, মোকদ্দমার বৃত্তান্তে প্রবেশ করা যাইতেছে। আসামী ১০ আইনের মোকদ্দমায় ক এবং খ চিহ্নিত পাট্টা লিখিত পড়িত করিয়া দিবার বিষয় শপথ পূর্ব্বক অস্বীকার করে। ক চিহ্নিত দলীল আসামী কর্ত্তৃক রামধন রায় এবং ক্ষেত্রনাথ পাঁড়েকে এবং খ চিহ্নিত দলীল কেবল রামধন রায়কে লিখিত পড়িত করিয়া দেওয়া হয়। রামধন রায় ক এবং খ চিহ্নিত দলীল লিখিত পড়িত হইবার বিষয়ে এবং পণের টাকা দিবার বিষয়ে নিঃসন্দেহরূপে শপথ করে। বাদীও শপথ করিয়া বলে যে, ঐ সকল দলীল সে রেজিষ্টরী করিতে দিবার পূর্ব্বে এবং রেজিষ্টরী হইয়া আসিবার পর তাহার নিকট ছিল।

এই ব্যক্তির সাক্ষ্য অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। তাহার মধ্যে কেবল আসামীর সহিত তাহার যে প্রকারের এবং যে পরিমাণের শত্রুতা ছিল তাহাই গোপন করার চেষ্টা সম্বন্ধে যে কোন আপত্তি হইতে পারে; কিন্তু ঐ আপত্তির বিরুদ্ধে এই বলা যায় যে, এই অভিযোগ প্রথমতঃ এই রামধন কর্ত্তৃক না হইয়া সব-রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃকই হয়।

সাক্ষী রামেশ্বর বসু ক এবং খ চিহ্নিত দলীল নিজে লিখিয়াছে এমত নিশানা দেয়, এবং এই শপথ করে যে, আসামী তাহা লিখিত পড়িত করিয়া পণের টাকা গ্রহণ করে। ইহা সত্য বটে যে, উক্ত দুই দলীলে ১৭ দিনের অগ্রপশ্চাতের তারিখ আছে এবং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে যে, এই লেখক সেই গ্রামের লোক বা চাকর না হওয়ায়ও উভয় দলীল তাহার দ্বারাই লিখিত হয়; কিন্তু সে শপথ করিয়া এক ভাবে বলে যে, সে রামধনের পরিচিত ব্যক্তি এবং মেদিনীপুরে কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে যাইত, এবং পথে রামধনের বাটীতে থাকিত। সমুদায় দৃষ্টে এই ব্যক্তির জবানবন্দী অবিশ্বাস করিবার কোন স্পষ্ট কারণ নাই।

অপর, নবীনচন্দ্র মাঝী ক চিহ্নিত পাট্টা লিখিত পড়িত হইবার বিষয়ে এবং পণের টাকা দিবার বিষয়ে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয়, এবং সে কেবল এই দলীল লিখিত পড়িত হইতে দেখে। সে ক চিহ্নিত পাট্টার শরীক ক্ষেত্রনাথ পাঁড়ের জমির

দুই কাঠা অন্তরে বাস করে এবং তাহার চাকর। এ ব্যক্তির জবানবন্দীতে এমত কিছু নাই যাহাতে কাহারও তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে।

স্কুলের শিক্ষক তারাপ্রসাদ সরকারও ঐ রূপ সাক্ষ্য দেয়। সে ক চিহ্নিত দলীলও আসামী কর্ত্তৃক লিখিত পড়িত হইবার কথা বলে। পরে রামসদয় ঘোষ নামক এক জন মহাজন বলে যে, আসামী তাহার নিকট ক চিহ্নিত পাট্টার লিখিত এই ওঘর মৌজার খাজানার মাতবরীতে ৩০০ টাকা কর্জ করে; তাহাকে তাহা ১২৭৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে অর্থাৎ যে মাসে উক্ত পাট্টা লিখিতপড়িত হয় তাহার পরের মাসে পরিশোধ করা হয়; এবং রামধন আসামীর সহিত আসিয়া উক্ত কট খালাস করিয়া লয়, এবং ঐ সাক্ষী আসামীকে ঐ দলীল ফেরৎ দেয়। ইহা নিরপেক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্য, এবং আমার মতে তাহা স্পষ্ট ও সন্তোষকর। যাদবেন্দু সামন্ত অর্থাৎ উক্ত ১০ আইনের মোকদ্দমার বাদী এবং রামধনের গোমাস্তা শপথ করিয়া বলে যে, উক্ত উভয় দলীলই আসামী কর্ত্তৃক লিখিত পড়িত হয় এবং আসামীর সাক্ষাতেই তাহা রেজিষ্টরী হয়।

সে, শপথ করিয়া বলে যে, রামেশ্বর বসুই ঐ দুই দলীল লেখে। উক্ত সাক্ষী বলে, যে, সে স্কুলের শিক্ষক ছিল, এবং যখন তাহাকে ডাকা হয়, তখন সে তাহার নিকটে পড়াইতেছিল; সে রামধনের এক পুত্রের শিক্ষক ও গোমাস্তা ছিল। তাহার সাক্ষ্যের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

বলা হইয়াছে যে, খ চিহ্নিত দলীলের বিষয় আমাদের দেখা উচিত নহে; কারণ তাহার ক চিহ্নিত পাট্টার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই; কিন্তু আমার বিবেচনায়, এ আপত্তি দুর্ব্বল।

ক চিহ্নিত পাট্টা দ্বারা সম্পূর্ণ ওঘর মৌজা রামধন ও ক্ষেত্রনাথ পাঁড়েকে পাট্টা দেওয়ার বিষয় স্বীকার করা হইয়াছে। ছে-মকররী পাট্টা দ্বারা কেবল রামধনকে সেই মৌজার ২৩/ বিঘা ভূমি ১৭ টাকা করে দেওয়া হয়।

বাদী তাহার ১০ আইনের মোকদ্দমার পোষকতায় এই উভয় দলীলই রেজিষ্টরীকৃত দলীল স্বরূপ দাখিল করে। উক্ত মোকদ্দমায় আসামী শপথ করিয়া উক্ত উভয় দলীলই লিখিতপড়িত এবং রেজিষ্টরী হইবার বিষয় অস্বীকার করে। এমত অবস্থায়, আমি বিবেচনা করি যে, এ মোকদ্দমার সদ্বিচারার্থে খ চিহ্নিত দলীল দেখা আবশ্যক।

আমরা এক্ষণে রেজিষ্টরী করা এবং উক্ত রেজিষ্টরী করিবার সময়ে আসামীকে নিশান দিহী করার বিষয়ের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। সব-রেজিষ্ট্রারের হেড ক্লার্ক স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, আসামী নিজে তাহার নিকট খ চিহ্নিত পাট্টা রেজিষ্টরীর পূর্ব্ব দিবসে আনে, এবং তাহার তাহা সম্পূর্ণ রূপে স্মরণ আছে, কারণ, কি প্রণালীতে রেজিষ্টরী হইবে, তাহা লইয়া আসামীর সহিত তাহার দুই ঘণ্টা তর্ক হয়। এই ব্যক্তির সাক্ষ্য অতি সাবধানে দেখিয়া সে যত দূর বলে তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না।

তদনন্তর, গোলাম নবী এবং গোলাম মহম্মদ খাঁর সাক্ষ্য দেখা যায়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি শপথ করিয়া আসামীর নিশানদিহী করে, এবং বলে যে, সে (সাক্ষী) যখন এক খানা বিক্রয়-কবালা রেজিষ্টরী করিয়াছিল, তখন আসামী ক এবং খ চিহ্নিত দলীল রেজিষ্টরী করে, এবং কেয়ামুদ্দিন নামক এক ব্যক্তি আসামীর মোক্তার স্বরূপ কার্য্য করে। এই গোলাম নবী সাক্ষীর সাক্ষ্য এই দুই দলীলের রেজিষ্টরী সম্বন্ধে সমস্ত প্রধান প্রধান বিষয়ে রামধন রায়ের বাক্যের প্রতিপোষক।

গোলাম খাঁর সম্বন্ধে দেখা যায় যে, সে রেজিষ্টরী সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয়, এবং এই শপথ করে যে, রামধন ও আসামী তাহাকে রেজিষ্টরী আফিস হইতে ক এবং খ চিহ্নিত দলীল ফেরৎ লইবার ক্ষমতা দেয়, এবং সে তাহা লইয়া মালিকগণকে ঐ সকল দলীল ফেরৎ

দেয়। সে ক এবং খ চিহ্নিত দলীলের নিশান দিহী করে, এবং আসামীর রেজিষ্টরী করিবার সময়ে উপস্থিত থাকিবার বিষয়ে শপথ করে। সত্য বটে, এই ব্যক্তি রেজিষ্টরী আফিসে কোন ব্যক্তির মিথ্যা নিশানদিহী করাতে সেশনে অর্পিত হয়, কিন্তু সে খালাস পায়। সে খালাস না পাইলেও, তাহার সাক্ষ্য বিশ্বাস্য হউক না হউক, গ্রাহ্য হইত। কিন্তু সে যখন খালাস পাইয়াছে, তখন এই প্রকারের কোন আপত্তিই সিদ্ধ নহে; বিশেষ, এই সাক্ষীর বাক্য সম্পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ রূপে প্রতিপোষিত হইয়াছে, এবং সেই জন্য তাহা বিশ্বাস্য।

তদনন্তর, আর এক সাক্ষী কেয়ামুদ্দিন শপথ করিয়া বলে যে, আসামী ক এবং খ চিহ্নিত দলীল রেজিষ্টরী করিবার সময়ে উপস্থিত ছিল, এবং সে (সাক্ষী) আসামীর নিশানদিহী করে। আসামীর উকীল আমাদিগের নিকট বলেন যে, উক্ত সাক্ষী যখন আসামীর নাম জানিত না, তখন সে যে তাহার নিশানদিহী করে, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য নহে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, কোন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ঠিক নাম না জানিয়াও তাহার বিশেষ কোন কার্য্য করণ সম্বন্ধে নিশানদিহী করিতে পারে। পরন্তু, যে স্থানে এবং যে প্রকারে উক্ত কার্য্য হয়, তৎসম্বন্ধে এ ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যন্ত ঠিক, এবং এ সকল কথা মিথ্যা হইলে সব-রেজিষ্ট্রার এবং তাঁহার মোহরেরের জবানবন্দী দ্বারা তাহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারিত।

পরিশেষে, আসামীর সাক্ষী দ্বারা আমার বিবেচনায়, তাহার স্থানান্তরে থাকার কথা সপ্রমাণ হয় নাই; উক্ত প্রমাণ এরূপ নহে যে, তদ্দৃষ্টে আমাদের এই বিবেচনা হইতে পারে যে, সে রেজিষ্টরী করিবার সময়ে উপস্থিত ছিল না। আমার বিবেচনায় আসামীর সমুদায় জওয়াবই অকর্ম্মণ্য।

অতএব আসামীর অপরাধ সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইয়াছে বিবেচনায় আমি আপীল ডিস্মিস্ করিব।

বিচারপতি নর্ম্যান। আমি এই আপীল অগ্রাহ্য করণে সম্মত হইলাম। প্রথমতঃ, বৃত্তান্ত সম্বন্ধে, এ মোকদ্দমায় এমত সকল অবস্থা দেখা যায় যাহাতে অভিযোগের মোকদ্দমার বিশ্বাস-যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছিল। প্রমাণ সম্পূর্ণ, এবং সাক্ষিগণ যদি সত্য কথা বলিয়া থাকে, তবে আসামীর অপরাধ স্পষ্ট সপ্রমাণ হইয়াছে। বিচার অতি সাবধানেই হইয়াছে, এবং আসামীর উকীলেরা তাহার পক্ষ অতি বলবৎ রূপে সমর্থন করিয়াছেন। অতএব যে সকল বিষয় আসামীর অনুকূলে প্রদর্শিত হইতে পারিত তাহা যে সকল তদন্ত করা হয় তাহা দ্বারা যে পরিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। জজ এবং আসেসরগণ এক বাক্যে স্থির করেন যে, অভিযোগের পক্ষের সাক্ষিগণ বিশ্বাস্য, এবং এ রূপ এক মতের বিরুদ্ধে আমি এমত কোন সন্দেহ উত্থাপন করিতে পারি না, যাহা কেবল নথীস্থ প্রমাণ পাঠে উপস্থিত হয়, যে সন্দেহ হয়ত আমি নিজে বিচারের সময় উপস্থিত থাকিলে কোন কোন সাক্ষীর ভাব-ভঙ্গী দেখিলে এবং কোন কোন সাক্ষীর বুদ্ধিবিবেচনা সম্বন্ধে মত স্থির করিলে সম্পূর্ণ রূপে দূরীকৃত হইতে পারিত, বা কখনই হইত না। আমি আরও এই বলিতে পারি যে, অভিযোগের পক্ষের সাক্ষিগণের সত্য পরায়ণতা সম্বন্ধেই এক মাত্র তর্ক। তাহাদের সংখ্যা অধিক, এবং তাহারা সকলেই কি অভিপ্রায়ে যাদবেন্দু সামন্তের অনুকূলে দুই খানা মিথ্যা দলীল এচ বাক্য হইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিবে, তাহা বুঝা কঠিন। যে জওয়াব দেওয়া হয় তাহা দ্বারা বৃথা এই সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করা হয় যে, ঐ দুই পাট্টা লিখিতপড়িত হওয়ার সময় আসামী স্থানান্তরে ছিল। অভিযোগ মিথ্যা হইলে, অভিযোগের মোকদ্দমা অনেক বিষয়ে প্রতিবাদিত হইতে পারিত।

অপর হেতু দৃষ্টে প্রথমে কিছু সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু নথীতে দেখা যায় যে, ডেপুটি

কালেক্টর মাধবচন্দ্র মিশ্রের মোকদ্দমা তদন্তের জন্য ফৌজদারী আদালতে পাঠাইবার হুকুম দেন। জেলার মাজিষ্ট্রেট বা অন্য যে কোন মাজিষ্ট্রেটের উক্ত অভিযোগ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল তিনিই তাহা লইয়া বিচার করিতে পারিতেন। আমার বোধ হয়, ১৭১ ধারামতে কালেক্টর এই সাধারণ বাক্যে হুকুম দিতে পারেন। তিনি মাজিষ্ট্রেটের বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করিতে এবং এই হুকুম দিতে বাধ্য নহেন যে, কোন এক বিশেষ কর্ম্মচারী দ্বারাই তদন্ত হইবে। ডেপুটি কালেক্টর সেই সময়ে এবং সেই হুকুমের মধ্যে আসামীকে আবদ্ধ রাখিতে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটকে অনুরোধ করেন। জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাই করেন, কিন্তু অভিযোক্তার বা কোন সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ দ্বারা নিজে মোকদ্দমার বিচার করেন না। ডেপুটি কালেক্টর স্বয়ং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া এবং শপথ-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করেন। আমার বোধ হয়, এ অভিযোগে কোন দোষ হয় নাই, এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের যখন সেশনে অর্পণ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, তখন উক্ত কার্য্য-প্রণালী ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ১৭৯ ধারার অনুমোদিত।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট আসামীকে বিচারার্থে সেশনে অর্পণ করেন। অতএব ১৮৬১ সালের ২৫ আইন যে ১৮৬৯ সালের ৮ আইন দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে তদনুসারে মাজিষ্ট্রেট-কর্তৃক রীতিমত অর্পিত হইয়াছে, এবং ৩৫৯ ধারার বিধান মতে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের দ্বারাই অভিযোগ হইয়াছে, যাহাতে সেশন আদালত-কর্তৃক রীতিমত এবং উচিতমত বিচার হইয়াছে।

পূর্ব্বের কার্য্যের কোন অংশ বে-জাবেতা হইলেও, (কিন্তু তাহা আমার বিবেচনায় এ মোকদ্দমায় হয় নাই) উক্ত অভিযোগ অনুসারে যে অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে আমি তাহার কিছুই অন্যথা হইতে দিতে পারি না। (ব)

২৬এ মার্চ, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন্।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম মেথী মোল্লা প্রভৃতি।

২৪-পরগণার জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের যে হুকুম দ্বারা দরখাস্তকারিগণকে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৩৫৩ ধারা অনুযায়ী অপরাধে কঠিন পরিশ্রম-সহ চারি মাস কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়, তত্রত্য সেশন জজ তাহা স্থির রাখিয়া যে হুকুম দেন তদ্বিরুদ্ধে আপীল।

বাবু মোহিনীমোহন রায় আসামীগণের উকীল।

চুম্বক।—কালেক্টরীর কোন্ পেয়াদা শস্য ক্রোকের সময়ে শান্তি রক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়া উক্ত হুকুম নির্ব্বাহ করিতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আসামীগণ তাহাকে মারপিট করে, এবং তাহার পরওয়ানা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে।

এ স্থলে, সরকারী কর্ম্মচারীকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের সময়ে আক্রমণ করা হেতু তাহারা ৩৫৩ ধারা অনুসারে উচিত মতেই অপরাধী।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—শস্য ক্রোক করিবার সময়ে কালেক্টরীর যে পেয়াদা শান্তি রক্ষার্থে নিযুক্ত হয়, তাহাকে মারপিট করাতে এ মোকদ্দমার আসামীগণ ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৩৫৩ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আসামীগণকে ৩৫৩ ধারার বিধান অনুসারে যে চারি মাস কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে আমাদের এই হেতুবাদে হস্তক্ষেপ করিতে বলা হয় যে, উক্ত মারপিটের সময়ে পেয়াদা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ছিল না। প্রমাণে দেখা যায় যে, তাহাকে যে হুকুম জারী করিতে নিযুক্ত করা হয়, সে তৎকার্য্যে রাস্তায় ছিল, তাহারি এই সকল লোকের সহিত রাস্তায় দেখা হয়,

এবং তাহারা তাহার নিকট হইতে পরওয়ানা কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করে, এবং তাহাকে অত্যন্ত মারপিট করে। বলা হইয়াছে যে, সে পথে ছিল বলিয়া তখন তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল না; কিন্তু যে সময়ে সেই কার্য্য-ভার তাহার উপরে অর্পিত হয়, এবং সে তাহা জারী করিতে রওয়ানা হয় তদবধি সে তাহা সম্পূর্ণ রূপে জারী করা পর্য্যন্ত, এবং তাহার প্রতি যে কর্ম্মের ভার দেওয়া হয় সে তাহা নির্ব্বাহ করিতে উক্ত স্থানে যাইবার কালে সরকারী চাকর স্বরূপেই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহে নিযুক্ত ছিল, এবং যদিও মাজিষ্ট্রেট বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তিদিগের শস্য ক্রোক হইতেছিল, তাহাদের সহিত আসামী-গণের সম্বন্ধ তিনি নিশ্চিত রূপে বাহির করিতে পারেন নাই, তথাপি তাহাদের ভাব এবং পেয়াদার নিকট হইতে পরওয়ানা কাড়িয়া লওয়ার বিষয় দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যই ছিল, এবং মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ হৃদ্বোধ হইয়াছে যে, এই পেয়াদাকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহের সময় মারপিট করা হয়। অতএব আমাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে, এবং এই দরখাস্ত ডিস্মিস্ করা গেল। (ব)

২রা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্সন্।

গয়ার সেশন জজ কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা অনুসারে এস্তমেজাজ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম মাধুচরণ দরখাস্তকারী।

**চুম্বক।**—কোন ব্যক্তি এক বাঁধ দেওয়াতে জল ব্যবহারের স্বত্ব লইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, মাজিষ্ট্রেটের ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২২ অধ্যায় অনুসারে কার্য্য করা উচিত, ২০ অধ্যায় অনুসারে সাধারণের অপকারজনক বিষয় স্বরূপে বিচার করা উচিত নহে।

**এস্তমেজাজ।**—যে কার্য্যের বিরুদ্ধে দরখাস্ত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই নিয়মবিরুদ্ধ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট এক কৃষকের নিকট হইতে এই দরখাস্ত প্রাপ্ত হন যে, উপস্থিত দরখাস্তকারী জলের গতি বন্ধ করায়, তাহার গ্রামের ভূমিতে জলসেচন বন্ধ হইয়াছে।

এ অভিযোগ যে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩২০ ধারা অনুসারে তদন্তের যোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাহা বিবেচনা না করিয়া বোধ হয়, এই বিবেচনা করেন যে, যে জল বন্ধ করার বিষয়ে অভিযোগ হইয়াছে, তাহা এরূপ অপকারক বিষয়, যাহা ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২০ অধ্যায়ের বিধান মতে সরাসরী রূপে বিচারিত হইবে।

অতএব তিনি এই দরখাস্তকারীকে উক্ত বাঁধ ভাঙ্গিবার বা জুরির নিকট উক্ত বিষয় অর্পণ করিবার হুকুম দেন।

দরখাস্তকারী জুরির নিকট তাহা অর্পণ না করায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সরেজমীন দৃষ্টি করত উক্ত বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত বিবেচনা হওয়ায় দরখাস্তকারীকে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হুকুম দেন। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কোন প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া স্পষ্ট এই হেতুবাদে উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন যে, জুরি নিযুক্ত করা হয় নাই।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, জলের গতি বাঁধ দিয়া বন্ধ করাকে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এমত অপকারক বিষয় জ্ঞান করা অন্যায় হইয়াছে, যাহা তিনি ২০ অধ্যায় অনুসারে সরাসরী রূপে নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

অভিযোক্তা সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপে দাবী করে না। সে গ্রামস্থ লোকের পক্ষ হইতে দাবী করিলেও, উক্ত দাবী জল ব্যবহারের স্বত্বের

নিমিত্ত এক শ্রেণীর লোকের দাবীর বিরুদ্ধে অপর শ্রেণীর দাবী। উক্ত প্রশ্ন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের গ্রহণ করা হইলে, ৩২০ ধারা অনুসারে গ্রহণ করাই উচিত ছিল।

২০ অধ্যায় অনুযায়ী কার্য্য আইন-বিরুদ্ধ।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এই সংস্কার যে, আমার বিবেচনায়, তাঁহার ৩২০ ধারা অনুসারে কার্য্য করা উচিত ছিল। আমি এই বলিয়াছি যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের তাহা গ্রহণ করা হইলে, ৩২০ ধারা অনুসারেই গ্রহণ করা উচিত ছিল। আমি বিবেচনা করি যে, ফৌজদারী কর্তৃপক্ষগণের জল ব্যবহারের এই সকল দাবী (যাহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে,) যত দূর সম্ভব দেওয়ানী আদালত দ্বারা বিচারিত হইতে দেওয়া উচিত।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বলেন যে, তিনি মাধুচরণের পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন নাই। আমি এই দেখাইতে চাহি যে, মাধুচরণ তাহার মোক্তার দ্বারা ১৮৬৯ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর তারিখে এই প্রার্থনায় এক দরখাস্ত করে যে, তাহার পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করা হয়; তাহাতে এই হুকুম দেওয়া হয় যে, প্রত্যেক পক্ষেরই সালিশ মান্য করা উচিত।

আমি এই বলিতে চাহি যে, এই হুকুম আপনা হইতেই অন্যায়, কারণ, ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩১০ ধারা অনুসারে অর্দ্ধেক সালিশ আপত্তিকারক নিযুক্ত করিবে, এবং অপর অর্দ্ধেক মাজিষ্ট্রেট যিনি হুকুম জারী করেন, তিনি নিযুক্ত করিবেন। এ বিষয় সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষের কিছু করিবার কথা বলা হয় নাই।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে জানান হইয়াছে যে, রবি-শস্য কাটা হওয়ায় তাঁহার চিঠির উপসংহার কালে তিনি যে, প্রয়োজন দর্শান তাহা আর নাই, অতএব এই এস্তমেজাজের ফল জানা পর্য্যন্ত তিনি হস্তক্ষেপ করিতে ক্ষান্ত থাকিতে পারেন।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আমরা বোধ করি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য আইন-সঙ্গত নহে, এবং সেশন জজ মোকদ্দমার যে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত। উভয় পক্ষের মধ্যে বাস্তবিক জল ব্যবহারের স্বত্ব লইয়া বিবাদ হয়, যাহাতে দ্বিতীয় পক্ষ বাঁধ দিয়াছে; এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের ৩২০ ধারা অনুসারে বিচার করা উচিত ছিল। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে বলেন যে, তিনি কার্য্য-বিধির ২২ অধ্যায়ের কোন ধারা অনুসারে প্রতিকার প্রদান করিতে পারেন না, কারণ, বাঁধ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, তাহা অশুদ্ধ। তাঁহার যদি এই মত হইত যে, প্রথম পক্ষের এই জলপ্রণালীর জল ব্যবহার করিবার স্বত্ব ছিল, তবে উক্ত অভিযোগ উপযুক্ত সময়ে উপস্থিত হইয়া থাকিলে, তিনি এই হুকুম দিতে পারিতেন যে, দ্বিতীয় পক্ষ একাকী তাহা দখল করিতে পারিবে না, এবং যে বাঁধের দ্বারা এক পক্ষের ঐ রূপ সম্পূর্ণ দখল হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুকুম দিতে পারিতেন।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন, তাহা যথেষ্ট হেতুবাদে দেওয়া হয় নাই; উপযুক্ত বিচার সম্বন্ধীয় তদন্ত, অথবা সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ ব্যতীতই দেওয়া হয়, এবং তাহা কোন আইন অনুসারে সংস্থাপিত হইতে পারে না। অতএব তাহা অন্যথা হইল। (ব°)

---

২ রা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

আসামের জুডিসিয়াল কমিশনর কর্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

লতপতী ডোমনী বনাম ভিক্ষা মুদাই।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন ফৌজদারী আদালত কোন ব্যক্তির স্ত্রীর এবং সন্তানগণের ভরণ-পোষণার্থে তাহার মাসিক কিছু টাকা দিবার

হুকুম দেন, এবং পরে স্বামী দাম্পত্য স্বত্বের দাবীতে দেওয়ানীতে নালিশ করায় দেওয়ানী আদালত স্বামীকে ডিক্রী দেন, সে স্থলে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর তারিখ হইতেই ফৌজদারী আদালতের ঐ হুকুম অকর্ম্মণ্য হয়।

এস্তমেজাজ।—মসম্মত লতপতী নাম্নী এক স্ত্রী ১৮৬৭ সালের ১১ ই জুন তারিখে আসামের অন্তর্গত নওগাঁয়ের মাজিষ্ট্রেটের আদালতে এই বলিয়া এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে যে, তাহার বিধিমত স্বামী তিক্কা মুদাই নামক এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া তাহাকে এবং তাহার দুই সন্তানকে ভরণ-পোষণ করে না। ১৪ ই তারিখে ডেপুটি কমিশনর, অভিযোক্তা এবং তাহার স্বামীর (যে বলে যে, সে তাহার স্ত্রীকে পুনর্গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছে) জবানবন্দী লইয়া প্রমাণ আর না লইয়া এই আদেশ করেন যে, তিক্কা মুদাই তাহার স্ত্রী এবং সন্তানদিগের ভরণ-পোষণার্থে মাসিক ২০ টাকা দিবে। ইহাতে এ মোকদ্দমা জুডিসিয়াল কমিসনরের নিকট আসাতে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা অনুসারে ১৮৬৭ সালের ৫ ই আগষ্ট তারিখের ৬৪ নং চিঠিতে প্রধানতম বিচারালয়ে এস্তমেজাজ করা হয়; তাহাতে ১৮৬৭ সালের ৩ রা সেপটেম্বর তারিখে এক হুকুম হয়, যদ্দারা প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণ এই আদেশ করেন যে, ডেপুটি কমিসনর যে হুকুম দেন তাহা আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া অন্যথা হইবে, এবং আরো এই হুকুম দেন যে, ডেপুটি কমিসনর ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩১১ ধারার বিধান-অনুসারে পুনরায় বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তদনুসারে ডেপুটি কমিসনর ১৮৬৭ সালের ২৬ এ সেপটেম্বর তারিখে ঐ কার্য্য পুনর্গ্রহণ করেন, এবং প্রমাণ লইয়া তাহার এই মত হওয়ায় যে, তাহাতে এই সংস্থাপিত হইয়াছে যে, মসম্মত লতপতী তিক্কা মুদাইয়ের বিধিমত স্ত্রী, এবং সে অসদ্ব্যবহার করায় তাহার স্ত্রী দুইটি সন্তান লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়, তিনি এই হুকুম দেন যে, সে তাহার স্ত্রী ও সন্তানদিগের ভরপোষণার্থে মাসিক ২০ টাকা দিবে।

পরে তিক্কামুদাই নওগাঁয়ের মুন্সেফের আদালতে দাম্পত্য স্বত্ব পুনঃস্থাপনার্থে এবং তাহার সন্তানদ্বয়ের অভিভাবকতার দাবীতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত করে, এবং এই মোকদ্দমায় ১৮৬৯ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার অনুকূলে ডিক্রী হয়, এবং সে ১৮৬৯ সালের ৬ ই নবেম্বর তারিখে ডিক্রীজারী করে; কিন্তু তাহার স্ত্রী মসম্মত লতপতী তাহার সহিত বাস করিতে অস্বীকার করাতে সে তাহাকে না পাওয়ায়, ১৮৬৯ সালের ১০ ই নবেম্বর তারিখে তাহাকে খোরপোসের দাবী হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য ফৌজদারী বিভাগে ডেপুটি কমিশনরের নিকট দরখাস্ত করে; এবং তাহাতে তাহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়া ১৮৬৯ সালের ১৭ ই নবেম্বর তারিখে পার্শ্বলিখিত হুকুম দেওয়া হয়।

“আমি দরখাস্তকারীকে পূর্ব্বে যে খোরপোষ দেওয়ার হুকুম দিয়াছি, আমি তাহাকে তাহার দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিব না। সে যদি ইচ্ছা করে যে, তাহার স্ত্রী দেওয়ানী আদালতের হুকুম মান্য করিবে, তবে তাহার সেই আদালতে দরখাস্ত করিতে হইবে।
(স্বাক্ষর) টি, বি, মিচেল
প্রতিনিধি ডেপুটি কমিসনর
১৭—১১—৬৯।”

পরে তিক্কামুদাই ১৮৬৯ সালের ২৭ এ নবেম্বর তারিখে দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীজারীর কার্য্যে তাহার পুত্র সম্পদ ওরফে মণ্ডরামের দখল পায়; তাহাতে উক্ত স্ত্রী মসম্মত লতপতী ফৌজদারী বিভাগে ডেপুটি কমিশনরের নিকট এই দরখাস্ত করে যে, তাহাকে তাহার পুত্র উক্ত সম্পদকে ফিরিয়া দেওয়া হয়, এবং এই হুকুম হয় যে, উক্ত ডিক্রী তাহাতে হস্তক্ষেপ না করে; তাহাতে ডেপুটি কমিশনর ১১ ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত হুকুম দেন:—

এই আদালত বিচারান্তে হুকুম দেন যে, অভি-যোক্তার স্বামী তাহার প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার "করায় স্বামীর নিকট হইতে অভিযোক্তা ভরণ-"পোষণ স্বরূপ মাসিক ২০ টাকা পাইবে। "তাহার নাবালগ সন্তানগণকেও তাহার নিকট "থাকিতে দেওয়া হয়। তাহার স্বামী এক্ষণে "তাহার নাবালগ এক সন্তানকে তাহার নিকট "হইতে লইয়া গিয়াছে; অতএব আমি আদেশ "করিতেছি যে, সে এই দণ্ডে উক্ত সন্তানকে "তাহার মাতার নিকট ফেরৎ দেয়।"

প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনর।

তারিখ ১১ ই ডিসেম্বর ১৮৬৯।"

( স্বাক্ষর ) টি, বি, মিচেল।

এ স্থলে নওগাঁয়ের মুন্সেফ ১৮৬৯ সালের ১৫ ই ডিসেম্বর তারিখে ডেপুটি কমিশনরের নিকট এই রুবকারী করেন যে, ডিক্রীদার তিক্ষা মুদাই তাহার স্ত্রী ও সন্তানগণের ভরণ-পোষণার্থে যে টাকা দিয়াছে এবং যাহা পুলিসের কোর্ট ইনস্পেক্টরের নিকট আমানত আছে তাহা ক্রোক করা হয়, কিন্তু ডেপুটি কমিশনর পার্শ্বলিখিত হুকুম দ্বারা মুন্সেফের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন।

"যে খোরপোষ "উপযুক্ত হাকিম-"কর্ত্তৃক উক্ত স্ত্রীলো-"ককে দেওয়া হইয়াছে, "তাহা আমি তাহার "স্বামীর নালিশে, "যাহার উক্ত খোর-"পোষ দিতে হইবে, "ক্রোক দিবার হুকুম "দিতে পারি না।

( স্বাক্ষর ) টি বি মিচেল।

প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনর।

তারিখ ২০ এ ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

পরিশেষে, যে সকল কার্য্যের কথা বলা গেল তদনুসারে তিক্ষা মুদাই ফৌজদারী বিভাগে জুডিশিয়াল কমিশনরের আদালতে আসিয়া বলে যে, ডেপুটি কমিশনর যে কার্য্য দ্বারা দেওয়ানী আদালতের কার্য্য স্থগিত রাখেন, তাহা আইন-বিরুদ্ধ; এবং এই প্রার্থনা করে যে, যে হুকুম দ্বারা খোরপোষের দাবী প্রবল রাখা হয়, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার হুকুম হয়।

যেহেতু প্রদর্শিত মোকদ্দমার বিষয়ে এই আদালত বিবেচনা করেন যে, ডেপুটি কমিশনর মাজিষ্ট্রেটের স্বরূপে আসীন হইয়া দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির এবং কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধে হুকুম দিয়া আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, এবং যেহেতু তিক্ষা মুদাই যে সকল হেতুবাদে তাহার স্ত্রী তাহার সহিত কোন মতেই বাস না করিতে চাওয়ায় তাহার খোরপোষ না দেওয়ার নিমিত্ত ডেপুটি কমিশনরের নিকট মাজিষ্ট্রেটের নিকট-স্বরূপে দরখাস্ত করে, তাহা যুক্তি-সিদ্ধ বোধ হইতেছে, অতএব আদালত প্রধানতম বিচারালয়ের বিচারপতিগণের সমীপে এই প্রার্থনা করেন যে, ডেপুটি কমিশনর ১৮৬৯ সালের ১৭ ই নবেম্বর তারিখের যে হুকুমদ্বারা খোর-পোষ দিবার হুকুম দেন তাহা, এবং ১৮৬৯ সালের ১১ ই ডিসেম্বর তারিখের আর যে এক হুকুম দ্বারা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীর বিরুদ্ধে এই আদেশ করেন যে, দরখাস্তকারীর পুত্র সম্পানকে তাহার মাতাকে ফিরিয়া দেওয়া হয়, তাহা অন্যথা করা হয়, এবং দেওয়ানী আদালতের ১৮৬৯ সালের ১১ ই সেপ্টেম্বরের ডিক্রীর তারিখ হইতে খোরপোষ দেওয়া ক্ষান্ত হয়।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি জ্যাকসন।—মেং মিচেলের ১৮৬৯ সালের ১৭ ই নবেম্বর এবং ১১ ই ডিসেম্বর তারিখের হুকুম যারপর নাই অন্যায় এবং আইন-বিরুদ্ধ। তাহা অন্যথা হইল। দেওয়ানী বা ফৌজদারী যে কোন আদালতের হুকুমই হউক, তাহা অমান্য করিতে ঐ জেলার মধ্যে মেং মিচেলের সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক নিবৃত্ত থাকা উচিত।

( ব )

---

৪ ঠা এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি নর্ম্যান এবং ই, জ্যাক্‌সন।

**শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম মেওয়ালাল।**

গয়ার সেশন জজ কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

মেং আর্ ই টুইডেল এবং বাবু নীলমাধব সেন ও বুধসেন সিংহ দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন জামিনদার এই সর্ত্তে খত দেয় যে, সে অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন এক নির্দ্দিষ্ট আদালতে হাজির থাকার জন্য দায়ী হইবে, তাহাতে যদি সেই আদালত জামিনদারের সম্মতি না লইয়া উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, কার্য্যানুরোধে স্থানান্তরে যাইতে অনুমতি দেন এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি পরে অন্য এক আদালতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে জামিনদার তদ্দ্বারাই তাহার জামিনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়।

এস্তমেজাজ।—আপেলাণ্ট নওয়াদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতে কোন এক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করিবার জন্য ৫০০ টাকা পরিমাণের জামিনদার ছিল। উক্ত মোকদ্দমা সদর ষ্টেসনে (গয়াতে) পাঠান হয়, এবং জামিনদার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিতে না পারায়, তাহাকে জামিন-নামার লিখিত দণ্ড দিতে বলা হয়।

জামিনদার এই আদালতে আপীল করে; কিন্তু আমার বিবেচনায় এ আদালত আপীলে উক্ত হুকুমে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। যে স্থলে লোকেরা “কোন বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়” তাহাতেই মাজিষ্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে সেশন আদালতে আপীল হয়; সদ্ব্যবহারের জামিন দিবার হুকুম ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ৪০৯ ধারা-নির্দ্দিষ্ট একমাত্র বর্জ্জিত বিষয়। জামিনদারের জামিন জব্দ হইবার হুকুম স্পষ্টই বিচারের পর অপরাধ-সাব্যস্তের দণ্ড নহে। অতএব আমি এই আপীল ডিস্‌মিস্‌ করিলাম।

কিন্তু যেহেতু আমার বোধ হইতেছে যে, এই আপত্তির হেতু আছে, এবং জামিননামার সর্ত্ত অনুসারে জামিনদার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিতে বাধ্য নহে, অতএব যে হুকুমের প্রতি আপত্তি হইয়াছে আমি তাহা প্রধানতম বিচারালয়ের বিবেচনার্থে অর্পণ করিলাম।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায়ঃ—

বিচারপতি নর্ম্যান।—রাম রায় প্রভৃতির উপর দাঙ্গার অভিযোগ হয়, এবং যে ভূমির সম্বন্ধে উক্ত দাঙ্গা হয় তাহার মালিক দীনদয়ালের উপর দণ্ড-বিধির ১৫৫ ধারামতে, উক্ত দাঙ্গা নিবারণার্থে তাহার সাধ্যানুযায়ী সমস্ত বিধিমত উপায় অবলম্বন না করিবার অভিযোগ হয়। উক্ত মোকদ্দমা নওয়াদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট চলিতেছিল।

১৮৬৯ সালের ৮ ই আগষ্ট তারিখে মেওয়ালাল এই সর্ত্তে ৫০০ টাকার জামিন হয় যে, দীনদয়াল হাজির থাকিবে, এবং অনুপস্থিত হইবে না, এবং সে পলায়ন করিলে মেওয়ালাল গবর্ণমেণ্টের নিকট ৫০০ টাকার দায়ী হইবে। ২৮ এ আগস্ট তারিখে দীনদয়াল কোন আবশ্যকীয় কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি চাহে। নওয়াদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট তাহাকে যাইতে অনুমতি দেন। ইহার কিছু কাল পরেই মোকদ্দমা গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয়। গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট দীনদয়াল প্রতিবাদীকে ২৮ এ নবেম্বর তারিখে হাজির হইবার হুকুম দেন। ২৮ এ নবেম্বর তারিখে উক্ত মোকদ্দমা উঠে, কিন্তু দীনদয়াল উপস্থিত হয় না। তদনন্তর ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বোধ হয় মেওয়ালালকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২২০ ধারামতে উক্ত দণ্ড দিতে, বা তাহা কেন দেওয়া হইবে না, তাহার কারণ দেখাইতে বলেন।

মেওয়ালাল ৩ রা ডিসেম্বর তারিখে এই বলিয়া জওয়াব দেয় যে, সে ২৮ এ আগষ্টের হুকুম দ্বারা, দীনদয়ালকে হাজির করিবার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। কিন্তু গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বিবেচনা করেন যে, মেওয়ালাল কেন উক্ত দণ্ড দিবে না, সে তাহার যথেষ্ট কারণ দেখায়

নাই; অতএব তাহাকে ৫০০ টাকা দিতে হুকুম দেন। মেওয়ালাল গয়ার জজের নিকট আপীল করে। জজ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হয় না দেখিয়া উক্ত মোকদ্দমা ৪৩৪ ধারা মতে এই আদালতে পাঠাইয়াছেন, এবং মেওয়ালালের পক্ষে টুইডেল সাহেব এক্ষণে আমাদের নিকট গয়ার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রহিত করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন।

আমরা বিবেচনা করি, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত সেক্রেটরী অব্ ষ্টেটের প্রতি এই হুকুম জারী হইবে যে, নিম্নলিখিত হেতুবাদে ৩ রা ডিসেম্বরের হুকুম কেন রদ করা হইবে না, তাহার কারণ দেখান হয়। প্রথমতঃ, নওয়াদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম দ্বারা দীনদয়ালকে অনুপস্থিত হইতে দেওয়ায় জামিনদারের বিনা সম্মতিতে জামিনের অবস্থা বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়; এবং দ্বিতীয়তঃ, যে জামিন দেওয়া হয়, তদ্দ্বারা মেওয়ালাল দীনদয়ালকে কেবল নওয়াদহের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করিতে বাধ্য ছিল, আর যে কোন আদালতে মোকদ্দমা পাঠান হয়, তথায় হাজির করিতে বাধ্য ছিল না। এই হুকুম গবর্ণমেণ্টের উকীলের উপর জারী হইবে, এবং ইহার সংবাদ ঐ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে দিতে হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—শেসন জজের মতে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম আইন-বিরুদ্ধ হইয়া থাকিলে, তাঁহার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করা উচিত ছিল। পুনর্দৃষ্টির জন্য এই আদালতে যে এস্তমেজাজ করা হয়, তৎসম্বন্ধে এই আদালতের সরকুলর চিঠীতে এই নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, যে কর্ম্মচারীর হুকুম আইন-বিরুদ্ধ বোধ হয়, তাঁহার কৈফিয়ৎ উক্ত এস্তমেজাজের সহিত থাকিবে। এ মোকদ্দমায় সেশন জজ যখন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ তলব করেন নাই, তখন আমার বিবেচনায়, নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ মাজিষ্ট্রেটগণের নিকট এই এস্তমেজাজের সংবাদ দিতে হইবে। অতএব মেওয়ালালের নিকট হইতে যে ৫০০ টাকা আদায় করা হইয়াছে তাহা কেন, তাহাকে ফেরৎ দেওয়া হইবে না, তাহার কারণ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা হইলে দর্শাইবেন।

প্রধানতম বিচারালয়ের চূড়ান্ত হুকুম ঃ—

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—উক্ত হুকুম মঞ্জুর হইবে, এবং ঐ জামিনের ৫০০ টাকা আদায় করিবার হুকুম অন্যথা হইবে এবং উক্ত টাকা দাখিল হইয়া থাকিলে ফেরৎ দিতে হইবে।　　　( ব )

৯ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন

এবং এফ, এ, গ্লবর।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম গবাদর ভুঞা। নরহত্যার অভিযোগ গয়ার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন আসামী সেশন আদালতে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ স্বীকার করে, তাহাতে সেশন জজ হয় তাহাকে উক্ত অপরাধ স্বীকার মতেই অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন, নচেৎ প্রমাণ দৃষ্টে তাহার বিচার করিতে পারেন; কিন্তু তিনি বিচার না করিয়া, আসামী যে অপরাধ (যথা, যে অপরাধ-জনক নরহত্যা জ্ঞানকৃত বধ নহে) স্বীকার করে নাই তাহার নিমিত্ত তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন না।

দণ্ডবিধির ৯৭, ৯৯ এবং ১০২ ধারা দৃষ্টে, এ মোকদ্দমায় মৃত ব্যক্তির ভয়প্রদর্শন হইতে আসামীর আপদ আশঙ্কার কোন যুক্তিসিদ্ধ কারণ না থাকায়, আত্মশরীর রক্ষার স্বত্ব এস্থলে জন্মে নাই, সুতরাং উপস্থিত অপরাধ সম্বন্ধে দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ২ য় বর্জ্জিত বিধি খাটে না; এবং ঐ অপরাধ জ্ঞানকৃত বধের তুল্য।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—এই মোকদ্দমায় আসামীর প্রতি জপ্ত ভুঞাকে খুন করিবার অভিযোগ হয়, এবং সে "অপরাধ স্বীকার," করে। ঐ স্বীকারহেতু জজ রীতিমত বিচার

করা অনাবশ্যক বোধ করিয়া মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক গৃহীত জবানবন্দীতে যে সকল অবস্থা প্রকাশ পায় তাহাই পর্য্যালোচনা করত, ঐ "অপরাধ স্বীকার" যাহা তিনি (জজ) লিখিয়া লইয়াছিলেন তাহা ন্যূন করিয়া, জ্ঞানকৃত বধ নহে এমত অপরাধজনক নরহত্যায় পরিণত করেন, এবং এই জন্য তিনি উক্ত অপরাধ আসামীর অনুকূলে, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির যে ৩০০ ধারায় জ্ঞানকৃত বধের অপরাধের ব্যাখ্যা আছে, তাহার দ্বিতীয় বৰ্জ্জিত বিধির অন্তর্গত করেন। উক্ত বৰ্জ্জিত বিধি এই যে, "সরলভাবে আত্মরক্ষার "কি সম্পত্তি রক্ষার অধিকারক্রমে আইনমতে "যে পর্য্যন্ত কার্য্য হইতে পারে তাহার অতিরিক্ত "কার্য্য যদি কোন ব্যক্তি করে, ও পূর্ব্ব মনস্থ না "করিয়াও আত্মরক্ষার নিমিত্তে যত হানি করা "আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত করিবার মানস "না করিয়া, যাহার বিরুদ্ধে সেই অধিকারক্রমে "কার্য্য করে তাহার মরণের কারণ হয়, তবে "এমত স্থলে অপরাধযুক্ত যে নরহত্যা তাহা "জ্ঞানকৃত বধ হয় না। উল্লিখিত জবানবন্দী সকল হইতে যে সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় তাহা এই যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি, মৃত ব্যক্তি এবং এবং অপর এক ব্যক্তি এক মদের দোকানে একত্র হইয়া মদ্যপান করে। পরে তাহারা এক সঙ্গে বেড়ায়, উক্ত তৃতীয় ব্যক্তি অপর দুই জনের কিঞ্চিৎ অগ্রসর হয়, এবং এই দুই জন ক্রমে বেড়াইতে বেড়াইতে, মৃত ব্যক্তি যাদু দ্বারা আসামীর চারিটি সন্তানের মৃত্যু সংঘটন করিয়াছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়। আসামীর বাক্যে প্রকাশ যে, মৃত ব্যক্তি স্বীকার করে যে, সে তাহাদের মৃত্যু সংঘটন করিয়াছে, আরো বলে যে, সে আসামীরও মৃত্যু সংঘটন করিবে; অর্থাৎ সে আসামীকে উক্ত স্থান হইতে যাইতে না দিয়া ব্যাঘ্রের দ্বারা ভক্ষণ করাইবে। তাহাতে, আসামী বলে যে, সে তাহাকে এক যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে করিতে মারিয়া ফেলে।

আসামী মূর্খ এবং অসভ্য বিধায় বিশ্বাস করে যে, উল্লিখিত প্রকারে তাহার মৃত্যু সংঘটন করিতে মৃতব্যক্তির ক্ষমতা ছিল, জজ এই মনে করিয়া আসামী আত্মরক্ষার স্বত্ব পরিচালনে উক্ত কার্য্য করিয়াছে, বিবেচনা করেন, কিন্তু উক্ত স্বত্ব পরিচালনে সে আইন অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে ৩০০ ধারার দ্বিতীয় বৰ্জ্জিত বিধির মধ্যে আনেন।

আমার বিবেচনায়, এই অভিপ্রায় একবারেই রক্ষা পাইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের আত্মরক্ষার স্বত্ব ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ৯৭ ধারায় বর্ণিত আছে এবং তথায় লেখা আছে যে, "৯৯ ধারার নিষেধের প্রতি মনোযোগ রাখিয়া, "মনুষ্যের শরীরের হানি হয় এমত কোন "অপরাধ হইতে প্রত্যেক ব্যক্তির আপন শরীর "বা অন্য কাহার শরীর রক্ষা করিবার অধি-"কার আছে।" "অপরাধ" শব্দে এমত কার্য্য বুঝায়, যাহা দণ্ডবিধি অনুসারে দণ্ডনীয়, এবং ৯৯ ধারার তৃতীয় নিষেধ এই যে, "যে স্থলে "রাজকীয় কার্য্যকারকদের আশ্রয় লইবার "অবকাশ থাকে, এমত স্থলে আত্মরক্ষার অধি-"কার থাকে না।" এবং ১০২ ধারায় বিধিবদ্ধ আছে যে, "অপরাধ করিবার উদ্যো-"গেতে কি ভয়প্রদর্শনেতে যখন শরীরের আপ-"দের আশঙ্কা যুক্তিমতে হয়, যদিও সেই সম-"য়েতেই অপরাধ না হইয়া থাকে, তথাপি সেই "সময়াবধি আত্মরক্ষার অধিকার জন্মে, আর "যত কাল শরীরের আপদের সেই আশঙ্কা "থাকে, তত কাল ঐ অধিকার থাকে।" আমি বিবেচনা করি যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্ভাবিত মূর্খতার প্রতি যথেষ্ট দৃষ্টি করিয়াও এমত বলা যাইতে পারে না যে, মৃত ব্যক্তি হয়ত নেশা বশতঃ যে সকল গালগল্প করে, তাহা হইতে শরীরের কোন হানির ন্যায্য আশঙ্কা হইতে পারে।

পরন্তু ৯৯ ধারার চতুর্থ নিষেধে লেখা আছে যে, "আত্মরক্ষার জন্য যত অপকার করা আব-

"শ্যক তাহার অধিক অপকার আত্মরক্ষার "অধিকার ক্রমে কোন স্থলে করা যাইতে পারে না।" অতএব আমার বোধ হয় যে, যে ভাবেই লওয়া যাউক, জজ আসামীর পক্ষে আপনা হইতে যেহেতু উত্থাপন করেন তাহা রক্ষা পাইতে পারে না; এবং যে বর্জিত বিধির উপর নির্ভর করা হইয়াছে তাহা প্রয়োগ হয় না।

এ মোকদ্দমায় শেসন জজের কার্য্য-প্রণালী বেজাবেতা বোধ হইতেছে। আসামী অপরাধ স্বীকার করায়, জজ উচিত বোধ করিলে তাহাকে সেই স্বীকার মতেই অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারিতেন; অতএব সে যে খুন করিবার অপরাধ স্বীকার করে, তাহাকে তাহারই নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা জজের উচিত ছিল; কিন্তু তিনি তাহাকে উক্ত অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা উচিত বোধ না করিয়া থাকিলে, তাহার বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহার উচিত ছিল, এবং তাহা হইলে আসামী জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ করিয়াছে, কি অন্য যে কোন অপরাধের নিমিত্ত সে অভিযুক্ত হয় তাহা করিয়াছে, তন্নিরূপণার্থে, যে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাই তাঁহার লইতে হইত।

বোধ হয় এই ঘটনার এক প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিল; এবং যদিও উক্ত সাক্ষী এত নিকটে ছিল না যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মৃত ব্যক্তির মধ্যে যে সকল কথা হয়, তাহা সে শুনিয়াছিল, তথাপি সে এ মোকদ্দমায় অতি গুরুতর সাক্ষ্য দিতে পারিত; এবং যে গতিকেই হউক, সে যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বাস্তবিকই এমত আঘাত করিতে দেখিয়াছে, যাহাতে নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সঙ্ঘটিত হয়, তখন যে কোন বর্জ্জিত বিধির দ্বারা আসামীর অপরাধ জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ হইতে অন্য কোন লঘু অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তন্মধ্যে আসামীকে আনা আসামীরই নিজের কার্য্য হইত।

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমাদের উক্ত কার্য্য সমস্ত অন্যথা করিয়া আসামীকে পুনরায় শেসন আদালতে উপস্থিত করিতে এবং হয় আসামীকে নিজের স্বীকার মতেই অপরাধী সাব্যস্ত করিতে, নচেৎ তাহার বিরুদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগের বিচারে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। (ব)

---

১৪ ই এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম কৃষ্ণরাম দাস এবং গোলমহম্মদ।

বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় গবর্ণমেণ্টের উকীল।

বাবু ভগবতীচরণ বসু এবং করুণাদাস বসু আসামীগণের উকীল।

অপরাধ-জনক বিশ্বাস-ঘাতকতা ইত্যাদির অভিযোগে গোয়ালপাড়ার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনর কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—১৮৬১ সালের ৮ আইনের ৪৪৫ (এ) এবং ৪৪৫ (বি) ধারার বিধান দৃষ্টে সেশন আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় অপরাধের বিচার করিতে আইনের অনধীন প্রদেশের প্রধান কার্য্যকারক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের বিধানমতে চলিতে বাধ্য, এবং আসামীর প্রতি যে সকল অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার কোন এক অপরাধ সেশন আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য না হইলেও, তিনি তাহার বিচার জুরি বা আসেসরগণের সাহায্যে করিবেন।

বিচারপতি কেম্প।—এই আসামীগণের প্রতি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১০৯, ৪০৯, এবং ১৯৩ ধারামতে অভিযোগ হয়। জেলা গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনর ইহার বিচার করেন। ঐ আদালত কৃষ্ণরাম দাসকে অপরাধ-জনক বিশ্বাসঘাতকতার এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রণয়ন করার অপরাধী স্থির করিয়া ছয় বৎসর কারাবাসের এবং ৫০০ টাকা জরিমানার দণ্ডাজ্ঞা দেন, এবং

উক্ত টাকা না দিলে আর ১৮ মাস ব হুকুম দেন। এই দণ্ড ঐ জেলার সমস্ত কর্ম্মচারীকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত দেওয়া হয় প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনরের হুকুমে গোলি মহম্মদ খালাস পায় কি অপরাধী সাব্যস্ত হয়, তাহা দৃষ্ট হয় না।

আপেলাণ্টের উকীল এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই এক প্রাথমিক আপত্তি করেন যে, এ মোকদ্দমায় গোয়ালপাড়ার প্রতিনিধি কমিশনর সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্য্য করেন। আমরা গবর্ণমেণ্টের উকীলকে নিম্ন আদালতের ক্ষমতা থাকিবার বিষয় দেখাইতে বলি। তিনি আমাদিগকে ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৪৫ (এ) ধারা দর্শান; তাহাতে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, যে জেলায় ফৌজদারী সম্বন্ধে বাঙ্গালার সাধারণ আইনাদি প্রচলিত নাই, এমত কোন জেলার ফৌজদারী বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব কার্য্য নিরূপণাধিকারী প্রধান কার্য্যকারকের প্রতি, তাঁহার যে খ্যাতিই হউক না কেন, মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনেরেল বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত সকল অপরাধের বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন, যাহা প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় নহে; এবং সেই বিধির বিধান অনুসারে সাত বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত যে কোন প্রকারের হউক, কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দিবার ক্ষমতাও অর্পণ করিতে পারেন; এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হুকুম সম্বন্ধে আমাদিগকে দেখান হইয়াছে যে, এই প্রতিনিধি ডেপুটি কমিশনরকে উক্ত ধারা অনুযায়ী সমস্ত অপরাধের বিচার করিবার এবং সাত বৎসরের অনধিক কালের নিমিত্ত কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উক্ত আইনের ৪৪৫ (বি) ধারায় ব্যক্ত হইয়াছে যে, যে সকল অপরাধ ঐ আইনের তফসীল অনুসারে কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য, ঐ প্রধান কর্ম্মকারক সেশন আদালত স্বরূপে সেই সকল অপরাধের বিচার করিবেন, এবং ঐ সকল বিচারে এই বিধির ২৫ অধ্যায়-লিখিত নিয়ম অনুসারে চলিবেন। ৪০৯ ধারা অনুযায়ী অপরাধ যে, সেশন আদালত এবং জেলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচার্য্য এবং ১৯৩ ধারা অনুযায়ী অপরাধ যে, কেবল সেশন আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য, তাহার কোন সন্দেহ নাই। অতএব ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৪৫ (বি) ধারা এই মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয়, এবং এই মোকদ্দমার বিচার ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৫ অধ্যায় লিখিত নিয়ম অনুসারে হইবে। গবর্ণমেণ্টের উকীল তর্ক করেন যে, এই আদালত ১৯৩ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ, যাহা দুই অভিযোগের মধ্যে গুরুতর, তাহা ছাড়িয়া দিয়া ৪০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ লইয়া তাহার যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে তাহা স্থির রাখিতে পারেন। আমরা এই অভিপ্রায়ে সম্মতি দিতে পারি না, কারণ, প্রথমতঃ আমার বোধ হয় যে, আসামী এই সকল মিথ্যা হিসাব প্রস্তুত করিয়াছে কি না, সে অপরাধজনক বিশ্বাসঘাতকতার নিমিত্ত অপরাধী কি না, ইহারই উপর তাহা অধিক নির্ভর করে; এবং দ্বিতীয়তঃ, নিশ্চয়ই দুই স্বতন্ত্র অভিযোগ ছিল, যাহাতে আসামী স্বতন্ত্র রূপে জওয়াব দিয়াছে এবং সতন্ত্ররূপে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, এবং মোকদ্দমার দোষগুণ সম্বন্ধে এই দুই অভিযোগ পৃথক্ করা অসম্ভব। এই সকল হিসাব কৃত্রিম করিয়া প্রস্তুত না করিয়া থাকিলে আসামী অপরাধজনক বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধী না হইতে পারে; পরন্তু, ফৌঃ কার্য্য-বিধির বিধান মতে আসামীর স্বদেশীয় জুরীর দ্বারা বিচারিত হওয়ার যে স্বত্ব আছে তাহা হইতে সে বঞ্চিত হইয়াছে। এই অপরাধ-সাব্যস্ত রহিত হইল এবং নিম্ন আদালতকে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৫ অধ্যায়ের বিধান অনুসারে জুরি বা আসেসরের সাহায্যে মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ করা গেল। যদি ঐ দেশে জুরিদ্বারা বিচারের নিয়ম প্রচলিত হইয়া থাকে, তবে আদালত জুরি দ্বারা এ মোকদ্দমার বিচার করিবেন, তাহা না হইয়া থাকিলে, আসেসরগণের সাহায্যে বিচার করিবেন। (ব.)

২০এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, পি, নর্ম্যান এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

### শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম মুক্তা সিংহ।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—কোন বিচারক এরূপ স্থলেই আপন সমীপস্থ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে পারেন যে স্থলে ঐ সাক্ষ্য তাঁহার সহিত একত্রে ও একসময়ে আসীন অন্যান্য তুল্য রূপ বিচারকগণের দ্বারা নিরপেক্ষ রূপে বিবেচিত হইতে পারে এবং অবশ্যই হইবে।

সেশন জজ সাক্ষী হইতে পারেন, এবং তিনি সাক্ষ্য দিলেই যে, তাঁহার তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার বাধা হইবে, এমত নহে।

যে সেশন জজ কোন আসামীর বিচার করেন তাঁহাকে ঐ আসামী এমত কোন বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বলিতে পারে যাহা সে আপন অনুকূল বিবেচনা করে।

যে সেশন জজ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন, ঐ অভিযোগের বিষয়ে তাঁহার কোন শারীরিক বা অর্থ-ঘটিত সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি জুরির সাহায্য ব্যতীতও পরে তাহার বিচার করিতে অক্ষম হইবেন না।

বিচারপতি নর্ম্যান।—শ্রীহট্টের জজ এই আসামীর বিচার করেন এবং আসেসরগণের সহিত একমতে তাহাকে গৌরকিশোর নামক এক ব্যক্তির ডাকাইতীর অপরাধের বিচারে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধী সাব্যস্ত করেন। সে কঠিন পরিশ্রম সহ চারি বৎসর কারাবাস দণ্ডপ্রাপ্ত হয়।

সে আপীল করে।

গৌরকিশোরের বিচারে আসামী যে সাক্ষ্য দেয় তাহা ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয় এবং জজ তাহা ইংরেজীতেই লিখিয়া লয়েন।

এই বর্ণনা মিথ্যা বলিয়া কথিত হয় যে, সে ৯ ই পৌষ তারিখে শ্রীহট্টের জেলা হইতে যায়, ১০ ই তারিখে দেওয়াদিগ নামক এক স্থানে পৌঁছে, ১১ ই পৌষ তারিখে দেওয়াদিগ ছাড়ে এবং ১২ ই তারিখে শ্রীহট্টে ফিরিয়া আইসে।

জজ কোবরণ সাহেব এই সাক্ষ্য মিথ্যা জানিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন এবং সাক্ষী স্বরূপে তাঁহার জবানবন্দী মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত হয়। মাজিষ্ট্রেট আসামীকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারা মতে, বিচারকার্য্যে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে সেশনে অর্পণ করেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে শ্রীহট্টের জজ স্বরূপে কোবরণ সাহেবের নিকট উপস্থিত হয়।

মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অভিযোগে আসামীর সেশন আদালতের বিচারে জজ কোবরণ নিজে শপথ করিয়া সাক্ষী স্বরূপে জবানবন্দী দেন এবং তিনি আসামীর যে জবানবন্দী লইয়াছিলেন তাহা দাখিল এবং সপ্রমাণ করেন। উক্ত জবানবন্দীতে মাসের নাম নাই। আসামী মণিপুরবাসী, এবং সে আপন জওয়াবে তর্ক করে যে, সে মণিপুরের কোন এক মাসের ৯ ই, ১০ ই ১১ ই এবং ১২ ই তারিখের কথা বলিয়াছে।

কিন্তু জজ সপ্রমাণ করেন যে, লিখিত জবানবন্দীতে প্রকাশ না থাকিলেও, আসামী পৌষ মাসের কথা বলে।

এক্ষণে, একমাত্র প্রশ্ন এবং অতি গুরুতর ও কঠিন প্রশ্ন এই যে, কোন সেশন জজ জুরির সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং আইন ও বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয়ের বিচারক স্বরূপে কোন মোকদ্দমার বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিজে সেই মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে পারেন কি না?

রাজ-হন্তা কর্নেল হ্যাকারের মহাপরাধের বিচারে (রাজসম্বন্ধীয় বিচারের ৫ ম ভালমের ১১৮১ পৃষ্ঠার টীকা, দ্রষ্টব্য) সেক্রেটরী মেং মরিস এবং লর্ড এনেসলী, আসামীগণের বিচারের কমিশনে নিযুক্ত হইয়া বিচারাসন হইতে নামিয়া শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য দেন। আদালত একমত হইয়া বলেন যে, তাঁহারা উত্তম সাক্ষী। তাঁহারা যে সকল আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন তাহা-

দের বিচারের সময় তাঁহারা আর বিচারাসন গ্রহণ করেন না। পিট টেলর বলেন—“যে “বিচারপতির নিকট কোন মোকদ্দমার বিচার “হয়, তিনি শপথ করিয়া সাক্ষ্য না দিলে, “যে বৃত্তান্ত তাঁহার জানা থাকে তাহা তাঁহাকে “গোপন করিতে হইবে; সুতরাং তিনিই একাকী “বিচারাসনে থাকিলে তিনি সাক্ষী স্বরূপে সাক্ষ্য “দিতে পারেন না।” এতদর্থে তিনি লুইসি- “য়ানার সুপ্রীমকোর্টের নিষ্পন্ন রস্ বনাম “বক্‌লরের মোকদ্দমা দর্শান:—“কোন বিচার- “পতি অন্যান্য বিচারপতির সহ একত্রে আসীন “হইলে তাঁহার শপথপূর্ব্বক জবানবন্দী লওয়া “যাইতে পারে। শেষোক্ত স্থলে কোন বিচার- “পতি ঐ অবস্থায় সাক্ষ্য দিলে, তাঁহাকে বিচারা- “সন পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বিচার সম্বন্ধে আর “কোন কার্য্য না করা কর্ত্তব্য, কারণ, তাঁহার “নিজের সাক্ষ্যের গ্রহণ-যোগ্যতা এবং অপরের “সাক্ষ্যের সহিত তাহা তুলনা করা সম্বন্ধে “তিনি যে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে সমর্থ “হইবেন, এমত বিবেচনা হইতে পারে না।”

টেলর সাহেব বোধ হয় বিবেচনা করেন যে, জুরি ও পার্লেমেণ্টের পীয়ারগণ যাঁহাদিগকে যেমন জজের ন্যায় সেই রূপ জুরির ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে, তাঁহাদের ও জজের মধ্যে কিছু প্রভেদ থাকিতে পারে।

একটি প্রসিদ্ধ নিয়ম এই যে, জুরির কোন ব্যক্তির শপথপূর্ব্বক সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে, এবং তিনি সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়াই যে, তিনি জুরি স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইতে, এবং মত প্রকাশ করিতে পারিবেন না, এমত নহে। ঐ প্রকারের এক মোকদ্দমা বাইনারের প্রমাণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের চুম্বকে বর্ণিত আছে, এবং মেরিস্থিথের বিচারে (১৮ বালম ষ্টেট ট্রায়েলের ১২৩ পৃষ্ঠা) প্রোবি নামক এক জন জুরর শপথ করিয়া আদালতে এবং জুরির আর আর ব্যক্তিদের নিকট সাক্ষ্য দেন। পার্লেমেণ্টের প্রধানতম বিচারা- লয়ের বিচারে যে সকল পীয়ারগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, তাঁহারা পরে পীয়ারদিগের হুকুমে আপন আপন মত দেন, যথা, ৭ বালম ষ্টেট ট্রায়েলের ১৩৮৪ পৃষ্ঠা লিখিত লর্ড ষ্টাফোর্ডের মোকদ্দমা দেখ।

তৃতীয় উইলিয়মের রাজত্বের সময়ে এটর্নী জেনরেল সর জন হল্‌স্ বলেন—“সকলেই জানে “যে, কোন জজ তাঁহার সমীপস্থ দেওয়ানী “মোকদ্দমার বিচারে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য হই- “য়াছেন, কারণ, ঐ বিশেষ স্থলে জজ আর জজ “স্বরূপে থাকেন না, এবং সাক্ষী স্বরূপ হয়েন, এবং “যদিও তিনি পরে আপন ক্ষমতা প্রাপ্ত হন “এবং জুরির মতের বিচারক হন, তথাপি “তাঁহার সাক্ষ্য জুরিকে বিচার করিতে হয়। “১১ বালম হাউলের ষ্টেট ট্রায়েলের ৪৫৯ “পৃষ্ঠা।” পূর্ব্বে যে কর্ণিসের মোকদ্দমার উল্লেখ করা হইয়াছে (১১ বালম ষ্টেট ট্রায়েল ৪৫৯ পৃঃ) তাহাতে সর জন হল্‌স্ আরো বলেন যে, “কর্ণিস কি সহজে এক জন সাক্ষী দিয়া সপ্র- “মাণ করিতে পারিত না যে, ঐ সাক্ষী, লর্ড রসে- “লের বিচারে রামজেকে শপথ করিয়া বলিতে “শুনিয়াছে যে, সে এজহার পড়িবার সময়ে “উপস্থিত ছিল না। যে সকল বিচারপতি তাহার “বিচার করেন, এবং যে সকল রাজ-কৌন্সেল “তাহার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁহারা কি লর্ড “রসেলের বিচারে উপস্থিত ছিলেন না, এবং “সে কি উক্ত বিষয় সপ্রমাণার্থে তাঁহাদের উপর “সপিনা জারী করিতে পারিত না; এবং “সপিনা ব্যতীতও কি তাঁহাদের তাহা ব্যক্ত করা “কর্ত্তব্য ছিল না?”

কিন্তু উক্ত মোকদ্দমায় যদি ক্রমানুয়ে সমস্ত জজের সাক্ষী স্বরূপে জবানবন্দী লওয়া হইত তথাপি জুরি তাঁহাদের প্রমাণ দৃষ্টে বৃত্তান্তের জজ স্বরূপে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতেন।

কর্ণেল হ্যাকারের মোকদ্দমায় সর জন হকিন্স বলেন—“বোধ হয় এবিষয়ে সকলে সম্মত যে, “কোন ব্যক্তি কোন আসামীর বিচারক বলি- “য়াই যে, তাহার অনুকুলে বা প্রতিকুলে তাঁহার

"সাক্ষ্য দিবার বাধা হইবে, এমত নহে।" * *

বেষ্ট ঐ মোকদ্দমার উল্লেখ করিবার কালে বলেন, মরিস এবং লর্ড এনেস্লীর আচরণ স্বত্ব-জনিত না হইয়া বরং স্পৃহা এবং সদাশয়-জনিত হইয়া থাকিতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও, কথিত প্রত্যেক মোকদ্দমায় স্বীকার করিতে হইবে যে, যে জজ সাক্ষ্য দেন, তাঁহার প্রমাণ তিনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির রায়ের নিমিত্ত অর্পিত হইত। তাহাতে নিশ্চয়ই এই পর্য্যন্ত প্রতিপন্ন হয় যে, কোন বিচারক কেবল এমত স্থলেই তাঁহার নিজের নিকট উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে পারেন, যে স্থলে তাঁহার সহিত এক সময়ে ও একত্রে আসীন তুল্য ক্ষমতাপন্ন অন্য বিচারকের নিরপেক্ষ মতের জন্য ঐ প্রমাণ অর্পিত হইতে পারে, এবং অবশ্যই হইবে।

১৮৫৫ সালের ২ আইনের ১৪ ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, "কেবল নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণই সাক্ষ্য দিতে অযোগ্য হইবে," যথা—

"১।—যে যে বৃত্তান্তের বিষয়ে জবানবন্দী "লওয়া যায়, তাহার প্রকৃত ভাব মনে গ্রহণ করিতে "কিম্বা তাহা যথার্থ মতে ব্যক্ত করিতে যাহা-"দিগকে অপারগ বোধ হয়, এমত সাত বৎসরের ন্যূন বয়সের বালকগণ। —অসুস্থমনাঃ যে "ব্যক্তিদের জবানবন্দী লওয়ার সময়ে যে বৃত্তান্ত "বিষয়ে জবানবন্দী লওয়া যায়, তাহার প্রকৃত "ভাব মনে গ্রহণ করিতে কিম্বা তাহা যথার্থ মত "ব্যক্ত করিতে অপারগ বোধ হয়, এমত অসুস্থ-"মনাঃ ব্যক্তিগণ।"

কোন জজের তাঁহার নিজের নিকট উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়া সম্বন্ধে কোন বর্জ্জিত বিধি করা হয় নাই।

দেখা যাইতেছে যে, এই আইন জারী হইবার পর তারাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের মোকদ্দমায় (নেজামত আদালতের ১৮৫৭ সালের ২ য় ভাগ রিপোর্টের ৮৩ পৃষ্ঠা) সেশন জজকে সাক্ষী মান্য করাতে তিনি সাক্ষ্য দেওয়ায়, এই স্থির হয় যে, জজের বিচারাধিকারে দোষ স্পর্শে নাই। ইহা বলা উচিত যে, ঐ মোকদ্দমায় বিচার কাজীর সহায়তায় হয়; তিনি আসামীকে খালাস দিবার বা অপরাধী সাব্যস্ত করিবার ফতওয়া দিতে পারিতেন। যদি জজ উক্ত ফতওয়া অগ্রাহ্য করিয়া এই বিবেচনা করিতেন যে, উক্ত কাজী খালাসের জন্য ফতওয়া দেওয়াতেও আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা উচিত, তবে তিনি নিজে আসামীকে দণ্ড দিতে পারিতেন না; তাঁহাকে ঐ মোকদ্দমা নেজামত আদালতে প্রেরণ করিতে হইত।—দ্রষ্টব্য, ১৮১৭ সালের ২২ কানুনের ২ ধারা।

ঐ মোকদ্দমা দ্বারা দুইটি বিষয় সংস্থাপিত হইতেছে:—প্রথমতঃ, জজ যোগ্য সাক্ষী বটেন; দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার নিজের সাক্ষ্য যে প্রমাণের এক অংশ, সেই প্রমাণের বিচার করিতে তিনি নিজে সাক্ষ্য দিয়াছেন বলিয়া নিবারিত নহেন।

আমার অতি স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে সেশন জজের নিকট কোন আসামীর বিচার হয়, সে যে বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষ্য তাহার অনুকূলে হইবে বিবেচনা করে, তাহাতে তাঁহারি দ্বারা সাক্ষ্য দেওয়াইতে স্বত্ববান্।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধি প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে যখন কোন সেশন জজ কাজীর সহায়তায় মোকদ্দমার বিচার করিতেন, তখন, ১৮৫৭ সালের মোকদ্দমা এবং ইংলণ্ডের মোকদ্দমা সমস্ত দৃষ্টে বোধ হয় যে, জজ আপন বিচারাধীন মোকদ্দমায় নিজে সাক্ষ্য দিতে পারিতেন। আসেসরগণের সহায়তায় বিচারের প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় দমনের আর এক উপায় সংস্থাপিত হয়। আসেসরগণ যে মত দেন তাহা জজ লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য। জজকে বিচারের চুম্বক হাইকোর্টে পাঠাইতে হয়, এবং উক্ত চুম্বক পড়িয়া ঐ কোর্ট নথী তলব দিয়া দেখিতে পারেন। পরন্তু, আপীলে হাইকোর্ট জজের প্রমাণ দৃষ্টে নিষ্পত্তির বিচার করিয়া তাহা অন্যথা করিতে পারেন।

উপস্থিত মোকদ্দমায় বলা যাইতে পারে যে, সেশন জজই মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, উক্ত অভিযোগ জজের অনুমতি ব্যতীত হইতে পারে না, (১৬৯ ধারা)। যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার বিচার কেবল সেশন আদালতেই হইতে পারে, অতএব, সেশন আদালতে জবানবন্দী ইংরেজীতে লিখিত হওয়ায় কেবল শ্রীহট্টের জজ কোবরণ সাহেবের নিকটই এই মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে। ইহা প্রায় নিশ্চিত যে এ রূপ অনেক মোকদ্দমা অবশ্যই হইবে যাহাতে জজ এক জন আবশ্যকীয় সাক্ষী হইবেন, এবং তাঁহার সাক্ষ্য ব্যতীত মোকদ্দমা চলিতে পারিবে না।

যে মোকদ্দমায় জজ নিজেই অভিযোক্তা এবং প্রধান সাক্ষী, জুরির সহায়তা ব্যতীত তাঁহার বিচার করা অত্যন্ত অসুবিধাকর। অভিযোগের বিষয়ে যদি তাঁহার কোন শারীরিক বা অর্থঘটিত সম্পর্ক থাকে, তবে নিঃসন্দেহই তিনি তাহার বিচার করিবার অযোগ্য হইবেন। কিন্তু তাহা না হইলে, জজ যদি কেবল সরকারী কর্ম্মচারী স্বরূপে স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে ঐ অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, তিনি তাহার বিচার করিতে অযোগ্য নহেন।

আপীলে আমাদিগকে কেবল আর এই এক প্রশ্নের বিচার করিতে হইবে যে, উক্ত অপরাধ সাব্যস্ত প্রমাণ-সিদ্ধ কি না। আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত অপরাধ-সাব্যস্তের শুদ্ধতা সম্বন্ধে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা এই আপীল ডিস্‌মিস্ করিলাম।

(ব)

২৩এ এপ্রিল, ১৮৭০।

বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ, এ, গ্লবর।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম সেখ মেহেরচাঁদ।

জ্ঞান-কৃত বধের অভিযোগে ঢাকার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্ত্তৃক বিচারিত।

চুম্বক।—ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩৬৬ ধারা মতে, মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তির যে জওয়াব গৃহীত হয়, তাহা আসামীর অনুকূলেই হউক বা প্রতিকূলেই হউক, সেশন আদালতের বিচারে প্রমাণ স্বরূপে উপস্থিত করিতে হইবে; তাহা দাখিল করা না করা অভিযোক্তার বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, এবং সে তাহা দাখিল না করিলে আদালতের তাহা তলব দিয়া লওয়া উচিত।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—খুনের অব্যবহিত পরেই গ্রামের লোকের নিকট আসামীর তাহা স্বীকার করা, এবং আর আর প্রমাণ দৃষ্টে, আসামীর প্রতি যে জ্ঞান-কৃত বধের অভিযোগ হয় তাহা যে, সে করিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ থাকে না, এবং এ মোকদ্দমায় আইনের লিখিত চরম দণ্ড কেন দেওয়া হয় নাই, আমরা তাহার কোন কারণ দেখিতেছি না; কারণ, প্রমাণ দৃষ্টেই অনেক স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, আসামী আপন বাটীতে মৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবার জন্য এক কৌশল করে, এবং যদিও আসামীর স্ত্রীর সহিত মৃত ব্যক্তির সহযোগ থাকায় যথেষ্ট ক্রোধোৎপাদনের কারণ ছিল, তথাপি উক্ত সহযোগ থাকিবার বিষয় সে বহুকালাবধি জানিত; সুতরাং সেই ক্রোধ হঠাৎ উৎপন্ন হয় নাই, অথবা খুনের সময়ে উক্ত সহযোগ সম্বন্ধীয় কোন প্রত্যক্ষ কার্য্যও হয় নাই।

আসামীর স্ত্রী, যে এ বিষয়ে গুরুতর প্রমাণ দিতে পারিত, সে কোন কথা না বলায় অভিযোগের পক্ষের মোকদ্দমা কিছু দুর্ব্বল হয় বটে,

কিন্তু উক্ত মোকদ্দমা তাহার সাক্ষ্য ব্যতীতই স্পষ্ট প্রবল।

আর এক জন প্রধান সাক্ষী ধনাই নামক একটি বালক যে, মৃত ব্যক্তিকে যে স্থানে বধ করা হয়, সেই স্থানে তাহাকে ডাকিয়া আনে বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহার জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, এবং তাহার জবানবন্দী কেন লওয়া হয় নাই তাহা ব্যক্ত নাই।

জজ অভিযোগের পক্ষের প্রমাণ গ্রহণের পর বলেন যে, মাজিষ্ট্রেটের নিকট আসামীর যে জওয়াব গৃহীত হয়, তাহা অভিযোক্তার উকীল দাখিল করেন না, এবং সেই জন্য তাহা মোকদ্দমার সেই সময়ে পঠিত হয় নাই। জজ তাহা অন্য কোন সময়ে পড়েন কি না, তাহা জানা যায় না। বোধ হয় তিনি তাহা পড়েন; কিন্তু উপর্যুক্ত স্থানে তাহা না পড়িবার কোন উদ্দেশ্য জানা যায় না। অভিযুক্ত ব্যক্তির জওয়াব দাখিল করা কি না, তাহা অভিযোক্তার উকীলের বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, কারণ, ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩১৬ ধারায় স্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তির যে জওয়াব গৃহীত হয়, তাহা বিচারের সময়ে প্রমাণ স্বরূপে প্রদর্শিত হইবে। ব্যবস্থাপক সমাজের অভিপ্রায় এই বোধ হয় যে, উক্ত জবানবন্দী আসামীর অনুকূলেই হউক বা প্রতিকূলেই হউক, প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব অভিযোক্তার কৌন্সেল তাহা দাখিল না করিলে, জজের তাহা তলব দিয়া লওয়া উচিত।

উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত এবং দণ্ডাজ্ঞা স্থির থাকিবে।

**বিচারপতি গ্লবর।**—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

---

২৩ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডব্লিউ মার্কবি।

আমীর চাঁদ নোহাটা, দরখাস্তকারী।

বাবু মোহিনীমোহন রায়, দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করে, তৎসমুদায়েরই জবানবন্দী লইতে মাজিষ্ট্রেট ফৌঃ কাঃ বিধির ২৭৬ ধারা মতে বাধ্য।

**বিচারপতি বেলি।**—এ মোকদ্দমায় আমীর চাঁদ নোহাটার সাত জন সাক্ষীর প্রতি সমন না দেওয়া এবং তাহাদের জবানবন্দী না লওয়া সম্বন্ধে মালদহের মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন, এবং যাহা জজ স্থির রাখেন, তাহা অন্যথা করিবার নিমিত্ত তাহার উকীল আমাদের নিকট প্রার্থনা করেন।

আমরা গত ৭ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এই হেতুবাদে কাগজ তলব দেই যে, মাজিষ্ট্রেট অন্যায় রূপে প্রার্থীর মানিত কয়েক জন সাক্ষীর প্রতি সমন করিতে অস্বীকার করেন। মাজিষ্ট্রেট বলেন যে, তিনি ঐ সকল সাক্ষীকে সমন করা আবশ্যকীয় বোধ করেন না।

যাহা হউক, নিম্ন আদালতে উকীল যাহা বলেন, এবং যাহা শুদ্ধ রূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট সার্টিফিকেট দিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে, দরখাস্তকারী যে আপত্তি করে যে, সে তাহার রাইয়ৎ দ্বারা দখীলকার ছিল, তাহা সপ্রমাণার্থে উক্ত উকীল বা মোক্তার ছয় জন সাক্ষী মান্য করেন, এবং উক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট বলেন যে, ঐ সকল সাক্ষী উপস্থিত ছিল, অর্থাৎ তাহাদিগকে আদালতে "উপস্থিত করা" হইয়াছিল।

জজ তাঁহার হুকুমে বলেন যে, "আসামী উক্ত "ভূমিতে দখীলকার থাকার বিষয়ে যে সকল "সাক্ষী দেয়, মাজিষ্ট্রেট যে তাঁহাদের জবানবন্দী "লয়েন না, এই আপত্তি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, "তাহাতে কোন ফল নাই, কারণ, ৩১৮ ধারা-"নুযায়ী কার্য্যেই উক্ত বিষয় পূর্ব্বে তাহার বিরুদ্ধে "নিষ্পন্ন হইয়াছে।" মাজিষ্ট্রেট যে "সমন" শব্দ ব্যবহার করেন এবং যাহা আমাদের নথী

তলব দেওয়ার হুকুমে উক্ত হইয়াছে এবং জজ যে তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ অর্থাৎ "জবানবন্দী লওয়া" শব্দ ব্যবহার করেন, ইহা এ মোকদ্দমায় অতি গুরুতর বিষয়, কারণ, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৬২ ধারা মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুকূলে যে ব্যক্তির গুরুতর সাক্ষ্য দিবার সম্ভাবনা থাকে তাহাকে উপস্থিত করাইবার জন্য মাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে সমন দিতে পারেন। কিন্তু ঐ আইনের ২৬৬ ধারা মতে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার না করে, তবে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের এবং সে আপন পোষকতায় যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করে তাহাদের বাক্য শুনিতে বাধ্য; (তাহাতে "শুনিবেন" শব্দ আছে)।

জজ যে বলেন যে, আসামীর পক্ষে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করা হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাদের জবানবন্দী লয়েন নাই, তাহা যদি আমরা শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করি, তবে তিনি যে হুকুম দেন যে, উক্ত আপত্তি ফলদায়ক নহে, তাহা ২৬৬ ধারার বাক্যের বিপরীত; এবং আমীরচাঁদ দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে ৩১৮ ধারামতে পূর্ব্বে কোন কার্য্য হইয়া থাকুক বা না থাকুক, ২৬৬ ধারার আদেশ অবিকল্পই থাকে। এতদর্থে আমার বিবেচনায়, জজের হুকুম অন্যায়।

তাহা ছাড়াও. আমি বিবেচনা করি যে, মাজিষ্ট্রেট যে "সমন" শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহার লিখিবার ভ্রম, কারণ, দরখাস্তকারীর মোক্তারের যে বর্ণনা মাজিষ্ট্রেট শুদ্ধ রূপে লিখিত হওয়ার সার্টিফিকেট দেন, তাহা হইতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, যে ছয় জন সাক্ষীর আদালতে 'উপস্থিত' থাকিবার কথা ঐ মোক্তার বলেন, তাহাদের জবানবন্দী লইবার জন্য তিনি প্রার্থনা করেন। এ কথা যথার্থ হইলে (এবং তাহার বিরুদ্ধে স্পষ্ট কোন বাক্য নাই) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছে, সুতরাং আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এমত অবস্থায় ২৬৬ ধারা মতে, তাহাদের জবানবন্দী লইতে অস্বীকার করিবার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল না।

অতএব এ মোকদ্দমা এই জন্য জজের নিকট ফেরৎ যাইবে যে, তিনি তাঁহার রায় পুনরায় বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং এমত হুকুম দিবেন, যাহা তাঁহার বিবেচনায়, আমাদের উপরোক্ত বাক্য এবং ২৬২ এবং ২৬৬ ধারা দৃষ্টে উচিত বোধ হয়।

বিচারপতি মার্কবি।—আমিও বিবেচনা করি, জজ যে, আপীলের হুকুমে বলেন যে, আসামী উক্ত ভূমিতে দখীলকার থাকা সম্বন্ধে যে সকল সাক্ষী দেয় মাজিষ্ট্রেটের তাহাদের জবানবন্দী না লওয়ার আপত্তি, উক্ত বিষয় পূর্ব্বেই ৩১৮ ধারা অনুযায়ী কার্য্যে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, কোন কার্য্যের নহে, তাহা আইন অনুসারে অন্যায়। যদি তদন্তে জানা যায়, (আমার বোধ হয় জানা গিয়াছে) যে সাক্ষিগণ আদালতে উপস্থিত ছিল এবং তাহাদের জবানবন্দী লইতে প্রার্থনা হইয়াছিল তবে তাহাদের জবানবন্দী লওয়া না লওয়া সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের কোন ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল না। এই বিষয় অল্প দিন গত হইল এই আদালতের অন্য এক খণ্ডাধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে বিচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই হেতুবাদে নথী তলব দেওয়া হয় নাই। কোন কোন সাক্ষীর প্রতি সমন না হওয়ায় নথী তলব দেওয়া হয়, এবং উকীল ২৬২ ধারার উপর নির্ভর করেন। ২৬২ ধারা মতে, মাজিষ্ট্রেটের সমন দেওয়া না দেওয়ার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে কি না, তাহাতে অত্যন্ত সন্দেহ আছে। কিন্তু যে এক নূতন হেতু এক্ষণে উত্থাপিত হইয়াছে, কেবল তদনুসারেই আমি বিবেচনা করি যে, এই মোকদ্দমা অতিরিক্ত তদন্তের নিমিত্ত ফেরৎ পাঠান উচিত।

২৩ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি জি লক্ এবং সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট।

ত্রিপুরার সেশন জজ কর্তৃক ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৩৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

সরফুদ্দীন বনাম কাশীনাথ।

চুম্বক।—খএর ভূমিতে ক অনধিকার-প্রবেশ করায় খএর চাকরেরা তাহাকে ধৃত করিয়া দুই দিন পর্য্যন্ত কয়েদ রাখিবার পর খ পুলিসে সংবাদ দেয়; এ স্থলে খ এবং তাহার চাকরেরা যে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৯৭, ১০৪ এবং ১০৫ ধারা মতে আপন সম্পত্তি রক্ষার অভিপ্রায়ে তাহাকে কয়েদ রাখে, এমত বলা যাইতে পারে না।

জজের এস্তমেজাজ।—হাইকোর্টের হুকুমের জন্য আমি বাবু * * * ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যের নথী এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে ত্রিপুরার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হিউম সাহেবের এক চিঠি পাইতেছি। আমি মাজিষ্ট্রেটের সহিত এই বিষয়ে ঐক্য হইতেছি যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যে সকল ধারা দর্শান তাহার তিনি অন্যায় অর্থ করিয়াছেন।

১৮৬৯ সালের ২১ এ মে তারিখের ২ নং সরকুলর অর্ডর অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের উক্ত বিষয়ে একেবারে হাইকোর্টে এস্তমেজাজ করা উচিত ছিল; কিন্তু এই আদালতে আপীল হওয়ায় এবং ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উল্লিখিত ধারাগুলির অন্যায় অর্থ করিয়াছেন বলিয়া আমারও হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় আমি হিউম সাহেবের এস্তমেজাজ তাঁহার নিকট ফেরৎ না পাঠাইয়া এই আদালতের এস্তমেজাজ সহ প্রেরণ করিলাম।

### মাজিষ্ট্রেটের এস্তমেজাজ।—

আমি ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের ৪৩৪ ধারা এবং প্রধানতম বিচারালয়ের ১৮৬৭ সালের ২৫ এ মার্চের ২ নং সরকুলর অর্ডর অনুসারে এই মোকদ্দমার নথী নিম্নলিখিত রিপোর্টসহ প্রধানতম বিচারালয়ে উপস্থিত করণার্থে পাঠাইতেছি।

মোকদ্দমার অবস্থা এই:—

কাশীনাথ দে নামক এক ব্যক্তি যে ভূমি তাহার তালুকের সামিল বলিয়া দাবী করে তাহাতে সরফুদ্দীন নামক এক ব্যক্তি আর কয়েক ব্যক্তির সহিত প্রবেশ করিয়া চাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাতে কাশীনাথের লোকেরা সরফুদ্দীনকে ধৃত করিয়া কাশীনাথের বাটীতে লইয়া কয়েদ করিয়া রাখে। ঐ সময়ে কাশীনাথ বাটীতে ছিল না, সে পর দিবস তাহার পক্ষের লোকের নিকট উক্ত সংবাদ পাইয়া পুলিসে সংবাদ দেয়, পুলিস ঐ বাটীতে আসিয়া আসামীকে খালাস করিয়া দিয়া কাশীনাথকে এবং তাহার যে চারিজন লোক আসামীকে কয়েদ করে তাহাদিগকে (কাশীনাথকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির ১০৯ এবং ৩৪২ ধারা, এবং তাহার সহচরগণকে ৩৪২ ধারা মতে) বিচারার্থে চালান করে।

যে পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন, তিনি ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৮০ ধারামতে এই বলিয়া সমুদায় অভিযুক্ত ব্যক্তিগণকে খালাস দেন যে, তাহাদের আত্ম সম্পত্তি রক্ষার স্বত্ব পরিচালনে সরফুদ্দীনকে কয়েদ রাখা উচিতই হইয়াছে।

আমি বিবেচনা করি যে, লোকের আত্ম সম্পত্তি রক্ষার স্বত্বের যে মর্ম্ম ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট গ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, এবং তাঁহার হুকুম ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ১০৩, ১০৪ এবং ১০৫ ধারার অন্যায় অর্থ-মূলক বলিয়া অন্যথা হওয়া উচিত। ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ নথীর সামিল পাঠান গেল।

### ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ:—

এই আদালত এ মোকদ্দমার প্রতিবাদিগণকে নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস দেন। তাহাতে মাজিষ্ট্রেট তাঁহার ৩ রা ফেব্রুয়ারির রুবকারী দ্বারা

এ আদালতের নিকট এই কৈফিয়ৎ চাহেন যে, প্রতিবাদিগণ ১০৩ ধারার কোন্ প্রকরণমত আত্মরক্ষার স্বত্ব পরিচালন করিয়াছে এবং খালাস পাইয়াছে, এবং প্রতিবাদিগণ বাদীকে কয়েদ করার বিষয় স্বীকার করা সত্ত্বেও কোন্ ধারামতে দণ্ডনীয় হয় নাই।

ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৯৭ ধারায় এই সাধারণ নিয়ম সংস্থাপিত হইয়াছে যে, অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশের স্থলে প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মরক্ষার স্বত্ব আছে। "অপরাধজনক অন-"ধিকার-প্রবেশের" ব্যাখ্যা ৪৪১ ধারায় আছে। বাদী অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশের কার্য্য করিবার কালে প্রতিবাদিগণের হস্তে পতিত হয়। যে সকল অপরাধ করিলে আততায়ীকে বধ করা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার স্বত্ব পরিচালিত হইতে পারে তাহা ১০৩ ধারায় বর্ণিত আছে। অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশ এই তালিকার মধ্যে নাই, প্রতিবাদী উক্ত স্বত্ব অনুসারে কার্য্য করে নাই।

যে সকল স্থলে অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশ হইলে ব্যক্তিবিশেষের আত্মরক্ষার স্বত্বে বধ ভিন্ন অন্য কোন হানি করা যায়, তাহা ১০৪ ধারায় বর্ণিত আছে।

১০৫ ধারায় অপরাধ-জনক অনধিকার-প্রবেশের স্থলে আত্মরক্ষার কাল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। প্রতিবাদিগণ যখন বাদীকে ধৃত করে তখনই তাহারা পুলিসে সংবাদ দেয়। আইনের এমন কোন বিধান নাই যদনুসারে, প্রতিবাদিগণ আত্মরক্ষার্থে বাদীকে ধৃত করার পরে কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট তাহাকে সমর্পণ না করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে; অতএব তাহাদিগকে পুলিস-কর্ম্মচারীর পৌঁছা পর্য্যন্ত কয়েদ রাখা হয়।

প্রতিবাদিগণ একবার এইরূপে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া অপরাধী হইতে পারে না; বিশেষতঃ প্রতিবাদিগণ যে কার্য্য করে, তাহা আত্মরক্ষার স্বত্ব পরিচালনের অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য এক অভিপ্রায়ে করা হয়।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি লক।—আদালত কাগজাদি পড়িয়া বিবেচনা করেন যে, মাজিষ্ট্রেট যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাই শুদ্ধ। অতএব আদালত এই আদেশ করেন যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম রহিত হইবে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিচার হইবে। (ব)

২৩ এ এপ্রিল, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

পূর্ব্ব বর্দ্ধমানের প্রতিনিধি সেশন জজ কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারামতে এস্তমেজাজ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম চন্দ্রশেখর রায়।

চুম্বক।—৯ম ভাগ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ৭৫ পৃষ্ঠা-প্রচারিত নজীর অন্যথা হইয়া স্থির হইল যে, কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালতের বিরুদ্ধে যে অপরাধী করা হয়, তিনি কতিপয় নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতীত, দণ্ড-বিধির ১৭৪ ধারামতে স্বয়ং তাহার বিচার করিতে পারেন না, তিনি ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৭১ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা বিচারার্থে অন্য এক মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে বাধ্য।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—আমার বোধ হয়, এই এস্তমেজাজে মাজিষ্ট্রেট যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শুদ্ধ, এবং যে সহকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালতের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ১৭৪ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করা হয়, তিনি উক্ত অপরাধের বিচার করিতে পারেন না; উক্ত অপরাধের তদন্ত করিবার যথেষ্ট হেতু আছে, এমত তাঁহার বোধ হইলে, যে মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার এবং বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহার নিকট তিনি ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৭১ ধারামতে, তদন্তার্থে মোকদ্দমা পাঠাইতে বাধ্য; এবং আমার বোধ হয়, এক্ষণে যে ধারা উক্ত হইল, তাহাতে স্পষ্টই

এরূপ মোকদ্দমা এমত এক মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবার বিধি আছে যাঁহার আদালতের বিরুদ্ধে ঐ অপরাধ করা হয় নাই।

সত্য বটে, আমি ৮ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ৬১ পৃষ্ঠা-প্রচারিত মোকদ্দমায় স্বতন্ত্র এক মত স্থির করি, কিন্তু এ বিষয় পুনরায় বিবেচনা করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, উক্ত মত অশুদ্ধ, এবং বিচারপতি হব্‌হৌস যিনি আমার সহিত ঐ মোকদ্দমার বিচার করেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া আমি বলিতেছি যে, তিনিও উক্ত নজীর অন্যথা করিতে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে যে, ১৭১ ধারার বিধানে এই সাধারণ নিয়ম আছে যে, যাঁহার কোন মোকদ্দমার সহিত সম্বন্ধ থাকে, তিনি তাহার বিচারক হইতে পারেন না। ঐ নিয়মের বর্জ্জিত বিধি ১৬১ ধারায় আছে, যাহার বিধান এই যে, প্রয়োজন অনুসারে মাল, দেওয়ানী বা ফৌজদারী যে কোন আদালত হউক, যে কোন প্রকারের অপরাধ উক্ত আদালতের সাক্ষাতে বা সম্মুখে হয়, তাহার সরাসরী বিচার তৎক্ষণাৎ করিতে পারেন; এবং ১৭২ ধারায় আছে যে, যে স্থলে ঐ রূপ কোন অপরাধ অর্থাৎ ১৬৮, ১৬৯ এবং ১৭০ ধারা-বর্ণিত অপরাধ সেশন আদালতে বা তাঁহার জ্ঞাতসারে হইলে, এবং উক্ত অপরাধ কেবল সেশন আদালতের বিচার্য্য হইলে, উক্ত আদালত ঐ অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিতে পারেন, এবং আপন অভিযোগে তাহাকে অর্পণ করিতে বা বিচারার্থে উপস্থিত করিতে বা বিচার করিতে পারেন। বোধ হয়, সেশন আদালত সম্বন্ধে ঐ বর্জ্জিতবিধি এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে হয় যে, উক্ত আদালত আসেসর বা জুরির সাহায্যে বিচার করিয়া থাকেন।

১০ ম বালম উইক্‌লি রিপোর্টরের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ৪ পৃষ্ঠা হইতে একটি নজীর দর্শান হইয়াছে। আমার বোধ হয়, যে হেতুবাদে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়, তৎসম্বন্ধে কিছু ভ্রম হইয়াছে। অতএব আমি তাহা নজীর রূপে উল্লেখ করিতেছি না; কিন্তু এই মাত্র যে সকল কারণ বর্ণনা করা গেল, তদনুসারে আমার মত এই যে, সহকারী মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং এই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না, তাঁহার ইহা অন্য এক মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারার্থে পাঠান উচিত ছিল।

বিচারপতি গ্লবর।—আমি সম্মত হইলাম।

(ব)

৭ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং ই, জ্যাক্‌সন।

নিত্যগোপাল পালিত ও দীনবন্ধু স্বর্ণকার প্রভৃতি আপেলাণ্ট।

চুম্বক।—কয়েদীদিগের আপীলের দরখাস্ত প্রণয়নার্থে সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—আসামীগণ আপীল করিয়াছে। আদালত অনুরোধ করেন যে, আসামীগণকে আইনের আদেশ মতে দরখাস্ত দ্বারা আপীল দাখিল করিতে এবং যে সকল হেতুবাদে তাহারা আপীল করিতে চাহে, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। যে কর্ম্মচারীর প্রতি জেলের ভার ছিল, তিনি বলেন যে, তিনি ঐ সকল হুকুম আপেলাণ্ট-গণকে জানাইয়াছেন, কিন্তু তাহারা দরখাস্ত দাখিল করে নাই। যে কর্ম্মচারীর প্রতি জেলের ভার ছিল, তিনি বলেন না যে, আপেলাণ্টগণ তাহাদের আপীল উঠাইয়া লইয়াছে; অতএব যদি এখনও তাহাদের আপীল করিবার ইচ্ছা থাকে, এবং দরখাস্ত লিখিবার সুযোগ থাকে, তবে তাহারা যে, তাহা লিখিতে চাহিবে না, এ বড় আশ্চর্য্য। আসামীগণ তাহাদের আপীলের হেতু উল্লেখ করিতে না চাহিলেও, তাহাদের আপীল আইন অনুসারে দরখাস্তের আকারে হইবে। আসামীগণকে আপীল করিতে কোন বাধা না দিলেই যে, যথেষ্ট হইল, এমত নহে; দরখাস্ত প্রস্তুত করণার্থে তাহাদিগের

সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। তাহাদের হাতে কাগজ, কলম, কালী যাইতে না দিলে তাহারা দরখাস্ত লিখিতে পারে না; এবং তাহারা লিখিতে না পারিলে, এবং অন্য কাহাকে তাহাদের জন্য তাহা লিখিতে না দিলে, তাহারা দরখাস্ত লিখিতে পারে না।" এবং ইহার যাহাই করা হয়, তাহাতেই আসামীগণের আইন অনুসারে যে স্বত্ব আছে, তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হয়।

জজকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তিনি জেল-দারগাকে অনুরোধ করিবেন যে, সে আসামীগণের আপীলের দরখাস্ত লিখিবার সুবিধা করিয়া দেয় এবং তাহাদের দরখাস্ত পাঠাইয়া দেয়।

কয়েদীদিগের আপীলের দরখাস্ত প্রণয়নার্থে সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। ( ব )

---

৭ ই মে, ১৮৭০ ।

## বিচারপতি এল, এস, জ্যাক্‌সন এবং এফ এ, গ্লবর।

ডাকাইতীর অভিযোগে হুগলীর মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম গোপীনাথ কলু।

চুম্বক।—কোন জেলার যে জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেটের উপর সদর মহকুমার ভার থাকে তাঁহার নিকট আসামী যে অপরাধ স্বীকার করে তাহা ১৮৬৯ সালের ৮ আইন অনুসারে তাঁহার গ্রহণ করিবার বিশেষ ক্ষমতা না থাকিলেও, প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য।

অপর সাধারণের নিকট যে অপরাধ স্বীকার করা হয়, তাহা যাহার নিকট স্বীকার করা হয় সে তাহা সপ্রমাণ করিলে আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গণ্য হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্‌সন।—সহকারী মাজিষ্ট্রেট মিয়ার্স সাহেবের নিকট আসামী যে অপরাধ স্বীকার করে, তাহাই এ মোকদ্দমায় তাহার বিরুদ্ধে মূল প্রমাণ।

আসামীর অপরাধ স্বীকার গ্রহণ করিতে মিয়ার্স সাহেবের ক্ষমতা ছিল না, এই হেতুবাদে সেশন জজ উক্ত অপরাধ স্বীকার সাধারণ ব্যক্তির নিকট অপরাধ স্বীকার অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান করেন না। তাহা হইলেও, যে ব্যক্তি তাহা শুনে তাহা দ্বারাই তাহা ঐ রূপে সপ্রমাণ হইতে পারে, এবং তখন তাহা আসামী বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হইতে পারে।

কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যখন মিয়ার্স সাহেব আসামীর জওয়াব লয়েন, তখন তিনি ঐ জেলার প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং স্পষ্টই ঐ জেলার সদর মহকুমার ভার তাঁহার উপর ছিল; উক্ত ক্ষমতানুসারে তিনি প্রাথমিক তদন্ত করিতে সক্ষম ছিলেন, এবং তাহা হইলে তাঁহার লিখিত জবানবন্দী আইন অনুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে।

অপরাধ সাব্যস্ত স্থির থাকিবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আসামীর অপরাধ স্বীকার বিধিমত প্রমাণ, এবং তদনুসারে জুরি তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন। এ মোকদ্দমায় আমি দেখিতেছি যে, মিয়ার্স সাহেব অভিযুক্ত ব্যক্তির জওয়াব লইবার সময়ে প্রতিনিধি জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সুতরাং স্পষ্টই ঐ জেলার সদর মহকুমার ভার তাঁহার উপর ছিল, অতএব ১৮৬৯ সালের ৮ আইন অনুসারে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলেও তাঁহার তদন্ত করিবার ক্ষমতা ছিল; কিন্তু সেশন জজের অনুমান অনুসারে তাঁহার নিকট সামান্য কোন ব্যক্তি স্বরূপে অপরাধ স্বীকার করা হইয়া থাকিলেও, যে ব্যক্তির নিকট ঐ অপরাধ স্বীকার করা হয় তাহার দ্বারা সপ্রমাণ হইলে তাহাই আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ গণ্য হইবে।

এই আপীল অগ্রাহ্য হইল। ( ব )

৭ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি বেলি এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

মীর ইয়ার আলী, দরখাস্তকারী।

মেং আর, ই, টুইডেল দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—কাহার প্রতি অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণের অভিযোগ হইলে, ইহা সপষ্ট সপ্রমাণ হওয়া আবশ্যক যে, সে অপরাধজনক জ্ঞানে ঐ সম্পত্তি রাখিয়াছে।

বিচারপতি বেলি।—মুঙ্গেরের মাজিষ্ট্রেট ১৮৭০ সালের ৪ ঠা মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি করেন যে, আসামী মীর ইয়ার আলী অভিযোগের দ্বিতীয় দফায় বর্ণিত অপরাধে অর্থাৎ তাহার সহায়তায় যে চুরি হয় সেই সহায়তা করা হেতু অপরাধী, এবং অভিযোগের তৃতীয় দফায় বর্ণিত অপরাধে অর্থাৎ অপহৃত সম্পত্তি জানিয়া শুনিয়া শঠতা পূর্ব্বক গ্রহণ করা হেতু অপরাধী, এবং তাহাকে যে, কঠিন পরিশ্রম-সহ এক বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা এবং ১৫০৲ টাকা জরিমানা করেন এবং তাহা না দিলে কঠিন পরিশ্রম-সহ আর ছয় মাস কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা করেন, দরখাস্তকারী তাহা অন্যথা করিবার, এবং ভাগলপুরের সেশন জজ ১৮৭০ সালের ২৫ এ মার্চ তারিখে যে নিষ্পত্তি দ্বারা উক্ত হুকুম এবং দণ্ডাজ্ঞা স্থির রাখেন তাহা অন্যথা করিবার জন্য প্রার্থনা করে।

উপস্থিত দরখাস্ত ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪০৪ ধারামতে' হইয়াছে, যদনুসারে এই আদালত যখন "উচিত' বোধ করেন তখন আপন "এলাকার অন্তর্গত কোন আদালতে কোন "ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার কার্য্যের কিম্বা "ফৌজদারী বিচারকার্য্য ভিন্ন ফৌজদারী আদা- "লতের কোন অনুসন্ধানাদি কার্য্যের নিষ্পত্তিতে "আইনঘটিত কোন বিষয়ে ভ্রম হইয়াছে, কিম্বা "আইনঘটিত কোন বিষয় হাইকোর্টের বিবেচনা "করা উচিত জ্ঞান করিলে, হাইকোর্ট ঐ মোক- "দ্দমা প্রভৃতির রেকর্ড পাঠাইতে আজ্ঞা করিয়া "ঐ মোকদ্দমাতে আইনঘটিত যে কোন কথা "উত্থাপন হয় তাহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন "ও তদ্বিষয়ের যে হুকুম ন্যায্য বোধ করেন তাহা "করিতে পারিবেন।"

দরখাস্তে বলা হইয়াছে যে, জজের নিষ্পত্তি কোন বিধিমত প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত না হওয়ায় আইন সম্বন্ধে ভ্রম-মূলক; এবং কার্য্যপ্রণালীতে যখন অনেক আইন-ঘটিত ভ্রম দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তখন আমাদের বিবেচনায় এই আপত্তি সঙ্গত। প্রথমতঃ, বক্তব্য এই যে, অভিযোগে যে অপহৃত দ্রব্যের কথা বলা হইয়াছে তাহা ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির এক খানা ২০ ফুটের রেল। এক্ষণে, প্রথমতঃ; যদিও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির বহুতর কর্ম্মচারী ঐ স্থানের নিকটে, যথা জামালপুরে থাকে, এবং যদিও তাঁহাদের দুই জন কর্ম্মচারী অর্থাৎ মাল-খানার অধ্যক্ষ এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে, তথাপি উক্ত কোম্পানি অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই। উক্ত প্রমাণ দ্বারাও এই জানা যায় যে, ঐ প্রকারের রেল কখন কখন খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয় হয়, এবং ইয়ার আলী তাঁহাদের এক জন প্রধান ক্রেতা; কিন্তু তাহারা এই রেলের নিশানা দিতে পারে না।

চুরীর সহায়তা সপ্রমাণের জন্য ধানু মিঞাই অভিযোক্তার পক্ষের প্রধান সাক্ষী। মাজিষ্ট্রেট নিজেই বলেন যে, এই সাক্ষী অতি-অনভিজ্ঞ এবং তাহার বাক্য অসংলগ্ন এবং পরস্পর বিরোধী; কিন্তু ইহা ছাড়াও, মাজিষ্ট্রেট বা সেশন জজ কেহই তাহাকে বিশ্বাস করেন নাই। তাহার সাক্ষ্য এই যে, আসামী ইয়ার আলী (যাহাকে ধনী এবং যাহার চরিত্রে পূর্ব্বে কখন কোন দোষারোপ করা হয় নাই বলিয়া সকলেই স্বীকার করে) আপন লোকদিগকে ডাকিয়া ঐ রেল খানা চুরী করিয়া আনিতে বলে। জজ অপরাধ-স্বীকা-

রক আসামীদের প্রমাণের উপর নির্ভর করেন না, এবং বাস্তবিকই কোন বিধিমত প্রমাণ নাই। অতএব আসামীকে এই অভিযোগে বিধিমতে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।

উক্ত রেল শঠতা পূর্ব্বক অর্থাৎ অপরাধ-জনক জ্ঞানে রাখিবার অভিযোগ সম্বন্ধেও কোন বিধিমত প্রমাণ নাই। এ বিষয় বোধ হয় আস্কার আলী নামক এক জন পয়েন্টস্‌ম্যান দ্বারা উত্থাপিত হয়। সে মাজিষ্ট্রেটের নিকট বলে যে, সে পুলিসের নিকট এ কথা বলে নাই যে, ঐ রেল লইয়া যাইতে সে দেখিয়াছে, অভিযোক্তাও এমত সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পায় না যে, সে তাহাই বলে। উক্ত সাক্ষী তাহা বাস্তবিক দেখিয়া থাকিলে, অভিযোক্তার ইহা সপ্রমাণ করা অত্যাবশ্যক ছিল। কখন এবং কি নিমিত্ত সে ঐ স্থানে প্রথমে যায়, কি কারণে সে চুরী হওয়ার অনুমান করে, সে যে ফ্লয়েডের মুন্সী তাস্‌রুল্লাকে ইহা জানাইতে গৌণ করে, এতৎসম্বন্ধে সে যে প্রমাণ দেয়, তাহা ইয়ার আলীর অপরাধ-জনক জ্ঞানের কোন প্রমাণই নহে। সে তারিখ এবং ঘণ্টার কথা বিশেষ করিয়া বলে, কিন্তু কোন্ তারিখে সে সাক্ষ্য দেয় তাহা সে জানে না।

পরে যে ব্যক্তি (জাসিমল্লা) সাক্ষ্য দেয় তাহার কথা পরস্পর বিরোধী, এবং তাহাতে ইয়ার আলীর প্রতি অপরাধ-জনক জ্ঞানের কোন দোষ স্পর্শে না। চিহ্ন দৃষ্টে উক্ত রেল কতক দূর বহন করিয়া এবং কতক দূর ঘাসের মধ্য দিয়া টানিয়া লইবার প্রমাণ কোন প্রমাণই নহে, কারণ, এক খানা কাষ্ঠের দ্বারাও ঐ প্রকারের চিহ্ন হইতে পারে। ঐ রেল লুক্কাইয়া রাখার নির্দ্দেশ সম্বন্ধে, স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, ইয়ার আলী অনুসন্ধানের সময়ে উপস্থিত ছিল না; শ্যামচাঁদ নামক এক ব্যক্তিই বাস্তবিক অনুসন্ধান করে, এবং তাহাকে একেবারেই ডাকা হয় নাই; এবং তাহার পর উক্ত ফ্লয়েড তদন্তে রত হয়, পুলিস নহে। যে সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তি ঐ অনুসন্ধানে উপস্থিত ছিল বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের কাহারই জবানবন্দী গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ইহা ছাড়াও, ইয়ার আলীর কারখানায় (যে খানে সে সচরাচর থাকে না বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে) ঐ রেল পাওয়া যাওয়াতে অবশ্যই ইয়ার আলীর অপরাধ-জনক জ্ঞান ছিল, এই নিষ্পত্তি, আমার মতে বিধিমত প্রমাণ-ঘটিত প্রতারণা-মূলক নহে।

প্রধান এক কথা এই যে, ফ্লয়েড পূর্ব্ব দিবস সমস্ত সংবাদ পাইয়া এবং পুলিস কর্ম্মচারী আর্স্কিনের সঙ্গে থাকিয়াও উক্ত বিষয় তখন প্রকাশ না করিয়া তাহার পর দিবস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। পুলিসের কার্য্য এবং পক্ষগণের মধ্যে যে দলীল লিখিতপড়িত হয়, তাহাও দেখিতে হইবে। সমুদায় অবস্থা দৃষ্টে, আমরা বিবেচনা করি যে, শঠতা-পূর্ব্বক অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার অভিযোগে ইয়ার আলীর অপরাধ সাব্যস্ত স্থির রাখিবার কোন বিধিমত প্রমাণ নাই।

ইহাও বক্তব্য যে, আসামীর এক স্পষ্ট আপত্তি এই যে, আসামী তাহার উকীলের উপর জওয়াব দিবার ভার দিয়াছে বলিয়া, তাহার অপরাধ-জনক জ্ঞান অনুমান করা আইন-ঘটিত ভ্রম। তাহা গ্রহণ করিতে হইলে তাহার অনুকূলে অনুমান স্বরূপে গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ হয়। যে আসামী তাহার বাটীতে কোন দ্রব্য থাকার যথেষ্ট কারণ না দর্শাইতে পারে, তাহার অপরাধের বিষয় অনুমান এই বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করে যে, মোকদ্দমার আর আর অবস্থা দৃষ্টে বাস্তবিক এবং যথার্থ রূপে ঐ অনুমান হইতে পারে কি না। এ মোকদ্দমায় পূর্ব্বেই দর্শান হইয়াছে যে, তাহা হয় না।

আসামী যখন পুলিস-কর্ম্মচারিগণকে তাহার বাটীর মধ্যে এই জিজ্ঞাসা করিতে দেখে যে, "এ কি," তখন আমার কোন দোষ নাই, এ কথা বলায়ই তাহার প্রতি যে দোষারোপ করা হয়, তৎসম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে।

এ বিষয় সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। সেশন জজের এবং মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অন্যথা করিবার পক্ষে আইন-ঘটিত যথেষ্ট ভ্রম আছে; অতএব তাহা অন্যথা করা গেল।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্মত হইলাম। যে কারখানায় ঐ সকল লৌহখণ্ড পাওয়া যায়, তাহা কখন ইয়ার আলী আসামীর বাসস্থান হইবার কোন প্রমাণই নাই। তাহা তাহার কর্ম্মকারদিগের বাসস্থান হইবার বিষয় স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে কিছুতেই তাহার অপরাধ-জনক জ্ঞান সপ্রমাণ হয় না। অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অভিযোক্তার সাক্ষিগণ যাহা কিছু বলিয়াছে, সে সমুদায় আমরা বিশ্বাস করিলেও, উক্ত অপরাধ ইয়ার আলীর প্রতি অর্পণ করিবার কোন বিধিমত প্রমাণ নথীতে নাই। যাহা হউক, আমি আরও বলিতে চাহি যে, আমার মতে অভিযোক্তার প্রমাণ একেবারেই অবিশ্বাস্য। ইয়ার আলীর সহিত ফ্লয়েডের যে সদ্ভাব নাই তাহা স্পষ্টই প্রকাশ আছে; অতএব আমার বিবেচনায়, ফ্লয়েডের তাহা অস্বীকার করা সত্য নহে। পরন্তু, যে ভাবে এই অভিযোগ আসামীর বিরুদ্ধে তৈয়ারি করা হয়, তাহা আসামীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অন্ততঃ, একটি সাক্ষী উপস্থিত করা, আসামীর সামাজিক অবস্থা, এবং তাহার চরিত্রের প্রমাণ যাহা মাজিষ্ট্রেট নিজেই অখণ্ডীয় বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এ সকল নিঃসন্দিগ্ধ বিষয় দৃষ্টে তাহাকে যে ষড়যন্ত্র করিয়া অপরাধী করা হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই; অতএব আমি স্পষ্টই খালাসের হুকুম দিলাম। (ব)

১৪ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এফ, বি, কেম্প এবং এবং ই, জ্যাক্সন।

রাজসাহীর সেশন জজ কর্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৪ ধারামতে এস্তমেজাজ।

বনওয়ারীলালের পক্ষে মোহন সরদার

বনাম

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নায়েব অভয়চরণ মুখোপাধ্যায়।

মেং আর, টি, এলেন এবং বাবু তারকনাথ দত্ত দরখাস্তকারীর উকীল।

বাবু শ্রীনাথ দাস প্রতিপক্ষের উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে কোন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কোন প্রমাণ না লইয়া ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬২ ধারামতে কোন এক হাটের দিন পরিবর্ত্তন করেন, এবং পরে প্রমাণ লইয়া দেখেন যে, তাঁহার প্রথম হুকুম অন্যায় এবং ক্ষমতা অভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার ঐ প্রথম হুকুম রহিত করা সম্মত কার্য্যই হয়।

বিচারপতি কেম্প।—প্রকাশ যে, বনওয়ারী লাল এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জমিদারদ্বয় কোন এক বহতা নদীর দুই ধারে তাঁহাদের আপন আপন জমিদারীতে দুই হাট বসান। দেখা যায় যে, ঐ দুই হাট এক দিনে হওয়ায় বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাটের দিন পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায়ে ৬২ ধারা মতে কার্য্য করা হয়। নাটোরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কেবল পুলিসের রিপোর্ট দৃষ্টে, আর কোন প্রমাণ না লইয়া; প্রথমতঃ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাটের দিন পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন। পরে প্রমাণ লইয়া সেই ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, শান্তিভঙ্গের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, অতএব প্রমাণ শ্রবণ করিয়া হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন, এবং তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম ক্ষমতা-বহির্ভূত বলিয়া রহিত করত এই হুকুম দেন যে, ঐ দুই হাট পূর্ব্বের ন্যায় এক দিবসেই হইবে। আমরা বিবেচনা করি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের প্রথম হুকুম ক্ষমতা ব্যতীত এবং প্রমাণা-ভাবে প্রদত্ত

হইয়াছিল দেখিয়া, এবং জমিদারগণের আপন জমিদারীর মধ্যে কোন এক দিবসে হাট বসাইবার যে অধিকার আছে, তৎপ্রতি যে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কার এক মাত্র হেতুতে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে সক্ষম, প্রমাণ দৃষ্টে সেই আশঙ্কার কোন কারণ নাই দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব হুকুম পরিবর্ত্তন বা রহিত করা সঙ্গতই হইয়াছে। আমরা বিবেচনা করি, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট যখন দেখিতে পাইয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বের হুকুম অবিবেচনা-মূলক এবং প্রমাণ ব্যতীত হইয়াছিল, এবং প্রমাণ লইয়া যখন তিনি দেখিতে পাইয়াছেন যে, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাটের দিন পরিবর্ত্তন করিবার উচিত এবং যুক্তিসিদ্ধ কারণ ছিল না, তখন তাঁহার ঐ পূর্ব্ব হুকুম তৎক্ষণাৎ রহিত করা অতি সঙ্গত এবং যথার্থ কার্য্যই হইয়াছে। অতএব আমরা ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের দ্বিতীয় হুকুম স্থির রাখিয়া এ মোকদ্দমার কাগজাত ফেরৎ পাঠাইলাম। (ব)

---

১৪ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এইচ, বি, বেলি এবং ডব্লিউ মার্কবি।

চব্বিশ-পরগণার সেশন জজ কর্ত্তৃক ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪১৪ ধারা মতে এস্তমেজাজ।

উত্তমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বনাম রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

**চুম্বক।**—যে হুকুম একবার দিলে স্বভাবতঃই তাহার ফল আর খণ্ডিত হইতে পারে না, ফৌঃ কাঃ বিধির ৬২ ধারা মতে কোন মাজিষ্ট্রেট ঐ রূপ হুকুম দিতে পারেন না। সম্পত্তির মালিককে কেবল কোন এক রূপে তাহা ব্যবহার করিতে তিনি হুকুম দিতে পারেন; কিন্তু তজ্জেতু কতকগুলি বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দিতে তাঁহার অধিকার নাই।

**বিচারপতি মার্কবি।**—এ মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা-প্রাপ্ত এক জন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট রামচন্দ্র নামক এক ব্যক্তিকে কতকগুলি বাঁশ কাটিয়া ফেলিবার হুকুম দেন, কারণ (আমরা যেমত বুঝিলাম) ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের এই মত হয় যে, তাহা যে প্রতিবাসী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ করে, তাহার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত-জনক।

ঐ সকল বাঁশ রামচন্দ্রের নিজের ভূমিতে ছিল।

পরে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা, ৬২ ধারা অবলম্বন না করিয়া ৩০৮ ধারা মতে জুরি নিযুক্ত করাইবার চেষ্টা পাওয়া হয়। কিন্তু স্পষ্ট রূপে জানা যায় না যে, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট উক্ত দরখাস্ত পাইয়া কি করেন, কিন্তু বাস্তবিক জুরি নিযুক্ত হইয়াছিল না।

পরে, ঐ সকল বাঁশ স্থানান্তরিত না করায় রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করিবার অভিযোগ হয়, এবং তাহার ২৫ টাকা জরিমানা হয়।

উক্ত হুকুম অন্যথা করণের অভিপ্রায়ে বিবেচনার্থে সেশন জজ তাহা আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন।

এই আদালত হরিমোহন মালো এবং জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মোকদ্দমায় (১ বালম বেঙ্গল ল রিপোর্টের আপীল বিভাগের ফৌজদারী নিষ্পত্তির ২০ পৃষ্ঠা) ৬২ ধারার যে অর্থ করেন, তাহা দ্বারা তাহার কার্য্য অনেক সীমাবদ্ধ হয়। তাহাতে স্থির হয় যে, ৩০৮ ধারা-বর্ণিত কোন মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের কোন ইচ্ছাধীন ক্ষমতা নাই, তিনি উক্ত ধারার বিশেষ আদেশের অনুবর্ত্তী হইতে বাধ্য, যাহাতে ঐ সম্পত্তি স্থানান্তরিত বা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাহার মালিককে কারণ দেখাইবার সময় দেওয়ার বিধান আছে।

আমাদের সমীপস্থ মোকদ্দমা ৩০৮ ধারা-বর্ণিত কোন মোকদ্দমা নহে; অতএব ঐ নিষ্পত্তি প্রয়োগ হয় না।

এমত অনুমান করা অসম্ভব যে, ব্যবস্থাপক

সমাজ মাজিস্ট্রেটকে প্রতিপক্ষের জওয়াব না শুনিয়া এই মোকদ্দমার হুকুমের ন্যায় এরূপ কোন সরাসরি হুকুম দিতে ক্ষমতা দিয়াছেন, যদ্দ্বারা, যদি পরে জানা যায় যে, মাজিস্ট্রেটকে অন্যায়রূপে জানান হইয়াছিল এবং তিনি অন্যায় সংস্কারে কার্য্য করিয়াছিলেন, তথাপি কোন ব্যক্তির সম্পত্তির বিশেষ হানি হইবে এবং তাহা তাহার পূর্ব্বাবস্থা আর প্রাপ্ত হইবে না। আমরা বিবেচনা করি, মাজিস্ট্রেট ৬২ ধারামতে এমত কোন হুকুম দিতে পারেন না যাহা স্বভাবতঃই আর অন্যথা হইতে পারে না। সম্পত্তির মালিককে তৎসম্বন্ধে "কোন কার্য্য করিতে" হুকুম দিতে তাঁহার ক্ষমতা আছে। তাহাতে বহুতর বৃক্ষচ্ছেদন করিবার হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না।

এই আদালত ১০ ম বালম উইকলি রিপোর্টরের ৩৬ পৃষ্ঠায় প্রচারিত গোলাম দরবেশের মোকদ্দমায় প্রায় এই রূপ হুকুমই দিয়াছেন।

অতএব আমাদের বিবেচনায়, আইন-বিরুদ্ধ হুকুমমতে দণ্ড করা হইয়াছে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা এবং ডেপুটি মাজিস্ট্রেটের পূর্ব্বের হুকুম অন্যথা হইবে, এবং জরিমানা লওয়া হইয়া থাকিলে, ফেরৎ দিতে হইবে। (ব)

---

১৪ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি সর চার্লস হব্‌হৌস বারণেট এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

ত্রিপুরার সেশন জজের এস্তমেজাজ।

ইমামুদ্দীন ভীণা, আসামী, দরখাস্তকারী।

চুম্বক।—ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওয়ার অভিযোগে মাজিস্ট্রেট আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, এবং তৎসঙ্গে শান্তিরক্ষার মুচলকা দিবার হুকুম দেন। এস্থলে, ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৮ অধ্যায়মতে, ঐ মুচলকা সম্বন্ধীয় হুকুম দিতে মাজিস্ট্রেটের অধিকার থাকায়, এবং তদ্ধেতু যথেষ্ট প্রমাণ থাকায়, সেশন জজ আপীলে, পীড়া দেওয়ার অপরাধ সাব্যস্ত বহাল রাখিয়া ঐ মুচলকা লওয়ার হুকুম রহিত করিতে পারেন না।

**এ মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেটের ১৮৭০ সালের ৬ ই জানুয়ারির হুকুম এই ঃ—**

অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অপরাধের অভিযোগ হয়, যাহাতে ভয়ানক আইন উল্লঙ্ঘন দৃষ্ট হয়, তাহা সম্পূর্ণ সপ্রমাণ হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি, যে বহুকালাবধি লুক্কায়িত থাকিয়া বিচার এড়াইয়া আসিয়াছে, সে ফকীরের বেশধারী এক প্রসিদ্ধ দুষ্ট লোক; সে কালীকান্ত রায় চৌধুরী নামক এক জমিদার কর্ত্তৃক নীলের প্রদেশে অবৈধ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত ছিল।

আদালত স্থির করেন যে, ইমামুদ্দীন ভীণা উক্ত অভিযোগ-বর্ণিত অপরাধে অপরাধী, অর্থাৎ, সে চাঁদগাজী নামক এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দিয়াছে; এবং আদালত আদেশ করিতেছেন যে, উক্ত ইমামুদ্দীন ভীণা কঠিন পরিশ্রমসহ (৩) তিন মাস কয়েদ থাকিবে (এক্ষণে সে দণ্ড-বিধির ৩৪২ ধারামতে যে দণ্ড ভোগ করিতেছে তাহার শেষ হইলে ঐ মিয়াদ আরম্ভ হইবে), এবং (৫০০) পাঁচ শত টাকা জরিমানা দিবে, অথবা তাহা না দিলে, কঠিন পরিশ্রম-সহ আর তিন মাস মিয়াদ খাটিবে। এবং আদালত আর এই আদেশ করিলেন যে, ঐ মিয়াদ অন্তের তারিখ হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত শান্তিরক্ষার্থে উক্ত ইমামুদ্দীনের (৫০০) পাঁচ শত টাকার মুচলকা দিতে হইবে।

**জজ আপীলে ১৮৭০ সালের ৯ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে এই রায় দেন ঃ—**

আসামীর প্রতি যে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার নিমিত্ত মাজিস্ট্রেট যে তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, কিন্তু মুচলকা লওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয় তদুপযোগী প্রমাণ নাই। "মাজিস্ট্রেটের যদি মত হয়" এই বাক্য থাকায় তিনি ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৮০ ধারা অনুসারে হুকুম দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে ঐ মত নথীস্থ বিবরণ দ্বারা সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। এ মোকদ্দমায় যে কার্য্যের নিমিত্ত আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইয়াছে কেবল তাহাই প্রমাণ দ্বারা সংস্থাপিত হয়। তাহাতে তাহার সাধারণ অত্যাচারের কথা অথবা তাহার প্রতি এক্ষণে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, তাহা তাহার পুনরায় করিবার সম্ভাবনা থাকিবার বিষয় প্রকাশ পায় না। নথীতে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির সাধারণ চরিত্রের কোন প্রমাণ থাকিত, তবে আমি হস্তক্ষেপ করিতাম না; কিন্তু ২৮০ ধারাতে মাজিস্ট্রেটের মতের যে উল্লেখ আছে তাহাতে এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, উক্ত মত কোন বিধিমত এবং যথেষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর

করিবে। অতএব আমাকে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের হুকুমের এই অংশ রহিত করিতে হইবে। যদি জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের এই মত হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শান্তিরক্ষার জন্য বাধ্য করিতে পরে কোন কার্য্যের আবশ্যক, তবে তিনি ২৮২ ধারা মতে চলিতে পারেন এবং তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে তাহাকে সাক্ষিগণের উপর জেরা সওয়াল করিতে দিতে হইবে ; এ মোকদ্দমায় তাহা সে করিতে পারে নাই, কারণ, সে জানিতে পারে নাই যে, এ মোকদ্দমায় তাহার উপর ঐ রূপ কোন হুকুম দেওয়া হইবে। অতএব জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের হুকুম ঐ রূপে সংশোধিত হইল।

মাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ এই, যথা ঃ—

আমি ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৮০ এবং ২৮১ ধারা মতে, ১৮৭০ সালের ৭ নং মোকদ্দমার আপেলাণ্ট ইমামুদ্দীন ভীণ্ডাকে এক বৎসরের জন্য শান্তিরক্ষার্থে মুচলকা এবং প্রতিভূ দিবার যে হুকুম দেই, মহাশয় তাহা অন্যাথা করিয়া যে হুকুম দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমার জওয়াব এই যে, ঐ ধারামতে মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দেন, সেশন জজের নিকট তাহার আপীল চলে না, সুতরাং তিনি তাহা বিধিমতে অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন না ( আগ্রা সদর আদালত, কাশীনাথ, ৭ ই নবেম্বর ১৮৬১ )।

অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, মহাশয় আপনার ঐ হুকুম অন্যথা করিবেন, অথবা আমার সহিত অনৈক্য হইলে এ বিষয়ে হুকুমের জন্য প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরণ করিবেন।

সেশন জজের প্রধানতম বিচারালয়ে এস্তমেজাজ ঃ—

আমি এই জেলার প্রতিনিধি মাজিষ্ট্রেট হাইম সাহেবের অনুরোধে তাঁহার কার্য্য এবং আপীলে আমার নিষ্পত্তি প্রধানতম বিচারালয়ের হুকুমার্থে প্রেরণ করিলাম।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহা যদি আপীল ব্যতীত মাজিষ্ট্রেটের দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁহার ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৮১ ধারা মতে মুচলকা লইবার হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হইবে না ; কিন্তু এ মোকদ্দমার ন্যায় যখন অপরাধ সাব্যস্ত এবং দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারে, তখন আমি এই স্থির করিতেছি যে, উক্ত সমগ্র হুকুমের বিরুদ্ধেই আপীল চলিবে। কারণ, উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত এবং দণ্ড আপীলে অন্যথা হইলে, মুচলকা লওয়ার যে হুকুম দেওয়া হয় তাহার কি হইবে? তাহা কাজে কাজেই অন্যথা হইবে, কি মাজিষ্ট্রেট তাঁহার নিজের হুকুম রহিত করিতে পারেন? কোন হুকুমের এক অংশের বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে এবং অপর অংশের বিরুদ্ধে পারিবে না, ইহা আমার নিকট অসংলগ্ন বোধ হয়। যদি এই সংস্থাপিত হয় যে, সমগ্র হুকুমের বিরুদ্ধেই আপীল হইতে পারে, তবে সেশন জজ উচিত এবং ন্যায্য বিবেচনা করিলে তাহার যে কোন অংশের ইচ্ছা বিচার করিতে পারেন। যদি সমগ্র হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হইবে না, সংস্থাপিত হয়, তবে জজ উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত স্থির রাখিলে, মুচলকা লওয়ার হুকুমে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না, কিন্তু তিনি উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত স্থির না রাখিলে, উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত দৃষ্টে হুকুমের ঐ অংশ আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া রহিত করিবার জন্য প্রধানতম বিচারালয়ে প্রেরণ করিবার আবশ্যক হইবে। প্রিন্সেপের ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২৮১ ধারায় আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর যে মোকদ্দমার উল্লেখ হইয়াছে, তাহার টীকা দেখ।

প্রধানতম বিচারালয়ের রায় ঃ—

বিচারপতি হব্‌হৌস।—আমি বিবেচনা করি, জজের ১৮৭০ সালের ৯ ই ফেব্রুয়ারি তারিখের হুকুমের যে অংশে মুচলকা না লইবার আদেশ করা হয়, তাহা ক্ষমতা অভাবে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া অন্যথা হইবে, এবং মাজিষ্ট্রেটের ১৮৭০ সালের ৬ ই জানুয়ারির তৎসম্বন্ধীয় হুকুম অবিকল স্থির থাকিবে।

মোকদ্দমার বৃত্তান্ত এই ঃ—উভয় মাজিষ্ট্রেট এবং জজ স্থির করেন যে, আসামীগণ অভিযোক্তার শান্তিভঙ্গের অপরাধী, এবং আসামী যে বিশেষ অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হয়, মাজিষ্ট্রেট তাহার নিমিত্ত দণ্ড দিয়া, অভিযোক্তার শান্তিরক্ষার নিমিত্ত আসামীকে মুচলকা দিবারও হুকুম দেন।

ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে মাজিষ্ট্রেটের এই হুকুম দিবার অধিকার ছিল। যে এক বিশেষ শান্তিভঙ্গের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দ্বারা আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তাহা হইতে

এ হুকুম সম্পূর্ণ ভিন্ন, এবং জজ উক্ত অপরাধ সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তি এবং দণ্ড স্থির রাখায়, তাঁহার মুচলকা লওয়ার হুকুম অন্যথা করিবার অধিকার ছিল না।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমার বিজ্ঞবর সহযোগী যে হুকুমের প্রস্তাব করিলেন আমি তাহাতে সম্মত। আমি বিবেচনা করি, আমার বিজ্ঞবর সহযোগী যে ধারার উল্লেখ করেন, তদনুসারে আসামীকে শান্তিরক্ষার জন্য মুচলকা দিবার হুকুম দিতে মাজিষ্ট্রেটের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, এবং যে প্রমাণ দৃষ্টে অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তাহাতেই স্পষ্ট প্রকাশ যে, তিনি উক্ত ক্ষমতা উচিতমতেই পরিচালন করিয়াছেন। জজ এই প্রমাণ অবিশ্বাস করেন নাই, অতএব আমি বিবেচনা করি না যে, মুচলকা সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের হুকুম অন্যথা করা জজের উচিত হইয়াছে। এক হাট লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, এবং অভিযোক্তার প্রমাণে এমত সকল বৃত্তান্ত এবং অবস্থা প্রকাশ পায় যাহা হইতে উচিতমতে অনুমান হইতে পারে যে, আবার শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আছে। জজ নিজে যে প্রমাণ বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই যখন উক্ত বিষয় যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, তখন তাঁহার এমত বিবেচনা করায় আইন-ঘটিত ভুম হইয়াছে যে, ঐ রূপ কোন প্রমাণ নাই। (ব)

১৭ ই মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি জে, বি, ফিয়ার এবং দ্বারকানাথ মিত্র।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম আসান সরিফ প্রভৃতি, দরখাস্তকারী।

মেং জি, সি, পল বারিষ্টর এবং বাবু কালীমোহন দাস দরখাস্তকারীর উকীল।

চুম্বক।—যে স্থলে ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে উচিত রূপে নিয়োজিত কোন পুলিশ কর্ম্মচারী, কোন আইনবিরুদ্ধ জনতার কালে, পুলিস-কর্ম্মচারী স্বরূপে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে, সে স্থলে সে ঐ আইন-বিরুদ্ধ জনতা-ভুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিতে সক্ষম, এবং যে ব্যক্তি ঐ রূপ ধৃত ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক ছিনিয়া লইয়া ঐ পুলিস-কর্ম্মচারীকে স্বকর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধা দেয়, সে দণ্ডবিধির ২২৫ ধারামতে বিধিমত গ্রেপ্তারী হইতে ছিনিয়া লওয়ার, অপরাধী।

বিচারপতি ফিয়ার।—আমি এ মোকদ্দমায় অপরাধ-সাব্যস্তে হস্তক্ষেপ করিবার কোন বিশেষ কারণ দেখি না।

আসামীগণ প্রথমতঃ, ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ২২৫ ধারার মর্ম্মমতে, কোন ব্যক্তিকে আইন-সঙ্গত আটক হইতে উদ্ধার করিবার; এবং দ্বিতীয়তঃ, দণ্ড-বিধির ৩৫৩ ধারার মর্ম্মমতে এক সরকারী কর্ম্মচারীকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে অপরাধ-জনক বলপূর্ব্বক বাধা জন্মাইবার জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

প্রথমতঃ, এই আপত্তি হয় যে, নিম্ন আদালতদ্বয় এক অপরাধ-জনক কার্য্যকে দুই ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ করিয়া তুলিয়াছেন; বস্তুতঃ, কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে বাধা জন্মান, যে বলপূর্ব্বক ছিনিয়া লওয়ার জন্য আসামীগণ ২২৫ ধারামতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভিন্ন নহে।

একরূপ হইলেও, দুই অপরাধের নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করা সঙ্গত হয় কি না, তৎসম্বন্ধে আমি এক্ষণে কোন মত ব্যক্ত করিতে চাই না। শারীরিক আঘাত যাহা ছিনিয়া লওয়ার কার্য্য হইতে বা না হইতেও পারে, তাহা নিঃসন্দেহই ঐ কার্য্য হইতে সর্ব্বথাই স্বতন্ত্র অপরাধ। কিন্তু এ স্থলে আমি দেখিতেছি যে, জজ আসামীগণকে কোন ব্যক্তিকে এক কর্ম্মচারীর নিকট হইতে ছিনিয়া লইবার নিমিত্ত, এবং অপর এক কর্ম্মচারীর প্রতি তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদনে বাধা দিতে অপরাধ-জনক বল প্রকাশ করিবার নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত করেন। আমার বোধ হইতেছে যে, এমত অবস্থায়, দ্বিগুণ অপরাধ সাব্যস্ত এবং দ্বিগুণ দণ্ড দেওয়ার হেতুবাদে যে আপত্তি হইয়াছে, তাঁহা আর থাকে না।

কিন্তু বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তিকে ছিনিয়া লওয়া হয়, সে এমত কোন ব্যক্তির বিধিমত জেম্মায় ছিল না, যে আইন অনুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার এবং আটক করিয়া রাখিতে পারে। দরখাস্তের প্রথম দফায় এই আপত্তি এই রূপ লেখা আছে, যথা,—"অভিযোক্তা বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় মাদারীপুরের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের আদালতের এক জন কর্ম্মচারী এবং যে বসিরহাট

" পুলিস-ষ্টেশনের এলাকার মধ্যে আইন-বিরুদ্ধ
" জনতা হইবার কথা বলা হয়, তথাকার ভার-
" প্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী নহেন। বসিরহাট যে
" মাদারীপুরের পুলিস-ষ্টেশনের আউট পোষ্ট,
" উক্ত বাবু তাহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীও নহেন;
" অতএব তিনি ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ১০১ ধারা
" মতে তাঁহার জানিত সংবাদ কেবল উপযুক্ত
" পুলিস-কর্ম্মচারীকে জানাইতে পারেন, স্বয়ং
" উক্ত আইন-বিরুদ্ধ জনতা ভাঙ্গিবার হুকুম
" দিতে পারেন না, কারণ, তাহা ফৌজদারী কার্য্য-
" বিধির ১১১ ধারা মতে কেবল মাজিষ্ট্রেট বা
" পুলিস-ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারীই
" করিতে পারেন, হীরালাল বাবু তাহার কোন
" পদস্থই নহেন। অতএব চেরাগ আলীকে ২২৫
" ধারার মর্ম্মমতে কোন বিধিমত আটকে রাখা
" হইয়াছিল না, অথবা যে যাদব কনষ্টেবেল
" হীরালাল বাবুর সহিত ঐ মোকদ্দমার তদন্ত
" করে, সেও ভারতবর্ষীয় দণ্ড-বিধির ৩৫৩ ধারার
" মর্ম্মমতে সরকারী কর্ম্মচারী স্বরূপে তাহার
" বিধিমত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনার্থে কোন কার্য্য
" করিতেছিল না, বা করিতে চেষ্টাও করে নাই।
" অতএব সমগ্র মোকদ্দমাই আইন-ঘটিত ভ্রম-
" মূলক; অতএব নিম্ন আদালতের বিজ্ঞবর জজের
" হুকুম স্থির থাকিতে পারে না

স্বীকার করা হইয়াছে যে, ১৮৬১ সালের ৫ আইন অনুসারে যে বঙ্গদেশীয় পুলিস-সৈন্যদল সংস্থাপিত হয়, হীরালাল বাবু তাহার অন্তর্গত এক কর্ম্মচারী; এবং উক্ত আইনের ২২ ধারায় ব্যক্ত আছে যে, " এই আইনের লিখিত সকল কার্য্যের " নিমিত্ত পুলিসের প্রত্যেক কর্ম্মকারক সর্ব্বদাই আপন পদের কর্ম্মে উপস্থিত আছে, এমত জ্ঞান করিতে হইবে, এবং পুলিসের সাধারণ এলা- " কার কোন স্থানে কোন সময়ে সে পুলিসের " কর্ম্মকারক স্বরূপে কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে।" অতএব যদি বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় এই ঘটনার সময়ে পুলিস-কর্ম্মচারী থাকিয়া থাকেন, তবে তিনি ঐ ঘটনার সময়ে বঙ্গদেশীয় পুলিসের অন্তর্গত এক কর্ম্মকারক স্বরূপে নিশ্চয়ই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে ঐ রূপে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহার কোন প্রমাণ আমাদিগের সমক্ষে নাই। প্রকাশ যে, যাহাকে বসিরহাটের আউট পোষ্টের এলাকা বলা হই-য়াছে, তিনি তাহারই মধ্যে অন্য এক মোকদ্দমার " তদন্তে " নিযুক্ত ছিলেন।

আমাদিগের নিকট যে নথী উপস্থিত আছে, তাহাতে নিশ্চয়ই এমত কিছু নাই যে, তিনি বঙ্গ-দেশীয় পুলিসের এক কর্ম্মচারী হইয়া এই " আউট পোষ্টের এলাকায় " উচিত মতে নিযুক্ত ছিলেন না; এবং দরখাস্তে যে বর্ণনা আছে, তাহাতেই প্রকাশ যে, তিনি ঐ রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি যে সময়ের কথা বলেন, তখন যদি তাঁহার উপর পুলিস-কর্ম্মচারীর কার্য্য-ভার থাকিয়া থাকে, তবে ইহা অপেক্ষা সপষ্ট আর কিছুই নাই যে, তিনি যে সকল বৃত্তান্ত ঘটিতে দেখিবার কথা বলেন, (আদালত তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে) তাহাতে তিনি কেবল শান্তিরক্ষার কর্ম্ম-চারীরূপে কার্য্য করিতে পারিতেন, এমত নহে, সাধা-রণের সুবিধার্থে তাঁহার তাহা করা কর্ত্তব্যই ছিল।

তিনি বলেন যে, যখন তিনি উপস্থিত হন তখন বহু সংখ্যক লাঠীওয়াল এবং সাং-ঘাতিক অস্ত্রধারী লোক লাফিয়া উঠিয়া তাহাদের লাঠী লয়, ও " মার! মার! " করিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, এবং নিশ্চয়ই তাঁহাকে আক্রমণ করিবার লক্ষণ দেখায়। যদি ইহাই শান্তিভঙ্গের প্রকাশ্য কার্য্য না হয়, তবে কোন্ কার্য্য হইবে তাহা আমি জানি না।

অবস্থাবিশেষে অতি প্রবল বল প্রকাশও উচিত কার্য্য হইতে পারে। কিন্তু এ মোকদ্দমার আদ্যোপান্তে এমত কিছু বলা হয় নাই যে, বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় পুলিস-কর্ম্মচারী হউন বা না হউন, তাঁহার তুল্য কোন ব্যক্তিকে এরূপ ভয়ানক রূপে আক্রমণ করা আইন অনুসারে সঙ্গত হইবার কোন কারণ ছিল। শরীরের প্রতি অন্যায় ভয় প্রদর্শনে শারীরিক স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত যে এই বল প্রকাশের আবশ্যক হইয়াছিল, এমত উদ্ভাবিত হয় নাই। এমন কোন সম্পত্তি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না যাহা রক্ষণার্থে এই কার্য্য হয়; অথবা যে কৌন্সল দরখাস্তকারীর পক্ষে আদালতে সওয়াল জওয়াব করেন তাঁহার কথা হইতে এমত কিছু প্রকাশ পায় না, যাহাতে উক্ত অত্যাচার সরলভাব ধারণ করিতে পারে।

আসামীগণের একজন বিজ্ঞবর কৌন্সেল বলেন যে, বাবু হীরালাল মুখোপাধ্যায় সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়ও আসামীগণকে ধৃত করিতে পারি-তেন। আমারও তাহাই বোধ হয়; এবং তাঁহার যদি সামান্য ব্যক্তি স্বরূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে যথাসাধ্য করা কর্ত্তব্য হয়, তবে

বঙ্গদেশীয় পুলিসের একজন প্রধান কর্ম্মচারী হইয়া দরখাস্তকারীর কথিত মতে ঐ স্থানে অন্য এক মোকদ্দমার তদন্তে বাস্তবিক নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার তাহা করা আরো কর্ত্তব্য ছিল।

নিম্ন আদালতদ্বয় যে নির্দ্দেশ করেন যে, হীরালাল তাঁহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্ব্বাহে চেরাগ আলীকে গ্রেপ্তার করেন, এবং তাহা করা অবস্থা দৃষ্টে উচিত হইয়াছে, তাহার পোষকতায় এ মোকদ্দমায় যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সম্বন্ধে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অন্যান্য প্রমাণ এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারিত যে, ঐরূপ গ্রেপ্তার আইন-বিরুদ্ধ, এবং জিনিষ লওয়া সঙ্গতই হইয়াছিল। এই দরখাস্ত সম্বন্ধে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, আমার মতে নিম্ন আদালতদ্বয় যে অপরাধ-সাব্যস্ত করেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে, এবং আমাদিগকে তাহা অন্যথা করিবার কোন কারণ দর্শান হয় নাই।

অতএব এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইল।

বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র।—আমি সম্পূর্ণ সম্মত হইলাম।　　( ৫ )

---

২৮ এ মে, ১৮৭০।

## বিচারপতি এল এস জ্যাক্সন এবং এফ এ গ্লবর।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বনাম রাধুধন দে।

সরকারী কর্ম্মচারি-কর্তৃক অপরাধ-জনক বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে যশোহরের মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অর্পিত এবং সেশন জজ কর্তৃক বিচারিত।

মেঃ সি গ্রেগরি এবং বাবু শশীধর সেন আসামীর উকীল।

চুম্বক।—স্পষ্ট হুকুম মতেই হউক, বা সরকারী কর্ম্মচারীর স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের অঙ্গ স্বরূপেই হউক, কি প্রণালীতে জেম্মার উৎপত্তি হয়, তাহা দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারাতে নির্দ্দিষ্ট নাই। অতএব যে স্থলে এমত সপ্রমাণ হয় যে, কোন আফিসের হেড্ ক্লার্ক তাঁহার উপরিস্থ হাকিমের অনুমতি মতে এবং জানিত রূপে ঐ আফিসের কোন অধীন আমলা, যথা নাজিরকে ষ্টাম্পের ভার অর্পণ করেন, সে স্থলে ঐ অধীন আমলা অর্থাৎ নাজির ঐ ষ্টাম্প আত্মসাৎ করিলে, দঃ বিধির ৪০৯ ধারা মতে, সরকারী কর্ম্মচারি-কর্তৃক অপরাধ-জনক বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধী হইবে।

বিচারপতি জ্যাক্সন।—এই মোকদ্দমায় আসামীর উকীল মেং গ্রেগরি প্রথমতঃ, তর্ক করেন যে, অপরাধ সাব্যস্তের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ নাই; দ্বিতীয়তঃ, আসামীর কোন অপরাধ থাকিলে তাহা দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা-বর্ণিত অপরাধ নহে, অন্য কোন অপরাধ হইবে; এবং তৃতীয়তঃ, উক্ত অপরাধ-সাব্যস্ত বৈধ হইলেও দণ্ড অধিক হইয়াছে।

এ মোকদ্দমায়, দেখা যাইতেছে যে, আসামীর নিকট যে সকল ষ্টাম্প রাখা গিয়াছিল তাহা না পাওয়া এবং তাহার নিকট যে টাকা থাকা উচিত ছিল তাহা না থাকা সম্বন্ধেই যে কেবল তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে, এমত নহে, তাহার আপন স্বীকার মতেই আমার বিবেচনায়, স্পষ্ট সংস্থাপিত হইয়াছে যে, আসামী খুলনিয়ার মহকুমার নাজির বিধায় কতকগুলি ষ্টাম্প গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি স্বরূপে তাহার নিকট রাখা হয়, এবং সে উক্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ-জনক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে।

তদনন্তর, গ্রেগরি সাহেব তর্ক করেন যে, ইহা ৪০৯ ধারা-বর্ণিত অপরাধ নহে। তাঁহার তর্ক এই যে, এই সকল ষ্টাম্প হেড ক্লার্কের জেম্মায় ছিল, এবং এবিষয়ে আসামীর যে কিছু জেম্মা সংস্থাপিত হইতে পারে, তাহা সরকারী চাকর স্বরূপে হয় না; আসামী এবং হেড ক্লার্কের আপনাদের মধ্যে ঘরাও বন্দোবস্তের দ্বারা তাহা হয়, সুতরাং আসামী যদি এমত অবস্থায় এই সকল ষ্টাম্প স্থানান্তরিত করিয়া থাকে, তবে সে অপরাধ-জনক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকিবে অথবা সে ঐ টাকা চুরী করিয়া থাকিবে, বা হেড ক্লার্কের প্রতি তঞ্চকতা করিয়া থাকিবে, কিন্তু ৪০৯ ধারা অনুসারে সে অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে না। গ্রেগরি সাহেবের তর্কের মূল এই যে, তাঁহার বিবেচনায়, কোন উপরিস্থ কর্ম্মচারীর প্রকাশ্য হুকুমানুসারে এই সকল ষ্টাম্প আসামীর জেম্মায় রাখা হয় নাই। অতএব তাঁহার বিবেচনায়, আইন অনুসারে আসামীর প্রতি ঐ সকল ষ্টাম্প রাখিবার ভার ছিল না।

কালেক্টর, ডেপুটি কালেক্টর এবং হেড ক্লার্কের প্রমাণ দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয় যে, যে

বন্দোবস্ত দ্বারা খুলনিয়ার মহকুমার ট্রেজরীর রুতকগুলি. ষ্টাম্প আসামীর হাতে এবং অধীনে থাকে তাহা উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ জানিত এবং অনুমোদিত ছিল। কিন্তু তাহা হউক বা না হউক, ইহাও স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঐ সকল ষ্টাম্প আসামীর নিকট নাজির স্বরূপে ছিল, এবং নাজির স্বরূপই (এবং কাজে কাজেই সরকারী কর্ম্মচারী স্বরূপে) সে উক্ত মহকুমার ষ্টাম্প রাখিবার ভার হেড ক্লার্কের সহিত ভাগ করিয়া লইয়াছিল; অর্থাৎ বিশেষ কোন হুকুম দ্বারাই হউক বা কোন সরকারী কর্ম্মচারীর আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম বলিয়াই হউক, কি প্রণালীতে কোন বিষয়ের ভার অর্পিত হয় তাহা ৪০৯ ধারায় নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহাতে "কোন দ্রব্য যে কোন প্রকারে কোন ব্যক্তির জেম্মায় অর্পিত হয়" শব্দ গুলি আছে। অতএব আসামীর প্রতি সরকারী কর্ম্মচারী স্বরূপে কোন এক প্রকারে ঐ সম্পত্তির ভার ছিল, এবং সেই ভার থাকায়, সে অপরাধ-জনক বিশ্বাস ঘাতকতার অপরাধ করিয়াছে, সুতরাং সে সম্পূর্ণ রূপে ৪০৯ ধারার অধীন হইয়াছে।

আর এই এক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যে, তাহাকে অত্যন্ত অধিক দণ্ড দেওয়া হইয়াছে কি না। এই কর্ম্মচারী ভদ্রবংশীয় ব্যক্তি, এবং এই পদের উপযুক্ত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছে অনুমান করিতে হইবে, এবং এই পদের বেতন অধিক না হইলেও তাহার ভরণপোষণ, সুখ স্বচ্ছন্দতা এবং সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষণার্থে যথেষ্ট ছিল। তাহার উপর মূল্যবান সম্পত্তির ভার ছিল, এবং তাহার পদ গুরুতর ছিল এবং তাহার বিরুদ্ধে সে যে গুরুতর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহার পদস্থ ব্যক্তি এরূপ অপরাধ করিলে আমার বিবেচনায় কঠিন পরিশ্রমসহ ৫ বৎসর মিয়াদ ও জরিমানা অধিক দণ্ড নহে। আমার বিবেচনায় অপরাধ সাব্যস্ত এবং দণ্ডাজ্ঞা স্থির থাকিবে।

বিচারপতি গ্লবর।—আমারও ঐ মত।

(ব)

# শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর

## প্রিবি কৌন্‌সিলের নিষ্পত্তি।

৩০ এ নবেম্বর, ১৮৬৯।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড; সর জেম্‌স্ ডবলিউ কল্‌বিল্; এবং সর জোসেফ নেপিয়ার ও সর লরেন্‌স পীল্।

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

সৈয়দ আজ্‌হুর আলী

বনাম

বিবী আল্‌তাফ্ ফতেমা প্রভৃতি।

চুম্বক।—বাদী আপন পিতার নামে কোন সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছিল বলিয়া তাহার অংশের দাবীতে নালিশ করে। প্রতিবাদী কহে যে, সে ঐ সম্পত্তি তাহার আপন অর্থ দ্বারা আপন স্ত্রী ও পুত্রের (বাদীর পিতার) বেনামীতে ক্রয় করে।

এ স্থলে, আদালতের দেখিতে হইবে যে, কোন্ স্থান হইতে ক্রয়-মূল্যের টাকা আসিয়াছিল; এবং অনুমান এই হইবে যে, রামের অর্থ দ্বারা শ্যামের নামে সম্পত্তি খরিদ হইলে, তাহা রামের উপকারার্থেই হয়; কারণ, পিতা হিন্দু বা মুসলমান হউক, পুত্রের নামে ক্রয় করিলেই, এমন অনুমান করা যাইতে পারে না যে, তাহা পুত্রেরই উপকারার্থে অর্থাৎ তাহাকেই দেওয়ার জন্য ক্রয় করা হইয়াছে।

নিষ্পত্তি।—প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ বোধ করেন যে, এই মোকদ্দমায় তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাতে, ভারতবর্ষীয় দুই আদালত একমতে বৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে নির্দ্দেশ করেন তাহা অসঙ্গত না হইলে প্রিবি কৌন্সিলে তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ হইবে না বলিয়া যে সুবিধি আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সেই সিদ্ধান্ত করেন নাই; কারণ, রেস্পণ্ডেণ্টের অনুকূল যে নির্দ্দেশ হইয়াছে তাহা সাবধানে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, সকল বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করার আবশ্যক ছিল, তাহার নির্দ্দেশই হয় নাই, অথবা সেই সকল বৃত্তান্ত আপেলাণ্টের অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হাইকোর্টের প্রতি যথোচিত সম্মান সহকারে প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ এই বলিয়া ঐ কোর্টের নিষ্পত্তি ডিস্‌মিস্ করিতে পারেন না, যে সকল বিচারপতি তখন উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহারা বিশুদ্ধ রূপেই হউক বা ভ্রমাত্মক রূপেই হউক, পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় বিবেচনা করিয়াছিলেন এবং খাস আপীলের বিচার যে সকল বিধির অনুগত, তদনুসারে তাঁহাদের নিম্ন আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন।

অনন্তর, প্রথম রায় অর্থাৎ প্রথম আদালতের রায় সম্বন্ধে প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের বোধ হয় যে, পক্ষগণের মধ্যে যে প্রকৃত প্রশ্ন ছিল, অর্থাৎ এই সম্পত্তি আপেলাণ্টের স্ত্রী ও পুত্র বেনামী ভোগ করিত, কি ঐ ব্যক্তিদ্বয় তাহাদের নিজের লাভের জন্য এবং প্রত্যেকের অংশ অনুযায়ী ভোগ করিত, ঐ আদালত সেই প্রশ্নের কোন বিচার করেন নাই।

আদালতে দুই ইসু উপস্থিত ছিল; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, তন্মধ্যে একটি ইসু বিশুদ্ধরূপে প্রণীত হয় নাই। তাহা এই বাক্যে হইয়াছে যে, একরারনামা অকৃত্রিম কি না, অর্থাৎ তদ্দ্বারা এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে তাহা জাল কি না?

পক্ষগণের মধ্যে বাস্তবিক যে প্রশ্ন জজ কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা এই যে, যে সকল ব্যক্তি ঐ দলীল স্বাক্ষর করিয়াছে অথবা স্বাক্ষর করিয়াছে বলিয়া কথিত হইয়াছে তাহারা তাহা দস্তখত করার কালে নাবালগ কি বয়ঃপ্রাপ্ত ছিল।

প্রধান সদর অমীন সেই বৃত্তান্ত আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং বিজ্ঞবর কৌন্সেল, সেই নির্দ্দেশের প্রতি আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে প্রার্থনা করেন নাই। কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট বৃত্তান্ত হইতে প্রধান সদর আমীন কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন? তাহা এই যে, ঐ দলীল কেবল ন্যাসসূচক একরার মাত্র এবং কেবল নাম খারিজদাখিল করিয়া লওয়া অর্থাৎ সম্পত্তি আপেলাণ্টের নামে খারিজ করিয়া লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু যাহারা তাহা দস্তখত করিয়াছে তাহারা এমন প্রকারে তাহা দস্তখত করাতে যাহা তাহাদের উপরে বাধ্যকর হয় না, আপেলাণ্টের স্বত্ত্ব সম্বন্ধে তাহা সাঙ্ঘাতিক হইয়াছে; এবং যে বৃত্তান্ত এই রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্দ্বারা কাজেই আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে রেস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং যাহারা ঐ সম্পত্তির দৃষ্টব্য মালিক ছিল তাহারা উহা নিজ স্বত্ত্বেই ভোগ করিত, আপেলাণ্টের বেনামদার সূত্রে নহে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এক মুহূর্ত্ত পরীক্ষা করিলেই টিকিবে না।

তাহার পরে মোকদ্দমা আপীলে জেলার জজের নিকট যায়; তিনি যে বৃত্তান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তিনি মুল বৃত্তান্ত আপেলাণ্টের অনুকূলে নির্দ্দেশ করেন, কারণ, তাঁহার রায়ের প্রারম্ভে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আদালতের নথীতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, আপেলাণ্ট তাহার পুত্রের জীবদ্দশায় ঐ সম্পত্তি তাহার নামে ক্রয় করে এবং তাহার পুত্র ঐ সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হইলে যে রূপ কার্য্য করা উচিত, বরাবর তদ্রূপই কার্য্য করিয়া আসিয়াছে।

তাহার পরে তিনি আপেলাণ্টের মোকদ্দমা বর্ণনা করিয়াছেন, যথা,—“আজহর আলী কর্ত্তৃক “তর্কিত হইয়াছে যে, সে যে সকল সম্পত্তি ক্রয় “করিয়াছে, তাহা সমস্তই তাহার পুত্রের নামে, তাহার নিজের ধনের দ্বারা ক্রীত হই- “য়াছে, এবং তাহাই সম্ভব।” অতএব প্রধান সদর আমীনের ন্যায় তিনিও মোকদ্দমার আবশ্যকীয় ইসুর মীমাংসা করেন নাই, নচেৎ সেই ইসু বাদীর অনুকূলে নিষ্পন্ন করিয়াছেন।

ঐ নিষ্পত্তি সকলের এই ফল বিধায়, প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের মত এই যে, নিম্ন আদালত সমস্তে বাস্তবিক আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে এমন কোন নিষ্পত্তি হয় নাই, যাহা তল্লিখিত হেতু দ্বারা প্রতিপোষিত হইতে পারে। অতএব ফল এই হইল যে, প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ ঐ সকল নিষ্পত্তি এককালে ছাড়িয়া দিয়া, নথীর প্রমাণের উপরে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

মোকদ্দমা এই। যদি এমত অনুমান করিয়া লওয়া যায় যে, আপেলাণ্টের স্ত্রীর ও রেস্পণ্ডেণ্টদিগের পিতার লাভের জন্য তাহাদের এজমালী নামে প্রথমে সম্পত্তি লওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে রেস্পণ্ডেণ্টদিগের পিতার যে অংশ হইত, সেই অংশ পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য রেস্পণ্ডেণ্টগণ বেদখলের মোকদ্দমার স্বরূপ এই নালিশ উপস্থিত করিয়াছে। প্রতিবাদী বলে যে, ঐ সম্পত্তি যাহার সে এক্ষণে দৃষ্টব্য মালিক, তাহার সে বরাবরই লাভভোগী মালিক ছিল। ইহা তাহার দ্বারা তাহার ধনে তাহার স্ত্রী ও পুত্রের বেনামীতে ক্রীত হয়, এবং সে দৃষ্টব্য মালিক স্বরূপে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, তাহা উক্ত স্বত্ত্বানুযায়ী কার্য্য হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই প্রকার কার্য্য নূতন নহে। ইহা বরাবর এই প্রিবি কৌন্সিলের গোচর হইয়াছে, এবং তৎসম্বন্ধীয় বিধি মুয়রের ভারতবর্ষীয় আপীলের ৬ষ্ঠ বালমের গোস্বামী বনাম গোস্বামীর মোকদ্দমায় পর্য্যালোচিত হইয়াছে। উপস্থিত মোকদ্দমায় পক্ষগণ মুসলমান বিধায়, উক্ত মোকদ্দমার কেবল হিন্দুশাস্ত্র অবলম্বন করত যে সকল হেতুবাদে নিষ্পত্তি হইয়াছিল তাহা উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে অবলম্বন করা যাইতে পারে না। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অন্যের নামে ভূমি ক্রয় করা ও ভোগ করার প্রথা ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে যে প্রকার প্রচলিত, মুসলমানদিগের

মধ্যেও তদ্রূপ ; এবং কোথা হইতে ক্রয়-মূল্য আসিয়াছিল, তাহাই যে, ভারতবর্ষীয় এরূপ মোকদ্দমা সকলের পরীক্ষা, গোস্বামী বনাম গোস্বামীর মোকদ্দমার রায় এবং উল্লিখিত নজীর সমস্তই তাহার প্রমাণ। রামের টাকায় শ্যামের নামে যে ক্রয় হয়, তাহা রামের লাভের জন্যই হয়, অনুমান করিয়া লইতে হইবে; এবং পিতা মুসলমান বা হিন্দু হউক, সে তাহার পুত্রের নামে যে ক্রয় করে, তদ্দ্বারা তুমি এমন অনুমান করিয়া লইতে পার না যে, ইংলণ্ডীয় আইনের দ্বারা ঐ রূপ কার্য্য পুত্রের জন্যই হইয়াছে বলিয়া যে প্রকার অনুমান হয়, উহাও সেই রূপ কার্য্য। অপিচ, এই সম্পত্তি কেবল পুত্রের নামে ক্রীত না হইয়া পুত্র ও স্ত্রী দুই জনেরই নামে ক্রীত হইয়াছিল; অতএব ঐ ক্রয় বেনামী বিবেচনা করার ইহাই এক প্রবল হেতু, কারণ, স্ত্রী ও পুত্র পরস্পরের এমন সমতুল্য স্বত্ব নহে, যাহার জন্য তাহাদের দুই জনকেই এজমালী মালিক করার আবশ্যক ছিল; এবং কোন সম্পত্তির জেম্মাতে এক জন অপেক্ষা দুই জনের নাম দেওয়ার কারণ ইংলণ্ডে যে প্রকার অনুভূত হয়, ভারতবর্ষীয় কার্য্য সম্বন্ধেও প্রায় তদ্রূপই হয়।

অপর, এই মোকদ্দমায় যে, প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সকলই প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের বিবেচনায়, এক পক্ষের প্রমাণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দুষ্টব্য মালিক স্বরূপ যে সকল কার্য্য করা হয়, তদ্দ্বারা কিছুই সপ্রমাণ হয় না; কিন্তু এ মোকদ্দমায় যদি কোন প্রমাণ থাকে, তবে কোথা হইতে টাকা আসিয়াছে, তাহারই প্রমাণ আছে, এবং তাহা পিতার টাকা।

অধিকন্তু, পুত্রের স্বীকৃত বাক্য আছে, এবং তাহা যদিও সম্পত্তির কেবল এক ভাগ সম্বন্ধে খাটে, তথাপি তদ্দ্বারা, ঐ কার্য্য কি ভাবের কার্য্য তদ্বিষয়ে মোকদ্দমায় যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার পোষকতা হয়। অতএব বিস্তারিত স্বরূপে ঐ প্রমাণের বিচার না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের মতে, কেবল এক সিদ্ধান্তই হইতে পারে, এবং যে দুই নিম্ন আদালতের জজ বৃত্তান্তের বিচার করিয়াছিলেন, মোকদ্দমা ন্যায্য রূপে বিচারিত হইলে তাঁহাদেরও সেই সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত ছিল।

এই সকল হেতুবাদে নিম্ন তিন আদালতেরই নিষ্পত্তি অন্যথা করিতে, ও খরচা সমেত বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ অতি বিনীত ভাবে শ্রীশ্রীমহারাজ্ঞীকে অনুরোধ করিবেন। বাদিগণ এই আপীলেরও খরচা দিবে। (স্ব)

১৩ ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

লর্ড চেম্‌স্ ফোর্ড; সর জেম্‌স্ ডবলিউ কল্‌বিল্ ও সর জোসেফ নেপিয়র ও সর লরেন্স পীল।

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

বামাসুন্দরী দাসী

বনাম

রাধিকা চৌধুরিণী, প্রভৃতি।

চুম্বক।—১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুন মতে খাজানা বৃদ্ধির নালিশে, যে তালুকের খাজানাবৃদ্ধি করিবার প্রার্থনা হয়, তাহার খাজানা অপরিবর্ত্তনীয় কি পরিবর্ত্তনশীল ইহা না দেখিয়া, তাহা কি ভাবের তালুক তাহাই দেখা অধিক আবশ্যকীয়; তালুক ঐ কানুনের ৪৯ বা ৫১ ধারার যে ধারার অন্তর্গত হয়, তদনুসারে, বাদী জমিদার যে প্রমাণ দর্শাইতে বাধ্য, তাহার আকার ও পরিমাণের বিভিন্নতা হয়।

হাইকোর্ট যে মত ব্যক্ত করেন যে, কোন তালুক উক্ত কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত করিতে হইলে, ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট যে, দশ-সালা বন্দোবস্তের কালে ঐ তালুক বর্ত্তমান

ছিল, এবং জমিদারের সেরেস্তায় রেজিস্টরী হইতে পারিত, ইহা অনুমোদিত হইল।

যে স্থলে এমত সাব্যস্ত হয় যে, তালুক উক্ত কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত অধীন তালুক, সে স্থলে খাজানা পরিবর্ত্তনশীল থাকার কথা বাদী জমিদারকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে।

নিষ্পত্তি।—রেস্পণ্ডেণ্ট যে জমিদারীর ।৶৹ আনার মালিক, আপেলাণ্ট তাহার মধ্যে যে কতিপয় ভূমি ভোগ করে, রেস্পণ্ডেণ্ট তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারে কি না, তাহাই এই আপীলের এক মাত্র বিচার্য্য প্রশ্ন। রেস্পণ্ডেণ্টের হিস্যার স্বত্ব সম্বন্ধে, ও যথেষ্ট রূপে নোটিস (যদ্দ্বারাই এরূপ মোকদ্দমার আইনানুযায়ী আরম্ভ হয়,) জারী হইয়াছে কি না, এবং ঐ খাজানা বৃদ্ধি হওয়ার দায়গ্রস্ত বিবেচনা করিলেও, কথিত কর সংস্থাপন ন্যায্য কি না, এই সমস্ত কথা সম্বন্ধে নিম্ন আদালত সমস্তে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎসম্বন্ধে এইক্ষণে আর কোন বিরোধ নাই।

খাজানা বৃদ্ধির নালিশ এই অনুমানের উপরে চলে যে, যে জমিদার স্থায়ী বন্দোবস্তের অধীন জমিদারী ভোগ করেন, তাঁহার উপরে, খাজানা বৃদ্ধি না করার কোন বাধ্যকর চুক্তি না থাকিলে অথবা বিরোধীয় ভূমি সমস্ত ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনের লিখিত বর্জ্জিত বিধান সমস্তের কোন বিধানান্তর্গত না হইলে, তিনি তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত খেরাজী ভূমির সময়ে সময়ে পরগণার অর্থাৎ প্রচলিত হারে খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন, এবং ইহাতে আরও অনুমান করিয়া লওয়া হয় যে, বিরোধীয় ভূমিতে প্রতিবাদীর কোন বৈধ জমা অথবা দখলের স্বত্ব আছে। এই নালিশ উপস্থিত হওয়ার কালে ১৮৬৯ সালের ১০ আইন প্রচলিত না হওয়াতে তদ্দ্বারা এ মোকদ্দমার কোন ব্যতিক্রম হয় না, অতএব উক্ত ১০ আইনের দ্বারা আইন পরিবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে জমিদারের অনুকূল ঐ অনুমানের দ্বারা, সচরাচর মোকদ্দমায় বাদীর উপরে যে প্রমাণের ভার থাকিত তাহা হইতে সে মুক্ত ছিল, এবং সেই প্রমাণ-ভার প্রতিবাদীর উপরে ছিল। কিন্তু ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনে সকল জমা ও দখলের স্বত্ব সম্বন্ধে এক প্রকার বিধান খাটান হয় নাই। ইহাতে উহারা দুই ব্যাপক শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ ৫১ ধারায় মর্ম্মান্তর্গত তালুক এবং রাইয়তী ও অন্যান্য অধীন জমা যাহাদের জন্য ৪৯ ধারায় বিধান হইয়াছে। যদি ইহা স্বীকার করা যায় যে, যাহারা ঐ শেষোক্ত ধারার উপকারের দাবী করে তাহারা যে, দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্ব ১২ বৎসর হইতে এক অপরিবর্ত্তিত করে তাহাদের ভূমি ভোগ করিয়া আসিতেছে তাহা সপ্রমাণ করার ভার আইনে তাহাদের উপরেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তবে সপষ্ট দেখা যাইবে যে, যাহারা ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত তালুক ভোগ করে তাহাদের পক্ষে ঐ ধারা অধিক সুবিধা-জনক, কারণ, তদ্দ্বারা, জমিদার যে কোন বিশেষ প্রথা বা চুক্তি অথবা তালুকদারের কোন কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকার কার্য্যের দ্বারা করবৃদ্ধি করিতে স্বত্ববান, তাহা দর্শাইবার ভার জমিদারের উপরেই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। অতএব খাজানাবৃদ্ধির সকল মোকদ্দমায়ই খাজানা অপরিবর্ত্তনীয় কি পরিবর্ত্তনশীল, এই কথা ছাড়িয়া দিয়া, জমা কি ভাবের জমা তাহাই প্রধান বিচার্য্য বিষয়, কারণ, বাদী কি ভাবের এবং কত দূর প্রমাণ দিতে বাধ্য তাহা ঐ বিষয়ের উপরেই নির্ভর করে।

উপস্থিত রেস্পণ্ডেণ্ট এই মোকদ্দমার প্রতিবাদিগণকে পরিবর্ত্তনশীল জমায় দখলের স্বত্ববিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া তাহাদের নামে নালিশ করিয়াছে। আপেলাণ্টগণ কহে যে, তাহারা সিকমী তালুকদার এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দশসালা বন্দোবস্তের বহু বৎসর পূর্ব্বে ঐ প্রকার তালুকদার হইয়াছে, এবং তাহারা অপরিবর্ত্তন-শীল জমায় ঐ তালুক ভোগ করিয়া

আসিয়াছে। এমত অবস্থায়, স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, প্রধান সদর আমীন যে ইসু নির্দ্ধারণ করেন যে, "বিরোধীয় মহালের খাজানা "বৃদ্ধির জন্য দায়ী কি না," তাহা যথেষ্ট ইসু নহে, কারণ, কেবল ঐ ইসুর নিষ্পত্তির জন্য নহে, তাহার বিচার করিবার প্রণালী স্থির করার জন্যেও এই প্রাথমিক প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক ছিল যে, আপেলাণ্টের জমা ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত তালুক কি না।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ প্রথমে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং তাঁহারা অনুমান করিয়া লইবেন যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে আইনানুসারে আপেলাণ্টের উপরেই তাহার ঐ রূপ তালুক থাকার কথা সপ্রমাণ করার ভার ছিল।

আপেলাণ্টেরা তাহাদের জমা যে প্রকারে সৃষ্ট হয় তাহা সপ্রমাণ করার ও দেখাইবার জন্য দশসালা বন্দোবস্তের বহু কাল পূর্ব্ব তারিখের দুই কবালা এবং এক বন্দোবস্তের কাগজ আদালতে দাখিল করে, এবং এক নির্দ্দিষ্ট হারে খাজানা দেওয়ার কথা দেখাইবার জন্য কতকগুলি দাখিলা অর্থাৎ খাজানা আদায়ের রসীদ দাখিল করে। এই সকল দলীল কৃত্রিম অথবা অবিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া ভারতবর্ষীয় আদালত সমস্ত কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ ঐ নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করিলেন, এবং ঐ সকল দলীলের কথা ছাড়িয়া দিয়া ঐ নির্দ্দেশের উপরে বিচার করিবেন।

বৃত্তান্ত এই যে, রূপরাম ও জয়কৃষ্ণ ঘোষের নিকট আপেলাণ্টেরা তাহাদের স্বত্ব পায়, এবং জওয়াবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, উক্ত ঘোষেরা রামচন্দ্র বসু নামক এক ব্যক্তির অধীনে বিরোধীয় ভূমি ভোগ করিত, এবং রামচন্দ্র বসুর নিকট হইতে জমিদারী কৃষ্ণ সিংহ এবং গঙ্গানারায়ণের হস্তে গমন করে, এবং তাহাদের নিকটেই রেস্পণ্ডেণ্ট দশসালা বন্দোবস্তের কিছু পূর্ব্বে আপন স্বত্ব প্রাপ্ত হয়, অতএব এই বৃত্তান্ত স্বীকৃত হইয়াছে যে, আপেলাণ্টদিগের জমা যে ভাবেরই হউক, দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে এবং ঐ বন্দোবস্তের কালে, বর্ত্তমান ছিল। কালেক্টরের নিকট যে সকল কার্য্য হয় তাহাতে অন্ততঃ ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, জমার তৎকালীন দখীলকারেরা বলিয়াছিল যে, ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুন অনুযায়ী ঐ তালুক জমিদারী হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, এবং তাহা সদর তাহুতী তালুক স্বরূপে কালেক্টরের সেরেস্তায় রেজিষ্টরী হইতে পারে।

এই সকল কার্য্যে দেখা যাইতেছে যে, জমিদার যদিও প্রথমে উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু তাহার পরে আসিয়া ঐ দাবীর প্রতি আপত্তি করে কিন্তু কোন চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই। তাহার জওয়াবের কি হেতু ছিল, তাহা দৃষ্ট হয় না, এবং প্রমাণে দেখা যাইতেছে যে, সে ঐ তালুক বর্ত্তমান থাকার কথা স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তর্ক করিয়াছিল যে, তাহা পরিবর্ত্তনশীল করে, ভোগীকৃত হইয়া আসিয়াছে, অথবা তাহাতে জমিদারের এমত কোন লভ্য-জনক স্বত্ব আছে, যদ্ধেতু তাহা জমিদারী হইতে পৃথক্ না হইয়া অধীন-তালুক স্বরূপেই থাকা উচিত। অপিচ, মোকদ্দমায় আধুনিক যে সকল দাখিলা দাখিল হইয়াছে, তদ্দ্বারা কেবল এই দেখা যায়, এমত নহে যে, এই জমার জন্য বাঙ্গালা ১২৪৫ সাল হইতে ১২৬৪, মোতাবেক ইংরেজী ১৮৩৮ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত এক অপরিবর্ত্তিত কোম্পানী ১৭৮৷০ অর্থাৎ সিক্কা ১৫৮৷০ টাকা খাজানা প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল দাখিলায় এই জমা "তালুক রূপরাম ঘোষ ও জয়কৃষ্ণ ঘোষ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যে নোটিসের দ্বারা এই মোকদ্দমার আরম্ভ হয়, তাহা বাঙ্গালা ১২৬৪ সালে জারী হয়। নথীর ৫১ পৃষ্ঠার জমাওয়াশীল-বাকী দ্বারা আপেলাণ্টের দাবীরই

পোষকতা হইতেছে, কারণ, তাহাতে প্রদর্শিত হয়, যে, এক দলীল যাহা স্বভাবতঃই জমিদারের কাছারী হইতে নির্গত হইয়া থাকিবে, এবং ১৮১০ সালে কালেক্টরের সেরেস্তায় দাখিল হয়, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিরোধীয় ভূমি তালুক রূপরাম ও জয়কৃষ্ণ ঘোষ, নামে এবং তাহা ১৮০৪ সালে সিক্কা ১৫৮৮৷/১০ টাকায় ভোগীকৃত হইয়াছে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ এই দলীলের উপরে অধিক নির্ভর করেন না, কারণ, রেস্পাণ্ডেণ্ট কহে যে, তাঁহা তাহার উপরে বাধ্যকর নহে, এবং ঐ দলীলের প্রমাণ পর্য্যাপ্ত এবং সন্তোষকর নহে।

কিন্তু উপরিউক্ত প্রমাণের দ্বারা প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের বিবেচনায়, দৃষ্টব্যে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, রূপরাম ঘোষ এবং জয়কৃষ্ণ ঘোষের জমা যাহা দশ-সালা বন্দোবস্তের কালে ও তৎপূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহা তালুক, এবং তাহাই আপেলাণ্টের এই জমা। এই কথা খণ্ডন করার জন্য রেস্পাণ্ডেণ্টের জওয়াব দেওয়ার আবশ্যক ছিল, কিন্তু তিনি জওয়াব স্বরূপে কোন প্রমাণই প্রদর্শন করেন নাই।

হাইকোর্টের রায়ের শব্দে এই জমা তালুক এবং দশ-সালা বন্দোবস্তের কালের তালুক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যদিও তাঁহারা তাহার 'পরে বলিয়াছেন যে, ইহা কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছিল তাহা অনিশ্চিত, এবং ইহার খাজানা পরিবর্ত্তন-শীল ছিল। প্রধান সদর আমীনের রায় যাহাতে উঁহদীলের খরচা বাবৎ শতকরা ১০ টাকার মিনাহী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এই জমা মধ্যবর্ত্তী জমা অর্থাৎ রাইয়তের কেবল পুরুষানুক্রমাগত্ত দখলের স্বত্ব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্টতর জমা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কিন্তু কথিত হইয়াছে যে, ইহা তালুক হইলেও, ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনের ৪৮ ধারা মতে রেজিষ্টরী হওয়া প্রদর্শিত না হইলে, ইহাকে ঐ কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত তালুক বলা যাইতে পারে না।

এই প্রস্তাব নিঃসন্দেহই সদর দেওয়ানী আদালতের ১৮৪৭ সালের রিপোর্টের ২৯২ ও ৪১৩ পৃষ্ঠায় প্রচারিত ঐ সালের ৩০ এ জুন ও ১০ ই আগষ্ট তারিখের ও ১৮৫০ সালের রিপোর্টের ৪৫১ পৃষ্ঠায় ঐ সালের ২৯ এ আগষ্ট তারিখের ও ১৮৫৯ সালের রিপোর্টের ৬০৭ পৃষ্ঠায় ঐ সালের ৩১ এ মে তারিখের নিষ্পত্তি সমস্তের দ্বারা প্রতিপোষিত। কিন্তু ইহা সেই মোকদ্দমার সহিত অনৈক্য যাহা ১৮৫৮ সালের ৩০ এ এপ্রিল তারিখে নিষ্পন্ন ও ১৮৫৮ সালের রিপোর্টের ৯০২ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে, এবং যাহাতে, যে দুই জন বিচারপতি ১৮৫৯ সালের মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন তাঁহারা কদিমি রাইয়তের জমা সম্বন্ধে ৫১ ধারার ফল বিস্তার করিয়াছেন; কিন্তু প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ বিবেচনা করেন যে, ঐ জমা ৪৮ ধারা মত রেজিষ্টরী করা বাধ্যকর নহে, এবং তাহা যে বাস্তবিক ঐ প্রকার রেজিষ্টরী হইয়াছিল এমত প্রদর্শিত হয় নাই। রেজিষ্টরী করার আবশ্যকতার যুক্তি ১৮৬৩ সালের ২৮ এ ফেব্রুয়ারি ও ১৮৬৭ সালের ২৩ এ জানুয়ারি তারিখে হাইকোর্ট-কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়াছে; ঐ নিষ্পত্তিদ্বয় হের্ হাইকোর্টের ১৮৬৩ সালের রিপোর্টের ২২০ পৃষ্ঠায় ও উইকলি রিপোর্টরের ৭ ম বালমের ৬১ পৃষ্ঠায় প্রচারিত হইয়াছে।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ ভারতবর্ষীয় এই সকল নজীরের ফল এই বিবেচনা করেন যে, যদিও ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানী আদালত-কর্ত্তৃক কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল যে, কোন তালুক ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, তাহা দশ-সালা বন্দোবস্তের সময়ে "রেজিষ্টরী-কৃত" বা "লিখিত" অথবা "স্বীকৃত" হইয়াছে (এই তিন শব্দই ঐ সকল মোকদ্দমায় ব্যবহৃত হইয়াছে,)

তথাপি তাহা হাইকোর্ট-কর্তৃক আইন বলিয়া গৃহীত হয় নাই; এবং ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট যে, দশসালা বন্দোবস্তের কালে জমা বর্ত্তমান ছিল, এবং রেজিষ্টরী হইতে পারিত। অতএব প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের বিবেচনায়, ঐ দফার শব্দগুলির যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, বহুকাল ক্রমাগত এক রূপ নজীর দৃষ্টে তাঁহারা তদপেক্ষা সঙ্কুচিত অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য নহেন। অতএব এই মোকদ্দমার প্রমাণ সামান্য হইলেও তাহা খণ্ডিত না হওয়ায়, আইনের ঐ অভিপ্রায় তাহাতে প্রয়োগ করিলে প্রিবি কৌন্‌সিলের বিচারপতিগণের বৃত্তান্ত সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ করিতে হইবে যে, আপেলাণ্টের জমা ১৭৯১ সালের ৮ ম কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত অধীন তালুক।

এই নির্দ্দেশই উপস্থিত নালিশের যথেষ্ট জওয়াব কি না, তৎসম্বন্ধে অবশ্যই তর্ক হইতে পারে, কারণ, এমত বলা যাইতে পারে যে, য বাদী আপন স্বত্বের উপরে নির্ভর করিয়া দখীলকার প্রজার বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করে, তাহাকে ঐ মোকদ্দমা অন্য এক পৃথক্ স্বত্বের উপর সংস্থাপিত ও অন্য এক বিধির অনুগত মোকদ্দমায় পরিবর্ত্তন করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। প্রিবি কৌন্‌সিলের বিচারপতিগণ সেই কথার উপরে বিশেষ নির্ভর না করিয়া ইহা বলাই যথেষ্ট বিবেচনা করেন যে, খাজানা যে পরিবর্ত্তন-শীল তাহা সপ্রমাণ করার ভার রেস্পণ্ডেণ্টের উপরে নিক্ষেপ করা ঐ প্রকার নির্দ্দেশের ফল, এবং যদি মোকদ্দমায় সেই বৃত্তান্তের কোন প্রমাণ না থাকে, তবে রেস্পণ্ডেণ্টের নালিশ অবশ্যই নিষ্ফল হইবে।

কিন্তু এমত কথিত হইতে পারে, এবং বোধ হয় যে, হাইকোর্টেরও এই মত যে, আপেলাণ্টেরা যে প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছে, তদ্দ্বারাই পর্য্যাপ্ত রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ঐ ভূমি সমস্ত পরিবর্ত্তন-শীল খাজানায় ভোগী-কৃত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রিবি কৌন্‌সিলের বিচারপতিগণ বিবেচনা করেন যে, বোধ হয় কালেক্টরের সমক্ষে ১৭৯৭ সাল হইতে ১৮০১ সাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত কার্য্য হয় তাহার ফলের ভ্রমাত্মক ভাব গ্রহণের দ্বারাই ঐ প্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ১৮০০ সালের ২ রা সেপ্‌টম্বর তারিখের রুবকারীতে দেখা যাইতেছে যে, নথীর ৪৮ পৃষ্ঠায় দরখাস্তে যে কিছু ভুল থাকুক, (দেখা যাইতেছে যে, ঐ দলীল পোকায় কাটা এবং অসম্পূর্ণ), ঐ তারিখে আপেলাণ্টের পূর্ব্ব পুরুষেরা বলে যে, তাহারা সিক্কা ১৫৮।১৫ খাজানায় এক তালুক ভোগ করে। প্রিবি কৌন্‌সিলের বিচারপতিগণের মত এই যে, মোকদ্দমার প্রমাণ দৃষ্টে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে যে, তালুক যে, পরিবর্ত্তনশীল জমায় ভোগীকৃত হইয়া আসিয়াছে, এবং যে তালুক এত বৎসর পর্য্যন্ত এক অপরিবর্ত্তিত করে ভোগীকৃত হওয়া সপ্রমাণ হইয়াছে তাহা যে রেস্পণ্ডেণ্টের বৃদ্ধি করার স্বত্ব আছে, ইহা সপ্রমাণ করিতে সে অকৃতকার্য্য হইয়াছে।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ ইহাও বলেন যে, রেস্পণ্ডেণ্টের বাক্য সত্য হইলে তাহা তাহার সপ্রমাণ করা কঠিন হইত না। বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতা নালিশ করিলে তাহার যে প্রকার কেবল আইন-প্রদত্ত স্বত্বের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং তৎপোষকতায় কোন দলীল থাকে না, রেস্পণ্ডেণ্ট সেই অবস্থায় নালিশ করে নাই। যে জমিদারের সহিত দশসালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল, রেস্পণ্ডেণ্ট তাহারই নিকট হইতে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং জমিদারী সেরেস্তার সকল কাগজপত্র যে সে পাইতে পারে ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। অতএব যে যেস্থলে কেবল আপেলাণ্টের প্রমাণের অনুমিত ত্রুটির উপরে নির্ভর করিয়াছে এবং যে স্থলে সে আপনার দাবীর সত্যতার পোষকতায় প্রমাণ প্রদর্শন করে নাই, সে স্থলে ইহাই প্রবলরূপে

অনুমান করা যাইতে পারে যেহু বাস্তবিক তাহার কোন প্রমাণ দর্শাইবার ছিল না। যদি ঐ প্রকার প্রমাণ থাকিয়া থাকে, তবে সে তাহা দর্শাইতে ত্রুটি করিয়াছে, সুতরাং তাহাকে তাহার নিজের সেই ত্রুটির ফলভোগ করিতে হইবে।

অতএব যে তিন ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে তাহা অন্যথা করার এবং তৎপরিবর্ত্তে, রেস্পণ্ডেন্টের নালিশ খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ করার ডিক্রী প্রদান করার জন্য প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ বিনীত ভাবে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে পরামর্শ দিবেন। এই আপীলের খরচা আপীলের ফলের অনুগামী হইবে। (গ)

১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড, সর জেমস্‌ কল্‌বিল্‌, সর জোসেফ নেপিয়ার ও সর লরেন্‌স পীল।

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

শ্রীমতী সুখিমণি দাসী প্রভৃতি
বনাম
মহেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি।

চুম্বক।—যে স্থলে বাদি-প্রতিবাদিগণ উভয়েই এক যৌত হিন্দুপরিবারস্থ ব্যক্তি, এবং বাদিগণ প্রতিবাদিগণের দখলী ভূমিতে দেবত্র সংস্থাপনার্থে এই বলিয়া নালিশ করে যে, যে দলীলের দ্বারা ঐ পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ আপনাদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ করে, কিন্তু যাহা বাদিগণের বাক্য মতে, ঐ পরিবারস্থ এক ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হওয়ায় তাহার উত্তমর্ণগণ হইতে সম্পত্তি রক্ষা করার অভিসন্ধিতে হইয়াছিল এবং কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই, সেই দলীলের পরের তারিখযুক্ত এক দলীল দ্বারা ঐ দেবত্রের সৃষ্টি হইয়াছে; সে স্থলে, উক্ত বিভাগ-পত্র রেজিষ্টরীকৃত দলীল এবং কাজে কাজে দুষ্টব্য উৎকৃষ্ট এবং ফলদায়ক দলীল বিধায়, বাদিগণকে এমত প্রমাণ দর্শাইতে হইবে যদ্দ্বারা ঐ বিভাগ-পত্র রহিত হইতে পারে।

হিন্দুপরিবারস্থ পরস্পর নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ পৃথক্‌ হইয়া পুনরায় একত্র হইতে পারে; তাহাদের কিয়দংশও পুনরায় একত্র হইতে পারে; এবং এরূপে পুনর্ম্মিলিত ব্যক্তিগণ, পরিবারের সাধারণের সম্মতিক্রমে তাহাদের পুনর্ম্মিলিত সম্পত্তির উপরে তাহাদের আইন অর্থাৎ হিন্দুব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত জেম্মা বা বৃত্তি সংস্থাপন করিতে পারে।

নিষ্পত্তি।—বাদী আপেলাণ্টের অনুকূল বীরভূমের জজের এক ডিক্রী অন্যথা করত কলিকাতার হাইকোর্ট যে নিষ্পত্তি করেন তাহা অন্যথা করার জন্য এইআপীল উপস্থিত হইয়াছে।

পাঁচটি ভ্রাতা যাহারা একদা আহার, দেবার্চনা এবং সম্পত্তি সম্বন্ধে এক যৌত হিন্দু-পরিবারস্থ ছিল, তন্মধ্যে চারি ভ্রাতার দায়াধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে বাদিগণ এই নালিশ উপস্থিত করে। প্রতিবাদী হরিনাথ অবশিষ্ট এক ভ্রাতার পুত্র এবং দায়াধিকারী। এই মোকদ্দমা চলিবার কালে হরিনাথের মৃত্যু হয়, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথমোক্ত রেস্পণ্ডেন্ট ও তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারা যাহারা আপনাদের অভিভাবকের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে তাহারাই তাহার স্থলাভিষিক্ত।

রেস্পণ্ডেণ্টগণের প্রত্যেকের দখলে যে সকল ভূমি আছে তৎসম্বন্ধে উক্ত রেস্পণ্ডেণ্টগণের বিরুদ্ধে দেবসেবার বৃত্তি সংস্থাপন করাই এই নালিশের উদ্দেশ্য। মোকদ্দমায় প্রথমে দুই দাবী যোগ করা হইয়াছিল, যাহা উচিত রূপে এক মোকদ্দমায় যোগ করা যাইতে পারে না; অর্থাৎ সেবাতসূত্রে বৃত্তির জেম্মা সংস্থাপন করার দাবী, এবং যৌত সম্পত্তির উপরে শরীকের সাধারণ স্বত্বের দাবী হইয়াছিল।

প্রতিবাদিগণের জওয়াবে বহু নালিশ জড়ীভূত করার আপত্তি উত্থাপিত হওয়াতে বাদিগণ তাহা স্বীকার করে এবং আরজী তৎসম্বন্ধে সংশোধিত হয়; অতএব ভূমি দেবত্র বলিয়া সেবাত

সুত্রে দাবী করাই এই নালিশের একমাত্র উদ্দেশ্য জ্ঞান করিতে হইবে।

জওয়াবে আর এই একটি আপত্তি উপস্থিত হয় যে, বাদিগণ কেবল ৮১৬ অংশের দাবী করিয়া অবিভাজ্য সম্পত্তি বিভাজ্য স্বরূপে ব্যবহার করিয়াছে। বীরভূমের জজ সম্পত্তির ঐ ভাব গ্রহণ করিয়া বোধ হয় বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বাদিগণকে তত্ত্বাবধারক স্বরূপ মানিয়া লইলে আরজী স্থির থাকিতে পারে। এই প্রকার ভাব গ্রহণ করিলে ঐ আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ, ভূমিতে তত্ত্বাবধারকের কোন বিভাজ্য অথবা অন্য কোন স্বত্ব নাই; এবং সাধারণ বিধির অনুসরণ করত এই প্রকারের জেম্মা এমন এক মোকদ্দমার দ্বারা সংস্থাপিত হওয়া উচিত যাহাতে দাবীর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে। যাহা হউক, প্রিবি কৌন্সিলের বিবেচনায় এই বিষয়ের দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের কোন তারতম্য হয় না, অতএব তাঁহারা মোকদ্দমার দোষগুণের বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন।

বাদিগণ তাহাদের মোকদ্দমা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে; যথা—বাঙ্গালা ১২৪৫ মোতাবেক ১৮৩৮ সালে তৎকালের পরিবারস্থ ব্যক্তিরা যে এক বণ্টন-নামা স্বাক্ষর করে তদ্দ্বারা এই বৃত্তি সংস্থাপিত হয়। পরিবার তখনও অবিভক্ত ছিল এবং তাহারা তাহাদের যৌত সম্পত্তির এক ভাগ তাহাদের বৃন্দাবনের ও বাটী মোকামের ঠাকুরের সেবার নিমিত্ত অর্পণ করে। পরিবারের সাধারণের সম্পত্তি ঐ প্রকার অর্পণ করার জন্য সাধারণের সম্মতিই ঐ বৃত্তিপ্রদানের মুল, অতএব এই মুল অকর্ম্মণ্য হইলে তাহার সহিত ঐ বৃত্তিও অকর্ম্মণ্য হইবে।

বাদিগণ তাহাদের আরজীতে বলে যে, তাহার পূর্ব্বে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২২৯ মোতাবেক ইং ১৮২২ সালে ঐ ৫ ভ্রাতা যাহারা সকলেই তখন জীবিত ছিল, তাহাদের কর্ত্তৃক এক বণ্টন-নামা স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু বাদিগণ এই কণ্টক এবং পশ্চাতে বৃত্তিপ্রদানের বাধা এই বলিয়া খণ্ডন করিতে চাহে যে, ঐ বণ্টন অনুযায়ী কার্য্য হয় নাই, এবং তাহা করারও মনস্থ ছিল না, কিন্তু বাস্তবিক, গোপীনাথ নামক পরিবারস্থ এক ব্যক্তি দেউলিয়া হওয়ায় তাহার উত্তমর্ণদিগের দাবী হইতে পরিবারের সম্পত্তি রক্ষা করার অভিসন্ধিতেই ঐ বণ্টন কেবল ছলমাত্র হইয়াছিল।

পক্ষান্তরে, প্রতিবাদী হরিনাথ ও যাহারা তাহার স্বত্বে দাবী করে অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতিবাদী বসু এবং কোল্ কোম্পানি অন্যান্য কথার মধ্যে ঐ প্রথম দলীল বৈধ বলিয়া তর্ক করে এবং বলে যে, তদনুযায়ী কার্য্য হইয়াছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন আদালতের ডিক্রীর দ্বারা বারম্বার সংস্থাপিত হইয়াছে যে; ঐ সম্পত্তির বণ্টন হইয়া গিয়াছে এবং তদন্তর্গত স্বত্ব সমস্ত প্রাপ্ত ও ভোগীকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং তাহারা অধিকন্তু বলে যে, ঐ দলীল প্রকাশ্যরূপে রেজিষ্টরী হইয়াছিল।

১৮৩৮ সালের দলীলের বিরুদ্ধে তাহারা বলে যে, তাহা রেজিষ্টরী হয় নাই এবং তাহা ষ্টাম্পেও লিখিত হয় নাই এবং তাহা প্রকাশিত হয় নাই, এবং নির্ধন গোপীনাথ তাহাতে অন্যান্য শরীকের ন্যায় তুল্যরূপে স্বত্ববান বলিয়া বর্ণিত আছে, এবং তাহাতে পূর্ব্ব দলীলের কোন উল্লেখ নাই এবং পূর্ব্বে যে সকল সম্পত্তি দেবসেবায় অর্পিত হইয়াছে এবং যাহা হস্তান্তরিত অথবা অন্য ঐহিক কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে না, তাহা ঐ দলীলে ঐ প্রকার নিয়োজিত হইয়াছে; এবং কোন নির্দ্দিষ্ট হেতু প্রদর্শন না করিয়া তাহাতে ঐ নির্ধনীকে সেবাত করা হইয়াছে এবং এক সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য এক স্বতন্ত্র জেম্মার সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই সমস্ত এবং অন্যান্য হেতুবাদে তাহারা বলে যে, এই শেষোক্ত দলীল মিথ্যা ও কৃত্রিম।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের বিবেচনায়,

ঐ সকল দলীলের মধ্যে কোন্ দলীল গ্রাহ্য, তাহা ব্যক্ত করিলেই বিরোধের নিষ্পত্তি হইবে, কারণ, ঐ দুই দলীল একত্রে গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বাদিগণের দাবীর জওয়াবে যে সকল আপত্তি উপস্থিত হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে ও বিশুদ্ধরূপে ইসুর স্বরূপে নথীর ৫৩ ও ৫৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। উহার ১ম, ৩য় ও চতুর্থ ইসুর উপরে প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ তাঁহাদের রায় প্রদান করিবেন। এই সকল ইসুর নিষ্পত্তি হইলে অন্যান্য ইসুর বিচারের আর আবশ্যক হইবে না।

১ম, ২য় ও ৩য় ইসু এই যে, এ মোকদ্দমায় তমাদীর আইন খাটে কি না?

বণ্টন ১২২৯ সালে কি ১২৪৫ সালে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল?

বিরোধীয় গ্রাম সমস্ত দেবত্র স্বরূপে প্রদত্ত হইয়াছে কি না?

প্রথম ইসু বীরভূমের আদালত কর্ত্তৃক বাদিগণের অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু হাইকোর্ট তাহা প্রতিবাদী রেস্পণ্ডেণ্টগণের অনুকূলে নির্দ্দেশ করেন।

আরজী প্রথমে যে প্রকার প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে এই ইসু ন্যায্য রূপেই উত্থাপিত হয়। কিন্তু আরজী সংশোধিত হইয়া সেবাদারের বিরুদ্ধ সেবাতের নালিশের ন্যায় নালিশ হইলে তমাদীর দ্বারা কোন বাধা হইতে পারে না। অতএব এই ইসু সম্বন্ধে দুই আদালতের নিষ্পত্তিতেই ত্রুটি আছে; কিন্তু যেহেতু ঐ দুই আদালতেই ঐ কথার নিষ্পত্তিতে সেবার বৈধতার কথা লিপ্ত ছিল, অতএব আসল প্রশ্ন দোষগুণের উপরেই নিষ্পত্তি হইয়াছে।

এই মোকদ্দমার প্রদর্শিত বৃত্তান্ত সমস্ত দৃষ্টে দেখা যাইতেছে যে, ২য় ইসু ৩য় ইসুতেই ভুক্ত।

বাদিগণ এমন বলে না যে, একবার বণ্টন হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বলে যে, পরিবার পুনরায় একত্রিত হয় এবং তাহার পরে তাহাদের তৎকালে যে যৌত সম্পত্তি ছিল তাহার একটি নূতন ও কার্য্যকর বণ্টন করত সকলে সম্মত হইয়া তাহার এক ভাগ দেবসেবায় অর্পণ করিয়া ভূমি দেবত্র করে।

পুনরায় একত্র হওয়া ও পশ্চাতে বণ্টন করার কথা সওয়ালজওয়াবে তর্কিত হয় নাই, এবং প্রমাণের দ্বারাও তাহা সাব্যস্ত হয় নাই।

বাদিগণ বলে, এবং তাহা তাহারা ন্যায্য রূপেই বলে যে, বৈধ বণ্টন অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকিলে দ্বিতীয় দলীল অকর্ম্মণ্য হইবে। হিন্দুপরিবারের এই প্রকার নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ পুনরায় একত্রিত হইতে পারে, বা তাহাদের কতক ব্যক্তি একত্রিত হইতে পারে, এবং এই প্রকার পুনর্ম্মিলিত ব্যক্তিরা সকলে সম্মত হইয়া তাহাদের শাস্ত্রসম্মত বৃত্তির জন্য তাহাদের পুনর্ম্মিলিত সম্পত্তি অর্পণ করিতে পারে। কিন্তু ইহার কোন ঘটনাই প্রিবি কৌন্সলের বিচারপতিগণের সমক্ষে এই ক্ষণে উপস্থিত নাই।

বাদিগণের উপরেই প্রমাণের ভার। সাধারণ আইন-সঙ্গত অনুমান এই যে, ১২২৯ সালের দলীল যথার্থ দলীল এবং যাহা তাহাতে লেখা আছে তাহাই তাহার উদ্দেশ্য, অর্থাৎ তাহা বণ্টন-নামা। ইহা অগ্রের তারিখ যুক্ত, এবং দৃষ্টতঃ উৎকৃষ্ট এবং কার্য্যকারক দলীল। বাদিগণের তাৎকালিক পরিবারস্থ সকল ব্যক্তি এবং যাহাদের নিকট হইতে বাদিগণ আপনাদের স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা সকলেই গুরুতর প্রবঞ্চকতা করিয়াছে, বাদিগণ এমত সপ্রমাণ করিতে না পারিলে ঐ দলীল খণ্ডিত হইতে পারে না। তাহাদের সওয়ালজওয়াবে ব্যক্ত হইয়াছে যে, ঐ বণ্টন-নামা উত্তমর্ণদিগকে বঞ্চনা করার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছিল, এবং তাহাদের সওয়ালজওয়াবে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, তদনুসারে কার্য্য হয় নাই। ঐ দলীল অনুসারে পরিবারের সকল বাহ্যিক কার্য্য কেবল তাহাদের আন্তরিক গূঢ় উদ্দেশ্য গোপন করার জন্য

হইয়াছিল, ইহা ভিন্ন ঐ কথার অন্য কোন ভাব বুঝা যায় না। হরিনাথ ও তাহার ক্রেতাগণ কর্তৃক যে এই দলীল আদালতে দাখিল ও সাব্যস্ত হইয়া তদবলম্বনে নানা ডিক্রী হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট ও অখণ্ডিত প্রমাণ আছে। সর রৌণ্ডেল পামর তাঁহার সুদীর্ঘ তর্কে এই বিষয়ের যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার উল্লেখের আবশ্যক নাই। অনেক বার যে এই রূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহা মেৎ ফিল্ড অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহার জওয়াব এই যে, ঐ সকল কার্য্য মূল অভিসন্ধি স্থির রাখার উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল; এবং যেহেতু এই দলীল উত্তমর্ণদিগকে প্রবঞ্চনা করার উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল, অতএব তাহা উপরিউক্ত রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং ঐ সকল কার্য্যের প্রমাণের দ্বারা অনায়াসেই এমন অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরিবারস্থ ব্যক্তিরা উক্ত দলীল কেবল এক খানা লিপি মাত্র জ্ঞান করিয়াছে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের সম্পত্তির ভাব পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বাদী যে সকল দখীলকারদিগকে উচ্ছেদ করিতে চাহে, যে দলীলের দ্বারা তাহার দাবী বারিত হয়, তাহা এই হেতুতে অকর্ম্মণ্য বলিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে সে নালিশ করিতে পারে কি না যে, যে সকল ব্যক্তি হইতে সে স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা সকলে প্রবঞ্চকতা করিয়া ঐ দলীল প্রস্তুত করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ কোন রায় ব্যক্ত না করিয়া, মোকদ্দমা পূর্ব্ব রায়-জনিত বাধার দ্বারা বারিত নহে এবং কেবল বৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় প্রমাণের উপর নির্ভর করে বলিয়া, এই মত ব্যক্ত করিলেন যে, যখন প্রকৃত ও বৈধ বণ্টননামা প্রবল করণার্থেও ঐ সকল প্রকাশ্য কার্য্য হয়, তখন ঐ দলীলান্তর্গত স্বত্বের প্রতি আপত্তি হইলে অথবা সেই স্বত্ব প্রবল করিতে হইলে ঐ দলীল অন্তর্গত যে সকল প্রকাশ্য কার্য্য হইয়াছে তাহা স্বতঃই কপটাচরণমূলক বিবেচনা করা যাইতে পারে না; এবং বাদিগণ ঐ দলীলের যে উদ্দেশ্য বলে তাহা গ্রহণ না করিয়া বরং প্রতিবাদিগণের বর্ণিত উদ্দেশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে।

অতএব প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের মত এই যে, বণ্টন ১২২৯ সালের দলীল মতে কি ১২৪৫ সালের দলীল মতে হইয়াছিল, তাহা রেস্পণ্ডেণ্টের অনুকূল নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত ছিল, এবং ৩ য় ইসু অর্থাৎ গ্রাম সমস্ত দেবত্র বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল কি না, তাহারও ঐ প্রকার নির্দ্দেশ করা উচিত ছিল।

প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ ইহাও বলিতে ইচ্ছা করেন যে, পশ্চাতের দলীল সম্বন্ধীয় সমুদায় প্রমাণের ফলের উপরে তাঁহারা যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা, হাইকোর্টের জজেরা ঐ প্রমাণ এই প্রকার চেষ্টা সাব্যস্ত করার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে বলিয়া যে রায় দিয়াছেন তাহার সহিত নিতান্ত বিভিন্ন নহে। পরিবারস্থ সম্পত্তির পরিবর্ত্তিত অবস্থা এবং তাহাদের ব্যয় বৃদ্ধি ও আয় ন্যূন হওয়াতে এমত বিবেচনা করা দুঃসাধ্য যে, তাহারা তাহাদের অবশিষ্ট সম্পত্তির এমন অধিক অংশ দেবসেবায় অর্পণ করিয়া তাহাদের হাতছাড়া করিয়াছিল। যখন এই মোকদ্দমায় ইহা বিবেচনা করা যায় যে, বাদিগণ ইহা বলিয়া তাহাদের নালিশের কিয়দংশ উপস্থিত করিয়াছে যে, এক খানা প্রকৃত দলীল যাহা রেজিষ্টরী হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের সম্পত্তি বণ্টনের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা কেবল একটি গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষ মাত্র, তখন প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ অবশ্য এই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহারা যে বলে যে, ঐ দেবত্রের দলীল পরিবারের সকলে সম্মত হইয়া বৃত্তিদানের জন্য স্বাক্ষর করিয়াছে, এবং যাহার চতুর্দ্দিকে অনেক সন্দেহের কথা আছে তাহার উপরে আদালত কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারেন? পরিবারের কতক ব্যক্তির মনের মধ্যে যে

চ্ছু প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকুক, যাহা মিথ্যা কথার ও তঞ্চকতার মধ্য হইতে উদ্ধার করা অতি দুঃসাধ্য, ক্রেতাগণের অন্ততঃ এই স্বত্ব আছে যে, পরিবারস্থ ব্যক্তিরা প্রকাশ্য রূপে যে সকল কার্য্য করিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদিগকে ক্রেতাগণ বাধ্য করিতে পারে। আদালতের শীঘ্র এমন সকল গূঢ় ও তঞ্চকতা-মূলক উদ্দেশ্যের কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে, যাহা অদ্য এক উদ্দেশ্যে ব্যক্ত হইয়া কল্য অন্য এক প্রয়োজনের জন্য পরিত্যক্ত ও অস্বীকৃত হইতে পারে।

উপরোক্ত মত সচরাচর সকল বেনামী কার্য্যেই অবলম্বন করা, অথবা যে বেনামী কার্য্য তঞ্চকতা-মূলক নহে, তদ্দৃষ্টে আদালতের ডিক্রী হইতে পারে বলিয়া যে বহুতর নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহার বলের ব্যতিক্রম করা প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণের ইচ্ছা নহে।

এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করার জন্য প্রিবি কৌন্সিলের বিচারপতিগণ অতি বিনীত ভাবে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে পরামর্শ দিবেন। (গ)

## রামানুজ-নারায়ণের দরখাস্তে মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিতা শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীর হুকুম।

উইণ্ডসর কাসলের রাজ-দরবারে।

১১ ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

উপস্থিত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী,

লর্ড প্রেসিডেণ্ট, লর্ড সেম্বরলেন; আরল্ গ্র্যান্‌বিল্ এবং মেং সেক্রেটরি ব্রুস্।

চুম্বক।—হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রিবি কৌন্সলে আপীল করার জন্য যে ছয় মাস মিয়াদ নিরূপিত আছে, তাহা, যে তারিখে হাইকোর্টের ডিক্রী উচ্চরিত অথবা তারিখবদ্ধ হয়, সেই তারিখ ছাড়িয়া গণনা করিতে হইবে।

অদ্য এই বোর্ডে, প্রিবি কৌন্সিলের জুডিসিয়েল কমিটির চলিত সনের ৬ ই ডিসেম্বর তারিখের নিম্নলিখিত রিপোর্ট পঠিত হইল, যথা:—

"মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিতা মহারাজ্ঞীর বিগত ১১ ই নবেম্বর তারিখের সাধারণ হুকুমের দ্বারা সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত পাটনা নগরবাসী রামানুজ-নারায়ণ নামক এক হিন্দু জমিদারের যে দরখাস্ত আমাদের এই কমিটিতে অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে, প্রার্থীর নালিশে গয়ার প্রধান সদর আমীন ১৮৬৬ সালের ১৯ এ সেপ্‌টেম্বর তারিখে প্রার্থী অর্থাৎ সেই নালিশের বাদীকে দাবী-কৃত ভূমির অংশে স্বত্ববান্ বলিয়া যে ডিক্রী প্রদান করেন, সেই ডিক্রী অন্যথা করিয়া বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্ট ১৮৬৮ সালের ১৬ ই জুন তারিখে যে ডিক্রী দেন, এবং যে ডিক্রী দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহার বিরুদ্ধে সে মহারাজ্ঞীর প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করার অনুমতি পাওয়ার জন্য (যাহা প্রদান করিতে ঐ হাইকোর্টের ক্ষমতা আছে,) উক্ত হাইকোর্টে (প্রার্থীর বাক্য মতে নিয়মিত কালের মধ্যে) দরখাস্ত করে; এবং ঐ দরখাস্তের সহিত এই হল্‌ফান এজহার ছিল যে, মোকদ্দমার মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক; এবং ঐ দরখাস্ত উক্ত হাইকোর্টের দুই জন বিচারপতি অর্থাৎ বিচারপতি এইচ বি বেলি এবং সি পি হব্‌হৌস্ কর্ত্তৃক শ্রুত হয়, এবং প্রার্থী পূর্ব্বে ঐ কোর্টের আপীল বিভাগে, কি জন্য ঐ অনুমতি প্রদত্ত হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য যে হুকুম প্রাপ্ত হয়, তাহা উক্ত বিচারপতিদ্বয় ১৮৬৯ সালের ১৩ ই মার্চ তারিখে রহিত করেন, এবং যে এক মাত্র হেতুবাদে ঐ অনুমতি প্রদত্ত হয় না তাহা এই যে, যে রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করার অনুমতির প্রার্থনা হয়, তাহার তারিখ ১৮৬৮ সালের ১৬ ই জুন, এবং তাহার বিরুদ্ধে আপীল করার অনুমতির

দরখাস্ত ১৮৬৮ সালের ১৬ ই ডিসেম্বরের পূর্ব্বে দাখিল হয় নাই; অতএব ভারতবর্ষীয় আপীল সম্বন্ধে ১৮৬৮ সালের ১০ ই এপ্রিল তারিখের মহারাজ্ঞীর হুকুমের মর্ম্মমতে উচিত কালের মধ্যে তাহা দাখিল হয় নাই; এবং ঐ প্রকার আপীলের অনুমতি করার পক্ষে যে সকল নিষেধক বাক্য উক্ত বিচারপতিদ্বয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই যে, 'যে রায়, ডিক্রী অথবা ডিক্রীর 'হুকুমের বিরুদ্ধে আপীল হয়, তাহার তারিখ 'হইতে ছয় মাসের মধ্যে ঐ রূপ দরখাস্ত না 'হইলে, আপীলের অনুমতি প্রদত্ত হইবে না; 'উক্ত বিচারপতিদ্বয় পক্ষগণের বিরোধ এই বাক্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, যথা—'প্রার্থী তর্ক 'করে যে, যে তারিখে রায় প্রদত্ত হয় অর্থাৎ '১৮৬৮ সালের ১৬ ই জুন তারিখ, গণনায় ছাড়িয়া 'দিতে হইবে, এবং ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, 'সেই তারিখ ছাড়িয়া গণনা করিলে প্রার্থী উচিত 'সময়েই আসিয়াছে।' যে হেতুবাদে উক্ত বিচারপতিদ্বয় ঐ হুকুম দেন তাহা এই যে, 'যে 'স্থলে "তারিখ হইতে" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 'সে স্থলে আমরা বিবেচনা করি যে, সেই দিন '"হইতে" গণনা করাই তাহার ন্যায্য অর্থ, 'সেই দিনের "পর" হইতে গণনা করা ন্যায্য 'অর্থ নহে; অতএব যদি "রায়ের তারিখ হইতে 'ছয় "মাস" গণনা করিতে হয়, তবে এই স্থলে 'ঐ ছয় মাস ১৮৬৮ সালের ১৬ ই ডিসেম্বরে 'অতীত হইয়া গিয়াছে; এবং ঐ তারিখের 'পূর্ব্বে আপীল দাখিল না হওয়ায় আমরা তাহা 'লইতে পারি না।' এ প্রযুক্ত উক্ত বিচারপতিদ্বয় উক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। এক্ষণে প্রার্থী অতি বিনীতভাবে বলে যে, উক্ত বিচারপতিদ্বয় মহারাজ্ঞীর উক্ত হুকুমের যে শব্দার্থ করিয়াছেন তাহা নূতন এবং ভ্রমাত্মক, কারণ, ঐ অর্থ ঐ সকল বাক্যের কেবল সচরাচর অর্থের বিরুদ্ধ, এমত নহে; মহারাজ্ঞীর এডমিনিষ্টর হলে ঐ প্রকার শব্দ সমস্তের যে অর্থ পরিগৃহীত হইয়াছে তাহারও বিরুদ্ধ, এবং প্রার্থী অতি বিনীতভাবে বলে যে, উক্ত বিচারপতিদ্বয় যে হুকুম দিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর সুপ্রীমকোর্টের নিষ্পত্তি ও কার্য্যপ্রণালীর স্পষ্ট বিরুদ্ধ, কারণ, মৃত মহারাজ তৃতীয় জর্জ্জের প্রদত্ত ১৭৭৪ সালের ২৬ এ মার্চ তারিখের ঐ আদালতের সনন্দে উক্ত প্রকার আপীলের নিষেধক দফার ব্যবহৃত "দিন হইতে" শব্দের অর্থ উক্ত সুপ্রীমকোর্ট এই সংস্থাপন করিয়াছিলেন যে, যে তারিখে ডিক্রী উচ্চরিত অথবা তারিখবদ্ধ হয় তাহা ছাড়িয়া গণনা করিতে হইবে; এবং প্রিবি কৌন্‌সিলের তাহা দৃষ্টি করার আবশ্যক হইলে, তাহা দৃষ্টি করার জন্য উল্লিখিত মোকদ্দমার নথীর ও হুকুমের নকল লণ্ডন নগরে প্রার্থীর উকীলের নিকট প্রেরিত হইয়াছে এবং তিনি তাহা প্রিবি কৌন্সিলের কাছারীতে দাখিল করিয়াছেন। প্রার্থী এইক্ষণে অতি বিনীত ভাবে তর্ক করে যে, মন্ত্রি অধিষ্ঠিতা মহারাজ্ঞীর উক্ত হুকুম-বর্ণিত কালের মধ্যেই আপীল করার অনুমতির প্রার্থনায় প্রার্থীর দরখাস্ত দাখিল হইয়াছিল, এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় ঐ প্রকার অনুমতি প্রদান করিতে অস্বীকার করায় সুবিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে, এবং প্রার্থীর স্বত্বের ক্ষতি হইয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত হাইকোর্ট যে সময়ের মধ্যে ঐ প্রকার অনুমতি প্রদান করিতে পারেন, তাহা এইক্ষণে অতীত হইয়াগিয়াছে, অতএব প্রার্থী অতি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করে যে, হাইকোর্টের উক্ত ১৮৬৮ সালের ১৬ ই জুন তারিখের ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য মহারাজ্ঞী তাহাকে বিশেষ অনুমতি প্রদান করেন, এবং ঐ মোকদ্দমায় যে সকল সওয়াল জওয়াব, প্রমাণ, রায়, ডিক্রী, রুবকারী, এবং হুকুম দাখিল হইয়াছে, প্রিবি কৌন্সিলের কাছারীতে শীঘ্র তাহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিতে উক্ত হাইকোর্টের প্রতি হুকুম হয়। প্রিবি কৌন্সিলের জুডিসিয়েল কমিটির লর্ডগণ মহারাজ্ঞীর

উক্ত সাধারণ হুকুম অনুসারে প্রার্থীর আপীল করার জন্য অনুমতি পাওয়ার প্রার্থনা পর্য্যালোচনা করিয়া এবং প্রার্থীর কৌন্সেলের তর্ক শ্রবণ করিয়া অদ্য এক মতে মহারাজ্ঞীর হুজুরে রিপোর্ট করিতেছেন যে, এই ব্যক্ত করা উচিত যে, ঐ লর্ডগণের মত এই যে, যখন ঐ দরখাস্ত দাখিল হইয়াছিল তখন আপীল দাখিল করার সময় অতীত হয় নাই; অতএব মোকদ্দমা এইক্ষণে হাইকোর্টে এই মর্ম্মে পুনঃপ্রেরণ করিতে হইবে যে, মোকদ্দমার মূল্য ১০০০০ টাকার অধিক হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ দাখিল হইলে, উক্ত কোর্ট নিয়মিত রূপে আপীল গ্রহণ করিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী উক্ত রিপোর্ট দৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রিবি কৌন্সিলের পরামর্শ মতে উক্ত রিপোর্ট গ্রাহ্য করিলেন, এবং হুকুম দিলেন, এবং তদনুসারে এই হুকুম ব্যক্ত হইল যে, যখন প্রার্থীর দরখাস্ত দাখিল হইয়াছিল তখন আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার সময় অতীত হইয়া যায় নাই, এবং মোকদ্দমার মূল্য ১০০০০ টাকার অধিক হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদত্ত হইলে আপীল দাখিল করিয়া লওয়ার জন্য, মোকদ্দমা হাইকোর্টে পুনঃপ্রেরিত হইবে। অতএব বাঙ্গালার ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতিগণও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য ব্যক্তিরা ইহা অবগত হইয়া এতদনুসারে কার্য্য করিবেন। (গ)

১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৬৯।

**লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড; সর জেমস্ ডবলিউ কল্‌বিল্; নাবিক সম্বন্ধীয় বিচারালয়ের বিচারপতি; লর্ড জষ্টিস গিফার্ড ও সর লরেন্স্ পীল।**

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

মহারাণী শিবেশ্বরী দেবী
বনাম
মথুরানাথ আচার্য্য।

চুম্বক।—কোন ভূমি দেবসেবায় নিয়োজিত হইলে, তাহার খাজানা আইনমতে ঐ দেবত্তর সম্পত্তি, সেবাতের তাহাতে আইনানুগত সম্পত্তি নাই, তাহার কেবল ঐ দেব-সেবার বৃত্তির তত্ত্বাবধারণের স্বত্ব আছে; এবং সে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না, কেবল প্রথানুসারে তাহার উচিত জমা প্রদান করিতে পারে। এক নির্দ্দিষ্ট এবং অপরিবর্ত্তনীয় খাজানায় ঐ ভূমির জমা প্রদান করা সেবাতের কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য।

নিষ্পত্তি।—এই আপীল প্রিবি কৌন্সিলের লর্ডগণের সমক্ষে একতরফা বিচারিত হইল।

যে মোকদ্দমা হইতে এই আপীল উপস্থিত তাহা কেবল মথুরানাথ আচার্য্য বাদি-কর্ত্তৃক মহারাণী কৃষ্ণমণি দেবী যিনি দেবসেবায় অর্পিত এক তালুকের সেবাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এবং আরজীর লিখিত কতিপয় অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে যশোহরের দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হয়। উক্ত তালুক সম্বন্ধীয় কতিপয় জমার স্বত্ব সাব্যস্ত ও কতিপয় ভূমির দখল পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ঐ নালিশ উপস্থিত হয়; ঐ জমা এবং ভূমি বাদী এই বলিয়া দাবী করে যে, গৌরিমোহন বিশ্বাস নামক এক হিন্দু যাহাকে প্রথমে উক্ত জমার স্বত্ব প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার বংশোদ্ভূত ৪ জন মুসলমান সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক-প্রতিবাদিনীর নিকট বাদী ক্রয় করে।

বর্ত্তমান আপেলাণ্ট তাহার নাবালগ পুত্রের অভিভাবিকা স্বরূপে উপস্থিত; কিন্তু এই নালিশের প্রারম্ভে ঐ নাবালগের পিতামহী মহারাণী কৃষ্ণমণি দেবী যাঁহার ইতিমধ্যে মৃত্যু হইয়াছে, তিনি নাবালগের মৃত পিতার আদেশক্রমে অভিভাবিকা ছিলেন। জমার ভাব যাহাই হউক, অর্থাৎ রাইয়তওয়ারী অথবা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জমাই হউক, নাবালগ যে ঐ ভূমির উচ্চতর

মালিক তাহার অধীনে ঐ জমা স্বীকৃত হয়।

বাদী কহে যে, ঐ জমা মৌরসী, এবং তাহা এক নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় খাজানায় ভোগ হইয়া আসিয়াছে।

আপেলাণ্ট সেবাত ঐ জমার মৌরসী ভাব, তাহার অপরিবর্ত্তনীয় খাজানা ও ক্রয়ের কথা অস্বীকার করে। সে কহে যে, ঐ জমার প্রজারা যাহাদের নিকট হইতে বাদী বলে যে, সে ক্রয় করিয়াছে, তাহাদের কোন মৌরসী জমা ছিল না, এবং তাহাদের যে স্বত্ব ছিল তাহা বাদীর নিকট কথিত বিক্রয়ের পূর্ব্বে, তাহারা আপেলাণ্টকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

কথিত ৪ জন বিক্রেতা-প্রতিবাদিগণের মধ্যে ৩ জন ঐ বিক্রয় অস্বীকার করিয়া আপেলাণ্টকে ছাড়িয়া দেওয়ার কথা স্বীকার করে। কিন্তু চতুর্থ ব্যক্তি বিক্রয় স্বীকার ও ছাড়িয়া দেওয়া অস্বীকার করে; অতএব আপেলাণ্টের সহিত তিন জন ঐক্য হয়, এবং এক জন বাদীর সহিত ঐক্য হয়। কিন্তু তাহারা সকলেই জমা মৌরসী বলিয়া ব্যক্ত করে।

যে তালুকের সহিত এই সকল জমার সম্বন্ধ আছে তাহা দেবসেবায় নিয়োজিত হইয়াছিল; অতএব তাহার খাজানা ঐ ঠাকুরের আইন-সঙ্গত সম্পত্তি। সেবাতের ঐ আইন-সঙ্গত সম্পত্তি ছিল না, তাহার কেবল দেবসেবার বৃত্তির তত্ত্বাবধারকের স্বত্ব ছিল।

সেই কার্য্যনির্ব্বাহে সেবাত ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারে না, কিন্তু তাহার মধ্যে প্রথানুযায়ী উচিত জমা সৃজন করিতে পারে।

যে বিক্রয় মতে বাদী দাবী করে, তাহা যশোহরের দেওয়ানী আদালতের জজ মেং সিটনকার যিনি এই মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন, তাঁহার ডিক্রী দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

তাঁহার নিষ্পত্তির বিরুদ্ধ আপীলে তাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক স্থির থাকে।

অতএব দুই আদালত বাদীর নিকট বিক্রয়ের কথা সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং কথিত ছাড়িয়া দেওয়ার প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করিয়াছেন।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দেশের পোষক প্রমাণ সমস্ত যথেষ্ট কি না, তাহা লর্ডগণ অনুসন্ধান করিবেন না। জমা এক নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় খাজানায় ভোগ হওয়ার কথা প্রমাণের দ্বারা সব্যস্ত হইয়াছে কি না, প্রিবি কৌন্সিলের এই আপীলে কেবল সেই কথারই নিষ্পত্তি হইবে।

প্রসন্নকুমারের মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপরে আপেলাণ্ট নির্ভর করে, এবং সে তাহা তাহার জওয়াবে উল্লেখ করিয়াছে এবং তাহা সওয়াল-জওয়াবেও উক্ত হইয়াছে; তাহার মর্ম্ম এই যে, এই মোকদ্দমায় উত্থাপিত জমার ন্যায় জমা যাহা আপেলাণ্ট রাইয়তওয়ারী জমা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে তাহা জমিদার অথবা তালুকদারের সম্মতি ভিন্ন হস্তান্তরিত হইতে পারে না। দুই আদালতের জজেরাই স্থির করিয়াছেন যে, ইহা অপরিবর্ত্তনীয় করের জমা, এবং উক্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ইহাতে খাটে না। উচ্চতর মালিকের সম্মতি ভিন্ন ইহা বিক্রীত হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কোন মত ব্যক্ত করেন নাই। আধুনিক এবং স্থানীয় প্রথা দ্বারা এই প্রকারের প্রশ্নের এমন তারতম্য হইতে পারে যে, মৌরসী জমার আনুষঙ্গিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া কেবল একটি আইন-ঘটিত প্রশ্ন স্বরূপে এই বিষয়ের উপরে সর্ব্ব শেষে আপীল-আদালতের কোন মত ব্যক্ত করা শ্রেয় নহে। সাধারণের পক্ষে আবশ্যকীয় যে কোন প্রশ্ন বর্ত্তমান মোকদ্দমার বিচারের জন্য নিতান্ত আবশ্যকীয় নহে, তৎসম্বন্ধে লর্ডগণ একতরফা আপীলের মোকদ্দমায় কোন রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন না।

যে সমস্ত ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল হইয়াছে

তাহা যদি অন্যথা না হইত, তাহা হইলে সওয়াল-জওয়াব, বিশেষতঃ, রায় সমস্ত দৃষ্টে, এক অপরিবর্তনীয় জমায় ভোগ করার স্বত্ব পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধা স্বরূপ পক্ষগণের এবং যাহারা তাহাদের অধীনে দাবী করে, তাহাদের উপরে বাধ্যকর বিবেচনা করা যাইত।

লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, এই সকল জমা যে কখন, এক অপরিবর্তনীয় করে ভোগ হইয়াছিল, মোকদ্দমায় তাহার কোন সন্তোষকর প্রমাণ নাই। এই বিচারে একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা একেবারেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ সেবাতের স্বত্বের ভার, এবং সে যে অন্য কাহাকে অধীন স্বত্ব প্রদান করিতে আইনমতে অক্ষম তাহা বিবেচনা করা হয় নাই। বৃত্তির উপকারের জন্য পরিবর্তনশীল জমা যাহা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার পরিবর্তে অপরিবর্তনশীল খাজানা সৃজন করার কালে ঐ খাজানা ন্যায্য এবং সঙ্গত হইলেও, তাহা চিরকালের জন্য সৃজন করা সেবাতের কর্তব্যকর্ম্মের বিরুদ্ধ; অতএব তাহা অনুমান করিয়া লওয়া যায় না। যে স্থলে পরিবর্তন-শীল খাজানা স্বভাবসিদ্ধ, সে স্থলে মৌরসী জমা প্রদানের সহিত একটি নির্দ্দিষ্ট খাজানার উল্লেখ করিলেই ঐ খাজানা যে অপরিবর্তনীয় খাজানা হইল, এমত, কোন স্পষ্ট বাক্য, অথবা অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলে, বিবেচনা করা যাইতে পারে না। এস্থলে খাজানা যে অপরিবর্তনীয় ছিল, একথার বিরুদ্ধে দুই অনুমানের উদ্ভব হইতেছে, অর্থাৎ তাহা খাজানার সচরাচর ভাব, এবং এই জমার বিশেষ ভাবের উপর নির্ভর করে এই খাজানা যে পরিবর্তন-শীল, এই অনুমান মোকদ্দমার আর এক ঘটনা হইতে উত্থিত হয়; এবং তাহা এই যে, কেবল যে এক দলীলে ঐ খাজানা অপরিবর্তনীয় বলিয়া লেখা আছে তাহা, যে তিন দলীলে মাজিষ্ট্রেট যেং স্কিনরের দস্তখত জাল করা হইয়াছিল তাহারই এক দলীল। প্রমাণ প্রস্তুত করার জন্য এই তঞ্চকতার গতিকে মোকদ্দমার এই ভাগের প্রতি আরো সন্দেহ জন্মে। জমা ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থাৎ ইস্তাফার যে সকল শব্দের উপরে হাইকোর্ট নির্ভর করিয়াছেন তাহাতে জমা নির্দ্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া লেখা নাই। ঐ দলীল যাহার উপরে হাইকোর্ট নির্ভর করিয়াছেন, লর্ডগণের বিবেচনায় তদ্দ্বারা অতি অল্প অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইস্তাফা-দাতা যে জমার উপরে নির্ভর করে তাহা সেবাত সেই প্রকারের জমা বলিয়া অবলম্বন এবং গ্রাহ্য করিয়াছিল, এবং যে স্থলে ঐ দলীলে এমন লেখা নাই যে, খাজানা নির্দ্দিষ্ট এবং জমা মৌরসী ছিল, সে স্থলে ঐ স্বত্ব স্বীকারের প্রসঙ্গ সম্বন্ধে ঐ দলীলের কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব জমা যে অপরিবর্তনীয় খাজানার জমা ইহা লর্ডগণের বিবেচনায় সপ্রমাণ হয় নাই। এই বিরোধের অবস্থা দৃষ্টে বাদীর কার্য্য সমস্ত দখলের বৈধ স্বত্বের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে না; কারণ, তাহার সহিত তাহার জমিদারের বিরোধে যে এক মাত্র স্বত্বের, অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় খাজানায় জমা ভোগ করার স্বত্বের উপরে নির্ভর করা হয় তাহা সংস্থাপিত হয় নাই, এবং যেপর্য্যন্ত মধ্যবর্ত্তী জমার দাবীর বৈধতা সংস্থাপিত না হয় এবং যে পর্য্যন্ত বাদী পরিবর্তনশীল খাজানায় মৌরসী স্বত্বের উপরে নির্ভর করা তাহার উচিত স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ঐ স্বত্বের উপরে নালিশের দ্বারা তাহা সংস্থাপন না করে, (যে নালিশে জমার প্রকৃত ভাব এবং তাহা জমিদার অথবা তালুকদারের সম্মতি ব্যতীত হস্তান্তরিত হইতে পারে কি না, তাহা নির্ণীত হইতে পারে) সে পর্য্যন্ত হিসাব করিয়া খাজানা লইতে জমিদারের অথবা তালুকদারের স্বত্ব প্রবল থাকিবে। অতএব লর্ডগণ এই আপীল মঞ্জুর করিতে এবং যে নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে

তাহা অন্যথা করিতে এবং তৎপরিবর্ত্তে খরচা সমেত রেস্পণ্ডেণ্টের নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করিতে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে বিনীত ভাবে পরামর্শ দিবেন ; এবং লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, আপেলাণ্ট এই আপীলের খরচা পাইবে। (গ)

৩ রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## সর জেমস্‌ কল্‌বিল্‌ সর জোসেফ্‌ নেপিয়র, লর্ড জষ্টিস গিফার্ড, ও সর লরেন্স পীল।

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

বীরচন্দ্র যুবরাজ

বনাম

ভুলুয়ার ডেপুটি কালেক্টর।

চুম্বক।—১৮৪৫ সাল হইতে নালিশ উত্থাপনের কাল পর্য্যন্ত যে ভূমি সম্পত্তি প্রতিবাদীর দখলে ছিল তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বাদী ১৮৫৬ সালে নালিশ উপস্থিত করাতে, স্থির হইল যে, বাদীর ঐ ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে তাহার দখল ছিল, এবং তাহার দখলের স্বত্ত্ব আছে।

নিষ্পত্তি।—এই মোকদ্দমার সওয়াল-জওয়াব এত দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত হইয়াছে যে, লর্ডগণ তাহা বিশেষ পর্য্যালোচনা করিতে পারিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মত এই যে, নিম্ন লিখিত সংক্ষিপ্ত হেতুবাদে ইহার নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে।

আপেলাণ্ট ১৮৫৬ সালে নালিশ উপস্থিত করেন। তিনি পরগণা সিমনাভুক্ত বলিয়া কতিপয় ভূমি পাওয়ার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁহার আরজীতে যে ভূমি পাওয়ার প্রার্থনা করেন তাহার মধ্যে, ১৮ দ্রোণ ভূমি তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য ১৮৪৫ সালের মে মাসে হুকুম হয়। মেং এবরক্রম্বি এই হুকুম দেন। তিনি দাবীদারকে এই সকল ভূমি ফেরৎ দিতে ও বন্দোবস্তের, সাধারণ রিপোর্টে বিরোধীয় অবশিষ্ট ভূমির বিস্তারিত বর্ণনা লিখিতে, হুকুম দেন।

ঐ হুকুম অনুসারে দখল দেওয়া হয়। ১৮৪৫ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত বিরোধীয় ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের নির্ব্বিরোধ দখল ছিল। নালিশ উপস্থিত হওয়ার বিলম্বের কোন হেতু প্রদর্শিত হয় নাই।

এই ক্ষণকার বিরোধীয় ভূমির কিয়দংশ সম্বন্ধে যে ১৮১১ সালের নালিশ ও ১৮২৪ সালের কার্য্য সমস্ত হইয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তখন যে, গবর্ণমেণ্ট দখীলকার ছিলেন তাহার প্রবল প্রমাণ আছে।

সদর মফস্বল সিবিল কোর্ট-আমীন যে এক রিপোর্ট করেন তাহা লর্ডগণের অবলম্বন করার জন্য প্রার্থনা হইয়াছে; কিন্তু তাহা আপেলাণ্টের এবং রেস্পণ্ডেণ্টেরও প্রার্থনা মতে অগ্রাহ্য হয়। আপেলাণ্ট তাহার বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিয়াছিল।

মুন্সেফের রিপোর্ট একতরফা হইয়াছিল।

তাহা গ্রহণ করা উচিত ছিল কি না, লর্ডগণ তাহার সিদ্ধান্ত করা আবশ্যকীয় বিবেচনা করেন না।

প্রধান সদর আমীন আমীনের রিপোর্টে যে কারণে সম্মত হন নাই তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিলে আরও ভাল হইত। কিন্তু সে যাহা হউক, যে স্থলে ইহা স্বীকৃত যে, গবর্ণমেণ্ট ১২৪৫ সাল অবধি দখলীকার ছিলেন এবং এখনও আছেন, সে স্থলে লর্ডগণের রায় এই যে, আপেলাণ্টের দুই কথা, অর্থাৎ নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে তাহার দখল থাকার ও দখলের স্বত্ব থাকার কথা সপ্রমাণ করা কর্তব্য ছিল। দখলের স্বত্বের কোন প্রমাণ নাই, এবং দখলেরও যথেষ্ট প্রমাণ নাই। দখলের সহিত কবুলিয়ৎ সমস্তের অথবা তাহার কোন এক কবুলিয়তের

সম্বন্ধের কোন প্রমাণ নাই। কএক জন নিঃসম্পর্কীয় স্বাধীন সাক্ষী নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের দখলের কথা বলিয়াছেন, এবং আপেলাণ্ট তাহার বিরুদ্ধ যে প্রমাণ দিয়াছে তাহা রেস্পণ্ডেণ্ট খণ্ডন করিয়াছে। ১৮১১ সাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য হইয়া গিয়াছে তাহা গবর্ণমেণ্টের দখলের অনুকূল এবং আপেলাণ্টের দখলের প্রতিকূল। প্রমাণ-ভার আপেলাণ্টের উপরেই বর্ত্তে, কিন্তু তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। অতএব লর্ডগণ এই আপীল খরচা সমেত ডিস্মিস করার জন্য শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে বিনীত ভাবে পরামর্শ দিবেন। (গ)

২০ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## লর্ড ওএষ্টবরী, সর জেম্‌স্‌ ডবলিউ কল্‌বিল, সর জোসেফ নেপিয়র ও সর লরেন্‌স পাল।

কলিকাতার হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

খাজে আসানুল্লা
বনাম
অভয়চরণ রায় প্রভৃতি।

**চুম্বক।**—গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নীলামে গবর্ণমেণ্ট ১৮২২ সালের ১১ কানুন মতে এক পরগণার জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়া তদন্তর্গত এক তালুক যাহা দশসালা বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট হয়, তাহা তালুকদার স্বরূপে বাদিগণের সহিত পুনঃ বন্দোবস্ত করেন। তাহার পরে, এবং বাদিগণের সহিত যে মিয়াদে ঐ পুনঃ বন্দোবস্ত হয় তাহা গত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জমিদারী স্বত্ব প্রতিবাদীকে বিক্রয় করেন, এবং প্রতিবাদী বাদীকে বেদখল করে। বাদী তাহাতে প্রতিবাদিগণের নামে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে কালেক্টরের নিকট নালিশ করে।

এস্থলে, নালিশ উচিত রূপেই ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে উপস্থিত হইয়াছে।

আর, পরগণার হারে খাজানা বৃদ্ধি হওয়ার সর্ত্তে তালুকদারদিগকে তাহাদের মিয়াদ পর্য্যন্ত তালুকে স্থির রাখাই গবর্ণমেণ্টের মনস্থ ছিল, এবং এই মোকদ্দমায় যে স্থলে ইহা দেখা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করেন তদ্দ্বারা তালুক অন্যথা হয় নাই, সে স্থলে প্রতিবাদী যে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রয় করে, সে বাদীকে উচ্ছেদ করিতে পারে না, কারণ, বাদী করবৃদ্ধির দায়ের অধীনে দখীলকার থাকিতে স্বত্ববান ছিল।

১৮২২ সালের পূর্ব্বে যে সমস্ত নীলামের আইন ছিল তদনুসারে ক্রেতা ইচ্ছা করিলেই তালুকদারদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিত না, তাহাতে তালুকদার কেবল পরগণার সম্পূর্ণ হার পর্য্যন্ত খাজানা দিতে দায়ী ছিল, এবং কেবল সেই বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অস্বীকার করিলেই উচ্ছেদিতে হইতে পারিত। কিন্তু ১৮২২ সালের ১১ কানুনমতে, দশসালা বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট তালুক সমস্ত ঐ কানুনের ৩১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত তালুক না হইলে, বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতার দ্বারা এককালে অন্যথা ও বাতিল হইতে পারে।

১৮২২ সালের ১১ কানুনের অন্তর্গত কোন নীলাম-ক্রেতা যদি কোন তালুকদারী স্বত্ব অন্যথা করিতে চাহে, তবে ঐ তালুক অন্যথা হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করার জন্য তাহার কোন সপষ্ট কার্য্য করা আবশ্যক।

**নিষ্পত্তি।**—জেলা ত্রিপুরার মধ্যে বরদাখাত নামক বৃহৎ জমিদারীর যে অংশে তালুক পূর্ব্বাআপ্তির ভূমি ও মৌজা সমস্ত স্থিত, আপেলাণ্ট সেই অংশের জমিদারীস্বত্বের বর্ত্তমান মালিক। এই তালুক স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে ১৮০১ সালে জমিদারীর ঐ অংশের তৎকালের মালিক মুর্জা হোসেনআলী কর্ত্তৃক রেস্পণ্ডেণ্টের পিতা অথবা পূর্ব্বপুরুষ বিশ্বনাথ রায়ের অনুকূলে সৃষ্ট হয়।

১৫৫০। ১০ টাকা স্থায়ী জমায় ইহা পুরুষানুক্রমে ভোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য

বলিয়া সৃষ্ট হয়। পশ্চাল্লিখিত বাকী রাজস্বের নীলামের কালে বরদাখাস্ত জমিদারীতে আরও অনেক তালুক ছিল যাহার মধ্যে কতক দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু তাহার অধিক ভাগই, তাহা যে সকল মহালভুক্ত তাহার স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট হয়।

১৮৩৫ সালের জানুয়ারি মাসে বরদা খাস্তের ৷৷০ আনা অংশ এবং ১৮৩৬ সালের মে মাসে ৵০ অংশ (এই শেষোক্ত ৵০ আনা অংশের মধ্যে বিরোধীয় তালুক ছিল) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের জন্য নীলাম হয়, এবং দুই বারেই গবর্ণমেণ্ট নিজে তাহা ক্রয় করিয়া তৎকালের নীলামের আইনের দ্বারা বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতার যে সকল স্বত্ব ছিল তাহা প্রাপ্ত হন।

সেই সমস্ত স্বত্ব পরিচালনে গবর্ণমেণ্ট ঐ সম্পত্তির পুনঃবন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত তালুকদারগণের এবং তৎসঙ্গে বিশ্বনাথ রায় অথবা তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চলে। পশ্চাতে ইহার বিশেষ পর্য্যালোচনা করা যাইবে; এইক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অবশেষে তালুক পূর্ব্বাআয়ত্তির ভূমি সম্বন্ধে অভয়চরণ রায়ের সহিত তাহার নিজের ও অন্যান্য রেস্পণ্ডেণ্টের পক্ষে ১৮৪১ সালের আগস্ট মাসে এক বৎসরের জন্য এবং ১৮৪২ সালের আগস্ট মাসে ২০ বৎসরের জন্য এবং ১৮৬২ সালের এপ্রিল মাসে এক বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত হয়। এই তৃতীয় বন্দোবস্ত শেষ হইবার পরে গবর্ণমেণ্টের কালেক্টর এই তালুকের রাইয়ত ও কৃষকদিগকে নোটিস দেন যে, তাহারা গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে খাজানা না দেয়; এবং ১৮৬৩ সালের ২৩ এ নবেম্বর তারিখে ঐ ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের জমিদারীর স্বত্ব, তালুকদারদের কোন স্বত্ব থাকিলে সেই স্বত্বাধীনে নীলাম হইয়া আপেলাণ্ট-কর্তৃক ক্রীত হয়।

১৮৬৪ সালের মার্চ মাসে রেস্পণ্ডেণ্ট এই নালিশ আপেলাণ্টের বিরুদ্ধে উপস্থিত করে, এবং তাহা হইতেই এই আপীল উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের ঐ ভূমির তালুকদারী-স্বত্ব হইতে বেদখল হওয়ার প্রসঙ্গে ঐ নালিশ কালেক্টরের নিকট ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে উপস্থিত হয়। ঐ হাকিম তাঁহার ১৮৬৪ সালের ৭ ই জুন তারিখের ডিক্রী দ্বারা নালিশ ডিস্মিস্ করেন, কিন্তু তাঁহার নিষ্পত্তি হাইকোর্ট-কর্তৃক ১৮৬৫ সালের ২৩ এ মার্চ তারিখে অন্যথা হয়, এবং এই শেষোক্ত ডিক্রী, এবং তৎপরে পুনর্ব্বিচারের এক দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়া যে হুকুম হয় তাহার বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে।

পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ সংক্ষেপে এই যে, রেস্পণ্ডেণ্টগণ কহে যে, তাহাদের তালুক এখনও বর্ত্তমান আছে, এবং যদিও তাহারা স্বীকার করে যে, জমিদার উচিত রূপে করবৃদ্ধি করার উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের করবৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তথাপি তাহাদের দখলের যে স্বত্ব আছে জমিদার কোন রূপে তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করিতে স্বত্ববান হইতে পারেন না। পক্ষান্তরে, আপেলাণ্ট বলে যে, রাজস্ব বাকীর নীলামের পরে গবর্ণমেণ্ট ঐ নীলাম-ক্রেতা-সূত্রে, বিশ্বনাথের অনুকূলে যে তালুক সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এক কালে এবং চূড়ান্ত রূপে অন্যথা ও বিনষ্ট করিয়াছেন। এবং তাহার পরে গবর্ণমেণ্ট অভয়চরণের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করেন তাহা কেবল কিছু কালের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত মাত্র, এবং যে স্থলে তাহার শেষ ইজারা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, সে স্থলে গবর্ণমেণ্টের এবং এইক্ষণে আপেলাণ্টের ঐ সকল ভূমির দখল লইয়া প্রজাদিগের নিকট নিজে খাজানা আদায় করিবার, অথবা যে ব্যক্তি

অধিক টাকা দিতে চাহিবে তাহার সহিত নূতন বন্দোবস্ত করিবার, ক্ষমতা আছে। সে আরও তর্ক করে যে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্য দ্বারা যদি রেস্পণ্ডেণ্টগণ পুনঃবন্দোবস্তের কোন ন্যায়ানুগত স্বত্ব পাইয়া থাকে, তবে বেদখলের মোকদ্দমা সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের দ্বারা কালেক্টরকে যে বিচারাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা ঐ স্বত্ব পরিচালিত হইতে পারে না। ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে, নীলামের কালে গবর্ণমেণ্টের যে স্বত্ব ছিল, আপেলাণ্ট ততোধিক স্বত্বের দাবী করিতে পারে না; এবং প্রথমে গবর্ণমেণ্টের ঐ জমা অন্যথা করার যে স্বত্ব ছিল, তাহা যদি গবর্ণমেণ্ট পরিত্যাগ করিয়া বা হারাইয়া থাকেন, তবে আপেলাণ্ট তাহা এইক্ষণে দাবী করিতে পারে না।

লর্ডগণের সমক্ষে যে প্রশ্নের তর্ক হইয়াছে তাহা এই যে :—

১ ম—১৮২২ সালের ১১ কানুনের ( অর্থাৎ নীলাম সম্বন্ধীয় যে কানুন মতে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছিলেন ) প্রকৃত মর্ম্মানুযায়ী এই জমা অন্যথা ও লোপ করিতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব ছিল কি না?

২ য়—ঐ স্বত্ব থাকার কথা স্বীকার করিয়া লইলেও, তাহা থাকার কালে কখন পরিচালিত হইয়াছিল কি না?

এবং পরিশেষে, রেস্পণ্ডেণ্টদিগের যে স্বত্বই হউক, তাহাদের এই নালিশ ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে উপস্থিত হওয়া উচিত হইয়াছে কি না?

যে শ্রেণীমতে এই তিন প্রশ্ন উল্লিখিত হইল, লর্ডগণ সেই শ্রেণীমতেই তাহার বিচার করিবেন।

স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে যে সকল রাজস্ব বাকীর নীলাম সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, দশসালা বন্দোবস্তের কালে যাহাদের সহিত রাজস্বের বন্দোবস্ত হইয়াছিল রাজস্ব-বাকীর নীলাম-ক্রেতাকে তাহাদের অবস্থায় স্থিত করিয়া রাজস্ব আদায় রক্ষা করাই ঐ সকল আইনের উদ্দেশ্য। স্থায়ী বন্দোবস্তের পরে বাকীদার জমিদার অথবা তাহার পূর্ব্বাধিকারীরা যে সকল পেটাও বন্দোবস্ত করিয়াছেন অর্থাৎ যে সকল পাট্টা দিয়াছেন এবং যদ্দ্বারা জমিদারীর খাজানা ও উপস্বত্ব যাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব আদায়ের প্রতিভূ স্বরূপ, তাহার হ্রাস হইয়াছে, ঐ সমস্ত আইনের দ্বারা ঐ নীলাম-ক্রেতাকে তাহা রহিত করার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপকগণ এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল স্থলে ঠিক এক উপায় অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে যে বিবিধ আইন প্রচার করিয়াছেন তাহার বিধানের শব্দের ও তৎপ্রদত্ত ক্ষমতার প্রভেদ আছে। ১৮৪০ সালের পূর্ব্বে যে সকল আইন প্রচারিত হয় তাহা মেং কলবিনের যে এক পত্র এই নথীতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে সমালোচিত হইয়াছে। বোর্ড অব রিবেনিউর ( মেং কলবিন যাহার সেক্রেটরী ছিলেন ) এবং এই জমিদারী যে ডিবিজনের অন্তর্গত তাহার কমিসনর মেং ড্যাম্পিয়রের পরস্পর মতভেদ হওয়াতে ঐ পত্র লেখা হয়। রেস্পণ্ডেণ্টগণ এইক্ষণে যে তর্ক করে, মেং ড্যাম্পিয়রেরও সেই রায় ছিল; তাহা এই যে, তালুকদারদের জমা দশসালা বন্দোবস্তের পরে অথবা পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়া থাকুক, তাহারা কয়েকটি বর্জ্জিত ঘটনা ভিন্ন, পরগণার নিরিখে তাহাদের খাজানা বৃদ্ধি হওয়ার দায়ের অধীনে জমা ভোগ করিতে স্বত্ববান। এবং নথীর ১৭ পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে যে, ঐ রায়, বোর্ড অব্ রিবেনিউ নিজে ১৮৩৩ সালের মে মাসে যে রায় ব্যক্ত করেন তাহার সহিত ঐক্য। আইনের এই অর্থ খণ্ডন ও অন্যথা করার জন্য ১৮৩৩ সালে বোর্ড অব রিবেনিউর পক্ষে মেং কলবিনের ঐ পত্র লেখা হয়।

মেং কলবিনের কয়েকটি সিদ্ধান্তে লর্ডগণ

সম্পূর্ণ রূপে সম্মত। তাঁহারা মেং কলবিনের সহিত এক মতে নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, ১৮২২ সালের পূর্ব্বে যে নীলামের আইন প্রচলিত ছিল, তদন্তর্গত ক্রেতা ইচ্ছামতে তালুকদারকে তাহার ভূমি হইতে উচ্ছেদিত করিতে পারিত না, এবং অধিক হইলেও সে পরগণা অথবা জেলার সম্পূর্ণ নিরিখে খাজানা দিতে দায়ী ছিল, এবং কেবল ঐ বর্দ্ধিত হারে খাজানা দিতে অস্বীকার করিলেই সে উচ্ছেদিত হইতে পারিত। তাঁহাদের আরও মত এই যে, মেং কলবিন বিশুদ্ধ রূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ১৮২২ সালের ১১ কানুন মতে, ঐ বন্দোবস্তের পরে যে সমস্ত তালুক সংস্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় বিধি এই যে, ঐ তালুক ঐ কানুনের ৩২ ধারার মর্ম্মান্তর্গত না হইলে "রাজস্ব বাকীর নীলাম-ক্রেতার ইচ্ছা "মতে এককালে অন্যথা ও বিলুপ্ত হইতে "পারে।" পূর্ব্ব কানুন সমস্তের বাক্যগুলির "সহিত উক্ত কানুনের ৩১ ধারার বাক্যগুলির বিশেষ প্রভেদ আছে। তাহার বিধান এই যে, "যে সমস্ত জমা বাকীদার অথবা তাহার "পূর্ব্বাধিকারীর দ্বারা সৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা অন্যথা ও বিলুপ্ত হইতে পারে।" পক্ষান্তরে, ১৭৯৩ সালের ৪৪ কানুনের ৫ ধারার বিধান কেবল এই যে, বাকীদার মালিক তাহার অধীন তালুকদারের সহিত যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া থাকে অথবা অধীন ইজার-দারদিগকে যে সকল পাট্টা দিয়া থাকে, তাহা সমস্ত অন্যথা হইবে, এবং ক্রেতা তালুক-দারদিগের নিকট হইতে পরগণার সম্পূর্ণ নিরিখে খাজানা আদায় করিবে। অতএব করবৃদ্ধির দায়ের অধীনে তালুকদারের তালুক বলবৎ রাখা, কিন্তু ইজারা পাট্টা অন্যাথা করা ঐ পূর্ব্ব আইনের ফল।

অতএব উপস্থিত পক্ষগণের মধ্যে মোকদ্দমার এই অংশে যে তর্ক উপস্থিত, তদ্রূপ ১৮৩৮ সালে কমিসনরের সহিত বোর্ড অব্ রিবেনিউর এই তর্ক উপস্থিত হয় যে, বিশ্বনাথ রায়ের ন্যায় তালুকদারেরা ৩২ ধারার দ্বারা রক্ষিত কিনা। মেং কলবিন তর্ক করেন যে, "ভূমিতে অথবা তাহার খাজানাতে পুরুষানুক্রমেভোগ্য "ও হস্তান্তরযোগ্য স্বত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া ঐ ধারায় "যে সকল মফঃসল তালুকদারের উল্লেখ আছে," তাহাদিগকে এমত তালুকদার বিবেচনা করিতে হইবে যাহারা ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনের ৫ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে; এবং যাহারা দশ-সালা বন্দোবস্তের কালে একেবারে গবর্ণমেণ্টে তাহা-দের ভূমির নির্দ্ধারিত খাজানা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে পারিত, এবং যাহারা ঐ বন্দোবস্তের পরেও যে পর্য্যন্ত ১৮০১ সালের ১ ম কানুনের দ্বারা তাহাদের সেই স্বত্ব বিলুপ্ত না হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত জমিদারের জমিদারী হইতে পৃথক হওয়ার দাবী করিতে পারিত। তিনি তর্ক করেন যে, অধীন তালুকদার শব্দে এমত সকল তালুকদার বুঝায় না, যাহাদের জমা ঐ বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট হইয়াছে, কারণ, তাহারা সেই প্রকার তালুকদার যাহারা ১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুনের ৭ ম ধারায়, ভূমিতে স্বত্বহীন এবং কেবল পাট্টা-গৃহীতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

লর্ডগণের বিবেচনায়, মেং কলবিনের এই তর্ক অতি প্রবল বোধ হইতেছে এবং ১৮০১ সালের ১ ম কানুনের ১৪ ধারার যে ভাগে ব্যক্ত আছে যে, যে সকল তালুক, পৃথক করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে ১৭৯৩ সালের ৮ কানু-নের বিধি সমস্ত দশসালা বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট তালুক সম্বন্ধে খাটে না, তদ্দ্বারা ঐ তর্কের পোষকতা হইতেছে। কিন্তু যে স্থলে দেখা যাইতেছে যে, উক্ত প্রকরণমতে কোন মোক-দ্দমা বিচারিত হওয়ার কথা প্রদর্শিত হয় নাই এবং যে স্থলে এই তর্ক নিম্ন আদালত সমস্তে উত্থিত ও পর্য্যালোচিত হয় নাই এবং এই আপীলেও তাহার মীমাংসা করা নিতান্ত আবশ্য-কীয় নহে, সে স্থলে লর্ডগণ এই বিষয়ে

আর অধিক বা চূড়ান্ত মত ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত রহিলেন।

লর্ডগণ অনুমান করিয়া লইবেন যে, বিশ্বনাথ রায়ের তালুকের ন্যায় তালুকদারী জমা যাহা মেং কল্‌বিন তাহার জন্য দাবী করেন, তাহা অন্যথা করিতে ১৮২২ সালের ১১ কানুনমতে নীলাম-ক্রেতার ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ইহা স্বীকার করিলেও, তাঁহাদের মত এই যে, ক্রেতা এই ক্ষমতা পরিচালন করিতে অথবা না করিতেও পারে; এবং রাণী স্বর্ণময়ীর মোকদ্দমার (১০ম বালম, মুয়রের ভারতবর্ষীয় আপীল) যুক্তি অনুসারে, এই তালুক অন্যথা বা বাতিল করার জন্য গবর্ণমেণ্টের কোন স্পষ্ট উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

লর্ডগণ এইক্ষণে এই আপীলের দ্বিতীয় প্রশ্নের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এবং সেই প্রশ্ন এই যে, গবর্ণমেণ্টের যখন ঐ তালুক অন্যথা করার ক্ষমতা ছিল, তখন গবর্ণমেণ্ট ঐ ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছেন কি না?

মেং কল্‌বিনের পত্র বোর্ড অব রিবেনিউর অভিপ্রায়সূচক, সুতরাং তাহা কেবল আইনের ব্যাখ্যা নহে; এবং এই জমিদারীর অন্তর্গত অধীন তালুক সমস্ত সম্বন্ধে ১৮৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গবর্ণমেণ্টের কি রূপ কার্য্য করার অভিপ্রায় ছিল, ঐ পত্র তদ্বিষয়েরও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ পত্রের ৫২ দফা হইতে শেষ দফা সকল পাঠ করিয়া ইহা ভিন্ন আর কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, গবর্ণমেণ্টের যে কিছু চরম স্বত্ব থাকুক, সকল প্রকার তালুকদারের সহিত বন্দোবস্ত করাই তাঁহাদের মনস্থ ছিল; অর্থাৎ অন্ততঃ, যে সকল তালুকদার খাজানা বৃদ্ধির দায় হইতে রক্ষিত ছিল না, তাহারা ১৮২২ সালের পূর্ব্বে যে অবস্থায় থাকিতে স্বত্ববান ছিল, অর্থাৎ পরগণার নিরিখে খাজানা বৃদ্ধি হওয়ার দায় সম্বলিত অধীন তালুকদার স্বরূপে তাহাদের ভূমির দখল রাখিতে স্বত্ববান ছিল, তাহাদিগকে সেই অবস্থান্বিত করাই গবর্ণমেণ্টের মনস্থ ছিল। ইহার কোন সন্দেহ নাই যে, ঐ পত্রে লেখা ছিল যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তালুকদারেরা নূতন বন্দোবস্ত না করিলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার চরম ক্ষমতা পরিচালন করিবেন। কিন্তু তালুকদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করাই গবর্ণমেণ্টের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল; এবং বন্দোবস্ত হইলে তালুক পরিবর্ত্তনশীল খাজানায় বর্ত্তমান থাকিত। ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমে ভূমির দখলের দ্বারা লোকে, বিশেষতঃ এই জমিদারী যে দূর প্রদেশে স্থিত, তথায় যে স্বত্ব প্রাপ্ত হয় তাহা বিবেচনা করিলে, মালের কর্ম্মচারীরা যে এই বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট ও তালুকদার উভয়ের নিমিত্ত উপকারজনক বিবেচনা করিয়াছিলেন তাহা অসম্ভব নহে।

তবে কি পশ্চাতের কার্য্য দ্বারা দৃষ্ট হয় যে, গবর্ণমেণ্টের প্রথমে যে মনস্থ ছিল পশ্চাতে গবর্ণমেণ্ট তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন?

এই সকল কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, রাজস্ব বাকীর সচরাচর নীলাম-ক্রেতা হইতে গবর্ণমেণ্টের অবস্থা এক বিষয়ে বিভিন্ন ছিল; কারণ, ১৮২২ সালের ১১ কানুনের ৩৬ ধারায় লেখা আছে যে, গবর্ণমেণ্টের ক্রীত সম্পত্তি সম্বন্ধে সচরাচর খাস মালগুজারী মহালের কার্য্য নির্ব্বাহের নিয়ম সমস্ত খাটিবে। ১৮২৫ সালের ৯ কানুনের দ্বারা এবং ১৮২২ সালের ৭ম কানুনের বিধান যাহা পূর্ব্বোক্ত কানুনের ২ ধারার দ্বারা খাস মহাল ও তল্লিখিত অন্যান্য মহাল সম্বন্ধে বিস্তারিত হয় তদ্দ্বারা, মালের কর্ম্মচারিগণের প্রতি যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হয়, উক্ত ১১ কানুনের মর্ম্মানুসারে ঐ সম্পত্তির উপরেও ১৮৩৩ সালে তাঁহাদের সেই সকল ক্ষমতা ছিল। অতএব যদিও সচরাচর নীলাম-ক্রেতা

অপেক্ষা অধীন-জমা অন্যথা অথবা খাজানা বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব অধিক ছিল না, তথাপি গবর্ণমেণ্ট ঐ স্বত্ব এমত প্রণালীতে সংস্থাপন করিতে পারিতেন যাহা অপর কোন ব্যক্তি অবলম্বন করিতে পারে না।

গবর্ণমেণ্ট প্রথম যে কার্য্য করেন তাহা খাজানা বৃদ্ধির নালিশ করার পূর্ব্বে সকল জমিদারই করিতে বাধ্য। তাহা এই যে, ৫০০০ টাকা খাজানা বৃদ্ধি করার জন্য ১৮১২ সালের ৫ ম কানুনের ৯ ধারামতে এক নোটিস ১৮৩৬ সালের ৭ ই জুন তারিখে জারী করা হয়, এবং তাহাতেই ১৮৩৭ সালের ১৯ এ জুন তারিখে মেং এলেনের রুবকারী হয়।

আপেলাণ্টের পক্ষের তর্কে এই রুবকারীর উপরে অনেক নির্ভর করা হইয়াছে। কিন্তু লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, তাহাতে "হুকুম হইল যে, তালুক অন্যথা হয়" প্রভৃতি যে সকল শব্দ ব্যবহৃত আছে তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাহার মর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে; এবং তাহা করিলেই দেখা যাইবে যে, উহা যে ব্যক্তির ভূমিতে দখল আছে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে খাজানা বৃদ্ধি করার এক কার্য্য মাত্র। এই প্রকার কার্য্যে প্রতিবাদী অবশ্যই বাদীর কর বৃদ্ধি করার স্বত্বের প্রতি দাবী-কৃত হারের ন্যায্যতার প্রতি অথবা উভয়ের প্রতিই আপত্তি করিতে পারে; কিন্তু যদি সে কর বৃদ্ধি করার স্বত্বের প্রতি আপত্তি করে, তবে খাজানার ন্যায্যতার প্রতি তাহার আপত্তি করার আবশ্যক নাই। এই মোকদ্দমায়, তালুকদার প্রথম উপায় অবলম্বন করে, অর্থাৎ সে বলে যে, তাহার তালুকের খাজানা অপরিবর্ত্তনীয়, এবং নীলাম-ক্রেতাও তাহা বৃদ্ধি করিতে পারে না। এবং ঐ মোকদ্দমায় এই বিষয় তাহার প্রতিকূলে নিষ্পত্তি হয়। মেং কলবিন তাঁহার পত্রের ৫৬ দফায় এই রূপ মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন।

অপিচ, দেখা যাইতেছে যে, ১৮৩৬ সালের জুলাই মাসে সুতরাং ঐ নোটিসের এবং মেং এলেনের রুবকারীর তারিখের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এই ভূমির জরিপ-জমাবন্দী করার হুকুম দিয়াছিলেন। অতএব ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, এই ৫০০০ টাকার খাজানা, কেবল খাজানা বৃদ্ধি করার স্বত্ব পরীক্ষা করার জন্য এক ইচ্ছা মত দাবী মাত্র হইয়াছিল, এবং কি জমা স্থির হইবে অথবা কোন্ ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত করিতে হইবে তাহা ১৮৩৭ সালের রুবকারীতে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

বাঙ্গালা ১২৪৫ সালের পূর্ব্বে জরিপ-জমাবন্দী সমাপ্ত হয় নাই, এবং ১৮৩৯ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর তারিখে কমিশনর কালেক্টরকে লেখেন যে, ১৫ দিবসের মধ্যে হাজীর হইয়া ২০ বৎসরের জন্য পরগণার নিরিখে বন্দোবস্ত করার জন্য তালুকদারের প্রতি নোটিস জারী করিতে হইবে, এবং যদি তাহারা হাজীর না হয় তবে তাহাদের স্বত্ব অন্যথা করিয়া ইজারা বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সকল অনুজ্ঞার দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, তালুকদারেরা পরগণার হারে বন্দোবস্ত করিতে অস্বীকার না করিলে ঐ সকল তালুকদারী স্বত্ব অন্যথা করিতে গবর্ণমেণ্টের তখনও ইচ্ছা ছিল না।

তদনুসারে, ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত নোটিস বিশ্বনাথের দায়াধিকারিগণের প্রতি ১৮৩৯ সালের ৫ ই ডিসেম্বর তারিখে জারী হয়। তাহাতে ১৫ দিবসের মধ্যে আসিয়া তালুকদারী বন্দোবস্ত করার নিমিত্ত তাহাদিগকে আহ্বান করা হয়, এবং তাহাতে লেখা হয় যে, তাহারা হাজীর না হইলে তাঁহাদের ভূত-পূর্ব্ব জমিদারের পত্তনী তালুকদারী স্বত্ব অথবা দখলের স্বত্ব তাহারা হারাইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মেং মণির রুবকারীতে দেখা যাইতেছে যে, রেস্পণ্ডেণ্ট অভয়চরণ এই নোটিসমতে বন্দোবস্ত করার জন্য হাজীর হয় নাই এবং সে তখনও

পুরাতন হারে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়ার অথবা বিলম্ব করার চেষ্টা করিতেছিল এবং, মেং মণি কালেক্টর স্বরূপে, সেখ আইনুদ্দীন নামক এক অপর ব্যক্তিকে ২০ বৎসরের ইজারা দেন। এই বন্দোবস্তে উচ্চতর কর্ম্মচারীর সম্মতির আবশ্যক ছিল, এবং ১০৭ পৃষ্ঠার বর্ণনায় আমরা দেখিতেছি যে, ১৮৪০ সালের ২৪ এ নবেম্বর তারিখে কমিশনর ঐ বন্দোবস্ত অবিকল স্থির রাখিতে অস্বীকার করেন এবং ঐ ইজারা ২০ বৎসরের জন্য না রাখিয়া এক বৎসরের জন্য মঞ্জুর করেন। ৪২ পৃষ্ঠায় আর এক নোটিস আছে; তাহা আইনুদ্দীনের এক বৎসরের ইজারা সমাপ্ত হওয়ার আশায় ১৮৪১ সালের ২৩ এ ফেব্রুয়ারি তারিখে পুনরায় বিশ্বনাথ রায়ের দায়াধিকারিগণের উপরে এই মর্ম্মে জারী হয় যে, তাহারা পরগণার নিরিখে তালুকদারী বন্দোবস্ত করিয়া লয়, এবং তাহাতে তাহারা ত্রুটি করিলে তাহাদের তালুকের সমুদায় স্বত্ব বিলুপ্ত হইবে।

আইনুদ্দীনের ইজারা দ্বারা রেস্পণ্ডেন্টের দখলের যে ব্যাঘাত হয় তাহার উপরে আপেলাণ্ট অনেক নির্ভর করিয়াছে, এবং যদি প্রথম ২০ বৎসরের ইজারা স্থির থাকিত, ও তদনুযায়ী আইনুদ্দীন দখল পাইত, তবে পূর্ব্ব তালুকদারী জমা অন্যথা হওয়ার কথা অতি প্রবল রূপে অনুভূত হইতে পারিত।

কমিশনরের ১৮৪০ সালের ২৪ এ নবেম্বরের পত্র সমুদায় দাখিল হয় নাই, এবং ইহা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, তদ্দ্বারা যদি আপেলাণ্টের মোকদ্দমার পোষকতা হইত, তবে আপেলাণ্ট অবশ্যই তাহা দাখিল করিবার উপায় পাইত। এই পত্র যেরূপ নথীতে দৃষ্ট হইতেছে তাহা, ও বিশ্বনাথের দায়াধিকারিগণের প্রতি শেষ যে নোটিস জারী হয় এবং যাহাতে তাহাদের তালুকদারী স্বত্ব তখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া লিখিত আছে, তাহা একত্রে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, ১৮২৫ সালের ৯ কানুনমতে মালের কর্ম্মচারিগণের যে রাজস্বের চূড়ান্ত বন্দোবস্ত করার ক্ষমতা ছিল তাহা করার উদ্যোগের মধ্যে ঐ এক বৎসরের ইজারা কেবল এক ক্ষণিক বন্দোবস্ত স্বরূপ হইয়াছিল। ইহা নিশ্চয় দেখা যাইতেছে যে, এই দ্বিতীয় নোটিসের দ্বারা রেস্পণ্ডেণ্ট অভয়চরণ ১৮৪১ সালে প্রথমে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করে এবং ১৮৪২ সালে ২০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করে, এবং ঐ দুইবারে যে কবুলিয়ৎ ও অন্যান্য দলীল লিখিতপড়িত হয় তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, উহা ঠিক পত্তনী তালুক বলিয়া বর্ণিত না হইতে পারিলেও, বিশ্বনাথ রায়কে পূর্ব্বে যে তালুক প্রদত্ত হইয়াছিল তদন্তর্গত ভূমিতে পুরুষানুক্রমে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া অভয়চরণের সহিত তালুকদারী বন্দোবস্ত হয়।

ইহাও দেখা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যদি ১৮৪২ সালের পূর্ব্বে ঐ জমা চূড়ান্ত রূপে অন্যথা না করিয়া থাকেন, তবে তাহা করিতে গবর্ণমেণ্টের যে আইনানুগত স্বত্ব ছিল তাহা বিলুপ্ত হইয়াছিল, কারণ, যে ১৮২২ সালের ১১ কানুনের উপরে ঐ স্বত্ব নির্ভর করে, তাহা ১৮৪১ সালের ১২ আইনের দ্বারা রদ হয়; অতএব তাহার পরের কার্য্য সমস্ত পর্য্যালোচনা করার আবশ্যক নাই। অতএব লর্ডগণ মোকদ্দমার এই ভাগ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিলেন তাহা এই যে, গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষমতাই থাকুক, গবর্ণমেণ্ট বাস্তবিক ঐ তালুক অন্যথা অথবা বিনষ্ট করেন নাই; পুরাতন আইনমতে তালুকদারদের যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থায়ই তাহাদিগকে স্থির রাখিয়াছিলেন, কেবল তাহাদের অপরিবর্ত্তনীয় খাজানার তালুককে পরিবর্ত্তনশীল খাজানার তালুকে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন; অতএব আপেলাণ্ট উচিত রূপে আরও কর বৃদ্ধি করার জন্য নালিশ উপস্থিত করিতে পারে, কিন্তু তালুকদারদিগের দখল অন্যথা অথবা যে ব্যক্তি অধিক খাজানা দিতে চাহে তাহাকে ঐ তালুক প্রদান করিতে পারে না।

• শেষ প্রশ্ন সম্বন্ধে লর্ডগণের রায় এই যে, এই মোকদ্দমায় অধীন-প্রজারা যে ভূমি হইতে বেদখল হইয়াছে সেই ভূমির প্রতি তাহারা দাবী করে, এবং জমিদার ঐ দখলের প্রতি আপত্তি করেন; অতএব তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এই মোকদ্দমা উচিত রূপেই ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণমতে উপস্থিত হইয়াছে।

অতএব লর্ডগণের মতে, নিম্ন আদালতের ডিক্রীর প্রতি হস্তক্ষেপ করার কোন হেতু সপ্রমাণ না হওয়ায় তাঁহারা এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্ করিতে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে বিনীত ভাবে পরামর্শ দিবেন। (গ)

---

২২ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## সর জেম্‌স ডবলিউ কলবিল, নাবিক সম্বন্ধীয় হাইকোর্টের বিচারপতি ও লর্ড জষ্টিস গিফার্ড এবং সর লরেন্‌স পীল।

আগ্রার ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

বারাণসী দাস।

বনাম

গোলাম হোসেন, মদনমোহন এবং লালা ভোলানাথ।

চুম্বক।—সচরাচর বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মহাজনের কুঠীর বখরাদারগণ সম্বন্ধে এই নিয়ম প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন বখরাদারের নাম হুণ্ডীতে প্রকাশ না থাকিলেও এবং সে গুপ্ত বখরাদার হইলেও এবং কুঠীর কোন কার্য্য না করিলেও, কুঠীর কারবার সম্বন্ধে কুঠীর চলিত নামে তাহার এক জন বখরাদার যে হুণ্ডী কাটে তাহার জন্য, ঐ প্রকার প্রত্যেক বখরাদারই দায়ী হইবে।

আইনের এই সাধারণ নিয়ম হইতে কোন হুণ্ডীর বিষয় বর্জ্জন করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, [ঐ হুণ্ডী-গৃহীতা তাহা লওয়ার সময় অবগত ছিল যে, ঐ হুণ্ডী এক জন বখরাদারের নিজের দ্বারাও কারবারের হুণ্ডী, সাধারণ কারবারের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই।

নিষ্পত্তি।—সহর কানপুরের প্রধান সদর আমীনের ডিক্রী স্থির রাখিয়া আগ্রার ভূতপূর্ব্ব সদর দেওয়ানী আদালত যে ডিক্রী দেন, তদ্বিরুদ্ধে এই আপীল হয়। গোলামহোসেন ও মদনমোহন যাঁহারা নিম্ন আদালতে বাদী ছিল তাহাদের অনুকূলে ডিক্রী হয়; পামর এবং রামপ্রসাদ প্রতিবাদী ছিল। ভোলানাথ ইদানীন্তন গোলাম এবং মদনের স্বত্ব ক্রয় করিয়াছে এবং বস্তুতঃ, সেই ব্যক্তিই এক মাত্র রেস্পণ্ডেণ্ট; এবং রামপ্রসাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিই এক মাত্র আপেলাণ্ট।

রামপ্রসাদ, পামরের সহিত ১৮৬১ সালের ৮ ই জুন তারিখে বখরাদারীতে প্রবিষ্ট হয়। পামর সেই সময়ে আলাহাবাদ, কানপুর এবং অন্যান্য স্থানে কারবার করিত, এবং সে রেলওএর স্লিপর যোগাইবার জন্য ১৮৬০ সালের ৬ ই অক্টোবর তারিখে রেলওএ কোম্পানির সহিত চুক্তি করে এবং এই চুক্তি পালনার্থে কতক স্লিপর ক্রয়ের জন্য হোসেন ও মোহনের সহিত দর-চুক্তি করে। এই দর-চুক্তি বাস্তবিক মৌখিক হয়। স্লিপরের আমদানী ১৮৬১ সালের ১৫ ই জানুয়ারি তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৪ ই জুলাই পর্য্যন্ত হয়। ৮ ই জুন অর্থাৎ যে তারিখে পামর ও রামপ্রসাদের বখরা হয়, সেই তারিখের পরেও অনেক স্লিপর দাখিল হয়।

১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে হোসেন এবং মোহন, পামরের নিকট তাহাদের হিসাবের টাকা পাওয়ার প্রার্থনা করে। পামর তাহাতে সেই হিসাবের মধ্যে তাহাদিগকে ১০,০০০ টাকার এক হুণ্ডী ও ২৫০০ টাকা করিয়া ৪ খানা হুণ্ডী একুনে পাঁচ খানা হুণ্ডীর দ্বারা ২০,০০০ টাকা দেয়। ঐ সকল হুণ্ডী "কানপুরে, ১৮৬১ সালের ৩১ এ ডিসেম্বর" তারিখে "পামর এবং কোম্পানির" দ্বারা কলিকাতার "পামর এবং কোম্পানির" উপর

প্রদত্ত হয়। এই সকল হুণ্ডী অমান্য হয়, এবং হুণ্ডী-গৃহীতারা তাহাতে আপত্তি করে; কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, রেস্পণ্ডেণ্টগণ তাহার পরে উক্ত হিসাবে ১০০,০০ টাকা পায়। পামরের সহিত যখন রামপ্রসাদের বখরা ছিল, তখন পামর কারবার সম্বন্ধে রেস্পণ্ডেণ্টগণের নিকট যে সকল দ্রব্য ক্রয় করে তাহার মূল্যের বাবতে রেস্পণ্ডেণ্টগণের আরও ২৪০০০ টাকা প্রাপ্য ছিল।

অতএব হোসেন ও মোহনকে পামর এবং কোম্পানির মোট দেনা ৩৪০০০।৩ টাকা ছিল। তাহারা এই টাকার জন্য ঐ সকল হুণ্ডীর উপরে এবং সাধারণ খাতার হিসাবে, পামর ও রামপ্রসাদ উভয়ের বিরুদ্ধে ও রামপত্ ও কালুমল যাহাদের নিকট ঐ হুণ্ডী অমান্য হওয়ার পরে রেস্পণ্ডেণ্টদিগকে টাকা দেওয়ার বরাৎ হয়, তাহাদের বিরুদ্ধে কানপুরের প্রধান সদর আমীনের আদালতে নালিশ উপস্থিত করিয়া ডিক্রী পায়। তাহার বিরুদ্ধে কেবল রামপ্রসাদ আগ্রার সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল করে, এবং ঐ আদালত প্রধান সদর আমীনের নিষ্পত্তিই স্থির রাখেন।

এই সকল নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে রামপ্রসাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি এবং তাহার নাবালগ পুত্রের অভিভাবক এই আদালতে আপীল করিয়াছে। পামর এবং রামপ্রসাদের মধ্যে যে একরারনামা হয়, তাহার সর্ত্তই এই আপীলের বুনিয়াদ। সেই একরারনামা এই, যথা—

মেং পামর কর্ত্তৃক প্রদত্ত ১৮৬১ সালের ৮ ই জুন তারিখের একরার-নামা ঃ—

"আমরা, টমাস জর্জ এডাম পামর, সাং "মৌজা নবিবাগের কুঠী পরগণা ছায়াল, ও রায় "রামপ্রসাদ বণিক আপন নাবালগ পুত্র "দামোদর দাসের অভিভাবক, সাং সহর "আলাহাবাদ মহল্লা দারাগঞ্জ, পরগণা ছায়াল, "জেলা আলাহাবাদ, বাণিজ্য করার নিমিত্ত "সমান বখরাদারীতে প্রবৃত্ত হওনে সম্মত "হইয়া সেই বন্দোবস্তের সর্ত্ত লিপিবদ্ধ করিয়া "তাহার সত্যতা লিখিয়া দিতেছি। যথা।—১ম, "এই কারবার "পামর এবং কোম্পানির" নামে "চলিবে। ২য়, রামপ্রসাদের নাবালগ পুত্র "দামোদর দাসের পক্ষে এই কারবারে এক "লক্ষের অনধিক টাকা খাটিবে এবং দামোদর "দাস এই টাকার ও তাহার লভ্য হইতে বার্ষিক "শত-করা ১২ টাকার হিসাবে সুদের মালিক "থাকিবে; নাবালগের প্রাপ্য ঐ হারে সুদ "ঐ কারবারের খাতায় জমা হইবে এবং ভাঙ্গা "হারে তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে। মেং "পামর এই কারবারে যে টাকা খাটাইবেন "তাহার সুদও তাঁহাকে ভাঙ্গা হারে দেওয়া "হইবে, এবং বাকী যে লভ্য থাকিবে, দামো- "দর দাস ও আমি মেং পামর তাহার "সমান ভাগে মালিক হইব। ৩য়, আমি মেং "পামর যে কর্ম্ম করিব তাহার বেতন স্বরূপে "মুনফা হইতে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা লইতে "পারিব, এবং এই খরচ ও অন্যান্য খরচ বাদে "আমরা মুনফার সমান ভাগ পাইব। ৪র্থ, "আমি মেং পামর, রায় রামপ্রসাদের সম্মতি "ও দস্তখৎ ভিন্ন এই কারবারে কোন চুক্তি "ইত্যাদিতে প্রবৃত্ত হইব না, এবং এই কারবার "চালাইবার জন্য যে সকল ব্যয়ের আবশ্যক "তাহা রায় রামপ্রসাদের সম্মতি লইয়া করিতে "হইবে। যদি কোন কাজ তাহার সম্মতি ভিন্ন "গৃহীত হয়, তবে তাহার ঐ কাজের সহিত "কোন সম্পর্ক থাকিবে না। ৫ম, রায় রামপ্রসাদ "যাহাকে খাজাঞ্চী করিবেন, সেই ব্যক্তিই এই কার- "বারের সমুদায় টাকা ও হিসাব রাখিবে, এবং ঐ "খাজাঞ্চীর সচ্চরিত্রতার জন্য রায় রামপ্রসাদ দায়ী "থাকিবেন। ৬ষ্ঠ, এই কারবার ২॥ বৎসর "পর্য্যন্ত চলিবে, এবং তাহার পরে যদি আমি "রামপ্রসাদ কোন বিশেষ কারণে এই কারবার "বন্ধ করিতে ইচ্ছা করি, তবে কারবার বন্ধ

করার ৬ য় মাস পূর্ব্বে মেৎ পামরকে সংবাদ "দিব। বন্ধ করার কালে দামোদর দাস "নাবালগের যে টাকা প্রাপ্য হইবে তাহা এক "টাকা শতকরা সুদ সমেত সে এই কারবারের "সমুদায় দ্রব্য ও সম্পত্তি হইতে আদায় করিয়া "লইতে পারিবে। এবং ঐ টাকা সুদ সমেত "আদায় হইবার পরে যদি কিছু বাকী অথবা "মুনফা থাকে, তবে তাহা আমরা সমভাগে "আমাদের মধ্যে বখরা করিয়া লইব। যদি "কমি হয় তবে আমরা সমভাগে সেই ক্ষতিপূরণ "করিব। ৭ ম, আমি মেৎ পামরের হিস্যার "যে কিছু মুনফা হইবে তাহা, রায় রামপ্রসাদ "ও রামরিখের নিকট আমার যে স্বতন্ত্র দেনা "আছে তাহা পরিশোধ করার জন্য বৎসর বৎসর "প্রয়োগ হইবে। ৮ ম, এই কারবার চালাইবার "জন্য আমি মেৎ পামর যে কোন চাকর নিযুক্ত "করিব অথবা টাকা ব্যয় করিব তাহা আমি রায় "রামপ্রসাদের সহিত পরামর্শ করিয়া করিব। "বেতন এবং খরচ এই কারবারের মুনফা হইতে "চলিবে। অতএব এই একরার-নামা লিখিত "হইল যে, আবশ্যকমতে ইহা ব্যবহার করা যাইতে "পারে।

"তারিখ ৮ ই জুন, ১৮৬১ সাল।

"(দস্তখত) পামর এবং কোম্পানি।"

তর্কিত হইয়াছে যে, এই একরার-নামার সর্ত্তেই দেখা যাইতেছে যে, ইহা সীমাবদ্ধ ভাবের একরার-নামা হইয়াছিল এবং ভবিষ্যতে রামপ্রসাদের সম্মতি এবং দস্তখতের দ্বারা যে চুক্তি হইবে তৎ-সম্বন্ধেই এই একরার-নামা খাটিবে, অতএব স্লিপর ক্রয়ের জন্য রেস্পণ্ডেণ্টের সহিত পামরের যে চুক্তি হয় তাহার সহিত ঐ একরার-নামার কোন সম্বন্ধ নাই, এবং রেস্পণ্ডেণ্ট ও রামপ্রসাদের পরস্পরের মধ্যে এই স্লিপর ক্রয় সম্বন্ধে কোন চুক্তির জ্ঞাতসারিতা ছিল না।

এই সকল বৃত্তান্তে আইনের যে যুক্তি খাটে, তাহা প্রসিদ্ধ আছে এবং তদ্বিষয়ে কোন বিরোধ নাই। সচরাচর বাণিজ্য ব্যবসায়ী মহাজনের কুঠীর বখরাদারগণের মধ্যে কাহার নাম হুণ্ডীতে প্রকাশ না থাকিলেও এবং সে গুপ্ত বখরাদার হইলেও এবং কুঠীর কোন কার্য্য না করিলেও, কুঠীর কারবার সম্বন্ধে কুঠীর চলিত নামে তাহার এক জন বখরাদার যে হুণ্ডী কাটে তাহার জন্য ঐ প্রকার প্রত্যেক বখরাদারই দায়ী হইবে।

আইনের এই সাধারণ নিয়ম হইতে কোন হুণ্ডীর বিষয় বর্জ্জন করিতে হইলে দেখাইতে হইবে যে, ঐ হুণ্ডী-গৃহীতা তাহা লওয়ার সময় ইহা অবগত ছিল যে, ঐ হুণ্ডী এক জন বখরাদারের নিজের খরাও কারবারের হুণ্ডী।

বর্ত্তমান মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দ্বারা এই হুণ্ডীর বিষয় যে ঐ রূপে বর্জ্জিত হইতে পারে এমত লর্ডগণের দৃষ্ট হয় না। প্রমাণের দ্বারা এমন সাব্যস্ত হয় নাই যে, রামপ্রসাদ এবং পামরের মধ্যে বখরাদারী যে ঐ রূপ সীমাবদ্ধ ছিল তাহা রেস্পণ্ডেণ্টগণ অবগত ছিল। স্লিপর যোগাইবার চুক্তি যে কেবল একটি চুক্তি ছিল এমত প্রদর্শিত হয় নাই; দিন দিন পামর কোম্পানির নামে স্লিপরের পৃথক্ পৃথক্ চালান দাখিল হইত। ঐ বখরাদারীর এক সর্ত্ত ছিল যে, কারবার "পামর এবং কোম্পানির" নামে চলিবে এবং তাহা সংস্থাপিত হওয়ার তারিখের পরেও চালান ঐ রূপে দাখিল হইত। রামপ্রসাদ যে প্রায় ৯২০০০ টাকা দেয় তাহা রামপ্রসাদের জানিত রূপে এই স্লিপরের কার্য্যে প্রয়োগ হয়, সুতরাং তাহা এই একরারনামার সর্ত্তের অন্তর্গত হয়।

একরারের লিখিত ঠিক কারবার কি ছিল তাহা দৃষ্ট হয় না, এবং সাক্ষী স্বরূপ রামপ্রসাদের নিজের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে, এবং তিনিও ঐ ঠিক কারবার কি ছিল তাহা ব্যক্ত করেন নাই; তিনি এই কারবারের জন্য টাকা দিয়াছেন, কিন্তু তিনি এমন কথা

বলেন নাই যে, টাকা কাহারও দ্বারা অন্যায় রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং তাঁহার যে কারবার করা মনস্থ ছিল, তদ্ভিন্ন অন্য কার্য্যে যে ঐ টাকা ব্যয় হইয়াছে, এমতও তিনি আদালতকে জানাইবার চেষ্টা করেন নাই। কুঠীর চলিত নামে হুণ্ডী কাটা হইয়াছিল; বিশেষতঃ যে সকল সাক্ষী জবানবন্দী দিয়াছে যে, রামপ্রসাদের গোমাস্তা মোরাদাবাদে উপস্থিত ছিল এবং তাহার সাক্ষাতে ও আদেশ অনুসারে স্লিপর সমস্ত ক্রীত ও চালান হইয়াছিল, নিম্ন আদালত তাহাদের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিয়াছেন; এবং যদিও এই সাক্ষ্যের উপরে লর্ডগণের নির্ভর করার আবশ্যক নাই, তথাপি তাঁহারা ঐ রায়ে অসম্মত হইবার কোন কারণ দেখেন না।

লর্ডগণ শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে এই আপীল খরচা সমেত ডিস্‌মিস্‌ করিবার জন্য বিনীত ভাবে পরামর্শ দিবেন। (গ)

২২ এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

## সর্ জেম্‌স ডবলিউ কল্‌বিল্; সর জোসেফ্ নেপিয়ার; লর্ড জষ্টিস গিফার্ড এবং সর লরেন্‌স পীল।

অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

সেখ জহুরুদ্দীন প্রভৃতি

বনাম

গোরকপুরের কালেক্টর।

**চুম্বক।**—"মৌজা সকল" বা তদ্রূপ অন্য কোন সাধারণ বর্ণনা-সূচক শব্দ কোন সনন্দে থাকিলে ও দুই পক্ষই তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলে এবং বহু বৎসর পর্য্যন্ত সেই ব্যাখ্যানুযায়ী স্বত্ব ভোগ হইয়া থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই ব্যাখ্যার প্রতি আপত্তি করে তাহারই দেখাইতে হইবে যে, ঐ ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক।

যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে এক সম্পূর্ণ তালুক দান করেন এবং পশ্চাতে এক বন্দোবস্তের দ্বারা তাহার দখল স্থির রাখেন, সে স্থলে এমন তর্ক করা যাইতে পারে না। যে, গবর্ণমেণ্ট ভ্রমবশতঃ ঐ তালুকের এক ভাগ দান না করিয়া, সমগ্র তালুক দান করিয়াছেন।

**নিষ্পত্তি।**—এই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বিশেষ বিরোধ নাই। স্বীকৃত হইয়াছে যে, পিণ্ডারা সর্দ্দার কাদের বক্‌সের বরাবর ১৮১৯ সালের ১৪ ই জানুয়ারি তারিখে তৎকালের গবর্ণর-জেনেরেল লর্ড হেষ্টিংস এক সনন্দ লিখিয়া দিয়াছিলেন, যাহার ব্যাখ্যা লইয়াই এত বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা কিছু সেই দান-ভুক্ত ছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট উক্ত পিণ্ডারাকে পূর্ব্বে যে মাসিক সিক্কা তিন শত টাকা খোরাকী দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন তৎপরিবর্ত্তে দেওয়া হয়; এবং তাহার সর্ত্ত এই যে, জায়গীর স্বরূপ যে ঐ ভূমি প্রদত্ত হয় তাহা সে তাহার জীবন পর্য্যন্ত নিষ্কর ভোগ করিবে, কিন্তু তাহার দায়াধিকারী এবং উত্তরাধিকারিগণের হস্তে গেলে তাহারা গবর্ণমেণ্টকে তাহার রাজস্ব দিবে। ১৮২২ সালের জানুয়ারি মাসে কাদের বক্‌সের দরখাস্ত মতে লর্ড হেষ্টিংসের গবর্ণমেণ্ট নির্দ্দেশ করেন যে, তাহার মৃত্যুর পরে ঐ জায়গীরভুক্ত ভূমি সমস্ত তাহার দায়াধিকারিগণ ১৮৭৭॥০ টাকা ইস্তমরারী জমায় ভোগ করিতে পারিবে।

এই মোকদ্দমায় প্রধান বিচার্য্য কথা এই যে, এই সনন্দের দ্বারা কি প্রদত্ত হইয়াছিল? আপেলাণ্টেরা তর্ক করে যে, তালুকা গণেশপুর যাহা গবর্ণমেণ্ট কাদের বকসকে দান করার জন্য মতি খানমের নিকটে ক্রয় করেন, তাহাই সমুদায় প্রদত্ত হয়। রেস্পণ্ডেণ্টগণ বলে যে, ঐ তালুকের এক অংশ ৩১৩৩ বিঘা মাত্র প্রদত্ত হয়।

তালুকা গণেশপুর যাহা মতিখানম এক নীলামে ক্রয় করে এবং যাহা সে গবর্ণমেণ্টকে বিক্রয় করে, তাহাতে ২৭ খানা প্রধান মৌজা ছিল এবং ইহার এক মৌজাসংলগ্ন ৫ টি তৌফীর মৌজা ছিল, যাহার নাম গবর্ণমেণ্টের নিকট

মতি খানমের কবালায় অথবা সনন্দেও লেখা নাই। ঐ তালুক প্রথমে যে প্রকার ছিল, তাহাতে তাহার প্রত্যেক প্রধান মৌজায় কিছু আবাদী ভূমি এবং অনেক জঙ্গল ছিল, এবং এই প্রকারে ঐ ২৭ মৌজায় এক্ষণকার বিরোধীয় সমুদায় জঙ্গল ভূমি ছিল। যে ৩১১৩ বিঘা ঐ সনন্দের দ্বারা প্রদত্ত হয় বলিয়া রেস্পণ্ডেণ্ট কহে, তাহাই আবাদী ছিল, এবং নথীর প্রথম নকসা যাহা গবর্ণমেণ্টের নিকট মতি খানমের বিক্রীত সমুদায় তালুকের বিশুদ্ধ নকসা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাতে যে প্রকার লেখা আছে, তদনুসারে ঐ আবাদী ভূমি চতুষ্পার্শ্বস্থ জঙ্গলের মধ্যে স্থানে স্থানে স্থিত ছিল।

গবর্ণমেণ্টের এক কর্ম্মচারী কাপ্তেন স্টোনহ্যাম যিনি [পিণ্ডারা সর্দারদিগের সুপরিণ্টেণ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তিনি কাদের বকসকে ঐ জায়গীরে দখল দেন। তিনি তাঁহার ১৮১৯ সালের ২৫ এ জানুয়ারি তারিখের এক পত্রের দ্বারা কালেক্টরকে ঐ পাঁচ তৌফীর মৌজার কথা অবগত করেন, এবং বলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন যে, তাহা গণেশপুরের এক অংশ। কাদের বকসকে ঐ তালুক সমুদায় প্রদত্ত হওয়ার কথা যে, ঐ পত্রে অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ঐ পত্র পাঠ করিয়া আর কিছু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। কালেক্টরও ১৮১৯ সালের ৯ ই ফেব্রুয়ারি তারিখে বোর্ড অব্ কমিসনরকে (যাঁহারা ঐ সময়ে ঐ সকল দত্ত প্রদেশে গবর্ণমেণ্টের নীচে সর্ব্বোচ্চ হাকিম ছিলেন,) অবগত করেন যে, কাদের বকসকে তালুকা গণেশপুরের দখল দেওয়া হইয়াছে, এবং ঐ তালুকা গবর্ণমেণ্টের অধিকারে থাকার কালে, রাজস্ব আদায়ের জন্য যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োজিত ছিল, তাহাদিগকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। ঐ জায়গীরের সীমার ভূমি ও জঙ্গল লইয়া ১৮২১ সালে নগরের রাজার সহিত কাদের বকসের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কাদের বকসের অনুকূলেই নিষ্পত্তি হয়। তাহার পরে, ১৮২৬, ১৮৩৪ এবং ১৮৩৫ সালে তালুকা গণেশপুরের সীমা এবং ঐ সীমাস্থিত জঙ্গল ভূমি লইয়া কয়েক মোকদ্দমা হয়, এবং তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমায়ই কাদের বকস জয়ী হয়, এবং নীলামে মতি খানম যাহা ক্রয় করিয়াছিল, এবং মতি খানম গবর্ণমেণ্টের নিকট যাহা বিক্রয় করিয়াছিল, তৎসমুদায়ের সহিত কাদের বকস তালুকা গণেশপুরের মালিক বলিয়া গ্রাহ্য হয়। ইহার মধ্যে ১৮২৬ সালের মোকদ্দমাই অতি আবশ্যকীয়, কারণ, তাহাতে কালেক্টর এক পক্ষ ছিলেন, এবং উক্ত তৌফীর মৌজা সমস্ত তালুকা গণেশপুরের অংশ কি না, তাহা ঐ মোকদ্দমার এক ইসু ছিল। কালেক্টরের সাক্ষাতে তাহা তালুকা গণেশপুরের এক অংশ এবং কাদের বকসের অধিকৃত বলিয়া নিষ্পত্তি হয়। অপিচ, ঐ তালুকেই পূর্ব্ব মালিকেরা উক্ত নীলাম অন্যথা ও রূপান্তর করার জন্য ১৮২১ সালের ১ম কানুন ও ১৮৩৫ সালের ৩ আইন মতে যে কয়েক মোকদ্দমা উপস্থিত করে, তাহাতে ১৮৩৬ ও ১৮৩৭ সালে ঐ তালুকের সমুদায়ে কাদের বকসের স্বত্ব গ্রাহ্য হয়। বিরোধীয় নীলামে যাহা কিছু বিক্রীত হইয়াছিল, তাহারি সমুদায়েরই মালিক বলিয়া ঐ সকল মোকদ্দমায় কাদের বকস মোজাহেম দেয়। পক্ষান্তরে, বিক্রীত তালুকার কোন অংশের প্রতি দাবী করত গবর্ণমেণ্ট মোজাহেম দেন নাই। মেং পলটিফেকস এবং মেং ফরছিথ এই বৃত্তান্তের প্রতি সন্দেহ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রমাণের উপরে লর্ডগণ অনায়াসে দেখিতেছেন যে, কাদের বকস ১৮১৯ সাল হইতে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের এবং গবর্ণমেণ্টের মালের কর্ম্মচারিগণের জানিত রূপে সমুদায় তালুকে দখীলকার ছিল, এবং নানাবিধ মোকদ্দমায় তাহার মালিক বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল। এবং ঐ তালুক-ভুক্ত জঙ্গল সম্বন্ধে

গবর্ণমেণ্ট যে, ঐ সময়ের মধ্যে কোন স্বত্বের দাবী অথবা কোন মালিকী স্বত্ব পরিচালন করিয়াছিলেন, তাহার কিছু মাত্র প্রমাণ নাই।

১৮৩৭ সালে কাদের বক্‌সের মৃত্যু হয়, এবং তাহার মৃত্যুর পরে যে সমস্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে গবর্ণমেণ্ট আরও নিঃসন্দেহ রূপে ঐ তালুকা এবং তদন্তর্গত বিরোধীয় ভূমিতে কাদের বক্‌সের ঐ সনন্দের অন্তর্গত স্বত্ব স্বীকার করেন। তাহার মৃত্যুর পরে ঐ নির্দ্দিষ্ট ১৮৭৭৷৷৹ টাকা জমা ভাগ করত ভিন্ন ভিন্ন মৌজা সমস্তের উপরে ধার্য্য করার আবশ্যক হয়। মেং চেষ্টর নামক এক জন সহকারী কালেক্টর ও বন্দোবস্তের হাকিমের দ্বারা তাহা সমাধা হয়। স্বীকৃত হইয়াছে যে, তিনি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মৌজার জরীপ অবলম্বন করিয়া বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাতে বিরোধীয় জঙ্গল ও অন্যান্য ভূমি সমস্ত ভুক্ত ছিল, এবং তাঁহার বন্দোবস্তের দ্বারা ঐ তালুকার সমুদায় ২৭ মৌজার মোট ১০৫৯২ একর অর্থাৎ ৩১৭৭৭ বিঘা ভূমির এক অপরিবর্ত্তনীয় খাজানা দেওয়ার সর্ত্তে কাদের বক্‌সের দায়াধিকারীরা সমুদায় তালুকার মালিক বলিয়া স্বীকৃত হয়।

এই বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এমন কথাও বলা যাইতে পারে না যে, তাহা এমত এক অধীন কর্ম্মচারী দ্বারা ভ্রমবশতঃ হইয়াছিল, যিনি এই তালুকের পূর্ব্বাপর বিবরণ অবগত ছিলেন না, অথবা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। জমার অল্পতা হেতু কমিশনরের দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তিনি ৫ই জুলাই তারিখে কৈফিয়ৎ তলব করেন, এবং তাহা মেং চেষ্টর কর্ত্তৃক ১৮৩৮ সালের ৯ই জুলাই তারিখে প্রদত্ত হয়। বন্দোবস্ত নিয়মিত রূপে রিবেনিউ বোর্ডের নিকট উপস্থিত হয়, এবং তাঁহারা বলেন যে, এই বন্দোবস্ত "ন্যায্য, "পরিমিত ও অনুমোদন-যোগ্য, এবং ইহার "জন্য মেং চেষ্টর প্রশংসা পাইতে পারেন।" অতএব ১৮৪০ সালের ১৪ই জানুয়ারি তারিখে তাহা গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইয়া গবর্ণরজেনরেল কর্ত্তৃক মঞ্জুর হয়। পূর্ব্ব গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার সনন্দের দ্বারা ঐ তালুকার কেবল এক অংশ প্রদান করত বহু মূল্যবান্ ও বৃহৎ জঙ্গল সমস্ত আপনার হস্তে রাখিতেন, তাহা হইলে, যে সকল আফিস ও কার্য্যবিভাগ দিয়া ঐ বন্দোবস্তী কাগজ অনুমোদিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন সেরেস্তায় যে, উহার কোন লেখাপড়া থাকিত না, ইহা কোন প্রকারেই সম্ভাবনীয় নহে। কিন্তু তথাপি গবর্ণমেণ্ট এই অনুমানে বর্ত্তমান দাবী উপস্থিত করিয়াছেন যে, ঐ বন্দোবস্ত ভ্রমবশতঃ হইয়াছিল।

ইহা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, গনেশপুরের পূর্ব্ব মালিকেরা ১৮৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৮৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐ ভ্রমের কথা মালের কর্ম্মচারিগণের গোচর করে; তাহারা প্রথমে কালেক্টরের নিকট, তৎপরে কমিশনরের নিকট এবং অন্তে বোর্ড অব রিবেনিউর নিকট দরখাস্ত করিয়া প্রায় ঠিক উপস্থিত মোকদ্দমার ন্যায় মোকদ্দমা উত্থাপন করে, কিন্তু উক্ত প্রত্যেক হাকিমই ঐ ভ্রম অগ্রাহ্য করিয়া দরখাস্ত ডিস্‌মিস্ করেন।

১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত এই রূপ ছিল। তখন মেং হোয়াইট নামক এক জন ডেপুটি কালেক্টর যিনি গোরকপুরের যে ভাগে এই সম্পত্তি স্থিত, সেই ভাগের বন্দোবস্তের কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তিনি এই বিষয় যাহা উপরের লিখিতরূপে মীমাংসিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা পুনরুত্থাপন করেন। ১৮৪৬ সালের ৮ আইনের ১ ম ধারায় দেখা যাইতেছে যে, গোরকপুরের পূর্ব্ব বন্দোবস্তের মেয়াদ ১৮৫৯ সালের জুলাই মাসে শেষ হইয়াছিল; অতএব যে নূতন বন্দোবস্তের আবশ্যক হইয়াছিল বোধ হয় তাহা সমাধা করিবার জন্যই মেং হোয়াইট নিয়োজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু দেখা যাইতেছে

যে, ঐ আইনের ৩ ধারার স্পষ্ট বিধান এই যে, যে সকল ব্যক্তি কোন বিশেষ সনন্দের বলে ভূমি ভোগ করে তাহারা সেই সনন্দের সর্ত্ত অনুযায়ীই তাহা ভোগ করিতে থাকিবে। অতএব গবর্ণমেণ্টের ১৮২২ সালের জানুয়ারি মাসের পত্রের লিখিত জমায় যদি আপেলাণ্টগণ ঐ সনন্দের অন্তর্গত সমুদায় তালুকা গণেশপুর ভোগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তৎকালে যে নূতন বন্দোবস্ত হইতেছিল তাহা হইতে তাহারা বর্জ্জিত ছিল। কিন্তু মেং হোয়াইট ১৮৩২ সালের ৯ ই এপ্রিল তারিখে যে পত্র লেখেন এবং যাহাতে তাঁহার জেদ ভিন্ন ন্যায্য কোন তর্ক দৃষ্ট হয় না, তাহাতে, তিনি যে হেতুবাদে বিবেচনা করেন যে, ঐ তালুকের অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত হইয়া খেরাজী ভূমির ন্যায় তদুপরি জমা সংস্থাপিত হইতে পারে, সেই সমস্ত হেতু কালেক্টরকে লেখেন।

কাদের বকস্‌কে ১৮১৮ সালে কেবল বার্ষিক ৪০০০ টাকার পরিবর্ত্তে তত্তুল্য মূল্যের সম্পত্তি দান করাই গবর্ণমেণ্টের মনস্থ ছিল, এমত অনুমান করিয়া লইয়া এবং আপন ইচ্ছানুযায়ী ঐ সনন্দের এবং অন্যান্য দলীলের ব্যাখ্যা করিয়া মেং হোয়াইট নির্দ্দেশ করেন যে, ৩৯৩৩ বিঘার অতিরিক্ত কিছুই প্রদত্ত হয় নাই, এবং অপরিবর্ত্তনীয় জমা তালুকের কেবল সেই ভাগ সম্বন্ধেই স্থির হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট ভাগের নূতন জমাবন্দী হইতে পারে, এবং যদি রেস্পণ্ডেণ্টেরা ঐ অবশিষ্ট ভাগে ন্যায্যরূপে দখীলকার থাকে, অথবা যদি তাহাদের সহিত বন্দোবস্ত হওয়ার তাহাদের কোন স্বত্ত্ব থাকে, তবে তাহাদের সহিতই বন্দোবস্ত হইতে পারে। তিনি কাদের বকস্ এবং তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদিগের উপর এই দোষারোপ করেন যে, তাহারা "প্রতারণা "ও কৌশল এবং অতি অদ্ভুত দৈব "শুভ ঘটনার দ্বারা জায়গীরের সীমা বৃদ্ধি "করিয়া লইয়াছে"; এবং লর্ডগণ বোধ করেন যে "দৈব শুভঘটনা" শব্দগুলির দ্বারাই এই প্রকাশ পায় যে, ৪০ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত যে সমস্ত আদালত ও গবর্ণমেণ্টের মাল সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণের নিকট আপেলাণ্টের স্বত্ত্বের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই আপেলাণ্টের অনুকূলে নিষ্পত্তি করিয়াছেন। মেং হোয়াইট বলেন যে, ঐ সকল হাকিম ভ্রমবশতঃ বা উচিত তদন্ত না করাতেই ঐ রূপ নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন।

কালেক্টর মেং বর্ড যাঁহার নিকট ঐ পত্র লেখা হইয়াছিল, তিনি আপেলাণ্টের স্বত্ত্ব সম্বন্ধে মেং হোয়াইটের রায়ের বিরুদ্ধ রায় করিয়া নির্দ্দেশ করেন যে, পূর্ব্ব বন্দোবস্তের প্রতি হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার রায় কমিশনর কর্ত্তৃক অন্যথা হয়, এবং কমিশনরের রায় বোর্ড অব রিবেনিউ স্থির রাখেন, এবং তাহার ফল এই হয় যে, রিবেনিউ কর্ম্মচারিগণ নির্দ্দেশ করেন যে, ঐ তালুকা উক্ত ৩৯৩৩ বিঘা বাদে বাজেয়াপ্ত এবং চলিত হারে জমা প্রদানের জন্য দায়ী হইতে পারে। মালের কর্ম্মচারিগণের এই সকল নিষ্পত্তি অন্যথা করার জন্য এবং তাহাদের সনন্দের অন্তর্গত অপরিবর্ত্তনীয় জমায় ঐ তালুকা ভোগ করার মালিকী স্বত্ত্ব সাব্যস্ত করার জন্য আপেলাণ্টেরা জাবেতা নালিশ উপস্থিত করেন কিন্তু প্রথম আদালতের জজ তাহাদের নালিশ ডিস্‌মিস্ করেন, এবং সেই ডিক্রী সদর আদালতে স্থির থাকে এবং দুই আদালতই নির্দ্দেশ করেন যে, গবর্ণমেণ্টের দাবী উৎকৃষ্ট।

মেং হোয়াইটের রিপোর্টে কাদের বকসের প্রতি প্রতারণা প্রভৃতির যে অলীক অপবাদ ছিল তাহা এই আপীলের সওয়াল-জওয়াবে অতি ন্যায্যরূপেই উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। তথাপি বলা হইয়াছে যে, ১৮৩৭ সালে ঐ পরিবারের দখলে তৎকালের বন্দোবস্তী যে সকল ভূমি ছিল তাহার অধিকাংশই ক্রমে ক্রমে সীমা অতিক্রম করিয়া দখল করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টের

কর্ম্মচারী কাপ্তেন ষ্টোনহ্যাম কাদের বকসকে যে ভূমির দখল দিয়াছিলেন, কাদের বকসের পরিবার যে তাহার অতিরিক্ত এক হাত ভূমিতেও দখীলকার ছিল, ইহার কোন প্রমাণ নথীতে লর্ড-গণের দৃষ্টি হয় না। তালুকার সীমার বহির্ভূত যে সকল ভূমি, মতি খানমের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিক্রীত হয়, তৎসম্বন্ধে এই নালিশে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে না। তাহা এবং তাহার জমাবন্দীর বিষয়ের নিষ্পত্তি অন্য মোকদ্দমায় হইবে। পূর্ব্ব দলীল সমস্ত অপেক্ষা এইক্ষণকার জরীপের কাগজে ঐ তালুকার যে অধিক ভূমি দেখা যায় তাহা বোধ হয় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ৩০ সালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে সূক্ষ্ম রূপে জরীপ হয় তদ্ধেতু হইয়াছে। অতএব লর্ডগণের বিচার্য্য প্রশ্ন কেবল এই যে, ১ ম, ঐ তালুকা যাহা গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার সমুদায়ই ঐ সনন্দের দ্বারা দান করা হইয়াছিল, কি কেবল ৩১৩৩ বিঘা প্রদত্ত হইয়াছিল? ২ য়, ১৮২২ সালে গবর্ণমেণ্ট যে ১৮৭৭৷৷৹ টাকার স্থায়ী জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন তাহা কি ভবিষ্যতে জমাবন্দীর জন্য জায়গীরের অবশিষ্ট ভূমি দায়ী করত, কেবল ঐ ৩১৩৩ বিঘার উপরে নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন? এবং ৩ য়, যদি ঐ দুই প্রশ্ন আপেলাণ্টের অনুকূলে নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে কি গবর্ণমেণ্টের ঐ দুই কার্য্য ভ্রমবশতঃ হইয়াছিল যে, তাহা এই নালিশে সংশোধিত হইতে পারে?

সনন্দের লিখিত বাক্যগুলি দৃষ্টেই সনন্দের অর্থ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, সনন্দে যদি "মৌজা সকল" বা তদ্রূপ সাধারণ বর্ণনা-সূচক অন্য বাক্য থাকে এবং সনন্দের দুই পক্ষই তাহার কোন এক বিশেষ অর্থ করিয়া থাকে এবং সেই ব্যাখ্যানুযায়ী স্বত্ব সমস্ত বহু বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ হইয়া থাকে, তবে যে ব্যক্তি সেই ব্যাখ্যার প্রতি আপত্তি করে তাহারই দেখাইতে হইবে যে, তাহা ভ্রমাত্মক। উপস্থিত মোকদ্দমায় তাহা দেখাইতে কি প্রকার চেষ্টা হইয়াছে?

সনন্দ এই এস্তাহারের স্বরূপ প্রদত্ত হয় যে, "গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের ১৮১৮ সালের ১৩ ই এপ্রিল তারিখের হুকুমমতে কাদের বকসকে যে ৪০০০ টাকা খোরাকী দেওয়া হয়, তৎপরিবর্ত্তে ফসলী ১২২৬ সালের শরৎকালের প্রারম্ভ হইতে তাহাকে নিষ্কর জায়গীর স্বরূপে নীচের তফসীলের লিখিত গবর্ণমেণ্টের ক্রীত তালুকা গণেশপুরের প্রধান ও অধীন মৌজা সমস্ত আবাদী ও গয়র-আবাদী ভূমি ও জলকর ও বনকর সমেত প্রদত্ত হইয়াছে।" এবং ঐ তফসীলে ২৭ মৌজার নাম লেখা আছে এবং আন্দাজী ভূমির ঘরে মোট ৩১৩৩ বিঘা ভূমি লেখা আছে, কিন্তু চৌহদ্দী নাই। রেস্পণ্ডেণ্টের বিজ্ঞবর কৌন্সেল ইহার সহিত, মতি খানম গবর্ণমেণ্টকে যে কবালা লিখিয়া দেয় তাহার বাক্য গুলির তুলনা করিয়াছেন; ঐ কবালায় আছে যে, নিম্নলিখিত ২৭ মৌজার তালুক গণেশপুর নীলাম-ক্রয়ের দ্বারা মতি খানমের সম্পত্তি হইয়াছে, অতএব উক্ত মৌজা সমস্তে তাহার যে কিছু মালিকীস্বত্ব, লাভ এবং অধিকার আছে ও নির্দ্দিষ্ট চৌহদ্দীবন্দী যে সকল আবাদী ও গয়র-আবাদী ভূমি, জঙ্গল, ইন্দারা, পুষ্করিণী, ডোবা, বনকর, জলকর ও ফলকর, বাগিচা, বৃক্ষ, উর্ব্বরা ও মরুভূমি ও লবণাক্ত ভূমি এবং প্রজার বাটী সকল আছে তাহা সে বিক্রয় করিতেছে।" এই কবালায় যে সকল "ব্যাপক শব্দ বিশেষতঃ "জঙ্গল" শব্দ ব্যবহৃত আছে এবং যাহা সনন্দে লেখা নাই, তাহার উপরে কৌন্সেল অত্যন্ত নির্ভর করেন। সনন্দের লিখিত "জলকর এবং বনকর" শব্দ গুলির উপরে নির্ভর করত প্রতিপক্ষ যে তর্ক করে, রেস্পণ্ডেণ্টগণ তাহার এই জওয়াব দেয় যে, যে জঙ্গলে বনকরের স্বত্ব থাকে তদ্দ্বারা যে, সেই জঙ্গলের ভূমির উপরে অবশ্যই স্বত্ব জন্মিবে, এমত নহে,

কারণ, অন্য এক ব্যক্তির জঙ্গলে বনকরের স্বত্ব পরিচালিত হইতে পারে, এবং প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করিলেও তাহা ঐ ৩৯৩৩ বিঘার সেই ভাগের বনকর যাহা ১৮১৮ সালের ২২ এ আগষ্ট তারিখের ফর্দ্দে, আবাদের যোগ্য হইলেও মরুভূমি অথবা গয়র-আবাদী বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। "নীচের তফসীল-লিখিত," এই শব্দগুলির উপরে এবং ঐ সকল মৌজার ৩৯৩৩ বিঘা ভূমি বলিয়া যাহা বর্ণিত আছে, তাহার উপরেও তাহারা অনেক নির্ভর করিয়াছে।

লর্ডগণের বিবেচনায়, এই সকল তর্ক কতক সঙ্গত বোধ হইলেও তদ্দ্বারা এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে না, যে গবর্ণমেণ্ট কেবল ৩৯৩৩ বিঘা ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। কবালার দ্বারা যে নামের ২৭ খানা মৌজা বিক্রীত হয়, সনন্দের দ্বারাও অবিকল সেই নামের ২৭ মৌজা প্রদত্ত হয়। কবালার দ্বারা এবং ১০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পূর্ব্ব রুকবা-বন্দী কাগজের দ্বারা নিঃসন্দেহ রূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে এবং সওয়াল-জওয়াবেও স্বীকৃত হইয়াছে যে, এই সকল মৌজা যাহা মতি খানম বিক্রয় করে, এবং যাহা প্রথম নকসায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই সমুদায় তালুকা এবং তাহার মধ্যে সমুদায় বিরোধীয় ভূমি ভুক্ত। ভারতবর্ষে কেবল কয়েক খানা বাটী অথবা কুড়িয়া ঘর, এবং ঐ ঘরবাসীরা বাস্তবিক যে ভূমি চাস করে, তাহা লইয়া মৌজা হয় না। ইহা এক পরগণার এক ভাগ এবং তাহাতে উপস্থিত মৌজা সকলের ন্যায় বসত-বাটী ও আবাদী ভূমি ও অনেক জঙ্গল থাকিতে পারে, যাহাতে প্রজার সহিত জমিদারেরও সমান স্বত্ব থাকিতে পারে। এক নামের মৌজা সমস্ত যাহা ঐ কবালা ও সনন্দের দ্বারা হস্তান্তরিত হয়, তাহা যে প্রসিদ্ধ এবং নির্ণীত চৌহদ্দী-বন্দী মৌজা তাহা দেখাইবার জন্য যদি সনন্দে অন্য কোন বর্ণনা না থাকে, এবং পক্ষান্তরে, ঐ সকল মৌজা যে তাহাদের জঙ্গল বাদে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও যদি ব্যক্ত না থাকে, তবে এক দলীল অপেক্ষা আর এক দলীলের শব্দগুলি কিছু ব্যাপক বলিয়াই কোন তারতম্য হইতে পারে না। অতএব "নীচের তফসীল অনুযায়ী" এই শব্দগুলি এবং মৌজা সমস্তের তফসীল দৃষ্টে এই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সনন্দের দ্বারা কেবল প্রত্যেক মৌজার এক এক ভাগ প্রদত্ত হয়, এবং সেই ভাগ চৌহদ্দীর দ্বারা স্থিরীকৃত হয় নাই, এবং অপিচ ইহাও সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, সনন্দের দ্বারা যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা তালুকার স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ খণ্ড খণ্ড ভূমি, এবং গবর্ণমেণ্ট যে জঙ্গল রাখিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ঐ সকল খণ্ড পরস্পর পৃথক্ ছিল। এই দলীলের কোন পরিচ্ছেদের দ্বারা যে, ঐ প্রকার অন্যায় ও অসংলগ্ন ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এমত লর্ডগণের দৃষ্ট হয় না। "নীচের তফসীলের লিখিত" এই শব্দের পরেই "গবর্ণমেণ্টের ক্রীত" শব্দদ্বয় আছে, অতএব এই অনুমান হয় যে, গবর্ণমেণ্ট যাহা ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহাই সনন্দের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং গবর্ণমেণ্ট যে সম্পত্তি ক্রয় ও দান করিয়াছেন, যে স্থলে তদুভয় সম্বন্ধেই ঐ শেষোক্ত শব্দ দ্বারা "নীচের তফসীল-লিখিত" শব্দগুলি সমতুল্য রূপে খাটে, সে স্থলে ঐ তফসীল অসম্পূর্ণ বর্ণনা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

রেস্পণ্ডেণ্টের বিজ্ঞবর কৌন্সেল তর্ক করিয়াছেন যে, মাসিক ৩০০ টাকা বেতনের পরিবর্ত্তে ১৮১৮ সালের গবর্ণমেণ্ট যে, এমন বৃহৎ এবং বহু মূল্যের সম্পত্তি দান করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব, এবং তিনি এই তর্কের পোষকতায়, ঐ দানের পূর্ব্বে যে সরকারী পত্র সমস্ত লেখা হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। লর্ডগণের মধ্যে এক জন দেখাইয়া দিয়াছেন যে, এই সনন্দের ব্যাখ্যা করার জন্য ঐ পত্র সমস্ত বিধিমতে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। তাঁহারা আরও

বলিতে পারেন যে, ঐ দান করার যে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত ছিল না, তাহা তাঁহাদের বিবেচনায়, তদ্দ্বারা সাব্যস্ত হয় নাই। ঐ সম্পত্তি অতি অল্প মূল্যে ক্রীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে প্রকারে এই সম্পত্তির সর্ব্বদা নীলাম হইয়াছিল তাহাতে উহার নির্দ্ধারিত রাজস্ব সম্পূর্ণ রূপে আদায় হইত কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। ইহা কেবল কাদের বক্‌সের জীবন পর্য্যন্ত নিষ্কর প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার দায়াধিকারীরা যে তাহা অপরিবর্ত্তনীয় জমায় ভোগ করিবে, তখন তাহার কোন সর্ত্ত ছিল না, এবং ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট যাঁহারা তৎকালে ও তাহার পরে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জঙ্গলের বিষয়ে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন, বোধ হয় তখন তাঁহাদের ইহাই মন্তব্য ছিল যে, জঙ্গল ক্রমশ, যেমন পরিষ্কার হইবে, তদনুযায়ী কাদের বক্‌সের উত্তরাধিকারীর হস্তে তাহার ক্রমশঃ কর বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। কিন্তু সে যাহা হউক, লর্ডগণ সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সনন্দের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা করিতে গেলে, যে তালুকা গণেশপুর গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়াছিলেন, তৎসমুদায়ই উক্ত সনন্দের দ্বারা প্রদত্ত হয়।

যদি তাহা হয়, তবে এখন পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক যে, এমত নির্দ্দেশ করার কোন হেতু আছে কি না যে, দানের পূর্ব্বে জায়গীরের যে অংশ সম্বন্ধে খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্টের ১৮২২ সালের ১৮ই জানুয়ারি তারিখের পত্রের দ্বারা কেবল সেই অংশ সম্বন্ধেই ঐ ১৮৭৭॥০ টাকা ইস্তমরারী জমা ধার্য্য হইয়া, অবশিষ্ট ভবিষ্যৎ জমাবন্দীর জন্য রাখা হইয়াছিল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যে নিয়মে সময়ে সময়ে কানুন মতে জমা নির্দ্ধারিত হয় তৎসম্বন্ধে লর্ডগণের সমক্ষে চতুরতার সহিত নানাপ্রকার তর্ক উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনায় উহা বর্ত্তমান মোকদ্দমায় খাটে না। জায়গীরভুক্ত ভূমি সমস্ত সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অপরিবর্ত্তনীয় জমা নির্দ্ধারণ করা একটি বিশেষ অনুগ্রহের কার্য্য হইয়াছিল, এবং তাহা ভারতবর্ষের তৎপ্রদেশস্থ রাজস্ব সম্বন্ধীয় সাধারণ আইন-বহির্ভূত কার্য্য হইয়াছিল। ঐ পত্রে ব্যবহৃত বাক্য হইতেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইবে, এবং লর্ডগণের বিবেচনায় তাহা চূড়ান্ত। তাহাতে লেখা আছে যে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনরেল বাহাদুরের অনুজ্ঞা এই যে, ঐ জায়গীরভুক্ত ভূমি সমস্ত কাদের বক্‌সের মৃত্যুর পরে তাহার দায়াধিকারীরা পাইবে এবং তাহারা তাহা ইস্তমরারী জমায় ভোগ করিবে। ঐ জায়গীরে যাহা কিছু ছিল তাহা ঐ জমার অন্তর্গত হইবে। ঐ দান সুবুদ্ধির কার্য্য না হইয়া থাকিবে, কিন্তু ১৮২২ সালের গবর্ণমেণ্ট তাহা করিয়া থাকিলে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উপরেও তাহা বাধ্যকর, এবং ১৮৩৭ সালের বন্দোবস্তের কালে তাহাই ন্যায্য রূপে বিবেচিত হইয়াছিল।

শেষ ইসু সম্বন্ধে অধিক বলা অনাবশ্যক। লর্ডগণ যে বিবেচনা করিয়াছেন যে, সমুদায় তালুকা প্রদত্ত এবং এক অপরিবর্ত্তনীয় জমায় তাহা ভোগ করার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, তাহা সত্য হইলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ভ্রম হওয়ার হেতুবাদে এই নালিশের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের এক কার্য্যও সংশোধিত হইতে পারে না। কিন্তু এই কথা কি প্রকারে কোন মোকদ্দমায় উত্থিত হইতে পারে তাহা বুঝা সুকঠিন। এমন দীর্ঘকাল পরে আমরা কিরূপে লর্ড হেষ্টিংসের কৌন্সিল ঘরে প্রবেশ করিয়া, কি মনস্থে তিনি এই পরিবারের প্রতি এমন অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে পারি, এবং কি রূপেই বা আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি, যে তিনি ভুলক্রমে এই দান করিয়াছিলেন, সকল বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দান করেন নাই এবং সেই সকল বৃত্তান্ত তাঁহার মন্ত্রিগণ তাঁহাকে বিদিত করেন নাই?

গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত কার্য্যের দ্বারা এই নালিশ উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে দুই পক্ষেই বহুল তর্কবিতর্ক হইয়াছে। লর্ডগণ সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার

করেন যে জনসমাজ যে দায়ের অধীন, তাহা হইতে কোন ব্যক্তি মুক্তি পাওয়ার জন্য যে সকল অমূলক দাবী করে তাহা হইতে সরকারী রাজস্ব রক্ষা করিতে গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব আছে, বরং তাহা রক্ষা করাই তাঁহাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু উপস্থিত মোকদ্দমায় লর্ডগণ ইহা না বলিয়া পারেন না যে, মেং হোয়াইটের বিবেচনাশূন্য মত তাঁহার উচ্চতর কর্ম্মচারিগণ উচিত পর্য্যালোচনা না করিয়াই অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সনন্দের যে ন্যায্য অর্থ ৪০ বৎসরের দখলের দ্বারা প্রতিপোষিত হইয়াছে এবং যাহা ১৮৩৭ সালের বন্দোবস্তের দ্বারা স্বীকৃত হয়, গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট হেতু ব্যতীত তাহার ফলের প্রতি অন্যায় রূপে আপত্তি করিয়াছেন।

এই আপীল গ্রাহ্য ও আগ্রার ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের ডিক্রী অন্যথা করত তৎপরিবর্ত্তে আপেলাণ্টগণের প্রার্থিত প্রতিকার তাঁহাদিগকে দুই নিম্ন আদালতের খরচা সমেত দেওয়ার ডিক্রী প্রদান করণার্থে লর্ডগণ বিনীতভাবে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে পরামর্শ দিবেন। আপেলাণ্টেরা এই আপীলেরও খরচা পাইবে। (গ)

---

৫ ই মার্চ, ১৮৭০।

## সর জেম্‌স্ ডবলিউ কল্‌বিল্; নাবিক সম্বন্ধীয় হাইকোর্টের জজ ও লর্ড জষ্টিস গিফার্ড এবং সর লরেন্স পীল।

আগ্রার ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

ভুবন দাস এবং আর এক ব্যক্তি

বনাম

সেখ মহম্মদ হোসেন প্রভৃতি।

চুম্বক।—বাদী নালিশ করে যে, সে যে হোসেন বক্‌সের সূত্রে দাবী করে, তাহারই উপকারের জন্য মুজার বরাবর এক কট-কবালা লিখিত হয়, এবং বাদী আরও বলে যে, হোসেন বক্‌স আপন টাকা হইতে ঐ বন্ধক রাখিবার টাকা দেয়। এ স্থলে যদি এমত সপ্রমাণ হয় যে, বন্ধকের জন্য যে টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা মুজার টাকা, তবে যাঁহারই বরাবর ঐ দলীল লিখিত হইয়া থাকুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না, কারণ, বাদী নিম্ন আদালতে যে স্বত্ব উত্থাপন করে, তাহার সহিত অসংলগ্ন অন্য কোন স্বত্ব সে আপীলে উত্থাপন করিতে পারে না। হোসেন বক্‌সের স্বত্ব ও হোসেন বক্‌সের টাকা সাব্যস্ত করার যথেষ্ট প্রমাণাভাবে বাদীর নালিশ ডিস্‌মিস্ হইল।

নিষ্পত্তি।—এই আপীলের এক মাত্র বিচার্য্য প্রশ্ন এই যে, ১৮৫৫ সালের ৭ ই নবেম্বর তারিখের এক কট-কবালার অন্তর্গত কট-গৃহীতার স্বত্ব হোসেন বক্‌স নামক এক স্ত্রীলোকের বরাত্ত গৃহীতা সূত্রে আপেলাণ্টের হস্তে বর্ত্তিয়াছে, কি মুজা আবদুল্লা বেগের স্থলাভিষিক্ত ও দায়াধিকারিণী সূত্রে রেস্পণ্ডেণ্ট হোসেনী বেগমের হস্তে আসিয়াছে?

আর দুই জন রেস্পণ্ডেণ্ট যাহারা বন্ধকদাতার স্থলাভিষিক্ত, তাহাদের বিরুদ্ধে ঐ বন্ধক পরিচালন করার জন্য এই নালিশ আপেলাণ্ট কর্ত্তৃক উপস্থিত হয়। রেস্পণ্ডেণ্ট হোসেনী বেগম দরখাস্ত দ্বারা এই বলিয়া মোজাহেম হয় যে, ঐ বন্ধকী খত যাহা উক্ত মুজার সম্পত্তির এক ভাগ, তাহা হোসেন বক্‌সের হস্তান্তর করার কোন স্বত্ব ছিল না, কারণ, তাহা মুজা আবদুল্লার দায়াধিকারিণী সূত্রে এইক্ষণে ঐ দরখাস্তকারীর সম্পত্তি। মোকদ্দমায় তাঁহাকে তাঁহার স্বত্ব রক্ষণার্থে পক্ষ করা হয়; এ প্রযুক্ত তাহাতে দুই প্রশ্ন উঠে, যথা, ১ম, আপেলাণ্টেরা হোসেন বক্‌স হইতে প্রাপ্ত স্বত্বের বলে মুল বন্ধক-গৃহীতার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে কি না, এবং যদি তাহা হয়, তবে ২য়তঃ তাহারা বন্ধক দাতাগণের বিরুদ্ধে দাবীকৃত প্রতিকার পাইতে স্বত্ববান হইতে পারে কি না। ইহার মধ্যে কেবল প্রথম প্রশ্নই নিম্ন আদালতে বিচারিত এবং এই আদালতে তর্কিত হইয়াছে।

মুর্জা আব্দুল্লা বেগের সম্পত্তি সম্বন্ধে রেস্পণ্ডেণ্ট হোসেনী বেগম এবং হোসেন বক্সের মধ্যে পূর্ব্বে যে এক মোকদ্দমা হয় তাহাতে নিম্ন দুই আদালতের ডিক্রী যাহা প্রিবি কৌন্সিলের দ্বারা স্থির থাকে, তদ্দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় যে, হোসেন বক্স ঐ মুর্জার বিবাহিতা স্ত্রী ছিল না, উপপত্নী ছিল এবং হোসেন বক্স স্বীয় অনুকূলে ঐ মুর্জার উইল বলিয়া যে এক দলীল উপস্থাপন করিয়াছিল তাহা কৃত্রিম এবং রেস্পণ্ডেণ্ট হোসেনী বেগমই ঐ মুর্জার বৈধ দায়াধিকারিণী সূত্রে তাহার সম্পত্তিতে স্বত্ববতী ছিলেন।

বিরোধীয় খতের ইতিবৃত্ত এই যে, বন্ধকদাতারা তালুক কোমরপুরের অর্দ্ধেকের মালিক থাকিয়া তাহা আপেলাণ্টের পিতা অথবা পূর্ব্ব পুরুষ বিষ্ণুদাসকে বন্ধক দিয়াছিল, এবং তাহারা সেই বন্ধক খালাসের ও অন্য প্রয়োজনের নিমিত্ত ১৮৫৫ সালের নবেম্বর মাসে ৭০০০ টাকা কর্জ্জ করে। সুদ সমেত এই নূতন কর্জ্জ পরিশোধ করার প্রতিভূ স্বরূপে তাহারা তাহাদের ঐ তালুকের অর্দ্ধেক হিস্যার এক কট-কবালা লিখিয়া দেয়, যাহা প্রবল করার নিমিত্ত বর্ত্তমান নালিশ উপস্থিত হইয়াছে। সেই তারিখের অর্থাৎ ১৮৫৫ সালের ৭ই নবেম্বরের অন্য দলীল দ্বারা তাহারা বন্ধক-গৃহীতার নিকট বন্ধকী সম্পত্তির বার্ষিক ৩১১৭৮১ টাকা জমায় এক ইজারা লয়, এবং তদনুযায়ী তাহারা এই সর্ত্তে তাহাতে দখীলকার থাকে যে, তাহারা ঐ জমা হইতে গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব এবং সম্পত্তির অন্যান্য খরচা দিবে, এবং বাকী ৮৪০ টাকা এই উপস্বত্বভোগী বন্ধকের বার্ষিক উপস্বত্ব স্বরূপে বন্ধক-গৃহীতাকে দিবে। মুর্জা আবদুল্লা বেগের স্ত্রী মসম্মত জরিয়তুল বতুল ওরফে বিবী হোসেনী কল্যাণের নামে ঐ বন্ধক লওয়া ও টাকা দেওয়া হয়। অতএব পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রশ্ন এই যে, কোন্ ব্যক্তি এই বন্ধক-গৃহীতা ছিল?

নিম্ন আদালতদ্বয়ে এই প্রশ্ন সম্বন্ধে দুই ইসু হয়, প্রথম ইসু এই যে, ঐ বর্ণনা দ্বারা কোন্ ব্যক্তিকে বুঝায় অর্থাৎ হোসেন বক্সকে বুঝায়, কি মুর্জা আবদুল্লা বেগের বিনীত বিবী নাম্নী স্বীকৃত স্ত্রীকে বুঝায়; এবং দ্বিতীয় ইসু এই যে, ঐ বর্ণনার দ্বারা যে কোন ব্যক্তিকেই বুঝায়, তাহার বেনামীতে বন্ধক লওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে মুর্জা কর্ত্তৃক টাকা দেওয়া এবং মুর্জার লভ্যের জন্য বন্ধক লওয়া হইয়াছিল কি না?

লর্ডগণের মত এই যে, যদি এমন প্রদর্শিত হয় যে, টাকা মুর্জা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তবে যাহার নামেই বন্ধক লওয়া হইয়া থাকুক না কেন, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। কারণ, আপেলাণ্টেরা যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, এবং যাহা তাহাদের সাক্ষীরা শপথ করিয়া বলিয়াছে তাহা এই যে, হোসেন বক্স কর্ত্তৃক ঐ টাকা প্রদত্ত এবং তাহারই লভ্যের জন্য ঐ বন্ধক-গৃহীত হইয়াছিল। নথীতে এমত কোন প্রসঙ্গ নাই যে, মুর্জা কর্ত্তৃক টাকা প্রদত্ত হইলেও বাস্তবিক ঐ কার্য্য হোসেন বক্সের উপকারের জন্য তাহাকে প্রদত্ত দান স্বরূপ হইয়াছিল; এবং আপেলাণ্টেরা নিম্ন আদালতে যে স্বত্ব উপস্থাপন করিয়াছে তাহার সহিত অনৈক্য কোন স্বত্ব এইক্ষণে তাহাদিগকে উপস্থাপন করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব ইহা শোচনীয় যে, এই আবশ্যকীয় ইসু যাহার সম্বন্ধে প্রায় সমুদায় প্রমাণই প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপরে নিম্ন আদালত দ্বয় তত স্পষ্ট নির্দ্দেশ করেন নাই, যত তাঁহারা হোসেন বক্সের আচরণ যাহা পশ্চাতে পর্য্যালোচিত হইবে, তাহার উপরে করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আপেলাণ্টেরা কহে যে, ঐ টাকা হোসেন বক্সের ছিল। এই কথা কেবল কয়েক জন চাকরের দ্বারা প্রতিপোষিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এক জনের সাক্ষ্য পূর্ব্ব মোকদ্দমায় অবিশ্বাস করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি শপথ করিয়াছে যে, হোসেন বক্স যখন মুর্জার অন্দরে আইসে,

তখন সে তাহার সঙ্গে প্রায় ১৫০০০ টাকার অধিক লইয়া আইসে; কিন্তু এই কথা নিতান্ত অসম্ভব। প্রধান সদর আমীন এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আপেলাণ্টের সাক্ষিগণ প্রতি-পক্ষের সাক্ষিগণের তুল্য বিশ্বাসযোগ্য নহে, এবং লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, তাহাদের উপরে কিছু মাত্র নির্ভর করা যাইতে পারে না। হোসেন বক্সের জবানবন্দী লওয়া হয় নাই, এবং কবুলিয়তের সর্ত্ত মতে বন্ধক-দাতারা কালেক্টরীতে খাজানা দাখিলের যে রসীদ বন্ধক-গৃহীতাকে প্রদান করিতে বাধ্য ছিল, তাহা দাখিল করিয়াও হোসেন বক্সের কথা সপ্রমাণ করা হয় নাই।

টাকা সম্বন্ধে রেস্পণ্ডেণ্টগণ কহে যে, ঐ ৭০০০ টাকার মধ্যে, নারায়ণ দাস নামক এক ব্যক্তির কুঠী হইতে মুদ্রা ৬৯০০ টাকা আনাইয়া দেন, এবং বাকী ১০০ টাকা তাঁহার নিজের তহবীল হইতে দেন। যে সকল সাক্ষী এই কথার জবানবন্দী দিয়াছে, তাহারাও প্রায়ই বাটীর চাকর। এই সকল সাক্ষীকে লর্ডগণের দেখিবার কোন উপায় না থাকায়, কি রূপে প্রধান সদর আমীন তাহাদিগকে প্রতিপক্ষের সাক্ষিগণ অপেক্ষায় অধিক বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহাও তাঁহাদের বিচার করার উপায় নাই। নারায়ণ দাসের কুঠী হইতে টাকা আনিবার কথা সপ্রমাণ করার জন্য যে গোমাস্তার জবানবন্দী হইয়াছে, তাহার প্রতি যে সকল আপত্তি হইয়াছে, তাহা না থাকিলে, ঐ জবানবন্দী দ্বারাই রেস্পণ্ডেণ্ট জয়ী হইতে পারে। এক্ষণে ঐ সকল আপত্তির পর্য্যালোচনা করিতে হইবে।

প্রথম আপত্তি এই যে, নথীতে যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে কুঠীওয়ালের খাতায় ঐ টাকা খরচের তারিখ ইংরেজী ১৮৫৫ সালের ২২ এ নবেম্বর; অতএব তাহা রেস্পণ্ডেণ্টের কথার সহিত অনৈক্য, কারণ, তদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বন্ধকের কার্য্যের পরে ঐ ৬৯০০ টাকা প্রদত্ত হয়। কিন্তু লর্ডগণের এমত প্রতীতি হইতেছে না যে, হিন্দী তারিখ নথীতে বিশুদ্ধ রূপে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। তাহা মিতু কার্ত্তিক সুদী, ১৩ ই। কট-কবালায় হিন্দী তারিখ কার্ত্তিক বুদী, ১৩ ই। মাসের নাম ও তারিখ সমান। কেবল "সুদী" আর "বুদী" অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের প্রভেদ। অতএব এক কথায় ভুল হওয়া অনুমান করিয়া লইলে ঐ অনৈক্যতা দূর হয়। লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, রেস্পণ্ডেণ্টের মোকদ্দমায় ও তাঁহার প্রমাণে যদি এই গুরুতর অনৈক্যতা থাকিত, তবে ঐ প্রদেশস্থ যে জজ প্রথম এই মোকদ্দমার বিচার করেন তিনি ও আপেলাণ্টেরা এই কথা কখন ছাড়িয়া দিতেন না। কিন্তু জজ কোন কথা না বলিয়া ঐ প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং দৃষ্টব্যে তাহা বিশ্বাসও করিয়াছেন, এবং আপেলাণ্টেরাও তাহাদের আপীলের হেতুতে অথবা আপীলের সওয়াল-জওয়াবে তদ্বিষয়ে কোন আপত্তি করে নাই।

যে প্রকার বিস্তারিত রূপে খাতায় ঐ খরচ লেখা আছে তাহাই উহার বিরুদ্ধে একটি প্রবলতর আপত্তি। জিজ্ঞাসিত হইয়াছে যে, কি জন্য ঐ খরচ এই প্রকারে লিখিত হইয়াছে যে, "এক বন্ধকের জন্য সেখ মহম্মদ হোসেন এবং সেখ মহম্মদ হাসনের সাক্ষাতে ঠাকুর হরণ সিংহের মার্ফৎ বিষ্ণুদাস ও গোপালদাসকে দেওয়া গেল।" এই রূপ খরচ লেখাতে মুক্তার বাটীতে না হইয়া কুঠীতে টাকা প্রদত্ত হওয়া প্রকাশ পায়। অন্য সাক্ষীরাও বিষ্ণুদাস এবং গোপালদাসকে টাকা দেওয়ার কথা বলে না; কিন্তু ইহা সম্ভব যে, কোন-না কোন স্থানে এবং সময়ে ঐ টাকা দেওয়া হইয়াছিল। ইহাও তর্কিত হইয়াছে যে, রেস্পণ্ডেণ্টের কথা যদি সত্য হইত, তবে তিনি জীবিত বন্ধকদাতা সেখ মহম্মদ হোসেনকে অথবা খাতার লিখিত ও সাক্ষিগণের বর্ণিত অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে ডাকিয়া তাহা সপ্রমাণ

করিতে পারিতেন। এই সকল তর্কে যে, অনেক বলী আছে ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, ঐ খরচ সম্বন্ধে কিম্বা অন্য বিষয়ে গোমাস্তাকে জেরা-সওয়াল করা হয় নাই। এই প্রমাণ প্রদানের প্রতি নিম্ন আদালত কোন আপত্তি করেন নাই। অতএব যদি ভারতবর্ষীয় আদালতদ্বয় এই প্রমাণের উপরে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেন যে, রেস্পণ্ডেণ্টের কথিত প্রকারে আবদুল্লা বেগ ঐ টাকা প্রদান করিয়াছিল, এবং যদি সেই নির্দ্দেশের উপরেই তাঁহাদের রায় প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে ঐ খাতার লিপি ও রেস্পণ্ডেণ্টের সাক্ষিগণের চরিত্র সম্বন্ধীয় আপত্তি সত্ত্বেও দুই নিম্ন আদালত একমতে যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তৎপ্রতি লর্ডগণ হস্তক্ষেপ করার কোন কারণ দেখিতেন না।

দুর্ভাগ্য বশতঃ, এই বৃত্তান্ত-ঘটিত ইসুর উপরে কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ হয় নাই। অতএব নিম্ন আদালতদ্বয় যে হেতুবাদে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা ন্যায্য কি না, ইহা লর্ডগণ পর্য্যালোচনা করিবেন।

প্রধান সদর আমীন প্রধানতঃ এই হেতুতে নিষ্পত্তি করিয়াছেন যে, হোসেন বক্স ঐ কৃত্রিম উইলের নিম্নভাগে "কোমরপুর" নামে মুজ্জার এক সম্পত্তি লেখাতেই এই অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, উহা মুজ্জার সম্পত্তি বলিয়া সে স্বীকার করিয়াছে। আপীল-আদালতও এই রায় অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি আরও নির্দ্দেশ করেন যে, হোসেন বক্সের নামে বন্ধক লওয়া হয় নাই, জীনত বিবীর নামে লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আদালত যে হেতুবাদে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা লর্ডগণের মতে সন্তোষকর নহে। "জুরিয়তুল বতুল" শব্দ দুই জনের সম্বন্ধেই সমতুল্য রূপে খাটিতে পারে। কিন্তু "ওরফে হোসেনী কল্যাণ" নাম জীনত বিবীর অপেক্ষা হোসেন বক্সের নামের নিকট। হোসেন বক্সের কথা সত্য হইলে এমত হইতে পারে যে, তাহার যে নাম ছিল তদপেক্ষা সে ঐ দলীলে খ্যাতি-বিশিষ্ট নাম লেখাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল, কিন্তু উইলের দান সম্বন্ধে কোন বিরোধ না হয় তজ্জন্য তাহাতে সে তাহার আদি নাম দিয়াছিল। আর সে যে আপনাকে মুজ্জার স্ত্রী বলিয়া বর্ণন করিয়াছে, তাহাও তাহার নালিশের সহিত অনৈক্য নহে, এবং মুজ্জার সহিত যদি ঐ কারবার হইয়া থাকে, তবে তিনিও যে হোসেন বক্সকে ঐ বর্ণনা করিতে দিয়াছিলেন ইহাও একেবারে অসম্ভব নহে। অতএব লর্ডগণ এমন কথা বলিতে পারেন না যে, হোসেন বক্স বেনামী বন্ধক-গৃহীতা ছিলেন না, যদিও তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, হোসেন বক্স বেনামী বন্ধক-গৃহীতা বলিয়াই সন্তোষকর রূপে সপ্রমাণ হইয়াছে।

রায়ের অন্য এক হেতু তাঁহাদের বিবেচনায় আরও প্রবল। ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে যে, উইলের নিম্ন ভাগে কোমরপুর নামে যাহা লেখা আছে, তাহা বন্ধকের লিখিত সম্পত্তি নহে। প্রধান সদর আমীন যিনি ঐ প্রদেশস্থ এক জন বিচারপতি, এবং যিনি তথাকার বিষয় সমস্ত অবগত ছিলেন, তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, উইলের লিখিত কোমরপুর নামে ঐ সম্পত্তিই বর্ণিত হইয়াছে। এই নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে আপীলের হেতুতে কোন আপত্তি উপস্থিত হয় নাই, এবং সদর আদালতের জজেরা যাঁহারা স্থানীয় বিষয় সকল তদ্রূপ অবগত ছিলেন না, তাঁহাদের সমক্ষে আপীলেও এই মাত্র তর্ক হইয়াছিল যে, ঐ নামে অন্য কোন সম্পত্তি বুঝাইতে পারে। কিন্তু ঐ নামে অন্য কোন্ সম্পত্তি বুঝায় তাহা দেখাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই; অতএব লর্ডগণ বিবেচনা করেন যে, প্রধান সদর আমীন যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ঐ কৃত্রিম উইলে বিরোধীয় সম্পত্তি মুজ্জার এক সম্পত্তি বলিয়া লেখা আছে, তাহা বিশুদ্ধ।

রেস্পণ্ডেণ্ট হোসেনী বেগমের সহিত বন্ধক দাতাগণের কারবার সম্বন্ধে এবং আপেলাণ্ট কর্তৃক হোসেন বক্সের স্বত্ব ক্রয় সম্বন্ধে যে সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা লর্ডগণের বিবেচনায়, দুই পক্ষের এক পক্ষেরও কোন আনুকূল্য করে না। আপেলাণ্টেরা চক্ষুঃ খুলিয়া এক সন্দিগ্ধ স্বত্ব ক্রয় করিয়াছে, এবং সেই স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে না পারিলে তাহাদের যত দূর সাধ্য ক্রয়মূল্য ফেরৎ পাওয়ার উপায় করিয়া রাখিয়াছে। এই তালুকের দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশের মালিক বিধায় আপেলাণ্টদিগের এই অর্দ্ধাংশ ক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার অনেক কারণ ছিল। পক্ষান্তরে, বন্ধক-দাতাদিগের দ্বারা রেস্পণ্ডেণ্টের স্বত্ব স্বীকৃত হওয়াতে এই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মুজাই বাস্তবিক মূল বন্ধক-গৃহীতা ছিল, কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্ট তাহাদিগকে যে সমস্ত সরল সর্ত্ত প্রদান করিয়াছে, তদ্দ্বারাই ঐ স্বীকারের কারণ বুঝা যাইতেছে।

সমুদায় দৃষ্টে লর্ডগণের মত এই যে, আপেলাণ্টেরা এমন প্রমাণের দ্বারা হোসেন বক্সের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে পারে নাই, যদ্দ্বারা আপীলকৃত ডিক্রী ন্যায্য রূপে অন্যথা করা যাইতে পারে। টাকা কাহার দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছিল, এই ইসুর আরও সন্তোষকর বিচার করার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে লর্ডগণের সন্দেহ হইয়াছিল। কিন্তু হোসেন বক্সের স্বত্বের প্রতি যে, অনেক সন্দেহ আছে, এবং প্রধান সদর আমীন যে, রেস্পণ্ডেণ্টের সাক্ষিগণকে অধিক বিশ্বাস করিয়াছেন তাহা, এবং তিনি যে সমস্ত হেতু প্রদর্শন করিয়া নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া এবং তাঁহার ঐ রায় উচ্চতর আদালত কর্তৃক স্থির থাকায় লর্ডগণ এই আপীল ডিস্মিস্ করার জন্যই শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে বিনীতভাবে পরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিলেন। এই নিষ্পত্তির ফলানুসারে খরচা আদায় হইবে। (গ)

৯ ই মার্চ, ১৮৭০।

লর্ড ওএষ্টবরী; সর জেম্স ডব্লিউ কল্‌বিল; সর জোসেফ নেপিয়ার ও সর লরেন্স পীল।

পঞ্জাবের জুডিসিয়াল কমিস্যনরের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল।

বার্লো

বনাম

অর্ড, প্রভৃতি।

চুম্বক।—সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উত্তরাধিকার হিন্দুশাস্ত্র মতে, মুসলমানদের, শরা মতে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান খৃষ্টিয়ানদিগের, ইংলণ্ডীয় আইনমতে নির্ণীত হয়; কিন্তু প্রত্যেক স্থলে মৃত ধনীর ষ্টেটস্ অর্থাৎ অবস্থা নির্ণয়ার্থে তাহার নিজের জীবনযাত্রার প্রণালী ও আচার-ব্যবহার, এবং সে যে শ্রেণী বা দলভুক্ত তাহার রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়; এবং স্থলবিশেষে প্রযুজ্য কোন বিশেষ নিয়ম নির্ণয় করিতে না পারিলে তত্তৎ স্থলে সুবিচার, ন্যায়পরতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের যুক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া বিচার করিতে হয়।

উইল দৃষ্টে "সন্তান" শব্দ উইল-কর্ত্তা কর্তৃক যে অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অনুভূত হয় তদ্দৃষ্টে, এবং প্রাকৃতিক ন্যায়ের যুক্তি মতে ঐ উইলের ব্যাখ্য করিয়া, অবধারিত হইল যে, যে স্থলে জারজ সন্তান তজ্জনক কর্তৃক আপন সন্তান বলিয়া স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ঐ "সন্তান" শব্দে ঐ জারজ সন্তান ও বিবাহজাত সন্তান উভয়ই বুঝায়।

নিষ্পত্তি।—ভূতপূর্ব্ব ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির জনৈক সৈনিক কর্ম্মচারী কর্ণেল জেম্স্ স্কিনরের উইলের অর্থ ও আইনানুগত ফলের উপরে এই আপীলের বিচার্য্য প্রশ্ন নির্ভর করে।

কার্ণেল স্কিনর ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরলোক গমন করেন; তাঁহার মৃত্যুকালে তিনি দিল্লীপ্রদেশবাসী ছিলেন এবং ঐ প্রদেশ তৎকালে ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলভুক্ত ছিল, কিন্তু গত রাজ-বিদ্রোহের পরে তাহা পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীন হয়।

বাসস্থানের আইন নির্ণয় হইলে, উইলের ব্যাখ্যা, ও ফল তাহারই উপরে নির্ভর করিবে। কর্ণেলের মৃত্যু কালে তিনি যে প্রদেশবাসী ছিলেন তাহাতে উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন ছিল না; অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই আপন আপন অবস্থা অর্থাৎ প্রধানতঃ ধর্ম্মের উপরে উত্তরাধিকারের নিয়ম নির্ভর করিত।

অতএব সাধারণ নিয়ম এই যে, হিন্দুর উত্তরাধিকার হিন্দুব্যবহারশাস্ত্রের ও মুসলমানের উত্তরাধিকার শরার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টীয়ানের উত্তরাধিকার ইংলণ্ডীয় আইনের উপর নির্ভর করিত। কিন্তু প্রত্যেক স্থলে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থা নির্ণয়ার্থে তাহার নিজের জীবনযাত্রার প্রণালী ও আচার-ব্যবহার, এবং সে যে শ্রেণী অথবা দলভুক্ত তাহার রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইত।

স্থলবিশেষে প্রযুজ্য কোন বিশেষ নিয়ম নির্ণয় করিতে না পারিলে ঐ প্রদেশের বিচারকদিগকে ঐ স্থলে সুবিচার, ন্যায়পরতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে হইত।

কর্ণেল স্কিনর যে প্রদেশবাসী ছিলেন, তত্রত্য আদালত সমূহের বিচারাধিকার নির্ণয় করার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে সকল কানুন করিয়াছিলেন এবং যাহা স্কিনরের মৃত্যু কালে প্রচলিত ছিল, তাহার ঐরূপ মর্ম্ম মুরের ভারতবর্ষীয় আপীলের ৯ম বালমের ১৯৫ পৃষ্ঠায় এব্রাহেম বনাম এব্রাহেমের মোকদ্দমায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কর্ণেল স্কিনরের নিজের অবস্থা নির্ণয় করার জন্য তাঁহার উইল ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণ নাই।

কথিত হইয়াছে এবং প্রমাণও আছে যে, তিনি জারজ ছিলেন; বোধ হয় যে, ঐ প্রদেশস্থ এক স্ত্রীর গর্ভে জনৈক ইউরোপীয় পুরুষের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে এক দল সিবন্দী অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতির পদে কর্ণেল স্কিনর অনেক যশঃ লাভ করেন, এবং তাঁহার কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপে তিনি বৃহৎ বৃহৎ ভূমি-সম্পত্তির দান প্রাপ্ত হন, যাহা কতক উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে এবং কতক দিল্লী প্রদেশে স্থিত।

মারকুইস অব্ হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল থাকার কালে, ইহার মধ্যে কয়েকটি জমিদারী সম্বন্ধে কর্ণেল স্কিনরকে যে নূতন সনন্দ দিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ করা উচিত। "আলতমগায়" কর্ণেল স্কিনরকে ঐ সনন্দ দেওয়া হয় এবং তাহা ফসলী ১২২৬ সাল হইতে প্রবল হওয়ার কথা ছিল, এবং তাহাতে এই প্রকার সর্ত্ত ছিল, যথা, "কর্ণেল স্কিনর, এবং "তাঁহার পরে তাঁহার দায়াধিকারিগণ অথবা "তিনি তাঁহার চরম উইলের দ্বারা "কিম্বা অন্য কোন বৈধ দলীলের দ্বারা "যে সকল ব্যক্তিকে দিয়া যাইবেন, তাহাদের "এবং তাহাদের দায়াধিকারিগণকে তিনি যে "পরিমাণে দিবেন তদনুসারে তাহারা প্রত্যেকে "আপন আপন অংশ ভোগ করিয়া ঐ উইলের "আদেশ প্রতিপালন করিবে।" যদি ঐ সনন্দ আলতমগায় কেবল উক্ত কর্ণেল এবং তাঁহার দায়াধিকারিগণকে প্রদত্ত হইত, তাহা হইলে কর্ণেল বিবাহজাত সন্তান না রাখিয়া পরলোক গমন করিলেই তাহা শেষ হইয়া যাইত; অতএব সনন্দে যে, উইলের দ্বারা দান করার ক্ষমতার কথা লেখা আছে, তাহা বোধ হয় কর্ণেল ইহা জানিয়াই লেখাইয়া লইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবাহ-জাত সন্তান রাখিয়া পরলোক গমন করার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এই তর্কে অধিক বল নাই। দেখা যাইতেছে যে, কর্ণেল স্কিনর কখন বিবাহ করেন নাই, কিন্তু তিনি কয়েক জন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোককে তাঁহার পরিবারভুক্ত রাখিয়া তাহাদের সহিত সহবাস করিতেন এবং তাহাদের গর্ভে তাঁহার কয়েকটি সন্তান হইয়াছিল।

কর্ণেল স্কিনর বা তাঁহার বংশ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাহাদের আচার ব্যবহার বা রীতিনীতি কিরূপ ছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। তাঁহার আদি মূল কেহ জানে না। জারজ বিধায় তিনি কোন বংশভুক্ত ছিলেন না। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, তিনি এক জন কপালে সৈনিকপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার বীর্য্য ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দ্বারা তিনি ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে উচ্চ পদ ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

এমত অবস্থায়, ঐ কর্ণেলের উইলের ব্যাখ্যার এবং তাঁহার উত্তরাধিকার নির্ণয়ের জন্য কোন্ আইন অবলম্বন করিতে হইবে তাহা বলা দুঃসাধ্য; অতএব তৎসম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন উত্থিত হউক, তাহা প্রাকৃতিক ন্যায়ের যুক্তিমতে মীমাংসিত হইবে।

ইংলণ্ডীয় আইনে ব্যাখ্যার এই এক পারিভাষিক নিয়ম আছে যে, সন্তানের শ্রেণীর মধ্যে জারজ সন্তানেরা কোন উইলকর্ত্তার জীবদ্দশায় তৎকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইলেও, তাহার উইলের দ্বারা ত্যক্ত সম্পত্তি বিবাহ-জাত সন্তানগণের সহিত একত্রে ভোগ করিতে পারে না; অতএব রেস্পণ্ডেণ্টগণ তর্ক করে যে, ব্যাখ্যার এই নিয়ম কর্ণেল স্কিনরের উইল সম্বন্ধে খাটিবে; কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই যে সকল হেতুর উল্লেখ করিয়াছি তদনুসারে আমাদের মত এই যে, ইংলণ্ডীয় আইনের দ্বারা কর্ণেল স্কিনরের উত্তরাধিকার শাসিত হইতে পারে না, অতএব তাহাতে ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ইংলণ্ডীয় ঐ নিয়মও খাটে না।

"সন্তান" শব্দ কর্ণেল স্কিনরের উইলের যে যে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার এমতভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে ভাবে ঐ উইলের ভাষা ও অভিপ্রায় দৃষ্টে উইল-কর্ত্তার দ্বারা তাহা ব্যবহৃত হওয়া স্পষ্ট অনুভূত হয়, অর্থাৎ ঐ শব্দের উইল-কর্ত্তার মনোগত এবং আভিধানিক অর্থ ঐ উইল দৃষ্টেই স্থির করিতে হইবে।

উইল-কর্ত্তা যখন উইল করিয়া পরলোক গমন করেন তখন তাঁহার ৫ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল এবং তাহারা সকলেই জারজ; কারণ, ইহা নিশ্চয় দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল সন্তানের প্রসূতিদিগের মধ্যে কাহার সহিতই ঐ কর্ণেলের উদ্বাহ ক্রিয়া হয় নাই।

এই সকল পুত্র এবং কন্যাদিগকে কর্ণেল স্কিনর আপন জীবদ্দশায় আপন সন্তান বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার উইলে তিনি তাহাদিগকে তাঁহার "পুত্র ও কন্যা" বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

যথা, "আমার পুত্র জোসেফ, জেমস্, হর্কিউলিস্, আলেক্জাণ্ডর এবং টমাস্কে" সাধারণ দান করিয়া উইলের আরম্ভ হইয়াছে, এবং তদন্তর চাকর ও অন্যান্য ব্যক্তিকে আজীবন পেন্সন দিয়া লেখা আছে যে, তাহাদের অভাবে তাহা "আমার পুত্রগণে" অর্শিবে।

উইলের অপর এক স্থলে "পুরুষ সন্তান" বলিয়া পুত্রগণের কথা লেখা আছে, এবং তাহার পরে তাহারা "আমার প্রসিদ্ধ সন্তান" বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, উইলকর্ত্তার মেজর রবর্ট স্কিনর নামক এক ভ্রাতা ছিলেন এবং তিনিও তাঁহার ন্যায় কখনও বিবাহ করেন নাই, কিন্তু কর্ণেল যখন উইল করেন, তখন তিনি কয়েকটি জারজ সন্তান রাখিয়া পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ঐ সকল সন্তানদিগকে তাহাদের পিতা আপন জীবদ্দশায় আপন সন্তান বলিয়া স্বীকার ও ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কর্ণেলের উইলে আরও দেখা যাইতেছে যে, তিনি ঐ সকল সন্তানের ট্রষ্টী অথবা অভিভাবক নিয়োজিত হইয়াছিলেন, অতএব অনায়াসে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, তিনি ঐ সকল সন্তানদিগের জারজত্বের কথা উত্তম রূপে অবগত ছিলেন। অতএব উইলে যে লেখা আছে যে, কোন্ কোন ঘটনায় "আমার মৃত ভ্রাতা

"মেজর রবর্ট স্কিনরের সন্তানেরা এবং তাহাদের "সন্তানেরা সমান ভাগে পাইবে," ইহা অবশ্যম্ভাবীয় কথা।

এই স্থানে মেজর রবর্টের জারজ সন্তানদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া লেখা হইয়াছে, এবং উইল-কর্ত্তা আপন কন্যা ও দৌহিত্রী এবং তাহাদের বিধিমত সন্তানের সহিত ঐ জারজ সন্তানদিগকে একত্রে ভাগী করিয়া গিয়াছেন।

এই উইলের লিখিত "সন্তান" শব্দে পুত্রের সন্তান বুঝায় বলিয়া আমরা যে ব্যাখ্যা করিলাম, তাহা এই কথা দ্বারা বিশুদ্ধ বোধ হইতেছে যে, কর্ণেল যখন তাঁহার উইলে তাঁহার কন্যাদিগের সন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন তখন তিনি অন্য প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

কর্ণেলের কন্যারা বৈধ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সম্পর্ক না করে এবং তাহাদের বিধিমত সন্তান ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের সন্তান না হয়, ইহা যে, কর্ণেলের ইচ্ছা ছিল, তাহা স্বভাবতঃই বিবেচনা করা যাইতে পারে; অতএব যেস্থলে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার প্রসিদ্ধ পুত্রেরা অর্থাৎ তাঁহার ৫ পুত্র কোন সন্তানসন্ততি না রাখিয়া পরলোক গমন করে, তবে তাঁহার কন্যা লুইসা এবং এলিজাবেথ এবং তাঁহার দৌহিত্রী সোফী যিনি বিবাহজাত সন্তান, অথবা তাহাদের বিধিমত সন্তানেরা সম্পত্তি পাইবে, সেই স্থানে দেখা যাইতেছে যে, তিনি তাঁহার পুত্রের সন্তানদিগকে যে বাক্য সমস্ত ব্যবহার করিয়া দান করিয়াছেন, তাহা তিনি কন্যাদিগের সম্বন্ধে ব্যবহার করেন নাই।

প্রমাণে আরও দেখা যাইতেছে যে, কর্ণেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফের (যাঁহার ১৮৫৫ সালে মৃত্যু হয়,) কোন বিবাহ-জাত সন্তান ছিল না, কিন্তু জর্জ নামক একটি জারজ পুত্র ছিল, এবং কর্ণেলের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাহার জন্ম হয়, এবং কর্ণেল তাহাকে বরাবর পৌত্র বলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন; এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এই প্রসিদ্ধ পুত্র জর্জ আপন পিতা জোসেফের মৃত্যুর পরে জোসেফের উত্তরাধিকারী হইয়াছে, এবং উইলমতে যে অংশ জোসেফের প্রাপ্য ছিল, তাহা পাইয়াছে।

"সন্তান" শব্দ যে স্থলে কোন বিশেষ ব্যক্তি-বোধক রূপে না হইয়া সন্তান-শ্রেণীবোধক রূপে ব্যবহৃত হয়, "সে স্থলে" আমাদের আইনে ঐ শব্দের যে সঙ্কুচিত অর্থ করা হয়, তাহা বোধ হয়, বিবাহ সম্বন্ধে খ্রীষ্টিয়ান ব্যবহারের ফল।

প্রাকৃতিক নিয়ম মতে সন্তান শব্দে ঔরস-জাত পুত্র অথবা কন্যা বুঝায়, এবং বিবাহিতা এক বা অধিক স্ত্রীর গর্ভজাত হওয়া, অথবা অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মিলে জনক কর্তৃক সন্তান বলিয়া স্বীকৃত হওয়াই ঐ সন্তানের পরীক্ষা।

কর্ণেল নিজে যেরূপ বিবাহ করণে ঔদাস্য প্রদর্শন করিয়াছেন, বোধ হয়, তদ্রূপ, তাঁহার পুত্রেরাও বিবাহ করুক বা না করুক তদ্বিষয়ে তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না।

অতএব লর্ডগণ এই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, কর্ণেল স্কিনরের উইলে "সন্তান" শব্দে জারজ এবং বিবাহজাত উভয় প্রকার সন্তানই বুঝায়, যে স্থলে ঐ জারজ সন্তানদের পিতা তাহাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া স্বীকার ও ব্যবহার করেন।

আমরা এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত মোকদ্দমায় খাটাইতে প্রবৃত্ত হইলাম, যাহা উইল-কর্ত্তার উইলের নিম্নলিখিত পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। যথা, "আমি উইলক্রমে ব্যক্ত "করিতেছি যে, আমার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য এই যে, "যদি আমার উক্ত পুত্রগণ অর্থাৎ জোসেফ, "জেম্‌স্‌, হর্‌কিউলিস্‌, আলেকজাণ্ডর ও টমাস "স্কিনরের মধ্যে কেহ অথবা সকলে লোকান্তর "গমন করে, এবং তাহাদের সন্তান-সন্ততি "থাকে, তবে তাহাদের আপন আপন পিতার

"অংশ তাহাদিগের প্রতি অর্শিবে এবং তাহারা "সমান অংশে তাহা ভাগ করিয়া লইবে।" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র জোসেফ কোন উইল না করিয়া এবং বিবাহ-জাত সন্তান না রাখিয়া ১৮৫৫ সালে লোকান্তরিত হয়, কিন্তু জর্জ নামে তাহার এক জারজ পুত্র ছিল, এবং উক্ত উইলের সর্ত্তমতে জর্জের পিতার অংশে জর্জ আপন খুড়াদিগের সম্মতি মতে উত্তরাধিকারী হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পুত্র জেম্স, সোফিয়া অর্ড নাম্নী এক বিবাহ-জাত কন্যা এবং জেম্স স্কিনর নাম এক জারজ পুত্র রাখিয়া ১৮৬১ সালে লোকান্তরিত হয়; এবং প্রশ্ন এই যে, জেম্সের পিতা কর্ণেল স্কিনরের উইলের অন্তর্গত পাঁচ পুত্রের মধ্যে জেম্স যে ভাগ পায়, তাহা কেবল তাহার কন্যা সোফিয়া পাইবে, কি তাহার জারজ পুত্র জেম্স ও সোফিয়া একত্রে পাইবে। আমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত হেতু ব্যক্ত করিয়াছি, তদনুসারেই আমাদের মত এই যে, কর্ণেল স্কিনরের পুত্র জেম্সের ভাগ জেম্সের কন্যা সোফিয়া এবং জারজ পুত্র জেম্স একত্রে পাইবে। জেম্স তাহার পিতা জেম্সের উইলে পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, অতএব তাহার সহিত তাহার ভগিনী বিবী অর্ডের সমান অবস্থা, এবং দুই জনেই তাহাদের পিতামহের উইলের লিখিত দান সমতুল্য রূপে লইবে।

আপীলের দ্বিতীয় প্রশ্ন উইলকর্ত্তার দ্বিতীয় পুত্র জেম্সের উইল এবং উত্তরাধিকার সম্বন্ধে উপস্থিত হইয়াছে।

জেম্স তাঁহার ১৮৫৯ সালের ১০ ই নবেম্বর তারিখের উইলে, তাঁহার পিতার উইলের দ্বারা প্রাপ্ত ভূমি-সম্পত্তির অংশ বিশেষ রূপে বর্ণনা করত তাহা, ও তাঁহার মৃত্যু কালে তাঁহার যে সকল টাকা, তমঃসুক কিম্বা অন্যান্য সম্পত্তি পাওয়ানা ছিল, তৎসমুদায় সমান অংশে তাঁহার কন্যা বিবী সোফিয়া এবেলিনা অর্ডকে এবং তাঁহার পুত্র জেম্সকে দান করিয়া, এই বাক্য লিখিয়াছেন, যথা "যেহেতু আমার পুত্র জেম্স "লেখা পড়া শিক্ষা করে নাই এবং তাহার "জীবন-যাত্রার অন্য কোন্ উপায় নাই, অত-"এব আমি তাহাকে ও তাহার মাতা ফেণী "বারলো ওরফে বিলাতী বেগমকে, কর্ণেল স্কিন-"রের মৃত্যুর পরে যে সকল মৌজা ও ভূমি "সম্পত্তি প্রভৃতি ক্রীত হইয়াছে যাহাতে আমার "পঞ্চম অংশ আছে তাহা সমুদায় এবং আমার "হান্সীর বাটী ও অন্যান্য ভূমি দান করিলাম।"

আপেলাণ্ট এবং রেস্পণ্ডেণ্টের মধ্যে বিরোধ এই যে, এই শেষ দানের দ্বারা কোন্ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়াছিল।

বৃত্তান্ত সমস্ত পরিষ্কার রূপে বর্ণিত না হইলেও তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, কর্ণেল তাঁহার উইলের দ্বারা তাঁহার পুত্রদিগকে যে সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন তাহা যত কাল একজেকিউটরের তত্ত্বাবধারণে ছিল সেই সময়ের মধ্যে ঐ সকল সম্পত্তির খাজানার বাবতে অনেক উদ্বৃত্ত টাকা যাহা পুত্রেরা লয় নাই, তাহার দ্বারা অতিরিক্ত ভূমি সম্পত্তি ক্রীত হয়; এবং রেস্পণ্ডেণ্টের দ্বারা তর্কিত হইয়াছে যে, এই সকল নূতন ক্রয় আইন-সঙ্গত রূপে উইলের প্রদত্ত সম্পত্তির আনুষঙ্গিক, সুতরাং তাহাও উইলের অনুমতি অনুসারে বর্ণন-যোগ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

তাহাই হইলে, ক্রীত সম্পত্তিতে পুত্র জেম্সের অংশ, তাহার পিতার উইলের অংশের ন্যায়, তাহার কন্যা বিবী অর্ড এবং পুত্র জেম্সের মধ্যে কর্ণেলের উইলের নিয়মমতে বিভক্ত হইবে এবং তাহার নিজের উইলের আদেশ মতে অর্শিবে না।

কিন্তু লর্ডগণ এই রূপ সিদ্ধান্ত করার কোন হেতু দেখেন না; এবং তাঁহাদের মত এই যে, যে ব্যক্তি ক্রয়-মূল্যের টাকার মালিক, ক্রীত সম্পত্তিও তাহারই সম্পত্তি, কিন্তু ঐ ক্রয়-মূল্যের টাকা এই স্থলে পাঁচ পুত্রেরই সম্পত্তি ছিল,

অতএব তাঁহাদের বিবেচনায়, ক্রীত সম্পত্তিতে জেম্‌সের পঞ্চমাংশ তাহার উইলের দানের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়াছে।

কিন্তু রেস্পণ্ডেণ্টের কৌন্সেল আর এক তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল স্কিনরকে কতিপয় মৌজার ও ভূমির যে পাট্টা দিয়াছিলেন তাহা কর্ণেলের মৃত্যু হওয়াতে সমাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কর্ণেলের উইলের লিখিত দানগৃহীতাগণের সহিত পুনরায় বন্দোবস্ত করেন; অতএব তর্কিত হইয়াছে যে, পূর্ব্ব মালিকী সূত্রেই ঐ পুনঃ বন্দোবস্ত হয়, অতএব ন্যায়ানুসারে ঐ পুনঃ বন্দোবস্তী সম্পত্তি উক্ত উইলের দানের অধীন হইবে।

রেস্পণ্ডেণ্টদিগের এই বৃত্তান্ত এমত রূপে বর্ণনা এবং সপ্রমাণ করা উচিত ছিল যদ্দ্বারা লর্ডগণ তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তাহারা করে নাই, এবং নিম্ন আদালতদ্বয়ও এই বিষয়ের কোন বিচার অথবা সিদ্ধান্ত করেন নাই।

যদি এই বিষয়ের তদন্তের জন্য বিবী সোফিয়া অর্ড প্রার্থনা করেন, এবং নিজে তাঁহার ঝুকী লইতে স্বীকার করেন, তবে লর্ডগণ তাঁহাদের হুকুমের মধ্যে তদ্বিষয়ের হুকুমের জন্য অনুরোধ করিবেন। লর্ডগণ বিনীতভাবে শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞীকে অনুরোধ করিবেন যে, যে ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে তাহা অন্যথা হয় এবং কর্ণেল স্কিনরের উইলে তাঁহার পাঁচ পুত্রকে সমান পাঁচ অংশে যে সম্পত্তি প্রদত্ত হয় তৎসমুদায় সম্পত্তির পঞ্চমাংশ মেজর জেম্‌স স্কিনরের কন্যা বিবী সোফিয়া অর্ড ও পুত্র জেম্‌স স্কিনর সমান ভাগে পাওয়ার হুকুম হয়, এবং ঐ উইলের দ্বারা কর্ণেলের পাঁচ পুত্রকে যে সকল সম্পত্তি প্রদত্ত হয়, কর্ণেলের মৃত্যুর পরে সেই সকল সম্পত্তির খাজানা এবং উপস্বত্ত্ব হইতে যে সকল সম্পত্তি ক্রীত হইয়াছিল তাহার পঞ্চমাংশ দ্বিতীয় পুত্র জেম্‌স স্কিনরে বর্ত্তিয়াছিল, অতএব এই জেম্‌স স্কিনরের উইলের দ্বারা তাহা সমান অংশে বিবী ফেণী বারলো এবং ঐ জেম্‌সের পুত্র জেম্‌সে বর্ত্তিয়াছে বলিয়া ব্যক্ত হয়, এবং বিবী সোফিয়া অর্ডের প্রার্থনামতে এবং ঝুঁকীতে এই হুকুম হয় যে, যে আদালতের ডিক্রীর বিরুদ্ধে এই আপীল হইয়াছে তাহার হুকুমমতে তদন্তের দ্বারা নির্ণীত হয় যে, কর্ণেল আপন জীবদ্দশা পর্য্যন্ত যে সমস্ত ইজারা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ঐ কর্ণেলের উইলের এক্‌জেকিউটরের সহিত গবর্ণমেণ্ট অথবা অন্য কোন ব্যক্তি পুনঃবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন কি না, এবং কি অবস্থায় এবং কি মূল্যে তাহা করা হইয়াছিল।

এক্ষণে খরচার মীমাংসা বাকী আছে।

মোকদ্দমার প্রথম বিচারে কোন পক্ষকেই খরচা দেওয়া হয় নাই। বিরোধীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রথম আদালতের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিবী অর্ড আপীল করত খরচা সমেত যে ডিক্রী পাইয়াছিলেন তাহার বিরুদ্ধে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে। লর্ডগণের বিবেচনায়, বিবী অর্ডের দুই বিষয়েই ভ্রম হইয়াছিল। অনস্বর, তিনি তাঁহার পিতার পঞ্চমাংশ নিজে একাকী পাইবেন বলিয়া যে তর্ক করেন তাহা, জোসেফের জারজ পুত্র জর্জের সম্বন্ধে পরিবারেরা যে রূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার সহিত অনৈক্য। অতএব কি জন্য সাধারণ নিয়ম প্রবল হইবে না, তাহার কোন কারণ লর্ডগণের দৃষ্ট হয় না। কর্ণেলের উইলের কোন কথার দ্বারা এই বিরোধ উপস্থিত হয় নাই; বিবী অর্ড যে তর্ক করেন যে, ইংলণ্ডীয় আইন (যাহা এ স্থলে খাটে না) অবলম্বন করিতে হইবে তদ্দ্বারাই ঐ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। যে নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা হইল, সেই আদালতের ও এই আপীলের খরচা আপেলাণ্টকে দেওয়ার জন্য লর্ডগণ বিবী অর্ডকে দায়ী করিলেন। রেস্পণ্ডেণ্ট আলেকজাণ্ডর স্কিনরের খরচার বিষয়ে কোন হুকুম দেওয়া গেল না।

---

(গ)

# রিবেনিউ বোর্ডের

ও

# হাইকোর্টের সরকুলর অর্ডর।

[ গবর্ণমেণ্ট গেজেট হইতে উদ্ধৃত ]

## রিবেনিউ বোর্ডের সরকুলর অর্ডর।

জানুয়ারি, ১৮৭০।

৯ নম্বর।

খাস আপীলের যে মোকদ্দমায়, গবর্ণমেণ্ট এক পক্ষ ও ঈশ্বরীপ্রসাদ স্বামী ও অন্যেরা অন্য পক্ষ ছিলেন সেই মোকদ্দমায় হাইকোর্টের ১৮৬৯ সালের মে মাসের ৩ রা তারিখের নিষ্পত্ত্যনুসারে বোর্ডের বাঙ্গালা বিধিপুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠায় চতুর্থ অধ্যায়ের ৫ ধারা নিম্নলিখিতমতে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

দুই কি অধিক মহালের যে যে ভূমি পরস্পর এমত মিশ্রিত হইয়াছে যে, কোন্ ভূমি কোন্ মহালের তাহা চিনিতে পারা যায় না, এমন ভূমি পৃথক্ পৃথক্ করণে বাঁটওয়ারা বিষয়ক আইন বর্ত্তে না। কিন্তু আসল যে মহাল বাঁটওয়ারার আইনমতে পূর্ব্বে বিভাগ করা গেলেও তন্মধ্যে কএক খণ্ড ভূমি সাধারণ থাকিল, উক্ত সকল মহাল সেই আসল মহালের অংশ হইলে ঐ বিভক্ত মহাল কিম্বা আসল মহালের অংশ বিভাগ করিবার অনুমতি হইতে পারিবে। যেহেতু তদ্রূপ গতিকে ভূমির যে ভাগের যে অংশ সাধারণ বলিয়া ভোগ হয় তাহার সন্দেহ থাকে না।

---

ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

৫ নম্বর।

বোর্ডের বাঙ্গালা বিধিপুস্তকের ২২৫ অধ্যায়ের ১১ ধারার পঞ্চম পঁক্তিতে "আবরণের মধ্যে" এই কথার পরে "কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা" এই কথা পড়িতে হইবে। আর ১১ (এ) বলিয়া এই নূতন ধারা দিতে হইবে, যথা,

১১ (এ)। পুরন্তু গবর্ণমেণ্টের মহাল নিলাম করিবার কোন আপত্তি হইলে, কিম্বা বন্দোবস্ত হওয়ার কোন দাওয়া থাকিলে, বোর্ডের নিকট আপীল করিবার সময়াতিরিক্ত এক মাস অতীত না হইলে কমিশ্যনরেরা রিবেনিউ বোর্ডে নিলামের ইশতিহার পাঠাইবেন না। উক্ত ইশ্তেহার পাঠাইলে, তাঁহাদের সমীপে পূর্ব্বলিখিত যে আপত্তি কি দাওয়া হইয়াছে, তাহাও ব্যক্ত করিয়া ঐ আপত্তির কি দাওয়ার উপলক্ষে যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহার সারাংশ লিখিয়া জানাইবেন।

২। এই বিধি হওয়া প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের মহালের নিলামের যে ইশতিহার এইক্ষণে বোর্ডের সম্মুখে উপস্থিত আছে তাহা কমিশ্যনরদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাঁহারা উক্ত বিধিমতে পুনরায় প্রেরণ করিবেন।

---

মার্চ, ১৮৭০।

৪ নম্বর।

১৮৭০ সালের ৫ ই মার্চের ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র * প্রকাশ করা গিয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, আদালতের রসুমের আইনমতে যে সকল ষ্টাম্পের ব্যবহার হয় তাহাতে

---

* ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৮ তারিখের ৯৪২৬ নম্বর।

"কোর্ট ফীস্" এই শব্দ মুদ্রিত থাকিবে। এই বিষয়ে জেলার কর্ত্তৃপক্ষদের বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। ষ্টাম্পের সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবকে প্রয়োজনমতে রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ ষ্টাম্পের পরিধিতে সেই কথা মুদ্রিত করাইবার আদেশ করা গিয়াছে। আর বিক্রেতাদিগকে আর ষ্টাম্প দিবার পূর্ব্বে উপযুক্ত ষ্টাম্পের শিরোভাগে কোর্ট "ফীস্" "আদালতের রসুম" এই কথা লেখা থাকে এই বিষয়ে মনোযোগ করিতে জেলার কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি আদেশ।

১২ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৭৫ পৃষ্ঠার ১১ অধ্যায়ের ৭ ধারার ২ (এ) বলিয়া নিম্নলিখিত বিধি লিখিতে হইবে। যথা—

২ (এ)। কোন ব্যক্তি চরম-পত্র না লিখিয়া মরিলে যদি তাহার অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের ক্রোক করিবার আজ্ঞামতে বদ্ধ হয়, তবে অন্য লোকেরা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বলিয়া দাওয়া করিলে এবং সেই মোকদ্দমায় গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষা করিবার যত্ন করা প্রয়োজন হইলে, জজ সাহেবের সম্মুখে গবর্ণমেণ্টের উকীল কালেক্টর সাহেবের স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

এপ্রিল, ১৮৭০।

১ নম্বর।

১৮৬৫ সালের ২০ আইনের বিধান কত দূর মানা গিয়াছে, বিশেষতঃ শাখাখণ্ডে কত দূর পালন হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহাদের সার্টিফিকেট না থাকে, রিবেনিউ এজেণ্ট স্বরূপ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিবার উপযুক্ত মনোযোগ হইয়াছে কি না, ও সার্টিফিকেট বৎসর বৎসর নূতন করিয়া দেওয়া গিয়াছে কি না, এই বিষয়ে বোর্ডের নিকট জেলার কর্ত্তৃপক্ষদের রিপোর্ট করিতে আদেশ হইয়াছে।

৩ নম্বর।

অধুনা, গবর্ণমেণ্টের সপক্ষ ডিক্রীর টাকা আদায় করণার্থে কালেক্টর সাহেবের নাজির ও মহাফেজ বিশেষ মতে দায়ী জ্ঞান হইয়া থাকেন, কিন্তু শাখাখণ্ডের কর্ম্মকারকদের আদালত ঐ খাতকদের বাড়ীর আরো নিকট ও তাঁহাদের সম্পত্তি থাকা বা না থাকা ইহা জানিতে ঐ কর্ম্মকারকদের অপেক্ষাকৃত সুযোগ আছে, এই প্রযুক্ত ঐ নাজির অপেক্ষা তাহারাই সেই ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে সক্ষম আছেন। এই কারণে বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৫৯ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধ্যায়ের ২ পরিচ্ছেদের ২৫ (এ) নম্বরের এই নূতন ধারা করা গেল।

২৫ (এ)। কালেক্টর সাহেবেরা বিহিত বোধ করিলে আপন আপন ক্ষমতাধীন স্থানে ডিক্রী সাধন করণার্থে শাখাখণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

মে, ১৮৭০।

১ নম্বর।

নিম্ন-লিখিত বিধি ৬৫ পৃষ্ঠায় সংযোগ করিতে হইবে।

২৫ (বি)—৫০০ টাকার অধিক ডিক্রী হইলে কালেক্টর সাহেবের সর্ব্বদা এই কর্ত্তব্য যে, স্থানীয় অনুসন্ধান করিবার জন্যে নাজিরকে কিম্বা নাএব নাজিরকে প্রেরণ করেন, ও রিপোর্টকারী ঐ কার্য্যকারক ঋণ শোধ করণোপযুক্ত মূল্যের দ্রব্য পাইতে না পারিলে স্বয়ং তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহার রিপোর্টের সত্যতা নিশ্চয় জানেন। সেই জিজ্ঞাসার ফল সন্তোষজনক না হইলে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে, আপন আদালতের অন্য কার্য্যকারকের দ্বারা তৎস্থানেই নূতন সন্ধান লন।

২ নম্বর।

বোর্ডের ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসের ৮ নম্বরের সরকুলর অর্ডরের এই কথা রহিত করা গেল।

"শাখাখণ্ডের নিমিত্ত ৬৬ নং রেজিষ্টরের কেবল এই সহজ পাঠ মানিতে হইবে। (১) মাস। (২) মাসে যত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইল তাহা। ছোট নম্বরে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ লিখিতে হইবে। সকল মোকদ্দমা নম্বর মতে নথীতে বাঁধিতে হইবে।"

৩ নম্বর।

১৮৭০ সালের ১০ আইন অর্থাৎ ভূমি গ্রহণার্থ নূতন আইন ১৮৭০ সালের জুন মাসের ১ তারিখ অবধি চলিবে। তদ্দ্বারা ১৮৫৭ সালের ৬ আইন ও ১৮৬৩ সালের ২২ আইন রহিত করা গেল। কিন্তু সেই রহিত করা আইন অনুসারে সেই সময়ে যে কার্য্য চলিতেছে, তৎপক্ষে নূতন আইনের কীদৃক্ ফল সম্ভাবনা, বোর্ডের সাহেবেরা এই প্রশ্ন করিলে এড্‌বোকেট জেনরেল সাহেব এই মত লিখিয়াছেন।

এই কঠিন কথা ব্যবস্থা-প্রণেতাদিগকে জ্ঞাত করা গেলে বোধ হয়, তাঁহারা ঐ আইনেতেই তাহার স্পষ্ট প্রতিবিধান করিতেন। নূতন আইনমত কার্য্যপ্রণালী ক্রমান্বয়ী ও পূর্ণ। ও পূর্ব্ব কার্য্যপ্রণালী হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। পূর্ব্ব প্রণালী মতে কার্য্য নির্ব্বাহ করত বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নূতন প্রণালীমতে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, ব্যবস্থা-প্রণেতাদের এমত কোন কথা না থাকাতে আমার বিবেচনায় পূর্ব্বপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কার্য্য শেষ করিতে হইবে। কিন্তু ১৮৬৮ সালের ১ আইনের ৬ ধারার বিধান এই। নূতন আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে যে কার্য্যের আরম্ভ হইয়াছে পুরাতন আইন রহিত করণ দ্বারা সেই কার্য্যের ব্যতিক্রম হইবে না। ইহার এমন অর্থও হইতে পারিবে যে, উক্ত বিধান ভূতপূর্ব্ব কার্য্যের প্রতি বর্ত্তিবে, ভাবিকার্য্যের প্রতি নয়। কিন্তু নূতন আইনে ভাবান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আমার বিবেচনায় ঐ বিষয়ের এই ভাব ধরিতে হইবে যে, ১৮৭০ সালের জুন মাসের ১ তারিখের পূর্ব্বে পুরাতন আইন মতে যে সকল কার্য্যের আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহার সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেই আইন মত কার্য্য চলিবে।

অনুসন্ধানক্রমে মীমাংসা পর্য্যন্ত কার্য্য হইয়া থাকিলে সুতরাং ভূস্বামীর স্বত্ব বর্ত্তে ও সেই কার্য্যত্যাগ হইতে পারে না। স্থলবিশেষে কার্য্য তত-দূর না চলিলে পুরাতন কার্য্যপ্রণালী ছাড়িয়া বর্ত্তমান আইনমতে কার্য্য পুনরারম্ভ হইতে পারিবে।

২। পূর্ব্বোক্ত কথা বিবেচনায় বোর্ডের সাহেবদের এই আদেশ। কালেক্টর সাহেব পুরাতন আইনমতে কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে পর যদি নূতন আইন অনুযায়ী কার্য্য করিতে চাহেন, তবে তিনি কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা বোর্ডের আজ্ঞা পাইবার জন্যে ঐ স্থলের বৃত্তান্ত জানাইবেন ও তাঁহার প্রস্তাবিত কার্য্যের হেতু লিখিয়া জ্ঞাত করিবেন।

৭ নম্বর।

১৮৬৫ সালের জুলাই মাসের ১৭ নং সরক্যুলর অর্ডরের ৩ ধারায় যে আদেশ প্রকাশ হইয়াছে জেলার সকল কর্ত্তৃপক্ষকে তাহাতে মনোযোগ করিবার আজ্ঞা হইল। তাহার মর্ম্ম এই। ১৭ নং করেন্সী রিটর্ণের ৪ (এ) এবং ১০ (এ) শীর্ষকের সমান পংক্তিতে (আই) চিহ্নিত যে ঘর আছে, ঐ দুই স্থানে ঐ ঘরের কথা সমান হইবে।

২। যদি কোন ব্যক্তি নোট আনিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য নোট ও রোক টাকা চাহে, তবে জেলার কর্ত্তৃপক্ষেরা প্রথমে ঐ নোটের সম্পূর্ণ মূল্যের তুল্য অল্প টাকার কএক নোট দিয়া ৪(এ) ও ১০ (এ) শীর্ষকের সমান পংক্তিতে তাহা লেখাইবেন। পরে তাঁহারা ঐ অল্প টাকার কএক নোট ফিরিয়া লইয়া তৎপরিবর্ত্তে রোক টাকা দিয়া রিটর্ণের ৫ শীর্ষকের সমান পংক্তিতে তাহা লিখিবেন। ৪ (এ) ও ১০ (এ) ঘরে রোক লিখিতে হইবে না।

৯ নম্বর।

দুই কি তদধিক জেলায় যে ব্যক্তিদের সম্পত্তি কি ব্যবসায়োৎপন্ন প্রাপ্তি হয়, স্থানীয় কোন্ কার্য্যকারকের অধীন স্থানে তাঁহাদের টাক্স ধার্য্য করা কর্ত্তব্য, এই বিষয়ে ঐ কার্য্যকারকদের মধ্যে বিবাদ হইয়া বহু পত্রাদির লিখনপঠন হইয়াছে এবং গত বৎসর ইনকম টাক্সের কার্য্য সম্পাদনের নিয়মের অনেককার

উল্লেখ হইয়াছে। এই হেতুক জেলার কর্তৃপক্ষদিগকে ইহা জ্ঞাত করা যাইতেছে, কোন ব্যক্তির টাক্স কোন্ জেলার মধ্যে ধার্য্য কর্‌া উচিত, যদি ভিন্ন ভিন্ন জেলার দুই আসেসরের কিম্বা একি কমিশ্যনর সাহেবের অধীন দুই জন কালেক্টর সাহেবের মধ্যে এই বিষয়ের বিবাদ হয়, তবে ১৮৬৯। ৭০ সালে ঐ ব্যক্তির টাক্স যে জেলায় ধার্য্য হইয়াছিল তদ্ভিন্ন অন্য জেলার যে কার্য্যকারক এইক্ষণে ঐ ব্যক্তির টাক্স ধার্য্য করিতে চাহেন, তিনি আপনার সেই অভিপ্রায়ের হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা লিখিয়া প্রথমোক্ত জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। আসেসর হইলে তিনি আপন জেলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা ঐ পত্র পাঠাইবেন। ঐ ব্যক্তির টাক্স উক্ত অন্য জেলার ধার্য্য করা কর্ত্তব্য, ঐ কালেক্টর সাহেব ইহা যে কারণে বোধ করেন, তাহা লিখিয়া উত্তর পত্র কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন। কমিশ্যনর সাহেবের অধীন কর্ম্মকারকদের বিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে। যে ব্যক্তির টাক্স ধার্য্য হয় তিনি সেই আজ্ঞাতে অসম্মত হইলে রিবেনিউ বোর্ডে আপীল করিতে পারিবেন।

২। উক্ত কার্য্যকারকেরা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের কার্য্যকারক হইলে এক খণ্ডের কমিশ্যনর অন্য খণ্ডের কমিশ্যনর সাহেবের নিকটে উক্ত পত্র পাঠাইবেন। তাঁহাদের মতের ঐক্য না হইলে তাহা একেবারে বোর্ডে অর্পণ করা যাইবে। তাঁহাদের মতের ঐক্য হইলে তদনুসারে টাক্স ধার্য্য হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তির টাক্স ধার্য্য হয় তিনি ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত মতে আপীল করিতে পারিবেন।

১৩ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ২৩১ পৃষ্ঠায় ৩ (এ) নম্বরের এই বিধি লিখিতে হইবে।

"শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত মহালের যে ভূম্যধি-"কারীরা ১ টাকা কিম্বা তাহার ন্যূন জমা দিয়া "থাকেন, তাঁহারা একবারে ঐ মহালের রাজস্বের "বিশগুণ দিয়া ভবিষ্যৎ দেয় রাজস্ব পরিক্রয় "করিতে পারিবেন।"

১৪ নম্বর।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইন প্রচলিত হওয়া প্রযুক্ত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞামতে পেয়াদাদের ফী ফণ্ড (অর্থাৎ পরওয়ানা দ্বারা প্রাপ্ত টাকার তহবীল) ১৮৭০ সালের ১ এপ্রিল অবধি উঠিয়া গেল। অতএব ১১ নং রিটর্ণের তৃতীয় টেবিল রহিত করা গিয়াছে। এই কথা জিলার কর্তৃপক্ষ সাহেবদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে। কিন্তু বোর্ডের প্রকারান্তর আজ্ঞা না পাইলে তাঁহারা ঐ টেবিল ভিন্ন ঐ রিটর্ণ পাঠাইতে থাকিবেন।

১৭ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ১২৭ পৃষ্ঠায়, ৬ ষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ১৪ (এ) ধারা বলিয়া এই বিধি লিখিতে হইবে।

১৪ (এ)। আমলাদের পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তনের আজ্ঞা হইলে যাঁহারা সমান বেতন পান তাঁহাদের, কিম্বা অনুমতিপ্রাপ্ত যে যে সিরিশতায় নিযুক্ত থাকেন, তদন্তর্গত সমান শ্রেণীর অমলাদের তদ্রূপ স্থান পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত।

১৮ নম্বর।

টাকা আমানত হইলে পর যদি সময়গতে তাহা ফিরিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে কালেক্টর সাহেবেরা তাহা ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র প্রস্তুত করণে যে অমনোযোগ প্রকাশ করেন, বোর্ডের সাহেবেরা তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। অতএব জেলার সকল কর্তৃপক্ষকে তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিতে আদেশ করেন। যে গতিকে সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার প্রয়োজন হয়, উক্ত সকল প্রার্থনাপত্রে সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট রূপে সেই গতিক ব্যক্ত করিতে হইবে।

জুন, ১৮৭০।

১ নম্বর।

মফঃসলের কোন স্থানে যে যে ব্যক্তির ও কুঠীর

ইনকম টাক্স ধার্য্য হইতে পারে কলিকাতায় তাঁহারদের যে প্রাপ্তি হয়, কলিকাতার কালেক্টর সাহেব ঐ মফঃসল স্থানের আসেসরদিগকে ইহার সন্ধান জ্ঞাত করিলেও, তাঁহারা কএকবার তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন, বোর্ডের সাহেবেরা ইহা দেখিতে পাইলেন। যদি কোন আসেসর, কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের ইষ্টিমেট অশুদ্ধ বলিয়া সন্দেহ করেন তবে তাঁহার কর্ত্তব্য যে, আপনার সন্দেহের হেতু লিখিয়া ঐ কালেক্টর সাহেবকে জ্ঞাত করেন, ও যত কাল তাঁহার উত্তর না পান ততকাল ঐ ব্যক্তিদের কি কুঠীর টাক্স ধার্য্য না করেন।

তদ্রূপ লিখনপঠন হইলে পর শেষে যে টাক্স ধার্য্য হয় তাহা কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের শেষ দত্ত অঙ্কের সঙ্গে না মিলিলে, আসেসরের কর্ত্তব্য যে অগৌণে উপযুক্ত প্রণালীমতে বোর্ডে সেই কথা জ্ঞাত করেন। তাহা হইলে কলিকাতার কালেক্টর সাহেব পরিশুদ্ধ সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া ইষ্টিমেট করিয়াছেন কি না, বোর্ডের সাহেবেরা ইহা নিশ্চিত রূপে জানিবার জন্যে পুনশ্চ অনুসন্ধান লইলেন।

গত বৎসর কলিকাতার কালেক্টর সাহেবের স্থানে যে রিপোর্ট পাওয়া যায়, পুনশ্চ লিখনপঠন ও অনুসন্ধান না করিয়া এই বৎসর টাক্স ধার্য্য করিবার মুল স্বরূপ তাহা ধরিতে হইবে না, সকল আসেসর ইহা জ্ঞাত থাকিবেন।

৫ নম্বর।

১৮৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ নং সরক্যুলর অর্ডর মতান্তর করণ পূর্ব্বক বোর্ডের সাহেবদের এই আদেশ। আদালতের রসুম বিষয়ক নূতন আইনমতে নাজিরদের সিরিশতার বিধান করণার্থ বিধি যত কাল প্রচারিত না হয়, যে পেয়াদারা লেখাপড়া না জানে তাহাদিগকে কর্ম্ম হইতে ছাড়াইবার যে বিধি আছে পুরাতন সুযোগ্য চাকরদের পক্ষে সেই বিধি তত কাল প্রবল না করা যায়।

৮ নম্বর।

কোন কোন ব্যক্তিদের দুই কি তদধিক জেলায় সম্পত্তি কি ব্যবসায় থাকাতে তদুৎপন্ন আয়ের উপর তাঁহাদের কর ধার্য্য হইতে পারিলে, তাঁহারা সামান্যতঃ যে জেলায় বাস কি ব্যবসায় করেন তদ্ভিন্ন অন্য জেলার আসেসরেরা তাঁহাদের যত আয় নিরূপণ করেন, সেই বিষয়ে তাঁহাদের প্রমাণ উপস্থিত করণপূর্ব্বক আপত্তি করিবার সুযোগ করা উচিত। এই হেতুক বোর্ডের সাহেবেরা এই বিধি করিয়াছেন। কোন আসেসরের অধীন স্থানে কোন ব্যক্তির কি কুঠীর আয় উৎপন্ন হয়, ও তিনি প্রচলিত বিধিমতে সেই আয় নিরূপণ করেন, কিন্তু সেই আয়কর ধার্য্য করা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, এমন স্থলে ঐ ব্যক্তির আয়কর যে জেলায় ধার্য্য হইতে পারে, উক্ত আসেসর প্রথমে সেই জেলার আসেসরকে আপনার অনুসন্ধানের ফল না জানাইয়া যে ব্যক্তির আয় নিরূপণ করিয়াছেন, তাঁহাকে কিম্বা তৎস্থানে তাঁহার স্বীকৃত কর্ম্মকারককে নোটিস দিয়া জানাইবেন যে, আমি আপনকার এত টাকা প্রাপ্তি নিরূপণ করিয়াছি; সেই নিরূপণ অশুদ্ধ হইয়াছে, ১৫ দিনের মধ্যে ইহা দর্শাইবার প্রমাণ উপস্থিত না করিলে যে কালেক্টর সাহেব ঐ আয়ের নিরূপণ পত্র চাহিয়াছেন তাঁহার নিকট পাঠাইব।

যে ব্যক্তি শেষে ঐ ব্যক্তির আয়কর নির্দ্ধার্য্য করিবেন, উক্ত অনুসন্ধানকারী আসেসর যখন তাঁহার নিকট প্রয়োজনমত রিপোর্ট পাঠান তখন উক্ত বিধিমতে কর্ম্ম করা গেল, ইহারও সংশিত কথা লিখিয়া দিবেন।

এই স্থলে যে কার্য্য-প্রণালীর আদেশ হইয়াছে, তাহা কেবল প্রথম স্থলীয় অনুসন্ধান স্বরূপ স্পষ্ট জানিতে হইবে। যিনি শেষে আয়কর নির্দ্ধার্য্য করিবেন, তিনি তাহাতে দৃঢ় সম্বদ্ধ নহেন, এবং যাঁহার কর ধার্য্য হইল তিনি আইনমতে যে আপীল করিতে পারেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার আপীল করিবারও অনুমতি নাই।

৯ নম্বর।

বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায়, ২ অধ্যায়ের ৪ র্থ পরিচ্ছেদে এই নূতন বিধি দেওয়া গেল।

২ (এ), কোন কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অন্য কর্ম্মকারকের স্থানে কোন প্রকারের দ্রব্য লইবার কল্পনা করিলে, বজেটের অনুমানপত্রে তাহার বিধান করিবেন; অর্থাৎ তিনি বাজারে ক্রয় করিলে যেমন করিতেন তেমনি করিবেন। ঐ দ্রব্যের মূল্য নগদ দেওয়া গেলে, কিম্বা যে কার্য্যালয়ে ঐ দ্রব্য আনীত হয়, তাহার হিসাবে খরচ লিখিয়া ঐ দ্রব্য যোগাইয়া দিবার বিভাগে জমা করা গেলেও সেই বিধান করা প্রয়োজন।

২। রাজকীয় আগামী বৎসরের আয় ব্যয় নিরূপণপত্র যখন প্রস্তুত করিতে উদ্যত হন, তখন উক্ত কথা মনে রাখিবেন।

১০ নম্বর।

গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ১৫ ধারার ১২ প্রকরণের প্রতি মনোযোগ করিবার আজ্ঞা হইল। তাহার এই স্পষ্ট নির্দ্দেশ। কোন ব্যক্তির কেবল পেনশ্যন কি উপকারার্থ দান পাইবার কারণে যে আফিডেবিট করা যায়, তাহার ষ্টাম্প লাগে না।

১১ নম্বর।

১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৪৫ ধারার বিধানের প্রতি, এবং ষ্টাম্প কাগজ যে তারিখে ক্রয় করা যায়, তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থনা না হইলে নূতন কাগজ পাওয়া যাইতে পারে না, ও তাহার মুল্য ফিরিয়া পাওয়া যাইতে পারে না, এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবার আদেশ হইল। এক বৎসরের মধ্যেই প্রার্থনা হইল কি না, এই কথা ঐ কাগজের পৃষ্ঠে বিক্রেতার যে লিপি থাকে, তদ্দ্বারা নিশ্চিত করা যাইবে। কালেক্টর সাহেবেরা উল্লিখিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া মুল্য ফিরিয়া দিতে কি নূতন কাগজ দিতে সমর্থ নহেন।

# হাইকোর্টের সরক্যুলর অর্ডর।

## দেওয়ানী।

২ নম্বর।

জেলার আদালতের এবং অধীন সকল দেওয়ানী আদালতের জজ সমীপেষু।

কলিকাতা, ১৮৭০ সাল, ১৪ ই ফেব্রুয়ারি।

ভূতপূর্ব্ব সদর আদালতের ১৮৫১ সালের ২১ এ অক্টোবরের ২৯ নম্বরের সরক্যুলর অর্ডরে জেলার জজ সাহেবদের ও প্রধান সদর আমীনদের (সবর্ডিনেট জজদের) ও মুন্সেফদের "বহীয়াদ্দাস্ত" নামক এক খান বহী রাখিবার আজ্ঞা হইয়া প্রত্যেক নম্বরী মোকদ্দমায় অথবা আপীলে যে চূড়ান্ত হুকুম অথবা মোকদ্দমা রুবকার সময়ে যে হুকুম হয় তাহা এবং (৬ ধারা) মোৎফরকা ও সরাসরী মোকদ্দমার হুকুম হইবামাত্র তাহাও ঐ বহীতে লিখিবার ও ঐ কথায় তৎসম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের উকীলের স্বাক্ষর করিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

২। ঐ সরক্যুলর অর্ডরের লিখিত উপদেশ সর্ব্বথা দৃঢ়মতে মানা যায় না এবং ঐ আজ্ঞার কোন কোন অংশ অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, এই বিষয়ে হাইকোর্টের মনোযোগ হওয়াতে তাঁহারা সেই বিষয়ের অন্য উপদেশ দেওয়া বিহিত বোধ করিয়াছেন।

৩। উক্ত সরক্যুলর অর্ডরের পরিবর্ত্তে এই সাধারণ বিধি প্রণীত হইয়াছে, তাহা সকল আদালতের প্রতি দৃঢ়মতে মানিতে আদেশ করা যাইতেছে।

প্রথম।—বঙ্গদেশের ফোর্ট উইলিয়মের হাইকোর্টের অধীন প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতে "অমুক স্থানের অমুকের আদালতের রোজনামচা" বলিয়া এক খানা বহী রাখিতে হইবে। পেজের অঙ্ক মুদ্রিত হইয়া ঐ বহী দৃঢ়মতে বাঁধাইয়া ষ্টেশনরি আফিস হইতে প্রত্যেক

কোর্টে পাঠান যাইবে। তদ্রূপে প্রাপ্ত না হইলে উক্ত কার্য্যে কোন বহী ব্যবহার করিতে হইবে না।

## দেওয়ানীপক্ষ।

### স্মরণার্থ ৩ নং পত্র।

১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ৮ আইন যে যে জেলায় প্রচলিত হইয়াছে সেই সেই জেলার জজ সাহেব ও জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু।

কলিকাতা, ১৮৬৯ সাল ১৪ এপ্রিল।

বঙ্গদেশের মান্যবর লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের ইচ্ছানুসারে এবং গবর্ণমেণ্টের গত ফেব্রুয়ারি * মাসের ২৪ এ তারিখের যে জ্ঞাপনপত্রক্রমে নিম্নলিখিত

| | |
|---|---|
| † বাকরগঞ্জ | ময়মনসিংহ |
| বীরভূম | নদীয়া |
| ভাগলপুর | পাটনা |
| বর্দ্ধমান (পূর্ব্ব) | পূরণীয়া |
| বর্দ্ধমান (পশ্চিম) | রাজসাহী |
| চট্টগ্রাম | রঙ্গপুর |
| ঢাকা | সারণ |
| দিনাজপুর | শাহাবাদ |
| গয়া | শ্রীহট্ট |
| হুগলী | ত্রিপুরা |
| যশোহর | ত্রিহুত |
| মেদিনীপুর | চব্বিশপরগণা |
| মুরসিদাবাদ | |

দেওয়ানী বিচারার্থে মুন্সেফী জিলা।

জেলায় বর্ত্তমান মাসের ১৩ তারিখ অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১২৭৭ সালের ১ লা বৈশাখাবধি বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার ১৮৬৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হইবার আদেশ করা যায়, সেই জ্ঞাপন পত্রের উপলক্ষে ঐ নূতন আইন যে যে জেলায় প্রচলিত হইবে হাইকোর্ট সেই জেলার † জজ সাহেবদিগকে মনোযোগে সেই আইনের কার্য্যের ফল দৃষ্টি করিতে, এবং তৎসংক্রান্ত কোন ব্যাপার কতক কাল দৃষ্টি করিয়া পরিবর্ত্তনাদির প্রয়োজন হইলে তাহা জ্ঞাত করিতে আদেশ করেন।

* এই বৎসরের ৮ মার্চের গেজেটের ২৫৩ পৃষ্ঠা দেখ।

## ফৌজদারী পক্ষ।

### ৮ নম্বর।

সকল সেশন জজ ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু।

কলিকাতা, ১৮৭০ সাল ১৪ ই এপ্রিল।

১৮৬৫ সালের ২০ আইন প্রচলিত হওনাবধি মোখতারগণের রীতিচরিত্রের ও বৃত্তি সম্পর্কীয় ক্ষমতার বিশেষ উৎকৃষ্টতা হইয়াছে কি না, হাইকোর্ট আপনাদের অধীন সকল সেশন জজ সাহেবের ও জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি এই বিষয়ের রিপোর্ট করিতে আদেশ করিয়াছেন।

## দেওয়ানী পক্ষ।

### ১৩ নম্বর।

### সমস্ত জেলার জজ সাহেব ও জুডিশ্যাল কমিশনর সাহেব ও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের জজ সমীপেষু।

কলিকাতা, ১৮৭০ সাল ৪ ঠা জুন।

হাইকোর্টের সাহেবেরা জেলার জজ সাহেবদের ও জুডিশ্যাল কমিশ্যনরদের জ্ঞানার্থে ও কার্য্যপদ্ধতি দর্শাওনার্থে এই কথা জ্ঞাত করিতেছেন। মফঃসলের ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তদ্বিষয়ে এই কোর্টের প্রতি তত্ত্বাবধারণ করিবার যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার প্রার্থনা অনায়াসে হইবার জন্যে নিম্নলিখিত বিধি প্রণীত হইল।

২। উক্ত বিধিতে যে আফিডেবিট কি ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞার প্রয়োজন হয় তাহা গ্রহণার্থে নানা জেলার জজ সাহেবেরা কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইবেন।

### বিধি।

বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের বিচারাধিপত্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই সেই মোকদ্দমার কোন নিষ্পত্তিতে কি আজ্ঞাক্রমে কোন ব্যক্তির ক্ষতি হইয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসরের

আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারায় হাইকোর্টের প্রতি উক্তাবধারণের যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি উক্ত ক্ষমতামতে কার্য্য হইবার প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক হইলে, যদি আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা উক্ত কোর্টে উপস্থিত হইতে না পারেন, তবে "আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের" ২২ ধারার কার্য্যোপলক্ষে ক্ষুদ্র মোকদ্দমার ঐ আদালত যে জেলার জজ সাহেবের আদালতের অধীন থাকে, তিনি সেই জেলার আদালতে হাইকোর্টের নামে দরখাস্ত উপস্থিত করিতে পারিবেন।

ঐ ব্যক্তির নিজে সেই প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে হইবে। কিন্তু যে স্ত্রীলোক আইন দ্বারা স্বয়ং আদালতে গমন হইতে নিষ্কৃতি পান এমন স্ত্রীলোক প্রার্থিনী হইলে, অন্যের দ্বারা পত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন। সেই প্রার্থনাপত্রে আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ২ তফসীলের ১ প্রকরণের (ঘ) দফাধৃতে উপযুক্ত রসুমের ষ্টাম্প থাকা প্রয়োজন। এবং দরখাস্ত যে যে বৃত্তান্তমুলক, সেই২ বৃত্তান্ত-ঘটিত এক আফিডেবিট ঐ প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে দিতে হইবে। সেই আফিডেবিট বিষয়ে জেলার জজ সাহেবের সম্মুখে শপথ কিম্বা বিষয়-বিশেষে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। উক্ত জিলার জজ সাহেব তৎকার্য্যার্থে কমিশ্যনর স্বরূপ নিযুক্ত হইবেন।

ঐ দরখাস্ত এবং প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কাগজপত্রও হাইকোর্টে পাঠাইতে যত খরচ হইতে পারে, জেলার আদালতে ঐ ব্যক্তির তাহাও অর্পণ করিতে হইবে।

জেলার জজ সাহেব ঐ দরখাস্ত ও আফিডেবিট প্রাপ্ত হইলে, ও তাহা পাঠাইবার খরচ আদালতে অর্পণ করা গেলে, তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া ও আদালতের মোহর বসাইয়া ঐ দরখাস্ত ও আফিডেবিট হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

দেওয়ানী পক্ষ।

১০ নম্বর।

বঙ্গ প্রভৃতি দেশের অন্তর্গত সকল জেলার আদালতেরও অধীন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি সমীপেষু

কলিকাতা, ১৮৭০ সাল ১২ ই মে।

দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীক্রমে যে ওয়াসিলাৎ কিম্বা অন্য টাকা দিবার আজ্ঞা হয় সেই আদালতের বিচারপতিরা সকল মোকদ্দমায় খরচার সহিত সেই ওয়াসিলাতের কি অন্য টাকার উপর সর্ব্বদা শতকরা ১২৲ টাকার হিসাবে সুদের আজ্ঞা যে করেন, ইহা আবশ্যক নয়। হাইকোর্টের সাহেবেরা অধীন সকল দেওয়ানী আদালতে ইহা জ্ঞাত করা বিহিত বোধ করেন।

২। ডিক্রী মতে যাঁহারা মহাজন হন অনেক মোকদ্দমায় তাঁহারা আসল অর্থীদের পক্ষে ধনগৃহীতা মাত্র। ফলতঃ অতি উচ্চ হারে সেই সুদের আজ্ঞা হইলে, তাঁহারা ঐ ডিক্রী সাধনে বিলম্ব করিয়া থাকেন। এবং ঐ ডিক্রী আদালতের বিচারমতে নির্ণীত আপনাদের স্বত্ব প্রাপণের উপায় না মানিয়া, টাকা বৃদ্ধি করিবার সদুপায় জ্ঞান করেন।

হাইকোর্টের আজ্ঞাক্রমে,

জে এস কারষ্টের্স,

একটিং রেজিষ্ট্রার।

১১ নম্বর।

সকল জুডিশ্যল কমিশনর ও জেলার জজ সাহেব ও মুন্সেফ সমীপেষু।

কলিকাতা, ১৮৭০ সাল ১৪ ই মে।

আজ্ঞা হইল যে, আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৪, ১৫, ১৭ নং অন্যতর ধারার বিধান মতে মুন্সেফদের আদালতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় মুনসেফেরা প্রতি সপ্তাহ সোমবারে নিম্নলিখিত পাঠে তৎপূর্ব্ব সপ্তাহের অর্থাৎ সোমবার অবধি শনিবার পর্য্যন্ত উপস্থিত করা ঐ সকল মোকদ্দমার বর্ণনাপত্র জেলার জজ সাহেবের নিকটে পাঠান, এই আদেশ করা গেল।

আইন-বহির্ভূত প্রদেশে তাঁহারা জেলার কর্তৃপক্ষদের দ্বারা ঐ বর্ণনাপত্র জুডিশিয়াল কমিশ্যনরদের নিকট পাঠাইবেন। উক্ত অন্যতর ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা উপস্থিত করিবার রসুম ঐ ঐ ধারায় নির্দ্ধারিত আছে।

২। হাইকোর্টের এই আজ্ঞা করিবার তাৎপর্য্য এই। উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা-ঘটিত বিবাদীয় বিষয়ের মুল্য ১০০০৲ টাকার অনধিক প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৬ ধারা ও ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ৫ ধারামতে মুনসেফদের আদালতে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ হয়। অতএব দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারাক্রমে জেলার জজ সাহেবদের যে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা তদনুসারে ঐ মোকদ্দমা আপনাদের আদালতে আনাইতে পারেন, কিম্বা ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ১৫ ধারামতে সবর্ডিনেট জজদের দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত অর্পণ করিতে পারেন, ইহা বিহিত।

৩। ১৮৫৯ ও ১৮৬৮ সালের উক্ত আইনের কথাক্রমে যদ্যপি মুনসেফদের আদালতে সেই সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা আবশ্যক, তথাপি তন্মধ্যে অনেক মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় জেলার উচ্চতর আদালতে তাহার বিচার হওয়া কর্ত্তব্য জ্ঞান হইতে পারে।

রিটর্ণের পাঠ।

| মোকদ্দমার রেজিষ্টরের নম্বর। | যে তারিখে উপস্থিত করা যায়। | নাম। অর্থীর। | নাম। প্রত্যর্থীর। | যে বিষয়ের। | মন্তব্য কথা। |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

দেওয়ানী পক্ষ।

১২ নম্বর।

বঙ্গ প্রভৃতি দেশের ও আইন-বহির্ভূত প্রদেশের সকল সিবিল জজ সাহেব ও জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু।

কলিকাতা ১৮৭০ সাল ২৭ এ মে।

আদালতের রসুমবিষয়ক আইনমতে পেয়াদাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইলে জেলার জজ সাহেবেরা ও জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেবেরা যখন তাহাদের নামের নির্ঘণ্ট করিতে আরম্ভ করেন, তখন খাজানা সম্পর্কীয় মোকদ্দমা দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ হওয়াতে রাজস্ব সংক্রান্ত যে পেয়াদাদের কর্ম্ম গিয়াছে তাহাদের প্রার্থনা বিবেচনা করুন ও তাহারা কর্ম্ম ও সচ্চরিত্রদ্বারা যোগ্য হইলে ঐ পদপ্রার্থী অন্য ব্যক্তিদের অগ্রে তাহাদিগকে কর্ম্ম দেন, হাইকোর্টের সাহেবেরা এই আদেশ করা বিহিত জ্ঞান করিয়াছেন।

দেওয়ানী পক্ষ।

১৬ নম্বর।

সকল সিবিল জজ সাহেব ও জুডিশ্যাল কমিশ্যনর সাহেব সমীপেষু।

কলিকাতা, ১৮৭০ সাল ১৭ ই জুন।

নানা শ্রেণীর বিচারপতিরা মুদ্রিত কি পাতরে ছাপা যে সকল পাঠ চাহেন অতঃপরে তাহা ষ্টেশনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে চাহিয়া লন হাইকোর্টের এই আজ্ঞা। হাইকোর্ট যে সকল পাঠ অনুমোদন করিয়াছেন উক্ত সাহেব তদ্ভিন্ন কোন প্রকারের পাঠ না দিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন।

২। গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবও ষ্টেশনরীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের স্থানে যে প্রার্থনা-পত্র পান তদ্ভিন্ন কোন প্রার্থনা-পত্র গ্রাহ্য না করিবার আজ্ঞা পাইয়াছেন।

৩। সবর্ডিনেট জজ ও মুন্‌সেফদের পত্র আপনাদের উপরিস্থ কার্য্যকারকদের দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

৪। যে পাঠ সাধারণমতে চলিত নয়, কোন জজ সাহেব দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রচলিত করিবার প্রস্তাব করিতে ইচ্ছুক হইলে সেই বিষয়ে কোর্টে পত্র লিখিতে পারিবেন।

হাইকোর্টের আজ্ঞাক্রমে,

এস কারষ্টের্স,

একটিং রেজিষ্ট্রার।

ষষ্ঠ ভাগ সমাপ্ত।

# বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের

# ষষ্ঠ ভাগের নির্ঘণ্ট

## দেওয়ানী নিষ্পত্তি

পৃষ্ঠা।*

### অ

**অংশ**

জমিদারের সেরেস্তায় শরীকের নাম পৃথক্ পৃথক্ রেজিষ্টরী হওয়াই, তাহাদের অংশ বিভক্ত হওয়ার প্রমাণ নহে। ... ১১৯

**অংশ মত দেনা**

† দুঃ যৌত দেনা

**অছি**

এ দেশে কোন ব্যক্তি উইল অনুযায়ী বিত্তাধিকারী হইবার পূর্ব্বে তাহার ঐ উইলানুযায়ী অছিয়ৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য নহে। ... ৬৫

**অধীন জমা**

বাঙ্গালার, কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইনানুসারে এক অধীন-জমার নীলাম-ক্রেতা তাহার পূর্ব্বাধিকারীর সৃষ্ট এক মোকররী জমা অন্যথা করিয়া তদন্তর্গত ভূমির খাস দখল পাওয়ার জন্য ঐ জমার দখীলকারের বিরুদ্ধে নালিশ করে। ঐ দখীলকার-প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, সে ১২ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত ঐ ভূমির চাষ করিয়া দখলের স্বত্বে স্বত্ববান হইয়াছে। এ স্থলে, প্রতিবাদী উচ্ছেদের দায় হইতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৬ ধারার দ্বারা রক্ষিত; এবং বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫

**অছি** পৃষ্ঠা।

সালের ৮ আইনের ১৬ ধারামতে ঐ মোকররী পাট্টা অন্যথা হইতে পারিলেও তাহাতেই যে, প্রতিবাদী অবশ্য দখলে হইতে উচ্ছেদিত হইবে, এমত হইতে পারে না। ... ... ৪১৬

**অনাবশ্যকীয় মত প্রকাশ**

যখন কোন বাদীর নালিশ এক কালে ডিস্‌মিস্ হয়, তখন ঐ রায়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধ কোন মত ব্যক্ত থাকিলেও, ঐ পক্ষগণের মধ্যে ভবিষ্যৎ কোন মোকদ্দমায়, তদ্দ্বারা প্রতিবাদীর স্বত্বের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। ... ২১৩

**অনিয়ম**

অনিয়মের হেতুতে ডিক্রীজারীর নীলাম অন্যথা করিতে হইলে দায়ীর কেবল ইহা দেখাইলেই হইবে না যে, তাহার ক্ষতি হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা দেখাইতে হইবে যে, ঐ অনিয়মের গতিকে সে বাস্তবিকই ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। ... ... ... ... ২০২

**অন্যায় রূপে পক্ষ করণ**

অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে পক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন না। ... ১৭১

**অভিভাবক**

১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে নিয়োজিত অভিভাবক আদালতের হুকুম না লইয়া তাহার ও নাবালগের এজমালী সম্পত্তি আবদ্ধ করত এক তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছে বলিয়া, তাহা তাহাকে ঐ পদচ্যুত করার যথেষ্ট হেতু হইতে পারে না। ... ... ... ... ২৯০

দুঃ আইন--১৮৫৮ সালের ৪০ আইন (৪) ‡

---

* এই "পৃষ্ঠা" শব্দের নিম্নস্থ পত্রাঙ্কে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের ষষ্ঠভাগের পত্রাঙ্ক বুঝাইবে।

† 'দুঃ' এই চিহ্নে "দ্রষ্টব্য" বুঝাইবে, যথা—'দুঃ যৌত দেনা' ইহাতে 'যৌত দেনা' শিরোনামে এই নির্ঘণ্টের যে অংশ আছে তাহা দেখিতে হইবে।

‡ ( ) এই চিহ্নের মধ্যে যে অঙ্ক থাকে তাহাকে ধারা বুঝাইবে, যথা—"দুঃ আইন--১৮৫৮ সালের

অর্থ পৃষ্ঠা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ধারায় যে "মহাল" শব্দ আছে তাহাতে কেবল সম্পূর্ণ মহাল বা জমিদারীই বুঝাইবে, এমত নহে; ঐ ধারার প্রথম ভাগে যে সকল হিস্যার উল্লেখ আছে তাহাও বুঝাইবে। ... ... ৪১১

# আ

## আইন

,, ১৮৪১ সালের ১২

বাকী রাজস্বের প্রকৃত নীলাম-ক্রেতার নালিশে বেনামী ক্রেতার জওয়াব দেওয়ার যে স্বত্ব ছিল তাহা, ১৮৪৫ সালের ১ আইনের দ্বারা ১৮৪১ সালের ১২ আইন রদ হওয়াতেই রহিত হইয়াছে। ... ... ... ৩৪০

,, ১৮৪৫ সালের ১

দ্রঃ যৌথ হিন্দু পরিবার

,, ১৮৫০ সালের ১৮

মাজিষ্ট্রেট যথোচিত সতর্ক এবং মনোযোগের সহিত কার্য্য না করিলে ১৮৫০ সালের ১৮ আইন মতে রক্ষিত হইতে পারেন না। মাজিষ্ট্রেটের যে কার্য্যের বিরুদ্ধে নালিশ হয় তাহা করিতে তাঁহার অধিকার থাকার বিষয় যদি তিনি ন্যায্যরূপে, সতর্কভাবে এবং সযত্নে বিশ্বাস না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার তাহা করিবার বা করিতে হুকুম দিবার অধিকার আছে বলিয়া তিনি যে, 'সরলভাবে' বিশ্বাস করিয়াছেন এমত বলা যাইতে পারে না। যদি কোন মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অন্যান্য প্রকারে নিয়মানুগত না হয় এবং আইনের তিনি যে অর্থ করেন তাহা যদি অন্য কোন বিবেচক ও যত্নশীল ব্যক্তি না করিতে পারে, তবে তিনি আইনের অন্যায় অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছেন বলিয়াই দায় এড়াইতে পারেন না। ... ৫

দ্রঃ মিউনিসিপেল কমিশনর

,, ১৮৫৮ সালের ৪০

(১) নাবালগের শরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পিতা কর্ত্তৃক অভিভাবক নিয়োজিত হইলেও, আদালত ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে

আইন—১৮৫৮ সালের ৪০ পৃষ্ঠা।

নাবালগের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণার্থে অন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারেন। ... ২১৫

(২) কোন জেলার জজ এক বিধবা স্ত্রীকে তাহার মৃত স্বামীর সম্পত্তি সম্বন্ধে ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে সার্টিফিকেট দিতে হুকুম দেন, কিন্তু তাহার পরে কালেক্টরের প্রার্থনামতে এবং যে সকল ব্যক্তি দাবী ও আপত্তি করিয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহার ঐ হুকুম রহিত করত কালেক্টরকে ঐ সম্পত্তির ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। এস্থলে, যদিও জজ বলেন যে, তিনি ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনের ১২ ধারামতে ঐ আদেশ করিয়াছেন, তথাপি তাহা বাস্তবিক ২১ ধারামতে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ঐ ধারামতে জজের তাহা দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ... ... ... ১১৬

(৩) জজ যদি ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে কোন নাবালগের সম্পত্তির তত্ত্বাবধারকের পদে কালেক্টরকে নিযুক্ত করিয়া, তাঁহার সেই হুকুম নিজে অন্যথা করেন, তবে নাবালগের পক্ষে তাহার কোন এক বন্ধু ২৮ ধারামতে তদ্বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারে। ... ২৪২

(৪) নাবালগের অভিভাবক নিযুক্ত করিতে হইলে, আদালত পক্ষগণের নিজ ব্যবহার-শাস্ত্রের (যথা, মুসলমান হইলে, শরার) প্রতি দৃষ্টি না করিয়াও, ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে ঐ অভিভাবক মনোনীত করিয়া নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু পক্ষগণের শাস্ত্রমতে যে ব্যক্তি অভিভাবক হইতে পারে সে যদি তদুপযুক্ত পাত্র হয়, তবে আদালত তাহাকেই নিযুক্ত করিতে পারেন। .... ... ... ৪১৭

(৫) ১৮৫৮ সালের ৪০ আইন মতে অভিভাবকতার সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ হইলে, ঐ অভিযোগ যথার্থ কি না এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত সার্টিফিকেট রাখিবার যোগ্য কি না, তাহা আদালতের তদন্ত করা কর্ত্তব্য, এবং তদন্ত দ্বারা এই সকল বিষয়ের মীমাংসা না করিয়া তাহার সার্টিফিকেট রহিত করত অন্যকে সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত নহে। ... ... ... ৪১৭

দ্রঃ অভিভাবক

,, ১৮৫৯ সালের ৮

(১) যে স্থলে সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ক্রেতার নাম তঞ্চকতা-পূর্ব্বক এবং ক্রেতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে

৪০ আইন (৪)" ইহাতে "আইন—১৮৫৮ সালের ৪০" শিরোনামে এই নির্ঘণ্টের যে অংশ আছে তাহার ৪ দফা দেখিতে হইবে।

আইন—১৮৬৩ সালের ২১　　পৃষ্ঠা।

২২ ধারা—দ্রঃ বিচারাধিকার ( ২ )

২৭ ও ৩৯ ধারা—দ্রঃ বিচারাধিকার ( ৩৭ )

,, ১৮৬৪ সালের ৩ ( বাঃ কৌঃ ) *

তিন মাসের মধ্যে নালিশ উপস্থিত করার জন্য বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৪ সালের ৩ আইনের ৮৭ ধারার বিধান কেবল ঐ আইনমতে এবং তাহার উদ্দেশ্য সাধনার্থে মিউনিসিপেল কমিশনরেরা যে সকল কার্য্য করেন, তৎসম্বন্ধেই খাটে। ১১ বৎসরের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া তাহার দখল পাওয়ার জন্য নালিশ করিতে সকল লোকের জন্য যে সাধারণ বিধি আছে তাহার লোপ করা ঐ আইনের অভিপ্রায় নহে। ... ৪৭৫

দ্রঃ মিউনিসিপেল কমিশনর

,, ১৮৬৫ সালের ৮ ( বাঃ কৌঃ )

জমার কিয়দংশের নীলাম সম্বন্ধে এই আইনের ১৬ ধারা খাটে না ... ১৪৪

১৬ ধারা—দ্রঃ অধীন জমা

দ্রঃ নীলাম ( ৪ )

,, ১৮৬৫ সালের ১০ ( বাঃ কৌঃ )

দ্রঃ ডিক্রীজারী ( ১৫ )

,, ১৮৬৫ সালের ১১

যে স্থলে এক ব্যক্তি দুই ছোট আদালতের জজ হন, এবং তিনি প্রতি মাসের প্রথম ১৫ দিন এক আদালতে এবং শেষ ১৫ দিন অপর আদালতে অধিবেশন করেন, তাহাতে “তাহার প্রত্যেক “আদালতের পরের অধিবেশন” উক্ত জজ প্রথম যে তারিখে পুনরায় সেই আদালতে অধিবেশন করেন সেই তারিখে হইবে। ... ৯০

৬ ধারা—দ্রঃ ক্ষতিপূরণ ( ২ )

দ্রঃ বিচারাধিকার ( ১৫ )

,, ১৮৬৫ সালের ২০

যে অভিযোগ ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ১৩ ধারা অনুসারে বিচারিত হয় তাহাতে অধঃস্থ আদালতের যদি এই অভিপ্রায় হয় যে, অভিযুক্ত উকীলকে মুক্তি দেওয়া উচিত, তবে আর জেলার জজের নিকট ঐ আদালতের রিপোর্ট করিবার আবশ্যক রাখে না। ... ৬১

১৪ ধারা—দ্রঃ উকীল

* বাঃ কৌঃ এই চিহ্নে বাঙ্গালার কৌন্সিলের আইন বুঝাইবে।

আইন—১৮৬৬ সালের ২০　　পৃষ্ঠা।

কাহার দায় সংস্থাপনার্থে যে নালিশ হয়, তাহা মূল দায়িগণের মধ্যে এক জনের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এবং কালেক্টরীতে নীলামের উদ্বর্ত্ত যে টাকা জমা থাকে, তাহার উপর দাবী প্রবল করণার্থে উপস্থিত হইলে, রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫৩ ধারার বিধানান্তর্গত হইতে পারে না। ১৯৩

৪৯ ও ১০০ ধারা—দ্রঃ রেজিষ্টরী ( ৩ )

দ্রঃ কার্য্য-প্রণালী ( ৫ )

,, ১৮৬৭ সালের ২৭

দ্রঃ আইন—১৮৫৯ সালের ৮ আইন ( ৬ )

দ্রঃ কার্য্য-প্রণালী ( ৯ )

,, ১৮৬৯ সালের ১৫

দ্রঃ কার্য্য-প্রণালী ( ৭ )

,, ১৮৬৯ সালের ১৮

দ্রঃ খত ( ১ )

দ্রঃ চুক্তি ( ২ )

আদালতের বাহিরে বন্দোবস্ত

ডিক্রীদার ও তাহার বিচারাদিষ্ট দায়ীর পরস্পরের মধ্যে আদালতের বাহিরে যে ঘরাও বন্দোবস্ত হয় তাহাতে দায়ী ডিক্রীদারকে কতিপয় সম্পত্তি অর্পণ করে, এবং ডিক্রীদার দায়ীকে ডিক্রীর সমস্ত দায় হইতে মুক্ত করিবার করার করে। পশ্চাতে ডিক্রীদার ঐ বন্দোবস্ত অস্বীকার করত দায়ীর বিরুদ্ধে ডিক্রীজারী করে, কিন্তু সে দায়ীর কোন সম্পত্তি ক্রোক অথবা তাহার কোন ক্ষতি করে নাই। ডিক্রীজারী চালাইবার ত্রুটি হেতু ডিক্রীজারীর মোকদ্দমা নম্বর-খারিজ হয়। তাহাতে দায়ী ডিক্রীদারকে যে সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিল তাহার মূল্য পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ছোট আদালতে নালিশ করে। এ স্থলে, প্রতিবাদীর কার্য্যের দ্বারা বাদী কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ায়, বাদীর ঐ নালিশ চলিতে পারে না। ... ... ১৩৪

আপত্তি।

দ্রঃ নোটিস ( ২ )

আপীল

( ১ ) নিম্ন আপীল-আদালতের ডিক্রী-লিখিত “আপীল ডিক্রী হইল” এই বাক্যের এমন অর্থ নহে যে, আপেলাণ্ট যাহা কিছু

আমলা পৃষ্ঠা।

দিগকে নিযুক্ত করার ভার ঐ সকল বিচার-প্রতির হস্তেই থাকিবে; জেলার জজ কেবল সেই নিয়োগে আপন সম্মতি বা অসম্মতি প্রদানের ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। নিয়োজিত ব্যক্তির নিজের বিরুদ্ধে যদি কোন আপত্তি থাকে, তবেই জজ তাহার নিয়োগ মঞ্জুর করণে অস্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এমন হুকুম দিতে পারেন না, যদ্দ্বারা অধঃস্থ বিচারপতি-গণ তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইবেন। ... ১৯০

আরজী

কি প্রতিকারের প্রার্থনা করা হয়, কি বিষয়ের দাবী করা হয়, নালিশের হেতু কি এবং তাহা কখন উপস্থিত হইয়াছে, তৎসমুদায়, আরজীতে লিখিতে হইবে, এবং ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমায়, কি প্রকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা লিখিতে হইবে। এই প্রদেশে নালিশের আরজীতে ইংলণ্ড দেশের নিয়ম সমস্ত খাটে না। ... ২৩৩

ই

ইস্যু

যে স্থলে পক্ষগণ আদালতের অন্যায় রূপে অবধারিত ইসুই গ্রহণ করে, সে স্থলে তাহাদিগকে তাহার দ্বারাই বাধ্য স্থির করিতে হইবে। ১৯৬

উ

উকীল

(১) ডিক্রীজারীর কার্য্যে দায়ীর পক্ষে ওকালতী করিয়া পশ্চাতে ডিক্রীদারের সহিত যোগ করত ডিক্রীজারীর নীলামে বিক্রীত সম্পত্তি ক্রয় করা উকীলের পক্ষে অতি অসঙ্গত। ... ২০২

(২) যদি কোন অধঃস্থ আদালতের উকীলের প্রতি এমত দোষারোপ হয়, যাহা সপ্রমাণ হইলে দণ্ডবিধির অন্তর্গত অপরাধের তুল্য হইতে পারে, তবে তাহা শুদ্ধ ব্যবসায় সম্বন্ধীয় অন্যায়াচরণ জ্ঞান না করিয়া ঐ উকীলকে ফৌজদারীতে বিচারার্থে অর্পণ করত, তথায় অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের ১৪ ধারামতে তাহাকে পদচ্যুত করিতে হইবে। ... ৪৬৯

উচ্ছেদ

(১) বাদী বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিয়া প্রার্থনা করে যে, যদি টাকা প্রদত্ত না হয়, তবে প্রতিবাদীকে উচ্ছেদ করিতে হইবে; ডেপুটি কালেক্টর তাহাকে যে ডিক্রী দেন, তাহাতে তিনি লেখেন যে, ঐ প্রার্থনা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৮ ধারার অন্তর্গত কার্য্যের জন্য হইয়াছে, এবং তিনি হুকুম দেন যে, ঐ ধারামতে ডিক্রীজারী হইবে, এমত স্থলে ঐ হুকুম উচ্ছেদের হুকুমই হইয়াছে। ... ২২৩

(২) রাইয়ত অথবা মধ্যবর্ত্তী প্রজা সূত্রেই হউক, যদি কোন ব্যক্তি খাজানা দিয়া আইন-সঙ্গত রূপে দখীলকার থাকে, তবে তাহার দখলের স্বত্ব আইন-সঙ্গত প্রণালীতে সমাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী খাস দখলের নালিশ করিতে পারে না। রাইয়তের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী প্রজাকেও যথোচিত নোটিস না দিয়া উচ্ছেদিত করা যাইতে পারে না। ... ... ... ২৫৩

উদ্বর্ত্ত মূল্য

পত্তনীর বাকী খাজানার নীলামের উদ্বর্ত্ত টাকা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ক্রোক হইয়া কালেক্টরের হস্তে থাকিলে ঐ আদালতের হুকুমের দ্বারা যে পর্য্যন্ত অপর কাহাকে দেওয়ার আদেশ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ টাকা বাকীদার পত্তনীদারের সম্পত্তি স্বরূপেই কালেক্টরের নিকট থাকে। ... ... ৫৩

দ্রঃ টাকা গ্রহণ

এ

একুটীর আদালত

যৌত সম্পত্তির কোন শরীক যদি সেই সম্পত্তি এমন ভাবে ভোগ করে যে, তদ্দ্বারা তাহার অপর শরীকের কোন ক্ষতি হয় না, তবে তৎপ্রতি একুটির আদালত হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু যদি তদ্দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট এবং স্পষ্ট স্বত্বের ক্ষতি করা হয় তাহা হইলে ঐ যুক্তি খাটিবে না। ... ... ৩১২

এজেণ্ট

কোন স্বীকৃত এজেণ্ট বা মোক্তার আপন মুনিবগণের পক্ষে, নিজ নামে বাদী স্বরূপে কোন নালিশ উপস্থিত করিতে, বা প্রতিবাদী স্বরূপে কোন নালিশের জওয়াব দিতে পারে না। যে কুঠী বর্ত্তমান নাই, সুতরাং তাহার কারবার চলিতেছে না, তাহার দেনা-পাওয়ানা পরিষ্কার না হইয়া থাকিলেও, সেই কুঠীর স্বীকৃত গোমাস্তা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ১৭ ধারার ২ প্রকরণের মর্ম্মান্তর্গত স্বীকৃত মোক্তার বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ... ... ৩৩৮

কানুন—১৮০৬ সালের ১৭　　পৃষ্ঠা।

৮ ধারা—দ্রঃ কট (১)

,, ১৮১৪ সালের ১৯

দ্রঃ বাটোয়ারা (১)

,, ১৮১৯ সালের ২

১৬ ধারা—দ্রঃ বাজেয়াপ্তী

,, ১৮১৯ সালের ৮

১৪ ধারা—দ্রঃ ডিক্রীজারী (৯)

কার্য্য

বাদী কতিপয় ভূমি তাহার মাল ভূমি বলিয়া তাহার জমাবন্দী করার স্বত্ত্ব সাব্যস্তের জন্য নালিশ করিয়া ডিক্রী পাইলে, প্রতিবাদিগণের মধ্যে কয়েক ব্যক্তি ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ১১৯ ধারামতে দরখাস্ত করিয়া ঐ ডিক্রী অন্যথা করার জন্য প্রার্থনা করে। অবশিষ্ট প্রতিবাদিগণকে পক্ষ করিয়া ডিক্রী অনেক রূপান্তরিত হয়। এমত স্থলে, প্রধানতম বিচারালয় স্থির করিলেন যে, যেহেতু ডিক্রীদার তাহার মূল ডিক্রী স্থির রাখার চেষ্টা করিতেছিল, অতএব তাহাই ডিক্রী সজীব রাখার কার্য্য বলিতে হইবে। ... ... ... ২০০

দ্রঃ ডিক্রীজারী (৫)

কার্য্য-প্রণালী

(১) কোন আইন-বিরুদ্ধ প্রতিবন্ধক বা সাধারণের অপকার-জনক বস্তু দূর করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের ফৌঃ কাঃ বিধির ২৫ অধ্যায় মতে কার্য্য করিতে হইলে, যে ব্যক্তি দ্বারা ঐ অপকার-জনক বস্তু বা প্রতিবন্ধক হইয়াছে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহা দূর করণার্থে, বা দূর না করার কারণ দর্শাইবার জন্য তলব করিতে হইবে। সে কারণ দর্শাইবার জন্য উপস্থিত হইলে, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যথেষ্ট ও সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়া বিচার করত কার্য্য করিবেন। ৬

(২) যে আদালত মোকদ্দমার বিচার করেন তাঁহারই খেসারতের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে; ডিক্রীজারীতে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। ... ... ১২৯

(৩) জজের নিকট এক উকীলের দ্বারা এক আপীল দাখিল করিয়া তৎপরের দিবস অপর এক উকীলের দ্বারা ঐ আপীল উঠাইয়া লওয়া হয়। পরে ঐ আপীল পুনরায় নথীভুক্ত করিবার জন্য এই হেতুবাদে দরখাস্ত

কার্য্য-প্রণালী　　পৃষ্ঠা।

হয় যে, উক্ত দ্বিতীয় উকীল ঐ আপীল উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন না। জজ এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। যেহেতু উকীলের নিকট ডাক যোগে প্রেরিত এক দরখাস্তের বলেই জজের নিকট ঐ প্রার্থনা হয়, অতএব প্রতারণার প্রসঙ্গ শপথ পূর্ব্বক উত্থাপন না করিলে জজকে এ বিষয়ে আর কোন তদন্ত করিতে সনন্দের ১৫ ধারা অবলম্বনে আদেশ করা যাইতে পারে না। ... ... ১৫৯

(৪) যে তমঃসুক ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন অথবা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন মতে বিশেষ রেজিষ্টরীকৃত হইয়াছে, সেই তমঃসুক-গৃহীতা যদি ১৮৬৬ সালের ২০ আইনের ৫৩ ধারামতে ঐ তমঃসুক জারী করিবার দরখাস্ত করে, তবে সে ঐ তমঃসুক ও বিশেষ একরার আদালতে দাখিল করিলে, তমঃসুকের সমুদায় টাকার ডিক্রী পাইবে; এবং আদালতের এই তমঃসুকের সর্ত্ত পরিবর্ত্তন করার কোন ক্ষমতা নাই, অর্থাৎ তিনি তমঃসুকের সর্ত্তের বিপরীতে এমন ডিক্রী দিতে পারেন না যে, সমুদায় টাকা এককালে আদায় না হইয়া কিস্তীবন্দীর দ্বারা আদায় হইবে; এবং করার অনুযায়ী সুদের হারও আদালত কমাইতে পারেন না। ... ২৪৯

(৫) যদি কোন আদালত দেখেন যে, মিথ্যা বর্ণনা অথবা যথার্থ বৃত্তান্ত গোপন করত কোন ব্যক্তি গতিকে তিনি কোন হুকুম দিয়াছেন, তবে তাহা উঠাইয়া লওয়ার কোন প্রকাশ্য নিষেধ না থাকিলে অথবা তাহা উঠাইয়া লওয়া অনাবশ্যক না হইলে, তাহা তিনি উঠাইয়া লইতে পারেন। ... ... ... ... ২৪২

(৬) যে স্থলে দেঃ কাঃ বিঃ ৭৫ ও ৭৮ ধারামতে প্রতিবাদীকে জেলে আবদ্ধ করা হয়, সে স্থলে আদালত তাহার জবানবন্দী লওয়ার জন্য তাহাকে আদালতে উপস্থিত করাইতে চাহিলে, ১৮৬৯ সালে ১৫ আইনের বিধান অবলম্বন না করিয়া, প্রতিবাদীকে আদালতে হাজির করণার্থে একেবারে জেলরের উপর হুকুম জারী করিলেই হইতে পারে। ... ... ১৬৯

(৭) যে রাইয়ত কালেক্টরের খাস দখলী ভূমির জোত ভোগ করিয়া কালেক্টরকে এক নির্দ্দিষ্ট খাজানা দেয়, সে ১৭৯৯ সালের ৭ম কানুনের ২৫ ধারার মর্ম্মান্তর্গত "পেটাও জোতদার;" অতএব যদি ঐ রাইয়ত খাজানা দিতে ত্রুটি করে, তবে বৎসরের শেষে তাহার

খরচা পৃষ্ঠা।

খাস্তক্রমে আদালত পক্ষগণকে হাজির হইতে হুকুম দেন এবং তাহারা হাজির হইতে অস্বীকার করায় ষ্টাম্প-মূল্য সম্বন্ধে প্রথমে যে হুকুম হইয়াছিল তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া আদালত ব্যক্ত করেন যে, তাহা দুই পক্ষের নিকট হইতে একত্রে আদায় হইবে। এ স্থলে, গবর্ণমেণ্টের অনুকূলে আদালতের ঐ দ্বিতীয় হুকুম প্রদান করার কোন ক্ষমতা ছিল না, এবং তদনুযায়ী ডিক্রীজারীতে যে কার্য্য হইয়াছে তাহা আইন-বিরুদ্ধ এবং বৃথা। ... ... ... ১৪৫

( ৩ ) ৩৮১০ বিঘা ভূমির দাবীতে ৩৪ জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে নালিশ হওয়ায়, ১৩ জন প্রতিবাদী উপস্থিত হইয়া প্রত্যেকে দাবীকৃত ভূমির আপন আপন অংশ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন জওয়াব দেয়। বহু মোকদ্দমা জড়িত হওয়ার হেতুতে নালিশ ডিস্‌মিস্ হয়। নালিশ যে পর্য্যন্ত ডিস্‌মিস্ হইয়াছিল, জজ তাহার ৫৪৪০ টাকা মূল্য ধরিয়া সেই পরিমাণে প্রত্যেক প্রতিবাদীকে সম্পূর্ণ খরচা দেন, অর্থাৎ প্রত্যেক প্রতিবাদীকে ১৫৭ টাকা উকীলের ফীস দেন, কিন্তু তাহা অনেক স্থলেই বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্যেরও অধিক হয়। এ স্থলে, ইহা ফীসের হুকুম দেওয়ার ন্যায্য প্রণালী নহে; যে প্রতিবাদীর ভূমিখণ্ড ৪০ বিঘার অধিক তাহাকে ৫ মোহর ও যাহার ভূমি ২০ বিঘার অধিক কিন্তু ৪০ বিঘার ন্যূন, তাহাকে ৩ মোহর এবং যাহার ভূমি ২০ বিঘার ন্যূন তাহাকে দুই মোহর ফীস দেওয়া উচিত ছিল। ... ... ... ৩১০

খাস আপীল

( ১ ) দেঃ কার্য্য-বিধির ২৪৬ ধারান্তর্গত এক মোকদ্দমার কোন পক্ষকে জবানবন্দী দেওয়ার জন্য সমন করাতে সে উপস্থিত হয় না। আদালত বিবেচনা করেন যে, তাহার অনুপস্থিত থাকার কোন আইন-সঙ্গত হেতু নাই, অতএব তিনি ঐ কার্য্য-বিধির ১৭০ ধারা মতে বিচার্য্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করেন। ঐ হুকুম আইন-সঙ্গত প্রমাণাভাবে প্রদত্ত হইবার হেতুবাদে তাহা অন্যথা করার জন্য বিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ আইনের ১৫ ধারা মতে প্রধানতম বিচারালয়ে প্রার্থনা হওয়ায়, স্থির হয় যে, এই প্রকার প্রার্থনা বাস্তবিক খাস আপীলের তুল্য, অতএব তাহা ২৪৬ ধারান্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। ... ... ১১৬

( ২ ) জজের নিকট এক উকীলের দ্বারা

খাস আপীল পৃষ্ঠা।

এক আপীল দাখিল করিয়া তৎপরের দিবস অপর এক উকীলের দ্বারা ঐ আপীল উঠাইয়া লওয়া হয়। পরে ঐ আপীল পুনরায় নথীভুক্ত করিবার জন্য এই হেতুবাদে দরখাস্ত হয় যে, উক্ত দ্বিতীয় উকীল ঐ আপীল উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন না। জজ এই দরখাস্ত অগ্রাহ্য করেন। এ স্থলে, জজের এই শেষোক্ত হুকুমের বিরুদ্ধে খাস আপীল চলে না, কারণ, এই হুকুম, আপীল উঠাইয়া লইতে দিবার প্রথমোক্ত হুকুমের পুনর্ব্বিচারের দরখাস্তের উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। ... ... ১৫৯

দঃ খরচা ( ১ )
দঃ প্রথা
দঃ বিচারাধিকার ( ২০ )

## গ

গবর্ণমেণ্ট

ব্যক্তিবিশেষের কোন সম্পত্তি হস্তগত বা নষ্ট করিলে সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে, এমত বিবেচনা হইলেই যে, গবর্ণমেণ্ট তাহার সেই সম্পত্তি সরাসরী রূপে নষ্ট করিতে স্বত্ববান হইবেন, এমত নহে। এই সকল বিষয়ে অপর ব্যক্তির যে প্রণালীতে কার্য্য করিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণও সেই প্রণালীতে কার্য্য করিতে বাধ্য, এবং কোন অপর ব্যক্তি তাহার নিজের সুবিধার জন্য অন্য কাহার সম্পত্তি অবৈধ রূপে নষ্ট করিলে যে রূপ ক্ষতিপূরণের দায়ী হয় সেই প্রকার সাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট বা তাঁহার কর্ম্মচারিগণও কাহার সম্পত্তি অবৈধ-রূপে নষ্ট করিলে দায়ী হইবেন। ... ... ... ৫

গ্রেপ্তার

দঃ আইন—১৮৫৯ সালের ৮ আইন ( ৫০ )
দঃ দায়ী

চিঠা

মালসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষেরা গবর্ণমেণ্টের কোন খাস মহালের জরীপের সময় যে সকল চিঠা প্রস্তুত করেন, তাহা তাঁহাদের রাজস্ব-সংক্রান্ত তদন্তের চিঠার তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে এবং তুল্য রূপেই প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য

চিঠা পৃষ্ঠা

হইবে; তাহা খাস মহাল সম্বন্ধীয় কার্য্য বলিয়াই সাধারণের সম্পর্কীয় বিষয়ে সরকারী কার্য্য গণ্য হইবে না, এমত হইতে পারে না। ... ৫০

চুক্তি

(১) প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে বাদী এক পত্তনী লয়, এবং পত্তনী পাট্টার সর্ত্ত অনুসারে তৎকালে প্রতিবাদিগণের বিরুদ্ধে উক্ত সম্পত্তির উপর যে সকল ডিক্রী ছিল তাহা পরিশোধ করিতে সম্মত হয়। পরে তাহাদের মধ্যে আর এই এক চুক্তি হয় যাহাতে বাদী প্রতিবাদীকেই টাকা দিয়া উক্ত ডিক্রী পরিশোধ করিবার দায় হইতে মুক্ত হয়। পরে প্রতিবাদী মোকদ্দমা করিয়া তাহার এক ডিক্রীর দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়; বাদী তাহাতে উক্ত টাকা প্রতিবাদীর দিতে হয় নাই বলিয়া তাহা ফেরৎ পাওয়ার দাবীতে নালিশ করে। স্থির হইল যে, উক্ত দ্বিতীয় চুক্তি দ্বারা যখন বাদী ঐ সকল ডিক্রীর দাবা-দাওয়া হইতে আপনাকে মুক্ত করে, তখন সে ঐ টাকা আর ফেরৎ পাইতে পারে না। ... ... ১০৮

(২) কোন কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পব্লিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট যে সকল চুক্তি-পত্র লেখাইয়া লন, তাহাতে ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ২ য় তফসীলের ১১ দফা মতে ॥০ আনা মূল্যের ষ্টাম্প লাগিবে। ... ... ৩৪৮

দৃঃ প্রমাণ (৮)
দৃঃ নাবালগ (২) (৩) (৪)
দৃঃ ছোট আদালত

## ছ

ছোট আদালত

হিন্দুদিগের আপনাদের পরস্পরের মধ্যে কারবার ও চুক্তি সম্বন্ধে, সাধারণ দেওয়ানী আদালত সমন্ধে যে আইন খাটে, তাহা ছোট আদালত সম্বন্ধেও খাটে। ... ১৩৫

ছোট নাগপুর

দৃঃ রেজিষ্টরী (২)

## জ

জমা

দৃঃ নীলাম (৫)

জলব্যবহার

বাদীর ভূমিতে জল পতিত হইয়া এক জলাশয়ে জমা হয় এবং তথা হইতে প্রতিবাদীর ভূমিতে গমন করে; এমত স্থলে, প্রতিবাদীর ঐ জল ব্যবহার করার কোন স্বত্ব নাই, এবং প্রতিবাদীর ভূমিতে জল যাইতে না পারে, এমত ভাবে বাদীর নিজের ভূমিতে বাঁধ প্রস্তুত করিতে বাদীর স্বত্ব আছে। ... ... ৪২১

জাবেতা

হাইকোর্টে আপীলের জন্য যে ৯০ দিবস সময় প্রদত্ত আছে, তাহা, যে তারিখে ডিক্রী ও রায়ের নকলের জন্য ষ্টাম্প কাগজ দাখিল হয় এবং যে তারিখে আদালতের উপযুক্ত কর্ম্মচারী কৈফিয়ৎ দেয় যে, নকল প্রস্তুত হইয়াছে, এই দুই তারিখের মধ্যবর্ত্তী কাল বাদ দিয়া গণনা করিতে হইবে। ... ... ১১৯

জামিন

দৃঃ খত (১)

জেম্মা

দৃঃ বিচারাধিকার (১২) (১৩)

টাকা গ্রহণ

নীলামের মূল্যের উদ্বৃত্ত যে টাকা কালেক্টরের হস্তে আমানত থাকে, তাহার কোন অংশ কোন ডিক্রীদার লইলে, বিচারাদিষ্ট দায়ী তৎপ্রতি আপত্তি না করিলেও ঐ রূপ টাকা লওয়া ৩৩ ধারার মর্ম্মান্তর্গত টাকা গ্রহণের তুল্য হইতে পারে না। ... ... ... ৪৩১

দৃঃ কর-বৃদ্ধি

## ড

ডিক্রী

(১) এজমালী ডিক্রীর এজমালী ভাব পক্ষগণের আপনাদের মধ্যে পশ্চাতের কোন বন্দোবস্তের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ... ... ... ... ১২০

(২) এক নালিশের ডিক্রী হওয়ার পরে প্রতিবাদিগণ আপীল করে, কিন্তু দুই পক্ষই আপোস নিষ্পত্তি করিয়াছে বলিয়া আপীল-আদালতে দরখাস্ত করাতে আপীল নথী-খারিজ হয়। বাদিগণ এইক্ষণে তাহাদের মুল ডিক্রী জারী করার জন্য দরখাস্ত করাতে, স্থির হইল যে, যেহেতু আপীল-আদালত প্রথম আদালতের নিষ্পত্তি অন্যথা করেন নাই, অতএব প্রথম

ডিক্রী পৃষ্ঠা।

আদালতের ডিক্রী এখনও বলবৎ রহিয়াছে; সুতরাং বাদী ডিক্রীদারগণ আপনাদের একরারের দ্বারা ঐ ডিক্রীজারী করিতে যত দূর নিবারিত হইয়াছে, তাহা বাদে তাহারা ঐ ডিক্রী জারী করিতে পারে। ... ... ৩০৪

(৩) তমঃসুকী ঋণের জন্য ডিক্রীতে যদি এমন সর্ত্ত থাকে যে, ডিক্রীদারের প্রাপ্য টাকা পরিশোধিত না হইলে তমঃসুকে আবদ্ধ সম্পত্তির নীলাম হইতে পারে, তবে ঐ সর্ত্তের এই অর্থ করিতে হইবে যে, ঐ আবদ্ধ সম্পত্তি ডিক্রীকৃত ঋণের জন্য দায়ী। ... ... ... ৪১৫

(৪) ডিক্রীদার কেবল ডিক্রীজারী করিয়াই ঐ সম্পত্তি ধৃত করিতে পারে, এবং তাহা হইলে সে অন্য ডিক্রীদারের অবস্থান্বিত এবং দেওয়ানী কার্য্য-বিধির বিধান সমস্তের দ্বারা বাধ্য হইবে, এবং বিচারাদিষ্ট দায়ী ২৪৩ ধারার উপকার লাভ করিতে পারিবে। ... ... ৪১৫

দ্রঃ যৌত ডিক্রী
দ্রঃ দখলের নালিশ (২)
দ্রঃ নীলাম (৩)

ডিক্রীজারী।

(১) কোন্ ভূমির দখলের মোকদ্দমার আরজীতে ওয়াশীলাতেরও দাবী ছিল, কিন্তু ঐ ভূমির কতক অংশের ডিক্রী হয়, এবং ঐ ডিক্রীতে ওয়াশীলাতের কোন হুকুমই থাকে না। ভূমির যে অংশের ডিক্রী হয় নাই তৎসম্বন্ধে বাদী আপীল করে; এবং নিম্ন আপীল-আদালত প্রথম আদালতের এই বিষয়ক রায় অন্যথা করত আপীলের "ডিক্রী" দেন। এ স্থলে ডিক্রীতে ওয়াশীলাৎ প্রদানের হুকুম না থাকায়, এবং এই মোকদ্দমায় ওয়াশীলাৎ সম্বন্ধীয় তর্ক ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারার অন্তর্গত হইতে না পারায় ঐ ডিক্রীজারীতে সেই ওয়াশীলাৎ পাওয়া যাইতে পারে না। ... ... ২

(২) যাবতীয় ডিক্রীই আদালতের নিজের কার্য্যের দ্বারা জারী হয়; অতএব পক্ষগণ যে প্রকার তাহাদের নিজের বন্দোবস্তের অথবা আচরণের দ্বারা নূতন করিয়া আদালত কর্ত্তৃক কার্য্য করাইতে পারে না, তদ্রূপ আদালত যে প্রতিকার প্রদান করেন তাহার ফলও তাহাদের কার্য্য দ্বারা বিস্তারিত হইতে পারে না। ২

(৩) কোন আপীল-আদালতের ডিক্রী জারী করিবার দরখাস্ত, উক্ত ডিক্রীজারী করণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে কোন হুকুম থাকুক বা না থাকুক, যে আদালত ঐ মোকদ্দমায় প্রথম ডিক্রী দেন সেই আদালতে করিতে হইবে।

(৪) যে স্থলে ক্রমান্বয়ে বহুকাল পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেবল এক মৃত প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা করা হয়, সে স্থলে উক্ত ব্যক্তি নিজের জন্য এবং ঐ অপর প্রতিবাদীর স্থলাভিষিক্ত স্বরূপে দায়ী হইলেও তাহাকে একজন মূল প্রতিবাদী বলিয়া তাহার নিজের বিরুদ্ধে আর ঐ ডিক্রীজারী হইতে পারে না। ... ... ... ... ২৮

(৫) যে স্থলে আদালত ডিক্রীদারের কোন দরখাস্ত ব্যতীত আপনি প্রস্তাবানুসারে কোন ডিক্রীজারীর নীলাম মঞ্জুর করেন এবং ডিক্রীদার পরে নীলামের মূল্যের টাকা বাহির করিয়া লয়, তাহাতে উক্ত দুই কার্য্যের কোন কার্য্যই ঐ ডিক্রীদারের ডিক্রী জারী রাখার কার্য্য গণ্য হইতে পারে না। ... ... ... ... ৩১০

(৬) যে স্থলে কোন ডিক্রীদার ডিক্রীজারীর মিয়াদের তিন বৎসর অতীত হওয়ার ঠিক এক দিন পূর্ব্বে ডিক্রীজারীর দরখাস্ত করে, এবং নোটিস জারী হইয়া ফেরৎ আসিবার পর উক্ত বিষয় সম্বন্ধে আর কিছুই করে না, সে স্থলে অনুমান হইবে যে, উক্ত দরখাস্ত করার কার্য্য সরলান্তঃকরণ-মূলক নহে। এমত স্থলে, প্রকৃত নোটিস জারীর প্রমাণের আবশ্যক রাখে না। ... ... ৩৫

(৭) যদিও ডিক্রীজারীর দরখাস্ত দাখিলের পর আদালতকে জারীর পরওয়ানা বাহির করিতে হয়, তথাপি আইনের সম্পূর্ণ অভিপ্রায় এই যে, যখন ডিক্রীদার দেখে যে, আদালত ডিক্রীজারীর পক্ষে কোন উপায় অবলম্বন করিতেছেন না, তখন মিয়াদ অতীত না হয় এ জন্য ডিক্রীদারকে সচেষ্ট হইয়া সময়ে সময়ে আদালতে তদর্থে প্রার্থনা করিতে হইবে। ... ৭৬

(৮) ১৮৬৫ সালের ৬ ই সেপ্টেম্বরের এক ডিক্রীজারীর দরখাস্ত ঐ তারিখ হইতে তিন বৎসর এক দিবসে অর্থাৎ ১৮৬৮ সালের ৭ ই সেপ্টেম্বর তারিখে দাখিল হয়, কারণ, ৬ ই তারিখ রবিবার ছিল। এমত স্থলে ঐ দরখাস্ত উচিত কালের মধ্যে দাখিল হওয়া গণ্য হইতে পারে না। ... ... ... ১১৭

(৯) যে স্থলে কোন পত্তনী তালুকের নীলাম অন্যথা করিবার দাবীর মোকদ্দমায় ১৮১৯ সালের ৮ ম কানুনের ১৪ ধারা অনুসারে ক্রেতাকে সহ-প্রতিবাদী করা হয়, এবং এই

ডিক্রীজারী পৃষ্ঠা।

ডিক্রী হয় যে, ক্রেতা তাহার ক্রয়-মূল্য জমিদারের নিকট পাইতে পারে; সে স্থলে ক্রেতা আর কোন নূতন মোকদ্দমা উপস্থিত না করিয়াই, তাহার ঐ ডিক্রীজারী করিতে পারে। ... ১৫২

( ১০ ) কোন ডিক্রীজারীর জন্য যে কার্য্য করা হয়, যাহাতে ডিক্রীদার ন্যায্য রূপে কৃত-কার্য্য হইতে পারে না, এবং যাহার পর তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন কার্য্য হয় না, তাহা যে, সরলান্তঃকরণে করা হইয়াছিল, এমত বলা যাইতে পারে না। ... ... ১৫৫

( ১১ ) ডিক্রীদার ও দায়ী উভয়ে সম্মত হইয়া ডিক্রীজারী কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিলেও যে তারিখে সেই ডিক্রীজারীর দরখাস্ত দাখিল হয় তাহার পরের কোন তারিখ পর্য্যন্ত তাহা বিস্তারিত হইবে না। ... ১৫৫

( ১২ ) যে স্থলে ডিক্রীদার ডিক্রীজারীতে খাস দখল লয়, এবং তাহার পরে বিচারা-দিষ্ট দায়ীর নিকট ক্রেতা ডিক্রীর অন্তর্গত বাকী খাজানা দিতে চাহে, সে স্থলে ঐ দুই ব্যক্তির অর্থাৎ ঐ ক্রেতা ও ডিক্রীদারের মধ্যে এমন কোন ন্যায়ানুগত সম্বন্ধ সংস্থাপিত হয় না, যদ্দ্বারা ডিক্রীদারের দখল রহিত করা যাইতে পারে। ... ... ... ... ২২৩

( ১৩ ) কতক টাকায় সমুদায়ের স্বত্ব আছে বলিয়া, পাঁচ ব্যক্তির অনুকূলে ডিক্রী হয়, কিন্তু ঐ টাকার অর্দ্ধ উহার তিন জনকে ও অপর অর্দ্ধ বাকী দুই জনকে আর্পত হয়। এ স্থলে, ঐ নিষ্পত্তির ফল দুই স্বতন্ত্র এবং পৃথক্ ডিক্রী হওয়ার ন্যায় গণ্য, এবং যে ডিক্রীদারের প্রতি এক অর্দ্ধ অর্পিত হয়, তাহার কোন কার্য্যের দ্বারা দ্বিতীয় অর্দ্ধের ডিক্রীদারের ডিক্রী সজীব থাকিতে পারে না। ... ... ২২৮

( ১৪ ) বিচারাদিষ্ট দায়ী এই হেতুবাদে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর নীলাম ক্ষান্ত থাকার জন্য প্রার্থনা করে যে, ঐ নীলামের জন্য যে দিন অবধারিত হইয়াছে তাহা রাজস্ব দেওয়ার অব-ধারিত দিবসের এত নিকট যে, সেই দিবসে নীলাম হইলে তাহার বিস্তর ক্ষতি হওয়ার সম্ভব। ইহা নীলাম ক্ষান্ত রাখার জন্য যথেষ্ট ও উৎকৃষ্ট হেতু নহে। ... ... ২৭২

( ১৫ ) যখন কোন জমা বাঙ্গালার কৌন্-সিলের ১৮৬৫ সালের ১০ আইনমতে ডিক্রী-জারীতে নীলাম হয়, তখন সেই নীলামের কালে ঐ জমার কোন ভাগ বর্জ্জিত না হইলে সমগ্র জমাই ঐ নীলাম দ্বারা বিক্রীত হওয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ... ... ... ২৯৪

( ১৬ ) ভূমি ও অস্থাবর সম্পত্তির দখলের এক ডিক্রী হওয়াতে, প্রতিবাদী কেবল অস্থা-বর সম্পত্তি সম্বন্ধে আপীল করে, এবং আপীল-আদালতে ভূমির বিষয়ে কোন কথা উত্থিত হয় না। অস্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধে আপীল-আদালত নিম্ন আদালতের ডিক্রী কিঞ্চিৎ রূপা-ন্তর করিয়া ডিক্রী দেন। এ স্থলে, আপীল-আদালতের ঐ কার্য্য দ্বারা ভূমির দখলের ডিক্রী সজীব থাকে না। ... ... ... ৩০১

( ১৭ ) কোন ডিক্রীর তারিখের এক বৎ-সরের অধিক কাল পরে ঐ ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হইলে, যাহার বিরুদ্ধে ডিক্রীজারীর প্রার্থনা হয় তাহার প্রতি রীতিমত নোটিস জারী হও-য়ার সন্তোষকর প্রমাণ না পাইলে আদালত ডিক্রীজারী করিতে পারেন না। .. ৪০৬

দঃ ডিক্রীর বরাত
দঃ খত ( ১ )
দঃ মঞ্জুর
দঃ ডিক্রী ( ২ ) ও ( ৪ )
দঃ আপোস
দঃ অনিয়ম
দঃ যৌত দেনা
দঃ যৌত ডিক্রী
দঃ বিচারাধিকার ( ১ )
দঃ নীলাম ( ৫ )

ডিক্রীর বরাত

( ১ ) ডিক্রীজারীতে আদালত ডিক্রী-ক্রেতাকে গ্রাহ্য করিতে বাধ্য নহেন। যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আদালত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন, কিম্বা যদি এমন আপত্তি থাকে যাহার তিনি মীমাংসা করিতে পারেন, তবে তিনি সেই আপত্তির বিচার করিতে পারেন, এবং সেই বিচারের ফল দৃষ্টে ক্রেতাকে ডিক্রীজারী চালাইতে অনুমতি দিতে পারেন। ১১৮

( ২ ) মূল ডিক্রীদারের পরিবর্ত্তে ডিক্রী-ক্রেতার নাম বসাইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করিবার হুকুম দিতে দেওয়ানী কার্য্য-বিধির ২০৮ ধারামতে দেওয়ানী আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা আছে; এবং ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ১১ ধারা যাহা যে মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়াছে কেবল তৎপক্ষগণ সম্বন্ধীয় বিবাদ সমস্তে খাটে, সেই ধারার বিশেষ বিধা-

তমাদী পৃষ্ঠা।

সকল বৃত্তান্ত সপ্রমাণ করে যদ্দ্বারা আদালত নিজে আইনঘটিত সিদ্ধান্ত করিতে পারেন, তবে যে পর্য্যন্ত নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে নালিশের হেতু উত্থাপিত হওয়া দৃষ্ট হয়, সে পর্য্যন্ত বাদীকে, তাহার আরজীর লিখিত নালিশের হেতুতে বাধ্য করিয়া রাখা উচিত নহে। ২৫৬

( ১০ ) ইন্দ্রমণি এক তমঃসুক লিখিয়া দেওয়ার পরে শ্রীকৃষ্ণকে দত্তক গ্রহণ করে এবং শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্রমণির মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি লয়। শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্পত্তির দখীল্‌কার থাকার কালে তমঃসুকগৃহীতারা তাহাদের টাকার জন্য শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করিয়া ডিক্রী পায়। ডিক্রীদারেরা যখন তাহাদের ডিক্রীজারী করিতে চেষ্টা করে, তখন ইন্দ্রমণির এক নাতি রাজকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ করিয়া তাঁহার দত্তকত্ব অন্যথা করত সম্পত্তি দখল করিয়াছিল। রাজকৃষ্ণ ঐ রূপ দখল পাওয়ার পরে ঐ সম্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ তমঃসুকের ডিক্রী অন্যথা করার জন্য নালিশ করিয়া জয়ী হয়। পরে, মূল তমঃসুক-গৃহীতার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণ ঐ তমঃসুকের টাকা পাওয়ার জন্য রাজকৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ উপস্থিত করাতে, স্থির হইল যে, বাদীর নালিশের স্বত্ব রাজকৃষ্ণের অনুকূল শেষ ডিক্রীর তারিখ হইতে উত্থিত হয় নাই; যখন তমঃসুকের সর্ত্তমতে টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল সেই সময় হইতেই তাহা উত্থিত হইয়াছে। ... ৩০৭

( ১১ ) ক উইলের দ্বারা তাহার সমুদায় সম্পত্তি তাহার ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিয়া এই সর্ত্তে তাহার এক কন্যাকে ৪০০০ টাকা দেয় যে, ঐ কন্যার পুত্র না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ টাকা পরিবারের ধনাগারে আমানত থাকিবে, এবং সে তাহার সুদ পাইবে, কিন্তু তাহার পুত্রসন্তান হওয়ার পরেই সে ঐ টাকা এবং ২০০ বিঘা ভূমি পাইবে। কয়ের মৃত্যুর কিয়ৎকাল পরেই ঐ কন্যার পুত্র জন্মে, কিন্তু তাহার মাতা ঐ ৪০০০ টাকা অথবা ভূমি না লইয়া পরলোক গমন করে, এবং কয়ের পরিবারের সম্পত্তির কর্ম্মাধ্যক্ষ ঐ পুত্রকে তাহার প্রাপ্য টাকা ও ভূমি দিতে অস্বীকার করা হেতু, সে নালিশ করাতে স্থির হইল যে,—

ইহা উইলক্রমে-দত্ত সম্পত্তি পাওয়ার জন্য নালিশ; এবং টাকার দাবী সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১১ প্রকরণ খাটে, এবং ঐ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রেই তাহার মাতা ঐ ৪০০০ টাকা ও ভূমি পাইতে স্বত্ববতী হইয়াছিল, অতএব বাদীর নালিশের হেতু তৎকালেই উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার এই নালিশ উচিত কাল মধ্যে না হওয়ায় বারিত হইয়াছে। ... ৩৫০

( ১২ ) যৌতুকের দাবী সম্বন্ধে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইন খাটে, কারণ, শরাতে যৌতুক ঋণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ... ... ৩১৭

( ১৩ ) তৎক্ষণাৎ দেয় যৌতুক সম্বন্ধে প্রিবি কৌন্সিল যে বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন যে, স্ত্রী পূর্ব্বে যৌতুকের দাবী না করিলেও নালিশ করিতে পারে, এবং সে তৎক্ষণাৎ অথবা তাহার স্বামীর জীবদ্দশায় নালিশ করিতে বাধ্য নহে, এই বিধি এমত স্ত্রীর মোকদ্দমায় খাটে না, যে স্ত্রী তাহার স্বামীর সহিত বহুকাল পৃথক্ থাকার পরে এবং পুনর্মিলিত হওয়ার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়ার পরে প্রকাশ্যরূপে তাহার যৌতুকের দাবী করে। যে স্ত্রী এই প্রকার দাবী করে, অপর ব্যক্তি লিখিত চুক্তি পরিচালন করিতে আইনমতে যে সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে বাধ্য, সেই স্ত্রীরও সেই সময়ের মধ্যেই তাহার নালিশ উপস্থিত করিতে হইবে। ... ... ... ৩৬৭

( ১৪ ) যে সকল অবস্থায় খাজানার বাকী হয়, তাহাতে যদি মাল আদালতের বিচারাধিকার না থাকে, তবে সেই বাকী খাজানার নালিশ দেওয়ানী আদালতে চলিতে পারে, এবং তাহাতে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের লিখিত তমাদী খাটে না ... ... ৩১৪

( ১৫ ) ডিক্রীর উপলক্ষে তাহার অতিরিক্ত যে ভূমি অন্যায়রূপে দখল করা হয় তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার নালিশের তমাদীর মিয়াদ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ১২ প্রকরণান্তর্গত। ... ... ৪৭১

দুঃ আইন—১৮৬৫ সালের ৮ (বাঃ কোঃ)
দুঃ নালিশের হেতু ( ৭ )
দুঃ প্রমাণ ( ৩ )
দুঃ ডিক্রীজারী ( ৮ ) ( ১৬ )
দুঃ নাবালগ ( ১ )
দুঃ পুনর্বিচার ( ২ )

ত্রুটি

যে স্থলে কালেক্টর দেখেন যে, তিনি যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, এজেণ্ট ( অর্থাৎ মোক্তার বা গোমাস্তা ) তাহার উচিত উত্তর দিতে পারে না, সে স্থলে তিনি মূল ব্যক্তির হাজির হওয়ার হুকুম দিলে, যদি সেই ব্যক্তি হাজির হইতে ত্রুটি করে, তবে মোকদ্দমা ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৫৮ ধারার অন্তর্গত হইবে, এবং এই

নালিশের হেতু পৃষ্ঠা।

পূর্ব্বের দাবীতে আর এক নালিশ উপস্থিত করে। এমত স্থলে, প্রথম নীলাম হইতে যে দাবী উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা একই নালিশের মধ্যে ভুক্ত করা উচিত ছিল, সুতরাং সেই একই নালিশের হেতুতে পশ্চাতে ক্ষতিপূরণের জন্য পৃথক নালিশ চলিতে পারে না। ১৯৪

(৭) প্রতিবাদীর প্রার্থনানুযায়ী অন্যায় নিষেধক হুকুম দ্বারা যখন বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখনই বাদীর নালিশের হেতু জন্মে, এবং যে পর্য্যন্ত সেই নিষেধক হুকুম জারী থাকে, সেই পর্য্যন্ত ঐ হেতুও বর্ত্তমান থাকে, এবং ঐ নিষেধ সমাপ্ত হইলেই তমাদীর কালের আরম্ভ হয়। ... ... ... ২৯৫

(৮) যে মোকদ্দমায় এক জন প্রতিবাদী ভিন্ন আর সমুদায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে সকল বাদীরই এক নালিশের হেতু থাকে, এবং কেবল এক জন বাদীর সেই এক জন প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অন্যান্য বাদীর নালিশের হেতু ভিন্ন অন্য নালিশের হেতু থাকে, তাহা হইলে ঐ দুই মোকদ্দমা একত্র করিয়া এক নালিশ হইতে পারে না। ... ... ৪০৯

দ্রঃ তমাদী (৯) (১০)
দ্রঃ শরা (৪)
দ্রঃ স্বত্ব অস্বীকার

## নির্ণায়ক ডিক্রী

উপযুক্ত ক্ষমতা-বিশিষ্ট কোন আদালত দেঃ কার্য্য-বিধির ১৫ ধারামতে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী ক্ষমতা পরিচালন করিয়া অর্দ্ধ-নির্ণায়ক ডিক্রী প্রদান করিবার পরে, যে আপত্তি দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না, এবং যাহা প্রথম আদালতের ডিক্রী প্রদত্ত হওয়ার কালে উত্থাপিত হয় নাই, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া আপীল-আদালত ঐ কার্য্য-বিধির ৩৫০ ধারামতে সেই ডিক্রী অন্যথা করিতে পারেন না। ... ... ... ... ১৭১

## নিষ্কপট কার্য্য

১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত কার্য্য সম্বন্ধে 'সরলান্তঃকরণ' শব্দে এই বুঝায় যে, যে কার্য্য করা হয় তাহা কেবল ঐ ধারানুযায়ী তমাদীর ফল এড়াইবার জন্য না করিয়া সেই সময়ে নিষ্কপটে ডিক্রীর ফললাভার্থে করা হইবে। ... ... ৩৫

## নীলাম পৃষ্ঠা।

(১) যে স্থলে মোকদ্দমার পক্ষগণ কর্ত্তৃক এই এক মাত্র প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, হিন্দু-বিধবা যে বিক্রয় করিয়াছে, তাহা ভাবী দায়াধিকারীর বিরুদ্ধে সিদ্ধ কি না, সে স্থলে ঐ প্রশ্ন অতিক্রম করিয়া, ঐ বিক্রয় বাস্তবিক হইয়াছিল কি না, তাহা আদালতের তদন্ত করা উচিত নহে। ... ... ... ... ১৬১

(২) কালেক্টর কর্ত্তৃক ডিক্রীজারীর নীলাম প্রতারণা দ্বারা হইয়াছে বলিয়া সপ্রমাণ হইলে দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক অন্যথা হইতে পারে; এমত স্থলে, যে ব্যক্তি বলে যে, প্রতারণা হইয়াছে, প্রমাণ-ভার তাহারই উপর বর্ত্তে। ... ১৭৯

(৩) কোন ডিক্রীজারীর নীলামের সময়ে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ অর্থাৎ তমাদীর দ্বারা বারিত হইলে ঐ নীলাম অকর্ম্মণ্য হয়। ... ২৬২

(৪) বাঙ্গালার কৌন্সিলের ১৮৬৫ সালের ৮ আইন মতে, বাকী খাজানার ডিক্রীজারীতে যদি কোন জমার নীলাম হয়, তবে তদ্দ্বারা নিজ জমাই বিক্রীত হয়, যে প্রজার নাম জমিদারের সেরেস্তায় রেজিষ্টরী-কৃত থাকে, কেবল তাহার স্বত্ব ও অধিকার বিক্রীত হয়, এমত নহে। ... ... .. ... ৪৪৪

(৫) কোন অধীন জমায় বিচারাদিষ্ট দায়ীর যে স্বত্ব ও লাভ থাকে, তাহা দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক টাকার ডিক্রীজারীতে নীলাম হইলে, তাহাতে প্রতারণার কোন সংস্রব না থাকিলে সেই নীলাম তাহার যোগ্যতা অনুসারে বলবৎ গণ্য; এবং ঐ জমার পূর্ব্ব দখীলকারের দেয় বাকী খাজানার জন্য ঐ দখীলকারের বিরুদ্ধ ডিক্রীজারীতে ঐ সম্পত্তি আর পুনরায় নীলাম হইতে পারে না। ... . ... ... ৪৬২

দ্রঃ হিন্দু শাস্ত্র (১) (২)
দ্রঃ বিচারাধিকার (২১) (২২)
দ্রঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বৃত্তি (১)

## নূতন বিচার

দ্রঃ নোটিস (১)

## ন্যূন মূল্য ধরণ

দ্রঃ বিচারাধিকার (২৭)

## নোটিস

(১) কোন ছোট আদালত ৬ই নবেম্বর তারিখে কোন মোকদ্দমার ডিক্রী দেন; ১২ই

নোটিস পৃষ্ঠা।

হইতে ১৫ ই পর্য্যন্ত রবিবার ও নির্দ্দিষ্ট পর্ব্ব উপলক্ষে আদালত বন্ধ থাকায় নূতন বিচারের দরখাস্তের নোটিস ১৬ ই তারিখে দাখিল করা হয়। এমত স্থলে, উক্ত নোটিস দেওয়ার জন্য আইনে যে ৭ দিনের মিয়াদ দেওয়া হইয়াছে তাহার শেষ তারিখে আদালত বন্ধ থাকায় তাহার পর প্রথম যে তারিখে আদালত খোলে, সেই তারিখে দরখাস্তকারী ঐ নোটিস দিতে পারে। ... ... ... ... ৯৮

(২) নোটিসজারী সপ্রমাণ না হওয়ার আপত্তি যদি প্রথম আদালতে উত্থিত না হয়, তবে তাহা খাস আপীলে, অথবা তৎপরে মোকদ্দমা নিম্ন আপীল-আদালতে পুনঃপ্রেরিত হইলে সেই আদালতেও উত্থিত হইতে পারে না। ৪৭৭

দ্রঃ আইন—১৮৫৯ সালের ৮ আইন (৯)

দ্রঃ হস্তান্তর

## প

### পত্তনী

কোন পত্তনী-পাট্টা অবৈধ ব্যক্ত করার স্বত্ব নির্ণয়ের ও খাস দখল পাওয়ার মোকদ্দমায়, বাদী, ভূত-পূর্ব্ব মালিকের বিধবা স্ত্রীর দত্তক-পুত্র স্বরূপে দাবী করে; ঐ পাট্টা ভূতপূর্ব্ব মালিকের মাতার দ্বারা প্রদত্ত হয়। এস্থলে, যদিও খাজানা লইয়া দাখিলা দেওয়া হইয়াছে, এবং দত্তক-গৃহীতা মাতা এবং দত্তক-পুত্র, পত্তনী বৈধ হইলে যে প্রকার মোকদ্দমা হইতে পারে, সেই প্রকার মোকদ্দমা করিয়াছে, তথাপি দত্তক-পুত্র ঐ স্বত্ব-নির্ণায়ক ডিক্রী পাইতে পারে, কারণ, সম্পত্তিতে যে ব্যক্তির কোন স্বার্থ ছিল না, তদ্দ্বারাই ঐ পাট্টা প্রদত্ত হইয়াছিল। ২৫৩

### পরওয়ানা

দ্রঃ ডিক্রীজারী (২)

### পয়বস্তী

ক্রমশঃ পয়বস্ত বা সিকস্তপয়বস্ত অথবা নদী বা সমুদ্র জজিরা স্বরূপে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে ভূমি উৎপন্ন হয়, তাহা আদৌ যে সময়ে পয়বস্ত বা উৎক্ষিপ্ত হইয়া সম্পত্তি স্বরূপে চাস ও দখলের যোগ্য হয়, সেই সময়ে তাহার

পয়বস্তী পৃষ্ঠা।

কি অবস্থা ছিল, তাহার তদন্ত করিয়া ঐ ভূমিতে দখলের স্বত্ব নির্ণয় করিতে হইবে। যদি তাহা নৌকা বা জাহাজ গমনাগমনের যোগ্য নদীতে এক দ্বীপ স্বরূপে সম্পত্তিতে পরিণত হয়, তবে পশ্চাতে তাহার এবং ঐ নদীর তটের মধ্যস্থিত সোতা শুষ্ক হইলেও, ঐ দ্বীপাকারে থাকার কালে যে ব্যক্তি তাহাতে স্বত্ব ও দখল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার স্বত্ব নষ্ট হইতে পারে না। তাহার স্বত্ব সঙ্গত, এবং গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত আর যাবতীয় লোকের বিরুদ্ধেই সেই স্বত্ব প্রবল গণ্য। ... ... ৩৬১

### পাট্টা

(১) যদি কোন পাট্টা-দাতা তাহার পাট্টা-গৃহীতাকে দর-পাট্টা দিতে ক্ষমতা দেয়, তবে দর-পাট্টা-গৃহীতা উপরোক্ত পাট্টা-দাতা ও পাট্টা-গৃহীতার বিরুদ্ধে যে স্বত্ব পায় তাহা তাহার নিজের সম্মতি ভিন্ন বিলুপ্ত হইতে পারে না। পাট্টা-গৃহীতা তাহার জমা ইস্তাফা করিলেও দর-পাট্টা-গৃহীতার স্বত্বের হানি হইতে পারে না। ... ... ২৭২

(২) দখলের স্বত্বাধিকারী প্রজার মোকররী পাট্টা দিবার স্বত্ব আছে; কিন্তু সে তৃতীয় ব্যক্তিকে যে পাট্টা দেয় তাহার সর্ত্ত কেবল তাহার ও ঐ তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যেই বাধ্যকর হয়। ভূম্যধিকারীর স্বত্বের কোন ব্যাঘাত হয় না; এবং ভূম্যধিকারী আইনের আদেশ ব্যতীত প্রজার পাট্টা-গৃহীতাকে বেদখল করিলে অনধিকার-প্রবেশের অপরাধী হন। ... ২৮২

(৩) যদি এমন সর্ত্তে এক পাট্টা দেওয়া হয় যে, পাট্টা-দাতা পাট্টা-গৃহীতার নিকট যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছে, তাহা পরিশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত পাট্টা-গৃহীতা ভূমিতে দখীলকার থাকিবে, তবে পাট্টা-দাতা বন্ধক-দাতার অবস্থাস্থিত হয়, এবং যত টাকার প্রতিভূ দেওয়া হয়, পাট্টা-গৃহীতা তাহার পরিমাণে বন্ধক-গৃহীতা হয়; কিন্তু পাট্টা-গৃহীতা সেই সম্পত্তি সাধারণ বন্ধকী সম্পত্তির ন্যায় বিক্রয় করিয়া লইতে পারে না। ৪৫৬

(৪) এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টার মূল্য সম্বন্ধে এক সর্ত্ত আছে বলিয়া, এবং পাট্টা-দাতা কতক টাকা দিলে পাট্টার মিয়াদ ন্যূন হইতে পারে বলিয়াই তাহা পাট্টা নহে, এমন বলা যাইতে পারে না। এই

প্রমাণ পৃষ্ঠা।

(৭) যে স্থলে আপীল-আদালত পক্ষগণের অথবা তাহাদের মোক্তারের সমক্ষে নূতন সাক্ষ্য লন, সে স্থলে তিনি যে কারণে তাহা লন, তাহা লিপিবদ্ধ করেন নাই বলিয়াই আপীলে ঐ প্রমাণ অগ্রাহ্য হইতে পারে না; কিন্তু বিচারকগণের ঐ রূপ সাক্ষ্য লওয়ার হেতু সর্ব্বদাই লিপিবদ্ধ করা উচিত এবং উপকারজনক। ... ... ... ... ২৯৩

(৮) যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ রেজিষ্টরী না হওয়াতে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে, তল্লিখিত কোন চুক্তিও প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে। ... ২৯৮

(৯) যদি এমন কথিত হয় যে, বাদী তঞ্চকতা পূর্ব্বক প্রতিবাদী হইতে কোন বিক্রয়-কবালা হস্তগত করিয়াছে, তবে বাদী নিম্ন আপীল-আদালতে উপস্থিত থাকিলে ঐ আদালত তাহার সাক্ষ্য আবশ্যকীয় বোধ করিলে আপন ইচ্ছামতে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। ঐ সাক্ষ্য গ্রহণের হেতু স্বরূপে আদালত যদি এই লেখেন যে, তাহা সদ্বিচারার্থে আবশ্যক, তাহা হইলেই আইনের আদেশ প্রতিপালিত হয়। ... ৩১৯

দ্রঃ চিঠা
দ্রঃ অংশ
দ্রঃ সাক্ষী

প্রমাণ-ভার

(১) কোন হিন্দু-পরিবার পঞ্জাব হইতে যে সময়ে বঙ্গদেশে আইসে, তখন তাহারা বঙ্গদেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্র মতে চলিত না, এবং আপন পুরোহিত সঙ্গে লইয়া আইসে; কিন্তু কথিত হয় যে, তাহারা এক্ষণে বঙ্গদেশীয় ব্যবহার-শাস্ত্রের অধীন; এমত স্থলে, যে ব্যক্তি উক্ত কথা কহে উহার প্রমাণ-ভার তাহারই উপর বর্ত্তে। ... ... ... ৪১

(২) যে স্থলে বাদী কোন সময়ে বল-পূর্ব্বক বেদখল হইবার কথা বলে, তাহাতে প্রতিবাদীকে কোন প্রমাণ দিতে বলিবার পূর্ব্বে বাদীকেই উক্ত বেদখল হইবার বিষয় সপ্রমাণ করিতে হইবে। ... ... ... ১০৭

(৩) দায়াধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তির দখলের নালিশে আদালত যদি অন্য এক ব্যক্তিকে সেই সম্পত্তিতে স্বার্থ-বিশিষ্ট অনুমান করিয়া প্রতিবাদী করেন, এবং মোকদ্দমায় জওয়াব দেওয়ার জন্য তাহার প্রতি আদেশ হইলে

প্রমাণ-ভার পৃষ্ঠা।

সে, যদি তাহার দাবী বর্ণনা করে, তবে বাদী যে স্থলে ঐ অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে সম্পত্তি লইতে চাহে, সে স্থলে বাদীর উপরেই আপন স্বত্বের প্রমাণ-ভার অর্শে। ... ... ১৯১

(৪) সরকারী বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতার বিরুদ্ধে লাখেরাজের স্বত্বনির্ণায়ক ডিক্রী পাওয়ার ও দখল স্থির রাখার নালিশে বাদীর ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে ঐ ভূমি নিষ্কর ভোগ হইয়া আসিয়াছে। ... ... ২৩২

(৫) বাদী আপন দখল স্থির রাখার ও নাম জারী করার জন্য এই বলিয়া নালিশ করে যে, তাহার খাজানা আদায়ে বাধা দিয়া প্রতিবাদী তাহার দখলের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে; তাহাতে এক তৃতীয় পক্ষ এই বলিয়া মোজাহেম দেয় যে, বিরোধীয় সম্পত্তি তাহারই দখলে আছে, এবং বাদী যাহাদের সূত্রে দাবী করে, তাহাদের ঐ সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব বা স্বার্থ ছিল না। এ স্থলে, ঐ তৃতীয় পক্ষকে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৭৩ ধারা মতে প্রতিবাদি-শ্রেণী-ভুক্ত করা অসঙ্গত নহে; এবং ঐ ব্যক্তিকে ঐ রূপে প্রতিবাদী করা হেতু, বাদীর প্রমাণ-ভার ঐ ব্যক্তির উপর নিক্ষিপ্ত হয় না; কারণ, বাদী আপন নালিশ সপ্রমাণ করিতে বাধ্য। ... ৩৫৪

(৬) সোফার স্বত্ব সাব্যস্ত করার মোকদ্দমায় বাদী বলে যে, প্রতিবাদিগণের অর্থাৎ বিক্রেতা এবং ক্রেতার মধ্যে যে বিক্রয়-কবালা লিখিত-পড়িত হইয়াছে, তাহাতে যে মূল্য লেখা আছে, তাহা প্রকৃত মূল্য নহে। এই কথা সপ্রমাণ করার জন্য বাদীরই কিছু প্রমাণ দর্শান উচিত। ... ... ৪৪৭

## ফ

ফসল

যদিও ভূমিতে সংলগ্ন ফসল রেজিষ্টরী আইনের অভিপ্রায় সাধনার্থে অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তথাপি তাহা স্থাবর সম্পত্তির শ্রেণীভুক্ত। ২৬৪

বন্ধক

দ্রঃ কট

বিচারাধিকার  পৃষ্ঠা।

অংশের টাকা গ্রহণ করে। বাদিনী প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে স্বীয় অংশের টাকার দাবীতে নালিশ করাতে প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, উক্ত টাকা বাদিনীকে দেওয়া হইয়াছে। এমত স্থলে, প্রতিবাদী যদি বাদিনীর প্রতিনিধি স্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকে, তবে তাহাদের মধ্যে এই চুক্তি থাকিবার কথা অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, প্রতিবাদী বাদিনীর প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া তাহাকে তাহা নগদ দিবে বা তাহার নিকাশ দিবে ; সুতরাং এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন। ... ... ৯৫

( ৯ ) যে অধঃস্থ জজের নিকট এই মোকদ্দমার আপীল হয়, তিনিই ছোট আদালতের জজ ছিলেন, এ জন্য প্রধানতম বিচারালয়ে এ বিষয়ে এস্তমেজাজ না করিয়াই তিনি তাহার বিচার করিতে পারেন। ... ... ৯৫

( ১০ ) কোন এক খাতার লিখিত হিসাব অনুসারে দেনা টাকার দাবীতে ছোট আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায়, তাহাতে উপযুক্ত ষ্টাম্প নাই বলিয়া, তাহা প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণের প্রতি প্রতিবাদী আপত্তি করে। স্থির হইল যে, তাহা যে, ষ্টাম্প কাগজে লেখা হয় না ইহা ষ্টাম্পের মূল্য এড়াইবার অভিসন্ধিতে হয় কি না, এ প্রশ্ন জজই ১৮৬২ সালের ১০ আইনের ১৫ এবং ১৭ ধারা অনুসারে তাঁহার সমীপস্থ বৃত্তান্ত দৃষ্টে মীমাংসা করিতে সক্ষম ; এবং এরূপ স্থলে প্রধান তম বিচারালয়ে জিজ্ঞাস্য কোন প্রশ্ন উপস্থিত নাই। ... ... ৮৯

( ১১ ) কোন প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ইট লইয়া যাওয়ায় তার ক্ষতিপূরণের দাবীর নালিশে প্রতিবাদী আপত্তি করে যে, সে তাহা সরলান্তঃকরণে মূল্য দিয়া বাদীর পূর্ব্বাধিকারীর নিকট হইতে ক্রয় করে ; বাদী প্রত্যুত্তরে বলে যে, হিন্দু-বিধবা তাহা বিধিমত প্রয়োজনাভাবে বিক্রয় করায় উক্ত বিক্রয় অসিদ্ধ, এ মোকদ্দমা ছোট আদালতের বিচারাধীন। ... ... ... ৯৭

( ১২ ) কোন অপ্রাপ্ত-ব্যবহার বালিকার শরীরের জেম্মাদারী সম্বন্ধীয় দাবী সমস্ত জেলার আদ্য বিচারাধিকার-বিশিষ্ট প্রধান দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত করিতে হইবে ; কেবল ঐ আদালতেরই ঐ দাবীর দরখাস্ত গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করিবার অধিকার আছে। ... ১০৫

( ১৩ ) মোকদ্দমা চলিবার সময়ে ঐ বালিকা কাহার জেম্মায় থাকিবে তদ্বিষয়ে জেলার জজ

বিচারাধিকার

তৎক্ষণাৎ যথোচিত হুকুম দিতে পারেন, এবং তৎপরে, অবশেষে সে কাহার জেম্মায় থাকিবে তাহার বিহিত আদেশ করিতে পারেন। ১০৫

( ১৪ ) কেবল শারীরিক ক্ষতির জন্য খেসারতের যে নালিশ হয়, তাহাতে ছোট আদালতের বিচারাধিকার নাই। ... ... ১১২

( ১৫ ) কোচবেহারের দেওয়ানী আহেলকারের আদালত বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্গত আদালত নহে, সুতরাং ঐ আদালতের ডিক্রীজারী করিতে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৮৪ ধারা মতে বৃটিশ রাজ্যান্তর্গত কোন মুন্সেফ-আদালতের ক্ষমতা নাই। ... ... ... ১৪৪

( ১৬ ) কালেকটরের রেজিষ্টরী বহীতে কি রূপে কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীর ফল লিখিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে জেলার জজের কালেক্টরের প্রতি কোন হুকুম দিবার অধিকার নাই। ... ... ... ... ১৫৪

( ১৭ ) যে জজ মোকদ্দমার রায় দেন, তাঁহার কর্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দী এবং প্রমাণ গৃহীত না হইয়া থাকিলে, এই দোষ উভয় পক্ষের সম্মতি দ্বারা সংশোধিত হইতে পারে। ১৭৬

( ১৮ ) খাজানার এক ডিক্রী জারী করার জন্য ডেপুটি কালেকটরের নিকট দরখাস্ত হওয়াতে বিচারাদিষ্ট দায়ী তাহার জমার নীলাম নিবারণের জন্য ঐ আদালতে টাকা দাখিল করে, এবং ডিক্রীদার তাহা বাহির করিয়া লয়। যখন দেওয়ানী আদালতে এই বিষয়ের মোকদ্দমা হইতেছিল যে, ঐ ডিক্রীজারী তমাদীর দ্বারা বারিত কি না, তখন ঐ টাকা দেওয়া লওয়া হয়। দেওয়ানী আদালতের চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে ঐ ডিক্রী বারিত বলিয়া স্থির হয়। এ স্থলে, বিচারাদিষ্ট দায়ীর ঐ টাকা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য দেওয়ানী আদালতে নালিশ করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। ... ... ২১৭

( ১৯ ) জজ যদি কোন একতরফা হুকুম দেন, তবে যে সকল ঘটনায় ঐ প্রকার হুকুম দিতে তাঁহার স্পষ্ট ক্ষমতা আছে তাহা ভিন্ন অন্য ঘটনায়, যে ব্যক্তির অসাক্ষাতে ঐ হুকুম হইয়া থাকে সে তাহা রহিত করার জন্য দরখাস্ত করিতে পারে, এবং জজ যদি দেখেন যে, ঐ হুকুম অন্যায় হইয়াছিল, তবে তিনি উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শ্রবণ করিয়া সেই হুকুম উঠাইয়া লইতে পারেন ২১৮

( ২০ ) ১৮৭১ সালের ২১ আইনের ২৭

## য

### যৌত দেনা

নালিশ করিলে তাহারা জওয়াব দেয় যে, ডিক্রী জারীর কোন কার্য্য প্রকৃতপ্রস্তাবে না হওয়াতে ঐ টাকা পরিশোধ করার কালে ডিক্রী বাতিল হইয়াছিল। এ স্থলে, প্রতিবাদিগণ যে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে তাহা ডিক্রীজারীতে অবশ্যই পর্য্যালোচিত হইয়াছিল, এবং আদালত যে, ন্যায্য রূপেই ডিক্রীজারীর হুকুম দিয়াছেন তাহা অবশ্য অনুমান করিয়া লইতে হইবে ; অতএব যে স্থলে বাদী যৌত দেনা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে স্থলে সে আপন দেয় অংশের অতিরিক্ত টাকা ফেরৎ পাইতে পারে। ... ... ২৮৯

### যৌত হিন্দুপরিবার

একজমালী হিন্দুপরিবারের কর্ত্তা তাঁহার আপন নামে, কিন্তু সেই একজমালী পরিবারের জন্য ১৮৪৫ সালের ১ আইনের অন্তর্গত বাকী রাজস্বের নীলামে যে ক্রয় করেন, তাহাতে ঐ আইনের ২১ ধারা খাটে না, এবং ঐ ধারার বিরুদ্ধ যে বিধানই থাকুক, কেবল ঐ কর্ত্তার নাম বয়নামায় ক্রেতা বলিয়া লেখা থাকিলেও ঐ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তি ঐ ক্রয়ের দ্বারা তাহাদের প্রাপ্ত স্বত্ব পরিচালনার্থে ঐ কর্ত্তার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে। ... ... ৩৪০

### যৌতুক

দ্রঃ তমাদী ( ১২ ) ( ১৩ )

দ্রঃ শরা ( ১ ) ( ৪ )

## র

### রাজকীয় সনন্দ

( ১ ) হাইকোর্টের পূর্ণাধিবেশনের বিচারপতিগণের মধ্যে পরস্পর মতভেদ হইলে, রাজকীয় সনন্দের ১৫ দফা মতে হাইকোর্টে আপীল করিতে লোকের যে স্বত্ব আছে, তাহা কেবল আপীলের চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে মতভেদ হইলেই পরিচালিত হইতে পারে ; কিন্তু আপীলে উত্থাপিত প্রসঙ্গ সমস্তের মধ্যে দুই এক কথায় মতভেদ হইলে সেই স্বত্বের উদ্ভব হয় না। ... ... ৬০৩

( ২ ) কোন মাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পাওয়ার পরে তাহাকে দেওয়ানী আদালতের হুকুম অনুসারে গেপ্তার করাতে মাজিষ্ট্রেট হস্তক্ষেপ না করায়, প্রধানতম বিচারালয় তাহাতে সনন্দের ১৫ ধারা-প্রদত্ত

### রাজকীয় সনন্দ পৃষ্ঠা।

ক্ষমতা অনুসারে হস্তক্ষেপ করিতে অস্বীকার করেন। ... ... ... ৩২৫

দ্রঃ বিচারাধিকার ( ৬ ) ( ৪৫ )

দ্রঃ খাস আপীল ( ১ )

### রিসিবর

দেঃ কার্য্য-বিধির ৯২ ধারায় দেওয়ানী আদালতকে মোকদ্দমা চলিবার সময়ে নিষেধক হুকুম দিবার এবং রিসিবর নিযুক্ত করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা, যে সম্পত্তি মোকদ্দমা চলিবার সময়ে বর্ত্তমান অবস্থায় রাখা আবশ্যক হয়, কিন্তু তাহা নষ্ট, অপচিত বা আদালতের অধিকারের বহির্ভূত হইবার আশঙ্কা থাকে, কেবল তৎসম্বন্ধেই পরিচালন করিতে হইবে। ৫৪

### রেজিষ্টরী

( ১ ) প্রিবি কৌনসিলে আপীল করিবার অপেক্ষায় দুই মাসের মধ্যে জামিন দেওয়ার জন্য দায়ীকে হাইকোর্ট আদেশ করায় সে ঐ মিয়াদের শেষ দিবসে জেলার আদালতে দরখাস্ত করিয়া এক দর-পত্তনী মহাল জামিন দিতে চাহে, এবং তাহার পর দিবস রেজিষ্টরী-শূন্য জামিননামা লিখিয়া দেয় ; কিন্তু ঐ আদালত ঐ জামিন অগ্রাহ্য করেন। এ স্থলে, ঐ জামিন আদালত কর্ত্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত দায়ী ঐ জামিননামা রেজিষ্টরী করিতে বাধ্য ছিল না, এবং যে সম্পত্তি জামিন দেওয়া হয়, তাহা উত্তম এবং যথেষ্ট কি না, তাহার তদন্ত করিতে ঐ আদালতের আদেশ করা উচিত ছিল। ... ... ... ... ৩৬

( ২ ) ছোট নাগপুর প্রদেশে কোন মহালের মালিক স্বরূপে কোন ব্যক্তির নাম রেজিষ্টরী করিতে কালেকটরকে বাধ্য করা যাইতে পারে না। ... ... ... ... ৪০১

( ৩ ) রেজিষ্টরী সম্বন্ধীয় ১৮৪৩ সালের ১৯ আইন জারী থাকার কালে যদি কোন বিক্রয়কবালা লিখিত-পড়িত হইয়া রেজিষ্টরীকৃত না হয়, এবং যাহার বরাবর তাহা লেখা হয় তাহাকে তল্লিখিত স্বত্ব প্রদানার্থে তাহা যদি বৈধ দলীল হয়, তবে তাহা ১৮৬৪ সালের অথবা ১৮৬৬ সালের রেজিষ্টরী আইন প্রচলিত হওয়ার পরে ১ বৎসরের মধ্যে রেজিষ্টরী করান হয় নাই বলিয়াই অবৈধ বা অসিদ্ধ হইতে পারে না ; অথবা ঐ দুই আইন মতে পশ্চাতে অন্য কোন কবালা লিখিত ও রেজিষ্টরীকৃত হইয়াছে বলিয়া

**রেজিষ্টরী** পৃষ্ঠা।

এই রেজিষ্টরীকৃত কবালা-গৃহীতার স্বত্ব অগ্রগণ্য হইতে পারে না। ... ... ... ৪৫৭

দ্রঃ পাট্টা ( ৪ )

## ল

**লাখেরাজ**

কোন ভূমি গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব হইতে মুক্ত করিতে হইলে এই দেখান আবশ্যক যে, তাহা স্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ে লাখেরাজ স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল ; কেবল ১২ বৎসর নিষ্কর ভোগ দর্শাইলেই হইবে না। ... ... ১১৮

**শরা**

( ১ ) শরা অনুসারে, স্ত্রীর যৌতুকের পরিবর্ত্তে টাকা দিবার সাধারণ চুক্তি থাকিলে. সেই চুক্তির সঙ্গে যদি কোন নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি প্রতিভূ রাখিবার কথা না থাকে, তাহা হইলেও যে, স্বামীর ভূসম্পত্তির উপরে স্ত্রীর দখলের দাবী অবশ্যই থাকিবে, এমত নহে। যদি স্বামীর মৃত্যুর পর দায়াধিকারিগণ স্ত্রীকে যৌতুকের টাকার পরিবর্ত্তে স্বামীর কোন সম্পত্তি দখল করিতে দেয়, তবে দায়াধিকারিগণের বিরুদ্ধে তাহার ঐ সম্পত্তির উপর বিধিমত দাবী হইবে। ... ... ... ... ৪৭

( ২ ) শরা অনুসারে, জারজ পুত্র পিতার পরিবারের সহিত সম্পর্কের দাবী করিতে পারে না। ... ... ... ... ২৫১

( ৩ ) শরা অনুসারে, মাজ্জাল অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ দেয় যৌতুক না দিলে স্বামী বিবাহের ফল সম্পূর্ণ করিতে মুক্তবান হইতে পারেন না। ... ... ... ... ৩১৭

( ৪ ) কোন স্ত্রীর যৌতুকের জন্য তাহার স্বামীর নামে পাপর সূত্রে নালিশ করার অনুমতি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত শুদ্ধ নোটিস বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে ; তাহা প্রকাশ্য কাছারীতে স্পষ্ট দাবী করার ন্যায় বিবেচনা করিতে হইবে, এবং স্বামী তৎকালে ঐ দাবী পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিলে তাহাই স্ত্রীর নালিশের হেতু বিবেচনা করিতে হইবে, এবং সেই অস্বীকারের তারিখ হইতে ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১ ধারার ৯ প্রকরণ মতে তমাদীর কাল গণিত হইবে। ... ... ... ৩১৭

দ্রঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানের বৃত্তি

**শরীক** পৃষ্ঠা।

কোন প্রজা সকল শরীকের নিকট হইতে স্বত্ব পাইয়া যে ভূমি ভোগ করে, এক শরীক তাহার আর সকল শরীকের সম্মতি ব্যতীত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। ... ৩৩১

## ষ

**ষ্টাম্প**

( ১ ) বিলাত-আপীলের জামিন নামা ৷৷০ আনার এক ষ্টাম্পে লিখিয়া উচিত মূল্যের ষ্টাম্প তাহার সহিত গাঁথিয়া দেওয়ায় তাহা যদি আদালতের নিয়ম-বহির্ভূত কার্য্য বলিয়া যে আপত্তি হয়, তাহা পারিভাষিক আপত্তি মাত্র ; তাহাতে মোকদ্দমার দোষগুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না। ... ... ... ৩৬

( ২ ) যখন কোন আরজী কোন মুন্সেফের আদালতে দাখিল হয়, এবং তাহার পরে ( প্রথম আদালতে বা নিম্ন আপীল-আদালতে অথবা হাইকোর্টেই হউক ) যদি দেখা যায় যে, মোকদ্দমার মূল্য মুন্সেফের বিচারাধিকার বহিভূত, তাহা হইলে, বাদী ঐ আরজীতে যে ষ্টাম্প দিয়াছে তাহা সে হারাইবে না ; অতিরিক্ত ষ্টাম্প বসাইয়া উচিত মূল্যের আরজী দাখিল করার জন্য তাহাকে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। ৫৫৩

দ্রঃ চুক্তি ( ২ )

দ্রঃ বিচারাধিকার ( ১০ )

## স

**সওয়াল-জওয়াব**

দ্রঃ বিচারাধিকার ( ৪৮ )

**সার্টিফিকেট**

( ১ ) যে স্থলে ১৮৬০ সালের ২৭ আইনের অন্তর্গত সার্টিফিকেট প্রদত্ত হইবার পরে এক ব্যক্তি আপনাকে প্রকৃত দায়াধিকারী বলিয়া এই দরখাস্ত করে যে, অপর ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া সার্টিফিকেট লইয়াছে, সে স্থলে জজের উচিত যে, দাবীদার যে দায়াধিকারী হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তি, ইহা সপ্রমাণ করার জন্য তিনি প্রতিপক্ষকে আদেশ করেন। ... ৩৫১

( ২ ) কোন ব্যক্তি আপন কোম্পানির কাগজের সুদ লওয়ার জন্য উইলে অপর এক ব্যক্তিকে ট্রষ্টি নিযুক্ত করিয়া যাওয়ার পর উক্ত ট্রষ্টির মৃত্যু হওয়ায় এবং নাবালগ দায়াদ

সার্টিফিকেট পৃষ্ঠা।

বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ায়, যাহারা ঐ সুদ হইতে স্বত্ববান, তাহারা তাহা লইবার জন্য ১৮৬০ সালের ২৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় দরখাস্ত করে। তাহাতে জজ এই হুকুম দেন যে, তাহারা উক্ত মৃত ট্রুষ্টির সম্পত্তি সম্বন্ধে সার্টিফিকেটের প্রার্থনা করিতে পারে। এ স্থলে দরখাস্তকারিগণের উক্ত ট্রুষ্টির সম্পত্তির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। অপর কোন ব্যক্তি ইহাদের অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট স্বত্ব দেখাইতে না পারিলে, ইহাদের দরখাস্তমতেই জজের সার্টিফিকেট দেওয়া উচিত। ... ... ৩১৫

(৩) কোন হিন্দু তাহার পরিবারের অন্য ব্যক্তির সহিত পৃথক্ থাকিলে, তাহার মৃত্যুর পরে তাহার প্রাপ্য আদায়ের জন্য তাহার বিধবা স্ত্রী সার্টিফিকেট পাইতে পারে। ... ৪৮৭

দঃ আইন—১৮৫৮ সালের ৪০ আইন (২) (৫)

সালিশের ফয়সলা

সালিশের ফয়সলা বৈধ হওয়ার জন্য কি কি নিয়ম পালন করিতে হইবে। ... ৫৭

সাক্ষী

(১) বাদী বা প্রতিবাদী আপন মোকদ্দমা সপ্রমাণার্থে যে সাক্ষী আবশ্যকীয় বিবেচনা করে, তাহাকে আদালতে উপস্থিত করা ও তাহার জবানবন্দী হইল কি না, তাহা দেখা ঐ বাদী বা প্রতিবাদীরই কর্ত্তব্য। এ রূপ সাক্ষী উপস্থিত আছে বলিয়া নাজীর রিপোর্ট দিলেও বাদী বা প্রতিবাদীর ঐ রূপ দেখা উচিত। ... ১৭৯

(২) প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে যে এক ফৌজদারী অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহাতে কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়; দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রতিবাদী সেই সাক্ষ্য দাখিল করাতে, তাহা ফৌজদারী মোকদ্দমায় অবিশ্বাস্য হইয়াছে বলিয়াই আদালত তাহা অগ্রাহ্য করায়, স্থির হইলে যে, এই কার্য্য অন্যায় হইয়াছে। ... ... ... ... ২১০

সুদ

(১) যদি বাদী খরচার এবং খরচার সুদের ডিক্রী পায় এবং প্রতিবাদীও খরচা বাবতে কিছু পাওয়ার হুকুম পায়, তবে বাদীর পাওয়ানা হইতে প্রতিবাদীর প্রাপ্য বাদ দিয়া যাহা বাকী থাকে তাহার উপরে বাদীর প্রাপ্য সুদ গণনা করিতে হইবে। ... ... ১২৮

সুদ পৃষ্ঠা।

(২) যদি কোন পত্তনী তালুকের নীলামের ক্রয়-মূল্য কালেক্টরীতে আমানত থাকে এবং জমিনদার-দায়ী উক্ত বিচারাদিষ্ট উক্তমর্ণের প্রাপ্য আদায়ে সাহায্য না করে, তবে সে উক্ত সমুদায় টাকার সুদের জন্য দায়ী হয়। ১৫২

সোফা

(১) যাহারা সম্পত্তি এজমালীতে ভোগ করে কেবল তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধেই যে, 'শরীক' শব্দ প্রয়োগ হয়, এমত নহে। এক বাসস্থানের মধ্যে যাহারা পৃথক্ পৃথক্ গৃহ দখল করে এবং উহার কোন গৃহের যে অংশীর আপন অংশ বিক্রয়ের দ্বারা সোফার স্বত্বের উৎপত্তি হয়, ইহারা শরার মর্ম্মানুসারে পরস্পর শরীক গণ্য। ... ১১৯

(২) সফী-খলীত অর্থাৎ পথ ও জলের স্বত্বের শরীক অপেক্ষা বিক্রীত মূল সম্পত্তির শরীক অগ্রগণ্য; এবং যে মোকদ্দমায় বাদী শরীক স্বরূপে নালিশ করে, তাহাতে নিম্ন আদালতের এই ইসু উত্থাপন করা উচিত নহে যে, সে সফী-খলীত স্বরূপে দাবী করে কি না। ...১৮১

(৩) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সমাধা হইলেই সোফার স্বত্ব উৎপন্ন হয়, এবং উক্ত চুক্তি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে পরে ভঙ্গ হইলেও ঐ সোফার স্বত্বের ব্যতিক্রম হয় না, বা সেই স্বত্ব রহিত হয় না ... ... ... ... ৩২৪

(৪) হিন্দুরা আপনাদের মধ্যে মুসলমান-ব্যবহার-শাস্ত্রের উক্ত সোফার বিধান অবলম্বন করিলে, মুসলমানেরাও ঐ হিন্দুর বিরুদ্ধে উক্ত স্বত্ব পরিচালন করিতে পারে। ... ৩২৪

দঃ কষ্ট (২)
দঃ প্রমাণ-ভার (৬)

স্থানান্তর

যদি কোন তালুক এক কালেক্টরী হইতে অন্য কালেক্টরীতে খারিজ হইয়া যায়, এবং তালুকদার তাহার নোটিস পাইয়াও তাহার রাজস্ব পূর্ব্ব কালেক্টরীতে দেয়, তবে তাহা ঐ রাজস্ব আদায় স্বরূপে গণ্য হইতে পারে না। কিন্তু সে যদি নোটিস পাওয়ার পূর্ব্বে ঐ রূপ দেয় এবং তাহার রসিদ পায়, তবে আদায় গণ্য হইতে পারে। ... ... ... ... ... ৩৩০

স্থানীয় তদন্ত

দঃ ওয়াশীলাৎ (৪)

**স্বকার্য্য-জনিত বাধা**

দৃঃ স্বীকার
দৃঃ পূর্ব্বনিষ্পত্তি-জনিত বাধা (১)

**স্বত্ব**

(১) যে ভূমির মধ্য দিয়া কোন নদী প্রবাহিত হয় তাহাতে যে ব্যক্তির স্বত্ব থাকে সে ঐ নদীর তটের মালিক স্বরূপ তাহার জল ব্যবহার করিবার যে স্বত্ব ভোগ করে তাহা ঐ ভূমির স্বত্বের স্বভাবতঃ আনুষঙ্গিক স্বত্ব, পূর্ব্ব-পরম্পরাগত ব্যবহার-জনিত স্বত্ব নহে। ... ... ৪৫

(২) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সরবরাহ এবং বণ্টনের জন্য তাহার কোন দায়াদ নালিশ করিয়া মৃত ব্যক্তির সমুদায় অস্থাবর সম্পত্তির নিকাশ চাহিতে পারে, এবং যে ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি অন্যায় রূপে আত্মসাৎ করে তাহার হস্তে ঐ দায়াদ সেই সম্পত্তি ধৃত করিতে পারে। আর এক জন দায়াদ ১৮৬০ সালের ২৭ আইনানুযায়ী সার্টিফিকেট পাইয়াছে বলিয়াই, ঐ স্বত্ব বিলুপ্ত হইতে পারে না। ... ... ৪৫৩

দৃঃ পয়বস্ত
দৃঃ জল ব্যবহার
দৃঃ দাবী
দৃঃ অনাবশ্যনীয় মত প্রকাশ

**স্বত্ব অস্বীকার**

ভূম্যধিকারী তাহার কোন প্রজার স্বত্ব অস্বীকার করিলে, যতবারই অস্বীকার করা হউক, তাহাতে কেবল একটি নালিশের হেতু জন্মে। ... ... ৬০

**স্বীকার**

যদি কোন বিক্রেতা আপন বিক্রয়-পত্রে লেখে যে, সে কোন ভূমি সম্পত্তির অর্দ্ধাংশের মালিক এবং বাকী অর্দ্ধাংশ অপর এক ব্যক্তির সম্পত্তি, তবে তাহাই, ঐ বিক্রেতার সেই বাকী অর্দ্ধাংশের মালিক হওয়ার প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রমাণ গণ্য হইবে না, এবং ঐ বিক্রেতার নিকট যাহারা সেই বাকী অর্দ্ধাংশ ক্রয় করে, তাহাদেরও স্বত্বের হানি হইবে না। ... .. ১

**হস্তান্তর**

(১) মাজিষ্ট্রেট যে টাকা ক্রোক করেন তাহার দাবীর নালিশে প্রতিবাদী বলে যে, সে বাণিজ্যে খাটাইবার জন্য উক্ত টাকা লইতে চাহে; নচেৎ তাহার হানি হইবে। এমত স্থলে, প্রতিবাদীর

হস্তান্তর পৃষ্ঠা।

উক্ত স্বীকার দ্বারাই স্পষ্ট প্রকাশ যে, উক্ত টাকা দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৯২ ধারার মর্ম্মানুসারে হস্তান্তরিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; সুতরাং সে তাহা ঐ ক্রোক হইতে খালাস করিয়া লইতে পারে না। ... ... ৮৪

(২) ক্রোক জারী থাকার কালে ক্রোকাবদ্ধ সম্পত্তির যদি প্রকৃত ঘরাও বিক্রয় হয়, তবে পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোকের সম্বন্ধেই ঐ বিক্রয় অকর্ম্মণ্য, এমত নহে; কেবল ঐ ক্রোককারী উত্তমর্ণ বা যাহারা তাহার সূত্রে দাবী করে, তাহাদের সম্বন্ধেই তাহা অকর্ম্মণ্য। ... ১২২

(৩) যদি কোন দলীলের এমন অর্থ হয় যে, তদ্দ্বারা সম্পত্তি পুত্রের বিধবা স্ত্রীকে এককালে দান করা হইয়াছে, এবং দান-গৃহীতা যদি তাহা দখল করিয়া থাকে, তবে হস্তান্তর করার নিষেধ না থাকায়, হিন্দুশাস্ত্রের কোন ব্যবস্থা বা কোন প্রথা দ্বারা ঐ বিধবা তাহা হস্তান্তর করণে নিবারিত নহে। ... ... ... ২৭৫

**হাইকোর্ট**

(১) হাইকোর্টের এডবোকেটগণ উহার আপীল-বিভাগে কেবল উপস্থিত হইয়া তর্কবিতর্ক করিতে পারেন, রেজিষ্ট্রারের আফিসে কোন দরখাস্ত দাখিল করিতে পারেন না; তাহা উকীলের ক্ষমতাধীন কার্য্য। ... ... ... ৫৫

(২) হাইকোর্টে আপীলের নিষ্পত্তি পর্য্যন্ত নিম্ন আদালতের ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার জন্য হাইকোর্টে প্রার্থনা হইলে, যথেষ্ট জামিন দিলে ডিক্রীজারী স্থগিত রাখার হুকুম হয়, এবং তদনুসারে জামিন দাখিল হয়। পরে, হাইকোর্টের এক খণ্ডাধিবেশনের সমক্ষে ঐ আপীল উপস্থিত হইয়া দুই বিচারপতির মতভেদ হওয়ায় সনন্দানুসারে জ্যেষ্ঠ বিচারপতির রায়ই প্রবল হইয়া আপীলের ডিক্রী হয় ও নিম্ন আদালতের রায় অন্যথা হয়। ঐ নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ঐ আপীলের রেস্পণ্ডেণ্ট পূর্ণাধিবেশনে আপীল করে। কিন্তু খণ্ডাধিবেশনের রায় প্রদত্ত হওয়ার পরে জামিনদার তাহার জামিন রহিত করার জন্য জেলার জজের নিকট দরখাস্ত করাতে জজ এই বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন যে, পূর্ণাধিবেশনে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জামিনদার তাহার খত ফেরৎ পাইতে পারে না। তাহাতে সে ঐ খত ফেরৎ পাওয়ার জন্য হাইকোর্টে মোশন করায় স্থির হইল যে, যে বিচারপতিদ্বয় আপীল শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের

# মোকদ্দমার নামের নির্ঘণ্ট।

## দেওয়ানী নিষ্পত্তি

### অ



### আ



### ঈ



### উ



### এ



### ও



### ক



### খ



### গ



---

* ইহাতে ইংরাজী উইক্লি রিপোর্টের ১৩ বালম বুঝাইবে এবং ইহার নিম্নস্থ পত্রাঙ্কে ঐ বালমের পত্রাঙ্ক বুঝাইবে।

† ইহার নিম্নস্থ পত্রাঙ্কে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্টের ৬ষ্ঠ ভাগের পত্রাঙ্ক বুঝাইবে।

## র



## ল

# ষষ্ঠ ভাগের নির্ঘণ্ট।

## মাল সংক্রান্ত নিষ্পত্তি।

### অ

**অনাবশ্যকীয় মত প্রকাশ** পৃষ্ঠা

নোটিস জারী না হওয়ার হেতুতে যদি কোন খাজানার মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয়, তবে ঐ ভূমি মাল কি লাখেরাজ তৎসম্বন্ধে ঐ মোকদ্দমার রায়ে যে কোন নির্দ্দেশ থাকুক, তাহা কথার কথা মাত্র। ... ... ৫৫

**অনিয়ম**

পাট্টা পাওয়ার নালিশে ডেপুটি কালেক্টর বাদীর কতিপয় সাক্ষীর জবানবন্দী লইতে ত্রুটি করায় নিম্ন আপীল-আদালত তাহাদের জবানবন্দী লওয়ার জন্য মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করেন। তাহা লওয়া হয়, এবং ডেপুটি কালেক্টর মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিয়া পুনরায় নালিশ ডিস্‌মিস্‌ করেন। আপীলে ঐ নিষ্পত্তি অন্যথা হয়। হাইকোর্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইল যে, জজের মোকদ্দমা পুনঃপ্রেরণ করিয়া ঐ অতিরিক্ত জবানবন্দী-সহ মোকদ্দমা তাঁহার নিকট ফেরৎ পাঠাইবার আদেশ না করাতে ভ্রম হইয়া থাকিবে, কিন্তু যে স্থলে ঐ অনিয়মের দ্বারা মোকদ্দমার দোষগুণের অথবা বিচারাধিকারের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, সে স্থলে খাস আপীলে তাঁহার নিষ্পত্তির প্রতি হস্তক্ষেপ করা ন্যায্য হইতে পারে না ... ... ৪১

**অবিভক্ত তালুক**

দ্রু কর (১)

**অর্থ**

ব্যবস্থাপক সমাজ কি মনে করিয়া কোন আইন জারী করেন, তাহা দেওয়ানী আদালতের দেখিবার বিষয় নহে; বিধিমতে আইনের শব্দগুলির যে অর্থ হয়, তদনুসারেই উক্ত আদালত চলিতে বাধ্য। ... ... ১০

### আ

**আইন**

" ১৮৫৯ সালের ৮

প্রথম আদালত কোন প্রতিবাদীর যে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহা যখন এরূপ অসম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা হয় যে, নিম্ন আপীল-আদালত তদ্দৃষ্টে যথেষ্ট রায় দিতে পারেন না, তখন নিম্ন আপীল-আদালত দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৩৫৫ ধারার বিধান অনুসারে স্বয়ং প্রতিবাদীর সাক্ষ্য সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু তিনি পুনর্ব্বিচারার্থে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে পারেন না। তিনি যদি ঐরূপে প্রতিবাদীর জবানবন্দী লয়েন, তবে এই নূতন প্রমাণ উচিত মতে গ্রহণ করা হইয়াছে কি না, তাহা প্রধানতম বিচারালয় আপীলে মীমাংসা করিতে সমর্থ হইবার জন্য, তাহার কারণ জজের লিখিতে হইবে। ... ১০

২ ধারা—দ্রুঃ নালিশের হেতু
১১৮ ধারা—দ্রুঃ সাক্ষী
২৩৭ ও ২৪২ ধারা—দ্রুঃ বিচারাধিকার (৫)
২৫৬ ধারা—দ্রুঃ আইন—১৮৫৯ সালের ১০ আইন (৪)
৩৫০ ধারা—দ্রুঃ অনিয়ম

" ১৮৫৯ সালের ১০

(১) কোন তহশীলদারের চিহ্নিত (স্বাক্ষরিত নহে) মবলগবন্দী-যুক্ত চালান ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত "দাখিলা" নহে। ... ... ৩

(২) উক্ত ধারা অনুসারে নিম্ন আপীল-আদালত যে ক্ষতি-পূরণের হুকুম দেন, তাহা অতিরিক্ত হইলেও, আইনের বিধানমত হইলে খাস আপীলে তাহা আইন-ঘটিত ভ্রম বলিয়া তৎপ্রতি হস্তক্ষেপ করা যাইতে পারে না। ৩

(৩) ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংক্রান্ত এক মোকদ্দমায় যখন প্রারম্ভিক শুনানী হইয়া ইসু

কর — পৃষ্ঠা।

পাট্টা দেওয়াতে ঐ ব্যক্তি দ্বারা সেই কাল পর্য্যন্ত প্রজাগণ বেদখল ছিল। এ স্থলে, ঐ প্রজাগণ বেদখলের পরে ওয়াশীলাৎ সমেত দখলের ডিক্রী পাইয়া থাকিলেও, ঐ বেদখলী কালের করের দাবীতে জমিদার তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারে না। ... ... ৬৪

(৩) মৃত ব্যক্তির প্রাপ্য আদায়ের জন্য বাদীর হস্তে ১৮৬০ সালের ২৭ আইনান্তর্গত এক সার্টিফিকেট থাকায় তাহার বলে সে বাকী করের জন্য নালিশ করে, কিন্তু ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ৭৭ ধারামতে এক ব্যক্তি মোজাহেম হয়। এ স্থলে, যে ব্যক্তি বাস্তবিক ও সরল ভাবে কর পাইয়াছে, সেই ব্যক্তিই দখল রাখিতে স্বত্ববান। ৬৭

(৪) ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের কার্য্য সাধনার্থে কর, "সম্পত্তি" এবং "অস্থাবর সম্পত্তি" শব্দের মর্ম্মান্তর্গত। ... ৭২

কর বৃদ্ধি

(১) যে স্থলে পার্শ্ববর্ত্তী তুল্য প্রকারের ভূমির করের প্রচলিত হার দর্শাইয়া বর্দ্ধিত হারে কবুলিয়ৎ পাওয়ার দাবীতে নালিশ হয়, সে স্থলে ঐ দাবী এরূপ সম্ভাবনা বা নিশ্চয়তার দ্বারাও, সাব্যস্ত হয় না যে, পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির পুনরায় জমাবন্দী করিলে দাবী-কৃত হারই সাব্যস্ত হইবে। ১৮

(২) যে ভূমির কোন কর আদায় হয় নাই তাহাতে কর সংস্থাপনের মোকদ্দমা করবৃদ্ধির মোকদ্দমা নহে। ... ২২

(৩) কোন জমিদার তাহার ও রাইয়তের মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারীর কর বৃদ্ধি করিতে চাহিলে এরূপ নির্দ্দিষ্ট নোটিস দিতে বাধ্য যাহাতে কর বৃদ্ধির হেতু স্পষ্ট রূপে বর্ণিত থাকে। ২২

(৪) কর বৃদ্ধির মোকদ্দমায় প্রতিবাদী জওয়াব দেয় যে, তাহার খাজানা ২০ বৎসরের অধিক কাল যাবৎ পরিবর্ত্তিত হয় নাই; কিন্তু সে এমন কথা কহে না অথবা প্রমাণও দেয় না যে, স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে তাহার খাজানা পরিবর্ত্তিত না হওয়াতে তাহার অপরিবর্ত্তনীয় খাজানায় জমা ভোগ করার স্বত্ব আছে। এমত স্থলে, দুই বিচারপতি নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতিবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তের কাল হইতে এক অপরিবর্ত্তিত হারে খাজানা দিয়া ভোগ করিয়াছে

কর বৃদ্ধি — পৃষ্ঠা।

কি না, এই ইসুর বিচার করা ডেপুটি কালেক্টরের পক্ষে ন্যায্যই হইয়াছে। ... ৩০

(৫) দখলের স্বত্ববিশিষ্ট কোন রাইয়তের বিরুদ্ধে করবৃদ্ধির মোকদ্দমায় যে নোটিস জারী হইয়াছে তাহা যদি আইন-সঙ্গত না হইয়া থাকে, তবে স্থানীয় তদন্তের দ্বারা বিরোধীয় ভূমির পরিমাণ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে প্রচলিত হার নির্ণয়ার্থে মোকদ্দমা ফেরৎ পাঠাইতে কার্য্যবিধির বিধানমতে জজের কোন ক্ষমতা নাই ... ৪০

(৬) ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারানুযায়ী নোটিসে প্রতিবাদীকে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট রাইয়ত বলিয়া বর্ণনা না করিলে, সেই নোটিস জারীর পরে করবৃদ্ধির মোকদ্দমায়, প্রতিবাদী যদি ১৭ ধারান্তর্গত হেতু ভিন্ন অন্য হেতুবাদে করবৃদ্ধির দায় হইতে মুক্ত হইতে চাহে, তবে শেষোক্ত ধারান্তর্গত ইসু উত্থাপনার্থে তাহাকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে, অথবা অন্ততঃ বলিতে হইবে যে, তাহার দখলের স্বত্ব আছে। ... ৪৮

(৭) যদি করবৃদ্ধির মোকদ্দমায় প্রতিবাদীর দখলের স্বত্ব না থাকে, এবং যদি জজ বিবেচনা করেন যে, দাবীকৃত খাজানার হারই সঙ্গত, তবে দখলের স্বত্ব-বিশিষ্ট অনেক পুরাতন রাইয়ত তাহার ন্যূন হারে খাজানা দিলেও তিনি ঐ দাবী-কৃত হারের ডিক্রী দিতে পারেন। ৪৮

(৮) বর্দ্ধিত করে কবুলিয়তের দাবীর মোকদ্দমায়, আরজীতে ভূমির যে পরিমাণ লিখিত থাকে, তৎসমুদায়ের প্রতি বাদীর স্বত্ব সপ্রমাণ না হইলে, নালিশ ডিসমিস্ হইবে; কারণ, করের দাবীকৃত হার সম্যকরূপে প্রমাণের দ্বারা সাব্যস্ত না হইলে যে রূপ ১০ বালম উইক্লি রিপোর্টের ১৪ পৃষ্ঠার পূর্ণাধিবেশনের নজীর (বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট, ৩ য় ভাগ, পূর্ণাধিবেশনের মালসংক্রান্ত নিষ্পত্তির ৩ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য) খাটে, আরজীর লিখিত মতে ভূমির পরিমাণ প্রমাণে সম্যকরূপে সাব্যস্ত না হইলেও সেই নজীর তদ্রূপ খাটে। ৫১

দ্রঃ নোটিস

কানুন

,, ১৮২৭ সালের ৫

রিবেনিউ কালেক্টর ১৮২৭ সালের ৫ ম কানুনের ৩ ধারা মতে কোন জমিদারীর এড্‌মিনিষ্ট্রেটর অর্থাৎ সরবরাহকার নিয়োজিত হইলেই তাঁহাকে কোন প্রকারে জমিদারের প্রজা বলা যাইতে পারে না। ... ২৬

**কার্য্য-প্রণালী** পৃষ্ঠা।

যে প্রতিবাদী বলে যে, সে সামিলাৎ তালুকদার অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫ ধারার বিধানান্তর্গত তালুকদার, তাহার কর বৃদ্ধির নালিশে আদালতের যে যে প্রণালী অবলম্বনে বিচার করিতে হইবে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া হইল। ... ... ৬

**চুক্তি**

যে স্থলে কোন একরার-নামায় এমন লেখা থাকে যে, এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক পক্ষের দ্বারা কোন কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে; তাহাতে যদি সেই পক্ষ সেই সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদন করিতে ত্রুটি করে, এবং সেই ত্রুটি সত্ত্বেও যদি প্রতিপক্ষ সেই চুক্তির উপকার লাভ করিতে থাকে, তবে ঐ প্রতিপক্ষকে সেই চুক্তি সম্বন্ধে আপন কর্ত্তব্য অবশ্য সম্পাদন করিতে হইবে; এবং সকল স্থলে ঐ চুক্তি অনুযায়ী ঠিক কার্য্য করা দুঃসাধ্য হইলেও, যত দূর সাধ্য ঐ চুক্তির সর্ত্ত সকল প্রতিপালন করিতে হইবে। ... ৬৯

## জ

**জমা**

যে জমা বৎসর বৎসর উল্লেখে প্রদত্ত হয়, তাহা পক্ষগণ যে পর্য্যন্ত সম্মত থাকে, সেই পর্য্যন্ত চলিত থাকে, এবং যদিও তাহা দুই পক্ষের এক পক্ষের ইচ্ছামতে কোন বৎসরের শেষে সমাপ্ত হইতে পারে, তথাপি তাহা প্রত্যেক বৎসরের শেষে যে, অবশ্যই সমাপ্ত হওয়া গণ্য হইবে, এমত নহে। ... ... ২৪

## ড

**ডিক্রীজারী**

(১) দেওয়ানী আদালত ভূমির দখলের যে ডিক্রী দেন তাহা কেবল দেওয়ানী আদালতই জারী করিতে পারেন। ... ... ২০

(২) বিচারাদিষ্ট দায়ীর আপন অধীন প্রজার নিকট প্রাপ্য কর পাওয়ার স্বত্ব, ঐ দায়ীর বিরুদ্ধে জমিদারের ১৮৫৯ সালের ১০ আইনান্তর্গত বাকী করের ডিক্রীজারীতে কালেক্টর নীলাম করিতে পারেন। ... ৭২

## ত

**তমাদী** পৃষ্ঠা।

কোন দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী আইন প্রয়োগ দ্বারা চূড়ান্ত হইবার পরে খাস আপীলে তাহার সিদ্ধতার প্রতি আপত্তি হইতে পারে না। ৫৪

**দখলের স্বত্ব**

যদি কোন প্রজার দখলের স্বত্ব থাকে এবং সে ঐ স্বত্ব বহাল রাখিতে চাহে, তবে তাহার প্রকারান্তরে এই করার করা হয় যে, তাহার জমিদার কবুলিয়ৎ চাহিলে সে উচিত এবং ন্যায্য হারে কবুলিয়ৎ দিবে; কিন্তু দখলের স্বত্ব না থাকিলে, প্রজা কেবল জমিদারের অনুমতিমতে, অর্থাৎ জমিদার ও তাহার মধ্যে যে সকল সর্ত্তের বন্দোবস্ত হয় কেবল তদনুসারেই ভূমিতে থাকিতে পারে। ... ২০

**দুই বিষয়ের একত্রে নালিশ**

এক হাওয়ালা উল্লেখে তাহার খাজানার নালিশে, প্রতিবাদিগণ জওয়াব দেয় এবং আদালত নির্দ্দেশ করেন যে, বিরোধীয় ভূমি সমস্ত দুই হাওয়ালা-ভুক্ত, এক হাওয়ালা নহে। এমত স্থলে, ঐ হেতুবাদে নালিশ ডিস্‌মিস করা উচিত নহে; সাধারণ যুক্তি অনুসারে এবং প্রতিবাদীরই সুবিধার জন্য আদালত পক্ষগণের মধ্যে অন্যান্য ইসুর তদন্ত করিয়া সুবিচার করিতে পারেন। ... ... ... ৫২

**নালিশের স্বত্ব**

কোন ব্যক্তি, কোন পাট্টাদাতার মালিকী স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া পাট্টাদারকে বেদখল করিলে, পাট্টাদার যদি পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ভূম্যধিকারী বলিয়া স্বীকার না করিয়া থাকে, তবে সে ঐ পাট্টাদারকে প্রজা উল্লেখে কালেক্টরের নিকট তাহার বাকী খাজানার জন্য নালিশ করিতে পারে না। ... ... ... ৪১

**নালিশের হেতু**

নোটিস জারীর পরে বর্দ্ধিত খাজানার দাবীর মোকদ্দমা, আপীলে ডিস্‌মিস হইলে, ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদী যে হার স্বীকার করিয়াছিল

নালিশের হেতু পৃষ্ঠা।

সেই হারে বাদী সেই বৎসরের খাজানার জন্য নালিশ করাতে, স্থির হইল যে, পূর্ব্ব মোকদ্দমার ও বর্ত্তমান মোকদ্দমায় নালিশের হেতু এক নহে; অতএব পূর্ব্ব-নিষ্পত্তি-জনিত বাধার বিধানের দ্বারা এই নালিশ বারিত নহে। ৫৯

নোটিস

যদি নোটিসে এমন কথা লেখা না থাকে যে, রাইয়ত তাহার সমশ্রেণীর প্রজা অপেক্ষা ন্যূন হারে খাজানা দেয়, তবে উক্ত রূপ রাইয়তদিগের দ্বারা যে খাজানা প্রদত্ত হয় নথীতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ থাকিলে ঐ অনিয়মে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু ঐ প্রকার প্রমাণ না থাকিলে নালিশ ডিস্‌মিস হইবে ... ... ৫৫

## প

পুনঃপ্রেরণ

(১) যে স্থলে প্রধানতম বিচারালয় ভ্রমে এমত এক ইসু ধার্য্য করিয়া মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ফেরৎ পাঠান যাহার উপর উক্ত মোকদ্দমা সেই সময়ে পক্ষগণের মধ্যে স্থাপন করা উচিত ছিল না; এবং পুনঃপ্রেরণের পর নিম্ন আপীল-আদালত যে এক বৃত্তান্তের নিষ্পত্তি করেন তাহাতে উক্ত মোকদ্দমা উচিত মতেই নিষ্পন্ন হয়; সে স্থলে নিম্ন আপীল-আদালতে যে ইসু পাঠান হয় উক্ত আদালত ঠিক তৎসম্বন্ধে উচিত মতে নথীস্থ প্রমাণ না দেখিয়া থাকিলেও বাদি-প্রতিবাদীর মধ্যে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ব্যতিক্রম হয় না। ... ... ... ১৩

(২) যখন প্রথম আদালত কোন মোকদ্দমা কোন প্রাথমিক প্রশ্ন সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করেন, এবং এমত কোন বৃত্তান্ত-ঘটিত প্রমাণ না লন যাহা নিম্ন আপীল-আদালতের নিকট পক্ষগণের স্বত্ত্ব নিরূপণার্থে প্রয়োজনীয় বোধ হয়, এবং যখন প্রথম আদালতের ডিক্রী উক্ত প্রাথমিক প্রশ্ন সম্বন্ধে আপীল-আদালত অন্যথা করেন; তদ্ব্যতীত আর কোন কারণেই নিম্ন আপীল আদালতের কোন মোকদ্দমা প্রথম আদালতে ফেরৎ পাঠাইবার অধিকার নাই। ... ... ১৮

দ্রঃ আইন—১৮৫৯ সালের ৮
দ্রঃ করবৃদ্ধি (৫)
দ্রঃ অনিয়ম

পুনর্ব্বিচার

সমনজারী না হওয়ার প্রমাণ উভয় পক্ষের মোক্তারের সমক্ষে প্রদত্ত হওয়ায়, মোকদ্দমা পুনর্ব্বিচারের রেজিষ্টরী-ভুক্ত করার জন্য আদালত যে হুকুম দেন তাহা বৈধ ... ... ... ৪৬

পূর্ব্ব নিষ্পত্তি-জনিত বাধা

যে স্থলে কোন ব্যক্তি অনধিকার-প্রবেশক থাকিবার হেতুবাদে কোন করের দাবীর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস হয়, সে স্থলে সে মাল-আদালতে দখলের দাবীর নালিশ উপস্থিত করিতে পারে না ... ... ... ... ... ৬১

প্রজা স্বরূপ অধীনতা স্বীকার

দ্রঃ বিচারাধিকার (৪)
দ্রঃ নালিশের স্বত্ত্ব

প্রমাণ

(১) কোন মোকদ্দমা এক ডেপুটি কালেক্টর কর্ত্তৃক ডিসমিস হয়, কিন্তু তাঁহার বিধিমত রায় না দিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়; তাহাতে নিম্ন আপীল-আদালত তাহা পুনর্ব্বিচারার্থে মৃত কর্ম্মচারীর পদাভিষিক্ত কর্ম্মচারীর নিকট অর্পণ করেন। তিনি তাহা কোন পক্ষের আপত্তি ব্যতীত নথীস্থ প্রমাণ দৃষ্টেই বাদীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করেন। স্থির হইল যে, পক্ষগণ প্রার্থনা না করিলে পুনরায় সাক্ষিগণের জবানবন্দী লওয়া বা অতিরিক্ত প্রমাণ গ্রহণ করা ঐ দ্বিতীয় ডেপুটি কালেক্টরের অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে। ... ... ... ৮

(২) বিপক্ষের হিসাবের খাতা অধিক হইলেও প্রতিপোষক প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারে, নিরপেক্ষ প্রমাণ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ... ... ... ৫৪

দ্রঃ আইন—১৮৫৯ সালের ৮

প্রমাণ-ভার

যে স্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্য অস্বীকার না করিয়া তাহা খণ্ডনার্থে আর এক কথা বলে, সে স্থলে প্রতিবাদীর ঐ কথা তাহার নিজেরই সপ্রমাণ করিতে হইবে। ... ... ... ১১

## ব

বর্ণনা-পত্র

প্রতিবাদী যে বর্ণনা-পত্র দাখিল করে, তাহাতে সত্যতা লেখাইয়া লওয়া উচিত; কিন্তু যদি সত্যতার লিপি ব্যতীতই তাহা নথীতে গ্রহণ করা হয়, তবে উল্লিখিত বিষয় দেখিতে হইবে, এবং তদনুসারে ইসু ধার্য্য করিতে হইবে। ... ৬১

## ভ



## স

# মোকদ্দমার নামের নির্ঘণ্ট।

## খাল-সংক্রান্ত নিষ্পত্তি।

# ষষ্ঠ ভাগের নির্ঘণ্ট।

## পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

**ডিক্রীজারী**　　　　পৃষ্ঠা

জারী করিতে হইবে; পক্ষগণ সম্মতি দিলেই যে, তিনি মূল ডিক্রীতে কোন কথা সংযোগ বা তাহার কোন সর্ত্তের পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, এমত নহে। ডিক্রীদার কর্ত্তৃক দায়ীর সম্পত্তি ক্রোক হইতে খালাস দেওয়ার কার্য্য, ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ২০ ধারার মর্ম্মান্তর্গত ডিক্রী সজীব রাখার কার্য্য নহে। ৫৭

দঃ ক্রোক (১)

## ত

**তমাদী**

ডিক্রীজারীতে কোন বিরোধের নিষ্পত্তি হইয়া তাহার খরচা দেওয়ার হুকুম হইলে, ঐ খরচা পাওয়ার প্রার্থনা করিবার মিয়াদ ১৮৫৯ সালের ১৪ আইনের ১১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত নহে, ২০ ধারার অন্তর্গত। ... ... ৯৭

## দ

**দখল**

দঃ প্রমাণ

**নিকাশ**

দঃ যৌত হিন্দু-পরিবার

## প

**প্রমাণ**

যদি কোন এক সাক্ষী এই মাত্র বলে যে, এক ব্যক্তি ভূমির দখীলকার আছে, তবে ঐ কথাই সেই ব্যক্তির দখীলকার থাকার আইনসঙ্গত প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইতে পারে। বিচারপতি দ্বারকানাথ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ নহেন। ৩৪

## ব

**বন্ধক**

দলীলে যদি এমত দেখা যায় যে, ভূমির উপরে দায় সৃজন করাই পক্ষগণের মনস্থ ছিল, তাহা হইলেই যথেষ্ট রূপে বন্ধক হয়। যদি দলীল হইতে সেই অভিপ্রায় সংগৃহীত হইতে পারে, তবে তাহাতে যে প্রকার বাক্যই ব্যবহৃত হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। ১০৬

**বেদখল**

দঃ কার্য্য-প্রণালী

## য

**যৌত হিন্দু-পরিবার**

যৌত হিন্দুপরিবারস্থ যে ব্যক্তির উপরে ঐ পরিবারের এজমালী সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব ভার থাকে, তাহার বিরুদ্ধে ঐ পরিবারস্থ অপর শরীকগণ নিকাশের দাবীতে নালিশ করিতে পারে, এবং যে কালের নিকাশের দাবী হয়, তখন ঐ অপর শরীকগণ নাবালগ থাকিয়া থাকিলেও ঐ রূপ নালিশ করিতে স্বত্ববান। ৯৮

## শ

**শরা**

দঃ সোফা

## স

**সোফা**

যে স্থানে হিন্দুদের মধ্যে সোফার স্বত্ব পরিচালনের প্রথা না থাকে, সে স্থানে কোন হিন্দু কোন ভূমি ক্রয় করিলে, বিক্রেতা ও সফী উভয়ে মুসলমান হইলেও, ঐ সফী নৈকট্য অথবা শরীকী সূত্রে শরা অনুযায়ী সোফার স্বত্ব পরিচালন করিতে পারে না। ... ... ২৮

## হ

**হিন্দুব্যবহার-শাস্ত্র**

বঙ্গদেশের প্রচলিত হিন্দুব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে পিতৃব্য-দৌহিত্র দায়াধিকারী হইতে পারে। ... ... ... ৬১

# মোকদ্দমার নামের নির্ঘণ্ট।

## পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।

### অ



### কৃ



### গ



### প



### ফ





### র



### শ

# ষষ্ঠ ভাগের নির্ঘণ্ট।

## ফৌজদারী নিষ্পত্তি।

## উ

## ও

ওয়ারেণ্ট　　　　　　　　　পৃষ্ঠা।

দ্রঃ কার্য্য-প্রণালী (২) (৯) (১০)
দ্রঃ সাক্ষী (১)

## ক

কার্য্য-প্রণালী

(১) ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬৮ ধারা মতে, ম্যাজিষ্ট্রেট যখন কোন অপরাধ-জনক কার্য্য হইবার বিষয় অবগত হন, তখনই কেবল তিনি কোন অভিযোগ ব্যতীত ঐ অপরাধের বিচার করিতে পারেন। স্বকপোল-কল্পিত সন্দেহ বা কোন গয়রুল্লা দরখাস্ত হইতে যে গোপনীয় সংবাদ পাওয়া যায়, তন্মূলক বিশ্বাস ঐ অবগতি নহে। গোপনীয় হউক বা নাই হউক, ম্যাজিষ্ট্রেট যে সংবাদ দৃষ্টে কার্য্য করেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট জারী করেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে বাধ্য। ১

(২) ম্যাজিষ্ট্রেট ৬৮ ধারা অনুসারে যে ওয়ারেণ্ট জারী করিতে পারেন, তাহা কয়েদ করিবার ওয়ারেণ্ট নহে, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে যত সময়ের আবশ্যক হয়, তাহা অপেক্ষা অধিক দিন তাঁহাকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারে না, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলেই উক্ত ওয়ারেণ্টের কার্য্য শেষ হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিতে হইলে অথবা অতিরিক্ত কাল আটক রাখিতে হইলে ২২২ বা ২২৪ ধারামতে নূতন ওয়ারেণ্ট জারী করিতে হইবে। ... ... ... ১

(৩) যে স্থলে কোন আসামী বিচারার্থে সেশনে অর্পিত হয় এবং তাহার সাক্ষীর তালিকা দেয়, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২২৮ ধারার অধীনে, সেই সকল সাক্ষীকে সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সমন করিতে পারেন। ২২৭ ধারা স্পষ্ট আজ্ঞা-সূচক, এবং কোন আসামী তাহার কোন জওয়াব সেশন আদালতে বলিবার জন্য রাখিয়া দিতে চাহিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাতে বাধা দিতে পারেন না; ২০৭ ধারায়ই ম্যাজিষ্ট্রেটকে কোন আসামীর পক্ষের প্রমাণ গ্রহণ করা না করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ... ... ... ৮

কার্য্য-প্রণালী　　　　　　　　　পৃষ্ঠা

(৪) কেবল ক্ষণকালের নিমিত্ত আবদ্ধ রাখা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেলে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে, ম্যাজিষ্ট্রেটের এরূপ সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া আবশ্যক যে, ঐ আসামীর কিছু অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে, অথবা এরূপ বিশ্বাসের ন্যায্য কারণ আছে যে, তাহার প্রতি যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, তাহার নিমিত্ত সে অপরাধী। ১

(৫) ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ২১২ ধারামতে অভিযোক্তার প্রমাণাদি দেওয়া শেষ হইয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জওয়াব দিতে এবং প্রমাণাদি দাখিল করিতে বলিতে হইবে। অতএব আসামীর জওয়াব এবং প্রমাণাদি দাখিল করিবার পর অভিযোক্তার পক্ষের এক জন সাক্ষীর পুনরায় জবানবন্দী লইয়া আসামীকে সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে জওয়াব এবং প্রমাণ দিতে অবকাশ না দিয়া যে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়, তাহা রহিত হইবে, এবং নূতন বিচার করিতে হইবে। ... ... ২৩

(৬) ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা-প্রাপ্ত জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা সেশনে অর্পণ করিলে ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৩৫৯ ধারা অনুসারে সেশন জজ তাহার বিচার করিতে পারেন; এবং যে ব্যক্তি ঐ অর্পণের শুদ্ধতার প্রতি দোষারোপ করে, তাহারই দেখাইতে হইবে যে, উক্ত অর্পণের ক্ষমতা ছিল না। ... ২৫

(৭) সেশন আদালতে কোন সাক্ষীর মূল অর্থাৎ আদ্য জবানবন্দী লওয়ার কালে, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তৎপ্রতি তাহাকে মনোযোগ করিতে বলা অনুচিত; ১৮৫৫ সালের ২ আইনের ২৩ ধারা মতে, তাহার পূর্ব্ব লিপিবদ্ধ বর্ণনা সম্বন্ধে তাহাকে জেরা করা যাইতে পারে; এবং তাহার পূর্ব্ব বর্ণনার যে অংশের দ্বারা তাহার পশ্চাতের বর্ণনার অনৈক্যতা দেখাইতে হইবে, তাহা ঐ জেরা করার কালে তাহাকে দেখান যাইতে পারে। ২৬

(৮) কোন সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট যদি এই অভিযোগ হয় যে, তাঁহার নিকট যে দলীল রেজিষ্টরী করা হয় তাহা জাল, তবে তিনি অভিযোক্তাকে ফৌঃ কার্য্য-বিধির ৬৬ ধারা অনুসারে নালিশ করিতে বলিতে বাধ্য। একই ব্যক্তি সব রেজিষ্ট্রার ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি ঐ মোকদ্দমা আপনার নিকট ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট স্বরূপে অর্পণ করিতে পারেন না; তাঁহাকে

| কার্য্য-প্রণালী | পৃষ্ঠা। |
|---|---|

১৮৬১ সালের ২০ আইনের ২৫ ধারা অনুসারে অভিযোগ করিতে হইবে। এমত স্থলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ রীতিমত প্রণয়ন করিতে হইবে, এবং তাঁহার সাক্ষাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ... ... ৩০

(৯) ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬৮ ধারা কেবল এমত সকল স্থলে খাটে, যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে অপর কোন ব্যক্তি রীতিমত অভিযোগ করিতে উপস্থিত না হয়; কিন্তু এ প্রকার স্থলেও কোন অপরাধজনক কার্য্য হইবার বিষয় মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং বা তাঁহার সমক্ষে বিধিমত প্রদত্ত প্রমাণ দৃষ্টে, অবগত না হইলে গেপ্তারীর ওয়ারেণ্ট জারী করিতে তাঁহার ক্ষমতা নাই। পুলিসের রিপোর্ট, অথবা যে বর্ণনা শপথ পূর্ব্বক না হয়, অথবা যাহা নিয়মিত রূপে প্রকৃত অভিযোগের তুল্য নহে, তদ্দৃষ্টে মাজিষ্ট্রেটের ঐ রূপ ওয়ারেণ্ট জারী করার অধিকার নাই। ... ... ৩৭

(১০) ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৭৭ ধারা এবং সংশোধিত বিধির ঐ বিষয় সম্বন্ধীয় ধারামতে, মাজিষ্ট্রেট সরকারী কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা ওয়ারেণ্ট জারী করাইতে পারেন বটে, কিন্তু যখন পুলিসের সহায়তা পাওয়া যায় না, অথবা তৎক্ষণাৎ কার্য্য করার অনিবার্য্য প্রয়োজন হয়, কেবল তখনই তিনি ঐ প্রকারে জারী করাইতে পারেন। ... ... ৩৭

(১১) অভিযোগের পক্ষের যে সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা আসামীর নূতন কোন কথা খণ্ডন করা অভিপ্রেত না হয়, তাহার সাক্ষ্য আসামীর জওয়াব লওয়ার পরে গ্রহণ করা অনিয়মিত কার্য্য। কিন্তু যে স্থলে উক্ত সাক্ষী যে সাক্ষ্য দিবে, তাহা আসামী জানিয়াশুনিয়া উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যের প্রসঙ্গে আপন জওয়াব দেয়, তাহাতে হাইকোর্ট ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৪৩৯ ধারা দৃষ্টে, উক্ত অনিয়ম হেতু অপরাধ-সাব্যস্ত রহিত করিতে অস্বীকার করেন। ... ... ৫১

(১২) মোকদ্দমা ডিস্মিসের কোন কারণ না দর্শাইয়া এবং অভিযোক্তার সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী না লইয়া, এবং তাহার যে সকল সাক্ষী উপস্থিত ছিল না, তাহাদিগকে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত সময় না দিয়া, তাহার অভিযোগ ডিস্মিস্ করা এবং দণ্ড-বিধির ২১১ ধারা মতে মিথ্যা অভিযোগের হেতুতে তাহার বিচার হইবার আদেশ করা, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটের পক্ষে নিয়ম-বিরুদ্ধ কার্য্য ... ... ৫১

(১৩) যে সকল বৃত্তান্ত এক অপরাধের অন্তর্গত, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধে ভাগ করিয়া লইবার প্রথা অসঙ্গত। ... ... ৫৫

(১৪) ১৮৬৯ সালের ৮ আইনের ৪৪৫ (এ) এবং ৪৪৫ (বি) ধারার বিধান দৃষ্টে সেশন আদালত কর্ত্তৃক দণ্ডনীয় অপরাধের বিচার করিতে, আইনের অধীন প্রদেশের প্রধান কার্য্যকারক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের বিধানমতে চলিতে বাধ্য, এবং আসামীর প্রতি যে সকল অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহার কোন এক অপরাধ সেশন আদালত কর্ত্তৃক বিচার্য্য না হইলেও, তিনি তাহার বিচার জুরি বা আসেসরগণের সাহায্যে করিবেন। ... ৭১

(১৫) কোন বিচারক এরূপ স্থলেই আপন সমীপস্থ মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে পারেন যে স্থলে ঐ সাক্ষ্য তাঁহার সহিত একত্রে ও একসময়ে আসীন অন্যান্য তুল্য রূপ বিচারকগণের দ্বারা নিরপেক্ষ রূপে বিবেচিত হইতে পারে এবং অবশ্যই হইবে। ... ... ৭৩

(১৬) সেশন জজ সাক্ষী হইতে পারেন, এবং তিনি সাক্ষ্য দিলেই যে, তাঁহার তৎসম্বন্ধে বিচার করিবার বাধা হইবে, এমত নহে। ৭১

(১৭) যে সেশন জজ কোন আসামীর বিচার করেন তাঁহাকে ঐ আসামী এমত কোন বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে বলিতে পারে যাহা সে আপন অনুকূল বিবেচনা করে। ... ৭১

(১৮) যে সেশন জজ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন, ঐ অভিযোগের বিষয়ে তাঁহার কোন শারীরিক বা অর্থ-ঘটিত সম্বন্ধ না থাকিলে, তিনি জুরির সাহায্য ব্যতীতও পরে তাহার বিচার করিতে অক্ষম হইবেন না। ৭৩

(১৯) অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনার্থে যে সকল সাক্ষী উপস্থিত করে, তৎসমুদায়েরই জবানবন্দী লইতে মাজিষ্ট্রেট ফৌঃ কাঃ বিধির ২১৬ ধারা মতে বাধ্য। ... ... ৭৭

(২০) যে স্থলে কোন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট কোন প্রমাণ না লইয়া ফৌজদারী কার্য্য-বিধির ৬২ ধারামতে কোন এক হাটের দিন পরিবর্ত্তন করেন, এবং পরে প্রমাণ লইয়া দেখেন যে, তাঁহার প্রথম হুকুম অন্যায় এবং ক্ষমতা অভাবে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার ঐ প্রথম হুকুম রহিত করা সঙ্গত কার্য্যই হয়। ... ৮৫

**জামিনদার** পৃষ্ঠা

এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি পরে অন্য এক আদালতে, উঠাইয়া দেওয়া হয়, তবে জামিনদার তদ্দ্বারাই তাহার জামিনের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হয়। ... ... ... ... ৩৭

**জাল**

যে স্থলে কোন ব্যক্তি দলীল জাল করিবার মনস্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অনেক গুলি মোহর রাখে, তাহাতে দণ্ডবিধির ৪৭৩ ধারামতে কেবল একটি জাল করিবার জন্য ঐ সকল মোহর রাখিবার বিষয় প্রকাশ না পাইলে, যত মোহর ঐ ব্যক্তির নিকট পাওয়া যায় তাহার প্রত্যেকের সম্বন্ধে এক এক সম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র অপরাধ হয়, এবং ঐ ব্যক্তি বিধিমতে উহার প্রত্যেক মোহর সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র অপরাধে দণ্ডণীয় হয়। ... ... ... ... ২৪

দ্রঃ কার্য্য-প্রণালী ( ৮ )

**জাল মোহর**

দ্রঃ জাল

**জুরি**

( ১ ) যে স্থলে সেশন জজ প্রত্যেক সাক্ষীর বর্ণনা অবিকল জুরির নিকট বর্ণন না করিয়া, অভিযোক্তা এবং আসামী উভয়ের পক্ষের প্রমাণের প্রধান প্রধান লক্ষণ বর্ণন করেন, সে স্থলে তাঁহার ঐ রূপ অবস্থাবর্ণন ফৌজদারী কার্য্য-বিধি মতে অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। ... ... ... ... ৩২

( ২ ) জুরির নিকট মোকদ্দমার অবস্থা বর্ণনে জজ বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জুরিকে উপদেশ দিতে বাধ্য, এবং প্রমাণ দৃষ্টে তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনি জুরিকে বলিতে পারেন। ... ৪৭

**জুরির নিকট অবস্থা বর্ণন**

দ্রঃ জুরি ( ১ ) ( ২ )

**জ্ঞান-কৃত বধ**

( ১ ) বধ করার উদ্যোগের অপরাধ এমত গুরুতর ও হঠাৎ ক্রোধোৎপাদনের দ্বারা হইয়াছে কি না, যদ্দ্বারা তাহা জ্ঞানকৃত বধের তুল্য হয় না, ইহা বৃত্তান্ত-ঘটিত বিষয় বিধায় এতৎসম্বন্ধে জুরি যে মীমাংসা করেন, তৎপ্রতি দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ১ ম বর্জ্জিত কথা দৃষ্টে, হাইকোর্ট আপীলে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ... ... ৪৫

( ২ ) যে স্থলে এক আইন-বিরুদ্ধ জনতা-

**জ্ঞান-কৃত বধ** পৃষ্ঠা।

ভুক্ত কতক ব্যক্তি রকে ভুলাইয়া বাহির করিবার জন্য প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাদের মধ্যে এক জন সেই কার্য্যের উদ্যোগে ফকে বধ করে, সে স্থলে ঐ বাহির করিয়া লইবার কার্য্যে যে সকল ব্যক্তি লিপ্ত থাকে, তাহারা সকলেই দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারামতে, ফকে বধ করিবার অপরাধে অপরাধী। ... ... ... ... ৪৬

( ৩ ) যে স্থলে কোন আসামী সেশন আদালতে জ্ঞান-কৃত বধের অপরাধ স্বীকার করে, তাহাতে সেশন জজ হয় তাহাকে উক্ত অপরাধ স্বীকার মতেই অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন, নচেৎ প্রমাণ দৃষ্টে তাহার বিচার করিতে পারেন; কিন্তু তিনি বিচার না করিয়া, আসামী যে অপরাধ ( যথা, যে অপরাধ-জনক নরহত্যা জ্ঞান-কৃত বধ নহে ) স্বীকার করে নাই তাহার নিমিত্ত তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে পারেন না। ৬৯

( ৪ ) দণ্ডবিধির ৯৭, ৯৯ এবং ১০২ ধারা দৃষ্টে, মোকদ্দমায় মৃত ব্যক্তির ভয় প্রদর্শন হইতে আসামীর আপদ আশঙ্কার কোন যুক্তি-সিদ্ধ কারণ না থাকায়, আত্মশরীর রক্ষার স্বত্ব এস্থলে জন্মে নাই, সুতরাং উপস্থিত অপরাধ সম্বন্ধে দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ২ য় বর্জ্জিত বিধি খাটে না; এবং ঐ অপরাধ জ্ঞানকৃত বধের তুল্য। ... ... ... ৬৯

## ড

**ডাকাইতী**

( ১ ) দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা মতে, ডাকাইতী করার অপরাধে ১৪ বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে না। ... ৩৭

( ২ ) কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা মতে ডাকাইতীর নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইলে, তাহার বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধের কোন প্রমাণ না থাকিলে, সে দণ্ড-বিধির ৪১১ ধারা অনুসারে শঠতা-পূর্ব্বক অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বা ৪১২ ধারা অনুসারে ডাকাইতী দ্বারা হস্তান্তরিত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অপরাধী সাব্যস্ত হইতে পারে না। ... ৫৫

## দ

**দণ্ড**

দ্রঃ জাল

# মোকদ্দমার নামের নির্ঘণ্ট।

## ফৌজদারী নিষ্পত্তি।

# ষষ্ঠ ভাগের নির্ঘণ্ট।

## প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

### অ



আপীল

হাইকোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে প্রিবি কৌন্সিলে আপীল করার জন্য যে ছয় মাস মিয়াদ নিরূপিত আছে, তাহা, যে তারিখে হাই-কোর্টের ডিক্রী উচ্চরিত অথবা তারিখবদ্ধ হয়, সেই তারিখ ছাড়িয়া গণনা করিতে হইবে। ... ... ... ... ১২

উইল

(১) সাধারণতঃ, হিন্দুদিগের উত্তরাধিকার হিন্দুশাস্ত্র মতে, মুসলমানদের শরা মতে এবং ইষ্টইণ্ডিয়ান খ্রীষ্টিয়ানদিগের, ইংলণ্ডীয় আইন মতে নির্ণীত হয়; কিন্তু প্রত্যেক স্থলে মৃত ধনীর ষ্টেটস্ অর্থাৎ অবস্থা নির্ণয়ার্থে তাহার নিজের জীবন-যাত্রার প্রণালী ও আচার-ব্যবহার, এবং সে যে শ্রেণী বা দল-ভুক্ত তাহার রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়; এবং স্থল-বিশেষে প্রযুজ্য কোন বিশেষ নিয়ম নির্ণয় করিতে না পারিলে তত্তৎ স্থলে সুবিচার, ন্যায়পরতা ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের যুক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া বিচার করিতে হয়। ... ... ... ৩৯

(২) উইল দৃষ্টে "সন্তান" শব্দ উইল-কর্ত্তা কর্ত্তৃক যে অর্থে ব্যবহৃত হওয়া অনুভূত হয় তদ্দৃষ্টে, এবং প্রাকৃতিক ন্যায়ের যুক্তি মতে ঐ উইলের ব্যাখ্যা করিয়া অবধারিত হইল যে, যে স্থলে জারজ সন্তান তজ্জনক কর্ত্তৃক 'আপন সন্তান বলিয়া স্বীকৃত ও ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ঐ

উইল — পৃষ্ঠা।

"সন্তান" শব্দে জারজ সন্তান ও বিবাহ-জাত সন্তান উভয়ই বুঝায়। ... ... ৩৯

### ক



কানুন

" ১৭৯৩ সালের ৮

(১) ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুন মতে খাজানা-বৃদ্ধির নালিশে, যে তালুকের খাজানাবৃদ্ধি করিবার প্রার্থনা হয়, তাহার খাজানা অপরিবর্ত্তনীয় কি পরিবর্ত্তনশীল ইহা না দেখিয়া, তাহা কি ভাবের তালুক তাহাই দেখা অধিক আবশ্যকীয়; তালুক ঐ কানুনের ৪৯ বা ৫১ ধারার যে ধারার অন্তর্গত হয়, তদনুসারে, বাদী জমিদার যে প্রমাণ দর্শাইতে বাধ্য তাহার আকার ও পরিমাণের বিভিন্নতা হয়। ... ... ৩

(২) হাইকোর্ট যে মত ব্যক্ত করেন যে, কোন তালুক ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত করিতে হইলে ইহা দেখাইলেই যথেষ্ট যে, দশসালা বন্দোবস্তের কালে ঐ তালুক বর্ত্তমান ছিল, এবং জমিদারের সেরেস্তায় রেজিষ্টরী হইতে পারিত, ইহা অনুমোদিত হইল। ৩

(৩) যে স্থলে এমত সাব্যস্ত হয় যে, তালুক ১৭৯৩ সালের ৮ম কানুনের ৫১ ধারার মর্ম্মান্তর্গত অধীন তালুক, সে স্থলে খাজানা পরিবর্ত্তনশীল থাকার কথা বাদী-জমিদারকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে। ... ... ... ৩



### গ

খ্যাখরাদার পৃষ্ঠা

দ্রঃ বখরাদারী কারবার

জ

জমা

দ্রঃ উইল

জমিদারের সেরেস্তায় রেজিষ্টরী

দ্রঃ কানুন—১৭৯৩ সালের ৮ ম কানুন (২)

ত

তমাদী

১৮৪৫ সাল হইতে নালিশ উত্থাপনের কাল পর্য্যন্ত যে ভূমি প্রতিবাদীর দখলে ছিল তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য বাদী ১৮৫৬ সালে নালিশ উপস্থিত করাতে, স্থির হইল যে, বাদীর ঐ ভূমি পুনঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, নালিশের পূর্ব্ব ১২ বৎসরের মধ্যে তাহার দখল ছিল, এবং তাহার দখলের স্বত্ব আছে। ... ... ... ১৭

তালুকদার

(১) গবর্ণমেণ্টের বাকী রাজস্বের নীলামে গবর্ণমেণ্ট ১৮২২ সালের ১১ কানুন মতে এক পরগণার জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়া তদন্তর্গত এক তালুক যাহা দশসালা বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট হয়, তাহা তালুকদার স্বরূপে বাদিগণের সহিত পুনঃবন্দোবস্ত করেন। তাহার পরে, এবং বাদিগণের সহিত যে মিয়াদে ঐ পুনঃ বন্দোবস্ত হয় তাহা গত হইলে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের জমিদারী স্বত্ব প্রতিবাদীকে বিক্রয় করেন, এবং প্রতিবাদী বাদীকে বেদখল করে। বাদী তাহাতে প্রতিবাদিগণের নামে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৩ ধারার ৬ প্রকরণ মতে কালেক্টরের নিকট নালিশ করে। এস্থলে, নালিশ উচিত রূপেই ১৮৫৯ সালের ১০ আইন মতে উপস্থিত হইয়াছে। ... ... ... ১৮

(২) পরগণার হারে খাজানা বৃদ্ধি হওয়ার সর্ত্তে তালুকদারদিগকে তাহাদের মিয়াদ পর্য্যন্ত তালুকে স্থির রাখাই গবর্ণমেণ্টের মনস্থ ছিল, এবং এই মোকদ্দমায় যে স্থলে ইহা দেখা যাইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট যে সকল কার্য্য করেন তদ্দ্বারা তালুক অন্যথা হয় নাই, সে স্থলে প্রতিবাদী যে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্রয় করে, সে বাদীকে উচ্ছেদ করিতে পারে না, কারণ, বাদী

তালুকদার পৃষ্ঠা

করবৃদ্ধির দায়ের অধীনে দখীলকার থাকিতে স্বত্ববান ছিল। ... ... ১৮

(৩) ১৮২২ সালের পূর্ব্বে যে সমস্ত নীলামের আইন ছিল তদনুসারে ক্রেতা ইচ্ছা করিলেই তালুকদারদিগকে উচ্ছেদ করিতে পারিত না, তাহাতে তালুকদার কেবল পরগণার সম্পূর্ণ হার পর্য্যন্ত খাজানা দিতে দায়ী ছিল, এবং কেবল সেই বর্দ্ধিত খাজানা দিতে অস্বীকার করিলেই উচ্ছেদিত হইতে পারিত। কিন্তু ১৮২২ সালের ১১ কানুনমতে, দশসালা বন্দোবস্তের পরে সৃষ্ট তালুক সমস্ত ঐ কানুনের ৩২ ধারার মর্ম্মান্তর্গত তালুক না হইলে, বাকী রাজস্বের নীলাম-ক্রেতার দ্বারা এককালে অন্যথা ও বাতিল হইতে পারে। ... ... ... ১৮

(৪) ১৮২২ সালের ১১ কানুনের অন্তর্গত কোন নীলাম-ক্রেতা যদি কোন তালুকদারী স্বত্ব অন্যথা করিতে চাহে, তবে ঐ তালুক অন্যথা হওয়ার বিষয় ব্যক্ত করার জন্য তাহার কোন স্পষ্ট কার্য্য করা আবশ্যক। ... ১৮

দখলের স্বত্ব

দ্রঃ তমাদী

দান-পত্র

(১) "মৌজা সকল" বা তদ্রূপ অন্য কোন সাধারণ বর্ণনা-সূচক শব্দ কোন সনন্দে থাকিলেও দুই পক্ষই তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকারের ব্যাখ্যা করিয়া থাকিলে এবং বহু বৎসর পর্য্যন্ত সেই ব্যাখ্যানুযায়ী স্বত্ব ভোগ হইয়া থাকিলে, যে ব্যক্তি সেই ব্যাখ্যার প্রতি আপত্তি করে তাহারই দেখাইতে হইবে যে, ঐ ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। ... ... ... ২৮

(২) যে স্থলে গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে এক সম্পূর্ণ তালুক দান করেন এবং পশ্চাতে এক বন্দোবস্তের দ্বারা তাহার দখল স্থির রাখেন, সে স্থলে এমন তর্ক করা যাইতে পারে না যে, গবর্ণমেণ্ট ভ্রমবশতঃ ঐ তালুকের এক ভাগ দান না করিয়া, সমগ্র তালুক দান করিয়াছেন। ... ... ২৮

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বৃত্তি

(১) যে স্থলে বাদী প্রতিবাদিগণ উভয়েই

# মোকদ্দমার নামের নির্ঘণ্ট।

## প্রিবি কৌন্সিলের নিষ্পত্তি।

# ষষ্ঠ ভাগের নির্ঘণ্ট।

## রিবেনিউ বোর্ডের

ও

## হাইকোর্টের সরকুলার অর্ডর

## রিবেনিউ বোর্ডের সরকুলার অর্ডর।

জানুয়ারি, ১৮৭০।

৯ নং

গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমার নিষ্পত্ত্যনুসারে বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠার ৫ম অধ্যায়ের ৫ ধারা পরিবর্ত্তনের কথা। মহাল সমূহের মিশ্রিত ভূমির বিভাগ। ... ১

ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

৫ নং

গবর্ণমেণ্টের মহাল নীলাম করিবার কোন আপত্তি হইলে অথবা বন্দোবস্ত হওয়ার কোন দাওয়া থাকিলে আপীল করিবার সময়াতিরিক্ত এক মাস গত না হইলে নীলামের এস্তাহার না পাঠাইবার কথা। .. ... ১

মার্চ্চ, ১৮৭০।

৪ নং

কোর্ট-ফীর ষ্টাম্প বিষয়ে ষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রতি উপদেশের কথা। ... ১

১২ নং

অকৃত-চরম-পত্র মৃত ব্যক্তির অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়ানী আদালতের আজ্ঞাক্রমে ক্রোক হইলে ও অন্য লোক তদুত্তরাধিকারী বলিয়া দাওয়া করিলে যদি গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ রক্ষা করিবার যত্ন করা প্রয়োজন হয় তবে গবর্ণমেণ্টের উকীল কালেকটরের মুলাভিবিক্ত হইবার কথা। ... ... ... ২

এপ্রিল, ১৮৭০।

১ নং

রিবেনিউ এজেণ্টদের বিষয়ে ১৮৬৫ সালের ২০ আইনের বিধান কত দূর মানা গিয়াছে, জেলার কার্য্যকারকদের ইহার রিপোর্ট করিবার কথা। ... ... ২

৩ নং

গবর্ণমেণ্টের স্বপক্ষ ডিক্রীর টাকা শাখা খণ্ডের কার্য্যকারকদের আদায় করিবার কথা, ও বোর্ডের বিধিপুস্তকের ৫৯ পৃঃ ৩ অঃ ২ পরিঃ ২৫ এ নং নূতন ধারা। ... ২

মে, ১৮৭০।

১ নং

৫০০৲ টাকার কি তদধিকের ডিক্রী হইলে স্থানীয় অনুসন্ধানের নিমিত্ত নাজীরকে কিম্বা নায়েব নাজীরকে পাঠাইবার কথা, ও তাঁহার রিপোর্ট সন্তোষ-জনক না হইলে অন্য কার্য্যকারক দ্বারা তৎস্থানে নূতন অনুসন্ধান করিবার কথা। ... ... ... ২

২ নং

১৮৬৮ সালের ৮ নং সরকুলার অর্ডরের এক দফা ৬৬ নং রেজিষ্টর রহিত হইবার কথা। ... ... ... ২

৩ নং

ভূমি গ্রহণার্থে ১৮৭০ সালের নূতন আইন ১৮৭০ সালের ১ জুন অবধি চলিবে। তদ্দ্বারা ১৮৫৭ সালের ৬ আইন ও ১৮৬৩ সালের ২২ আইন রহিত হইল, কিন্তু রহিত করা আইন অনুসারে সেই সময়ে যে কার্য্য চলিতেছে তৎ-

নূতন আইনের কীদৃক্ ফল সম্ভাবনা এই বিষয়ে এড্‌বোকেট্ জেনেরেলের মতের কথা। ... ৩

৭ নং

১৮৬৫ সালের জুলাই মাসের ১৭ নং সরক্যুলর অর্ডরের ৩ ধারায় যে আদেশ প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে করেন্সী সংক্রান্ত ১৭ নং রিটর্ণের দুই স্থান পরিবর্ত্তনের কথা। ... ৩

৯ নং

দুই কি তদধিক জেলায় যে ব্যক্তিদের সম্পত্তি কি ব্যবসায়োৎপন্ন আয় হয়, স্থানীয় কোন্ কার্য্যকারকের অধীন তাঁহাদের টাকস ধার্য্য করা কর্ত্তব্য এবিষয়ের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা। ... ... ... ৩

১৩ নং

জেলা শ্রীহট্টের মহালের রাজস্ব পরিক্রম করিবার কথা। ... ... ৪

১৪ নং

পেয়াদাদের ফী খণ্ড রহিত হওয়া প্রযুক্ত ১৯ নং রিটর্ণের তৃতীয় টেবিল রহিত হইবার কথা ... ... ... ৪

১৭ নং

আমলাদের পরস্পর স্থান পরিবর্ত্তনের আজ্ঞা হইলে সমান বেতনের ও সমান শ্রেণী মতে হইবার কথা। ... ৪

১৮ নং

সময় গতে আমানতী টাকা ফেরৎ লওয়া যাইতে পারিলে যে গতিকে সেই টাকা ফিরিয়া পাওয়ার প্রার্থনা-পত্র হয় সেই প্রার্থনা-পত্রে সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট রূপে সেই গতিক ব্যক্ত করিবার কথা। ... ... ৪

জুন, ১৮৭০।

১ নং

কলিকাতায় কোন ব্যক্তির সম্পত্তি থাকিলে মফঃসলে তাহার ইনকম্‌টাকস ধার্য্য হইবার কথা। ... ... ... ৪

৫ নং

যে পেয়াদারা লেখাপড়া না জানে তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিবার যে বিধি আছে তাহা পুরাতন সুযোগ্য পেয়াদাদের প্রতি না বর্ত্তিবার কথা। ... ... ... ৫

৮ নং

দুই কি তদধিক জেলায় কোন ব্যক্তির ইনকম্ টাকস ধার্য্য হইতে পারিলে তদ্বিষয়ক বিধি ... ... ... ... ৫

৯ নং

কোন কর্ম্মকারক গবর্ণমেণ্টের অন্য কর্ম্মকারকের স্থানে কোন প্রকারের দ্রব্য লইবার কল্পনা করিলে বজেটের অনুমান-পত্রে তাহার বিধান করিবার কথা। ... ... ৬

১০ নং

১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ১৫ ধারার ১২ প্রকরণে মনোযোগ করিবার কথা, ও কোন ব্যক্তির কেবল পেন্‌স্যান কি উপকারার্থে দান পাইবার কারণে যে আফিডেবিট্ করা যায় তাহাতে ষ্টাম্প না লাগিবার কথা। ... ৬

১১ নং

১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ৪৫ ধারার বিধানের প্রতি মনোযোগের, এবং ষ্টাম্প কাগজ যে তারিখে ক্রয় করা যায় তাহার পর এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থনা না হইলে নূতন কাগজ না পাইবার ও তাহার মূল্য ফিরিয়া না পাইবার কথা। ... ... ... ৬

# হাইকোর্টের সরক্যুলর অর্ডর। দেওয়ানী পক্ষ।

ফেব্রুয়ারি, ১৮৭০।

২ নং

প্রত্যেক দেওয়ানী আদালতে বহীয়াদস্ত নামক এক খানা বহী রাখিবার কথা ও তদ্বিষয়ক বিধি। ... ... ৬

এপ্রিল, ১৮৭০।

৩ নং

যে যে জেলায় ১৮৬৯ সালের ৮ আইন প্রচলিত হয় সেই সেই জেলায় ঐ আইনের

# নির্ঘণ্ট।

## দেওয়ানী।



## পূর্ণাধিবেশনের দেওয়ানী নিষ্পত্তি।